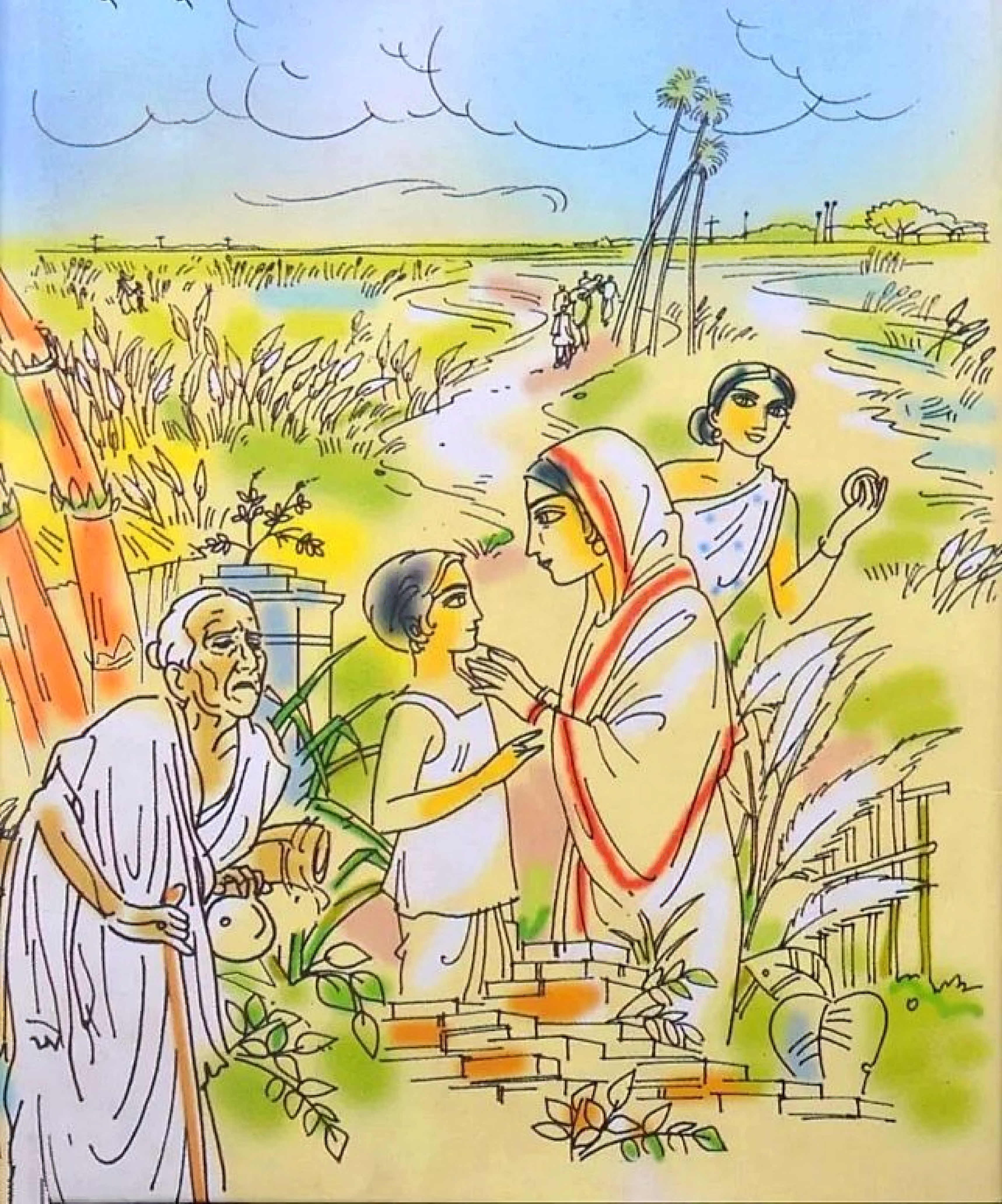
অপুর সংসার সমগ্র

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় • তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়





অপুর সংসার সমগ্র

অপুর সংসার সমগ্র

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়



মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদপট ও অলঙ্করণ
ইন্দ্রনীল ঘোষ

OPUR SANSAR SAMAGRA

An omnibus volume comprising the novels : Pather Panchali, Aparajita by Bibhuti Bhusan Banerjee and Kajal, Tritiya Purush by Taradas Banerjee.
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.
10 Shyamacharan Dey Street, Kolkata 700 073

ISBN : 81-7293-966-3

শব্দগ্রন্থন
টেক্‌নোগ্রাফ, ১/৯৮ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রোগ্রেসিভ আর্ট কনসার্ন, ১৫৯/১-এ, বি.বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০১২ হইতে অনিল হরি কর্তৃক মুদ্রিত

সূচিপত্র

ভূমিকা

ছোটবেলা থেকে মায়ের কাছে শুনেছি বাবার ইচ্ছে ছিল অপুর ছেলে কাজলকে নিয়ে একটি উপন্যাস লেখার। 'কাজল কেন লিখব' নামে একটি পনেরো-ষোলো পংক্তির ছোট্ট লেখাও লিখেছিলেন। সেই বয়সেই এ রকম দুঃসাহসিক চিন্তা করা সম্ভব। তখন থেকেই একটু-আধটু লিখতাম ছোট পত্রিকায়, হাতে-লেখা কাগজ প্রকাশ করতাম। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ফলের জন্য যে তিনমাস অপেক্ষা করতে হয়েছিল, তখন একটা ফুলস্ক্যাপ সাইজের মোটা কাগজে বাঁধানো খাতায় একপাতা দুপাতা করে কাজল লিখতে আরম্ভ করি। ওই খাতার বত্রিশ পাতা লিখেছিলাম। তারপর রেজাল্ট বেরুল। কলেজে ঢুকলাম। তিন-চারবছর খাতাটা তাকের ওপর বইপত্রের নিচে চাপা পড়েছিল। এম.এ. পড়বার সময় গরমের ছুটিতে 'কাজল' লিখে শেষ করে ফেলি। উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং প্রথম প্রকাশ করেছিলেন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক মনোজ বসু। উনিশশো সত্তর সালের ১০ই অগাস্ট 'কাজল' গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। তারপর কুড়ি-বাইশ বছর ধরে পাঠকেরা চিঠি লিখে ফোন করে বা দেখা হলে জানতে চেয়েছেন তারপর কাজলের কী হল। 'কাজল'-এর আখ্যানভাগ যেখানে শেষ তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। সেখান থেকে গল্প ধরে 'তৃতীয় পুরুষ'-এর কাহিনী টেনে নিয়ে গেলাম স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে। এরপর আমার আর দায়িত্ব নেই, আর আমি পারব না। 'কাজল' লিখেছিলাম ঘোরের মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায়। 'তৃতীয় পুরুষ' সচেতনভাবে লেখা, খুব পরিশ্রম হয়েছিল লিখতে। আমার নিজের জীবনকে আবছা কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করেছি দুটি উপন্যাসেই। সেখানেই ঘটেছে বিপদ। কাজলের জন্ম ১৩৩০ বঙ্গাব্দে। 'অপরাজিত'-তে তেমনই বলেছেন বিভূতিভূষণ। আর আমার ১৩৫৪-তে। এই চব্বিশ বছরের ব্যবধানকে উপন্যাসে মসৃণ করতে দারুণ বেগ পেতে হয়েছে। পেরেছি কিনা বিচার করবেন পাঠক।

এই সংকলনের বইগুলি আলাদাভাবে বাজারে পাওয়া যায়। তাহলে এগুলিকে একত্র করে প্রকাশ করার কারণ কী? এ প্রশ্ন পাঠকের মনে থাকতেই পারে। সবকটি কাহিনী একত্র করার একটা বড় কারণ এই যে অপু-দুর্গার গল্প সম্বন্ধে বাঙালি পাঠকের বিগতপ্রায় আট দশক ধরে ভালোবাসা এবং কৌতূহল রয়েছে। শেষ পর্যন্ত কী হল তাদের? অপুর ছেলে বড় হয়ে কী করছে, সে কি বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হল? একসঙ্গে দুই মলাটের ভেতর এই সব প্রশ্নের উত্তর পেলে পাঠকের পরিশ্রম বাঁচে কারণ যখন যে বই পড়তে ইচ্ছে করে, সেইমুহূর্তে তা হাতের কাছে পাওয়া যায় না। তাছাড়া গল্পের ধারাবাহিকতা এবং পারম্পর্য এভাবে আরো একান্ত করে পাওয়া যেতে পারে।

মানুষের গল্প কিন্তু শেষ হয় না। হরিহরের পরিবারের কাহিনী এগিয়েই চলেছে। হয়তো পরবর্তী প্রজন্মের কেউ সেই গল্প বলবার ভার নেবে। 'তৃতীয় পুরুষ'-এর শেষে সেই ইঙ্গিত আছে।

আমার পরম সৌভাগ্য বাবার সঙ্গে মিশে রইলাম। খুব ভালোবাসতেন আমাকে। আমার খেলার সঙ্গী ছিলেন। মাত্র তিনবছর বয়েসে তাঁকে হারাই। এতদিন পরে আবার এই আশ্চর্য মিলন। সাতান্ন বছর পরে।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

পথের পাঁচালী



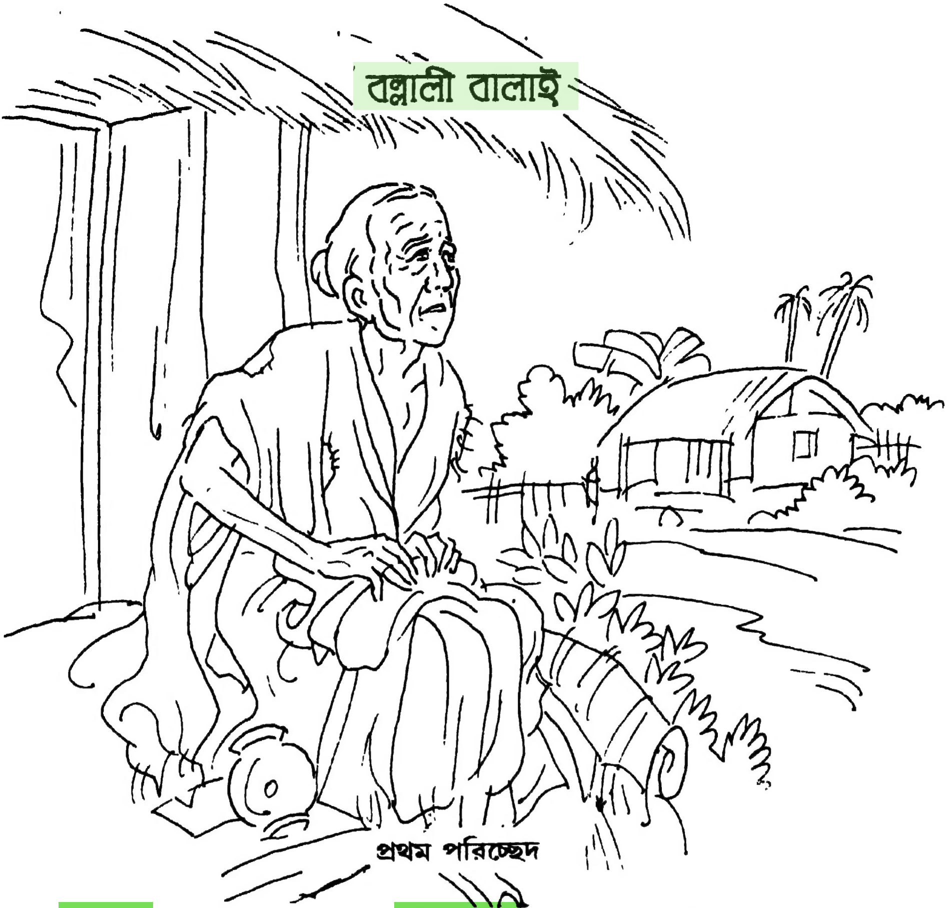
প্রথম প্রকাশ
মহালয়া আশ্বিন ১৩৩৬

অপুর সংসার সমগ্র—১

উৎসর্গ

পিতৃদেবকে

বল্লালী বালাই



প্রথম পরিচ্ছেদ

নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের একেবারে উত্তরপ্রান্তে হরিহর রায়ের ক্ষুদ্র কোঠা-বাড়ি। হরিহর সাধারণ অবস্থার গৃহস্থ, পৈতৃক আমলের সামান্য জমিজমার আয় ও দু-চার ঘর শিষ্য সেবকের বার্ষিকী প্রণামীর বন্দোবস্ত হইতে সাদাসিধাভাবে সংসার চালাইয়া থাকে।

পূর্বদিন ছিল একাদশী। হরিহরের দূরসম্পর্কীয়া দিদি ইন্দির ঠাক্‌রুন সকালবেলা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চালভাজার গুঁড়া জলখাবার খাইতেছে। হরিহরের ছয় বৎসরের মেয়েটি চুপ করিয়া পাশে বসিয়া আছে ও পাত্র হইতে তুলিবার পর হইতে মুখে পুরিবার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিমুঠা ভাজার গুঁড়ার গতি অত্যন্ত করুণভাবে লক্ষ করিতেছে এবং মাঝে মাঝে ক্রমশূন্যায়মান কাঁসার জামবাটির দিকে হতাশভাবে চাহিতেছে। দু-একবার কি বলি বলি করিয়াও যেন বলিতে পারিল না। ইন্দির ঠাক্‌রুন মুঠার পর মুঠা উঠাইয়া পাত্র নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া খুকির দিকে চাহিয়া বলিল, ও মা, তোর জন্যে দুটো রেখে দেলাম না?—ওই দ্যাখো!

মেয়েটি করুণ চোখে বলিল, তা হোক পিতি, তুই খা—

দুটো পাকা বড় বীচে-কলার একটা হইতে আধখানা ভাঙিয়া ইন্দির ঠাক্‌রুন তাহার হাতে দিল। এবার খুকির চোখ-মুখ উজ্জ্বল দেখাইল—সে পিসিমার হাত হইতে উপহার লইয়া মনোযোগের সহিত ধীরে ধীরে চুষিতে লাগিল।

ও ঘর হইতে তাহার মা ডাকিল, আবার ওখানে গিয়ে ধন্না দিয়ে বসে আছে? উঠে আয় ইদিকে।

ইন্দির ঠাক্‌রুন বলিল, থাক বৌ—আমার কাছে বসে আছে, ও কিছু করচে না। থাক্ বসে—

তবুও তাহার মা শাসনের সুরে বলিল, না, কেনই বা খাবার সময় ওরকম বসে থাকবে? ওসব আমি পছন্দ করি নে, চলে আয় বল্‌চি উঠে—

খুকি ভয়ে ভয়ে উঠিয়া গেল।

ইন্দির ঠাক্‌রুনের সঙ্গে হরিহরের সম্পর্কটা বড় দূরের। মামার বাড়ির সম্পর্কে কি রকমের বোন। হরিহর রায়ের পূর্বপুরুষের আদি বাড়ি ছিল পাশের গ্রামে যশড়া-বিষ্ণুপুর। হরিহরের পিতা রামচাঁদ রায় মহাশয় অল্প-বয়সে প্রথমবার বিপত্নীক হইবার পরে অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত লক্ষ করিলেন যে দ্বিতীয়বার তাঁহার বিবাহ দিবার দিকে পিতৃদেবের কোন লক্ষ্যই নাই। বছরখানেক কোনরকমে চক্ষুলজ্জায় কাটাইয়া দেওয়ার পরও যখন পিতার সেদিকে কোন উদ্যম দেখা গেল না, তখন রামচাঁদ মরীয়া হইয়া প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে নানারূপ অস্ত্র ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলেন। দুপুরবেলা কোথাও কিছু নাই, সহজ মানুষ রামচাঁদ আহারাদি করিয়া বিছানায় ছটফট করিতেছেন—কেহ নিকটে বসিয়া কি হইয়াছে জানিতে চাহিলে রামচাঁদ সুর ধরিতেন, তাঁহার আর কে আছে, কে-ই বা আর তাঁহাকে দেখিবে—এখন তাঁহার মাথা ধরিলেই বা কি—ইত্যাদি। ফলে এই নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে রামচাঁদের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ হয় এবং বিবাহের অল্পদিন পরে পিতৃদেবের মৃত্যু হইলে যশড়া-বিষ্ণুপুরের বাস উঠাইয়া রামচাঁদ স্থায়ীভাবে এখানেই বসবাস শুরু করেন। ইহা তাঁহার অল্প বয়সের কথা—রামচাঁদ এ গ্রামে আসিবার পর শ্বশুরের যত্নে টোলে সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন, এবং কালে এ অঞ্চলের মধ্যে ভালো পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তবে কোন বিষয়কর্ম কোনদিন তিনি করেন নাই, করার উপযুক্ত তিনি ছিলেন কিনা, সে বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহের কারণ আছে। বৎসরের মধ্যে নয় মাস তাঁহার স্ত্রী-পুত্র শ্বশুরবাড়িতেই থাকিত। তিনি নিজে পাড়ার পতিরাম মুখুজ্যের পাশার আড্ডায় অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দুইবেলা ভোজনের সময় শ্বশুরবাড়ি হাজির হইতেন মাত্র; যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত—পণ্ডিতমশায়, বৌটা ছেলেটা আছে, আখেরটা তো দেখতে হবে? রামচাঁদ বলিতেন—কোন ভাবনা নেই ভায়া, ব্রজো চক্কোত্তির ধানের মরাই-এর তলা কুড়িয়ে খেলেও এখন ওদের দু-পুরুষ হেসে-খেলে কাটবে। পরে তিনি ছক্কা ও পঞ্জুড়ির জোড় কি ভাবে মিলাইলে ঘর ভাঙিতে পারিবেন, তাহাই একমনে ভাবিতেন।

ব্রজ চক্রবর্তীর ধানের মরাই-এর নিত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার আস্থা যে কতটা বে-আন্দাজি ধরনের হইয়াছিল, তাহা শ্বশুরের মৃত্যুতে পরে রামচাঁদের বুঝিতে বেশি বিলম্ব হয় নাই। এ গ্রামে তাঁহার জমিজমাও ছিল না, নগদ টাকাও বিশেষ কিছু নয়। দুই চারিটি শিষ্য-সেবক এদিকে ওদিকে জুটিয়াছিল, তাহাদের দ্বারা কোন রকমে সংসার চালাইয়া পুত্রটিকে মানুষ করিতে থাকেন। তাঁহার পূর্বে তাঁহার এক জ্ঞাতি-ভ্রাতার বিবাহ তাঁহার শ্বশুরবাড়িতেই হয়। তাহারাও এখানেই বাস করিয়াছিল। তাহাদের দ্বারাও রামচাঁদের অনেক সাহায্য হইত। জ্ঞাতি-ভ্রাতার পুত্র নীলমণি রায় কমিসেরিয়েটে চাকরি করিতেন, কিন্তু কর্ম উপলক্ষে তাঁহাকে বরাবর বিদেশে থাকিতে হইত বলিয়া তিনি শেষকালে এখানকার বাস একরূপ উঠাইয়া বৃদ্ধা মাতাকে লইয়া কর্মস্থলে চলিয়া যান। এখন তাঁহাদের ভিটাতে আর কেহ নাই।

শোনা যায়, পূর্বদেশীয় এক নামজাদা কুলীনের সঙ্গে ইন্দির ঠাক্‌রুনের বিবাহ হইয়াছিল। স্বামী বিবাহের পর কালেভদ্রে এ গ্রামে পদার্পণ করিতেন। এক-আধ রাত্রি কাটাইয়া পাথেয় খরচ ও কৌলীন্য-সম্মান আদায় করিয়া লইয়া, খাতায় দাগ আঁকিয়া পরবর্তী নম্বরের শ্বশুরবাড়ি অভিমুখে তল্পি-বাহক সহ রওনা হইতেন, কাজেই স্বামীকে ইন্দির ঠাক্‌রুন ভালো মনে করিতেই পারে না। বাপ-মায়ের মৃত্যুর পর ভাই-এর আশ্রয়ে দু-মুঠা অন্ন পাইয়া আসিতেছিল, কপালক্রমে সে ভাইও অল্প বয়সে মারা গেল। হরিহরের পিতা রামচাঁদ অল্প পরেই এ ভিটাতে বাড়ি তুলিলেন এবং সেই সময় হইতেই ইন্দির ঠাক্‌রুনের এ সংসারে প্রথম প্রবেশ। সে সকল আজিকার কথা নহে।

তাহার পর অনেকদিন হইয়া গিয়াছে, শাঁখারিপুকুরে নাল ফুলের বংশের পর বংশ কত

আসিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে। চক্রবর্তীদের ফাঁকা মাঠে সীতানাথ মুখুজ্যে নতুন কলমের বাগান বসাইল এবং সে সব গাছ আবার বুড়া হইতেও চলিল। কত ভিটায় নতুন গৃহস্থ বসিল, কত জনশূন্য হইয়া গেল, কত গোলোক চক্রবর্তী, ব্রজ চক্রবর্তী মরিয়া হাজিয়া গেল, ইছামতীর চলোর্মি-চঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা অনন্ত কালপ্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কুটার মতো, ঢেউয়ের ফেনার মতো, গ্রামের নীলকুঠির কত জন্‌সন টম্‌সন সাহেব, কত মজুমদারকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল।

শুধু ইন্দির ঠাক্‌রুন এখনও বাঁচিয়া আছে। ১২৪০ সালের সে ছিপছিপে চেহারার হাস্যমুখী তরুণী নহে, পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধা, গাল তোবড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া শরীর সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, দূরের জিনিস আগের মতো চোখে ঠাহর হয় না, হাত তুলিয়া যেন রৌদ্রের ঝাঁজ হইতে বাঁচাইবার ভঙ্গিতে চোখ ঢাকিয়া বলে, কে আসে? নবীন? বেহারী? না, ও তুমি রাজু...

এই ভিটারই কি কম পরিবর্তনটা ইন্দির ঠাক্‌রুনের চোখের উপর ঘটিয়া গেল! ওই ব্রজ চক্রবর্তীর যে ভিটা আজকাল জঙ্গল হইয়া পড়িয়া আছে, কোজাগরী লক্ষ্মী-পূর্ণিমার দিন গ্রামসুদ্ধ লোক সেখানে পাত পাড়িত। বড় চণ্ডীমণ্ডপে কি পাশার আড্ডাটাই বসিত সকালে বিকালে! তখন কি ছিল ওই রকম বাঁশবন! পৌষ-পার্বণের দিন ওই ঢেঁকিশালে একমণ চাল কোটা হইত পৌষ-পিঠার জন্য—চোখ বুজিয়া ভাবিলেই ইন্দির ঠাক্‌রুন সে সব এখনও দেখিতে পায় যে! ওই রায়বাড়ির মেজবৌ লোকজন সঙ্গে করিয়া চাল কুটাইতে আসিয়াছেন, ঢেঁকিতে দমাদম পাড় পড়িতেছে, সোনার বাউটি রাঙা হাতে একবার সামনে সরিয়া আসিতেছে আবার পিছাইয়া যাইতেছে, জগদ্ধাত্রীর মতো রূপ, তেমনি স্বভাবচরিত্র। নতুন যখন ইন্দির ঠাক্‌রুন বিধবা হইল, তখন প্রতি দ্বাদশীর দিন প্রাতঃকালে নিজের হাতে জলখাবার গোছাইয়া আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া যাইতেন। কোথায় গেল কে! সেকালের আর কেহ বাঁচিয়া নাই যার সঙ্গে সুখদুঃখের দুটো কথা কয়।

তারপর এ সংসারে আশ্রয়দাতা রামচাঁদ মারা গেলেন, তাঁর ছেলে হরিহর তো হইল সেদিন। ঘাটের পথে লাফাইয়া লাফাইয়া খেলিয়া বেড়াইত, মুখুজ্যেদের তেঁতুল গাছে ডাঁশা তেঁতুল খাইতে গিয়া পড়িয়া হাত ভাঙিয়া দুই-তিন মাস শয্যাগত ছিল; সেদিনের কথা। ধুমধাম করিয়া অল্প বয়সে তাহার বিবাহ হইল—পিতার মৃত্যুর পর দশ বৎসরের নববিবাহিতা পত্নীকে বাপের বাড়ি ফেলিয়া রাখিয়া দেশছাড়া হইয়া গেল। আট-দশ বছর প্রায় খোঁজখবর ছিল না—কালেভদ্রে একআধখানা চিঠি দিত, কখনও কখনও দু'পাঁচ টাকা বুড়ির নামে মনি-অর্ডার করিয়া পাঠাইত। এই বাড়ি আগুলিয়া কত কষ্টে, কতদিন না খাইয়া প্রতিবেশীর দুয়ারে চাহিয়া চিন্তিয়া তাহার দিন গিয়াছে।

অনেকদিন পরে হরিহর আজ ছয় সাত বৎসর আসিয়া ঘর-সংসার পাতিয়াছে, তাহার একটি মেয়ে হইয়াছে—সেও প্রায় ছয় বৎসরেরটি হইতে চলিল। বুড়ি ভাবিয়াছিল এতদিনে সেই ছেলেবেলার ঘর-সংসার আবার বজায় হইল। তাহার সংকীর্ণ জীবনে সে অন্য সুখ চাহে নাই, অন্য প্রকার সুখদুঃখের ধারণাও সে করিতে অক্ষম—আশৈশব-অভ্যস্ত জীবনযাত্রার পুরাতন পথে যদি গতির মোড়টা ঘুরিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলেই সে খুশি, তাহার কাছে সেইটাই চরম সুখের কাহিনী।

হরিহরের ছোট্ট মেয়েটাকে সে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতে পারে না—তাহার নিজেরও এক মেয়ে ছিল, নাম ছিল তার বিশ্বেশ্বরী। অল্প বয়সেই বিবাহ হয় এবং বিবাহের অল্প পরেই মারা যায়। হরিহরের মেয়ের মধ্যে বিশ্বেশ্বরী মৃত্যুপারের দেশ হইতে চল্লিশ বছর পরে তাহার অনাথা মায়ের কোলে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। চল্লিশ বছরের নিভিয়া-যাওয়া ঘুমন্ত মাতৃত্ব মেয়েটার মুখের বিপন্ন অপ্রতিভ ভঙ্গিতে, অবোধ চোখের হাসিতে—একমুহূর্তে সচকিত আগ্রহে, শেষ-হইতে চলা জীবনের ব্যাকুল ক্ষুধায় জাগিয়া উঠে।

কিন্তু যাহা সে ভাবিয়াছিল তাহা হয় নাই। হরিহরের বৌ দেখিতে টুকটুকে সুন্দরী হইলে কি হইবে, ভারি ঝগড়াটে, তাহাকে তো দুই চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারে না। কোথাকার কে তার ঠিকানা নাই, কি তাহার সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজিয়া মেলে না, বসিয়া বসিয়া অন্নধ্বংস করিতেছে।

সে খুঁটিনাটি লইয়া বুড়ির সঙ্গে দুবেলা ঝগড়া বাধায়। অনেকটা ঝগড়া চলিবার পর বুড়ি নিজস্ব একটি পিতলের ঘটি কাঁখে ও ডান হাতে একটা কাপড়ের পুঁটুলি ঝুলাইয়া বলিত—চল্লাম নতুন বৌ, আর যদি কখনও এ বাড়ির মাটি মাড়াই, তবে আমার—। বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গিয়া বুড়ি মনের দুঃখে বাঁশবাগানে সারাদিন বসিয়া কাটাইত। বৈকালের দিকে সন্ধান পাইয়া হরিহরের ছোট্ট মেয়েটা তাহার কাছে গিয়া তাহার আঁচল ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিত—ওঠ্ পিতিমা, মাকে বল্‌বো আল্ তোকে বক্‌বে না, আয় পিতিমা। তাহার হাত ধরিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে বুড়ি বাড়ি ফিরিত। সর্বজয়া মুখ ফিরাইয়া বলিত, ওই এলেন। যাবেন আর কোথায়! যাবার কি আর চুলো আছে এই ছাড়া?... তেজটুকু আছে এদিকে ষোল আনা!

এ রকম উহারা বাড়ি আসার বৎসর-খানেকের মধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে—বহুবার হইয়া গিয়াছে এবং মাঝে মাঝে প্রায়ই হয়।

হরিহরের পুবের ভিটায় খড়ের ঘরখানা অনেকদিন বে-মেরামতি অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই ঘরটাতে বুড়ি থাকে। একটা বাঁশের আল্‌নায় খান দুই ময়লা ছেঁড়া থান। ছেঁড়া জায়গাটার দুই প্রান্ত একসঙ্গে করিয়া গেরো বাঁধা। বুড়ি আজকাল ছুঁচে সুতা পরাইতে পারে না বলিয়া কাপড় সেলাই করিবার সুবিধা নাই, বেশি ছিঁড়িয়া গেলে গেরো বাঁধে। একপাশে একখানা ছেঁড়া মাদুর ও কতকগুলি ছেঁড়া কাঁথা। একটা পুঁটুলিতে রাজ্যের ছেঁড়া কাপড় বাঁধা। মনে হয় কাঁথা বুনিবার উপকরণ স্বরূপ সেগুলি বহুদিন হইতে সযত্নে সঞ্চিত আছে, কখনও দরকার হয় নাই, বর্তমানে দরকার হইলেও কাঁথা বুনিবার মতো চোখের তেজ আর তাহার নাই। তবুও সেগুলি পরম যত্নে তোলা থাকে, ভাদ্রমাসে বর্ষার পর রৌদ্র ফুটিলে বুড়ি সেগুলি খুলিয়া মাঝে মাঝে উঠানে রৌদ্রে দেয়। বেতের পেঁট্‌রাটার মধ্যে একটা পুঁটুলি বাঁধা কতকগুলো ছেঁড়া লালপাড় শাড়ি—সেগুলি তাহার মেয়ে বিশ্বেশ্বরীর; একটা পিতলের চাদরের ঘটি, একটা মাটির ছোবা, গোটা দুই মাটির ভাঁড়। পিতলের ঘটিতে চালভাজা ভরা থাকে, রাত্রে হামানদিস্তা দিয়া গুঁড়া করিয়া তাই মাঝে মাঝে খায়। মাটির ভাঁড়গুলার কোনোটাতে একটুখানি তেল, কোনোটাতে একটু নুন, কোনোটাতে সামান্য একটু খেজুরের গুড়। সর্বজয়ার কাছে চাহিলে সব সময় মেলে না বলিয়া বুড়ি সংসার হইতে লুকাইয়া আনিয়া সেগুলি বিবাহের বেতের পেঁট্‌রার মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দেয়।

সর্বজয়া এ ঘরে আসে ক্বচিৎ কালেভদ্রে কখনো। কিন্তু সন্ধ্যার সময় তার মেয়ে ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া-কাঁথা-পাতা বিছানায় বসিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত একমনে পিসিমার মুখে রূপকথা শোনে। খানিকক্ষণ এ-গল্প ও-গল্প শুনিবার পর খুকি বলে,—পিতি, সেই ডাকাতের গল্পটা বল্ তো! গ্রামের একঘর গৃহস্থবাড়িতে পঞ্চাশ বছর আগে ডাকাতি হইয়াছিল, সেই গল্প। ইতিপূর্বে বহুবার বলা হইয়া গেলেও কয়েকদিনের ব্যবধানে উহার পুনরাবৃত্তি করিতে হয়, খুকি ছাড়ে না। তাহার পর সে পিসিমার মুখে ছড়া শোনে। সেকালের অনেক ছড়া ইন্দির ঠাক্‌রুনের মুখস্থ ছিল। অল্পবয়সে ঘাটে পথে সমবয়সি সঙ্গিনীদের কাছে ছড়া মুখস্থ বলিয়া তখনকার দিনে ইন্দির ঠাক্‌রুন কত প্রশংসা আদায় করিয়াছে। তাহার পর অনেক দিন সে এরকম ধৈর্যশীল শ্রোতা পায় নাই; পাছে মরিচা পড়িয়া যায়, এইজন্য তাহার জানা সব ছড়াগুলিই আজকাল প্রতি সন্ধ্যায় একবার ক্ষুদ্র ভাইঝিটির কাছে আবৃত্তি করিয়া ধার শানাইয়া রাখে। টানিয়া টানিয়া আবৃত্তি করে—

ও ললিতে চাঁপকলিতে একটা কথা শুন্‌সে,
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে—

এই পর্যন্ত বলিয়া সে হাসি-হাসি মুখে প্রতীক্ষার দৃষ্টিতে ভাইঝির দিকে চাহিয়া থাকে। খুকি উৎসাহের সঙ্গে বলে—চুড়োবাঁধা এক—মিন্‌সে।—'মি' অক্ষরটার উপর অকারণ জোর দিয়া ছোট মাথাটি সামনে তাল রাখিবার ভাবে ঝুঁকাইয়া পদটার উচ্চারণ শেষ করে। ভারি আমোদ লাগে খুকির।

তাহার পিসি ভাইঝিকে ঠকাইবার চেষ্টায় এমন সব ছড়া আবৃত্তি করে ও পাদপূরণের জন্য ছাড়িয়া দেয়, যাহা হয়তো দশ পনেরো দিন বলা হয় নাই—কিন্তু খুকি ঠিক মনে রাখে, তাহাকে ঠকানো কঠিন।

খানিক রাত্রে তাহার মা খাইতে ডাকিলে সে উঠিয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হরিহর রায়ের আদি বাসস্থান যশড়া-বিষ্ণুপুরে। যশড়া-বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ধনী-বংশ চৌধুরীরা নিষ্কর ভূমি দান করিয়া যে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণকে সেকালে গ্রামে বাস করাইয়া ছিলেন, হরিহরের পূর্বপুরুষ বিষ্ণুরাম রায় তাহাদের মধ্যে একজন।

ব্রিটিশ শাসন তখনও দেশে বদ্ধমূল হয় নাই। যাতায়াতের পথ সকল ঘোর বিপদসংকুল ও ঠগী, ঠ্যাঙাড়ে, জলদস্যু প্রভৃতিতে পূর্ণ থাকিত। এই ডাকাতের দল প্রায়ই গোয়ালা, বাগ্‌দি, বাউরি শ্রেণীর লোক। তাহারা অত্যন্ত বলবান—লাঠি এবং সড়কি চালানোতে সুনিপুণ ছিল। বহু গ্রামের নিভৃত প্রান্তে ইহাদের স্থাপিত ডাকাতে-কালীর মন্দিরের চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। দিনমানে ইহারা ভালোমানুষ সাজিয়া বেড়াইত, রাত্রে কালীপূজা দিয়া দূর পল্লীতে গৃহস্থ-বাড়ি লুঠ করিতে বাহির হইত। তখনকার কালে অনেক সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থও ডাকাতি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতেন। বাংলা দেশে বহু জমিদার ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের অর্থের মূলভিত্তি যে এই পূর্বপুরুষ-সঞ্চিত লুণ্ঠিত ধনরত্ন, যাঁহারাই প্রাচীন বাংলার কথা জানেন, তাঁহারা ইহাও জানেন।

বিষ্ণুরাম রায়ের পুত্র বীরু রায়ের এইরূপ অখ্যাতি ছিল। তাঁহার অধীনে বেতনভোগী ঠ্যাঙাড়ে থাকিত। নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের উত্তরে যে কাঁচা সড়ক ওদিকে চুয়াডাঙা হইতে আসিয়া নবাবগঞ্জ হইয়া টাকী চলিয়া গিয়াছে, ওই সড়কের ধারে দিগন্তবিস্তৃত বিশাল সোনাডাঙার মাঠের মধ্যে, ঠাকুরঝি পুকুর নামক সেকালকার এক বড় পুকুরের ধারে ছিল ঠ্যাঙাড়েদের আড্ডা। পুকুরের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের তলে তাহারা লুকাইয়া থাকিত এবং নিরীহ পথিককে মারিয়া তাহার যথাসর্বস্ব অপহরণ করিত। ঠ্যাঙাড়েদের কার্যপ্রণালী ছিল অদ্ভুত ধরনের। পথ-চলতি লোকের মাথায় লাঠির আঘাত করিয়া আগেই তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া তবে তাহারা তাহার কাছে অর্থান্বেষণ করিত—মারিয়া ফেলিবার পর এরূপ ঘটনাও বিচিত্র ছিল না যে, দেখা গেল নিহত ব্যক্তির কাছে সিকি পয়সাও নাই। লাশ পুকুরের মধ্যে গুঁজিয়া রাখিয়া ঠ্যাঙাড়েরা পরবর্তী শিকারের উপর দিয়া এ বৃথা শ্রমটুকু পোষাইয়া লইবার আশায় নিরীহমুখে পুকুরপাড়ের গাছতলায় ফিরিয়া যাইত। গ্রামের উত্তরে এই বিশাল মাঠের মধ্যে সেই বটগাছ আজও আছে, সড়কের ধারের একটা অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিকে আজও ঠাকুরঝি পুকুর বলে। পুকুরের বিশেষ চিহ্ন নাই, চৌদ্দ আনা ভরাট হইয়া গিয়াছে—ধান আবাদ করিবার সময় চাষিদের লাঙলের ফালে সেই নাবাল জমিটুকু হইতে আজও মাঝে মাঝে নরমুণ্ড উঠিয়া থাকে।

শোনা যায় পূর্বদেশীয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বালক-পুত্রকে সঙ্গে করিয়া কালীগঞ্জ অঞ্চল হইতে টাকী শ্রীপুরের ওদিকে নিজের দেশে ফিরিতেছিলেন। সময়টা কার্তিক মাসের শেষ, কন্যার বিবাহের অর্থসংগ্রহের জন্য ব্রাহ্মণ বিদেশে বাহির হইয়াছিলেন, সঙ্গে কিছু অর্থ ও জিনিসপত্র ছিল। হরিদাসপুরের বাজারে চটিতে রন্ধন-আহারাদি করিয়া তাঁহারা দুপুরের কিছু পরে পুনরায় পথে বাহির হইয়া পড়িলেন, ইচ্ছা রহিল যে সম্মুখে পাঁচক্রোশ দূরের নবাবগঞ্জ বাজারের চটিতে রাত্রি যাপন করিবেন। পথের বিপদ তাঁহাদের অবিদিত ছিল না, কিন্তু আন্দাজ করিতে কিরূপ ভুল হইয়াছিল—কার্তিক মাসের ছোট দিন, নবাবগঞ্জের বাজারে পৌঁছিবার অনেক পূর্বে সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে

সূর্যকে ডুবুডুবু দেখিয়া তাঁহারা দ্রুতপদে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ঠাকুরঝি পুকুরের ধারে আসিতেই তাঁহারা ঠ্যাঙাড়েদের হাতে পড়েন।

দস্যুরা প্রথম ব্রাহ্মণের মাথায় এক ঘা লাঠি বসাইয়া দিতেই তিনি প্রাণভয়ে চিৎকার করিতে করিতে পথ ছাড়িয়া মাঠের দিকে ছুটিলেন, ছেলেও বাবার পিছু পিছু ছুটিল। কিন্তু একজন বৃদ্ধ অপরে বালক—ঠ্যাঙাড়েদের সঙ্গে কতক্ষণ দৌড়পাল্লা দিবে? অল্পক্ষণেই তাহারা আসিয়া শিকারের নাগাল ধরিয়া ঘেরাও করিয়া ফেলিল। নিরুপায় ব্রাহ্মণ নাকি প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাকে মারা হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্রের জীবনদান—বংশের একমাত্র পুত্র—পিণ্ডলোপ ইত্যাদি। ঘটনাক্রমে বীরু রায়ও নাকি সেদিনের দলের মধ্যে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিতে পারিয়া প্রাণভয়ার্ত বৃদ্ধ তাঁহার হাতে-পায়ে পড়িয়া অন্তত পুত্রটির প্রাণরক্ষার জন্য বহু কাকুতি-মিনতি করেন—কিন্তু সরল ব্রাহ্মণ বুঝেন নাই, তাঁহার বংশের পিণ্ডলোপের আশঙ্কায় অপরের মাথাব্যথা হইবার কথা নহে, বরং তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে ঠ্যাঙাড়ে দলের অনুরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে হতভাগ্য পিতাপুত্রের মৃতদেহ একসঙ্গে ঠাণ্ডা হেমন্ত রাতে ঠাকুরঝি পুকুরের জলে টোকাপানা ও শ্যামাঘাসের দামের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়া বীরু রায় বাটী চলিয়া আসিলেন।

এই ঘটনার বেশি দিন পরে নয়, ঠিক পর বৎসর পূজার সময়। বাংলা ১২৩৮ সাল। বীরু রায় সপরিবারে নৌকাযোগে তাঁহার শ্বশুরবাড়ি হলুদবেড়ে হইতে ফিরিতেছিলেন। নাকিপুরের নিচের বড় নোনা গাঙ পার হইয়া মধুমতীতে পড়িবার পর দুই দিনের জোয়ার খাইয়া তবে আসিয়া দক্ষিণ শ্রীপুরের কাছে ইছামতীতে পড়িতে হইত। সেখান হইতে আর দিন-চারেকের পথ আসিলেই স্বগ্রাম।

সারাদিন বাহিয়া আসিয়া অপরাহ্নে টাকীর ঘাটে নৌকা লাগিল। বাড়িতে পূজা হইত। টাকীর বাজার হইতে পূজার দ্রব্যাদি কিনিয়া রাত্রিতে সেখানে অবস্থান করিবার পর প্রত্যুষে নৌকা ছাড়িয়া সকলে দেশের দিকে রওনা হইলেন। দিন দুই পরে সন্ধ্যার দিকে ধবলচিতের বড় খাল ও ইছামতীর মোহনায় একটা নির্জন চরে জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকা লাগাইয়া রন্ধনের জোগাড় হইতে লাগিল। বড় চর, মাঝে মাঝে কাশঝোপ ছাড়া অন্য গাছপালা নাই। একস্থানে মাঝিরা ও অন্যস্থানে বীরু রায়ের স্ত্রী রন্ধন চড়াইয়াছিলেন। সকলেরই মন প্রফুল্ল, দুই-দিন পরেই দেশে পৌঁছানো যাইবে। বিশেষত পূজা নিকটে, সে আনন্দ তো আছেই।

জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। নোনা গাঙের জল চক্‌চক্‌ করিতেছিল। হু-হু হাওয়ায় চরের কাশফুলের রাশি আকাশ, জ্যোৎস্না, মোহনার জল একাকার করিয়া উড়িতেছিল। হঠাৎ কিসের শব্দ শুনিয়া দু-একজন মাঝি রন্ধন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কাশঝোপের আড়ালে যেন একটা হুটপাট্‌ শব্দ, একটা ভয়ার্ত কণ্ঠ একবার অস্ফুট চিৎকার করিয়া উঠিয়াই তখনই থামিয়া যাইবার শব্দ। কৌতূহলী মাঝিরা ব্যাপার কি দেখিবার জন্য কাশঝোপের আড়ালটা পার হইতে না হইতে কি যেন একটা হুড়ুম করিয়া চর হইতে জলে গিয়া ডুব দিল। চরের সেদিকটা জনহীন—কিছু কাহারও চোখে পড়িল না।

কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, কি হইল, বুঝিবার পূর্বেই বাকি দাঁড়ি-মাঝি সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। গোলমাল শুনিয়া বীরু রায় আসিলেন, তাঁহার চাকর আসিল। বীরু রায়ের একমাত্র পুত্র নৌকাতে ছিল, সে কই? জানা গেল রন্ধনের বিলম্ব দেখিয়া সে খানিকক্ষণ আগে জোৎস্নায় চরের মধ্যে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। দাঁড়ি-মাঝিদের মুখ শুকাইয়া গেল, এদেশের নোনা গাঙ সমূহের অভিজ্ঞতায় তাহারা বুঝিতে পারিল কাশবনের আড়ালে বালির চরে বৃহৎ কুমীর শুইয়া ওৎ পাতিয়া ছিল। ডাঙা হইতে বীরু রায়ের পুত্রকে লইয়া গিয়াছে।

তাহার পর অবশ্য যাহা হয় হইল। নৌকার লগি লইয়া এদিকে ওদিকে খোঁজাখুঁজি করা হইল, নৌকা ছাড়িয়া মাঝনদীতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সকলে সন্ধান করিয়া বেড়াইল—তাহার পর কান্নাকাটি,

হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি। গত বৎসর দেশের ঠাকুরঝি পুকুরের মাঠে প্রায় এই সময়ে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, যেন এক অদৃশ্য বিচারক এ বৎসর ইছামতীর নির্জন চরে তাহার বিচার নিষ্পন্ন করিলেন। মূর্খ বীরু রায় ঠেকিয়া শিখিলেন যে সে অদৃশ্য ধর্মাধিকরণের দণ্ডকে ঠাকুরঝি পুকুরের শ্যামাঘাসের দামে প্রতারিত করিতে পারে না, অন্ধকারেও তাহা আপন পথ চিনিয়া লয়।

বাড়ি আসিয়া বীরু আর বেশি দিন বাঁচেন নাই। এইরূপে তাঁহার বংশে এক অদ্ভুত ব্যাপারের সূত্রপাত হইল। নিজের বংশ লোপ পাইলেও তাঁহার ভাইয়ের বংশাবলী ছিল। কিন্তু বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান কখনও বাঁচিত না, সাবালক হইবার পূর্বেই কোন-না-কোন রোগে মারা যাইত। সকলে বলিল, বংশে ব্রহ্মশাপ ঢুকিয়াছে। হরিহর রায়ের মাতা তারকেশ্বর দর্শনে গিয়া এক সন্ন্যাসীর কাছে কাঁদাকাটা করিয়া একটি মাদুলি পান। মাদুলির গুণেই হৌক বা ব্রহ্মশাপের তেজ দুই পুরুষ পরে কর্পূরের মতো উবিয়া যাওয়ার ফলেই হৌক, এত বয়সেও হরিহর আজও বাঁচিয়া আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দিন কতক পর।

খুকি সন্ধ্যার পর শুইয়া পড়িয়াছিল। বাড়িতে তাহার পিসিমা নাই, অদ্য দুই মাসের উপর হইল একদিন তাহার মায়ের সঙ্গে কি ঝগড়া-ঝাঁটি হওয়ার পর রাগ করিয়া দূর গ্রামে কোন্ এক আত্মীয়বাড়িতে গিয়া আছে। মায়েরও শরীর এতদিন বড় অপটু ছিল বলিয়া তাহাকে দেখিবারও কোন লোক নাই। সম্প্রতি মা কাল হইতে আঁতুড় ঘরে ঢোকা পর্যন্ত সে কখন খায় কখন শোয় তাহা কেহ বড় দেখে না।

খুকি শুইয়া শুইয়া যতক্ষণ পর্যন্ত ঘুম না আসিল, ততক্ষণ পিসিমার জন্য কাঁদিল। রোজ রাত্রে সে কাঁদে। তাহার পর খানিক রাত্রে কাহাদের কথাবার্তা শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, কুড়ুনীর মা দাই রান্নাঘরের ছেঁচতলায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে, পাড়ার নেড়ার ঠাকুরমা, আরও কে কে উপস্থিত আছেন। সকলেই যেন ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন। খুকি খানিকটা জাগিয়া থাকিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

বাঁশবনে হাওয়া লাগিয়া শির্‌শির্ শব্দ হইতেছে, আঁতুড় ঘরে আলো জ্বলিতেছে ও কাহারা কথাবার্তা কহিতেছে। দাওয়ায় জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু পরে সে ঘুমাইয়া পড়িল। খানিক রাত্রে ঘুমের ঘোরে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ও গোলমাল শুনিয়া আবার তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাহার বাবা ঘর হইতে বাহির হইয়া আঁতুড় ঘরেব দিকে দৌড়িয়া ব্যস্তভাবে বলিতে বলিতে যাইতেছে—কেমন আছে খুড়ি? কি হয়েচে? আঁতুড় ঘরের ভিতর হইতে কেমন ধরনের গলার আওয়াজ সে শুনিতে পাইল। গলার আওয়াজটা তার মায়ের। অন্ধকারের মধ্যে ঘুমের ঘোরে সে কিছু বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার কেমন ভয়-ভয় করিতেছিল। মা ও-রকম করিতেছে কেন? কি হইয়াছে মায়েব?

সে আরও খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া শুইয়া পড়িল এবং একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে সে জানে না—কোথায় যেন বিড়ালছানার ডাকে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চট্ করিয়া তাহার মনে পড়িল পিসিমার ঘরের দাওয়ায় ভাঙা উনুনের মধ্যে মেনি বিড়ালের ছানাগুলো সে বৈকালবেলা লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে—ছোট তুলতুলে ছানা কয়টি, এখনও চোখ ফুটে নাই। ভাবিল—ওই যাঃ, ওদের হুলো বেড়ালটা এসে বাচ্চাগুলোকে সব খেয়ে ফেললে... ঠিক্।

ঘুমচোখে উঠিয়া তাড়াতাড়ি সে অন্ধকারের মধ্যে পিসিমার দাওয়ায় গিয়া উনুনের মধ্যে হাত পুরিয়া দেখিল, বাচ্চা কয়টি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে। হুলো বেড়ালের কোন চিহ্ন নাই কোনও দিকে। পরে সে অবাক হইয়া আসিয়া শুইয়া পড়িল এবং একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমের ঘোরে আবার কিন্তু কোথায় বিড়ালছানা ডাকিতেছিল।

পরদিন উঠিয়া সে চোখ মুছিতেছে, কুড়ুনীর মা দাই বলিল, ও খুকি, কাল রাত্তিরে তোমার একটা ভাই হয়েচে, দেখবা না? ওমা, কাল রাত্তিরে এত চেঁচামেচি, এত কাণ্ড হয়ে গেল—কোথায় ছিলে তুমি? যা কাণ্ড হয়েলো, কালপুরের পীরির দরগায় সিন্নি দেবানে—বড্ড রক্ষে করেছেন রাত্তিরে।

খুকি এক দৌড়ে ছুটিয়া আঁতুড় ঘরের দুয়ারে গিয়া উঁকি মারিল। তাহার মা আঁতুড়ের খেজুর পাতার বেড়ার গা ঘেঁষিয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। একটি টুকটুকে অসম্ভব রকমের ছোট্ট, প্রায় একটা কাচের বড় পুতুলের চেয়ে কিছু বড় জীব কাঁথার মধ্যে শুইয়া—সেটিও ঘুমাইতেছে। গুলের আগুনের মন্দ মন্দ ধোঁয়ায় ভালো দেখা যায় না। সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই জীবটা চোখ মেলিয়া মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিয়া অসম্ভব রকমের ছোট্ট হাত দুটি নাড়িয়া নিতান্ত দুর্বলভাবে অতি ক্ষীণ সুরে কাঁদিয়া উঠিল। এতক্ষণ পরে খুকি বুঝিল রাত্রিতে বিড়ালছানার ডাক বলিয়া যাহা মনে করিয়াছিল তাহা কি। অবিকল বিড়ালছানার ডাক—দূর হইতে শুনিলে কিছু বুঝিবার জো নাই। হঠাৎ অসহায়, অসম্ভব রকমের ছোট্ট নিতান্ত ক্ষুদে ভাইটির জন্য দুঃখে, মমতায়, সহানুভূতিতে খুকির মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নেড়ার ঠাকুরমা ও কুড়ুনীর মা দাই বারণ করাতে সে ইচ্ছা সত্ত্বেও আঁতুড় ঘরে ঢুকিতে পারিল না।

মা আঁতুড় হইতে বাহির হইলে খোকার ছোট্ট দোলাতে দোল দিতে দিতে খুকি কত কি ছড়া গান করে। সঙ্গে সঙ্গে কত সন্ধ্যাদিনের কথা, পিসিমার কথা মনে আসিয়া তাহার চোখ জলে ভিজিয়া যায়। এই রকমের কত ছড়া যে পিসিমা বলিত! খোকা দেখিতে পাড়ার লোক ভাঙিয়া আসে। সকলে দেখিয়া বলে, ঘর-আলো-করা খোকা হয়েছে, কি মাথার চুল, কি রং! বলাবলি করিতে করিতে যায়—কি হাসি দেখেচ ন'দি?

খুকি কেবল ভাবে তাহার পিসিমা একবার যদি আসিয়া দেখিত। সবাই দেখিতেছে, আর তাদের পিসিমাই কোথায় গেল চলিয়া—আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না? সে ছেলেমানুষ হইলেও এটুকু বুঝিয়াছে যে, এ বাড়িতে বাবা কি মা কেহই পিসিমাকে ভালোবাসে না, তাহাকে আনিবার জন্য কেহ গা করিবে না। দিনমানে পিসির ঘরের দিকে চাহিলে মন কেমন করে, ঘরের কবাটটা এক এক দিন খোলাই পড়িয়া থাকে। দাওয়ায় চামচিকার নাদি জমিয়াছে। উঠানে সে-রকম আর ঝাঁট পড়ে না, এখানে শেওড়ার চারা, ওখানে কচু গাছ—পিসিমা বুঝি হইতে দিত? খুকির বড় বড় চোখ জলে ভরিয়া যায়—সেই ছড়া, সেই সব গল্প খুকি কি করিয়া ভোলে।

সেদিন হরি পালিতের মেয়ে আসিয়া তাহার মাকে বলিল, তোমাদের বুড়ি ঘাটের পথে দেখি মাঠের দিক থেকে একটা ঘটি আর পুঁটুলি হাতে করে আসছে—এসে চক্কোত্তি মশায়দের বাড়িতে ঢুকে বসে আছে, যাও দুগ্‌গাকে পাঠিয়ে দাও, হাত ধরে ডেকে আনুক, তাহলে রাগ পড়বে এখন—

হরি পালিতেরই বাড়ি বসিয়া বুড়ি তখন পাড়ার মেয়েদের মুখে হরিহরের ছেলে হওয়ার গল্প শুনিতেছিল।

ও পিতি!

বুড়ি চমকিয়া চাহিয়া দেখিল দুর্গা হাঁপাইতেছে, যেন অত্যন্ত ছুটিয়া আসিয়াছে। বুড়ি ব্যগ্রভাবে দুর্গাকে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেল—সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা ঝাঁপাইয়া বুড়ির কোলে পড়িল—তাহার মুখে হাসি অথচ চোখে জল—উঠানে ঝি-বউ যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, অনেকের চোখে জল আসিল। প্রবীণা হরি পালিতের স্ত্রী বলিলেন—নেও ঠাকুরঝি, ও তোমার আর জন্মে মেয়ে ছিল, সেই মেয়েই তোমার আবার ফিরে এসেছে—

বাড়ি আসিলে খোকাকে দেখিয়া তো বুড়ি হাসিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। কতদিন পরে ভিটায় আবার চাঁদ উঠিয়াছে।

বুড়ি সকালে উঠিয়া মহা খুশিতে ভিতর উঠান ঝাঁট দেয়, আগাছার জঙ্গল পরিষ্কার করে। দুর্গার মনে হয় এতদিনে আবার সংসারটা যেন ঠিকমতো চলিতেছে, এতদিন যেন কেমন ঠিক ছিল না।

দুপুরে আহার করিয়া বুড়ি খিড়কির পিছনে বাঁশবনের পথের উপর বসিয়া কঞ্চি কাটে। সেদিকে আর নদীর ধার পর্যন্ত লোকজনের বাস নাই, নদী অবশ্য খুব নিকটে নয়, প্রায় একপোয়া পথ—এই সমস্তটা শুধু বড় বড় আমবাগান ও ঝুপসি বাঁশবন ও অন্যান্য জঙ্গল। কঞ্চি কাটার সময় দুর্গা আসিয়া কাছে বসে, আবোলতাবোল বকে। ছোট এক বোঝা কাটা কঞ্চি জড়ো হইলে দুর্গা সেইগুলি বহিয়া বাড়ির মধ্যে রাখিয়া আসে। কঞ্চি কাটিতে কাটিতে মধ্যাহ্নের অলস আমেজে শীতল বাঁশবনের ছায়ায় বুড়ির নানা কথা মনে আসে।

সেই কতকাল আগের কথা সব!

সেই তিনি বার-তিনেক আসিয়াছিলেন—স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। একবার তিনি পুঁটুলির মধ্যে কি খাবার আনিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বরী তখন দুই বৎসরের। সকলে বলিল, ওলা—চিনির ডেলার মতো। ঘটির জলে গুলিয়া সেও একটু খাইয়াছিল। সেই একজন লোক আসিল—পুরানো সেই পেয়ারা গাছটার কাছে ঠিক সন্ধ্যার সময় আসিয়া দাঁড়াইল, শ্বশুরবাড়ির দেশ হইতে আসিয়াছে, একখানা চিঠি। চিঠি পড়িবার লোক নাই, ভাই গোলোকও পূর্ব বৎসর মারা গিয়াছে—ব্রজকাকার চণ্ডীমণ্ডপে পাশার আড্ডায় সে নিজেই পত্তরখানা লইয়া গেল। সেদিনের কথা আজ স্পষ্ট মনে হয়—ন'জ্যেঠা, মেজ জ্যেঠা, ব্রজ কাকা, ও-পাড়ার পতিত রায়ের ভাই যাদু রায়, আর ছিল গোলোকের সম্বন্ধী ভজহরি। পত্তর পড়িলেন সেজ জ্যেঠা। অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কে আনলে এ চিঠি রে ইন্দির? তাহার পর ইন্দির ঠাক্‌রুনকে বাড়ি আসিয়া তখনই হাতের নোয়া ও প্রথম যৌবনের বড় সাধের জিনিস বাপ-মায়ের দেওয়া রূপার পৈঁছেজোড়া খুলিয়া রাখিয়া কপালের সিন্দুর মুছিয়া নদীতে স্নান করিয়া আসিতে হইল। কত কালের কথা—সে সব স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে, তবু যেন মনে হয় সেদিনের!...

নিবারণের কথা মনে হয়—নিবারণ, নিবারণ! ব্রজ কাকার ছেলে নিবারণ! ষোল বৎসরের বালক, কি টক্‌টকে গায়ের রং, কি চুল! ওই যে চণ্ডীমণ্ডপের পোতা জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া আছে, বাঁশবনের মধ্যে—ওই ঘরে সে কঠিন জ্বররোগে শয্যাগত হইয়া যায়-যায় হইয়াও দুই-তিন-দিন রহিল। আহা, বালক সর্বদা জল জল করিত কিন্তু ঈশান কবিরাজ জল দিতে বারণ করিয়াছিলেন—মৌরীর পুঁটুলি একটু করিয়া চুষানো হইতেছিল। সেই নিবারণ চতুর্থ দিন রাত্রে মারা গেল, মৃত্যুর একটু আগেও সেই 'জল জল' তার মুখে বুলি—তবুও একবিন্দু জল তাহার মুখে ঠেকানো হয় নাই। সেই ছেলে মারা যাওয়ার পর পাঁচদিনের মধ্যে বড় খুড়ির মুখে কেউ জল দেওয়াইতে পারে নাই—পাঁচদিনের পর ভাশুর রামচাঁদ চক্কোত্তি নিজে ভ্রাতৃবধূর ঘরে গিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, তুই চলে গেলে আমার কি দশা হবে? এ বুড়ো বয়সে কোথায় যাব মা? বড় খুড়ি বনিয়াদি ধনী ঘরের মেয়ে ছিলেন—জগদ্ধাত্রীর মতো রূপ, অমন রূপসী বধূ এ অঞ্চলে ছিল না। স্বামীর পাদোদক না খাইয়া কখনও জল খান নাই—সেকালের গৃহিণী, রন্ধন করিয়া আত্মীয়-পরিজনকে খাওয়াইয়া নিজে তৃতীয় প্রহরে সামান্য আহার করিতেন। দান-ধ্যানে, অন্নবিতরণে ছিলেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। লোককে রাঁধিয়া খাওয়াইতে বড় ভালোবাসিতেন। তাই ভাশুরের কথায় মনের কোন কোমল স্থানে বুঝি ঘা লাগিল—তাহার পর তিনি উঠিয়াছিলেন ও জলগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু বেশিদিন বাঁচেন নাই, পুত্রের মৃত্যুর দেড় বৎসরের মধ্যেই তিনিও পুত্রের অনুসরণ করেন।

—একটু জল দে মা—এতটুকু দে—

—জল খেতে নাই, ছিঃ বাবা—কবরেজ মশায় যে বারণ করেচেন—জল খায় না—

—এতটুকু দে—এক ঢোক খাই মা—পায়ে পড়ি...

দুপুরের পাখ্‌পাখালির ডাকে সুদূর পঞ্চাশ বছরের পার হইতে বাঁশের মর্ মর্ শব্দ কানে ভাসিয়া আসে।

খুকি বলে—পিতি, তোর ঘুম নেগেচে? আয়, শুবি চল্।

হাতের দা-খানা রাখিয়া বুড়ি বলে—ওই দ্যাখো, আবার পোড়া ঝিমুনি ধরেছে—অবেলায় এখন আর শোবো না মা—এইগুলো সাঙ্গ করে রাখি—নিয়ে আয় দিকি ওই বড় আগালেডা?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খোকা প্রায় দশ মাসের হইল। দেখিতে রোগা রোগা গড়ন, অসম্ভব রকমের ছোট্ট মুখখানি। নিচের মাড়িতে মাত্র দু'খানি দাঁত উঠিয়াছে। কারণে অকারণে যখন-তখন সে সেই দু'খানি মাত্র দুধে দাঁতওয়ালা মাড়ি বাহির করিয়া হাসে। লোকে বলে—বৌমা, তোমার খোকার হাসিটা বায়না করা। খোকাকে একটুখানি ধরাইয়া দিলে আর রক্ষা নাই, আপনা হইতে পাগলের মতো এত হাসি শুরু করিবে যে, তাহার মা বলে—আচ্ছা খোকন, আজ থামো, বড্ড হেসেচো, আজ বড্ড হেসেচো—আবার কালকের জন্যে একটু রেখে দাও। মাত্র দুইটি কথা সে বলিতে শিখিয়াছে! মনে সুখ থাকিলে মুখে বলে জে—জে—জে—জে এবং দুধে-দাঁত বাহির করিয়া হাসে। মনে দুঃখ হইলে বলে, না—না—না—না ও বিশ্রী রকমের চিৎকার করিয়া কাঁদিতে শুরু করে। যাহা সামনে পায়, তাহারই উপর ওই নতুন দাঁত দু'খানির জোর পরখ করিয়া দেখে—মাটির ঢেলা, এক টুকরা কাঠ, মায়ের আঁচল; দুধ খাওয়াইতে বসিলে এক এক সময় সে হঠাৎ কাঁসার ঝিনুকখানাকে মহা আনন্দে নতুন দাঁত দু'খানি দিয়া জোরে কামড়াইয়া ধরে। তাহার মা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলে—ওকি, হাঁরে ও খোকা, ঝিনুকখানাকে কামড়ে ধল্লি কেন?—ছাড় ছাড়—ওরে করিস কি—দু'খানা দাঁত তো তোর মোটে সম্বল—ভেঙে গেলে হাসবি কি করে শুনি? খোকা তবুও ছাড়ে না। তাহার মা মুখের ভিতব আঙুল দিয়া অতিকষ্টে ঝিনুকখানাকে ছাড়াইয়া লয়।

খুকির উপর সব সময় নির্ভর করিয়া থাকা যায় না বলিয়া রান্নাঘরের দাওয়া খানিকটা উঁচু করিয়া বাঁশের বাকারি দিয়া ঘিরিয়া তাহার মধ্যে খোকাকে বসাইয়া রাখিযা তাহার মা নিজের কাজ করে। খোকা কাটরার মধ্যে শুনানি হওয়া ফৌজদারি মামলার আসামির মতো আটক থাকিয়া কখনও আপন মনে হাসে, অদৃশ্য শ্রোতাগণের নিকট দুর্বোধ্য ভাষায় কি বকে, কখনও বাখারির বেড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাঁশবনের দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার মা ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিলে—মায়ের ভিজে কাপড়ের শব্দ পাইতেই খোকা খেলা হইতে মুখ তুলিয়া এদিক-ওদিক চাহিতে থাকে ও মাকে দেখিতে পাইয়া একমুখ হাসিয়া বাখারির বেড়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। তার মা বলে—একি, ওমা, এই কাজল পরিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে গেলাম, একেবারে হাঁড়িচাচা পাখি সেজে বসে আছে? দেখি, এদিকে আয়। জোর করিয়া নাকমুখ রগড়াইয়া কাজল উঠাইতে গিয়া খোকার রাঙা মুখ একেবারে সিঁদুর হইয়া যায়—মহা আপত্তি করিয়া রাগের সহিত বলে, জে—জে—জে—জে, তাহার মা শোনে না।

ইহার পর মায়ের হাতে গামছা দেখিলেই খোকা থল্‌থল্ করিয়া হামাগুড়ি দিয়া একদিকে ছুটিয়া পলাইতে যায়, এক একদিন ঘাট হইতে আসিয়া সর্বজয়া বলে—খোকন বলে টু—উ—উ! দোলো তো খোকা? দোলে দোলে খোকন দোলে—! খোকা অমনি বসিয়া পড়িয়া সামনে পিছনে বেজায় দুলিতে থাকে ও মনের সুখে ছোট্ট হাত দুটি নাড়িয়া গান ধরে—

(গীত)

জে—এ—এ—জে—জে—জে—এ—এ—ই

জে—জে—জে—জে—এ

জে—জে—জে—জে—জে—জে

তার মা বলে, আচ্ছা থামো আর দুলো না খোকা, হয়েচে, হয়েচে, খুব হয়েচে। কখনও কখনও

কাজ করিতে করিতে সর্বজয়া কান পাতিয়া শুনিত, খোকার বেড়ার ভিতর হইতে কোন শব্দ আসিতেছে না—যেন সে চুপ করিয়া গিয়াছে! তাহার বুক ধড়াস্ করিয়া উঠিত—শেয়ালে নিয়ে গেল না তো? সে ছুটিয়া আসিয়া দেখিত খোকা সাজি উপুড়-করা একরাশ চাঁপা ফুলের মতো মাটির উপর বে-কায়দায় ছোট্ট হাতখানি রাখিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, চারিদিক হইতে নাল্‌সে পিঁপড়ে, মাছি ও সুড়সুড়ি পিঁপড়ের দল মহালোভে ছুটিয়া আসিতেছে, খোকার পাতলা পাতলা রাঙা ঠোঁট দুটা ঘুমের ঘোরে যেন একটু একটু কাঁপিতেছে, ঘুমের ঘোরে সে যেন মাঝে মাঝে ঢোঁক গিলিয়া জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতেছে—যেন জাগিয়া উঠিল, আবার তখনই এমন ঘুমাইয়া পড়িতেছে যে নিশ্বাসের শব্দটিও পাওয়া যাইতেছে না।

সকাল হইতে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা হইতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহাদের বাঁশবাগানের ধারে নির্জন বাড়িখানি দশ মাসের শিশুর অর্থহীন আনন্দ-গীতি ও অবোধ কলহাস্যে মুখরিত থাকে।

মা ছেলেকে স্নেহ দিয়া মানুষ করিয়া তোলে, যুগে যুগে মায়ের গৌরবগাথা তাই সকল জনমনের বার্তায় ব্যক্ত। কিন্তু শিশু যা মাকে দেয়, তাই কি কম? সে নিঃস্ব আসে বটে, কিন্তু তার মন-কাড়িয়া-লওয়া হাসি, শৈশব-তারল্য, চাঁদ ছানিয়া-গড়া মুখ, আধ আধ আবোল-তাবোল বকুনির দাম কে দেয়? ওই তার ঐশ্বর্য, ওরই বদলে সে সেবা নেয়, রিক্ত হাতে ভিক্ষুকের মতো নেয় না।

এক একদিন যখন হরিহর বাজারের হিসাব কি নিজের লেখা লইয়া ব্যস্ত আছে—সর্বজয়া ছেলেকে লইয়া গিয়া বলে, ওগো, ছেলেটাকে একটু ধরো না? মেয়েটা কোথায় বেরিয়েছে—ঠাকুরঝি গিয়েচে ঘাটে...ধরো দিকি একটু! আমি নাইবো, না, ছেলে ঘাড়ে করে বসে থাকলেই হবে?

হরিহর বলে—উঁহু, ওসব গোলমাল এখন এখানে নিয়ে এসো না, বড় ব্যস্ত।

সর্বজয়া রাগিয়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। হরিহর হিসাবপত্র লিখিতে লিখিতে হঠাৎ দেখে ছেলে তার চটিজুতার পাটিটা মুখে দিয়া চিবাইতেছে! হরিহর জুতাখানা কাড়িয়া লইয়া বলে—আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আছি একটা কাজ নিয়ে।

হঠাৎ একটা চড়ুই পাখি আসিয়া রোয়াকের ধারে বসে। খোকা বাবার মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া সেদিকে দেখাইয়া হাত নাড়িয়া বলে—জে—জে—জে—

হরিহরের বিরক্তি দূর হইয়া গিয়া ভারি মমতা হয়।

অনেক দিন আগের এক রাত্রির কথা মনে পড়ে।

নতুন পশ্চিম হইতে আসিয়া সেদিন সে গ্রামের সকলের পরামর্শে শ্বশুরবাড়ি স্ত্রীকে আনিতে গিয়াছিল। দুপুরের পর শ্বশুরবাড়ির গ্রামের ঘাটে নৌকা পৌঁছিল। বিবাহের পর একটিবার মাত্র সে এখানে আসিয়াছিল, পথঘাট মনে ছিল না, লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া সে শ্বশুরবাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার ডাকাডাকিতে একটি গৌরাঙ্গী ছিপছিপে চেহারার তরুণী কে ডাকিতেছে দেখিবার জন্য বাহিরের দরজায় দাঁড়াইল এবং তাহার সহিত চোখোচোখি হওয়াতে সেখান হইতে চট্ করিয়া সরিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল—হরিহর ভাবিতে লাগিল, মেয়েটি কে? তাহার স্ত্রী নয় তো? সে কি এত বড় হইয়াছে?

রাত্রিতে সন্ধান মিলিল। সর্বজয়া দারিদ্র্য হইতে রক্ষিত তাহার মায়ের একখানা লালপাড় মট্‌কা শাড়ি পরিয়া অনেক রাত্রে ঘরে আসিল। হরিহর চাহিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইল। দশ বৎসর আগেকার সে বালিকাপত্নীর কিছুই আর এই সুন্দরী তরুণীতে নাই—কে যেন ভাঙিয়া নতুন করিয়া গড়িয়াছে। মুখের সে কচিভাবটুকু আর নাই বটে, কিন্তু তাহার স্থানে যে সৌন্দর্য ফুটিয়াছে তাহা যে খুব সুলভ নহে হরিহরের সেটুকু বুঝিতে দেরি হইল না। হাত-পায়ের গঠন, গতিভঙ্গি সবই নিখুঁত ও নতুন।

ঘরে ঢুকিয়া সর্বজয়া প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল। যদিও সে বড় হইয়াছে, এ পর্যন্ত স্বামীর সহিত দেখা একরূপ ঘটে নাই বলিলেই চলে। নববিবাহিতার সে লজ্জাটুকু তাহাকে যেন নতুন

করিয়া পাইয়া বসিল। হরিহরই প্রথমে কথা কহিল। স্ত্রীর ডানহাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বিছানায় বসাইয়া বলিল—বোসো এখানে, ভালো আছো?

সর্বজয়া মৃদু হাসিল। লজ্জাটা যেন কিছু কাটিয়া গেল। বলিল—এতদিন পরে বুঝি মনে পড়ল? আচ্ছা, কি বলে এতদিন ডুব মেরে ছিলে? পরে সে হাসিয়া বলিল—কেন, কি দোষ করেছিলাম বলো তো?

স্ত্রীর কথাবার্তায় অজ পাড়াগাঁয়ের টান ও ভঙ্গিটুকু হরিহরের নতুন ও ভারি মিষ্ট বলিয়া মনে হইল। পরে সে লক্ষ করিয়া দেখিল স্ত্রীর হাতে কেবল গাছকয়েক কড় ও কাঁচের চুড়ি ছাড়া অন্য কোন গহনা নাই। গরিব ঘরের মেয়ে, দিবার কেহ নাই, এতদিন খবর না লইয়া ভারি অন্যায় করিয়াছে সে। সর্বজয়াও চাহিয়া স্বামীকে দেখিতে ছিল। আজ সারাদিন সে চার-পাঁচ বার আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়াছে—স্বাস্থ্যময় যৌবন হরিহরের সুগঠিত শরীরের প্রতি অঙ্গে যে বীরের ভঙ্গি আনিয়া দিয়াছে, তাহা বাংলা দেশের পল্লীতে সচরাচর চোখে পড়ে না। বাপ-মায়ের কথাবার্তায় আজ সে শুনিয়াছে তাহার স্বামী পশ্চিম হইতে নাকি খুব লেখাপড়া শিখিয়া আসিয়াছে, টাকাকড়ির দিক হইতেও দু'পয়সা না আনিয়াছে এমন নয়। এতদিনে তাহার দুঃখ ঘুচিল, ভগবান বোধ হয় এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। সকলেই বলিত স্বামী তাহার সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে—আর কখনও ফিরিবে না। মনে-প্রাণে একথা বিশ্বাস না করিলেও স্বামীর পুনরাগমন এতকাল তাহার কাছে দুরাশার মতোই ঠেকিয়াছে। কত রাত্রি দুশ্চিন্তায় জাগিয়া কাটাইয়াছে, গ্রামের বিবাহ উপনয়নের উৎসবে ভালো করিয়া যোগ দিতে পারে নাই—সকলেই আহা আহা বলে, গায়ে পড়িযা সহানুভূতি জানায়; অভিমানে তাহার চোখে জল আসিত—অনাবিল যৌবনের সোনালি কল্পনা এতদিন শুধু আড়ালে আবডালে নির্জন রাত্রিতে চোখের জলে ঝরিয়া পড়িয়াছে।, কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করে নাই, কিন্তু বসিয়া বসিয়া কতদিন ভাবিত—এই তো সংসারের অবস্থা, যদি সত্যসত্যই স্বামী ফিরিয়া না আসে, তবে বাপ-মায়ের মৃত্যুর পরে কোথায় দাঁড়াইবে—কে আশ্রয় দিবে?

এতদিনে কিনারা মিলিল।

হরিহর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, আমাকে যখন তুমি ওবেলা দরজার বাইরে দেখলে—তখন চিনতে পেরেছিলে? সত্যি কথা বোলো কিন্তু—

সর্বজয়া হাসিয়া বলিল—নাঃ, তা চিনব কেন! প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি, তারপর তখুনি—

—আন্দাজে—

—আন্দাজে নয় গো, আন্দাজে নয়—সত্যি-সত্যি। দেখলে না, তখ্খনি মাথায় কাপড় দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম? তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তুমি বলো তো, আমায় চিনতে পেরেছিলে? বলো তো গা ছুঁয়ে?

নানা কেজো-অকেজো কথাবার্তায় রাত বাড়িতে লাগিল। পরলোকগত দাদার কথা উঠিতে সর্বজয়ার চোখের জল আর বাঁধ মানে না। হরিহর জিজ্ঞাসা করিল—বীণার বিয়ে কোথায় হল? ছোট শালীর নাম জানিত না, আজই শ্বশুরের মুখে শুনিয়াছে।

—তার বিয়ে হোল কুড়ুলে বিনোদপুর—ওই যে বড় গাঙ, কি বলে? মধুমতী।—সেই মধুমতীর ধারে।

একটা প্রশ্ন বার বার সর্বজয়ার মনে আসিতে লাগিল—স্বামী তাহাকে লইয়া যাইবে তো? না, দেখাশুনা করিয়া আবার চলিয়া যাইবে সেই কাশী গয়া? বলি বলি করিয়াও মুখ ফুটিয়া সে কথাটা কিন্তু কোনরূপেই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না—তাহার মনের ভিতর কে যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বলিল—না নিয়ে যাক্ গে—আবার তা নিয়ে বলা, কেন এত ছোট হতে যাওয়া?—

হরিহর সমস্যার সমাধান নিজ হইতেই করিল। বলিল—কাল চল তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাই নিশ্চিন্দিপুরে—

সর্বজয়ার বুকে ধড়াস করিয়া যেন ঢেঁকির পাড় পড়িল—সামলাইয়া লইয়া মুখে বলিল—কালই কেন? অ্যাদ্দিন পরে এলে—দুদিন থাকো না কেন? বাবা মা কি তোমায় এখুনি ছেড়ে দেবেন? পরশু আবার আমার বকুলফুলের বাড়ি তোমায় নেমন্তন্ন করে গিয়েছে—

—কে তোমার বকুলফুল?

—এই গাঁয়েই বাড়ি—এ পাড়ায়, আবার ও-পাড়াতে বিয়ে হয়েছে। পরে সে আবার হাসিয়া বলিল, কাল সকালে তোমাকে দেখতে আসবে বলেছে যে—

কথাবার্তার স্রোত একইভাবে চলিল—রাত্রি গভীর হইল। বাড়ির ধারেই সজনে গাছে রাত-জাগা পাখি অদ্ভুত রব করিয়া ডাকিতেছিল। হরিহরের মনে হইল বাংলার এই নিভৃত পল্লীপ্রান্তের বাঁশবনের ছায়ায় একখানি স্নেহব্যগ্র গৃহকোণ যখন তাহার আগমনের আশায় মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অভ্যর্থনাসজ্জা সাজাইয়া প্রতীক্ষা করিয়াছে, কিসের সন্ধানেই সে তখন পশ্চিমের অনুর্বর অপরিচিত মরু-পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে গৃহহীন নিরাশ্রয়ের ন্যায় ঘুরিয়া মরিতেছিল যে!

রাত-জাগা পাখিটা একঘেয়ে ডাকিতেছিল, বাহিরের জ্যোৎস্না ক্রমে ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতেছে। এক হিসেবে এই রাত্রি তাহার কাছে বড় রহস্যময় ঠেকিতেছিল, সম্মুখে তাহাদের নবজীবনের যে পথ বিস্তীর্ণ ভবিষ্যতে চলিয়া গেছে—আজ রাতটি হইতেই তাহার শুরু। কে জানে সে জীবন কেমন হইবে? কে জানে জীবন-লক্ষ্মী কোন্ সাজি সাজাইয়া রাখিয়াছেন তাহাদের সে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের পাথেয়-রূপে?

দুজনেরই মনে বোধ হয় অনেকটা অস্পষ্টরূপে একই ভাব জাগিতেছিল। দুজনেই চুপ করিয়া জানালার বাহিরের ফাঁকে জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চাহিয়া রহিল।

তারপর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে। তখন কোথায় ছিল এই শিশুর পাত্তা?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইন্দির ঠাক্‌রুন ফিরিয়া আসিয়াছে ছয় সাত মাস হইল, সর্বজয়া কিন্তু ইহার মধ্যে একদিনও বুড়ির সঙ্গে ভালো করিয়া কথা কহে নাই। আজকাল তাহার আরও মনে হয় যে ওই বুড়ি ডাইনি সাতকুলখাগীটাকে তাহার মেয়ে যেন তাহার চেয়েও ভালোবাসে। হিংসা তো হয়ই, রাগও হয়। পেটের মেয়েকে পর করিয়া দিতেছে। দু'বেলা কথায় কথায় বুড়িকে সময় থাকিতে পথ দেখিবার উপদেশ ইঙ্গিতে জানাইয়া দেয়। সে পথ কোন্ দিকে—জ্ঞান হইয়া অবধি আজ পর্যন্ত সত্তর বৎসরের মধ্যে বুড়ি তাহার সন্ধান পায় নাই, এতকাল পরে কোথায় তাহা মিলিবে, ভাবিয়াই সে ঠাহর পায় না।

বর্ষার শেষদিকে বুড়ি অবশেষে এক যুক্তি ঠাওরাইল। ছয় ক্রোশ দূরে ভাণ্ডারহাটিতে তাহার জামাইবাড়ি। তাহার জামাই চন্দ্র মজুমদার বাঁচিয়া আছেন। জামাইয়ের অবস্থা বেশ ভালো, সম্পন্ন গৃহস্থ, অবশ্য মেয়ে মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জামাই-এর সঙ্গে সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে—আজ পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বৎসরের আগেকার কথা—তাহার পর আর কখনও দেখাশোনা বা খবরাখবরের লেন-দেন হয় নাই। তবুও যদি সেখানে যাওয়া যায়, জামাই একটু আশ্রয় দিতে কি গররাজি হইবে?

সন্ধ্যার পূর্বে ভাণ্ডারহাটি গ্রামে ঢুকিয়া একখানা বড় চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে গাড়োয়ান গাড়ি দাঁড় করাইল। গাড়োয়ানের ডাক-হাঁকে একজন চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের যুবক আসিয়া বলিল—কোথাকার গাড়ি? তাহার পিছনে পিছনে একজন বৃদ্ধ বাড়ির ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বাহির হইলেন—কে রাধু? জিজ্ঞেস্ করো কোথা থেকে আসছেন?

বুড়ি চিনিল—কিন্তু অবাক্ হইয়া রহিল—এই সেই তাহার জামাই চন্দর! চল্লিশ বৎসর পূর্বের সে সবল দোহারা-গড়ন সুচেহারা ছেলেটির সঙ্গে এই পক্ককেশ প্রবীণ ব্যক্তির মনে মনে তুলনা করিয়া সে যেন হাঁপাইয়া উঠিল। পরক্ষণেই কেমন এক বিভিন্ন ভাবের সংমিশ্রণে উৎপন্ন—না-হাসি-না-দুঃখ গোছের মনের ভাবে সে বিহ্বলের মতো ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনেক দিন পরে মেয়ের নাম ধরিয়া কাঁদিল।

বিস্ময়বিমূঢ় চন্দ্র মজুমদার প্রথমটা আকাশ-পাতাল হাতড়াইতেছিলেন, পরে ব্যাপারটা বুঝিলেন ও আসিয়া শাশুড়ির পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিলেন। একটু সামলাইয়া বুড়ি মাথায় কাপড় তুলিয়া দিয়া ভাঙাগলায় বলিল—তোমার কাছে এয়েচি বাবাজী এতদিন পরে—একটুখানি আচ্ছয়ের জন্যি—আর কডা দিনই বা বাঁচবো! কেউ নেই আর ত্রিভুবনে—এই বয়সে দুটো ভাত কাপড়ের জন্যি—

মজুমদার মহাশয় বড়ছেলেকে গাড়ির দ্রব্যাদি নামাইতে বলিলেন ও ছেলের সঙ্গে শাশুড়িকে বাড়ির মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। দ্বিতীয়পক্ষের বিধবা মেয়ে ও বড় পুত্রবধূ সংসারের গৃহিণী। আরও তিনটি পুত্রবধূ আছে। নাতি-নাতিনীও তিন-চারিটি।

তালগাছের গুঁড়ির খুঁটি ও আড়াবাঁধা প্রকাণ্ড দুইখানা দাওয়া উঁচু আটচালা ঘর; জিনিসপত্র, সিন্দুকতোরঙ্গে বোঝাই, পা ফেলিবার স্থানাভাব। মজুমদার মহাশয়ের বিধবা মেয়েটির নাম হৈমবতী। খুব ভালো মেয়ে—সে নিজের হাতে ফল কাটিয়া জলখাবার সাজাইয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত করিয়া কাছে বসাইয়া খাওয়াইল; একথা ওকথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, বলিল—দিদিমা, আমায় কখনও দেখেননি, না? কখনও তো এদিকে পায়ের ধুলো দ্যান্‌নি এর আগে! আক কেটে দেবো দিদিমা? দাঁত আছে?

পাশের রান্নাঘরে ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যাবেলা ভাত খাইতে বসিয়া হৈ চৈ করিতেছে। একজন চেঁচাইয়া বলিতেছে, ও মা দ্যাখো, উমি সব ডালটুকু আমার পাতে ঢেলে দিচ্ছে! পুত্রবধূ চেঁচাইতেছে, ওর কাছে খেতে বসিস কেন? রোজ না বলচি আলাদা বস্‌বি—এই উমি, বড্ড বাড় হয়েচে, না?

কিন্তু দশ-বারো দিন কাটিয়া গেল, বুড়ির সব কেমন যেন নতুন নতুন ঠেকিতে লাগিল, তেমন স্বস্তি পাওয়া যায় না—নতুন ধরনের ঘরদোর, নতুন পথঘাট, নতুন ভাবের গৃহস্থালি। কেমন যেন মনে হয় এ তো ঠিক তাহার নিজের নয়, সব পর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ই মনে পড়িত নিরিবিলি দাওয়া আর খুকি-খোকার মুখ। দিন কুড়িক পরে বুড়ি যাইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। এখানে আর মন টেকে না। কর্তার প্রথম পক্ষের শাশুড়ির এ আকস্মিক আবির্ভাব ও তাঁহার মতলব শুনিয়া বাড়ির বড়বধূ প্রথম হইতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, অন্তর্ধানে খুশি ছাড়া অ-খুশি হইলেন না। চন্দ্র মজুমদারের ইচ্ছা কি ছিল ভগবান জানেন, কিন্তু বড়ছেলে ও বড়বধূর ভয়ে কিছু বলিতে পারিলেন না।

অনেকদিন পরে আবার নিজের ঘরের দাওয়ায় দুর্গাকে কাছে লইয়া খোকাকে কাছে লইয়া বসিয়া জ্যোৎস্না-ঝরা নারিকেলশাখার মৃদু কম্পন দেখিতে দেখিতে সুখে বুড়ির ঘুমের আমেজ আসে।

খুকি প্রথমে ভারি অভিমান করিয়াছিল, কথা কহিবে না, কাছে আসিবে না। নানা কথায় সান্ত্বনা দিবার পর আজকাল ভাব হইয়াছে। বুড়ি ভাইঝির মাথায় আদর করিয়া হাত বুলাইয়া বলে—কেশ লাল একজোড়া ঢেঁড়ি ঝুমকো হয় তো দিব্যি মানায়, না আজকাল কি উঠেচে—ওগুলোকে বলে কি ছাই—

শীত আসিল। বুড়ি—ও পাড়ার গাঙ্গুলি বাড়ি গিয়া বুড়া রামনাথ গাঙ্গুলি মহাশয়ের কাছে বলিল—ও রাম, এই জাড় পড়লো বড্ড আবার—তা গায়ে একখানা বস্তর এমন নেই যে, সকাল-সন্দে একটু মুড়িসুড়ি দিয়ে বসি, তা আমায় যদি একখানা—

রাম গাঙ্গুলি বলিলেন—আচ্ছা দিদি, একদিন এসো, এ মাসটায় আর হবে না—ও মাসে বরং দেখবো।

বহুদিন যাবৎ হাঁটাহাঁটি ঘোরা-ফেরার পরে একদিন কুষ্ঠিয়ার রাঙা ছিটের সুতি চাদর একখানা বাহির করিয়া হাতে দিয়া বলিলেন—এই নাও দিদি, ভারি গরম জিনিস—সাড়ে ন' আনা দাম—এর চেয়ে ভালো জিনিস আর নবাবগঞ্জে পাওয়া যায় না—বুধবার এনে রেখেচি—দ্যাখো না খুলে?

বুড়ির তখনও যেন বিশ্বাস হইতেছিল না। আহ্লাদে একগাল হাসিয়া সে সেখানাকে খুলিয়া গায়ে জড়াইয়া বলিল—দিব্যি, কেমন ওম্—মোটা-সোটা দিব্যি কাপড়—আঃ দাদা, বেঁচে থাকো—কানাই বলাই বেঁচে থাকুক, অক্ষয় প্রমাই হোক—কাঙাল গরিবকে কেউ দেয় না, ওই অন্নদার কাছে একখানা গায়ের কাপড় চাচ্চি আজ তিন বছর থেকে—দেব দেব বলে, তা দিলে না—শখটা মিটিয়ে নি, কড়া দিনই আর বা?

সর্বজয়াকে আহ্লাদ করিয়া দেখাইতেই সে বলিল, দ্যাখো ঠাকুরঝি, এ বাড়ি থেকে যে তুমি সাত দোর মেগে বেড়াবে তা হবে না, স্পষ্ট বলে দিচ্চি। ভিক্ষে মাগতে হয়, আলাদা বন্দোবস্ত করো—

বুড়ি সে কথা হজম করিয়া লইল। এরূপ অনেক কথাই তাহাকে দিনের মধ্যে দশবার হজম করিতে হয়। সেকালের ছড়াটা সে এখনও ভোলে নাই—

লাথি ঝাঁটা পায়ের তল,
ভাত পাথরটা বুকের বল—

দুর্গা ভারি খুশি হইয়া বলে, ক'পয়সা দাম পিতিমা—কেমন নাঙা—না?

আশ্বাসের সুরে পিসি বলে, আমি মরে গেলে তোকে দিয়ে যাবো, তুই গায়ে দিস্ বড় হলে।

নতুন চাদরের সোঁদা সোঁদা মাড়ের গন্ধটা বুড়ির কাছে ভারি উপাদেয়, ভারি শৌখিন বলিয়া মনে হয়। সকালে চাদরখানা গায়ে জড়াইয়া ঝাঁট দিবার সময় মাঝে মাঝে নিজের দিকে চাহিয়া দেখে। নিষ্প্রয়োজনে ঘাটের পথে দাঁড়াইয়া থাকে, পথ-চলতি নিরীহ ঝি-বউকে ডাকিয়া বলে, কে যায়? রাজীর মা?—এত বেলা যে? ভূমিকা আর বেশি দূর না করিয়া একটু হাসিয়া নিজের গায়ের দিকে চাহিয়া বলে, এই গায়ের কাপড়খানা এবার ও-পাড়ার রামচাঁদ—সাড়ে ন' আনা দাম—

দু' একটা দুষ্ট মেয়ে বলে—উঃ, ঠাক্‌মাকে রাঙাকাপড়ে যা মানিয়েচে! ঠাক্‌মার বুঝি বিয়ে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ও পাড়ার দাসীঠাক্‌রুন আসিয়া হাসিমুখে বলিল—পয়সা দুটোর জন্যি এয়েছিলাম বৌ, ইন্দির পিসি কাল আমার কাছ থেকে একটা নোনা নিয়ে এল, বল্লে, কাল দাম গিয়ে চেয়ে নিয়ে এসো—

সর্বজয়া ঘরের কাজকর্ম করিতেছিল, অবাক হইয়া বলিল—নোনা কিনে এনেছে তোমার কাছ থেকে?

দাসীঠাক্‌রুন ঘোর ব্যবসাদার মানুষ। সামান্য তেঁতুল আমড়া হইতে একগাছি শাক পর্যন্ত পয়সা না লইয়া কাহাকেও দেয় না। দাসীর অমায়িক ভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল। বলিল—এনেচে কিনা জিজ্ঞেস করো না তোমার ননদকে। সকালবেলা কি মিথ্যে বলতে এলাম দুটো পয়সার জন্যি? চার পয়সার কমে আমি দেবো না—বল্লে বুড়োমানুষ খাবার ইচ্ছে হয়েছে—তা যাক দু'পয়সাতেই—

রাগে সর্বজয়ার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। নোনার মতো ফল যাহা কিনা এত অপর্যাপ্ত

বনে জঙ্গলে ফলে যে গরু-বাছুরের পর্যন্ত খাইয়া অরুচি হইয়া যায়, তাহা আবার পয়সা দিয়া কিনিয়া খাইবার লোক যে পাড়াগাঁয়ে আছে, তাহা সর্বজয়ার ধারণায় আসে না।

ঠিক এই সময় ইন্দির বুড়ি কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্বজয়া তাহার উপর যেন ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল—বলি হ্যাঁগা, তিন কাল গিয়েছে, এককালে তো ঠেকেচ, যার বসে খাই তার পয়সায় তো একটু দুখ-দরদ করে চল্‌তে হয়? নোনা গিয়েচ কিনতে? কোথা থেকে তোমায় বসিয়ে আজ নোনা কাল দানা খাওয়াব? শখের পয়সা নিজে থেকে নিয়ে দাওগে যাও, পরের ওপর দিয়ে শখ করতে লজ্জা হয় না?

বুড়ির মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তবুও একটুখানি হাসি আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—তা দে বৌ—পাকা নোনাডা, তা ভাবলাম নিই খেয়ে, কডা দিনই বা বাঁচবো? তা দিয়ে দে দুটো পয়সা—

সর্বজয়া চতুর্গুণ চিৎকার করিয়া বলিল—বড় পয়সা সস্তা দেখেচ কিনা? নিজের ঘটি-বাটি আছে, বিক্রি করে নিয়ে দাও গিয়ে পয়সা—

পরে সে ঘড়া লইয়া খিড়কি দুয়ার দিয়া ঘাটের পথে বাহির হইয়া গেল।

দাসী খানিকটা দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল—আমার নাকে খত কানে খত, জিনিস বেচে এমন হয়রান তো কখনও হইনি! তোমায়ও বলি ইন্দির পিসি, নিজের পয়সাই যদি না ছিল তবে তোমার কাল নোনাটা আনা ভালো হয়নি বাপু, ও-রকম ধারে জিনিসপত্তর আর এনো না। তা তোমাদের ঝগড়া তোমরা করো, আমি গরিব লোক, ও বেলা আসবো, আমার পয়সাদুটো বাপু ফেলে দিয়ো—

দাসীর পিছু পিছু খুকি বাহিরের উঠান পর্যন্ত আসিল। বলিতে বলিতে আসিল—পিসিমা বুড়ো মানুষ, একটা নোনা এনেছে, তা বুঝি বকে? খেতে ইচ্ছে হয় না, হ্যাঁ দাসীপিসি? বেশ নোনা, আমায আধখানা কাল দিয়েছে—তোমার বাড়ি বুঝি গাছ আছে পিসি?—পরে সে ডাকিযা কহিল—শোনো না দাসীপিসি, আমি একটা পয়সা দেবো এখন, পুতুলের বাক্সে আছে, মা ঘরে চাবি দিয়ে ঘাটে গেল, এলে নুকিয়ে দেবো এখন, মাকে বোলো না যেন পিসি।

দুপুরের কিছু পূর্বে ইন্দির বুড়ি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। বাঁ হাতে ছোট একটা ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি, ডানহাতে পিতলের চাদরের ঘটিটা ঝুলানো, বগলে একটা পুরোনো মাদুর, মাদুরের পাড় ছিঁড়িযা কাঠিগুলি ঝুলিতেছে।

খুকি বলিল, ও পিসি, যাস্‌নে—ও পিসি কোথায় যাবি? পরে সে ছুটে আসিয়া মাদুরের পিছনটা টানিয়া ধরিল। তুই চলে গেলে আমি কাঁদবো পিসি—ঠিক—

সর্বজয়া ঘরের দাওয়া হইতে বলিল, তা যাবে যাও, গেরস্তর অকল্যাণ করে যাওয়া কেন? ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি, এতকাল যার খেলে তার একটা মঙ্গল তো দেখতে হয়, অনখ সময়ে না খেয়ে চলে গিয়ে তারপর গেরস্তর একটা অকল্যেণ বাধুক, এই তোমার ইচ্ছে তো? ওই রকম কুচক্কুরে মন না হলে কি আর এই দশা হয়?...

বুড়ি ফিরিল না। খুকি কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক দূর পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেল।

বুড়ি গিয়া গ্রামের ও-পাড়ার নবীন ঘোষালের বাড়ি উঠিল। নবীন ঘোষালের বউ সব শুনিয়া গালে হাত দিয়া বলিল—ওমা, এমন তো কখনও শুনিনি, হ্যাঁগো খুড়ি? তা থাকো তুমি, এইখানেই থাকো।

মাস-দুই সেখানে থাকার পর বুড়ি সেখান হইতে বাহির হইয়া তিনকড়ি ঘোষালের বাড়ি ও তথা হইতে পূর্ণ চক্রবর্তীর বাড়ি আশ্রয় লইল। প্রত্যেক বাড়িতেই প্রথম আপ্যায়নের হৃদ্যতাটুকু কিছুদিন পর উবিয়া যাওয়ার পরে বাড়ির লোকে নানা রকমে বিরক্তি প্রকাশ করিত। পরামর্শ দিত ঝগড়া মিটাইয়া ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইতে। বুড়ি আরও দু'এক বাড়ি ঘুরিল, সব সময়ই তাহার ভরসা ছিল বাড়ি হইতে আর কেহ না হয়, অন্তত হরিহর ডাকিয়া পাঠাইবে। কিন্তু তিনমাস হইয়া গেল, কেহই আগ্রহ করিয়া ডাকিতে আসিল না। দুর্গাও আসে নাই। বুড়ি জানে ও-পাড়া হইতে

এ-পাড়া অনেক দূরে, ছোট মেয়ে এতদূর আসিতে পারে না। সে আশায় আশায় ও-পাড়ায় দু'একবার গেল, খুকির সঙ্গে দেখা হইল না।

বারো মাস লোকের বাড়ি আশ্রয় হয় না। পুব-পাড়ার চিন্তে গয়লানীর চালা ঘরখানি পড়িয়া ছিল—মাস দুই পরে সকলে মিলিয়া সেই ঘরখানি বুড়ির জন্য ঠিক করিয়া দিল এবং ঠিক করিল পাড়া হইতে সকলে কিছু কিছু সাহায্য করিবে। ঘরখানা নিতান্ত ছোট, ছিটে বেড়ার দেয়াল, পাড়া হইতে দূরে, একটা বাঁশবনের মধ্যে। লোকের মুখে শুনিত সর্বজয়া নাকি বলিয়াছে—তেজ দেখুক পাঁচজনে। এ বাড়ি আর না, আমার বাছাদের মুখের দিকে যে তাকায়নি—তাকে আর আমার দোরে মাথা গলাতে হবে না, ভাগাড়ে পড়ে মরুক গিয়ে।

যাহাদের সাহায্য করিবার কথা ছিল, তাহারা প্রথম দিনকতক খুব উৎসাহের সঙ্গে জোগাইল, ক্রমে কিন্তু তাহাদের আগ্রহও কমিয়া গেল। বুড়ি ভাবে, কেন সেদিন অত রাগ করে চলে এলাম? বৌ বারণ কল্লে, খুকি কত কাঁদলে, হাতে ধরে টানাটানি কল্লে—! নিজের উপর অত্যন্ত দুঃখে চোখের জলে দুই তোবড়ানো গাল ভাসিযা যায়। বলে—শেষ কালডা এত দুঃখুও ছিল অদেষ্টে—আজ যদি মেয়েডাও থাকতো—

চৈত্র মাসের সংক্রান্তি। সারাদিন বড় রৌদ্রের তেজ ছিল, সন্ধ্যার সময় একটু একটু বাতাস বহিতেছে, গোঁসাইপাড়ায় চড়কের ঢাক এখনও বাজিতেছে, মেলা এখনও শেষ হয় নাই।

রৌদ্রে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরিয়া ও দুর্ভাবনায় বুড়ির রোজ সন্ধ্যার পরে একটু একটু জ্বর হয়। সে মাদুর পাতিয়া দাওয়ায় চুপ করিয়া শুইয়া আছে, মাথার কাছে মাটির ভাঁড়ে জল। পিতলের চাদরের ঘটিটা ইতিমধ্যে চার আনায় বাঁধা দিয়া চাল কেনা হইয়াছে। জ্বরের তৃষ্ণায় মাঝে মাঝে একটু একটু জল মাটির ভাঁড় হইতে খাইতেছে।

—পিসিমা!..বুড়ি কাঁথা ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিল, দাওয়ার পৈঠায় খুকি উঠিতেছে, পিছনে তাহাদের পাড়ার বেহারী চক্কত্তির মেয়ে রাজী। খুকির পরনে ফরসা কাপড়, আঁচলের প্রান্তে কি সব পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধা। বুড়ির মুখ দিয়া বেশি কথা বাহির হইল না। প্রবল আগ্রহে সে শীর্ণ হাত বাড়াইয়া তাহাকে জ্বরতপ্ত বুকে জড়াইয়া ধরিল।

—বলিসনে কাউকে পিসি, কেউ যেন টের পায় না, চড়ক দেখে সন্দেবেলা চুপি চুপি এলাম, রাজীও এলো আমার সঙ্গে, চড়কের মেলা থেকে এই দ্যাখ, তোর জন্যে সব এনেচি—

খুকি পুঁটলি খুলিল।

—মুড়কি পিসিমা, তোর জন্যে দু'পয়সার মুড়কি আর দুটো কদ্‌মা আর খোকার জন্যে একটা কাঠের পুতুল—।

বুড়ি ভালো করিয়া উঠিয়া বসিল। জিনিসগুলো নাড়িতে চাড়িতে বলিল—দেখি দেখি, ও আমার মানিক, কত জিনিস এনেচে দ্যাখো। রাজরানী হও, গরিব পিসির ওপর এত দয়া! দেখি খোকার কাঠের পুতুলডা! বাঃ দিব্যি পুতুল—কড়া পয়সা নিলে?...

এক ঝোঁক কথাবার্তার পরে খুকি বলিল—পিসি, তোর গা যে বড্ড গরম?

—সমস্ত দিন টউরে বেড়িয়ে এই রকমডা হয়েছে, তাই বলি একটু শুয়ে থাকি—

ছেলেমানুষ হইলেও দুর্গা পিসিমার রৌদ্রে ঘুরিবার কারণ বুঝিল। দুঃখে ও অনাহারে শীর্ণ পিসিমার গায়ে সে সস্নেহে হাত বুলাইয়া বলিল, তুই অবিশ্যি করে বাড়ি যাস্—সন্দে বেলা গল্প শুনতে পাইনে, কিছু না—কাল যাবি—কেমন তো?

বুড়ি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, বলিল, বৌ বুঝি তোকে কিছু বলে দিয়েছে আজ?

রাজী বলিল—খুড়িমা তো কিছু বলে দেয়নি পিসিমা, ওকে তো এখানে খুড়িমা আসতে দেয় না। আমরা বল্লে বকে, তবে তুমিও যেয়ো পিসিমা। তুমি একটুখানি বোলো, তাহলে খুড়িমা আর কিছু বলবে না—

খুকি বলিল—কাল তুই ঠিক যাস্ পিসি, মা কিছু বলবে না—তাহলে এখন বাড়ি যাই পিসি, কাউকে যেন বলিসনে? কাল সকালে ঠিক যাস্ কিন্তু।

সকালে উঠিয়া বুড়ি দেখিল শরীরটা একটু হাল্‌কা। একটু বেলা হইলে ছোট্ট পুঁটুলিতে ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড় দু'খানা ও ময়লা গামছাখানা বাঁধিয়া বুড়ি বাড়ির দিকে চলিল। পথে গোপী বোষ্টমের বৌ বলিল, দিদি ঠাক্‌রুন, তা বাড়ি যাচ্ছ বুঝি? বৌদিদির রাগ চলে গিয়েছে বুঝি?

বুড়ি একগাল হাসিল, বলিল—কাল দুর্গা যে সন্দে বেলা ডাকতে গিয়েছিল, কত কাঁদলে, বল্লে, মা বলেচে—চ' পিসি বাড়ি চ'—তা আমি বল্লাম—আজ তুই যা, কাল সকাল বেলাডা হোক, আমি বাড়ি গিয়ে উঠবো—মেয়ের আমার কত কান্না, যেতে কি চায়!...তাই সকালে যাচ্ছি।

বুড়ি ঢুকিয়া দেখিল কেহ বাড়ি নাই। কাল সারারাত জ্বর ভোগের পর এতটা পথ রৌদ্রে দুর্বল শরীরে আসিয়া বোধ হয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, পুঁটুলিটা নামাইয়া সে নিজের ঘরের দাওয়ার পৈঠায় বসিয়া পড়িল।

একটু পরেই খিড়কি দোর ঠেলিয়া সর্বজয়া স্নান করিয়া নদী হইতে ফিরিল। এদিকে চোখ পড়িলে বুড়িকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া একটুখানি দাঁড়াইল। বুড়ি হাসিয়া বলিল—ও বৌ, ভালো আছিস? এই অ্যালাম অ্যাদ্দিন পরে, তোদের ছেড়ে আর কোথায় যাবো এ বয়সে—তাই বলি—

সর্বজয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল—তুমি এ বাড়ি কি মনে করে?

তার ভাবভঙ্গি ও গলার স্বরে বুড়ির হাসিবার উৎসাহ আর বড় রহিল না। সর্বজয়া কথার উত্তর দিতে না দিয়াই বলিল—এ বাড়ি আর তোমার জায়গা কিছুতেই হবে না—সে তোমাকে আমি সেদিন বলে দিয়েচি—ফের কোন্ মুখে এয়েচ?

বুড়ি কাঠের মতো হইয়া গেল, মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। পরে সে হঠাৎ একেবারে কাঁদিয়া বলিল—ও বৌ, অমন করে বলিসনে—একটুখানি ঠাঁই দে আমারে—কোথায় যাবো আর শেষকালডা বল্ দিকিনি—তবু এই ভিটেটাতে—

—ন্যাও, আর ভিটের দোহাই দিতে হবে না, ভিটের কল্যাণ ভেবে তোমার তো ঘুম নেই, যাও এক্ষুনি বিদেয় হও, নইলে অনথ বাধাবো—

ব্যাপার এরূপ দাঁড়াইবে বুড়ি বোধ হয় আদৌ প্রত্যাশা করে নাই। জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন ডুবিয়া যাইবার সময় যাহা পায় তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়, বুড়ি সেইরূপ মুঠা আঁকড়াইয়া আশ্রয় খুঁজিতে লক্ষ্যহীন ভাবে এদিক ওদিক চাহিল—আজ তাহার কেন মনে হইল যে, বহুদিনের আশ্রয় সত্য সত্যই তাহার পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে, আর তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই।

সর্বজয়া বলিল—যাও আর বসে থেকো না ঠাকুরঝি, বেলা হয়ে যাচ্ছে আমার কাজকর্ম আছে, এখানে তোমার জায়গা কোনোরকমে দিতে পারবো না—

বুড়ি পুঁটুলি লইয়া অতিকষ্টে আবার উঠিল। বাহির দরজার কাছে যাইতে তাহার নজর পড়িল তাহার উঠান-ঝাঁটের ঝাঁটাগাছটা পাঁচিলের কোণে ঠেস দেওয়ানো আছে, আজ তিন-চারি মাস তাহাতে কেহ হাত দেয় নাই। এই ভিটার ঘাসটুকু, ওই কত যত্নে পোঁতা লেবু গাছটা, এই অত্যন্ত প্রিয় ঝাঁটাগাছটা, খুকি, খোকা, ব্রজ পিসের ভিটা—তার সত্তর বৎসরের জীবনে এ সব ছাড়া সে আর কিছু জানেও নাই, বুঝেও নাই।

চিরকালের মতো তাহারা [illegible] যাইতেছে।

সজনেতলা দিয়া পুটুলি [illegible] যাইতে পিছন হইতে [illegible]বাড়ির গিন্নি বলিল—ঠাক্‌মা, ফিরে যাচ্ছো কোথায়? বাড়ি যাবে [illegible] উত্তর না পাইয়া বলিল—[illegible] আজকাল কানের মাথা একেবারে খেয়েছে।

বৈকালে ও-পাড়া হইতে কে আসিয়া বলিল—ও মা-ঠাকরুন, তোমাদের বুড়ি বোধ হয় মরে

যাচ্ছে, পালিতদের গোলার কাছে দুপুর থেকে শুয়ে আছে, রোদ্দুরে ফিরে যাচ্ছিল, আর যেতে পারেনি—একবার গিয়ে দেখে এসো—দাদাঠাকুর বাড়ি নেই? একবার পাঠিয়ে দেও না!

পালিতদের বড় মাচার তলায় গোলার পাশে ইন্দির ঠাক্‌রুন মরিতেছিল একথা সত্য। হরিহরের বাড়ি হইতে ফিরিতে ফিরিতে তাহার গা কেমন করে, রৌদ্রে আর আগাইতে না পারিয়া এইখানেই শুইয়া পড়ে। পালিতেরা চণ্ডীমণ্ডপে তুলিয়া রাখিয়াছিল। বুকে পিঠে তেল মালিশ, পাখার বাতাস, সব করিবার পরে বেশি বেলায় অবস্থা খারাপ বুঝিয়া নামাইয়া রাখিয়াছে। পালিত-পাড়ার অনেকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ বলিতেছে—তা রোদ্দুরে বেরুলেই বা কেন? সোজা রোদ্দুরটা পড়েছে আজ? কেহ বলিতেছে—এখুনি সামলে উঠবে এখন, ভির্‌মি লেগেছে বোধ হয়—

বিশু পালিত বলিল—ভির্‌মি নয়। বুড়ি আর বাঁচবে না, হরিজেঠা বোধ হয় বাড়ি নেই, খবর তো দেওয়া হয়েচে, কিন্তু এতদূর আসে কে?

শুনিতে পাইয়া দীনু চক্রবর্তীর বড় ছেলে ফণী ব্যাপার কি দেখিতে আসিল। সকলে বলিল—দাও দাদাঠাকুর, ভাগ্যিস এসে পড়েচ, একটুখানি গঙ্গাজল মুখে দাও দিকি। দ্যাখো তো কাণ্ড, বামুনপাড়া না কিছু না—কে একটু মুখে জল দেয়?

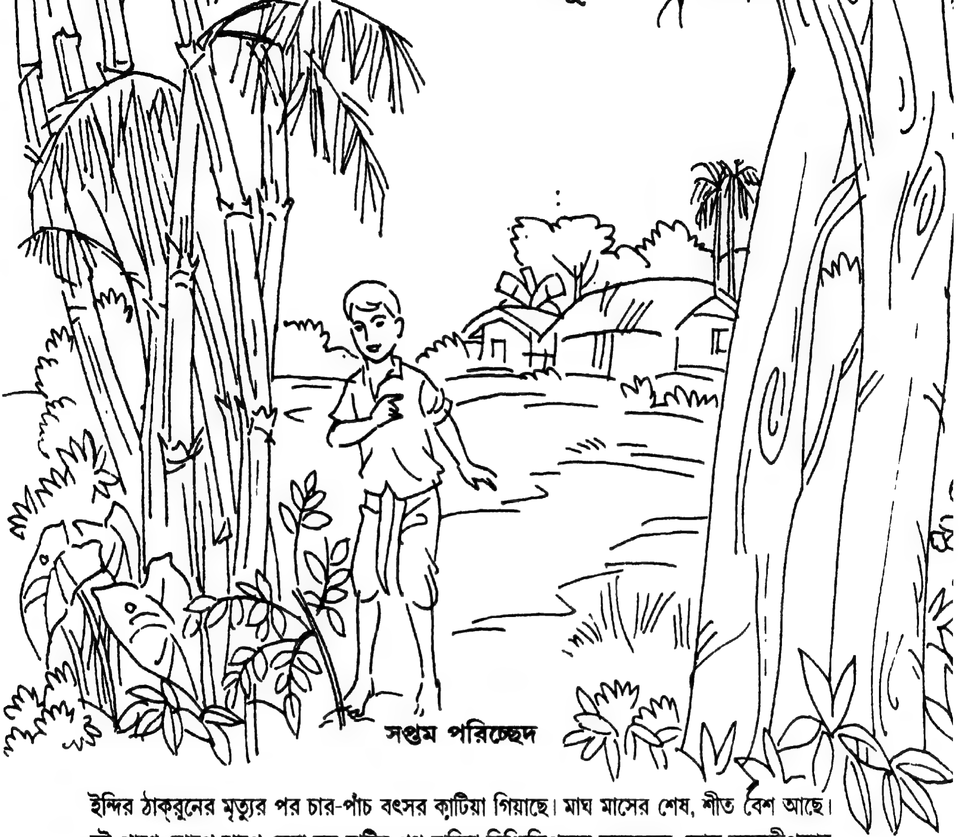
ফণী হাতের বৈঁচিকাঠের লাঠিটা বিশু পালিতের হাতে দিয়া বুড়ির মুখের কাছে বসিল। কুশি করিয়া গঙ্গাজল লইয়া ডাক দিল—ও পিসিমা!

বুড়ি চোখ মেলিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া মুখের দিকে চাহিয়াই রহিল, তাহার মুখে কোন উত্তর শুনা গেল না। ফণী আবার ডাকিল—কেমন আছেন পিসিমা? শরীর কি অসুখ মনে হচ্ছে?

পরে সে গঙ্গাজলটুকু মুখে ঢালিয়া দিল। জল কিন্তু মুখের মধ্যে গেল না, বিশু পালিত বলিল—আর একবার দাও দাদাঠাকুর—

আর খানিকক্ষণ পরে ফণী বুড়ির চোখের পাতা বুজাইয়া দিতেই কোটরগত অনেকখানি জল শীর্ণ গাল-দুটা বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ইন্দির ঠাক্‌রুনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল।



আম-আঁটির ভেঁপু

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইন্দির ঠাক্‌রুনের মৃত্যুর পর চার-পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মাঘ মাসের শেষ, শীত বেশ আছে। দুই পাশে ঝোপে-ঝাপে-ঘেরা সরু মাটির পথ বাহিয়া নিশ্চিন্দিপুরের কয়েকজন লোক সরস্বতীপূজার বৈকালে গ্রামের বাহিরের মাঠে নীলকণ্ঠ পাখি দেখিতে যাইতেছিল।

দলের একজন বলিল, ওহে হরি, ভূষণো গোয়ালার দরুন কলাবাগানটা তোমরা কি ফের জমা দিয়েচো নাকি?

যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইল তাহাকে দেখিলে দশ বৎসর পূর্বের সে হরিহর রায় বলিয়া মনে হয় না। এখন সে মধ্যবয়সি, পুরাদস্তুর সংসারী, ছেলেমেয়ের বাপ হরিহর খাজনা সাধিয়া গ্রামে গ্রামে ঘোরে, পৈতৃক আমলের শিষ্যসেবকের ঘরগুলি সন্ধান করিয়া বসিয়া গুরুগিরি চালায়, হাটেমাঠে জমির ঘরামির সঙ্গে ঝিঙে-পটলের দর-দস্তুর করিয়া ঘোরে, তাহার সঙ্গে আগেকার সে অবাধগতি, মুক্তপ্রাণ, ভবঘুরে যুবক হরিহরের কোন মিল নাই। ক্রমে ক্রমে পশ্চিমের সে-জীবন অনেক দূরের হইয়া গিয়াছে—সেই চুনার দুর্গের চওড়া প্রাচীরে বসিয়া বসিয়া দূর পাহাড়ের সূর্যাস্ত দেখা, কেদারের পথে তেজপাতার বনে রাত-কাটানো, শাহ কাশেম সুলেমানীর দরগার বাগান হইতে টক কমলালেবু ছিঁড়িয়া খাওয়া, গলিত রৌপ্যধারার মতো স্বচ্ছ, উজ্জ্বল হিমশীতল স্বর্গনদী অলকানন্দা, দশাশ্বমেধ ঘাটের জলের ধারের রানা—একটু একটু মনে পড়ে, যেন অনেকদিন আগেকার দেখা স্বপ্ন।

হরিহর সায়সূচক কিছু বলিতে গিয়া পিছন ফিরিয়া বলিল, ছেলেটা আবার কোথায় গেল? ও খোকা, খোকা-আ-আ—

পথের বাঁকের আড়াল হইতে একটি ছয় সাত বছরের ফুটফুটে সুন্দর, ছিপছিপে চেহারার ছেলে ছুটিয়া আসিয়া দলের নাগাল ধরিল। হরিহর বলিল—আবার পিছিয়ে পড়লে এরই মধ্যে? নাও এগিয়ে চল—

ছেলেটা বলিল—বনের মধ্যে কি গেল বাবা? বড় বড় কান?

হরিহর প্রশ্নের দিকে কোন মনোযোগ না দিয়া নবীন পালিতের সঙ্গে মৎস্যশিকারের পরামর্শ আঁটিতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে পুনরায় আগ্রহের সুরে বলিল—কি দৌড়ে গেল বাবা বনের মধ্যে? বড় বড় কান?

হরিহর বলিল—কি জানি বাবা, তোমার কথার উত্তর দিতে আমি আর পারিনে। সেই বেরিয়ে অবধি শুরু করেচো এটা কি, ওটা কি—কি গেল বনের মধ্যে তা কি আমি দেখেচি? নাও এগিয়ে চলো দিকি!

বালক বাবার কথায় আগে আগে চলিল।

নবীন পালিত বলিল, বরং এক কাজ করো হরি, মাছ যদি ধরতে হয়, তবে বঁয়শার বিলে একদিন চলো যাওয়া যাক্—পুব-পাড়ার নেপাল পাড়ুই বাচ্ দিচ্ছে, রোজ দেড়মন দু'মন এইরকম পড়চে—পাঁচ-সেরের নিচে মাছ নেই! শুনলাম, একদিন শেষরাত্তিরে নাকি বিলের একেবারে মধ্যিখানে অথই জলে সাঁ সাঁ করে ঠিক যেন বক্‌না বাছুরের ডাক—বুঝ্‌লে?

সকলে একসঙ্গে আগাইয়া আসিয়া নবীন পালিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—অনেক-কেলে পুরোনো বিল, গহিন জল, দেখেছো তো মধ্যিখানে জল যেন কালো শিউগোলা, পদ্মগাছের জঙ্গল, কেউ বলে রাঘব বোয়াল, কেউ বলে যক্ষি—যতক্ষণ ফরসা না হলো ততক্ষণ তো মশাই নৌকোর ওপর সকলে বসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো—

বেশ জমিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ হরিহরের ছেলেটি মহা-উৎসাহে পাশের এক উলুখড়ের ঝোপের দিকে আঙুল তুলিয়া চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া গেল—ওই যাচ্ছে বাবা, দ্যাখো বাবা, ওই গেল বাবা, বড় বড় কান, ওই—

তাহার বাবা পিছন হইতে ডাক দিয়া বলিল,—উঁহু উঁহু উঁহু—কাঁটা কাঁটা কাঁটা—পরে তাড়াতাড়ি আসিয়া খপ্ করিয়া ছেলের হাতখানি ধরিয়া বলিল,—আঃ বড্ড বিরক্ত কল্লে দেখচি তুমি, একশ' বার বারণ কচ্চি তা তুমি কিছুতেই শুনবে না, ওই জন্যেই তো আনতে চাচ্ছিলাম না।

বালক উৎসাহে ও আগ্রহে উজ্জ্বল মুখ উঁচু করিয়া বাবার দিকে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বাবা?

হরিহরি বলিল—কি তা কি আমি দেখেচি! শুওর-টুওর হবে—নাও চলো, ঠিক রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটো—

—শুওর না বাবা, ছোট্ট যে! পরে সে নিচু হইয়া দৃষ্ট বস্তুর মাটি হইতে উচ্চতা দেখাইতে গেল।

—চল চল—হ্যাঁ—আমি বুঝতে পেরেচি, আর দেখাতে হবে না—চল দিকি!...

নবীন পালিত বলিল—ও হলো খরগোশ, খোকা খরগোশ। এখানে খড়ের ঝোপে খরগোশ থাকে, তাই।

বালক বর্ণপরিচয়ে 'খ'-এ খরগোশের ছবি দেখিয়াছে, কিন্তু তাহা যে জীবন্ত অবস্থায় এ রকম লাফাইয়া পালায় বা তাহা আবার সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়, এ কথা সে কখনও ভাবে নাই।

খরগোশ!—জীবন্ত—একেবারে তোমার সামনে লাফাইয়া পালায়;—ছবি না, কাচের পুতুল না—একেবারে কানখাড়া সত্যিকারের খরগোশ! এইরকম ভাঁটগাছ বৈঁচিগাছের ঝোপে!—জল-মাটির তৈরি নশ্বর পৃথিবীতে এ ঘটনা কি করিয়া সম্ভব হইল, বালক তাহা কোনমতেই ভাবিয়া ঠাহর করিতে পারিতেছিল না।

সকলে বনে ঘেরা সরু পথ ছাড়াইয়া মাঠে পড়িল। নদীর ধারের বাব্‌লা ও জিওল গাছের আড়ালে একটা বড় ইঁটের পাঁজার মতো জিনিস নজরে পড়ে, ওটা পুরানো কালের নীলকুঠির জ্বালঘরের ভগ্নাবশেষ। সেকালে নীলকুঠির আমলে এই নিশ্চিন্দিপুর বেঙ্গল ইন্ডিগো কন্‌সারনের হেড কুঠি ছিল, এ অঞ্চলের চৌদ্দটা কুঠির উপর নিশ্চিন্দিপুর কুঠির ম্যানেজার জন্‌ লারমার দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিত। এখন কুঠির ভাঙা চৌবাচ্চাঘর, জ্বালঘর, সাহেবের কুঠি, আপিস জঙ্গলাকীর্ণ ইটের স্তূপে পরিণত হইয়াছে। যে প্রবল-প্রতাপ লারমার সাহেবের নামে এক সময় এ অঞ্চলে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাইত, আজকাল দু'একজন অতিবৃদ্ধ ছাড়া সে লোকের নাম পর্যন্ত কেহ জানে না।

মাঠের ঝোপঝাপগুলো উলুখড়, বনকলমি, সোঁদাল ও কুলগাছে ভরা। কলমিলতা সারা ঝোপগুলোর মাথা বড় বড় সবুজ পাতা বিছাইয়া ঢাকিয়া দিয়াছে—ভিতরে স্নিগ্ধ ছায়া, ছোট গোয়ালে, নাটাকাঁটা, ও নীল বন-অপরাজিতা ফুল সূর্যের আলোর দিকে মুখ উঁচু করিয়া ফুটিয়া আছে, পড়ন্ত বেলার ছায়ায় স্নিগ্ধ বনভূমির শ্যামলতা, পাখির ডাক, চারিধারে প্রকৃতির মুক্ত হাতে ছড়ানো ঐশ্বর্য রাজার মতো ভাণ্ডার বিলাইয়া দান, কোথাও এতটুকু দারিদ্র্যের আশ্রয় খুঁজিবার চেষ্টা নাই, মধ্যবিত্তের কার্পণ্য নাই। বেলাশেষের ইন্দ্রজালে মাঠ, নদী, বন মায়াময়।

মাঠের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে নবীন পালিত মহাশয় একবার এই মাঠের উত্তর অংশের জমিতে শাঁকআলুর চাষ করিয়া কিরূপ লাভবান হইয়াছিলেন, সে গল্প করিতে লাগিলেন। একজন বলিল, কুঠির ইটগুলো নাকি বিক্রি হবে শুনছিলাম, নবাবগঞ্জের মতি দাঁ নাকি দরদস্তুর কচ্ছে। মতি দাঁর কথায় সে ব্যক্তি সামান্য অবস্থা হইতে কিরূপে ধনবান হইয়াছে সে কথা আসিয়া পড়িল। ক্রমে তাহা হইতে বর্তমান কালের দুর্মূল্যতা, আষাঢ়ুর বাজারে কুণ্ডুদের গোলদারী দোকান পুড়িয়া যাইবার কথা, গ্রামের দীনু গাঙ্গুলির মেয়ের বিবাহের তারিখ কবে পড়িয়াছে প্রভৃতি বিবিধ আবশ্যকীয় সংবাদের আদান-প্রদান হইতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে বলিল—নীলকণ্ঠ পাখি কই বাবা?

—এই দেখো এখন, বাব্‌লাগাছে এখুনি এসে বসবে—

বালক মুখ উঁচু করিয়া নিকটবর্তী সমুদয় বাব্‌লাগাছের মাথার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মাঠের ইতস্তত নিচু নিচু কুলগাছে অনেক কুল পাকিয়া আছে, বালক অবাক হইয়া লুব্ধদৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। কয়েকবার কুল পাড়িতে গিয়া বাবার বকুনিতে তাহাকে নিবৃত্ত হইতে হইল। এত ছোট গাছে কুল হয়? তাহাদের পাড়ায় যে কুলের গাছ আছে, তাহা খুব উঁচু বলিয়া ইচ্ছা থাকিলেও সে সুবিধা করিতে পারে না। ভারী আঁকুশিটা দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়াও তুলিতে পারে না, কুপথ্যের জিনিস লুকাইয়া খাওয়া কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে—এ সে টের পায়। খবর পাইয়া মা আসিয়া বাড়ি ধরিয়া লইয়া যায়, বলে—ওমা আমার কী হবে! এমন দুষ্টু ছেলে হয়েচ তুমি? এই সেদিন উঠলে জ্বর থেকে আজ অমনি কুলতলায় ঘুরে বেড়াচ্চ! একটুখানি পিছন ফিরেচি, আর অমনি এসে দেখি বাড়ি নেই! কটা কুল খেয়েচিস, দেখি মুখ দেখি?

সে বলে, কুল খাইনি তো মা, তলায় একটাও কুল পড়ে নেই, আমি বুঝি পাড়তে পারি?

পরে সে টুকটুকে মুখটি মায়ের অত্যন্ত নিকটে লইয়া গিয়া হাঁ করে। তাহার মা ভালো করিয়া দেখিয়া পুত্রের ননীর মতো গন্ধ বাহির হওয়া সুন্দর মুখে চুমা খাইয়া বলে—কক্‌খনো খেয়ো না যেন খোকা! তোমার শরীর সেরে উঠুক, আমি কুল কুড়িয়ে আচার করে হাঁড়িতে তুলে রেখে দেবো—তাই বোশেক জষ্টি মাসে খেয়ো; লুকিয়ে লুকিয়ে কক্‌খনো আর খেয়ো না—কেমন তো?

হরিহর বলিল—কুঠি কুঠি বলছিলে, ওই দ্যাখো খোকা, সাহেবদের কুঠি, দেখেচো?

নদীর ধারের অনেকটা জুড়িয়া সেকালের কুঠিটা যেখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় হিংস্র

জন্তুর কঙ্কালের মতো পড়িয়া ছিল, গতিশীল কালের প্রতীক নির্জন শীতের অপরাহু তাহার উপর অল্পে অল্পে তাহার ধূসর উত্তরচ্ছদবিশিষ্ট আস্তরণ বিস্তার করিল।

কুঠির হাতার কিছু দূরে কুঠিয়াল লারমার সাহেবের এক শিশুপুত্রের সমাধি পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। বেঙ্গল ইন্ডিগো কন্‌সারনের বিশাল হেডকুঠির এইটুকু ছাড়া অন্য কোনও চিহ্ন আর অখণ্ড অবস্থায় মাটির উপর দাঁড়াইয়া নাই। নিকটে গেলে অনেক কালের কালো পাথরের জীর্ণ ফলকে এখনও পড়া যায়—

Here lies Edwin Lermor,
The only son of John & Mrs. Lermor,
Born May 13, 1853, Died April 27, 1860.

অন্য অন্য গাছপালার মধ্যে একটি বন্য সোঁদাল গাছ তাহার উপর শাখাপত্রে ছায়াবিস্তার করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, চৈত্র বৈশাখ মাসে আড়াই-বাঁকির মোহনা হইতে প্রবহমান জোর হাওয়ায় তাহার পীত পুষ্পস্তবক সারা দিনরাত ধরিয়া বিস্মৃত বিদেশী শিশুর ভগ্ন-সমাধির উপর রাশি রাশি পুষ্প ঝরাইয়া দেয়। সকলে ভুলিয়া গেলেও বনের গাছপালা শিশুটিকে এখনও ভোলে নাই।

বালক অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। তাহার ছয় বৎসরের জীবনে এই প্রথম সে বাড়ি হইতে এতদূরে আসিয়াছে। এতদিন নেড়াদের বাড়ি, নিজেদের বাড়ির সামনেটা, বড়জোর রানুদিদিদের বাড়ি, ইহাই ছিল তাহার জগতের সীমা। কেবল এক এক দিন তাহাদের পাড়ার ঘাটে মায়ের সঙ্গে স্নান করিতে আসিয়া সে স্নানের ঘাট হইতে আবছা দেখিতে পাওয়া কুঠির ভাঙা জ্বালঘরটার দিকে চাহিয়া দেখিত—আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত, মা, ওদিকে কি সেই কুঠি? সে তাহার বাবার মুখে, দিদির মুখে, আরও পাড়ার কত লোকের মুখে কুঠির মাঠের কথা শুনিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার প্রথম সেখানে আসা! ওই মাঠের পর ওদিকে বুঝি মায়ের মুখের সেই রূপকথার রাজ্য? শ্যাম-লঙ্কার দেশে বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গাছের নিচে, নির্বাসিত রাজপুত্র যেখানে তলোয়ার পাশে রাখিয়া একা শুইয়া রাত কাটায়? ও-ধারে আর মানুষের বাস নাই, জগতের শেষ সীমাটাই এই। ইহার পর হইতেই অসম্ভবের দেশ, অজানার দেশ শুরু হইয়াছে।

বাড়ি ফিরিবার পথে সে পথের ধারে একটা নিচু ঝোপ হইতে একটা উজ্জ্বল রং-এর ফলের থোলো ছিঁড়িতে হাত বাড়াইল। তাহার বাবা বলিল, হাঁ হাঁ হাত দিয়ো না হাত দিয়ো না—আল্‌কুশি আল্‌কুশি। কি যে তুমি করো বাবা! বড্ড জ্বালালে দেখছি। আর কোনদিন কোথাও নিয়ে বেরুচ্চিনে বলে দিলাম—এক্ষুনি হাত চুলকে ফোস্কা হবে—পথের মাঝখান দিয়ে এত করে বলছি হাঁটতে—তা তুমি কিছুতেই শুনবে না।

—হাত চুলকুবে, কেন বাবা?

—হাত চুলকুবে, বিষ বিষ—আলকুশিতে কি হাত দেয় বাবা? শুঁয়ো ফুটে রি রি করে জ্বলবে এক্ষুনি—তখন তুমি চিৎকার শুরু করবে।

গ্রামের মধ্যে দিয়া হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া খিড়কির দোর দিয়া বাড়ি ঢুকিল। সর্বজয়া খিড়কির দোর খোলার শব্দে বাহিরে আসিয়া বলিল—এই এত রাত হল! তা ওকে নিয়ে গিয়েচ, না একটা দোলাই গায়ে, না কিছু!

হরিহর বলিল—আঃ, নিয়ে গিয়ে যা বিরক্ত! এদিকে যায়, ওদিকে যায়, সামলে রাখতে পারিনে—আলকুশির ফল ধরে টানতে যায়। পরে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল—কুঠির মাঠ দেখবো, কুঠির মাঠ দেখবো—কেমন, হল তো কুঠির মাঠ দেখা?

সকাল বেলা। আটটা কি নয়টা। হরিহরের পুত্র আপন মনে রোয়াকে বসিয়া খেলা করিতেছে, তাহার একটা ছোট টিনের বাক্স আছে, সেটার ডালা ভাঙা। বাক্সের সমুদয় সম্পত্তি সে উপুড় করিয়া মেঝেতে ঢালিয়াছে। একটা রং-ওঠা কাঠের ঘোড়া, চার পয়সা দামের, একটা টোল্-খাওয়া টিনের ভেঁপু-বাঁশি, গোটাকতক কড়ি। এগুলি সে মায়ের অজ্ঞাতসারে লক্ষ্মীপূজার কড়ির চুপড়ি হইতে খুলিয়া লইয়াছিল ও পাছে কেহ টের পায় এই ভয়ে সর্বদা লুকাইয়া রাখে—একটা দু'পয়সা দামের পিস্তল, কতকগুলো শুকনো নাটা ফল। দেখিতে ভালো বলিয়া তাহার দিদি কোথা হইতে অনেকগুলি কুড়াইয়া আনিয়াছিল, কিছু তাহাকে দিয়াছে, কিছু সে নিজের পুতুলের বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে। খানকতক খাপরার কুচি। গঙ্গাযমুনা খেলিতে এই খাপরাগুলির লক্ষ্য অব্যর্থ বলিয়া বিশ্বাস হওয়ায় সে এগুলি সযত্নে বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে, এগুলি তাহার মহামূল্যবান সম্পত্তি। এতগুলি জিনিসের মধ্যে সবে সে টিনের বাঁশিটা কয়েকবার বাজাইয়া সেটির সম্বন্ধে বিগতকৌতূহল হইয়া তাহাকে এক পাশে রাখিয়া দিয়াছে। কাঠের ঘোড়া নাড়াচাড়া করা হইয়া গিয়াছে। সেটিও একপাশে পিঁজরাপোলের আসামীর ন্যায় পড়িয়া আছে। বর্তমানে সে গঙ্গা-যমুনা খেলিবার খাপরাগুলিকে হাতে লইয়া মনে মনে দাওয়ার উপর গঙ্গা-যমুনার ঘর আঁকা কল্পনা করিয়া চোখ বুজিয়া খাপরা ছুঁড়িয়া দেখিতেছে, তাক্ ঠিক হইতেছে কিনা।

এমন সময়ে তাহার দিদি দুর্গা উঠানের কাঁঠালতলা হইতে ডাকিল—অপু—ও অপু—। সে এতক্ষণ বাড়ি ছিল না, কোথা হইতে এইমাত্র আসিল। তাহার স্বর একটু সতর্কতামিশ্রিত। মানুষের গলার আওয়াজ পাইয়া অপু কলের পুতুলের মতো লক্ষ্মীর চুপড়ির কড়িগুলি তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিল। পরে বলিল—কি রে দিদি?

দুর্গা হাত নাড়িয়া ডাকিল—আয় এদিকে—শোন্—

দুর্গার বয়স দশ এগারো বৎসর হইল। গড়ন পাতলা পাতলা, রং অপুর মতো অতটা ফরসা নয়, একটু চাপা। হাতে কাচের চুড়ি, পরনে ময়লা কাপড়, মাথাব চুল রুক্ষ—বাতাসে উড়িতেছে, মুখের গড়ন মন্দ নয়, অপুর মতো চোখগুলি বেশ ডাগব ডাগর। অপু বোযাক হইতে নামিয়া কাছে গেল, বলিল,—কি রে?

দুর্গার হাতে একটা নারিকেলের মালা। সেটা সে নিচু করিয়া দেখাইল, কতকগুলি কচি আম কাটা। সুর নিচু করিয়া বলিল—মা ঘাট থেকে আসে নি তো?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু—

দুর্গা চুপি চুপি বলিল—একটু তেল আর একটু নুন নিয়ে আসতে পারিস? আমের কুশি জারাবো—

অপু আহ্লাদের সহিত বলিয়া উঠিল—কোথায় পেলি রে দিদি?

দুর্গা বলিল—পটলিদের বাগানে সিঁদুরকোটোর তলায় পড়ে ছিল—আন্ দিকি একটু নুন আর তেল?

অপু দিদির দিকে চাহিয়া বলিল—তেলের ভাঁড় ছুঁলে মা মারবে যে? আমার কাপড় যে বাসি?

—তুই যা না শিগ্‌গির করে, মা'র আসতে এখন ঢের দেরি—ক্ষার কাচতে গিয়েচে—শিগ্‌গির যা—

অপু বলিল—নারকেলের মালাটা আমায় দে। ওতে ঢেলে নিয়ে আসবো—তুই খিড়কি দোরে গিয়ে দ্যাখ্ মা আসচে কিনা।

দুর্গা নিম্নস্বরে বলিল—তেল টেল যেন মেঝেতে ঢালিস্‌নে, সাবধানে নিবি, নইলে মা টের পেয়ে যাবে—তুই তো একটা হাবা ছেলে—

অপু বাড়ির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলে দুর্গা তাহার হাত হইতে মালা লইয়া আমগুলি বেশ করিয়া মাখিল,—বলিল, নে হাত পাত।

—তুই অতগুলো খাবি দিদি?

—অতগুলি বুঝি হল? এই তো—ভারি বেশি—যা, আচ্ছা নে আর দু'খানা—বাঃ, দেখতে বেশ হয়েচে রে, একটা লঙ্কা আনতে পারিস? আর একখানা দেবো তাহলে—

—লঙ্কা কি করে পাড়বো দিদি? মা যে তক্তার ওপর রেখে দ্যায়, আমি যে নাগাল পাইনে?

—তবে থাক্‌গে যাক্‌—আবার ওবেলা আনবো এখন—পট্‌লিদের ডোবার ধারের আমগাছটায় গুটি যা ধরেচে—দুপুরের রোদে তলায় ঝরে পড়ে—

দুর্গাদের বাড়ির চারিদিকেই জঙ্গল। হরিহর রায়ের জ্ঞাতি-ভ্রাতা নীলমণি রায় সম্প্রতি গত বৎসর মারা গিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্রকন্যা লইয়া নিজ পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন। কাজেই পাশের এ ভিটাও জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িয়া আছে। নিকটে আর কোন লোকের বাড়ি নাই। পাঁচ মিনিটের পথ গেলে তবে ভুবন মুখুজ্যের বাড়ি।

হরিহরের বাড়িটাও অনেক দিন হইয়া গেল মেরামত হয় নাই, সামনের দিকের রোয়াক ভাঙা, ফাটলে বন-বিছুটির ও কালমেঘ গাছের বন গজাইয়াছে—ঘরের দোর-জানালার কপাট সব ভাঙা, নারিকেলের দড়ি দিয়া গরাদের সঙ্গে বাঁধা আছে।

খিড়কি দোর ঝনাৎ করিয়া খুলিবার শব্দ হইল এবং একটু পরেই সর্বজয়ার গলা শুনা গেল—দুগ্‌গা ও দুগ্‌গা—

দুর্গা বলিল—মা ডাকছে, যা দেখে আয়—ওখানা খেয়ে যা—মুখে যে নুনের গুঁড়ো লেগে আছে, মুছে ফ্যাল্‌—

মায়ের ডাক আর একবার কানে গেলেও দুর্গার এখন উত্তর দিবার সুযোগ নাই, মুখ ভর্তি। সে তাড়াতাড়ি জারানো আমের চাক্‌লাগুলি খাইতে লাগিল। পরে এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কাঁটালগাছটার কাছে সরিয়া গিয়া গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সেগুলি গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। অপু তাহার পাশে দাঁড়াইয়া নিজের অংশ প্রাণপণে গিলিতেছিল, কারণ চিবাইয়া খাওয়ার আর সময় নাই। খাইতে খাইতে দিদির দিকে চাহিয়া সে দোষ সম্বন্ধে সচেতনতাসূচক হাসি হাসিল। দুর্গা খালি মালাটা এক টান মারিয়া ভেরেণ্ডাকচার বেড়া পার করিয়া নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল। ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—মুখটা মুছে ফ্যাল্‌ না বাঁদর, নুন লেগে রয়েছে যে...

পরে দুর্গা নিরীহমুখে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—কি মা?

—কোথায় বেরুনো হয়েছিল শুনি? একলা নিজে কতদিকে যাবো? সকাল থেকে ক্ষার কেচে গা-গতর ব্যথা হয়ে গেল, একটুখানি যদি কোনোদিক থেকে আসান আছে তোমাদের দিয়ে—অত বড় মেয়ে সংসারের কুটোগাছটা ভেঙে দু'খানা করা নেই, কেবল পাড়ায় পাড়ায় টো টো টোক্‌লা সেধে বেড়াচ্ছেন—সে বাঁদর কোথায় গেল?

অপু আসিয়া বলিল, মা, খিদে পেয়েছে।

—রোসো রোসো, একটুখানি দাঁড়াও বাপু...একটুখানি হাঁপ জিরোতে দ্যাও! তোমাদের রাতদিন খিদে আর রাতদিন ফাই-ফরমাজ! ও দুগ্‌গা, দ্যাখ্‌ তো বাছুরটা হাঁক পাড়ছে কেন?

খানিকটা পরে সর্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বঁটি পাতিয়া শসা কাটিতে বসিল। অপু কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল—আর এট্টু আটা বের করো না মা, মুখে বড্ড লাগে।

দুর্গা নিজের ভাগ হাত পাতিয়া লইয়া সংকুচিত সুরে বলিল—চালভাজা আর নেই মা?

অপু খাইতে খাইতে বলিল—উঃ, চিবনো যায় না। আম খেয়ে যা দাঁত টকে—

দুর্গার ভ্রুকুটিমিশ্রিত চোখ-টেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্ধপথেই বন্ধ হইয়া গেল। তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল,—আম কোথায় পেলি?

সত্য কথা প্রকাশ করিতে সাহসী না হইয়া অপু দিদির দিকে জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে চাহিল। সর্বজয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—তুই ফের এখন বেরিয়েছিলি বুঝি?

দুর্গা বিপন্নমুখে বলিল—ওকে জিজ্ঞেস করো না? আমি—এই তো এখন কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে—তুমি যখন ডাকলে তখন তো—

স্বর্ণ গোয়ালিনী গাই দুহিতে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। তাহার মা বলিল—যা, বাছুরটা ধরগে যা—ডেকে ডেকে সারা হল—কমলে বাছুর, ও সন্ন, এত বেলা করে এলে কি বাঁচে? একটু সকাল করে না এলে এই তেতপ্পর পজ্জন্ত বাছুর বাঁধা—

দিদির পিছনে পিছনে অপুও দুধ দোয়া দেখিতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা তাহার পিঠে দুম্ করিয়া নির্ঘাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল—লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর! পরে মুখে ভ্যাঙাইয়া কহিল—আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েছে—আবার কোনো দিন আম দেবো খেয়ো—ছাই দেবো—এই ওবেলাই পটলিদের কাঁকুড়তলির আম কুড়িয়ে এনে জারাবো, এত বড় বড় গুটি হয়েছে, মিষ্টি যেন গুড়—দেবো তোমায়? খেয়ো এখন? হাবা একটা কোথাকার—যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে!

দুপুরের কিছু পরে হরিহর কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিল। সে আজকাল গ্রামের অন্নদা রায়ের বাটীতে গোমস্তার কাজ করে। জিজ্ঞাসা করিল—অপুকে দেখচিনে?

সর্বজয়া বলিল—অপু তো ঘরে ঘুমুচ্ছে।

—দুগ্‌গা বুঝি—

—সে সেই খেয়ে বেরিয়েছে—সে বাড়ি থাকে কখন? দুটো খাওয়ার সঙ্গে যা সম্পর্ক। আবার সেই খিদে পেলে তবে আসবে—কোথায় কার বাগানে কার আমতলায় জামতলায় ঘুরছে—এই চত্তির মাসের রোদ্দুরে, ফের দ্যাখো না এই জ্বরে পড়লো বলে—অত বড় মেয়ে, বলে বোঝাবো কত? কথা শোনে, না কানে নেয়?

একটু পরে হরিহর খাইতে বসিয়া বলিল—আজ দশঘরায় তাগাদার জন্যে গেছলাম, বুঝলে? একজন লোক, খুব মাতব্বর, পাঁচটা ছয়টা গোলা বাড়িতে, বেশ পয়সাওয়ালা লোক—আমায় দেখে দণ্ডবৎ করে বল্লে—দাদাঠাকুর আমায় চিনতে পাচ্চেন? আমি বল্লাম—না বাপু, আমি তো কই—? বল্লে—আপনার কর্তা থাকতে তখন তখন পূজা-আচ্চায় সব সময়ই তিনি আসতেন, পায়ের ধুলো দিতেন। আপনারা আমাদের গুরুতুল্য লোক, এবার আমরা বাড়িসুদ্ধ মন্তর নেবো ভাবচি—তা আপনি যদি আজ্ঞে করেন, তবে ভরসা করে বলি—আপনিই কেন মন্তরটা দেন না? তা আমি তাদের বলেচি আজ আর কোনো কথা বলবো না, ঘুরে এসে দু-এক দিনে—বুঝলে?

সর্বজয়া ডালের বাটি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল, বাটি মেঝেতে নামাইয়া সামনে বসিয়া পড়িল। বলিল—হ্যাঁগো, তা মন্দ কি? দাও না ওদের মন্তর, কি জাত?

হরিহর সুর নামাইয়া বলিল—বোলো না কাউকে।—সদ্‌গোপ। তোমার তো আবার গল্প করে বেড়ানো স্বভাব—

—আমি আবার কাকে বলতে যাবো, তা হোক হে সদ্‌গোপ, দাও গিয়ে দিয়ে, এই কষ্ট যাচ্ছে—ওই রায়বাড়ির আটটা টাকা ভরসা, তাও দু'তিন মাস অন্তর তবে দ্যায়—আর এদিকে রাজ্যের দেনা। কাল ঘাটের পথে সেজ ঠাক্‌রুন বল্লে—বৌমা, আমি বন্দক ছাড়া টাকা ধার দিইনে—তবে তুমি অনেক করে বল্লে ব'লে দিলাম—আজ পাঁচ পাঁচ মাস হয়ে গেল, টাকা আর রাখতে পারবো না। এদিকে রাধা বোষ্টমের বৌ তো ছিঁড়ে খাচ্ছে, দু'বেলা তাগাদা আরম্ভ করেছে। ছেলেটার

কাপড় নেই—দু'তিন জায়গায় সেলাই, বাছা আমার তাই পরে হাসিমুখে নেচে নেচে বেড়ায়—আমার এমন হয়েচে যে ইচ্ছে করে একদিকে বেরিয়ে যাই—

—আর একটা কথা ওরা বলছিল, বুঝলে? বলছিল গাঁয়ে তো বামুন নেই, আপনি যদি এই গাঁয়ে উঠে আসেন, তবে জায়গা-জমি দিয়ে বাস করাই—গাঁয়ে একঘর বামুন বাস করানো আমাদের বড্ড ইচ্ছে। তা কিছু ধানের জমিটমি দিতেও রাজি—পয়সার তো অভাব নেই! আজকাল চাষাদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা—ভদ্দর লোকেরই হয়ে পড়েচে হা ভাত যো ভাত—

আগ্রহে সর্বজয়ার কথা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল—এখ্‌খুনি। তা তুমি রাজি হলে না কেন? বল্লেই হত যে আচ্ছা আমরা আসবো! ও-রকম একটা বড় মানুষের আশ্রয়—এ গাঁয়ে তোমার আছে কি? শুধু ভিটে কামড়ে পড়ে থাকা—

হরিহর হাসিয়া বলিল—পাগল! তখুনি কি রাজি হতে আছে? ছোটলোক, ভাববে ঠাকুরের হাঁড়ি দেখচি শিকেয় উঠেচে—উঁহু, ওতে খেলো হয়ে যেতে হয়—তা নয়, দেখি একবার চুপি চুপি মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে—আর এখন ওঠ বল্লেই কি ওঠা চলে? সব ব্যাটা এসে বলবে টাকা দাও, নইলে যেতে দেবো না—দেখি পরামর্শ করে কি রকম দাঁড়ায়—

এই সময়ে মেয়ে দুর্গা কোথা হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া বাহিরের দুয়ারের আড়াল হইতে সর্তকতার সহিত একবার উঁকি মারিল এবং অপর পক্ষ সম্পূর্ণ সজাগ দেখিয়া ও-ধারে পাঁচিলের পাশ বাহিয়া বাহির-বাটীর রোয়াকে উঠিল। দালানের দুয়ার আস্তে আস্তে ঠেলিয়া দেখিল উহা বন্ধ আছে। এদিকে রোয়াকে দাঁড়ানো অসম্ভব, রৌদ্রের তাপে পা পুড়িয়া যায়, কাজেই সে-স্থান হইতে নামিয়া গিয়া উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইল। রৌদ্রে বেড়াইয়া তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, আঁচলের খুঁটে কী-কতকগুলা যত্ন করিয়া বাঁধা। সে আসিয়াছিল এইজন্য যে, যদি বাহিরের দুয়ার খোলা পায় এবং মা ঘুমাইয়া থাকে, তবে ঘরের মধ্যে চুপি চুপি ঢুকিয়া একটু শুইয়া লইবে। কিন্তু বাবার, বিশেষত মা'র সামনে সম্মুখ দুয়ার দিয়া বাড়ি ঢুকিতে তাহার সাহস হইল না।

উঠানে নামিয়া সে কাঁটালতলায় দাঁড়াইয়া কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া নিরুৎসাহভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। পরে সেখানেই বসিয়া পড়িয়া আঁচলের খুঁট খুলিয়া কতকগুলি শুক্‌নো রড়া ফলের বীচি বাহির করিল। খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে আপন মনে সেগুলি গুনিতে আরম্ভ করিল, এক—দুই—তিন—চার...ছাব্বিশটা হইল। পরে সে দুই তিনটা করিয়া বীচি হাতের উলটা পিঠে বসাইয়া উঁচু করিয়া ছুঁড়িয়া দিয়া পরে হাতের সোজা পিঠ পাতিয়া ধরিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল—অপুকে এইগুলো দেবো—আর এইগুলো পুতুলের বাক্সে রেখে দেবো—কেমন বীচিগুলো তেল চুকচুক কচ্চে—আজই গাছ থেকে পড়েচে, ভাগ্যিস আগে গেলাম, নইলে সব গরুতে খেয়ে ফেলে দিত, ওদের রাঙী গাইটা একেবারে রাক্কস, সব জায়গায় যাবে, সেবার কতকগুলো এনেছিলাম আর এইগুলো নিয়ে অনেকগুলো হোল।

সে খেলা বন্ধ করিয়া সমস্ত বীচি আবার সযত্নে আঁচলের খুঁটে বাঁধিল। পরে হঠাৎ কি ভাবিয়া রুক্ষ চুলগুলি বাতাসে উড়াইতে উড়াইতে মহা খুশির সহিত পুনরায় সোজা বাটীর বাহির হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

অপুদের বাড়ি হইতে কিছু দূরে একটা খুব বড় অশ্বত্থ গাছ ছিল। কেবল তাহার মাথাটা উহাদের দালানের জানালা কি রোয়াক হইতে দেখা যায়। অপু মাঝে মাঝে সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত। যতবার সে চাহিয়া দেখে, ততবার তাহার যেন অনেক—অনেক—অনেক দূরের কোন দেশের কথা

মনে হয়—কোন্ দেশ, এ তাহার ঠিক ধারণা হইত না—কোথায় যেন কোথাকার দেশ—মা'র মুখে ওই সব দেশের রাজপুত্তুরদের কথাই সে শোনে।

অনেক দূরের কথায় তাহার শিশুমনে একটা বিস্ময়মাখানো আনন্দের ভাবের সৃষ্টি করিত। নীল রং-এর আকাশটা অনেক দূর, ঘুড়িটা—কুঠির মাঠটা অনেক দূর—সে বুঝাইতে পারিত না, বলিতে পারিত না কাহাকেও, কিন্তু এসব কথায় তাহার মন যেন কোথায় উড়িয়া চলিয়া যাইত—এবং সর্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই যে, অনেক দূরের এই কল্পনা তাহার মনকে অত্যন্ত চাপিয়া তাহাকে যেন কোথায় লইয়া ফেলিয়াছে—ঠিক সেই সময়েই মায়ের জন্য তাহার মন কেমন করিয়া উঠিত, যেখানে সে যাইতেছে সেখানে তাহার মা নাই, অমনি মায়ের কাছে যাইবার জন্য মন আকুল হইয়া পড়িত। কতবার যে এ রকম হইয়াছে। আকাশের গায়ে অনেক দূরে একটা চিল উড়িয়া যাইতেছে—ক্রমে ছোট্ট—ছোট্ট—ছোট্ট হইয়া নীলুদের তালগাছের উঁচু মাথাটা পিছনে ফেলিয়া দূর আকাশে ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে—চাহিয়া দেখিতে দেখিতে যেন উড়ন্ত চিলটা দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া যাইত, অমনি সে চোখ নামাইয়া লইয়া বাহিরবাটী হইতে একদৌড়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া গৃহকার্যরত মাকে জড়াইয়া ধরিত। মা বলিত—দ্যাখো দ্যাখো, ছেলের কাণ্ড দ্যাখো—ছাড়্—ছাড়্—দেখছিস সকড়ি হাত?...ছাড়ো মানিক আমার, সোনা আমার, তোমার জন্যে এই দ্যাখো চিংড়িমাছ ভাজছি—তুমি যে চিংড়িমাছ ভালোবাসো? হ্যাঁ, দুষ্টুমি করে না—ছাড়ো—

আহারাদির পর দুপুরবেলা তাহার মা কখনও কখনও জানালার ধারে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ছেঁড়া কাশীদাসী মহাভারতখানা সুর করিয়া পড়িত। বাড়ির ধারে নারিকেল গাছটাতে শঙ্খচিল ডাকিত, অপু নিকটে বসিয়া হাতের লেখা ক-খ লিখিতে লিখিতে একমনে মায়ের মুখের মহাভারত পড়া শুনিত। দুর্গাকে তাহার মা বলিত, একটা পান সেজে দে তো দুগ্‌গা। অপু বলিত, মা সেই ঘুঁটে কুড়োনোর গল্পটা? তাহার মা বলে—ঘুঁটে কুড়োনোর কোন্ গল্প বল্ তো—ও সেই হরিহোড়ের? সে তো অন্নদামঙ্গলে আছে, এতে তো নেই? পরে পান মুখে দিয়ে সুর করিয়া পড়িতে থাকিত—

রাজা বলে শুন শুন মুনির নন্দন।
কহিব অপূর্ব কথা না যায় বর্ণন॥
সোমদত্ত নামে রাজা সিন্ধু দেশে ঘর।
দেবদ্বিজে হিংসা সদা অতি—

অপু অমনি মায়ের মুখের কাছে হাতখানি পাতিয়া বলিত, আমায় একটু পান? মা চিবানো পান নিজের মুখ হইতে ছেলের প্রসারিত হাতের উপর রাখিয়া বলিত—এঃ, বড্ড তেতো—এই খয়েরগুলোর দোষ, রোজ হাটে বারণ করি ও-খয়ের যেন আনে না, তবুও—

জানালার বাহিরে বাঁশবনের দুপুরের রৌদ্র-মাখানো শেওড়া ঘেঁটু বনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মহাভারতের—বিশেষত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে সে তন্ময় হইয়া যায়। মহাভারতের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে কর্ণের চরিত্র বড় ভালো লাগে তাহার কাছে। ইহার কারণ কর্ণের উপর তাহার কেমন একটা মমতা হয়। রথের চাকা মাটিতে পুঁতিয়া গিয়াছে—দুই হাতে প্রাণপণে সেই চাকা মাটি হইতে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন—সেই নিরস্ত্র অসহায়, বিপন্ন কর্ণের অনুরোধ মিনতি উপেক্ষা করিয়া অর্জুন তীর ছুঁড়িয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলেন! মায়ের মুখে এই অংশ শুনিতে শুনিতে দুঃখে অপুর শিশুহৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত, চোখের জল বাগ মানিত না—চোখ ছাপাইয়া তাহার নরম তুলতুলে গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িত—সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃখে চোখে জল পড়ার যে আনন্দ, তাহা তাহার মনোরাজ্যে নব অনুভূতির সজীবত্ব লইয়া পরিচিত হইতে লাগিল। জীবন-পথের যে দিক মানুষের চোখের জলে, দীনতায়, মৃত্যুতে, আশাহত ব্যর্থতায়, বেদনায় করুণ—পুরোনো বইখানার ছেঁড়া পাতার ভরপুর গন্ধে, মায়ের মুখের মিষ্ট সুরে, রৌদ্রভরা দুপুরের মায়া-অঙ্গুলি-নির্দেশে, তাহার শিশুদৃষ্টি অস্পষ্টভাবে সে পথের সন্ধান পাইত। বেলা পড়িলে মা গৃহকার্যে

উঠিয়া গেলে, সে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইয়া দূরের সেই অশ্বত্থ গাছটার দিকে এক এক দিন চাহিয়া দেখে—হয়তো কড়া চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্রে গাছটার মাথা ধোঁয়া-ধোঁয়া অস্পষ্ট, নয়তো বৈকালের অবসন্ন রাঙা রোদ অলসভাবে গাছটার মাথায় জড়াইয়া আছে—সকলের চেয়ে এই বৈকালের রাঙা-রোদ-মাখানো গাছটার দিকে চাহিয়াই তাহার মন কেমন করিত। কর্ণ যেন ওই অশ্বত্থ গাছটার ওপারে আকাশের তলে, অনেক দূরে কোথায় এখনও মাটি হইতে রথের চাকা দুই হাতে প্রাণপণে টানিয়া তুলিতেছে—রোজই তোলে—রোজই তোলে—মহাবীর, কিন্তু চিরদিনের কৃপার পাত্র কর্ণ! বিজয়ী বীর অর্জুন নহে—যে রাজ্য পাইল, মান পাইল, রথের উপর হইতে বাণ ছুঁড়িয়া বিপন্ন শত্রুকে নাশ করিল; বিজয়ী কর্ণ—যে মানুষের চিরকালের চোখের জলে জাগিয়া রহিল, মানুষের বেদনায় অনুভূতিতে সহচর হইয়া বিরাজ করিল—সে।

এক-একদিন মহাভারতের যুদ্ধের কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হয় যুদ্ধ জিনিসটা মহাভারতে বড় কম লেখা আছে। ইহার অভাব পূর্ণ করিবার জন্য এবং আশ মিটাইয়া যুদ্ধ জিনিসটা উপভোগ করিবার জন্য সে এক উপায় বাহির করিয়াছে। একটা বাখারি কিংবা হালকা কোন গাছের ডালকে অস্ত্রস্বরূপ হাতে লইয়া সে বাড়ির পিছনে বাঁশবাগানের পথে অথবা বাহিরের উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায় ও আপন মনে বলে—তারপর দ্রোণ তো একেবারে দশ বাণ ছুড়লেন, অর্জুন করলেন কি, একেবারে দুশোটা বাণ দিলেন মেরে! তারপর—ওঃ—সে কি যুদ্ধ! কি যুদ্ধ! বাণের চোটে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল! (এখানে সে মনে মনে যতগুলি বাণ হইলে তাহার আশা মিটে তাহার কল্পনা করে, যদিও তাহার কল্পনার ধারা মা'র মুখে কাশীদাসী মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধের প্রণালী সম্বন্ধে যাহা শুনা আছে তাহা অতিক্রম করে না) তারপর তো অর্জুন করলেন কি, ঢাল আর তরোয়াল নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন—পরে এই যুদ্ধ! দুর্যোধন এলেন—ভীম এলেন—বাণে বাণে আকাশ অন্ধকার করে ফেলেচে—আর কিছু দেখা গেল না। মহাভারতের রথিগণ মাত্র অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ করিয়া নাম কিনিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রক্ত-মাংসের দেহে জীবন্ত থাকিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন, যশোলাভের পথ ক্রমশই কিরূপ দুর্গম হইয়া পড়িতেছে। বালকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে তাঁহারা মাসের পর মাস সমানভাবে অস্ত্রচালনা করিতে পারিতেন কি?

গ্রীষ্মকালের দিনটা, বৈশাখের মাঝামাঝি।

নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের ধারে সেদিন দুপুরের কিছু পূর্বে দ্রোণগুরু বড় বিপদে পড়িয়াছেন—কপিধ্বজ রথ একেবারে তাঁহার ঘাড়ের উপরে, গাণ্ডীব-ধনু হইতে ব্রহ্মাস্ত্র মুক্ত হইবার বিলম্ব চক্ষের পলক মাত্র, কুরুসৈন্যদলে হাহাকার উঠিয়াছে—এমন সময় শেওড়া বনের ওদিক হইতে হঠাৎ কে কৌতুকের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—ও কি রে অপু? অপু চমকিয়া উঠিয়া আকর্ণ-টানা জ্যা-কে হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল তাহার দিদি জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে। অপু চাহিতেই বলিল—হ্যাঁরে পাগলা, আপন মনে কি বক্‌চিস্ বিড়্‌বিড়্ করে, আর হাত পা নাড়ছিস? পরে সে ছুটিয়া আসিয়া সস্নেহে ভাই-এর কচি গালে চুমু খাইয়া বলিল—পাগল! কোথাকার একটা পাগল, কি বক্‌ছিলি রে আপন মনে?

অপু লজ্জিতমুখে বার বার বলিতে লাগিল—যাঃ...বক্‌ছিলাম বুঝি?...আচ্ছা, যাঃ—

অবশেষে দুর্গা হাসি থামাইয়া বলিল—আয় আমার সঙ্গে...

পরে সে অপুর হাত ধরিয়া বনের মধ্যে লইয়া চলিল। খানিক দূর গিয়া হাসিমুখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখেচিস্?...কত নোনা পেকেচে?...এখন কি করে পাড়া যায় বল্ দিকি?

অপু বলিল—উঃ, অনেক রে দিদি!—একটা কঞ্চি দিয়ে পাড়া যায় না?

দুর্গা বলিল—তুই এক কাজ কর, ছুটে গিয়ে বাড়ির মধ্যে থেকে আঁকুশিটা নিয়ে আয় দিকি? আঁকুশি দিয়ে টান দিলে পড়ে যাবে দেখিস্ এখন—

অপু বলিল—তুই এখানে দাঁড়া দিদি, আমি আনচি—

অপু আঁকুশি আনিলে দুজনে মিলিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও চার-পাঁচটার বেশি ফল পাড়িতে পারিল না—খুব উঁচুগাছ, সর্বোচ্চ ডালে যে ফল আছে তাহা দুর্গা আঁকুশি দিয়াও নাগাল পাইল না। পরে সে বলিল—চল্ আজ এইগুলো নিয়ে যাই, নাইবার বেলায় মাকে সঙ্গে আনবো—মার হাতে ঠিক নাগাল আসবে। দে নোনাগুলো আমার কাছে, তুই আঁকুশিটা নে। নোলক পর্‌বি?

একটা নিচু ঝোপের মাথায় ওড়্‌কলমি লতায় সাদা সাদা ফুলের কুঁড়ি, দুর্গা হাতের ফলগুলো নামাইয়া নিকটের ফুলের কুঁড়ি ছিঁড়িতে লাগিল। বলিল—এদিকে সরে আয়, নোলক পড়িয়ে দি—

তাহার দিদি ওড়্‌কলমি ফুলের নোলক পরিতে ভালোবাসে, বনজঙ্গল সন্ধান করিয়া সে প্রায়ই খুঁজিয়া আনিয়া নিজে পড়ে ও ইতিপূর্বে কয়েকবার অপুকেও পরাইয়াছে। অপু কিন্তু মনে মনে নোলক-পরা পছন্দ করে না। তাহার ইচ্ছা হইল, বলে, নোলকে তাহার দরকার নাই। তবে দিদির ভয়ে সে কিছুই বলিল না। দিদিকে চটাইবার ইচ্ছা তাহার আদৌ নাই, কারণ দিদিই বনজঙ্গল ঘুরিয়া কুলটা, জামটা, নোনাটা, আমড়াটা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে লুকাইয়া খাওয়ায়, এমন সব জিনিস জুটাইয়া আনে, যাহা হয়তো কুপথ্য হিসাবে উহাদের খাইতে নিষেধ আছে, কাজেই অন্যায় হইলেও দিদির কথা না শুনা তাহার সাহসে কুলায় না।

একটা কুঁড়ি ভাঙিয়া সাদা জলের মতো যে আঠা বাহির হইল, তাহার সাহায্যে দুর্গা অপুর নাকে কুঁড়িটি আঁটিয়া দিল, পরে নিজেও একটা পরিল—তারপর ভাইয়ের চিবুকে হাত দিয়া নিজের দিকে ভালো করিয়া ফিরাইয়া বলিল—দেখি, কেমন দেখাচ্ছে? বাঃ বেশ হয়েচে, চল্ মাকে দেখাইগে—

অপু লজ্জিতমুখে বলিল—না দিদি—

—চল্ না—খুলে ফেলিসনে যেন—বেশ হয়েচে—

বাড়ি আসিয়া দুর্গা নোনাফলগুলি রান্নাঘরের দাওয়ায় নামাইয়া রাখিল। সর্বজয়া রাঁধিতেছিল—দেখিয়া খুব খুশি হইয়া বলিল—কোথায় পেলি রে?

দুর্গা বলিল—ওই লিচু-জঙ্গলে—অনেক আছে, কাল গিয়ে তুমি পাড়বে মা? এমন পাকা—একেবারে সিঁদুরের মতো রাঙা—

সে আড়াল ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল—দ্যাখো মা—

অপু নোলক পরিয়া দিদির পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। সর্বজয়া হাসিয়া বলিল—ও মা! ও আবার কে রে?—কে চিন্‌তে তো পারছি নে—

অপু লজ্জায় তাড়াতাড়ি নাকের ডগা হইতে ফুলের কুঁড়ি খুলিয়া ফেলিল। বলিল—ওই দিদি পরিয়ে দিয়েছে—

দুর্গা হঠাৎ বলিয়া উঠিল—চল্ রে অপু, ওই কোথায় ডুগডুগি বাজচে, চল্, বাঁদর খেলাতে এসেছে ঠিক, শিগ্‌গির আয়—

আগে আগে দুর্গা ও তাহার পিছনে পিছনে অপু ছুটিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল। সম্মুখের পথ বাহিয়া, বাঁদর নয়, ও-পাড়ার চিনিবাস ময়রা মাথায় করিয়া খাবার ফেরি করিতে বাহির হইয়াছে। ও-পাড়ায় তাহার দোকান, তা ছাড়া সে আবার গুড়ের ও ধানের ব্যবসাও করে। কিন্তু পুঁজি কম হওয়ায় কিছুতেই সুবিধা করিতে পারে না, অল্পদিনেই ফেল মারিয়া বসে। তখন হয়তো মাথায় করিয়া হাটে হাটে আলু পটল, কখনও পান বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। শেষে তাতেও যখন সুবিধা হয় না, তখন হয়তো সে ঝুলি ঘাড়ে করিয়া জাত-ব্যবসা আরম্ভ করে। পরে হঠাৎ একদিন দেখা যায় যে, আবার পাথুরে চুন মাথায় করিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে। লোকে বলে একমাত্র মাছ ছাড়া এমন কোনো জিনিস নাই, যাহা তাহাকে বিক্রয় করিতে দেখা যায় নাই। কাল দশহরা, লোকে আজ হইতেই মুড়কি সন্দেশ কিনিয়া রাখিবে। চিনিবাস হরিহর রায়ের দুয়ার দিয়া গেলেও এ বাড়ি ঢুকিল না।

কারণ সে জানে এ বাড়ির লোকে কখনও কিছু কেনে না। তবুও দুর্গা-অপুকে দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—চাই নাকি?

অপু দিদির মুখের দিকে চাহিল। দুর্গা চিনিবাসের দিকে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—নাঃ—

চিনিবাস ভুবন মুখুজ্যের বাড়ি গিয়া মাথার চাঙাড়ি নামাইতেই বাড়ির ছেলেমেয়েরা কলরব করিতে করিতে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভুবন মুখুজ্যে অবস্থাপন্ন লোক, বাড়িতে পাঁচ-ছয়টা গোলা আছে, এ গ্রামে অন্নদা রায়ের নিচেই জমিজমা ও সম্পত্তি বিষয়ে তাঁহার নাম করা যাইতে পারে।

ভুবন মুখুজ্যের স্ত্রী বহুদিন মারা গিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার সেজ ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী এ সংসারের কর্ত্রী।

সেজ-বৌ-এর বয়স চল্লিশের উপর হইবে, অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে।

সেজ-বৌ একখানা মাজা পিতলের সরায় করিয়া চিনিবাসের নিকট হইতে মুড়কি, সন্দেশ, বাতাসা দশহরা পূজার জন্য লইলেন। ভুবন মুখুজ্যের ছেলেমেয়ে ও তাঁহার নিজের ছেলে সুনীল সেইখানেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের জন্যও খাবার কিনিলেন। পরে অপুকে সঙ্গে লইয়া দুর্গা চিনিবাসের পিছন পিছন ঢুকিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সেজ-বৌ নিজের ছেলে সুনীলের কাঁধে হাত দিয়া একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—যাও না, রোয়াকে উঠে গিয়ে খাও না। এখানে ঠাকুরের জিনিস, মুখ থেকে ফেলে এঁটো করে বসবে।

চিনিবাস চাঙাড়ি মাথায় তুলিয়া পুনরায় অন্য বাড়ি চলিল। দুর্গা বলিল—আয় অপু, চল্ দেখিগে টুনুদের বাড়ি—

ইহারা সদর দরজা পার হইতেই সেজ-বৌ মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন—দেখতে পারিনে বাপু। ছুঁড়িটার যে কী হ্যাংলা স্বভাব—নিজের বাড়ি আছে, গিয়ে বসে কিনে খেগে যা না? তা না, লোকের দোর দোর, যেমন মা তেমনি ছা—

ইহাদের বাটীর বাহির হইয়া দুর্গা ভাইকে আশ্বাস দিবার সুরে বলিল—চিনিবাসের ভারি তো খাবার! বাবার কাছ থেকে দেখিস্ রথের সময় চারটে পয়সা নেবো—তুই দুটো, আমি দুটো। তুই আর আমি মুড়কি কিনে খাবো—

খানিকটা পরে ভাবিয়া ভাবিয়া অপু জিজ্ঞাসা করিল—রথের আর কতদিন আছে রে দিদি?

দশম পরিচ্ছেদ

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে।

সর্বজয়া ভুবন মুখুজ্যের বাড়ির কুয়া হইতে জল তুলিয়া আনিল, পিছনে পিছন অপু মায়ের আঁচল মুঠা পাকাইয়া ধরিয়া ও-বাড়ি হইতে আসিল। সর্বজয়া ঘড়া নামাইয়া রাখিয়া বলিল—তা তুই পেছনে পেছনে অমন করে ঘুরতে লাগলি কেন বল্ দিকি? ঘরকন্নার কাজকর্ম সারবো তবে তো ঘাটে যাবো? কাজ কর্তে দিবি না—না?

অপু বলিল—তা হোক্—কাজ তুমি ও-বেলা কোরো এখন মা, তুমি যাও ঘাটে। পরে মায়ের সহানুভূতি আকর্ষণের আশায় অতীব করুণস্বরে কহিল—আচ্ছা আমার খিদে কি পায় না? আজ চারদিন যে খাইনি।

—খাওনি তো করবো কি? রোদ্দুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে জ্বর বাধিয়ে বসবে, বল্লে কথা কানে নাও নাকি তোমরা? ছিষ্টির কাজ করবো তবে তো ঘাটে যাব। বসে তো নেই? যা ও-রকম দুষ্টুমি করিস নে—তোমাদের ফরমাজ মতো কাজ করবার সাধ্যি আমার নেই, যা—

অপু মায়ের আঁচল আরও জোর করিয়া মুঠা পাকাইয়া ধরিয়া বলিল—কক্ষনো তোমায় কাজ কর্তে দেবো না। রোজই তো কাজ করো, একদিন বুঝি বাদ যাবে না? এক্ষুনি ঘাটে যাও—না, আমি শুনবো না...করো দিকি কেমন কাজ করবে?

সর্বজয়া পুত্রের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—ও রকম দুষ্টুমি করে না, ছিঃ—এই হয়ে গ্যালো বলে, আর একটুখানি সবুর করো—ঘাটে যাবো, ছুটে এসে তোমার ভাত চড়িয়ে দোব—দুষ্টুমি করে কি? ছাড় আঁচল, ক'খানা পল্‌তার বড়া ভাজা খাবি বল্ দিকি?

ঘণ্টাখানেক পর অপু মহা উৎসাহের সহিত খাইতে বসিল।

গ্রাস তুলিয়া সে ঢকঢক করিয়া অর্ধেকখানি খালি করিয়া ফেলিয়া, পরে আরও দু'এক গ্রাস খাইয়া কিছু ভাত পাতের নিচে ছড়াইয়া বাকি জলটুকু শেষ করিয়া হাত তুলিয়া বসিল।

—কই খাচ্ছিস, কই? এতক্ষণ তো ভাত ভাত করে হাঁপাচ্ছিলে—পল্‌তার বড়া—পল্‌তার বড়া—ওই তো সবই ফেলে রাখলি, খেলি কি তবে?

সর্বজয়া একবাটি দুধ-ভাত মাখিয়া পুত্রকে খাওয়াইতে বসিল। দেখি হাঁ কর্—তোমার কপালখানা—মণ্ডা না মেঠাই না, দুটো ভাত আর ভাত—তা ছেলের দশা দেখলে হয়ে আসে—রোজ ভাত খেতে বসে মুখ কাঁচুমাচু—বাঁচবে কি খেয়ে? বাঁচতে কি এসেচ? আমায় জ্বালাতে এসেচ বই তো নয়—ওরকম মুখ ঘুরিও না, ছিঃ—হাঁ করো লক্ষ্মী—দেখি এই দলাটা হলেই হয়ে গেল—আবার ওবেলা টুনুদের বাড়িতে মনসার ভাসান হবে। তুই জানিস নে বুঝি? শিগ্‌গির শিগ্‌গির খেয়ে নিয়ে চলো। আমরা সব—

দুর্গা বাড়ি ঢুকিল। কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিতেছে। এক পা ধুলা, কপালের সামনে একগোছা চুল সোজা হইয়া প্রায় চার আঙুল উঁচু হইয়া আছে। সে সব সময় আপন মনে ঘুরিতেছে—পাড়ার সমবয়সি ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাহার বড় একটা খেলা-ধুলা নাই—কোথায় কোন্ ঝোপে বৈঁচি পাকিল, কাদের বাগানে কোন্ গাছটায় আমের গুটি বাঁধিয়াছে, কোন্ বাঁশতলায় শেয়াকুল খাইতে মিষ্ট—এ সব তাহার নখদর্পণে। পথে চলিতে চলিতে সে সর্বদা পথের দুই পাশে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে—কোথাও কাঁচপোকা বসিয়া আছে কি না। যদি কোথাও কণ্টিকারী গাছের পাকা ফল দেখিতে পাইল, তৎক্ষণাৎ খেলাঘরের বেগুন করিবার জন্য তাহা তুলিতে বসিয়া যাইবে। হয়তো পথে কোথাও বসিয়া সে নানারকমের খাপ্‌রা লইয়া ছুঁড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে, গঙ্গা-যমুনা খেলায় কোন্‌খানায় ভালো তাক হয়—পরীক্ষায় যেখানা ভালো বলিয়া প্রমাণিত হইবে, সেখানা সে সযত্নে আঁচলে বাঁধিয়া লইবে। সর্বদাই সে পুতুলের বাক্স ও খেলাঘরের সরঞ্জাম লইয়া মহাব্যস্ত।

সে ঢুকিয়া অপরাধীর দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল। সর্বজয়া বলিল—এলে! এসো, ভাত তৈরি। খেয়ে আমায় উদ্ধার করো—তারপর আবার কোন্ দিকে বেরুতে হবে বেরোও। বোশেখ মাসের দিন—সকলের মেয়ে দ্যাখো গে যাও সেঁজুতি করচে, শিবপুজো করচে—আর অত বড় ধাড়ি মেয়ে—দিনরাত কেবল টো টো। সেই সকাল হতে না হতে বেরিয়েচে, আর এখন এই বেলা দুপুর ঘুরে গিয়েচে, এখন এলো বাড়ি—মাথাটার ছিরি দ্যাখো না! না একটু তেল দেওয়া, না একটু চিরুনি ছোঁয়ানো—কে বলবে বামুনের মেয়ে, ঠিক যেন দুলে কি বাগদিদের কেউ—বিয়েও হবে ওই দুলে-বাগদিদের বাড়িতেই—আঁচলে ওগুলো কী ধন্‌দৌলত বাঁধা—খোল্—

দুর্গা ভয়ে ভয়ে আঁচলের খুঁট খুলিতে খুলিতে কহিল—ওই রায়কাকাদের বাড়ির সামনে কালকাসুন্দে গাছে—পরে ঢোক গিলিয়া কহিল—এই অনেক বেনেবৌ তাই—

বেনেবৌয়ের কথায় হৃদয় গলে না এমন পাষাণ জীবও জগতে অনেক আছে। সর্বজয়া তেলেবেগুনে জ্বলিয়া কহিল—তোর বেনেবৌয়ের না নিকুচি করেচে, যত ছাই আর ভস্‌সো রাতদিন বেঁধে নিয়ে ঘুরছেন—আজ টান মেরে তোমার পুতুলের বাক্স ওই বাঁশতলার ডোবায় যদি না ফেলি তবে—

সর্বজয়ার কথা শেষ হইবার পূর্বেই এক ব্যাপার ঘটিল। আগে আগে ভুবন মুখুজ্যের বাড়ির সেজ-ঠাক্‌রুন, পিছনে পিছনে তাঁহার মেয়ে টুনু ও দেওরের ছেলে সতু, তাহাদের পিছনে আর চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে সম্মুখ দরজা দিয়া বাড়ি ঢুকিল। সেজ-ঠাক্‌রুন কোনো দিকে না চাহিয়া বাড়ির কাহারও সহিত কোনো আলাপ না করিয়া সোজা হন্‌ হন্‌ করিয়া ভিতরের দিকের রোয়াকে উঠিলেন। নিজের ছেলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—কই নিয়ে আয়—বের কর্‌ পুতুলের বাক্স, দেখি—

এ বাড়ির কেহ কোনো কথা বলিবার পূর্বেই টুনু ও সতু, দুজনে মিলিয়া দুর্গার টিনের পুতুলের বাক্সটা ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া রোয়াকে নামাইল এবং টুনু বাক্স খুলিয়া খানিকটা খুঁজিবার পর একছড়া পুঁতির মালা বাহির করিয়া বলিল—এই দ্যাখো মা, আমার সেই মালাটা—সেদিন যে সেই খেলতে গিয়েছিল, সেদিন চুরি করে এনেচে।

সতু বাক্সের এক কোণ সন্ধান করিয়া গোটাকতক আমের গুটি বাহির করিয়া বলিল—এই দ্যাখো জেঠিমা, আমাদের সোনামুখী গাছের আম পেড়ে এনেচে।

ব্যাপারটা এত হঠাৎ হইয়া গেল বা ইহাদের গতিবিধি এ বাড়ির সকলের কাছেই এত রহস্যময় মনে হইল যে এতক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হয় নাই। এতক্ষণ পরে সর্বজয়া কথা খুঁজিয়া পাইয়া বলিল—কি, কি খুড়িমা? কি হয়েচে? পরে সে রান্নাঘরের দাওয়া হইতে ব্যগ্রভাবে উঠিয়া আসিল।

—এই দ্যাখো না কি হয়েচে, কীর্তিখানা দ্যাখো না একবার—তোমার মেয়ে সেদিন খেলতে গিয়ে টুনুর পুতুলের বাক্স থেকে এই পুঁতির মালা চুরি করে নিয়ে এসেচে—মেয়ে ক'দিন থেকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। তারপর সতু গিয়ে বললে যে, তোর পুঁতির মালা দুগ্‌গাদিদির বাক্সের মধ্যে দেখে এলাম—দ্যাখো একবার কাণ্ড—তোমার ও মেয়ে কম নাকি? চোর—চোরের বেহদ্দ চোর—আর ওই দ্যাখো না—বাগানের আমগুলো গুটি পড়তে দেরি সয় না—চুরি করে নিয়ে এসে বাক্সে লুকিয়ে রেখেচে।

যুগপৎ দুই চুরির অতর্কিততায় আড়ষ্ট হইয়া দুর্গা পাঁচিলের গায়ে ঠেস্‌ দিয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল—এনিচিস্‌ এই মালা ওদের বাড়ি থেকে?

দুর্গা কথার উত্তর দিতে না দিতে সেজ-বৌ বলিলেন,—না আনলে কি আর মিথ্যে করে বলচি নাকি! বলি এই আম কটা দ্যাখো না? সোনামুখীর আম চেনো, না কি? এও কি মিথ্যে কথা?

সর্বজয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল—না সেজখুড়ি, আপনার মিথ্যে কথা তা তো বলিনি! আমি ওকে জিজ্ঞেস করচি।

সেজ-ঠাক্‌রুন হাত নাড়িয়া ঝাঁজের সহিত বলিলেন—জিজ্ঞেস করো আর যা করো বাপু, ও মেয়ে সোজা মেয়ে হবে না আমি বলে দিচ্চি—এই বয়েসে যখন চুরি বিদ্যে ধরেচে, তখন এর পর যা হবে সে টেরই পাবে! চল্‌ রে সতু—নে আমের গুটিগুলো বেঁধে নে—বাগানের আমগুলো লক্ষ্মীছাড়া ছুঁড়ির জ্বালায় যদি চোখে দেখবার জো আছে! টুনু, মালা নিইচিস তো?

সর্বজয়ার কি জানি কেমন একটু রাগ হইল—ঝগড়াতে সে কিছু পিছু হটিবার পাত্র নয়, বলিল—পুঁতির মালার কথা জানিনে সেজ-খুড়ি, কিন্তু আমের গুটিগুলো, সেগুলো পেড়েছে কি তলা থেকে কুড়িয়ে এনেচে, তার গায়ে তো নাম লেখা নেই সেজখুড়ি—আর ছেলেমানুষ যদি ধরো এনেই থাকে—

সেজ-ঠাক্‌রুন অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিলেন—বলি কথাগুলি তো বেশ কেটে কেটে বলচো? বলি আমের গুটিতে নাম লেখা না-হয় নেই-ই, তোমাদের কোন্‌ বাগান থেকে এগুলো এসেচে তা বলতে পারো? বলি টাকাগুলোতেও তো নাম লেখা ছিল না—তা তো হাত পেতে নিতে পেরেছিলে? আজ এক বচ্ছরের ওপর হয়ে গ্যালো, আজ দেবো কাল দেবো—আস্‌বো এখন

ওবেলা, টাকা দিয়ে দিয়ো—ও আমি আর রাখতে পারবো না—টাকার জোগাড় করে রেখো বলে দিচ্চি।

দলবলসহ সেজ-ঠাকরুন দরজার বাহির হইয়া গেলেন। সর্বজয়া শুনিতে পাইল, পথে কাহার কথার উত্তরে তিনি বেশ উচ্চকণ্ঠেই বলিতেছেন—ওই এ-বাড়ির ছুঁড়িটা, টুনুর বাক্স থেকে এই পুঁতির মালাছড়াটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে করেচে কি নিজের বাক্সে লুকিয়ে রেখেচে—আর দ্যাখো না এই আমগুলো—পাশেই বাগান, যত ইচ্ছে পাড়লেই হল—তাই বলতে গেলাম, তা মা আবার কেটে কেটে বলচে (এখানে সেজ-বৌ সর্বজয়ার কথা বলিবার ভঙ্গি নকল করিলেন)—তা—এনেচে ছেলেমানুষ—ও রকম এনেই থাকে—ওতে কি তোমাদের নাম লেখা আছে নাকি? (সুর নিচু করিয়া) মা-ই কি কম চোর নাকি, মেয়ের শিক্ষে কি আর অম্‌নি হয়েচে? বাড়িসুদ্দ সব চোর—

অপমানে দুঃখে সর্বজয়ার চোখে জল আসিল। সে ফিরিয়া দুর্গার রুক্ষ চুলের গোছা টানিয়া ধরিয়া ডাল ভাত মাখা হাতেই দুড়দাড় করিয়া তাহার পিঠে কিলের উপর কিল ও চড়ের উপব চড় মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল—আপদ্‌বালাই একটা কোত্থেকে এসে জুটেছে—ম'লে ও আপদ চুকে যায়—মরেও না যে বাঁচি—হাড় জুড়োয়—বেরো বাড়ি থেকে, দূর হয়ে যা—যা, এখ্‌খুনি বেরো—

দুর্গা মার খাইতে খাইতে ভয়ে খিড়কি-দোর দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার ছেঁড়া রুক্ষ চুলের গোছা দু-এক গাছা সর্বজয়ার হাতে থাকিয়া গেল।

অপু খাইতে খাইতে অবাক হইয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল। দিদি পুঁতির মালা চুবি কবিযা আনিয়াছিল কিনা তাহা সে জানে না—পুঁতির মালাটা সে ইহাব আগে কোনও দিন দেখে নাই—কিন্তু আমের গুটি যে চুরির জিনিস নয় তাহা সে নিজে জানে। কাল বৈকালে দিদি তাহাকে সঙ্গে করিয়া টুনুদের বাগানে আম কুড়াইতে গিয়াছিল এবং সোণামুখীর তলায় আম কটা পড়িয়া ছিল, দিদি কুড়াইয়া লইল, সে জানে কাল হইতে অনেকবার দিদি বলিয়াছে—ও অপু, এবার সেই আমের গুটিগুলো জারাবো, কেমন তো? কিন্তু মা অসুবিধাজনকভাবে বাড়ি উপস্থিত থাকার দরুন উক্ত প্রস্তাব আর কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। দিদির অত্যন্ত আশার জিনিস আমগুলো এভাবে লইয়া গেল, তাহার উপর আবার দিদি এরূপ ভাবে মারও খাইল। দিদির চুল ছিঁড়িয়া দেওয়ায় মায়ের উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইল। যখন তাহার দিদির মাথার সামনে রুক্ষ চুলের এক গোছা খাড়া হইয়া বাতাসে উড়ে তখনই কি জানি কেন, দিদির উপর অত্যন্ত মমতা হয়—কেমন যেন মনে হয় দিদির কেহ কোথাও নাই—সে যেন একা কোথা হইতে আসিয়াছে—উহার সাথী কেহ এখানে নাই। কেবলই মনে হয়, কেমন করিয়া সে দিদির সকল দুঃখ ঘুচাইয়া দিবে—সকল অভাব পূরণ করিয়া তুলিবে! তাহার দিদিকে সে এতটুকু কষ্টে পড়িতে দিবে না।

খাওয়ার পরে অপু মায়ের ভয়ে ঘরের মধ্যে বসিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহার মন থাকিয়া থাকিয়া কেবলই বাহিরে ছুটিয়া যাইতেছিল। বেলা একটু পড়িলে সে টুনুদের বাড়ি, পটলিদের বাড়ি, নেড়াদের বাড়ি—একে একে সকল বাড়ি খুঁজিল—দিদি কোথাও নাই। রাজকৃষ্ট পালিতের স্ত্রী ঘাট হইতে জল লইয়া আসিতেছিলেন—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—জেঠিমা, আমার দিদিকে দেখেচো? সে আজ ভাত খায়নি, কিছু খায়নি—মা তাকে আজ বড্ড মেরেচে—মার খেয়ে কোথায় পালিয়েচে—দেখেচো জেঠিমা?

বাড়ির পাশের পথ দিয়া যাইতে যাইতে ভাবিল—বাঁশ-বাগানে সে যদি বসিয়া থাকে? সেদিকে গিয়া সমস্ত খুঁজিয়া দেখিল। সে খিড়কি-দরজা দিয়া বাড়ি ঢুকিয়া দেখিল, বাড়িতে কেহ নাই। তাহার মা বোধ হয় ঘাটে কি অন্য কোথাও গিয়াছে। বাড়িতে বৈকালের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে। সম্মুখের দরজার কাছে যে বাঁশঝাড় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার একগাছা ঝুলিয়া-পড়া শুকনো কঞ্চিতে

তাহার পরিচিত সেই লেজঝোলা হলদে পাখিটা আসিয়া বসিয়াছে। রোজই সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সে কোথা হইতে আসিয়া এই বাঁশঝাড়ের ওই কঞ্চিখানার উপর বসে—রোজ—রোজ—রোজ। আরও কত কি পাখি চারিদিকের বনে কিচ-কিচ করিতেছে। নীলমণি রায়েদের পোড়ো ভিটা গাছপালার ঘন ছায়ায় ভরিয়া গিয়াছে। অপু রোয়াকে দাঁড়াইয়া দূরের সেই অশ্বত্থ গাছটার মাথার দিকটায় চাহিয়া দেখিল—একটু একটু রাঙা রোদ গাছের মাথায় এখনও মাখানো, মগডালে একটা কি সাদা মতো দুলিতেছে, হয় বক, নয় কাহারও ঘুড়ি ছিঁড়িয়া আটকাইয়া ঝুলিতেছে—সমস্ত আকাশ জুড়িয়া যেন ছায়া আর অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। চারিদিকে নির্জন...কেহ কোনোদিকেই নাই...নীলমণি রায়ের পোড়ো ভিটায় কচুঝাড়ের কালো ঘন সবুজ নতুন পাতা চক্ চক্ করিতেছে। তাহার মন হঠাৎ হু-হু করিয়া উঠিল। কতক্ষণ হইল, সেই গিয়াছে, বাড়ি আসে নাই, খায় নাই—কোথায় গেল দিদি?

ভুবন মুখুজ্যের বাড়ির ছেলেমেয়েরা মিলিয়া উঠানে ছুটাছুটি করিয়া লুকোচুরি খেলিতেছে। রানু তাহাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল—ভাই, অপু এসেচে...ও আমাদের দিকে হবে, আয় রে অপু।

অপু তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমি খেল্‌বো না রানুদি,—দিদিকে দেখেচো?

রানু জিজ্ঞাসা করিল—দুগ্‌গা? না, তাকে তো দেখিনি! বকুলতলায় নেই তো?

বকুলতলার কথা তাহার মনেই হয় নাই। সেখানে দুর্গা প্রায়ই থাকে বটে। ভুবন মুখুজ্যের বাড়ি হইতে সে বকুলতলায় গেল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—বকুলগাছটা অনেক দূর পর্যন্ত জুড়িয়া ডালপালা ছড়াইয়া ঝুপসি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—তলাটা অন্ধকার। কেহ কোথাও নাই...যদি কোনো দিকে গাছপালার আড়ালে থাকে! সে ডাক দিল—দিদি, ও দিদি! দিদি!

অন্ধকার গাছটায় কেবল কতকগুলা বক পাখা ঝটপট করিতেছে মাত্র। অপু ভয়ে ভয়ে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল। বকুলতলা হইতে একটু দূরে একটা ডোবার ধারে খেজুর গাছ আছে, এখন ডাঁশা খেজুরের সময়, সেখানেও তাহার দিদি মাঝে মাঝে থাকে বটে। কিন্তু অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, ডোবাটার দুই ধারে বাঁশবন, সেখানে যাইয়া দেখিতে তাহার সাহস হইল না। বকুলগাছের গুঁড়ির কাছে সরিয়া গিয়া সে দুই-একবার চিৎকার করিয়া ডাকিল—ভাঁটশেওড়া বনে কি জন্তু তাহার গলার সাড়া পাইয়া খস্ খস্ শব্দ কবিয়া ডোবার দিকে ছুটিয়া পলাইল।

বাড়ির পথে ফিরিতে ফিরিতে হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল। সামনে সেই গাব গাছটা! একা সন্ধ্যার পর এ গাবগাছের তলার পথ দিয়া যাওয়া! সর্বনাশ! গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। কেন যে তাহার এই গাছটার নিচে দিয়া যাইতে ভয় করে, তাহা সে জানে না। কোন কারণ নাই, এমনিই ভয় করে এবং কারণ কিছু নাই বলিয়া ভয় অত্যন্ত বেশি করে। এত দেরি পর্যন্ত সে কোনো দিন বাড়ির বাহিরে থাকে নাই—আজ তাহার সে খেয়াল হইল না। মন ব্যস্ত ও অন্যমনস্ক না থাকিলে সে কখনই এপথে আসিত না।

অপু খানিকক্ষণ অন্ধকার গাবতলাটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিল। তাহাদের বাড়ি যাইবার আর একটা পথ আছে—একটুখানি ঘুরিয়া পট্‌লিদের বাড়ির উঠান দিয়া গেলে গাবতলার এ অজানা বিভীষিকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

পট্‌লির ঠাকুরমা সন্ধ্যার সময় বাড়ির রোয়াকে ছেলেপিলেদের লইয়া হাওয়ায় বসিয়া গল্প করিতেছেন। পট্‌লির মা রান্নাঘরে রাঁধিতেছেন। উঠানের মাচাতলায় বিধু জেলেনি দাঁড়াইয়া মাছ বিক্রয়ের পয়সা তাগাদা করিতেছে।

অপু বলিল—দিদিকে খুঁজতে গিয়েছিলাম ঠাকুমা—বকুলতলা থেকে আসতে আসতে—

ঠাকুরমা বলিলেন—দুগ্‌গা এই তো বাড়ি গেল। এই কতক্ষণ যাচ্ছে—ছুটে যা দিকি—বোধ হয় এখনও বাড়ি গিয়ে পৌঁছয়নি—

সে এক দৌড়ে বাড়ির দিকে ছুটিল। পিছন হইতে পট্‌লির বোন রাজী চেঁচাইয়া বলিল—কাল

সকালে আসিস্ অপু—আমরা গঙ্গা-যমুনা খেলার নতুন ঘর কেটেছি। ঢেঁকশালের পেছনে নিমতলায়—দুগ্‌গাকে বলিস্—

তাহাদের বাড়ির কাছে আসিয়া পৌঁছিয়া হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল—দুর্গা আর্তস্বরে চিৎকার করিতে করিতে বাড়ির দরজা দিয়া দৌড়াইয়া বাহির হইতেছে—পিছনে পিছনে তাহার মা কি একটা হাতে মারিতে মারিতে তাড়া করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। দুর্গা গাবতলার পথ দিয়া ছুটিয়া পালাইল, মা দরজা হইতে ধাবমানা মেয়ের পিছনে চেঁচাইয়া বলিল—যাও বেরোও—একেবারে জন্মের মতো যাও—আর কক্ষনো বাড়ি যেন ঢুকতে না হয়—বালাই, আপদ চুকে যাক্—একেবারে ছাতিমতলায় দিয়ে আসি।

ছাতিমতলায় গ্রামের শ্মশান। অপুর সমস্ত শরীর যেন জমিয়া পাথরের মতো আড়ষ্ট ও ভারী হইয়া গেল। তাহার মা সবেমাত্র ভিতরের বাড়িতে ঢুকিয়া মাটির প্রদীপটা রোয়াকের ধার হইতে উঠাইয়া লইতেছে। সে পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ি ঢুকিতেই তাহার মা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি আবার এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে শুনি? মোটে তো আজ ভাত খেয়েচো?

তাহার মনে নানা প্রশ্ন জাগিতেছিল। দিদি আবার মার খাইল কেন? সে এতক্ষণ কোথায় ছিল? দুপুর বেলা দিদি কি খাইল? সে কি আবার কোন জিনিস চুরি করিয়া আনিয়াছে? কিন্তু ভয়ে কোনো কথা না বলিয়া সে কলের পুতুলের মতো মায়ের কথামতো কাজ করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। পরে ভয়ে ভয়ে প্রদীপ উসকাইয়া দিয়া নিজের ছোট বইয়ের দপ্তরটি বাহির করিয়া পড়িতে বসিল। সে পড়ে মোটে তৃতীয় ভাগ—কিন্তু তাহার দপ্তরে দুখানা মোটা মোটা ভারী ইংরাজি কি বই, কবিরাজি ঔষধের তালিকা, একখানা পাতা-ছেঁড়া দাশুরায়ের পাঁচালি, একখানা ১৩০৩ সালের পুরাতন পাঁজি প্রভৃতি আছে। সে নানাস্থান হইতে চাহিয়া এগুলি জোগাড় করিয়াছে এবং এগুলি না পড়িতে পারিলেও রোজ একবার করিয়া খুলিয়া দেখে।

খানিকক্ষণ দেওয়ালের দিকে চাহিয়া সে কি ভাবিল। পবে আর একবার প্রদীপ উসকাইয়া দিয়া পাতা-ছেঁড়া দাশুরায়ের পাঁচালিখানা খুলিয়া অন্যমনস্কভাবে পাতা উলটাইতেছে, এমন সময়ে সর্বজয়া এক বাটি দুধ হাতে করিয়া ঢুকিয়া বলিল—এসো, খেয়ে নাও দিকি!

অপু দ্বিরুক্তি না করিয়া বাটি উঠাইযা লইয়া দুধ চুমুক দিয়া খাইতে লাগিল। অন্যদিন হইলে এত সহজে দুধ খাইতে তাহাকে রাজি করানো খুঁব কঠিন হইত। একটুখানি মাত্র খাইয়া সে বাটি মুখ হইতে নামাইল। সর্বজয়া বলিল—ওকি? নাও সবটুকু খেয়ে ফেলো—ওইটুকু দুধ ফেললে তবে বাঁচবে কি খেয়ে—

অপু বিনা প্রতিবাদে দুধের বাটি পুনরায় মুখে উঠাইল। সর্বজয়া দেখিল সে মুখে বাটি ধরিয়া রহিযাছে কিন্তু চুমুক দিতেছে না—তাহার বাটিসুদ্ধ হাতটা কাঁপিতেছে...পরে অনেকক্ষণ মুখে ধরিয়া রাখিয়া হঠাৎ বাটি নামাইয়া সে মায়ের দিকে চাহিয়া ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। সর্বজয়া আশ্চর্য হইয়া বলিল—কি হল রে? কি হয়েচে, জিভ কামড়ে ফেলেছিস?

অপু মায়ের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের বাঁধ না মানিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—দিদির জন্য বড্ড মন কেমন করছে!...

সর্বজয়া অল্পক্ষণ মাত্র চুপ করিয়া বসিয়া পরে সরিয়া আসিয়া ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে শান্তসুরে বলিতে লাগিল—কেঁদো না, অমন করে কেঁদো না,—ওই পটলিদের কি নেড়াদের বাড়ি বসে আছে—কোথায় যাবে অন্ধকারে? কম দুষ্টু মেয়ে নাকি? সেই দুপুর বেলা বেরুল—সমস্ত দিনের মধ্যে আর চুলের টিকি দেখা গেল না—না খাওয়া, না দাওয়া, কোথায় ও-পাড়ার পালিতদের বাগানে বসে ছিল, সেখানে বসে কাঁচা আম আর জামরুল খেয়েচে, এক্ষুনি ডাকতে পাঠাচ্ছি—কেঁদো না অমন করে—আবার জ্বর আসবে—ছিঃ।

পরে সে আঁচল দিয়া ছেলের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বাকি দুধটুকু খাওয়াইবার জন্য বাটি

তাহার মুখে তুলিয়া ধরিল—হাঁ করো দিকি, লক্ষ্মী সোনা, উনি এলেই ডেকে আন্‌বেন এখন—একেবারে পাগল—কোত্থেকে একটা পাগল এসে জন্মেছে—আর এক চুমুক—হ্যাঁ—

রাত অনেক হইয়াছে। উত্তরের ঘরে তক্তাপোশে অপু ও দুর্গা শুইয়া আছে। অপুর পাশে তাহার মায়ের শুইবার জায়গা খালি আছে। কারণ মা এখন রান্নাঘরের কাজ সারিয়া আসে নাই। তাহার বাবা আহারাদি সারিয়া পাশের ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। বাবা বাড়ি আসিয়া দুর্গাকে পাড়া হইতে খুঁজিয়া আনিয়াছেন।

বাড়ি আসিয়া পর্যন্ত দুর্গা কাহারও সঙ্গে কোনো কথা বলে নাই। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আসিয়া চুপ করিয়া শুইয়াছে। অপু দুর্গার গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, মা কি দিয়ে মেরেছিল রে সন্ধেবেলা? তোর চুল ছিঁড়ে দিয়েচে?

দুর্গার মুখে কোন কথা নাই।

সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—আমার উপর রাগ করেছিস্ দিদি? আমি তো কিছু করিনি।

দুর্গা আস্তে আস্তে বলিল—না বইকি! তবে সতু কি করে টের পেলে যে পুঁতির মালা আমার বাক্সে আছে?

অপু প্রতিবাদের উত্তেজনায় উঠিয়া বসিল।—না—সত্যি আমি তোর গা ছুঁয়ে বল্‌চি দিদি, আমি তো দেখাইনি। আমি জানিনে যে তোর বাক্সে আছে—কাল সতু বিকেল বেলা এসেছিল, ওর সেই বড় রাঙা ভাঁটাটা নিয়ে আমরা খেল্‌ছিলাম—তার পর, বুঝলি দিদি, সতু তোর পুতুলের বাক্স খুলে কি দেখছিল—আমি বল্লাম, ভাই, তুমি আমার দিদির বাক্সে হাত দিয়ো না—দিদি আমাকে বকে—সেই সময়ে দেখেচে—

পরে সে দুর্গার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—খুব লেগেচে রে দিদি? কোথায় মেরেচে মা?

দুর্গা বলিল—আমার কানের পাশে মা একটা বাড়ি যা মেরেছে—রক্ত বেরিয়েছিল, এখনও কন্ কন্ হচ্ছে, এইখানে এই দ্যাখ হাত দিয়ে! এই—

—এইখানে? তাই তো রে! কেটে গিয়েছে যে? একটু পিদিমের তেল লাগিয়ে দেব দিদি?

—থাকগে—কাল পালিতদের বাগানে বিকেল বেলা যাব বুঝলি? কামরাঙা যা পেকেছে? এই এত বড় বড়, কাউকে যেন বলিসনে! তুই আর আমি চুপি চুপি যাবো—আমি আজ দুপুরবেলা দুটো পেড়ে খেয়েছি—মিষ্টি যেন গুড়—

একাদশ পরিচ্ছেদ

এদিনের ব্যাপারটা এইরূপে ঘটিল।

অপু বাবার আদেশে তালপাতে সাতখানা ক খ হাতের লেখা শেষ করিয়া কি করা যায় ভাবিতে ভাবিতে বাড়ির মধ্যে দিদিকে খুঁজিতে গেল। দুর্গা মায়ের ভয়ে সকালে নাহিয়া আসিয়া ভিতরের উঠানে পেঁপেতলায় পুণ্যিপকুরের ব্রত করিতেছে। উঠানে ছোট্ট চৌকোণা গর্ত কাটিয়া তাহার চারিধারে ছোলা, মটর ছড়াইয়া দিয়াছিল—ভিজে মাটিতে সেগুলির অঙ্কুর বাহির হইয়াছে—চারিদিকে কলার ছোট বোগ পুঁতিয়া ধারে পিটুলি গোলার আলপনা দিতেছে—পদ্মলতা, পাখি, ধানের শিষ, নতুন ওঠা সূর্য।

দুর্গা বলিল—দাঁড়া, এই মন্তরটা বলে নিয়ে চল্ এক জায়গায় যাবো।

—কোথা রে দিদি?

—চল্ না, নিয়ে যাবো এখন, দেখিস এখন—। পরে আনুষঙ্গিক বিধি-অনুষ্ঠান সাঙ্গ করিয়া সে এক নিশ্বাসে আবৃত্তি করিতে লাগিল—

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা কে পুজে রে দুপুর বেলা?
আমি সতী লীলাবতী ভায়ের বোন্ ভাগ্যবতী—

অপু দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসিয়া বলিল—ইঃ।

দুর্গা ছড়া থামাইয়া ঈষৎ লজ্জা-মিশানো হাসির সঙ্গে বলিল—তুই ও-রকম কচ্চিস্ কেন? যা এখান থেকে—তোর এখানে কি?—যা।

অপু হাসিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে আবৃত্তি করিতে লাগিল—আমি সতী লীলাবতী, ভাই বোন্ ভাগ্যবতী, হি হি—ভাই বোন্ ভাগ্যবতী—হি—হি—

দুর্গা বলিল, তোমার বড় ইযে হয়েচে, না? মাকে বলে তোমার ভ্যাংচানো বার করবো এখন—

ব্রতানুষ্ঠান শেষ করিয়া দুর্গা বলিল, চল্ গড়ের পুকুরে অনেক পানফল হয়ে আছে—ভোঁদার মা বলছিল, চল্ নিয়ে আসি—

গ্রামের একেবারে উত্তরাংশে চারিধারে বাঁশবন ও আগাছা এবং প্রাচীন আম-কাঁঠালের বাগানের ভিতর দিয়া পথ। লোকালয় হইতে অনেক দূরে গভীর বন যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে মাঠের ধারে মজা পুকুরটা। কোনকালে গ্রামের আদি বাসিন্দা মজুমদারদের বাড়ির চতুর্দিকে যে গড়খাই ছিল তাহার অন্য অংশ.এখন ভরাট হইয়া গিয়াছে—কেবল এই খাতটাতে বারো মাস জল থাকে, ইহারই নাম গড়ের পুকুর। মজুমদারদের বাড়ির কোন চিহ্ন এখন নাই।

সেখানে পৌঁছিয়া তাহারা দেখিল পুকুরে পানফল অনেক আছে বটে, কিন্তু কিনারার ধারে বিশেষ কিছু নাই, সবই জল হইতে দূরে। দুর্গা বলিল—অপু, একটা বাঁশের কঞ্চি দ্যাখ্ তো খুঁজে—তাই দিয়ে টেনে টেনে আনবো। পরে সে পুকুরধারের ঝোপের শেওড়া গাছ হইতে পাকা শেওড়ার ফল তুলিয়া খাইতে লাগিল। অপু বনের মধ্যে কঞ্চি খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইয়া বলিল—ও দিদি, ও ফল খাস্‌নি!—দূর—আশ-শ্যাওড়ার ফল কি খায় রে! ও-তো পাখিতে খায়—

দুর্গা পাকা ফল টিপিয়া বীজ বাহির করিতে করিতে বলিল—আয় দিকি—দ্যাখ্ দিকি খেয়ে—মিষ্টি যেন গুড়—কে বলেচে খায় না? আমি তো কত খেইচি।

অপু কঞ্চি কুড়ানো রাখিয়া দিদির কাছে আসিয়া বলিল—খেলে যে বলে পাগল হয়? আমায় একটা দে দিকি, দিদি—

পরে সে খাইয়া মুখ একটু কাঁচুমাচু করিয়া বলিল—এট্টু এট্টু তেতো যে দিদি—

—তা এট্টু তেতো থাকবে না? তা থাক্, কিন্তু কেমন মিষ্টি বল্ দিকি—কথা শেষ করিয়া দুর্গা খুব খুশির সহিত গোটাকতক বড়বড় পাকা ফল মুখের মধ্যে পুরিল।

জন্মিয়া পর্যন্ত ইহারা কখনও কোনো ভালো জিনিস খাইতে পায় নাই। অথচ পৃথিবীতে ইহারা নূতন আসিয়াছে, জিহ্বা ইহাদের নূতন—তাহা পৃথিবীর নানা রস, বিশেষত মিষ্ট রস আস্বাদ করিবার জন্য লালায়িত। সন্দেশ মিঠাই কিনিয়া সে পরিতৃপ্তি লাভ করিবার সুযোগ ইহাদের ঘটে না—বিশ্বের অনন্ত সম্পদের মধ্যে তুচ্ছ বনগাছ হইতে মিষ্টরস আহরণরত এই সব লুব্ধ দরিদ্র ঘরের বালকবালিকাদের জন্য তাই করুণাময়ী বনদেবীরা বনের তুচ্ছ ফুলফল মিষ্টি মধুতে ভরাইয়া রাখেন।

খানিকটা পরে দুর্গা পুকুরের জলে একটু নামিয়া বলিল—কত নাল ফুল রয়েছে অপু! দাঁড়া তুলছি। জলে আরও নামিয়া সে দুইটা ফুলের লতা ধরিয়া টানিল—ডাঙায় ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—ধর অপু।

অপু বলিল—পানফল তো খুব জলে—ওখানে কি করে যাবি দিদি?

দুর্গা একটা কঞ্চি দিয়া দূর জলের পানফলের গাছগুলো টানিবার চেষ্টা করিয়া পারিল না।

বলিল—বড্ড গড়ানে পুকুর রে—গড়িয়ে যাচ্ছি ডুবজলে—নাগাল পাই কি করে? তুই এক কাজ কর্, পেছন থেকে আমার আঁচল ধরে টেনে রাখ দিকি, আমি কঞ্চি দিয়ে পানফলের ওই ঝাঁকটা টেনে আনি।

বনের মধ্যে হলদে কি একটা পাখি ময়নাকাঁটা গাছের ডালের আগায় বসিয়া পাতা নাচাইয়া ভারি চমৎকার শিস দিতেছিল। অপু চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল—কি পাখি রে দিদি?

—পাখি-টাখি এখন থাক্—ধর্ দিকি বেশ করে আঁচলটা টেনে, গড়িয়ে যাবো—জোর করে—

অপু পিছন হইতে আঁচল টানিয়া রহিল। দুর্গা পায়ে পায়ে নামিয়া যতদূর যায় কঞ্চি আগাইয়া দিল। কাপড়-চোপড় ভিজিয়া গেল তবু নাগাল আসে না—আরও একটুখানি নামিয়া আঙুলের আগায় মাত্র কঞ্চিখানাকে ধরিয়া টানিবার চেষ্টা করিল। অপু টানিয়া ধরিয়া থাকিতে থাকিতে শক্তিতে আর কুলাইতেছে না দেখিয়া পিছন হইতে হাসিয়া উঠিল। হাসির সঙ্গে আঁচল ঢিলা হওয়াতে দুর্গা জলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল কিন্তু তখনই সামলাইয়া হাসিয়া বলিল—দূর, তুই যদি কোনো কাজের ছেলে—ধর ফের। অতিকষ্টে একটা পানফলের ঝাঁক কাছে আসিল—দুর্গা কৌতূহলের সহিত দেখিতে লাগিল কতগুলা পানিফল ধরিয়াছে। পরে ডাঙায় ছুড়িয়া দিয়া বলিল—বড্ড কচি, এখনও দুধ হয়নি মধ্যে, আর একবার ধর্ তো। অপু আবার পিছন হইতে টানিয়া ধরিয়া রহিল। খানিকটা থাকিবার পর সে দিদির ঝুঁকিবার সঙ্গে সঙ্গে টানের চোটে আবার দু-এক পা জলের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল—পরে কাপড় ভিজিয়া যায় দেখিয়া হাল ছাড়িয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দুর্গা হাসিয়া বলিল—দূর!

ভাইবোনের কলহাস্যে খানিকক্ষণ ধরিয়া পুকুরপ্রান্তের নির্জন বাঁশবাগান মুখরিত হইতে লাগিল। দুর্গা বলিল—এতটুকু যদি জোর থাকে তোর গায়ে! গাবের ঢেঁকি কোথাকার!

খানিকটা পরে দুর্গা জলে নামিয়া আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতেছে, অপু ডাঙায় দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় অপু পাশের একটা শ্যাওড়া গাছের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—দিদি, দ্যাক কি এখানে!... পরে সে ছুটিয়া গিয়া মাটি খুঁড়িয়া কি তুলিতে লাগিল।

দুর্গা জল হইতে জিজ্ঞাসা করিল—কি রে? পরে সেও উঠিয়া ভাইয়ের কাছে আসিল।

অপু ততক্ষণ মাটি খুঁড়িয়া কি একটা বাহির করিয়া কোঁচার কাপড় দিয়া মাটি মুছিয়া সাফ করিতেছে। হাতে করিয়া আহ্লাদের সহিত দিদিকে দেখাইয়া বলিল—দ্যাখ্ দিদি, চক্‌চক্ কচ্ছে—কি জিনিস রে?

দুর্গা হাতে লইয়া দেখিল—গোলমত একদিক ছুঁচোলো পল-কাটা-কাটা চক্‌চকে কি একটা জিনিস। সে খানিকক্ষণ আগ্রহের সহিত নানাভাবে উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ কি ভাবিয়া তাহার রুক্ষ চুলে-ঘেরা মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ দেখিতেছে কিনা। চুপিচুপি বলিল—অপু, এটা বোধ হয় হীরে! চুপ্ কর, চেঁচাসনে। পরে সে ভয়ে ভয়ে আর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

অপু দিদির দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। হীরক বস্তুটি তাহার অজ্ঞাত নয় বটে, মায়ের মুখে দিদির মুখে রূপকথার রাজপুত্র ও রাজকন্যার হীরামুক্তার অলঙ্কারের ঘটা সে অনেকবার শুনিয়াছে; কিন্তু হীরা জিনিসটা কি রকম দেখিতে, সে সম্বন্ধে তাহার মনে একটু ভুল ধারণা ছিল। তাহার মনে হইত হীরা দেখিতে মাছের ডিমের মতো, হল্‌দে হল্‌দে, তবে নরম নয়—শক্ত।...

সর্বজয়া বাড়ি ছিল না, পাড়া হইতে আসিয়া দেখিল—ছেলেমেয়ে বাড়ির ভিতর দিকে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। কাছে যাইতে দুর্গা চুপিচুপি বলিল—মা, একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েচি আমরা। গড়ের পুকুরে পানফল তুলতে গিইছিলাম মা। সেখানে জঙ্গলের মধ্যে এটি পোঁতা ছিল।

অপু বলিল—আমি দেখে দিদিকে বল্লাম, মা।

দুর্গা আঁচল হইতে জিনিসটা খুলিয়া মায়ের হাতে দিয়া বলিল—দ্যাখো দিকি কী এটা মা?

সর্বজয়া উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিতে লাগিল। দুর্গা চুপিচুপি বলিল—মা, এটা ঠিক হীরে—নয়?

সর্বজয়ারও হীরক সম্বন্ধে ধারণা তাহাদের অপেক্ষা বেশি স্পষ্ট নহে। সে সন্দিগ্ধ সুরে জিজ্ঞাসা করিল—তুই কি করে জান্‌লি হীরে?

দুর্গা বলিল—মজুমদারেরা বড়লোক ছিল তো মা? ওদের ভিটের জঙ্গলে কারা নাকি মোহর কুড়িয়ে পেয়েছিল—পিসি গল্প করতো। এটা একেবারে পুকুরের ধারে বনের মধ্যে পোঁতা ছিল, রোদ্দুর লেগে চক্‌চক্‌ কচ্ছিল, এ ঠিক মা হীরে।

সর্বজয়া বলিল—আগে উনি আসুন, ওঁকে দেখাই।

দুর্গা বাহিরে উঠানে আসিয়া আহ্লাদের সহিত ভাইকে বলিল—হীরে যদি হয় তবে দেখিস্‌ আমরা বড়মানুষ হয়ে যাবো।

অপু না বুঝিয়া বোকার মতো হি হি করিয়া হাসিল।

ছেলেমেয়ে চলিয়া গেলে জিনিসটা বাহির করিয়া সর্বজয়া ভালো করিয়া দেখিতে লাগিল। গোলমতো, ধারকাটা ও পালতোলা, এক মুখ ছুঁচোলো—যেন সিন্দুর কৌটার ঢাক্‌নির উপরটা। বেশ চক্‌চকে। সর্বজয়ার মনে হইল যেন অনেক রকম রং সে ইহার মধ্যে দেখিতে পাইতেছে। তবে কাচ যে নয়—ইহা ঠিক। এ রকম ধরনের কাচ সে কখনও দেখিয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না। হঠাৎ তাহার সমস্ত গা দিয়া যেন কিসের স্রোত বহিয়া গেল, তাহার মনের এক কোণে নানা সন্দেহের বাধা ঠেলিয়া একটা গাঢ় দুরাশা ভয়ে ভয়ে একটু উঁকি মারিল—সত্যিই যদি হীরে হয়, তা হলে?

হীরক সম্বন্ধে তাহার ধারণাটা পরশপাথর কিংবা সাপের মাথার মণি জাতীয় ছিল। কাহিনীর কথা মাত্র, বাস্তব জগতে বড় একটা দেখা যায় না। আর যদি বা দেখা যায়, তবে দুনিয়ার ঐশ্বর্য বোধ হয় এক টুকরা হীরার বদলে পাওয়া যাইতে পারে।

খানিকটা পরে একটা পুঁটুলি হাতে হরিহর বাড়ি ঢুকিল।

সর্বজয়া বলিল—ওগো, শোনো, এদিকে এসো তো! দ্যাখো তো এটা কি!

হরিহর হাতে লইয়া বলিল—কোথায় পেলে?

—দুগ্‌গা গড়ের পুকুরে পানফল তুল্‌তে গিয়েছিল, কুড়িয়ে পেয়েচে। কি বলো দিকি?

হরিহর খানিকক্ষণ উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিয়া বলিল—কাচ, না-হয় পাথর-টাথর হবে—একটুকু জিনিস, ঠিক বুঝতে পারচি নে।

সর্বজয়ার মনে একটুখানি ক্ষীণ আশার রেখা দেখা দিল—কাচ হইলে তাহার স্বামী কি চিনিতে পারিত না? পরে সে চুপিচুপি, যেন পাছে স্বামী বিরুদ্ধযুক্তি দেখায় এই ভয়ে বলিল—হীরে নয় তো? দুগ্‌গা বলছিল মজুমদার বাড়ির গড়ে তো কত লোক কত কি কুড়িয়ে পেয়েচে! যদি হীরে হয়?

—হ্যাঁ, হীরে যদি পথেঘাটে পাওয়া যেত তবে আর ভাবনা কি ছিল? তুমিও যেমন!

তাহার মনে মনে ধারণা হইল ইহা কাচ। পরক্ষণেই কিন্তু মনে হইল হয়তো হইতেও পারে। বলা যায় কি? মজুমদারেরা বড়লোক ছিল। বিচিত্র কি যে হয়তো তাদেরই গহনায়-টহনায় কোনো কালে বসানো ছিল, কি করিয়া মাটির মধ্যে পুঁতিয়া গিয়াছে। কথায় বলে, কপালে না থাকিলে গুপ্তধন হাতে পড়িলেও চেনা যায় না—শেষে কি দরিদ্র ব্রাহ্মণের গল্পের মতো ঘটিবে!

সে বলিল—আচ্ছা দাঁড়াও, একবার বরং গাঙ্গুলি-বাড়ি দেখিয়ে আসি।

রাঁধিতে রাঁধিতে সর্বজয়া বার বার মনে মনে বলিতে লাগিল—দোহাই ঠাকুর, কত লোক তো কত কি কুড়িয়ে পায়। এই কষ্ট যাচ্ছে সংসারের—বাছাদের দিকে মুখ তুলে তাকিও—দোহাই ঠাকুর!

তাহার বুকের মধ্যে টিপ টিপ করিতেছিল।

খানিকটা পরে দুর্গা বাড়ি আসিয়া আগ্রহের সুরে বলিল—বাবা এখনও বাড়ি ফেরেনি, হ্যাঁ মা?

সঙ্গে সঙ্গে হরিহর বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া বলিল—হুঁ, তখনই আমি বল্লাম এ কিছুই নয়। গাঙ্গুলি মশায়ের জামাই সত্যবাবু কলকাতা থেকে এসেচেন—তিনি দেখে বল্লেন, এ একরকম বেলোয়ারি কাচ—ঝাড়-লণ্ঠনে ঝুলোনো থাকে। রাস্তাঘাটে যদি হীরে জহরত পাওয়া যেত তা হলে—তুমিও যেমন!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বৈশাখ মাসের দিন। প্রায় দুপুর বেলা।

সর্বজয়া বাটনা বাটিতে বাটিতে ডান হাতের কাছে রক্ষিত একটা ফুলের সাজিতে (অনেকদিন হইতে ফুলের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই, মশলা রাখিবার পাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়) মশলা খুঁজিতে গিয়া বলিল—আবার জিরে-মরিচের পুঁটুলিটা কোথায় নিয়ে পালালি? বড্ড জ্বালাতন কচ্চিস্ অপু—রাঁধতে দিবিনে? তারপর একটু পরেই বোলো এখন—মা ক্ষিদে পেয়েছে!

অপুর দেখা নাই।

—দিয়ে যা বাপ আমার, লক্ষ্মী আমার—কেন জ্বালাতন কচ্চিস্ বল্ দিকি? দেখচিস বেলা হয়ে যাচ্ছে।

অপু রান্নাঘরের ভিতর হইতে দুয়ারের পাশ দিয়া ঈষৎ উঁকি মারিল, মায়ের চোখ সেদিকে পড়িতেই তাহার দুষ্টুমির হাসি-ভরা টুকটুকে মুখখানা শামুকের খোলার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবার মতো তৎক্ষণাৎ আবার দুয়ারের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। সর্বজয়া বলিল—দ্যাখ্ দিকি কাণ্ড—কেন বাপু দিক্ করিস দুপুরবেলা? দিয়ে যা—

অপু পুনরায় হাসিমুখে ঈষৎ উঁকি মারিল।

—ওই আমি দেখতে পেয়েছি—আর লুকুতে হবে না, দিয়ে যা—

—হি-হি-হি—আমোদের হাসি হাসিয়া সে আবার দুয়ারের আড়ালে মুখ লুকাইল।

সর্বজয়া ছেলেকে ভালোরূপেই চিনিত। যখন অপু ছোট্ট খোকা দেড়বছরেরটি, তখন দেখিতে সে এখনকার চেয়েও টুকটুকে ফরসা ছিল। সর্বজয়ার মনে আছে, সে তাহার ডাগর চোখ দুটিতে বেশ করিয়া কাজল পরাইয়া কপালের মাঝখানে একটি টিপ পরাইয়া দিত ও তাহার মাথায় একটা নীল রং-এর কম দামের ঘণ্টিওয়ালা পশমের টুপি পরাইয়া, কোলে করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে বাহিরের রকে দাঁড়াইয়া ঘুম পাড়াইবার উদ্দেশ্যে সুর টানিয়া টানিয়া বলিত—

আয় রে পাখি—ই—ই লেজঝোলা,
আমার খোকনকে নিয়ে—এ—এ—গাছে তোলা...

খোকা ট্যাপা-ট্যাপা ফুলো-ফুলো গালে মায়ের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত, পরে হঠাৎ কি মনে করিয়া সম্পূর্ণ দন্তহীন মাড়ি বাহির করিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া মল-পরা অসম্ভবরূপ ছোট্ট পায়ে মাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মায়ের পিঠের দিকে মুখ লুকাইত। সর্বজয়া হাসিমুখে বলিত—ওমা, খোকা আবার কোথায় লুকুলো? তাই তো, দেখতে তো পাচ্ছিনে! ও খোকা!...পরে সে ঘাড়ের দিকে মুখ ফিরাইতেই শিশু আবার হাসিয়া মুখ সামনের দিকে ফিরাইত এবং নির্বোধের মতো হাসিয়া মায়ের কাঁধে মুখ লুকাইত। যতই সর্বজয়া বলিত—ওমা, কই আমার খোকা কই—আবার কোথায় গেল—কই দেখি, ততই শিশুর খেলা চলিত। বার বার সামনে পিছনে ফিরিয়া সর্বজয়ার ঘাড়ে ব্যথা হইলেও শিশুর খেলার বিরাম হইত না। সে তখন একেবারে আন্‌কোরা টাট্‌কা, নতুন সংসারে আসিয়াছে। জগতের অফুরন্ত আনন্দভাণ্ডারের এক অণুর সন্ধান

পাইয়া তাহার অবোধ মন তখন সেইটাকে লইয়াই লোভীর মতো বার বার আস্বাদ করিয়াও সাধ মিটাইতে পারিতেছে না—তখন তাহাকে থামায় এমন সাধ্য তাহার মায়ের কোথায়? খানিকক্ষণ এরূপ করিতে করিতে তাহার ক্ষুদ্র শরীরে শক্তির ভাণ্ডার ফুরাইয়া আসিত—সে হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হইয়া হাই তুলিতে থাকিত—সর্বজয়া ছোট্ট হাঁ-টির সামনে তুড়ি দিয়া বলিত—ষাট ষাট—এই দ্যাখো দেয়ালা করে করে এইবার বাছার আমার ঘুম আস্‌চে। পরে সে মুগ্ধ নয়নে শিশুপুত্রের টিপ-কাজলপরা কচি মুখের দিকে চাহিয়া বলিত—কত রঙ্গই জানে সন্‌কু আমার—তবুও তো এই ঘেটের দেড় বছরের! হঠাৎ সে আকুল চুম্বনে খোকার রাঙা গাল দুটি ভরাইয়া ফেলিত। কিন্তু মায়ের এই গাঢ় আদরের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াই শিশুর নিদ্রাতুর আঁখিপাতা ঢুলিয়া আসিত, সর্বজয়া খোকার মাথাটা আস্তে আস্তে নিজের কাঁধে রাখিয়া বলিত—ওমা, সন্দেবেলা দ্যাখো ঘুমিয়ে পড়লো! এই ভাবছি সন্দেটা উৎবুলে দুধ খাইয়ে তবে ঘুম পাড়াবো—দ্যাখো কাণ্ড!

সর্বজয়া জানিত—ছেলে আট বছরের হইলে কি হইবে, সেই ছেলেবেলাকার মতো মায়ের সহিত লুকোচুরি খেলিবার সাধ তাহার এখনও মিটে নাই।

এমন সব স্থানে সে লুকায় যেখান হইতে অন্ধও তাহাকে বাহির করিতে পারে; কিন্তু সর্বজয়া দেখিয়াও দেখে না—এক জায়গায় বসিয়াই এদিকে ওদিকে চায়, বলে—তাই তো! কোথায় গেল? দেখতে তো পাচ্ছিনে!...অপু ভাবে—মাকে কেমন ঠকাইতে পারা যায়! মায়ের সহিত এ খেলা করিয়া মজা আছে। সর্বজয়া জানে যে, খেলায় যোগ দিবার ভান করিলে এইরূপ সারাদিন চলিতে পারে, কাজেই সে ধমক দিয়া কহিল—তা হলে কিন্তু থাকলো পড়ে রান্নাবান্না। অপু, তুমি ওই রকম করো, খেতে চাইলে তখন দেখবে মজাটা—

অপু হাসিতে হাসিতে গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া মশলার পুঁটুলি মায়ের সামনে রাখিয়া দিল।

তাহার মা বলিল, যা একটু খেলা করগে যা বাইরে। দেখগে যা দিকি তোর দিদি কোথায় আছে! গাছতলায় দাঁড়িয়ে একটু হাঁক দিয়ে দ্যাখ্ দিকি। তার আজ নাইবার দিন—হতচ্ছাড়া মেয়ের নাগাল পাওয়ার জো আছে? যা তো লক্ষ্মী ছেলে—

কিন্তু এখানে মাতৃ-আদেশ পালন করিয়া সুপুত্র হইবার কোনো চেষ্টা তাহাব দেখা গেল না। সে বাটনা-বাটা-রত মায়ের পিছনে গিয়া কি করিতে লাগিল।

—হু-উ-উ-উ-উম্—

সর্বজয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল অপু বড়ি দেওয়ার জন্য চালের বাতায় রক্ষিত একটা পুরানো চট আনিয়া মুড়ি দিয়া মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়া বসিয়া আছে।

—দ্যাখো দ্যাখো, ছেলের কাণ্ড দ্যাখো একবার। ও লক্ষ্মীছাড়া, ওতে যে সাত-রাজ্যির ধুলো। ফ্যাল্ ফ্যাল্—সাপ-মাকড় আছে না কি আছে ওর মধ্যে—আজ কদ্দিন থেকে তোলা রয়েছে—

—হু-উ-উ-উম্—(পূর্বাপেক্ষা গম্ভীর সুরে)

—নাঃ, বল্লে যদি কথা শোনে—বাবা আমার, সোনা আমার, ওখানা ফ্যাল্—আমার বাট্‌নার হাত—দুষ্টুমি কোরো না, ছিঃ!

থলে-মোড়া মূর্তিটা হামাগুড়ি দিয়া এবার দুই কদম আগাইয়া আসিল। সর্বজয়া বলিল—ছুঁবি ছুঁবি—ছুঁও না মানিক আমার—ওঃ, ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিইচি—ভারি ভয় হয়েছে আমার!

অপু হি-হি করিয়া হাসিয়া থলেখানা খুলিয়া এক পাশে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথার চুল, মুখ, চোখের ভুরু, কান ধুলায় ভরিয়া গিয়াছে। মুখ কাঁচুমাচু করিয়া সে সামনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁত কিচ্ কিচ্ করিতেছে।

—ওমা আমার কি হবে! হাঁরে হতভাগা, ধুলো মেখে যে একেবারে ভূত সেজেছিস? উঃ—ওই পুরানো থলেটার ধুলো! এক্কেবারে পাগল!

ধূলিধূসরিত অবোধ পুত্রের প্রতি করুণা ও মমতায় সর্বজয়ার বুক ভরিয়া আসিল; কিন্তু অপুর

পরনে বাসি কাপড়—নাহিয়া-ধুইয়া ছোঁয়া চলে না বলিয়া বলিল—গামছাখানা নে, ওই দিয়ে ধুলোগুলো আগে ঝেড়ে ফ্যাল্। ছেলে যেন কি একটা।

খানিকটা পরে ছেলেকে রান্নাঘরে পাহারার জন্য বসাইয়া সে জল আনিতে বাহির হইয়া যাইতেছে, দেখে দরাজ দিয়া দুর্গা বাড়ি ঢুকিতেছে। মুখ রৌদ্রে রাঙা, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, অথচ ধুলোমাখা পায়ে আল্তা পরা। একেবারে মায়ের সামনে পড়াতে আঁচলে বাঁধা আম দেখাইয়া ঢোক গিলিয়া কহিল—এই পুণ্যিপুকুরের জন্যে ছোলার গাছ আন্তে গেলাম রাজীদের বাড়ি, আম পেড়ে এনেছে ভাগ হচ্ছে, তাই রাজীর পিসিমা দিলে।

—আহা, মেয়ের দশা দ্যাখো, গায়ে খড়ি উড়চে, মাথার চুল দেখলে গায়ে জ্বর আসে—পুণ্যিপুকুরের জন্য ভেবে তো তোমার রাত্তিরে ঘুম নেই!—পরে মেয়ের পায়ের দিকে চাহিয়া কহিল—ফের বুঝি লক্ষ্মীর চুব্ড়ি থেকে আলতা বের করে পরা হয়েচে?

দুর্গা আঁচল দিয়া মুখ মুছিয়া উস্কোখুস্কো চুল কপাল হইতে সরাইয়া বলিল—লক্ষ্মীর চুব্ড়ির আল্তা বইকি! আমি সেদিন হাটে বাবাকে দিয়ে আল্তা আনালাম এক পয়সার, তার দরুন দু'পাতা আল্তা আমার পুতুলের বাক্সে ছিল না বুঝি?

হরিহর কল্কে হাতে রান্নাঘরের দাওয়ায় আগুন লইতে আসিল।

সর্বজয়া বলিল—ঘণ্টায় ঘণ্টায় তামাকে আগুন দি কোথা থেকে? সুঁদরীকাঠের বন্দোবস্ত করে রেখেচো কিনা একেবারে! বাঁশের চেলার আগুন কতক্ষণ থাকে যে আবার ঘড়ি-ঘড়ি তামাক খাওয়ার আগুন জোগাবো? পরে আগুন তুলিবার জন্য রক্ষিত একটা ভাঙা পিতলের হাতাতে খানিকটা আগুন উঠাইয়া বিরক্তমুখে সামনে ধরিল। পরে সুর নরম করিয়া বলিল—কি হল?

—এক রকম ছিল তো সবই ঠিক, বাড়িসুদ্ধ সবাই মন্তর নেবার কথাই হয়েছিল, কিন্তু একটু মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। মহেশ বিশ্বেসের শ্বশুরবাড়ির বিষয়-আশায় নিয়ে কি গোলমাল বেধেছে, বিশ্বেস মশায় গিয়েচে সেখানে চলে—সে-ই আসল মালিক কিনা। তাই আবার একটু পিছিয়ে গেল; আবার এদিকেও তো অকাল পড়চে আষাঢ় মাস থেকে।

—আর সেই যে বাসের জায়গা দেবে, বাস করাবে বলছিল, তার কি হল?

—এই নিয়ে একটু মুশকিল বেধে গেল কিনা! ধরো যদি মন্তর নেওয়া পিছিয়ে যায়, তবে ও-কথা আর কি করে ওঠাই?

সর্বজয়া খুব আশায় আশায় ছিল, সংবাদ শুনিয়া আশাভঙ্গ হইয়া পড়িল। বলিল, তা ওখানে না হয়, অন্য কোন জায়গায় দ্যাখো না? বিদেশে মান আছে, এখানে কেউ পোছে? এই দ্যাখো আম-কাঁঠালের সময়ে একটা আম-কাঁঠাল ঘরে নেই—মেয়েটা কাদের বাড়ি থেকে আজ দুটো আধপচা আম নিয়ে এল।—পরে সে উদ্দেশে বাড়ির পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—এই ঘরের দোর থেকে ঝুড়ি-ঝুড়ি আম পেড়ে নিয়ে যায়—বাছারা আমার চেয়ে চেয়ে দ্যাখে,—এ কি কম কষ্ট!

বাগানের কথার উল্লেখে হরিহর বলিল—উঃ, ও কি কম ধড়িবাজ নাকি! বছরে পঁচিশ টাকা খাজনা ফেলে-ঝেলে হোত, তাই কিনা লিখে নিলে পাঁচ টাকায়! আমি গিয়ে এত করে বললাম, কাকা, আমার ছেলেটা মেয়েটা আছে, ওই বাগানে আম-জাম কুড়িয়ে মানুষ হচ্ছে। আমার তো আর কোথাও কিছু নেই। আর ধরুন, আমাদের জ্ঞাতির বাগান—আপনার তো ঈশ্বর ইচ্ছেয় কোনো অভাব নেই, দুটো অত বড় বাগান রয়েচে, আম জাম নারকেল সুপারি—আপনার অভাব কি? বাগানখানা গিয়ে ছেড়ে দিন গে যান! তা বল্লে কি জানো? বল্লে, নীলমণি দাদা বেঁচে থাকতে ওর কাছে নাকি তিনশো টাকা ধার করেছিল, তাই অমনি করে শোধ করে নিল। শোন কথা। নীলমণি দাদার বড্ড অভাব ছিল কিনা, তাই তিন্‌শো টাকার জন্যে গিয়েছে ভুবন মুখুজ্যের কাছে হাত পাততে! বৌদিকে ভালোমানুষ পেয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে নিলে আর কি।

—ভালোমানুষ তো কত। সেও নাকি বলেছে, যে জ্ঞাতিশত্তুর—পর-হাতে বাগান থাকলে তো

আর কিছু পাওয়া যাবে না, ফল-পাকুড় এমনিই খাবে, তার চেয়ে কিছু কম জমাতেও যদি বন্দোবস্ত হয়, খাজনাটা তো পাওয়া যাবে।

হরিহর বলিল—খাজনা কি আর আমি দিতাম না? বাগান জমা দেবে, তাই কি আমায় জানতে দিলে? বৌদিকে—লুচি-মোহনভোগ খাইয়ে হাত করে চুপি চুপি লিখিয়ে নিলে।...

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বৈকালের দিকটা হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল। অনেকক্ষণ হইতে মেঘ মেঘ করিতেছিল, তবুও ঝড়টা যেন খুব শীঘ্র আসিয়া পড়িল। অপুদের বাড়ির সামনে বাঁশঝাড়ের বাঁশগুলো পাঁচিলের উপর হইতে ঝড়ের বেগে হটিয়া ওধারে পড়াতে বাড়িটা যেন ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতে লাগিল—ধুলা, বাঁশপাতা, কাঁঠালপাতা, খড় চারিধার হইতে উড়িয়া তাহাদের উঠান ভরাইয়া ফেলিল। দুর্গা বাটীর বাহির হইয়া আম কুড়াইবার জন্য দৌড়িল—অপুও দিদিব পিছু পিছু ছুটিল। দুর্গা ছুটিতে ছুটিতে বলিল—শিগ্‌গিব ছোট্, তুই বরং সিঁদুরকৌটাতলায় থাক্, আমি যাই সোনামুখী-তলায়—দৌড়ো—দৌড়ো। ধুলায় চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে—বড় বড় গাছের ডাল ঝড়ে বাঁকিয়া গাছ ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখাইতেছে। গাছে গাছে সোঁ সোঁ, বোঁ বোঁ শব্দে বাতাস বাধিতেছে—বাগানে শুক্‌না ডাল, কুটা, বাঁশের খোলা উড়িয়া পড়িতেছে—শুক্‌না বাঁশপাতা ছুঁচালো আগাটা উঁচুদিকে তুলিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে উঠিতেছে—কুক্‌শিমা গাছের শুঁয়ার মতো পালকওয়ালা সাদা সাদা ফুল ঝড়ের মুখে কোথা হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতেছে—বাতাসের শব্দে কান পাতা যায় না।

সোনামুখী-তলায় পৌঁছিয়াই অপু মহা-উৎসাহে চিৎকার করিতে করিতে লাফাইযা এদিক ওদিক ছুটিতে লাগিল—এই যে দিদি, ওই একটা পড়্‌লো রে দিদি—ওই আর একটা রে দিদি! চিৎকার যতটা করিতে লাগিল তাহার অনুপাতে সে আম কুড়াইতে পারিল না। ঝড় ঘোর রবে বাড়িয়া চলিয়াছে। ঝড়ের শব্দে আম পড়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না, যদিবা শোনা যায় ঠিক কোন্ জায়গা বরাবর শব্দটা হইল—তাহা ধরিতে পারা যায় না। দুর্গা আট-নয়টা আম কুড়াইয়া ফেলিল, অপু এতক্ষণের ছুটাছুটিতে মোটে পাইল দুইটা। তাহাই সে খুশির সহিত দেখাইয়া বলিতে লাগিল—এই দ্যাখ্ দিদি, কত বড় দ্যাখ্—ওই একটা পড়্‌লো—ওই ওদিকে—

এমন সময় হই-হাই শব্দে ভুবন মুখুজ্জের বাড়ির ছেলে-মেয়েরা সব আম কুড়াইতে আসিতেছে শোনা গেল। সতু চেঁচাইয়া বলিল—ও ভাই, দুগ্‌গাদি আর অপু আম কুড়ুচ্ছে—

দল আসিয়া সোনামুখী-তলায় পৌঁছিল। সতু বলিল—আমাদের বাগানে কেন এয়েচ আম কুড়ুতে? সেদিন মা বারণ করে দিয়েচে না? দেখি কতগুলো আম কুড়িয়েচো?

পরে দলের দিকে চাহিয়া বলিল—সোনামুখীর কতগুলো আম কুড়িয়েচে দেখেছিস টুনু?—যাও আমাদের বাগান থেকে দুগ্‌গাদি—মাকে গিয়ে নইলে বলে দেবো।

রানু বলিল—কেন তাড়িয়ে দিচ্ছিস সতু? ওরাও কুড়ুক—আমরাও কুড়ুই।

—কুড়োবে বই কি! ও এখানে থাকলে সব আম ওই নেবে। আমাদের বাগানে কেন আস্‌বে ও?—না, যাও দুগ্‌গাদি—আমাদের তলায় থাক্‌তে দেবো না।

অন্য সময় হইলে দুর্গা হয়তো এত সহজে পরাজয় স্বীকার করিত না—কিন্তু সেদিন ইহাদেরই কৃত অভিযোগে মায়ের নিকট মার খাইয়া তাহার পুনরায় বিবাদ বাধাইবার সাহস ছিল না। তাই খুব সহজেই পরাজয় স্বীকার করিয়া লইয়া সে একটু মনমরা ভাবে বলিল—অপু, আয় রে চল্। পরে হঠাৎ মুখে কৃত্রিম উল্লাসের ভাব আনিয়া বলিল—আমরা সেই জায়গায় যাই চল্ অপু, এখানে

থাকতে না দিলে বয়ে গেল—বুঝলি তো?—এখানকার চেয়েও বড় বড় আম—তুই আমি মজা করে কুড়োবো এখন—চলে আয়—এবং এখানে এতক্ষণ ছিল বলিয়া একটা বৃহত্তর লাভ হইতে বঞ্চিত ছিল, চলিয়া যাওয়ায় প্রকৃতপক্ষে শাপে বর হইল, সকলের সম্মুখে এইরূপ ভাব দেখাইয়া যেন অধিকতর উৎসাহের সহিত অপুকে পিছনে লইয়া রাংচিতার বেড়ার ফাঁক গলিয়া বাগানের বাহির হইয়া গেল।

রানু বলিল—কেন ভাই ওদের তাড়িয়ে দিলে—তুমি ভারি হিংসুক কিন্তু সতুদা!

রানুর মনে দুর্গার চোখের ভরসা-হারা চাহনি বড় ঘা দিল।

অপু অতশত বোঝে নাই, বেড়ার বাহিরের পথে আসিয়া বলিল—কোন্ জায়গায় বড় বড় আম রে দিদি? পটুদের সল্‌তেখাগী-তলায়?

কোন্ তলায় দুর্গা তাহা ঠিক করে নাই, একটু ভাবিয়া বলিল—চল্ গড়ের পুকুরের ধারের বাগানে যাবি—ওদিকে সব বড় বড় গাছ আছে—চল্—।

গড়ের পুকুর এখান হইতে প্রায় পনেরো মিনিট ধরিয়া সুঁড়িপথে অনবরত বন-বাগান অতিক্রম করিয়া তবে পৌছানো যায়। অনেককালের প্রাচীন আম ও কাঁঠালের গাছ—গাছতলায় বন-চালতা ময়না-কাঁটা ষাঁড়া গাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। দূর বলিয়া এবং জনপ্রাণীর বাসশূন্য গভীর বনের মধ্যে বলিয়া এসব স্থানে কেহ বড় একটা আম কুড়াইতে আসে না। কাছির মতো মোটা মোটা অনেককালের পুরোনো গুলঞ্চ লতা এ-গাছে ও-গাছে দুলিতেছে—বড় বড় প্রাচীন গাছের তলাকার কাঁটাভরা ঘন ঝোপ-জঙ্গল খুঁজিয়া তলায় পড়া আম বাহির করা সহজসাধ্য তো নহেই, তাহার উপর আবার ঘনায়মান নিবিড়-কৃষ্ণ ঝোড়ো মেঘে ও বাগানের মধ্যের জঙ্গলে গাছের আওতায় এরূপ অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে যে, কোথায় কি ভালো দেখা যায় না। তবুও খুঁজিতে খুঁজিতে নাছোড়বান্দা দুর্গা গোটা আট-দশ আম পাইল।

হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—ওরে অপু—বিষ্টি এল!

সঙ্গে সঙ্গে ঝড়টা যেন খানিকক্ষণ একটু নরম হইল—ভিজে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ পাওয়া গেল—একটু পরেই মোটা মোটা ফোঁটায় চড়বড় করিয়া গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিল।

—আয় আমরা এই গাছতলায় দাঁড়াই—এখানে বিষ্টি পড়বে না—

দেখিতে দেখিতে চারিদিক ধোঁয়াকার করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল—বৃষ্টির ফোঁটা পড়িবার জোরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল—ভরপুর টাটকা ভিজা মাটির গন্ধ আসিতে লাগিল। ঝড় একটু যেন নরম পড়িয়াছিল—তাহাও আবার বড় বাড়িল—দুর্গা যে গাছতলায় দাঁড়াইয়াছিল, এমনি হয়তো হঠাৎ তথায় বৃষ্টি পড়িত না, কিন্তু পুবে হাওয়ার ঝাপ্‌টা গাছতলা ভাসাইয়া লইয়া চলিল। বাড়ি হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে—অপু ভয়ের স্বরে বলিল—ও দিদি—বড্ড যে বিষ্টি এল।

—তুই আমার কাছে আয়—দুর্গা তাহাকে কাছে আনিয়া আঁচল দিয়া ঢাকিয়া কহিল—এ বিষ্টি আর কতক্ষণ হবে—এই ধরে গেল বলে—বৃষ্টি হল ভালোই হল—আমরা আবার সোনামুখী-তলায় যাবো এখন, কেমন তো?

দুজনে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—

নেবুর পাতায় করম্‌চা,
হে বিষ্টি ধরে যা—

কড়-কড়—কড়াৎ...প্রকাণ্ড বন-বাগানের অন্ধকার মাথাটা যেন এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত চিরিয়া গেল—চোখের পলকের জন্য চারিধার আলো হইয়া উঠিল—সামনের গাছের মগডালে থোলো থোলো বন-ধুঁধুল ফল ঝড়ে দুলিতেছে। অপু দুর্গাকে ভয়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ও দিদি!

—ভয় কি রে! রাম রাম বল্—রাম রাম রাম রাম—নেবুর পাতায় করম্‌চা হে বিষ্টি ধরে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা হে বিষ্টি ধরে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা—

বৃষ্টির ঝাপটায় তাহাদের কাপড় চুল ভিজিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল—গুম্-গুম্ গুম্-ম্-ম্—চাপা গম্ভীর ধ্বনি—একটা বিশাল লোহার বুল কে যেন আকাশের ধাতব মেঝেতে এদিক হইতে ওদিকে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে—অপু শঙ্কিত সুরে বলিল—ওই দিদি, আবার—

—ভয় নেই, ভয় কি?—আর একটু সরে আয়—এঃ, তোর মাথাটা ভিজে যে একেবারে জুবড়ি হয়ে গিয়েচে—

চারিধারে শুধু মুষলধারে বৃষ্টিপতনের হুস্-স্-স্-স্ একটানা শব্দ, মাঝে মাঝে দমকা ঝড়ের সোঁ-ও-ও-ও, বোঁ-ও-ও-ও-ও রব, ডালপালার ঝাপটের শব্দ—মেঘের ডাকে কানে তালা ধরিয়া যায়। এক-একবার দুর্গার মনে হইতেছিল সমস্ত বাগানখানা ঝড়ে মড় মড় করিয়া ভাঙিয়া উপুড় হইয়া তাহাদের চাপা দিল বুঝি।

অপু বলিল—দিদি, বিষ্টি যদি আর না থামে?

হঠাৎ ঝটিকাক্ষুব্ধ অন্ধকাব আকাশের এপ্রান্ত হইতে লক্‌লকে আলো জিহ্বা মেলিয়া বিদ্রূপেব বিকট অট্টহাস্যের রোল তুলিয়া এক লহমায় ও-প্রান্তের দিকে ছুটিয়া গেল।

কড়-কড়-কড়াৎ!

সঙ্গে সঙ্গে বাগানের মাথায় বৃষ্টির ধোঁয়ার রাশি চিড়িয়া ফাড়িয়া উড়াইয়া, ভৈরবী প্রকৃতিব উন্মত্ততার মাঝখানে ধরা পড়া দুই অসহায় বালক-বালিকার চোখ ঝলসাইয়া তীক্ষ্ণ নীল বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

অপু ভয়ে চোখ বুজিল।

দুর্গা শুষ্ক গলায় উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল,—বাজ পড়িতেছে নাকি?—গাছের মাথায় বন-ধুঁধুলের ফল দুলিতেছে।

সেই বড় লোহার বুলটাকে আকাশের ওদিক হইতে কে যেন আবার এদিকে টানিয়া আনিতেছিল—

শীতে অপুর ঠক্ ঠক্ করিয়া দাঁতে দাঁত লাগিতেছিল—দুর্গা তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া শেষ আশ্রয়ের সাহসে বার বার দ্রুত আবৃত্তি করিতে লাগিল—নেবুর পাতায় কবম্‌চা—হে বিষ্টি ধরে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা—হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করমচা...ভয়ে তাহার স্বর কাঁপিতেছিল।

সন্ধ্যা হইবার বেশি বিলম্ব নাই। ঝড়-বৃষ্টি খানিকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। সর্বজয়া বাহিরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। পথে জমিয়া যাওয়া বৃষ্টির জলের উপর ছপ্-ছপ্ শব্দ করিতে করিতে রাজকৃষ্ণ পালিতের মেয়ে আশালতা পুকুরের ঘাটে যাইতেছিল। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ মা, দুর্গা আর অপুকে দেখেছিস ওদিকে?

আশালতা বলিল—না খুড়িমা, দেখিনি তো। কোথায় গিয়েচে? তারপর হাসিয়া বলিল—কি ব্যাঙ-ডাকানি জল হয়ে গেল খুড়িমা!

—সেই ঝড়ের আগে দুজনে বেরিয়েচে আম কুড়োতে যাই বলে আর তো ফেরেনি—এই ঝড়-বিষ্টি গেল, সন্দে হোল, ও মা কোথায় গেল তবে?

সর্বজয়া উদ্বিগ্ন মনে বাড়ির মধ্যে ফিরিয়া আসিল। কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময় খিড়কির দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া আপাদমস্তক সিক্ত অবস্থায় দুর্গা আগে আগে একটা ঝুনা নারিকেল হাতে ও পিছনে পিছনে অপু একটা নারিকেলের বাগলো টানিয়া লইয়া বাড়ি ঢুকিল। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি ছেলে-মেয়ের কাছে গিয়া বলিল—ওমা আমার কি হবে! ভিজে যে সব একেবারে পান্তা ভাত

হয়েচিস্! কোথায় ছিলি বিষ্টির সময়? ছেলেকে কাছে আনিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিল—ওমা, মাথাটা যে ভিজে একেবারে জুবড়ি। পরে আহ্লাদের সহিত বলিল—নারকোল কোথা পেলি রে দুর্গা?

অপু ও দুর্গা দুজনেই চাপা কণ্ঠে বলিল—চুপ চুপ মা—সেজজেঠিমা বাগানে যাচ্ছে—এই গেল—ওদের বাগানের বেড়ার ধারের দিকে যে নারকোল গাছটা, ওর তলায় পড়ে ছিল। আমরাও বেরুচ্চি, সেজজেঠিমাও ঢুকলো।

দুর্গা বলিল—অপুকে তো ঠিক দেখেচে—আমাকেও বোধ হয় দেখেছে। পরে সে উৎসাহের সঙ্গে অথচ চাপা সুরে বলিতে লাগিল—একেবারে গাছের গোড়ায় পড়ে ছিল মা, আগে আমি টের পাইনি, সোনামুখী-তলায় যদি আম পড়ে থাকে তাই দেখতে গিয়ে দেখি বাগলোটা পড়ে রয়েছে। অপুকে বললাম—অপু বাগলোটা নে—মার ঝাঁটার কষ্ট, ঝাঁটা হবে। তারপরই দেখি—হস্তস্থিত নারিকেলটার দিকে উজ্জ্বল মুখে চাহিয়া বলিল—বেশ বড়, না মা?

অপু খুশির সুরে হাত নাড়িয়া বলিল—আমি অম্‌নি বাগলোটা নিয়ে ছুট—

সর্বজয়া বলিল—বেশ বড় দোমালা নারকোলটা। ছেঁচতলায় রেখে দে, জল দিয়ে নেবো—

অপু অনুযোগের সুরে বলিল—তুমি বলো মা নারকোল নেই, নারকোল নেই,—এই তো হল নারকোল! এইবাব কিন্তু বড়া করে দিতে হবে। আমি ছাড়বো না—কখ্‌খনো—

বৃষ্টির জলে ছেলেমেয়ের মুখ বৃষ্টিধোঁয়া জুঁই ফুলের মতো সুন্দর দেখাইতেছিল। ঠাণ্ডায় তাহাদের ঠোঁট নীল হইয়া গিয়াছে, মাথার চুল ভিজিয়া কানের সঙ্গে লেপটাইয়া লাগিয়া গিয়াছে। সর্বজয়া বলিল—আয় সব, কাপড় ছাড়িয়ে দিই আগে, পায়ে জল দিয়ে রোয়াকে ওঠ্ সব—

খানিক পরে সর্বজয়া কুয়ার জল তুলিতে ভুবন মুখুজ্যের বাড়ি গেল। ভুবন মুখুজ্যের খিড়কি-দোর পর্যন্ত যাইতেই সে শুনিল সেজ ঠাক্‌রুন বাড়ির মধ্যে চিৎকার করিয়া বাড়ি মাথায় করিতেছেন।

—একটা মুঠো টাকা খরচ করে তবে বাগান নেওয়া—মাগনা তো নয়। তার কোনো কুটোটা যদি হাঘরেদের জন্যে ঘরে ঢুকবার জো আছে! এ ছুঁড়িটা রাদ্দিন বাগানে বসে আছে, কুটোগাছটা নিয়ে গিয়ে ঘরে তুলবে—এতে মাগীরও শিক্ষে আছে, ও মাগী কি কম নাকি?—ও মা, ভাবলাম বিষ্টি থেমেচে, যাই একবার বাগানটা গিয়ে দেখে আসি—এই এত বড় নাককোলটা কুড়িয়ে নিয়ে একেবারে দুড়্‌দুড়্ দৌড়!—এত শত্তুরতা যেন ভগবান সহ্যি না করেন—উচ্ছন্ন যান্, উচ্ছন্ন যান্—এই ভস্ সন্দেবেলা বলচি, আব যেন নারকোল খেতে না হয়—একবাব শিগ্‌গির যেন ছাতিমতলা-সই হন—

সর্বজয়া খিড়কির বাহিরে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছেলেমেয়ের বর্ষণসিক্ত কচিমুখ মনে করিয়া সে ভাবিল যদি গালাগাল ওদের লাগে! বাবা যে লোক! দাঁতে বিষ আছে! কি করি? কথাটা ভাবিতেই তাহার গা শিহরিয়া উঠিয়া সর্বশরীর যেন অবশ হইয়া গেল। সে আর মুখুজ্যেবাড়ি ঢুকিল না—আশশ্যাওড়া বনে, বাঁশঝাড়ের তলায় বর্ষণস্তব্ধ সন্ধ্যায় জোনাকি জ্বলিতেছে, পা যেন আর উঠিতে চাহে না—ভয়ে ভয়ে সে জল তুলিবার ছোট্ট বালতিটা ও ঘড়া কাঁখে লইয়া বাড়ির দিকে ফিরিল।

পথে আসিতে আসিতে ভাবিল—যদি নারকোলটা ওদের ফেরত দিই—তাহলেও কি গাল লাগবে? তা কেন লাগবে—যার জিনিস তাকে তো ফেরত দেওয়া হল, তা কখনও লাগে?

বাড়িতে পা দিয়াই মেয়েকে বলিল—দুগ্‌গা, নারকোলটা সতুদের বাড়ি দিয়ে আয় গিয়ে।

অপু ও দুর্গা অবাক হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—

দুর্গা বলিল—এখ্‌খুনি?

—হ্যাঁ—এখ্‌খুনি দিয়ে আয়। ওদের খিড়কির দোর খোলা আছে। চট করে যা। বলে আয়, আমরা কুড়িয়ে পেইছিলাম, এই নাও দিয়ে গেলাম।

—অপু আমাকে একটু দাঁড়াবে না, মা? বড্ড অন্ধকার হয়েচে, চল্ অপু আমার সঙ্গে।

ছেলেমেয়ে চলিয়া গেলে সর্বজয়া তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে দিতে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—ঠাকুর, নারকোল ওরা শত্তুরতা করে কুড়ুতে যায়নি সে তো তুমি জানো, এ গাল যেন ওদের না লাগে। দোহাই ঠাকুর, ওদের তুমি বাঁচিয়ে-বর্তে রেখো ঠাকুর। ওদের তুমি মঙ্গল কোরো। তুমি ওদের মুখের দিকে চেয়ো। দোহাই ঠাকুর।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

গ্রামের প্রসন্ন গুরুমহাশয় বাড়িতে একখানা মুদির দোকান করিতেন এবং দোকানেরই পাশে তাঁহার পাঠশালা ছিল। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাহুল্য ছিল না। তবে এই বেতের উপর অভিভাবকদেরও বিশ্বাস গুরুমহাশয়ের অপেক্ষা কিছু কম নয়। তাই তাঁহারা গুরুমহাশয়কেও বলিয়া দিয়াছিলেন, ছেলেদের শুধু পা খোঁড়া এবং চোখ কানা না হয়, এইটুকু মাত্র নজর রাখিয়া তিনি যত ইচ্ছা বেত চালাইতে পারেন। গুরুমহাশয়ও তাঁহার শিক্ষাদানের উপযুক্ত ক্ষমতা ও উপকরণের অভাব একমাত্র বেতের সাহায্যে পূর্ণ করিবার চেষ্টায় এরূপ বেপরোয়া ভাবে বেত চালাইয়া থাকেন যে ছাত্রগণ পা খোঁড়া ও চক্ষু কানা হওয়ার দুর্ঘটনা হইতে কোনরূপে প্রাণে বাঁচিয়া যায় মাত্র।

পৌষ মাসের দিন। অপু সকালে লেপ মুড়ি দিয়া রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়া ছিল, মা আসিয়া ডাকিল—অপু, ওঠ্ শিগ্‌গির করে, আজ তুমি যে পাঠশালায় পড়তে যাবে! কেমন সব বই আনা হবে তোমার জন্যে, শেলেট। হ্যাঁ ওঠো, মুখ ধুয়ে নাও, উনি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে পাঠশালায় দিয়ে আসবেন।

পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু সদ্য-নিদ্রোত্থিত চোখ দুটি তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ধারণা ছিল যে যাহারা দুষ্টু ছেলে, মার কথা শোনে না, ভাইবোনদের সঙ্গে মারামারি করে, তাহাদেরই শুধু পাঠশালায় পাঠানো হইয়া থাকে। কিন্তু সে তো কোনোদিন ওরূপ করে না, তবে সে কেন পাঠশালায় যাইবে?

খানিক পরে সর্বজয়া পুনরায় আসিয়া বলিল—ওঠো অপু, মুখ ধুয়ে নাও, তোমায় অনেক করে মুড়ি বেঁধে দেবো এখন, পাঠশালায় বসে বসে খেয়ো এখন, ওঠো লক্ষ্মী মানিক!

মায়ের কথার উত্তরে সে অবিশ্বাসের সুরে বলিল—ইঃ! পরে মায়ের দিকে চাহিয়া জিভ বাহির করিয়া চোখ বুজিয়া একপ্রকার মুখভঙ্গি করিয়া রহিল, উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না।

কিন্তু অবশেষে বাবা আসিয়া পড়াতে অপুর বেশি জারিজুরি খাটিল না, যাইতে হইল। মা'র প্রতি অভিমানে তাহার চোখে জল আসিতেছিল, খাবার বাঁধিয়া দিবার সময় বলিল—আমি কখ্‌খনো আর বাড়ি আসছিনে, দেখো!

—ষাট ষাট, বাড়ি আসবিনে কি! ওকথা বলতে নেই, ছিঃ! পরে তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইয়া বলিল—খুব বিদ্যে হোক, ভালো করে লেখাপড়া শিখো, তখন দেখবে তুমি কত বড়ো চাকরি করবে, কত টাকা হবে তোমার, কোনো ভয় নেই।—ওগো, তুমি গুরুমশায়কে বলে দিয়ো যেন ওকে কিছু বলে না।

পাঠশালায় পৌঁছাইয়া দিয়া হরিহর বলিল—ছুটি হবার সময়ে আমি আবার এসে তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাবো, অপু, বসে বসে লেখো, গুরুমশায়ের কথা শুনো, দুষ্টুমি কোরো না যেন! খানিকটা পরে পিছন ফিরিয়া অপু চাহিয়া দেখিল বাবা ক্রমে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। অকূল সমুদ্র। সে অনেকক্ষণ মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল। পরে ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, গুরুমহাশয় দোকানের মাচায় বসিয়া দাঁড়িতে সৈন্ধব লবণ ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন, কয়েকটি বড় বড়

ছেলে আপন আপন চাটাই-এ বসিয়া নানারূপ কুস্বর করিয়া কি পড়িতেছে ও ভয়ানক দুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোট একটি ছেলে খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া আপন মনে পাততাড়ির তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে। আর একটি বড় ছেলে, তাহার গালে একটা আঁচিল, সে দোকানের মাচার নিচে চাহিয়া কি লক্ষ করিতেছে। তাহার সামনে দুজন ছেলে বসিয়া স্লেটে একটা ঘর আঁকিয়া কি করিতেছিল। একজন চুপিচুপি বলিতেছিল, আমি এই ঢ্যারা দিলাম, অন্য ছেলেটি বলিতেছিল, এই আমার গোল্লা, সঙ্গে সঙ্গে তার স্লেটে আঁক পড়িতেছিল ও মাঝে মাঝে আড়চোখে বিক্রয়রত গুরুমহাশয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। অপু নিজের স্লেটে বড় বড় করিয়া বানান লিখিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে ঠিক জানা যায় না, গুরুমহাশয় হঠাৎ বলিলেন—এই ফনে, স্লেটে ওসব কি হচ্ছে রে? সম্মুখের সেই ছেলে দুটি অমনি স্লেটখানা চাপা দিয়া ফেলিল, কিন্তু গুরুমহাশয়ের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানো বড় শক্ত, তিনি বলিলেন, এই সতে, ফনের স্লেটটা নিয়ে আয় তো! তাঁহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে বড় আঁচিলওয়ালা ছেলেটি ছোঁ মারিয়া স্লেটখানা উঠাইয়া লইয়া গিয়া দোকানের মাচার উপর হাজির করিল।

—হুঁ, এসব কি খেলা হচ্ছে স্লেটে?—সতে, ধরে নিয়ে আয় তো দুজনকে, কান ধরে নিয়ে আয়!

যেভাবে বড় ছেলেটা ছোঁ মারিয়া স্লেট লইয়া গেল এবং যেভাবে বিপন্ন মুখে সাম্‌নের ছেলে দুটি পায়ে পায়ে গুরুমহাশয়ের কাছে যাইতেছিল, তাহাতে হঠাৎ অপুর বড় হাসি পাইল, সে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গুরুমহাশয় বলিলেন, হাসে কে? হাস্‌চো কেন খোকা, এটা কি নাট্যশালা? অ্যাঁ? এটা নাট্যশালা নাকি?

নাট্যশালা কি, অপু তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

—সতে, একখানা থান ইট নিয়ে আয় তো তেঁতুলতলা থেকে বেশ বড় দেখে?

অপু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার গলা পর্যন্ত কাঠ হইয়া গেল, কিন্তু ইট আনীত হইলে সে দেখিল, ইটের ব্যবস্থা তাহার জন্য নহে, ওই ছেলে দুটির জন্য। বয়স অল্প বলিয়াই হউক বা নতুন ভর্তি বলিয়াই হউক, গুরুমহাশয় সে-যাত্রা তাহাকে রেহাই দিলেন।

পাঠশালা বসিত বৈকালে। সবসুদ্ধ আট-দশটি ছেলেমেয়ে পড়িতে আসে। সকলেই বাড়ি হইতে ছোট ছোট মাদুর আনিয়া পাতিয়া বসে, অপুর মাদুর নাই, সে বাড়ি হইতে একখানা জীর্ণ কার্পেটের আসন আনে। যে ঘরটায় পাঠশালা হয়, তার কোনো দিকে বেড়া বা দেওয়াল কিছু নাই, চারিধারে খোলা, ঘরের মধ্যে সারি দিয়া ছাত্রগণ বসে। পাঠশালা-ঘরের চারিপাশে বন, পিছন দিকে গুরুমহাশয়ের পৈতৃক আমলের বাগান। অপরাহ্নের তাজা গরম রৌদ্র বাতাবিলেবু, গাব ও পেয়ারাফুলি আম গাছটার ফাঁক দিয়া পাঠশালার ঘরের বাঁশের খুঁটির পায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। নিকটে অন্য কোনদিকে কোনো বাড়ি নাই, শুধু বন ও বাগান, একধারে একটা যাতায়াতের সরু পথ।

আট-দশটি ছেলেমেয়ের মধ্যে সকলেই বেজায় দুলিয়া ও নানারূপ সুর করিয়া পড়া মুখস্থ করে, মাঝে মাঝে গুরুমহাশয়ের গলা শোনা যায়,—এই ক্যাবলা, ওর শেলেটের দিকে চেয়ে কি দেখচিস? কান ম'লে ছিঁড়ে দেবো একেবারে! নুটু, তোমার ক'বার নেতি ভিজুতে হবে? ফের যদি দেখি নেতি ভিজুতে উঠেচ...

গুরুমহাশয় একটা খুঁটি হেলান দিয়া একখানা তালপাতার চাটাই-এর উপর বসিয়া থাকেন। মাথার তেলে বাঁশের খুঁটির হেলান দেওয়ার-অংশটি পাকিয়া গিয়াছে। বিকালবেলা প্রায়ই গ্রামের দীনু পালিত কি রাজু রায় তাঁহার সহিত গল্প করিতে আসেন। পড়াশুনার চেয়ে এই গল্প শোনা অপুর অনেক বেশি ভালো লাগিত। রাজু রায় মহাশয় প্রথম যৌবনে 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস' স্মরণ করিয়া

কিভাবে আষাঢ়ুর হাটে তামাকের দোকান খুলিয়াছিলেন সে গল্প করিতেন। অপু অবাক হইয়া শুনিত। বেশ কেমন নিজের ছোট্ট দোকানের ঝাঁপটা তুলিয়া বসিয়া বসিয়া দা দিয়া তামাক কাটা, তারপর রাত্রে নদীতে যাওয়া, ছোট্ট হাঁড়িতে মাছের ঝোল ভাত রাঁধিয়া খাওয়া, হয়তো মাঝে মাঝে তাদের সেই ছেঁড়া মহাভারতখানা কি বাবার সেই দাশু রায়ের পাঁচালিখানা মাটির প্রদীপের সামনে খুলিয়া বসিয়া বসিয়া পড়া! বাহিরে অন্ধকারে বর্ষারাতে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে, কেহ কোথাও নাই, পিছনের ডোবায় ব্যাঙ ডাকিতেছে—কি সুন্দর! বড় হইলে সে তামাকের দোকান করিবে।

এই গল্পগুজব এক এক দিন আবার ভাব ও কল্পনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠিত, গ্রামের ও পাড়ার রাজকৃষ্ণ সান্যাল মহাশয় যেদিন আসিতেন। যে কোনো গল্প হউক, যত সামান্যই হউক না কেন, সেটি সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল অসাধারণ। সান্যাল মহাশয় দেশভ্রমণ-বাতিকগ্রস্ত ছিলেন। কোথায় দ্বারকা, কোথায় সাবিত্রী পাহাড়, কোথায় চন্দ্রনাথ, তাহা আবার একা দেখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না, প্রতিবারই স্ত্রী-পুত্র লইয়া যাইতেন এবং খরচপত্র করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া ফিরিতেন। দিব্য আরামে নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থেলো হুঁকা টানিতেছেন, মনে হইতেছে সান্যাল মহাশয়ের মতন নিতান্ত ঘরোয়া, সেকেলে, পাড়াগাঁয়ের প্রচুর অবসরপ্রাপ্ত গৃহস্থ বেশি আর বুঝি নাই, পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল সদর দরজায় তালাবন্ধ, বাড়িতে জনপ্রাণীর সাড়া নাই। ব্যাপার কি? সান্যাল মশায় সপরিবারে বিন্ধ্যাচল না চন্দ্রনাথ ভ্রমণে গিয়াছেন। অনেকদিন আব দেখা নাই, হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা ঠুক্‌ঠুক্ শব্দে লোকে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দুই গরুর গাড়ি বোঝাই হইয়া সান্যাল মশায় সপরিবারে বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ও লোকজন ডাকাইয়া হাঁটু-সমান উঁচু জলবিছুটি ও অর্জুন গাছের জঙ্গল কাটিতে কাটিতে বাড়ি ঢুকিতেছেন।

একটা মোটা লাঠি হাতে তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া পাঠশালায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন—এই যে প্রসন্ন, কি রকম আছ, বেশ জাল পেতে বসেচ যে! ক'টা মাছি পড়লো!

নামতা-মুখস্থ-রত অপুর মুখ অমনি অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সান্যাল মশায় যেখানে তালপাতার চাটাই টানিয়া বসিয়াছেন সেদিকে হাতখানেক জমি উৎসাহে আগাইয়া বসিত। শ্লেট বই মুড়িয়া একপাশে রাখিয়া দিত যেন আজ ছুটি হইয়া গিয়াছে, আর পড়াশুনার দরকার নাই, সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাগর ও উৎসুক চোখ দুটি গল্পের প্রত্যেক কথা যেন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহে গিলিত।

কুঠির মাঠের পথে যে জায়গাটাকে এখন নাল্‌তাকুড়ির জোল বলে, ওইখানে আগে—অনেক কাল আগে—গ্রামের মতই হাজবার ভাই চন্দর হাজরা কি বনের গাছ কাটিতে গিয়াছিল। বর্ষাকাল—এখানে ওখানে বৃষ্টির জলের তোড়ে মাটি খাসিয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ চন্দর্ হাজরা দেখিল এক জায়গায় যেন একটা পিতলের হাঁড়ির কানামতো মাটির মধ্য হইতে একটুখানি বাহির হইয়া আছে। তখনই সে খুঁড়িয়া বাহির করিল। বাড়ি আসিয়া দেখে—এক হাঁড়ি সেকেলে আমলের টাকা। তাই পাইয়া চন্দর্ হাজরা দিনকতক খুব বাবুগিরি করিয়া বেড়াইল—এসব সান্যাল মহাশয়ের নিজের চোখে দেখা।

এক এক দিন রেলভ্রমণের গল্প উঠিত। কোথায় সাবিত্রী পাহাড় আছে, তাহাতে উঠিতে তাঁহার স্ত্রীর কি রকম কষ্ট হইয়াছিল, নাভিগয়ায় পিণ্ড দিতে গিয়া পাণ্ডার সঙ্গে হাতাহাতি হইবার উপক্রম। কোথাকার এক জায়গায় একটা খুব ভালো খাবার পাওয়া যায়, সান্যাল মশায় নাম বলিলেন—প্যাঁড়া। নামটা শুনিয়া অপুর ভারি হাসি পাইয়াছিল—বড় হইলে সে 'প্যাঁড়া' কিনিয়া খাইবে।

আর একদিন সান্যাল মশায় একটা কোন্ জায়গার গল্প করিতেছিলেন। সে জায়গায় নাকি আগে অনেক লোকের বাস ছিল, সন্ধ্যার সময় তেঁতুলের জঙ্গলের মধ্যে দিয়া তাঁহারা সেখানে যান—সান্যাল মশায় বার বার যে জিনিসটা দেখিতে যান তাহার নাম বলিতেছিলেন—"চিকামসজিদ"। কি জিনিস তাহা প্রথমে সে বুঝিতে পারে নাই, পরে কথাবার্তার ভাবে বুঝিয়াছিলেন একটা ভাঙা পুরোনো বাড়ি। অন্ধকারপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল—তাঁহারা ঢুকিতেই এক ঝাঁক চামচিকা

সাঁ করিয়া উড়িয়া বাহির হইয়া গেল। অপু বেশ কল্পনা করিতে পারে—চারিধারে অন্ধকার তেঁতুল জঙ্গল, কেউ কোথাও নাই, ভাঙা পুরোনো দরজা, যেমন সে ঢুকিল অমনি সাঁ করিয়া চামচিকার দল পলাইয়া গেল—রানুদের পশ্চিমদিকের চোরাকুঠুরির মতো অন্ধকার ঘরটা।

কোন্ দেশে সান্যাল মহাশয় একজন ফকিরকে দেখিয়াছিলেন, সে এক অশথ্‌তলায় থাকিত। এক ছিলিম গাঁজা পাইলে সে খুশি হইয়া বলিত—আচ্ছা কোন্ ফল তোমরা খাইতে চাও বল। পরে ঈপ্সিত ফলের নাম করিলে সে সম্মুখের যে কোনো একটা গাছ দেখাইয়া বলিত—যাও, ওখানে গিয়া লইয়া আইস। লোকে গিয়া দেখিত হয়তো আমগাছে বেদানা ফলিয়া আছে কিংবা পেয়ারা গাছে কলার কাঁদি ঝুলিয়া আছে।

রাজু রায় বলিতেন—ও সব মন্তর-তন্তরের খেলা আর কি! সেবার আমার এক মামা—

দীনু পালিত কথা চাপা দিয়া বলিতেন—মন্তরের কথা যখন ওঠালে, তখন একটা গল্প বলি শোনো। গল্প নয়, আমার স্বচক্ষে দেখা। বেলেডাঙার বুধো গাড়োয়ানকে তোমরা দেখেচো কেউ? রাজু না দেখে থাকো, রাজকৃষ্ট ভায়া তো খুব দেখেচো। কাঠের দড়ি-বাঁধা এক ধরনেব খড়ম পায়ে দিয়ে বুড়ো বরাবর নিতে-কামারের দোকানে লাঙলের ফাল পোড়াতে আসতো। একশ' বছর বয়সে মারা যায়, মারাও গিয়েছে আজ পঁচিশ বছরের ওপর। জোয়ান বয়সে আমরা তার সঙ্গে হাতের কব্জির জোরে পেরে উঠতাম না। একবার— অনেক কালের কথা—আমার তখন সবে হয়েচে উনিশ কুড়ি বয়েস, চাক্‌দা থেকে গঙ্গাচান করে গরুর গাড়ি করে ফিরছি। বুধো গাড়োয়ানের গাড়ি—গাড়িতে আমি, আমার খুড়িমা, আর অনন্ত মুখজ্যের ভাইপো রাম, যে আজকাল উঠে গিয়ে খুলনায় বাস করছে। কানসোনার মাঠের কাছে প্রায় বেলা গেল। তখন ওসব দিকে কি রকম ভয়ভীত্‌ ছিল, তা রাজকৃষ্ট ভায়া জানো নিশ্চয়। একে মাঠের রাস্তা, সঙ্গে মেয়েমানুষের দল, কিছু টাকাকড়িও আছে—বড্ড ভাবনা হল! আজকাল যেখানে নতুন গাঁ-খানা বসেচে—ওই বরাবাব এসে হল কি জানো? জন-চারেক যণ্ডামার্কাগোছেব মিশকালো লোক এসে গাড়ির পেছন দিকের বাঁশ দুদিক থেকে ধল্লে। এদিকে দুজন, ওদিকে দুজন। দেখে তো মশাই আমার মুখে আর রা-টা নেই, কোনো রকমে গাড়ির মধ্যে বসে আছি, এদিকে তারাও গাড়ির বাঁশ ধরে সঙ্গেই আস্‌চে, সঙ্গেই আস্‌চে, সঙ্গেই আস্‌চে। বুধো গাড়োয়ান দেখি পিট্‌ পিট্‌ করে পেছন দিকে চাইচে। ইশারা করে আমাদের কথা বলতে বারণ করে দিলে। বেশ আছে! এদিকে গাড়ি একেবারে নবাবগঞ্জ থানার কাছাকাছি এসে পড়ল। বাজার দেখা যাচ্চে, তখন সেই লোক কজন বল্লে—ওস্তাদজী, আমাদের ঘাট হয়েছে, আমরা বুঝতে পারিনি, ছেড়ে দাও। বুধো গাড়োয়ান বল্লে—সে হবে না ব্যাটারা। আজ সব থানায় নিয়ে গিয়ে বাঁধিয়ে দোব। অনেক কাকুতি-মিনতির পর বুধো বল্লে—আচ্ছা যা, ছেড়ে দিলাম এবার, কিন্তু কক্ষনো এরকম আর করিসনি! তবে তারা বুধো গাড়োয়ানের পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল। আমার স্বচক্ষে দেখা। মন্তরের চোটে ওই যে ওরা বাঁশ এসে ধরেছে, অমনি ধরেই রয়েচে—আর ছাড়াবার সাধ্যি নেই—চলেছে গাড়ির সঙ্গে! একেবারে পেরেক-আঁটা হয়ে গিয়েচে। তা বুঝলে বাপু? মন্তর-তন্তরের কথা—

গল্প বলিতে বলিতে বেলা যাইত। পাঠশালার চারিপাশের বনজঙ্গলে অপরাহ্নের রাঙা রৌদ্র বাঁকা ভাবে আসিয়া পড়িত। কাঁঠাল গাছের জগডুমুর গাছের ডালে ঝোলা গুলঞ্চ লতার গায়ে টুনটুনি পাখি মুখ উঁচু করিয়া বসিয়া দোল খাইত। পাঠশালা-ঘরে বনের গন্ধের সঙ্গে লতাপাতার চাটাই ছেঁড়াখোড়া বই-দপ্তর, পাঠশালার মাটির মেজে ও কড়া দা-কাটা তামাকের ধোঁয়া, সবসুদ্ধ মিলিয়া এক জটিল গন্ধের সৃষ্টি করিত।

সে গ্রামের ছায়া-ভরা মাটির পথে একটি মুগ্ধ গ্রাম্য বালকের ছবি আছে। বইদপ্তর বগলে লইয়া সে তাহার দিদির পিছন পিছন সাঁজিমাটি দিয়া কাচা, সেলাই করা কাপড় পরিয়া পাঠশালা হইতে ফিরিতেছে, তাহার ছোট্ট মাথাটির অমন রেশমের মতো নরম চিক্কণ সুখ-স্পর্শ চুলগুলি তাহার

মা যত্ন করিয়া আঁচড়াইয়া দিয়াছে—তাহার ডাগর ডাগর সুন্দর চোখ দুটিতে কেমন যেন অবাক ধরনের চাহনি—যেন তাহারা এ কোন্ অদ্ভুত জগতে নতুন চোখ মেলিয়া চাহিয়া চাহিয়া দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে। গাছপালায় ঘেরা এইটুকুই কেবল তার পরিচিত দেশ—এখানেই মা রোজ হাতে করিয়া খাওয়ায়, চুল আঁচড়াইয়া দেয়, দিদি কাপড় পরাইয়া দেয়, এই গণ্ডিটুকু ছাড়াইলেই তাহার চারিধারে ঘিরিয়া অপরিচয়ের অকূল জলধি! তাহার শিশুমন থই পায় না।

ওই যে বাগানের ওদিকে বাঁশবন—ওর পাশ কাটিয়া যে সরু পথটা ওধারে কোথায় চলিয়া গেল—তুমি বরাবর সোজা যদি ও-পথটা বাহিয়া চলিয়া যাও তবে শাঁখারিপুকুরের পাড়ের মধ্যে অজানা গুপ্তধনের দেশে পড়িবে—বড় গাছের তলায় সেখানে বৃষ্টির জলে মাটি খসিয়া পড়িয়াছে—কত মোহরভরা হাঁড়ি-কলসির কানা বাহির হইয়া আছে, অন্ধকার বনঝোপের নিচে, কচু ওল ও বনকলমির চক্‌চকে সবুজ পাতার আড়ালে চাপা—কেউ জানে না কোথায়।

একদিন পাঠশালায় এমন একটি ঘটনা হইয়াছিল, যাহা তাহার জীবনের একটি নতুন অভিজ্ঞতা।

সেদিন বৈকালে পাঠশালায় অন্য কেহ উপস্থিত না থাকায় কোন গল্পগুজব হইল না, পড়াশুনা হইতেছিল—সে গিয়া বসিয়া পড়িতেছিল শিশুবোধক—এমন সময় গুরু-মহাশয় বলিলেন—দেখি, শেলেট নেও, শ্রুতিলেখন লেখো—

মুখে মুখে বলিয়া গেলেও অপু বুঝিয়াছিল গুরুমহাশয় নিজের কথা বলিতেছেন না, মুখস্থ বলিতেছেন, সে যেমন দাশুরায়ের পাঁচালী ছড়া মুখস্থ বলে তেমনি।

শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হইল অনেকগুলো অমন সুন্দর কথা একসঙ্গে পর পর সে কখনও শোনে নাই। ও-সকল কথার অর্থ সে বুঝিতেছিল না, কিন্তু অজানা শব্দ ও ললিত পদের ধ্বনি, ঝংকার-জড়ানো এক অপরিচিত শব্দসংগীত, অনভ্যস্ত শিশুকর্ণে অপূর্ব ঠেকিল এবং সব কথার অর্থ না বোঝার দরুনই কুহেলি-ঘেরা অস্পষ্ট শব্দ-সমষ্টির পিছন হইতে একটা অপূর্ব দেশের ছবি বারবার উঁকি মারিতেছিল।

বড় হইয়া স্কুলে পড়িবার সময় সে বাহির করিয়াছিল ছেলেবেলাকার এই মুখস্থ শ্রুতিলিখন কোথায় আছে—

"এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি। ইহার শিখরদেশে আকাশপথে সতত-সমীর-সঞ্চরমাণ-জলধর-পটল সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত—অধিত্যকাপ্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বন-পাদপসমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে স্নিগ্ধ শীতল ও রমণীয়...পাদদেশে প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া...।

সে ঠিক বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না, কিন্তু সে জানে—তাহার মনে হয়, অনেক সময়েই মনে হয়—সেই যে বছর দুই আগে কুঠির মাঠে সরস্বতী পূজার দিন নীলকণ্ঠ পাখি দেখিতে গিয়াছিল, সেদিন মাঠের ধার বাহিয়া একটা পথকে দূরে কোথায় যাইতে দেখিয়াছিল সে। পথটার দু'ধারে যে কত কি অচেনা পাখি, অচেনা গাছপালা, অচেনা বনঝোপ,—অনেকক্ষণ সেদিন সে পথটার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল। মাঠের ওদিকে পথটা কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে তা ভাবিয়া সে কূল পায় নাই।

তাহার বাবা বলিয়াছিল—ও সোনাডাঙা মাঠের রাস্তা, মাধবপুর দশঘরা হয়ে সেই ধলচিতের খেয়াঘাটে গিয়ে মিশেচে।

ধলচিতের খেয়াঘাটে নয়, সে জানিত, ও পথটা আরও অনেক দূরে গিয়াছে। রামায়ণ-মহাভারতের দেশে।

সেই অশথ্ গাছের সকলের চেয়ে উঁচু ডালটার দিকে চাহিয়া থাকিলে যাহার কথা মনে উঠে—সেই বহুদূরের দেশটা।

শ্রুতিলিখন শুনিতে শুনিতে সেই দুই-বছর-আগে-দেখা পথটার কথাই তাহার মনে হইয়া গেল।

ওই পথের ওধারে অনেক দূরে কোথায় সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-পর্বত! বনঝোপের স্নিগ্ধ গন্ধে, না-জানার ছায়া নামিয়া আসা ঝিকিমিকি সন্ধ্যায়, সেই স্বপ্নলোকের ছবি তাহাকে অবাক করিয়া দিল। কতদূরে সে প্রস্রবণ-গিরির উন্নত শিখর, আকাশপথে সতত-সঞ্চরমাণ মেঘমালায় যাহার প্রশান্ত, নীল সৌন্দর্য সর্বদা আবৃত থাকে?

সে বড় হইলে যাইয়া দেখিবে।

কিন্তু সে বেতসীকণ্টকিত তট, বিচিত্রপুলিনা গোদাবরী, সে শ্যামল জনস্থান, নীল মেঘমালায় ঘেরা সে অপূর্ব শৈলপ্রস্থ, রামায়ণে বর্ণিত কোনো দেশে ছিল না। বাল্মীকি বা ভবভূতিও তাহাদের সৃষ্টিকর্তা নহেন। কেবল অতীত দিনের কোনো পাখিডাকা গ্রাম্য সন্ধ্যায় এক মুগ্ধমতি গ্রাম্য বালকের অপরিণত শিশু-কল্পনার দেশে তাহারা ছিল বাস্তব, একেবারে খাঁটি, অতি সুপরিচিত। পৃথিবীপৃষ্ঠে যাহাদের ভৌগোলিক অস্তিত্ব কোনোকালে সম্ভব ছিল না, শুধু এক অনভিজ্ঞ শৈশবমনেই সে কল্পজগতের প্রস্রবণ-পর্বত তাহার সতত-সঞ্চরমাণ মেঘজালে ঢাকা নীল শিখরমালার স্বপ্ন লইয়া অক্ষয় আসন পাতিয়া বসিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দুর্গা ভাইকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। পাড়ার নানাস্থানে খুঁজিয়া কোথাও পাইল না। অন্নদা রায় মহাশয়ের বাড়ির কাছে আসিয়া ভাবিল—একবার এখানে দেখে যাই, খুড়িমার সঙ্গেও দেখাটা হবে এখন—

অন্নদা রায়ের বাড়ি ঢুকিতেই একটা হৈ হৈ চিৎকার ও কান্নাকাটির কলরব তাহার কানে গেল। বাড়ির মধ্যে না ঢুকিয়া সে দরজার কাছে দাঁড়াইল। রোয়াকের একপাশে দাঁড়াইয়া অন্নদা রায়ের বিধবা ভগ্নী সখী ঠাক্‌রুন চিৎকার করিয়া বাড়ি ফাটাইতেছেন :

—তাই কি মনে একটু ভয় আছে নাকি? ঢের ঢের জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ দেখিচি, এমন আর কক্ষনো দেখিনি রে বাপু, পায়ে গড় করি—বলে ওই যমের মতো সোয়ামী, রাগলে হাড়ে মাসে এক রাখে না—তাই না হয় বাপু, একটু সম্‌ঝে চলি? সত্যিই তো, আজ তিন দিন ধরে বলচে ধানগুলো একটু রোদে দাও, ওগো ধানগুলো একটু রোদে দাও—কথা কি গেরাহ্যি হয় নাকি? না কানে যায়? কার কথা কে শোনে! গেরস্ত ঘরের বৌ ধান ভানবে, কাজ করবে এই জানি—তা না, রাদ্দিন পটের বিবি সেজে বসে আছে!—'পটের বিবি' জিনিসটি পরিস্ফুট করিবার জন্য উত্তমরূপে সাজিয়া যেরূপ ভাবে বসিয়া থাকা উচিত বলিয়া সখী ঠাক্‌রুনের ধারণা তিনি এখানে তাহার অভিনয় করিলেন—এ তো বাপু কখনও কোথাও বাপের জন্মে দেখিনি, শুনিওনি—

দালানের মধ্য হইতে অন্নদা রায়ের পুত্রবধূ নাকীসুরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—পটের বিবি হয়ে সেজে বসে থাকি নাকি! কাল যে দশ সের মুগের ডাল ভাজলাম সারা বিকেল ধরে? দুপুর বেলা খেয়েই আরম্ভ করিচি, আর যখন পাঁচটার গাড়ি যাওয়ার শব্দ পেলাম তখনও খোলার তাতেই বসে আছি, দু-ধামা ডাল ভাজা রে, ভাঙা রে—করে অন্ধকার হয়ে গিয়েচে তখন উঠিচি—সে কি অমনি হয়? গা-গতর ব্যথা হয়ে গেচে, রাত্তিরে বলি বুঝি জ্বর হল, এম্‌নি গায়ে-হাতে ব্যথা—তা কি কেউ দ্যাখে? তার ওপর সকাল বেলা বিনি দোষে এই মার—কেন সংসারে কি বসে বসে খাই?

এমন সময় অন্নদা রায়ের ছেলে গোকুল এক হাতে একখানা কাঁচা বাঁশের পাতাসুদ্ধ ডগা ও আর এক হাতে দা লইয়া বাড়ি ঢুকিল। স্ত্রীর কান্নার শেষ অংশ শুনিতে পাইয়া গর্জন করিয়া কহিল—

এখনও তোমার হয়নি—এখন তোমার অদেষ্টে বেস্তর দুক্খু আছে দেখচি—আমার রাগ বাড়িও না মেলা সক্কাল বেলা! আজ তিনদিন ধরে ধানগুলো রোদ্দুরে দেওয়ার জন্যে বলে বলে হয়রান—এই মেঘলা মেঘলা যাচ্চে, এর পর ধানগুলো যদি কলিয়ে যায়, তবে তোমার কোন্ বাবা এসে সামলাবে?...সারা বছরের পিণ্ডি জুটবে কোত্থেকে?

গোকুলের বউ হঠাৎ কান্না বন্ধ করিয়া তেজের সহিত জোর গলায় বলিয়া উঠিল—তুমি আমার বাবা তুলে গালাগালি কোরো না বলে দিচ্চি—আমার বাবা কি করেচে তোমার, কেন তুমি বাবার নামে যখন তখন যা তা বলবে?

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে গোকুল হাতের বাঁশ নামাইয়া রাখিয়া দা হাতে এক লাফে রোয়াকের সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া কহিল—তবে রে! আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন—তোমার বাপের বাড়ির আবদার না ঘুচিয়ে আমি আজ—

একটা খুনোখুনি ব্যাপার বুঝি বা হয় দেখিয়া বাড়ির কৃষাণ উঠান হইতে ডাকিয়া কহিল—কি করেন দা-ঠাকুর—কি করেন, থামুন, থামুন—পরে সে ছুটিয়া রোয়াকে উঠিল—দুর্গাও ছুটিয়া আসিল—সখী ঠাক্‌রুনও রোয়াক হইতে দালানের মধ্যে ঢুকিলেন—খুব একটা হৈ-চৈ হইল। দালানের মধ্যে গোকুলের স্ত্রী স্বামীর উদ্যত আক্রমণের সম্মুখে পিছাইয়া গিয়া মার ঠেকাইবার জন্য দুই হাত তুলিয়া দেওয়ালের গায়ে প্রাণপণে ঠেস দিয়া জড়োসড়ো হইয়া দাঁড়াইয়াছে, চোখে তার ভয়ের দৃষ্টি—কৃষাণ গিয়াই গোকুলের হাত হইতে দা-খানা কাড়িয়া লইল; পরে তাহাকে ধরিয়া দালানের বাহিরে আনিতে আনিতে বলিতে লাগিল—কি করেন দা-ঠাকুর, থামুন—আঃ—আসুন নেমে।

গোকুলের বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের কম নয়, কিন্তু দেহ তেমন সবল নহে, বলিষ্ঠ কৃষাণের সহিত ম্যালেরিয়া-দুর্বল দেহ লইয়া হাত ছাড়াছাড়ির চেষ্টা করিতে গেলে দুর্বলতাটাই অধিকতর প্রকাশ হইয়া পড়িবে বুঝিয়া বলিতে বলিতে নামিল—দ্যাখো না—একটা ডোল ধান, বীজ ধান, জল পেয়ে যদি কলিয়ে যায়, ও কি আর রোয়া হবে? আজ তিনদিন ধরে বলচি—আবার তেজড়া দেখলে তো?—তোমার তেজ আমি—

দুর্গা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কিন্তু এ সময়ে খুড়িমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় কথাবার্তার সময় নাই বুঝিয়া সে একপ্রকার নিঃশব্দেই অন্নদা রায়ের বাড়ির বাহির হইয়া পড়িল।

পাঁচু বাঁড়ুজ্যের বাড়ির কাছে জামতলায় একজন লোক ঘটিবাটি সারাইতে বসিয়াছে। কাঠের কয়লার হাপরে গনগনে আগুন, পাড়ার লোকের অনেক ভাঙা ঘটিবাটি জড়ো করা। বেঁটে ধরনের লোকটা, পাকসিটে গড়নের চেহারা, বয়স কত বুঝিবার উপায় নেই, ত্রিশও হইতে পারে, পঞ্চাশও হইতে পারে, গলায় ত্রিকণ্ঠি তুলসীর মালা, মুখের ডান দিকে একটা কাটার দাগ—হাতের কব্জিতে দড়ির মতো শির বাহির হইয়া আছে, পরনে আধময়লা ধুতি। পাড়ার অনেক ছেলেমেয়ে তাহাকে ঘিরিয়া ঘটিবাটি সারানো দেখিতেছে। দুর্গাও গেল। লোকটা বলিল—কি চাই খুকি?

সে বলিল—কিছু না, দেখবো।

বাড়ি ফিরিয়া মা'র কাছে বলিল—আজ মা গোকুল কাকা খুড়িমাকে যা মেরেছে সে কি বলবো—পরে সে আনুপূর্বিক বর্ণনা করিল।

সর্বজয়া বলিল—গোঁয়ার গোবিন্দ চাষা একটা বই তো নয়!—আহা, ভালোমানুষ বৌটা এমন হাতে আর এমন বাড়িতে পড়েচে—ঠেঙা খেতে খেতেই জীবনটা গেল।

—আমাকে তো বড্ড ভালোবাসে—যখন যা বাড়িতে হবে, আমার জন্যে তুলে রেখে দেবে। খুড়িমার কান্না দেখে এমন কষ্ট হল মা! সখী ঠাক্‌মা আবার এখন উল্‌টে খুড়িমাকেই বকে—

সে তিন-চার দিন জামতলায় ঘটিবাটি সারানো দেখিতে গেল। লোকটি তাহার বাড়ি, বাপের

নাম সব খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করে। বলিল—তোমাদের বাড়ির জিনিসপত্তর সারাবে না? নিয়ে এসো না খুকি?

দুর্গা বাড়ি আসিয়া মাকে বলিল—আমাদের ভাঙা ঘটি-গাড়ু গুলো দেবে মা, একজন বেশ ভালোমানুষ লোক এসেচে—ওপাড়ার পথে জামতলায় বসে সারাচ্ছে—

লোকটা তার নাম বলে পিতম—জাতে নাকি কাঁসারি। হাপর জ্বালাইতে জ্বালাইতে এক-একবার সোজা হইয়া বসিয়া বলে—জয় রাধে!—রাধে গোবিন্দ!

সকাল বেলা তাহার কাছে পাড়ার অনেকে আসিয়া জোটে। সে চিমটা দিয়া হাপর হইতে আগুন উঠাইয়া অনবরত তামাক সাজিয়া ভদ্রলোকদের হাতে দিতেছে—দিবার সময় মুখখানা বিনয়ে কাঁচুমাচু করিয়া ঘাড় একধারে কাত করিয়া বলে—হেঁ হেঁ, তামাক ইচ্ছে করুন বাবাঠাকুর!—রাধারানী-পদ ভরসা!...নারকেলের কথা আর বলবেন না বাবাঠাকুর, আর বছর জষ্টিমাসে বলি দিই গোটাকতক চারা বসিয়ে!—আধকাঠা-খানেক জমিতে ছগণ্ডা চারা কিনে লাগিয়ে দিলাম—তা ব্যাঙের উপদ্রুতে—একেবারে মূলশেকড়-টুলশেকড় সবসুদ্দ...কটা টাকাই মাটি।

মুখুজ্যে মশায় সকাল হইতে ঠায় বসিয়া আছেন, কোনো রকমে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া একটা পিতলের ঘড়া বিনামূল্যে সারাইয়া লইবেন। তামাক খাইতে খাইতে পূর্ব কথার খেই ধরিয়া বলিলেন—এই তো গেল কাণ্ড বাপু—তা—এবারও তো ভেবেছিলাম কুড়িখানেক চারা বাড়ির পেছনে—তা এমন ম্যালেরিয়া ধরল—তোমাদের ওদিকে কি রকম হে কারিগর? (তিনি সকাল হইতেই তাহাকে কারিগর বলিয়া ডাকিতেছেন)।

—পরিপুন্নু—আজ্ঞে পরিপুন্নু—ম্যালেরিয়ার কথা বলবেন না বাবাঠাকুর—হাড় জ্বালিয়ে খেয়েচে—এই নিন্ আপনার ঘড়াটা, ছটা পয়সা দেবেন—

মুখুজ্যে মশায় ঘড়াটা হাতে লইয়া উঠিয়া পড়িয়া বলেন—হ্যাঁ! এর জন্যে আবার পয়সা—দিলে একটা জিনিস ব্রাহ্মণকে সারিয়ে অমনি কার্তিক মাসের দিনটা—তার আবার—

পিতম তাড়াতাড়ি মুখুজ্যে মশায়ের হাতের ঘড়াটা ধরিয়া অত্যন্ত অমায়িক ভাবে হাসিয়া বলে—আজ্ঞে না, মাপ করবেন বাবাঠাকুর, এমনি সারিয়ে দিতে পারবো না—এখনও সক্কাল বেলা বউনি হয়নি। আজ্ঞে না—তা পারবো না—ঘড়াটা রেখে যান্—বাড়ি গিয়ে পহা কটা পাঠিয়ে দেবেন—

দুর্গার মা বলে—দেখিস দিকি—ভাঙা বাসন-কোসন বদলে নতুন বাসন-কোসন অনেক সময় ওরা দেয়—জিজ্ঞেস করিস তো।

পিতম খুব রাজি। দুর্গা বাড়ি হইতে বহিয়া বহিয়া এক রাশ পুরানো গাড়ু ঘটিবাটি ঘড়া তাহার কাছে লইয়া গিয়া হাজির করে। অর্ধেক দিনটা সে জামতলাতেই কাটায়—হাপর জ্বালানো, রাং ঝাল করা বসিয়া বসিয়া দেখে। পিতম বলিয়াছে তাহাকে একটা পিতলের আংটি গড়াইয়া দিবে—ইহাও বলিয়াছে যে, সারাইবার পয়সা তাহাদের লাগিবে না। সর্বজয়া শুনিয়া বলে—আহা বড্ড ভালো লোকটা তো! আসচে বুধবার অপুর জন্মবারটা, বলিস্ তাকে আসতে—আমাদের এখানে দুটো ডাল-ভাত পের্‌সাদ পেয়ে যাবে এখন—

বুধবার সকালে উঠিয়া দুর্গা জামতলায় গিয়া দেখিল লোকটা নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিল পূর্বদিন সন্ধ্যার পর কোন্ সময়ে সে দোকান উঠাইয়া চলিয়া গিয়াছে—হাপরের গর্ত ও পোড়া কয়লার রাশি ছাড়া অন্য কোন চিহ্ন নাই। দুর্গা এখানে ওখানে খোঁজ করিল—একে ওকে জিজ্ঞাসা করিল, কেহ জানে না সে কোথায় গিয়াছে। ভয়ে দুর্গার মুখ শুকাইয়া গেল—মা শুনিলে কি বলিবে! সংসারের অর্ধেক বাসন তাহার কাছে যে! সে দুর্গাকে বলিয়াছিল, ঝিকরহাটির বাজারে তাহার কাঁসারির দোকান আছে, সেখানে সে খবর পাঠাইয়াছে—তাহার ভাই একদিনের মধ্যে নতুন বাসন লইয়া আসিয়া পড়িল বলিয়া—আসিলেই ভাঙাচোরা বাসনগুলা সব বদলাইয়া দিবে। কোথায়ই বা

সে—আর কোথায়ই বা তাহার ভাই! কোথায় সে যে গেল তাহা দুর্গা অনেক খুঁজিয়াও পাইল না। কেবলমাত্র তাহাদেরই জিনিস গিয়াছে—অন্য হুঁশিয়ার লোকের এক টুকরা পিতলও খোয়া যায় নাই।

সারাদিনের পরে সন্ধ্যার সময় দুর্গা কাঁদো কাঁদো মুখে মাকে সব বলিল। হরিহর বিদেশে—কেই বা খোঁজ করে, কেই বা দেখে। সর্বজয়া অবাক হইয়া যায়! বলে—একবার তোর রায় জেঠামশায়কে গিয়ে বল্ তো! ওমা এমন কথা তো কখনও শুনিনি!...

হরিহর বাড়ি আসিলে ঝিকরহাটির বাজারে খোঁজ করা হইয়াছিল—পিতম নামক কোন লোকের সেখানে কাঁসারির দোকান নাই বা উক্ত চেহারার কোনো লোকও সেখানে নাই।

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। ভাদ্র মাস।

অপু বৈকাল বেলা বেড়াইতে যাইবার সংকল্প করিতেছে, এমন সময় তাহার মা পিছনে ডাকিয়া বলিল—কোথায় বেরুচ্ছিস রে অপু?—চাল ভাজা আর ছোলা ভাজা ভাজচি—বেরিয়ো না যেন। ...এক্ষুনি খাবি—

অপু শুনিয়াও শুনিল না—যদিও সে চাল-ছোলা ভাজা খাইতে ভালোবাসে বলিয়াই মা তাহার জন্য ভাজিতে বসিয়াছে ইহা সে জানে—তবুও সে কি করিতে পারে?—এতক্ষণ কি খেলাটাই চলিতেছে নীলুদের বাড়িতে? সে যখন বাহির দরজায় পা দিয়াছে, মার ডাক আবার কানে গেল—বেরুলি বুঝি!—ও অপু, বা রে, দ্যাখো মজা ছেলের! গরম গরম খাবি—আমি তাড়াতাড়ি ঘাট থেকে এসে ভাজতে লাগলাম—ও অপু-উ-উ—

অপু এক ছুট দিয়া নীলুদের বাড়ি গিয়া পৌঁছিল। অনেক ছেলে জুটিয়াছিল, অপু আসিবার আগেই খেলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। নীলু বলিল—চল্ অপু, দক্ষিণ মাঠে পাখির ছানা দেখতে যাবি? অপু রাজি হইলে দুজনে দক্ষিণ মাঠে গেল। ধান ক্ষেতের ওপারেই নবাবগঞ্জের বাঁধা সড়কটি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা হইয়া যেন মাঠের মাঝখান চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। গ্রাম হইতে এক মাইলেব উপব হইবে। অপু এতদূর কখনও বেড়াইতে আসে নাই—তাহার মনে হইল যেন সমস্ত পরিচিত জিনিসের গণ্ডি ছাড়াইয়া কোথায় কতদূরে নীলুদা তাহাকে টানিয়া আনিল। একটুখানি পরেই সে বলিল, বাড়ি চল নীলুদা, আমায় মা বকবে, সন্দে হয়ে যাবে, আমি একা গাবতলার পথ দিয়ে যেতে পারবো না। তুমি বাড়ি চল—

ফিরিতে যাইয়া নীলু পথ হারাইয়া ফেলিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া কাহাদের একটা বড় আমবাগানের ধার দিয়া একটা পথ মিলিল। সন্ধ্যা হইবার তখনও কিছু বিলম্ব আছে, আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে—এমন সময় চলিতে চলিতে নীলু হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া অপুর কনুই-এ টান দিয়া সম্মুখ দিকে চাহিয়া ভয়ের সুরে বলিল—ও ভাই অপু!

অপু সঙ্গীর ভয়ের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিল—কি রে নীলুদা? পরে সে চাহিয়া দেখিল, যে সুঁড়িপথটা দিয়া তাহারা চলিতেছিল, তাহা কাহাদের উঠানে গিয়া শেষ হইয়াছে—উঠানে একখানা ছোট্ট চালাঘর ও একটা বিলাতী আমড়ার গাছ। তাহার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই নীলু ভয়ের সুরে বলিয়া উঠিল—আতুরী ডাইনির বাড়ি!

অপুর মুখ শুকাইয়া গেল...আতুরী ডাইনির বাড়ি: ...সন্ধেবেলা কোথায় আসিয়া তাহারা পড়িয়াছে! কে না জানে যে ওই উঠানের গাছে চুরি করিয়া বিলাতি আমড়া পাড়িবার অপরাধে ডাইনিটা জেলেপাড়ার কোন্ এক ছেলের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া কচুর পাতায় বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, পরে মাছে তাহা খাইয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে বেচারির আমড়া খাইবার সাধ এ জন্মের মতো মিটিয়া যায়! কে না জানে সে ইচ্ছা করিলে চোখের চাহনিতে ছোট ছেলেদের রক্ত চুষিয়া খাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, যাহার রক্ত খাওয়া হইল, সে কিছুই জানিতে পারিবে না, কিন্তু বাড়ি গিয়া খাইয়া-দাইয়া সেই যে বিছানায় শুইবে আর পরদিন উঠিবে না! কতদিন শীতের রাত্রে

লেপের তলায় শুইয়া দিদির মুখে আতুরী ডাইনির গল্প শুনিতে শুনিতে সে বলিয়াছে—রাত্রিতে তুই ওসব গল্প বলিসনে দিদি, আমার ভয় করে,—তুই সেই কুচবরণ রাজকন্যের গল্পটা বল্ দিকি?

ঝাপসা দৃষ্টিতে সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে গেল বাড়িতে কেহ আছে কিনা এবং চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত শরীর যেন জমিয়া হিম হইয়া গেল...বেড়ার বাঁশের আগড়ের কাছে...অন্য কেহ নয়, একেবারে স্বয়ং আতুরী ডাইনি তাহাদের—এমন কি যেন শুধু তাহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া!...

যাহার জন্য এত ভয়, তাহাকে একেবারে সম্মুখেই এভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অপুর সামনে পিছনে কোনো দিকেই পা উঠিতে চাহিল না।

আতুরী বুড়ি ভুরু কুঁচকাইয়া তোব্ড়ানো গালটা আরও ঝুলাইয়া ভালো করিয়া লক্ষ করিবার ভঙ্গিতে মুখটা সামনের দিকে একটু বাড়াইয়া দিয়া পায়ে পায়ে তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। অপু দেখিল সে ধরা পড়িয়াছে, কোনো দিকেই আর পলাইবার পথ নাই—যে কারণেই হউক ডাইনির রাগটা তাহার উপরেই—এখনই তাহার প্রাণটি সংগ্রহ করিয়া কচুর পাতায় পুরিবে!

মুখের খাবার ফেলিয়া, মায়ের ডাকের উপর ডাক উপেক্ষা করিয়া সে যে আজ মায়ের মনে কষ্ট দিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহার ফল এই ফলিতে চলিল। সে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিল—আমি কিছু জানিনে—ও বুড়ি পিসি—আমি আর কিছু করবো না—আমায় ছেড়ে দাও, আমি ইদিকে আর কখনও আসবো না—আজ ছেড়ে দাও ও বুড়ি পিসি—

নীলু তো ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল—কিন্তু অপুর ভয় এত হইয়াছিল যে, চোখে তাহার জল ছিল না।

বুড়ি বলিল—ভয় কি মোরে, ও বাবারা? মোরে ভয় কি?...পরে খুব ঠাট্টা করা হইতেছে ভাবিয়া হাসিয়া বলিল, মুই কি ধরে নেবো খোকারা? এসো মোর বাড়িতি এসো—আমচুর দেবানি এসো—

আমচুর!...ডাইনি বুড়ি ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া বাড়িতে পুরিতে চাহিতেছে—গেলেই আর কি!. .ডাইনিরা রাক্ষসীরা যে এ-রকম ভুলাইয়া ফাঁদে ফেলে—এ-রকম কত গল্প তো সে মা'র মুখে শুনিয়াছে।

এখন সে কি করে!...উপায়?

বুড়ি তাহার দিকে আরও খানিক আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল—ভয় কি ও মোরে বাবারা? মুই কিছু বলবো না, ভয় কি মোরে?

আর কি, সব শেষ! মায়ের কথা না শুনিবার ফল ফলিবার আর দেরি নাই, হাত বাড়াইয়া তাহার প্রাণটা সংগ্রহ করিয়া এখনই কচুর পাতায় পু—রিল! প্রতি মুহূর্তেই তাহার আশঙ্কা হইতেছিল যে এখনই এ বুড়ি হাসিমুখ বদ্লাইয়া ফেলিয়া বিকট মূর্তি ধরিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিবে—রাক্ষসী রানীর গল্পের মতো! বনের অজগর সাপের দৃষ্টির কুহকে পড়িয়া হরিণশিশু নাকি অন্য দিকে চোখ ফিরাইতে পারে না, তাহারও চোখদুটির কুহক-মুগ্ধ দৃষ্টি সেরূপ বুড়ির মুখের উপর দৃঢ়নিবদ্ধ ছিল—সে আড়ষ্ট কণ্ঠে দিশাহারা ভাবে বলিয়া উঠিল, ও বুড়ি পিসি, আমার মা কাঁদবে, আমায় আজ আর কিছু বোলো না—আমি তোমার গাছে কোনো দিন আমড়া নিতে আসিনি—আমার মা কাঁদবে—

আতঙ্কে সে নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে...বাড়ি, ঘরদোর, গাছপালা, নীলু, চারিধার যেন ধোঁয়া ধোঁয়া। কেহ কোনোদিকে নাই...কেবল একমাত্র সে আর আতুরী ডাইনির ক্রূর দৃষ্টি মাখানো একজোড়া চোখ...আর অনেক দূরে কোথায় যেন মা আর তাহার চাল-ভাজা খাওয়ার ডাক!...

পরক্ষণেই কিন্তু অত্যধিক ভয়ে তাহার একরূপ মরীয়া সাহস জোগাইল, একটা অস্পষ্ট আর্তরব করিয়া প্রাণভয়ে দিশাহারা অবস্থায় সে সম্মুখের ভাঁট, শেওড়া, রাংচিতার জঙ্গল ভাঙিয়া ডিঙাইয়া সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে যেদিকে দুই চোখ যায় ছুটিল—নীলুও ছুটিল তাহার পিছনে পিছনে।...

ইহাদের ভয়ের কারণ কি বুঝিতে না পারিয়া বুড়ি ভাবিল—মুই মাত্তিও যাইনি, ধত্তিও যাইনি—কাঁচা ছেলে, কি জানি মোরে দেখে কেন ভয় পালে সন্দেবেলা? খোকাডা কাদের?

অপু যখন বাড়ি আসিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সর্বজয়া সবে উনুন ধরাইয়া তালের বড়া ভাজিবার আয়োজন করিতেছে, দুর্গা নিকটে বসিয়া তাল চাঁচিয়া রস বাহির করিতেছে—ছেলেকে দেখিয়া বলিল—কোথায় ছিলি বল্ দিকি? সেই বেরিয়েচো বিকেলবেলা, কিছুই তো আজ খাবার খেলিনে—খিদেতেষ্টা পায় না?

মায়ের নিকট বলিবার জিনিস অপুর মনে স্তূপাকার হইয়া সকলেই একসঙ্গে বাহিরে আসিবার জন্য এরূপভাবে চেষ্টা পাইতেছিল যে, পরস্পরের ঠেলাঠেলিতে পরস্পরের নির্গমপথ এককালীন রুদ্ধ হইয়া গিয়া অপুকে একেবারে নির্বাক করিয়া দিল। সে শুধু বলিল—আমি কি কাপড় ছাড়বো মা? আমার এখানা ওবেলার কাপড়—

পরে সে বিস্ময়ের সহিত দেখিল যে, মা তাহাকে চালভাজা দিবার কোনো আগ্রহই না দেখাইয়া তালের রসটা ঘন না পাতলা হইয়াছে, তাহাই অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতেছে। পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে দুর্গাকে বলিল—দু-চারখানা ভেজে দেখি, না হয়, বড় তক্তপোশের নিচেটায় চালের গুঁড়ো আছে, আর দুটো নিয়ে আসিস এখন—পরে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল—দাঁড়া অপু, তোকে গরম গরম ভেজে দিচ্ছি।

অপু বলিল—কেন মা, চাল-ছোলা ভাজা কই?

—তা চাল ভাজা তুই খেলি কই? এতবার ডাকলাম, তুই বেরিয়ে চলে গেলি —ঠাণ্ডা হয়ে গেল, দুর্গা খেয়ে ফেল্লে, তা এই বড়া তো হয়ে গেল বলে। ভাজবো আর দেবো—

অপু সেই বৈকালবেলা হইতে মনের মধ্যে যে তাসের ঘর নির্মাণ করিতেছিল, এক ফুঁয়ে কে তাহা একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিল। এই তাহার মা তাহাকে ভালোবাসে! সে বৈকালবেলা বাটীর বাহিরে যাওয়ার পর হইতে অনবরত ভাবিতেছে—মা না জানি কত দুঃখই করিতেছে তাহার জন্য! অপু আমার এখনও কেন যে এলো না, তার জন্যে এত করে ঘাট থেকে এসে ভাজলাম, আহা সে দুটো খেলে না—হাঁ, দায় পড়িয়াছে, তাহার জন্য ভাবিয়া তো মায়েব ঘুম নাই—মা দিব্যি সেগুলি দিদিকে খাওয়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে—সে-ই শুধু এতক্ষণ মিছামিছি ভাবিয়া মরিতেছিল।

দুর্গা বলিল—মা শিগ্‌গির শিগ্‌গির ভেজে নাও। বড্ড মেঘ করে আস্‌চে, বিষ্টি এলে আর ভাজা হবে না,—ঘরে যে জল পড়ে!—সেদিনকার মতো হবে কিন্তু—

দেখিতে দেখিতে চারিধার ঘিরিয়া ঘনাইয়া-আসা মেঘের ছায়ায় বাঁশবনেব মাথা কালো হইয়া উঠিল। খুব মেঘ জমিয়া আকাশ অন্ধকার হইয়াছে, অথচ বৃষ্টি এখনও নামে নাই—এসময় মনে এক প্রকার আনন্দ ও কৌতূহল হয়—না জানি কি ভয়ঙ্কর বৃষ্টিই আসিতেছে, পৃথিবী বুঝি ভাসাইয়া লইয়া যাইবে—অথচ বৃষ্টি হয় প্রতিবারই, পৃথিবী কোনোবারেই ভাসায় না, তবুও এ মোহটুকু ঘোচে না! দুর্গার মন সেই অজানার আনন্দে ভরিয়া উঠিল, সে মাঝে মাঝে দাওয়ার ধারে আসিয়া নিচু চালের ছাঁচ হইতে মুখ বাড়াইয়া মেঘান্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল।

সর্বজয়া খানকতক বড়া ভাজিয়া বলিল—এই বাটিটা করে ওকে দে তো দুগ্‌গা।—ওর খিদে পেয়েচে, বিকেল থেকে কিছু তো খায় নি! এই শেষ কথাই কাল হইল—এতক্ষণ অপু যা হয় এক রকম ছিল কিন্তু মায়ের শেষের দিকের আদরের সুরে তাহার অভিমানের বাঁধ একেবারে ভাঙিয়া পড়িল, সে বড়াসুদ্ধ বাটিটা উঠানে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—আমি খাবো না তো বড়া, কখ্‌খনো খাবো না—যাও—

সর্বজয়া ছেলের কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। গরিবের ঘরকন্না, কত কষ্টে যে কি

জোগাড় করিতে হয় সে-ই জানে। আর হতভাগা ছেলেটা কিনা দু-দুবার সেই কত কষ্টে সংগৃহীত মুখের জিনিস নষ্ট করিল! ক্ষোভে, রাগে সে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার আজ হয়েছে কি! তোমার অদৃষ্টে আজ ছাই লেখা আছে, খেয়ো এখন তাই গরম গরম—

এবার অপুর পালা। এ রকম কথা মা'র মুখে সে কখনও শোনে নাই। কোথায় সে চাহিতেছে, মা দুটো আদরের কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিবে, না সন্ধ্যাবেলা এমন নিষ্ঠুর কথা! সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা মা, আমি চালভাজা খাইনি তাতে আমার মনে কষ্ট হয় না? আমি বিকেল থেকে ভাবছিনে বুঝি? আমি—আমি কখ্খনো তোমার বাড়ি আর আসচিনে—আমি ছাই খাবো, কেন আমি ছাই খাবো? আর দিদি বুঝি সব ভালো ভালো জিনিস খাবে? আমি আস্‌বো না তোমার বাড়ি, কখ্খনো আসবো না—

পরে সে আতুরী বুড়ির বাড়ি হইতে এইমাত্র যেরূপ অন্ধকার, কাঁটাবন, আমবন না মানিয়া ছুটিয়াছিল এখনও রাগে আত্মহারা হইয়া দাওয়া হইতে নামিয়া বাহিরের উঠানের দিকে ঠিক সেইরূপ মরীয়ার মতো ছুটিল। ভাই-এর অভিমান-ভরা দৃষ্টি, ফুলা ঠোঁট ও কথা বলিবার ধরন দুর্গার নিকট এরূপ হাস্যকর ঠেকিল যে, সে হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িল।—হি-হি—অপুটা—একেবারে পাগল মা, কেমন বল্লে—পরে ভাই-এর কথা বলিবার উক্তির নকল করিয়া বলিল—আমি চালভাজা খাইনি—হি-হি—তাতে বুঝি আমার কষ্ট হয় না? বোকা একেবারে যা—ও অপু, শুনে যা, ও অপু-উ-উ—

অপু ছুটিয়া পাঁচিলের পাশের পথ দিয়া পিছনের বাঁশবাগানের দিকে ছুটিল। আকাশে মেঘ তখনও থমকিয়া আছে, বাঁশবনের তলাটা ঝোপেঝাড়ে নির্জন বর্ষাসন্ধ্যায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। সহজ অবস্থায় এরূপ স্থানে এ-সময় একা আসিবার কল্পনাই সে করিতে পারিত না কোনদিনও। কিন্তু বর্তমানে চারিধারের নির্জনতা ও অন্ধকার, বাঁশঝাড়ের মধ্যে কিসের খড়মড় শব্দ, অদূরে সলতে-খাগী আমগাছে ভূতের প্রবাদ প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল—আমি কখ্খনো বাড়ি যাবো না তো!—এ জন্মে আর বাড়ি যাবো না—

অভিমানের প্রথম বেগটা কাটিয়া গেলে তাহার একটু গা ছমছম কবিতে লাগিল—ভয়ে ভয়ে সে একবার দূরের সলতে-খাগী আমগাছটার দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল—এখন যদি একটা ভূতে আমায় তুলে একবারে মগডালে নিয়ে যায় তো বেশ হয়—মা খুঁজে খুঁজে কেঁদে মরে—ভাবে, কেন সন্দেবেলা ছাই খাও বল্লাম, তাই তো খোকা আমার রাগ করে কোথায় অন্ধকারে মেঘ মাথায় বেরিয়ে চলে গেল, আর ফিরে এলো না। ভূতের হাতে সে মরিয়া গেলে মা'র কি রকম কষ্ট হইবে তাহা সে খানিকক্ষণ প্রতিহিংসার আনন্দে উপভোগ করিল। পরে সেখান হইতে সে গিয়া পাঁচিলের পাশের পথে দাঁড়াইল। তাহার ভয় ভয় করিতেছিল—সম্মুখের বাঁশঝাড়ে একটা যেন অস্পষ্ট শব্দ হইল, অপু একবার ভয়ে ভয়ে চোখ উঁচু করিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার মা ও দিদি রানুদের বাড়ির দিকে ডাকিতেছে—ও অপু-উ-উ! বাঁশঝাড়ে আবার যেন একটা শব্দ হইল। সে মনে মনে বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু মুশকিল এই যে, তাহাকে খোশামোদ না করিলে সে নিজেই এত রাগের মাথায় বাড়ি গিয়া ঢুকিবে, সত্য সত্য এতটা আত্মসম্মানজ্ঞানশূন্য সে নয় নিশ্চয়ই। এবার তাহার দিদি রানুদের বাড়ির খিড়কি দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে যেন। সে ছুটিয়া দরজার সামনে পাঁচিলের কোণটাতে দাঁড়াইল। হঠাৎ আসিতে আসিতে পাঁচিলের পাশে চোখ পড়িতেই দুর্গা চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, ওই দাঁড়িয়ে রয়েছে মা!...এই দ্যাখো পাঁচিলের পাশে। পরে সে ছুটিয়া গিয়া ভাইয়ের হাত ধরিল। (ছুটিবার আবশ্যকতা ছিল না।)—ওরে দুষ্টু, এখানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকা হয়েচে, আর আমি আর মা সমস্ত জায়গা খুঁজে বেড়াচ্চি, এই দ্যাখো।

দুজনে মিলিয়া তাহাকে বাড়ির মধ্যে ধরিয়া লইয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এবার বাড়ি হইতে যাইবার সময় হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বলিল—বাড়ি থেকে কিছু খেতে পায় না, তবুও বাইরে বেরুলে দুধটা, ঘিটা—ওর শরীরটা সারবে এখন।

অপু জন্মিয়া অবধি কোথাও কখনও যায় নাই। এ গাঁয়েরই বকুলতলা, গোঁসাইবাগান, চালতেতলা, নদীর ধার—বড়জোর নবাবগঞ্জ যাইবার পাকা সড়ক—এই পর্যন্ত তাহার দৌড়। মাঝে মাঝে বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব গরম পড়িলে তাহার মা বৈকালে নদীর ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিত। নদীর ওপারের খড়ের মাঠে বাবলা গাছে গাছে হলুদ রং-এর ফুল ফুটিয়া থাকিত, গরু চরিত, মোটা গুলঞ্চলতা-দুলানো শিমুল গাছটাকে দেখিলে মনে হইত যেন কতকালের পুরাতন গাছটা। রাখালেরা নদীর ধারে গরুকে জল খাওয়াইতে আসিত, ছোট্ট একখানা জেলেডিঙি বাহিয়া তাহাদের গাঁয়ের অক্রূর মাঝি মাছ ধরিবার দোয়াড়ি পাতিতে যাইত, মাঠের মাঝে মাঝে ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল বৈকালের ঝিরঝির বাতাসে দুলিতে থাকিত—ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ এক-একদিন ওপারের সবুজ খড়ের জমির শেষে নীল আকাশটা যেখানে আসিয়া দূর গ্রামের সবুজ বনরেখার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সেদিকে চাহিয়া দেখিতেই তাহার মনটা যেন কেমন হইয়া যাইত—সে সব প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে জানিত না। শুধু তাহার দিদি ঘাট হইতে উঠিলে সে বলিত—দিদি দিদি, দ্যাখ্ দ্যাখ্ ওইদিকে—পরে সে মাঠের শেষের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত—ওই যে? ওই গাছটার পিছনে? কেমন অনেক দূর, না?

দুর্গা হাসিয়া বলিত—অনেক দূর—তাই দেখাচ্ছিলি? দূর, তুই একটা পাগল!

আজ সেই অপু সর্বপ্রথম গ্রামের বাহিরে পা দিল। কয়েকদিন পূর্ব হইতেই উৎসাহে তাহার রাত্রিতে ঘুম হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছিল, দিন গুনিতে গুনিতে অবশেষে যাইবার দিন আসিয়া গেল।

তাহাদের গ্রামের পথটি বাঁকিয়া নবাবগঞ্জের সড়ককে ডাইনে ফেলিয়া মাঠের বাহিরে আষাঢ়-দুর্গাপুরের কাঁচা রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। দুর্গাপুরের রাস্তায় উঠিয়াই সে বাবাকে বলিল—বাবা, যেখান দিয়ে রেল যায় সেই রেলের রাস্তা কোন্ দিকে?

তাহার বাবা বলিল—সামনেই পড়বে এখন, চলো না। আমরা রেল লাইন পেরিয়ে যাব এখন—

সেবার তাহাদের রাঙী গাইয়ের বাছুর হারাইয়াছিল। নানা জায়গা খুঁজিয়াও দুই তিন দিন ধরিয়া কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সে তাহার দিদির সঙ্গে দক্ষিণ মাঠে বাছুর খুঁজিতে আসিয়াছিল। পৌষ মাস, ক্ষেতে ক্ষেতে কলাই গাছের ফলে দানা বাঁধিয়াছে, সে ও তাহার দিদি নিচু হইয়া ক্ষেত হইতে মাঝে মাঝে কলাই ফল তুলিয়া খাইতেছিল—তাহাদের সামনে কিছুদূরে নবাবগঞ্জের পাকা রাস্তা, খেজুর গুড় বোঝাই গরুর গাড়ির সারি পথ বাহিয়া ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিতে করিতে আষাঢ়ুর হাটে যাইতেছিল।

তাহার দিদি পাকা রাস্তার ওপারে বহুদূরে ঝাপসা মাঠের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কি দেখিতেছিল, হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল,—এক কাজ করবি অপু, চল্ যাই আমরা রেলের রাস্তা দেখে আসি, যাবি?

অপু বিস্ময়ের সুরে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—রেলের রাস্তা—সে যে অনেক দূর! সেখানে কি করে যাবি?

তাহার দিদি বলিল—বেশি দূর বুঝি! কে বলেচে তোকে—ওই পাকা রাস্তার ওপারে তো—না?

অপু বলিল—নিকটে হলে তো দেখা যাবে? পাকা রাস্তা থেকে দেখা যায়—চল্ দিকি দিদি, গিয়ে দেখি।

দুইজনে অনেকক্ষণ নবাবগঞ্জের সড়কে উঠিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার দিদি বলিল—বড্ড অনেক দূর, না। যাওয়া যাবে না—

—কিছু তো দেখা যায় না—অত দূর গেলে আবার আসব কি করে? তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু দূরের দিকে আবদ্ধ ছিল, লোভও হইতেছিল, ভয়ও হইতেছিল। হঠাৎ তাহার দিদি মরীয়া ভাবে বলিয়া উঠিল—চল্ যাই দেখে আসি অপু—কতদূর আর হবে? দুপুরের আগে ফিরে আসবো এখন, হয়তো রেলের গাড়ি যাবে এখন—মাকে বলবো বাছুর খুঁজতে দেরি হয়ে গেল—

প্রথমে তাহারা একটুখানি এ-দিক ও-দিক চাহিয়া দেখিল কেহ তাহাদিগকে লক্ষ করিতেছে কিনা। পরে পাকা রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িয়া দুপুর রোদে ভাই বোনে মাঠ বিল জলা ভাঙিয়া সোজা দক্ষিণ মুখে ছুটিল। দৌড়, দৌড়, দৌড়—নবাবগঞ্জের লাল রাস্তা ক্রমে অনেক দূর পিছাইয়া পড়িল—রোয়ার মাঠ, জলসত্রতলা, ঠাকুরঝি পুকুর বামধারে, ডানধাবে দূরে দূরে পড়িয়া রহিল—সামনে একটা ছোট বিল নজরে আসিতে লাগিল। তাহার দিদি হাসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—মা টের পেলে কিন্তু—পিঠের ছাল তুলবে। অপু একবার হাসিল—মরীয়ার হাসি। আবার দৌড়, দৌড় দৌড়,—জীবনে এই প্রথম বাধাহীন, গণ্ডিহীন মুক্তির উল্লাসে তাহাদের তাজা তরুণ রক্ত তখন মাতিয়া উঠিয়াছিল—পরে কি হইবে, তাহা ভাবিবার অবসর কোথায়?

পরে যাহা হইল, তাহা সুবিধাজনক নয়। খানিক দূরে গিয়া একটা বড় জলা পড়িল একেবারে সামনে—হোগলা আর শোলা গাছে ভরা, তাহার উপব তাহার দিদি পথ হারাইয়া ফেলিল—কোনো গ্রামও চোখে পড়ে না—সামনে কেবল ধানক্ষেত, জলা, আর বেত-ঝোপ। ঘন বেতবনের ভিতর দিয়া যাওয়া যায় না, পাঁকে জলে পা পুঁতিয়া যায়, রৌদ্র এমন বাড়িয়া উঠিল যে, শীতকালেও তাহাদের গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল—দিদির পরনের কাপড় কাঁটায় নানা স্থানে ছিঁড়িয়া গেল, তাহার নিজের পায়ে দু'তিন বার কাঁটা টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে হইল—শেষে রেলরাস্তা দূরের কথা, বাড়ি ফেরাই মুশকিল হইয়া উঠিল। অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, পাকা রাস্তাও আর দেখা যায় না, জল ভাঙিয়া ধানক্ষেত পার হইয়া যখন তাহারা বহু কষ্টে আবার পাকা রাস্তায় আসিয়া উঠিল তখন দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে। বাড়ি আসিয়া তাহার দিদি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলিয়া তবে নিজের ও তাহার পিঠ বাঁচাইল।

সেই রেলের রাস্তা আজ এমনি সহজভাবেই সামনে পড়িবে—সেজন্য ছুটিতে হইবে না, পথ হারাইতে হইবে না—বকুনি খাইতে হইবে না!

কিছু দূর গিয়া সে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিল নবাবগঞ্জের পাকা সড়কের মতো একটা উঁচু রাস্তা মাঠের মাঝখান চিরিয়া ডাইনে বাঁয়ে বহুদূর গিয়াছে। রাঙা রাঙা খোয়ার রাশি উঁচু হইয়া ধারের দিকে সাবি দেওয়া। সাদা সাদা লোহার খুঁটির উপর যেন একসঙ্গে অনেক দড়ির টানা বাঁধা—যতদূর দেখা যায়, ওই সাদা খুঁটি ও দড়ির টানা বাঁধা দেখা যাইতেছে—

তাহার বাবা বলিল—ওই দ্যাখো খোকা, রেলের রাস্তা—

অপু একদৌড়ে ফটক পার হইয়া রাস্তার উপর আসিয়া উঠিল। পরে সে রেলপথের দুইদিকে বিস্ময়ের চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দুইটা লোহা বরাবর পাতা কেন? উহার উপর দিয়া রেলগাড়ি যায়? কেন? মাটির উপর দিয়া না গিয়া লোহার ওপর দিয়া যায় কেন? পিছলাইয়া পড়িয়া যায় না? কেন? ওগুলোকে তার বলে? তাহার মধ্যে সোঁ সোঁ কিসের শব্দ? তারে খবর যাইতেছে? কাহারা খবর দিতেছে? কি করিয়া খবর দেয়? ওদিকে কি ইস্টিশান? এদিকে কি ইস্টিশান?

সে বলিল—বাবা, রেলগাড়ি কখন আস্‌বে? আমি রেলগাড়ি দেখবো বাবা।

—রেলগাড়ি এখন কি করে দেখবে?...সেই দুপুরের সময় রেলগাড়ি আস্‌বে, এখনও দু'ঘণ্টা দেরি!

—তা হোক বাবা, আমি দেখে যাবো, আমি কখ্‌খনো দেখিনি—হ্যাঁ বাবা—

—ও রকম কোরো না, ওই জন্য তোমায় কোথাও আন্‌তে চাইনে—এখন কি করে দেখবে? সেই দুপুর একটা অবধি বসে থাক্‌তে হবে তা হলে এই ঠায় রোদ্দুরে, চল আস্‌বার দিন দেখাবো।

অপুকে অবশেষে জল-ভরা চোখে বাবার পিছনে পিছনে অগ্রসর হইতে হইল।

তুমি চলিয়া যাইতেছ...তুমি কিছুই জানো না, পথের ধারে তোমার চোখে কি পড়িতে পারে, তোমার ডাগর নবীন চোখ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় চারিদিককে গিলিতে গিলিতে চলিয়াছে—নিজের আনন্দের এ হিসাবে তুমিও একজন দেশ-আবিষ্কারক। অচেনার আনন্দকে পাইতে হইলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই। আমি যেখানে আর কখনও যাই নাই, আজ নতুন পা দিলাম, যে নদীর জলে নতুন স্নান করিলাম, যে গ্রামের হাওয়ায় শরীর জুড়াইল, আমার আগে সেখানে কেহ আসিয়াছিল কিনা, তাহাতে আমার কি আসে যায়? আমার অনুভূতিতে তাহা যে অনাবিষ্কৃত দেশ। আমি আজ সর্বপ্রথম মন, বুদ্ধি, হৃদয় দিয়া উহার নবীনতাকে আস্বাদ করিলাম যে!

আমডোব! ছোট্ট চাষাদের গাঁ-খানা—কেমন নামটি! মেয়েবা উঠানে বিচালি কাটিতেছে, ছাগল বাঁধিতেছে, মুরগিকে ভাত খাওয়াইতেছে, বড় লোকেরা পাট শুকাইতেছে, বাঁশ কাটিতেছে—দেখিতে দেখিতে গাঁ পিছনে ছাড়িয়া একেবারে বাইরের মাঠ...বিলে জল থই থই করিতেছে.. উড়ি ধানের ক্ষেতে বক বসিয়া আছে. .নাল ফুলের পাতা ও ফুটন্ত ফুলে জল দেখা যায না।

খল্‌সেমাবির বিলের প্রান্তে ঘন সবুজ আউশ ধানের ক্ষেতেব উপবকার বৃষ্টিধৌত, ভাদ্রের আকাশের সুনীল প্রসার। সারা চক্রবাল জুড়িয়া সূর্যাস্তের অপরূপ বর্ণচ্ছটা, বিচিত্র রং-এর মেঘেব পাহাড়, মেঘের দ্বীপ, মেঘের সমুদ্র, মেঘের স্বপ্নপুরী...খোলা আকাশের সহিত এরকম পরিচয় তাহাব এতদিন হয় নাই, মাঠের পারের দূরের দেশটা এবার তাহার রহস্য-অবগুণ্ঠন খুলিল আট বছরের ছেলেটির কাছে।

যাইতে যাইতে বড় দেরি হইল। তাহার বাবা বলিল—তুমি বড্ড হাঁ-করা ছেলে, যা দ্যাখো তাতেই হাঁ করে থাকো কেন অমন? জোরে হাঁটো।

সন্ধ্যার পর তাহারা গন্তব্য স্থানে পৌছিল। শিষ্যেব নাম লক্ষ্মণ মহাজন, বেশ বড় চাষী ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাহিরের বড় আটচালা ঘরে মহা আদবে তাহাদের থাকিবার স্থান করিয়া দিল।

লক্ষ্মণ মহাজনের ছোটভাইয়ের স্ত্রী সকালে স্নান করিবার জন্য পুকুরের ঘাটে আসিয়াছে—জলে নামিতে গিয়া পুকুরের পাড়ে নজর পড়াতে সে দেখিল পুকুরপাড়ের কলাবাগানে একটি অচেনা ছোট ছেলে একখানি কঞ্চি হাতে কলাবাগানের একবার এদিক একবার ওদিক পায়চারি করিতেছে ও পাগলের মতো আপন মনে বকিতেছে। সে ঘড়া নামাইয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কাদের বাড়ি এসেছ, খোকা?

অপুর যত জারিজুরি তাহার মায়ের কাছে। বাহিরে সে বেজায় মুখচোরা।

প্রথমটা অপুর মাথায় আসিল যে টানিয়া দৌড় দেয়। পরে সংকুচিত সুরে বলিল—ওই ওদের বাড়ি—

বধূটি বলিল—বট্‌ঠাকুরদের বাড়ি? বট্‌ঠাকুরের গুরুমশায়ের ছেলে? ও!

বধূ সঙ্গে করিয়া তাহাকে নিজের বাড়িতে লইয়া গেল। তাহাদের বাড়ি পৃথক—লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়ি হইতে সামান্য দূরে, কিন্তু মধ্যে পুকুরটা পড়ে।

বধূর ব্যবহারে অপুর লাজুকতা কাটিয়া গেল। সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ঘরের জিনিসপত্র কৌতূহলের সহিত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ওঃ কত কি জিনিস!...তাহাদের বাড়িতে এ রকম জিনিস নাই। এরা খুব বড়লোক তো! কড়ির আল্‌না, রং-বেরং-এর ঝুলন্ত শিকা, পশমের পাখি,

কাঁচের পুতুল, মাটির পুতুল, শোলার গাছ—আরও কত কি!—দু-একটা জিনিস সে ভয়ে ভয়ে হাতে তুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল।

বধূ এতক্ষণ ভালো করিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখে নাই—কাছের গোড়ায় দেখিয়া মনে হইল যে, এ এখনও ভারি ছেলেমানুষ, মুখের ভাব যেন পাঁচ বছরের ছেলের মতো কচি। এমন সুন্দর অবোধ চোখের ভাব সে আর কোনো ছেলের চোখে এ পর্যন্ত দেখে নাই—এমন রং, এমন গড়ন, এমন সুন্দর মুখ, এমন তুলি দিয়া আঁকা ডাগর ডাগর নিষ্পাপ চোখ—অচেনা ছেলেটির উপর বধূর বড় মমতা হইল।

অপু বসিয়া নানা গল্প করিল—বিশেষ করিয়া কল্যকার রেলপথের কথাটি। খানিকটা পরে বধূ মোহনভোগ তৈয়ারি করিয়া খাইতে দিল। একটা বাটিতে অনেকখানি মোহনভোগ, এত ঘি দেওয়া যে আঙুলে ঘিয়ে মাখামাখি হইয়া যায়। অপু একটুখানি মুখে তুলিয়া খাইয়া অবাক হইয়া গেল—এমন অপূর্ব জিনিস আব সে কখনও খায় নাই তো!—মোহনভোগে কিস্‌মিস্‌ দেওয়া কেন? কই তাহার মায়ের তৈরি মোহনভোগে তো কিসমিস্‌ থাকে না? বাড়িতে সে মা'ব কাছে আবদার ধরে—মা, আজ আমাকে মোহনভোগ করে দিতে হবে! তাহার মা হাসিমুখে বলে—আচ্ছা ওবেলা তোকে করে দেবো—পরে সে শুধু সুজি জলে সিদ্ধ করিয়া একটু গুড় মিশাইয়া পুলটিসের মতো একটা দ্রব্য তৈয়ারি করিয়া কাঁসার সরপুরিয়া থালাতে আদর করিয়া ছেলেকে খাইতে দেয়। অপু তাহাই খুশির সহিত এতদিন খাইয়া আসিয়াছে, মোহনভোগ যে এরূপ হয় তাহা সে জানিত না। আজ কিন্তু তাহাব মনে হইল এ মোহনভোগে আর মায়ের তৈয়ারি মোহনভোগে আকাশ-পাতাল তফাত!. .সঙ্গে সঙ্গে মায়ের উপর করুণায় ও সহানুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। হয়তো তাহার মাও জানে না যে, এ রকমের মোহনভোগ হয়!—সে যেন আবছায়া ভাবে বুঝিল, তাহার মা গরিব, তাহারা গরিব—তাই তাহাদেব বাড়ি ভালো খাওয়া-দাওয়া হয় না।

একদিন পাড়ার এক ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর বাড়ি অপুর নিমন্ত্রণ হইল। দুপুর বেলা সে-বাড়ির একটি মেয়ে আসিয়া অপুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। ওদের রান্নাঘরের দাওয়ায় যত্ন করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া জল ছিটাইয়া অপুকে খাবার জায়গা করিয়া দিল। যে মেয়েটি অপুকে ডাকিতে আসিয়াছিল, নাম তার অমলা, বেশ টকটকে ফরসা রং, বড় বড় চোখ, বেশ মুখখানি, বয়স তার দিদির মতো। অমলার মা কাছে বসিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন, নিজের হাতের তৈয়ারি চন্দ্রপুলি পাতে দিলেন। খাওয়ার পরে অমলা তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ি দিয়া গেল। সেদিন বৈকালে খেলিতে খেলিতে অপুর পায়ের আঙুল হঠাৎ বাগানের বেড়ার দুই বাঁশের ফাঁকে পড়িয়া আটকাইয়া গেল। টাট্‌কা-চেরা নতুন বাঁশের বেড়া, আঙুল কাটিয়া রক্তারক্তি হইল, অমলা ছুটিয়া আসিয়া পা-খানা বাঁশের ফাঁক হইতে বাহির না করিলে গোটা আঙুলটাই কাটা পড়িত। সে চলিতে পারিতেছিল না, অমলা তাহাকে কোলে করিয়া গোলার পাশ হইতে পাথরকুচির পাতা তুলিয়া বাটিয়া আঙুলে বাঁধিয়া দিল। পাছে বাবার বকুনি খাইতে হয়, এই ভয়ে অপু একথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিল না।

সে রাত্রে শুইয়া অপু শুধু অমলারই স্বপ্ন দেখিল। সে অমলার কোলে বেড়াইতেছে, অমলার কাছে বসিয়া আছে, অমলার সঙ্গে খেলা করিতেছে, অমলা তাহার পায়ের আঙুলে পটি বাঁধিয়া দিতেছে, সে ও অমলা রেলরাস্তায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে—অমলার হাসিভরা চোখমুখ ঘুমের ঘোরে সারারাত নিজের কাছে কাছে। ভোরে সে শুধু খুঁজিতে লাগিল অমলা কখন আসে। আরও সব ছেলেমেয়েরা আসিল, খেলা আরম্ভ হইয়া গেল, ক্রমে বেশ বেলা হইল—কিন্তু অমলার দেখা নাই। বাড়ির ভিতর হইতে বধূ খাবার খাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইল—রোজ সকালে বিকালে বধূ নিজের হাতে খাবার তৈয়ারি করিয়া তাহাকে খাওয়াইত—খাওয়া শেষ করিয়া আসিবার সময় সে বধূকে জিজ্ঞাসা করিল—সকালে কি অমলাদিদি এসেছিল? না, সে আসে নাই। ক্রমে আরও বেলা হওয়াতে খেলা ভাঙিয়া গেল। তাহার বাবা তাহাকে স্নান করিবার জন্য ডাকিল। তবুও কোথায় অমলা?

অভিমানে তাহার মন ছাপাইয়া উঠিল, বেশ, নাই বা আসিল? অমলার সহিত তাহার জন্মের তো আড়ি—আর যদি সে কখনও তাহার সহিত কথা কয়! বৈকালেও খেলা আরম্ভ হইল, আর সকলেই আসিল—অমলা নাই। পাঁচ ছয়টি ছেলেমেয়ে খেলিতে আসিলেও অপুর মনে হইল, কাহার সহিত সে খেলিবে? কেহই উপযুক্ত খেলার সাথী বলিয়া মনে হইল না। উৎসাহহীন ভাবে সে খানিকক্ষণ খেলা করিল, তবুও অমলার দেখা নাই।

পরদিন সকালে অমলা আসিল। অপু কোনো কথা বলিল না। অমলা যেখানে বসে, সে তাহার ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না, অথচ মাঝে মাঝে আড়চোখে চাহিয়া দেখে, সে যে রাগ করিয়া এরূপ করিতেছে, অমলা তাহা বুঝিয়াছে কিনা। অমলা সত্যই প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই, পরে যখন সে বুঝিল যে, কিছু একটা হইয়াছে নিশ্চয়, তখন সে কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল--কি খোকা, কথা বলচো না কেন?...কি হয়েচে?

অপু অতশত বোঝে না, সে অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—কি হয়েচে বইকি! তা কিছু কি আর হয়েচে? কাল আসনি কেন?

অমলা অবাক হইয়া বলিল—আসিনি, তাই কি?—সেইজন্যে রাগ করেচ?

অপু ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল, ঠিক তাই। অমলা খিল্ খিল করিয়া হাসিয়া অপুকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিল বাড়ির ভিতর। সেখানে বধূ সব শুনিয়া প্রথমটা হাসিয়া খুন হইল, পরে মুখে হাসি টিপিয়া বলিল—তা হলে অমলা, তোমার আর এখন বাড়ি যাওয়ার জো নেই তো দেখ্‌চি—কি আর কর্‌বে, খোকা যখন তোমাকে ছাড়তে পারে না, তখন এখানেই থেকে যাও—আর না হয়—

বধূর কথার ভঙ্গিতে অমলা কি জানি কি একটা ঠাওরাইয়া লজ্জিত প্রতিবাদের সুরে বলিল—আচ্ছা যাও বৌদি—ও-রকম করলে কিন্তু কক্ষনো আর তোমাদের বাড়ি—

খানিকক্ষণ পরে অপু অমলার সঙ্গে তাহাদের বাড়ি গেল। অমলা তাহাদের আলমারি খুলিয়া কাঁচের বড় মেম-পুতুল, মোমের পাখি, গাছ, আরও কত-কি দেখাইল। কালীগঞ্জের স্নানযাত্রার মেলা হইতে সে-সব নাকি কেনা, অপু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল। নতুন নতুন খেলার জিনিস-—একটা রবারের বাঁদর, সেটা তুমি যেদিকে যাও, তোমার দিকে চাহিয়া চোখ পিট্‌পিট্ করিবে—একটা কিসের পুতুল, সেটার পেট টিপিলে দুহাতে মৃগীরোগীব মতো হঠাৎ হাত পা ছুঁড়িয়া খঞ্জনী বাজাইতে থাকে—সকলের চেয়ে আশ্চর্যের জিনিস হইতেছে একটা টিনের ঘোড়া, রানুদির কাকা তাহাদের বাড়ির দালানের ঘড়িতে যেমন দম দেয়, ওইরকম দম দিয়া ছাড়িয়া দিলে সেটা খড়্‌খড়্ করিয়া মেঝের উপর চলিতে থাকে—অনেক দূর যায়—ঠিক যেন একেবারে সত্যিকারের ঘোড়া। সেইটা দেখিয়া অপু অবাক হইয়া গেল। হাতে তুলিয়া বিস্ময়ের সহিত উলটাইয়া-পালটাইয়া দেখিয়া অমলার দিকে চাহিয়া বলিল—এ কি রকম ঘোড়া, বেশ তো! এ কোথা থেকে কেনা, এর দাম কত?

তাহার পর অমলা তাহাকে একটা সিঁদুরের কৌটা খুলিয়া দেখাইল—সেটার মধ্যে রাঙা রং-এর একখানা ছোট রাংতার মতো কি। অপু বলিল—ওটা কি? রাংতা?

অমলা হাসিয়া বলিল—রাংতা হবে কেন?—সোনার পাত দেখনি অপু?

অপু সোনার পাত দেখে নাই। সোনার রং কি অত রাঙা? সোনার পাতখানা নাড়িয়া চাড়িয়া ভালো করিয়া দেখিতে লাগিল। অমলার সহিত বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে সে ভাবিল—আহা, দিদিটার ও-সব খেলনা কিছুই নেই—মরে কেবল শুক্‌নো নাটাফল আর রড়ার বিচি কুড়িয়ে, আর শুধু পরের পুতুল চুরি করে মার খায়!...তাহার দিদির বয়সি অন্য কোনো মেয়ের খেল্‌নার ঐশ্বর্য কত বেশি, তাহা সে এ পর্যন্ত কোনো দিন দেখে নাই, আজ তুলনা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়া দিদির প্রতি অত্যন্ত করুণায় তাহার মনটা যেন গলিয়া গেল। তাহার পয়সা থাকিলে সে দিদিকে একটা কলের ঘোড়া কিনিয়া দিত—আর একটা রবারের বাঁদর...তুমি যেদিকে যাও, তোমার দিকে চাহিয়া সেটা চোখ পিট্‌পিট্ করে...

বধূর কাছে একজোড়া পুরানো তাস ছিল, ঠিক একজোড়া বলা চলে না, সেটা নানা জোড়া তাসের পরিত্যক্ত কাগজগুলি এক জায়গায় জড়ো করা আছে মাত্র—অপু সেগুলি লইয়া মধ্যে মধ্যে নাড়ে চাড়ে। রানুদির বাড়িতে মাঝে মাঝে দুপুরবেলা তাসের আড্ডা বসিত, সে বসিয়া বসিয়া খেলা দেখিত। টেক্কা, গোলাম, সাহেব, বিবি—কাগজ ধরা লইয়া মারামারি হয়—বেশ খেলা! সে তাস খেলিতে জানে না, তাহার মা দিদি কেহই জানে না। এক-এক দিন তাহার মা তাস খেলিতে যায়, তাহার মাকে লইয়া কেহ বসিতে চায় না, সকলে বলে, ও কিছু খেলা জানে না; এক এক দিন তাহার মা তাস খেলিতে বসে, এমন ভাব দেখায় যেন সে খুব পাকা খেলোয়াড়—খানিকক্ষণ পরেই কিন্তু ধরা পড়ে। কেউ বলে, ও বৌ, একি? এখানে টেক্কা মেরে বসলে যে! দেখলে না ও-হাতে রংয়ের গোলাম কাট্‌লে?—তোমার চোখের সামনে যে? তাহার মা তাড়াতাড়ি অজ্ঞতা ঢাকিতে যায়, হাসিয়া বলে, তাই তো! বড্ড তো ভুল হয়ে গেছে, ও ঠাকুরঝি, মোটেই তো মনে নেই। পরে সে আবার খেলিতে থাকে, মুখ টিপিয়া হাসে, এর ওর দিকে চায়, এমন ভাবটা দেখায় যে তাহার কাছে সকলের হাতের তাসের খবরই আছে, এবার একটা কিছু না করিয়া সে ছাড়িবে না—কিন্তু খানিকটা পরে একজন অবাক হইয়া বলিয়া উঠে—একি বৌমা, দেখি? ওমা আমার কি হবে! তোমার হাতে যে, এমন বিন্তি ছিল, দেখাওনি?—তাহার মা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বিজ্ঞের ভাব করিয়া বলে,—আছে, আছে, ওর মধ্যে একটা কথা আছে! ইচ্ছে করেই দেখাই নি। সে আসলে বিন্তি কিসে হয় সব জানে না—তাহার খেলুড়ে রাগ করিয়া বলে—ওর মধ্যে আবার কথাটা কি শুনি? এমন হাতটা নষ্ট কল্লে? দাও তুমি তাস সেজবৌকে, দাও, তোমার আর খেল্‌তে হবে না—ঢের হয়েছে। তাহার মা অপমান ঢাকিতে গিয়া আবার হাসে—যেন কিছুই হয় নাই, সবই ঠাট্টা, উহারা ঠাট্টা করিয়া বলিতেছে, সেও সেই ভাবেই লইতেছে।...

সে যদি একজোড়া তাস পায় তবে, সে, মা ও দিদি খেলে। খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা তাদের বাড়ির বনের ধারের দিকের সেই জানালাটা...যেটার কবাটগুলোর মধ্যে কি পোকায় কাটিয়া সরিষার মতো গুঁড়া করিয়া দিয়াছে...নাড়া দিলে ঝুর্‌ঝুর্ করিয়া ঝরিয়া পড়ে, পুরানো কাঠের গুঁড়ার গন্ধ বার হয়—জানালার ধারের বন থেকে দুপুরের হাওয়ায় গন্ধভেদালি লতার কটু গন্ধ আসে, রোয়াকের কালমেঘের গাছের জঙ্গলে দিদির পরিচিত কাঁচপোকাটা একবার ওড়ে, আবার বসে, আবার ওড়ে আবার বসে—নির্জন দুপুরে তারা তিনজনে সেই জানালাটির ধারে মাদুর পাতিয়া বসিয়া আপন মনে তাস খেলিবে। কিসে কিসে বিন্তি হয় তাদের নাই-বা থাকিল জানা, তাদের খেলায় বিন্তি না দেখাইতে পারিলেও চলিবে—সেজন্য কেহ কাহাকেও উঠাইয়া দিবে না, কোন অপমানের কথা বলিবে না, কোন হাসি-বিদ্রূপ করিবে না, যে যেরূপ পারে সেইরূপই খেলিবে। খেলা লইয়া কথা—নাই বা হইল বিন্তি দেখানো!

সন্ধ্যার পরে বধূর ঘরে অপুর নিমন্ত্রণ ছিল। খাইতে বসিয়া খাবার জিনিসপত্র ও আয়োজনের ঘটা দেখিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। ছোট একখানা ফুলকাটা রেকাবিতে আলাদা করিয়া নুন ও নেবু কেন? নুন নেবু তো মা পাতেই দেয়। প্রত্যেক তরকারির জন্যে খাবার আলাদা আলাদা বাটি!—তরকারিই বা কত! অত বড় গল্‌দা চিংড়ির মাথাটা কি তাহার একার জন্য?

লুচি! লুচি! তাহার ও তাহার দিদির স্বপ্নকামনার পারে এক রূপকথার দেশের নীল-বেলা আবছায়া দেখা যায়...কত রাতে, দিনে, ওলের ডাঁটাচচ্চড়ি ও লাউ-ছেঁচকি দিয়া ভাত খাইতে খাইতে, কত জল-খাবার-খাওয়া-শূন্য সকালে বিকালে, অন্যমনস্ক মন হঠাৎ লুব্ধ উদাস গতিতে ছুটিয়া চলে সেখানে—যেখানে গরম রোদে দুপুরবেলা তাহাদের পাড়ার পাকা রাঁধুনী বীরু রায় গামছা কাঁধে ঘুরিয়া বেড়ায়, সদ্য তৈয়ারি বড় উনুনের উপর বড় লোহার কড়াই-এ ঘি চাপানো থাকে, লুচি-ভাজার অপূর্ব সুধা-রুচি-ঘ্রাণ আসে, কত ছেলেমেয়ে ভালো কাপড়-জামা পরিয়া যাতায়াত করে, গাঙ্গুলি বাড়ির বড় নাটমন্দির ও জলপাই-তলা বিছাইয়া গ্রীষ্মের দিনে শতরঞ্চ পাতা হয়, একদিন

মাত্র বছরে সে দেশের ঠিকানা খুঁজিয়া মেলে—সেই চৈত্র বৈশাখ মাসে রামনবমী দোলের দিনটা—তাহাদের সেদিন নিমন্ত্রণ থাকে ওপাড়ার গাঙ্গুলি বাড়ি। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সে সুদিনের উদয় হইল কি করিয়া! খাইতে বসিয়া বার বার তাহার মনে হইতেছিল, আহা, তাহার দিদি এ রকম খাইতে পায় নাই কখনও!

পরদিন সকালে আবার খেলা আরম্ভ হইল। অমলা আসিতেই অপু ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল—আমি আর অমলাদি একদিকে, আর তোমরা সব একদিকে—

খানিকটা খেলা হইবার পর অপুর মনে হইল অমলা তাহাকে দলে পাওয়ার অপেক্ষা বিশুকে দলে পাইতে বেশি ইচ্ছুক। ইহার প্রকৃত কারণ অপু জানিত না—অপু একেবারে কাঁচা খেলুড়ে, তাহাকে দলে লওয়ার মানেই পরাজয়—বিশু ডান্‌পিটে ছেলে, তাহাকে দৌড়িয়া ধরা কি খেলায় হারানো সোজা নয়। একবার অমলা স্পষ্টই বিরক্তি প্রকাশ করিল। অপু প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল যাহাতে সে জেতে, যাহাতে অমলা সন্তুষ্ট হয়—কিন্তু বিস্তর চেষ্টা সত্ত্বেও সে আবার হারিয়া গেল।

সে-বার দল গঠন করিবার সময় অমলা ঝুঁকিল বিশুর দিকে।

অপুর চোখে জল ভরিয়া আসিল। খেলা তাহার কাছে হঠাৎ বড় বিস্বাদ মনে হইল—অমলা বিশুর দিকে ফিরিয়া সব কথা বলিতেছে, হাসিখুশি সবই তাহার সঙ্গে। খানিকটা পরে বিশু কি কাজে বাড়ি যাইতে চাহিলে অমলা তাহাকে বার বার বলিল যে, সে যেন আবার আসে। অপুর মনে অত্যন্ত ঈর্ষা হইল, সারা সকালটা একেবারে ফাঁকা হইয়া গেল! পরে সে মনে মনে ভাবিল—বিশু খেলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে—গেলে খেলার খেলুড়ে কমে যাবে, তাই অমলাদি ওইরকম বল্‌চে, আমি গেলে আমাকেও বলবে, ওর চেয়েও বেশি বল্‌বে। হঠাৎ সে চলিয়া যাইবার ভান করিয়া বলিল—বেলা হয়ে যাচ্ছে, আমি যাই, নাইবো।

অমলা কোনো কথা বলিল না, কেবল কামারদের ছেলে নাড়ুগোপাল বলিল—আবার ও-বেলা এসো ভাই!

অপু খানিক দূর গিয়া একবার পিছনে চাহিল—তাহাকে বাদ দিয়া কাহারও কোনো ক্ষতি হয় নাই, পুরাদমে খেলা চলিতেছে, অমলা মহা উৎসাহে খুঁটির কাছে বুড়ি হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না।

অপু আহত হইয়া অভিমানে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল, কাহারও সঙ্গে কোনো কথা বলিল না। ভারি তো অমলাদি! না চাহিল তাহাকে—তাতেই বা কি?...

দিন দুই পরে হরিহর ছেলেকে লইয়া বাড়ি আসিল।

এই মোটে কয়দিন, এরই মধ্যে সর্বজয়া ছেলেকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারিতেছিল না।

দুর্গার খেলা কয়দিন হইতে ভালোরকম জমে নাই, অপুর বিদেশ-যাত্রার দিনকতক আগে দেশী কুমড়ার শুকনো খোলার নৌকা লইয়া ঝগড়া হওয়াতে দুজনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—এখন আরও অনেক কুমড়ার খোলা জমিয়াছে, দুর্গা কিন্তু আর সেগুলি জলে ভাসাইতে যায় না—কেন মিছিমিছি এ নিয়ে ঝগড়া করে তার কান ম'লে দিলাম? আসুক সে ফিরে, আর কক্ষনো তার সঙ্গে ঝগড়া নয়, সব খোলা সে-ই নিয়ে নিক্।

বাড়ি আসিয়া অপু দিন পনেরো ধরিয়া নিজের অদ্ভুত ভ্রমণকাহিনী বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত আশ্চর্য জিনিস সে দেখিয়াছে এই কয়দিনে! রেলের রাস্তা, যেখান দিয়া সত্যিকারের রেলগাড়ি যায়! মাটির আতা, পেঁপে, শসা—অবিকল যেন সত্যিকার ফল! সেই পুতুলটা, যেটার পেট টিপিলে মৃগীরোগীর মতো হাত-পা ছুঁড়িয়া হঠাৎ খঞ্জনী বাজাইতে শুরু করে! অমলাদি! কতদূর যে সে গিয়াছিল, কত পদ্মফুলে ভরা বিল, কত অচেনা নতুন গাঁ পার হইয়া কত মাঠের উপরকার নির্জন

পথ বাহিয়া, সেই যে কোন্ গাঁয়ে পথের ধারের কামার-দোকানে বাবা তাহাকে জল খাওয়াইতে লইয়া গেলে, তাহারা তাহাকে বাড়ির মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গিয়া যত্ন করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া দুধ, চিঁড়ে, বাতাসা খাইতে দিয়াছিল! কোন্‌টা ফেলিয়া সে কোন্‌টার গল্প করে!

রেলরাস্তার গল্প শুনিয়া তাহার দিদি মুগ্ধ হইয়া যায়, বার বার জিজ্ঞাসা করে—কত বড় নোয়াগুনো দেখলি অপু? তার টাঙানো বুঝি? খুব লম্বা? রেলগাড়ি দেখতে পেলি? গেল?

না—রেলগাড়ি অপু দেখে নাই। ওইটাই কেবল বাদ পড়িয়াছে—সে শুধু বাবার দোষে। মোটে ঘণ্টা চার-পাঁচ রেলরাস্তার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই রেলগাড়ি দেখা যাইত—কিন্তু বাবাকে সে কিছুতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারে নাই।

বেলা হইয়া যাওয়াতে ব্যস্ত অবস্থায় সর্বজয়া তাড়াতাড়ি অন্যমনস্কভাবে সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া উঠানে পা দিতেই কি যেন একটা সরু দড়ির মতো বুকে আটকাইল ও সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা পটাং করিয়া ছিঁড়িয়া যাইবার শব্দ হইল এবং দুদিক হইতে দুটা কি, উঠানে ঢিলা হইয়া পড়িয়া গেল। সমস্ত কার্যটি চক্ষের নিমেষে হইয়া গেল, কিছু ভালো করিয়া দেখিবার কি বুঝিবার পূর্বেই।

অল্পখানিক পরেই অপু বাড়ি আসিল। দরজা পার হইয়া উঠানে পা দিতেই সে থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া গেল—নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না—এ কি! বা রে, আমার টেলিগিরাপের তার ছিঁড়লে কে?

ক্ষতির আকস্মিকতায় ও বিপুলতায় প্রথমটা সে কিছু ঠাহর করিতে পারিল না। পরে একটু সামলাইয়া লইয়া চাহিয়া দেখিল উঠানের মাটিতে ভিজা পায়ের দাগ এখনও মিলায় নাই। তাহার মনের ভিতর হইতে কে ডাকিয়া বলিল—মা ছাড়া আর কেউ নয়। কক্‌খনো আর কেউ নয়, ঠিক মা। বাড়ি ঢুকিয়া সে দেখিল মা বসিয়া বসিয়া বেশ নিশ্চিন্ত মনে কাঁঠালবীচি ধুইতেছে। সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল এবং যাত্রা দলের অভিমন্যুর মতো ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বাঁশির সপ্তমের মতো রিন্‌রিনে তীব্র মিষ্টসুরে কহিল—আচ্ছা মা, আমি কষ্ট করে ছোটাগুলো বুঝি বন বাগান ঘেঁটে নিয়ে আসি নি?

সর্বজয়া পিছনে চাহিয়া বিস্মিতভাবে বলিল—কি নিয়ে এসেচিস্? কি হয়েচে—

—আমার বুঝি কষ্ট হয় না? কাঁটায় আমার হাতপা ছড়ে যায় নি বুঝি?

—কি বলে পাগলের মতো? হয়েচে কি?

—কি হয়েচে! আমি এত কষ্ট করে টেলিগিরাপের তার টাঙালাম আর ছিঁড়ে দেওয়া হয়েচে না?

—তুমি যত উদ্‌ঘুট্টি কাণ্ড ছাড়া তো এক দণ্ড থাকো না বাপু!—পথের মাঝখানে কি টাঙানো রয়েচে—কি জানি টেলিগিরাপ কি কি-গিরাপ, আসচি তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে গেল—তা এখন কি করবো বলো—

পরে সে পুনরায় নিজ কাজে মন দিল।

উঃ! কি ভীষণ হৃদয়হীনতা! আগে আগে সে ভাবিত বটে যে, তাহার মা তাহাকে ভালোবাসে। অবশ্য যদিও তাহার সে ভ্রান্ত ধারণা অনেকদিন ঘুচিয়া গিয়াছে—তবুও মাকে এতটা নিষ্ঠুর পাষাণীরূপে কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। কাল সারাদিন কোথায় নীলমণি জেঠার ভিটা, কোথায় পালিতদের বড় আমবাগান, কোথায় প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের বাঁশবন—ভয়ানক ভয়ানক জঙ্গলে একা ঘুরিয়া বহু কষ্টে উঁচু ডাল হইতে দোলানো গুলঞ্চলতা কত কষ্টে জোগাড় করিয়া সে আনিল, এখুনি রেল-রেল খেলা হইবে, সব ঠিকঠাক, আর কি না...

হঠাৎ সে মাকে একটা খুব কড়া, খুব রূঢ়, খুব একটা প্রাণ-বিঁধানো কথা বলিতে চাহিল—এবং খানিকটা দাঁড়াইয়া বোধ হয় অন্য কিছু ভাবিয়া না পাইয়া আগের চেয়েও তীব্র নিখাদে বলিল—আমি আজ ভাত খাবো না যাও—কখ্‌খনো খাবো না—

তাহার মা বলিল—না খাবি না খাবি যা—ভাত খেয়ে একেবারে রাজা করে দেবেন কিনা? এদিকে তো রান্না নামাতে তর সয় না—না খাবি যা, দেখবো ক্ষিদে পেলে কে খেতে দ্যায়?

ব্যস্! চক্ষের পলকে—সব আছে, আমি আছি তুমি আছ—সেই তাহার মা কাঁটালবীচি ধুইতেছে—কিন্তু অপু কোথায়? সে যেন কর্পূরের মতো উবিয়া গেল! কেবল ঠিক সেই সময়ে দুর্গা বাড়ি ঢুকিতে দরজার কাছে তাহাকে পাশ কাটাইয়া ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া বিস্মিত সুরে ডাকিয়া বলিল—ও অপু, কোথায় যাচ্ছিস্ অমন করে, কি হয়েচে, ও অপু শোন—

তাহার মা বলিল—জানিনে আমি, যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড বাপু তোমাদের, হাড় মাস কালি হয়ে গেল—কি এক পথের মাঝখানে টাঙিয়ে রেখেচে, আসচি, ছিঁড়ে গেল—তা এখন কি হবে? আমি কি ইচ্ছে করে ছিঁড়িচি? তাই ছেলের রাগ—আমি ভাত খাবো না—না খাস্ যা, ভাত খেয়ে সব একেবারে স্বগ্‌গে ঘণ্টা দেবে কিনা তোমরা?

মাতাপুত্রের এরূপ অভিমানের পালায় দুর্গাকেই মধ্যস্থ হইতে হয়—সে অনেক ডাকাডাকির পরে বেলা দুইটার সময় ভাইকে খুঁজিয়া বাহির করিল। সে শুষ্কমুখে উদাসনয়নে ও-পাড়ার পথে রায়েদের বাগানে পড়ন্ত আমগাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া ছিল।

বৈকালে যদি কেহ অপুদের বাড়ি আসিয়া তাহাকে দেখিত তবে সে কখনই মনে করিতে পারিত না যে, এ সেই অপু—যে আজ সকালে মায়ের উপর অভিমান করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছিল। উঠানের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত তার টাঙানো হইয়া গিয়াছে। অপু বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল, কিছুই বাকি নাই, ঠিক যেন একবারে সত্যিকার বেলরাস্তার তার।

সে সতুদের বাড়ি গিয়া বলিল—সতুদা, আমি টেলিগিরাপের তার টাঙিয়ে রেখেচি আমাদের বাড়িব উঠানে, চল রেল-বেল খেলা করি—আসবে?

—তার কে টাঙিয়ে দিল রে?

—আমি নিজে টাঙালাম। দিদি ছোটা এনে দিয়েছিল—

সতু বলিল—তুই খেল্‌গে যা, আমি এখন যেতে পাববো না—

অপু মনে মনে বুঝিল, বড় ছেলেদের ডাকিযা দল বাঁধিযা খেলার জোগাড় করা তাহাব কর্ম নয়। কে তাহাব কথা শুনিবে? তবুও আর একবার সে সতুর কাছে গেল। নিরাশ মুখে রোয়াকেব কোণটা ধরিয়া নিরুৎসাহভাবে বলিল—চল না সতুদা, যাবে? তুমি আমি আর দিদি খেলবো এখন? পরে সে প্রলোভনজনক ভাবে বলিল—আমি টিকিটের জন্যে এতগুলো বাতাবি নেবুব পাতা তুলে এনে রেখেচি। সে হাত ফাঁক করিয়া পরিমাণ দেখাইল।—যাবে?

সতু আসিতে চাহিল না। অপু বাহিরে বড় মুখ-চোরা, সে আর কিছু না বলিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেল। দুঃখে তাব চোখে প্রায় জল আসিতেছিল—এত করিয়া বলিতেও সতুদা শুনিল না!

পরদিন সকালে সে ও তাহার দিদি দুজনে মিলিয়া ইট দিয়া একটা বড় দোকানঘর বাঁধিয়া জিনিসপত্রের জোগাড়ে বাহির হইল। দুর্গা বনজঙ্গলে উৎপন্ন দ্রব্যের সন্ধান বেশি রাখে—দুজনে মিলিয়া নোনাপাতার পান, মেটে আলু, ফলের আলু, রাধালতা ফুলের মাছ, তেলাকুচির পটল, চিচ্চিড়ের বরবটি, মাটির ঢেলার সৈন্ধব লবণ—আরও কত কি সংগ্রহ করিয়া আসিয়া দোকান সাজাইতে বড় বেলা করিয়া ফেলিল। অপু বলিল—চিনি কিসের কর্‌বি রে দিদি?

দুর্গা বলিল—বাঁশতলার পথে সেই ঢিবিটায় ভালো বালি আছে—মা চাল-ভাজা ভাজবার জন্যে আনে! সেই বালি চল্ আনি গে—সাদা চক্ চক্ করচে—ঠিক একেবারে চিনি—

বাঁশবনে চিনি খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা পথের ধারের বনের মধ্যে ঢুকিল। খুব উঁচু একটা বন, চটকা গাছের আগ্‌ডালে একটা বড় লতার ঘন সবুজ আড়ালে, টুকটুকে রাঙা, বড় বড় সুগোল কি ফল দুলিতেছে। অপু ও দুর্গা দুজনেই দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। অনেক চেষ্টায় গোটা কয়েক ফল

নিচের দিকে লতার খানিকটা অংশ ছিঁড়িয়া তলায় পড়িতেই মহা আনন্দে দুজনে একসঙ্গে ছুটিয়া গিয়া সেগুলিকে মাটি হইতে তুলিয়া লইল।

পাকা ফল মোটে তিনটি। প্রধানত বিপণি-সজ্জার উদ্দেশ্যেই তাহা দোকানে এরূপ ভাবে রক্ষিত হইল যে, খরিদ্দার আসিলে প্রথমেই যেন নজরে পড়ে। পুরাদমে বেচাকেনা আরম্ভ হইয়া গেল। দুর্গা নিজেই পান কিনিয়া দোকানের পান প্রায় ফুরাইয়া ফেলিল। খেলা খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় সদর দরজা দিয়া সতুকে ঢুকিতে দেখিয়া অপু মহা আনন্দে তাহাকে আগাইয়া আনিতে দৌড়িয়া গেল—ও সতুদা, দ্যাখো না কি রকম দোকান হয়েচে, কেমন ফল দ্যাখো। আমি আর দিদি পেড়ে আন্‌লাম—কি ফল বলো দিকি? জানো?

সতু বলিল—ও তো মাকাল ফল—আমাদের বাগানে ক-ত ছিল!

সতু আসিতে অপু যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। সতুদা তাহাদের বাড়িতে তো বড় একটা আসে না—তা ছাড়া সতুদা বড় ছেলেদের দলের চাঁই। সে আসাতে খেলার ছেলেমানুষিটুকু যেন ঘুচিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পুরা মরসুমে খেলা চলবার পর দুর্গা বলিল—ভাই আমাকে দুমণ চাল দাও, খুব সরু, কাল আমার পুতুলের বিয়ের পাকা দেখা, অনেক লোক খাবে—

সতু বলিল—আমাদের বুঝি নেমন্তন্ন, না?

দুর্গা মাথা দুলাইয়া বলিল—না বই কি! তোমরা তো হলে কনে-যাত্রী—কাল সকালে এসে নকুতো করে নিয়ে যাবো—সতুদা, রানুকে বল্‌বে আজ রাত্তিরে যেন একটু চন্দন বেটে রাখে। কাল সকালে নিয়ে আস্‌বো—

দুর্গার কথা ভালো কবিয়া শেষ হয় নাই এমন সময় সতু দোকানে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত পণ্যেব মধ্য হইতে কি-একটা তুলিয়া লইয়া হঠাৎ দৌড় দিয়া দরজার দিকে ছুটিল—সঙ্গে সঙ্গে অপুও, ওরে দিদি রে—নিয়ে গেল রে—বলিয়া তাহার রিন্‌রিনে তীব্র মিষ্ট গলায় চিৎকার করিতে করিতে তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল।

বিস্মিত দুর্গা ভালো করিয়া ব্যাপাবটা কি বুঝিবার আগেই সতু ও অপু দৌড়াইয়া দরজার বাহির হইয়া চলিয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে খেলাঘরের দিকে চোখ পড়িতেই দুর্গা দেখিল, সেই পাকা মাকাল ফল তিনটির একটিও নাই!...

দুর্গা একছুটে দরজার কাছে আসিয়া দেখিল, সতু গাবতলার পথে আগে আগে ও অপু তাহা হইতে অল্প নিকটে পিছু পিছু ছুটিতেছে। সতুর বয়স অপুর চেয়ে তিন চার বৎসরের বেশি, তাহা ছাড়া সে অপুর মতো ওরকম ছিপছিপে মেয়েলি গড়নের ছেলে নয়—বেশ জোরালো হাত-পা-ওয়ালা ও শক্ত—তাহার সহিত ছুটিয়া অপুর পারিবার কথা নহে—তবুও যে সে ধরি-ধরি করিয়া তুলিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে সতু ছুটিতেছে পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া এবং অপু ছুটিতেছে প্রাণের দায়ে।

হঠাৎ দুর্গা দেখিল যে সতু ছুটিতে ছুটিতে পথে একবারটি যেন নিচু হইয়া পিছনে ফিরিয়া চাহিল—সঙ্গে সঙ্গে অপুও হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল—সতু ততক্ষণ ছুটিয়া দৃষ্টির বাহির হইয়া চাল্‌তেতলার পথে গিয়া পড়িয়াছে।

দুর্গা ততক্ষণে দৌড়িয়া গিয়া অপুর কাছে পৌছিল। অপু একদম চোখ বুজিয়া একটু সামনের দিকে নিচু হইয়া ঝুঁকিয়া দুই হাতে চোখ রগড়াইতেছে—দুর্গা বলিল—কি হয়েছে রে অপু?

অপু ভালো করিয়া চোখ না চাহিয়াই যন্ত্রণার সুরে দু'হাত দিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল—সতুদা চোখে ধুলো ছুঁড়ে মেরেচে দিদি—চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না রে—

দুর্গা তাড়াতাড়ি অপুর হাত নামাইয়া বলিল—সর্ সর্ দেখি—ওরকম করে চোখ রগড়াস নে, দেখি?—

অপু তখনই দু'হাত আবার চোখে উঠাইয়া আকুল সুরে বলিল—উঁহু ও দিদি—চোখের মধ্যে কেমন হচ্ছে—আমার চোখ কানা হয়ে গিয়েচে দিদি—

—দেখি দেখি ওরকম করে চোখে হাত দিস্‌নে—সর্—পরে সে কাপড়ে ফুঁ পাড়িয়া চোখে ভাপ দিতে লাগিল। কিছু পরে অপু একটু একটু চোখ মেলিয়া চাহিতে লাগিল—দুর্গা তাহার চোখের পাতা তুলিয়া অনেকবার ফুঁ দিয়া বলিল—এখন বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছিস?—আচ্ছা তুই বাড়ি যা...আমি ওদের বাড়ি গিয়ে ওর মাকে আর ঠাক্‌মাকে সব বলে দিয়ে আসচি—রানুকেও বল্‌বো—আচ্ছা দুষ্টু ছেলে তো—তুই যা আমি আসছি এখ্‌খুনি—

রানুদের খিড়্‌কি দরজা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া দুর্গা কিন্তু আর যাইতে সাহস করিল না। সেজঠাক্‌রুনকে সে ভয় করে। খানিকক্ষণ খিড়্‌কির কাছে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিয়া সে বাড়ি ফিরিল। সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া সে দেখিল অপু দরজার বাম ধারের কবাটখানি একটুখানি সামনে ঠেলিয়া দিয়া তাহারই আড়ালে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। সে ছিঁচকাঁদুনে ছেলে নয়, বড় কিছুতেই সে কখনও কাঁদে না—রাগ করে, অভিমান করে বটে, কিন্তু কাঁদে না। দুর্গা বুঝিল আজ তাহার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে, অত সাধের ফলগুলি গেল...তাহা ছাড়া আবার চোখে ধুলা দিয়া এরূপ অপমান করিল! অপুর কান্না সে সহ্য করিতে পারে না—তাহার বুকের মধ্যে কেমন যেন করে।

সে গিয়া ভাইয়ের হাত ধরিল—সান্ত্বনার সুরে বলিল—কাঁদিস নে অপু—আয় তোকে আমার সেই কড়িগুলো সব দিচ্চি—আয়—চোখে কি আর ব্যথা বাড়চে?...দেখি, কাপড়খানা বুঝি ছিঁড়ে ফেলেচিস?

খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা অপু কোথাও বাহির না হইয়া ঘরে থাকে। অনেকদিনের জীর্ণ পুরাতন কোঠা-বাড়ির পুরাতন ঘর। জিনিসপত্র, কাঠের সেকালের সিন্দুক, কটা রং-এর সেকালের বেতের প্যাঁট্‌রা, কড়ির আল্‌না, জলচৌকিতে ঘর ভরানো। এমন সব বাক্স আছে যাহা অপু কখনও খুলিতে দেখে নাই, তাহাতে রক্ষিত এমন সব হাঁড়ি-কলসি আছে, যাহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

সব-সুদ্ধ মিলিয়া ঘরটিতে পুরানো জিনিসের কেমন একটা পুরানো পুরানো গন্ধ বাহির হয়—সেটা কিসের গন্ধ সে জানে না, কিন্তু সেটা যেন বহু অতীত কালের কথা মনে আনিয়া দেয়। সে অতীত দিনে অপু ছিল না, কিন্তু এই কড়ির আলনা ছিল, ওই ঠাকুরদাদার বেতের ঝাঁপিটা ছিল, ওই বড় কাঠের সিন্দুকটা ছিল, ওই যে সোঁদালি গাছের মাথা বনের মধ্যে হইতে বাহির হইয়া আছে, ওই পোড়াজঙ্গলে-ভরা জায়গাটাতে কাহাদের বড় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, আরও কত নামের কত ছেলেমেয়ে একদিন এই ভিটাতে খেলিয়া বেড়াইত, কোথায় তারা ছায়া হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে, কতকাল আগে!

যখন একা ঘরে থাকে, মা ঘাটে যায়—তখন তাহার অত্যন্ত লোভ হয় ওই বাক্সটা, বেতের ঝাঁপিটা খুলিয়া দিনের আলোয় বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে কি অদ্ভুত রহস্য উহাদের মধ্যে গুপ্ত আছে। ঘরের আড়ার সর্বোচ্চ তাকে কাঠের বড় বারকোশে যে তালপাতার পুঁথির স্তূপ ও খাতাপত্র আছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিল সেগুলি তাহার ঠাকুরদাদা রামচাঁদ তর্কালঙ্কারের—তাহার বড় ইচ্ছা ওইগুলি যদি হাতের নাগালে ধরা দেয়, তবে সে একবার নিচে নামাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে। এক-একদিন বনের ধারে জানালাটায় বসিয়া দুপুরবেলা সে সেই ছেঁড়া কাশীদাসের মহাভারতখানা লইয়া পড়ে, সে নিজেই খুব ভালো পড়িতে শিখিয়াছে, আগেকার মতো আর মুখে শুনিতে হয় না, নিজেই জলের মতো পড়িয়া যায় ও বুঝিতে পারে। পড়াশুনায় তাহার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, তাহার বাবা মাঝে মাঝে তাহাকে গাঙ্গুলিবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধদের মজলিশে লইয়া যায়, রামায়ণ কি পাঁচালী পড়িতে দিয়া বলে, পড়ো তো বাবা, এঁদের একবার শুনিয়ে দাও তো? বৃদ্ধেরা খুব তারিফ করেন, দীনু চাটুজ্যে বলেন—আর আমার নাতিটা, এই তোমার খোকারই

বয়স হবে, দুখানা বর্ণপরিচয় ছিঁড়লে বাপু, শুনলে বিশ্বাস করবে না, এখনও ভালো করে অক্ষর চিনলে না—বাপের ধারা পেয়ে বসে আছে—ওই যে-কদিন আমি আছি রে বাপু, চক্ষু বুজলেই লাঙলের মুঠো ধরতে হবে। পুত্রগর্বে হরিহরের বুক ভরিয়া যায়। মনে মনে ভাবে—ও কি তোমাদের হবে? কল্মে তো চিরকাল সুদের কারবার!—হলামই বা গরিব, হাজার হোক পণ্ডিত-বংশ তো বটে, বাবা মিথ্যেই তালপাতা ভরিয়ে ফেলেন নি পুঁথি লিখে, বংশে একটা ধারা দিয়ে গিয়েছেন, সেটা যাবে কোথায়?

তাহাদের ঘরের জানলার কয়েক হাত দূরেই বাড়ির পাঁচিল এবং পাঁচিলের ওপাশ হইতেই পাঁচিলের গা ঘেঁষিয়া কি বিশাল আগাছার জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে! জানালায় বসিয়া শুধু চোখে পড়ে সবুজ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ভাঁট্‌শেওড়া গাছের মাথাগুলো, এগাছে ওগাছে দোদুল্যমান কত রকমের লতা, প্রাচীন বাঁশঝাড়ের শীর্ষ বয়সের ভারে যেখানে সোঁদালি, বন-চালতা গাছের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার নিচের কালো মাটির বুকে খঞ্জন পাখির নাচ! বড় গাছপালার তলায় হলুদ, বনকচু, কটু ওলের ঘন সবুজ জঙ্গল ঠেলাঠেলি করিয়া সূর্যের আলোর দিকে মুখ ফিরাইতে প্রাণপণ করিতেছে, এই জীবনের যুদ্ধে যে গাছটা অপারগ হইয়া গর্বদৃপ্ত প্রতিবেশীর আওতায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে, তাহার পাতাগুলি বিবর্ণ, মৃত্যুপাণ্ডুর ডাঁটা গলিয়া আসিল,—মরণাহত দৃষ্টির সম্মুখে শেষ-শরতের বন-ভরা পরিপূর্ণ ঝলমলে রৌদ্র, পরগাছার ফুলের আকুল আর্দ্র সুগন্ধ মাখানো পৃথিবীটা তাহার সকল সৌন্দর্য-রহস্য, বিপুলতা লইয়া ধীরে ধীরে আড়ালে মিলাইয়া চলিয়াছে।

তাহাদের বাড়ির ধার হইতে এ বনজঙ্গল একদিকে সেই কুঠির মাঠ, অপর দিকে নদীর ধার পর্যন্ত একটানা চলিয়াছে। অপুর কাছে এ বন অফুরন্ত ঠেকে, সে দিদির সঙ্গে কতদূর এ বনের মধ্যে তো বেড়াইয়াছে, বনের শেষ দেখিতে পায় নাই—শুধু এইরকম তিত্তিরাজ গাছের তলা দিয়া পথ, মোটা মোটা গুলঞ্চলতা-দুলানো থোলো থোলো বনচালতার ফল চারিধারে। সুঁড়ি পথটা একটা আমবাগানে আসিয়া শেষ হয়, আবার এগাছের ওগাছের তলা দিয়া বন-কলমি, নাটা-কাঁটা, ময়না-ঝোপের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে কোথায় কোন্ দিকে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে, শুধুই বন-ধুঁধুলের লতা কোথায় সেই ত্রিশূন্যে দোলে, প্রাচীন শিরীষ গাছের শ্যাওলা-ধরা ডালের গায়ে পরগাছার ঝাড় নজরে আনে!

এই বন তার শ্যামলতার নবীন স্পর্শটুকু তার আর তার দিদির মনে বুলাইয়া দিয়াছিল। জন্মিয়া অবধি এই বন তাহাদের সুপরিচিত, প্রতি পলের প্রতিমুহূর্তের নীরব আনন্দে তাহাদের পিপাসুহৃদয় কত বিচিত্র, কত অপূর্ব রসে ভরিয়া তোলে। বর্ষাসতেজ, ঘন সবুজ ঝোপের মাথায় নাটা-কাঁটার সুগন্ধ ফুলের হলুদ রং-এর শিষ, আসন্ন সূর্যাস্তের ছায়ায় মোটা ময়না-কাঁটা ডালের আগায় কাঠবিড়ালীর লঘুগতি আসাযাওয়া, পত্রপুষ্পফলের সে প্রাচুর্য সবাকার অপেক্ষা যখন ঘন বনের প্রান্তবর্তী, ঝোপঝাপের সঙ্গীহীন বাঁকা ডালে বনের কোনো অজানা পাখি বসিয়া থাকে, তখন তাহার মনের বিচিত্র, অপূর্ব, গভীর আনন্দরসের বর্ণনা সে মুখে বলিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। সে যেন স্বপ্ন, যেন মায়া, চারিপাশ ঘিরিয়া পাখি গান গায়, ঝুর ঝুর করিয়া ঝরিয়া ফুল পড়ে, সূর্যাস্তের আলো আরও ঘন ছায়াময় হয়।

এই বনের মধ্যে কোথায় একটা মজা পুরানো পুকুর আছে, তারই পাড়ে যে ভাঙা মন্দিরটা আছে, আজকাল যেমন পঞ্চানন্দ ঠাকুর গ্রামের দেবতা, কোনো সময় ওই মন্দিরের বিশালাক্ষী দেবী সেই রকম ছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রামের মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠিত দেবতা, এক সময়ে কি বিষয়ে সফলমনস্কাম হইয়া তাঁহারা দেবীর মন্দিরে নরবলি দেন, তাহাতে রুষ্টা হইয়া দেবী স্বপ্নে জানাইয়া যান যে তিনি মন্দির পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, আর কখনও ফিরিবেন না। অনেক কালের কথা, বিশালাক্ষীর পূজা হইতে দেখিয়াছে এরূপ কোনো লোক আর জীবিত নাই, মন্দির ভাঙিয়া চুরিয়া গিয়াছে, মন্দিরের সম্মুখের পুকুর মজিয়া ডোবায় পরিণত হইয়াছে, চারিধার বনে ছাইয়া ফেলিয়াছে, মজুমদার বংশেও বাতি দিতে আর কেহ নাই।

কেবল—সেও অনেকদিন আগে—গ্রামের স্বরূপ চক্রবর্তী ভিন-গাঁ হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিতেছিলেন—সন্ধ্যার সময় নদীর ঘাটে নামিয়া আসিতে পথের ধারে দেখিলেন একটি সুন্দরী ষোড়শী মেয়ে দাঁড়াইয়া। স্থানটি লোকালয় হইতে দূরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পথে কেহ কোথাও নাই, এ সময় নিরালা বনের ধারে একটি অল্পবয়সি সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া স্বরূপ চক্রবর্তী দস্তুরমতো বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তিনি কোনো কথা কহিবার পূর্বেই মেয়েটি ঈষৎ গর্বমিশ্রিত অথচ মিষ্টসুরে বলিল—আমি এ গ্রামের বিশালাক্ষী দেবী। গ্রামে অল্পদিনে ওলাওঠার মড়ক আরম্ভ হবে—বলে দিয়ো চতুর্দশীর রাত্রে পঞ্চানন্দতলায় একশ আটটা কুমড়ো বলি দিয়ে যেন কালীপূজা করে। কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্তম্ভিত স্বরূপ চক্রবর্তীর চোখের সাম্‌নে মেয়েটি চারিধারে শীত-সন্ধ্যার কুয়াশায় ধীরে ধীরে যেন মিলাইয়া গেল। এই ঘটনার দিন কয়েক পরে সত্যই সেবার গ্রামে ভয়ানক মড়ক দেখা দিয়াছিল।

এ সব গল্প কতবার শুনিয়াছে। জানালার ধারে দাঁড়াইলেই বিশালাক্ষী ঠাকুরের কথা তাহার মনে ওঠে। দেবী বিশালাক্ষীকে একটিবার দেখিতে পাওয়া যায় না? হঠাৎ সে বনের পথে হয়তো গুলঞ্চের লতা পাড়িতেছে—সেই সময়—

খুব সুন্দর দেখিতে, রাঙাপাড় শাড়ি পরনে, হাতে গলায় মা-দুর্গার মতো হার বালা।

—তুমি কে?

—আমি অপু।

—তুমি বড় ভালো ছেলে, কি বর চাও?

সে বিছানায় গিয়া শোয়। এক একবার ঝিরঝিরে হাওয়ায় কত কি লতাপাতার তিক্তমধুর গন্ধ ভাসিয়া আসে, ঠিক দুপুরবেলা, অনেক দূরের কোনো বড় গাছের মাথার উপর হইতে গাঙ্‌চিল টানিয়া টানিয়া ডাকে, যেন এই ছোট্ট গ্রামখানির অতীত ও বর্তমান সমস্ত ছোটখাটো দুঃখ শান্তি দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে, শরৎ-মধ্যাহ্নের রৌদ্রভরা, নীল নির্জন আকাশ-পথে, এক্ উদাস, গৃহবিবাগী পথিক-দেবতার সুকণ্ঠের অবদান দূর হইতে দূরে মিলাইয়া চলিয়াছে।

কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে বুঝিতে পারে না, ঘুমাইয়া উঠিয়া দেখে বেলা একেবারে নাই। জানালার বাহিরে সারা বনটায় ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, বাঁশঝাড়ের আগায় রাঙা রোদ।

প্রতিদিন এই সময়—ঠিক এই ছায়া-ভরা বৈকালটিতে, নির্জন বনের দিকে চাহিয়া তাহার অতি অদ্ভুত কথা সব মনে হয়। অপূর্ব খুশিতে মন ভরিয়া ওঠে, মনে হয় এ রকম লতাপাতার মধুর গন্ধভরা দিনগুলি ইহার আগে কবে একবার যেন আসিয়াছিল, সে সব দিনের অনুভূত আনন্দের অস্পষ্ট স্মৃতি আসিয়া এই দিনগুলিকে ভবিষ্যতের কোন্ অনির্দিষ্ট আনন্দের আশায় ভরিয়া তোলে। মনে হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে, এ দিনগুলি বুঝি বৃথা যাইবে না—একটা বড় কোনো আনন্দ ইহাদের শেষে অপেক্ষা করিয়া আছে যেন!

এই অপরাহ্ণগুলির সঙ্গে আজন্মসাথী সুপরিচিত এই আনন্দভরা বহুরূপী বনটার সঙ্গে কত রহস্যময়, স্বপ্ন-দেশের বার্তা যে জড়ানো আছে! বাঁশঝাড়ের উপরকার ছায়া-ভরা আকাশটার দিকে চাহিয়া সে দেখিতে পায়, এক তরুণ বীরের উদারতার সুযোগ পাইয়া কে প্রার্থী একজন তাহার অক্ষয় কবচ-কুণ্ডল মাগিয়া লইতে হাত পাতিয়াছে, পিটুলি-গোলা পান করিয়া কোথাকার এক ক্ষুদ্র দরিদ্র বালক খেলুড়েদের কাছে 'দুধ খেয়েছি, দুধ খেয়েছি' বলিয়া উল্লাসে নৃত্য করে—ওই যে পোড়ো ভিটার বেলতলাটা—ওইখানেই তো শরশয্যাশায়িত প্রবীণ বীর ভীষ্মদেবের মরণাহত ওষ্ঠে তীক্ষ্ণবাণে পৃথিবী ফুঁড়িয়া অর্জুন ভোগবতীধারা সিঞ্চন করিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে সরযূতটের কুসুমিত কাননে মৃগয়া করিতে গিয়া রাজা দশরথ মৃগভ্রমে যে জলআহরণগত দরিদ্র বালককে বধ করেন—সে ঘটিয়াছিল ওই রানুদিদিদের বাগানের বড় জাম গাছটার তলায় যে ডোবা—তাহারই ধারে।

তাহাদের বাড়ি একখানা বই আছে, পাতাগুলো সব হলদে, মলাটটার খানিকটা নাই, নাম লেখা

আছে 'বীরাঙ্গনা কাব্য', কিন্তু লেখকের নাম জানে না, গোড়ার দিকের পাতাগুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। বইখানা বড় ভালো লাগে—তাহাতে সে পড়িয়াছে—

অদূরে দেখিনু হ্রদ, সে হ্রদের তীরে
রাজরথী একজন যান গড়াগড়ি
ভগ্নউরু! দেখি উচ্চে উঠিনু কাঁদিয়া
এ কি কুস্বপন নাথ দেখাইলা মোরে!

কলুইচণ্ডী ব্রতের দিন মায়ের সঙ্গে গ্রামে উত্তর মাঠে যে পুরানো মজা পুকুরের ধারে সে বন-ভোজন করিতে যায়—কেউ জানে না—চারিধারে বনে ঘেরা সেই ছোট্ট পুকুরটাই মহাভারতের সেই দ্বৈপায়ন হ্রদ। ওই নির্জন মাঠের পুকুরটার মধ্যে সে ভগ্নউরু, অবমানিত বীর থাকে একা একা, কেউ দেখে না, কেউ খোঁজ করে না। উত্তর মাঠের কলাবেগুনের ক্ষেত হইতে কৃষাণেরা ফিরিয়া আসে, জনমানুষের চিহ্ন থাকে না কোনো দিকে—সোনাডাঙা মাঠের পারের অনাবিষ্কৃত, বসতিশূন্য, অজানা দেশে চন্দ্রহীন রাত্রির ঘন অন্ধকার ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে, তখন হাজার হাজার বছরের পুরাতন মানব-বেদনা কখনও বা দরিদ্র পিতার প্রবঞ্চনা-মুগ্ধ অবোধ বালকের উল্লাসে, কখনও বা এক ভাগ্যহত, নিঃসঙ্গ অসহায় রাজপুত্রের ছবিতে তাহার প্রবর্ধমান, উৎসুক মনের সহানুভূতিতে জাগ্রত ও সার্থক হয়। ওই অজ্ঞাতনামা লেখকের বইখানা পড়িতে পড়িতে কতদিন যে তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিয়াছে!

তাহার বাবা বাড়ি নাই। বাড়ি থাকিলে তাহাকে এক মনে ঘরে বসিয়া দপ্তর খুলিয়া পড়িতে হয়। একেবারে বেলা শেষ হইয়া যায় তবুও ছুটি হয় না। তাহার মন ব্যাকুল হইয়া ওঠে। আর কতক্ষণ বসিয়া বসিয়া শুভঙ্করীর আর্যা মুখস্থ করিবে? আজ আর বুঝি সে খেলা করিবে না? বেলা বুঝি আর আছে? বাবার উপর ভারি রাগ হয়, অভিমান হয়।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে ছুটি হইয়া যায়। বইদপ্তর কোনোরকমে ঝুপ্ করিয়া এক জায়গায় ফেলিয়া রাখিয়া ছায়াভরা উঠানে গিয়া খুশিতে সে নাচিতে থাকে।

অপূর্ব, অদ্ভুত বৈকালটা...নিবিড় ছায়াভরা গাছপালার ধারে খেলাঘর...গুলঞ্চলতার তার টাঙানো... খেজুর ডালের ঝাঁপ...বনের দিক থেকে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গন্ধ বাহির হয়...রাঙা রোদটুকু জেঠামহাশয়দের পোড়ো ভিটায় বাতাবিলেবু গাছের মাথায় চিক্ চিক্ করে...চক্চকে বাদামী রঙ-এর ডানাওয়ালা তেড়ো পাখি বনকলমি ঝোপে উড়িয়া আসিয়া বসে...তাজা মাটির গন্ধ...ছেলেমানুষের জগৎ ভরপুর আনন্দে উছলিয়া ওঠে, কাহাকে সে কি করিয়া বুঝাইবে সে কি আনন্দ!

সন্ধ্যার পর সর্বজয়া ভাত চড়াইয়াছিল। অপু দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া আছে। খুব অন্ধকার, একটানা ঝিঁঝি পোকা ডাকিতেছে।

অপু জিজ্ঞাসা করিল—পুজোর আর কদিন আছে, মা?

দুর্গা বঁটি পাতিয়া তরকারি কাটিতেছিল। বলিল, আর বাইশ দিন আছে, না মা?

সে হিসাব ঠিক করিয়াছে। তাহার বাবা বাড়ি আসিবে, অপুর, মায়ের, তাহার জন্য পুতুল, কাপড়, আলতা।

আজকাল সে বড় হইয়াছে বলিয়া তাহার মা অন্য পাড়ায় গিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে দেয় না। লুচি খাইতে কেমন তাহা সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। ফুট্‌ফুটে কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রে বাঁশবনের আলোছায়ায় জাল-বুনানি পথ বাহিয়া সে আগে আগে পাড়ায় পাড়ায় বেড়াইয়া লক্ষ্মীপূজার খই-মুড়ি ভাজা আঁচল ভরিয়া লইয়া আসিত। বাড়িতে বাড়িতে শাঁখ বাজে, পথে লুচিভাজার গন্ধ বাহির হয়, হয়তো পাড়ার কেউ পূজার শীতলের নৈবেদ্য একখানা তাহাদের বাড়িতে পাঠাইয়া দেয়। সেও অনেক খই-মুড়ি আনিত, তাহার মা দুইদিন ধরিয়া তাহাদের জলপান খাইতে

দিত, নিজেও খাইত। সেবার সেজ ঠাক্‌রুন বলিয়াছিল—ভদ্দর লোকের মেয়ে আবার চাষা লোকের মতো বাড়ি-বাড়ি ঘুরে খই-মুড়ি নিয়ে বেড়াবে কি? ওসব দেখতে খারাপ...ওরকম আর পাঠিয়ো না বৌমা—সেই হইতে সে আর যায় না।

দুর্গা বলিল—তাস খেলবে?

—তা যা, ও ঘর থেকে তাসটা নিয়ে আয়, একটু খেলি—

দুর্গা বিপন্নমুখে অপুর দিকে চাহিল।

অপু হাসিয়া বলিল—চল্‌ আমি দাঁড়াচ্চি—

তাহাদের মা বলিল—আহা-হা, মেয়ের ভয় দেখে আর বাঁচিনে, সারাদিন বলে হেঁট-মাটি ওপর করে বেড়াবার সময় ভয় থাকে না, আর রাত্রিতে এঘর থেকে ওঘর যেতে একেবারে সব আড়ষ্ট:...

শিষ্যবাড়ি হইতে অপুর আনা সেই তাসজোড়াটা। তাস খেলায় তিনজনেরই কৃতিত্ব সমান। অপু এখনও সব রং চেনে না—মাঝে মাঝে হাতের তাস বিপক্ষদলের খেলোয়াড় মাকে দেখাইয়া বলে, এটা কি রং, রুইতন? দ্যাখো না মা—

দুর্গার মন আজ খুব খুশি আছে। রাত্রিতে রান্না প্রায়ই হয় না, ওবেলার বাসি ভাত তবকারি থাকে। আজ ভাত চড়িয়াছে, তরকারি রান্না হইবে, ইহাতে তাহার মহা আনন্দ। আজ যেন একটা উৎসবের দিন। অপু বলিল—তাস খেলতে খেলতে সেই গল্পটা বলো না মা, সেই শ্যামলঙ্কাব গল্পটা?

হঠাৎ সে মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়ে। মায়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আবদারের সুরে বলে—সেই ছড়াটা বলো না মা, সেই—শ্যামলঙ্কা বাট্‌না বাটে মাটিতে লুটায় কেশ।

দুর্গা বলে—খেলার সময় ছড়া বললে খেলা কি করে হবে অপু? ওঠ্‌—

সর্বজয়া বলিল—দুগ্‌গা, পাতালকোঁড় আজ কোথায় পেলি রে?

—সেই যে গোঁসাইদের বড় বাগানটা আছে? সেই রাঙী গাই খুঁজতে একবার তুই আব আমি, অপু? সেখানে অনেক ফুটেছিল, কেউ টের পায়নি, মা, খুব বন কি না? তা হলে লোকে তুলে নিয়ে যেত—

অপু বলিল—সেখানে গিইছিলি? উঃ, সে যে বড্ড বন রে দিদি!

সর্বজয়া সস্নেহে বার বার ছেলের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। সেদিনকার সেই অপু --আয় চাঁদ আয় চাঁদ, খোকনের কপালে টি-ই-ই-ই দিয়ে যা—বলিলে বার বার কলের পুতুলের মতো চাঁদের মতো কপালখানি অঙ্গুলিবদ্ধ হস্তের দিকে ঝুঁকাইয়া দিত, সে কি না আজ তাস খেলিতে বসিয়াছে! তাহার কাছে দৃশ্যটা বড় অভিনব ঠেকে। অপু খেলিতে না পারিলে বা আশা করিয়া কোনো পিট্‌ জিতিতে না পারিলে কিংবা অপুর হাতে খারাপ তাসগুলো গিয়া নিজের হাতে ভালো তাস আসিলে, বিপক্ষদলের খেলোয়াড় হইয়াও তাহার মনে কষ্ট হইতেছিল।

দুর্গা বলিল—আজ কি হয়েছে জানো মা—

অপু বলিল—যাঃ, তা হলে তোর সঙ্গে আড়ি করবো, বলে দ্যাখ্—

—কর্‌গে যা আড়ি—শোনো মা, ও পোস্তদানার নাম জানে না, আজ রাজীদের বাড়ি পোস্তদানা রদ্দুরে দিয়েচে, ও বল্লে, কি রাজীদি? রাজী বল্লে, যষ্টিমধু, খেয়ে দ্যাখ্—ও খেয়ে এলো মা সেখানে দাঁড়িয়ে, বুঝতে পাল্লে না যে পোস্ত—এমন বোকা—না মা?

অপু মুখে বলিল বটে কিন্তু দিদির সহিত সে আড়ি করিবে না। সেই যে যেদিন তাহার পাকা মাকাল ফলগুলো সতুদা লইয়া পলাইয়াছিল, সেদিন তাহার দিদি সারাদিন বন বাগান খুঁজিয়া সন্ধ্যার সময় কোথা হইতে আঁচলে বাঁধিয়া একরাশ মাকাল ফল আনিয়া তাহার সম্মুখে খুলিয়া দেখাইয়া বলিয়াছিল—কেমন হল এখন? বড্ড যে কাঁদছিলি সকালবেলা? সে সন্ধ্যায় কিসে সে বেশি আনন্দ

পাইয়াছিল—মাকাল ফলগুলো হইতে কি দিদির মুখের, বিশেষ করিয়া তাহার ডাগর চোখের মমতাভরা স্নিগ্ধ হাসি হইতে—তাহা সে জানে না।

—ছক্কার খেলা অপু বুঝেসুজে খেলিস?—দুর্গা মহাখুশির সহিত তাস কুড়াইয়া সাজাইতে লাগিল।

—কি ফুলের গন্ধ বেরুচ্চে, না দিদি?

তাহাদের মা বলিল, তাহাদের জেঠামশায়দের ভিটার পিছনে ছাতিমগাছ আছে, সেই ফুলের গন্ধ। অপু ও দুর্গা দুজনেই আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ মা, ওই ছাতিমতলায় একবার বাঘ এসেছিল বলেছিলে না? কিন্তু তাহার মা তাড়াতাড়ি তাস ফেলিয়া উঠিয়া বলিল—ওই যাঃ ভাত পুড়ে গেল, ধরাগন্ধ বেরিয়েছে—ভাতটা নামিয়ে দাঁড়া বলচি—

খাইতে বসিয়া দুর্গা বলিল—পাতালকোঁড়ের তরকারিটা কি সুন্দর খেতে হয়েচে মা!

তাহার মুখ স্বর্গীয় তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে অপুও বলিল—বাঃ খেতে ঠিক মাংসের মতো, না দিদি? পাতালকোঁড় এক জায়গায় কত ফুটে আছে মা, আমি ভাবি ব্যাঙের ছাতা, তাই তুলি নে—

উভয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-বাক্যে সর্বজয়ার বুক গর্বে ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। তবুও কি আর উপযুক্ত উপকরণ সে পাইয়াছে? লোকের বাড়িতে ভোজে রাঁধিতে ডাকে সেজঠাক্‌রুনকে, ডাকুক না দেখি একবার তাহাকে, রান্না কাহাকে বলে সেজঠাক্‌রুনকে সে—হ্যাঁ।

সর্বজয়া বলিল—অপুর হাতে জল ঢেলে দে দুগ্‌গা, ও কি ছেলেব কাণ্ড? ওই রাস্তার মাঝখানে মুখ ধোয়? রোজই রাত্রে তুমি ওই পথের উপর—

কিন্তু অপু আর এক পাও নড়িতে চাহে না, সম্মুখের সেই ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক, অন্ধকার বাঁশবন, ঝোপ-জঙ্গলের অন্ধকার ঝিঙের বিচির মতো কালো। পোড়ো ভিটেবাড়ি...আরও অজানা কত কি বিভীষিকা! সে বুঝিতে পারে না যেখানে প্রাণ লইয়া টানাটানি সেখানে পথের উপর আঁচানোটাই কি এত বেশি; তাহার পরে সকলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। রাত্রি গভীর হয়, ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাসে হেমন্তের আঁচ-লাগা শিশিরার্দ্র নৈশ বায়ু ভরিয়া যায়। মধ্যরাত্রে বেণুবনশীর্ষে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্না উঠিয়া শিশিরসিক্ত গাছপালায়, ডালে-পাতায় চিক্‌চিক্ করে। আলো-আঁধারের অপরূপ মায়ায় বনপ্রান্ত ঘুমন্ত পরীর দেশের মতো রহস্য-ভরা। শন্ শন্ করিয়া হঠাৎ হয়তো এক ঝলক হাওয়া সোঁদালির ডাল দুলাইয়া, তেলাকুচা ঝোপের মাথা কাঁপাইয়া বহিয়া যায়।

এক-একদিন এই সময়ে অপুর ঘুম ভাঙিয়া যাইত।

সেই দেবী যেন আসিয়াছেন, সেই গ্রামের বিস্মৃতা অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষী।

পুলিনশালিনী ইছামতীর ডালিমের রোয়ার মতো স্বচ্ছ জলের ধারে, কুচা শ্যাওলা ভরা ঠাণ্ডা কাদায় কতদিন আগে যাহাদের চরণ-চিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তীরের প্রাচীন সপ্তপর্ণটাও হয়তো যাদের দেখে নাই, পুরানো কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরে তারাই এক সময়ে ফুল-ফল-নৈবেদ্যে পূজা দিত, আজকালকার লোকেরা কে তাঁহাকে জানে?

তিনি কিন্তু এ গ্রামকে এখনও ভোলেন নাই।

গ্রাম নিষুতি হইয়া গেলে অনেক রাত্রে, তিনি বনে বনে ফুল ফুটাইয়া বেড়ান, বিহঙ্গ-শিশুদের দেখাশুনা করেন, জ্যোৎস্না-রাত্রের শেষ প্রহরে ছোট্ট ছোট্ট মৌমাছিদের চাকগুলি বুনো-ভাঁওরা, নট্‌কান, পুঁয়ো ফুলের মিষ্ট মধুতে ভরাইয়া দেন।

তিনি জানেন কোন্ ঝোপের কোণে বাসক ফুলের মাথা লুকাইয়া আছে, নিভৃত বনের মধ্যে ছাতিম ফুলের দল কোথায় গাছের ছায়ায় শুইয়া, ইছামতীর কোন্ বাঁকে সবুজ শ্যাওলার ফাঁকে ফাঁকে নীল-পাপ্‌ড়ি কলমিফুলের দল ভিড় পাকাইয়া তুলিতেছে, কাঁটা গাছের ডালপালার মধ্যে ছোট্ট খড়ের বাসায় টুনটুনি পাখির ছেলেমেয়েরা কোথায় ঘুম ভাঙিয়া উঠিল।

তাঁর রূপের স্নিগ্ধ আলোয় বন যেন ভরিয়া গিয়াছে। নীরবতায়, জ্যোৎস্নায়, সুগন্ধে, অস্পষ্ট আলো-আঁধারের মায়ায় রাত্রির অপরূপ শ্রী।

দিনের আলো ফুটিবার আগেই কিন্তু বনলক্ষ্মী কোথায় মিলাইয়া যান, স্বরূপ চক্রবর্তীর পর তাঁহাকে কেহ কোনোদিন দেখে নাই।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

গ্রামের অন্নদা রায় মহাশয় সম্প্রতি বড় বিপদে পড়িয়াছেন।

গ্রামের জরিপ আসাতে উত্তর মাঠে তাঁবু পড়িয়াছে। জরিপের বড় কর্মচারী মাঠের মধ্যে নদীর ধারে অফিস খুলিয়াছেন, ছোটখাটো আমলাও সঙ্গে আসিয়াছে বিস্তর। গ্রামের সকল ভদ্রলোকই কিছু জমিজমার মালিক; পিতৃপুরুষের অর্জিত এই সব সম্পত্তির নিরাপদ কূলে জীবনতরণীর লগি কষিয়া পুঁতিয়া জড় পদার্থের ন্যায় উদ্যমহীন, গতিহীন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দিনগুলি একরূপ বেশই কাটিতেছিল কিন্তু এবার সকলেই একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রাম হয়তো শ্যামের জমি নির্বিবাদে নিজের বলিয়া ভোগ করিয়া আসিতেছে, যদু দশ বিঘার খাজনায় বারো বিঘা নিরুপদ্রবে দখল করিতেছে, এতদিন যাহা পূর্ণ শান্তিতে নিষ্পন্ন হইতেছিল, এইবার সেই সকলের মধ্যে গোলমাল পৌঁছিল। বিপদ একরূপ সর্বজনীন হইলেও অন্নদা রায়ের বিপদ একটু অন্য ধরনের বা একটু বেশি গুরুতর। তাঁহার এক জ্ঞাতিভ্রাতা বহুদিন যাবৎ পশ্চিম-প্রবাসী। এতদিন তিনি উক্ত প্রবাসী জ্ঞাতির আম-কাঁঠালের বাগান ও জমি নির্বিঘ্নে ভোগ করিতেছিলেন এবং সম্পূর্ণ ভরসা ছিল জরিপের সময় পারিয়া উঠিলে সবই, অন্ততপক্ষে কতকাংশ নিজের বলিয়া লিখাইয়া লইবেন, কিন্তু কি জানি গ্রামের কে উক্ত প্রবাসী জ্ঞাতিকে কি পত্র লিখিয়াছে—ফলে অদ্য দিন দশেক হইল জ্ঞাতিভ্রাতার জ্যেষ্ঠপুত্রটি জরীপের সময় বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করিতে আসিয়াছে। মুখের গ্রাস তো গেলই, তাহা ছাড়া বিপদ আরও আছে। ওই আত্মীয়ের অংশের ঘরগুলিই বাড়ির মধ্যে ভালো, রায় মহাশয় গত বিশ বৎসর সেগুলি নিজে দখল করিয়া আসিতেছেন, সেগুলি ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে—জ্ঞাতিপুত্রটি শৌখিন ধরনের কলেজের ছেলে, একখানিতে শোয়, একখানিতে পড়াশুনা করে উপরের ঘরখানি হইতে লোহার সিন্দুক, বন্ধকী মাল, কাগজপত্রাদি সরাইয়া ফেলিতে হইয়াছে। নিচের যে ঘরে পালিত-পাড়া হইতে সস্তাদরে কেনা কড়িবরগা রক্ষিত ছিল, সে ঘরও শীঘ্র ছাড়িয়া দিতে হইবে।

বৈকালবেলা। অন্নদা রায়ের চণ্ডীমণ্ডপে পাড়ার কয়েকটি লোক আসিয়াছেন—এই সময়েই পাশা খেলার মজলিশ বসে। কিন্তু অদ্য এখনও কাজ মেটে নাই। অন্নদা রায় একে একে সমাগত খাতকপত্র বিদায় করিতেছিলেন।

উঠানের রোয়াকের ঠিক নিচেই একটি অল্পবয়সি কৃষক-বধূ একটা ছোট ছেলে সঙ্গে লইয়া অনেকক্ষণ হইতে ঘোমটা দিয়া বসিয়া ছিল, সে এইবার তাহার পালা আসিয়াছে ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রায় মহাশয় মাথা সামনে একটু নিচু করিয়া চশমার উপর হইতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—কে? তোর আবার কি?

কৃষক-বধূটি আঁচলের খুঁট খুলিতে খুলিতে নিম্নকণ্ঠে বলিল—মুই কিছু টাকার জোগাড় করিচি অনেক কষ্টে, মোর টাকাডা নেন...আর গোলার চাবিটা খুলে দ্যান, বড্ড কষ্ট যাচ্ছে মনিব ঠাকুর, সে আর কি বল্‌বো—

অন্নদা রায়ের মুখ প্রসন্ন হইল, বলিলেন—হরি, নেও তো ওর টাকাটা গুনে। খাতাখানায় দেখো তারিখটা, সুদটা আর একবার হিসেব করে দেখো—

কৃষক-বধূ আঁচলের খুঁট হইতে টাকা বাহির করিয়া হরিহরের সম্মুখে রোয়াকের ধারে রাখিয়া দিল। হরিহর গুনিয়া বলিল—পাঁচ টাকা?

রায় মহাশয় বলিলেন—আচ্ছা—জমা করে নাও—তারপর আর টাকা কই?

—ওই এখন ন্যান্, তারপর দোবো—মুই গতর খাটিয়ে—শোধ করে তোলবো, এখন ওই নিয়ে মোর গোলার চাবিডা খুলে দ্যান্, মোর মাতোরে দুটো খেইয়ে তো আগে বাঁচাই, তার পর ঘরদোর ফুটো হয়ে গিয়েছে, সে না হয়—।

এমন নিরুদ্বেগে কথা বলিতেছিল যেন গোলার চাবি তাহার করতলগত হইয়া গিয়াছে। রায় মহাশয়কে চিনিতে তাহার বিলম্ব ছিল।

রায় মহাশয় কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন—ওঃ, ভারি যে দেখছি মাগীর আবদার, চল্লিশ টাকার কাছাকাছি সুদে আসলে বাকি—পাঁচ টাকা এনিচি, নিয়ে গোলা খুলে দ্যান, ছোট লোকের কাণ্ডই আলাদা।—যা এখন দুপুরবেলা দিক করিস্ নে—

কৃষক-বধূ চণ্ডীমণ্ডপের অন্য কাহারও অপরিচিতা নহে, দীনু ভট্‌চায্যি চোখে ভালো দেখিতেন না, বলিলেন—কে ও অন্নদা?

—ওই ও-পাড়ার তম্‌রেজের বৌ—দিন চারেক হোল তম্‌রেজ না মারা গিয়েচে? সুদে আসলে চল্লিশ টাকা বাকি, তাই মরবার দিনই বিকেল থেকে গোলায় চাবি দিয়ে রেখেচি, এখন গোলা খুলিয়ে দ্যান্—হেন করুন—তেন করুন—

পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া গেলেও তম্‌রেজের বৌ অত চম্‌কিয়া উঠিত না—সে ব্যাপার এখন অনেকটা বুঝিল, আগাইয়া আসিয়া বলিল—ওকথা বলবেন না মনিব ঠাকুর, মোর খোকার একটা রুপোর নিমফল ছেল, ও বছর গড়িয়ে দিইছিল! তাই ভোঁদা সেক্‌রার দোকানে বিক্রি কল্লে পাঁচটা টাকা দেলে—ছেলেমানুষের জিনিস ব্যাচবার ইচ্ছে ছেল না, তা কি করি, এখন দুটো খেইয়ে বাঁচি, ভাবলাম এর পর দিন দেন মালিক তো মোর বাছারে মুই আবার নিমফল গড়িয়ে দেবো! তা দেন মনিব ঠাকুর চাবিডা গিয়ে—

—যা যা—এখন যা—এ সব টাকাকড়ির কাণ্ড কি নাকে কাঁদলেই মেটে? তা মেটে না। সে তুই কি বুঝবি, থাক্‌তো তোর সোয়ামী তো বুঝতো, যা এখন দিক্ করিস্ নি—ওই পাঁচ টাকা তোর নামে জমা রৈল—বাকি টাকা নিয়ে আয় তারপর দেখা যাবে।

অন্নদা রায় চশমা খুলিয়া খাপের মধ্যে পুরিতে পুরিতে উঠিয়া পড়িলেন ও বাড়ির ভিতরে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। তম্‌রেজের বৌ আকুল সুরে বলিয়া উঠিল—কনে যান্ ও মনিব ঠাকুর, মোর খোকার একটা উপায় করে যান, ওরে মুই খাওয়াবো কি, এক পয়সার মুড়ি কিনে দেবার যে পয়সা নেই—মোর গোলা না খুলে দ্যান্, মোর টাকা কড়া মোরে ফেরত দ্যান্—

রায় মহাশয় মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—যা যা সন্দে বেলা মাগী ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস নে—এক মুঠো টাকা জলে যাচ্চে তার সঙ্গে খোঁজ নেই, গোলা খুলে দাও, টাকা ফেরত দাও—গোলায় আছে কি তোর? জোর শলি চারেক ধান, তাতে টাকা শোধ যাবে? ও পাঁচ টাকাও উশুল রয়ে রৈল, আমার টাকা দেখ্‌বো না! ওঁর ছেলে কি খাবে বলে দ্যাও—ছেলে কি খাবে তা আমি কি জানি? যা, পারিস্ তো নালিশ করে খোলাগে যা—

রায় মহাশয় বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলে দীনু ভট্‌চায্যি বলিলেন—হ্যাঁগো বৌ, তম্‌রেজ ক'দিন হল—কই তা তো—

—বুধবারের দিন বাবা ঠাকুর, হাট থে ভাঙন মাছ আনলে, পেঁয়াজ দিয়ে রাঁধলাম—ভাত দেলাম—সহজ মানুষ ভালো খেলে দিব্যি—খেয়ে বল্‌লে মোর শীত করচে, কাঁথা চাপা দিয়ে দ্যাও, দেলাম—ওমা সইতে তারা উঠ্‌তি না উঠ্‌তি মানুষ দেখি আর সাড়াশব্দ দেয় না, দুপুর হতি না হতি মোরে পথে বসিয়ে—মোর খোকারে পথে বসিয়ে—চোখের জলে তাহার গলা আটকাইয়া গেল;

মিনতির সুরে বলিল—আপনারা এট্টু বলেন—বলে গোলার চাবিডা দিইয়ে দ্যান্, সংসারে বড্ড কষ্ট হয়েচে—কর্জ কি মুই বাকি রাখবো—ঝে করে হোক—

এই সময়ে নবাগত জ্ঞাতিপুত্রটি আসিয়া পড়াতে কথাবার্তা বন্ধ হইল। দীনু বলিলেন—এসো হে নীরেন বাবাজী, মাঠের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলে বুঝি? এই তোমার বাপ-ঠাকুরদার দেশ বুঝলে হে, কি রকম দেখ্‌লে বল?

নীরেন একটু হাসিল। তাহার বয়স একুশ-বাইশের বেশি নয়, বেশ বলিষ্ঠ গড়ন, সুপুরুষ। কলিকাতার কলেজে আইন পড়ে, অত্যন্ত মৌনী প্রকৃতির মানুষ—দেখিবার জন্য পিতা কর্তৃক প্রেবিত হইলেও কাজকর্ম সে কিছুই দেখে না বোঝেও না, দিনরাত নভেল পড়িয়া ও বন্দুক ছুঁড়িয়া কাটায়। সঙ্গে একটি বন্দুক আনিয়াছে, শিকারের ঝোঁক খুব।

নীরেন উপরে নিজের ঘরে ঢুকিতে গিয়া দেখিল, গোকুলের স্ত্রী ঘরের মেজেতে বসিয়া পড়িয়া মেজে হইতে কি খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিতেছে। দোরেব কাছে যাইতেই তাহার নজর পড়িল, তাহার দামি বিলাতী আলোটা মেজেতে বসানো; উহার কাঁচের ডুম্‌টা ভাঙিয়া চুরমার হইয়াছে, সাবা মেজেতে কাঁচ ছড়ানো। দোরের কাছে জুতাব শব্দ পাইয়া গোকুলেব স্ত্রী চম্‌কাইয়া পিছন ফিরিয়া চাহিল, সে আঁচল পাতিয়া মেজে হইতে কাঁচের টুকরাগুলি খুঁটিয়া খুঁটিযা তুলিতেছিল,—ভাবে মনে হয় প্রতিদিনেব মতো ঘর পরিষ্কার করিতে আসিয়া আলোটি জ্বালিতে গিয়াছিল, কি কবিয়া ভাঙিযা ফেলিয়াছে এবং আলোর মালিক আসিবার পূর্বেই নিজেই অপবাধের চিহ্নগুলি তাড়াতাড়ি সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টায় ছিল, হঠাৎ বামাল ধরা পড়িয়া অত্যন্ত অপ্রতিভ হইল। ক্ষতিকারিণীব লজ্জাব ভারটা লঘু করিয়া দিবার জন্যই নীরেন হাসিযা বলিয়া উঠিল—এই যে বৌদি, আলোটা ভেঙে বসে আছেন বুঝি? এই দেখুন ধরা পড়ে গেলেন, জানেন তো আইন পড়ি। আচ্ছা এখন একটু চা কবে নিয়ে আসুন তো বৌদি, চট্ করে, দেখি কেমন কাজের লোক। দাঁড়ান আলোটা জ্বেলে নিই, ভাগ্যিস বাক্সে আর একটা ডুম্ আছে।

গোকুলের স্ত্রী সলজ্জ সুরে বলিল, দেশলাই আন্‌বো ঠাকুরপো?

নীরেন কৌতুকের সুরে বলিল—দেশলাই আনেন নি তবে আলো পেড়ে কি করছিলেন শুনি?

বধূ এবার হাসিয়া ফেলিল, নিম্নসুরে বলিল—ঝুল পড়ে রয়েচে, ভাবলুম একটু মুছে দিই, তা যেমন কাঁচটা নামাতে গেলাম, কি জানি ও'সব ইংরিজি কলের আলো—কথা শেষ না কবিয়াই সে পুনরায় সলজ্জ হাসিয়া নিচে পলাইল!

নীরেন দশ বারো দিন আসিয়াছে বটে, সম্পর্কে বৌদিদি হইলেও গোকুলের স্ত্রীর সঙ্গে তাহার বিশেষ আলাপ হয় নাই। কাঁচ ভাঙার সন্ধ্যা হইতে কিন্তু উভয়ের মধ্যে নূতন পরিচযেব সংকোচটা কাটিয়া গেল। নীরেন অবস্থাপন্ন পিতাব পুত্র, তাহাব উপর বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে এই প্রথম আসা, নিঃসঙ্গ আনন্দহীন প্রবাসে দিনগুলি কাটিতে চাহিতেছিল না। সমবয়সি বৌদির সহিত পবিচয়ের পথটা সহজ হইয়া যাওয়ার পর হইতে সকাল-সন্ধ্যায় চা-পানের সময়টি সহজ আদান-প্রদানের মাধুর্যে আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল!...

দুপুরে সেদিন দুর্গা বেড়াইতে আসিল। রান্নাঘরের দুয়ারে উঁকি মারিয়া বলিল—কি রাঁধচো ও খুড়িমা?

বধূ বলিল—আয় মা আয়, একটু কাজ করে দিবি? একা আর পেরে উঠ্‌চিনে।..

দুর্গা মাঝে মাঝে যখনই আসে, খুড়িমার কার্যে সাহায্য করে। সে মাছ কুটিতে কুটিতে বলিল—হাঁ খুড়িমা, এ কাঁক্‌ড়া কোথায় পেলে? এ কাঁক্‌ড়া তো খায় না।

—কেন খাবে না রে, দূর! বিধু জেলেনি বলে গেল এ কাঁক্‌ড়া সবাই খায়।

—হ্যাঁ খুড়িমা, ওমা সেকি, তুমি কিন্‌লে?

—কিন্‌লামই তো, ওই অতগুলো পাঁচ পয়সায় দিয়েচে বিধু।

দুর্গা কিছু বলিল না। মনে মনে ভাবিল—খুড়িমার আর সব ভালো, কেবল একটু বোকা! এ কাঁক্ড়া আবার পয়সা দিয়ে কেনেই বা কে, খায়ই বা কে? ভালোমানুষ পেয়ে বিধু ঠকিয়ে নিয়েচে। সঙ্গে সঙ্গে এই সরলা খুড়িমাটির উপর তাহার স্নেহ নিবিড়তর হইয়া উঠিল।

সেদিন নাকি গোকুল-কাকা খুড়িমার মাথায় খড়মের বাড়ি মারিয়াছিল—স্বর্ণ গোয়ালিনী তাহাদের বাড়ি গল্প করে। সে-ও সেদিন নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়েছিল। খুড়িমা স্নান করিতে আসিয়া মাথা ডুবাইয়া স্নান করিল না, পাছে জ্বালা করে। সেদিন দুঃখে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল; কিন্তু কিছু বলে নাই পাছে খুড়িমা অপ্রতিভ হয়—এক ঘাট লোকের সাম্নে লজ্জা পায়। তবুও রায়-জেঠি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বৌমা, নাইলে না?...

খুড়িমা হাসিয়া উত্তর দিল—নাবো না আজ আর দিদিমা, শরীরটা ভালো নেই।...

খুড়িমা ভাবিয়াছিল তাহার মার খাওয়ার কথা বুঝি কেহ জানে না। কিন্তু খুড়িমা ঘাট হইতে উঠিয়া গেলেই রায়-জেঠি বলিল—দেখেচো বৌটাকে কি রকম মেরেচে গোক্‌লো, মাথার চুলে রক্ত একেবারে আঠা হয়ে এঁটে আছে!...রায়-জেঠির ভারি অন্যায়। জানো তো বাপু, তবে আবার জিজ্ঞেস করাই বা কেন, আর সকলকে বলাই বা কেন?

মাছ ধুইয়া রাখিয়া চলিয়া যাইবার সময় দুর্গা ভয়ে ভয়ে বলিল—খুড়িমা, তোমাদের চিঁড়ের ধান আছে? মা বলছিল অপু চিঁড়ে খেতে চেয়েছে, তা আমাদের তো এবার ধান কেনা হয়নি।...

গোকুলের বুক চুপি চুপি বলিল—আসিস এখন দুপুরের পর।...দালানের দিকে ইশারায় দেখাইয়া কহিল—ঘুমুলে আসিস্!

দুর্গা জিজ্ঞাসা করিল—খুড়িমা, তোমাদের বাড়ি কে এসেছে, আমি একদিনও দেখিনি কিন্তু।

—ঠাকুরপোকে দেখিসনি? এখন নেই কোথায় বেরিয়েচে, বিকেলবেলা আসিস্, দেখা হবে এখন।...তারপর গোকুলের বউ হাসিয়া বলিল—তোর সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ে হলে কিন্তু দিব্যি মানায়।

দুর্গা লজ্জায় রাঙা হইয়া বলিল—দূর!

গোকুলের বউ আবার হাসিয়া বলিল—কেন রে, দূর কেন? কেন, আমাদের মেয়ে কি খারাপ? দেখি?...সে দুর্গার চিবুকে হাত দিয়া মুখখানা একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিল—দ্যাখ্ তো এমন দুগ্‌গা প্রতিমার মতো সুন্দর মুখখানি? হলই বা বাপের পয়সা নেই?

দুর্গা ঝাঁকুনি দিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া কহিল—যাও, খুড়িমা যেন কি...পরে সে একপ্রকার ছুটিয়াই খিড়কি দোর দিয়া বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে সে ভাবিল—খুড়িমার আর সব ভালো, কেবল একটু বোকা, নইলে দ্যাখো না...? দূর!

দুর্গা চলিয়া যাইতে না যাইতে স্বর্ণ গোয়ালিনী দুধ দুহিতে আসিল। বধূ ঘর হইতে বলিল—ও সন্ন, আমার হাত জোড়া, বাছুরটা ওই বাইরের উঠোনে পিটুলি-গাছে বাঁধা আছে—নিয়ে আয়, আর রোয়াকে ঘটিটা মাজা আছে দ্যাখ্।

সখী ঠাক্‌রুনের এতক্ষণে পূজাহ্নিক সমাপ্ত হইল। তিনি বাহিরে আসিয়া উত্তর দিকে স্থানীয় কালীমন্দিরের উদ্দেশে মুখ ফিরাইয়া প্রণাম করিতে করিতে টানিয়া টানিয়া আবৃত্তির সুরে বলিতে লাগিলেন—দোহাই মা সিদ্ধেশ্বরী, দিন দিয়ো মা, ভবসমুদ্দুর পার কোরো মা—মা রক্ষেকালী, রক্ষে কোরো, মা-গো!

গোকুলের বউ রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া বলিল—ও পিসিমা, নারকোলের নাড়ু রেখে দিইচি, দুটো খেয়ে জল খান।

হঠাৎ সখী ঠাক্‌রুন রোয়াক হইতে ডাক দিলেন—বৌমা, দেখে যাও তো এদিকে।

স্বর শুনিয়া গোকুলের বউ-এর প্রাণ উড়িয়া গেল। সখী ঠাক্‌রুনকে সে যমের মতো ভয় করে। মায়া-দয়া বিতরণ সম্বন্ধে ভগবান সখী ঠাক্‌রুনের প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব দেখান নাই—একথা

নিঃসন্দেহে বলা চলে। রোয়াকের কোণে জড়ো-করা মাজা বাসনগুলির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিলেন—দ্যাখো তো চক্ষু দিয়ে, দেখতে পাচ্ছো? একেবারে স্পষ্ট জলের দাগ দেখ্‌লে তো? এইখান থেকে সন্ন ঘটি তুলে নিয়ে গিয়েচে, তারপর সেই শূদ্দুরের ছোঁয়া এঁটো বাসন আবার হেঁসেলে নিয়ে সাত-রাজ্যি জজানো হয়েচে! হাঃ! জাতজম্মো একেবারে গেল!

সখী ঠাক্‌রুন হতাশভাবে রোয়াকে বসিয়া পড়িলেন। যেন উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ পাইলে ইহার চেয়ে বেশি হতাশ হইতে পারিতেন না।

—হাঘরে হাড়হাবাতে ঘরের মেয়ে আন্‌লেই অমনি হয়, ভদ্দরলোকের রীত শিখ্‌বেই বা কোথা থেকে—জানবেই বা কোথা থেকে? বাসন মাজলি তো দেখলি নে এঁটো গেল কি রৈল? তিনপহর বেলা হয়েচে, ভাব্‌লাম একটু জল মুখে দিই! শূদ্দুরের এঁটো, এখ্‌খনি নেয়ে মরতে হোত—ভাগ্যিস ঘটিটা ছুঁইনি।

গোকুলের বউ বিষণ্ণমুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল—কেন মত্তে সন্ন পোড়ারমুখীকে ঘটি তুলে নিতে বল্লাম, নিজে দিলেই হত।

সখী ঠাক্‌রুন মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—ধিঙ্গি হয়ে দাঁড়িয়ে রৈলে যে? যাও হাঁড়ি কুড়ি ফেলে দাও গিয়ে। বাসন-কোসন মেজে আনো ফের্‌। রান্নাঘরে গোবর দিয়ে নেয়ে এসো। যত লক্ষ্মীছাড়া ঘরের মেয়ে জুটে সংসারটাকে ছারখারে দিলে।...সখী ঠাক্‌রুন রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে ঘরে ঢুকিলেন, বাহিরের খররৌদ্র তাঁহার সহ্য হইতেছিল না।

হুকুম-মতো সকল কাজ সারিতে বেলা একেবারে পড়িয়া গেল। নদীতে সে যখন পুনরায় স্নান করিতে গেল, তখন রৌদ্রে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় ও পরিশ্রমে তাহার মুখ শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে!

ঘাটে বৈকালের ছায়া খুব ঘন, ওপারে বড় শিমুল গাছটায় রোদ চিক্‌ চিক্‌ করিতেছে। নদীর বাঁকে একখানা পাল-তোলা নৌকা দাঁড় বাহিয়া বাঁক ঘুরিয়া যাইতেছে। হালের কাছে একজন লোক দাঁড়াইয়া কাপড় শুকাইতেছে, কাপড়টা ছাড়িয়া দিয়াছে, বাতাসে নিশানের মতো উড়িতেছে. মাঝনদীতে একটা বড় কচ্ছপ মুখ তুলিয়া নিঃশ্বাস লইয়া আবার ডুবিয়া গেল—সোঁ-ও-ও-ও-ভুস্‌!

নদীর জলের কেমন একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সুন্দর গন্ধ আসে, ছোট্ট নদী; ওপারের চরে একটা পানকৌড়ি মাছ-ধরা বাঁশের দোয়াড়ির উপর বসিয়া আছে।

এই সময় প্রতিদিন তাহার শৈশবের কথা মনে পড়ে—

পানকৌড়ি পানকৌড়ি, ডাঙায় ওঠোসে...

গোকুলের বউ খানিকক্ষণ পানকৌড়িটার দিকে চাহিয়া রহিল। মায়ের মুখ মনে পড়ে। সংসারে আর কেহ নাই যে, মুখের দিকে চায়। মায়ের কি মরিবার বয়স হইয়াছিল? গরিব পিতৃকুলে কেবল এক গাঁজাখোর ভাই আছে, সে কোথায় কখন থাকে—তার ঠিকানা নাই। গত বৎসর পূজার সময় এখানে আসিয়া চার দিন ছিল। সে লুকাইয়া লুকাইয়া ভাইকে নিজের বাক্স হইতে যাহা সামান্য কিছু পুঁজি—সিকিটা দু'য়ানিটা বাহির করিয়া দিত। পরে একদিন সে হঠাৎ এখান হইতে উধাও হয়। চলিয়া গেলে প্রকাশ পাইল যে, এক কাবুলি আলোয়ান-বিক্রেতার নিকট একখানি আলোয়ান ধারে কিনিয়া তাহার খাতায় ভগ্নীপতির নাম লিখাইয়া দিয়াছে। তাহা লইয়া অনেক হৈ চৈ হইল। পিতৃকুলের অনেক সমালোচনা, অনেক অপমান! ভাইটির সেই হইতে আর কোন সন্ধান নাই।

নিঃসহায় ছন্নছাড়া ভাইটার জন্য সন্ধ্যাবেলা কাজের ফাঁকে মনটা হু-হু করে। নির্জন মাঠের পথের দিকে চাহিয়া মনে হয়, গৃহহারা পথিক ভাইটা হয়তো দূরের কোন জনহীন আঁধার মেঠো-পথ বাহিয়া একা কোথায় চলিয়াছে, রাত্রে মাথা গুঁজিবার স্থান নাই, মুখের দিকে চাহিবার কোনো মানুষ নাই।...

বুকের মধ্যে উদ্বেল হইয়া উঠে, চোখের জলে ছায়াভরা নদীর জল, মাঠ, ঘাট, ওপারের শিমুল গাছটা, বাঁকের মোড়ে বড় নৌকাখানা—সব ঝাপ্‌সা হইয়া আসে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অপু সেদিন জেলেপাড়ায় কড়ি খেলিতে গিয়াছিল। বেলা দুইটা বা আড়াইটার কম নয়, রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর। প্রথমে সে তিনকড়ি জেলের বাড়ি গেল। তিনকড়ির ছেলে বঙ্কা পেয়ারাতলায় বাখারি চাঁচিতেছিল, অপু বলিল—এই কড়ি খেলবি?

খেলিবার ইচ্ছা থাকিলেও বঙ্কা বলিল, তাহাকে এখনই নৌকায় যাইতে হইবে, খেলা করিতে গেলে বাবা বকিবে! সেখান হইতে সে গেল রামচরণ জেলের বাড়ি।

রামচরণ দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল; অপু বলিল—হৃদয় বাড়ি আছে?

রামচরণ বলিল—হৃদয়কে কেন ঠাকুর? কড়ি খেলা বুঝি? এখন যাও, হৃদে বাড়ি নেই।

ঠিক-দুপুর বেলায় ঘুরিয়া অপুর মুখ রাঙা হইয়া গেল। আরও কয়েক স্থানে বিফলমনোরথ হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বাবুরাম পাড়ুইয়ের বাড়ির নিকটবর্তী তেঁতুলতলার কাছে আসিয়া তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তেঁতুলতলায় কড়ি খেলার আড্ডা খুব জমিয়াছে। সকলেই জেলেপাড়ার ছেলে কেবল ব্রাহ্মণপাড়ার ছেলের মধ্যে আছে পটু। অপুর সঙ্গে পটুর তেমন আলাপ নাই, কারণ পটুর যে পাড়ায় বাড়ি, অপুদের বাড়ি হইতে তাহা অনেক দূর। অপুর চেয়ে বয়সে পটু কিছু ছোট; অপুর মনে আছে, প্রথম যেদিন সে প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালায় ভর্তি হইতে যায়, সেদিন এই ছেলেটিকেই সে শান্তভাবে বসিয়া তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতে দেখিয়াছিল।...অপু তাহার কাছে গিয়া বলিল—কটা কড়ি?...পটু কড়ির গেঁজে বাহির করিয়া দেখাইল। রাঙা সুতার বুনানি ছোট্ট গেঁজেটি—তাহার অত্যন্ত শখের জিনিস। বলিল, সতেরোটা এনেছি—সাতটা সোনা-গেঁটে; হেরে গেলে আরও আন্‌বো।...পরে সে গেঁজেটা দেখাইয়া হাসিমুখে কহিল—কেমন দেখচিস? গেঁজেটায় একপণ কড়ি ধরে।

খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমটা পটু হারিতেছিল, পরে জিতিতে শুরু করিল। কয়েকদিন মাত্র আগে পটু আবিষ্কার করিয়াছে যে, কড়ি-খেলায় তাহার হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ হইয়া উঠিয়াছে; সেইজন্যই সে দিগ্বিজয়ের উচ্চাশায় প্রলুব্ধ হইয়া এতদূর আসিয়াছিল। খেলার নিয়মানুসারে পটু উপর হইতে টুক্ করিয়া বড় কড়ি দিয়া তাক্ ঠিক করিয়া মারিতেই যেমন একটা কড়ি বোঁ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায় অমনি পটুর মুখ অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। পরে সে জিতিয়া পাওয়া কড়িগুলি তুলিয়া গেঁজের মধ্যে পুরিয়া লোভে ও আনন্দে বার বার গেঁজেটির দিকে চাহিয়া দেখে, সেটা ভর্তি হইতে আর কত বাকি!

কয়েকজন জেলের ছেলে কি পরামর্শ করিল। একজন পটুকে বলিল—আর এক হাত তফাত থেকে তোমায় মারতে হবে ঠাকুর, তোমার হাতে টিপ্ বেশি!

পটু বলিল—বা রে, তা কেন, টিপ্ বেশি থাকাটা দোষ বুঝি? তোমরাও জেতো না, আমি তো কাউকে বারণ করিনি।

পরে সে চারদিকে চাহিয়া দেখিল, জেলের ছেলেরা সব একদিকে হইয়াছে। পটু ভাবিল—এত বেশি কড়ি আমি কোনদিন জিতি নি; আজ আর খেল্‌চি নে—খেল্লে কি আর এই কড়ি বাড়ি নিয়ে যেতে পারবো? আবার একহাত বাধ্ বেশি! সব হেরে যাব!...হঠাৎ সে কড়ির ছোট্ট থলিটি হাতে লইয়া বলিল—আমি এক হাত বেশি নিয়ে খেলবো না, আমি বাড়ি যাচ্ছি।...পরে জেলের ছেলেদের ভাবভঙ্গি ও চোখের নিষ্ঠুর দৃষ্টি দেখিয়া সে নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের কড়ির থলিটি শক্ত মুঠায় চাপিয়া রাখিল।

একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল—তা হবে না ঠাকুর, কড়ি জিতে পালাবে বুঝি?...সঙ্গে সঙ্গে সে হঠাৎ পটুর থলিসুদ্ধ হাতটা চাপিয়া ধরিল। পটু ছাড়াইয়া লইতে গেল, কিন্তু জোরে পারিল না;

বিষণ্ণমুখে বলিল—বা-রে, ছেড়ে দাও না আমার হাত:—পিছন হইতে কে একজন তাহাকে ঠেলা মারিল; সে পড়িয়া গেল বটে, কিন্তু কড়ির থলি ছাড়িল না। সে বুঝিয়াছে এইটিই কাড়িবার জন্য ইহাদের চেষ্টা! পড়িয়া গিয়া সে প্রাণপণে থলিটা পেটের কাছে চাপিয়া রাখিতে গেল; কিন্তু একে সে ছেলেমানুষ, তাহাতে গায়ের জোরও কম, জেলেপাড়ার বলিষ্ঠ ও তাহার চেয়ে বয়সে বড় ছেলেদের সঙ্গে কতক্ষণ যুঝিতে পারিবে! হাত হইতে কড়ির থলিটি অনেকক্ষণ কোন্ ধারে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল—কড়িগুলি চারিধারে ছত্রাকার হইয়া গেল।

অপু প্রথমটা পটুর দুর্দশায় একটু খুশি না হইয়াছিল তাহা নহে, কারণ সে-ও অনেক কড়ি হারিয়াছে। কিন্তু পটুকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া, বিশেষ করিয়া তাহাকে অসহায় ভাবে পড়িয়া মার খাইতে দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, সে ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া গিয়া বলিল—ছেলেমানুষ ওকে তোমরা মারচ কেন? বা রে, ছেড়ে দাও—ছাড়ো! পরে সে পটুকে মাটি হইতে উঠাইতে গেল, কিন্তু পিছন হইতে কাহার হাতেব ঘুঁষি খাইয়া খানিকক্ষণ সে চোখে কিছু দেখিতে পাইল না; তারপর ঠেলাঠেলিতে সে-ও মাটিতে পড়িয়া গেল।

অপুকেও সেদিন বেদম প্রহার খাইতে হইত নিশ্চয়ই, কারণ তাহার মেয়েলী ধরনের হাতে-পায়ে কোন জোর ছিল না, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে নীরেন এই পথে আসিয়া পড়াতে বিপক্ষদল সরিয়া পড়িল। পটুর লাগিয়াছিল খুব বেশি; নীরেন তাহাকে মাটি হইতে উঠাইয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিল। একটু সামলাইয়া লইয়াই সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল—ছড়ানো কড়িগুলার দু'একটি ছাড়া বাকিগুলি অদৃশ্য, প্রায় কড়ির থলিটি পর্যন্ত। পরে সে অপুর কাছে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—অপুদা, তোমার বেশি লাগে নি তো?

এতদূরে ঠিক দুপুরবেলা জেলের ছেলেদের দলে মিশিয়া কড়ি খেলিতে আসিবার জন্য নীরেন দুজনকেই বকিল। সময় কাটাইবার জন্য নীরেন পাড়ার ছেলেদের লইয়া অন্নদা রায়ের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা খুলিয়াছিল, সেখানে গিয়া কাল হইতে পড়িবার জন্য দুজনকেই বার বার বলিল। পটু চলিতে চলিতে শুধুই ভাবিতেছিল—কেমন সুন্দর কড়ির গেঁজেটা আমার, সেদিন অত করে ছিবাসেব কাছে চেয়ে নিলাম—গেল! আমি যদি কড়ি জিতে আর না খেলি তা ওদের কি? সে তো আমার ইচ্ছে!...

•

বাড়ি ঢুকিয়াই অপু দুর্গাকে বলিল—দিদি, শিউলিতলায় গুঁড়ির কাছে আমি একটা বাঁকা কঞ্চি রেখে গিইছি, আর তুই বুঝি সেটাকে ভেঙে দু'খণ্ড করে রেখেচিস?

দুর্গা সেখানাকে ভাঙিয়াছিল ঠিকই।—আহা, ভাবি তো একখানা বাঁকা-কঞ্চি! তোর যত পাগলামি—বাঁশ-বাগানে খুঁজলে কঞ্চি আর মিলবে না বুঝি। কঞ্চির ভারি অমিল কিনা!

অপু লজ্জিত মুখে বলিল—অমিল না তো কি? তুই এনে দে দিকি ওইরকম একখানা কঞ্চি! আমি কত খুঁজেপেতে নিয়ে আস্‌বো, আর তুই সব ভেঙেচুবে রাখবি—বেশ তো!

তার চোখে জল আসিয়া গেল।

দুর্গা বলিল—দেবো এখন এনে যত চাস, কান্না কিসের?

বাঁকা-কঞ্চি অপুর জীবনে এক অদ্ভুত জিনিস! একখানা শুকনো, হাল্‌কা, গোড়ার দিক মোটা, আগার দিক সরু বাঁকা-কঞ্চি হাতে করিলেই অপুর মন পুলকে শিহরিয়া ওঠে, মনে অদ্ভুত সব কল্পনা জাগে। একখানা বাঁকা-কঞ্চি হাতে করিয়া একদিন সে সারা সকাল কি বৈকাল আপনমনে বাঁশবনের পথে কি নদীর ধারে বেড়াইয়া বেড়ায়; কখনও রাজপুত্র, কখনও তামাকের দোকানী, কখনও ভ্রমণকারী, কখনও বা সেনাপতি, কখনও মহাভারতের অর্জুন—কল্পনা করে ও আপনমনে বিড় বিড় করিয়া কাল্পনিক ঘটনা যাহা ওই অবস্থায় তাহার জীবনে ঘটিলে তাহার আনন্দ হইত, সেই সব ঘটনা বলিয়া যায়। কঞ্চি যত মনের মতো হালকা হইবে ও পরিমাণমতো বাঁকা হইবে, তাহার আনন্দ ও

কল্পনা ততই পরিপূর্ণতা লাভ করে; কিন্তু সে রকম কঞ্চি সংগ্রহ করা যে কত শক্ত অপু তাহা বোঝে। কত খুঁজিয়া তবে একখানা মেলে।

অপু যে বাঁকা-কঞ্চি হাতে এরকম করিয়া বেড়ায়, এ কথা কেউ না শুনিতে পারে অপুর সেদিকে অত্যন্ত চেষ্টা। এরূপ অবস্থায় লোকে তাহাকে আপনমনে বকিতে দেখিলে পাগল ভাবিবে বা অন্য কিছু মনে করিবে, এই আশঙ্কায় সে পারতপক্ষে জন-সমাগমপূর্ণ স্থানে অথবা যেদিকে কেহ হঠাৎ আসিয়া পড়িতে পারে, সে সব দিকে না গিয়া নদীর ধারে—নির্জন বাঁশবনের পথে—নিজেদের বাড়ির পিছনে তেঁতুল-তলায় ঘোরে। এ অবস্থায় তাহাকে কেহ না দেখে, সেদিকে তাহার অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি! কচিৎ যদি কেহ আসিয়া পড়ে, তখনই সে জিভ কাটিয়া হাতের কঞ্চিখানা ফেলিয়া দেয়—পাছে কেহ কিছু মনে করে—এজন্য তাহার ভারি লজ্জা।

কেবল জানে তাহার দিদি। দিদি তাহাকে এ অবস্থায় দু'একবার দেখিয়া ফেলিয়াছিল, কাজেই দিদির কাছে আর লুকাইয়া কি হইবে? তাই সে বাঁকা-কঞ্চির কথা দিদিকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিল। অন্য লোক হইলে, লজ্জায় অপু কখনই এ কথার উল্লেখ করিতে পারিত না, যদিও কেহই জানে না অপুর সহিত বাঁকা-কঞ্চির কি রহস্যময় সম্পর্ক, তবুও অপুর মনে হয় সকলেই সেকথা জানে, বলিলেই সকলে তাহাকে পাগল বলিয়া ঠাট্টা করিবে। কে বুঝিবে—একখানা বাঁকা-কঞ্চি হাতে পাইলে, সে না খাইয়া-দাইয়া নদীর ধারে কি কোনো জনহীন বনের পথে কি অপূর্ব আনন্দেই সারাদিন একা একা কাটাইয়া দিতে পারে!...

দিদিকে অনুরোধ করিয়াছিল—মাকে যেন এসব বলিসনে দিদি!...দুর্গা বলে নাই!

সে জানে, অপু একটা পাগল! ভারি মমতা হয় ওর ওপর, ছোট বোকা আদুরে ভাইটা—এসব মাকে বলিয়া কি হইবে?...

মধুসংক্রান্তির ব্রতের পূর্বদিন সর্বজয়া ছেলেকে বলিল—কাল তোদের মাস্টার মশায়কে নেমন্তন্ন করে আসিস—বলিস দুপুর-বেলা এখানে খেতে।

মোটা চালের ভাত, পেঁপের ডালনা, ডুমুরের সুক্তনি, থোড়ের ঘণ্ট, চিংড়ি মাছের ঝোল, কলার বড়া ও পায়েস।

দুর্গাকে তাহার মা পরিবেশন-কার্যে নিযুক্ত করিয়াছে। নিতান্ত আনাড়ি—ভয়ে ভয়ে এমন সন্তর্পণে সে ডালের বাটি নিমন্ত্রিতের সম্মুখে রাখিয়া দিল—যেন তাহার ভয় হইতেছে এখনই কেহ বকিয়া উঠিবে। অত মোটা চালের ভাত নীরেনের খাওয়া অভ্যাস নাই; এত কম তৈলঘৃতের রান্না তরকারি কি করিয়া লোকে খায় তাহা সে জানে না। পায়েস পান্‌সে—জলমিশানো দুধের তৈরি, একবার মুখে দিয়াই পায়েস-ভোজনের উৎসাহ তাহার অর্ধেক কমিয়া গেল। অপু মহা খুশি ও উৎসাহসহকারে খাইতেছিল; এত সুখাদ্য তাহাদের বাড়িতে দু'একদিন মাত্র হইয়াছে—আজ তাহার স্মরণীয় উৎসবের দিন!—আপনি আর একটু পায়েস নিন্ মাস্টার মশায়।...নিজে সে এটা-ওটা বার বার দিদির কাছে চাহিয়া লইতেছিল।

বাড়ি ফিরিলে গোকুলের বউ হাসিমুখে বলিল—দুগ্‌গাকে পছন্দ হয় ঠাকুরপো? দিব্যি দেখতে শুনতে! আহা! গরিবের ঘরের মেয়ে, বাপের পয়সা নেই। কার হাতে যে পড়বে?—সারা জীবন পড়ে পড়ে ভুগবে। তা তুমি ওকে বিয়ে করো না কেন ঠাকুরপো, তোমাদেরই পালটি ঘর—মেয়েও দিব্যি; ভাইবোনের দুজনেরই কেমন বেশ পুতুল-পুতুল গড়ন!...

জরিপের তাঁবু হইতে ফিরিতে গিয়া নীরেন সেদিন গ্রামের পিছনের আমবাগানের পথ ধরিয়াছিল। একটা বনে-ঘেরা সরু পথ বাহিয়া আসিতে আসিতে দেখিল বাগানের ভিতর হইতে একটি মেয়ে সম্মুখের পথের উপরে আসিয়া উঠিতেছে, সে চিনিল—অপুর বোন দুর্গা। জিজ্ঞাসা করিল—কি খুকি, তোমাদের বাগান বুঝি এইটে?

দুর্গা পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া লজ্জিত হইল, কিছু বলিল না।

পরে সে পথের পাশে দাঁড়াইয়া নীরেনকে পথ ছাড়িয়া দিতে গেল। নীরেন বলিল—না না খুকি, তুমি চল আগে আগে। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হল। ওইদিকে একটা পুকুরের ধারে গিয়ে পড়েছিলাম, তারপর পথ খুঁজে হয়রান। যে বন তোমাদের দেশে!

দুর্গা যাইতে যাইতে হঠাৎ থামিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া নীরেনের মুখের দিকে চাহিবার চেষ্টা করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কাপড়ের ভিতর হইতে কিসের ফল গোটাকতক পথের উপর পড়িয়া গেল।

নীরেন বলিল—কি যেন পড়ে গেল খুকি! কিসের ফল ওগুলো?

দুর্গা নিচু হইয়া কুড়াইতে কুড়াইতে সংকুচিতভাবে বলিল—ও কিচ্ছু না, মেটে আলু।

—মেটে আলু? খেতে ভালো লাগে বুঝি? কি করে খায়?

এ প্রশ্ন দুর্গার কাছে অত্যন্ত কৌতূহলজনক ঠেকিল। একটি পাঁচ বছরের ছেলে যা জানে, চশ্‌মাপরা একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা জানে না! সে বলিল—এ ফল তো খায না, এ তো তেতো।

—তবে তুমি যে—

দুর্গা সলজ্জসুরে বলিল—আমি নিয়ে যাচ্ছি এমনি—খেল্‌বার জন্যে।.. একথা তাহার মনে ছিল যে, এই চশমা-পরা ছেলেটির সঙ্গেই সেদিন খুড়িমা ঠাট্টাচ্ছলে তাহাব বিবাহের কথা তুলিয়াছিল। তাহার ভারি কৌতূহল হইতেছিল, ছেলেটিকে সে ভালো করিয়া দেখে। কিন্তু মধুসংক্রান্তির ব্রতের দিনেও তাহা সে পাবে নাই, আজও পারিল না।

—অপুকে বোলো কাল সকালে যেন বই নিয়ে যায়—বল্‌বে তো?

দুর্গা চলিতে চলিতে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

আর একটু গিয়া পাশেব একটা পথ দেখাইয়া বলিল—এই পথ দিয়ে গেলে আপনাব খুব সোজা হবে।

নীরেন বলিল—আচ্ছা, আমি চিনে যাবো এখন, তোমাকে একটু এগিয়ে দিই। তুমি একলা যেতে পারবে?

দুর্গা আঙুল দিযা দেখাইযা কহিল—ওই তো আমাদেব বাড়ি একটু এগিযে গিয়েই, আমি তো—এইটুকু একলা যাবো এখন। আপনি আর—

দুর্গাকে ইহার আগে নীরেন কখনও ভালো করিয়া দেখে নাই,—চোখ দুটিব অমন সুন্দর ভাব কেবল দেখিয়াছে ইহারই ভাই অপুব মধ্যে। যেন পল্লীপ্রান্তের নিভৃত চূত-বকুল-বীথির প্রগাঢ় শ্যামস্নিগ্ধতা ডাগর চোখ দুটির মধ্যে অর্ধসুপ্ত রহিয়াছে। প্রভাত এখনও হয় নাই, রাত্রিশেষের অলস অন্ধকার এখনও জড়াইয়া আছে। তবে তাহা প্রভাতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় বটে,—কত সুপ্ত আঁখির জাগরণ, কত কুমারীর ঘাটে যাওয়া, ঘরে ঘরে কত নবীন জাগরণের অমৃত উৎসব—জানালায় জানালায় ধূপগন্ধ।

দুর্গা খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া কেমন যেন উস্‌খুস্‌ করিতে লাগিল। নীরেনের মনে হইল সে কি বলিবে মনে করিতে পারিতেছে না। সে বলিল—না খুকি, তোমাকে আর একটু এগিয়ে দিই? চল, তোমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই যাই।

দুর্গা ইতস্তত করিতে লাগিল, পরে একটু মুখ টিপিয়া হাসিল। নীরেনের মনে হইল এইবার সে কথা বলিবে। পরক্ষণে কিন্তু দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া তাহার সহিত যাইতে হইবে না জানাইয়া দিয়া, বাড়ির পথ ধরিয়া চলিয়া গেল।

দুপুর বেলা। ছাদে কাপড় তুলিতে আসিয়া গোকুলের বউ নীরেনের ঘরের দুয়ারে উঁকি দিয়া দেখিল। গরমে নীরেন বিছানায় শুইয়া খানিকটা এপাশ-ওপাশ করিবার পর, নিদ্রার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, মেজেতে মাদুর পাতিয়া বাড়িতে পত্র লিখিতেছিল।

গোকুলের বউ হাসিয়া বলিল—ঘুমোও নি যে ঠাকুরপো? আমি ভাবলাম ঠাকুরপো ঘুমিয়ে পড়েচে বুঝি, আজ মোচার ঘণ্ট যে বড় খেলে না—পাতেই রেখে এলে, সেদিন তো সব খেয়েছিলে?

—আসুন বৌদি। মোচার ঘণ্টা খাবো কি? বাঙালে কাণ্ড সব; যে ঝাল তাতে খেতে বসে কি চোখে দেখ্‌তে পাই—কোন্‌টা ঘণ্ট, কোন্‌টা কি?

গোকুলের বউ ঘরের দুয়ারের গব্‌রাটে মাথাটা হেলাইয়া ঠেস দিয়া অভ্যস্তভাবে মুখের নিচু দিকটা আঁচল দিয়া চাপিয়া দাঁড়াইল।

—ইস্‌, ঠাকুরপো, বড্ড শহুরে চাল দিচ্ছ যে! ওইটুকু ঝাল আর তোমাদের সেখানে কেউ খায় না—না?

—মাপ করবেন বৌদি, এতে যদি 'ওইটুকু' হয়, তবে আপনাদের বেশিটা একবার খেয়ে না দেখে আমি এখান থেকে যাচ্ছি নে! যা থাকে কপালে—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন! দিন্‌ একদিন চক্ষুলজ্জার মায়া কাটিয়ে যত খুশি লঙ্কা।

—ওমা আমার কি হবে! চক্ষুলজ্জার ভয়েই শিল-নোড়ার পাঠ তুলে দিয়ে চুপ করে বসে আছি নাকি ঠাকুরপো? শোনো কথা ঠাকুরপোর—বলে কিনা যাঁহা বাহান্ন...হাসির চোটে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। খানিকটা পরে সামলাইয়া লইয়া বলিল—আচ্ছা তোমাদের সেখানে গরম কেমন ঠাকুরপো?

—সেখানে, কোথায়? কলকাতায় না পশ্চিমে? পশ্চিমের গরম কি রকম সে এখান থেকে কি বুঝতে পারবেন! সে বাংলাদেশে থেকে বোঝা যাবে না। বোশেখ মাসের দিকে রাত্রে কি কেউ ঘরের মধ্যে শুতে পারে? ছাদে বিকেলে জল ধরে ছাদ ঠাণ্ডা করে রেখে তাইতে রাত্রে শুতে হয়।

—আচ্ছা, তোমরা যেখানে থাকো এখান থেকে কতদূর?

—এখান থেকে রেলে প্রায় দু'দিনের রাস্তা। আজ সকালের গাড়িতে মাঝেরপাড়া স্টেশনে চড়লে কাল দুপুর-রাত্রে পৌছানো যায়।

—আচ্ছা ঠাকুরপো, শুনিচি নাকি গয়াকাশীর দিকে পাহাড় কেটে রেল নিয়ে গিয়েচে—সত্যি?

—সত্যি। অনেক বড় বড় পাহাড়, ওপরে জঙ্গল—তার ভেতর দিয়ে যখন রেলগাড়ি যায়—একেবারে অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না, গাড়ির মধ্যে আলো জ্বেলে দিতে হয়।

গোকুলের বউ উৎসুকভাবে বলিল—আচ্ছা, ভেঙে পড়ে না?

—ভেঙে পড়বে কেন বৌদি? বড় বড় এঞ্জিনিয়ারে সুড়ঙ্গ তৈরি করেচে, কত টাকা খরচ করেচে, ভাঙলেই হল! এ কি আপনাদের রায়পাড়ার ঘাটের ধাপ যে দু'বেলা ভাঙচে?

এঞ্জিনিয়ার কোন্‌ জিনিস গোকুলের বউ তাহা বুঝিতে পারিল না। বলিল—পাহাড়টা মাটির না পাথরের?

—মাটিরও আছে, পাথরেরও আছে। নাঃ বৌদি, আপনি একেবারে পাড়াগেঁয়ে। আচ্ছা আপনি রেলগাড়িতে কতদূর গিয়েছেন?

গোকুলের বউ আবার কৌতুকের হাসি হাসিয়া উঠিল। চোখ প্রায় বুজিয়া মুখ একটুখানি উপরের দিকে তুলিয়া ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে বলিল—ওঃ, ভারি দূর গিইচি, একেবারে কাশী গয়া মক্কা গিইচি! সেই ও-বছর পিস্‌শাশুড়ি আর সতুর মা'র সঙ্গে আড়ংঘাটার যুগলকিশোর দেখ্‌তে গিইছিলাম। সেই আমার জন্মের মধ্যে কম্ম—রেলগাড়িতে চড়া!

এই মেয়েটি অল্পক্ষণের মধ্যেই সামান্য সূত্র ধরিয়া তাহার চারিপাশের এমন একটা হাসি-কৌতুকের জাল বুনিতে পারে—যাহা নীরেনের ভারি ভালো লাগে। যে ধরনের লোকের মনের মধ্যে আনন্দের এমন অফুরন্ত ভাণ্ডার থাকে, যার কারণে-অকারণে অন্তর্নিহিত আনন্দের উৎস মনের পাত্র উপচাইয়া পড়িয়া অপরকেও সংক্রামিত করিয়া তোলে, এই পল্লীবধূটি সেই দলের একজন।

আজকাল নীরেন মনে মনে ইহারই আগমনের প্রতীক্ষা করে—না আসিলে নিরাশ হয়, এমন কি যেন একটু গোপন অভিমানও হইয়া থাকে।

—আচ্ছা বৌদি, আপনাদের সবাই চলুন, একবার পশ্চিমে সব বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

—এ বাড়ির লোকে বেড়াতে যাবে পশ্চিম! তুমিও যেন ঠাকুরপো! তাহলে উত্তর মাঠের বেগুন-ক্ষেতে চৌকি দেবে কে?

কথার শেষে সে আর একদফা ব্যঙ্গমিশ্রিত কৌতুকের হাসি হাসিয়া উঠিল। একটু পরে গম্ভীর হইয়া নিচু সুরে বলিল—দ্যাখো ঠাকুরপো, একটা কথা রাখবে?

—কি কথা বলুন আগে?

—যদি রাখো তো বলি!

—ও সাদা কাগজে সই করা আমার দ্বারা হবে না, বৌদি! জানেন তো আইন পড়ি। আগে কথাটা শুনবো, তারপর কথার উত্তর দেবো।

গোকুলের বউ দুয়ার ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে আসিল। কাপড়ের ভিতর হইতে একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া বলিল—এই মাক্‌ড়ি দুটো রেখে আমায় পাঁচটা টাকা দেবে?

নীরেন বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন বলুন তো?

—সে এখন বলবো না। দেবে ঠাকুরপো?

—আগে বলুন টাকা দিয়ে কি হবে? নইলে কিন্তু—

গোকুলের বৌ নিম্নসুরে বলিল—আমি এক জায়গায় পাঠাবো। দ্যাখো তো এই চিঠিখানার ওপরের ঠিকানাটা ইংরিজিতে কি লেখা আছে!

নীরেন পড়িয়া বলিল—আপনার ভাই, না বৌদি?

—চুপ চুপ, এবাড়ির কাউকে বোলো না যেন। পাঁচটা টাকা চেয়ে পাঠিয়েচে, কোথায় পাবো ঠাকুরপো, কি রকম পরাধীন জানো তো? তাই ভাবলাম এই মাক্‌ড়ি দুটো—টাকা পাঁচটা দাও গিয়ে ঠাকুরপো—হতভাগা ছোঁড়াটির কি কেউ আছে ভূভারতে?...গোকুলের বউ-এর গলার স্বর চোখের জলে ভারী হইয়া উঠিল।

নীরেন বলিল—টাকা আমি দেবো বৌদি, পাঁচটা হয় দশটা হয়, আপনি যখন হয় শোধ দেবেন; কিন্তু মাক্‌ড়ি আমি নিতে পারবো না—

গোকুলের বউ কৌতুকের ভঙ্গিতে ঘাড় দুলাইয়া হাসিমুখে বলিল—তা হবে না ঠাকুরপো, বাঃ বেশ তো তুমি! তারপর আমি তোমার ঋণ রেখে মরে যাই আর তুমি—সে হবে না, ও তোমায় নিতেই হবে। আচ্ছা যাই ঠাকুরপো, নিচে অনেক কাজ পড়ে রয়েচে—

সে দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু সিঁড়ির কাছ পর্যন্ত গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় নিম্নস্বরে বলিল—কিন্তু টাকার কথা যেন কাউকে বোলো না ঠাকুরপো! কাউকে না—বুঝলে?

দুর্গা কাঁথার তলা হইতে অত্যন্ত খুশির সহিত ডাকিল—অপু, ও অপু!

অপু জাগিয়াই ছিল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন কথা বলে নাই। বলিল—দিদি, জানালাটা বন্ধ করে দিবি? বড্ড ঠাণ্ডা হাওয়া আসচে।

দুর্গা উঠিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল—রানুর দিদির বিয়ে কবে জানিস? আর কিন্তু বেশি দেরি নেই। খুব ঘটা হবে, ইংরিজি বাজনা আসবে। দেখিচিস্ তুই ইংরিজি বাজনা?

—হাঁ, সব মাথায় টুপি পরে বাজায়, এই বড় বড় বাঁশি—মস্ত বড় ঢাক, আমি দেখেচি—আর একরকম বাঁশি বাজায়, কালো কালো, অত বড় নয়, ফ্লোট বাঁশি বলে—এমন চমৎকার বাজে! ফ্লোট বাঁশি শুনিচিস?

দুর্গা আর একটা কথা ভাবিতেছিল।

কাল সে বৈকালে ওপাড়ার খুড়িমার কাছে বেড়াইতে যায়। একথা-সেকথার পর খুড়িমা জিজ্ঞাসা করিল, দুগ্‌গা, তোর সঙ্গে ঠাকুরপোর কোথায় দেখা হয়েছিল রে?

সে বলিল—কেন খুড়িমা?...পরে সে সেদিনের কথা বলিল। কৌতুকের সুরে বলিল, পথ হারিয়ে খুড়িমা ওতেই—একেবারে গড়ের পুকুর—সেই বনের মধ্যে—

খুড়িমা হাসিয়া বলিল—আমি কাল ঠাকুরপোকে বলছিলাম তোর কথা—বলছিলাম—গরিবের মেয়ে ঠাকুরপো, কিছু দেবার থোবার সাধ্যি তো নেই বাপের—বড্ড ভালো মেয়ে—যেন একালেরই মেয়ে না—তা ওকে নাওগে না? তাই ঠাকুরপো তোর কথা-টথা জিজ্ঞেস করছিল—বল্লে, ঘাটের পথে সেদিন কোথায় দেখা হল—পথ ভুলে ঠাকুরপো কোথায় গিয়ে পড়েছিল—এই সব। তারপর আমি আজ তিনদিন ধরে বল্‌চি শ্বশুর-ঠাকুরকে দিয়ে তোর বাবাকে বলাবো। ঠাকুরপোর যেন মত আছে মনে হল, তোকে যেন মনে লেগেচে—

দুর্গা গোয়াল হইতে বাছুর বাহির করিয়া রৌদ্রে বাঁধিল বটে, কিন্তু অন্যদিন বাড়ির কাজ তবু তো যাহোক কিছু করে, আজ সে ইচ্ছা তাহার মোটেই হইতেছিল না। এক-একদিন, তাহার এরকম মনের ভাব হয়; সেদিন সে কিছুতেই বাড়ির গণ্ডিতে আট্‌কাইয়া থাকিতে পারে না—কে তাহাকে পথে পথে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। আজ যেন হাওয়াটা কেমন সুন্দর, সকালটা না-গরম-না-ঠাণ্ডা, কেমন মিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায় লেবু ফুলের—যেন কি একটা মনে আসে, কি তাহা সে বলিতে পারে না।

বাড়ির বাহির হইয়া সে রানুদের বাড়ি গেল। ভুবন মুখুজ্যে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, এই তাঁর প্রথম মেয়ের বিবাহ, খুব ঘটা করিয়াই বিবাহ হইবে। বাজিওয়ালা আসিয়া বাজির দরদস্তুর করিতেছে। সীতানাথ ও-অঞ্চলের বিখ্যাত রসুনচৌকি বাজিয়ে, তাহারও বায়না হইয়াছে, বিবাহ উপলক্ষে নানাস্থান হইতে কুটুম্বের দল আসিতে শুরু করিয়াছে। তাহাদের ছেলেমেয়েতে বাড়ির উঠান সরগরম।

দুর্গার মনে ভারি আনন্দ হইল—আর দিনকতক পরে ইহাদেরই বাড়িতে কত বাজি পুড়িবে। সে কোনো বাজি কখনও দেখে নাই, কেবল একবার গাঙ্গুলি বাড়ির ফুলদোলে একটা কি বাজি দেখিয়াছিল, হুস্‌ করিয়া আকাশে উঠিয়া একেবারে যেন মেঘের গায়ে গিয়া ঠেকে, সেখান হইতে আবার পড়িয়া যায়, এমন চমৎকার দেখায়!. .অপু বলে, হাউই বাজি।

দুপুরের পর মা দালানে আঁচল বিছাইয়া একটু ঘুমাইয়া পড়িলে, সে সুড়ুৎ করিয়া পুনরায় বাড়ির বাহির হইল। ফাল্গুনের মাঝামাঝি, রৌদ্রের তেজ চড়িয়াছে, একটানা তপ্ত হাওয়ায় রানুদের বাগানের বড় নিমগাছটার হল্‌দে পাতাগুলো ঘুরিতে ঘুরিতে ঝরিয়া পড়িতেছে—কেহ কোনদিকে নাই, নেড়াদের বাড়ির দিকে কে যেন একটা টিন বাজাইতেছে। বু-উ-উ-উ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। কাঁচপোকা! দুর্গা নিজের অনেকটা অজ্ঞাতসারে তাড়াতাড়ি আঁচল মুঠার মধ্যে পাকাইয়া চকিত দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল।

কাঁচপোকা নয়, সুদর্শন পোকা।

তাহার মুঠার আঁচল আপনা-আপনি খুলিয়া গেল—আগ্রহের সহিত পা টিপিয়া টিপিয়া সে পোকাটার দিকে আসিতে লাগিল। সামনের পথের উপর বসিয়াছে, পাখার উপর শ্বেত ও রক্ত চন্দনের ছিটার মতো বিন্দু বিন্দু দাগ।

সুদর্শন পোকা—ঠিক পোকা নয়—ঠাকুর। দেখিতে পাওয়া অত্যন্ত ভাগ্যের কাজ—তাহার মার মুখে, আরও অনেকের মুখে সে শুনিয়াছে। সে সন্তর্পণে ধুলার উপর বসিয়া পড়িল, পরে হাত একবার কপালে ঠেকাইয়া আর একবার পোকার কাছে লইয়া গিয়া বার বার দ্রুতবেগে আবৃত্তি করিতে লাগিল—সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো...সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো...সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো (অবিকল এই রূপই সে অপরের মুখে বলিতে শুনিয়াছে)। পরে সে নিজের কিছু কথা মন্ত্রের

মধ্যে জুড়িয়া দিল—অপুকে ভালো রেখো, মাকে ভালো রেখো, বাবাকে ভালো রেখো, ওপাড়ার খুড়িমাকে ভালো রেখো—পরে একটু ভাবিয়া ইতস্তত করিয়া বলিল—নীরেনবাবুকে ভালো রেখো, আমার বিয়ে যেন ওখানেই হয় সুদর্শন, রানুর দিদির মতো বাজিবাজনা হয়।

ভক্তের অর্ঘ্যের আতিশয্যে পোকাটা ধুলার উপর বিপন্নভাবে চক্রাকারে ঘুরিতেছিল, দুর্গা মনের সাধ মিটাইয়া প্রার্থনা শেষ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত পাশ কাটাইয়া গেল।

পাড়ার ভিতরকার পথে পথে মাথার উপর প্রথম ফাল্গুনের সুনীল, এমন কি অনেকটা ময়ূরকণ্ঠী রং-এর আকাশ গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে।

শ্যাওড়া বনের মাঝখান দিয়া নদীর ঘাটের সরু পথ। সুঁড়ি পথের দুধারেই আমবাগান। তপ্ত বাতাস আম্র-বাউলের মিষ্ট গন্ধে, বনে বনে মৌমাছি ও কাঁচপোকার গুঞ্জনরবে, ছায়াগহন আমবনে কোকিলের ডাকে, স্নিগ্ধ হইয়া আসিতেছে।

বাগানগুলি পার হইয়া চড়কতলার মাঠ। ঘাসে-ভরা মাঠে ছায়া পড়িয়া গিয়াছে। দুর্গা ঝোপের মধ্যে মধ্যে সেঁয়াকুল খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল—সেঁয়াকুল এখন আর বড় থাকে না, শীতের শেষে ঝরিয়া যায়। ওই উঁচু ঢিবিতে ঝোপের মধ্যের একটা গাছে অনেক সেঁয়াকুল সেদিনও তো সে খাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন আর নাই, সব ঝরিয়া গিয়াছে, গোলমরিচের মতো শুক্‌না সেঁয়াকুল ঘন ঝোপের তলা বিছাইয়া পড়িয়া আছে। এক ঝাঁক শালিক পাখি ঝোপের মধ্যে কিচ্ কিচ্ করিতেছিল, দুর্গা নিকটে যাইতে উড়িয়া গেল।

তাহার মনে খুশির আবার একটা প্রবল ঢেউ আসিল। উৎসবের নৈকট্য, রানুর দিদিব বাসরে রাত জাগা ও গান শুনিবার আশা—

খুশিতে তাহার ইচ্ছা হইল সে মাঠের এধাব হইতে ওধার পর্যন্ত ছুটিয়া বেড়ায়।

একবার সে হাত দুটা ছড়াইয়া ডানার মতো লম্বা করিয়া দিয়া খানিকটা ঘুরপাক খাইয়া খানিকটা ছুটিয়া গেল। সে উড়িতে চায়!...শরীর তো হাল্‌কা জিনিস—হাত ছড়াইয়া ডানার মতো বাতাস কাটিতে কাটিতে যদি যাওয়া হইত!

শুধু শব্দ করিবার আনন্দে সে শুক্‌নো ঝবাপাতার রাশির উপর ইচ্ছা করিয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া মচ্ মচ্ শব্দ করিতে করিতে চলিল। পাতা ভাঙিয়া গিয়া শুক্‌না শুক্‌না ধূলা মিশানো, খানিকটা সোঁদা সোঁদা খানিকটা তিক্ত গন্ধে জায়গাটা ভরিয়া গেল।

সাম্‌নে একটু দূরে সোনাডাঙার মাঠের দিকে যাইবার কাঁচা সড়ক। একখানা গরুর গাড়ি ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দে মাঠের পথের দিকে যাইতেছে। টাটকা কাটা কঞ্চির ঘেরা বাঁধিয়া তাহার উপর কাঁথা ও ছেঁড়া লাল নকশাপাড় কাপড় ঘিরিয়া ছই তৈয়ারি করিয়াছে। ছই-এর মধ্যে কাহাদের একটা ছোট মেয়ে একঘেয়ে, একটানা ছেলেমানুষ ধরনে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে—কোন গাঁয়ের চাষাদের মেয়ে বোধ হয় বাপের বাড়ি হইতে শ্বশুরবাড়ি চলিয়াছে।

দুর্গা অবাক্ হইয়া একদৃষ্টে গাড়িখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

বিয়ের পর মা, বাবা, অপু—সব ছাড়িয়া এই রকম কোথায় কতদূরে চলিয়া যাইতে হইবে হয়তো—যখন তখন সেখান হইতে তাহারা আসিতে দিবে কি? সে এতক্ষণ একথা ভাবিয়া দেখে নাই—এই বাগান, বাসকফুলের ঝাড়, রাঙী গাইটা, উঠানের কাঁঠালতলাটা যাহা সে এত ভালোবাসে, এই শুকনো পাতার গন্ধ, ঘাটের পথ এইসব ছাড়িয়া যাইতে হইবে চিরকালের জন্য! ছই-এর মধ্যের ছোট্ট মেয়েটা বোধ হয় সেই দুঃখেই কাঁদিতেছে।

কাঁচা সড়কটা ছাড়াইয়া আর একটা ছোট্ট পোড়ো মাঠ পার হইলেই নদী।

ওপারের জেলেরা কি মাছ ধরিতেছে? খয়রা? এপারে আসিলে দু'পয়সার মাছ কিনিয়া বাড়ি লইয়া যাইত। অপু খয়রা মাছ খাইতে বড় ভালোবাসে।

বাড়ি ফিরিয়া সন্ধ্যার পর সে অনেকক্ষণ ধরিয়া পুতুলের বাক্স গোছাইল। ঘরের মেঝেতে

তাহার মা তেল পুরিতে গিয়া অনেকটা কেরোসিন তেল ফেলিয়া দিয়াছে, তাহার গন্ধ বাহির হইতেছে, হাওয়াটা যেন একটু গরম। পুতুল-গুছানো প্রায় শেষ হইয়াছে, অপু আসিয়া বলিল—তুই বুঝি আমার বাক্স থেকে ছোট্ট আরশিখানা বের করে নিয়েচিস দিদি?

—হুঁ—আরশি তো আমার—আমিই তো আগে দেখতে পেয়েছিলাম, তক্তপোশের নিচে পড়েছিল। যাও, আমি আরশি আমার বাক্সে রাখবো। বেটাছেলে আবার আরশি নিয়ে কি হবে?

—বা রে, তোমার আরশি বই কি? ও-পাড়ার খুড়িমাদের বাড়ি থেকে মা তো কি বের্তোতে আরশি এনেছিল, আমি তো আগেই মা'র কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলাম। না দিদি, দাও—

কথা শেষ করিয়াই সে দিদির পুতুলের বাক্সের কাছে বসিয়া পড়িয়া তাহার মধ্যে আরশি খুঁজিতে লাগিল।

দুর্গা ভাইয়ের গালে এক চড় লাগাইয়া দিয়া বলিল—দুষ্টু কোথাকার—আমি পুতুল গুছিয়ে রাখচি আর উনি হাণ্ডুল-পাণ্ডুল করছেন—যা আমার বাক্সে হাত দিতে হবে না তোমায়—দোবো না আমি আরশি।

কিন্তু কথা শেষ না হইতেই অপু ঝাঁপাইয়া তাহার ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহার রুক্ষ চুলের গোছা ধরিয়া টানিয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কান্না আটকানো গলায় বলিতে লাগিল—কেন তুমি আমাকে মারবে? আমার লাগে না বুঝি?—দাও আমায়—মাকে বোলে দেবো—লক্ষ্মীর চুপ্‌ড়ি থেকে আলতা চুরি কোরেচ—

আলতা চুরির কথায় দুর্গা ক্ষেপিয়া গেল। ভাই-এর কান ধরিয়া তাহাকে ঝাঁকুনি দিয়া উপরি উপরি পটাপট কয়েকটা চড় দিতে দিতে বলিল—আলতা নিইচি?—আমি আলতা নিইচি, লক্ষ্মীছাড়া দুষ্টু বাঁদর! আর তুমি যে লক্ষ্মীর চুপড়ির থেকে কড়িগুলো খুলে লুকিয়ে রেখেচ, মাকে বলে দেবো না?

চিৎকার, কান্না ও মারামারির শব্দ শুনিয়া সর্বজয়া ছুটিয়া আসিল।

ততক্ষণে দুর্গা অপুর কান ধরিয়া তাহাকে মাটিতে প্রায় শোয়াইয়া ফেলিয়াছে—অপুও প্রাণপণে দুর্গার চুলের গোছা মুঠি্ পাকাইয়া টানিয়া এরূপ ধরিয়া আছে, যে দুর্গার মাথা তুলিবার ক্ষমতা নাই।

অপুর লাগিয়াছিল বেশি। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—দ্যাখো না মা, আমার আরশিখানা বাক্স থেকে বের করে নিজের বাক্সে রেখে দিয়েচে—দিচ্ছে না—এমন চড় মেরেচে গালে—

দুর্গা প্রতিবাদ করিয়া বলিল—না মা, দ্যাখো না আমার পুতুলের বাক্স গোছাচ্ছি, ও এসে সেগুলো সব—

সর্বজয়া আসিয়া মেয়ের পিঠের উপর দুম্ দুম্ করিয়া সজোরে কয়েকটি কিল বসাইয়া দিয়া বলিল—ধাড়ি মেয়ে—কেন তুই ওর গায়ে হাত দিবি যখন তখন?—ওতে আর তোতে অনেক তফাৎ জানিস?—আরশি—আরশি তোমার কোন্ পিণ্ডিতে লাগবে শুনি? কথায় কথায় উনি যান ওকে তেড়ে মারতে। মরণ আর কি! পুতুলের বাক্স—রোসো—

কথা শেষ না করিয়াই সে মেয়ের গুছানো পুতুলের বাক্স উঠাইয়া একটান মারিয়া বাহির উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

—ধাড়ি মেয়ের কোনো কাজ নেই, কেবল খাওয়া আর পাড়ায় পাড়ায় টো টো করে বেড়ানো—আর কেবল পুতুলের বাক্স আর পুতুলের বাক্স! ও সব টেনে এক্ষুনি বাঁশবাগানে ফেলে দিয়ে আসচি। দিচ্চি তোমার খেলা ঘুচিয়ে একেবারে—

দুর্গার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। পুতুলের বাক্স তাহার প্রাণ, দিনের মধ্যে দশবার সে পুতুলের বাক্স গোছায়—পুতুল, রাংতা, ছোপানো কাপড়, আলতা, কত কষ্টের সংগ্রহ করা নাটফল, টিনমোড়া আরশিখানা, পাখির বাসা—সব অন্ধকার উঠানের মধ্যে কোথায় কি ছড়াইয়া পড়িল। মা

যে তাহার পুতুলের বাক্স এরূপ নির্মমভাবে ফেলিয়া দিতে পারে, একথা কখনও সে ভাবিতে পারিত না! কত কষ্টে কত জায়গা হইতে জোগাড় করা কত জিনিস উহার মধ্যে!

কোনো কথা বলিতে সাহস না করিয়া সে কেমন অবাক হইয়া রহিল।

অপুর কাছেও বোধ হয় শাস্তিটা কিন্তু বেশি কঠোর বলিয়াই ঠেকিল। সে আর কোনো কথা না বলিয়া চুপচাপ গিয়া শুইয়া পড়িল।

রাত্রি অনেক হইয়াছে, মেজেতে কেরোসিন তেলের গন্ধ বাহির হইতেছে, ঘরের মধ্যে বাঁশবাগানের মশা বিন্ বিন্ করিতেছে। খানিকক্ষণ বসিয়া বসিয়া দুর্গা গিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

ভাঙা জানালা দিয়া ফাগুন জ্যোৎস্নার আলো বিছানায় পড়িয়াছে, পোড়ো ভিটার দিক হইতে ভুর ভুর করিয়া লেবু ফুলের গন্ধ আসিতেছে।

একবার তাহার মনে হইল উঠিয়া গিয়া পুতুলের বাক্সটা ও ছড়ানো জিনিসগুলা তুলিয়া আনে—কাল সকালে কি আর পাওয়া যাইবে? কত কষ্টের জিনিসগুলা! কিন্তু সাহস পাইল না। আনিতে গেলে মা যদি আবার মারে?

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। হঠাৎ সে গায়ের উপর কাহার হাত অনুভব করিল। অপু ভয়ে ভয়ে ডাকিল—দিদি? দুর্গা কোনো জবাব দিবার পূর্বেই অপু বালিশে মুখ গুঁজিয়া হাউ হাউ কবিয়া কাঁদিয়া উঠিল—আমি আর করবো না—আমার ওপর রাগ করিসনে দিদি—তোর পায়ে পড়ি। কান্নাব আবেগে তাহার গলা আটকাইয়া যাইতে লাগিল।

দুর্গা প্রথমটা বিস্মিত হইল—পরে সে উঠিয়া বসিয়া ভাইয়ের কান্না থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।—কাঁদিসনে, চুপ চুপ, মা শুনতে পেলে আবার আমায় বকবে, চুপ, কাঁদতে নেই—আচ্ছা আমি রাগ করবো না, কেঁদো না ছিঃ—চুপ—

তাহার ভয় হইতেছিল অপুর কান্না শুনিলে মা আবাব হয়তো তাহাকেই মারিবে।

অনেক করিয়া সে ভাইয়ের কান্না থামাইল। পরে শুইয়া শুইয়া তাহাকে নানান গল্প, বিশেষত রানুর দিদির বিয়ের গল্প বলিতে লাগিল। একথা-ওকথাব পর অপু দিদিব গায়ে হাত দিয়া চুপি চুপি বলিল—একটা কথা বলবো দিদি?—তোর সঙ্গে মাস্টার মশায়ের বিয়ে হবে --

দুর্গার লজ্জা হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাব অত্যন্ত কৌতূহলও হইল; কিন্তু ছোট ভাই-এর কাছে এ সম্বন্ধে কোনো কথাবার্তা বলিতে তাহার সংকোচ হওয়াতে সে চুপ করিয়া রহিল।

অপু আবার বলিল—খুড়িমা বলছিল রানুর মায়ের কাছে আজ বিকালে। মাস্টার মশায়ের নাকি অমত নেই—

কৌতূহলের আবেগে চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল—হ্যাঁ বলছিল—যাঃ—তোর সব যেমন কথা—

অপু প্রায় বিছানায় উঠিয়া বসিল,—সত্যি বল্‌চি দিদি, তোর গা ছুঁয়ে বল্‌চি। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে, আমাকে দেখেই তো কথা উঠল। বাবাকে দিয়ে পত্তর লেখাবে সেই মাস্টার মশায়ের বাবা যেখানে থাকেন সেখানে—

—মা জানে?

—আমি এসে মাকে জিজ্ঞেস করবো ভাবলাম—ভুলে গিইচি। জিজ্ঞেস করবো দিদি? মা বোধ হয় শোনে নি; কাল খুড়িমা মাকে ডেকে নিয়ে বলবে বলছিল—

পরে সে বলিল—তুই কত রেলগাড়ি চড়বি দেখিস, মাস্টার মশাইরা থাকেন এখান থেকে অনেক দূরে—রেলে যেতে হয়—

দুর্গা চুপ করিয়া রহিল।

সে রেলগাড়ির ছবি দেখিয়াছে—অপুর একখানা বইয়ের মধ্যে আছে। খুব লম্বা, অনেকগুলো

চাকা, সামনের দিকে কল, সেখানে আগুন দেওয়া আছে, ধোঁয়া ওড়ে। রেলগাড়িখানা আগাগোড়া লোহার, চাকাও তাই—গরুর গাড়ির মতো কাঠের চাকা নয়। রেল লাইনের ধারে কোনো খড়ের বাড়ি নাই, থাকিতে পারে না, পুড়িয়া যায়। রেলগাড়ি যখন চলে তখন তাহার নল হইতে আগুন বাহির হয় কিনা! সে ভাই-এর গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—তোকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। তাহার পর দুজনেই চুপ করিয়া ঘুমাইবার জোগাড় করিল। ঘুমাইতে গিয়া একটা কথা বার বার দুর্গার মনে হইতেছিল—ঠাকুর সুদর্শন তাহার কথা শুনিয়াছেন! আজই তো সুদর্শনের কাছে সে—ঠাকুরের বড্ড দয়া—মা তো ঠিক কথা বলে!

অপু বলিল—লীলাদির জন্যে কেমন চমৎকার শাড়ি কেনা হয়েচে, আজ লীলাদির কাকা বিয়ের জন্যে কিনে এনেচে রানাঘাট থেকে, সেজ জেঠিমা বললে—বালুচরের শাড়ি—

দুর্গা হাসিমুখে বলিল—একটা ছড়া জানিস?...পিসি বলতো,

বালুচরের বালুর চরে একটা কথা কই—
মোষের পেটে ময়ূরছানা দেখে এলাম সই।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

অপু কাউকে একথা এখনও বলে নাই—তাহার দিদিকেও না।

সেদিন চুপি চুপি দুপুরে সে যখন তাহার বাবার ওই বই-বোঝাই কাঠের সিন্দুকটা লুকাইয়া খুলিয়াছিল, সিন্দুকটার মধ্যে একখানা বই-এর মধ্যেই এই অদ্ভুত কথাটার সন্ধান পাইয়াছে!

উঠানের উপর বাঁশঝাড়ের ছায়া তখন পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ হয় নাই, ঠিক-দুপুরে সোনাডাঙার তেপান্তর মাঠের সেই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের ছায়ার মতো এক জায়গায় একরাশ ছায়া জমাট বাঁধিয়া ছিল।

একদিন সে দুপুরবেলা বাপের অনুপস্থিতিতে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া চুপি চুপি বই-এর বাক্সটা লুকাইয়া খুলিল। অধীর আগ্রহের সহিত সে এ-বই ও-বই খুলিয়া খানিকটা করিয়া ছবি দেখিতে এবং খানিকটা করিয়া বই-এর মধ্যে ভালো গল্প লেখা আছে কি না দেখিতে লাগিল। একখানা বই-এর মলাট খুলিয়া দেখিল নাম লেখা আছে 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ'। ইহার অর্থ কি, বইখানা কোন্ বিষয়ের তাহা সে বিন্দুবিসর্গও বুঝিল না। বইখানা খুলিতেই একদল কাগজ-কাটা পোকা নিঃশব্দে বিবর্ণ মার্বেল কাগজের নিচে হইতে বাহির হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে যেদিকে দুই চোখ যায় দৌড় দিল। অপু বইখানা নাকের কাছে লইয়া গিয়া ঘ্রাণ হইল, কেমন পুরানো গন্ধ! মেটে রঙের পুরু পুরু পাতাগুলোর এই গন্ধটা তাহার বড় ভালো লাগে—গন্ধটায় কেবলই বাবার কথা মনে করাইয়া দেয়। যখনই এ গন্ধ সে পায় তখনই কি জানি কেন তাহার বাবার কথা মনে পড়ে।

অত্যন্ত পুরানো মার্বেল কাগজের বাঁধাই করা মলাটের নানাস্থানে চটা উঠিয়া গিয়াছে। এই পুরানো বই-এর উপরই তাহার প্রধান মোহ। সেজন্য সে বইখানা বালিশের তলায় লুকাইয়া রাখিয়া অন্যান্য বই তুলিয়া বাক্স বন্ধ করিয়া দিল।

লুকাইয়া পড়িতে পড়িতে এই বইখানিতেই একদিন সে পড়িল বড় অদ্ভুত কথাটা! হঠাৎ শুনিলে মানুষ আশ্চর্য হইয়া যায় বটে—কিন্তু ছাপার অক্ষরে বইখানার মধ্যে এ কথা লেখা আছে, সে পড়িয়া দেখিল। পারদের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে লেখক লিখিয়াছেন—শকুনির ডিমের মধ্যে পারদ পুরিয়া কয়েকদিন রৌদ্রে রাখিতে হয়, পরে সেই ডিম মুখের ভিতর পুরিয়া মানুষ ইচ্ছা করিলে শূন্যমার্গে বিচরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

অপু নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না,—আবার পড়িল—আবার পড়িল।

পরে নিজের ডালাভাঙা বাক্সটার মধ্যে বইখানা লুকাইয়া রাখিয়া বাহিরে গিয়া কথাটা ভাবিতে ভাবিতে সে অবাক হইয়া গেল।

দিদিকে জিজ্ঞাসা করে—শকুনিরা বাসা বাঁধে কোথায় জানিস দিদি?

তাহার দিদি বলিতে পারে না। সে পাড়ার ছেলেদের—সতু, নীলু, কিনু, পটল, নেড়া—সকলকে জিজ্ঞাসা করে। কেউ বলে সে এখানে নয়; উত্তর মাঠে উঁচু গাছের মাথায়। তাহার মা বকে—এই দুপুরবেলা কোথায় ঘুরে বেড়াস্! অপু ঘরে ঢুকিয়া শুইবার ভান করে, বইখানা খুলিয়া সেই জায়গাটা আবার পড়িয়া দেখে—আশ্চর্য! এত সহজে উড়িবার উপায়টা কেউ জানে না? হয়তো এই বইখানা আর কাহারও বাড়ি নাই, শুধু তাহার বাবারই আছে; হয়তো এই জায়গাটা আর কেহ পড়িয়া দেখে নাই, শুধু তাহারই চোখে পড়িয়াছে এতদিনে।

বইখানার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আবার সে আঘ্রাণ লয়—সেই পুরানো পুরানো গন্ধটা! এই বইয়ে যাহা লেখা আছে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোন অবিশ্বাস থাকে না।

পারদের জন্য ভাবনা নাই—পারদ মানে পারা সে জানে। আয়নার পেছনে পারা মাখানো থাকে, একখানা ভাঙা আয়না বাড়িতে আছে, উহা জোগাড় করিতে পারিবে এখন। কিন্তু শকুনির ডিম এখন সে কোথায় পায়?

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে এক একদিন তাহার দিদি ডাকে—আয় শোন্ অপু, মজা দেখবি আয়। পরে সে একমুঠো পাতের ভাত লইয়া বাড়ির খিড়কি-দোরের বাঁশবাগানে গিয়া হাঁক দেয়—আয় ভুলো—তু-উ-উ-উ। ডাক দিয়াই দুর্গা ভাইয়ের দিকে হাসি হাসি মুখে চুপ করিযা চাহিয়া থাকে, যেন কি অপূর্ব রহস্যপুরীর দুয়ার এখনই তাহাদের চোখের সামনে খুলিয়া যায়! হঠাৎ কোথা হইতে কুকুরটা আসিয়া পড়িতেই দুর্গা হাত তুলিয়া বলিযা উঠে—ওই এসেচে! কোত্থেকে এলো দেখলি?—খুশিতে সে হিহি করিয়া হাসে।

রোজ রোজ এই কুকুরকে ভাত খাওয়ানোর ব্যাপারে দুর্গার আমোদ হয় ভারি।—তুমি হাঁক দেও, কেউ কোথাও নাই, চারিদিকে চুপ! ভাত মাটিতে নামাইয়া দুর্গা চোখ বুজিয়া থাকে, আশা ও কৌতূহলের ব্যাকুলতায় বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করে; মনে মনে ভাবে—আজ ভুলো আসবে না বোধ হয়, দেখি দিকি কোত্থেকে আসে! আজ কি আর শুনতে পেয়েছে!—

হঠাৎ ঘনঝোপে একটা শব্দ ওঠে—

চক্ষের নিমেষে বনজঙ্গলেব লতাপাতা ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভুলো কোথা হইতে নক্ষত্রবেগে আসিয়া হাজির।

অমনি দুর্গার সমস্ত গা দিয়া একটা কিসের স্রোত বহিয়া যায়। বিস্ময় ও কৌতুকে তাহার মুখ-চোখ উজ্জ্বল দেখায়! মনে মনে ভাবে—ঠিক শুনতে পায় তো, আসে কোত্থেকে! আচ্ছা কাল একটু চুপি চুপি ডেকে দেখবো দিকি, তাও শুনতে পাবে?

এই আমোদ উপভোগ করিতে সে মায়ের বকুনি সহ্য করিয়াও রোজ খাইবার সময় নিজে বরং কিছু কম খাইয়া কুকুরের জন্য কিছু ভাত পাতে সঞ্চয় করিয়া রাখে।

অপু কিন্তু দিদির কুকুর ডাকিবার মধ্যে কি আমোদ আছে তাহা খুঁজিয়া পায় না। দিদির ওসব মেয়েলি ব্যাপারের মধ্যে সে নাই। অধীর আগ্রহে ভোজনরত শীর্ণ কুকুরটার দিকে সে চাহিয়াও দেখে না, শুধু শকুনির ডিমের কথা ভাবে।

অবশেষে সন্ধান মিলিল। হীরু নাপিতের কাঁঠালতলায় রাখালেরা গরু বাঁধিয়া গৃহস্থের বাড়িতে তেল-তামাক আনিতে যায়। অপু গিয়া তাহাদের পাড়ার রাখালকে বলিল—তোরা কত মাঠে মাঠে বেড়াস, শকুনির বাসা দেখতে পাস? আমায় যদি একটা শকুনির ডিম এনে দিস আমি দুটো পয়সা দেবো।

দিন-চারেক পরেই রাখাল তাহাদের বাড়ির সামনে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া কোমরের

থলি হইতে দুইটা কালো রং-এর ছোট ছোট ডিম বাহির করিয়া বলিল—এই দ্যাখো ঠাকুর এনিচি।

অপু তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিল—দেখি। পরে আহ্লাদের সহিত উলটাইতে-পালটাইতে বলিল—শকুনির ডিম! ঠিক তো?

রাখাল সে সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ উত্থাপিত করিল। ইহা শকুনির ডিম কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নাই, সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কোথাকার কোন্ উঁচু গাছের মগডাল হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে—কিন্তু দুই আনার কমে দিবে না।

পারিশ্রমিক শুনিয়া অপু অন্ধকার দেখিল। বলিল, দুটো পয়সা দেবো, আর আমার কড়িগুলো নিবি? সব দিয়ে দেবো, এক টিনের ঠোঙা কড়ি—সব। এই এত বড় বড় সোনাগেঁটে—দেখবি, দেখাবো?

রাখালকে সাংসারিক বিষয়ে অপুর অপেক্ষা অনেক হুঁশিয়ার বলিয়া মনে হইল। সে নগদ পয়সা ছাড়া কোনো রকমেই রাজি হয় না। অনেক দরদস্তুরের পর আসিয়া চার পয়সায় দাঁড়াইল। অপু দিদির কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া দুটা পয়সা জোগাড় করিয়া তাহাকে চুকাইয়া দিয়া ডিম দুটি লইল। তাহা ছাড়া রাখাল কিছু কড়িও লইল। এই কড়িগুলা অপুর প্রাণ, অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার বিনিময়েও সে এই কড়ি কখনও হাতছাড়া করিত না অন্য সময়; কিন্তু আকাশে উড়িবার আমোদের কাছে কি আর বেগুন-বীচি খেলা!

ডিমটা হাতে করিয়া তাহার মনটা যেন ফুঁ-দেওয়া রবারের বেলুনের মতো হালকা হইয়া ফুলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা সন্দেহের ছায়া তাহার মনে আসিয়া পৌঁছিল, এটুকু এতক্ষণ ছিল না, ডিম হাতে পাওয়ার পর হইতে যেন কোথা হইতে ওটুকু দেখা দিল খুব অস্পষ্ট। সন্ধ্যার আগে আপনমনে নেড়াদের জামগাছের কাটা গুঁড়ির উপর বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, সত্যি সত্যি উড়া যাইবে তো! সে উড়িয়া কোথায় যাইবে? মামার বাড়ির দেশে? বাবা যেখানে আছে সেখানে? নদীর ওপারে? শালিখ পাখি ময়না পাখির মতো ও-ই আকাশের গায়ে তারাটা যেখানে উঠিয়াছে?

সেই দিনই, কি তাহার পরদিন। সন্ধ্যার একটু আগে দুর্গা সলিতার জন্য ছেঁড়া নেকড়া খুঁজিতেছিল। তাকের হাঁড়ি-কলসির পাশে গোঁজা সলিতা পাকাইবার ছোঁড়া-খোড়া কাপড়ের টুকরার তাল হাতড়াইতে হাতড়াইতে কি যেন ঠক্ করিয়া তাহার পিছন হইতে গড়াইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর অন্ধকার, ভালো দেখা যায় না, দুর্গা মেজে হইতে উঠাইয়া লইয়া বাইরে আসিয়া বলিল—ওমা কিসের দুটো বড় বড় ডিম এখানে। এঃ, পড়ে একেবারে গুঁড়ো হয়ে গিয়েচে—দেখেচো কি পাখি ডিম পেড়েচে ঘরের মধ্যে মা!

তাহার পর কি ঘটিল, সে কথা না তোলাই ভালো। অপু সেদিন রাত্রে খাইল না...কান্না...হৈ হৈ কাণ্ড। তাহার মা ঘাটে গল্প করে—ছেলেটার যে কি কাণ্ড, ওমা এমন কথা তো কখনও শুনি নি—শুনেচো সেজ ঠাকুরঝি, শকুনির ডিম নিয়ে নাকি মানুষে উড়তে পারে—ওই ওদের বাড়ির রাখাল ছোঁড়াটা, বদ্‌মায়েশের ধাড়ি। তাকে বুঝি বলেচে, সে কোত্থেকে দুটো কাগের না কিসের ডিম এনে বলেচে,—এই নেও শকুনির ডিম। তাই নাকি, আবার চার পয়সা দিয়ে কিনেচে তার কাছে। ছেলেটা যে কি বোকা সে আর তোমার কাছে কি বলবো সেজ ঠাকুরঝি—কি করি যে এ ছেলে নিয়ে আমি!

কিন্তু বেচারি সর্বজয়া কি করিয়া জানিবে, সকলেই তো কিছু 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ' পড়ে নাই, বা সকলেই কিছু পারদের গুণও জানে না।

আকাশে তাহা হইলে তো সকলেই উড়িত!

বিংশ পরিচ্ছেদ

অনেকদিন হইতে গ্রামের বৃদ্ধ নরোত্তম দাস বাবাজির সঙ্গে অপুর বড় ভাব। গাঙ্গুলি পাড়ার গৌরবর্ণ দিব্যকান্তি, সদানন্দ বৃদ্ধ সামান্য খড়ের ঘরে বাস করেন। বিশেষ গোলমাল ভালোবাসেন না, প্রায়ই নির্জনে থাকেন, সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে গাঙ্গুলিদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া বসেন। অপুর বাল্যকাল হইতেই হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া মাঝে মাঝে নরোত্তম দাসের কাছে লইয়া যাইত—সেই হইতেই দুজনের মধ্যে খুব ভাব। মাঝে মাঝে অপু গিয়া বৃদ্ধের নিকট হাজির হয়, ডাক দেয়,—দাদু আছো? বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া তালপাতার চাটাইখানা দাওয়ায় পাতিয়া দিয়া বলেন—এসো দাদাভাই এসো, বসো বসো—

অন্যস্থানে অপু মুখচোবা, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না—কিন্তু এই সরল শান্তদর্শন বৃদ্ধের সঙ্গে সে সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে মিশিয়া থাকে, বৃদ্ধের সঙ্গে তাহার আলাপ, খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপের মতো ঘনিষ্ঠ, বাধাহীন ও উল্লাস-ভরা! নরোত্তম দাসের কেহ নাই, বৃদ্ধ একাই থাকেন—এক স্বজাতীয় বৈষ্ণবের মেয়ে কাজকর্ম করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। অনেক সময় সারা বিকাল ধরিয়া অপু বসিয়া বসিয়া গল্প শোনে ও গল্প করে। একথা সে জানে যে, নরোত্তম দাস বাবাজি তাহার বাবার অপেক্ষাও বয়সে অনেক বড়, অন্নদা রায়েব অপেক্ষাও বড়—কিন্তু এই বয়োবৃদ্ধতার জন্যই অপুর কেমন যেন মনে হয় বৃদ্ধ তাহার সতীর্থ, এখানে আসিলে তাহার সকল সংকোচ, সকল লজ্জা আপনা হইতেই ঘুচিয়া যায়। গল্প করিতে করিতে, অপু মন খুলিয়া হাসে, এমন সব কথা বলে যাহা অন্যস্থানে সে ভয়ে বলিতে পারে না, পাছে প্রবীণ লোকেরা কেহ ধমক দিয়া 'জ্যাঠা ছেলে' বলে। নরোত্তম দাস বলেন—দাদু, তুমি আমার গৌর,—তোমাকে দেখলে আমার মনে হয় দাদু, আমার গৌর তোমার বয়সে ঠিক তোমার মতই সুন্দর, সুশ্রী, নিষ্পাপ ছিলেন—ওইরকম ভাব-মাখানো চোখ ছিল তাঁরও—

অন্যস্থানে এ কথায় অপুর হয়তো লজ্জা হইত, এখানে সে হাসিয়া বলে—দাদু তা হলে এবার তুমি আমায় সেই বইখানার ছবি দেখাও।

বৃদ্ধ ঘর হইতে 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা' খানা বাহির করিযা আনেন। তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ, নির্জনে পড়িতে পড়িতে তিনি মুগ্ধ বিভোর হইয়া থাকেন। ছবি মোট দু'খানি, দেখানো শেষ হইয়া গেলে বৃদ্ধ বলেন, আমি মরবাব সময়ে বইখানা তোমাকে দিয়ে যাবো দাদু, তোমার হাতে বইয়ের অপমান হবে না—

তাঁহার এক শিষ্য মাঝে মাঝে পদ রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইতে আসিত। বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া বলিতেন, পদ বেঁধেচো বেশ করেচো, ওসব আমায় শুনিয়ো না বাপু, পদকর্তা ছিলেন বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস—তাঁদের পর ওসব আমার কানে বাজে—ওসব গিয়ে অন্য জায়গায় শোনাও।

সহজ, সামান্য, অনাড়ম্বর জীবনের গতিপথ বাহিয়া এখানে কেমন যেন একটা অন্তঃসলিলা মুক্তির ধারা বহিতে থাকে, অপুর মন সেটুকু কেমন করিয়া ধরিয়া ফেলে। তাহার কাছে তাহা তাজা মাটি, পাখি, গাছপালার সাহচর্যের মতো অন্তরঙ্গ ও আনন্দপূর্ণ ঠেকে বলিয়াই দাদুর কাছে আসিবার আকর্ষণ তাহার এত প্রবল।

ফিরিবার সময় অপু নরোত্তম দাসের উঠানের গাছতলাটা হইতে একরাশি মুচুকুন্দ-চাঁপা ফুল কুড়াইয়া আনে। বিছানায় সেগুলি সে রাখিয়া দেয়। তাহার পরে সন্ধ্যায় আলো জ্বলিলেই বাবার আদেশে পড়িতে বসিতে হয়। ঘণ্টা-খানেকের বেশি কোনোদিনই পড়িতে হয় না, কিন্তু অপুর মনে হয় কত রাতই যে হইয়া গেল! পরে ছুটি পাইয়া সে শুইতে যায়, বিছানায় শুইয়া পড়ে,—আর অমনি আজকার দিনের সকল খেলাধুলা, সারাদিনের সকল আনন্দের স্মৃতিতে ভরপুর হইয়া বিছানায় রাখা

মুচকুন্দ-চাঁপার গন্ধ তাহার ক্লান্ত দেহমনকে খেলাধুলার অতীত ক্ষণগুলির জন্য বিরহাতুর বালক-প্রাণকে অভিভূত করিয়া বহিতে থাকে। বিছানায় উপুড় হইয়া ফুলের রাশির মধ্যে মুখ ডুবাইয়া সে অনেকক্ষণ ঘ্রাণ লয়।

সেদিন তাহার দিদি চুপি চুপি বলে—চড়ুইভাতি কর্‌বি অপু?

তাহাদের দোর দিয়া পাড়ার সকলে কুলুই-চণ্ডীর ব্রতের বন-ভোজনে গ্রামের পিছনের মাঠে যায়, তাহার মাও যায়। কিন্তু তাহাকে লইয়া যায় না। সেখানে সব নিজের নিজের জিনিসপত্র। অত চাল-ডাল তাহাদের নাই। আর বন-ভোজনে গিয়া সকলে বাহির করে কত কি জিনিস, ভালো চাল, ডাল, ঘি, দুধ—তাহার মা বাহির করে শুধু মোটা চাল, মটরের-ডাল-বাটা, আর দুই একটি বেগুন। পাশে বসিয়া ভুবন মুখুজ্যেদের সেজ ঠাক্‌রুনের ছেলেমেয়েরা নতুন আখের গুড়ের পাটালি দিয়া দুধ ও কলা মাখিয়া ভাত খায়, নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য তাহার মায়ের মন কেমন করে।

তাহার অপুও ওই-রকম দুধ কলা দিয়া পাটালি মাখিয়া ভাত খাইতে ভালোবাসে!...

শান্ত মাঠের ধারের বনে রাঙা সন্ধ্যা নামে, বাঁশবনের পথে ফিরিতে শুধু ছেলের মুখই মনে পড়ে।

নীলমণি রায়ের জঙ্গলাকীর্ণ ভিটার ওধারের খানিকটা বন দুর্গা নিজের হাতে দা দিয়া কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া ভাইকে বলিল—দাঁড়িয়ে দ্যাখ্ তেঁতুলতলায় মা আস্‌চে কিনা—আমি চাল বের করে নিয়ে আসি শিগ্‌গির করে—

একটা ভালো নারিকেলের মালায় দুই পলা তেল চুপি চুপি তেলের ভাঁড়টা হইতে বাহির করিয়া আনিল। অপহৃত মালামাল বাহিরে আনিয়া ভাইয়ের জিম্মা করিয়া বলিল—শিগ্‌গির নিয়ে যা, দৌড়ো অপু—সেইখানে রেখে আয়, দেখিস যেন গরু-টরুতে খেয়ে ফেলে না—

এমন সময় মাতোর মা তাহার ছোট ছেলেকে পিছনে লইয়া খিড়কির দোর দিয়া উঠানে ঢুকিল। দুর্গা বলিল—এদিকে কোত্থেকে তমরেজের বৌ?

মাতোর মায়ের বয়সও খুব বেশি নয়, দেখিতেও মন্দ ছিল না, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর হইতেই কষ্টে পড়িয়া মলিন ও শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বলিল—কুঠির মাঠে গিয়েছিলাম কাঠ কুড়ুতি—বুঁইচের মালা নেবা?

দুর্গা তো বন-বাগান খুঁজিয়া নিজেই কত বৈঁচিফল প্রায়ই তুলিয়া আনে, ঘাড় নাড়াইয়া বলিল—সে কিনিবে না।

মাতোর মা বলিল—নেও না দিদি ঠাক্‌রোন, বেশ মিষ্টি বুঁইচে মধুখালির বিলির ধারে থে তুলেলাম—কোঁচড় হইতে একগাছা মালা বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখো কত বড় বড়! কাঠ নিয়ে বাজারে যেতি, বিক্রি কত্তি, পয়সা পেতি বড্ড বেলা হয়ে যাবে, মাতোরে ততক্ষণ এক পয়সার মুড়ি কিনে দেতাম। নেও, পয়সায় দু গাছ দেবানি—

দুর্গা রাজি হইল না, বলিল—অপু, ঘটিতে একগাল খানিক চালভাজা আছে, নিয়ে এসে মাতোর হাতে দে তো!

উহারা খিড়কি দোর দিয়াই পুনরায় বাহির হইয়া গেলে দুজনে জিনিসপত্র লইয়া চলিল।

চারিদিক বনে ঘেরা। বাহির হইতে দেখা যায় না। খেলাঘরের মাটির ছোবার মতো ছোট্ট একটি হাঁড়িতে দুর্গা ভাত চড়াইয়া দিয়া বলিল—এই দ্যাখ্ অপু, কত বড় বড় মেটে আলুর ফল নিয়ে এসিচি এক জায়গা থেকে। পুঁটিদের তালতলায় একটা ঝোপের মাথায় অনেক হয়ে আছে, ভাতে দোবো...

অপু মহা উৎসাহে শুকনা লতা-কাটি কুড়াইয়া আনে। এই তাহাদের প্রথম বন-ভোজন। অপুর এখনও বিশ্বাস হইতেছিল না যে, এখানে সত্যিকারের ভাত-তরকারি রান্না হইবে, না খেলাঘরের

বন-ভোজন, যা কতবার হইয়াছে, সে রকম হইবে,—ধুলার ভাত, খাপরার আলুভাজা, কাঁঠাল পাতার লুচি?

কিন্তু বড় সুন্দর বেলাটি!—বড় সুন্দর স্থান বন-ভোজনের! চারিধারে বনঝোপ, ওদিকে তেলাকুচা লতার দুলুনি, বেলগাছের তলে জঙ্গলে শ্যাওড়া গাছে ফুলের ঝাড়, আধপোড়া কটা দূর্বাঘাসের উপর খঞ্জন পাখিরা নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, নির্জন ঝোপ-ঝাপের আড়ালে নিভৃত নিরালা স্থানটি। প্রথম বসন্তের দিনে ঝোপে ঝোপে নতুন কচি পাতা, ঘেঁটুফুলের ঝাড় পোড়ো ভিটাটা আলো করিয়া ফুটিয়া আছে, বাতাবি লেবু গাছটায় কয়দিনের কুয়াশায় ফুল অনেক ঝরিয়া গেলেও থোপা থোপা সাদা সাদা ফুল উপরেব ডালে চোখে পড়ে।

দুর্গা আজকাল যেন এই গাছপালা, পথঘাট এই অতি পরিচিত গ্রামের প্রতি অন্ধিসন্ধিকে অত্যন্ত বেশি করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছে। আসন্ন বিরহের কোন্ বিষাদে এই কত প্রিয় গাবতলার পথটি, ওই তাহাদের বাড়ির পিছনের বাঁশবন, ছায়াভরা নদীর ঘাটটি আচ্ছন্ন থাকে। তাহার অপু—তাহার সোনার খোকা ভাইটি, যাহাকে এক বেলা না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না, মন হু-হু করে—তাহাকে ফেলিয়া সে কতদূর যাইবে!

আর যদি সে না ফেরে—যদি নিতম পিসির মতো হয়?

এই ভিটাতেই নিতম পিসি ছিল, বিবাহ হইয়া কতদিন আগে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আর বাপের ভিটাতে ফিরিয়া আসে নাই। অনেককাল আগেব কথা—ছেলেবেলা হইতে গল্প শুনিয়া আসিতেছে। সকলে বলে বিবাহ হইয়াছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়—সে কতদূরে? কোথায়? কেহ আব তাহার খোঁজখবব করে না, আছে কি নাই, কেহ জানে না। বাপকে নিতম পিসি আর দেখে নাই, মাকে আর দেখে নাই, ভাই-বোনকেও না। সব একে একে মবিযা গিযাছে। মাগো, মানুষ কেমন করিয়া এমন নিষ্ঠুর হয়! কেন তাহার খোঁজ কেহ যে আব করে নাই! কতদিন সে নির্জনে এই নিতম পিসিব কথা ভাবিয়া চোখের জল ফেলিয়াছে! আজ যদি হঠাৎ সে ফিরিয়া আসে—এই ঘোর জঙ্গল-ভরা জনশূন্য বাপেব ভিটা দেখিয়া কি ভাবিবে?

তাহারও যদি ওইরকম হয়? ওই তাহার বাবাকে, মাকে, অপুকে ছাড়িযা—আব কখনও দেখা হইবে না—কখনও না—কখনও না—এই তাহাদের বাড়ি, গাবতলা, ঘাটের পথ?

ভাবিলে গা শিহরিয়া ওঠে, দরকাব নাই। কি জানি কেন আজকাল তাহার মনে হয় একটা কিছু তাহার জীবনে শীঘ্র ঘটিবে। একটা এমন কিছু জীবনে শীঘ্রই আসিতেছে যাহা আর কখনও আসে না। দিন-রাতে খেলা-ধুলার, কাজ-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে এ কথা তাহার প্রায়ই মনে হয়...ঠিক সে বুঝিতে পারে না তাহা কি, বা কেমন করিয়া সেটার আসিবার কথা মনে উঠে, তবুও মনে হয়, কেবলই মনে হয়, তাহা আসিতেছে...আসিতেছে...শীঘ্রই আসিতেছে...

চড়ুই-ভাতির মাঝামাঝি অপুদের বাড়ির উঠানে কাহার ডাক শোনা গেল। দুর্গা বলিল—বিনির গলা যেন—নিয়ে আয় তো ডেকে অপু। একটু পরে অপুর পিছনে পিছনে দুর্গার সমবয়সি একটি কালো মেয়ে আসিল—একটু হাসিয়া যেন কতকটা সম্ভ্রমের সুরে বলিল—কি হচ্চে দুর্গা দিদি?

দুর্গা বলিল—আয় না বিনি, চড়ুই-ভাতি কচ্চি—বোস্—

মেয়েটি ও পাড়ার কালীনাথ চক্কত্তির মেয়ে—পরনে আধময়লা শাড়ি, হাতে সরু সরু কাচের চুড়ি, একটু লম্বা গড়ন, মুখ নিতান্ত সাদাসিধা। তাহার বাপ যুগীর বামুন বলিয়া সামাজিক ব্যাপারে পাড়ায় তাহাদের নিমন্ত্রণ হয় না, গ্রামের একপাশে নিতান্ত সংকুচিত ভাবে বাস করে। অবস্থাও ভালো নয়। বিনি দুর্গার ফরমাইজ খাটিতে লাগিল খুব। বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ সে যেন একটা লাভজনক ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এখন ইহারা তাহাকে সে উৎসবের অংশীদার স্বীকার করিবে কি না করিবে—এরূপ একটা দ্বিধামিশ্রিত উল্লাসের ভাব তাহার কথাবার্তায় ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পাইতেছিল। দুর্গা বলিল—বিনি, আর দুটো শুকনো কাঠ দ্যাখ্ তো—আগুনটা জ্বলচে না ভালো—

বিনি তখনই কাঠ আনিতে ছুটিল এবং একটু পরে এক বোঝা শুকনো বেলের ডাল আনিয়া হাজির করিয়া বলিল—এতে হবে দুগ্‌গা দিদি—না আর আন্‌বো?...

দুর্গা যখন বলিল—বিনি এসেচে—ও-ও তো এখানে খাবে—আর দুটো চাল নিয়ে আয় অপু—

বিনির মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খানিকটা পরে বিনি জল আনিয়া দিল। আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—কি কি তরকারি দুগ্‌গা দিদি?

ভাত নামাইয়া দুর্গা তেলটুকু দিয়া বেগুন তাহাতে ফেলিয়া দিয়া ভাজে। খানিকটা পরে সে অবাক হইয়া ছোবার দিকে চাহিয়া থাকে, অপুকে ডাকিয়া বলে—ঠিক একেবারে সত্যিকারের বেগুন ভাজার মতো রং হচ্চে দেখচিস অপু! ঠিক যেন মা'র রান্না বেগুন-ভাজা না?

অপুরও ব্যাপারটা আশ্চর্য বোধ হয়। তাহারও এতক্ষণ যেন বিশ্বাস হইতেছিল না যে, তাহাদের বন-ভোজনে সত্যিকার ভাত, সত্যিকার বেগুন-ভাজা সম্ভবপর হইবে! তাহার পর তিনজনে মহা আনন্দে কলার পাতে খাইতে বসে, শুধু ভাত আর বেগুন-ভাজা আর কিছু না। অপু গ্রাস মুখে তুলিবার সময় দুর্গা সেদিকে চাহিয়া ছিল, আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে,—কেমন হয়েচে রে বেগুনভাজা?

অপু বলে—বেশ হয়েচে দিদি, কিন্তু নুন হয় নি যেন—

লবণকে রন্ধনের উপকরণের তালিকা হইতে ইহারা অদ্য একেবারেই বাদ দিয়াছে, লবণের বালাই রাখে নাই। কিন্তু মহাখুশিতে তিনজনে কোষো মেটে আলুর ফল ভাতে ও পান্‌সে আধপোড়া বেগুন-ভাজা দিয়া চড়ুইভাতির ভাত খাইতে বসিল। দুর্গার এই প্রথম রান্না, সে বিস্ময়মিশানো আনন্দের সঙ্গে নিজের হাতের শিল্প-সৃষ্টি উপভোগ করিতেছিল! এই বন-ঝোপের মধ্যে, এই শুক্‌নো আতাপাতার রাশের মধ্যে, খেজুর তলায় ঝরিয়া-পড়া খেজুর পাতার পাশে বসিয়া সত্যিকারের ভাত তরকারি খাওয়া।

খাইতে খাইতে দুর্গা অপুর দিকে চাহিয়া হি হি করিয়া খুশির হাসি হাসিল। খুশিতে ভাতের দলা তাহার গলার মধ্যে আটকাইয়া যাইতেছিল যেন। বিনি খাইতে খাইতে ভয়ে ভয়ে বলিল—একটু তেল আছে দুগ্‌গাদি? মেটে আলুর ফল ভাতে মেখে নিতাম।

দুর্গা বলিল—অপু, ছুটে নিয়ে আয় একটু তেল—

যে জীবন কত শত পুলকের ভাণ্ডার, কত আনন্দ-মুহূর্তের আলো-জ্যোৎস্নার অবদানে মণ্ডিত, ইহাদের সে মাধুরীময় জীবনযাত্রার সবে তো আরম্ভ। অনন্ত যে জীবনপথ দূর হইতে বহুদূরে দৃষ্টির কোন্ ওপারে বিসর্পিত, সে পথের ইহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র পথিকদল, পথের বাঁকে ফুলেফলে দুঃখেসুখে, ইহাদের অভ্যর্থনা একেবারে নূতন।

আনন্দ! আনন্দ! প্রসারের আনন্দ, জীবনের মাঝে মাঝে যে আড়াল আছে, বিশাল তুষারমৌলি গিরিসংকটের ওদিকের যে পথটা দেখিতেছে না, তাহার আনন্দ! আজকের আনন্দ! সামান্য, সামান্য ছোটখাটো তুচ্ছ জিনিসের আনন্দ!

অপু বলিল—মাকে কি বল্‌বি দিদি? আবার ওবেলা ভাত খাবি?

—দূর মাকে কখনও বলি! সন্ধের পর দেখিস্ খিদে পাবে এখন—

যুগীর বামুন বলিয়া পাড়ায় জল খাইতে চাহিলে লোকে ঘটিতে করিয়া জল খাইতে দেয়, তাহাও আবার মাজিয়া দিতে হয়। বিনি দু-একবার ইতস্তত করিয়া অপুর গ্লাসটা দেখাইয়া বলিল—আমার গালে একটু জল ঢেলে দেও তো অপু? জল তেষ্টা পেয়েছে!

অপু বলিল—নাও না বিনিদি, তুমি নিয়ে চুমুক দিয়ে খাও না!

তবু যেন বিনির সাহস হয় না। দুর্গা বলিল—নে না বিনি, গেলাসটা নিয়ে খা না?

খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে দুর্গা বলিল—হাঁড়িটা ফেলা হবে না কিন্তু, আবার আর একদিন বনভোজন করবো—কেমন তো, ওই কুলগাছটার ওপরে টাঙিয়ে রেখে দেবো।

অপু বলিল—হ্যাঁ, ওখানে থাকবে কিনা? মাতোর মা কাঠ কুড়োতে আসে, দেখতে পেলে নিয়ে যাবে দিদি—ভারি চোর—

একটা ভাঙা পাঁচিলের ঘুলঘুলির মধ্যে ছোবাটা দুর্গা রাখিয়া দিল।

অপুর বুক টিপ্ টিপ্ করিতেছিল। ওই ঘুলঘুলিটার ওপিঠে আর একটা ছোট ঘুলঘুলি আছে, তাহার মধ্যে অপু লুকাইয়া চুরুটের বাক্স রাখিয়া দিয়াছে, দিদি সেদিকে যদি যাইয়া পড়ে!

নেড়াদের বাড়িতে কিছুদিন আগে নেড়ার ভগ্নীপতি ও তাঁহার এক বন্ধু আসিয়াছিল। কলিকাতার কাছে কোথায় বাড়ি। খুব বাবু, খুব চুরুট খায়। এই একবার খাইল, আবার এই খাইতেছে। অপুর মনে মনে অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল সেও একবাব চুরুট খাইয়া দেখিবে, কেমন লাগে। সে নেড়ার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গ্রামের হরিশ যুগীর দোকান হইতে তিন পয়সায় রাঙা কাগজ মোড়া দশটি চুরুট কিনিয়া আনে। সেদিন এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে একা বসিয়া চুপি চুপি একটা সিগারেট ধরাইয়া খাইয়াছিল—ভালো লাগে নাই, তেতো তেতো, কেমন একটা ঝাঁঝ, দুটান খাইয়া সে আর খাইতে পারে নাই, কিন্তু তাহার ভাগের বা·কী চারটি চুরুট সে ফেলিয়াও দিতে পারে নাই, নেড়ার ভগ্নীপতির নিকট সংগৃহীত একটা খালি চুরুটের বাক্সে সে-কয়টি সে ওই পোড়োভিটের জঙ্গলে ভাঙা পাঁচিলের ঘুলঘুলিতে লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছে। প্রথম চুরুট খাইবার দিন চুরুট টানা শেষ হইয়া গেলে ভয়ে তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিতেছিল, পাছে মুখের গন্ধে মা টের পায়। পাকা কুল অনেক করিয়া খাইয়া নিজের মুখের হাই হাত পাতিয়া ধরিয়া অনেকবার পরীক্ষা করিয়া তবে সে সেদিন পুনর্বার মনুষ্যসমাজে প্রবেশ করিয়াছিল। যায় বুঝি আজ বামালসুদ্ধ ধরা পড়িয়া!

কিন্তু দিদির পাঁচিলের ওপিঠে যাইবার দরকার হয় না। এপিঠেই কাজ সারা হইয়া যায়।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কথাটা সর্বজয়া ঘাটে গিয়া পাড়ার মেয়েদের মুখে শুনিল।

আজ কয়েকদিন হইতে নীরেনের সঙ্গে অন্নদা রায়ের, বিশেষ করিয়া তাঁহার ছেলে গোকুলের মনান্তর চলিতেছিল। কাল দুপুর বেলা নাকি খুব ঝগড়া ও চেঁচামেচি বাধে। ফলে কাল রাত্রেই নীরেন জিনিসপত্র লইয়া এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। অন্নদা রায়ের প্রতিবেশী যজ্ঞেশ্বর দীঘড়ীর স্ত্রী হরিমতি বলিতেছিলেন—সত্যি মিথ্যে জানিনে, ক'দিন থেকে তো নানারকম কথা শুনতে পাচ্ছি—আমি বাপু বিশ্বেস্ করিনে, বৌটে তেমন নয়। আবার নাকি শুনলাম নীরেন লুকিয়ে টাকা দিয়েছে, বৌ নাকি টাকা কোথায় পাঠিয়েছিল, নীরেনের হাতের লেখা রসিদ ফিরে এসে গোকুলের হাতে পড়েচে এই সব।—যাক বাপু, সে সব পরের কুচ্ছ শুনে কি হবে? নীরেন শুনলাম বলচে—আপনারা সকলে মিলে একজনের ওপর অত্যাচার কর্তে পারেন তাতে দোষ হয় না?—আপনারা যা ভাবেন ভাবুন, বৌ-ঠাক্‌রুন একবার হুকুম করুন, আমি ওঁকে এই দণ্ডে আমার হারানো মায়ের মতো মাথায় করে নিয়ে যাবো—তারপর আপনারা যা করবার করবেন। তারপর খুব হৈ চৈ খানিকক্ষণ হল—সন্দের আগেই সে গয়লাপাড়া থেকে একখানা গাড়ি ডেকে আনলে, জিনিসপত্তর নিয়ে চলে গেল।

সর্বজয়া কথাটা শুনিয়া বড় দমিয়া গেল। ইতিমধ্যে স্বামীকে দিয়া অন্নদা রায়কে নীরেনের পিতার নিকট এ বিবাহ সম্বন্ধে পত্র লিখিতে অনুরোধ করিয়াছে। নীরেনকে আরও দুইবার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল—ছেলেটিকে তাহার অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে। হরিহর তাহাকে অনেকবার বুঝাইয়াছে, নীরেনের পিতা বড়লোক—তাহাদের ঘরে তিনি কি আর পুত্রের বিবাহ দিবেন? সর্বজয়া কিন্তু আশা ছাড়ে নাই, তাহার মনের মধ্যে কোথায় যেন সাহস পাইয়াছে—এ বিবাহের যোগাযোগ

যেন দুরাশা নয়, ইহা ঘটিবে। হরিহর মনে মনে বিশ্বাস না করিলেও স্ত্রীর অনুরোধে অন্নদা রায়কে কয়েকবার তাগিদ দিয়াছিল বটে। কিন্তু এখন যে বড় বিপদ ঘটিল!

ইতিমধ্যে একদিন পথে দুর্গার সঙ্গে গোকুলের বউয়ের দেখা হইল। সে চুপি চুপি দুর্গাকে অনেক কথা বলিল, নীরেন কেন চলিয়া গেল তাহারই ইতিহাস। বলিতে বলিতে তাহার চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

—এই রকম ঝাঁটালাথি খেয়েই দিন যাবে—কেউ নেই দুগ্‌গা—তাই কি ভাইটা মানুষ? কোথাও যে দু'দিন জুড়বো সে জায়গা নেই—

সহানুভূতিতে দুর্গার বুক ভরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে খুড়িমার কলঙ্কের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও তাহার দুঃখে সান্ত্বনাসূচক নানা কথা অস্পষ্টভাবে তাহার মনের মধ্যে জোট পাকাইয়া উঠিল। সব কথা গুছাইয়া বলিতে না পারিয়া শুধু বলিল, ওই সখী ঠাকুরমা যা লোক! বলুক গে না, সে করবে কি? কেঁদো না খুড়িমা লক্ষ্মীটি, আমি রোজ যাবো তোমার কাছে—

সর্বজয়া শুনিয়া আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—বৌমা কি বল্লে-টল্লে দুর্গা?...তা নীরেনের কথা কিছু হল নাকি?

দুর্গা লজ্জিত সুরে বলিল—তুমি কাল জিজ্ঞেস কোরো না ঘাটে? আমি জানি নে—

অপু একবার জিজ্ঞাসা করিল,—খুড়িমার কাছে কি শুনলি, মাস্টার মশায় আর আসবেন না?

দুর্গা ধমক দিয়া কহিল—তা আমি কি জানি—যাঃ—

পড়ন্ত রোদে ছায়াভরা পথটি কেমন যেন মন-কেমন-করা-করা। সে তাহার ভাই-এর জন্য। এ-রকম তাহার হয়, কতবার হইয়াছে, বেশিক্ষণ ধরিয়া যদি সে বাড়ি না থাকে, কি ভাইকে না দেখে, ভাইয়ের রাশি রাশি কাল্পনিক দুঃখের কথা মনে হইয়া মনের মধ্যে কেমন করে।

তাহার অমন দুধে-আলতা রং-এর সোনার পুতুলের মতো ভাইটা ময়লা আধছেঁড়া মতো একখানা কাপড় পরিয়া বাড়ির দরজার সামনে আপনমনে একা একা কড়ি চালিয়া বেগুন-বীচি খেলিতেছে। তাহার কাছে পয়সা চায় এটা-ওটা কিনিতে, সে দিতে পারে না—ভারি কষ্ট হয় মনে—

দিন কয়েক পরে। ভুবন মুখুজ্যের বাড়ি রানুর দিদির বিবাহ শেষ হইয়া গিয়াছে বটে কিন্তু এখনও কুটুম্ব-কুটুম্বিনীরা সকলে যান নাই। ছেলেমেয়েও অনেক। একটি ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে দুর্গাব বেশ আলাপ হইয়াছে, তাহার নাম টুনি। তাহার বাপও আসিয়াছিলেন। আজ দুপুরের পর স্ত্রী ও কন্যাকে কিছুদিনের জন্য এখানে রাখিয়া কর্মস্থানে গিয়াছেন। ঘণ্টা খানেক পরে, সেজ ঠাক্‌রুন এ ঘরে কি কাজ করিতেছিলেন, টুনির মায়ের গলা তাঁহার কানে গেল। সেজ ঠাক্‌রুন দালানে আসিয়া বলিলেন—কি রে হাসি কি? টুনির মা উত্তেজিতভাবে ও ব্যস্তভাবে বিছানাপত্র, বালিশের তলা হাতড়াইতেছে, উঁকি মারিতেছে, তোশক উলটাইয়া ফেলিয়াছে; বলিল—এই একটু আগে আমার সেই সোনার সিঁদুরের কৌটোটা এই বিছানার পাশে এইখানটায় রেখেছি, খোকা দোলায় চেঁচিয়ে উঠল, উনি বাড়ি থেকে এলেন—আর তুলতে মনে নেই—কোথায় গেল আর তো পাচ্ছি নে?—

সেজ ঠাক্‌রুন বলিলেন—ওমা সে কি? হাতে করে নিয়ে যাস নি তো?

—না দিদিমা, এইখানে রেখে গেলুম। বেশ মনে আছে, ঠিক এইখানে—

সকলে মিলিয়া খানিকক্ষণ চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করা হইল, কৌটার সন্ধান নাই। সেজ ঠাক্‌রুন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, দালানে প্রথমটা এ বাড়ির ছেলেমেয়ে ছিল, তারপর খাওয়ার ডাক পড়িলে ছেলেমেয়েরা সব খাবার খাইতে যায়, তখন বাহিরের লোকের মধ্যে ছিল দুর্গা। সেজ ঠাক্‌রুনের ছোট মেয়ে টেঁপি চুপি চুপি বলিল—আমরা যেই খাবার খেতে এলাম দুগ্‌গাদি তখন দেখি যে খিড়কির দোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এই মাত্তর আবার এসেছে—

সেজ ঠাক্‌রুন চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন, পরে রুক্ষসুরে দুর্গাকে বলিলেন—কৌটো দিয়ে দে দুগ্‌গা, কোথায় রেখেচিস্ বল্—বার কর এখ্‌খুনি বলচি—

দুর্গার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছিল, সেজ ঠাক্‌রুনের ভাবভঙ্গিতে তাহার জিব যেন মুখের মধ্যে জড়াইয়া গেল। অস্পষ্টভাবে কি বলিল ভালো বোঝা গেল না।

টুনির মা এতক্ষণ কোনো কথা বলে নাই—একজন ভদ্রঘরের মেয়েকে সকলে মিলিয়া চোর বলিয়া ধরাতে সে একটু অবাক হইয়া গিয়াছিল, বিশেষত দুর্গাকে সে কয়েকদিন এখানে দেখিতেছে, দেখিতে বেশ চেহারা বলিয়া দুর্গাকে পছন্দ করে—সে চুরি করিবে ইহা কি সম্ভব? সে বলিল—ও নেয় নি বোধ হয় সেজদি—ও কেন—

সেজ ঠাক্‌রুন বলিলেন—তুমি চুপ করে থাকো না! তুমি ওর কি জানো, নিয়েচে কি না নিয়েচে আমি জানি ভালো করে—

একজন বলিলেন—তা নিয়ে থাকিস বের করে দে, নয়তো কোথায় আছে বল্—আপদ চুকে গেল। দিয়ে দে লক্ষ্মীটি, কেন মিথ্যে—

দুর্গা যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল—তাহার পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল—সে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমি তো জানিনে কাকিমা—আমি তো—

সেজ ঠাক্‌রুন বলিলেন—বল্লেই আমি শুনবো? ঠিক ও নিয়েচে—ওর ভাব দেখে আমি বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, ভালো কথায় বলচি কোথায় রেখেচিস্ দিয়ে দে, জিনিস দিয়ে দাও তো কিছু বোল্‌বো না—আমার জিনিস পেলেই হল—

পূর্বোক্ত কুটুম্বিনী বলিলেন—ভদ্দর লোকের মেয়ে চুরি করে কোথাও শুনিনি তো কখনও। এই পাড়াতেই বাড়ি নাকি?

সেজ ঠাক্‌রুন বলিলেন—তুমি ভালো কথাব কেউ নও! দেখবে তুমি মজাটা একবাব, তুমি আমার বাড়ির জিনিস নিয়ে হজম কর্তে গিয়েচো—এ কি যা তা পেয়েচ বুঝি?—তোমায় আমি আজ—

পরে তিনি দুর্গার হাতখানা ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া তাহাকে দালানের ঠিক মাঝখানে আনিয়া বলিলেন, দুর্গা, বল্ এখনও কোথায় রেখেচিস?...বল্‌বি নে?. .না, তুমি জানো না, তুমি খুকি—তুমি কিছু জানো না—শিগ্‌গির বল্, নৈলে দাঁতের পাটি একেবারে সব ভেঙে গুঁড়ো করে ফেল্‌বো এখুনি! বল্ শিগ্‌গির—বল্ এখনও বল্‌চি—

টুনির মা হাত ধরিতে আগাইয়া আসিতেছিল, একজন কুটুম্বিনী বলিলেন, রোসো না, দেখ্‌চো না ও-ই ঠিক নিয়েচে। চোরের মারই ওষুধ—দিয়ে দাও এখুনি মিটে গেল,—কেন মিথ্যে—

দুর্গার মাথার মধ্যে কেমন করিতেছিল। সে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া অতি কষ্টে শুক্‌নো জিবে জড়াইয়া উচ্চারণ করিল—আমি তো জানিনে কাকিমা, ওরা সব চলে গেল আমিও তো—কথা বলিবার সময়ে সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া সেজ ঠাক্‌রুনের দিকে চোখ রাখিয়া দেওয়ালের দিকে ঘেঁষিয়া যাইতে লাগিল।

পরে সকলে মিলিয়া আরও খানিকক্ষণ তাহাকে বুঝাইল। তাহার সেই এক কথা—সে জানে না।

কে একজন বলিল—পাকা চোর—

টেঁপি বলিল—বাগানের আমগুলো তলায় পড়বার জো নেই কাকিমা—

শেষোক্ত কথাতেই বোধ হয় সেজ ঠাক্‌রুনের কোন ব্যথায় ঘা লাগিল। তিনি হঠাৎ বাজখাঁই রকমের আওয়াজ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—তবে রে পাজি, নচ্ছার চোরের ঝাড়, তুমি জিনিস দেবে না? দেখি তুমি দেও কি না দেও! কথা শেষ না করিয়াই তিনি দুর্গার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার মাথাটা লইয়া সজোরে দেওয়ালে ঠুকিতে লাগিলেন। বল্ কোথায় রেখেচিস্—বল্ এখুনি—বল্ শিগ্‌গির—বল্—

টুনির মা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া সেজ ঠাক্‌রুনের হাত ধরিয়া বলিল, করেন কি—করেন কি সেজদি—থাক্‌গে আমার কৌটো—ওরকম করে মারেন কেন?—ছেড়ে দিন—থাক্‌, হয়েছে, ছাড়ুন, ছিঃ!

টুনি মার দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পূর্বোক্ত কুটুম্বিনী বলিলেন—এঃ, রক্ত পড়ছে যে...

দুর্গার নাক দিয়া ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া রক্ত পড়িতেছে কেহ লক্ষ করে নাই। বুকের কাপড়ের খানিকটা রক্তরাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

টুনির মা বলিলেন,—শিগ্‌গির একটু জল নিয়ে আয় টেঁপি—রোয়াকের বাল্‌তিতে আছে দ্যাখ্‌—

চেঁচামিচি ও হৈ চৈ শুনিয়া পাশের বাড়ির কামারেব ঝি-বৌরা ব্যাপার কি দেখিতে আসিল। রানুর মা এতক্ষণ ছিলেন না—দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে কামার-বাড়ি বসিয়া গল্প করিতেছিলেন—তিনিও আসিলেন।

মারেব চোটে দুর্গার মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, সে দিশাহারা ভাবে ভিড়ের মধ্যে একবার চাহিয়া কি দেখিল।

জল আসিলে রানুর মা তাহার চোখে মুখে জল দিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন। তাহার মাথার মধ্যে কেন ঝিম্‌ ঝিম্‌ করিতেছিল, সে দিশাহারা ভাবে বসিয়া পড়িল। রানুর মা বলিলেন—অমন করে কি মারে সেজদি?...রোগা মেয়েটা—ছিঃ—

—তোমরা ওকে চেনো নি এখনও। চোরের মার ছাড়া ওষুধ নেই এই বলে দিলুম—মারেব এখনও হয়েছে কি—না পাওয়া গেলে ছাড়বো নাকি? হরি রায় আমায় যেন শূলে ফাঁসে দেয় এরপর—

বানুব মা বলিলেন—হয়েচে, এখন একটু সামলাতে দেও সেজদি—যে কাণ্ড করেচো—

টুনির মা বলিল—ওমা, এত হবে জান্‌লে কে কৌটোর কথা বল্‌তো?...চাইনে আমার কৌটো—ওকে ছেড়ে দাও সেজ্‌দি—

সেজ ঠাক্‌রুন এত সহজে ছাড়িতেন কিনা বলা যায় না, কিন্তু জনমত তাঁহার বিরুদ্ধে রায় দিতে লাগিল।...কাজেই তিনি আসামীকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

রানুর মা তাহাকে ধরিয়া ওদিকের দরজা খুলিয়া খিড়কিব উঠানে বাহির করিযা দিলেন। বলিলেন—খুব ক্ষণে আজ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলি যা হোক! যা, আস্তে আস্তে যা—টেঁপি খিড়কিটা ভালো করে খুলে দে—

দুর্গা দিশাহারা ভাবে খিড়কি দিয়া বাহির হইয়া গেল, মেয়েছেলে ও যাহারা উপস্থিত ছিল—সকলে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

একজন বলিল—তবুও তো স্বীকার কল্লে না—কি রকম দেখচো একবার?. .চোখ দিয়ে কিন্তু এক ফোঁটা জল পড়লো না—

রানুর মা বলিলেন—জল পড়বে কি, ভয়েই শুকিয়ে গিয়েচে। চোখে কি আর জল আছে? ওইরকম করে মারে সেজদি!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

গ্রামে বারোয়ারি চড়কপূজার সময় আসিল। গ্রামের বৈদ্যনাথ মজুমদার চাঁদার খাতা হাতে বাড়ি বাড়ি চাঁদা আদায় করিতে আসিলেন। হরিহর বলিল, না খুড়ো, এবার আমার এক টাকা চাঁদা ধরাটা অনেয্য হয়েছে—এক টাকা দেবার কি আমার অবস্থা? বৈদ্যনাথ বলিলেন—না হে না, এবার

নীলমণি হাজরার দল। এ রকম দলটি এ অঞ্চলে কেউ চক্ষেও দেখেনি। এবার পালপাড়ার বাজারে মহেশ স্যাকরার বালক-কেত্তনের দল গাইবে, তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চাই-ই—

বৈদ্যনাথ এমন ভাব দেখাইলেন যে নিশ্চিন্দিপুরবাসিগণের জীবন-মরণ এই প্রতিযোগিতার সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

অপু একটা কঞ্চি টানিতে টানিতে বাড়ি ঢুকিয়া বলিল—পাকা কঞ্চি বাবা, তোমার খুব ভালো কলম হবে, ডোবার ধারের বাঁশতলায় পড়ে ছিল, কুড়িয়ে আনলাম—পরে সে হাসিমুখে সেটা কতকটা উঁচু করিয়া তুলিয়া দেখাইয়া বলিল, হবে না বাবা তোমার কলম? কেমন পাকা, না?

চড়কের আর বেশি দেরি নাই। বাড়ি বাড়ি গাজনের সন্ন্যাসী নাচিতে বাহির হইয়াছে। দুর্গা ও অপু আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীদলের পিছনে পিছনে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইল। অন্য অন্য গৃহস্থ বাড়ি হইতে পুরানো কাপড় দেয়, চাল পয়সা দেয়—কেউ বা ঘড়া দেয়—তাহারা কিছুই দিতে পারে না দুটো চাল ছাড়া—এজন্য তাহাদের বাড়িতে এ দল কোনো বারই আসে না! দশ বারো দিন সন্ন্যাসী-নাচনের পর চড়কের পূর্বরাত্রে নীলপূজা আসিল।

নীলপূজার দিন বৈকালে একটা ছোট খেজুরগাছে সন্ন্যাসীরা কাঁটা ভাঙে—এবার দুর্গা আসিয়া খবর দিল প্রতি বৎসরের সে গাছটাতে এবার কাঁটা-ভাঙা হইবে না, নদীর ধারে আর একটা গাছ সন্ন্যাসীরা এবার পূর্ব হইতেই ঠিক করিয়াছে। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া দুর্গা ও অপু সেখানে গিয়া জোটে। তারপর কাঁটা-ভাঙার নাচ হইয়া গেলে সকলে চড়কতলাটাতে একবার বেড়াইতে যায়। খেজুরের ডাল দিয়া নীলপূজার মণ্ডপ ঘিরিয়াছে—চড়কতলার মাঠের শ্যাওড়াবন ও অন্যান্য জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। সেখানে ভুবন মুখুজ্যেদের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে দেখা হইল—রানী, পুঁটি, টুনু—এদের বাড়িতে কড়া শাসন আছে, দুর্গার মতো টো টো করিয়া যেখানে সেখানে বেড়াইবার হুকুম নাই—অতি কষ্টে বলিয়া কহিয়া ইহারা চড়কতলা পর্যন্ত আসিয়াছে।

টুনু বলিল—আজ রাত্রে সন্নিসিরা শ্মশান জাগাতে যাবে—

রানী বলিল—আহা, তা বুঝি আর জানিনে? একজন মড়া হবে। তাকে বেঁধে নিয়ে যাবে শ্মশানের সেই ছাতিমতলায়। তাকে আবার বাঁচাবে, তারপর মড়ার মুণ্ড নিয়ে আসবে—ছড়া বলতে বলতে আসবে—ওর সব মন্তর আছে—

দুর্গা বলিল—আমি জানি ওদের ছড়া, শুন্‌বি বল্‌বো?

স্বগ্‌গো থেকে এলো রথ
নাম্‌লো মর্ত্যতলে
চব্বিশ কুটী বাণবর্ষা শিবের সঙ্গে চলে—
সত্যযুগের মড়া আর শাওল যুগের মাটি
শিব শিব বল রে ভাই ঢাকে দ্যাও কাঠি—

পরে হাসিয়া বলে—কেমন চমৎকার এবার গোষ্টবিহারের পুতুল হয়েছে নীলুদা?...দাশু কুমোরের বাড়ি দেখে এলাম—দেখিস্‌নি রানু?

পুঁটি বলিল—সত্যিকার মড়ার মুণ্ড রানুদি?

—নয় তো কি? অনেক রাত্রে যদি আসিস্ তো দেখ্‌তে পাবি। চল্ ভাই আমরা বাড়ি যাই—আজ রাতটা ভালো নয়—আয়রে অপু, দুগ্‌গাদি আয়।

অপু বলিল—কেন ভালো নয় রানুদি? কী আজ হবে রাতে?

রানু বলিল—সে সব কথা বলতে নেই—তুই আয় বাড়ি।

অপু গেল না, কিন্তু দুর্গা ওদের দলের সঙ্গে চলিয়া গেল। তারপর হঠাৎ মেঘ করিল, সন্ধ্যার অন্ধকার মেঘে ঘনীভূত করিয়া তুলিল। অপু বাড়ি ফিরিতেছে, পথে জনপ্রাণী নাই, সন্ধ্যা হইতে শ্মশানের ও মড়ার মুণ্ডের গল্প শুনিয়া তাহার কেমন ভয় ভয় করিতেছে। মোড়ের বাঁশবনের কাছে

আসিয়া মনে হইল কিসের যেন কটুগন্ধ বাহির হইতেছে। সে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। আর একটুখানি গিয়া নেড়ার ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা। নেড়ার ঠাকুরমা নীলপুজার নৈবেদ্য হাতে চড়কতলায় পূজা দিতে যাইতেছে। অপু অন্ধকারে প্রথমটা চিনিতে পারে নাই, পরে চিনিয়া বলিল—কিসের গন্ধ বেরিয়েছে ঠাকুরমা?

বুড়ি বলিল—আজ ওঁরা সব বেবিয়েচেন কিনা?...তারই গন্ধ আর কি—

অপু বলিল—কারা ঠাকুরমা?

—কারা আবার—শিবের দলবল, সন্দেবেলা ওঁদের নাম করতে নেই—রাম রাম—রাম রাম—

অপুর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। চারিধারে অন্ধকার সন্ধ্যা, আকাশে কালো মেঘ, বাঁশবন, শ্মশানের গন্ধ, শিবের অনুচর ভূতপ্রেত—ছোট ছেলের মন বিস্ময়ে, ভয়ে, রহস্যে, অজানার অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। সে আতঙ্কের সুরে বলিল—আমি কি করে বাড়ি যাবো ঠাক্‌মা!...

বুড়ি বকিয়া উঠিল।—তা এত রাত করাই বা কেন বাপু আজকের দিনে?...এসো আমার সঙ্গে। নীল পুজোর থালাখানা দিয়ে আসি, তারপর এগিয়ে দেবো'খন। ধন্যি যা হোক—

বারোয়ারি তলায় ঘাস চাঁচিয়া প্রকাণ্ড বাঁশের মেরাপ বাঁধিয়া সামিয়ানা টাঙানো হইয়াছে। যাত্রার দল আসে আসে—এখনও পৌছে নাই, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, লোকে বলে কাল সকালের গাড়িতে আসিবে, সকাল চলিয়া গেলে বৈকালেব আশায় থাকে। অপুর স্নানাহার বন্ধ হইবার উপক্রম হইযাছে।...বাত্রে অপুর ঘুম হয় না, বাঁধ ভাঙা বন্যার স্রোতের মতো কৌতূহল ও খুশির যে কী প্রবল অদম্য উচ্ছ্বাস! বিছানায় ছট্‌ফট্ এপাশ-ওপাশ করে। যাত্রা হবে! যাত্রা হবে! যাত্রা হবে!

মাযেব বারণ আছে অত বড় মেয়ে পাড়া ছাড়িয়া কোথাও না যায়, দুর্গা চুপি চুপি গিয়া দেখিয়া আসিয়া রাজলক্ষ্মীর কাছে আসর-সজ্জা ও বাঁশের গায়ে-ঝুলানো লাল নীল কাগজের অভিনবত্ব সম্বন্ধে গল্প করে, অপুর মনে হয়, যে পঞ্চাননতলায় সে দু'বেলা কড়িখেলা করে, সেই তুচ্ছ অত্যন্ত পবিচিত সামান্য স্থানটাতে আজ বা কাল নীলমণি হাজবার দলের যাত্রার মতো একটা অভূতপূর্ব অবাস্তব ঘটনা ঘটিবে, এও কি সম্ভব? কথাটা যেন তাহার বিশ্বাসই হয় না।

হঠাৎ শুনিতে পাওয়া যায় আজ বিকালেই দল আসিবে। এক ঝলক রক্ত যেন বুক হইতে নাচিয়া চল্‌কাইয়া একেবারে মাথায় উঠিয়া পড়ে।...

কুমার-পাড়ার মোড়ে দুপুরের পব হইতেই সকল ছেলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর দূরে একখানা গরুব গাড়ি তাহার চোখে পড়িল, সাজের বাক্স বোঝাই গাড়ি—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ খানা! পটু একে একে আঙুল দিয়া গুনিয়া খুশির সুরে বলিল—অপুদা, আমরা এদের পেছনে পেছনে এদের বাসায় গিয়ে দেখে আসি, যাবি? সাজের গাড়িগুলার পিছনে দলের লোকেরা যাইতেছে, সকলের মাথায় টেরিকাটা, অনেকের জুতা হাতে। পটু একজন দাড়িওয়ালা লোককে দেখাইয়া কহিল—এ বোধ হয় রাজা সাজে, না অপুদা?

আকাশ-বাতাসের রং একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল—অপু মহা উৎসাহে বাড়ি ফিরিয়া দেখে তাহার বাবা দাওয়ায় বসিয়া কি লিখিতেছে ও গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতেছে। সে ভাবে, যাত্রা আসিবার কথা তাহার বাবাও জানিতে পারিযাছে, তাই এত স্ফূর্তি। উৎসাহে হাত নাড়িয়া বলে—সাজ একেবারে পাঁচ গাড়ি বাবা! এ রকম দল!—

হরিহর শিষ্যবাড়ি বিলি করার জন্য বালির কাগজে কবচ লিখিতেছিল, মুখ তুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলে—কিসের সাজ রে খোকা?

অপু আশ্চর্য হইয়া যায়, এত বড় ঘটনা বাবার জানা নাই! বাবাকে সে নিতান্ত কৃপার পাত্র বিবেচনা করে।

সকালে উঠিয়া অপুকে পড়িতে বসিতে হয়। খানিক পরে সে কাঁদোকাঁদো ভাবে বলে—আমি বারোয়ারিতলায় যাবো বাবা, সকলে যাচ্চে আর আমি এখন বুঝি বসে বসে পড়বো? এখ্‌খুনি যদি যাত্রা আরম্ভ হয়?

তাহার বাবা বলে—পড়ো, পড়ো, এখন বসে পড়ো, যাত্রা আরম্ভ হলে ঢোল বাজবার শব্দ তো শুনতে পাওয়া যাবে? তখন না হয় যেয়ো এখন। প্রৌঢ় বয়সের ছেলে, নিজে সব সময়ে আজকাল বিদেশে থাকে, অল্পদিনের জন্য বাড়ি আসিয়া ছেলেকে চোখছাড়া করিতে মন চায় না। অভিমানে রাগে অপুর চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে, সে কান্নাভরা গলায় আবার শুভঙ্করী শুরু করে—মাস মাহিনা যাব যত দিন তার পড়ে কত?

কিন্তু সকালে যাত্রা বসে না, খবর আসে ওবেলা বসিবে। ওবেলা অপু মায়ের কাছে যাইয়া কাঁদো কাঁদো ভাবে বাবার অত্যাচারের কাহিনী আনুপূর্বিক বর্ণনা করে। সর্বজয়া আসিয়া বলে—দাও না গো ছেলেটাকে ছেড়ে? বছরকারের দিনটা—তোমার ন মাস বাড়িতে থাকা নেই বছরে, আর ও একদিনের পড়াতে একেবারে তর্কালঙ্কার ঠাকুর হয়ে উঠবে কিনা?

অপু ছুটি পায়। সারা দুপুর তাহার বারোয়ারিতলায় কাটে। বৈকালে যাত্রা বসিবার পূর্বে বাড়িতে খাবার খাইতে আসিল। বাবা রোয়াকে বসিয়া কবচ লিখিতেছে। অন্যদিন এ সময তাহাকে তাহার বাবার কাছে বসিয়া বই পড়িতে হয়। পাছে ছেলে চটিয়া যায় এই ভয়ে তাহার বাবা তাহাকে খুশি রাখিবার জন্য নানারকম কৌতুকের আয়োজন করে। বলে, খোকা চট্ করে সিলেটে লিখে আনো দিকি, ঐঃ ভূত বাপ্ রে!..অপু সব অদ্ভুত ধরনেব কথা শুনিয়া হাসিয়া খুন হয়, তাড়াতাড়ি লিখিয়া আনিয়া দেখায়। বলে—বাবা এইটে হয়ে গেলে আমি কিন্তু চলে যাবো।. তাহাব বাবা বলে—যেয়ো এখন, যেয়ো এখন, খোকা—আচ্ছা চট্ কবে লিখে আনো দিকি—আর একটা অদ্ভুত কথা বলে। অপু আবার হাসিয়া উঠে।

আজ কিন্তু অপুর মনে হইল, বাহিব হইতে কি একটা প্রচণ্ড শক্তি আসিয়া তাহাকে তাহাব বাবার নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। বাবা নির্জন ছায়াভবা বৈকালে বাঁশ বন ঘেরা বাড়িতে একা বসিয়া বসিয়া লিখিতেছে, কিন্তু এমন শক্তি নাই যে, তাহাকে বসাইয়া রাখে। এখন যদি বলে—খোকা, এসো পড়তে বসো—অমনি চারিদিক হইতে একটা যেন ভয়ানক প্রতিবাদের হট্টগোল উঠিবে। সকলে যেন বলিবে—না, না, এ হয না! এ হয় না! যাত্রা যে বসে বসে!...কোনো উল্লাসের প্রবল শক্তি তাহার বাবাকে যেন নিতান্ত অসহায় নিরীহ দুর্বল করিয়া দিয়াছে। সাধ্য নাই যে, তাহার পড়িবার কথা পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করে। বাবার জন্য অপুর মন কেমন করে।

দুর্গা বলিল—অপু, তুই মাকে বল্ না আমিও দেখতে যাবো। অপু বলে—মা, দিদি কেন আসুক না আমার সঙ্গে? চিক্ দিয়ে ঘিরে দিয়েচে, সেইখেনে বসবে?

মা বলে—এখন থাক, আমি ওই ওদের বাড়ির মেয়েরা যাবে, তাদের সঙ্গে যাবো,—আমার সঙ্গে যাবে এখন।

বারোয়ারিতলায় যাইবার সময় দুর্গা পিছন হইতে তাহাকে ডাকিল—শোন্ অপু। পরে সে কাছে আসিয়া হাসি-হাসি মুখে বলিল—হাত পাত দিকি! অপু হাত পাতিতেই দুর্গা তাহার হাতে দুটা পয়সা রাখিয়াই তাহার হাতটা নিজের দু'হাতের মধ্যে লইয়া মুঠা পাকাইয়া দিয়া বলিল—দু পয়সায় মুড়কি কিনে খাস্, নয়তো যদি নিচু বিক্রি হয় তো কিনে খাস্।

ইহার দিনসাতেক পূর্বে একদিন অপু আসিয়া চুপি চুপি দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—তোর পুতুলের বাক্সে পয়সা আছে? একটা দিবি? দুর্গা বলিয়াছিল—কি হবে পয়সা তোর? অপু দিদির মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল—নিচু খাবো—কথা শেষ করিয়া সে পুনরায় লজ্জার হাসি হাসিল। কৈফিয়তের সুরে বলে—বোষ্টমদের বাগানে ওরা মাচা বেঁধেচে দিদি, অনেক নিচু

পেড়েচে, দু-ঝুড়ি-ই-ই—এক পয়সার ছটা, এই এত বড় বড়, একেবারে সিঁদুরের মতো রাঙা, সতু কিন্‌লে সাধন কিন্‌লে—পরে একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আছে দিদি?

দুর্গার পুতুলের বাক্সে সেদিন কিছুই ছিল না, সে কিছু দিতে পারে নাই। অপুকে বিরসমুখে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সেদিন তাহার খুব কষ্ট হইয়াছিল, তাই কাল বৈকালে সে বাবার কাছে পয়সা দুটা চড়ক দেখিবার নাম করিয়া চাহিয়া লয়। সোনার ভাঁটার মতো ভাইটা, মুখের আবদার না রাখিতে পারিলে দুর্গার ভারি মন কেমন করে।

অপু চলিয়া গেলে তাহার মা ঘাট হইতে আসিয়া বলে—দুগ্‌গা একটা কাজ কর্ তো! রানুদের বাগান থেকে দুটো সাদা গন্ধভেদালির পাতা খুঁজে নিয়ে আয় তো—অপুর শরীরটা অসুখ করেচে, একটু ঝোল করে দোব!—

মায়ের কথায় সে একছুটে রানুদের বাগানে যায়—বাগানে মানুষ-সমান উঁচু ঘন আগাছার জঙ্গলের মধ্যে গন্ধভেদালির পাতা খুঁজিতে খুঁজিতে মনের সুখে মাথা দুলাইয়া পিসিমার মুখে ছেলেবেলায় শেখা একটি ছড়া আবৃত্তি করে—

হলুদ বনে বনে—
নাক-ছাবিটি হারিয়ে গেছে সুখ নেইকো মনে—

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

যাত্রা আরম্ভ হয়। জগৎ নাই, কেহ নাই—শুধু অপু আছে, আর নীলমণি হাজরার যাত্রা দল আছে সামনে। সন্ধ্যার আগে বেহালায় ইমন আলাপ করে, ভালো বেহালাদার। পাড়াগাঁয়ের ছেলে কখনও সে ভালো জিনিস শোনে নাই—উদাস-করুণ সুরে হঠাৎ মন কেমন করিয়া উঠে. .মনে হয় বাবা এখনও বসিযা বাড়িতে সেই কী লিখিতেছে—দিদি আসিতে চাহিয়াও আসিতে পারে নাই। প্রথম যখন জরির সাজ-পোশাক পবিয়া টাঙানো ঝাড় ও কড়ির ডুমের আলো-সজ্জিত আসরে বাজার মন্ত্রীর দল আসিতে আরম্ভ করে, অপু মনে ভাবে এমন সব জিনিস তাহার বাবা দেখিল না! সবাই তো আসরে আসিয়াছে গ্রামের, তাহাদের পাড়ার কোনও লোক তো বাকি নাই! বাবা কেন এখনও...? পালা দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। সেবার সে বালক-কীর্তনের দলের যাত্রা শুনিয়াছিল—সে কি, আর এ কি! কি সব সাজ! কি সব চেহারা।..

হঠাৎ পিছন হইতে কে বলে—খোকা বেশ দেখতে পাচ্ছ তো?...তাহার বাবা কখন আসিয়া আসরে বসিয়াছে অপু জানিতে পারে নাই। বাবার দিকে ফিরিয়া বলে—বাবা, দিদি এসেচে?...চিকের মধ্যে বুঝি?

মন্ত্রীব গুপ্ত ষড়যন্ত্রে যখন রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া বনে চলিতেছেন, তখন কাঁদুনে সুরে বেহালার সংগত হয়। তারপব রাজা করুণ রস বহুক্ষণ জমাইয়া রাখিবার জন্য স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া এক এক পা করিয়া থামেন, আর এক এক পা অগ্রসর হইতে থাকেন, সত্যিকার জগতে কোন বনবাস-গমনোদ্যত রাজা নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ না হইলে একদল লোকের সম্মুখে সেরূপ করে না। বিশ্বস্ত রাজ-সেনাপতি রাগে এমন কাঁপেন যে মৃগী-রোগগ্রস্ত রোগীর পক্ষেও তাহা হিংসার বিষয় হইবার কথা। অপু অপলক চোখে চাহিয়া বসিয়া থাকে, মুগ্ধ বিস্মিত হইয়া যায়; এমন তো সে কখনও দেখে নাই।

তারপর কোথায় চলিয়া গিয়াছেন রাজা, কোথায় গিয়াছেন রানী!...ঘন নিবিড় বনে শুধু রাজপুত্র অজয় ও রাজকুমারী ইন্দুলেখা ভাইবোন ঘুরিয়া বেড়ায়! কেউ নাই যে তাহাদের মুখের দিকে চায়, কেউ নাই যে নির্জন বনে তাহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলে। ছোট ভাইয়ের জন্য ফল আনিতে

একটু দূরে চলিয়া যাইয়া ইন্দুলেখা আর ফেরে না। অজয় বনের মধ্যে বোনকে খুঁজিয়া বেড়ায়—তাহার পর নদীর ধরে হঠাৎ খুঁজিয়া পায় ইন্দুলেখার মৃতদেহ—ক্ষুধার তাড়নায় বিষফল খাইয়া সে মরিয়া গিয়াছে। অজয়ের করুণ গান—কোথা ছেড়ে গেলি এ বনকান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণসাথী রে—শুনিয়া অপু এতক্ষণ মুগ্ধ চোখে চাহিয়া ছিল—আর থাকিতে পারে না, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে।

কলিঙ্গরাজের সহিত বিচিত্রকেতুর যুদ্ধে তলোয়ার খেলা কী!...যায়, বুঝি ঝাড়গুলা গুঁড়া হয়, নয় তো কোন হতভাগ্য দর্শকের চোখ দুটি বা যায়। রব ওঠে—ঝাড় সাম্‌লে—ঝাড় সাম্‌লে!...কিন্তু অদ্ভুত যুদ্ধকৌশল—সব বাঁচাইয়া চলে—ধন্য বিচিত্রকেতু!

মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া জুড়ির দীর্ঘ গান ও বেহালায় কসরত-এর সময় অপুকে তাহার বাবা ডাকিয়া বলে—ঘুম পাচ্ছে... বাড়ি যাবে খোকা?...ঘুম। সর্বনাশ!...না সে বাড়ি যাইবে না। বাহিরে ডাকিয়া তাহার বাবা বলে—এই দুটো পয়সা রাখো বাবা, কিছু কিনে খেযো, আমি বাড়ি গেলাম। অপুর ইচ্ছা হয় সে এক পয়সার পান কিনিয়া খাইবে, পানের দোকানের কাছে অত্যন্ত কিসের ভিড় দেখিয়া অগ্রসর হইয়া দ্যাখে, অবাক কাণ্ড! সেনাপতি বিচিত্রকেতু হাতিয়ারবন্দ অবস্থায় বার্ডসাই কিনিয়া ধরাইতেছেন—তাঁহাকে ঘিরিয়া রথযাত্রার ভিড়। আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য!...রাজকুমার অজয় কোথা হইতে আসিয়া বিচিত্রকেতুর কনুই-এ হাত দিয়া বলিল—এক পযসার পান খাওয়াও না কিশোরীদা? রাজপুত্রের প্রতি সেনাপতির বিশ্বস্ততার নিদর্শন দেখা গেল না—হাত ঝাড়া দিয়া বলিল—যাঃ অত পয়সা নেই—ওবেলা সাবানখানা যে দুজনে মাখ্‌লে, আমাকে কি বলেছিলে? রাজপুত্র পুনবায় বলিল—খাওয়াও না কিশোরীদা? আমি বুঝি কখনও কিছু দিইনি তোমাকে? বিচিত্রকেতু হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

অপুর সমবয়সি হইবে। টুকটুকে, বেশ দেখিতে, গানেব গলা বড় সুন্দব। অপু মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকে—বড় ইচ্ছা হয় আলাপ কবিতে। হঠাৎ সে কিসের টানে সাহসী হইয়া আগাইয়া যায়—একটু লজ্জার সঙ্গে বলে—পান খাবে?...অজয় একটু অবাক্ হয়, বলে—তুমি খাওয়াবে? নিয়ে এসো না। দুজনে ভাব হইয়া যায়। ভাব বলিলে ভুল হয়। অপু মুগ্ধ, অভিভূত হইয়া যায়! ইহাকেই সে এতদিন মনে মনে চাহিয়া আসিয়াছে—এই রাজপুত্র অজযকে। তাহার মাযের শত রূপকথার কাহিনীর মধ্য দিয়া, শৈশবের শত স্বপ্নময়ী মুগ্ধ কল্পনার ঘোরে তাহাব প্রাণ ইহাকেই চাহিয়াছে—এই চোখ, এই মুখ, এই গলার স্বর! ঠিক সে যাহা চায় তাহাই। অজয় জিজ্ঞাসা করে—তোমাদের বাড়ি কোথায় ভাই? ..আমাকে একজনের বাড়ি খেতে দিয়েছে, বড্ড বেলায় খেতে দেয়। তোমাদের বাড়িতে খায় কে? ..

খুশিতে অপুর সারা গা কেমন করে, সে বলে—ভাই, আমাদের বাড়িতে একজন খেতে যায়, সে আজ দেখলাম ঢোলক বাজাচ্চে—তুমি কাল থেকে যেয়ো, আমি এসে ডেকে নিয়ে যাবো—ঢোলকওয়ালা না হয় তুমি যে বাড়িতে আগে খেতে, সেখানে খাবে—

খানিকক্ষণ দুজনে এদিক-ওদিক বেড়াইবার পর অজয় বলে—আমি যাই ভাই, শেষ সিনে আমার গান আছে—আমার পার্ট কেমন লাগচে তোমার?

শেষ বাত্রে যাত্রা ভাঙিলে অপু বাড়ি আসে। পথে আসিতে আসিতে যে যেখানে কথা বলে, তাহার মনে হয যাত্রাব এক্‌টো হইতেছে। বাড়িতে তাহার দিদি বলে—ও অপু, কেমন যাত্রা শুনলি?...অপুর মনে হয়, গভীর জনশূন্য বনের মধ্যে রাজকুমারী ইন্দুলেখা কি বলিয়া উঠিল! কিসের যে ঘোর তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। মহা খুশির সহিত সে বলে—কাল থেকে, অজয় যে সেজেছিল মা, সে আমাদের বাড়ি খেতে আসবে—

তাহার মা বলে—দুজনে খাবে?—দুজনকে কোত্থেকে—

অপু বলে—তা না, একজন তো চলে যাবে, শুধু অজয় খাবে।

দুর্গা বল্লে—কেমন যাত্রা রে অপু?...এমন কক্ষনো দেখিনি—কেমন গান কল্লে যখন সেই

রাজকন্যা মরে গেল?...অপুর তো রাত্রে ঘুমের ঘোরে চারিধারে যেন বেহালা সংগীত হয়। ভোর হইলে একটু বেলায় তাহার ঘুম ভাঙে—শেষ রাত্রে ঘুমাইয়াছে, তৃপ্তির সঙ্গে ঘুম হয় নাই, সূর্যের তীক্ষ্ণ আলোয়.চোখে যেন সুঁচ বিঁধে। চোখে জল দিলে জ্বালা করে। কিন্তু তাহার কানে একটা বেহালা-ঢোল-মন্দিরার ঐকতান বাজনা তখনও যেন বাজিতেছে—তখনও যেন সে যাত্রার আসরেই বসিয়া আছে।

ঘাটের পথে যাইতে পাড়ার মেয়েরা কথা বলিতে বলিতে যাইতেছে, অপুর মনে হইল কেহ ধীরাবতী, কেহ কলিঙ্গদেশের মহারানী, কেহ রাজপুত্র অজয়ের মা বসুমতী। দিদির প্রতি কথায়, হাত পা নাড়ার ভঙ্গিতে, রাজকন্যা ইন্দুলেখা যেন মাখানো! কাল যে ইন্দুলেখা সাজিয়াছিল তাহাকে মানাইয়াছিল মন্দ নয় বটে, কিন্তু তাহার মনে মনে রাজকন্যা ইন্দুলেখার যে প্রতিমা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহার দিদিকে লইয়া, ওই রকম গায়ের রং, অমনি বড়বড় চোখ, অমনি সুন্দর মুখ, অমনি সুন্দর চুল!

ইন্দুলেখা তাহার সকল করুণা, স্নেহ মাধুরী লইয়া কোন্ সেকালের দেশের অতীত জীবনের পরে আবার তাহার দিদি হইয়া যেন ফিরিয়া আসিয়াছে—কাল তাই ইন্দুলেখার কথার ভঙ্গিতে, প্রতি পদক্ষেপে দিদিই যেন ফুটিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। যখন গভীর বনে সে শতস্নেহে ছোট ভাইকে জড়াইয়া রাখিয়াছিল, তাকে খাওয়াইবার জন্য ফল আহরণ করিতে গিয়া এক নির্জন বনের মধ্যে হারাইয়া গেল—সেই একদিনের মাকাল ফলের ঘটনাটাই অপুর ক্রমাগত মনে হইতেছিল।

দুপুর বেলা খাইবার জন্য অপু গিয়া অজয়কে ডাকিয়া আনিল। তাহার মা দুজনকে এক জায়গায় খাইতে দিয়া অজয়ের পরিচয় লইতে বসিল। সে ব্রাহ্মণের ছেলে, তাহার কেহ নাই, এক মাসী তাহাকে মানুষ করিয়াছিল, সেও মরিয়া গিয়াছে। আজ বছরখানেক যাত্রার দলে কাজ করিতেছে। সর্বজয়ার ছেলেটির উপর খুব স্নেহ হইল—বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে খাওয়াইল। খাওয়াইবার উপকরণ বেশি কিছু নাই, তবু ছেলেটি খুব খুশির সঙ্গে খাইল। তাহার পর দুর্গা মাকে চুপি চুপি বলিল—মা, ওকে সেই কালকের গানটা গাইতে বল না—সেই "কোথা ছেড়ে গেলি এ বন-কান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণসাথী রে"—

অজয় গলা ছাড়িয়া গানটি গাহিল—অপু মুগ্ধ হইয়া গেল—সর্বজয়ার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। আহা, এমন ছেলের মা নাই! তাহার পর সে আরও গান গাহিল। সর্বজয়া বলিল—বিকেলে মুড়ি ভাজবো, তখন এসে অবিশ্যি করে মুড়ি খেয়ে যেয়ো—লজ্জা কোরো না যেন—যখন খুশি আসবে, আপনার বাড়ির মতো, বুঝলে?

অপু তাহাকে সঙ্গে করিয়া নদীর ধারের দিকে বেড়াইতে গেল। সেখানে অজয় বলিল, ভাই, তোমার তো গলা মিষ্টি—একটা গান গাও না?...অপুর খুব ইচ্ছা হইল ইহার কাছে গান গাহিয়া সে বাহাদুরি লইবে। কিন্তু বড় ভয় করে—এ একজন যাত্রাদলের ছেলে—এর কাছ তার গান গাওয়া? নদীর ধারে বড় শিমুলগাছটার তলায় চলা-চল্‌তির পথ হইতে কিছুদূরে বাঁশঝোপের আড়ালে দুজনে বসে। অপু অনেক কষ্টে লজ্জা কাটাইয়া একটা গান করে—শ্রীচরণে ভার একবার গা তোল হে অনন্ত—দাশু রায়ের পাঁচালীর গান বাবার মুখে শুনিয়া সে লিখিয়া লইয়াছে। অজয় অবাক হইয়া যায়, বলে—তোমার এমন গলা ভাই? তা তুমি.গান গাও না কেন?...আর একটা গাও। অপু উৎসাহিত হইয়া আর একটা ধরে—খেয়ার আশে বসে রে মন ডুবল বেলা খেয়ার ধারে। তাহার দিদি কোথা হইতে শিখিয়া আসিয়া গাহিত, সুরটা বড় ভালো লাগায় অপু তাহার কাছ হইতে শিখিয়াছিল—বাড়িতে কেহ না থাকিলে মাঝে মাঝে গানটা তাহারা দুজনে গাহিয়া থাকে।

গান শেষ হইলে অজয় প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বলিল—এমন গলা থাকলে যে কোনো দলে ঢুকলে পোনেরো টাকা করে মাইনে সেধে দেবে বলচি তোমায়—এর ওপর একটু যদি শেখো।

বাড়িতে কেহ না থাকিলে দিদির সামনে গাহিয়া অপু কতদিন দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—হ্যাঁ দিদি, আমার গলা আছে? গান হবে?...দিদি তাহাকে বরাবর আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দিদির আশ্বাস যতই আশাপ্রদ হৌক, আজ একজন সংগীতদক্ষ খাস যাত্রার দলের নামকরা মেডেলওয়ালা গায়কের মুখে এ প্রশংসার কথা শুনিয়া আনন্দে অপু কি বলিয়া উত্তর করিবে ঠাওর করিতে পারিল না।

বলিল—তোমার ওই গানটা আমায় শেখাও না?...

তাহার পর দুইজনে গলা মিশাইয়া সে গানটা গাহিল।

অনেকক্ষণ হইয়া গেল। নদী বাহিয়া ছপ ছপ করিয়া নৌকা চলিতেছে, নদীর পাড়ের নিচে জলের ধারে একজন কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, অজয় বলিল—কি খুঁজচে ভাই?

অপু বলিল—ও ব্যাঙাচি খুঁজচে, ছিপে মাছ ধরবে—তাহার পর বলিল—আচ্ছা ভাই তুমি আমাদের এখানে থাকো না কেন?...যেয়ো না কোথাও, থাক্‌বে?...

এমন চোখ, এমন মিষ্টি গলার সুর! তাহার উপর অপুর কাছে সে সেই রাজপুত্র অজয়! কোন্ বনে ফিরিতে ফিরিতে অসহায় ছন্নছাড়া রূপবান্ রাজার ছেলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া ভাব হইয়া গিয়াছে—চিরজন্মের বন্ধু! আর তাহাকে কি করিয়া ছাড়া যায়?

অজয়ও অনেক মনের কথা বলিয়া ফেলিল। এমন সাথী তাহার আর জুটে নাই। সে প্রায় চল্লিশ টাকা জমাইয়াছে। আর একটু বড় হইলে সে এ-দল ছাড়িয়া দিবে। অধিকারী বড় মারে। সে আশুতোষ পালের দলে যাইবে—সেখানে বড় সুখ, রোজ রাত্রে লুচি। না খাইলে তিন আনা পয়সা খোরাকি দেয়। এ দল ছাড়িলে সে আবার অপুদের বাড়ি আসিবে ও সে সময় কিছুদিন থাকিবে। বৈকালের কিছু আগে অজয় বলিল—চল ভাই, আজ আবার এখুনি আসব হবে, সকাল সকাল ফিরি। যদি "পরশুরামের দর্প-সংহার" হয়, তবে আমি নিয়তি সাজবো, দেখো কেমন একটা গান আছে—

আরও তিন দিন যাত্রা হইল। গ্রামসুদ্ধ লোকের মুখে যাত্রা ছাড়া আর কথা নাই। পথে ঘাটে মাঠে গাঁয়ের মাঝি নৌকা বাহিতে বাহিতে, রাখাল গরু চরাইতে চরাইতে যাত্রার পালার নতুন শেখা গান গায়। গ্রামের মেয়েরা দলের ছেলেদের বাড়ি ডাকাইয়া যাহার যে গান ভালো লাগিয়াছে তাহার মুখে সে গান ফরমাইশ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। অপু আরও তিন-চারটা নতুন গান শিখিয়া ফেলিল। একদিন সে যাত্রার দলের বাসায় অজয়ের সঙ্গে গিয়াছে, সেখানে তাহাকে দলের সকলে মিলিয়া ধরিল, তাহাকে একটা গান গাহিতে হইবে। সেখানে সকলে অজয়ের মুখে শুনিয়াছে সে খুব ভালো গান গাহিতে পারে। অপু বহু সাধ্যসাধনার পর নিজের বিদ্যা ভালো করিয়া জাহির করিবার খাতিরে একটা গাহিয়া ফেলিল। সকলে তাহাকে ধরিয়া অধিকারীর নিকটে লইয়া গেল। সেখানেও তাহাকে একটা গাহিতে হইল। অধিকারী কালো রং-এর ভুঁড়িওয়ালা লোক, আসরে জুড়ি সাজিয়া গান করে। গান শুনিয়া বলিল—এসো না খোকা, দলে আস্‌বে? অপুর বুকখানা আনন্দে ও গর্বে দশহাত হইল। আরও সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরে—এসো, চলো তোমাকে আমাদের দলে নিয়ে যাই। অপুর তো ইচ্ছা সে এখনই যায়। যাত্রার দলে কাজ করা মনুষ্য জীবনের চরম উদ্দেশ্য, সেকথা এতদিন সে কেন জানিত না, ইহাই তো আশ্চর্যের বিষয়। সে গোপনে অজয়কে বলিল—আচ্ছা ভাই, এখন যদি আমি দলে যাই, আমাকে কি সাজতে দেবে?

অজয় বলিল—এখন এই সখী-ঠখী, কি বালকের পার্ট এই রকম, তারপর ভালো করে শিখলে—

অপু সখী সাজিতে চায় না—জরির মুকুট মাথায় সে সেনাপতি সাজিয়া তলোয়ার ঝুলাইবে, যুদ্ধ করিবে। বড় হইলে সে যাত্রার দলে যাইবেই, উহাই তাহার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য। অজয় তাহাকে চুপি চুপি কষ্টি পাথরের রং একটা ছোকরাকে দেখাইয়া কহিল, এই যে দেখছো, এর নাম বিষ্টু তেলি।

আমার সঙ্গে মোটে বনে না, আমার নিজের পয়সায় দেশলাই কিনে বালিশের তলায় রেখে শুই, দেশলাই উঠিয়ে নেয় চুরুট খেতে, আর দেয় না। আমি বলি আমার রাত্রে ভয় করে, দেশলাইটা দাও। অন্ধকারে মন ছম্‌ ছম্‌ করে, তাই সেদিন চেয়েছিলাম বলে এমনি থাবড়া একটা মেরেচে! নাচে ভালো বলে অধিকারী বড় খাতির করে, কিছু বলবারও জো নেই—

দিন পাঁচেক পরে যাত্রা দলের গাওনা শেষ হইয়া গেলে তাহারা রওনা হইল। অজয় বাড়ির ছেলের মতো যখন তখন আসিত যাইত, এই কয়দিনে সে যেন অপুরই আর এক ভাই হইয়া পড়িয়াছিল। অপুরই বয়সি ছোট ছেলে, সংসারে কেহ নাই শুনিয়া সর্বজয়া তাহাকে এ কয়দিন অপুর মতো যত্ন করিয়াছে। দুর্গাও তাহাকে আপন ভাইয়ের চোখে দেখিয়াছে—তাহার কাছে গান শিখিয়া লইয়াছে, কত গল্প শুনাইয়াছে, তাহার পিসিমার কথা বলিয়াছে, তিনজনে মিলিয়া উঠানে বড় ঘর আঁকিয়া গঙ্গা-যমুনা খেলিয়াছে, খাইবার সময়ে জোর করিয়া বেশি খাইতে বাধ্য করিয়াছে। যাত্রাদলে থাকে, কে কোথায় দ্যাখে, কোথায় শোয়, কি খায়, আহা বলিবার কেহ নাই; গৃহ-সংসারের যে স্নেহস্পর্শ বোধ হয় জন্মাবধিই তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই, অপ্রত্যাশিত ভাবে আজ তাহার স্বাদ লাভ করিয়া লোভীর মতো সে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছিল না।

যাইবার সময় সে হঠাৎ পুঁটুলি খুলিয়া কষ্টে সঞ্চিত পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া সর্বজয়ার হাতে দিতে গেল। একটু লজ্জার সুরে বলিল—এই পাঁচটা টাকা দিয়ে দিদির বিয়ের সময় একখানা ভালো কাপড়—

সর্বজয়া বলিল—না বাবা, না—তুমি মুখে বললে এই খুব হল, টাকা দিতে হবে না, তোমার এখন টাকার কত দরকার—বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হতে হবে—

তবু সে কিছুতেই ছাড়ে না। অনেক বুঝাইয়া তবে তাহাকে নিরস্ত করিতে হইল।

তাহার পর সকলে উহাদের বাড়ির দরজার সামনে খানিকটা পথ পর্যন্ত তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিল। যাইবার সময় সে বার বার বলিয়া গেল, দিদির বিয়ের সময় অবশ্য করিয়া যেন তাহাকে পত্র দেওয়া হয়।

গাবতলার ছায়ায় ছায়ায় তাহার সুকুমার বালকমূর্তি ভাঁটশ্যাওড়া ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেলে হঠাৎ সর্বজয়ার মনে হইল, বড্ড ছেলেমানুষ আহা, এই বয়সে বেরিয়েছে নিজের রোজগার নিজে কর্তে। অপুর আমার যদি ওইরকম হত—মাগো!...

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রথম প্রথম যখন হরিহর কাশী হইতে আসিল তখন সকলে বলিত তাহার ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল, এ অঞ্চলে ওরকম বিদ্যা শিখিয়া কেহ আসে নাই। তাহার বিদ্যার সুখ্যাতি সকলের মুখে ছিল, সকলে বলিত সে এইবার একটা কিছু করিবে। সর্বজয়াও ভাবিত, শীঘ্রই উহারা তাহার স্বামীকে ডাকাইয়া একটা ভালো চাকুরি দিবে (কাহারা চাকুরি দেয় সে সম্বন্ধে তাহার ধারণা ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন সমুদ্রবক্ষের মতো অস্পষ্ট)। কিন্তু মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর করিয়া বহুকাল চলিয়া গেল, অর্ধরাত্রির মাথায় কোনো জরির পোশাকপরা ঘোড়সওয়ার সভাপণ্ডিত পদের নিয়োগ-পত্র লইয়া ছুটিয়া আসিল না, বা আরব্য উপন্যাসের দৈত্য কোন মণি-খচিত মায়াপ্রাসাদ আকাশ বাহিয়া উড়াইয়া আনিয়া তাহাদের ভাঙা ঘরে বসাইয়া দিয়া গেল না, বরং সে ঘরের পোকা-কাটা কবাট দিন দিন আরও জীর্ণ হইতে চলিল, কড়িকাঠ আরও ঝুলিয়া পড়িতে চাহিল, আগে যাও বা ছিল তাও আর সব থাকিতেছে না, তবু সে একেবারে আশা ছাড়ে নাই। হরিহরও বিদেশ হইতে আসিয়া প্রতিবারই একটা না একটা

আশার কথা এমনভাবে বলে, যেন সব ঠিক, অল্পমাত্র বিলম্ব আছে, অবস্থা ফিরিল বলিয়া। কিন্তু হয়

জীবন বড় মধুময় শুধু এইজন্য যে, এই মাধুর্যের অনেকটাই স্বপ্ন ও কল্পনা দিয়া গড়া। হোক না স্বপ্ন মিথ্যা, কল্পনা বাস্তবতার লেশশূন্য; নাই বা থাকিল সব সময় তাহাদের পিছনে সার্থকতা; তাহারাই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহারা আসুক, জীবনে অক্ষয় হোক্ তাহাদের আসন; তুচ্ছ সার্থকতা, তুচ্ছ লাভ।

হরিহর বাড়ি হইতে গিয়াছে প্রায় দুই-তিন মাস। টাকাকড়ি খরচপত্র অনেকদিন পাঠায় নাই। দুর্গা অসুখে ভুগিতেছে একটু বেশি, খায় দায় অসুখ হয়, দুদিন একটু ভালো থাকে, হঠাৎ একদিন আবার হয়।

সর্বজয়া মেয়ের বিবাহের জন্য স্বামীকে প্রায়ই তাগাদা দেয়। স্বামীকে দিয়া দুই-তিনখানা পত্র নীরেন্দ্রের পিতা রাজ্যেশ্বরবাবুর নিকট লিখিয়াছে। সেদিকের আশাও সে এখনও ছাড়ে নাই। হরিহর বলে, তুমি কি খেপ্‌লে নাকি? ওসকল বড়লোকের কাণ্ড, রাজ্যেশ্বর কাকা কি আব আমাদের পুঁছবেন? তবুও সর্বজয়া ছাড়ে না; বলে, লেখো না আর একখানা, লিখেই দ্যাখো না—নীরেন তো পছন্দই করে গিয়েছেন। দুই এক মাস চলিয়া যায়, বিশেষ কোন উত্তর আসে না, আবাব সে স্বামীকে পত্র লিখিবার তাগাদা দিতে শুরু করে।

এবার হরিহর যখন বিদেশে যায়, তখন বলিয়া গিয়াছে এইবার সে এখান হইতে উঠিয়া অন্যত্র বাস করিবার একটা কিছু ঠিক করিয়া আসিবেই।

পাড়ার একপাশে নিকনো পুছানো ছোট্ট খড়ের ঘর দু'তিনখানা। গোয়ালে হৃষ্টপুষ্ট দুগ্ধবতী গাভী বাঁধা, মাচা ভরা বিচালি, গোলা ভরা ধান। মাঠের ধারের মটর ক্ষেতের তাজা, সবুজ গন্ধ খোলা হাওয়ায় উঠান দিয়া বহিয়া যায়। পাখি ডাকে—নীলকণ্ঠ, বাবুই, শ্যামা। অপু সকালে উঠিয়া বড় মাটির ভাঁড়ে ধোয়া এক পাত্র তাজা সফেন কালো গাই-এর দুধের সঙ্গে গরম মুড়ির ফলার খাইয়া পড়িতে বসে। দুর্গা ম্যালেরিয়ায় ভোগে না। সকলেই জানে, সকলেই খাতির করে, আসিয়া পায়ের ধুলা লয়। গরিব বলিয়া কেহ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না।

...শুধুই স্বপ্ন দেখে, দিন নাই, রাত নাই, সর্বজয়া শুধুই স্বপ্ন দেখে। তাহার মনে হয়, এতকাল পরে সত্য-সত্যই একটা কিছু লাগিয়া যাইবে। মনের মধ্যে কে যেন বলে।

কেন এতদিন হয় নাই? কেন এতকাল পরে? সেই ছেলেবেলাকার দিনে জামতলায় সজনেতলায় ঘুরিবার সময় হইতে সেঁজুতির আলপনা আঁকা মন্ত্রের সঙ্গে এ সাধ যে তাহার মনে জড়াইয়া আছে, লক্ষ্মীর আলতাপরা পায়ের দাগ আঁকা আঙিনায় শ্বশুরবাড়ির ঘর-সংসার পাতাইবে। এরকম ভাঙা পুরানো কোঠা বাঁশবন কে চাহিয়াছিল?

দুর্গা একটা ছোট্ট মানকচু কোথা হইতে জোগাড় করিয়া আনিয়া রান্নাঘরে ধরনা দিয়া বসিয়া থাকে। তাহার মা বলে, তোর হোল কি দুগ্‌গা? আজ কি বলে ভাত খাবি? কাল সন্ধেবেলাও তো জ্বর এসেচে?

দুর্গা বলে, তা হোক্ মা, সে জ্বর বুঝি—একটু তো মোটে শীত করলো?...তুমি এই মানকচুটা ভাতে দিয়ে দুটো ভাত—।

তাহার মা বলে—যাঃ, অসুখ হয়ে তোর খাই খাই বড্ড বেড়েছে। আজ কাল ভালো যদি থাকিস তো পরশু বরং দেবো—

অনেক কাকুতিমিনতির পর না পারিয়া শেষে দুর্গা মানকচু তুলিয়া রাখিয়া দেয়। খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, আপন মনে বলে, আজ খুব ভালো আছি, আজ আর জ্বর আস্‌বে না আমার—ওবেলা দুখানা রুটি আর আলুভাজা খাবো। একটু পরে হাই ওঠে, সে জানে ইহা জ্বর আসার পূর্বলক্ষণ। তবুও সে মনকে বোঝায়, হাই উঠুক, এমনি তো কত হাই ওঠে, জ্বর আর হবে না। ক্রমে

শীত করে, রৌদ্রে গিয়া বসিতে ইচ্ছা হয়। সে রৌদ্রে না গিয়া মনকে প্রবোধ দেয় যে, শীত বোধ হওয়া একটা স্বাভাবিক শারীরিক ব্যাপার, জ্বর আসার সহিত ইহার সম্পর্ক কি?

কিন্তু কোনো প্রবোধ খাটে না। রৌদ্র না পড়িতে পড়িতে জ্বর আসে, সে লুকাইয়া গিয়া রৌদ্রে বসে, পাছে মা টের পায়। তাহার মন হু-হু করে, ভাবে—জ্বর জ্বর ভেবে এরকম হচ্ছে, সত্যি সত্যি জ্বর হয়নি—

রাঙা রোদ শ্যাওলাধরা ভাঙা পাঁচিলের গায়ে গিয়া পড়ে। বৈকালের ছায়া ঘন হয়। দুর্গার মনে হয় অন্যমনস্ক হইয়া থাকিলে জ্বর চলিয়া যাইবে। অপুকে বলে, বোস্ দিকি একটু আমার কাছে, আয় গল্প করি।

একদিন আর-বছর ঘন বর্ষার রাতে সে ও অপু মতলব আঁটিয়া শেষরাত্রে পিছনে সেজ ঠাক্‌রুনদের বাগানে তাল কুড়াইতে গিয়াছিল, হঠাৎ দুর্গার পায়ে পট্ করিয়া এক কাঁটা ফুটিয়া গেল। যন্ত্রণায় পিছু হটিয়া বাঁ পা-খানা যেখানে রাখিল, সেখানে বাঁ পায়েও পট্ করিয়া আর একটা।...সকাল বেলা দেখা গেল, পাছে রাত্রে উহারা কেহ তাল কুড়াইয়া লয়, এজন্য সতু তালতলার পথে সোজা করিয়া সারি সারি বেল-কাঁটা পুঁতিয়া রাখিয়াছে।

আর একদিন যা আশ্চর্য ব্যাপার!—

কোথা হইতে সেদিন এক বুড়া বাঙাল মুসলমান একটা বড় রং-চং করা কাচবসানো টিনের বাক্স লইয়া খেলা দেখাইতে আসে। ও-পাড়ায় জীবন চৌধুরীর উঠানে সে খেলা দেখাইতেছিল। দুর্গা পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পয়সা ছিল না। আর সকলে এক এক পয়সা দিয়া বাক্সের গায়ে একটা চোঙের মধ্য দিয়া কি সব দেখিতেছিল।

বুড়া মুসলমানটি বাক্স বাজাইয়া সুর করিয়া বলিতেছিল, তাজ বিবিকা রোজা দেখো, হাতি বাঘকা লড়াই দেখো! এক-একজনের দেখা শেষ হইলে যেমন সে চোঙ হইতে চোখ সরাইয়া লইতেছিল অমনি দুর্গা তাহাকে মহা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছিল, কি দেখলি রে ওর মধ্যে? সব সত্যিকারের?

উঃ! সে কি অপূর্ব ব্যাপার দেখিয়াছে তাহা তাহারা বলিতে পারে না।...কি সে সব।

সকলের দেখা একে একে হইয়া গেল। দুর্গা চলিয়া যাইতেছিল, বুড়া মুসলমানটি বলিল, দেখবে না খুকি?...

দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, নাঃ—আমার কাছে পয়সা নাই।

লোকটি বলিল, এসো এসো খুকি, দেখে যাও—পয়সা লাগ্‌বে না—

দুর্গার একটু লজ্জা হইয়াছিল, মুখে বলিল,—নাঃ—কিন্তু আগ্রহে কৌতূহলে তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া উঠিল।

লোকটি বলিল, এসো এসো, দোষ কি?...এসো, দ্যাখো—

দুর্গা উজ্জ্বলমুখে পায়ে পায়ে বাক্সের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল বটে, তবুও সাহস করিয়া মুখটা চোঙের মধ্যে দিতে পারে নাই। লোকটি বলিল, এই নলটার মধ্যে দিয়া তাকাও দিকি খুকি?

দুর্গা মাথার উড়ন্ত চুলের গোছা কানের পাশে সরাইয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল। পরের দশ মিনিটের কথার সে কোনো বর্ণনা করিতে পারে না। সত্যকারের মানুষ ছবিতে কি করিয়া দেখা যায়? কত সাহেব, মেম, ঘরবাড়ি, যুদ্ধ, সে সব কথা সে বলিতে পারে না! কি জিনিসই সে দেখিয়াছিল!

অপুকে দেখাইতে বড় ইচ্ছা করে, দুর্গা কতবার খুঁজিয়াছে, ও খেলা আর কোনও দিন আসে নাই।

গল্প ভালো করিয়া শেষ হইতে না হইতে দুর্গা জ্বরের ধমকে আর বসিতে পারে না, উঠিয়া ঘরের মধ্যে কাঁথা মুড়ি দিয়া শোয়।

আজকাল বাবা বাড়ি নাই, অপুকে আর খুঁজিয়া মেলা দায়। বই দপ্তরে ঘুণ ধরিবার জোগাড়

হইয়াছে। সকাল বেলা সেই যে এক পুঁটুলি কড়ি লইয়া বাহির হয়, আর ফেরে একেবারে দুপুর ঘুরিয়া গেলে খাইবার সময়। তাহার মা বকে—ছেলের না নিকুচি করেচে—তোমার লেখাপড়া একেবারে ছিকেয় উঠ্‌লো? এবার বাড়ি এলে সব কথা বলে দেবো, দেখো এখন তুমি—

অপু ভয়ে ভয়ে দপ্তর লইয়া বসে। বইগুলো খুব চারিদিকে ছড়ায়। মাকে বলে, একটু খয়ের দাও মা, আমি দোয়াতের কালিতে দেবো—

পরে সে বসিয়া বসিয়া হাতের লেখা লিখিয়া রৌদ্রে দেয়। শুকাইয়া গেলে খয়ের-ভিজানো কালি চক্ চক্ করে—অপু মহাখুশির সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে—ভাবে—আর একটু খয়ের দেবো কাল থেকে—ওঃ কী চক্ চক্ করচে দেখো একবার! পানের বাটা হইতে মাকে লুকাইয়া বড় একখণ্ড খয়ের লইয়া কালির দোয়াতে দেয়। পরে লেখা লিখিয়া শুখাইতে দিয়া কতটা আজ জ্বলজ্বল করে দেখিবার জন্য কৌতূহলের সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে। মনে হয়—আচ্ছা যদি আর একটু দি?

একদিন মার কাছে ধরা পড়িয়া যায়। মা বলে, ছেলের লেখার সঙ্গে খোঁজ নেই। কেবল ড্যালা ড্যালা খয়ের রোজ দরকার—রেখে দে খয়ের—

ধরা পড়িয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া বলে, খয়ের নৈলে কালি হয় বুঝি?...আমি বুঝি এমনি এমনি—

—না খয়ের নৈলে কালি হবে কেন? এইসব রাজ্যির ছেলে আর লেখাপড়া কচ্চে না—তাদের সের সের খয়ের রোজ জোগানো রয়েছে যে দোকানে! যাঃ—

অপু বসিয়া বসিয়া একখানা খাতায় নাটক লেখে। বহু লিখিয়া খাতাখানা সে প্রায় ভরাইয়া ফেলিয়াছে, মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় রাজা রাজ্য ছাড়িয়া বনে যান, রাজপুত্র নীলাম্বর ও রাজকুমারী অম্বা বনের মধ্যে দস্যুর হাতে পড়েন, ঘোর যুদ্ধ হয়, পরে রাজকুমারীর মৃতদেহ নদীতীরে দেখা যায়। নাটকে সতু বলিয়া একটি জটিল চরিত্র সৃষ্ট হইবার অল্পপরেই বিশেষ কোনো মারাত্মক দোষের বর্ণনা না থাকা সত্ত্বেও সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। নাটকের শেষদিকে রাজপুত্রী অম্বার নারদের বরে পুনর্জীবন প্রাপ্তি বা বিশ্বস্ত সেনাপতি জীবনকেতুর সহিত তাঁহার বিবাহ প্রভৃতি ঘটনায় যাঁহারা বলেন যে, গত বৈশাখ মাসে দেখা যাত্রার পালা হইতে এক নামগুলি ছাড়া মূলত কোন অংশই পৃথক নহে, বা সেই হইতেই ইহা হুবহু লওয়া, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, অতীতের কোনো এক নীরব জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে নির্জন বাসকক্ষের স্তিমিত দীপশয্যায় এক প্রাচীন কবির নীলমেঘের মতো দৃশ্যমান ময়ুর-নিনাদিত দূর বনভূমির স্বপ্ন যদি কালিদাসকে মুক্ত মেঘের ভ্রমণ বর্ণনে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে, তাহা হইলেই বা কি?...সে বিস্মৃত শুভ-যামিনীর বন্দনা মানুষে নিজের অজ্ঞাতসারে হাজার বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছে।

আগুন দিয়াই আগুন জ্বালানো যায়, ছাই-এর ঢিপিতে মশাল গুঁজিয়া কে কোথায় মশাল জ্বালে?...

দপ্তরে একখানা বই আছে—বইখানার নাম চরিতমালা, লেখা আছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। পুরানো বই, তাহার বাবার নানা জায়গা হইতে ছেলের জন্য বইসংগ্রহ করিবার বাতিক আছে, কোথা হইতে একখানা আনিয়াছিল, অপু মাঝে মাঝে খানিকটা পড়িয়া থাকে। বইখানিতে যাঁহাদের গল্প আছে সে ওই রকম হইতে চায়। হাটে আলু বেচিতে পাঠাইলে কৃষকপুত্র রস্কো বেড়ার ধারে বসিয়া বীজগণিতের চর্চা করিত, কাগজের অভাবে চামড়ার পাতে ভোঁতা আল দিয়া অঙ্ক কষিত, মেষপালক ডুবাল ইতস্তত সঞ্চরণশীল মেষদলকে যদৃচ্ছ বিচরণের সুযোগ দিয়া একমনে গাছতলায় বসিয়া ভূচিত্র পাঠে মগ্ন থাকিত—সে ওই রকম হইতে চায়।...'বীজগণিত' কি জিনিস? সে বীজগণিত পড়িতে চায় রস্কোর মতো। সে এই হাতের লেখা লিখিতে চায় না, ধারাপাত কি শুভঙ্করী এসব তাহার ভালো লাগে না। ওইরকম নির্জন গাছতলায়, বনের ছায়ায়, কি বেড়ার ধারে বসিয়া বসিয়া সে "ভূচিত্র" (জিনিসটা কি?) পাতিয়া পড়িবে, বড় বড় বই পড়িবে, পণ্ডিত হইবে ওই

রকম। কিন্তু কোথায় পাইবে সে সব জিনিস? কোথায় বা 'ভূচিত্র', কোথায় বা 'বীজগণিত', কোথায়ই বা ল্যাটিন ব্যাকরণ?—এখানে শুধুই কড়ি কষার আর্যা, আর তৃতীয় নামতা।

মা বকিলে কি হইবে, যাহা সে পড়িতে চায়, তাহা এখানে কই?

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

কয়দিন খুব বর্ষা চলিতেছে। অন্নদা রায়ের চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যাবেলায় মজলিশ বসে। সেদিন সেখানে নীলকুঠির ভুয়ো গল্প হইতে শুরু হইয়া পুরীর কোন্ মন্দিরের মাথায় পাঁচমন ভারী চুম্বক পাথর বসানো আছে, যাহার আকর্ষণের বলে নিকটবর্তী সমুদ্রগামী জাহাজ প্রায়ই পথভ্রষ্ট হইয়া আসিয়া তীরবর্তী মগ্ন শৈলে লাগিয়া ভাঙিয়া যায় প্রভৃতি—আরব্য উপন্যাসের গল্পের মতো নানা আজগুবি কাহিনীর বর্ণনা চলিতেছিল। শ্রোতাদের কাহারও উঠিবার ইচ্ছা ছিল না, এরকম আজগুবি গল্প ছাড়িয়া কাহারও বাড়ি যাইতে মন সরিতেছিল না। ভূগোল হইতে শীঘ্রই গল্পের ধারা আসিয়া জ্যোতিষে পৌঁছিল। দীনু চৌধুরী বলিতেছিলেন—ভৃগু-সংহিতার মতো অমন বই তো আর নেই! তুমি যাও, শুধু জন্মরাশিটা গিয়ে দিয়ে দাও, তোমার বাবার নাম, কোন্ কুলে জন্ম, ভূত ভবিষ্যৎ সব বলে দেবে—তুমি মিলিয়ে নাও—গ্রহ ও রাশিচক্রের যত রকম ইয়ে হয়—তা সব দেওয়া আছে কি না? মায় তোমার পূর্বজন্ম পর্যন্ত—

সকলে সাগ্রহে শুনিতেছিলেন, কিন্তু রামময় হঠাৎ বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন—না, ওঠা যাক্, এর পর যাওয়া যাবে না—দেখচো না—দেখচো না কাণ্ডখানা? একটা বড় ঝট্‌কা-টট্‌কা না হলে বাঁচি, গতিক বড় খারাপ, চলো সব—

বৃষ্টির বিরাম নাই। একটু থামে, আবাব অমনি জোরে আসে, বৃষ্টির ছাটে চারিধার ধোঁয়া ধোঁয়া।

হরিহর মোট পাঁচটা টাকা পাঠাইয়াছিল, তাহার পর আর পত্রও নাই, টাকাও নাই। সেও অনেক দিন হইয়া গেল—রোজ সকালে উঠিয়া সর্বজয়া ভাবে আজ ঠিক খরচ আসিবে। ছেলেকে বলে, তুই খেলে খেলে বেড়াস বলে দেখতে পাস্‌নে, ডাক-বাক্সটার কাছে বসে থাক্‌বি—পিওন যেমন আস্‌বে আর অম্‌নি জিজ্ঞেস করবি—

অপু বলে—বা, আমি বুঝি বসে থাকি নে? কালও তো এলো পুঁটিদের চিঠি, আমাদের খবরের কাগজ দিয়ে গেল—জিজ্ঞেস করে এসো দিকি পুঁটিকে? কাল তবে আমাদের খবরের কাগজ কি করে এলো? আমি থাকিনে বই কি?

বর্ষা রীতিমতো নামিয়াছে। অপু মায়ের কথায় ঠায় রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে পিওনের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে। সাধু কর্মকারের ঘরে চালা হইতে গোলা পায়রার দল ভিজিতে ভিজিতে ঝটাপট করিয়া উড়িতে উড়িতে রায়েদের পশ্চিমের ঘরের কার্নিসে আসিতেছে, চাহিয়া চাহিয়া দ্যাখে। আকাশের ডাককে সে বড় ভয় করে। বিদ্যুৎ চম্‌কাইলে মনে মনে ভাবে—দেবতা কিরকম নলপাচ্চে দেখেচো, এইবার ঠিক ডাক্‌বে—পরে সে চোখ বুজিয়া কানে আঙুল দিয়া থাকে।

বাড়ি ফিরিয়া দ্যাখে মা ও দিদি সারা বিকাল ভিজিতে ভিজিতে রাশীকৃত কচুর শাক তুলিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় জড়ো করিয়াছে।

অপু বলে—কোত্থেকে আনলে মা? উঃ কত!

দুর্গা হাসিয়া বলে—কত—! উ-উঃ! তোমার তো বসে বসে বড় সুবিধে!...ওই ওদের ডোবার জামতলা থেকে—এই এতটা এক হাঁটু জল! যাও দিকি?...

সকালে ঘাটে গিয়া নাপিত-বৌয়ের সঙ্গে দেখা হয়। সর্বজয়া কাপড়ের ভিতর হইতে কাঁসার একখানা রেকাবি বাহির করিয়া বলে, এই দ্যাখো জিনিসখানা, খুব ভালো—ভরণ না, কিছু না, ফুল কাঁসা। তুমি বলেছিলে, তাই বলি যাই নিয়ে—এ সে জিনিস নয়, এ আমার বিয়ের দান—এখন এ জিনিস আর মেলে না—

অনেক দরদস্তুরের পর নাপিত-বৌ নগদ একটি আধুলি আঁচল হইতে খুলিয়া দিয়া রেকাবিখানা কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লয়। কাউকে যেন না প্রকাশ করে—সর্বজয়া এ অনুরোধ বার বার করে।

দুই একদিনে ঘনীভূত বর্ষা নামিল। হু-হু পুবে হাওয়া, খানাডোবা সব থই থই করিতেছে—পথে ঘাটে একহাঁটু জল, দিনরাত সোঁ সোঁ, বাঁশবনে ঝড় বাধে—বাঁশের মাথা মাটিতে লুটাইয়া লুটাইয়া পড়ে—আকাশের কোথাও ফাঁক নাই—মাঝে মাঝে আগেকার চেয়ে অন্ধকার করিয়া আসে—কালো কালো মেঘের রাশ হু-হু উড়িয়া পুব হইতে পশ্চিমে চলিয়াছে—দূর আকাশের কোথায় যেন দেবাসুরের মহাসংগ্রাম বাধিয়াছে, কোন্ কৌশলী সেনানায়কের চালনায় জলস্থল-আকাশ একাকারে ছাইয়া ফেলিয়া বিরাট দৈত্যসৈন্য, বাহিনীর পর বাহিনী, অক্ষৌহিণীব পর অক্ষৌহিণী, অদৃশ্য রথী-মহারথীদের নায়কত্বে ঝড়ের বেগে অগ্রসর হইতেছে—প্রজ্বলন্ত অত্যুগ্র দেববজ্র আগুন উড়াইয়া চক্ষের নিমেষে বিশাল কৃষ্ণচমূর এদিক-ওদিক পর্যন্ত ছিঁড়িয়া ফাঁড়িয়া এই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছে—এই আবার কোথা হইতে রক্তবীজের বংশ করাল কৃষ্ণছায়ায় পৃথিবী অন্তরীক্ষ অন্ধকার করিয়া ঘিরিয়া আসিতেছে।

মহাঝড়!

দিন রাত সোঁ-সোঁ শব্দ—নদীর জল বাড়ে—কত ঘবদোর কত জায়গায় যে পড়িয়া গেল!,...নদী নালা জলে ভাসিয়া গিয়াছে—গরু-বাছুর গাছের তলে, বাঁশবনে, বাড়ির ছাঁচতলায় অঝোরে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে, পাখি-পাখালির শব্দ নাই কোনোদিকে! চাবপাঁচ দিন সমান ভাবে কাটিল—কেবল ঝড়ের শব্দ আর অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণ!—অপু দাওয়ায় উঠিয়া তাড়াতাড়ি ভিজা মাথা মুছিতে মুছিতে বলিল—আমাদের বাঁশতলায় জল এসেচে দিদি, দেখবি?

দুর্গা কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়াছিল—না উঠিয়াই বলিল—কতখানি জল এসেচে রে?...

অপু বলে, তোর জ্বর সারলে কাল দেখে আসিস। ...তেঁতুলতলার পথে হাঁটু জল! পরে জিজ্ঞাসা করে—মা কোথায় বে?

ঘরে একটা দানা নেই—দুটোখানি বাসি চালভাজা মাত্র আছে। অপু কান্নাকাটি করে,—তা হবে না মা, আমার খিদে পায় না বুঝি—আমি দুটি ভাত খাবো—হুঁ-উ—

তার মা বলিল, লক্ষ্মী মানিক আমাব—ও রকম কি করে! অনেক করে চালভাজা মেখে দেবো এখন—রাঁধবো কেমন করে; দেখচিস নে কি রকম সেঁওটা করেচে?—উনুনের মধ্যে এক উনুন জল যে? পরে সে কাপড়ের ভিতর হইতে একটা কি বাহির করিয়া হাসিমুখে দেখাইয়া বলে—এই দ্যাখ্ একটা কইমাছ বাঁশতলায় কানে হেঁটে দেখি বেড়াচ্চে—বন্যের জল পেয়ে সব উঠে আসছে গাঙ থেকে—বরোজ পোতার ডোবা ভেসে নদীর সঙ্গে এক হয়ে গিয়েচে কিনা?...তাই সব উঠে আসচে—

দুর্গা কাঁথা ফেলিয়া ওঠে—অবাক হইয়া যায়। বলে, দেখি মা মাছটা? হাঁ মা, কইমাছ বুঝি কানে হেঁটে বেড়ায়? আর আছে?...

অপু এখনই বৃষ্টিমাথায় ছুটিয়া যায় আর কি—অনেক কষ্টে তাহার মা তাহাকে থামায়।

দুর্গা বলে—একটু জ্বর সারলে কাল সকালে চল্ অপু, তুই আর আমি বাঁশবাগান থেকে মাছ নিয়ে আসবো এখন। পরে সে অবাক হইয়া ভাবে—বাঁশাবাগানে মাছ! কী করে এল? বাঃ তো!—মা কি আর ভালো করে খুঁজেচে। খুঁজলে আরও সেখানে আছে—দেখতে পেলাম না কি রকম কইমাছ কানে হাঁটে—কাল সকালে দেখবো—সকালে জ্বর সেরে যাবে—

চারিদিকে বন-বাগান ঘিরিয়া সন্ধ্যা নামে। সন্ধ্যার মেঘে ত্রয়োদশীর অন্ধকারে চারিধার একাকার। দুর্গা যে বিছানা পাতিয়া শুইয়া আছে, তাহারই এক পাশে তাহার মা ও অপু বসে। সর্বজয়া ভাবে—আজ যদি এখ্‌খুনি একখানা পত্তর আসে নীরেন বাবাজীর? কি জানি, তা হতে কি আর পারে না? নীরেন তো পছন্দই করে গিয়েচেন—কি জানি কি হল অদেষ্টে! নাঃ, সে সব কি আর আমার অদেষ্টে হবে? তুমিও যেমন! তা হলে আর ভাবনা ছিল কি?

ওদিকে ভাইবোনে তুমুল তর্ক বাধিয়া যায়। অপু সরিয়া মায়ের কাছে ঘেঁষিয়া বসে—ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেজায় শীত করে। হাসিয়া বলে—মা—কি? সেই—শ্যামলঙ্কা বাট্‌না বাটে মাটিতে লুটায় কেশ?...

দুর্গা বলে—ততক্ষণে মা আমার ছেড়ে গিয়েচেন দেশ—

অপু বলে—দূর—হাঁ মা তাই? ততক্ষণে মা আমার ছেড়ে গিয়েচেন দেশ?—কথা বলিয়াই সে দিদির অজ্ঞতায় হাসে।

সর্বজয়ার বুকে ছেলের অবোধ উল্লাসের হাসি শেলের মতো বেঁধে। মনে মনে ভাবে—সাতটা নয় পাঁচটা নয়—এই তো একটা ছেলে—কি অদেষ্ট যে করে এসেছিলাম—তার মুখের আবদার রাখতে পারিনে—ঘি না, লুচি না, সন্দেশ না—কি না শুধু দুটো ভাত—নিনকি্য!...আবার ভাবে—এই ভাঙা ঘর, টানাটানির সংসার—অপু মানুষ হলে আর এ দুঃখ থাকবে না—ভগবান তাকে মানুষ করে তোলেন যেন।...

তাহার পর সে বসিয়া বসিয়া গল্প করে, যখন প্রথম সে নিশ্চিন্দিপুরে ঘর করিতে আসিয়াছিল, তখন এক বৎসর এই রকম অবিশ্রান্ত বর্ষায় নদীর জল এত বাড়িয়াছিল যে ঘাটের পথে মুখুজ্যেবাগানের কাছে বড় বোঝাই নৌকা পর্যন্ত আসিয়াছিল।

অপু বলে—কত বড় নৌকো মা?

—মস্ত—ওই যে খোট্টাদের চুনের নৌকো, সাজিমাটির নৌকো, মাঝে মাঝে আসে দেখিচিস তো—অত বড়—

দুর্গা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে—মা তুমি চারগুছির বিনুনি করতে জানো?

অনেক রাত্রে সর্বজয়ার ঘুম ভাঙিয়া যায়—অপু ডাকিতেছে—মা, ওমা ওঠো—আমার গায়ে জল্ল পড়চে—

সর্বজয়া উঠিয়া আলো জ্বালে—বাহিরে ভয়ানক বৃষ্টির শব্দ হইতেছে। ফুটা ছাদ দিয়া ঘরের সর্বত্র জল পড়িতেছে। সে বিছানা সরাইয়া পাতিয়া দেয়। দুর্গা অঘোর জ্বরে শুইয়া আছে—তাহার মা গায়ে হাত দিয়া দ্যাখে তাহার গায়ের কাঁথা ভিজিয়া সপ সপ করিতেছে। ডাকিয়া বলে—দুর্গা—ও দুর্গা শুন্‌ছিস?...একটু ওঠ্ দিকি? বিছানাটা সরিয়ে নি—ও দুর্গা—শিগ্‌গির, একেবারে ভিজে গেল যে সব?...

ছেলেমেয়ে ঘুমাইয়া পড়িলেও সর্বজয়ার ঘুম আসে না। অন্ধকার রাত—এই ঘন বর্ষা...তাহার মন ছম্‌ছম্ করে—ভয় হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে...কিছু ঘটিবে। বুকের মধ্যে কেমন যেন করে। ভাবে—সে মানুষেরই বা কি হল? কোন পত্তরও আসে না—টাকা মরুক্‌গে যাক। এরকম তো কোনোবার হয় না?...তাঁর শরীরটা ভালো আছে তো? মা সিদ্ধেশ্বরী, স-পাঁচ আনার ভোগ দেবো, ভালো খবর এনে দাও মা—

তার পরদিন সকালের দিকে সামান্য একটু বৃষ্টি থামিল। সবজয়া বাটীর বাহির হইয়া দেখিল বাঁশবনের মধ্যে ছোট ডোবাটা জলে ভর্তি হইয়া গিয়াছে। ঘাটের পথে নিবারণের মা ভিজিতে ভিজিতে কোথায় যাইতেছিল, সর্বজয়া ডাকিয়া বলিল—ও নিবারণের মা শোন্—পরে সলজ্জভাবে বলিল—সেই তুই একবার বলিছিলি না, বিন্দাবুনি চাদরের কথা তোর ছেলের জন্যে—তা নিবি?...

নিবারণের মা বলিল—আছে? দেয়া একটু ধরুক, মোর ছেলেরে সঙ্গে করে এখনি আস্‌বো এখন—নতুন আছে মা-ঠাক্‌রোন, না পুরোনো?...

সর্বজয়া বলিল, তুই আয় না—এখুনি দেখ্‌বি?...একটু পুরোনো, কিন্তু সে কেউ গায়ে দেয় নি—ধোয়া তোলা আছে—পরে একটু থামিয়া বলিল—তোরা আজকাল চাল ভান্‌চিস নে?...

নিবারণের মা বলিল—এই বাদলায় কি ধান শুকোয় মা ঠাক্‌রোন...খাবার বলে দুটোখানি রেখে দিইচি অম্‌নি—

সর্বজয়া বলিল—এক কাজ কর্‌ না—তাই গিয়ে আমায় আধকাটা খানেক আজ দিয়ে যাবি?... একটু সরিয়া আসিয়া মিনতির সুরে বলিল—বৃষ্টির জন্যে বাজার থেকে চাল আনাবার লোক পাচ্চিনে—টাকা নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চি তা কেউ যদি রাজি হয়—বড় মুশকিলে পড়িচি মা—

নিবারণের মা স্বীকার হইয়া গেল, বলিল—আসবো এখন নিয়ে, কিন্তু সে ভেটের ধানের চালির ভাত কি আপনারা খেতে পারবেন মা-ঠাক্‌রোন?...বড্ড মোটা—

নিমছাল সিদ্ধ দুর্গা আর খাইতে পারে না। তাহার অসুখ একভাবেই আছে। ঔষধ নাই, পথ্য নাই, ডাক্তার নাই, বৈদ্য নাই। বলে—এক পয়সার বিস্কুট আনিয়ে দেবে মা, নোন্‌তা, মুখে বেশ লাগে।

সাবু তাই জোটে না, তার বিস্কুট।

বৈকালবেলা হইতে আবার ভয়ানক বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ও যেন বেশি করিয়া আসে—ঘোর বর্ষণমুখর নির্জন, জলে থই-থই, হু-হু পুবে হাওয়া বওয়া, মেঘে অন্ধকারে একাকার ভাদ্র-সন্ধ্যা! আবার সেই রকম কালো কালো পেঁজা তুলোর মতো মেঘ উড়িয়া চলিয়াছে...বৃষ্টির শব্দে কান পাতা যায় না—দরজা জানালা দিয়া ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্‌টার সঙ্গে বৃষ্টির ছাট হু-হু করিয়া ঢোকে—ছেঁড়া থলে ছেঁড়া কাপড়-গোঁজা ভাঙা কবাটের আড়ালের সাধ্য কি যে ঝড়ের ভীম আক্রমণের মুখে দাঁড়ায়।

বেশি রাত্রে সকলে ঘুমাইলে বেশি বৃষ্টি নামিল। সর্বজয়ার ঘুম আসে না—সে বিছানায় উঠিয়া বসে। বাহিরে শুধু একটানা হুস্‌ হুস্‌ জলের শব্দ; ক্রুদ্ধ দৈত্যের মতো গর্জমান একটানা গোঁ গোঁ রবে ঝড়ের দমকা বাড়িতে বাধিতেছে!..জীর্ণ কোঠাখানা এক-একবারের দমকায় যেন থর থর করিয়া কাঁপে...ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া যায়...গ্রামের একধারে বাঁশবনের মধ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে লইয়া নিঃসহায়!...মনে মনে বলে—ঠাকুর, আমি মরি তাতে খেতি নেই—এদের কি করি?—এই রাত্তিরে যাই বা কোথায়?...মনে মনে বসিয়া বসিয়া ভাবে—আচ্ছা যদি কোঠা পড়ে, তবে দালানের দেওয়ালটা বোধ হয় আগে পড়বে—যেমন শব্দ হবে অম্‌নি পানচালার দোর দিয়ে এদের টেনে বার করে নেবো—

সে যেন আর বসিয়া থাকিতে পারে না—কয়দিন সে ওলশাক কচুশাক সিদ্ধ করিয়া খাইয়া দিন কাটাইতেছে—নিজে উপবাসের পর উপবাস দিয়া ছেলেমেয়েকে যাহা কিছু সামান্য খাদ্য ছিল খাওয়াইতেছে—শরীর ভাবনায় অনাহারে দুর্বল, মাথার মধ্যে কেমন করে।

ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দ, অনেক রাত্রে ঝড় বাড়িল। বাহিরে কি ঝট্‌কা আসিল! উপায়! একবার বড় একটা দম্‌কায় ভয় পাইয়া সে ঝড়ের গতিক বুঝিবার জন্য সন্তর্পণে দালানের দুয়ার খুলিয়া বাইরের রোয়াকে মুখ বাড়াইল...বৃষ্টির ছাটে কাপড় চুল সব ভিজিয়া গেল—হু-হু একটানা হাওয়ার শব্দে বৃষ্টিপতনের ঝড়ের শব্দ ঢাকিয়া গিয়াছে—বাহিরে কিছু দেখা যায় না—অন্ধকারে মেঘে আকাশে বাতাসে গাছপালায় সব একাকার! ঝড়-বৃষ্টির শব্দে আর কিছু শোনা যায় না।

এই হিংস্র অন্ধকার ও ক্রূর ঝটিকাময়ী রজনীর আত্মা যেন প্রলয়দেবের দূতরূপে ভীম ভৈরব বেগে সৃষ্টি গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসিতেছে—অন্ধকারে, রাত্রে, গাছপালায়, আকাশে, মাটিতে তাহার

গতিবেগ বাধিয়া শব্দ উঠিতেছে—সু-ইশ সু-উ-উ-উ-ইশ্...সু উ উ উ ই শ...এই শব্দের প্রথমাংশের দিকে বিশ্বগ্রাসী দূতটা যেন পিছু হটিয়া বল সঞ্চয় করিতেছে—সু উ উ—এবং শেষের অংশটায় পৃথিবীর উচ্চ নীচ তাবৎ বায়ুস্তর আলোড়ন, মন্থন করিয়া বায়ুস্তরে বিশাল তুফান তুলিয়া তাহার সমস্ত আসুরিকতার বলে সর্বজয়াদের জীর্ণ কোঠাটার পিছনে ধাক্কা দিতেছে—ই ই শ...! কোঠা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে...আর থাকে না! ইহার মধ্যে যেন কোনো অধীরতা, বিশৃঙ্খলতা, ভ্রম-ভ্রান্তি নাই—যেন দৃঢ়, অভ্যস্থ, প্রণালীবদ্ধ ভাবের কর্তব্যকার্য!...বিশ্বটাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চূর্ণ করিয়া উড়াইয়া দেওয়ার ভার যে লইয়াছে, যুগে যুগে এরকম কত হাস্যমুখী সৃষ্টিকে বিধ্বস্ত করিয়া অনন্ত আকাশের অন্ধকারে তারাবাজির মতো ছড়াইয়া দিয়া আসিয়াছে যে মহাশক্তিমান ধ্বংসদূত—এ তার অভ্যস্ত কার্য...এতে তার অধীরতা উন্মত্ততা সাজে না...

আতঙ্কে সর্বজয়া দোর বন্ধ করিয়া দিল...আচ্ছা যদি এখন একটা কিছু ঘরে ঢোকে? মানুষ কি অন্য কোন জানোয়ার? চারিদিকে ঘন বাঁশবন, জঙ্গল, লোকজনের বসতি নাই—মাগো! জলের ছাটে ঘর ভাসিয়া যাইতেছে...হাত দিয়া দেখিল ঘুমন্ত অপুর গা জলে ভিজিয়া ন্যাতা হইয়া যাইতেছে...সে কি করে? আর কত রাত আছে? সে বিছানা হাতড়াইয়া দেশলাই খুঁজিয়া কেরোসিনের ডিবাটা জ্বালে। ডাকে—ও অপু ওঠ্ তো? জল পড়চে—। অপু ঘুমচোখে জড়িত গলায় কি বলে বোঝা যায় না। আবার ডাকে—অপু? শুন্‌চিস্ ও অপু? ওঠ্ দিকি! দুর্গাকে বলে—পাশ ফিরে শো তো দুগ্‌গা। বড্ড জল পড়চে—একটু সরে, পাশ ফের দিকি—

অপু উঠিয়া বসিয়া ঘুমচোখে চারিদিকে চায়—পরে আবার শুইয়া পড়ে। হুড়ুম করিয়া বিষম কি শব্দ হয়, সর্বজয়া তাড়াতাড়ি আবার দুয়ার খুলিয়া বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিল—বাঁশবাগানের দিকটা ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতেছে—রান্নাঘরের দেওয়াল পড়িয়া গিয়াছে?...তাহার বুক কাঁপিয়া ওঠে—এইবার বুঝি পুরানো কোঠাটা—? কে আছে, কাহাকে সে এখন ডাকে? মনে মনে বলে—হে ঠাকুর, আজকার রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে দাও, হে ঠাকুর, ওদের মুখের দিকে তাকাও—

তখনও ভালো করিয়া ভোর হয় নাই, ঝড় থামিয়া গিয়াছে কিন্তু বৃষ্টি তখনও অল্প অল্প পড়িতেছে। পাড়ার নীলমণি মুখুজ্যের স্ত্রী গোহালে গরুর অবস্থা দেখিতে আসিতেছেন, এমন সময় খিড়কিদোরে বার বার ধাক্কা শুনিয়া দোর খুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—নতুন বৌ!...সর্বজয়া ব্যস্তভাবে বলিল—ন'দি, একবার বট্‌ঠাকুরকে ডাকো দিকি?...একবার শিগ্‌গির আমাদের বাড়িতে আসতে বলো—দুগ্‌গা কেমন করচে!

নীলমণি মুখুজ্যের স্ত্রী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—দুগ্‌গা? কেন কি হয়েছে দুগ্‌গার?...

সর্বজয়া বলিল—ক'দিন থেকে তো জ্বর হচ্ছিল—হচ্ছে আবার যাচ্ছে—ম্যালেরিয়ার জ্বর, কাল সন্দে থেকে জ্বর বড্ড বেশি—তার ওপর কাল রাত্রে কি রকম কাণ্ড তো জানোই—একবার শিগ্‌গির বট্‌ঠাকুরকে—

তাহার বিস্রস্ত কেশ ও রাত-জাগা রাঙা রাঙা চোখের কেমন দিশাহারা চাহনি দেখিয়া নীলমণি মুখুজ্যের স্ত্রী বলিলেন—ভয় কি বৌ—দাঁড়াও আমি এখুনি ডেকে দিচ্চি—চল আমিও যাচ্ছি—কাল আবার রাত্তিরে গোয়ালের চালাখানা পড়ে গেল—বাবা, কাল রাত্তিরের মতো কাণ্ড আমি তো কখনও দেখিনি—শেষরাত্রে সব উঠে গরু-টরু সরিয়ে রেখে আবার শুয়েচে কিনা?...দাঁড়াও আমি ডাকি—

একটু পরে নীলমণি মুখুজ্যে, তাঁহার বড় ছেলে ফণি, স্ত্রী ও দুই মেয়ে সকলে অপুদের বাড়িতে আসিলেন। রাত্রের অন্ধকারে সেই দৈত্যটা যেন সারা গ্রামখানা দলিত, পিষ্ট, মথিত করিয়া দিয়া আকাশ-পথে অন্তর্হিত হইয়াছে—ভাঙা গাছের ডাল, পাতা, চালের খড়, কাঁচা বাঁশপাতা, বাঁশের কঞ্চিতে পথ ঢাকিয়া দিয়াছে—ঝড়ের বাঁশ নুইয়া পথ আটকাইয়া রহিয়াছে। ফণি বলিল—দেখেচেন

বাবা কাণ্ডখানা? সেই নবাবগঞ্জের পাকা রাস্তা থেকে বিলিতি তট্‌কা গাছটার পাতা উড়িয়ে এনেচে!...নীলমণি মুখুজ্যের ছোট ছেলে একটা মরা চড়ুই পাখি বাঁশপাতার ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিল।

দুর্গার বিছানার পাশে অপু বসিয়া আছে—নীলমণি মুখুজ্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কি হয়েছে বাবা অপু?

অপুর মুকে উদ্বেগের চিহ্ন। বলিল, দিদি কি সব বকছিল জেঠামশায়।

নীলমণি বিছানার পাশে বসিয়া বলিলেন—দেখি হাতখানা?...জ্বরটা একটু বেশি, আচ্ছা কোনো ভয় নেই—ফণি, তুমি একবার চট করে নবাবগঞ্জে চলে যাও দিকি শরৎ ডাক্তারের কাছে—একেবারে ডেকে নিয়ে আসবে। পরে তিনি ডাকিলেন—দুর্গা, ও দুর্গা? দুর্গার অঘোর আচ্ছন্ন ভাব, সাড়া শব্দ নাই। নীলমণি বলিলেন, এঃ, ঘরদোরের অবস্থা তো বড্ড খারাপ? জল পড়ে কাল রাত্রে ভেসে গিয়েছে...তা বৌমার লজ্জার কারণই বা কি—আমাদের ওখানে না হয় উঠলেই হত? হরিটারও কাণ্ডজ্ঞান আর হল না এ জীবনে—এই অবস্থায় এইরকম ঘরদোর সারানোর একটা ব্যবস্থা না করে কি যে করচে, তাও জানিনে—চিরকালটা ওর সমান গেল—

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন—ঘর সারাবে কি, খাবার নেই ঘরে, নৈলে কি এরকম আতান্তরে ফেলে কেউ বিদেশে যায়? আহা, রোগা মেয়েটা কাল সারারাত ভিজেচে--একটু জল গরম করতে দাও—ওই জানালাটা খুলে দাও তো ফণি?

একটু বেলায় নবাবগঞ্জ হইতে শরৎ ডাক্তার আসিলেন—দেখিয়া শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। বলিয়া গেলেন যে বিশেষ ভয়ের কোনো কারণ নাই, জ্বর বেশি হইয়াছে, মাথায় জলপটি নিয়মিতভাবে দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন। হরিহর কোথায় আছে জানা নাই—তবুও তাহাব পূর্ব ঠিকানায় তাহাকে একখানি পত্র দেওয়া হইল।

পরদিন ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল—আকাশের মেঘ কাটিতে শুরু করিল। নীলমণি মুখুজ্যে দু'বেলা নিয়মিত দেখাশোনা করিতে লাগিলেন। ঝড় বৃষ্টি থামিবার পরদিন হইতেই দুর্গার জ্বর আবার বড় বাড়িল। শরৎ ডাক্তার সুবিধা বুঝিলেন না। হরিহরকে আর একখানা পত্র দেওয়া হইল।

অপু তাহার দিদির মাথার কাছে বসিয়া জলপটি দিতেছিল। দিদিকে দু-একবার ডাকিল—ও দিদি শুন্‌ছিস্, কেমন আছিস্, ও দিদি? দুর্গার কেমন আচ্ছন্ন ভাব। ঠোঁট নড়িতেছে—কি যেন আপন মনে বলিতেছে, ঘোর ঘোর। অপু কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া দু-একবার চেষ্টা করিয়াও কিছু বুঝিতে পারিল না।

বৈকালের দিকে জ্বর ছাড়িয়া গেল। দুর্গা আবার চোখ মেলিয়া চাহিতে পারিল এতক্ষণ পরে। ভারি দুর্বল হইয়া পড়িয়াচে, চিঁচিঁ করিয়া কথা বলিতেছে, ভালো করিয়া না শুনিলে বোঝা যায় না কি বলিতেছে।

মা গৃহকার্যে উঠিয়া গেলে অপু দিদির কাছে বসিয়া রহিল। দুর্গা চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—বেলা কত রে?

অপু বলিল—বেলা এখনও অনেক আছে—রদ্দুর উঠেচে আজ দেখিচিস দিদি? এখনও আমাদের নারকেল গাছের মাথায় রোদ্দুর রয়েচে—

খানিকক্ষণ দুজনেই কোনো কথা বলিল না। অনেকদিন পরে রৌদ্র ওঠাতে অপুর ভারি আহ্লাদ হইয়াছে। সে জানালার বাহিরে রৌদ্রালোকিত গাছটার মাথায় চাহিয়া রহিল।

খানিকটা পরে দুর্গা বলিল—শোন্ অপু—একটা কথা শোন্—

—কি রে দিদি? পরে সে দিদির মুখের আরও কাছে মুখ লইয়া গেল।

—আমায় একদিন তুই রেলগাড়ি দেখাবি?

—দেখাবো এখন—তুই সেরে উঠলে বাবাকে বলে আমরা সব একদিন গঙ্গা নাইতে যাবো রেলগাড়ি করে—

সারা দিন রাত্রি কাটিয়া গেল। ঝড় বৃষ্টি কোনও কালে হইয়াছিল মনে হয় না। চারিধারে দারুণ শরতের রৌদ্র।

সকাল দশটার সময় নীলমণি মুখুজ্যে অনেকদিন পরে নদীতে স্নান করিতে যাইবেন বলিয়া তেল মাখিতে বসিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীর উত্তেজিত সুর তাঁর কানে গেল—ওগো, এসো তো একবার এদিকে শিগ্‌গির—অপুদের বাড়ির দিক থেকে যেন একটা কান্নার গলা পাওয়া যাচ্চে—

ব্যাপার কি দেখিতে সকলে ছুটিয়া গেলেন।

সর্বজয়া মেয়ের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিতেছে—ও দুগ্‌গা চা দিকি—ওমা, ভালো করে চা দিকি—ও দুগ্‌গা—

নীলমণি মুখুজ্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কি হয়েচে—সরো সব, সরো দিকি—আহা কি সব বাতাসটা বন্ধ করে দাঁড়াও?

সর্বজয়া ভাসুর-সম্পর্কের প্রবীণ প্রতিবেশীর ঘরের মধ্যে উপস্থিতি ভুলিয়া গিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—ওগো, কি হল, মেয়ে অমন করচে কেন?

দুর্গা আর চাহিল না।

আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের হাতছানি আসে—পৃথিবীর বুক থেকে ছেলেমেয়েরা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া গিয়া অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলে—পরিচিত ও গতানুগতিক পথের বহুদূরপারে কোন্ পথহীন পথে—দুর্গার অশান্ত, চঞ্চল প্রাণের বেলায় জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা বড় অজানার ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে!

তখন আবার শরৎ ডাক্তারকে ডাকা হইল—বলিলেন—ম্যালেরিয়ার শেষ স্টেজটা আর কি—খুব জ্বরের পর যেন বিরাম হয়েচে আর অমনি হার্টফেল করে—ঠিক এরকম একটা case হয়ে গেল সেদিন দশঘরায়—

আধঘণ্টার মধ্যে পাড়ার লোকে উঠান ভাঙিয়া পড়িল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

হরিহর বাড়ির চিঠি পায় নাই।

এবার বাড়ি হইতে বাহির হইয়া হরিহর রায় প্রথমে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর যায়। কাহারও সঙ্গে তথায় পরিচয় ছিল না। শহর-বাজার জায়গা, একটা না একটা কিছু উপায় হইবে এই কুহকে পড়িয়াই সে সেখানে গিয়াছিল। গোয়াড়ীতে কিছুদিন থাকিবার পর সে সন্ধান পাইল যে, শহরে উকিল কি জমিদারের বাড়িতে দৈনিক বা মাসিক চুক্তি হিসারে চণ্ডীপাঠ করার কার্য প্রায়ই জুটিয়া যায়। আশায় আশায় দিন পনেরো কাটাইয়া বাড়ি হইতে পথখরচ বলিয়া যৎসামান্য যাহা কিছু আনিয়াছিল ফুরাইয়া ফেলিল, অথচ কোথাও কিছু সুবিধা হয় না।

সে পড়িল মহাবিপদে—অপরিচিত স্থান, কেহ একটি পয়সা দিয়া সাহায্য করে এমন নাই—খোড়ে বাজারের যে হোটেলটিতে ছিল পয়সা ফুরাইয়া গেলে সেখান হইতে বাহির হইতে হইল। একজনের নিকট শুনিল স্থানীয় হরিসভায় নবাগত অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণ পথিককে বিনামূল্যে থাকিতে ও খাইতে দেওয়া হয়। অভাব জানাইয়া হরিসভার একটা কুঠুরির একপাশে থাকিবার স্থান পাইল বটে,

কিন্তু সেখানে বড় অসুবিধা, অনেকগুলি নিষ্কর্মা গাঁজাখোর লোক রাত্রিতে সেখানে আড্ডা করে, প্রায় সমস্ত রাত্রি হৈ হৈ করিয়া কাটায়, এমন কি গভীর রাত্রিতে এক-একদিন এমন ধরনের স্ত্রীলোকের যাতায়াত দেখা যাইতে লাগিল যাহাদের ঠিক হরিমন্দির দর্শন-প্রার্থিনী ভদ্রমহিলা বলিয়া মনে হয় না।

অতিকষ্টে দিন কাটাইয়া সে শহরের বড় বড় উকিল ও ধনী গৃহস্থের বাড়িতে ঘুরিতে লাগিল। সারাদিন ঘুরিয়া অনেক রাত্রিতে ফিরিয়া এক-একদিন দেখিত তাহার স্থানটিতে তাহারই বিছানাটি টানিয়া লইয়া কে-একজন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। হরিহর কয়েকদিন বাহিরের বারান্দায় শুইয়া কাটাইল। প্রায়ই এরূপ হওয়াতে ইহা লইয়া গাঁজাখোর সম্প্রদায়ের সহিত তাহার একটু বচসা হইল। পরদিন প্রাতে তাহারা হরিসভার সেক্রেটারির কাছে গিয়া কি লাগাইল তাহারাই জানে—সেক্রেটারি-বাবু নিজ বাড়িতে হরিহরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও বলিলেন, তাঁহাদের হরিসভায় তিনদিনের বেশি থাকিবার নিয়ম নাই, সে যেন অন্যত্র বাসস্থান দেখিয়া লয়।

সন্ধ্যার পরে জিনিসপত্র লইয়া হরিহরকে হরিসভার বাড়ি হইতে বাহির হইতে হইল।

খোড়ে নদীর ধারে অল্প একটু নির্জন স্থানে পুঁটুলিটা নামাইয়া রাখিয়া নদীর জলে হাত-মুখ ধুইল।

সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নাই—সেদিন একটি কাঠের গোলাতে বসিয়া শ্যামাবিষয় গান করিয়াছিল—গোলার অধিকারী একটি টাকা প্রণামী দেয়—সেই টাকাটি হইতে কিছু পয়সা ভাঙাইয়া বাজার হইতে মুড়ি ও দই কিনিয়া আনিল। খাবার গলা দিয়া যেন নামে না—মাত্র দিনদশেকের সম্বল রাখিয়া সে বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছে। অদ্য প্রায় দুই মাসের উপর হইয়া গেল—এ পর্যন্ত একটি পয়সা পাঠাইতে পারে নাই—এতদিন কি করিয়া তাহাদের চলিতেছে! অপু বাড়ি হইতে আসিবার সময় বার বার বলিয়া দিয়াছে—তাহার জন্য একখানা পদ্মপুরাণ কিনিয়া লইয়া যাইবার জন্য। ছেলে বই পড়িতে বড় ভালোবাসে—মাঝে মাঝে সে যে বাপের বাক্স-দপ্তর হইতে লুকাইয়া বই বাহির করিয়া লইয়া পড়ে, তাহা হরিহর বুঝিতে পারে—বাক্সের ভিতর আনাড়ি হাতের হেলাগোছা করা থাকে—কোন্ বই বাবা বাক্সর কোথায় রাখে, ছেলে তাহা জানে না—উলটা-পালটা করিয়া সাজাইয়া চুরি ঢাকিবার অক্ষম চেষ্টা করে—হরিহর বাড়ি ফিরিয়া বাক্স খুলিলেই বুঝিতে পারে ছেলের কীর্তি।

তাহার বাড়ি হইতে আসিবার পূর্বে হরিহর যুগীপাড়া হইতে একখানা বটতলার পদ্মপুরাণ পড়িবার জন্য লইয়া আসে—অপু বইখানা দখল করিয়া বসিল—রোজ রোজ পড়ে—কুচনী পাড়ায় শিবঠাকুরের মাছ ধরিতে যাওয়ার কথাটা পড়িয়া তাহার ভারি আমোদ—হরিহর বলে—বইখানা দ্যাও বাবা, যাদের বই তারা চাচ্ছে যে! অবশেষে একখানা পদ্মপুরাণ তাহাকে কিনিয়া দিতে হইবে—এই শর্তে বাবাকে রাজি করাইয়া তবে সে বই ফেরত দেয়। আসিবার সময় বার বার বলিয়াছে—সেই বই একখানা এনো কিন্তু বাবা, এবার অবিশ্যি অবিশ্যি। দুর্গার উঁচু নজর নাই, সে বলিয়া দিয়াছে, একখানা সবুজ হাওয়াই কাপড় ও একপাতা ভালো দেখিয়া আলতা লইয়া যাইবার জন্য। কিন্তু সে সব তো দূরের কথা, কি করিয়া বাড়িতে সংসার চলিতেছে সেই না এখন সমস্যা! সন্ধ্যার পর পূর্ব-পরিচিত কাঠের গোলাটায় গিয়া সে রাত্রের মতো আশ্রয় লইল। ভালো ঘুম হইল না—বিছানায় শুইয়া বাড়িতে কি করিয়া কিছু পাঠায় এই ভাবনায় এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল।

সকালে উঠিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সে লক্ষ্যহীন ভাবে পথের একস্থানে দাঁড়াইল। রাস্তার ওপারে একটা লাল ইঁটের লোহার ফটকওয়ালা বাড়ি। অনেকক্ষণ চাহিয়া তাহার কেমন মনে হইল এই বাড়িতে গিয়া দুঃখ জানাইলে তাহার একটা উপায় হইবে। কলের পুতুলের মতো সে ফটকের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। সাজানো বৈঠকখানা, মার্বেল পাথরের ধাপে স্তরে স্তরে বসানো ফুলের টব, পাথরের পুতুল, পাম, দরজায় ঢুকিবার স্থানে পা-পোষ পাতা। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বৈঠকখানায় খবরের কাগজ পড়িতেছেন—অপরিচিত লোক দেখিয়া কাগজ পাশে রাখিয়া সোজা হইয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? কি দরকার?

হরিহর বিনীতভাবে বলিল—আজ্ঞে আমি ব্রাহ্মণ—সংস্কৃত পড়া আছে, চণ্ডী পাঠ-টাট্ করি—তা ছাড়া ভাগবত কি গীতা পাঠও—

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ভালো করিয়া কথা না শুনিয়াই তাঁহার সময় অত্যন্ত মূল্যবান, বাজে কথা শুনিবার সময় নিতান্ত সংক্ষেপ জানাইয়া দিবার ভাবে বলিলেন—না, এখানে ওসব কিছু এখন সুবিধে হবে না, অন্য জায়গায় দেখুন।

হরিহর মরীয়া ভাবে বলিল—আজ্ঞে নতুন শহরে এসেচি, একেবারে কিছু হাতে নেই—বড় বিপদে পড়িচি, ক'দিন ধরে কেবলই—

প্রৌঢ় লোকটি তাড়াতাড়ি বিদায় করিবার ভঙ্গিতে ঠেস দেওয়ার তাকিয়াটা উঠাইয়া একটা কি তুলিয়া লইয়া হরিহরের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন—এই নিন, যান, অন্য কিছু হবে-টবে না, নিন। সেটা যে শ্রেণীর মুদ্রাই হউক সেইটাই অন্য সুরে দিতে আসিলে হরিহর লইতে কিছুমাত্র আপত্তি করিত না—এরূপ সে বহুস্থানে লইয়াছেও; কিন্তু সে বিনীতভাবে বলিল—আজ্ঞে আপনি রাখুন, আমি এমনি কাবুর কাছে নিইনে—আমি শাস্ত্র পাঠ-টাট্ করি—তা ছাড়া কাবুর কাছে—আচ্ছা থাক্—

একটু শুভযোগ বোধ হয় ঘটিয়াছিল। রক্ষিত মহাশয়ের কাঠের গোলাতেই একদিন একটা সন্ধান জুটিল। কৃষ্ণনগরের কাছে একটা গ্রামে একজন বর্ধিষ্ণু মহাজন গৃহ-দেবতার পূজা-পাঠ করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ খুঁজিতেছে, যে বরাবর টিকিয়া থাকিবে। রক্ষিত মহাশয়ের যোগাযোগে অবিলম্বে হরিহর সেখানে গেল—বাড়ির কর্তাও তাহাকে পছন্দ করিলেন। থাকিবার ঘর দিলেন, আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হইল না।

কয়েকদিন কাজ করিবার পরেই পূজা আসিয়া পড়িল। বাড়ি যাইবার সময় বাড়ির কর্তা দশ টাকা প্রণামী ও যাতায়াতের গাড়িভাড়া দিলেন, গোয়াড়ীতে রক্ষিত মহাশয়ের নিকট বিদায় লইতে আসিলে সেখান হইতেও পাঁচটি টাকা প্রণামী পাওয়া গেল।

আকাশে-বাতাসে গরম রৌদ্রের গন্ধ, নীল নির্মেঘ আকাশের দিকে চাহিলে মনে হঠাৎ উল্লাস আসে, বর্ষাশেষের সরস সবুজ লতাপাতায় পথিকের চরণভঙ্গিতে কেমন একটা আনন্দ মাখানো। রেলপথের দুপাশে কাশ ফুলের ঝাড় গাড়ির বেগে লুটাইয়া পড়িতেছে, চলিতে চলিতে কেবলই বাড়ির কথা মনে হয়।

একদল শান্তিপুরের ব্যবসায়ী লোক পূজার পূর্বে কাপড়ের গাঁট ক্রয় করিতে কলিকাতায় গিয়াছিল, চূর্ণীঘাটের খেয়ার নৌকায় উঠিয়া কলরব করিতেছে—সর্বত্র একটা উৎসবের উল্লাস। রানাঘাটের বাজারে সে স্ত্রী ও পুত্রকন্যার জন্য কাপড় কিনিল। দুর্গা লালপাড় কাপড় পরিতে ভালোবাসে, তাহার জন্য বাছিয়া একখানা ভালো কাপড়, ভালো দেখিয়া আলতা কয়েক পাতা। অপুর 'পদ্মপুরাণ' অনেক সন্ধান করিয়াও মিলিল না, অবশেষে একখানা 'সচিত্র চণ্ডী-মাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান' ছয় আনা মূল্যে কিনিয়া লইল। গৃহস্থালির টুক্‌টাক দু'একটা জিনিস সর্বজয়া বলিয়া দিয়াছিল—একটা কাঠের চাকি-বেলুনের কথা, তাহাও কিনিল।

দেশের স্টেশনে নামিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে বৈকালের দিকে সে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। পথে বড় একটা কাহারও সহিত দেখা হইল না, দেখা হইলেও সে হন্ হন্ করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কাহারও দিকে বিশেষ লক্ষ না করিয়া বাড়ির দিকে চলিল। দরজায় ঢুকিতে ঢুকিতে আপন মনে বলিল—উঃ, দ্যাখো কাণ্ডখানা, বাঁশ-ঝাড়টা ঝুঁকে পড়েচে একেবারে পাঁচিলের ওপর, ভুবন কাকা কাটাবেনও না—মুশকিল হয়েচে আচ্ছা—পরে সে বাড়ির উঠানে ঢুকিয়া অভ্যাসমতো আগ্রহের সুরে ডাকিল—ওমা দুগ্‌গা—ও অপু—

তাহার গলার স্বর শুনিয়া সর্বজয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

হরিহর হাসিয়া বলিল—বাড়ির সব ভালো? এরা সব কোথায় গেল? বাড়ি নেই বুঝি?

সর্বজয়া শান্তভাবে আসিয়া স্বামীর হাত হইতে ভারী পুঁটুলিটা নামাইয়া লইয়া বলিল, এসো— ঘরে এসো।

স্ত্রীর অদৃষ্টপূর্ব শান্তভাব হরিহর লক্ষ করিলেও তাহার মনে কোনো খটকা হইল না—তাহার কল্পনার স্রোত তখন উদ্দাম বেগে অন্যদিকে ছুটিয়াছে—এখনই ছেলে মেয়ে ছুটিয়া আসিবে—

দুর্গা আসিয়া হাসিমুখে বলিবে—কি বাবা এর মধ্যে? অমনি তাড়াতাড়ি হরিহর পুঁটুলি খুলিয়া মেয়ের কাপড় ও আলতার পাতা এবং ছেলের সচিত্র 'চণ্ডী-মাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান' ও টিনের রেলগাড়িটা দেখাইয়া তাহাদের তাক লাগাইয়া দিবে। সে ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, বেশ কাঁঠালের চাকি-বেলুন এনিচি এবার। পরে কিছু নিরাশামিশ্রিত সতৃষ্ণ নয়নে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, কই—অপু দুগ্‌গা এরা বুঝি সব বেরিয়েচে—

সর্বজয়া আর কোনো মতেই চাপিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওগো দুগ্‌গা কি আর আছে গো—মা যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েচে গো—এতদিন কোথায় ছিলে!

গাঙ্গুলি-বাড়ির পূজা অনেক কালের। এ কয়দিন গ্রামে অতি বড় দরিদ্রও অভুক্ত থাকে না। সব বনেদী বন্দোবস্ত, নির্দিষ্ট সময়ে কুমোর আসিয়া প্রতিমা গড়ায়, পোটো চালচিত্র করে, মালাকার সাজ জোগায়, বারাসে-মধুখালির দ' হইতে বাউরিরা রাশি রাশি পদ্মফুল তুলিয়া আনে।

আঁসমালির দীনু সানাইদার অন্য অন্য বৎসরের মতো রসুনচৌকি বাজাইতে আসিল। প্রভাতের আকাশে আগমনীর আনন্দ সুর বাজিয়া ওঠে—আসন্ন হেমন্ত ঋতুর স্নেহঅভ্যর্থনা—নব ধান্যগুচ্ছের, নব আগন্তুক শেফালিদলের, হিমালয়ের পার হইতে উড়িয়া আসা পথিক-পাখি শ্যামার, শিশির-স্নিগ্ধ মৃণাল-ফোটা হেমন্তসন্ধ্যার।

নূতন কাপড় পরাইয়া ছেলেকে সঙ্গে লইয়া হরিহর নিমন্ত্রণ খাইতে যায়। একখানি অগোছালো চুলে-ঘেরা ছোট মুখের সনির্বন্ধ গোপন অনুরোধ দুয়ারের পাশের বাতাসে মিশাইয়া থাকে—হরিহব পথে পা দিয়া কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে—ছেলেকে বলে, এগিয়ে চলো, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে বাবা—

গাঙ্গুলি-বাড়ির প্রাঙ্গণ উৎসবেশে সজ্জিত হাসিমুখ ছেলেমেয়েতে ভরিয়া গিয়াছে। অপু চাহিয়া দেখিল, সতু ও তাহার ভাই কেমন কমলালেবু রং-এর জামা গায়ে দিয়াছে—সবুজ শাড়ি পরিয়া ও দিব্য চুল বাঁধিয়া রানু দিদিকে যা মানাইয়াছে! গাঙ্গুলি বাড়ির মেয়ে সুনয়নী খোঁপায় রজনীগন্ধা ফুল গুঁজিয়া আর পাঁচ-ছয়টি মেয়ের সঙ্গে পূজার দালানে দাঁড়াইয়া খুব গল্প করিতেছে ও হাসিতেছে। সুনয়নী বাদে বাকি মেয়েদের সে চেনে না, বোধ হয় অন্য জায়গা হইতে উহাদের বাড়ি পূজার সময় আসিয়া থাকিবে—শহরের মেয়ে বোধ হয়, যেমন সাজগোজ, তেমন দেখিতে! অপু একদৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। ওদিকে কে চেঁচাইয়া বলিতেছে—বড় সামিয়ানাটা আনবার ব্যবস্থা এখনও হল না?—বাঃ—তোমাদের যা কাজ-কর্ম, দেখো এখন এর পর মজাটা। তারপর ব্রাহ্মণ খেতে বসবে কি বেলা পাঁচটায়?

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে দিন কাটিয়া গেল। শীতকালও শেষ হইতে চলিয়াছে।

দুর্গার মৃত্যুর পর হইতে সর্বজয়া অনবরত স্বামীকে এ গ্রাম হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য তাগিদ দিয়া আসিতেছিল, হরিহরও নানাস্থানে চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নাই। কিন্তু কোনো স্থানেই কোনো

সুবিধা হয় নাই। সে আশা সর্বজয়া আজকাল একরূপ ছাড়িয়াই দিয়াছে। মধ্যে গত শীতকালে হরিহরের জ্ঞাতিভ্রাতা নীলমণি রায়ের বিধবা স্ত্রী এখানে আসিয়াছেন ও নিজেদের ভিটা জঙ্গলাবৃত হইয়া যাওয়াতে ভুবন মুখুজ্যের বাটীতে উঠিয়াছেন। হরিহর নিজের বাটীতে বৌদিদিকে আনাইয়া রাখিবার যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়া ছিল কিন্তু নীলমণি রায়ের স্ত্রী রাজি হন নাই। এখানে বর্তমানে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে মেয়ে অতসী ও ছোট ছেলে সুনীল। বড় ছেলে সুরেশ কলিকাতায় স্কুলে পড়ে, গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্বে এখানে আসিতে পারিবে না। অতসীর বয়স বছর চৌদ্দ, সুনীলের বয়স আট বৎসর। সুনীল দেখিতে তত ভালো নয়; কিন্তু অতসী বেশ সুশ্রী, তবে খুব সুন্দরী বলা চলে না। তাহা হইলেও বরাবর ইহারা লাহোরে কাটাইয়াছে, নীলমণি রায় সেখানে কমিসারিয়েটে চাকরি করিতেন, সেখানে ইহাদের জন্ম, সেখানেই লালিত পালিত; কাজেই পশ্চিম-প্রদেশ-সুলভ নিটোল স্বাস্থ্য ইহাদের প্রতি অঙ্গে।

ইহারা এখানে প্রথম আসিলে সর্বজয়া বড়মানুষ জায়ের সঙ্গে মেশামেশি করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। সুনীলের মা নগদে ও কোম্পানির কাগজে দশ হাজার টাকার মালিক এ কথা জানিয়া জায়ের প্রতি সম্ভ্রমে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়, গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা কম করে নাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্বজয়া নির্বোধ হইলেও বুঝিতে পারিল যে, সুনীলের মা তাহাকে ততটা আমল দিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার স্বামী চিরকাল বড় চাকরি করিয়া আসিয়াছেন, তিনি ও তাঁহার ছেলেমেয়ে অন্যভাবে জীবনযাপনে অভ্যস্ত। শুরু হইতেই তিনি দরিদ্র জ্ঞাতি পরিবার হরিহরের সঙ্গে এমন একটা ব্যবধান রাখিয়া চলিতে লাগিলেন যে সর্বজয়া আপনিই হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। কথায়, ব্যবহারে, কাজে, খুঁটিনাটি সব ব্যাপারেই তিনি জানাইয়া দিতে লাগিলেন যে, সর্বজয়া কোনরকমেই তাঁহাদের সঙ্গে সমানে সমানে মিশিবার যোগ্য নহে। তাঁহাদের কথাবার্তায়, পোশাক-পরিচ্ছদে, চালচলনে এই ভাবটা অনবরত প্রকাশ পায় যে, তাঁহারা অবস্থাপন্ন ঘর। ছেলেমেয়ে সর্বদা ফিটফাট সাজিয়া আছে, কাপড় এতটুকু ময়লা হইতে পায় না, চুল সর্বদা আঁচড়ানো, অতসীর গলায় হার, হাতে সোনার চুড়ি, কানে সোনার দুল, একপ্রস্থ চা ও খাবার না খাইয়া সকালে কেহ কোথাও বাহির হয় না, সঙ্গে পশ্চিমা চাকর আছে, সে-ই সব গৃহকর্ম করে—মোটের উপর সব বিষয়েই সর্বজয়াদের দরিদ্র সংসারের চাল-চলন হইতে উহাদের ব্যাপারের বহু পার্থক্য।

সুনীলের মা নিজের ছেলেকে গ্রামের কোনো ছেলের সঙ্গেই বড় একটা মিশিতে দেন না, অপুর সঙ্গেও নয়—পাছে পাড়াগাঁয়ের এই সব অশিক্ষিত অসভ্য ছেলেপিলেদের দলে মিশিয়া তাঁহার ছেলেমেয়ে খারাপ হইয়া যায়। তিনি এ গ্রামে বাস করিবার জন্য আসেন নাই, জরিপের সময় নিজেদের বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে আসাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ভুবন মুখুজ্যেরা ইঁহাদের কিছু জমা রাখেন, সেই খাতিরে পশ্চিম কোঠায় দুখানা ঘর ইঁহাদের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়াও ইঁহাদের পৃথক হয়। ভুবন মুখুজ্যেদের সঙ্গে ব্যবহারে সুনীলের মায়ের কোনো পার্থক্য দৃষ্ট হয় না; কারণ ভুবন মুখুজ্যের পয়সা আছে, কিন্তু সর্বজয়াকে তিনি একেবারে মানুষের মধ্যেই গণ্য করেন না।

দোলের সময় নীলমণি রায়ের বড় ছেলে সুরেশ কলিকাতা হইতে আসিয়া প্রায় দিন দশেক বাড়ি রহিল। সুরেশ অপুরই বয়সি, ইংরাজি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। দেখিতে খুব ফরসা নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। নিয়মিত ব্যায়াম করে বলিয়া শরীর বেশ বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান। অপুর অপেক্ষা এক বৎসর মাত্র বয়স বেশি হইলেও আকৃতি ও গঠনে পনেরো-ষোল বৎসরের ছেলের মতো দেখায়। সুরেশও এপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বড় একটা মেশে না। ওপাড়ায় গাঙ্গুলি-বাড়ির রামনাথ গাঙ্গুলির ছেলে তাহার সহপাঠী। গাঙ্গুলি-বাড়ি রামনবমী দোলের খুব উৎসব হয়, সেই উপলক্ষে সেও মামার বাড়ি বেড়াইতে আসিয়াছে। সুরেশ অধিকাংশ সময় সেখানেই কাটায়, গাঁয়ের অন্য কোনো ছেলে মিশিবার যোগ্য বলিয়া সেও বোধ হয় বিবেচনা করে না।

যে পোড়ো ভিটাটা জঙ্গলাবৃত হইয়া বাড়ির পাশে পড়িয়া থাকিত সে জ্ঞান হইয়া অবধি দেখিতেছে, সেই ভিটার লোক ইহারা। সে হিসাবে ইহাদিগের প্রতি অপুর একটা বিচিত্র আকর্ষণ। তাহার সমবয়সি সুরেশ কলিকাতায় পড়ে—ছুটিতে বাড়ি আসিলে তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য অনেকদিন হইতে সে প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু সুরেশ আসিয়া তাহার সহিত তেমন মিশিল না, তা ছাড়া সুরেশের চালচলন কথাবার্তার ধরন এমনি যে সে যেন প্রতিপদেই দেখাইতে চায়, গ্রামের ছেলেদের চেয়ে সে অনেক বেশি উঁচু। সমবয়সি হইলেও মুখচোরা অপু তাহাতে আরও ভয় পাইয়া কাছে ঘেঁষে না।

অপু এখনও পর্যন্ত কোনো স্কুলে যায় নাই, সুরেশ তাহাকে লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছে, আমি বাড়িতে বাবার কাছে পড়ি। দোলের দিন গাঙ্গুলিদের পুকুরে বাঁধাঘাটে জলপাইতলায় বসিয়া সুরেশ গ্রামের ছেলেদিগকে দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক পণ্ডিতের ভঙ্গিতে এ-প্রশ্ন ও-প্রশ্ন করিতেছিল। অপুকে বলিল—বলো তো ইন্ডিয়ার বাউন্ডারি কি? জিওগ্রাফি জানো?

অপু বলিতে পারে নাই। সুরেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, অঙ্ক কি কষেচ? ডেসিমল ফ্র্যাকশান কষতে পারো?

অপু অতশত জানে না। না জানুক, তাহার সেই টিনের বাক্সটাতে বুঝি কম বই আছে? একখানা নিত্যকর্মপদ্ধতি, একখানা পুরানো প্রাকৃতিক ভূগোল, একখানা শুভঙ্করী, পাতা-ছেঁড়া বীরাঙ্গনা কাব্য একখানা, মায়ের সেই মহাভারত—এই সব। সে ওই সব বই পড়িয়াছে—অনেকবার পড়া হইয়া গেলেও আবার পড়ে। তাহার বাবা প্রায়ই এখান ওখান হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া বই আনিয়া দেয়, ছেলে খুব লেখাপড়া শিখিবে, পণ্ডিত হইবে, তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে, এ বিষয়ে বিকারের রোগীর মতো তাহার একটা অদম্য অপ্রশমনীয় পিপাসা। কিন্তু তাহার পয়সা নাই, দূরের স্কুলের বোর্ডিং-এ রাখিয়া দিবার মতো সংগতির একান্ত অভাব, নিজেও খুব বেশি লেখাপড়া জানে না। তবুও যতক্ষণ সে বাড়ি থাকে নিজের কাছে বসাইয়া ছেলেকে এটা ওটা পড়ায়, নানা গল্প করে, ছেলেকে অঙ্ক শিখাইবার জন্য নিজে একখানা শুভঙ্করীর সাহায্যে বাল্যের অধীত বিস্মৃত বিদ্যা পুনরায় ঝালাইয়া তুলিয়া তবে ছেলেকে অঙ্ক কষায়। যাহাতেই মনে করে ছেলের জ্ঞান হইবে, সেইটাই হয় ছেলেকে পড়িতে দেয়, নতুবা পড়িয়া শোনায়। সে বহুদিন হইতে বঙ্গবাসীর গ্রাহক, অনেক দিনের পুরানো বঙ্গবাসী তাহাদের ঘরে জমা আছে, ছেলে বড় হইলে পড়িবে এজন্য হরিহর সেগুলিকে সযত্নে বান্ডিল বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছিল, এখন সেগুলি কাজে লাগিতেছে। মূল্য দিতে না পারায় নূতন কাগজ আর তাহাদের আসে না, কাগজওয়ালারা কাগজ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ছেলে যে এই 'বঙ্গবাসী' কাগজখানার জন্য কিরূপ পাগল, শনিবার দিনটা সকালবেলা খেলাধুলা ফেলিয়া কেমন করিয়া সে যে ভুবন মুখুজ্যের চণ্ডীমণ্ডপে ডাকবাক্সটার কাছে পিওনের প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে—হরিহর তাহা খুব জানে বলিয়াই ছেলের এত আদরের জিনিসটা জোগাইতে না পারিয়া তাহার বুকের ভিতর বেদনায় টনটন করে।

অপু তবুও পুরাতন 'বঙ্গবাসী' পড়িয়া অনেক গল্প শিখিয়াছে। পটুর কাছে বলে—লিউকা ও রাফেল মার্টিনিক দ্বীপের অগ্ন্যুৎপাত, সোনাকরা জাদুকরের গল্প, আরও কত কথা। কিন্তু স্কুলের লেখাপড়া তাহার কিছুই হয় না। মোটে ভাগ পর্যন্ত অঙ্ক জানে, ইতিহাস নয়, ব্যাকরণ নয়, জ্যামিতি পরিমিতির নামও শোনে নাই, ইংরাজির দৌড় ফার্স্ট বুকের ঘোড়ার পাতা।

ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার মায়ের একটু অন্যরূপ ধারণা। সর্বজয়া পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। ছেলে স্কুলে পড়িয়া মানুষ হইবে এ উচ্চ আশা তাহার নাই। তাহার পরিচিত মহলে কেউ কখনও স্কুলের মুখ দেখে নাই। তাহাদের যে সব শিষ্য-বাড়ি আছে, ছেলে আর কিছুদিন পরে সে সব ঘরে যাতায়াত করিবে, সেগুলি বজায় রাখিবে, ইহাই তাহার বড় আশা। আরও একটা আশা সর্বজয়া রাখে। গ্রামের পুরোহিত দীনু ভট্টাচার্য বৃদ্ধ হইয়াছে। ছেলেরাও কেহ উপযুক্ত নয়। রানীর মা,

গোকুলের বউ, গ্যাঙ্গুলি-বাড়ির বড়বধূ সকলেই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহারা ইহার পর অপুকে দিয়া কাজকর্ম করাইবেন, দীনু ভট্টাচার্যের অবর্তমানে তাঁহার গাঁজাখোর পুত্র ভোম্বলের পরিবর্তে নিষ্পাপ, সরল, সুশ্রী এই ছেলেটি গ্রামের মনসা-পূজায় লক্ষ্মী-পূজায় তাহাদের আয়োজনের সঙ্গী হইয়া থাকিবে, গ্রামের মেয়েরা এই চায়। অপুকে সকলেই ভালোবাসে। ঘটে পথে প্রতিবেশিনীদের মুখে এ ইচ্ছা প্রকাশ করিতে সর্বজয়া অনেকবার শুনিয়াছে এবং এইটাই বর্তমানে তাহার সব চেয়ে উচ্চ আশা। সে গরিব ঘরের মেয়ে, গরিব ঘরের বধূ, ইহা ছাড়া কোনো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ধারণা নাই। এই যদি ঘটে তাহা হইলেই শেষ রাত্রের স্বপ্নকে সে হাতের মুঠায় পায়।

একদিন এ কথা ভুবন মুখুজ্যের বাড়িতে উঠিয়াছিল। দুপুরের পর সেখানে তাসের আড্ডায় পাড়ার অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সর্বজয়া সকলের মন জোগাইবার ভাবে বলিল—এই বড় খুড়ি আছেন, ঠাকুমা আছেন, মেজদি আছেন, এঁদের যদি দয়া হয় তবে অপু আমার সাম্‌নের ফাগুনে পৈতেটা দিয়ে নিয়ে গাঁয়ের পুজোটাতে হাত দিতে পারে। ওর আমার তা হলে ভাবনা কি? আট দশ ঘর শিষ্যবাড়ি আছে, আর যদি মা সিদ্ধেশ্বরীর ইচ্ছেয় গাঙ্গুলি-বাড়ির পুজোটা বাঁধা হয়ে যায় তাহলেই—

সুনীলের মা মুখ টিপিয়া হাসিলেন। তাঁহার ছেলে সুরেশ বড় হইলে আইন পড়িয়া—তাঁহার জেঠতুতো ভাই পাটনার বড় উকিল, তাঁহার কাছে আসিয়া ওকালতি করিবে। সুরেশের সে মামা নিঃসন্তান অথচ খুব পসারওয়ালা উকিল। এখন হইতেই তাঁহাদের ইচ্ছা যে সুরেশকে কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শেখান,—কিন্তু সুনীলের মা পরের বাড়ি ছেলে রাখিতে যাইবেন কেন ইত্যাদি সংবাদ নির্বোধ সর্বজয়ার মতো হাউ হাউ না বকিয়াও, ইতিপূর্বে মাঝে-মিশালে কথাবার্তার ফাঁকে তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ভুবন মুখুজ্যের বাড়ির বাহিরে আসিয়া সর্বজয়া ছেলেকে বলিল—শোন্ একটা কথা—পরে চুপি চুপি বলিল—তোর জেঠীমার কাছে গিয়া বলিস্ না যে, জেঠীমা আমার জুতো নেই—আমায় একজোড়া জুতো দাও না কিনে?

অপু বলিল, কেন মা?

—বলিস না, বড়লোক ওরা, চাইলে হয়তো ভালো একজোড়া জুতো দেবে এখন—দেখিস্‌নি যেমন ওই সুরেশের পায়ে আছে? তোর পায়ে ওইরকম লাল জুতো বেশ মানায়—

অপু লাজুক মুখে বলিল—আমার বড় লজ্জা করে, আমি বলতে পারবো না—কি হয়তো ভাববে—আমি...

সর্বজয়া বলিল—তা এতে আবার লজ্জা কি!...আপনার জন—বলিস না—তাতে কি?

—হুঁ...উ—আমি বলতে পারবো না মা। আমি কথা বলতে পারিনে জেঠীমার সামনে...

সর্বজয়া রাগ করিয়া বলিল—তা পারবে কেন? তোমার যত বিদ্ধি সব ঘরের কোণে—খালি পায়ে বেড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছো, আজ দু'বছর পায়ে নেই জুতো সে ভালো, বড়লোক, চাইলে হয়তো দিয়ে দিত কিনে—তা তোমার মুখ দিয়ে বাক্যি বেরুবে না—মুখচোরার রাজা—

পূর্ণিমার দিন রানীদের বাড়ি সত্যনারায়ণের পূজার প্রসাদ আনিতে অপু সেখানে গেল। রানী তাহাকে ডাক দিয়া হাসিমুখে বলিল—আমাদের বাড়ি তো আগে আগে কত আস্‌তিস্, আজকাল আসিস নে কেন রে?

—কেন আসবো না রানুদি,—আসি তো?

রানু অভিমানের সুরে বলিল—হ্যাঁ আসিস্। ছাই আসিস্। আমি তোর কথা কত ভাবি। তুই ভাবিস্ আমার, আমাদের কথা?

—না বই কি। বা রে—মাকে জিজ্ঞেস করে দেখো দিকি?

এ ছাড়া অন্য কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ তাহার জোগাইল না। রানী তাহাকে সেখানে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া নিজে গিয়া তাহার জন্য ফল প্রসাদ ও সন্দেশ লইয়া আসিয়া হাতে দিল। হাসিয়া বলিল,—থালা সুদ্ধ নিয়ে যা, আমি কাল গিয়ে খুড়িমার কাছ থেকে নিয়ে আসবো—

রানীর মুখের হাসিতে তাহার উপর একটা পরম নির্ভরতার ভাব আসিল অপুর। রানুদি কি সুন্দর দেখিতে হইয়াছে আজকাল, রানুদির মতো সুন্দরী এ পর্যন্ত অন্য কোনো মেয়ে সে দেখে নাই। অতসীদি সর্বদা বেশ ফিটফাট থাকে বটে, কিন্তু দেখিতে রানুদির কাছে লাগে না। তাহা ছাড়া অপু জানে এ গ্রামের মেয়েদের মধ্যে, রানুদির মতো মন কোনো মেয়েরই নয়। দিদির পরই যদি সে কাহাকেও ভালোবাসে তো সে রানুদি। রানুদিও যে তাহার দিকে টানে তাহা কি আর অপু জানে না?

সে থালা তুলিয়া চলিয়া যাইবার সময় একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—রানুদি, তোমাদের এই পশ্চিমের ঘরের আলমারিতে যে বইগুলো আছে সতুদা পড়তে দেয় না। একখানা দেবে পড়তে? পড়েই দিয়ে যাবো।

রানী বলিল—কোন্ বই আমি তো জানিনে, দাঁড়া আমি দেখছি—

সতু প্রথমে কিছুতেই রাজি হয় না, অবশেষে বলিল—আচ্ছা পড়তে দিই, যদি এক কাজ করিস। আমাদের মাঠের পুকুরে রোজ মাছ চুরি যাচ্ছে—জেঠামশায় আমাকে বলেছে, সেখানে গিয়ে দুপুরবেলা চৌকি দিতে,—আমার সেখানে একা একা ভালো লাগে না, তুই যদি যাস্ আমাব বদলে তবে বই পড়তে দেবো—

রানী প্রতিবাদ করিয়া বলিল—বেশ তো? ও ছেলেমানুষ, সেই বনের মধ্যে বসে মাছ চৌকি দেবে বই কি? তুমি বুড়ো ছেলে পারো না, আর ও যাবে? যাও তোমায় বই দিতে হবে না, আমি বাবার কাছে চেয়ে দেবো—

অপু কিন্তু রাজি হইল। রানীর বাবা ভুবন মুখুজ্যে বিদেশে থাকেন, তাঁহার আসিবার অনেক দেরি অথচ এই বইগুলার উপর তাহার বড় লোভ। এগুলি পড়িবার লোভে সে কতদিন লুব্ধচিত্তে সতুদের পশ্চিমের ঘরটায় যাতায়াত করিয়াছে। দু-একখানা একটু-আধটু পড়িয়াছেও। কিন্তু সতু নিজে তো পড়েই না, তাহাকেও পড়িতে দেয় না। নায়কের ঠিক সংকটময় মুহূর্তটিকেই হাত হইতে বই কাড়িয়া লইয়া বলে—রেখে দে অপু, এ সব ছোট কাকার বই, ছিঁড়ে যাবে, দে।

অপু হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল।

প্রতিদিন দুপুরবেলা আলমারি হইতে বাছিয়া এক-একখানি করিয়া বই সতুর নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া যায় ও বাঁশবনের ছায়ায় কতকগুলো শ্যাওড়াগাছের কাঁচা ডাল পাতিয়া তাহার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া একমনে পড়ে। বই অনেক আছে—প্রণয়-প্রতিমা, সরোজ-সরোজিনী, কুসুম-কুমারী, সচিত্র যৌবনে যোগিনী নাটক, দস্যু-দুহিতা, প্রেম-পরিণাম বা অমৃতে গরল, গোপেশ্বরের গুপ্তকথা...সে কত নাম করিবে! এক-একখানি করিয়া সে ধরে, শেষ না করিয়া আর ছাড়িতে পারে না। চোখ টাটাইয়া ওঠে, রগ টিপ টিপ্ করে; পুকুরধারের নির্জন বাঁশবনের ছায়া ইতিমধ্যে কখন দীর্ঘ হইয়া মজা পুকুরটার পাটা-শ্যাওলার দামে নামিয়া আসে, তাহার খেয়ালই থাকে না কোন দিক দিয়া বেলা গেল!

কি গল্প! সরোজিনীকে সঙ্গে লইয়া সরোজ নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদে যাইতেছেন, পথে নবাবের লোকে নৌকা লুঠিয়া তাহাদের বন্দী করিল। নবাবের হুকুমে সরোজের হইয়া গেল প্রাণদণ্ড, সরোজিনীকে একটা অন্ধকার ঘরে চাবিতালা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। গভীর রাত্রে কক্ষের দরজা খুলিয়া গেল, নবাব মত্ত অবস্থায় কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—সুন্দরী, আমার হুকুমে সরোজ মরিয়াছে, আর কেন...ইত্যাদি। সরোজিনী সদর্পে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন—রে পিশাচ, রাজপুত রমণীকে তুই এখনও চিনিস্ নাই, এ দেশে প্রাণ থাকিতে....ইত্যাদি। এমন সময় কাহার ভীম পদাঘাতে কারাগারের জানালা ভাঙিয়া গেল। নবাব চমকিয়া উঠিয়া দেখিলেন—একজন জটাজুটধারী

তেজঃপুঞ্জকলেবর সন্ন্যাসী, সঙ্গে যমদূতের মতো বলিষ্ঠ চারি-পাঁচজন লোক। সন্ন্যাসী রোষকষায়িত-নয়নে নবাবের দিকে চাহিয়া বলিলেন—নরাধম, রক্ষক হইয়া ভক্ষক? পরে সরোজিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—মা, আমি তোমার স্বামীর গুরু—যোগানন্দ স্বামী, তোমার স্বামীর প্রাণহানি হয় নাই, আমার কমণ্ডলুর জলে পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে, এখন তুমি চল মা আমার আশ্রমে, বৎস সরোজ তোমার অপেক্ষা করিয়া আছে।...গ্রন্থকারের লিপিকৌশল সুন্দর,—সরোজের এই বিস্ময়জনক পুনরুজ্জীবন আরও বিশদভাবে ফুটাইবার জন্য তিনি পরবর্তী অধ্যায়ের প্রতি পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়া বলিতেছেন—এইবার চল পাঠক, আমরা দেখি বধ্যভূমিতে সরোজের প্রাণদণ্ড হইবার পর কি উপায়ে তাঁহার পুনর্জীবন লাভ সম্ভব হইল...ইত্যাদি।

এক-একটি অধ্যায় শেষ করিয়া অপুর চোখ ঝাপসা হইয়া আসে—গলায় কি যেন আটকাইয়া যায়। আকাশের দিকে চাহিয়া সে দুই-এক মিনিট কি ভাবে,—আনন্দে বিস্ময়ে, উত্তেজনায় তাহার দুই কান দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে থাকে, পরে রুদ্ধনিঃশ্বাসে পরবর্তী অধ্যায়ে মন দেয়। সন্ধ্যা হইয়া যায়, চারিধারে ছায়া দীর্ঘ হইয়া আসে, মাথার উপর বাঁশঝাড়ে কত কী পাখির ডাক শুরু হয়, উঠি-উঠি করিয়াও বইয়ের পাতার এক-ইঞ্চি ওপরে চোখ রাখিয়া পড়িতে থাকে—যতক্ষণ অক্ষর দেখা যায়।

এইরকম বই তো সে কখনও পড়ে নাই! কোথায় লাগে সীতার বনবাস আর ডুবালের গল্প?

বাড়ি আসিলে তাঁহার মা বকে—এমন হাবলা ছেলেও তুই? পরের মাছ চৌকি দিস্ গিয়ে সেই একলা বনের মধ্যে বসে একখানা বই পড়বার লোভে? আচ্ছা বোকা পেয়েছে তোকে।

কিন্তু বোকা অপুর লাভ যেদিক দিয়া আসে, তাহার মায়ের সেদিক সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই।

আজকাল সে দুইখানা বই পাইয়াছে 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'। ...উইঢিবি, বৈঁচিবনের প্রেক্ষাপটে নিস্তব্ধ দুপুরের মায়ায় দৃশ্যের পর দৃশ্য পরিবর্তিত হইয়া চলে—জেলেখা নদীর উপর বসিয়া আহত নরেনের শুশ্রূষা করিতেছে, আওরঙ্গজেবের দরবারে নিজেকে পাঁচহাজারী মন্সবদারের মধ্যে স্থান পাইতে দেখিয়া শিবাজী রাগে ফুলিয়া ভাবিতেছেন—শিবাজী পাঁচ-হাজারী? একবার পুনায় যাও তো, শিবাজীর ফৌজে কত পাঁচ-হাজারী মন্সবদার আছে গনিয়া আসিবে!...

রাজবারার মরুপর্বতে, দিল্লি-আগ্রার রঙমহালে, শিশ্‌মহালে, ওড়না-পেশোয়াজ-পরা সুন্দরীদলের সঙ্গে তাহার সারা দিনমান কাটে। এ কোন্ জগৎ—যেখানে শুধু জ্যোৎস্না, তলোয়ার-খেলা, সুন্দর মুখের বন্ধুত্ব, আহেরিয়া-উৎসবে দীর্ঘ বর্শা হাতে ঘোড়ায় চড়িয়া ঊষর উপত্যকা ও ভুট্টাক্ষেত্র পার হইয়া ছোটা?...

বীরের যাহা সাধ্য, রাজপুতের যাহা সাধ্য, মানুষের যাহা সাধ্য—প্রতাপসিংহ তাহা করিয়াছিলেন। হলদিঘাটের পার্বত্য বর্ত্মের প্রতি পাষাণ-ফলকে তাহার কাহিনী লেখা আছে। দেওয়ারের রণক্ষেত্রের দ্বাদশ সহস্র রাজপুতের হৃদয়রক্তে তাহার কাহিনী অক্ষয় মহিমায় লেখা আছে।

বহুদিন পরেও প্রাচীন যোদ্ধগণ শীতের রাত্রিতে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া পৌত্রপৌত্রিগণের নিকট হলদিঘাটের অদ্ভুত বীরত্বের কথা বলিত।...

অদৃশ্যহস্তনিক্ষিপ্ত একটি বর্শা আসিল।—অপু এই গ্রামের চিরশ্যাম বনভূমির ছায়ায়, লতাপাতার নিবিড়তায়, ভিজামাটির গন্ধে মানুষ হইয়াছে—তবুও সে জানে রাজপুতানার ভীল-প্রদেশের বা আরাবল্লী-মেবারের প্রত্যেকটি স্থান, নাহারা মগ্‌রোর অপূর্ব বন্য সৌন্দর্য সে ভালো করিয়াই চেনে।... পর্বত হইতে অবতরণশীল শস্ত্রপাণি তেজসিংহের মূর্তি কি সুন্দর মনে হয়!...

"সেই চপ্পন প্রদেশে অনেকদিন অবধি সেই ভীল গ্রামের নির্জন কন্দরে ও উন্নতশিখরে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটি রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত গীত শ্রুত হইত। অতি প্রত্যূষে নির্জন প্রান্তরে, পথিকগণ কখনও কখনও একটি রমণীর পাণ্ডুর মুখ ও চঞ্চল-নয়ন দেখিতে পাইত; লোকে বলিত কোনো

বিশ্রামশূন্যা উদ্বিগ্ন বনদেবী হইবে"...সেই গানের অস্পষ্ট করুণ মূর্ছনা যেন অপুর কানে বাঁশবাগানের পিছন হইতে ভাসিয়া আসে!...

কমলমীর, সূর্যগড়ের যুদ্ধ, সেনাপতি শাহবাজ খাঁ, সুন্দরী নূরজাহান, পুষ্পকুমারী, বন্য ভীলপ্রদেশ, বীরবালক চন্দনসিংহ—দূর সুদূর কল্পনা।—তবু কত নিকট, কত বাস্তব মনে হয়। রাজবারার মরুভূমি আর নীল আরাবল্লীর উন্নত পর্বতের শিখরে শিখরে চেনার বৃক্ষে ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে, দেবী মিবারলক্ষ্মীর অলক্ত-রক্তপদচিহ্ন আঁকা রহিয়াছে বুনাস ও বরী নদীর তটভূমির শিলাখণ্ডে, ঝরনার উপলরাশির উপরে, বাজরা ও জওয়ার-ক্ষেতে ও মৌউল বনে।...

চিতোর রক্ষা হইল না! রানা অমরসিংহ বাদশাহের সম্মান গ্রহণ করিলেন। সর্বহারা পিতা প্রতাপসিংহ যিনি পঁচিশ বৎসর ধরিয়া বনে পর্বতে ভীলের পাল লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি ব্যথাক্ষুব্ধচিত্তে কোথা হইতে দেখিয়াছিলেন এ সব?...

তপ্ত চোখের জলে পুকুর, উইঢিবি, বৈঁচিবন, বাঁশবাগান—সব ঝাপ্‌সা হইয়া আসে।

সেদিন দুপুরে তাহার বাবা একটা কাগজের মোড়ক দেখাইয়া হাসিমুখে বলিল—দ্যাখো তো খোকা, কি বলো দিকি?

অপু তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল; উৎসাহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—খবরের কাগজ? না বাবা?

সেদিন রামকবচ লিখিয়া দিয়া বেহারী ঘোষের শাশুড়ির নিকট যে তিনটি টাকা পাইয়াছে, স্ত্রীকে গোপন করিয়া হরিহর তারই মধ্যে দু'টাকা খবরের কাগজের দাম পাঠাইয়া দিয়াছিল, স্ত্রী জানিতে পারিলে অন্য পাঁচটা অভাবের গ্রাস হইতে টাকা দুইটাকে কোনো মতেই বাঁচানো যাইত না।

অপু বাবার হাত হইতে তাড়াতাড়ি কাগজের মোড়কটা লইয়া খুলিয়া ফেলে। হাঁ—খবরের কাগজ বটে। সেই বড় বড় অক্ষরে 'বঙ্গবাসী' কথাটা লেখা, সেই নতুন কাগজের গন্ধটা, সেই ছাপা সেই সব—যাহার জন্য বৎসরখানেক পূর্বে সে তীর্থের কাকের মতো অধীর আগ্রহে ভুবন মুখুজ্যেদের চণ্ডীমণ্ডপের ডাকবাক্সটার কাছে পিওনের অপেক্ষায় প্রতি শনিবারে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিত! খবরের কাগজ! খবরের কাগজ! কি সব নতুন খবর না জানি দিয়াছে? কি অজানা কথা সব লেখা আছে ইহার বড় বড় পাতায়?

হরিহরের মনে হয়—দুইটি টাকার বিনিময়ে ছেলের মুখে যে আনন্দের হাসি ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহার তুলনায় কোন বন্দকী মাকড়ী খালাসের আত্মপ্রসাদ মোটেই বেশি হইত না!

অপু খানিকক্ষণ পড়িয়া বলে—দ্যাখো বাবা, একজন 'বিলাত যাত্রী'র চিঠি বেরিয়েছে, আজ থেকেই নতুন বেরুলো। খুব সময়ে আমাদের কাগজটা এসেচে—না বাবা?

তবুও তার মনে দুঃখ থাকিয়া যায় যে গত বৎসর কাগজখানা হঠাৎ উহারা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে জাপানী মাকড়সাসুরের গল্পটার শেষ ভাগ তাহার পড়া হয় নাই, রাইকো রাজসভায় যাওয়ার পর তাহার যে কি ঘটিল তাহা সে জানিতে পারে নাই।...

একদিন রানী বলিল—তোর খাতায় তুই কি লিখচিস্ রে?

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোন্ খাতায়? তুমি কি করে—

—আমি তোমাদের বাড়ি সেদিন দুপুরে যাইনি বুঝি? তুই ছিলিনে, খুড়িমার সঙ্গে কতক্ষণ বসে কথা বোল্লাম। কেন, খুড়িমা তোকে বলেনি? তাই দেখলাম তোর বই-এর দপ্তরে তোর সেই রাঙা খাতাখানায় কি সব লিখিচিস্—আমার নাম রয়েচে, আর দেবী সিংহ না কি একটা—

অপু লজ্জায় লাল হইয়া বলিল—ও একটা গল্প।

—কি গল্প রে? আমায় কিন্তু পড়ে শোনাতে হবে।

পরদিন রানী একখানা ছোট বাঁধানো খাতা অপুর হাতে দিয়া বলিল—এতে তুই আমাকে

একটা গল্প লিখে দিস্—একটা বেশ ভালো দেখে। দিবি তো? অতসী বল্‌ছিল তুই ভালো লিখতে পারিস্ নাকি! লিখে দে, আমি অতসীকে দেখাবো।...

অপু রাত্রে বসিয়া বসিয়া খাতা লেখে। মাকে বলে—আর একটা পলা তেল দাও না মা। এইটুকু লিখে রাখি আজ।...

তাহার মা বলে—আজ রাত্তিরে আর পড়ে না—মোটে দু'পলা তেল আছে, কাল আবার রাঁধবো কি দিয়ে? এই খানে রাঁধছি, এই আলোতে বসে পড়।

অপু ঝগড়া করে।

মা বকে—এঃ, ছেলের রাত্তির হলে যত লেখা-পড়ার চাড়—সারাদিন চুলের টিকিটি দেখবার জো নেই। সকালে করিস্ কি? যা তেল দেবো না।

অবশেষে অপু উনুনের পাড়ে কাঠের আগুনের আলোয় খাতাখানা আনিয়া বসে। সর্বজয়া ভাবে—অপু আর একটু বড় হলে আমি ওকে ভালো দেখে বিয়ে দেবো। এ ভিটেতে নতুন পাকা বাড়ি উঠবে। আস্‌চে বছর পৈতেটা দিয়ে নিই, তারপর গাঙ্গুলি-বাড়ির পুজোটা যদি বাঁধা হয়ে যায়—

...চার-পাঁচদিন পরে সে রানীর হাতে খাতা ফিরাইয়া দিলে রানী আগ্রহের সহিত খাতা খুলিতে খুলিতে বলিল—লিখেচিস?

অপু হাসি-হাসি মুখে বলিল—দ্যাখো না খুলে?

রানী দেখিয়া খুশির সুরে বলিল—ওঃ, অনেক লিখেচিস যে রে! দাঁড়া অতসীকে ডেকে দেখাই।

অতসী দেখিয়া বলিল—অপু লিখেচে না আরও কিছু—ইস্! এ সব বই দেখে লেখা।

অপু প্রতিবাদের সুরে বলিল—ইঃ, বই দেখে বইকি? আমি তো গল্প বানাই—পটুকে জিজ্ঞেস কোরো দিকি অতসীদি? ওকে বিকেলে গাঙের ধারে বসে বসে কত বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলিনে বুঝি?

রানী বলিল—না ভাই, ও লিখেচে আমি জানি! ও ওই রকম লেখে। খাসা যাত্রার পালা লিখেছিল খাতাতে, আমায় পড়ে শোনালে।...পরে অপুকে বলিল—নাম লিখে দিস্‌নি তোর? নাম লিখে দে।

অপু এবার একটু অপ্রতিভতার সুরে বলিল যে, গল্পটা তাহার শেষ হয় নাই, হইলেই নাম লিখিয়া দিবে এখন। 'সচিত্র যৌবনে-যোগিনী' নাটকের ধরনে গল্প আরম্ভ করিলেও শেষটা কিরূপ হইবে সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই। অথচ দীর্ঘ দিন তাহার কাছে খাতা থাকিলে বানুদি—বিশেষ করিয়া অতসীদি পাছে তাহার কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়ে, এই ভয়ে অসমাপ্ত অবস্থাতেই সেখানা ফেরত দিয়াছে।...

তাহার বাবা বাড়িতে নাই। সকালে উঠিয়া সে তাহাদের গ্রামের আর সকলের সঙ্গে পাশের গ্রামে এক আদ্যশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে গেল। সুনীলও গেল তাহার সঙ্গে। নানা গ্রামের ফলারে বামুনের দল পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূর হইতেও হাঁটিয়া আসিয়াছে। এক এক ব্যক্তি পাঁচ-ছয়টি করিয়া ছেলেমেয়ে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছে; সকলকে সুবিধামতো স্থানে বসাইতে গিয়া একটা দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম। প্রত্যেকের পাতে চারিখানি করিয়া লুচি দিয়া যাইবার পর পরিবেশনকারীরা বেগুনভাজা পরিবেশন করিতে আসিয়া দেখিল কাহারও পাতে লুচি নাই,—সকলেই পার্শ্ববর্তী চাদরে বা গামছায় লুচি তুলিয়া বসিয়া আছে।...ছোট ছোট ছেলে অতশত না বুঝিয়া পাতের লুচি ছিঁড়িতে যাইতেছে—তাহার বাপ বিশ্বেশ্বর ভট্‌চায ছোঁ মারিয়া ছেলের পাত হইতে লুচি উঠাইয়া পাশের চাদরে রাখিয়া বলিল—এগুলো রেখে দাও না! আবার এখুনি দেবে, খেয়ো এখন।

তাহার পর খানিকক্ষণ ধরিয়া ভীষণ শোরগোল হইতে লাগিল—"লুচির ধামাটা এ সারিতে" "কুমড়োটা যে আমার পাতে একেবারেই", "ওহে, গরম গরম দেখে", "মশাই কি দিলেন হাত দিয়ে দেখুন দিকি, স্রেফ কাঁচা ময়দা". .ইত্যাদি। ছাঁদার পরিমাণ লইয়া কর্মকর্তাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের তুমুল বিবাদ! কে একজন চিৎকার কবিয়া বলিতে লাগিল—তা হলে সেখানে ভদ্দরলোকেদের নেমন্তন্ন করতে নেই। স-পাঁচ গণ্ডা লুচি এ একেবারে ধরা-বাঁধা ছাঁদার রেট—বল্লাল সেনের আমল থেকে বাঁধা রয়েচে। চাইনে তোমার ছাঁদা, কন্দপ্পো মজুমদার এমন জায়গায় কখনও—

কর্মকর্তা হাতে-পায়ে ধবিয়া কন্দর্প মজুমদারকে প্রসন্ন করিলেন।

অপুও এক পুঁটুলি ছাঁদা বহিয়া আনিল। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে বলিল—ওমা, এ যে কত এনেচিস—দেখি খোল্ তো? লুচি, পানতুয়া, গজা—কত রে! ঢেকে রেখে দি, সকালবেলা খেয়ো এখন।

অপু বলিল—তোমায়ও কিন্তু মা খেতে হবে—তোমাব জন্যে আমি চেয়ে দু'বার করে পানতুয়া নিইচি।

সর্বজয়া বলিল—হ্যাঁরে, তুই বল্লি নাকি আমাব মা খাবে দাও?—তুই তো একটা হাবলা ছেলে!

অপু ঘাড় ও হাত নাড়িয়া বলিল—হ্যাঁ, তাই বুঝি আমি বলি! এমন করে বল্লাম তাবা ভাবলে আমি খাবো।

সর্বজয়া খুশির সহিত পুঁটুলিটা তুলিয়া ঘরে লইযা গেল।

খানিকক্ষণ পরে অপু সুনীলদের বাড়ি গেল। উহাদেব ঘবেব বোযাকে পা দিযাই শুনিল, সুনীলের মা সুনীলকে বলিতেছেন—ওসব কেন বয়ে আনলি বাড়িতে? কে আনতে বলেচে তোকে?

সুনীলও সকলের দেখাদেখি ছাঁদা বাঁধিয়াছিল, বলিল—কেন মা, সবাই তো নিলে—অপুও তো এনেচে।

সুনীলের মা বলিলেন—অপু আনবে না কেন—ও ফলারে বামুনের ছেলে। ও এবপরে ঠাকুরপুজো করে আর ছাঁদা বেঁধে বেড়াবে,—ওই ওদের ধারা। ওর মা-টাও অমনি হ্যাংলা। ওইজন্যে আমি তখন তোমাদের নিয়ে এ গাঁয়ে আসতে চাইনি। কুসঙ্গে পড়ে যত কুশিক্ষে হচ্ছে! যা, ওসব অপুকে ডেকে দিয়ে আয়—যা; না হয় ফেলে দিগে যা। নেমন্তন্ন করেচে নেমন্তন্ন খেলি—ছোটলোকের মতো ওসব বেঁধে আনবার দরকাব কি!

অপু ভয় পাইয়া আর সুনীলদের ঘরে ঢুকিল না। বাড়ি ফিরিতে ফিবিতে ভাবিল—যাহা তাহার মা পাইয়া এত খুশি হইল, জেঠাইমা তাহা দেখিয়াই এত রাগিল কেন? খাবারগুলো কি ঢেলামাটি যে, সেগুলো ফেলিয়া দিতে হইবে? তাহার মা হ্যাংলা? সে ফলাবে বামুনের ছেলে? বা রে, জেঠিমা যেন অনেক পানতুয়া-গজা খাইয়াছে, তাহার মা তো ও-সব কিছুই খাইতে পায় না। আর সে-ই বা নিজে এসব ক'দিন খাইয়াছে? সুনীলের কাছে যাহা অন্যায়, তাহার কাছে সেটা কেমন করিয়া অন্যায় হইতে পারে।

লেখাপড়া বড় একটা তাহার হয় না, সে এই সবই করিয়া বেড়ায়। ফলার খাওয়া, ছাঁদা বাঁধা, বাপের সঙ্গে শিষ্যবাড়ি যাওয়া, মাছধরা। সেই ছোট্ট ছেলে পটু—জেলে পাড়ায় কড়ি খেলিতে গিয়া যে সে-বার মার খাইয়াছিল—সে এ সব বিষয়ে অপুর সঙ্গী। আজকাল সে আরও বড় হইয়াছে, মাথাতে লম্বা হইয়াছে, সব সময় অপুদার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। ওপাড়া হইতে এপাড়ায় আসে শুধু অপুদার সঙ্গে খেলিতে, আর কাহারও সঙ্গে সে বড় একটা মেশে না। তাহাকে বাঁচাইতে গিয়া অপুদা যে জেলের ছেলেদের হাতে মার খাইয়াছিল, সেকথা সে এখনও ভোলে নাই।

মাছ ধরিবার শখ অপুর অত্যন্ত বেশি। সোনাডাঙা মাঠের নিচে ইছামতীর ধারে কাঁচিকাটা

খালের মুখে ছিপে খুব মাছ ওঠে। প্রায়ই সে এইখানটি গিয়া নদীতীরে একটা বড় ছাতিম গাছের তলায় মাছ ধরিতে বসে। স্থানটা তাহার ভারি ভালো লাগে, একেবারে নির্জন, দুধারে নদীর পাড়ে কত কি গাছপালা নদীর জলে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ওপারে ঘন সবুজ উলুবন, মাঝে মাঝে লতাদোলানো কদম-শিমুল গাছ, বেগুনী রং-এর বনকলমি ফুলে ছাওয়া ঝোপ, দূরে মাধবপুর গ্রামের বাঁশবন, পাখির ডাকে বনের ছায়ায় উলুবনের শ্যামলতায় মেশামেশি মাখামাখি স্নিগ্ধ নির্জনতা!

সেই ছেলেবেলায় প্রথম কুঠির-মাঠে আসার দিনটি হইতে এই মাঠ-বন-নদীর কি মোহ যে তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে! ছিপ ফেলিয়া ছাতিম গাছের ছায়ায় বসিয়া চারিদিকে চাহিতেই তাহার মন অপূর্ব পুলকে ভরিয়া ওঠে। মাছ হোক বা না হোক, যখনই ঘন বৈকালের ছায়া মাঠের ধারের খেজুর ঝোপের ডাঁসা খেজুরের গন্ধে ভরপুর হইয়া ওঠে, স্নিগ্ধ বাতাসে চারিধার হইতে বৌ-কথা-কও, পাপিয়ার ডাক ভাসিয়া আসে, ডালে-ডালে অভ্র-আবীর ছড়াইয়া সূর্যদেব সোনাডাঙার মাঠের সেই ঠ্যাঙাড়ে বটগাছটার আড়ালে হেলিয়া পড়েন, নদীর জল কালো হইয়া যায়, গাঙশালিকের দল কলরব করিতে করিতে বাসায় ফেরে, তখনই তাহার মন বিভোর হইয়া ওঠে, পুলক-ভরা চোখে চারিদিকে চাহিয়া দেখে; মনে হয়--মাছ না পাওয়া গেলেও রোজ রোজ সে এইখানটিতে আসিয়া বসিবে, ঠিক এই বড় ছাতিম গাছের তলাটাতে।

মাছ প্রায়ই হয় না, শরের ফাতনা স্থির জলে দণ্ডের পর দণ্ড নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অটল। একস্থানে অতক্ষণ বসিয়া থাকিবার ধৈর্য তাহার থাকে না, সে এদিকে ওদিকে ছটফট করিয়া বেড়ায়, ঝোপের মধ্যে পাখির বাসার খোঁজে, ফিরিয়া আসিয়া হয়তো চোখে পড়ে ফাতনা একটু একটু ঠুক্‌রাইতেছে! ছিপ তুলিয়া বলে—দূর! ঝেঁয়া মাছের ঝাঁক লেগেচে, এখানে কিছু হবে না।. পরে সেখান হইতে ছিপ তুলিয়া একটু দূরে শ্যাওলা দামের পাশে গিয়া টোপ ফেলে। জলটার গভীর কালো রঙ-এ মনে হয় বড় বুই কাতলা এখনই টোপ গেলে আর কি! ভ্রম ঘুচিতে বেশি দেরি হয় না, শরের ফাতনা নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হয়।. .

এক-একদিন সে এক-একখানা বই সঙ্গে করিয়া আনিয়া বসে।

ছিপ ফেলিয়া বই খুলিয়া পড়ে। সুরেশের নিকট হইতে সে একখানা নিচের ক্লাসের ছবিওয়ালা ইংরাজি বই ও তাহার অর্থপুস্তক চাহিয়া লইয়াছে। ইংরাজি সে বুঝিতে পারে না, অর্থপুস্তক দেখিয়া গল্পের বাংলাটা বুঝিয়া লয় ও ইংরাজি বইখানাতে শুধু ছবি দেখে। দূর দেশের কথা ও সকল রকম মহত্ত্বের কাহিনী ছেলেবেলা হইতেই তাহার মনকে বড় দোলা দেয়, এই বইখানাতে সে ধরনের অনেকগুলি গল্প আছে। কোথাকার মুক্ত প্রান্তরে একজন ভ্রমণকারী বিষম তুষারঝটিকার মধ্যে পথ হারাইয়া চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে শীতে প্রাণ হারায়, অজানা মহাসমুদ্রে পাড়ি দিয়া ক্রিস্টোফার কলম্বাস কিরূপে আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন—এমনি সব গল্প। যে দুটি ইংরাজ বালক-বালিকা সমুদ্রতীরের শৈলগাত্রে গাঙচিলের বাসা হইতে ডিম সংগ্রহ করিতে গিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, যে সাহসিনী বালিকা প্রাস্‌কোভিয়া লপুলফ নির্বাসিত পিতার নির্বাসনদণ্ড প্রত্যাহার করিবার আশায় জনহীন তুষারাবৃত প্রান্তরের পথে সুদূর সাইবেরিয়া হইতে একা বাহির হইয়াছিল—তাহাদের যেন সে দেখিলেই চিনিতে পারে।

স্যার ফিলিপ সিডনির ছোট্ট গল্পটুকু পড়িয়া তাহার চোখ দুটি জলে ভরিয়া যায়। সুরেশকে গিয়া জিজ্ঞাসা করে—সুরেশদা, এই গল্পটা জানো তুমি? বড় করে বলো না?

সুরেশ বলে—ও, জুটফেনের যুদ্ধের কথা!

অপু অবাক হইয়া বলে—কি সুরেশদা? জুটফেন! কোথায় সে?

সুরেশ ওইটুকুর বেশি আর বলিতে পারে না।...

মাসেখানেক পরে একদিন।

মাছ ধরিতে গিয়া একটা বড় সরপুঁটি মাছ কি করিয়া তাহার ছিপে উঠিয়া গেল।

লোভ পাইয়া সে জায়গাটি আর অপু ছাড়ে না—গাছের ডালপালা ভাঙিয়া আনিয়া বিছাইয়া বসে।

ক্রমে বেলা যায়, নদীর ধারের মাঠে আবার সেই অপূর্ব নীরবতা, ওপারের দেয়াড়ের মাঠের পারে সুদূরপ্রসারী সবুজ উলুবনে কাশঝোপে, কদম-শিমুল গাছের মাথায় আবার তাহার শৈশব পুলকের শুভমুহূর্তের অতি পরিচিত, পুরাতন সাথী—বৈকালের মিলিয়ে-যাওয়া শেষ রোদ!

বঙ্গবাসীতে বিলাত-যাত্রীর চিঠির মধ্যে পড়া সেই সুন্দর গল্পটি তাহার মনে পড়ে...

সে সুরেশদাদার ইংরাজি ম্যাপে ভূমধ্যসাগর কোথায় দেখিয়াছে, তারই ওপারে ফ্রান্স দেশ সে জানে। কতকাল আগে ফ্রান্স দেশের বুকে তখন বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী চাপিয়া বসিয়াছে, দেশ বিপন্ন, রাজা শক্তিহীন, চারিদিকে অরাজকতা, লুঠ-তরাজ! জাতির এই ঘোর অপমানের দিনে, লোরেন্ প্রদেশের অন্তঃপাতী এক ক্ষুদ্র গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক দুহিতা পিতার মেষপাল চরাইতে যায়, আর মেষের দলকে ইতস্তত ছাড়িয়া দিয়া নিভৃত পল্লীপ্রান্তরে তৃণভূমির উপর বসিয়া সুনীল নয়ন দুটি আকাশের পানে তুলিয়া নির্জনে দেশের দুর্দশা চিন্তা করে। দিনের পর দিন এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার নিষ্পাপ কুমারী-মনে উদয় হইল কে তাহাকে বলিতেছে—তুমি ফ্রান্সের রক্ষাকর্ত্রী, তুমি গিয়া রাজসৈন্য জড়ো করো, অস্ত্র ধরো, দেশের জাতির পরিত্রাণের ভার তোমার হাতে। দেবী মেরী তাহার উৎসাহদাত্রী—দূর স্বর্গ হইতে তাঁহার আহ্বান আসে দিনের পর দিন। তারপর নবতেজোদৃপ্ত ফরাসি সৈন্যবাহিনী কি করিয়া শত্রুদলকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল, কি করিয়া ভাবময়ী কুমারী নিজে অস্ত্র ধরিয়া দেশের রাজাকে সিংহাসনে বসাইলেন, তারপর অজ্ঞানান্ধ লোকে কি করিয়া তাঁহাকে ডাইনি অপবাদে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিল, এ সকল কথাই সে আজ পড়িয়াছে।

এই বৈকাল বেলাটাতে, এই শান্ত নদীর ধারে গল্পটি ভাবিতে ভাবিতে কি অপূর্ব ভাবেই তাহার মন পূর্ণ হইয়া যায়!—কুমারীর যুদ্ধের কথা, জয়ের কথা, অন্য সব কথা সে তত ভাবে না। কিন্তু যে ছবিটি তাহার বার বার মনে আসে, তাহা শুধু নির্জন প্রান্তরে চিন্তারতা বালিকা আর চারিধারে যদৃচ্ছ-বিচরণশীল মেষদল, নিম্নে শ্যাম তৃণভূমি, মাথার উপর মুক্ত নীল আকাশ। একদিকে দুর্ধর্ষ বৈদেশিক শত্রু, নিষ্ঠুরতা, জয়লালসার দর্প, রক্তস্রোত,—অপরদিকে এক সরলা, দিব্য ভাবময়ী নীলনয়না পল্লীবালিকা। ছবিটা তাহার প্রবর্ধমান বালকমনকে মুগ্ধ করিয়া দেয়।

আরও ছবি মনে আসে। কতদূরের নীল-সমুদ্র-ঘেরা মার্টিনিক দ্বীপ। চারিদিকে আখের খেত, মাথার উপর নীল আকাশ—বহু—বহু দূর—শুধু নীল আকাশ আর নীল সমুদ্র!—শুধু নীল আর নীল! আরও কত কি, তাহা বুঝানো যায় না—বলা যায় না।

ছিপ গুটাইয়া সে বাড়ির দিকে যাইবার জোগাড় করে। নদীর ধারে ধারে নতশীর্ষ বাব্‌লা ও সাঁইবাব্‌লার বন নদীর স্নিগ্ধ কালো জলে ফুলের ভার ঝরাইয়া দিতেছে। সোনাডাঙা মাঠের মাঝে ঠ্যাঙাড়ে বটগাছটার আড়ালে প্রকাণ্ড রক্তবর্ণ সূর্য হেলিয়া পড়িয়াছে,—যেন কোন্ দেবশিশু অলকার জ্বলন্ত ফেনিল সোনার সমুদ্র হইতে ফুঁ দিয়া একটা বুদ্বুদ তুলিয়া খেলাচ্ছলে আকাশে উড়াইয়া দিয়াছিল, এইমাত্র সেটা পশ্চিম দিগন্তে পৃথিবীর বনান্তরালে নামিয়া পড়িতেছে!

পিছন হইতে কে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। সে জোর করিয়া হাত দিয়া চোখ ছাড়াইয়া লইতেই পটু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া সামনে আসিয়া বলিল—তোকে খুঁজে খুঁজে কোথাও পাইনে অপুদা; তারপর ভাবলাম তুই ঠিক মাছ ধর্তে এইছিস্, তাই এলাম। মাছ হয়নি?...একটাও না? চল্ বরং একখানা নৌকা খুলে নিয়ে বেড়িয়ে আসি—যাবি?

কদমতলায় সাহেবের ঘাটে অনেক দূরদেশ হইতে নৌকা আসে,—গোলপাতা-বোঝাই, ধান-বোঝাই, ঝিনুক-বোঝাই নৌকা সারি সারি বাঁধা। নদীতে জেলেদের ঝিনুক-তোলা নৌকায় বড় জাল ফেলিয়াছে। এ সময় প্রতি বৎসরই ইহারা দক্ষিণ হইতে ঝিনুক তুলিতে আসে; মাঝ নদীতে নৌকায়

নৌকায় জোড়া দিয়া দাঁড় করিয়া রাখিয়াছে। অপু ডাঙায় বসিয়া দেখিতেছিল,—একজন কালোমতো লোক বার বার ডুব দিয়া ঝিনুক খুঁজিতেছে ও অল্পক্ষণ পরে নৌকার পাশে উঠিয়া হাতের থলি হইতে দু'চারিখানা কুড়ানো ঝিনুক বালি-কাদার রাশি হইতে ছাঁকিয়া নৌকার খোলে ছুড়িয়া ফেলিতেছে। অপু খুশির সহিত পটুকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখছিস্ পটু, কতক্ষণ ডুব দিয়ে থাকে? আয় গুনে দেখি এক-দুই করে! পারিস্ তুই অতক্ষণ ডুবে থাক্‌তে?...

নদীর দূর্বাঘাস-মোড়া তীরটি ঢালু হইয়া জলের কিনারা পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে, এখানে-ওখানে বোঝাই নৌকায় খোঁটা পোঁতা—নোঙর ফেলা। ইহারা কত দেশ হইতে আসিয়াছে, কত বড় নদী খাল পার হইয়া, বড় বড় নোনা গাঙের জোয়ার-ভাঁটা-তুফান খাইয়া বেড়ায়,—অপুর ইচ্ছা করে মাঝিদের কাছে বসিয়া সে সব দেশের গল্প শোনে। তাহার কেবল নদীতে নদীতে সমুদ্রে সমুদ্রে বেড়াইতে ইচ্ছা হয়, আর কিছু সে চায় না। সুরেশের বইখানাতে নানা দেশের নাবিকদের কথা পড়িয়া অবধি ওই ইচ্ছাই তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে! পটু ও সে নৌকার কাছে গিয়া দর করে—ও মাঝি, এই গোলপাতা একপাটি কি দর?...তোমার এই ধানের নৌকো কোথাকার, ও মাঝি?...ঝালকাঠির? সে কোন্ দিকে, এখেন থেকে কতদূর?...

পটু বলিল—অপু-দা, চল্ তেঁতুলতলার ঘাটে একখানা ডিঙি দেখি, একটু বেড়িয়ে আসি চল্।

দুজনে তেঁতুলতলার ঘাট হইতে একখানা ছোট্ট ডিঙি খুলিয়া লইয়া, তাহাকে এক ঠেলা দিয়া ডিঙির উপর চড়িয়া বসিল। নদীজলের ঠাণ্ডা আর্দ্র গন্ধ উঠিতেছে, কলমি-শাকের দামে জলপিপি বসিয়া আছে, চরের ধারে-ধারে চাষীরা পটলক্ষেত নিড়াইতেছে, কেহ ঘাস কাটিয়া আঁটি বাঁধিতেছে, চালতেপোতার বাঁকে তীরবর্তী ঘন ঝোপে গাঙ্‌শালিকের দল কলরব করিতেছে, পড়ন্ত বেলায় পুব আকাশের গায়ে নানা রঙের মেঘস্তূপ।

পটু বলিল—অপু-দা একটা গান কর না? সেই গানটা সেদিনের!

অপু বলিল—সেটা না। বাবার কাছে সুর শিখে নিয়েছি একটা খুব ভালো গানের। সেইটে গাইবো, আর-এট্টু ওদিকে গিয়ে কিন্তু ভাই, এখানে ডাঙায় ওই সব লোক রয়েচে—এখানে না।

—তুই ভারি লাজুক অপু-দা। কোথায় লোক রয়েচে কতদূরে, আব তোর গান গাইতে—দূর, ধর্ সেইটে!

খানিকটা গিয়া অপু গান শুরু করে। পটু বাঁশের চটার বৈঠাখানা তুলিয়া লইয়া নৌকার গলুই-এ চুপ করিয়া বসিয়া একমনে শোনে; নৌকা বাহিবার আবশ্যক হয় না, স্রোতে আপনা-আপনি ভাসিয়া ডিঙিখানা ঘুরিতে ঘুরিতে লা-ভাঙার বড় বাঁকের দিকে চলে। অপুর গান শেষ হইলে পটু একটা গান ধরিল। অপু এবার বাহিতেছিল। নৌকা কম দূরে আসে নাই—লা-ভাঙার বাঁকটা নজরে পড়িতেছিল এরই মধ্যে। হঠাৎ পটু ঈশানকোণের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ও অপু দা, কি রকম মেঘ উঠেচে দেখছিস! এখুনি ঝড় এলো বলে—নৌকা ফেরাবি?

অপু বলিল—হোক্‌গে ঝড়, ঝড়েই তো নৌকা বাইতে—গান গাইতে লাগে ভালো, চল্ আরও যাই।

কথা বলিতে বলিতে ঘন কালো মেঘখানা মাধবপুরের মাঠের দিক হইতে উঠিয়া সারা আকাশ ভরিয়া ফেলিল, তাহার কালো ছায়া নদীজল ছাইয়া ফেলিল। পটু উৎসুক চোখে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। অনেক দূরে সোঁ সোঁ রব উঠিল, একটা অস্পষ্ট গোলমালের সঙ্গে অনেক পাখির কলরব শোনা গেল, ঠাণ্ডা হাওয়া বহিল, ভিজা মাটির গন্ধ ভাসিয়া আসিল। পাখাওয়ালা আকন্দের বীজ মাঠের দিক হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে গাছপালা মাথা লুটাইয়া দোলাইয়া ভাঙিয়া ভীষণ কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল।

নদীর জল ঘন কালো হইয়া উঠিল, তীরের সাঁইবাব্‌লা ও বড় বড় ছাতিম গাছের ডালপালা ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, সাদা বকের দল কালো আকাশের নিচে দীর্ঘ সারি বাঁধিয়া উড়িয়া

পলাইল! অপুর বুক ফুলিয়া উঠিল, উৎসাহে উত্তেজনায় সে হাল ছাড়িয়া চারিধারে চাহিয়া ঝড়ের কাণ্ড দেখিতে লাগিল, পটু কোঁচার কাপড় খুলিয়া ঝড়ের মুখে পালের মতো উড়াইয়া দিতেই বাতাস বাধিয়া সেখানা ফুলিয়া উঠিল।

পটু বলিল—বড্ড মুখোড় বাতাস অপু-দা, সামনে আর নৌকা যাবে না। কিন্তু যদি উলটে যায়? ভাগ্যিস সুনীলকে সঙ্গে করে আনিনি!

অপু কিন্তু পটুর কথা শুনিতেছিল না, সেদিকে তাহার কান ছিল না—মনও ছিল না। সে নৌকার গলুইয়ে বসিয়া একদৃষ্টে ঝটিকাক্ষুব্ধ নদী ও আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার চারিধারে কালো-নদীর নর্তনশীল জল, উড়ন্ত বকের দল, ঝোড়ো মেঘের রাশি, দক্ষিণ দেশের মাঝিদের ঝিনুকের স্তূপগুলা, স্রোতে ভাসমান কচুরিপানার দাম সব যেন মুছিয়া যায়! নিজেকে সে 'বঙ্গবাসী' কাগজের সেই বিলাত-যাত্রী কল্পনা করে! কলিকাতা হইতে তাহার জাহাজ ছাড়িয়াছে; বঙ্গোপসাগরের মোহনায় সাগরদ্বীপ পিছনে ফেলিয়া সমুদ্র-মাঝের কত অজানা ক্ষুদ্র দ্বীপ পার হইয়া, সিংহল-উপকূলের শ্যামসুন্দর নারকেলবনশ্রী দেখিতে দেখিতে কত অপূর্ব দেশের নীল পাহাড় দূরচক্রবালে রাখিয়া, সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় অভিষিক্ত হইয়া, নতুন দেশের নব নব দৃশ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে!—চলিয়াছে!—চলিয়াছে!

এই ইছামতীর জলের মতোই কালো, গভীর ক্ষুব্ধ, দূরের সে অদেখা সমুদ্রবক্ষ; এই রকম সবুজ বনঝোপ আরব সমুদ্রের সে দ্বীপটিতেও। সেখানে এইরকম সন্ধ্যায় গাছতলায় বসিয়া এডেন বন্দরে সেই বিলাত-যাত্রী লোকটিব মতো সে রূপসী আরবী মেয়ের হাত হইতে এক গ্লাস জল চাহিয়া লইয়া খাইবে। চালতেপোতার বাঁকের দিকে চাহিলে খবরের কাগজে বর্ণিত জাহাজের পিছনেব সেই উড়নশীল জলচর পক্ষীর ঝাঁককে সে একেবারে স্পষ্ট দেখিতে পায় যেন!...

সে ওই সব জায়গায় যাইবে, ওই সব দেখিবে, বিলাত যাইবে, জাপান যাইবে, বাণিজ্যযাত্রা করিবে, বড় সওদাগর হইবে, অনবরত দেশে-বিদেশে সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরিবে, বড় বড় বিপদের মুখে পড়িবে; চীনসমুদ্রের মধ্যে আজিকার এই মনমাতানো কালবৈশাখীর ঝড়েব মতো বিষম ঝড়ে তাহাব জাহাজ ডুবু-ডুবু হইলে "আমার অপূর্ব ভ্রমণ"-এ পঠিত নাবিকদের মতো সেও জালি-বোটে করিয়া ডুবোপাহাড়ের গায়ে-লাগা গুগ্‌লি-শামুক পুড়াইয়া খাইতে খাইতে অকূল দরিয়ায় পাড়ি দিবে! ওই যে মাধবপুর গ্রামের বাঁশবনের মাথায় তুঁতে রং-এর মেঘের পাহাড় খানিকটা আগে ঝুঁকিয়া ছিল—ওরই ওপারে সেই সব নীল-সমুদ্র, অজানা বেলাভূমি, নারিকেলকুঞ্জ, আগ্নেয়গিরি, তুষাববর্ষী প্রান্তর, জেলেখা, সরযূ, গ্রেস ডার্লিং, জুট্‌ফেন, গাঙচিল-পাখির-ডিম-আহরণরতা সেই সব সুশ্রী ইংরাজ বালক-বালিকা, সোনাকর জাদুকর বটগার, নির্জন প্রান্তরে চিন্তারতা লোরেনের সেই নীলনয়না পল্লীবালা জোয়ান—আরও কত কি আছে! তাহার টিনের বাক্সের বই কখানা, রানু-দিদিদের বাড়ির বইগুলি, সুরেশ-দাদার কাছে চাহিয়া লওয়া বইখানা, পুরাতন 'বঙ্গবাসী' কাগজগুলো ওই সব দেশের কথাই তাহাকে বলে; সেসব দেশে কোথায় কাহারা যেন তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। সেখান হইতে তাহারও ডাক আসিবে একদিন—সে-ও যাইবে!

এ কথা তাহার ধারণায় আসে না কতদূরে সে সব দেশ, কে তাহাকে লইয়া যাইবে, কি করিয়া তাহার যাওয়া সম্ভব হইবে! আর দিনকতক পরে বাড়ি-বাড়ি ঠাকুরপূজা করিয়া যাহাকে সংসার চালাইতে হইবে, রাত্রিতে যাহার পড়িবার তেলের জন্য মায়ের বকুনি খাইতে হয়, অত বয়স পর্যন্ত যে ইস্কুলের মুখ দেখিল না, ভালো কাপড়, ভালো জিনিস যে কাহাকে বলে জানে না—সেই মূর্খ, অখ্যাত সহায়-সম্পদহীন পল্লীবালককে বৃহত্তর জীবনের আনন্দ-যজ্ঞে যোগ দিতে কে আহ্বান করিবে?

এ সব প্রশ্ন মনে জাগিলে হয়তো তাহার তরুণ-কল্পনার রথবেগ—তাহাব আশাভরা জীবন-পথের দুর্বার মোহ, সকল ভয় সকল সংশয়কে জয় করিতে পারিত; কিন্তু এসকল কথা তাহার মনেই

ওঠে না। শুধু মনে হয়—বড় হইলেই সব হইবে, অগ্রসর হইলেই সকল সুযোগ-সুবিধা পথের মাঝে কুড়াইয়া পাইবে...এখন শুধু বড় হইবার অপেক্ষা মাত্র। সে বড় হইলে সুযোগ পাইবে, দিক দিক হইতে তাহার সাদর আমন্ত্রণ আসিবে,—সে জগৎ জানার, মানুষ চেনার দিগ্বিজয়ে যাইবে।

রঙিন্ ভবিষ্যৎ জীবন-স্বপ্নে বিভোর হইয়া তাহার বাকি পথটুকু কাটিয়া যায়। বৃষ্টি আর পড়ে না, ঝড়ে কালো মেঘের রাশি উড়াইয়া আকাশ পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল। তেঁতুলতলার ঘাটে ডিঙি ভিড়িতেই তাহার চমক ভাঙে; নৌকা বাঁধিয়া পটুর আগে আগে সে বাঁশবনের পথে উল্লাসে শিস্ দিতে দিতে বাড়ির দিকে চলে। সে-ও তাহার মা ও দিদির মতো স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছে।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

আসলে অপু কিন্তু ঘুমায় নাই, সে জাগিয়া ছিল। চোখ বুজিয়া শুইয়া রাত্রে মায়ের সঙ্গে বাবার যেসব কথাবার্তা হইতেছিল, সে সব শুনিয়াছে। তাহারা এদেশের বাস উঠাইয়া কাশী যাইতেছে। এদেশ অপেক্ষা কাশীতে থাকিবার নানা সুবিধার কথা বাবা গল্প করিতেছিল মায়ের কাছে। বাবা অল্প বয়সে সেখানে অনেকদিন ছিল, সে দেশের সকলের সঙ্গে বাবার আলাপ ও বন্ধুত্ব, সকলে চেনে বা মানে। জিনিসপত্রও সস্তা। তাহার মা খুব আগ্রহ প্রকাশ করিল, সে সব সোনার দেশে কখনও কাহারও অভাব নাই—দুঃখ এ-দেশে বারোমাস লাগিয়াই আছে, সাহস করিয়া সেখানে যাইতে পারিলেই সব দুঃখ ঘুচিবে। মা আজ যাইতে পাইলে আজই যায়, একদিনও আর থাকিবার ইচ্ছা নাই। শেষে স্থির হইল বৈশাখ মাসের দিকে তাহাদের যাওয়া হইবে।...

গঙ্গানন্দপুরের সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুর-বাড়িতে সর্বজয়ার পূজা মানত ছিল। ক্রোশ তিনেক দূরে কে পূজা দিতে যায়—এইজন্য এ-পর্যন্ত মানত শোধ হয় নাই। এবার এদেশ হইতে যাইবার পূর্বে পূজা দিয়া যাওয়া দরকার, কিন্তু খুঁজিয়া লোক মিলিল না। অপু বলিল—সে পূজা দিয়া আসিবে ও ওই গ্রামে তাহার পিসিমা থাকেন, তাঁহার সহিত কখনও দেখাশোনা হয় নাই, অমনি দেখা করিয়া আসিবে। তাহার মা বলিল—যাঃ, বকিস্ নে তুই, একলা যাবি বই কি? এখান থেকে প্রায় চার-ক্রোশ পথ।

অপু মায়ের সঙ্গে তর্ক শুরু করিল—আমি বুঝি সবদিন এইরকম বাড়িতে বসে থাকবো? যেতে পাববো না কোথাও বুঝি? আমার বুঝি চোখ নেই, কান নেই, পা নেই?

—সব আছে, উনি একলা যাবেন সেই গঙ্গানন্দপুর—বড় সাহসী পুরুষ কিনা!

অবশেষে কিন্তু অপুর নির্বন্ধাতিশয্যে তাহাকেই পাঠাইতে হইল।

সোনাডাঙা মাঠের বুক চিরিয়া উঁচু মাটির পথ। পথের দু'ধারে মাঠের মধ্যে শুধুই আকন্দফুলের বন, দীর্ঘ শ্বেতাভ ডাঁটাগুলি ফুলের ভারে নত হইয়া দূর্বাঘাসের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। পথে কোনো লোক নাই, দুপুরের অল্পই দেরি আছে, গাছপালার ছায়া ছোট হইয়া আসিতেছে। অপুর খালি পায়ে বেলেমাটির তাত লাগিতেছিল—তাহাতে বেশ আরাম হয়। পথের ধারের বন-ঝোপে কত কি ফুল ফুটিয়াছে, সাঁইবাব্‌লা গাছের নতুন ফোটা ফুলের শিষ সূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে, ছোট এক রকমের গাছে রাঙা রাঙা বনডুমুরের মতো কি ফল অজস্র পাকিয়া টুকটুক করিতেছে, মাটির মধ্য হইতে কেমন রোদপোড়া সোঁদা সোঁদা গন্ধ বাহির হইতেছে...সে মাঝে মাঝে নিচু হইয়া ঝোপের ভিতর হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বৈঁচিফল তুলিয়া হাতে-সেলাই-করা রাঙা সাটিনের জামাটার দু'পকেট ভর্তি করিয়া লইতেছিল।

যাইতে যাইতে তাহার মন পুলকে ভরিয়া উঠিতেছিল। সে কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারে না যে, সে কী ভালোবাসে এই মাটির তাজা রোদপোড়া গন্ধটা, এই ছায়াভরা দূর্বাঘাস, সূর্যের

আলোমাখানো মাঠ, পথ, গাছপালা, পাখি, বনঝোপ, ওই দোলানো ফুলফুলের থোলো, আলকুশি, বনকলমি, নীল অপরাজিতা। ঘরে থাকিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা হয় না; ভারি মজা হয় যদি বাবা তাহাকে বলে—খোকা, তুমি শুধু পথে পথে বেড়িয়ে বেড়াও, তাহা হইলে এইরকম বনফুল-ঝুলানো ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের তলা দিয়া ঘুঘু-ডাকা দূর বনের দিকে চোখ রাখিয়া এই রকম মাটির পথটি বাহিয়া শুধুই হাঁটে—শুধুই হাঁটে।...মাঝে মাঝে হয়তো বাঁশবনের কঞ্চির ডালে ডালে শর্-শর শব্দ, বৈকালের রোদে সোনার সিঁদুর ছড়ানো আর নানা রঙ-বেরঙ-এর পাখির গান।

অপুর শৈশব কাটিতেছিল এই প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে। এক ঋতু কাটিয়া গিয়া কখন অন্য ঋতু পড়ে—গাছপালায়, আকাশে বাতাসে, পাখির কাকলীতে তাহার বার্তা রটে। ঋতুতে ঋতুতে ইছামতীর নব নব পরিবর্তনশীল রূপ সম্বন্ধে তাহার চেতনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল—কোন্ ঋতু গাছপালায় জলে-স্থলে-শূন্যে ফুলে ফলে কি পরিবর্তন ঘটায় তাহা সে ভালো করিয়া চিনিয়া ফেলিয়াছিল। ইহাদের সহিত এই ঘনিষ্ঠ যোগ সে ভালোবাসে, ইহাদের ছাড়া সে জীবন কল্পনা করিতে পারে না। এই বিরাট অপরূপ ছবি চোখের উপরে রাখিয়া সে মানুষ হইতেছিল। গ্রীষ্মের খরতাপ ও গুমোটের অবসানে সারা দিকচক্রবাল জুড়িয়া ঘননীল মেঘসজ্জার গম্ভীর সুন্দর রূপ, অস্তবেলায় সোনাডাঙার মাঠের উপরকার আকাশে কত বর্ণের মেঘের খেলা, ভাদ্রের শেষে ফুটন্ত কাশ-ফুলে-ভরা মাধবপুরের দূরপ্রসারিত চর, চাঁদিনী রাতে জ্যোৎস্নাজালের খুপ্‌রি-কাটা বাঁশবনেব তলা,—অপুর স্ফুটনোন্মুখ কৈশোরের সতেজ আগ্রহভরা অনাবিল মনে ইহাদের অপূর্ব বিশাল সৌন্দর্য চিরস্থায়ী ছাপ মারিয়া দিয়াছিল, কান্তিরসের চোখ খুলিয়া দিয়াছিল, চুপি চুপি তাহার কানে অমৃতের দীক্ষামন্ত্র শুনাইয়াছিল।—অপু কখনও জীবনে এ শিক্ষা বিস্মৃত হয় নাই। চিবজীবন সৌন্দর্যের পূজারি হইবার ব্রত, নিজের অলক্ষিতে মুক্তরূপা প্রকৃতি তাহাকে তাহা ধীরে ধীবে গ্রহণ করাইতেছিলেন।..

নতিডাঙার বাঁওড়ে কাহারা মাছ ধরিয়াছে। সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিল। গ্রামেব মধ্যে একটা কানা ভিখারি একতারা বাজাইয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছে—ও গান তো অপু জানে—কতবার গাহিয়াছে—

'দিন-দুপুরে চাঁদের উদয় রাত পোহানো হোল ভার।....

বোষ্টম দাদু গানটা খুব ভালো গায়।

হরিশপুরের মধ্যে ঢুকিয়া পথের ধারে একটা ছোট্ট চালাঘরে পাঠশালা বসিয়াছে, ছেলেরা সুর করিয়া নামতা পড়িতেছে, সে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। গুরুমশায়ের বয়স বেশি নয়, তাহাদের গাঁয়েব প্রসন্ন গুরুমশাযের চেয়ে অনেক কম।

আর এক কথা তাহার বার বার মনে হইতেছিল। এই তো সে বড় হইয়াছে, আর ছোট নাই, ছোট থাকিলে কি আর মা একা কোথাও ছাড়িয়া দিত?...এখন কেবলই চলা, কেবলই সামনে আগাইয়া যাওয়া। তাহা ছাড়া, আস্‌চে মাসের এই দিনটিতে তাহারা কতদূর, কোথায় চলিয়া যাইবে! কোথায় সেই কাশী—সেখানে!

বৈকালের দিকে গঙ্গানন্দপুরে গিয়া পৌছিল। পাড়ার মধ্যে পৌছিতেই কোথা হইতে রাজ্যের লজ্জা তাহাকে এমন পাইয়া বসিল যে, সে কোনো দিকে চাহিতেই পারিল না। কায়ক্লেশে সম্মুখের পথে দৃষ্টি রাখিয়া কোনোরকমে পথ চলিতে লাগিল। তাহার মনে হইল সকলেই তাহার দিকে চাহিতেছে। সে যে আজ আসিবে তাহা যেন সকলেই জানে; হয়তো ইহারা এতক্ষণ মনে মনে বলিতেছে—এই সেই যাচ্ছে, দ্যাখ্ দ্যাখ্ চেয়ে।...সে যে পুঁটুলির ভিতর বাঁধিয়া নারিকেল-নাড়ু লইয়া যাইতেছে, তাহাও যেন সকলেই জানে। তাহার পিসেমশায় কুঞ্জ চক্রবর্তীর বাড়িটা কোন্‌দিকে এ কথাটা পর্যন্ত সে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

অবশেষে এক বুড়িকে নির্জনে পাইয়া তাহাকেই জিজ্ঞাসা করাতে সে বাড়ি দেখাইয়া দিল।

বাড়িটার সামনে পাঁচিল-ঘেরা। উঠানে ঢুকিয়া সে কাহারও সাক্ষাৎ পাইল না। দু'একবার কাশিল, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় সাধ্য কি? কতক্ষণ সে চৈত্রমাসের খররৌদ্রে বাহিরের উঠানে দাঁড়াইয়া থাকিত ঠিকানা নাই, কিন্তু খানিকটা পরে একজন আঠারো-উনিশ বছরের শ্যামবর্ণ মেয়ে কি কাজে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে পা দিতেই দেখিল—দরজার কাছে কাহাদের একটি অপরিচিত প্রিয়দর্শন বালক পুঁটুলি-হাতে লজ্জাকুণ্ঠিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। মেয়েটি বিস্মিতভাবে বলিল—

তুমি কে খোকা? কোত্থেকে আস্‌চো?...

অপু আনাড়ির মতো আগাইয়া আসিয়া অতিকষ্টে উচ্চারণ করিল—এই আমার বাড়ি—নিশ্চিন্দিপুরে, আমার—নাম অ-অপু।

তাহার মনে হইতেছিল, না আসিলেই ভালো হইত! হয়তো তাহার পিসিমা তাহার এরূপ অপ্রত্যাশিত আগমনে বিরক্ত হইবে, হয়তো ভাবিবে কোথা হইতে আবার এক আপদ আসিয়া জুটিল।...তাহা ছাড়া,—কে জানিত আগে যে অপরিচিত স্থানে আসিয়া কথাবার্তা কওয়া এত কঠিন কাজ? তাহার কপাল ঘামিয়া উঠিল।

কিন্তু মেয়েটি তখনই ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া মহা-আদরে রোয়াকে উঠাইয়া লইয়া গেল। তাহার মা-বাবা কেমন আছেন সেকথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহার চিবুকে হাত দিয়া কত আদরের কথা বলিল। দিদিকে যদিও কখনও দেখে নাই তবুও দিদির নাম করিয়া খুব দুঃখ করিল। নিজের হাতে তাহার গায়ের জামা খুলিয়া হাতমুখ ধোয়াইয়া শুকনা গামছা দিয়া মুছাইয়া তাড়াতাড়ি এক গ্লাস চিনির শরবৎ করিয়া আনিল। পিসি বলিতে সে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নয়, অল্প বয়স, রাজীর দিদির চেয়ে একটু বড়।

তাহার পিসিও তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। জ্ঞাতি-সম্পর্কের ভাইপোটি যে দেখিতে এত সুন্দর বা তাহার বয়স এত কম তাহার পিসি বোধ হয় ইতিপূর্বে জানিত না। তাই পাশের বাড়ি হইতে একজন প্রতিবেশিনী আসিয়া অপুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে একটু গর্বের সহিত বলিল—আমার ভাইপো, নিশ্চিন্দিপুরে বাড়ি, খুড়তুতো ভায়ের ছেলে; সম্পর্কে খুবই আপন, তবে আসা-যাওয়া নেই তাই!...পরে সে পুনরায় গর্বের চোখে অপুর দিকে চাহিয়া রহিল। ভাবটা এই—দ্যাখো আমার ভাইপোর কেমন রাজপুত্তুরের মতো চেহারা, এখন বোঝো কী দরের—কী বংশের মেয়ে আমি!...

সন্ধ্যার পর কুণ্ডু চক্রবর্তী বাড়ি আসিল। পাক্‌শিটে-মারা চোয়াড়ে-চোয়াড়ে চেহারা, বয়স বুঝিবার উপায় নাই। তাহার পিসিকে দেখিয়া তাহার যেমন লজ্জা হইয়াছিল, পিসেমশায়কে তেমনি তাহার ভয় হইল। ছেলেবেলায় সে যে প্রসন্ন গুরুমশায়ের কাছে পড়িত, তেমনি যেন চেহারাটা। মনে হইল এ লোক যেন এখনই বলিতে পারে—বড্ড জ্যাঠা ছেলে দেখছি তো তুমি?...

পরদিন সকালে উঠিয়া অপু পাড়ার পথে এদিকে-ওদিকে একটু ঘুরিয়া আসিল। চারিদিক জঙ্গলে ভরা, ফাঁকা জমি—দূর্বাঘাস প্রায় নাই, এমন জঙ্গল। এই একটা বাড়ি, আবার বনে-ঘেরা সুঁড়িপথ বাহিয়া গিয়া আবার দূরে একটা বাড়ি। অনেক সময় লোকের বাড়ির উঠানের উপর দিয়া পথ। তাহার বয়সি দু'চারজনকে খেলা করিতে দেখিল বটে, কিন্তু সকলেই তাহার দিকে এমন হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল যে, তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টা করা তো দূরের কথা, সে তাহাদের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না।

পিসির বাড়ির দিকে ফিরিবার সময়ও বিপদ। এরূপ সকালে মার কাছে সে চিঁড়া, মুড়ি, নাড়ু বা বাসি-ভাত খাইয়া থাকে। এখানে কি উহারা দিবে? কাল তো রাত্রে ভাত খাইবার সময় দুধের সঙ্গে সন্দেশ কিনিয়া আনিয়া দিয়াছে। আজ যদি সে এখনই ফিরে, তবে হয়তো উহারা ভাবিবে ছেলেটা ভারি পেটুক; খাবার খাইবার লোভে-লোভে এত সকালে বাড়ি ফিরিল। রোজ রোজ খাবার

খাওয়া কি ভালো?...এখন সে কি করে? নাঃ, বাড়ি ফিরিবে না। আরও খানিক পথে পথে ফিরিয়া একেবারে সেই ভাত খাওয়ার সময়ের একটু আগে বাড়ি যাইবে। অপরিচিত জায়গায় এতক্ষণ পথেই বা কোথায় দাঁড়াইয়া থাকে?

পায়ে পায়ে সে অবশেষে বাড়িতেই আসিয়া পৌঁছিল।

একটি ছয়-সাত বছরের মেয়ে একটা কাঁসার বাটি হাতে বাড়ি ঢুকিয়া উঠান হইতে ডাকিয়া কহিল—নাউ রেঁধেচো জেঠিমা, মোরে একটু দেবে?...

অপুর পিসিমা ঘরের ভিতর হইতে বলিল—কে রে, গুল্‌কী? না, ওবেলা রাঁধবো, এসে নিয়ে যাস্...

গুল্‌কী বাটি নামাইয়া রোয়াকের ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। মাথার চুলগুলা ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া, ছেলেদের চুলের মতো খাটো। ময়লা কাপড় পরনে, মাথায় তেল নাই, রং শ্যামবর্ণ। অপুর দিকে চাহিয়া, কি বুঝিয়া একবার ফিক্ করিয়া হাসিয়া সে বাটি উঠাইয়া চলিয়া গেল।

অপু জিজ্ঞাসা করিল—মেয়েটা কাদের পিসিমা?

তাহার পিসি বলিল—কে, গুলকী? ওদের বাড়ি এখানে না—ওর মা-বাপ কেউ কোথাও নেই। নিবারণ মুখুজ্যের বৌ—এই যে পাশের বাড়ি, ওর দূর-সম্পর্কের জেঠি—সেখানেই থাকে।

পরদিন পাড়ার একটা ছেলে আসিয়া যাচিয়া তাহার সঙ্গে ভাব করিল ও সঙ্গে করিয়া গ্রামের সকল পাড়া ঘুরাইয়া দেখাইয়া বেড়াইল। বাড়ি ফিরিবার পথে দেখিল—সেই অনাথা মেয়ে গুল্‌কী পথের ধারে পা ছড়াইয়া একলাটি বসিয়া কী খাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আঁচল গুটাইতে গেল—আঁচলে একরাশ আধপাকা বকুল ফল। অপু ইতিমধ্যে পিসিমার কাছে তাহার আরও পরিচয় লইয়াছে; নিবারণ মুখুজ্যের বৌ ভালো ব্যবহার করে না, লোক ভালো নয়। পিসিমা বলিতেছিল—জেঠি তো নয় রণচণ্ডী, কত দিন খেতেও দেয় না, এর বাড়ি ওর বাড়ি খেয়ে বেড়ায়। নিজের পুষ্যিই সাতগণ্ডা—তাদেরই জোটে না, তায় আবার পর!...গুল্‌কীকে দেখিয়া অপুর মোটেই লজ্জা হয় না—ছোট্ট একটুকু মেয়েটা, আহা কেহ নাই! তাহার সঙ্গে ভাব করিতে অপুর বড় ইচ্ছা হইল। সে কাছে গিয়া বলিল—আঁচলে কি লুকুচ্চিস্ দেখি খুকি?...

গুল্‌কী হঠাৎ আঁচল গুটাইয়া লইয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া নিচু হইয়া দৌড় দিল। তাহাব কাণ্ড দেখিয়া অপুর হাসি পাইল। ছুটিবার সময় গুল্‌কীর আঁচলের বকুলফল পড়িতে পড়িতে চলিয়াছিল, সেগুলি সে কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল—পড়ে গেল, সব পড়ে গেল, নিয়ে যা তোর বকুল ও খুকি, কিছু বলবো না, ও খুকি!...

গুল্‌কী ততক্ষণে উধাও হইয়াছে।

পুকুরে স্নান সারিয়া আসিয়া সে বসিয়া আছে, এমন সময় দেখিতে পাইল খিড়কি দরজার আড়াল হইতে গুল্‌কী একবার একটুখানি করিয়া উঁকি মারিতেছে আর একবার মুখ লুকাইতেছে। তাহার সহিত চোখোচোখি হওয়াতে গুল্‌কী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। অপু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—দাঁড়া, তোকে ধরচি এক দৌড়ে—বলিয়া সে খিড়কি-দরজার দিকে ছুটিল।

গুল্‌কী আর পেছনদিকে না চাহিয়া পথ বাহিয়া সোজা পুকুরপাড়ের দিকে ছুট্ দিল। কিন্তু অপুর সঙ্গে পারিবে কেন? নিরুপায় দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেই অপু তাহার ঝাঁকড়া চুলগুলা মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া বলিল—বড় ছুট দিচ্ছিলি যে? আমার সঙ্গে ছুটে বুঝি তুই পারবি, খুকি?

গুল্‌কীর প্রথম ভয় হইয়াছিল বুঝি বা তাহাকে মারিবে! কিন্তু অপু চুলের মুঠি ছাড়িয়া দিয়া হাসিয়া ফেলায়, সে বুঝিল এ একটা খেলা। সে আবার সেই রকম হাসিয়া ফেলিল।

অপুর বড় দয়া হইল। তাহার মুখের হাসিতে এমন একটা আভাস ছিল যাহাতে অপুর মনে হইল এ তাহার সঙ্গে ভাব করিতে চায়—খেলা করিতে চায়; কিন্তু ছেলেমানুষ, কথা কহিতে জানে না বলিয়া এইরকম উঁকিঝুঁকি মারিয়া—ফিক্ করিয়া হাসিয়া—দৌড়িয়া পলাইয়া—তাহার ইচ্ছা

প্রকাশ করে। অন্য উপায় ইহার জানা নাই। এ যেন ঠিক তাহার দিদি: এই বয়সে দিদি যেন এই রকমই ছিল—এই রকম আঁচলে কুল-বেল-বৌঁচি বাঁধিয়া আপন মনে ঘুরিয়া বেড়াইত, কেহ বুঝিত না, কেহ দেখিত না, এই রকম পেটুক—এই রকম বুদ্ধিহীন ছোট মেয়ে!

অপু ভাবিল—এর্ সঙ্গে কেউ খেলা করে না, একে নিয়ে একটু খেলি। আহা, মা-বাপ-হারা দুঃখী মেয়ে, আপন মনে বেড়ায়!—সে গুল্‌কীর চুলের মুঠা ছাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়াছিল, বলিল—খেলা করবি খুকি? চল্ ওই পুকুরের পাড়ে। না, এক কাজ কর খুকি, আমি তোকে ধরবো—আর তুই ছুটে যাবি; ওই কাঁঠাল গাছটা বুড়ি। আয়—

মুঠা ছাড়িয়া দিতেই গুল্‌কী আর না দাঁড়াইয়া আবার নিচু হইয়া দৌড় দিল। অপু চেঁচাইয়া বলিল—আচ্ছা যা, যা দেখি কদ্দূর যাবি—ঠিক তোকে ধরব দেখিস্। আচ্ছা ওই গেলি তো এই দ্যাখ্—বলিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া সে এক দৌড় দিল—চু-উ-উ-উ। গুল্‌কী পিছন দিকে চাহিয়া অপুকে দৌড়িতে দেখিয়া প্রাণপণে যতটুকু তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে কুলায় দৌড়িবার চেষ্টা করিল—কিন্তু অপু একটুখানি ছুটিয়া গিয়াই তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ভারি ছুটতে শিখিচিস্ খুকি না? তা কি তুই আমার সঙ্গে পারিস? চল্ চোর-চৌকিদার খেলা করবি—তুই হবি চোর—এই কাঁঠাল পাতা চুরি করে পালাবি, বুঝলি?...আর আমি হবো চৌকিদার, তোকে ধরবো।

গুল্‌কীর মুখে হাসি আর ধরিতেছিল না—হয়তো সে এতক্ষণ মনে মনে চাহিতেছিল এই সুন্দর ছেলেটির সঙ্গে ভাব করিতে। মাথা নাড়িয়া আশ্বাস দিবার সুরে বলিল—কাঁইবিচি নেবে?

অপু মনে ভাবিল চাষার গ্রামে থাকিয়া ও এই সব কথা শিখিয়াছে—তাহাদের গ্রামে যেমন গোয়ালা কি সদ্‌গোপের ছেলেমেয়েরা কথা বলে তেমনি।

দুপুরবেলা তাহার পিসিমা ডাকিলে পিছনে পিছনে গুল্‌কী আসিল। অপুর খাওয়া হইয়া গেলে তাহার পিসি জিজ্ঞাসা করিল—ভাত খাবি গুল্‌কী? অপুর পাতে বোস্—মোচার ঘণ্ট আছে—ডাল দিচ্ছি, অপু ভাবিল—আহা, ও খাবে জান্‌লে দুখানা মাছ ওর জন্যে রেখে দিতাম। গুল্‌কী দ্বিরুক্তি না করিয়া নির্লজ্জভাবে খাইতে বসিল। অনেকগুলি ভাত চাহিয়া লইয়া ডাল দিয়া সেগুলি মাখিল, পরে অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া অত ভাত না খাইতে পারিয়া পাতের পাশে রাশীকৃত ঠেলিয়া রাখিল। তবুও উঠিবার নাম করে না। অপুর পিসিমা হাসিয়া বলিল—আর খেতে হবে না গুল্‌কী—হাঁসফাঁস কচ্চিস—নে ওঠ, কত ভাত নিয়ে ফেল্‌লি দ্যাখ্ তো? তোর কেবল দিষ্টি-খিদে—পরে বলিল, জেঠিমার কাণ্ড দ্যাখো—এতখানি বেলা হয়েচে—কাঁচা মেয়েটা—ভাত খেতে ডাকেও না? হলইবা পর—তা হলেও কচি তো?...

শনিবারে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে অপু পূজা দিতে গেল। আচার্য ঠাকুরের খুব লম্বা সাদা দাড়ি বুকের ওপর পড়িয়াছে, বেশ চেহারা। তাঁহার বিধবা মেয়ে বাপের সঙ্গে সঙ্গে আসে, পূজার আয়োজন করিয়া দেয়, বৃদ্ধ বাপকে খুব সাহায্য করে। মেয়েটি বলিল—চার পয়সা দক্ষিণে কেন খোকা? এতে তো হবে না, বারের পুজোতে দু'আনা দক্ষিণে লাগ্‌বে—।

অপু বলিল—আমার মা যে চার পয়সা দিয়েচে মোটে, আর তো আমার কাছে নেই?

মেয়েটি খানকতক কলা মুলা বাছিয়া একখানা পাতায় মুড়িয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল—ঠাকুরের প্রসাদ এতে রৈল, বেলপাতা আর সিঁদুরও দিলাম, তোমাদের বাড়ির মেয়েদের দিয়ো। অপু ভাবিল—বেশ লোক এরা, আমার যদি পয়সা থাক্‌তো আরও দু'পয়সা দিতাম—

পিসিমার বাড়ি ফিরিয়া সে বাহিরের রোয়াকে জ্যোৎস্নার আলোতে বসিয়া পিসিমার সঙ্গে পূজার গল্প করিতেছে, পাশের গুল্‌কীদের বাড়িতে হঠাৎ গুল্‌কীর সরু গলার আকাশ-ফাটানো চিৎকার শোনা গেল—ওরে জেঠি, অমন করে মেরো না—ওরে বাবারে—ও জেঠি, মোর পিঠ কেটে অক্ত পড়চে—মেরো না জেঠি—

সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্কশ গলার চিৎকার শোনা গেল—হারামজাদী—বদমায়েশ—চৌধুরীদের বাড়ি গিয়েচো নেমতন্ন খেতে এমনি তোমার নোলা? তোমার নোলায় যদি আজ হাতা পুড়িয়ে ছেঁকা না দিই—লোকের বাড়ি খেয়ে খেয়ে বেড়াবে আর শতেকক্ষোয়ারীরা চোখের মাথা খেয়ে দেখতে পায় না, বলে কি না খেতে দেয় না—আপদ্ বালাই কোথাকার—বাড়িতে তোমায় খেতে দেয় না?...তোমায় আজ—

অপুর পিসিমা বলিল—দেখচো, ঠেস্ দিয়ে দিয়ে কথা শুনিয়ে শুনিয়ে বলচে? সত্যি কথা বল্লেই লোকের সঙ্গে আর ভাব থাকে না—তা হলেই তুমি খারাপ—।

অপুর মনটা আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। চোখের জলে গলা আড়ষ্ট হওয়ার দরুন কোনো কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না।

পরদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আহারাদি সারিয়া অপু গোয়ালাপাড়ার দিকে চলিল। আগেব দিন তাহার পিসেমশায় ঠিক করিয়া দিয়াছে এ গ্রাম হইতে নবাবগঞ্জে তামাক বোঝাই গাড়ি যাইবে, সেই গাড়িতে উঠিয়া সন্ধ্যার সময় রওনা হইলে সকালের দিকে নিশ্চিন্দিপুরের পথে তাহাকে উহারা নামাইয়া দিবে।

অল্পদূরে গিয়া বামুনপাড়ার পথের মোড়ে গুল্‌কীর সঙ্গে দেখা। সে সন্ধ্যায় খেলা করিয়া বাড়ি ফিরিতেছে। অপু বলিল—বাড়ি চলে যাচ্ছি রে খুকি আজ—সারাদিন ছিলি কোথায়? খেলতে এলিনে কিছু না—। পরে গুল্‌কী অবিশ্বাসের হাসি হাসিতেছে দেখিয়া বলিল—সত্যি রে, সত্যি বলচি, এই দ্যাখ্ পুঁটলি, কার্তিক গোয়ালার বাড়ি গিয়ে গাড়ি উঠবো—আয় না আমার সঙ্গে একটু এগিয়ে দিবি?

গুল্‌কী পিছনে পিছনে অনেকদূর চলিল। বামুনপাড়া ছাড়িয়া খানিকটা ফাঁকা মাঠ। তাহার পরেই গোয়ালাপাড়া। গুল্‌কী মাঠের ধার পর্যন্ত আসিল। অপুর রাঙা সাটিনের জামাটার দিকে আঙুল দেখাইয়া কহিল—তোমার এই আঙা জামাটা ক'পয়সা?

অপু হাসিমুখে বলিল—দু'টাকা—তুই নিবি?

গুল্‌কী ফিক্ করিয়া হাসিল। অর্থাৎ তুমি যদি দাও, এখ্খনি...

হঠাৎ সামনের পথে চোখ ফিরাইতেই অপু দেখিতে পাইল, মাঠের শেষে গাছপালার ফাঁকে আলো হইয়া উঠিয়াছে—অমনি কেমন করিয়া তাহার মনে হইল আগামী মাসের এমন দিনটাতে তাহারা কোথায় কতদূরে চলিয়া যাইবে। পরে গুল্‌কীকে বলিল—আর আসিস্ নে খুকি, তুই চলে যা—অনেকদূরে এসে গিইচিস—তোর বাড়িতে হয়তো আবার বকবে—চলে যা খুকি—আবার এলে দেখা হবে, কেমন তো? হয়তো আর আসবো না, আমরা কাশী চলে যাবো বোশেখ মাসে, সেখানে বাস কর্‌বো—গুল্‌কী আর একবার ফিক্ করিয়া হাসিল।

সেদিন পূর্ণিমা কি চতুর্দশী এমনি একটা তিথি। সে এদিকে আর কখনও আসে নাই, কিন্তু বাল্যের এই একা প্রথম বিদেশ-গমন সম্পর্কিত একটা ছবি অনেক দিন পর্যন্ত তাহার মনে ছিল—সোজা মাঠের পথে দূর-প্রান্তে গাছপালার ফাঁকে পূর্ণচন্দ্র উঠিতেছে (বা চতুর্দশীর চন্দ্র, তাহার ঠিক মনে ছিল না) পিছনে পিছনে অল্পদিনের পরিচিতা, অনাথা, অবোধ ঝাঁকড়াচুল ছোট একটি মেয়ে তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিয়াছে।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বৈশাখ মাসের প্রথমে হরিহর নিশ্চিন্দিপুর হইতে বাস উঠাইবার সব ঠিক করিয়া ফেলিল। যে জিনিসপত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া চলিবে না, সেগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া নানা খুচরা দেনা

শোধ দিয়া দিল। সেকালের কাঁঠালকাঠের বড় তক্তপোশ, সিন্দুক, পিঁড়ি ঘরে অনেকগুলি ছিল, খবর পাইয়া ওপাড়া হইতে পর্যন্ত খরিদ্দার আসিয়া সস্তাদরে কিনিয়া লইয়া গেল।

গ্রামের মুরুব্বীরা আসিয়া হরিহরকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিশ্চিন্দিপুরের দুগ্ধ ও মৎস্য যে কত সস্তা বা কত অল্প খরচে এখানে সংসার চলে সে বিষয়ের একটা তুলনামূলক তালিকাও মুখে মুখে দাখিল করিয়া দিলেন। কেবল রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য স্ত্রীর সাবিত্রীব্রত উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর বলিলেন—বাপু, আছেই বা কি দেশে যে থাকতে বল্‌বো—তা ছাড়া এক জায়গায় কাদায় গুণ পুঁতে থাকাও কোনো কাজের নয়, এ আমি নিজেকে দিয়ে বুঝি—মন ছোট হয়ে থাকে, মনের বাড় বন্ধ হয়ে যায়। দেখি এবার তো ইচ্ছে আছে একবার চন্দ্রনাথটা সেরে আসবো যদি ভগবান দিন দেন—

রানী কথাটা শুনিয়া অপুদের বাড়ি আসিল। অপুকে বলিল—হ্যাঁরে অপু, তোরা নাকি এ গাঁ ছেড়ে চলে যাবি? সত্যি?

অপু বলিল—সত্যি রানুদি, জিজ্ঞেস করো মাকে—

তবুও রানী বিশ্বাস করে না। শেষে সর্বজয়ার মুখে সব শুনিয়া রানী অবাক হইয়া গেল। অপুকে বাহিরের উঠানে ডাকিয়া বলিল—কবে যাবি রে?

—সামনের বুধবারের পরের বুধবারে—

—আস্‌বি নে আর কখনও?

রানীর চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, বলিল—তুই যে বলিস্ নিশ্চিন্দিপুর আমাদেব বড় ভালো গাঁ, এমন নদী, এমন মাঠ কোথাও নেই—সে গাঁ ছেড়ে তুই যাবি কি করে?

অপু বলিল—আমি কি করবো, আমি তো আব বলিনি যাবাব কথা? বাবার সেখানে বাস করবার মন, এখানে আমাদেব চলে না যে? আমার লেখা খাতাটা তোমাকে দিয়ে যাবো বানুদি, বড় হলে হয়তো আবাব দেখা হবে—

রানী বলিল—আমার খাতাতে গল্পটাও তো শেষ করে দিলি নে, খাতায় নাম সইও করে দিলি নি, তুই বেশ ছেলে তো অপু?

চোখের জল চাপিয়া রানী দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইয়া গেল। অপু বুঝিতে পারে না রানুদি মিছামিছি কেন রাগ করে! সে কি নিজের ইচ্ছাতে দেশ ছাড়িয়া যাইতেছে?

স্নানের ঘাটে পটুর সঙ্গে অপুর কত কথা হইল। পটুও কথাটা জানিত না, অপুর মুখে সব শুনিয়া তাহার মনটা বেজায় দমিয়া গেল। ম্লানমুখে বলিল—তোর জন্যে নিজে জলে নেমে কত কষ্টে শ্যাওলা সরিয়ে ফুট্ কাটলাম, একদিনও মাছ ধরবিনে তাতে?

এবার রামনবমীর দোল, চড়কপূজা ও গোষ্ঠবিহার অল্পদিন পরে পরে পড়িল। প্রতি বৎসর এই সময় অপূর্ব অসংযত আনন্দে অপুর বুক ভরিয়া তোলে। সে ও তাহার দিদি এ সময় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিত। অপুর দিক হইতে অবশ্য এবারও তাহার কোনো ত্রুটি হইল না।

চড়কের দিন গ্রামের আতুরী বুড়ি মারা গেল। নতুন যে মাঠটাতে আজকাল চড়কের মেলা বসে, তাহারই কাছে আতুরী বুড়ির সেই দো-চালা ঘরখানা। অনেক লোক জড়ো হইয়াছে দেখিয়া সেও সেখানে দেখিতে গেল। সেই যে একবার আতুরী ডাইনির ভয়ে বাঁশবন ভাঙিয়া দৌড় দিয়াছিল—তখন সে ছোট ছিল—এখন তাহার সে কথা মনে হইলে হাসি পায়। আজ তাহার মনে হইল আতুরী বুড়ি ডাইনি নয়, কিছু নয়। গ্রামের একধারে লোকালয়ের বাহিরে একা থাকিত—গরিব অসহায়, ছেলে ছিল না, মেয়ে ছিল না, কেহ দেখিবার ছিল না, থাকিলে কি আজ সারাদিন ঘরের মধ্যে মরিয়া পড়িয়া থাকিত? সৎকারের লোক হয় না? পাঁচু জেলের ছেলে একটা হাঁড়ি বাইরে আনিয়া ঢালিল—এক-হাঁড়ি শুক্‌না আমচুর। ঝোড়ো আম কুড়াইয়া বুড়ি আম্‌সি আমচুর তৈয়ারি

করিয়া রাখিয়া দিত ও তাহা হাটে হাটে বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিত। অপু তাহা জানে, কারণ গত রথের মেলাতেও তাহাকে ডালা পাতিয়া আম্‌সি বিক্রয় করিতে দেখিয়াছে।

চড়কটা যেন এবার কেমন ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। আর-বছরও চড়কের বাজারে দিদি নতুন পট কিনিয়া কত আনন্দ করিয়াছে। মনে আছে সেদিন সকালে দিদির সহিত তাহার ঝগড়া হইয়াছিল। বৈকালে তাহার দিদি বলিল—পয়সা দেবো অপু, একখানা সীতাহরণের পট দেখিস যদি মেলায় পাস্? অপু প্রতিশোধ লইবার জন্য বলিল—যত সব পান্‌সে পুতু পুতু পট, তাই তোর কিনতে হবে, আমি পারবো না যা—কেন রামরাবণের যুদ্ধ একখানা কেন্ না? তাহার দিদি বলিল—তোর কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ—ছেলের যা কাণ্ড! কেন ঠাকুর-দেবতার পট বুঝি ভালো হল না?...দিদির শিল্পানুভূতি-শক্তির উপর অপুর কোনো কালেই শ্রদ্ধা ছিল না।

তাহাদের বেড়ার গায়ে রাংচিতা ফুল লাল হইয়া ফুটিলে, তাহার মুখ মনে পড়ে, পাখির ডাকে, সদ্যফোটা ওড়কল্‌মির ফুলের দুলুনিতে—দিদির জন্য মন কেমন করে। মনে হয় যাহার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিলে খুশি হইত, সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কতদূর!...আর কখনও, কখনও—সে এসব লইয়া খেলা করিতে আসিবে না।...

মেলার গোলমালের মধ্যে কে চমৎকার বাঁশি বাজাইতেছে। নতুন সুর তাহার বড় ভালো লাগে—খুঁজিয়া বাহির করিল—মালপাড়ার হারান মাল এক বাণ্ডিল বাঁশের বাঁশি চাঁচিয়া বিক্রয় করিবার জন্য আনিয়াছে ও বিজ্ঞাপন স্বরূপ একটা বাঁশি নিজে বাজাইতেছে। অপু জিজ্ঞাসা করিল—একটা ক'পয়সা? হারান মাল তাহাকে খুব চেনে। কতবার তাহাদের রান্নাঘর ছাইয়া দিয়া গিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা নাকি শোন্‌লাম খোকা গাঁ ছেড়ে চল্লে? তা কোথায় যাচ্চ—খোকা?

অপু দেড় পয়সা দিয়া সরু বাঁশের বাঁশি একটা কিনিল। বলিল—কোন্ কোন্ ফুটোতে আঙুল টেপো হারানকাকা? একবার দেখিয়ে দাও দিকি?

মনে আছে একবার অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া সে খানিকক্ষণ জাগিয়া ছিল। দূরে নদীতে অন্ধকার রাত্রে জেলেদের আলোয় মাছধরা দোনা-জালের একঘেয়ে একটানা ঠক্ ঠক্ শব্দ হইতেছিল। এমন সময় তাহার কানে গেল অনেক দূরে যেন কুঠির মাঠের পথের দিক অত রাত্রে কে খোলা গলায় গান গাহিয়া পথ চলিয়াছে। কুঠির মাঠের পথে বেশি রাত্রে বড় একটা কেহ হাঁটে না, তবুও আধঘুমে কতদিন যে নিশীথ রাত্রির জ্যোৎস্নায় অচেনা পথিক-কণ্ঠে মধুকানের পদ-ভাঙা গানের তানকে দূর হইতে দূরে মিলাইয়া যাইতে শুনিয়াছে—কিন্তু সেবার যাহা শুনিয়াছিল তাহা একেবারে নতুন। সুরটা সে আয়ত্ত করিতে পারে নাই—আধ-জাগরণের ঘোরে সুষমাময়ী সুরলক্ষ্মী দুই ঘুমের মাঝখানের পথ বাহিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, কোনোদিন আর তাঁহার সন্ধান মিলে নাই—কিন্তু অপু কি তাহা কোনোদিন ভুলিবে?

চড়ক দেখিয়া নানা গাঁয়ের চাষাদের ছেলেমেয়েরা রঙিন কাপড় জামা, কেউবা নতুন কোরা শাড়ি পরনে, সারি দিয়া ঘরে ফিরিতেছে। ছেলেরা বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে। গোষ্ঠবিহারের মেলা দেখিতে চার-পাঁচ ক্রোশ দূর হইতেও লোকজন আসিয়াছিল। শোলার পাখি, কাঠের পুতুল, রঙিন কাগজের পাখা, রং-করা হাঁড়ি, ছোবা—সকলেরই হাতে কোনো না কোনো জিনিস। চিনিবাস বৈষ্ণব মেলার বেগুনি ফুলুরির দোকান খুলিয়াছিল, তাহার দোকান হইতে অপু দু'পয়সার তেলে-ভাজা খাবার কিনিয়া হাতে লইয়া বাড়ির দিকে চলিল। ফিরিতে ফিরিতে মনে হইল, যেখানে তাহারা উঠিয়া যাইতেছে সেখানে কি এরকম গোষ্ঠবিহার হয়? হয়তো সে আর চড়কের মেলা দেখিতে পাইবে না! মনে ভাবিল—সেখানে যদি চড়ক না হয় তবে বাবাকে বল্‌বো, আমি মেলা দেখ্‌বো বাবা, নিশ্চিন্দিপুর চল যাই—না হয় দু'দিন এসে খুড়িমাদের বাড়ি থেকে যাবো?

চড়কের পরদিন জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হইতে লাগিল। কাল দুপুরে আহারাদির পর রওনা হইতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের দাওয়ায় তাহার মা তাহাকে গরম গরম পরোটা ভাজিয়া দিতেছিল। নীলমণি জেঠার ভিটায় নারিকেল গাছটার পাতাগুলি জ্যোৎস্নার আলোয় চিক্‌চিক্ করিতেছে—চাহিয়া দেখিয়া অপুর মন দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এতদিন নতুন দেশে যাইবার জন্য তাহার যে উৎসাহটা ছিল, যতই যাওয়ার দিন কাছে আসিয়া পড়িতেছে, ততই আসন্নবিরহের গভীর ব্যথায় তাহার মনের সুরটি করুণ হইয়া বাজিতেছে।

এই তাহাদের বাড়ি-ঘর, ওই বাঁশবন, সলতে-খাগীর আমবাগানটা, নদীর ধার, দিদির সঙ্গে চড়ুইভাতি করার ওই জায়গাটা—এ সব সে কত ভালোবাসে! ওই অমন নারিকেল গাছ কি তাহারা যেখানে যাইতেছে সেখানে আছে? জ্ঞান হইয়া পর্যন্ত এই নারিকেল গাছ সে এখানে দেখিতেছে, জ্যোৎস্নাবাত্রে পাতাগুলি কি সুন্দর দেখায়! সুমুখ জ্যোৎস্নারাত্রে এই দাওয়ায় বসিয়া জ্যোৎস্নাঝরা নারিকেল শাখার দিকে চাহিয়া কত বাত্রে দিদির সঙ্গে সে দশ-পঁচিশ খেলিয়াছে, কতবার মনে হইয়াছে কি সুন্দর দেশ তাহাদের এই নিশ্চিন্দিপুর! যেখানে যাইতেছে, সেখানে কি রান্নাঘরের দাওয়াব পাশে বনের ধারে এমন নাবিকেল গাছ আছে? সেখানে কি সে মাছ ধরিতে পাবিবে, আম কুড়াইতে পারিবে, নৌকা বাহিতে পারিবে, রেল রেল খেলিতে পাবিবে, কদমতলার সায়েবের ঘাটের মতো ঘাট কি সে দেশে আছে? রানুদি আছে? সোনাডাঙার মাঠ আছে? এই তো বেশ ছিল তাহারা, কেন এসব মিছামিছি ছাড়িয়া যাওয়া?

দুপুবে এক কাণ্ড ঘটিল।

তাহাব মা সাবিত্রীব্রতেব নিমন্ত্রণে গিয়াছে, হরিহর পাশের ঘরে আহারাদি সারিয়া ঘুমাইতেছে, অপু ঘবের মধ্যে তাকেব উপবিস্থিত জিনিসপত্র কি লওযা যাইতে পারে না পারে নাড়িযা চাড়িযা দেখিতেছে। উঁচু তাকের উপব একটা মাটির কলসী সরাইতে গিয়া তাহার ভিতর হইতে একটা কি জিনিস গড়াইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। সে সেটাকে মেজে হইতে কুড়াইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। ধুলা ও মাকড়সার ঝুল মাখা হইলেও জিনিসটা কি বা তাহার ইতিহাস বুঝিতে তাহার বাকি বহিল না।

সেই ছোট্ট সোনার কৌটাটা আর বছর যেটা সেজ ঠাক্‌রুনদের বাড়ি হইতে চুরি গিয়াছিল।

দুপুরে কেহ বাড়ি নাই, কৌটাটা হাতে লইয়া অনেকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, বৈশাখ দুপুবের তপ্ত রৌদ্রভরা নির্জনতায় বাঁশবনের শন্ শন্ শব্দ অনেক দূরের বার্তার মতো কানে আসে। আপন মনে বলিল—দিদি হতভাগী চুবি করে এনে ওই কলসীটার মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিইছিল!

সে একটুখানি ভাবিল, পরে ধীরে ধীরে খিড়কি-দোরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল—বহুদূর পর্যন্ত বাঁশবন যেন দুপুরের রৌদ্রে ঝিমাইতেছে, সেই শঙ্খচিলটা কোন্ গাছের মাথায় টানিয়া টানিয়া ডাকিতেছে, দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত প্রাচীন যুগের সেই পরাজিত ভাগ্যহত রাজপুত্রের বেদনাকরুণ মধ্যাহ্নটা! একটুখানি দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে হাতের কৌটাটাকে একটান মারিয়া গভীর বাঁশবনের দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার দিদি ভুলো কুকুরকে ডাক দিলে যে ঘন বনঝোপের ভিতর দিয়া ভুলো হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিত, ঠিক তাহারই পাশে রাশীকৃত শুক্‌না বাঁশ ও পাতার রাশির মধ্যে বৈঁচি-ঝোপের ধারে কোথায় গিয়া সেটা গড়াইয়া পড়িল।

মনে মনে বলিল—রইল ওইখানে, কেউ জানতে পারবে না কোনো কথা, ওখানে আর কে যাবে?

সোনার কৌটার কথা অপু কাহাকেও কিছু জানাইল না, কখনও জানায় নাই, এমন কি মাকেও না।

দুপুর একটু গড়াইয়া গেলে হীরু গাড়োয়ানের গরুর গাড়ি রওনা হইল। সকালের দিকে আকাশে একটু একটু মেঘ ছিল বটে কিন্তু বেলা দশটার পূর্বেই সেটুকু কাটিয়া গিয়া পরিপূর্ণ প্রচুর বৈশাখী মধ্যাহ্নের রৌদ্র গাছেপালায় পথে মাঠে যেন অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে। পটু গাড়ির পিছনে পিছনে অনেক দূর পর্যন্ত আসিতেছিল, বলিল—অপুদা, এবার বারোয়ারিতে ভালো যাত্রাদলের বায়না হয়েচে, তুই শুন্‌তে পেলিনে এবার—

অপু বলিল—তুই পালার কাগজ একখানা বেশি করে নিবি, আমায় পাঠিয়ে দিবি—

আবার সেই চটকের মাঠের ধার দিয়া রাস্তা। মেলার চিহ্নস্বরূপ সারা মাঠটায় কাটা ডাবের খোলা গড়াগড়ি যাইতেছে, কাহারা মাঠের একপাশে রাঁধিয়া খাইয়াছে, আগুনে কালো মাটির ঢেলা ও একপাশে কালিমাখা নতুন হাঁড়ি পড়িয়া আছে। হরিহর চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, তাহার যেন কেমন কেমন ঠেকিতেছিল। কাজটা কি ভালো হইল? কতদিনের পৈতৃক ভিটা, ওই পাশের পোড়ো ভিটাতে সে সব ধুমধাম একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছিলই তো, যা-ও বা মাটির প্রদীপ টিম্ টিম করিতেছিল, আজ সন্ধ্যা হইতে চিরদিনের জন্য নিবিয়া গেল। পিতা রামচাঁদ তর্কবাগীশ স্বর্গ হইতে দেখিয়া কি মনে করিবেন?

গ্রামের শেষ বাড়ি হইতেছে আতুরী বুড়ির সেই দোচালা ঘরখানা, যতক্ষণ দেখা গেল অপু হাঁ করিয়া সেদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পরই একটা বড় খেজুর বাগানের পাশ দিয়া গাড়ি গিয়া একেবারে আষাঢ়ু যাইবার বাঁধা রাস্তার উপর উঠিল। গ্রাম শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বজয়ার মনে হইল যা কিছু দারিদ্র্য, যা কিছু হীনতা, যা কিছু অপমান সব রহিল পিছনে পড়িয়া—এখন সামনে শুধু নতুন সংসার, নতুন জীবনযাত্রা, নব সচ্ছলতা!...

ক্রমে রৌদ্র পড়িল—গাড়ি তখন সোনাডাঙার মাঠের মধ্যে দিয়া যাইতেছিল। হরিহর মাঠের মধ্যের একটা বড় বটগাছ দেখাইয়া কহিল—ওই দ্যাখো ঠাকুরঝি পুকুরের ঠ্যাঙাড়ে বটগাছ। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি মুখ বাহির করিয়া দেখিল। পথ হইতে অল্প দূরেই একটা নাবাল জমির ধারে বিশাল বটগাছটা চারিধারে ঝুরি গাড়িয়া বসিয়া আছে। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাহার বালকপুত্রের গল্প সে কতবার শুনিয়াছে। আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাহার শ্বশুরের পূর্বপুরুষ এই রকম সন্ধ্যাবেলা ওই বটতলায় নিরীহ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার অবোধ পুত্রকে অর্থলোভে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া পাশের ওই নাবাল জমি, যেটা সেকালের ঠাকুরঝি পুকুর ছিল—ওইখানে পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। ছেলেটির মা হয়তো পুত্রের বাড়ি ফিরিবার আশায় কত মাস, কত বছর বৃথা অপেক্ষা করিত, সে-ছেলে আর ফিরে নাই—মাগো! সর্বজয়ার চোখ হঠাৎ জলে ঝাপ্‌সা হইয়া আসে, গলায় কি একটা আটকাইয়া যায়!

সোনাডাঙার মাঠ এ অঞ্চলের সকলের বড় মাঠ। এখানে ওখানে বনঝোপ শিমুল বাবুল গাছ, খেজুর গাছে খেজুর কাঁদি ঝুলিতেছে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় দুলিতেছে, চারিধারে বৌ-কথা-কও পাপিয়ার ডাক। দূরপ্রসারী মাঠের উপর তিসির ফুলের রং-এর মতো গাঢ় নীল আকাশ উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, দৃষ্টি কোথাও বাধে না, ঘন সবুজ ঘাসে মোড়া উঁচু নিচু মাঠের মধ্যে কোথাও আবাদ নাই, শুধুই গাছপালা-বনঝোপের প্রাচুর্য আর বিশাল মাঠটার শ্যামপ্রসার, সম্মুখে কাঁচা মাটির চওড়া পথটা গৃহত্যাগী উদাস বাউলের মতো দূর হইতে দূরে আপন মনে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। একটু দূরে গিয়া বারাসে-মধুখালির বিল পড়িল। কোন্ প্রাচীন কালের নদী শুকাইয়া গিয়া জীবনের যাত্রাপথের পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, অন্তর্হিত নদীর বিশাল খাতটা এখন পদ্মফুলে ভরা বিল। অপু গাড়িতে বসিয়া মাঠ ও চারিধারের অপূর্ব আকাশের রংটা দেখিতে দেখিতে যাইতেছিল। বেলাশেষের স্বপ্নপটে

আবার কত কি শৈশব-কল্পনার আসা-যাওয়া! এই তো সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়াছে! এখন হয়তো কোথায় কতদূরে চলিবে, যাওয়া তার সবে আরম্ভ হইল, এইবার হয়তো সে-সব দেশ, স্বপ্ন-দেখা সে অপূর্ব জীবন!

হরিহর দূরের একটা গ্রাম আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওই হল ধঞ্চে-পলাশগাছি, ওরই ওপাশে নাটাবেড়ে—ওইখানে বনবিবির দরগাতলায় শ্রাবণ মাসে ভারি মেলা হয়, এমন সস্তা কুমড়ো আর কোথাও মেলে না।

আষাঢ়ু বাজারের নিচে খেয়ায় বেত্রবতী পার হইবার সময় চাঁদ উঠিল, জ্যোৎস্নার আলোয় জল চিক্‌চিক্ করিতেছিল। আজ আষাঢ়ুর হাট, কয়েকজন হাটুরে লোক কলরব করিতে করিতে ওপার হইতে খেয়ানৌকায় এপারে আসিতেছে। অপুদের গাড়িসুদ্ধ পার হইয়া ওপারে উঠিল। অপু বাবাকে বলিয়া আষাঢ়ুর বাজার দেখিতে নামিল। ছোট বাজার, সারি সারি ঝাঁপতোলা দোকান, স্যাকরার দোকানের টুক্‌টাক্ শুনা যাইতেছে, একটা খেজুরগুড়ের আড়তের সামনে বহু গরুর গাড়ির ভিড়। মাঝেরপাড়া স্টেশন এখনও প্রায় চারি ক্রোশ, রাস্তা কাঁচা হইলেও বেশ চওড়া, দুধারে নীলকুঠির সাহেবদের আমলে রোপিত বট, অশ্বত্থ, তুঁতগাছ। বৈশাখ মাসের প্রথমে পথিপার্শ্বের বট-অশ্বত্থের ডালের মধ্যে কোথায় কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া সারা হইতেছে, সারা পথটা প্রাচীন বটের সারির ঝুরি দোলানো। কচি পাতার রাশি জ্যোৎস্না লাগিয়া স্বচ্ছ দেখাইতেছে।

বাংলার বসন্ত চৈত্র বৈশাখের মাঠে, বনে, বাগানে, যেখানে-সেখানে, কোকিলের এলোমেলো ডাকে, নতপল্লব নাগকেশর গাছের অজস্র ফুলের ভারে, বনফুলের গন্ধভরা জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ দক্ষিণহাওয়ায় উল্লাসে আনন্দনৃত্য শুরু করিয়াছে. এরূপ অপরূপ বসন্তদৃশ্য অপু জীবনে এই প্রথম দেখিল। এই অল্প বয়সেই তাহার মনে বাংলার মাঠ, নদী, নিরালা বনপ্রান্তরের সুমুখ জ্যোৎস্না রাত্রির যে মায়ারূপ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার উত্তরকালের শিল্পীজীবনের কল্পনামুহূর্তগুলি মাধুর্যে ও প্রেরণায় ভরিয়া তুলিবার তাহাই ছিল শ্রেষ্ঠ উপাদান।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় স্টেশনে আসিয়া গাড়ি পৌঁছিল। আজ অনেকক্ষণ হইতেই কখন গাড়ি স্টেশনে পৌঁছাইবে সেই আশায় অপু বসিয়া ছিল, গাড়ি থামিতেই নামিয়া সে একদৌড়ে গিয়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে হাজির হইল। সন্ধ্যা সাড়ে আটটার ট্রেন অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিয়াছে সারারাত্রির মধ্যে আর ট্রেন নাই। ওই হীরু গাড়োয়ানের গরু দুইটার জন্যই এরূপ ঘটিল, নতুবা এখনই সে ট্রেন দেখিতে পাইত। প্ল্যাটফর্মে একরাশ তামাকের গাঁট সাজানো—দুজন রেলের লোক একটা লোহার বাক্স মতো দেখিতে অথচ খুব লম্বা ডাণ্ডাওয়ালা কলে তামাকের গাঁট চাপাইয়া কি করিতেছে। জ্যোৎস্না পড়িয়া রেলের পাটি চিক্ চিক্ করিতেছে। ওদিকে রেল লাইনের ধারে একটা উঁচু খুঁটির গায়ে দুটা লাল আলো, এদিকে আবার ঠিক সেই রকম দুটা লাল আলো। স্টেশনের ঘরে টেবিলের উপরে চৌপায়া তেলের লণ্ঠন জ্বলিতেছে। এক রাশ বাঁধানো খাতাপত্র। অপু দরজার কাছে গিয়া খানিকটা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, একটা ছোট্ট খড়মের বউলের মতো জিনিস টিপিয়া স্টেশনের বাবু খট খট শব্দ করিতেছে।

ইস্টিশান! ইস্টিশান! বেশি দেরি নয়, কাল সকালেই সে রেলের গাড়ি শুধু যে দেখিবে তাহা নয়, চড়িবেও!...

প্ল্যাটফর্ম হইতে নড়িতে তাহার মন সরিতেছিল না। কিন্তু তাহার বাবা ডাকিতে আসিল। খড়মের বউলের মতো জিনিসটাই নাকি টেলিগ্রাফের কল, তাহার বাবা বলিল।

অপু ফিরিয়া দেখিল স্টেশনের পুকুর ধারে রাঁধিয়া খাইবার জোগাড় হইতেছে। আর একখানি গাড়ি পূর্ব হইতেই সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। আরোহীর মধ্যে আঠারো-উনিশ বৎসরের এক বৌ ও একটি যুবক। অপু শুনিল বৌটি হবিবপুরের বিশ্বাসদের বাড়ির, ভাইয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ি

যাইতেছে। তাহার মায়ের সঙ্গে বৌটির খুব ভাব হইয়া গিয়াছে। তাহার মা খিচুড়ির চালডাল ধুইতেছে, বৌটি আলু ছাড়াইতেছে। রান্না একত্র হইবে।

সকাল সাড়ে সাতটায় ট্রেন আসিল। অপু হাঁ করিয়া অনেকক্ষণ হইতে গাড়ি দেখিবার জন্য প্ল্যাটফর্মের ধারে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার বাবা বলিল, খোকা, অত ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থেকো না, সরে এসো এদিকে। একজন খালাসিও লোকজনদের হটাইয়া দিতেছিল।

কত বড় ট্রেনখানা! কী ভয়ানক শব্দ! সামনের একেই ইঞ্জিন বলে? উঃ, কী কাণ্ড!

হবিবপুরের বৌটি ঘোমটা খুলিয়া কৌতূহলের সহিত প্রবেশমান ট্রেনখানার দিকে চাহিয়া ছিল।

গাড়িতে হৈ হৈ করিয়া মোট-ঘাট সব উঠানো হইল। কাঠের বেঞ্চি সব মুখোমুখি করিয়া পাতা। গাড়ির মেজেটা যেন সিমেন্টের বলিয়া মনে হইল। ঠিক যেন ঘর একখানা; জানলা দরজা সব হুবহু! এই ভারী গাড়িখানা, যাহা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা যে আবার চলিবে, সে বিশ্বাস অপুর হইতেছিল না। কি জানি হয়তো নাও চলিতে পারে; হয়তো উহারা এখনই বলিতে পারে, ওগো তোমরা সব নামিয়া যাও, আমাদের গাড়ি আজ আর চলিবে না। তারের বেড়ার এদিকে একজন লোক একবোঝা উলুঘাস মাথায় করিয়া ট্রেনখানা চলিয়া যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল, অপুর মনে হইল লোকটা কৃপার পাত্র! আজিকার দিনে যে গাড়ি চড়িল না, সে বাঁচিয়া থাকিবে কি করিয়া? হীরু গাড়োয়ান ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া গাড়ির দিকে চাহিয়া আছে।

গাড়ি চলিল। অদ্ভুত, অপূর্ব-দুলুনি! দেখিতে দেখিতে মাঝেরপাড়া স্টেশন, লোকজন, তামাকের গাঁট, হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া-থাকা হীরু গাড়োয়ান, সকলকে পিছনে ফেলিয়া গাড়ি বাহিরের উলুখড়ের মাঠে আসিয়া পড়িল। গাছপালাগুলো সটসট করিয়া দুদিকের জানালার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া পলাইতেছে—কী বেগ! এরই নাম রেলগাড়ি! উঃ, মাঠখানা যেন ঘুরাইয়া ফেলিতেছে! ঝোপঝাড় গাছপালা, উলুখড়ের চাউনি, ছোটখাটো চাষাদের ঘর সব একাকার করিয়া দিতেছে! গাড়ির তলায় জাঁতা-পেষার মতো একটা একটানা শব্দ হইতেছে—সামনের দিকে ইঞ্জিনের কী শব্দটা!

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিসস্ট্যান্ট সিগন্যালখানাও ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে!...

অনেক দিন আগের সে দিনটা!

সে ও দিদি যেদিন দুজনে বাছুর খুঁজিতে খুঁজতে মাঠ-জলা ভাঙিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে রেলের রাস্তা দেখিতে ছুটিয়া গিয়াছিল! সেদিন—আর আজ?

ওই যেখানে আকাশের তলে আষাঢ়ু-দুর্গাপুরের বাঁধা সড়কের গাছের সারি ক্রমশ দূর হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে, ওরই ওদিকে যেখানে তাহাদের গাঁয়ের পথ বাঁকিয়া আসিয়া সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে উঠিয়াছে, সেখানে পথের ঠিক সেই মোড়টিতে, গ্রামের প্রান্তের বুড়ো জামতলাটায় তাহার দিদি যেন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের রেলগাড়ির দিকে চাহিয়া আছে!...

তাহাকে কেহ লইয়া আসে নাই, সবাই ফেলিয়া আসিয়াছে, দিদি মারা গেলেও দুজনের খেলা করার পথেঘাটে, বাঁশবনে, আমতলায় সে দিদিকে যেন এতদিন কাছে কাছে পাইয়াছে, দিদির অদৃশ্য স্নেহস্পর্শ ছিল নিশ্চিন্দিপুরের ভাঙা কোঠাবাড়ির প্রতি গৃহ-কোণে—আজ কিন্তু সত্য-সত্যই দিদির সহিত চিরকালের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল!...

তাহার যেন মনে হয় দিদিকে আর কেহ ভালোবাসিত না, মা নয়, কেউ নয়! কেহ তাহাকে ছাড়িয়া আসিয়া দুঃখিত নয়।

হঠাৎ অপুর মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া গেল। তাহা দুঃখ নয়, শোক নয়, বিরহ নয়, তাহা কি সে জানে না। কত কি মনে আসিল অল্প এক মুহূর্তের মধ্যে...আতুরী ডাইনী...নদীর ঘাট...তাহাদের কোঠাবাড়িটা...চালতেতলার পথ...রানুদি...কত বৈকাল, কত দুপুর...কতদিনের কত হাসিখেলা...পটু...দিদির কত না-মেটা সাধ...

দিদি এখনও একদৃষ্টে চাহিয়া আছে—

পরক্ষণেই তাহার মনের মধ্যের অবাক ভাষা চোখের জলে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেন এই কথাই বার বার বলিতে চাহিল—আমি চাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ইচ্ছে করে ফেলেও আসিনি—ওরা আমায় নিয়ে যাচ্ছে—

সত্যই সে ভুলে নাই।

উত্তরজীবনে নীলকুন্তলা সাগরমেখলা ধরণীর সঙ্গে তাহার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু যখনই গতির পুলকে তাহার সারা দেহ শিহরিয়া উঠিতে থাকিত, সমুদ্রগামী জাহাজের ডেক হইতে প্রতিমুহূর্তে নীল আকাশের নব নব মায়ারূপ চোখে পড়িত, হয়তো দ্রাক্ষাকুঞ্জবেষ্টিত কোন নীল পর্বতসানু সমুদ্রের বিলীন চক্রবাল সীমায় দূর হইতে দূরে ক্ষীণ হইয়া পড়িত, দূরের অস্পষ্ট আবছায়া দেখিতে পাওয়া বেলাভূমি এক প্রতিভাশালী সুরস্রষ্টার প্রতিভার দানের মতো মহামধুর কুহকের সৃষ্টি করিত তাহার ভাবময় মনে—তখনই, এই সব সময়েই, তাহার মনে পড়িত এক ঘনবর্ষার রাতে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে এক পুরানো কোঠার অন্ধকার ঘরে, রোগশয্যাগ্রস্ত এক পাড়াগাঁয়ের গরিব ঘরের মেয়ের কথা—

—অপু, সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি?

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালখানা দেখিতে দেখিতে কতদূরে অস্পষ্ট হইতে হইতে শেষে মিলাইয়া গেল।

অক্রূর সংবাদ

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দুপুরের পর রানাঘাট স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইল। অপুর চোখে দু-দুবার কয়লার গুঁড়া পড়া সত্ত্বেও সে গাড়ির জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সারাদিনটা বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। স্টেশনে স্টেশনে ওগুলাকে কি বলে? সিগন্যাল? পড়িতেছে উঠিতেছে কেন? গাড়ি যেখানে লাগিতেছে সেখানটা উঁচুমতো ইঁটের গাঁথা, ঠিক যেন রোয়াকের মতো। তাকে প্ল্যাটফর্ম বলে? কাঠের গায়ে বড় বড় অক্ষরে ইংরাজি ও বাংলাতে সব স্টেশনের নাম লেখা আছে—কুড়ুলগাছি, গোবিন্দপুর, বানপুর। গাড়ি ছাড়িবার সময় ঘণ্টা পড়ে—ঢং ঢং ঢং ঢং—চার ঘা—অপু গুনিয়াছে, একটা বড় লোহার চাকার চারিধারে হাতলপরানো, তাহাই ঘুরাইলে সিগ্‌ন্যাল পড়ে—কুড়ুলগাছি স্টেশনে অপু লক্ষ করিয়া দেখিল।

সর্বজয়া এবার লইয়া মোটে দুইবার রেলে চড়িল। আর একবার সেই কোন্ কালে—উনি তখন নতুন কাশী হইতে আসিয়া দেশে সংসার পাতিয়াছেন—জ্যৈষ্ঠমাসে আড়ংঘাটায় যুগলকিশোর ঠাকুর দেখিতে গিয়াছিল—সে কি আজকার কথা। সে খুশির সহিত স্টেশনে স্টেশনে মুখ বাড়াইয়া লোকজনের ওঠা-নামা লক্ষ করিতেছিল—বউঝিরা উঠিতেছে নামিতেছে—কেমন সব চেহারা, কেমন কাপড়-চোপড়, গহনাপত্র। জগন্নাথপুর স্টেশনে ভালো মুড়ির মোয়া ফিরি করিতেছে দেখিয়া সে ছেলেকে বলিল—অপু, মুড়ির মোয়া খাবি? তুই তো ভালোবাসিস, নেবো তোর জন্যে? স্টেশনে টেলিগ্রাফের তারের ওপর কি পাখি বসিয়া দোল খাইতেছে, অপু ভালো করিয়া চাহিয়া চাহিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দ্যাখো মা, কাদের বাড়ির খাঁচা থেকে একটা ময়নাপাখি পালিয়ে এসেচে।

নৈহাটি স্টেশনে গাড়ি বদলাইয়া গঙ্গার প্রকাণ্ড পুলটার উপর দিয়া যাইবার সময় সূর্য অস্ত যাইতেছিল, সর্বজয়া একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল—ওপার হইতে হু হু বাতাস বহিতেছে, গঙ্গার জলে নৌকা, দুপারে কত ভালো ভালো বাড়ি বাগান, এ সব দৃশ্য জীবনে সে কখনও দেখে নাই। ছেলেকে দেখাইয়া বলিল—দেখেচিস্ অপু, একখানা ধোঁয়ার জাহাজ? পরে সে যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া আপন মনে বলিল—মা গঙ্গা, তোমার ওপর দিয়ে যাচ্চি, অপরাধ নিয়ো না মা, কাশীতে গিয়ে ফুল-বিল্বিপত্রে তোমায় পুজো করবো, অপুকে ভালো রেখো, যে জন্যে যাওয়া তা যেন হয়, সেখানে যেন আশ্রয় হয় মা—

আনন্দে পুলকে, অনিশ্চিতত্তার রহস্যে তার হৃদয় দুলিতেছিল—এরকম মনোভাব এর আগে সে কখনও অনুভব করে নাই। সুবিধায় হৌক, অসুবিধায় হৌক, অবাধ মুক্ত জীবনের আনন্দ সে পাইল এই প্রথম, তার চিরকালের বাঁশবনের বেড়া ঘেরা ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ পল্লীজীবনে এরকম সচল দৃশ্যরাজি, এরকম অভিনব গতির বেগ, এত অনিশ্চয়ের পুলকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় কখনও হয় নাই—যে জীবন চারিধারে পাঁচিল দেওয়াল তুলিয়া আপনাকে আপনি ছোট করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আজ চলিয়াছে, চলিয়াছে, সম্মুখে চলিয়াছে—ওই পশ্চিম আকাশের অস্তমান সূর্যকে লক্ষ করিয়া—নদ-নদী, দেশবিদেশ—ডিঙাইয়া ছুটিয়াছে—এই চলিয়া চলার বাস্তবতাকে সে প্রতি হৃদয় দিয়া অনুভব করিতেছিল আজ।—এই তো সেদিন এক বৎসর আগেও নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িতে কত রাত্রে শুইয়া যখনই সে ভাবিত, সুবিধা হইলে একবার চাকদা কি কালীগঞ্জে গঙ্গাস্নানে যাইবে, তখনই তাহা সম্ভবের ও নিশ্চয়তার বহু বাহিরের জিনিস বলিয়া মনে হইয়াছে—আর আজ?

ব্যান্ডেল স্টেশনে গাড়ি আসিবার একটু আগে সম্মুখের বড় লাইন দিয়া একখানা বড় গাড়ি হু হু শব্দে ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অপু বিস্ময়ের সঙ্গে সেদিকে চাহিয়া রহিল। কি আওয়াজ!—উঃ! ব্যান্ডেল স্টেশনে পৌঁছিয়া তাহারা গাড়ি হইতে নামিল। এদিকে-ওদিকে এঞ্জিন দৌড়িতেছে, বড় বড় মালগাড়িগুলা স্টেশন কাঁপাইযা প্রতি পাঁচমিনিট অন্তব না থামিয়া চলিয়া যাইতেছে। হৈ হৈ শব্দ—এদিকে এঞ্জিনের সিটির কানে-তালা-ধরা আওয়াজ, ওদিকে আব একখানা যাত্রীগাড়ি ছাড়িয়া যাইতেছে, গার্ড সবুজ নিশান দুলাইতেছে—সন্ধ্যার সময় স্টেশনের পূর্বে পশ্চিমে লাইনের ওপব এত সিগ্‌ন্যাল ঝাঁকে ঝাঁকে—লাল সবুজ আলো জ্বলিতেছে—রেল, এঞ্জিন, গাড়ি, লোকজন!—

একটু রাত্রি হইলে তাহাদের কাশী যাইবার গাড়ি আসিয়া বিকট শব্দে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইল। বিশাল স্টেশন, বেজায় লোকের ভিড়—সর্বজয়া কেমন দিশেহারা হইয়া গেল—তাড়া খাইয়া অনভ্যস্ত আড়ষ্ট পায়ে পায়ে স্বামীর পিছনে এখাখানা কামরার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইতেই হরিহর অতিকষ্টে দুর্জয় ভিড় ঠেলিয়া বেপথুমানা স্ত্রীকে ও দিশেহারা পুত্রকে কায়ক্লেশে গাড়ির বেঞ্চিতে বসাইয়া দিয়া কুলির সাহায্যে মোট-গাঁট উঠাইয়া দিল।

ভোরের দিকে সর্বজয়ার তন্দ্রা গেল ছুটিয়া। ট্রেন ঝড়ের বেগে ছুটিয়াছে—মাঠ, মাটি, গাছপালা একাকার করিয়া ছুটিয়াছে—রাত্রের গাড়ি বলিয়া তাহারা সকলে এক গাড়িতেই উঠিয়াছে—হরিহর তাহাকে মেয়ে-কামরায় দেয় নাই। গাড়িতে ভিড় আগের চেয়ে কম—এক এক বেঞ্চে এক একজন লম্বা হইয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। উপরের বেঞ্চে একজন কাবুলী নাক ডাকাইতেছে। অপু কখন উঠিয়া হাঁ করিয়া জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

হরিহর জাগিয়া উঠিয়া ছেলেকে বলিল—ওরকম করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকো না খোকা, এখ্খুনি চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়বে—

কয়লার গুঁড়া তো নিরীহ জিনিস, চোখ দুটা যদি উপড়াইয়া চলিয়াও যায় তবুও অপুর সাধ্য নাই যে, জানালার দিক হইতে এখন সে চোখ ফিরাইয়া লইতে পাবে। সে প্রায় সারারাত্রি ঠায় এইভাবে বসিয়া। বাবা মা তো ঘুমাইতেছিল—সে যে কত কি দেখিয়াছে। কত স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ায়

নাই, আলো লোকজন সুদ্ধ স্টেশনটা হুশ করিয়া হাউইবাজির মতো পাশ কাটাইয়া উড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল—রাত্রে কখন তাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যাইতেই সে মুখ বাহির করিয়া দেখিল যে, গভীর রাত্রির জ্যোৎস্নায় রেলগাড়িখানা ঝড়ের বেগে একটা কোন নদীর ছোট সাঁকো পার হইতেছে,—সামনে খুব উঁচু একটা কালোমতো ঢিবি, ঢিবিটার ওপরে অনেক গাছপালা, নদীর জলে জ্যোৎস্না পড়িয়া চিক্ চিক্ করিয়া উঠিল, আকাশে সাদা সাদা মেঘ—তারপর সেই ধরনের বড় বড় আরও কয়েকটা ঢিবি, আরও সেই রকম গাছপালা। তাহার পর একটা বড় স্টেশন, লোকজন, আলো—পাশের লাইনে একখানা গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—একজন পানওয়ালার সঙ্গে একটা লোকের যা ঝগড়া হইয়া গেল!—স্টেশনে একটা বড় ঘড়ি ছিল—সে তাহার মাস্টার মশায় নীরেনবাবুর কাছে গাড়ি দেখিতে শিখিয়াছিল, গুনিয়া গুনিয়া দেখিল রাত্রি তিনটা বাজিয়া বাইশ মিনিট হইয়াছে। তারপর আবার গাড়ি ছাড়িল—আবার কত গাছ, আবার সেই ধরনের উঁচু উঁচু ঢিবি—অনেক সময়ে রেলের রাস্তার দুধারেই সেইরকম ঢিবি—গাড়িতে সবাই ঘুমাইতেছে, ইহারা যদি কিছু দেখিবে না তবে রেলগাড়ি চড়িয়াছে যে কেন! কাহাকে সে জিজ্ঞাসা করে যে অত ঢিবি কিসের? এক-একবার সে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ঝুঁকিয়া মাটির দিকে চাহিয়া নিরূপণ করিবার চেষ্টা কবিতেছিল গাড়িখানা কত জোরে যাইতেছে—চুল বাতাসে উড়িয়া মুখে পড়ে, মাটি দেখা যায় না, যেন কে মাটির গায়ে কতকগুলি সরল রেখা টানিযা চলিয়াছে—উঃ! রেলগাড়ি কি জোরে যায়!—কৌতূহলে, উত্তেজনায় সে একবার এদিকের জানালায়, একবার ওদিকের জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছিল।

মাঝে মাঝে পূর্বদিকের দ্রুতবিলীয়মান অস্পষ্ট জ্যোৎস্নাভরা মাঠের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইতেছিল, কত দূরে তাহারা আসিয়াছে! এসব কোন দেশের উঁচু নিচু মাঠ দিয়া তাহাবা চলিয়াছে?

সকালের দিকে সে আবার একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, একটা প্রকাণ্ড স্টেশনে সশব্দে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল—প্ল্যাটফর্মের পাথরের ফলকে নাম লেখা আছে—পাটনা সিটি।

তাহার পর কত স্টেশন চলিয়া গেল। কি বড় বড় পুল! গাড়ি চলিয়াছে, চলিয়াছে, মনে হয় বুঝি পুলটা শেষ হইবে না—কত ধরনের সিগ্ন্যাল, কত কল-কারখানা, একটা কোন্ স্টেশনের ঘরের মধ্যে একটা লোহার থামের গায়ে চোঙ্লাগানো মতো—তাহারই মধ্যে মুখ দিয়া একজন রেলের বাবু কি কথা কহিতেছে—প্রাইভেট নম্বর?...হাঁ আচ্ছা—সিক্সটি নাইন্—সিক্সটি নাইন্—হাঁ?...উনসত্তর... ছয়ের পিঠে নয়—হাঁ—হাঁ—

সে অবাক হইয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিল—ও কি কল বাবা? ওর মধ্যে মুখ দিয়ে ওরকম বলচে কেন?

তখন বেলা খুব পড়িয়া গিয়াছে, এমন সময় হরিহর বলিল—এইবার আমরা কাশী পৌঁছে যাবো, বাঁ দিকে চেয়ে থেকো, গঙ্গার পুলের উপর গাড়ি উঠলেই কাশী দেখা যাবে—

অপু একটা কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতেছিল। আজ সে সারা পথ টেলিগিরাপের তার ও খুঁটি দেখিতে দেখিতে আসিতেছে—সেই একটিবার ছাড়া এমন করিয়া এর আগে কখনও দেখে নাই জীবনে। এইবার যদি সে রেল-রেল খেলার সুযোগ পায়, তখনই সে ওই ধরনের তারের খুঁটি বসাইবে। কি ভুলটাই করিত আগে! যেখানে যাইতেছে, সেখানকার বনে গুলঞ্চলতা পাওয়া যায় তো?

দিন পনেরো কাটিয়া গিয়াছে। বাঁশফট্‌কা গলির একখানা মাঝারি গোছের তেতলা বাড়ির একতলায় হরিহর বাসা লইয়া আছে। কোনো পূর্বপরিচিত লোকের সন্ধান সে মিলাইতে পারে নাই।

আগে যাহারা যেসব জায়গায় ছিল, এখন সেসব স্থানে তাহাদের সন্ধান কেহ দিতে পারে না। কেবল বিশ্বেশ্বরের গলির পুরাতন হালুইকর রামগোপাল সাহু এখনও বাঁচিয়া আছে।

বাড়ির ওপরের তলায় একজন পাঞ্জাবী সপরিবারে থাকে, মাঝের তলায় এক বাঙালি ব্যবসায়ী থাকে, বাইরের ঘরটা তাঁর দোকান ও গুদাম—আশেপাশের দু'তিন ঘরে তাঁর রন্ধন ও শয়নঘর।

এ পাঁচ ছয় দিনে সর্বজয়া নিকটবর্তী সকল জায়গা স্বামীর সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়াছে। স্বপ্নেও কখনও সে এমন দৃশ্যের কল্পনা করে নাই,—এমন মন্দির! এমন ঠাকুর-দেবতা! এত ঘরবাড়ি! আড়ংঘাটার যুগলকিশোরের মন্দির এতদিন তাহাব কাছে স্থাপত্য-শিল্পের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন জানা ছিল—কিন্তু বিশ্বনাথের মন্দির?—অন্নপূর্ণার মন্দির? দশাশ্বমেধ ঘাটের ওপরকার লালপাথরের মন্দিরগুলা?

মধ্যে একদিন সে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটির স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রে বিশ্বনাথের আরতি দেখিতে গিয়াছিল—সে যে কি ব্যাপার তাহা সে মুখে বলিতে পারে না। ধূপ-ধুনার ধোঁয়ায় মন্দির অন্ধকার হইয়া গেল—সাত-আটজন পূজারী একসঙ্গে মন্ত্র পড়িতে লাগিল—কি ভিড়, কি জাঁকজমক, কত বড় ঘরের মেয়েরা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদের বেশভূষারই বা কি বাহার! কোথাকার একজন রানী আসিয়াছিলেন—সঙ্গে চার-পাঁচজন চাকরানী। দামি বারাণসী শাড়ি পরনে, সোনার কল্কাবসানো আঁচলটা আরতির পঞ্চপ্রদীপের আলোয় আগুনের মতো জ্বলিতেছিল—কি টানা ডাগর চোখ—কি ভুরু কি মুখশ্রী—সত্যিকার রানী সে কখনও দেখে নাই—গল্পেই শুনিয়াছে—হাঁ, রানীর মতো রূপ বটে! তাঁহাকে বেশিক্ষণ ধরিয়া দেখিয়াছে, কি ঠাকুরের আরতি বেশিক্ষণ দেখিয়াছে, তাহা সে জানে না।

ঠাকুর-দেবতার মন্দির ছাড়া এক-একখানা বসতবাড়িই বা কি!...দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণে নিশ্চিন্দিপুরের গাঙ্গুলি-বাড়ি গিয়া সে গাঙ্গুলিদের নাটমন্দির, দো-মহলা বাড়ি, বাঁধানো পুকুরঘাট দেখিয়া মনে মনে কত ঈর্ষান্বিত হইত—মনে আছে একবার দুর্গাকে বলিয়াছিল—দেখেচিস্ বড়ল্যোকের বাড়িঘরের কি লক্ষ্মীছিরি?—এখন সে যেসব বাড়ি রাস্তাব দুধারে দেখিতেছে—তাহার কাছে গাঙ্গুলি-বাড়ি—

এত গাড়িঘোড়া একসঙ্গে যাইতে কখনও সে দেখে নাই। গাড়িই বা কত ধরনের! আসিবার দিন রানাঘাটে, নৈহাটিতে সে ঘোড়ার গাড়ি দেখিয়াছে বটে, কিন্তু এত ধবনের গাড়ি সে আগে কখনও দেখে নাই। দু-চাকার গাড়িই যে কত যায়!...তাহার তো ইচ্ছা করে পথের ধারে দাঁড়াইয়া দুদণ্ড এইসব দ্যাখে—কিন্তু পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকটি সঙ্গে থাকে বলিয়া লজ্জায় পারে না।

অপু তো একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছে। এরকম কাণ্ডকারখানা সে কখনও কল্পনায় আনিতে পারে নাই। তাদের বাসা হইতে দশাশ্বমেধ ঘাট বেশি দূর নয়, রোজ বিকালে সে সেখানে বেড়াইতে যায়। রোজই যেন চড়কের মেলা লাগিয়াই আছে। এখানে গান হইতেছে, ওখানে কথা হইতেছে, ওদিকে কে একজন রামায়ণ পড়িতেছে, লোকজনের ভিড়, হাসিমুখ, উৎসব, অপু সেখানে শুধু ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া দেখে আর সন্ধ্যার পর বাড়ি আসিয়া মহাউৎসাহে গল্প করে।

কাহাদের চাকর একটি ছোট ছেলেকে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া রোজ বেড়াইতে আনে, অপু ভাব করিয়াছে—তার নাম পল্টু, ভালো কথা কহিতে জানে না, ভারি চঞ্চল, তাই পাছে হারাইয়া যায় বলিয়া বাড়ির লোকেদের এই জেল-কয়েদির মতো ব্যবস্থা। অপু হাসিয়া খুন। চাকরকে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু সে ভয়ে দড়ি খুলিতে চাহে না। বন্দী নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অবোধ—এ ধরনের ব্যবহার যে প্রতিবাদযোগ্য, সে জ্ঞানই তাহার নাই। আসিলে সর্বজয়া রোজ তাহাকে বকে—একলা একলা ওরকম যাস্ কেন? শহর বাজার জায়গা, যদি রাস্তা হারিয়ে ফেলিস?...মায়ের আশঙ্কা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, একথা সে মাকে হাত নাড়িয়া দুবেলা অধ্যবসায়-সহকারে বুঝায়।

কাশীতে আসিয়া হরিহরের আয়ও বাড়িল। কয়েক স্থানে হাঁটাহাঁটি করিয়া সে কয়েকটি মন্দিরে নিত্য পুরাণ-পাঠের কার্য জোগাড় করিল। তাহা ছাড়া একদিন সর্বজয়া স্বামীকে বলিল—দশাশ্বমেধ ঘাটে রোজ বিকেলে পুঁথি নিয়ে বোসো না কেন? কত ফিকিরে লোক পয়সা আনে, তোমার কেবল বসে বসে পরামর্শ আঁটা—

স্ত্রীর তাড়া খাইয়া হরিহর কাশীখণ্ডের পুঁথি লইয়া বৈকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে। পুরাণ পাঠ করা তাহার কিছু নতুন ব্যবসায় নহে, দেশে শিষ্য বাড়ি গিয়া কত ব্রতপার্বণ উপলক্ষে সে এ কাজ করিয়াছে। পুঁথি খুলিয়া সুস্বরে সে বন্দনা গান শুরু করে—

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং।
...স্মিতসুভগমুখং স্বাধরে ন্যস্ত রেণুং
...ব্রহ্মাগোপালবেশং।

ভিড় মন্দ হয় না।

বাসায় ফিরিয়া বালির কাগজে কি লেখে। স্ত্রীকে বলে, শুধু শ্লোক পড়ে গেলে কেউ শুনতে চায় না—ওই বাঙাল কথকটার ওখানে আমার চেয়ে বেশি ভিড় হয়—ভেবেচি গোটাকতক পালা লিখবো, গান থাকবে, কথকতার মতোও থাকবে নৈলে লোক জমে না—বাঙালটার সঙ্গে পরশু আলাপ হল, দেবনাগরীর অক্ষর-পরিচয় নেই, শুধু ছড়া কেটে মেয়ে ভুলিয়ে পয়সা নেয়...আমার রেকাবি কুড়িয়ে ছ'আনা, আট আনা, আর ওর একটা টাকার কম নয়...শুন্‌বে একটু কেমন লিখ্‌চি?

খানিকটা সে পড়িয়া শোনায়। বলে—ওই কথকের পুঁথি দেখে বনের বর্ণনাটা লিখে নেবো ভেবেচি—তা কি দেবে?

—তুমি কোন্‌খানটায় বসে কথা বলো বল তো? একদিন শুনতে যেতে হবে—

—যেয়ো না, ষষ্ঠীর মন্দিরের নিচেই বসি—কালই যেয়ো, নূতন পালাটা বল্‌বো, কাল একাদশী আছে দিনটা ভালো—

—আসবার সময় বিশ্বেশ্বরের গলির দোকান থেকে চার পয়সার পানফলের জিলিপি এনো দিকি অপুর জন্যে—সেদিন ওপরের খোট্টা বউ কি পুজো করে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে জল খেতে দিলে, বল্লে, পানফলের জিলিপি, বিশ্বেশ্বরের গলিতে পাওয়া যায়, খেতে গিয়ে ভাবলাম অপু জিলিপি খেতে বড় ভালোবাসে—তা জল খেতে দিয়েচে আমি আর কি বলে নিয়ে আসি—এনো দিকি আজ চার পয়সার।

কয়েকদিন ধরিয়া হরিহরের কথকতা শুনিতে বেশ ভিড় হইতেছে। একখানা বড় বারকোশে করিয়া নারদঘাটের কালীবাড়ির ঝি বড় একটা সিধা আনিয়া অপুদের দাওয়ায় নামাইল। সর্বজয়া হাসিমুখে বলিল—আজ বুঝি বারের পুজো? উনি বাড়ি আসচেন দেখলে, হ্যাঁ ঝি? চলিয়া গেলে ছেলেকে ডাকিয়া বলিল—এদিকে আয় অপু—এই দ্যাখ্‌ তোর সেই নারকেলের ফোঁপল—তুই ভালোবাসিস? কিশমিশ, কলা, কত বড় বড় আম দেখেছিস, আয় খাবি, দিই—বোস এখানে—

উৎসাহ পাইয়া হরিহর পুরাতন খাতাপত্রের তাড়া আবার বাহির করে। সর্বজয়া বলে—ধ্রুবচরিত্র শুনতে শুনতে লোকের কান যে ঝালাপালা হল, নতুন একটা কিছু ধরো না?

সারা সকাল ও দুপুর বসিয়া হরিহর একমনে জড়ভরতের উপাখ্যানকে কথকতার পালার আকারে লিখিয়া শেষ করে। মনে পড়ে এই কাশীতেই বসিয়া আজ বাইশ বৎসর পূর্বে যখন সে গীতগোবিন্দের পদ্যানুবাদ করে, তখন তাহার বয়স ছিল চব্বিশ বৎসর। দেশে গিয়া জীবনের উদ্দেশ্য যেন নিজের কাছে আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কাশীতে এত ছিল না—দেশে ফিরিয়া চারিধারে দাশুরায়ের গান, দেওয়ানজীর গান, গোবিন্দ অধিকারীর শুকসারীর দ্বন্দ্ব, লোকা ধোপার দলের মতি জুড়ির গানের বিস্তৃত প্রচলন ও পসার তাহার মনে একটা নতুন ধরনের প্রভাব বিস্তার করিল।

রাত্রে স্ত্রীর কাছে গল্প করিত—বাজারের বারোয়ারিতে কবির গান হচ্ছে বুঝলে? বসে বসে শুনলাম, বুঝলে?...সোজা পদ সব...কিছুই না, রও না, সংসারটা একটু গুছিয়ে নিয়ে বসি ভালো হয়ে—নতুন ধরনের পালা বাঁধবো—এরা সকলে গায় সেই মান্ধাতার আমলের পদ—রাজুকে তাই কাল বল্‌ছিলাম।

অনেক রাত্রে উঠিয়া এক-একদিন হরিহর বাহিরে দাওয়ায় বসিয়া কি ভাবিত, অনির্দিষ্ট কোন আনন্দে তাহার মন যেন পালকের মতো হালকা হইয়া উঠিত।

কি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাহার সম্মুখে।...

ঝাড়লণ্ঠনের আলো-দোলানো বড় আসরে সে দেখিতে পায়, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে তাহার ছড়া, গান, শ্যামাসংগীত, পদ রাত্রির পর রাত্রি ধরিয়া গাওনা হইতেছে। কত দূর-দূরান্তর হইতে মাঠ ঘাট ভাঙিয়া লোক খাবারের পুঁটুলি বাঁধিয়া আনিয়া বসিয়া আছে শুনিতে। দলের অধিকারীরা তাহার বাড়ি আসিয়া সাধিয়া পালা চাহিয়া লইয়া গিয়াছে।

বাঃ! ভারি চমৎকার তো। কার বাঁধা ছড়া?—"কবির গুরু ঠাকুর হরু—" হরু ঠাকুরের?—না। নিশ্চিন্দিপুরের হরিহর রায় মহাশয়ের।

এই দশাশ্বমেধ ঘাটেই বসিয়া তো বাইশ বৎসর পূর্বে মনে মনে কত ভাঙাগড়া করিয়াছে—তারপর কবে সে সব ধীরে ধীরে ভুলিয়া গেল—কবে ধীরে ধীরে নতুন খাতাপত্রের তাড়া বাক্সের অনাদৃত, গুপ্ত কোণ আশ্রয় করিয়া দিনের আলো হইতে মুখ লুকাইয়া রহিল—যৌবনের স্বপ্নজাল জীবন-মধ্যাহ্নে কুয়াশার মতো দিগন্তে মিলাইয়া গেল।

হারানো যৌবনের দিকে চাহিয়া দেখিলে বুকের মধ্যে কেমন করিয়া ওঠে, কত কথা মনে পড়ে—জীবনের সে সব দিনকে আর একটিবারও ফেরানো যায় না?

দশাশ্বমেধ ঘাটে অনেক ছেলের সঙ্গে অপুর ভাব হইয়াছে। কিন্তু এখানে তাহার বয়সি সব ছেলেই স্কুলে পড়ে, সে-ই কেবল এখনও স্কুলে পড়ে নাই। নিশ্চিন্দিপুরে মাছ ধরিয়া ও নৌকায় বেড়াইয়া দিন কাটানো চলিত বটে, কিন্তু এখানে সমবয়সিদের কাছে কিছু পড়ে না বলিতে লজ্জা করে।

তাহা ছাড়া দশাশ্বমেধ ঘাটে যেসব ছেলের সঙ্গে আহার ভাব হইয়াছে, সবাই অবস্থাপন্ন ঘরের চলে। পল্টুর দাদা একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিল যে তাহার বাবাকে খুব বিদেশে বেড়াইতে হয়। অপু বলিয়াছিল—কেন, তোমাদের বুঝি খুব শিষ্য-বাড়ি আছে?

পল্টুর দাদা আশ্চর্য হইয়া বলিল—শিষ্য-বাড়ি? কিসের ভাই?...

অপু সদুত্তর দিবার পূর্বেই সে বলিল—আমার বাবা কন্ট্রাক্টরি করেন কি না? তা ছাড়া কাঁথিতে ছোট জমিদারি আছে—তবে আজকাল কিস্তি দিয়ে কী-ই বা থাকে?

এক-একদিন বৈকালে অপু দশাশ্বমেধ ঘাটে বেড়াইতে গিয়া বাবার মুখে পুরাণপাঠ শোনে। হরিণশিশু শ্বাপদ কর্তৃক নিহত হইলে হরিণ-বালকের স্নেহাসক্ত রাজর্ষি ভরতের করুণ বিরহবেদনা ও পরিশেষে তাঁহার মৃত্যুর কাহিনী ষষ্ঠী মন্দিরে পৈঠার উপর বসিয়া একমনে শুনিতে শুনিতে তাহার চোখে জল আসে—এদিকে আবার যখন সিন্ধু সৌবীরের রাজা রহূগণ তাঁহার স্বরূপ না জানিয়া ব্রহ্মর্ষি ভরতকে শিবিকাবাহক নিযুক্ত করেন—তখন হইতে কৌতূহলে ও উৎকণ্ঠায় তাহার বুক দুরু দুরু করে, মনে হয় এইবার একটা কিছু ঘটিবে; ঠিক ঘটিবে। কথকতার শেষে পূরবী সুরের আশীর্বচনটি তাহার ভারি ভালো লাগে—

কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী
লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ...

সন্ধ্যার দিকে মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনির সঙ্গে অস্তসূর্যের রাঙা আভা ও পূরবীর মূর্ছনার সঙ্গে হরিণ-বালকের বিয়োগবেদনাতুর রাজর্ষির ব্যথা যেন মিশাইয়া থাকে।

বাড়িতে কাগজ কলম বাবার কাছে লইয়া গিয়া বলে—আমায় লিখে দাও না বাবা, ওই যে তুমি গাও—কালে বর্ষতু পর্জন্যং?

হরিহর খুশি হইয়া বলে—তুই বুঝি শুনসি্ খোকা?

—আমি তো রোজই থাকি—তুমি কাল যখন ভারতের মা মারা যাওয়ার কথা বলছিলে আমি তখন তো তোমার পিছন দিকে বসে—ষষ্ঠীর মন্দিবের ধাপে—

—তোর কি রকম লাগে—ভালো লাগে?

—খু-উ-উ-ব। আমি তো রোজ রোজ শুনি—

অপু কিন্তু একটা কথা লুকায়। যেদিন তাহার সঙ্গীরা থাকে, সেদিন কিন্তু বাবার দিকে সে যায় না। সেদিন বাবার নিকট দিয়া যাইতেছিল, তাহার বাবা দেখিতে পাইয়া ডাকিল—খোকা, ও খোকা—

তাহার সঙ্গের বন্ধুটি বলিল—তোমাকে চেনে নাকি?

অপু শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানায়, হাঁ। সে বাবার কাছে আসে নাই সেদিন। তাহার বাবা ঘাটে কথকতা করিতেছে, একথা বন্ধুরা পাছে টের পায়! সে পল্টুর দাদা ছাড়া অন্য বন্ধুদের কাছে গল্প করিয়াছে, কাশীতে তাহাদের বাড়ি আছে, তাহারা কাশীতে হাওয়া বদলাইতে আসিয়াছে, দেশে খুব বড় বাড়ি, তাহার বাবা কন্ট্রাক্টরি করেন, তা ছাড়া দেশে জমিদারিও আছে। শেষে বলে—কিন্তু জমিদারি থাকলে কি হবে, কিস্তি দিয়ে কীইবা থাকে?

তাহার বন্ধুদের বয়স তাহার অপেক্ষা খুব বেশি নয় বলিয়াই বোধ হয় তাহার বর্ণিত গল্পের সঙ্গে তাহার পোশাক-পরিচ্ছদের অসঙ্গতি ধরা পড়ে না, বিশেষত তাহার সুন্দব মুখের গুণে সব মানাইয়া যায়।

পূর্ণিমার দিন কথক ঠাকুরেব ওখানে বেশ ভিড় হইল। সন্ধ্যার পব হরিহর কথা শেষ করিযা ঘাটের রানায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, কথক ঠাকুর জলে হাত মুখ ধুইতে নামিল। হরিহরকে দেখিয়া বলিল—এই যে আপনিও আছেন, দেখলেন তো কাণ্ড, পুন্নিমের দিনটা—বলি আজ দিনটা ভালো আছে, বামন-ভিক্ষে লাগাই—মাসে মাসে এই কাশীতে বামন-ভিক্ষা হলে পরে পনেরো সের আধমণ করে চাল পড়তো—আজকাল মশাই মহা বামন-ভিক্ষেতেও লোকে আর ভেজে না—চালের তো একটা দানাও না—এদিকে সিকে পাঁচেক হবে, তাব মধ্যে আবার দুটো অচল দোয়ানি!..মশায়ের শিক্ষা কোথায়?

—শিক্ষা তো ছিল এ কাশীতেই অনেকদিন আগে। তবে এত দিন দেশেই ছিলাম—এইবার এখানে এসে বাসা করে আছি...

—মশায়ের বাসা কি নিকটে?...একটু চা খাওয়াতে পারেন?...কদিন থেকে ভাবচি একটু চা খাবো—এই দেখুন না, চাদরের মুড়োয় চা বেঁধে নিয়ে নিয়ে ঘুরি, বলি না হয় কোনো হালুইকরের দোকানে একটু গরম জল করিগে...গলা বসে গিয়েচে, একটু লোন্-চা খেলে গলাটা...

—হাঁ হাঁ, আসুন না এই তো নিকটেই আমার বাসা—চলুন না? কথককে লইয়া হরিহর বাড়ি আসিল।

চা খাওয়ার পাট কোন কালে নাই। কড়ায় জল গরম করিয়া চা তৈরি হইল। অপু কাঁসার গ্লাসে চা ও রেকাবিতে কিছু খাবার কথকের সামনে লইয়া আসিল। খাবার দেখিয়া কথকঠাকুর ভারি খুশি হইল—খাবারের আশা সে করে নাই।

—এটি ছেলে বুঝি! বাঃ বেশ ছেলে তো আপনার? ভারি সুন্দর দেখতে—বাঃ—এসো এসো বাবা, থাক থাক্ কল্যাণ হোক—লোন্-চা করিয়েছেন তো মশায়?...দেখি—

হরিহর বলিল—আপনার কি ছেলেপিলে সব এখানেই—

—সংসারই নেই তো ছেলেপিলে?...দশ বিঘে জমিও বেরিয়ে গেল অথচ ও মূলেও হাভাত—জমি ক'বিঘে যদি আজ থাকতো—তো আজ কি এই এতদূরে আসি—আপনিও যেমন!...এসব কি আর দেশ মশাই?...বিশ্বেশ্বর অবিশ্যি মাথায় থাকুন—এমন শীতকাল যাচ্চে মশাই—না একটু খেজুর রস, না একটু গুড় পাটালি—আমার নিজের মশাই দু'কুড়ি খেজুর গাছ—

—মশাইয়ের দেশটা কোথায়?

—সাতক্ষীরের সন্নিকট—বাদুড়ে-শীতলকাটি জানেন? শীতলকাঠির চক্কত্তিরা খুব ঘবানা—

হরিহর তামাক সাজিয়া নিজে কয়েক টান দিয়া কথক ঠাকুরের হাতে দিয়া বলিল—খান—

—কিছু না মশায়, ফাগুন মাসের দিকে তো যাই—একটা বাগান আছে, দিয়ে আসি বিক্রি করে—আমরা আবার শ্রোত্রিয় কিনা?.. তা জমি দশ বিঘে ছিল তাই বন্ধক দিয়ে পণ জোগাড় করলাম—বিয়েও করলাম—মশাই দশ বছর ঘর করলাম—হল কি জানেন? সন্ধ্যাবেলা রান্নাঘরের চাল থেকে কুমড়ো কাটতে গিয়েচে—ছিল মশাই সেখানে সাপ আমার জন্যে তৈরি হয়ে—হাতে দিয়েচে কামড়ে—আমি আবার নেই সেদিন বাড়ি—কেইবা বদ্যি কবরেজ দেখিয়েচে, কেই বা করেচে—পাটুলির ঘাট পার হচ্চি--গাঁয়ের মহেশ সাধুখাঁ ওপার থেকে আসচে, আমায় বল্লে—শিগ্‌গির বাড়ি যান মশায়—আপনার বাড়ি বড় বিপদ—কি বিপদ তা বলে না—বাড়ি পৌঁছে দেখি আগের রাত্রিতেই বৌ তো গিয়েচে মরে!—এই গেল ব্যাপার মশাই...জমিকে জমিও গেল—এদিকেও—। সেই থেকে বলি যাই, দেশে থেকে আর কী-ই বা হবে—কোত্থেকে পাবো তিন-চারশ টাকা যে আবার ঘিয়ে করবো?...যাই বিশ্বনাথের ওখানে...অন্নকষ্টটা তো হবে না...আজ বছর আষ্টেক হয়ে গেল—এক খুড়তুতো ভাই আছে—জমিজমা সামান্য যা একটু আছে, দখল করে বসে আছে—বলে তোমার ভাগ নেই—বেশ বাপু, নেই তো নেই—গোলমালের মধ্যে কখ্‌খনো আমি যাবো না—করগে যা দখল। উঠি মশাই—আপনাব এখানে বেশ চা খাওয়া গেল—আপনার ছেলেটি কোথায় গেল? . বেশ ছেলে, খাসা ছেলে—

পুরানো চামড়ায় তালি দেওয়া ক্যাম্বিসের জুতা জোড়াটা ঝাড়িয়া লইয়া কথকঠাকুর পায়ে দিয়া দবজার কাছে আসিল—যাইতে যাইতে বলিল—কালও লাগাবো বামনভিক্ষে—দেখি কি হয়—

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হরিহরের বাসাটা বিশেষ ভালো নয়। নিচের তলায় স্যাঁৎসেঁতে ঘর, তাও মাত্র দুখানি, এত অন্ধকার যে হঠাৎ বাহির হইতে আসিলে ঘরের কোনো জিনিস নজরে পড়ে না। এরকম স্থানে সর্বজয়া কখনও বাস করে নাই, তাহাদের দেশের বাড়ি পুরানো হইলেও রৌদ্রহাওয়া খেলিবার বড় বড় দরজা জানালা ছিল, সেকালের উঁচু ভিতের কোঠা, খট্ খট্ করিত, শুক্‌না। এ বাসার স্যাঁৎসেঁতে মেজে ও অন্ধকারে সর্বজয়ার মাথা ধরে। অপু তো মোটেই ঘরে থাকে না, সূর্যালোকপুষ্ট নবীন তরুর ন্যায় শুধু আলোর দিকে তার মুখটি থাকে ফিরানো, নিশ্চিন্দিপুরের মুক্ত মাঠে, নদীর আলো হাওয়ায় মানুষ হইয়া এই বদ্ধঘরের অন্ধকারে তার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে, একদণ্ডও সে সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না।

কাশী দেখিয়া সে একটু নিরাশ হইয়াছে। বড় বড় বাড়িঘর থাকিলে কি হইবে, এখানে বন নাই মোটেই।

সন্ধ্যার দিকে একদিন কথকঠাকুর হরিহরের বাসায় আসিল। একথা ওকথার পর বলিল—কই আপনার ছেলেকে দেখচি নে?

হরিহর বলিল—কোথায় বেরিয়েচে খেলা করতে, দশাশ্বমেঘ ঘাটের দিকেই বোধ হয় বেরিয়েচে—

কথকঠাকুর উড়ানির প্রান্তে কি দ্রব্য খুলিতে খুলিতে বলিল—আপনার ছেলের সঙ্গে বড় ভাব হয়ে গিয়েচে মশাই—সেদিন ঘাটে কাছে ডেকে বসিয়ে অনেকক্ষণ ওর সঙ্গে কথা কইলাম—কড়ি খেলতে ভালোবাসে তাই এই দুটো বড় বড় সমুদ্রের কড়ি সেদিন ব্রতের সিধে কারা দিইছিল, ভাবলাম ওকে দিয়ে আসি—রেখে দিন আপনি, ও এলে দেবেন—

অগ্রহায়ণ মাসের শেষে অপু বাবাকে ধরিল সে স্কুলে ভর্তি হইবে। বলিল—সবাই পড়ে ইস্কুলে বাবা, আমিও পড়বো—ওই তো গলির মোড় ছাড়িয়ে একটুখানি গিয়েই ভালো ইস্কুল—

হরিহর ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিল। যদিও ছাত্রবৃত্তি স্কুল তবে ইংরাজি পড়াও হয়। প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালা ছাড়িয়া দেওয়ার পরে—সে প্রায় চার পাঁচ বছর হইয়া গিয়াছে—এই তাহার পুনরায় অন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি কথকঠাকুর এক টুকরা বালির কাগজ হাতে একদিন হরিহরের বাসায় আসিয়া হাজির। কাগজের টুকরা দেখাইয়া বলিল—দেখুন তো মশাই পড়ে, এই রকম যদি লিখি তবে হয়?

হরিহর পড়িয়া দেখিল, কাশীবাসী রামগোপাল চক্রবর্তী নামে কোনো লোক কথকঠাকুরের নামে স্বগ্রামের দশবিঘা জমি দানপত্র লিখিয়া দিতেছে, অমুক অমুক সাক্ষী, স্থান দশাশ্বমেধ ঘাট, অমুক তারিখ। কথকঠাকুর বলিল—ব্যাপারটা কি জানেন! আমাদের দেশে কুমুরে গ্রামের রামগোপাল চক্কত্তি ভারি পণ্ডিত ছিলেন, মরবার বছর খানেক আগে আমাকে বল্লেন—রামধন, তোমার তো কিচ্ছু নেই, ভাব্‌চি তোমাকে বিঘে দশেক জমি দান করব—তুমি নেবে কি? তা ভাব্‌লাম সদ্‌ব্রাহ্মণ, দিতে চাচ্ছেন, দোষই বা কি? তারপর তিনি মুখে মুখে জমিটা আমায় দিয়ে দিলেন। দিলেন দিলেন—এতকাল তত গা করিনি, কাশীতেই থাকবো, দেশে ঘরে থাকবো না, কি হবে জমি? তারপর চক্কত্তি মশায় গেলেন মারা। জমির দানটা মুখে মুখেই রয়ে গেল। এতকাল পরে ভাবচি দেশে যাবো—ছেলেপিলে না হলে কি আর মানুষ মশাই? আপনাকে বলতে কি, শ'তিনেক টাকা হাতে করেচি—করেচি জলাহার করে মশাই—আর শ'দুই টাকা পেলে শ্রোত্রিয় ঘরের মেয়ে পাওয়া যায়—তা যদি তাই ঘটে, তবে জমিটা দরকার হবে তো? ভাবলুম মুখে মুখে দান, সে কি আর চক্কত্তি মশাই-এর ছেলেরা মানবে? ভেবে চিন্তে এই কাগজখানা বসে বসে লিখিচি—নিজেই লিখিচি মশাই, সইটই সব—দুজন সাক্ষী, সব বানানো—দেখি লেখা কাগজ যদি মানে। গিয়ে বলবো এই দ্যাখো তোমার বাবা এই জমিটা দান করেচেন—

উঠিবার সময় কথকঠাকুর বলিল—ভালো কথা মশাই, মঙ্গলবারে মাঘী-পূর্ণিমার দিন আপনার ছেলেকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো ওই টেওটার রাজার ঠাকুরের বাড়িতে, ঠিক মানমন্দিরের গায়েই একেবারে। সন্ধের পর বছর বছর ব্রাহ্মণভোজন করায় কি না। একটু সগর্বে বলিল—আমায় একখানা করে নেমন্তন্ন পত্তর দ্যায়, বেশ ভালো খাওয়ায়, চমৎকার। আমি এসে নিয়ে যাবো সেদিন কিন্তু।

মাঘী-পূর্ণিমার দিন শেষরাত্রি হইতে পথে স্নানার্থীদের ভিড় দেখিয়া সর্বজয়া অবাক হইয়া গেল। দলে দলে মেয়ে পুরুষে "জয় বিশ্বনাথজী কি জয়", "বোলো বোম্‌", "বোলো বোম্‌" বলিতে বলিতে দুরন্ত মাঘের শীতকে উপেক্ষা করিয়া স্নানের জন্য চলিয়াছে। একটু বেলা হইলে পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সর্বজয়াও স্নান করিতে গেল—গঙ্গার ঘাটের জল, সিঁড়ি, মন্দির, পথ সব উৎসববেশে সজ্জিত নরনারীতে পূর্ণ। জলে নামা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ষষ্ঠীর মন্দিরে লাল নিশান উড়িতেছে।

সন্ধ্যার আগে কথকঠাকুর অপুকে লইতে আসিল। সর্বজয়া বলিল—পাঠিয়ে দাও গিয়ে, কেউ নেই, অপুর ওপর একটা দম হয়েচে, দশাশ্বমেধ ঘাটে ওকে ডেকে কাছে বসিয়ে গল্প করে, একদিন নাকি পেঁপে কিনে খাইয়েচে—পাঠিয়ে দাও, লোক ভালো—

অপু প্রথমে কথকঠাকুরের সঙ্গে তাহার বাসায় গেল। খোলার ঘর, মাটির দেওয়ালের নানাস্থানে খড়ি দিয়া হিসাব লেখা। নমুনা :—

সিয়ারসোলের রানীর বাড়ি ভাগবত পাঠ ...৪৲

মুসম্মত কুন্তার ঠাকুর বাড়ি... ওই ... ... ২৲

ধারক লালজী দোবের একদিনের খোরাকি... ৪।০

বিশেষ কিছু আসবাবপত্র নাই। একখানা সরু চৌকি পাতা, একটা ছোট টিনের তোরঙ্গ, একটা দড়ি-টাঙানো আল্‌না, একজোড়া খড়ম। দেওয়ালের গায়ে পেরেকে একটা বড় পদ্মবীজের মালা টাঙানো।

কথকঠাকুর বলিল—কমলালেবু খাবে?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আছে আপনার?

কি জানি কেন এই কথকঠাকুরের কাছে তাহার কোনোপ্রকার লজ্জা কি সংকোচ বোধ হইতেছিল না। লেবুর খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল—"কালে বর্ষতু পর্জন্যং" জানেন আপনি?

—কালে বর্ষতু পর্জন্যং? খুব জানি, রোজ বলি তো, একদিন শুনো না—

—এখন বলুন না একটিবার?

কথক সুর করিয়া বলিল বটে কিন্তু অপুর মনে হইল তাহার বাবার মুখে শুনিলে আরও ভালো লাগে, কথকের গলা বড় মোটা।

দেশে লইয়া যাইবার জন্য কথকঠাকুর নানা খুচ্‌রা মাটির ও পাথরের জিনিস—পুতুল, খেলনা, শিবলিঙ্গ মালা, কাঠের কাঁকই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। অপুকে দেখাইয়া বলিল—কাশীর জিনিস, সবাই বল্‌বে কি এনেচ দেখি! তাই নিয়ে যাবো—

নানা সরু গলি পার হইয়া একটা অন্ধকার বাড়ির দরজার সামনে আসিয়া কথকঠাকুর দাঁড়াইল। নিচু দরজা দিয়া অতি কষ্টে কথকের সঙ্গে ঢুকিয়া অপুর মনে হইল বাড়িটায় কেহ কোথাও নাই, সব নিঝুম। কথকঠাকুর দু'একবার গলায় কাশির শব্দ করিতে কে একজন দালানের চারপাই হইতে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া মোটা গলায় হিন্দিতে কি জিজ্ঞাসা করিল, অপু তাহা বুঝিতে পারিল না। কথকঠাকুর পরিচয় দিবার পরেও মনে হইল লোকটা তাহাকে চিনেও না বা তাহাদের আগমন প্রত্যাশাও করে নাই। পরে লোকটা যেন একটু বিরক্তির সহিত কাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে গেল। কিন্তু ফিরিতে এত দেরি করিতে লাগিল যে, অপুর মনে হইল হয়তো ইহারা বলিবে তোমাদের তো নিমন্ত্রণ হয় নাই, যাও তোমরা। যাহাই হউক, অন্ধকারে ঠায় পনেরো মিনিট দাঁড়াইবার পরে লোকটা ফিরিয়া আসিয়া দালানের একস্থানে আধ-অন্ধকারে খানকতক শালপাতা পাতিয়া ইহাদের বসাইয়া দিল। একটা মোটা পিতলের লোটায় জল দিয়া গিয়াছে। কথকঠাকুর যেন ভয়ে ভয়ে গিয়া আসনের উপর বসিল। রাজার বাড়ি, কি না জানি খাওয়ায়? অধীর আগ্রহে অপু প্রায় আরও বিশ মিনিট পাতা পাতিয়া বসিয়া রহিল—কাহারও দেখা নাই। নিমন্ত্রণ খাইতে পাইবার নিশ্চয়তার সম্বন্ধে যখন পুনরায় অপুর মনে সন্দেহ দেখা দিতেছে ঠিক সেই সময় পরিবেষ্টার আবির্ভাবরূপ অঘটন ঘটিল। মোটা মোটা আটার পুরী ও স্বাদ-গন্ধহীন বেগুনের ঘণ্ট—শেষে খুব বড় বড় লাড্ডু। অপু কামড়াইতে গিয়া লাড্ডুতে দাঁত বসাইতে পারিল না, এত কঠিন। কথকঠাকুর চাহিয়া চাহিয়া সেই মোটা পুরী খান

* ৪৲ টাকা = ৪ টাকা, ২৲ = ২ টাকা। ।০ = ৪ আনা, এখনকার ২৫ পয়সার সমতুল্য।

দশ-বারো আগ্রহের সহিত খাইল। মাঝে মাঝে অপুর দিকে চাহিয়া বলিতেছিল—পেট ভরে খাও, লজ্জা কোরো না, বেশ খাওয়ায়—বেশ লাড্ডু না? দাঁতে এখনও খুব জোর আছে, বেশ চিবুতে পারি।

একশত বৎসর একসঙ্গে থাকিলেও কেহ হয়তো আমার হৃদয়ের বাহিরে থাকিয়া যায় যদি না কোনো বিশেষ ঘটনায় সে আমার হৃদয়ের কবাট খুলিতে পারে। আজকার এই নিমন্ত্রণ খাইতে আসার অনাদর, অবজ্ঞা, অপু বালক হইলেও বুঝিযাছিল। তাহার পরও এই খাইবার লোভে ও আনন্দে অপুর অন্তরতম হৃদয়ে ঘা লাগিল। তাহার মনে হইল এ কথকঠাকুর অতি অভাজন। ভাবিল, কথকঠাকুর কখনও কিছু খেতে পায় না, আহা, এই লাড্ডু তাই অমন করে খাচ্ছে—ওকে একদিন মাকে বলে বাসাতে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবো—

করুণা ভালোবাসার সব চেয়ে মূল্যবান মশলা, তার গাঁথুনি বড় পাকা হয়। তাহার শৈশব মনে এই বিদেশী, দুদিনের পরিচিত, বাঙাল কথকঠাকুর তাহার দিদি ও গুলকীর সঙ্গে এক হারে গাঁথা হইয়া গেল সুদ্ধ এক লাড্ডু খাইবার অধীর লোভের ভঙ্গিতে।

ইহার অল্পদিন পরেই কথকঠাকুর দেশে চলিয়া গেল। রাজঘাটের স্টেশনে কথকঠাকুরের নির্বন্ধাতিশয্যে হরিহর অপুকে সঙ্গে করিয়া তাহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেল। হরিহরের মনে হইল আজ বাইশ বৎসর পূর্বে সে যাহা করিতে দেশে গিয়াছিল—এ ব্যক্তি তাহার বর্তমান বয়সের চেয়েও অন্তত আট বৎসর বেশি বয়সে তাহাই করিতে অর্থাৎ নূতন করিয়া সংসার পাতিতে দেশে চলিয়াছে। সুতরাং তাহারই বা বয়সটা এমন কি হইয়াছে? কোন্ কাজ করিবার সময়ের অভাব হইতে পারে তাহার?

গাড়ি ছাড়িলে অপুর চোখে জল আসিল। বালকের প্রাণে সময়ে সময়ে বয়স্ক লোকের উপর স্থায়ী সত্যিকার স্নেহ আসে। দুর্লভ বলিয়াই তাহা বড় মূল্যবান।

মাঘ মাসের শেষের দিকে একদিন হরিহর হঠাৎ বাড়ি ঢুকিযাই উঠানের ধারে বসিয়া পড়িল। সর্বজয়া কি করিতেছিল, কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া বলিল—কি হয়েচে, এমন করে বসে পড়লে যে? স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কিন্তু মুখের কথাটা তাহার মুখেই রহিয়া গেল। হরিহরের চোখ দুটা জবাফুলের মতো লাল, ডান হাতখানা যেন কাঁপিতেছে। সর্বজয়া হাত ধরিয়া তুলিতে আসিতে সে ঘোর-ঘোর আচ্ছন্নভাবে বলিল—খোকা কোথায় গেল? খোকা?

সর্বজয়া গায়ে হাত দিয়া দেখিল জ্বরে তাহার গা পুড়িয়া যাইতেছে। সন্তর্পণে হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া বলিল—অপু আস্‌চে, তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েচে ওপরের ওই নন্দবাবু, বোধ হয় গোধুলিয়ার মোড়ে তার দোকানে নিয়ে গিয়েচে—

অপু দোকানে যায় নাই, নন্দবাবুর ঘরের সামনে ছাদে বসিয়া বসিয়া বই পড়িতেছিল। মাসখানেক হইল নন্দবাবুর সঙ্গে অপুর খুব আলাপ জমিয়াছে। নন্দবাবুর বয়স কত তাহা ঠিক করিয়া বুঝিবার ক্ষমতা তাহার হয় নাই, তবে তাহার বাবার চেয়ে ছোট মনে হয়। নন্দবাবুর উপরের ঘরে সে অনেকগুলি বই আবিষ্কার করিয়াছে—নন্দবাবু যখন ঘরে থাকে তখন বই লইয়া ছাদে বসিয়া পড়ে। কিন্তু ভয় হয় পাছে নন্দবাবু পড়িতে না দিয়া বই কাড়িয়া লয়, কারণ একদিন সেরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ছাদের এক কোণে রৌদ্রে বসিয়া অপু বই পড়িতেছিল, নন্দবাবু ঘরের ভিতর কি খুঁজিতে খুঁজিতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া ধমক দিয়া বলিল—আরে রেখে দাও, তোমার বসে বসে যত ওই সব বই পড়া, কোথাকার জিনিস কোথায় রাখো তার ঠিক নেই, কাজের সময় খুঁজে মেলে না—যাও, রাখো বই, যাও—

সে তো ঘরের অন্য কোনো জিনিসে হাত দেয় না, তবে তাহাকে বকিবার কারণ কি? সেই হইতে সে ভয়ে ভয়ে বই লইয়া থাকে।

নন্দবাবু সন্ধ্যার সময় টেরি কাটিয়া ভালো জামা কাপড় পরিয়া শিশি হইতে কি গন্ধ মাখিয়া রোজ বেড়াইতে যায়। অপুর গায়ে একদিন একটু শিশি হইতে ছড়াইয়া দিয়াছিল, বেশ ভুরভুরে গন্ধটা।

সন্ধ্যার পরও সে আগে আগে নন্দবাবুর ঘরে পড়িতে যাইত। কিন্তু সন্ধ্যার পরে নন্দবাবু আলমারি হইতে একটা বোতল লইয়া লাল-মতো একটা ঔষধ খায়। সে সময়ে সে একদিন ঘরে গিয়া পড়িলে তাহাকে ভারী বকিয়াছিল। নন্দবাবুদের ঘরে উঠিবার সিঁড়ি অন্যদিকে—আর একদিন রাত্রে হঠাৎ ওপরের ঘরে গিয়া সে দেখিয়াছিল একটি কে স্ত্রীলোক ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া নন্দবাবু বলিয়াছিল—এখন যাও অপূর্ব, ইনি আমার শালী—দেখতে এসেচেন, এখুনি চলে যাবেন। ফিরিয়া আসিতে আসিতে সে শুনিয়াছিল নন্দবাবু বলিতেছে—ও আমাদের নিচের ভাড়াটের ছেলে—কিছু বোঝে-সোঝে না।

নন্দবাবু তাহাকে প্রায়ই তাহার মার কথা জিজ্ঞাসা করে। বলে—তোমার মাকে বলে পান নিয়ে এসো দিকি? আমার চাকরটা পান সাজতে জানে না—

অপু মায়ের কাছে আবদার করিয়া ওপরে প্রায়ই পান আনে। নন্দবাবু মাঝে মাঝে বলে—তোমার মা আমার কথা কিছু বলেন-টলেন নাকি—না?—

অপু বাড়ি আসিয়া মাকে বলে—নন্দবাবু বেশ লোক মা—তোমার কথা রোজ জিজ্ঞেস্ করে—

—আমার কথা? আমার কথা কি জিজ্ঞেস করে—

—বলছিল তোমার মাকে বোলো, আমি তাঁর কথা জিজ্ঞেস করি-টরি—বেশ লোক—

—করুক গে—তুই পাজি ছেলে অত ওপরের ঘরে যাস্-টাস্ কেন? বিকেলে ওপরে বসে বসে কি করিস?

হরিহরের জ্বরটা একটু কমিল। অপু স্কুল হইতে আসিয়া বই নামাইয়া রাখিতেছে। পায়ের শব্দ পাইয়া হরিহর বলিল—খোকা এসো, একটু বসো বাবা—

অপু বসিয়া বসিয়া স্কুলের গল্প করিতে লাগিল। হাসিমুখে নিচু সুরে বলিল—এই দুমাস তো স্কুলে গিইচি, এরই মধ্যে বাবা, স্কুলের সবাই খুব ভালোবাসে, রোজ রোজ ফার্স্ট বসি—স্কুলে আমাদের ক্লাসে একখানা কাগজ ছাপিয়ে বার করবে এক মাস অন্তর। আমাকে সেই দলে নিয়েচে—তোমায় দেখাবো বাবা বেরুলে—

হরিহরের বুকের ভিতরটা মমতায় বেদনায় কেমন করে। অপু একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলে—একটা লেখা লিখেচি—কাগজখানা ছাপাবে বলেচে, আমার নামে—কিন্তু যারা দু'টাকা করে চাঁদা দেবে শুধু তাদেরই লেখা ছাপবে বলেচে—দু'টাকা দেবে বাবা?

হরিহর অধীর আগ্রহে ছেলের হাত হইতে কাগজখানা লইয়া পড়িতে শুরু করে। ছেলে যে লেখে, সে খবর সে জানিত না। রাজপুত্রের মৃগয়ার গল্প সুন্দর বানানো, হরিহর খুশি হইয়া বালিশে ভর দিয়া উঠিয়া বসে, বলে—তুই লিখিচিস্ খোকা?

—আমি তো আরও কত লিখিচি বাবা, ভূতের গল্প, রাজকন্যের—বাড়ি থাক্‌তে রানুদির খাতায় লিখে লিখে দিতাম তো—

সর্বজয়া টাকার নাম শুনিয়া দিতে চাহে না। স্বামী অসুখে পড়িয়া এ অবস্থায় যাহা আছে তাহা সংসারের খরচেই কুলাইবে না, দরকার নাই ছাপানো কাগজে। হরিহর বুঝাইয়া বলিয়া টাকা দেওয়ায়, বলে—দাও গিয়ে, আহা খোকার লেখাটা ছাপিয়ে আসুক, সেরে উঠে পথ্যি করলেই ঠাকুর-বাড়ির ভাগবত পাঠটা তো ঠিকই রয়েচে—ওতেও তো গোটা দশেক টাকা পাবো—

দিন দুই পরে অপু নিরাশ মুখে রাঙা ঠোঁট ফুলাইয়া বাবার কাছে চুপি চুপি আসিয়া বলে—

হলো না বাবা। ছাপাখানাওয়ালার লোকেরা বেশি দাম চেয়েচে, তাই আজ স্কুলে বলে দিয়েচে, চার টাকা করে চাঁদা চাই,—

ছেলের মুখের নিরাশার ভাব হরিহরের বুকে খচ্ করিয়া বিঁধে। খানিকক্ষণ অন্য কথার পর সে বলে—দ্যাখ্ দিকি খোকা তোর মা কোথায় গেল...বালিশের তলা হইতে চাবির থোলো বাহির করিয়া দিয়া বলে—চুপি চুপি ওই কাঠের ছাপ বাক্স, যেটাতে আমার কঞ্চির কলমের বাণ্ডিল আছে, ওইটে খোল্ তো?...কোণে দ্যাখ্ তো ক'টাকা আছে? তাহার পর হরিহর সন্তর্পণে বাক্সখোলা-নিরত পুত্রের দিকে মমতার চোখে চাহিয়া থাকে। অবোধ, অবোধ, নিতান্ত অবোধ!...ওর সুন্দর, শুভ্র চাঁদের মতো ললাটটি ওর মায়ের ললাট, চোখ দুটি ওর মায়ের চোখ। যখন হরিহর প্রথম যৌবনে বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে ঘরে আনে, নববধূ সর্বজয়ার অবিকল সেই মুখের হাসি এগারো বছরের অপুর অনাবিল, নবীন মুখে।

অকারণে হরিহরের বুকের মধ্যে স্নেহসমুদ্র উদ্বেল উত্তাল হইয়া উঠিয়া চোখে জল ভরিয়া আনে।

অপু যেন প্রথম বসন্তের নবকিশলয়, তাহার মুখের আনন্দ যেন প্রভাতের নব-অরুণ আভা, তার ডাগর ডাগর নীলাভ চোখ দুটির চাহনির মধ্যে নিজের অতীত যৌবনদিনের সে অসীম স্বপ্ন, সুনীল পাহাড়ের নবীন শালতরুশ্রেণীর উল্লাস-মর্মর...কূলহারা সমুদ্রের দূরাগত সংগীতধ্বনি।

অপু চুপি চুপি বাবাকে দেখাইয়া বলে—চারটে টাকা আছে বাবা!—হরিহরি সময় অসময়ের জন্য টাকা কয়টি রাখিয়া দিয়াছে নিজের বাক্সে লুকাইয়া, স্ত্রী জানে না, কাজেই সে নিশ্চিন্তমনে বলিতে পারিল—নিয়ে যা খোকা, চাঁদা দিয়ে দিস, কিন্তু তোর মাকে যেন বলিস্‌নে।

অপু খুশির সুরে বলে—ছাপা বেরুলে তোমায় দেখাবো বাবা, আমার নামে ছাপিয়ে দেবে বলেচে—এই সোমবারের পরের সোমবারে বেরুবে—

পরদিন সকাল হইতে হরিহরের অসুখ আবার বাড়িল।

সর্বজয়া ভয় পাইয়া ছেলেকে বলিল—নন্দবাবুকে বলগে যা তো—একবার এসে দেখে যান—

নন্দবাবু দেখিয়া বলিল—একজন ডাক্তার ডাকতে হবে অপূর্ব, তোমার মাকে বলো।

বৈকালে নন্দবাবুই একজন ডাক্তার সঙ্গে করিয়া আনিল। ডাক্তার দেখিয়া শুনিয়া বলিল—ঠাণ্ডা লেগে হয়েচে, ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া—ভালো নার্সিং চাই,—নিচের ঘরে কি এমনি করে থাকে!...খোকা, তুমি একটা শিশি নিয়ে এসো আমায় ডাক্তারখানায়, ওষুধ দেবো—

অপু কয়দিন গিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারি হইতে ঔষধ আনিল।

বিশেষ কোনো ফল দেখা গেল না। দিন দিন হরিহর দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। এদিকে টাকা যে কয়টি ছিল—ভিজিটে ও পথ্যে খরচ হইয়া গেল। ডাক্তার বলিল, অন্তত এক সের করিয়া দুধ ও অন্যান্য ফল মা খাইতে দিলে রোগী দুর্বল হইয়া পড়িবে। সাড়ে তিন টাকা দামের একটা বিলাতী পথ্যের ব্যবস্থাও দিয়া গেল। বিদেশ-বিভুঁই জায়গা। একবার দেখিয়া সাহস দেয় এমন লোক নাই, সর্বজয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিল।

এই বিপদের মধ্যে সর্বজয়া আবার এক নূতন বিপদে পড়িল। উপরের ছাদে দাঁড়াইয়া ঝুঁকিয়া দেখিলে রাঁধিবার ঘর দেখা যায়। ইতিপূর্বেও সে মাঝে মাঝে নন্দবাবুকে ছাদ হইতে তার রান্নাঘরের দিকে উঁকিঝুঁকি মারিতে দেখিয়াছে, সম্প্রতি হরিহরের অসুখ হইবার পর হইতে নন্দবাবু বড় বাড়াইয়া তুলিল। নানা অছিলায় সে দিনে দশবার ঘরের মধ্যে আসে—আগে আগে অপুকে আড়াল করিয়া জিজ্ঞাসা করিত—আজকাল সরাসরিই তাহাকে সম্বোধন করিয়া কথাবার্তা বলে। প্রথমটা সর্বজয়া কিছু মনে করে নাই—বরং বিপদের সময়ে এই অনাত্মীয় লোকটি যথেষ্ট সাহায্য ও দেখাশুনা

করিতেছে ভাবিয়া মনে মনে কৃতজ্ঞই ছিল, কিন্তু ক্রমেই যেন তাহার মনে হইতে লাগিল যে, এই যে বাড়াবাড়ি—ইহা কোথায় যেন বেখাপ ঠেকিতেছে। নন্দবাবু নিজে পান কিনিয়া আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া বলে—চাকরদের হাতে পান সাজা—জীবনটা গেল বৌঠাক্‌রুন—সাজুন দিকি একবার—তাহাতেও সর্বজয়া দোষ ধরে নাই, বরং এই প্রবাসী আত্মীয়স্নেহবঞ্চিত লোকটির উপর মনে মনে একটু করুণাই হইত—কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ক্রমে শোভনতার সীমা ডিঙাইতে চলিল। আজকাল পান আনিয়া বলে—রাখো দিকি বৌঠাক্‌রুন। হাত হইতে সর্বজয়া লইবে—এইরূপই যেন চায়। অপু তো পাগল—অধিকাংশ সময়ই বাটীতে তাহাকে খুঁজিয়া মেলে না—ওঘরে হরিহর অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে—আর ঠিক সেই সময়টিতেই নন্দবাবু ঘরে আসিবে রোগী দেখিতে!...ছলছুতায় একথা-ওকথায় আধঘণ্টা না কাটাইয়া সে ঘর হইতে যায় না। বলে—কোনো ভয় নেই বৌঠাক্‌রুন—আমি আছি ওপরে—অপূর্ব থাকে না থাকে—ওই সিঁড়িটার ওপর গিয়ে ডেকো না! বিপদের সময় অত বাছতে গেলে...একটু চুন দাও তো! বোঁটা নেই?..আহা আঙুলেব মাথাতে করেই একটু দাও না অম্‌নি—

হরিহরের জ্ঞান হইলেই ছেলের জন্য অস্থির হইয়া উঠে। এদিকে ওদিকে চাহিয়া ক্ষীণসুরে বলে—খোকা কই! খোকা কই!...সর্বজয়া বলে—আসচে, তাই কি হতচ্ছাড়া ছেলে একটু কাছে বস্‌বে...বেরিয়েচে বুঝি সেই ঘাটে। ছেলে বাড়ি এলে বলে—বসতে পারিসনে একটু কাছে। খোকা খোকা করে পাগল—খোকার তো ভেবে ঘুম নেই—যা বস্‌গে যা, গায়ে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিতে নেই বুঝি? ছেলে হয়ে স্বগ্‌গে ঘণ্টা দেবেন কি না?

অপু অপ্রতিভ মুখে বাবার শিয়রের পাশে বসে। কিন্তু খানিক বসিয়াই মনে ভাবে—ওঃ! কতক্ষণ বসে থাকবো—বেশ তো? আমার বুঝি একটু বেড়াতে কি খেলা করতে নেই। কন্‌কনে ঠাণ্ডায় পা অবশ হইয়া আসে। তাহার মন ছট্‌ফট করে—একদৌড়ে একেবারে সেই দশাশ্বমেধ ঘাট। জলের রানা, নির্মল মুক্ত হাওয়া, সুবেশ নবনারীর ভিড়। পল্টু. সুবীর...গুলু...পটল—পল্টুব দাদা। রামনগরের রাজার সেই ময়ূরপঙ্খীটায় আজ আবার বাচ, বেলা চারটার সময়! উস্‌খুস্ কবিতে করিতে চক্ষুলজ্জায় সন্ধ্যা করিয়া ফেলে, মায়ের ভয়ে যাইতে সাহস পায় না।

সকালে সর্বজয়া একদিন ছেলেকে বলিল—হ্যাঁরে, ওই সাদা বাড়িটার পাশে কোন্ ছত্তর জানিস?

—উঁহু—

—তুই ছত্তরে খাস্‌নি একদিনও এখানে এসে? কাশীতে এসে ছত্তরে খেতে হয় কিন্তু, জানিসনে বুঝি! খেয়ে আসিস না আজ?...দেখেই আসিস্ না?

—কাশীতে এসে ছত্তরে খেতে হয় কেন?

—খেলে পুণ্যি হয়—আজ দশাশ্বমেধ ঘাটে নেয়ে অম্‌নি ছত্তর থেকে খেয়ে আসিস বুঝলি।

বেলা বারোটার সময় সত্র হইতে খাইয়া অপু বাড়ি ফিরিল। তাহার মা রান্নাঘবেব বাবান্দায় বসিয়া বাটিতে কি লইয়া খাইতেছিল—তাহাকে দেখিয়া প্রথমটা লুকাইবার চেষ্টা করিল বটে কিন্তু অপু অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে—লুকাইতে গেলে সন্দেহ জাগানো হয় ভাবিয়া সহজ সুরে বলিবার চেষ্টা করিল—খেয়ে এলি? কেন খাওয়ালে রে?

মা অড়হরের ডাল-ভিজা খাইতেছে।

—ভালো না—কুমড়োর একটা ছাই ঘণ্ট—বসে বসে হয়রান—বড্ড ময়লা কাপড়-পরা লোক সব খেতে যায়—আমি আর যাচ্ছি নে, পুণ্যিতে আমার দরকার নেই—ওকি খাচ্ছ মা? তোমার বের্তো নাকি? রান্না হয় নি?

—আজ তো আমার কুলুইচণ্ডী—এই দুটো অড়লের ডাল ভিজে—বেশ খেতে লাগে—আমি বড় ভালোবাসি...খাবি দুটো ওবেলা?

রাত্রিতেও রান্না হইল না। তাহার মা বলিল—অড়লের ডাল ভিজে খেয়ে দ্যাখ্ দিকি? বেশ লাগবে এখন—এবেলা রাঁধলাম না, ভারি তো খাস্, এত কটা ভাতে বসিস্ বই তো নয়—ওই খেয়ে কি আর খেতে পারবি?

পরদিন দুপুরে নন্দবাবু একতাড়া পান অপুর হাতে দিয়া বলিল—তোমার মার কাছ থেকে সেজে নিয়ে এসো তো? রোগীর ঘরের পাশের ঘরে সর্বজয়া বসিয়া পান সাজিতেছে। নন্দবাবু জুতার শব্দ করিতে করিতে উপর হইতে নামিয়া রোগীর ঘরে ঢুকিল এবং অতি অল্পক্ষণ পরেই সেখান হইতে বাহির হইয়া সর্বজয়া যে-ঘরে পান সাজিতেছে সেখানে ঢুকিল। সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া সর্বজয়ার ঝিমানি ধরিয়াছিল, জুতার শব্দে চমক ভাঙিলে একেবারে সম্মুখে নন্দবাবুকে দেখিয়া সে জড়সড় হইয়া ঘোমটা টানিয়া দিল। নন্দবাবু বলিল—পান সাজা হয়েচে বৌঠাক্‌রুন? সর্বজয়া নীরবে সাজা পানের খিলিগুলি রেকাবিতে করিয়া সামনে দিকে ঠেলিয়া দিতে নন্দবাবু এক খিলি তুলিয়া মুখের মধ্যে পুরিয়া বলিল—চুন বড্ড কম হয় বৌঠাক্‌রুন তোমার পানে, সরো দেখি আমি নিচ্চি—

সর্বজয়ার কোলের কাছে পানের বাটা। বাড়িতে কেহ নাই, অপু কোথায় বাহির হইয়াছে। পাশের ঘরে হরিহর ঔষধের বশে ঘুমাইতেছে। নিস্তব্ধ দুপুর। হঠাৎ সর্বজয়ার মনে হইল যেন নন্দবাবু চুন লইবার অছিলায় অনাবশ্যকরূপে—তাহার অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া আসিতে চাহিতেছে—একটা অস্পষ্ট চিৎকার করিয়া এক লহমার মধ্যে সে উঠিয়া গিয়া ঘরের বাহিরে দাঁড়াইল। একটা বিদ্যুতের মতো কিসের স্রোত তাহার পা হইতে মাথা পর্যন্ত খেলিয়া গেল। আঙুল দিয়া সিঁড়ি দেখাইয়া তীব্রস্বরে বলিল—চলে যান এখ্‌খনি ওপরে—কখ্‌খনো আর নিচে আসবেন না—নিচে এলে আমি মাথা খুঁড়ে খুন হবো—কেন আপনি আসেন? খবরদার আর আসবেন না—

সর্বজয়া পড়িল মহা ফাঁপরে। বিদেশ জায়গা, এই রোগী ঘরে—নিঃসহায়, হাতে একটি পয়সা নাই, একটি পরিচিত লোক কোনো দিকে নাই, ছেলের বছর এগারো বয়স মোটে—তাও বুদ্ধিসুদ্ধি নাই, নিতান্ত নির্বোধ। এদিকে এই সব উৎপাত।

উপরের পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকটি কালেভদ্রে নিচে নামে—এক আধ বার সর্বজয়াকে উপরে তাহার ঘরে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পাঁচ-ছয় মাস কাশীতে আসিয়াও সর্বজয়া না পারে হিন্দি বলিতে, না পারে ভালো বুঝিতে, কাজেই আলাপ মোটেই জমে নাই। অদ্য তাহার কাছে গিয়া নন্দবাবুর ঘটনা আনুপূর্বিক বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। পাঞ্জাবী মেয়েটির নাম সূরযকুঁয়াবী, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পাঞ্জাবের রোয়ালসর জেলার অধিবাসী; স্বামীটি রেলে ওভারসিয়ারের কাজ করে। মেয়েটির বয়স খুব অল্প না হইলেও দেখিতে কম বয়সি, গৌরাঙ্গী, আয়তনয়না, আঁটসাঁট দীর্ঘগড়ন। সে সব শুনিয়া বলিল—কোনো ভয় নাই, আপনি নির্ভয়ে থাকুন, আবার যদি কিছু বদমায়েশির ভাব দেখেন আমায় বলবেন, আমার স্বামীকে দিয়া উহার নাক কাটিয়া ঠাণ্ডা করিয়া ছাড়িব।...

ঠিক দুপুর। কয়রাত্রি জাগিবার পর সর্বজয়া মেজেতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। উত্তরের ঘরের জানালা দিয়া একফালি রৌদ্র আসিয়া সরু উঠানটাতে বাঁকাভাবে পড়িয়াছে। অপু মাটির মাল্‌সাতে গাঁদাফুলের গাছ লাগাইয়াছিল, দু-তিনটা একপেটে গাঁদা নিতান্ত বিরক্তভাবে ফুটিয়া আছে,—তলায় একটা বিড়াল-ছানা বসিয়া। অপু বাবার বিছানার পাশেই বসিয়া ছিল। তাহার বাবা আজ সকাল হইতে একটু ভালো আছে—ডাক্তার বলিয়াছে বোধহয় জীবনের আশা হইল। ভালো থাকিলেও রোগীর খুব চৈতন্য আছে বলিয়া মনে হয় না, বেহুঁশ অবস্থা। তাহার বাবা হঠাৎ চোখ খুলিয়া তাহার দিকে খানিকটা চাহিয়া থাকিয়া কি বলিল। অপুর মনে হইল বাবা তাহাকে আরও কাছে সরিয়া যাইতে বলিতেছে। অপু সরিয়া যাইতে হরিহর রোগশীর্ণ ক্ষীণ দুই হাতে ছেলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে তাহার মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। অপু একটু অবাক হইল, বাবার চোখের ওরকম দৃষ্টি কখনও সে দেখে নাই।

রাত্রি দশটার সময় নিদ্রিত অপুর কি শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘরে ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে—মা অঘোরে ঘুমাইতেছে, বাবার গলার মধ্যে নানাসুরে যেন কি একটা শব্দ হইতেছে। তাহার কেমন ভয় ভয় ঠেকিল। ঝুলমাখানো কড়িকাঠ, স্যাঁতা মেঝে, হাড়ভাঙা শীত, কাঠকয়লার আগুনের ধোঁয়া—সব মিলিয়া যেন একটা কঠিন দুঃস্বপ্ন। বাবার অসুখ সারিলে যে বাঁচা যায়!

শেষ রাত্রে তাহার মায়ের ঠেলা পাইয়া তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল!—অপু, ও অপু ওঠ্, শিগ্গির গিয়ে ওপরে থেকে হিন্দুস্তানী বৌকে ডেকে আন্‌তো—

অপু উঠিয়া শুনিল বাবার গলার সেই শব্দটা আরও বাড়িয়াছে। উপর হইতে সুরযকুঁয়ারী আসিবার একটু পরেই রাত্রি চারটার সময় হরিহর মারা গেল।

মাঝ-বর্ষার ধারামুখর কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে মনে হয় যে পৃথিবীর রৌদ্রদীপ্ত দিনগুলো স্বপ্ন না সত্য? এই মেঘ, এই দুর্দিন, অনন্ত ভবিষ্যতের পথে এরাই রহিল চিরসাথী—দিগন্তের মায়ালীলার মতো চৈত্র-বৈশাখের যে দিনগুলা অতীতে মিলাইয়া গিয়াছে—আর কি তাহা ফিরিয়া আসে?

চারিধার হইতে সর্বজয়াকে কি এক কুয়াশায় ঘিরিয়া ফেলিল। তাহার মধ্য দিয়া না দেখা যায় পথ, না চেনা যায় সাথী, না জানা যায় কোথায় আছি। সন্দেহ হয় এ কুয়াশা বোধ হয় বেলা হইলে রৌদ্র উঠিলেও কাটিবে না, এর পেছনে আছে আকাশ-ছাওয়া ফিকে ধূসর রং-এর সারাদিনব্যাপী অকাল বাদলের মেঘ।

বিপদের দিনে পাঞ্জাবী ওভারসিয়ার জালিম সিং ও তাহার স্ত্রী যথেষ্ট উপকার করিল। জালিম সিং অফিস কামাই করিয়া সৎকারের লোকের জন্য বাঙালিটোলায় ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। খবর পাইয়া রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সেবকও আসিয়া পৌঁছিল।

মণিকর্ণিকার ঘাটে সৎকারঅন্তে সন্ধ্যাবেলা অপু স্নান করিয়া ঠাণ্ডা পশ্চিমে বাতাসে কাঁপিতে কাঁপিতে পৈঠার উপর উঠিল। রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সেবক ও নন্দবাবু তাহাকে উত্তরীয় পরাইতেছিল। বেলা খুব পড়িয়া গিয়াছে, অস্ত-দিগন্তের ম্লান আলো পাথরের মন্দিরগুলার আগাটুকুতে মাত্র চিক্‌চিক করিতেছে। সারাদিনের ব্যাপারে দিশেহারা অপুর মনে হইল তাহার বাবার পরিচিত গলায় উৎসুক শ্রোতাগণের সম্মুখে কে যেন বসিয়া আবৃত্তি করিতেছে—

কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী...
লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ...

যে বাবাকে সকলে মিলিয়া আজ মণিকর্ণিকার ঘাটে দাহ করিতে আনিয়াছিল,—রোগে, জীবনের যুদ্ধে পরাজিত সে বাবা স্বপ্ন মাত্র—অপু তাহাকে চেনে না, জানে না—তাহার চিরদিনের একান্ত নির্ভরতার পাত্র, সুপরিচিত, হাসিমুখ বাবা জ্ঞান হইয়া অবধি পরিচিত সহজ সুরে, সুকণ্ঠে, প্রতিদিনের মতো কোথায় বসিয়া যেন উদাস পূরবীর সুরে আশীর্বাচন গান করিতেছে—

কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী...
লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ...

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কোনোরূপে মাসখানেক কাটিল। এই একমাসের মধ্যে সর্বজয়া নানা উপায় চিন্তা করিয়াছে কিন্তু কোনোটাই সমীচীন মনে হয় না। দু-একবার দেশে ফিরিবার কথাও যে তাহার না মনে হইয়াছে এমন নয়, কিন্তু যখনই সে কথা মনে ওঠে, তখনই সে তাহা চাপিয়া যায়। প্রথমত তো দেশের এক ভিটাটুকু ছাড়া বাকি সব কতক দেনার দায়ে, কতক এমনি বেচিয়া কিনিয়া আসা হইয়াছে, জমিজমা

কিছুই আর নাই। দ্বিতীয়ত সেখান হইতে বিদায় লইবার পূর্বে সে পথে-ঘাটে বৌ-ঝিদের সম্মুখে নিজেদের ভবিষ্যতের সুখের ছবি কতভাবে আঁকিয়া দেখাইয়াছে। নিশ্চিন্দিপুরের মাটি ছাড়িয়া যাওয়ার অপেক্ষা মাত্র, এ পোড়া মূর্খের দেশে তাহার স্বামীর কদর কেহ বুঝিল না, কিন্তু যেখানে যাইতেছে সেখানে যে তাহাকে সকলে লুফিয়া লইবে, অবস্থা ফিরিতে যে এক বৎসরও দেরি হইবে না—এ কথা হাতমুখ নাড়িয়া সর্বজয়া কতভাবে তাহাদের বুঝাইয়াছে! এই তো চৈত্র মাস, এক বৎসর এখনও পূর্ণ হয় নাই। ইহারই মধ্যে এরূপ নিঃসম্বল দীন অবস্থায়, তাহার উপরে বিধবার বেশে সেখানে ফিরিয়া গিয়া সকলের সম্মুখে দাঁড়াইবার কথাটা ভাবিতেই সে লজ্জায় সংকোচে মাটিতে মিশিয়া যাইতেছিল। যাহা হইবার এখানেই হউক, ছেলের হাত ধরিয়া কাশীর পথে পথে ভিক্ষা করিয়া ছেলেকে মানুষ করিবে, কে দেখিতে আসিবে এখানে?

মাসখানেক পরে একটা সুবিধা হইল। কেদার ঘাটের এক ভদ্রলোক মিশনের অফিসে জানাইলেন যে তাঁহার পরিচিত এক ধনী পরিবারের জন্য একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে আবশ্যক, জাতের মেয়ে, ঘরে আসিবেন, কাজকর্মে সাহায্য করিবেন। মিশন এরূপ কোনো লোকের সন্ধান দিতে পারেন কি না? শেষ পর্যন্ত মিশনের যোগাযোগে ভদ্রলোকটি অপুদের সেখানে পাঠাইতে রাজি হইলেন। সর্বজয়া অকূল সমুদ্রে কূল পাইয়া গেল। দিন-দুই পরে সেই ভদ্রলোকটি বলিয়া পাঠাইলেন যে, বাসা একেবারে উঠাইয়া যাইবার জন্য যেন ইহারা প্রস্তুত হয়, কারণ সেই ধনী গৃহস্থদের বাটী কাশীতে নয়, তাঁহাদের বাড়ির কাহারা কাশীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন, ফিরিবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন।

প্রকাণ্ড বড় হলদে রঙের বাড়িটা। কাশীতে যে রকম বড় বড় বাড়ি আছে, সেই ধরনের খুব বড় বাড়ি। সকলের পিছনে পিছনে সর্বজয়া ছেলেকে লইয়া সংকুচিতভাবে বাড়ির ভিতর ঢুকিল।

অন্তঃপুরে পা দিতেই অভ্যর্থনার একটা রোল উঠিল—তাহার জন্য নহে—যে দলটি এইমাত্র কাশী হইতে বেড়াইয়া ফিরিল, তাহাদের জন্য।

ভিড় ও গোলমাল একটু কমিলে বাড়ির গিন্নি সর্বজয়ার সম্মুখে আসিলেন। খুব মোটাসোটা, এক সময়ে বেশ সুন্দরী ছিলেন বোঝা যায়, বয়স পঞ্চাশের উপর। গিন্নিকে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন—থাক, থাক, এসো, এসো—আহা এই অল্প বয়সেই এই—এটি ছেলে বুঝি? খাসা ছেলে—কি নাম?

আর একজন কে বলিলেন—বাড়ি বুঝি কাশীতেই? না?—তবে বুঝি—

সকলের কৌতূহল-দৃষ্টির সম্মুখে সর্বজয়া বড় লজ্জা ও অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। গিন্নির হুকুমে যখন ঝি তাহার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে তাহাকে লইয়া গেল, তখন সে হাঁপ ফেলিয়া বাঁচিল।

পরদিন হইতে সর্বজয়া চুক্তিমতো রান্নার কাজে ভর্তি হইল। রাঁধুনী সে একা নয়, চার-পাঁচজন আছে। তিন-চারটা রান্নাঘর। আঁশ নিরামিষ, দুধের ঘর, রুটির ঘর, বাহিরের লোকদিগের রান্নার আলাদা ঘর। ঝি-চাকরের সংখ্যা নাই। রান্নাবাড়িটা অন্তঃপুরের মধ্যে হইলেও একটু পৃথক। সেদিকটা যেন ঝি-চাকর-বামুনের রাজত্ব। বাড়ির মেয়েরা কাজ বলিয়া ও বুঝাইয়া দিয়া যান মাত্র, বিশেষ কারণ না ঘটিলে রান্নাবাড়িতে বড় একটা থাকেন না।

সর্বজয়া কি রাঁধিবে একথা লইয়া আলোচনা হয়। সর্বজয়ার বরাবরই বিশ্বাস সে খুব ভালো রাঁধিতে পারে। সে বলিল, নিরামিষ তরকারি রান্নার ভার বরং তাহার উপর থাকুক। রাঁধুনী বামনী মোক্ষদা মুচকি হাসিয়া বলিল—বাবুদের রান্না তুমি করবে? তা হলেই তো চিত্তির। পরে পাঁচিঝিকে ডাক দিয়া কহিল, শুন্‌চিস, ও পাঁচি, কাশীর ইনি বল্‌চেন নাকি বাবুদের তরকারি রাঁধবেন। কি নাম গো তোমার? ভুলে যাই—মোক্ষদার ওষ্ঠের কোণের ব্যঙ্গের হাসিতে সর্বজয়া সেদিন সংকোচে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু দু-একদিনেই সে বুঝিতে পারিল যে তাহার পাড়াগাঁয়ের

কোনো তরকারি রান্না সেখানে খাটিবে না। ঝোলে যে এত চিনি মিশাইতে হয় বা বাঁধাকপি ফ্রিটার্স বলিয়া যে একটা তরকারি আছে, একথা সে এই প্রথম শুনিল।

গৃহিণী সর্বজয়াকে মাস দুই বেশ যত্ন করিয়াছিলেন। হালকা কাজ দেওয়া, খোঁজখবর নেওয়া। ক্রমে ক্রমে অন্য পাঁচজনের সমান হইয়া দাঁড়াইতে হইল। বেলা দুইটা পর্যন্ত কাজ করার পর প্রথম প্রথম সে বড় অবসন্ন হইয়া পড়ে, এভাবে অনবরত আগুনের তাতে থাকার অভ্যাস তাহার কোনো কালে নাই, অত বেলায় খাইবার প্রবৃত্তি বড় একটা থাকে না। অন্য অন্য রাঁধুনীরা নিজেদের জন্য আলাদা করিয়া মাছ তরকারি লুকাইয়া রাখে, কতক খায়, কতক বাহিরে কোথাও লইয়া যায়। সে পাতের কাছে একবার বসে মাত্র!

রান্নার বিরাট ব্যাপার দেখিয়া সর্বজয়া অবাক হইয়া যায়, এত বড় কাণ্ড-কারখানার ধারণা কোনো দিন স্বপ্নেও তাহার ছিল না, বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবে, দু'বেলায় তিন সের করে তেলের খরচ? রোজ একটা যজ্ঞির তেল-ঘি এর খরচ!... পাড়াগাঁয়ের গরিব ঘরের ছোট সংসারের অভিজ্ঞতা লইয়া সে এসব বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

একদিন সরু চালের ভাত রান্নার বড় ডেকচিটা নামাইবার সময় মোক্ষদা বামনীকে ডাক দিয়া বলিল—ও মাসিমা, ডেক্‌চিটা একটুখানি ধরবে?

মোক্ষদা শুনিয়াও শুনিল না।

এদিকে ভাত ধরিয়া যায় দেখিয়া নিজেই নামাইতে গিয়া ভারী ডেক্‌চিটা কাত করিয়া ফেলিল, গরম ফেন পায়ের পাতায় পড়িয়া তখনই ফোস্কা পড়িয়া গেল। গৃহিণী সেই দিনই তাহাকে রুটির ঘরে বদলি করিয়া বলিয়া দিলেন, পা না সারা পর্যন্ত তাহাকে কোনো কাজ করিতে হইবে না।

সর্বজয়া ছেলেকে লইয়া নিচের একটা ঘরে থাকে। ঘরটা পশ্চিমদিকের দালানের পাশেই। কিন্তু সেটা এত নিচু, আর মেঝে এত স্যাঁতসেঁতে এবং ঘরটাতে সব সময় এমন একটা গন্ধ বাহির হয় যে, কাশীর ঘরও এর চেয়ে অনেক ভালো ছিল। দেয়ালের নিচের দিকটা নোনা-ধরা, বাঙা রাঙা বড় বড় ছোপ, প্রতিবার বাহির হইতে ঢুকিয়াই অপু বলে—উঃ, কিসের গন্ধ দেখ্‌চো মা, ঠিক যেন পুরোনো চালের কি কিসের গন্ধ বলো দিকি?...নিচের এ ঘরগুলা কর্তৃপক্ষ মনুষ্যবাসের উপযুক্ত করিয়া তৈয়ারি করেন নাই, সেইজন্যই এগুলিতে চাকর-বাকর রাঁধুনীরা থাকে।

উপরের দালানের সব ঘরগুলি অপু বাহির হইতে বেড়াইয়া বেড়াইয়া দেখিয়াছে, বড় বড় জানালা দরজা। জানালায় সব কাচ বসানো। ঘরে ঘরে গদি-আঁটা বড় বড় চেয়ার, ঝক্‌ঝকে টেবিল, যেন মুখ দেখা যায়, এত ঝক্‌ঝক্ করে। অপুদের বাড়িতে যেমন কার্পেটের পুরানো আসন ছিল, ওই রকম কিন্তু ওর চেয়েও ঢের ভালো, পুরু ও প্রায় নতুন—কার্পেট মেজেতে পাতা। দেওয়ালে আয়না টাঙানো, এত বড় বড় যে, অপুর সমস্ত চেহারাখানা তাহাতে দেখা যায়। সে মনে মনে ভাবে—এত বড় বড় কাচ পায় কোথায়? জুড়ে জুড়ে করেচে বোধ হয়—

দোতলার বারান্দায় আর একটা বড় ঘর আছে—সেটা প্রায়ই বন্ধ থাকে, মাঝে মাঝে চাকর-বাকরে আলো হাওয়া খাওয়াইবার জন্য খোলে। সেটার মধ্যে কি আছে জানিবার জন্য অপুর অদম্য কৌতূহল হয়। একদিন ঘরের দরজা খোলা দেখিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াছিল। কি বড় বড় ছবি! পাথরের পুতুল! বড় বড় গদি-আঁটা চেয়ার,—আয়না,—সে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সব দেখিতেছে, এমন সময় ছটু খানসামা তাহাকে ঘরের মধ্যে দেখিতে পাইয়া রুখিয়া আসিয়া বলিল—কোন্ বা?... কাহে ইস্‌মে ঘুসা?

হয়তো সেদিন সে মারই খাইত, কিন্তু বাড়ির একজন ঝি দালান দিয়া যাইতে যাইতে দেখিয়া বলিল—এই ছটু, ছেড়ে দাও, কিছু বোলো না—ওর মা এখানে থাকে—দেখচে দেখুক না—

সকলের খাওয়া-দাওয়া সারা হইলে সর্বজয়া বেলা আড়াইটার সময়ে নিজের ঘরটিতে আসিয়া খানিকটা শোয়। সারাদিনের মধ্যে এই সময়ের মধ্যে কেবল মায়ের সঙ্গে মন খুলিয়া কথা হয় বলিয়া

মাঝে মাঝে অপু এসময়ে ঘরে আসে। তাহার মা তাহাকে একবার করিয়া দিনের মধ্যে চায়। এ বাড়িতে আসা পর্যন্ত অপু যেন দূরে চলিয়া গিয়াছে। সারাদিন খাটুনি আর খাটুনি—ছেলের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে হয়। বহু রাত্রে কাজ সারিয়া আসিতে অপু ঘুমাইয়া পড়ে, কথা হয না। এই দুপুবটার জন্য তার মন তৃষিত হইয়া থাকে।

দোরে পায়ের শব্দ হইল। সর্বজয়া বলিল—কে, অপু! আয়—দোর ঠেলিয়া বাম্‌নী মাসি ঘরে ঢুকিল। সর্বজয়া বলিল—আসুন, মাসিমা বসুন। সঙ্গে সঙ্গে অপুও আসিল। বাম্‌নী মাসি বাবুদের সম্পর্কে আত্মীয়া। কাজেই তাহাকে খাতিব করিয়া বসাইল। বাম্‌নী মাসির মুখ ভারী-ভারী। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—দেখ্‌লে তো আজ কাণ্ডখানা বড়-বৌমার? বলি কি দোষটা. . তুমি তো বরাবরই বুগির ঘরে ছিলে? মাছ, ঘি এনে চুপড়িতে করে রেখে গেল, আমি ভাবলাম বাঁধাকপিতে বুঝি—কি রকম অপমানটা দেখলে তো একবার? পোলোয়ার মাছ তো সে কথা ঝিকে দিয়ে বলে পাঠালে তো হত। সদু ঝিও কি কম বদ্‌মায়েশের ধাড়ি নাকি?... গিন্নির পেয়ারের ঝি কিনা? মাটি মাড়িয়ে চলে না, ওপরে গিয়ে সাতখানা করে লাগায়—ওই তো ছিরিকণ্ঠ ঠাকুরও ছিল—বলুক দিকি?

.গল্প করিতে করিতে বেলা যায়। মাসি বলে, যাই, জলখাবারের ময়দা মাখি গে—চারটে বাজ্‌লো—

মাসি চলিয়া গেলে অপু মায়েব কাছে ঘেঁষিয়া বসিল। তাহাব মা আদর করিয়া চিবুকে হাত দিয়া বলিল—কোথায় থাকিস দুপ্যুরে বল্‌ তো?. .

অপু হাসিয়া বলিল—ওপরের বৈঠকখানা ঘরে কলেব গান বাজচে মা—শুন্‌ছিলাম—ওই বারান্দাটা থেকে—

সর্বজয়া খুশি হইল।

—হাঁরে, তোর সঙ্গে বাবুদেব ছেলেদের ভাব-সাব হয় নি?... তোকে ডেকে বসায়?

—খু-উ-উব!...

অপু এটা মিথ্যা বলিল। তাহাকে ডাকিয়া কেহ বসায় না। ওপরের বৈঠকখানাতে গ্রামোফোন বাজানোব শব্দ পাইলেই খানিকটা ইতস্তত করিয়া পরে ভয়ে ভয়ে উপরে উঠিয়া যায় ও বৈঠকখানার দোরের পাশে চুপ কবিয়া দাঁড়াইয়া গান শোনে। প্রতি মুহূর্তেই তাহাব ভয় হয় এইবাব হযতো উহাবা তাহাকে বলিবে নিচে চলিয়া যাইতে। গান শেষ হইলে নিচে নামিবাব সময় ভাবে—কেউ তো কিছু বক্‌লে না? কেন বক্‌বে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনি বাইরে, আমি তো বাবুদের ঘরের মধ্যে যাচ্ছি নে? এরা ভালো লোক খুব—

এ বাড়ির ছেলেদের সঙ্গেও তার মেলামেশা হইল না। তাহারা উহাকে আমলই দেয় নাই। সেদিন রমেন, টেবু, সমীর, সন্তু—ইহারা একটা চৌকা পিঁড়ির মতো তক্তা সামনে পাতিয়া কাঠের কালো কালো গুটি চালিয়া এক রকম খেলা খেলিতেছিল, নাম নাকি ক্যাবাম খেলা—সে খানিকটা দূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খেলাটা দেখিতেছিল—তার চেয়ে বেগুনবিচি খেলা ঢের ভালো।

বৈশাখেব প্রথমে বড়বাবুর মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে বাড়ি সরগরম হইয়া উঠিল। গয়া, মুঙ্গের, এলাহাবাদ, কলিকাতা, কাশী নানাস্থান হইতে কুটুম্ব-কুটুম্বিনীদের আগমন শুরু হইল। সকলেই বড়লোকের ঘরের মেয়ে ও বড়ঘরের বধূ, প্রত্যেকের সঙ্গে নিজেদের ঝি-চাকর আসিয়াছে। নিচের তলার দালান-বারান্দা রাত্রে তাহারাই দখল করে। সারারাত্রি হৈ চৈ।

সকালে সর্বজয়াকে ডাকিয়া গিন্নি বলিলেন—ও অপূর্বের মা, তুমি এক কাজ করো, এখন দিন দুই রান্নাঘরের কাজ তোমার থাকুক, নানান জায়গা থেকে তত্ত্ব আসচে, তুমি আর ছোট মোক্ষদা সে সবগুলো গুছিয়ে তোমাদের রুটির ঘরের ভাঁড়ারে তোলাপাড়া করো—মিষ্টি খাবার ওখানেই রেখো, ফল-ফুলুরি যা দেখবে পচবার মতো, সদুঝির হাতে পাঠিয়ে দেবে, নয়তো রেখে দিয়ো, জলখাবারের সময় নিয়ে আসবে বাম্‌নী মাসি—

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঝি-বেহারাদের মাথায় কত জায়গা হইতে যে কত তত্ত্ব আসিতে লাগিল সর্বজয়া গুনিয়া সংখ্যা করিতে পারে না। মিষ্টান্নের জায়গা দিতে পারা যায় না, ছোট ছোট রূপার চন্দনের বাটি জমিয়া গেল পনেরো-যোলটা। আম এখনও উঠে নাই, তবুও একটা বড় ধামা আমে বোঝাই হইয়া গেল।

সর্বজয়া বামনী মাসির হাতে খাবার তুলিয়া দিতে দিতে ভাবে—এই এত ভালোমন্দ, এত কাণ্ড, তাই কি ছেলেটার জন্যে কিছু—আহা, বাছা আমার সরকারদের খাবার ঘরের কোণটায় কাঁচুমাচু হয়ে বসে দুটো ভাত খায়, না দিতে পারি পাতে দুখানা ভালো দেখে মাছ, না একটু ভালো তরকারি, না এক হাতা দুধ—এখুনি ওই সদু হারামজাদী লাগাবে নিজের ছেলের পাতে বাবুদের হেঁসেল থেকে সব—

বিবাহের দিন খুব ভিড়। বরপক্ষ সকালের গাড়িতে আসিয়া পৌঁছিয়া শহরের অন্য এক বাড়িতে ছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা করিয়া বর আসিল।

বাহিরের উঠান নিমন্ত্রিতদের দলে ভরিয়া গিয়াছে। সারা উঠানটাতে শতরঞ্চি পাতা, এক কোণে চওড়া জরিপাড় লাল মখমলে মোড়া উঁচু বরাসন, জরির ঝালর-দোলানো নীল সাটিনের চাঁদোয়া, দুপাশে কিংখাবের তাকিয়া, বড় বড় বেলফুলের মালা তিনগাছা করিয়া চাঁদোয়ার খিলানে খিলানে টাঙানো। চারিপাশে বরযাত্রীগণের চেয়ার ও কৌচ্। বিলাতি সেন্ট ও গোলাপ জলের পিচ্‌কারি ঘন ঘন ছুটিতেছে।

অপু এ সমস্ত বিশেষ কিছু দেখে নাই, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। একবার মাত্র সে বাড়ির মধ্যে গিয়াছিল, তখন স্ত্রী-আচার হইতেছে, রাত্রি অনেক! মাকে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না, উৎসবের ভিড়ে কে জানে কোথায় কি কাজে ব্যস্ত আছে। দামি বেনারসী শাড়ি-পরা মেয়েদের ভিড়ে উঠানের কোথাও এতটুকু স্থান ফাঁকা নাই। ছোটবাবুর মেয়ে অরুণা কাহাকে ডাকিয়া বাহিরের বৈঠকখানা হইতে বড় অর্গ্যানটা বাড়ির ভিতর আনিতে বলিতেছে।

বিবাহের দিন দুই পরে শখের থিয়েটার উপলক্ষে আবার খুব হৈ চৈ। উঠানের এক কোণে স্টেজ বাঁধা হইয়াছে। গোলাপফুলে ও অর্কিডে স্টেজটা খুব চমৎকার সাজানো। পাঁচশত ডালের প্রকাণ্ড ঝাড়টা স্টেজের মধ্যে খাটানো হইল। এ কয়দিনের ব্যাপারে তো একেই অপুর তাক্ লাগিয়াছে, আজকার থিয়েটার জিনিসটি কি সে আদৌ জানে না, আগ্রহ ও কৌতূহলের সহিত পূর্ব হইতেই ভালো জায়গাটি দখল করিয়া রাখিবার জন্য সে আসরের সামনের দিকে সন্ধ্যা হইতে বসিয়া রহিল।

ক্রমে ক্রমে একে একে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা আসিতে লাগিলেন, চারিদিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল। বাড়ির দারোয়ানেরা জরির উর্দি পরিয়া আসরের বাহিরে ও দরজার কাছে দাঁড়াইল। সরকার ইতস্তত ছুটাছুটি করিয়া কাজ দেখাইতে লাগিল। কনসার্ট আরম্ভ হইল। যখন ড্রপসিন উঠিবার আর বেশি দেরি নাই, বাড়ির গোমস্তা গিরিশ সরকার তাহার কাছে আসিয়া নিচু হইয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল—কে? অপু মুখ উঁচু করিয়া চাহিয়া দেখিল কিন্তু মুখচোরা বলিয়া খানিকক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। তাহাকে জবাব দিবার অবকাশ না দিয়াই গিরিশ সরকার বলিল—ওঠো, ওঠো, এখানে বাবুরা বসবেন—ওঠো—গিরিশ সরকার আন্দাজে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল।

অপু পিছনে চাহিয়া বিপন্নমুখে নামতা পড়ার সুরে বলিল—আমি সন্দে থেকে এইখানটায় বসে আছি, পেছনে যে সব ভর্তি, কোথায় যাবো?...তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে গিরিশ সরকার তাহার হাতের নড়া ধরিয়া জোরে ঝাঁকুনি দিয়া উঠাইয়া দিয়া বলিল—তোর না কিছু করেছে, জ্যাঠা ছোকরা কোথাকার, জ্ঞান নেই, একেবারে সামনে—বাবুরা বসবেন, উনি রাঁধুনীর ব্যাটা এসেছেন মুখের কাছে বস্‌তে! কোথায় যাবো ওঁকে বলে দাও—ফাজিল জ্যাঠা কোথাকার—যা এখান থেকে যা, ওই থামটার কাছে বস্‌গে যা কোথাও—

পিছন হইতে দু'একজন কর্মকর্তা বলিলেন—কি হয়েচে, কি হয়েচে গিরিশ—কিসের গোল? কে ও?

—এই দেখুন না ম্যানেজারবাবু, এই জ্যাঠা ছোক্‌রা বাবুদের এখানে এসে বসে আছে, একেবারে সামনে—চন্দননগরের ওঁরা এসেচেন, বসাবার জায়গা নেই—উঠতে বল্‌চি, আবার মুখোমুখি তর্ক!

ম্যানেজারবাবু বলিলেন—দাও না দুই থাপ্পড় বসিয়ে—

অপু জড়সড় হইয়া কোনো দিকে না চাহিয়া অভিভূতের মতো আসরের বাহির হইয়া আসিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল আসরের সকলের চোখ তাহার দিকে, সকলেই কৌতূহলের সহিত তাহার দিকে চাহিয়া আছে! প্রথমটা ভাবিল হঠাৎ এক দৌড় দিয়া সে এখনই এক আসর লোকের চোখের আড়ালে যে কোনো জায়গায় ছুটিয়া পলায়। তাহার পর সে গিয়া এক থামের আড়ালে দাঁড়াইল। তাহার গা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল ভয়ে; অপমানে, লজ্জায়, তাহার সূক্ষ্ম অনুভূতির পর্দাগুলিতে হঠাৎ বেখাপ্পা গোছের কাঁপুনি লাগিয়াছিল। একটু সামলাইয়া লইয়া থামের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল... কিন্তু চারিধারে চাকর-বাকর, ওপরের বারান্দায় চিকের আড়ালে মেয়েরা, ঝি-রাঁধুনীরা নিচের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে—তাহারা তো সকলেই ব্যাপারটা দেখিয়াছে, কি মনে করিতেছে উহারা! না জানিয়া কি কাণ্ডই করিয়া বসিয়াছে! সে তো জানে না ওটা বাবুদের জায়গা! সে বার বার মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল তাহাকে সম্ভবত কেহ চিনিতে পারে নাই। কে না কে, কত তো বাইরের লোক আসিয়াছে—কে তাহাকে চিনিয়াছে?

তাহার পর থিয়েটার আরম্ভ হইয়া গেল। সেদিকে তাহার লক্ষ্যই রহিল না। সম্মুখের এই লোকের ভিড়, বদ্ধ বায়ু, আলোর মেলা, দারোয়ান চাকরের হৈ চৈ—কোনোদিকে তাহার খেয়াল রহিল না! ছুটু খানসামা একটা রূপার হাঁসের পানদান লইয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সারিতে পান বিলি করিতেছিল—সেইটার দিকে চাহিয়া অপুর গা যেন কেমন করিয়া উঠিল। ওপরের ঘেরা বারান্দার দিকে চাহিয়া ভাবিল, ওদিকে মা নাই তো? যদি মা একথা জানিতে পারে? কিন্তু অপুর ভয় সম্পূর্ণ অমূলক, তাহার মা তখন সে অঞ্চলেও ছিল না, এসব কথা তাহার কানেও যায় নাই।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরের বাড়ি নিতান্ত পরাধীন অবস্থায় চোরের মতো থাকা সর্বজয়ার জীবনে এই প্রথম। সুখে হৌক্, দুঃখে হৌক, সে এতদিন একা ঘরের একা গৃহিণী ছিল। দরিদ্র সংসারের রাজরানী—সেখানে তাহার হুকুম এই এত বড় বাড়ির গৃহিণী, বৌ-রানীদের চেয়ে কম কার্যকরী ছিল না। এ যেন সর্বদা জুজু হইয়া থাকা, সর্বদা মন যোগাইয়া চলা, আর একজনের মুখের দিকে চাহিয়া পথ হাঁটা, পান থেকে চুন না খসে!—ছোটর ছোট তস্য ছোট!... এ তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। খাটিতে খাটিতে মুখে রক্ত ওঠে—কিন্তু এখানে খাটার মূল্য নাই। প্রাণপণে খাটো—কেহ নাম করিবার নাই। উহারা যখন দিবে তখন গর্বের সঙ্গে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে—তোমার খাটার মূল্য দিতেছে বলিয়া সমানে সমানে দিবে না। তোমাকে হাঁটু গাড়িয়া লইতে হইবেই।

এ ক্রমে তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু উপায় কি?...বাহিরে যাইবার সুবিধা কই? আশ্রয় কে দিবে? কোথায় দাঁড়াইবে?...

চিরকাল এইরকম কাটিবে? যতদিন বাঁচিবে ততদিন? ওই বামনী মাসির মতো?...

বিবাহের উৎসবের জের এখনও মেটে নাই, আজ মেয়েদের প্রীতিভোজ, সন্ধ্যার পর হইতেই নিমন্ত্রিত মহিলাদের গাড়ি পিছনের গেটে আসিতে শুরু করিল। ভিতরের বড় দরজা পার হইয়া

সম্মুখেই মেয়ে-মহলের দোতলার বারান্দায় উঠিবার চওড়া মার্বেলের সিঁড়িটা নীলফুলের কাজ-করা কার্পেট দিয়া মোড়া। সারা বারান্দাতে ও সিঁড়িতে গ্যাসের আলো, দোতলার বারান্দায় উঠিবার মুখে বড় গ্যাসের ঝাড় জ্বলিতেছে। দুই বৌ-রানী ও বাড়ির মেয়েরা অভ্যর্থনা করিয়া সকলকে উপরে পাঠাইয়া দিতেছিলেন। নিমন্ত্রিতা মেয়েরা কেহ মুচকি হাসিয়া, কেহ হাসির লহর তুলিয়া কেহ ধীর, কেহ ক্ষিপ্র, কেহ সুন্দর অপূর্ব গতি-ভঙ্গিতে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছেন।

অপু অনেকক্ষণ হইতে নিচের বারান্দায় একটা থামের কাছে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। এ ধরনের দৃশ্য জীবনে সে এই প্রথম দেখিল, সেদিন বিবাহের রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িবার দরুন সে বিশেষ কিছু দেখে নাই। সকলের চেয়ে তাহার ভালো লাগিতেছিল এ বাড়ির মেয়ে সুজাতাকে। সে কার্পেট-মোড়া মার্বেল পাথরের সিঁড়ি বাহিয়া এক-একবার নামিয়া আসিতেছে, নিমন্ত্রিতাদের মধ্যে কাহারও দিকে চাহিয়া হাসিমুখে বলিতেছে—বা বেশ তো মণি-দি? একেবারে রাত আটটা কোরে? বকুলবাগানের বৌদি এলেন না?

অভ্যর্থিতা সুন্দরী হাসিয়া বলিলেন—গাড়ি সাজিয়ে বসে আছি বেলা ছটা থেকে...বেরুনো তো সোজা নয় ভাই, সব তৈরি না হলে তো... জানোই তো সব—

সুজাতা কাঞ্চনফুল রং-এর দামি চায়না ক্রেপের হাত্‌কাটা জামার ফাঁক দিয়া বাহির হওয়া শুভ্র, সুগোল, নিটোল বাহু দিয়া পিছন হইতে নিমন্ত্রিতাকে বেষ্টন করিয়া আদরের ধরনে তাঁহার ডান কাঁধে মুখ রাখিয়া একসঙ্গে উপরে উঠিতে লাগিল। বলিতে বলিতে চলিল—মা বল্‌ছিলেন বকুলবাগানের বৌদি নাকি সামনের মাসে যাবেন কলকাতা—বুধবারে মা গেছলেন যে—ঠিক কিছু হল?

সিঁড়ির ওপরের ধাপে মেজ বৌ-রানী দেখা দিলেন। বয়স একটু বেশি, বোধ হয় ত্রিশের উপর, অপূর্ব সুন্দরী। তাঁর বেশের কোনো বাহুল্য নাই, ফিকে চাঁপা রং-এর চওড়া লালপাড় রেশমী শাড়ির প্রান্ত মাথার চুলে হীরার ক্লিপ দিয়া আঁটা, সিঁড়ির বড় ঝাড়ের আলোয় গলার সরু সোনার চেন চিক্‌ চিক্‌ করিতেছিল, সুন্দর গড়ন, একটু ধীর, গম্ভীর—এই বয়সেও দুধে-আলতা রং-এর আভা অপূর্ব। মাসখানেক হইল উপযুক্ত ভাই মারা যাওয়াতে একটুখানি বিষাদের ছায়া পরিণত মুখের সৌন্দর্যকে একটি সংযত শ্রী দান কবিয়াছে।

মণি-দি উঠিতে উঠিতে মেজ বৌ-রানীকে সম্মুখে দেখিয়া সিঁড়ির ওপরই দাঁড়াইয়া গেলেন—মেজ বৌদির শরীর আজকাল কেমন আছে? এই দেখুন না, একবার আস্‌বো আস্‌বো করে... কাল ওঁরা এঁটোয়া থেকে সব এলেন, তাই নিয়ে অনেক রাত অব্‌ধি...

এত সুন্দর দেখিতে মানুষ হয়, অপুর এ ধারণা ছিল না। অপু ইঁহাকে এই প্রথম দেখিল কারণ ইনি এতদিন এখানে ছিলেন না, ভাইয়ের মৃত্যুর পর সবে দিনকয়েক হইল বাপের বাড়ি হইতে আসিয়াছেন—সে মুগ্ধ চোখে অপলক বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এই আলো, চারিধারে সুন্দরীর মেলা, দামি পুষ্পসারের মৃদু, মনমাতানো সৌরভ, বীণার ঝংকারের মতো সুর ও হাসির লহরীতে তাহার কেমন এক নেশা জমিয়া গেল। এই যদি সারাদিন চলে?...

মেজ বৌ-রানী অনেকক্ষণ হইতে দেখিতেছিলেন সিঁড়ির কোণে একজন অপরিচিত ছেলে দাঁড়াইয়া আছে। সকলকে তিনি জানেন না—তাঁহার বাপও খুব বড়লোক, প্রায়ই বাপের বাড়ি থাকেন। দু'ধাপ নামিয়া আসিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন—খোকা, এসো উঠে। দাঁড়িয়ে কেন? তুমি কোত্থেকে আস্‌চ?...

অপু অন্যদিকে চাহিয়া অন্য একদল আগন্তুকদের লক্ষ করিতেছিল—হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া তাহাকেই মেজ বৌ-রানী ডাকিতেছিলেন দেখিয়া প্রথমটা বিস্মিত হইল—যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না। পরে রাজ্যের লজ্জা আসিয়া জুটিতেই সে উপরে উঠিয়া যাইবে কি ছুটিয়া পলাইবে ভাবিতেছে—এমন সময় মেজ বৌ-রানী নিজেই নামিয়া আসিলেন—কাছে আসিয়া বলিলেন—কোত্থেকে আস্‌চ খোকা?...

অতি কষ্টে অনেক চেষ্টায় অপুর মুখ দিয়া বাহির হইল—আমি—আমি—ওই—আমার মা—এই বাড়ি থাকেন—সঙ্গে সঙ্গে তাহার অত্যন্ত ভয় হইল যে, এখানে সে দাঁড়াইয়া আছে—কোথাকার রাঁধুনীর ছেলে—একথা শুনিয়া এখনই হয়তো ইনি কাহাকেও ডাকিয়া বলিবেন—ইহাকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দাও এখান থেকে!...

মেজ বৌ-রানী কিন্তু সে সব কিছুই করিলেন না—তিনি বিস্মিতমুখে বলিলেন—এ বাড়ি থাকেন তোমার মা?... কে বলো তো... কি করেন? কতদিন তোমরা এসেচ?

অপু ভাঙা ভাঙা কথায় আবোলতাবোল ভাবে পরিচয় দিল। মেজ বৌ-রানী বোধ হয় ইহাদের কথা এবার আসিয়া শুনিয়াছেন—বলিলেন—ও তোমরা কাশী থেকে এসেছ বুঝি?...কি নাম তোমার?—তাহার সুন্দর, সরল চোখের দিকে চাহিয়া তাঁহার বোধ হয় কেমন করুণা হইল। বলিলেন—এসো না ওপরে দাঁড়াবে—এখানে কেন?—ওপরে এসো—

অপু চোরের মতো বৌ-রানীর পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া কোণ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

উপরে মেয়েদের বড় মজলিশ, সারা বারান্দাটা কার্পেট-মোড়া। ধারে ধারে বড় বড় কাঁচকড়ার টবে গোলাপ গাছ, এরিকা পাম। কোণে বড় বৈঠকখানার অর্গানটা। একটি মেয়ে খানিকক্ষণ সাধাসাধির পর অর্গ্যানের ধারে ছোট গদি-আঁটা টুলে গিয়া বসিলেন ও দু'একবার হালকা হাতে চাবি টিপিয়া—খানিকক্ষণ চুপ করিয়া হাসিমুখে একটি গান ধরিলেন। মেয়েটি দেখিতে সুশ্রী নয়, রংটা মাঝামাঝি, কিন্তু গানের গলা ভারি সুন্দর। তাহার পর আর একটি মেয়ে গান গাহিলেন, এ মেয়েটি দেখিতে তত ভালো নয়। মেজ বৌ রানীর মেয়ে লীলা একটি হাসির কবিতা ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে আবৃত্তি করিয়া সকলকে খুব হাসাইল। ভারি সুন্দর মেয়ে, মায়ের মতো সুশ্রী। আর কি মিষ্টি হাসি।

অপু ভাবিতেছিল এই সময় তাহার মা একবার উপরে আসিয়া দেখিল না কেন? কোথায় রহিল মা কোন্ রান্নাঘরে পড়িয়া, হয়তো কাজ করিতেছে, এ সব মা আর কোথায় দেখিতে পাইবে?

মেয়েদের মজলিশ চলিতেছে, এমন সময় নিচে এক হৈ চৈ উঠিল। গিরিশ সরকারের গলাটা খুব শোনা যাইতেছিল।

সদু ঝি হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিয়া বলিল—পোড়ানি!..কাণ্ড দ্যাখো ..হি হি.. বলে কিনা হুঁকোর মধ্যে...হি হি...।

দুই-তিনজন নিমন্ত্রিতা মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হয়েচে রে? কি?

—ওই ঠিকে ঠাকুর একটা এসেছিল কোত্থেকে...লুচি ভাজতে গিয়েচে...সরকারদের খাবার ঘরের উঠোনে বসে লুচি ভাজচে... বলে আসি বাইরে থেকে একবার... হুঁকোর মধ্যে... হি হি... নিয়ে যাচ্চে পুরে চুরি করে... আধসেরের ওপর... গোমস্তা মশায় ধরেচে... রামনিহোর সিং মার যা দিচ্চে...চুলের ঝুঁটি না ধরে—

সর্বজয়ার আজ সকাল হইতে নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না। প্রায় দুই মন মাছ ভাজার ভার তার একার উপর—সকাল আটটা হইতে সে মাছের ঘরে এই কাজেই লাগিয়া আছে। চেঁচামেচি শুনিয়া সে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল এক উঠান লোকের মধ্যে একজন পঁচিশ-ত্রিশ বছরের পাতলা ময়লা রং-এর ময়লা কাপড়-পরা বামুনের ছেলেকে দু-তিনজনে মিলিয়া কেহ কিল, কেহ চড় বর্ষণ করিতেছে—লোকটা ঠিকে রাঁধুনী, অদ্যকার কার্যের জন্যই বাহির হইতে আসিয়াছিল—সে নাকি হুঁকার ভিতর করিয়া ঘি চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার সে হুঁকাটি একদিকে ছিটকাইয়া ঘিটুকু উঠানের একদিকে পড়িয়া গিয়াছে—কাছা মারের চোটে খুলিয়া গিয়াছে—লোকটা বিপন্নভাবে সাফাই গাহিবার চেষ্টা করিতেছে এবং হুঁকার ভিতরে ঘৃত পাওয়া একটা যে খুব স্বাভাবিক এবং নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা বা ইহার মধ্যে সন্দেহের বা আশ্চর্য হইবার কথা কিছুই নাই—এই কথা উন্মত্ত জনসঙ্ঘকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। কথা শেষ না করিতে দিয়াই শম্ভুনাথ সিং দারোয়ান তাহাকে

এমন এক ঠেলা মারিল যে, সে অস্ফুট স্বরে 'বাবা রে' বলিয়া দালানের কোণের দিকে ঘুরিয়া পড়িয়া গেল এবং থামের কোণে মাথাটা ঠক্ করিয়া জোরে লাগিয়া বোধ হয় রক্তও বাহির হইল।

সর্বজয়া ক্ষেমি ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েচে ক্ষেমিমাসি?... আহা, ওরকম করে মারে?... বামুনের ছেলে...

ক্ষেমি বলিল—মারবে না! হাড় গুঁড়ো করে ছাড়বে... মারার হয়েছে কি এখনও...পুলিশে দেবে, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা—

ক্ষেমি ঝির মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

সে উপরে উঠিবার সিঁড়ির দিকে চাহিয়াই তটস্থ অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। সর্বজয়া চাহিয়া দেখিল একজন পঁয়ষট্টি-সত্তর বছরের বৃদ্ধা সিঁড়ি বাহিয়া নামিতেছেন, পাশাপাশি গৃহিণী, পিছনে দুই বৌ-রানী ও এ বাড়ির মেয়ে অরুণা ও সুজাতা। সকল ঝি-চাকরের দল তটস্থ অবস্থায় সিঁড়ির নিচের বারান্দায় কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া—এ উহার পিঠে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। সর্বজয়া ক্ষেমি ঝিকে চুপি চুপি বলিল, কে ক্ষেমিমাসি? ক্ষেমি ঝি ফিস্‌ফিস্ করিয়া কি বলিল—কোথাকার রানীমা—সর্বজয়া ভালো শুনিতে পাইল না। কিন্তু তাহার মনে হইল ঠিক এইরকম চেহারার মানুষ সে যেন কোথায় আগে দেখিয়াছে। গিন্নি কাহাকে বলিলেন—খিড়কির ফটকে ইঁহার পালকি আসিয়াছে কিনা দেখিয়া আসিতে। বৃদ্ধার নিজের সঙ্গেও দুই তিনটি ঝি আসিয়াছে, তাহারা পিছনে পিছনে আছে। নানা বিদায় আপ্যায়নের বিনিময় হইল, বহু বিনীত হাস্য বিস্তার লাভ করিল, হঠাৎ এ বাড়ির ঝি-চাকরের দল মাটিতে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া খানিকক্ষণ যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া রহিল। সর্বজয়া মনে মনে ভাবিল—এরা এত বড়লোক, এরা যখন এত খাতির করচে, তখন তো যে সে নয়...। বৃদ্ধার ষোল বেহারার প্রকাণ্ড পালকিটা খিড়কির ফটকেই এতক্ষণ ছিল, বৃদ্ধাও পালকিতে উঠিলেন। তাঁহার দারোয়ানেরা পালকির সামনে পিছনে দাঁড়াইল। তাঁহাকে বিদায় দিয়া গৃহিণী, অন্যান্য মেয়েরা উপরে উঠিয়া গেলেন।

মাসিমা রুটির ঘরে আসিয়া চুপি চুপি বলিলেন—পয়সা রে বাপু, দেখলে তো পয়সার আদরটা? নিজেরই মস্ত জমিদারি, দুলাখ টাকা দান করেছেন, বাঙাল দেশের কোথাকার কলেজের জন্যে—পয়সারই আদর—আর এই তো আমিও আছি...ওদের তো আপনার লোক...গেরাহ্যি করে কেউ!

সর্বজয়ার কিন্তু সেদিকে মন ছিল না। এইমাত্র তাহার মনে পড়িয়াছে। অনেকটা এইরকম চেহারার ও এইরকম বয়সের—সেই তাহার বুড়ি ঠাকুরঝি ইন্দির ঠাক্‌রুন, সেই ছেঁড়া কাপড় গেরো দিয়া পরা, ভাঙা পাথরে আমড়া ভাতে ভাত, তুচ্ছ একটা নোনাফলের জন্য কত অপমান, কেউ পোঁছে না, কেউ মানে না, দুপুর বেলায়, সেই বাড়ি হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া, পথে পড়িয়া সেই দীন মৃত্যু...

সর্বজয়ার অশ্রু বাধা মানিল না।

মানুষের অন্তর-বেদনা মৃত্যুর পরপারে পৌঁছায় কিনা সর্বজয়া জানে না, তবু সে আজ বার বার মনে মনে ক্ষমা চাহিয়া অপরিণত বয়সের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কয়েকদিন পরে অপু দালান দিয়া যাইতেছে, উপরের সিঁড়ি বাহিয়া মেজ বৌ-রানীর মেয়ে লীলা নামিতেছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল—দাঁড়াও না? তোমার নাম কি—অপু না কি?

অপু বলিল—অপু বলে মা ডাকে—ভালো নাম শ্রীঅপূর্বকুমার রায়...

সে একটু অবাক হইল। এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা কখনও ডাকিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহে নাই। লীলা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কি সুন্দর মুখ। রানুদি, অতসীদি, অমলাদি, সকলেই দেখিতে ভালো বটে কিন্তু তখন সে তাহাদের চেয়ে ভালো কাহাকেও দেখে নাই। এ বাড়ি আসিয়া পর্যন্ত তাহার পূর্বেকার ধারণা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া মেজ বৌ-রানীর মতো সুন্দর কোনো মেয়ে কল্পনাও সে করে নাই। লীলাও মায়ের মতো সুন্দরী—সেদিন যখন লীলা মেয়ের মজলিশে হাসির কবিতা বলিতেছিল, তখন অপু একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, কবিতা সে ভালো শোনে নাই।

লীলা বলিল—তোমরা কতদিন এসেচ আমাদের বাড়ি? সেবার এসে তো দেখিনি?

—আমরা ফাল্গুন মাসে এইচি, এই ফাল্গুন মাসে—

—কোত্থেকে এসেচ তোমরা?

—কাশী থেকে। আমার বাবা সেইখানেই মারা গেলেন কিনা—তাই-—

অপুর যেন বিশ্বাস হইতেছিল না। সারা ঘটনাটা এখনও যেন অবাস্তব, অসম্ভব ঠেকিতেছিল। লীলা, মেজ বৌ-রানীর মেয়ে লীলা তাহাকে ডাকিয়া যাচিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহিতেছে! খুশিতে তাহার সারা গা কেমন করিতে লাগিল।

লীলা বলিল—চলো, আমার পড়ার ঘরে গিয়ে বসি, মাস্টার মশায়ের আসবার সময় হয়েচে—এসো—

অপু জিজ্ঞাসা করিল—আমি যাবো?

লীলা হাসিয়া বলিল—বারে, বলচি তো চলো, তুমি তো ভারি লাজুক?—এসো—তুমি দেখোনি আমার পড়ার ঘর? ওই পশ্চিমের দালানের কোণে?...

ঘর বেশি বড় নয় কিন্তু বেশ সাজানো। একটি ছোট পাথরের টেবিলের দুপাশে দুখানা চামড়ার গদি-আঁটা চেয়ার পাতা। একখানা বড় ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডার। সবুজ কাঁচকড়ার খোলে একটা ছোট টাইমপিস ঘড়ি। একটা বই রাখিবার ছোট দেরাজ। চার-পাঁচখানা বাঁধানো ফটোগ্রাফ এ দেওয়ালে, ও দেওয়ালে। লীলা একটা চামড়ার অ্যাটাশি কেস খুলিয়া বলিল—এই দ্যাখো আমার জলছবি, মাস্টার মশায় কিনে দিয়েছেন, ভাগ শিখলে আরও দেবেন, জলছবি ওঠাতে জানো?

অপু বলিল—তুমি ভাগ জানো না?

—তুমি জানো? ভাগ কষেচ?

অপু তাচ্ছিল্যের সহিত ঠোঁট উলটাইয়া বলিল—কবে!...

এই ভঙ্গিতে অপুর সুন্দর মুখখানি আরও ভারি সুন্দর দেখাইল।

লীলা হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তুমি বেশ মজার কথা বলতে পারো তো? পরে সে অপুর ঠোঁটের নিচে হাত দিয়া বলিল—এটা কি? তিল? বেশ দেখায় তো তোমার মুখে, তিলে বেশ মানিয়েচে, তোমার বয়স কত? তেরো? আমার এগারো—তোমার চেয়ে দু'বছরের ছোট—

অপু বলিল—তুমি সেদিন মুখস্ত বলেছিলে, সেই একটা হাসির ছড়া, বেশ লেগেচে আমার—

—তুমি জানো কবিতা?

—জানি—বাবার একখানা বই আছে, তা থেকে শিখিচি—

—বলো দিকি?

লীলার গলার সুর কি মিষ্টি, এমন সুর সে কোনো মেয়ের এ পর্যন্ত শোনে নাই।

অপু ঘাড় দুলাইয়া বলিল—

যে জনের খড় পেতে খেজুর চেটায় ঘুমিয়ে কাল কাটে,
তাকে খাট-পালঙ্ক খাসা মশারি খাটিয়ে দিলে কি খাটে?

কথার শেষে সে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ে। বলিল—দাশু রায়ের পাঁচালীর ছড়া, আমার কাছে বই আছে—

লীলা হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে আর কি। বলিল—তুমি ভারি মজার কথা জানো তো? এমন হাসাতে পারো তুমি!...

লীলার মুখের প্রশংসায় অপুর মনে আহ্লাদ ধরে না। সে উৎসাহের সুরে বলিল—আর একটা বলবো? আমি আরও জানি—পরে সে কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া একটুখানি ভাবিয়া লইয়া পরে আবার ঘাড় দুলাইয়া আরম্ভ করে—

মুনির চিন্তা চিন্তামণি নাই অন্য আশা
নিষ্কর্মা লোকের চিন্তা তাস আর পাশা।
ধনীর চিন্তা ধন আর নিরেনব্বই এর ধাক্কা
যোগীর চিন্তা জগন্নাথ, ফকিরের চিন্তা মক্কা,
গৃহস্থের চিন্তা বজায় রাখতে চারি চালের ঠাট্‌টা,
শিশুর চিন্তা সদাই মাকে, পশুর চিন্তা পেট্‌টা।

এ ছড়ার সকল কথার অর্থ লীলা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু আবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িবার জোগাড় করিল। বলিল, দাঁড়াও লিখে নেবো—

লীলা অ্যাটাশি কেস্‌টা হইতে একটা কলম বাহির করিয়া বলিল—বলো দিকি?

অপু আবার বলিতে শুরু করিল। খানিকটা পরে একটু অবাক হইয়া বলিল—কালি নেওনি তো লিখ্‌চো কেমন করে?

লীলা বলিল—এ তো ফাউন্টেন পেন—কালি তো লাগে না, এর মধ্যে ভরা আছে—জানো না?

অপুর হাতে লীলা কলমটা তুলিয়া দিল। অপু উলটাইয়া-পালটাইয়া দেখিয়া বলিল—এ তো বেশ, কালিতে মোটে ডোবাতে হয় না!

—তা নয়, কালি ভরা থাকে, ভরে নিতে হয়—এই দ্যাখো, দেখিয়ে দি—

—বাঃ বেশ তো! দেখি একবারটি—

লীলা কলমটা অপুর হাতে দিয়া হাসিমুখে বলিল—তোমায় দিয়ে দিলাম একেবারে—

অপু অবাক হইয়া লীলার দিকে চাহিল। পরে লজ্জিতমুখে বলিল—না আমি নেবো না···

লীলা বলিল—কেন?

—উঁহু—

—কেন?

—নাঃ।

লীলা একটু দুঃখিত হইল। বলিল—নাও না?...আমি আর একটা বাবার কাছ থেকে নেবো, নাও তুমি এটা, দেখি তোমার হাত? বাস!... আর ফেরত দিতে পারবে না।

ব্যাপারটা অপুর সম্পূর্ণ অবাস্তব ঠেকিল। সে বলিল—কিন্তু তোমায় যদি কেউ বকে?

লীলা বলিল—ফাউন্টেন পেন দেবার জন্যে? কেউ বকবে না, আমি মাকে বলবো অপূর্বকে দিয়ে দিলাম—বাবার কাছ থেকে আর একটা নেবো—বাবার ফটো দেখবে?...ওই ক্যালেন্ডারের পাশে টাঙানো—দাঁড়াও পাড়ি—

তাহার পর লীলা আরও দু'তিনখানি ফটো দেখাইল। আলমারি হইতে খানকতক বই বাহির করিয়া বলিল—মাস্টার মশায় কিনে দিয়েছেন—তুমি কোন্ স্কুলে পড়ো?

অপু কাশীতে সেই যা দিনকতক স্কুলে পড়িয়াছিল, আর ঘটে নাই। বলিল—কাশীতে পড়তাম এখন আর পড়ি নে—কথাটা বলিতে সে সংকোচ বোধ করিতেছিল বলিয়াই শেষের কথাটা এমন সুরে বলিল, যেন না পড়িয়া খুব একটা বাহাদুরি করিতেছে। একখানা বইয়ে অনেক ছবি। অপু বলিল—বইখানা পড়তে দেবে একবারটি?

লীলা বলিল—নাও না? আমার আরও অনেক ছবির বই আছে, তিন বছরের বাঁধানো মুকুল আছে, মায়ের ঘরের আলমারিতে, এনে দেবো, পড়ো—

অপু বলিল—আমার কাছেও বই আছে, আনবো?

লীলা বলিল—চলো, তোমাদের ঘরে যাই—

লীলাকে নিজেদের ঘরে লইয়া যাইতে অপুর লজ্জা করিতে লাগিল। আসবাবপত্র কিছু নাই, ছেঁড়া বালিশের ওয়াড়, আলনায় গায়ে দেওয়ার কাঁথা। লীলা তবুও গেল। অপু নিজের টিনের বাক্সটা খুলিয়া একখানা কি বই হাসি-হাসি মুখে দেখাইয়া গর্বের সুরে বলিল—আমার লেখা, এই দ্যাখো, ছাপার অক্ষরে লেখা আছে আমার নাম—

লীলা তাড়াতাড়ি হাত হইতে লইয়া বলিল—দেখি দেখি?

সেই কাশীর স্কুলের ম্যাগাজিনখানা। হরিহর ছেলের গল্প ছাপানো দেখিয়া যাইতে পারে নাই, তাহার মৃত্যুর তিন দিন পরে কাগজ বাহির হয়। লীলা পড়িতে লাগিল, অপু তাহার পাশে বসিয়া উৎফুল্ল মুখে লীলার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া পঠিত লাইনগুলি নিজেও মনে মনে একবার করিয়া পড়িয়া যাইতেছিল। শেষ করিয়া লীলা প্রশংসমান চোখে অপুর মুখের দিকে খানিকটা চাহিয়া থাকিয়া বলিল—বেশ তো হয়েছে, আমি এখানা নিয়ে যাই, মাকে দেখাবো—

অপুর ভারি লজ্জা হইল। বলিল—না—

লীলা শুনিল না। কাগজখানা হাতে করিয়া রাখিল। বলিল—নিশ্চিন্দিপুর লেখা আছে, নিশ্চিন্দিপুর কোথায়?

—নিশ্চিন্দিপুর যে আমাদের গাঁ—সেইখানেই তো আমাদের আসল বাড়ি—কাশীতে তো মোটে বছর খানেক হল আমরা—

এমন সময় ছোট মোক্ষদা দুয়ারের কাছে আসিয়া ঘরের মধ্যে মুখ বাড়াইয়া কহিল—ওমা দিদিমণি, তুমি এখানে বসে? আমার পোড়ানি! ওদিকে মাস্টারবাবু বসে বসে হয়রান, আমি ওপর নিচে সব ঘর খুঁজে খুঁজে—তা কে জানে তুমি এঁদো-পড়া কুঠুরিতে—এসো এসো—

লীলা বলিল—যা তুই, আমি যাচ্ছি, যা—

ছোট মোক্ষদা বলিল—তা বসবার কি এই জায়গা নাকি? বলে আমাদেরই তাই মাথা ধরে—তাই কি ওই আস্তাবলের খোট্টা মিন্সেরা ঘোড়ার জায়গাগুলো ঝাঁট দেয়, না ধোয়? উহু-হু, কি গন্ধ আসছে দ্যাখো—এসো দিদিমণি, শিগ্‌গির—

লীলা বলিল—যাবো না যাঃ, আমি আজ পড়বো না, যা বল্‌গে যা—কে তোকে বলেছে এখানে বক্‌বক্ করতে? যা মাকে বলগে যা—

ছোট মোক্ষদা খর্ খর্ করিয়া চলিয়া গেল। অপু বলিল—তোমার মা বক্‌বেন না? কেন ওকে ওরকম বল্লে?

পরদিন দুপুরে সে নিজের ঘরে ঘুমাইতেছিল। কাহার ঠেলায় ঘুম ভাঙিয়া চোখ চাহিয়াই দেখিল—লীলা হাসিমুখে বিছানার পাশে। সে মেঝেতে মাদুর পাতিয়া ঘুমাইতেছিল, লীলা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাকে ঠেলা মারিয়া উঠাইয়াছে, এখনও সেই ভাবেই কৌতুকপূর্ণ ডাগর চোখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। হাসিমুখে বলিল—বেশ তো, দুপুর বেলায় বুঝি এমন ঘুমোয়? আমি বা'র থেকে ডাক দিলাম, এসে দেখি খুব ঘুম—

অপু কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। বলিল—সকালবেলা পড়তে আসোনি? আমি তো পড়ার ঘর-টর সব খুঁজে দেখি কেউ কোথাও নেই—

লীলা অপুর স্কুলের সেই কাগজখানা অপুর হাতে দিয়া বলিল—মাকে পড়ে শোনালাম কাল রাত্রে, মা নিজেও পড়ে দেখলেন।

অপুর সারা গা খুশিতে কেমন করিয়া উঠিল। অত্যন্ত লজ্জা ও সংকোচ বোধ হইল। মেজ বৌ-রানী তাহার লেখা পড়িয়াছেন।

লীলা বলিল—এসো আমার পড়ার ঘরে, 'সখা-সাথী' বাঁধানো এনে রেখেচি তোমার জন্যে—

অপু আলনার দিকে চাহিল। তাহার ভালো কাপড়খানা এখনও শুকায় নাই, যেখানা পরিয়া আছে সেখানা পরিয়া বাহিরে যাওয়া যায় না। বলিল—এখন যাবো না—

লীলা বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন?

অপু ঠোঁট চাপিয়া সকৌতুক হাসিমুখে ঘাড় নাড়িল। সে জানে না তাহার মুখ কি অপূর্ব সুন্দর দেখায় এই ভঙ্গিতে।

লীলা মিনতির সুরে বলিল—এসো এসো—

অপু আবার মুখ টিপিয়া হাসিল।

—বাবা, কি একগুঁয়ে ছেলে যে তুমি! না বল্লে আর হাঁ হবার জো নেই বুঝি? আচ্ছা দাঁড়াও, বইটা এখানে—

অপু হাসি চাপিতে না পারিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

লীলা বলিল—অত হাসি কেন? কি হয়েছে বলো—না বলতেই হবে—বলো ঠিক—

অপু আলনার দিকে হাসি-ভরা চোখের ইঙ্গিত করিল মাত্র, কিছু বলিল না।

এবার লীলা বুঝিল। আলনার কাছে গিয়া হাত দিয়া বলিল—একটুখানি শুকিয়েছে, তুমি বসো, আমি বইখানা আনি—ফাউন্টেন পেনে লিখচো? কেমন, বেশ ভালো লেখা হয় তো?

তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া লীলার আনা বই দুজনে দেখিল। বই মাদুরে পাতিয়া দুইজনে পাশাপাশি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া উপুড় হইয়া বই-এর উপর ঝুঁকিয়া বই দেখিতেছিল। লীলার রেশমের মতো চিকন নরম চুলগুলি অপুর খোলা গায়ে লাগিয়া যেন গা সির্ সির্ করে। হঠাৎ লীলা বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিল—তুমি গান জানো?

অপু ঘাড় নাড়িল।

—তবে একটা গাও—

—তুমি জানো?

—একটু একটু, কেন বিয়ের দিন শোনোনি?

ছোট মোক্ষদা ঝি ঘরে উঁকি মারিয়া কহিল—এই যে দিদিমণি এখানে। আমিও মনে ভেবেচি তাই, উপরে নেই, পড়ার ঘরে নেই, তবে ঠিক—এসো দিকি, এই দুধটুকু খেয়ে যাও, জুড়িয়ে গেল—হাতে করে খুঁজে খুঁজে হয়রান—

রূপার ছোট গ্লাসে এক গ্লাস দুধ! লীলা বলিল—রেখে যা—এসে এর পর গ্লাস নিয়ে যাস্—

ঝি চলিয়া গেল। আরও খানিকটা বইয়ের ছবি দেখা চলিল। এক ফাঁকে লীলা দুধের গ্লাস হাতে তুলিয়া বলিল—তুমি খেয়ে নাও আদ্ধেকটা—

অপু লজ্জিত সুরে বলিল—না।

—তোমাকে ভারি খোশামোদ কর্তে হয় সব তাতে—কেন ওরকম? আমাদের মুলতানী গরুর দুধ—খেয়ে নাও—ক্ষীরের মতো দুধ, লক্ষ্মী ছেলে—

অপু চোখ কুঁচকাইয়া বলিল—ইঃ লক্ষ্মী ছেলে? ভারি ইয়ে কি না? উনি আবার—

লীলা দুধের গ্লাস অপুর মুখে তুলিয়া দিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আর লজ্জায় কাজ নেই—আমি চোখ বুজে আছি, নাও—

অপু এক চুমুকে খানিকটা দুধ খাইয়া-ফেলিয়া মুখ নামাইয়া লইল ও ঠোঁটের উপরের দুধের দাগ তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটে মুছিতে মুছিতে হাসিয়া ফেলিল।

লীলা গ্লাসে চুমুক দিয়া বাকি দুধটুকু শেষ করিল, পরে সেও খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—বেশ মিষ্টি দুধ, না?

—আমার এঁটো খেলে কেন? খেতে আছে পরের এঁটো?

—আমার ইচ্ছে—একটুখানি থামিয়া কহিল—তুমি বল্লে জলছবি তুলতে জানো, ছাই জানো, দাও তো আজ আমার ক'খানা জলছবি তুলে?

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সর্বজয়া চাহিয়া-চিন্তিয়া কোনো রকমে অপুর উপনয়নের ব্যবস্থা করিল। পরের বাড়ি, ঠাকুর-দালানের রোয়াকের কোণে ভয়ে ভয়ে কাজ সারিতে হইল। বাম্‌নী মাসি নাড়ু ভাজিতে সাহায্য করিল, দু'একজন রাঁধুনী-বামুনঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল, বাহিরের সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে বীরু গোমস্তা ও দীনু খাতাঞ্জি। উপনয়ন মিটিয়া যাওয়ার দিনকতক পরে অপু নিজের ঘরটিতে বসিয়া বসিয়া লীলার দেওয়া বাঁধানো 'মুকুল' পড়িতেছিল। খোলা দরজা দিয়া কে ঘরে ঢুকিল। অপু যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতেই পারিল না, তাহার পরই বলিয়া উঠিল—এ কি, বাঃ—কখন—

লীলা কৌতুক ও হাসিভরা চোখে দাঁড়াইয়া। অপু বলিল—বাঃ, বেশ তো তুমি। বলে গেলে সোমবারে আসবো কলকাতা থেকে, কত সোমবার হয়ে গেল—ফিরবার নামও নেই—

লীলা হাসিয়া মেজেতে বসিয়া পড়িল। বলিল—আসবো কি করে? স্কুলে ভর্তি হয়েচি, বাবা দিয়েছেন ভর্তি করে, বাবার শরীর খারাপ, এখন আমরা কলকাতার বাড়িতেই থাকবো কি না? এখন ক'দিন ছুটি আছে তাই মার সঙ্গে এলাম—আবার বুধবার যাবো।

অপুর মুখ হইতে হাসি মিলাইয়া গেল। বলিল—থাকবে না আর তোমরা এখানে?

লীলা বলিল—বাবার শরীর ভালো হলে আবার আসবো—

পরে সে হাসিমুখে বলিল—চোখ বুজে থাকো তো একটু?

অপু বলিল—কেন?

—থাকো না?

অপু চক্ষু বুজিল ও সঙ্গে সঙ্গে হাতে কি একটা ভারী জিনিসের স্পর্শ অনুভব করিল। চোখ খুলিতেই লীলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। একটা কার্ড বোর্ডের বাক্স তাহার কোলের উপর। বাক্সটা খুলিয়া ফেলিয়া লীলা দেখাইল ভালো দেশী ধুতি চাদর ও রাঙা সিল্কের একটা পাঞ্জাবি। লীলা হাসিমুখে বলিল—মা দিয়েছেন—কেমন হয়েচে? তোমার পৈতের জন্যে—

ধুতি-চাদর বিশেষ করিয়া পাঞ্জাবিটা দরের জিনিস, ব্যবহার করা দূরের কথা। এ বাড়িতে পা দিবার পূর্বে অপু চক্ষেও কখনও দেখে নাই।

লীলা অপুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—এক মাসে তোমার মুখ বদলে গিয়েছে? আরও বড় দেখাচ্চে, দেখি নতুন বামুনের পৈতে?—তারপর কান বিঁধতে লাগলো না? আমার ছোট মামাতো ভাইয়েরও পৈতে হল কিনা, সে কেঁদে ফেলেছিল—

হঠাৎ অপু একখণ্ড 'মুকুল' দেখাইয়া বলিল—পড়েচো এ গল্পটা?

লীলা বলিল—কি দেখি?

অপু পড়িয়া শোনাইল। সমুদ্রের তলায় কোন্ স্থানে স্পেনদেশের এক ধনরত্নপূর্ণ জাহাজ দুই তিনশত বৎসর পূর্বে ডুবিয়া যায়—আজ পর্যন্ত অনেকে খোঁজ করিয়াছে, কেহ স্থানটা নির্ণয় করিতে পারে নাই। গল্পটা এইমাত্র পড়িয়া সে ভারি খুশি হইয়াছে।

বলিল—কেউ বার কর্তে পারেনি—কত টাকা আছে জানো? একক, দশক, শতক, সহস্র,

অযুত, লক্ষ—পঞ্চাশ লক্ষ পাউন্ডের সোনা-রুপো... এক পাউন্ডে তেরো টাকা—গুণ করো দিকি? * তাহার পরে সে তাড়াতাড়ি একটু কাগজে আঁকটা কষিয়া দেখাইয়া বলিল—এই দ্যাখো এত টাকা!...আগেও সে আঁকটা একবার কষিয়াছে। উজ্জ্বলমুখে বলিল—আমি বড় হলে যাবো—দেখ্‌বো গিয়ে—ঠিক বার করবো দেখো—কেউ সন্ধান পায়নি এখনও সেখেনে—

লীলা সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল—তুমি যাবে? কোন্ জায়গায় আছে তুমি বার করবে কি করে?

—এই দ্যাখো লিখেচে "পোর্তো প্লাতার সন্নিহিত সমুদ্র গর্ভে"—খুঁজে বার করবো!...

সে গল্পটি পড়িয়াই ভাবিয়াছে, ভালোই হইয়াছে কেহ বাহির করিতে পারে নাই। সবাই সব বাহির করিয়া লইলে তাহার জন্য কি থাকিবে? সে বড় হইয়া তবে কি তুলিবে? এখন সে যাওয়া পর্যন্ত থাকিলে হয়!...

লীলার বয়স কম হইলেও খুব বুদ্ধিমতী। ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল—ওদের মতো জাহাজ পাবে কোথায়? তোমার একখানা আলাদা জাহাজ চাই—ওদের মতন—

—সে হয়ে যাবে, কিন্‌বো, বড় হলে আমার টাকা হবে না বুঝি?

এবার বোধ হয় লীলার অনেকটা বিশ্বাস হইল। সে এ লইয়া আর কোনও তর্ক উঠাইল না।

খানিকটা পরে বলিল—তুমি কলকাতা গিয়েচ?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আমি দেখিনি কখ্‌খনো—খুব বড় শহর?—এর চেয়ে বড়?

লীলা হাসিয়া বলিল—ঢের ঢের—

—কাশীর চেয়েও বড়?

—কাশী আমি দেখিনি—

তারপর সে অপুকে নিজের পড়ার ঘরে লইয়া আসিল। একখানা খাতা দেখাইয়া বলিল—দ্যাখো তো কেমন ফুলগাছ এঁকেচি, কি রকম ড্রইংটা?

অপু খানিকটা পরে বলিল—আমি শুইগে, মাথাটা বড্ড ধরেচে—

লীলা বলিল—দাঁড়াও আমি একটা মন্তর জানি মাথা-ধরা সারাবার—দেখি? পরে সে দুহাতের আঙুল দিয়া কপাল এমনভাবে টিপিয়া দিতে লাগিল যে অপু হাসিয়া উঠিয়া বলিল—উঃ বড় সুড়সুড়ি লাগ্‌চে।

লীলা হাসিয়া বলিল—আমার বড় মামাতো ভাইকে কুস্তি শেখায় একজন পালোয়ান আছে, তার কাছে শেখা—বেশ ভালো না? সেরেচে তো?

দিনকতক পরেই লীলারা পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া গেল।

অপু মাকে বলিয়া কহিয়া একটা ছোট স্কুলে যায়। যে বড় রাস্তার ধারে ইঁহাদের বাড়ি, সেখান হইতে কিছুদূর গিয়া বাঁ-ধারে ছোট গলির মধ্যে একতলা বাড়িতে স্কুল। জনপাঁচেক মাস্টার, ভাঙা বেঞ্চি, হাতল-ভাঙা চেয়ার, তেলকালি ওঠা ব্ল্যাকবোর্ড, পুরানো ম্যাপ খানকতক—ইহাই স্কুলের আসবাব। স্কুলের সামনেই খোলা ড্রেন, অপুদের ক্লাস হইতে জানালা দিয়া বাহিরে চাহিলে পাশের বাড়ির চুনবালির কাজ-বিরহিত নগ্ন ইঁটের দেওয়াল নজরে পড়ে। সে স্কুলে যাইতে যাইতে দেখে ধাঙড়ে ড্রেন সাফ করিতে করিতে চলিয়াছে, স্থানে স্থানে ময়লা জড়ো করা। সারাদিন স্কুলের মধ্যে কেমন একটা বদ্ধ বাতাসের গন্ধ, পাশের এক হিন্দুস্থানী ভুজাওয়ালা দুপুরের পর কয়লার আঁচ দেয়, কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বাহির হয়, অপুর মাথার মধ্যে কেমন করে, স্কুলের বাহিরে আসিয়া যেন সেটা কাটিতে চায় না।

তাহার ভালো লাগে না, মোটেই ভালো লাগে না, শহরের এই সব ইঁট-সিমেন্টের কাণ্ড-

* ১৯২৮ সালের হিসাবে এক পাউন্ডের দাম ছিল ভারতীয় মুদ্রায় ১৩ টাকা।

কারখানায় তাহার হাঁফ ধরে, কেমন যেন দম আট্‌কাইয়া আসে। কিসের অভাবে প্রাণটা যেন আকুলি-বিকুলি করে, সে বুঝিতে পারে না কিসের অভাবে।

পথে ঘাস খুব কম, গাছপালা বেশি নাই, দু'একটা এখানে ওখানে। সুর্‌কির পথ, পাকা ড্রেন, দুই বাড়ির মাঝখানের ফাঁকে আবর্জনা, ময়লা জল, ছেঁড়া কাপড়, কাগজ। একদিন সে এক সহপাঠীর সঙ্গে তাহাদের বাড়িতে গিয়াছিল। একতলা খোলার ঘর। অপরিসর উঠানের চারিধারের ঘরগুলিতে এক-একঘর গৃহস্থ ভাড়াটে থাকে। দোরের গায়ে পুরানো চটের পর্দা। ঘরের মেঝে উঠান হইতে বিঘতের বেশি উঁচু নয়, কাজেই আর্দ্রতা কাটে না। ঘরের মধ্যে আলো-হাওয়ার বালাই নাই। উঠান বিশ্রী নোংরা, সকল গৃহস্থই একসঙ্গে কয়লার আঁচ দিয়াছে, আবার সেই মিষ্টি মিষ্টি গন্ধটা। সবসুদ্ধ মিলিয়া অপুর অত্যন্ত খারাপ লাগে, মন যেন ছোট এতটুকু হইয়া যায়, সেদিন তাহারা উহাকে বসিতে বলিলেও সে বেশিক্ষণ থাকিতে পারে নাই, সদর রাস্তায় আসিয়া তবুও অনেকটা স্বস্তি বোধ করিয়াছিল।

বাড়ি ফিরিয়াও সেই বদ্ধতা। বরং যেন আরও বেশি। এখানে ইঁট-সিমেন্ট আর মার্বেল পাথরে চারিধার মায় উঠান পর্যন্ত বাঁধানো। অপু মাটি দেখিতে না পাইলে থাকিতে পারে না, এখানে যা মাটি আছে, তাও যেন অন্যরকম। যে মাটির সঙ্গে তার পরিচয় এ যেন সে মাটি নয়। তাহা ছাড়া ইহাদের বাড়ি চলিবার ফিরিবার স্বাধীনতা কই? থাকিতে হয় ভয়ে ভয়ে চোরের মতো। কে কি বলিবে, উঁচু গলায় কথা কওয়া যায় না, ভয় করে।

এক-একদিন অপু দপ্তরখানায় গিয়া দেখিয়াছে বুড়ো খাতাঞ্জি একটা লোহার সিক বসানো খাঁচার মতো ঘরে অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া থাকে। অনেকগুলি খেরো বাঁধানো হিসাবের খাতা একদিকে স্তূপীকৃত করা। ছোট্ট কাঠের হাতবাক্স সামনে করিয়া বুড়া সারাদিন ঠায় একটা ময়লা চিট তাকিয়া হেলান দিয়া আছে। ঘরে এত অন্ধকার যে, দিনমানেও মাঝে মাঝে ছোট্ট একটা রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলে। গিরিশ গোমস্তা জমা-সেরেস্তায় বসে। নিচু তক্তাপোশের উপর ময়লা চাদর পাতা—চারিধারে দু'কোণে কাপড়ে বাঁধা রাশি রাশি দপ্তর। সে ঘরটা খাতাঞ্জিখানার মতো অত অন্ধকার নয়, দু'তিনটি বড় বড় জানালাও আছে, কিন্তু তক্তপোশের নিচে রাশীকৃত তামাকের গুল ও ছেঁড়া কাগজ এবং কড়িকাঠে মাকড়সার জাল ও কেরোসিন আলোর ঝুল। যখন বীরু মুহুরি হাঁকিয়া বলে—ওহে রামদয়াল, দেখো তো গত তৌজিতে বাদ্যকর খাতে কত খরচ লেখা আছে?... তখনই কি জানি কেন অপুর মনে দারুণ বিতৃষ্ণা আবার জাগিয়া উঠে।

সকালবেলা। অপু দেউড়ির কাছটায় আসিয়া দেখিল বাড়ির ছেলেরা চেয়ার-গাড়িটা ঠেলিয়া খেলিতেছে। গাড়িটা নূতন তৈয়ারি হইয়া আসিয়াছে, ডাণ্ডালাগানো লোহার চেয়ার, উপরে চামড়ার গদি, বড় বড় চাকা—ঝক্‌ঝকে দেখিতে। সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, রমেন বলিল—এই, এসে ঠেল তো একবার আমাদের—

এই গাড়িটা আসা অবধি অপুর মনে মনে ইহার উপর লোভ আছে, খুশি হইয়া বলিল—ঠেলচি, আমায় একবার চড়তে দেবেন তো?

রমেন বলল—আচ্ছা হবে, ঠেল্ তো—খুব জোরে দিবি—

খুব খানিকক্ষণ খেলা হইবার পর রমেন হঠাৎ বলিল—আচ্ছা খুব হয়েচে এবেলা—থাক্ আর নয়—

পরে গাড়ি লইয়া সকলে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া অপু বলিল—আমি এট্টু চড়বো না?

রমেন বলিল—আচ্ছা যা যা, এ বেলা আর চড়ে না, বেশি চড়লে আবার ভেঙে যাবে—দেখা যাবে ওবেলা—

ক্ষোভে অপুর চোখে জল আসিল। সে এতক্ষণ ধরিয়া আশায় আশায় ইহাদের সকলকে প্রাণপণে ঠেলিয়াছে।

বলিল—বা, আপনি যে বল্লেন আমাকে একবার চড়তে দেবেন আমার পালায়? আমি সকলকে ঠেল্‌লাম—বেশ তো! সেদিনও ওইরকমই চড়ালেন না শেষকালে—

রমেন বলিল—ঠেললি কেন তুই, না ঠেললেই পাত্তিস—যা—কে বলেচে তোকে চড়তে দেবে? গাড়ি কিনতে পয়সা লাগে না?

সে বলিল—কেন আপনিও বল্লেন, ওই সন্তুও তো বল্লে—ঠেলে ঠেলে আমার হাত গিয়েছে—আর আমি বুঝি একবারটি—বেশ তো আপনি—

রমেন গরম হইয়া বলিল—আমি বলিনি যা—

সন্তু বলিল—ফু-র্‌-র্‌-র্‌,—বক দেখেচ?

কোনও কিছু না, হঠাৎ বড়বাবুর ছেলে টেবু আসিয়া তাহার গলায় হাত দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বলিল—যা যা—আমরা চড়াবো না আমাদের খুশি—তোর নিজের ঘরের দিকে যা—এদিকে আসিস কেন খেলতে?

টেবু অপুর অপেক্ষা বয়সে ছোট বলিয়া তাহার কৃত অপমানের দরুনই হউক বা সকলের ঠাট্টা বিদ্রূপের জন্যই হউক—অপুর মাথা কেমন বেঠিক হইয়া গেল—সে ঝাঁকুনি দিয়া ঘাড় ছিনাইয়া লইয়া টেবুকে এক ধাক্কা মারিতেই টেবু ঘুরিয়া গিয়া দেওয়ালের উপর পড়িয়া গেল—কপালটা দেওয়ালে লাগিয়া খানিকটা কাটিয়া রক্তপাত হইতে টেবু সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঝি-চাকর ছুটিয়া আসিল, খানসামা দারোয়ান ছুটিয়া আসিল—উপরের বৈঠকখানায় বড়বাবু সকালবেলা কাছারি করিতেছিলেন, তিনি সদলবলে নিচে নামিয়া আসিলেন। দশ দিক হইতে দশ ঘটি জল...বাতাস...জলপটি, হৈ-হৈ কাণ্ড!

গোলমাল একটু কমিলে বড়বাবু বলিলেন—কই, কে মেরেচে দেখি?

রামনিহোরা সিং দারোয়ান পিছন হইতে ঠেলিয়া অপুকে বড়বাবুর সামনে দাঁড় করাইয়া দিল।

বড়বাবু বলিলেন—এ কে? ওই সেই কাশীর বামুনঠাকরুনের ছেলে না?

গিরিশ সরকার আগাইয়া আসিয়া বলিল—ভারি বদ্‌ ছোক্‌রা—আবার জ্যাঠামি ওর যদি শোনেন বাবু, সেই সেবার থিয়েটারের দিন, বসেচে একেবারে সকলের মুখের সামনে বাবুদের জায়গায়. সরে বসতে বলেচি, মুখোমুখি তর্ক কি? সেদিন আবার দেখি ওই শেঠেদের বাড়ির মোড়ে রাস্তায় একটা লাল পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বার্ডসাই খেতে খেতে আসচে—এই বয়সেই তৈরি—

বড়বাবু রমেনকে বলিলেন—সকালে আজ তোমাদের মাস্টার আসেনি? পড়াশুনো ছিল না? এই, আমার বেতের ছড়িটা নিয়ে এসো তো কেউ? ওর সঙ্গে মিশে খেলা কর্তে কে বলে দিয়েচে তোমাদের?

রমেন কাঁদো কাঁদো মুখে বলিল—ও-ই তো আমাদের খেলার সময় আসে, আমরা কেন যাবো, জিজ্ঞেস করুন বরং সন্তুকে—আপনার সেই ছবিওয়ালা ইংরাজি ম্যাগাজিনগুলোর ছবি দেখতে চায়—আবার বড় বৈঠকখানায় ঢুকে এটা সেটা নেড়েচেড়ে দেখে—

গিরিশ সরকার বলিল—দেখুন, শখটা দেখুন আবার—

এবার অপুর পালা। বড়বাবু বলিলেন।—সরে এসো এদিকে—টেবুকে মেরেছ কেন?

ভয়ে অপুর প্রাণ ইতিপূর্বেই উড়িয়া গিয়াছিল, সে রাগের মাথায় ধাক্কা দিয়াছিল বটে কিন্তু এত কাণ্ডের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে আড়ষ্ট জিহ্বা দ্বারা অতি কষ্টে উচ্চারণ করিল—টেবু আমাকে আগে তো—আমাকে—

বড়বাবু কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন—টেবুর বয়স কত আর তোমার বয়স কত জানো?

গুছাইয়া বলিতে জানিলে অপুর পক্ষ হইতেও একথা বলা চলিত যে টেবুর বয়স কিছু কম হইলেও কার্যে সে অপুর জেঠামশাই নীলমণি রায় অপেক্ষাও পাকা। বলা চলিতে পারিত যে, টেবু

ও এ-বাড়ির সব ছেলেই বিনা কারণে যখন তখন তাহাকে বাঙাল বলিয়া খেপায়, বক দেখায়, পিছন হইতে মাথায় ঠোকর মারে—সে না হয় একটু খেলা করিতে যায় এই তো তাহার অপরাধ। কিন্তু উঠানভরা লোকারণ্যের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে বিশেষ করিয়া বড়বাবুর সঙ্গে কথা কহিতে জিহ্বা তাহার তালুর সঙ্গে জুড়িয়া গিয়াছিল—সে শুধু বলিল—টেবুও—আমাকে—শুধু শুধু—আমাকে এসে—

বড়বাবু গর্জন করিয়া বলিলেন—স্টুপিড, ডেঁপো ছোকরা—কে তোমাকে বলে দিয়েচে এদিকে এসে ওদের সঙ্গে মিশতে—এই দাও তো বেতটা—এগিয়ে এসো—এসো—

সপাং করিয়া এক ঘা সজোরে পিঠে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে কেমন বিস্ময়ের চোখে বড়বাবু ও তাঁহার পুনর্বার উদ্যত বেতের ছড়িটার দিকে চাহিল—জীবনে সে কখনও ইহার পূর্বে মার খায় নাই, বাবার কাছেও নয়—তাহার বিভ্রান্ত মন যেন প্রথমটা প্রহার খাওয়ার সত্যটাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না—পরে সে কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই বেতটা ঠেকাইবার জন্য হাত দুখানা উঠাইল। কিন্তু এবার আর তাহার দুঃখ করিবার কিছু রহিল না যে, সে তাহার পালার বেলা ফাঁকে পড়িল। বেতের সপাসপ শব্দে টেবুকেও কপালের ব্যথা ভুলিয়া চাহিয়া দেখিতে হইল। রাঁধুনীর ছেলের যাহাতে স্পর্ধা আর না হয়, বড়বাবু এ বিষয়ে তাহাকে সুশিক্ষাই দিলেন। অন্য বেত হইলে ভাঙিয়া যাইত, এ বেতটা বোধ হয় খুব দামি।

বড়বাবু হাঁপ জিরাইয়া লইয়া বলিলেন—বুড়ো ধাড়ি বয়াটে ছোক্‌রা কোথাকার, আজ তোমাকে সাবধান করে দিচ্চি, ফের যদি শুনি এ বাড়ির কোনো ছেলের সঙ্গে মিশেচ, কান ধরে তক্ষুনি বাড়ি থেকে বিদেয় করে দেবো—পরে কাহাব দিকে চাহিয়া কহিলেন—দেখুন না ধীরেনবাবু, বিধবা মা, সতীশবাবু ম্যানেজার কাশী থেকে আনলেন, ভাবলাম জাতের মেয়ে থাকুক—দেখুন কাণ্ড, মা ভাত রাঁধে—উনি পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে সিগারেট খেয়ে বেড়ান—

ধীবেনবাবু বলিলেন—ওসব ওই রকমই হয়ে থাকে—এরপর কোকেন খাবে—মা'র বাক্স ভাঙবে—ওর নিয়মই ওই—তার ওপর আবার কাশীর ছেলে—

বাড়ির মধ্যে সব কথা গিয়া পৌঁছায় না, অপুর মার খাওয়ার কথা কিন্তু সর্বজয়া শুনিল। একটু ভালো কবিয়াই শুনিল। গৃহিণী বলিলেন—ওবকম যদি গুণ্ডো ছেলে হয় তা হলে বাছা—ইত্যাদি।

বুটির ঘর হইতে আসিয়া দেখিল অপু স্কুলে গিয়াছে, মাকে কিছু বলে নাই, এসব কথা সে কখনও মাকে বলেও না। রাগে দুঃখে, ক্ষোভে সর্বজয়ার গা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল, সর্বাঙ্গ হইতে যেন ঝাল বাহির হইতে থাকিল, ঘরে না থাকিতে পারিয়া সে বাহিরের অপরিসর বারান্দাটাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহার অপুর গায়ে হাত! সে যে এখনও বলে, মা সিঁড়ির ঘর দিয়ে যখন তুমি রান্নাবাড়ি থেকে আসবে তখন রাত্রে তোমায় একদিন এমন ভয় দেখাবো?...তাহার কি কোনো বুদ্ধি আছে? কত লাগিয়াছিল, কে তাহাকে বুঝিয়াছে সেখানে, কে শুনিয়াছে তাহার কান্না?

সর্বজয়ার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল।...

অন্ধকার রাত, আকাশে দু'একটা তারা জ্বল জ্বল করে—আস্তাবলের মাথায় আমলকি গাছের ডালে বাতাস বাধে, দালানের কোণের লোহার ফুটা চৌবাচ্চার পাশে বসিয়া কথাটা ভাবিতে ভাবিতে কান্নার বেগে তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল—

—ঠাকুর, ঠাকুর, ও আমার বড় আদরের ধন, তুমি তো জানো ও একদণ্ড চোখের আড়াল থেকে সরলে আমি স্থির থাকতে পারি নে, যা কিছু শাস্তি দেবার আমার ওপর দিয়ে দাও, ঠাকুর ওকে কিছু বোলো না, আমার বুক ফেটে যায় ঠাকুর, তা আমি সইতে পারবো না—

সকাল সকাল অপুদের স্কুলের ছুটি হইয়া গেল। তাহার ক্লাসের ছেলেরা ধরিল তাহাদের

ফুটবল খেলায় অপুকে রেফারি হইতে হইবে। অপু ভারি খুশি হইল, ফুটবল খেলা সে এ শহরে আসিবার পূর্বে কোনোদিন দেখে নাই, সে খুব ভালো খেলিতেও পারে না, তবুও কিন্তু ক্লাসের ছেলেরা তাহাকেই সকলের চেয়ে পছন্দ করে, খেলায় রেফারি হইতে প্রায়ই তাহার ডাক পড়ে।

সে বলিল—সেই বড় হুইসিলটা বাড়ি থেকে নিয়ে আসি ভাই, বাক্সে পড়ে রয়েচে, আমি ঠিক চারটের সময় মাঠে যাবো এখন—

পথে আসিতে আসিতে অপুর সকালের কথাটা মনে উঠিল। আজ সারা দিনটাই সে সে-কথা ভাবিয়াছে। বার্ডসাই খাইতে গিয়া সেদিন গিরিশ সরকারের সামনে পড়িয়া গিয়াছিল একথা ঠিক কিন্তু বার্ডসাই কি সে রোজ খায়? সেদিন মেজ বৌরানীর দেওয়া রাঙা পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়া স্কুল হইতে ফিরিবার-পথে তাহার হঠাৎ শখ হইয়াছিল, এই রকম পাঞ্জাবি গায়ে দিয়া বাবুরা বার্ডসাই খায়, সেও একবার খাইবে। তাই খাবারের পয়সাটায় বার্ডসাই কিনিয়া সে ধরাইয়া খাইতেছিল, কিন্তু সেই একদিন নিশ্চিন্দিপুরে লুকাইয়া খাইতে গিয়াও ভালো লাগে নাই, সেদিনও লাগিল না। তাহার মনে হইয়াছিল—দূর! এ না কিনে এক পয়সার ছোলাভাজা কিনলে বেশ হত! এ যে কেন লোকে কিনে খায়, কিন্তু গিরিশ সরকার না জানিয়া-শুনিয়া তাহাকে যা-তা বলিল কেন?

ভাগ্যিস লীলা এখানে নাই। থাকিলে সে দেখিলে বড় লজ্জার কথা হইত। মাও বোধ হয় টের পায় নাই। পাছে মা টের পায় এই জন্যই তো সে ওবেলা তাড়াতাড়ি স্কুলে চলিয়া আসিয়াছিল!

লীলা কতদিন এখানে আসে নাই! সেই আর বছর গিয়াছে আর আসে নাই। এখন আসিলেই কি আর উহারা তাহার সহিত কথা কহিতে দিবে?

বাড়ি ফিরিতেই দেউড়ির কাছটায় আসিয়া শুনিল উপরের বৈঠকখানায় কলের গান হইতেছে। শব্দটা কানে যাইতেই সে খুশি-ভরা উৎসুক চোখে মুখ উঁচু করিয়া দোতলার জানলার নিচে রাস্তার উপব দাঁড়াইয়া গেল। রাস্তা হইতে গানের কথা সব ভালো বোঝা যায় না। কিন্তু সুরটি ভারি চমৎকার, শুনিতে শুনিতে—স্কুল, খেলা, রেফারিগিরি, ওবেলা মার-খাওয়া, মন হইতে সব একেবারে মুছিয়া গেল।

গানের সুরে তাহার মনটা আপনা-আপনি কোথায় উড়িয়া যায়—সেই তখন তখন নিশ্চিন্দিপুরের নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়া কতদিন দেখিত, ওপারে উলুখড়েব মাঠে ছোট রাঙা ফুলে-ভরা শিমুল চারা, তাহাদের পিছনে কত দূরে নীল আকাশের পট—খড়ের মাঠ যেন আঁকা, রাঙা-ফুল শিমুলচারা যেন আঁকা, শুকনো ডালে কি পাখি বসিয়া থাকিত—সব যেন আঁকা। তাহাদের সকলের পিছনে সেই দেশটা, ব-হু-উ-দূরের দেশটা—কোন্ দেশ তাহার জানা নাই, মাত্র মনের খুশিতে সেটা ধরা দিত।

কে যেন ডাকে, কতদূর হইতে উচ্ছ্বসিত আনন্দভরা পরিচিত সুরের ডাক আসে—অপু—উ-উ-উ-উ—

মন খুশিতে ভরিয়া উঠিয়া সাড়া দেয়—যা—আ-আ-ই-ই-ই—

তাহাদের ছোট ঘরটাতে ফিরিতে তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল—সকাল সকাল এলি যে?

সে বলিল—ওপর ক্লাসের ছেলেরা বল খেলায় জিতেছে তাই হাফ স্কুল—

তাহার মা বলিল—আয় বোস্ এখানে। খানিকক্ষণ পরে গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—আজ তোকে ওরা কি জন্যে নাকি ডেকে নিয়ে গিয়ে নাকি—বকেচে?

—নাঃ, ওই টেবুর একটুখানি লেগেচে তাই বড় বাবু ডেকে বলছিলেন কি হয়েচে—তাই—

—বকে-টকে নি তো?

—নাঃ—

তাহার মা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—একটা কথা ভাবচি, এখান থেকে চলে যাবি?

সে আশ্চর্য হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। পরে হঠাৎ খুশি হইয়া বলিয়া উঠিল—কোথায়

মা, নিশ্চিন্দিপুর? সেই বেশ তো, চলো, আমি সেখানে ঠাকুর-পুজো করবো—পৈতেটা তো হয়ে গিয়েচে—নিজেদের দেশ, বেশ হবে—এখানে আর থাকবো না—

সর্বজয়া বলিল—সে কথাও তো ভাবচি আজ দু'বছর। সেখানে যাবি বলচিস্, কি আর আছে বল্ দিকি সেখানে? এক বাড়িখানা, তাও আজ তিন বছর বর্ষার জল পাচ্চে, তার কিছু কি আছে অ্যাদ্দিন? মান্ধাতার আমলের পুরোনো বাড়ি—ছিল একটু ধানের জমি, তাও তো—গিয়ে মাথা গোঁজবার জায়গাটুকু নেই—শত্তুর হাসাতে যাওয়া.... খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—একটা কাজ কল্লে হয়, চল্ বরং—আচ্ছা কাশী যাবি?

বিশেষ কিছু ঠিক হইল না। তাহার মায়ের তখনও খাওয়া হয় নাই। স্নান সারিয়া পুনরায় রান্নাবাড়ি চলিয়া গেল। অপুর একটা কথা মনে হইল। তাহার গানের গলা আছে, দিদি বলিত, যাত্রাদলের বন্ধুও সেবার বলিয়াছিল। সে যদি কোনো যাত্রাদলে যায়, তাহাকে নেয় না? এখানে মা'র বড় কষ্ট। এখান হইতে সে মাকে লইয়া যাইবে!

উঃ কি গরম! রান্নাবাড়ির নলের মুখে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে, কার্নিসের গায়ে রোদ... ঘরের ভিতরটা এরই মধ্যে অন্ধকার... আস্তাবলে মাতাবিয়া সহিস কি হিন্দি বুলি বলিতেছে.. পাথর-বাঁধানো মেজেতে ঘোড়ার খুর ঠুকিবার খট্ খট্ আওয়াজ. ড্রেনের সেই গন্ধ... তাহার মাথাটা এমন ধরিয়াছে যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছে। সে ভাবিল .. এখন একটু শুয়ে নিই, এরপর উঠে খেলার মাঠে যাবো—মোটে তিনটে বেজেছে—এখন বড় রোদ্দটা।

বিছানায় শুইয়া একটা কথাই বার বার তাহার মনে আসিতে লাগিল। এ কথাটা এতদিন এভাবে সে ভাবিয়া দেখে নাই। এতদিন যেন তাহার মনের কোন্ কোণে সব সময়ই স্পষ্টভাবে জাগিয়া থাকিত যে, এ সবের শেষে যেন তাহাদের গ্রাম অপেক্ষা করিয়া আছে—তাহাদের জন্য! যদিও সেখান হইতে চলিয়া আসিবার সময় ফিরিবার কোনো কথাই ছিল না—সে জানে, তবুও এ মোহটুকু তার একেবারে কাটে নাই।

কিন্তু আজকার সমুদয় ব্যাপারে বিশেষ করিয়া মাযেব ও বড়বাবুব কথায় তাহাদের নিরাশ্রয়তা ও গৃহহীনতার দিকটা তাহার কাছে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আর কি কখনও সে তাহাদের গাঁয়ে ফিরিতে পাইবে না?—কখনও না?—কখনও না?

এই বিদেশ, এই গিরিশ সরকার, এই চোর হইযা থাকা—না হয় মায়ে ছেলে হাত ধবিয়া ছন্নছাড়া পথে পথে চিরকাল—এরাই কি কাযেম হইতে আসিয়াছে?

আস্তাবলে দুই সহিসে ঝগড়া বাধাইযাছে, রান্নাবাড়ির ছাদে কাকের দল ভাতের লোভে দলে দলে জুটিতেছে—একটু পরে তাহার মনে হইল, একই কি কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতেছে, একই কি কথা। আস্তাবলে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ থামে নাই... সে যেন মাটির ভিতর কোথায় সেঁধিয়া যাইতেছে... খুব, খুব মাটির ভিতর...নিচের দিকে কে যেন টানিতেছে... বেশ আরাম...মাথা ধরা নাই, বেশ আরাম।...

উঃ—কি রোদটাই ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে! দিদির যা কাণ্ড—এত রোদ্দুরে চড়ুইভাতি! সে বলিতেছে—দিদি শুয়ে নে, এত রোদ্দুরে চড়ুইভাতি?

রানুদি কানের কাছে বসিয়া কি সব কথা, অনেক কি সব কথা বলিয়া যাইতেছে। রানুদির ছলছলে ডাগর চোখ দুটি অভিমান-ভরা! সে কি করিবে? নিশ্চিন্দিপুরে তাদের চলে না যে? রানুদি না লীলা?

হারান কাকা বাঁশের বাঁশি বেচিবার জন্য আনিয়া বাজাইতেছে...ভারি চমৎকার বাজায়! সে বাবাকে বলিল—এক পয়সার বাঁশের বাঁশি কিনবো বাবা, একটা পয়সা দেবে?...

তাহার বাবা তাহার বড় বড় চুল কানের পাশে তুলিয়া দিতে দিতে আদর করিয়া বলিতেছে—বেশ হয়েচে তোর গল্পটা, ছাপিয়ে এলে আমায় দেখ্তে দিস্ খোকা?

সে বলিতেছে—কোকেন কি বাবা? গিরিশ সরকার বলেচে আমি নাকি কোকেন খাবো—

বাবার গলায় পদ্মবীজের মালা। সেই কথকঠাকুরের মতো।

তাহাদের মাঝেরপাড়ার ইস্টিশান। কাঠের বড় তক্তাটায় লেখা আছে, মা-ঝে-র—পা-ড়া। সে আগে আগে ভারী বোঁচকাটা পিঠে, মা পিছনে পিছনে। তাহার গায়ে রাঙা পাঞ্জাবিটা। কেমন ছায়া সারাপথে। আকাশে সন্ধ্যাতারা উঠিয়াছে। পাকা বটফলের গন্ধে-ভরা বাতাসটা।

নিশ্চিন্দিপুরের পথ যেন ফুরাইতেছে না...সে চলিয়াছে...চলিয়াছে...চলিয়াছে...সে আর মা..এ পথে একা কখনও আসে নাই, পথ সে চিনিতে পারিতেছে না...ও কাস্তে হাতে কাকা, শুনচো, নিশ্চিন্দিপুরের পথটা এট্টু বলে দ্যাও না আমাদের? যশড়া-নিশ্চিন্দিপুর, বেত্রবতীর ওপারে?

তাহার মা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—হাঁরে ওঠ্, ও অপু, বেলা যে আর নেই, বল্‌লি যে কোথায় খেলতে যাবি?—ওঠ্-ওঠ্।

সে মায়ের ডাকে ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে চাহিল—উঃ কি বেলাই গিয়াছে!... রোদ একেবারে কোথায় উঠিয়া গিয়াছে? তাহার মা বলিল—বল্‌লি যে কোথায় খেলতে যাবি, তা গেলি কই? অবেলায় পড়ে পড়ে কি ঘুমটাই দিলি? দেবো তোর সেই বাঁশিটা বের করে?

তোরঙ্গ হইতে বাহির করিয়া বাঁশিটা মা বিছানার কোণে রাখিয়া দিল বটে, সে কিন্তু রেফারিগিরি করিতে যাওয়ার কোনো উৎসাহ দেখাইল না। ঘরের ভিতর এরই মধ্যে অন্ধকার! উঠিয়া আসিয়া জানালার কাছে অন্যমনস্কভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। বেলা একেবারে নাই। এক অসহ্য গুমোট! আস্তাবলের ড্রেনের গন্ধটা যেন আরও বাড়িয়াছে। ফটকের পেটাঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া বোধ হয় ছ'টা বাজাইতেছে।

ওই আস্তাবলের মাথায় যে আকাশটা, ওরই ওপারে পূর্বদিকে বহুদূরে তাহাদের নিশ্চিন্দিপুর।

আজ কতদিন সে নিশ্চিন্দিপুর দেখে নাই—তি-ন বৎসর! কতকাল!

সে জানে নিশ্চিন্দিপুর তাহাকে দিন রাতে সব সময় ডাকে, শাঁখারিপুকুর ডাক দেয়, বাঁশবনটা ডাক দেয়, সোনাডাঙার মাঠ ডাক দেয়, কদমতলার সায়েবের ঘাট ডাক দেয়, দেবী বিশালাক্ষী ডাক দেন।

পোড়ো ভিটার মিষ্ট লেবু ফুলের গন্ধে সজনেতলার ছায়ায় ছায়ায় আবার কবে গতিবিধি? আবার কবে তাহাদের বাড়ির ধারের শিরীষ সোঁদালি বনে পাখির ডাক?

এতদিনে তাহাদের সেখানে ইছামতীতে বর্ষার ঢল নামিয়াছে। ঘাটের পথে শিমুল তলায় জল উঠিয়াছে। ঝোপে ঝোপে নাটা-কাঁটা, বনকলমির ফুল ধরিয়াছে। বন অপরাজিতার নীল ফুলে বনের মাথা ছাওয়া।

তাহাদের গ্রামের ঘাটটাতে কুঁচ-ঝোপের পাশে রাজুকাকা হয়তো এতক্ষণে তাহার অভ্যাসমতো অবেলায় স্নান করিতে নামিয়াছে, চাল্‌তেপোতার বাঁকে নতুন কষাড় বনের ধারে ধারে অক্রূর মাঝি মাছ ধরিবার দোয়াড়ি পাতিয়াছে, আজ সেখানকার হাট-বার, ঠাকুরঝি-পুকুরের সেই বটগাছটার পিছনে দিগন্তের কোলে রাঙা আগুনের ফেনার মতো সূর্য অস্ত যাইতেছে, আর তাহারই তলাকার মেঠোপথ বাহিয়া গ্রামের ছেলে পটু, নীলু, তিনু, ভোলা সব হাট করিয়া ফিরিতেছে।

এতক্ষণে তাদের বনে-ঘেরা বাড়িটার উঠানটাতে ঘন ছায়া পড়িয়া আসিতেছে, কিচ্ কিচ্ করিয়া পাখি ডাকিতেছে, সেই মিষ্ট নিঃশব্দ শান্ত বৈকাল—সেই হল্‌দে পাখিটা আজও আসিয়া পাঁচিলের উপরের কঞ্চির ডালটাতে সেই রকমই বসে, মায়ের হাতে পোঁতা লেবুচারাটাতে হয়তো এতদিনে লেবু ফলিতেছে।...

আরও কিছুক্ষণ পরে তাহাদের সে ভিটায় সন্ধ্যার অন্ধকার হইয়া যাইবে, কিন্তু সে সন্ধ্যায় সেখানে কেহ সাঁজ জ্বালিবে না, প্রদীপ দেখাইবে না, রূপকথা বলিবে না। জনহীন ভিটার উঠানভরা

কালমেঘের জঙ্গলে ঝিঁঝি পোকা ডাকিবে, গভীর রাত্রে পিছনের ঘন বনে জগ্‌ডুমুর গাছে লক্ষ্মীপেঁচার রব শোনা যাইবে...কেহ কোনোদিন সেদিক মাড়াইবে না, গভীর জঙ্গলে চাপা-পড়া মায়ের সে লেবুগাছটার সন্ধান কেহ কোনোদিন জানিবে না, ওড়-কলমির ফুল ফুটিয়া আপনা-আপনি ঝরিয়া পড়িবে, কুল নোনা মিথ্যাই পাকিবে, হলদে-ডানা তেড়ো পাখিটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিবে।

বনের ধারে সে অপূর্ব মায়াময় বৈকালগুলি মিছামিছিই নামিবে চিরদিন।

ওবেলা এক উঠান লোকের সম্মুখে বিনাবিচারে মার খাইয়াও তাহার চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল বাহির হয় নাই, কিন্তু এখন নির্জন ঘরের জানালাটাতে একা-একা দাঁড়াইয়া হঠাৎ সে কাঁদিয়া আকুল হইল, উচ্ছ্বসিত চোখের জল ঝর-ঝর করিয়া পড়িয়া তাহার সুন্দর কপোল ভাসাইয়া দিতেই চোখ মুছিতে হাত উঠাইয়া আকুল সুরে মনে মনে বলিল—আমাদের যেন নিশ্চিন্দিপুর ফেরা হয়—ভগবান—তুমি এই কোরো, ঠিক যেন নিশ্চিন্দিপুর যাওয়া হয়—নইলে বাঁচবো না—পায়ে পড়ি তোমার—

পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন—মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায় কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়? তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে...দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে...

দিন রাত্রি পার হয়ে, জন্ম মরণ পার হয়ে, মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চলে যায়... তোমাদের মর্মর জীবন-স্বপ্ন শ্যাওলা-ছাতার দলে ভরে আসে, পথ আমার তখনও ফুরোয় না.. চলে... চলে... চলে... এগিয়েই চলে...

অনির্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্ত কাল আর অনন্ত আকাশ...

সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া করে এনেছি!...

চল এগিয়ে যাই।

— ঃ ঃ —

অপরাজিত



প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৩৮

উৎসর্গ

মাতৃদেবীকে

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুপুর প্রায় গড়াইয়া গিয়াছে। রায়চৌধুরীদের বাড়ির বড়ো ফটকে রবিবাসরীয় ভিখারিদের ভিড় এখনও ভাঙে নাই। বীরু মুহুরির উপর ভিখারির চাউল দিবার ভার আছে, কিন্তু ভিখারিদের মধ্যে পর্যন্ত অনেকে সন্দেহ করে যে, জমাদার শম্ভুনাথ সিংহের সঙ্গে যোগ-সাজসের ফলে তাহারা ন্যায্য প্রাপ্য হইতে প্রতিবারই বঞ্চিত হইতেছে। ইহা লইয়া তাহাদের ঝগড়া দ্বন্দ্ব কোনকালেই মেটে নাই। শেষ পর্যন্ত দারোয়ানেরা রাগিয়া ওঠে, রামনিহোরা সিং দু-চারজনকে গলাধাক্কা দিতে যায়। তখন হয় বুড়ো খাজাঞ্চি মহাশয়, নয়তো গিরীশ গোমস্তা আসিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া দেয়। প্রায় কোন রবিবারই ভিখারি-বিদায় ব্যাপারটা বিনা গোলমালে নিষ্পন্ন হয় না।

রান্না-বাড়িতে কি একটা লইয়া এতক্ষণ রাঁধুনীদের মধ্যে বচসা চলিতেছিল। রাঁধুনী বাম্‌নী মোক্ষদা থালায় নিজের ভাত সাজাইয়া লইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া সরিয়া পড়াতে সেখানকার গোলমালও একটু কমিল। রাঁধুনীদের মধ্যে সর্বজয়ার বয়স অপেক্ষাকৃত কম—বড়োলোকের বাড়ি—শহর-বাজার জায়গা, পাড়াগেঁয়ে মেয়ে বলিয়া ইহাদের এসব কথাবার্তায় সে বড়ো একটা থাকে না। তবুও মোক্ষদা বাম্‌নী তাহাকে মধ্যস্থ মানিয়া সদু-ঝিয়ের কি অবিচারের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছিল। যখন যে দলে থাকে, তখন সে দলের মন জোগাইয়া কথা বলাটা সর্বজয়ার একটা অভ্যাস, এজন্য তাহার উপর কাহারও রাগ নাই। মোক্ষদা সরিয়া পড়ার পর সর্বজয়াও নিজের ভাত বাড়িয়া লইয়া তাহার থাকিবার ছোট ঘরটাতে ফিরিল। এ বাড়িতে প্রথম আসিয়া বছর-দুই ঠাকুরদালানের পাশের যে ঘরটাতে সে থাকিত, এ ঘরটা সেটা নয়; তাহারই সামনাসামনি পশ্চিমের বারান্দার কোণের ঘরটাতে সে এখন থাকে—সেই রকমই অন্ধকার, সেই ধরনেরই স্যাঁতসেঁতে মেজে, তবে সে ঘরটার মতো ইহার পাশে আস্তাবল নাই, এই একটু সুবিধার কথা।

সর্বজয়া তখনও ভালো করিয়া ভাতের থালা ঘরের মেজেতে নামায় নাই, এমন সময় সদু-ঝি অগ্নিমূর্তি হইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

—বলি, মুখি বাম্‌নী কী পর্‌চেয় দিচ্ছিল তোমার কাছে শুনি? বদমায়েশ মাগী কোথাকার, আমার নামে যখন-তখন যার-তার কাছে লাগিয়ে করবে কি জিগ্যেস করি? বলে দেয় যেন বড়ো বৌরানীর কাছে—যায় যেন বলতে—তুমিও দেখে নিয়ো বলে দিচ্ছি বাছা, আমি যদি গিন্নিমার কাছে বলে ওকে এ বাড়ি থেকে না তাড়াই তবে আমি রামনিধি ভড়ের মেয়ে নই—নই—নই—এই তোমায় বলে দিলুম।

সর্বজয়া হাসিমুখে বলিল, না সদু-মাসি, সে বললেই অমনি আমি শুনবো কেন? তা ছাড়া ওর স্বভাব তো জানো—ওই রকম, ওর মনে কোন রাগ নেই, মুখে হাউ-হাউ করে বকে—এমন তো কিছু বলেও নি—আর তা ছাড়া আমি আজ দু-মাস দশ মাস তো নয়, তোমায় দেখচি আজ তিন বছর—বল্‌লেই কি আর আমি শুনি? তিন বচ্ছর এ বাড়িতে ঢুকিচি, কই তোমার নামে—

সদু-ঝি একটু নরম হইয়া বলিল, অপু কোথায়, দেখচি নে—আজ তো রবিবার—ইস্কুল তো আজ বন্দ—

সর্বজয়া প্রতিদিন রান্নাঘরের কাজ সারিয়া আসিয়া তবে স্নান করে, তেলের বাটিতে বোতল হইতে নারিকেল তৈল ঢালিতে ঢালিতে বলিল, কোথায় বেরিয়েচে। ওই শেঠেদের বাড়ির পাশে কোন্ এক বন্ধুর বাড়ি, সেখানে ছুটির দিন যায় বেড়াতে। তাই বুঝি বেরিয়েচে। ছেলে তো নয়, একটা পাগল—দুপুর রোদ্দুর রোজ মাথার ওপর দিয়ে যাওয়া চাই তার। দাঁড়িয়ে কেন, বোসো না মাসি!

সদু বলিল, না, তুমি খাও, আর বসবো না—ভাবলুম, যাই কথাটা গিয়ে শুনে আসি, তাই

এলুম। বোলো ওবেলা মুখি বাম্‌নীকে, একটু বুঝিয়ে দিয়ো—খোকাবাবুর ভাতে সেই দইয়ের হাঁড়ি বৈ-করা মনে নেই বুঝি? সদুর পেটে অনেক কথা আছে, বুঝলে? দেখতেই ভালোমানুষটি, বোলো বুঝিয়ে—

সদু-ঝি চলিয়া গেলে সর্বজয়া তেল মাখিতে বসিল। একটু পরে দোরের কাছে পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল, ওঃ, রোদ্দুরে ঘুরে তোর মুখ যে একেবারে রাঙা হয়ে গিয়েচে! বোস্‌ বোস্‌—আয়—ওমা আমার কি হবে।

অপু ঘরের ভিতর ঢুকিয়া একেবারে সোজা বিছানায় গিয়া একটা বালিশ টানিয়া শুইয়া পড়িল। হাত-পাখাখানা সজোরে নাড়িয়া মিনিটখানেক বাতাস খাইয়া লইয়া মায়েব দিকে চাহিয়া বলিল, এখনও নাও নি? বেলা তো দুটো—

সর্বজয়া বলিল, ভাত খাবি দুটো—

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না—

—খা না দুটোখানি? ভালো ছানার ডালনা আছে, সকালে শুধু তো ডাল আর বেগুনভাজা দিয়ে খেয়ে গিইচিস্‌। ক্ষিদে পেয়েচে আবার এতক্ষণ—

অপু বলিল, দেখি কেমন?

পরে সে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া মেজেতে ভাতের থালার ঢাকনি উঠাইতে গেল। সর্বজয়া বলিল, ছুঁস নে, ছুঁস নে—থাক এখন, নেয়ে এসে দেখাচ্চি।

অপু হাসিয়া বলিল, ছুঁস নে ছুঁস নে কেন? কেন? আমি বুঝি মুচি? ব্রাহ্মণকে বুঝি অমনি বলতে আছে? পাপ হয় না?

—যা হয় হবে। ভারি আমার বামুন, সন্ধে নেই, আহ্নিক নেই, বাচবিচের জ্ঞান নেই, এঁটো জ্ঞান নেই—ভারি আমার—

খানিকটা পরে সর্বজয়া স্নান সারিয়া আসিয়া ছেলেকে বলিল, আমার পাতে বসিস্‌ এখন।

অপু মুখে হাসি টিপিয়া বলিল, আমি কারুর পাতে বসচি নে, ব্রাহ্মণের খেতে নেই কারুর এঁটো।

সর্বজয়া খাইতে বসিলে অপু মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া সুর নিচু করিয়া বলিল, আজ এক জায়গায় একটা চাকরির কথা বলেচে মা একজন। ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, গাড়ি যখন এসে লাগবে—লোকেদের কাছে নতুন পাঁজি বিক্রি করতে হবে। পাঁচটাকা মাইনে আর জলখাবার। ইস্কুলে পড়তে পড়তেও হবে। একজন বলছিল।

ছেলে যে চাকুরির কথা একে ওকে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ায় সর্বজয়া একথা জানে। চাকুরি হইলে সে মন্দ কথা নয়, কিন্তু অপুর মুখে চাকুরির কথা তাহার মোটেই ভালো লাগে না। সে তো এমন কিছু বড়ো হয় নাই। তাহা ছাড়া রৌদ্র আছে, বৃষ্টি আছে। শহর-বাজার জায়গা, পথে ঘাটে গাড়ি-ঘোড়া—কত বিপদ! অত বিপদের মুখে ছেলেকে ছাড়িয়া দিতে সে রাজি নয়।

সর্বজয়া কথাটা তেমন গায়ে মাখিল না। ছেলেকে বলিল, আয় বোস্‌ পাতে—হয়েচে আমার। আয়—

অপু খাইতে বসিয়া বলিল, বেশ ভালো হয়, না মা? পাঁচ টাকা করে মাইনে। তুমি জমিয়ো। তারপর মাইনে বাড়াবে বলেচে। আমার বন্ধু সতীনদের বাড়ির পাশে খোলার ঘর ভাড়া আছে দু-টাকা মাসে। সেখানে আমরা যাবো—এদের বাড়ি তোমার যা খাটুনি! ইস্কুল থেকে অমনি চলে যাবো ইস্টিশানে—খাবার সেখানেই খাবো। কেমন তো?

সর্বজয়া বলিল—রুটি করে দেবো, বেঁধে নিয়ে যাস্‌।

দিন দশেক কাটিয়া গেল। আর কোন কথাবার্তা কোনো পক্ষেই উঠিল না। তাহার পর

বড়োবাবু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত সঙ্গীন ও সংকটাপন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া তাঁহার দিন-পনেরো কাটিল। বাড়িতে সকলের মুখে, ঝি-চাকর-দারোয়ানদের মুখে বড়োবাবুর অসুখের বিভিন্ন অবস্থার কথা ছাড়া আর অন্য কথা নাই।

বড়োবাবু সামলাইয়া উঠিবার দিনকয়েক পর একদিন অপু আসিয়া হাসি-হাসি মুখে মাকে বলিল, আজ মা, বুঝলে, একটা ঘুড়ির দোকানে বলেচে যদি আমি বসে বসে ঘুড়ি জুড়ে দি আঠা দিয়ে, তারা সাত টাকা করে মাইনে আর রোজ দু-খানা করে ঘুড়ি দেবে। মস্ত ঘুড়ির দোকান, ঘুড়ি তৈরি করে কলকাতায় চালান দেয়—সোমবারে যেতে বলেচে—

এ আশার দৃষ্টি এ হাসি এ সব জিনিস সর্বজয়ার অপরিচিত নয়। দেশে নিশ্চিন্দিপুরের ভিটাতে থাকিতে কতদিন, দীর্ঘ পনেরো-ষোল বৎসব ধরিয়া মাঝে মাঝে কতবার স্বামীর মুখে এই ধরনের কথা সে শুনিয়াছে। এই সুর, এই কথার ভঙ্গি সে চেনে। এইবার একটা কিছু লাগিয়া যাইবে—এইবার ঘটিল, অল্পই দেরি। নিশ্চিন্দিপুরের যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া পথে বাহির হওয়ার মূলেও সেই সুরেরই মোহ।

চারি বৎসর এখনও পূর্ণ হয় নাই, এই দশা ইহাব মধ্যে। কিন্তু সর্বজয়া চিনিয়াও চিনিল না। আজ বহুদিন ধরিয়া তাহার নিজের গৃহ বলিযা কিছু নাই, অথচ নারীর অন্তর্নিহিত নীড় বাঁধিবার পিপাসাটুকু ভিতবে ভিতরে তাহাকে পীড়া দেয়। অবলম্বন যতই তুচ্ছ ও ক্ষণভঙ্গুর হউক, মন তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিতে ছুটিয়া যায়, নিজেকে ভুলাইতে চেষ্টা করে।

তাহা ছাড়া পুত্রের অনভিজ্ঞ মনের তরুণ উল্লাসকে পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতাব চাপে শ্বাসরোধ করিয়া মারিতে মায়াও হয়।

সে বলিল, তা যাস না সোমবারে! বেশ তো,—দেখে আসিস্। হ্যাঁ শুনিস নি, মেজ বৌরানী যে শিগ্‌গির আসচেন, আজ শুনছিলাম রান্না-বাড়িতে—

অপুর চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল, কবে মা, কবে?

—এই মাসের মধ্যেই আসবেন। বড়োবাবুর শরীর খারাপ, কাজ-টাজ দেখতে পারেন না, তাই মেজবাবু এসে থাকবেন দিন-কতক।

লীলা আসিবে কি-না একথা দুই-দুইবার মাকে বলি বলি করিয়াও কি জানি কেন সে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। বাহিরে যাইতে যাইতে মনে মনে ভাবিল, তাদের বাড়িতে সবাই আসচে, মা বাবা আসচে, আর সে কি সেখানে পড়ে থাকবে? সে-ও আসবে—ঠিক আসবে।

পরদিন সে স্কুল হইতে ফিরিয়া তাহাদের ঘরটাতে ঢুকিতেই তাহার মা বলিল, অপু, আগে খাবার খেয়ে নে। আজ একখানা চিঠি এসেচে, দেখাচ্চি।

অপু বিস্মিতমুখে বলিল, চিঠি? কোথায়? কে দিয়েচে মা?

কাশীতে তাহার বাবার মৃত্যুর পর হইতে এ পর্যন্ত আজ আড়াই বৎসরের উপর এ বাড়িতে তাহারা আসিয়াছে, কই, কেহ তো একখানা পোস্টকার্ডে একছত্র লিখিয়া তাহাদের খোঁজ করে নাই? লোকের যে পত্র আসে, একথা তাহারা তো ভুলিয়াই গিয়াছে!

সে বলিল, কই দেখি?

পত্র—তা আবার খামে! খামটার উপরে মায়ের নাম লেখা! সে তাড়াতাড়ি পত্রখানা খাম হইতে বাহির করিয়া অধীর আগ্রহের সহিত সেখানাকে পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ করিয়া বুঝিতে-না-পারার দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ভবতারণ চক্রবর্তী কে মা?—পরে পত্রের উপরকার ঠিকানাটা আর একবার দেখিয়া বলিল, কাশী থেকে লিখেচে।

সর্বজয়া বলিল, তুই তো ওঁকে নিশ্চিন্দিপুরে দেখেচিস!—সেই সেবার গেলেন, দুগ্গাকে পুতুলের বাক্স কিনে দিয়ে গেলেন, তুই তখন সাত বছরের। মনে নেই তোর? তিনদিন ছিলেন আমাদের বাড়ি।

—জানি মা, দিদি বলতো তোমার জ্যাঠামশায় হন—না? তা এতদিন তো আর কোনও—

—আপন নয়, দূর সম্পর্কের। জ্যাঠামশায় তো দেশে বড়ো-একটা থাকতেন না, কাশী-গয়া, ঠাকুর-দেবতার জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, এখনও বেড়ান। ওঁদের দেশ হচ্চে মনসাপোতা, আড়ংঘাটার কাছে। সেখেন থেকে ক্রোশ দুই—সেবার আড়ংঘাটায় যুগল দেখতে গিয়ে ওঁদের বাড়ি গিয়ে ছিলাম দু-দিন। বাড়িতে মেয়ে-জামাই থাকত। সে মেয়ে-জামাই তো লিখেচেন মারা গিয়েচে—ছেলেপিলে কাবুর নেই—

অপু বলিল, হ্যাঁ, তাই তো লিখেচেন। নিশ্চিন্দিপুরে গিয়ে আমাদের খোঁজ করেচেন। সেখানে শুনেচেন কাশী গিইচি। তারপর কাশীতে গিয়ে আমাদের সব খবর জেনেচেন। এখানকার ঠিকানা নিয়েচেন বোধ হয় রামকৃষ্ণ মিশন থেকে।

সর্বজয়া হাসিয়া বলিল—আমি দুপুরবেলা খেয়ে একটু বলি গড়াই—ক্ষেমিঝি বললে তোমার একখানা চিঠি আছে। হাতে নিয়ে দেখি আমার নাম—আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। তারপব খুলে পড়ে দেখি এই—নিতে আসবেন লিখচেন শিগ্‌গির। দ্যাখ্ দিকি, কবে আসবেন লেখা আছে কিছু?

অপু বলিল, বেশ হয়, না মা? এদের এখেনে একদণ্ড ভালো লাগে না। তোমার খাটুনিটা কমে—সেই সকালে উঠে রান্না-বাড়ি ঢোকো, আর দুটো তিনটে—

ব্যাপারটা এখনও সর্বজয়া বিশ্বাস করে নাই। আবার গৃহ মিলিবে, আশ্রয় মিলিবে, নিজের মনোমতো ঘর গড়া চলিবে! বড়োলোকের বাড়ির এ রাঁধুনীবৃত্তি, এ ছন্নছাড়া জীবনযাত্রায় কি এতদিনে—বিশ্বাস হয় না। অদৃষ্ট তেমন নয় বলিয়া ভয় কবে।

তাহার পর দু-জনে মিলিয়া নানা কথাবার্তা চলিল। জ্যাঠামশায় কি রকম লোক, সেখানে যাওয়া ঘটিলে কেমন হয়,—নানা কথা, উঠিবার সময় অপু বলিল—শেঠেদের বাড়িব পাশে কাঠগোলায় পুতুলনাচ হবে একটু পরে। দেখে আসবো মা?

—সকাল সকাল ফিরবি, যেন ফটক বন্ধ করে দেয় না, দেখিস—

পথে যাইতে যাইতে খুশিতে তাহার গা কেমন করিতে লাগিল। মন যেন শোলার মতো হালকা। মুক্তি, এতদিন পরে মুক্তি! কিন্তু লীলা যে আসিতেছে? পুতুলনাচের আসরে বসিয়া কেবলই লীলার কথা মনে হইতে লাগিল। লীলা আসিয়া তাহার সহিত মিশিবে তো? হয়তো এখন বড়ো হইয়াছে, হয়তো আর তাহার সঙ্গে কথা বলিবে না।

পুতুলনাচ আরম্ভ হইতে অনেক দেরি হইয়া গেল। না দেখিয়াও সে যাইতে পারিল না। অনেক রাত্রে যখন আসর ভাঙিয়া গেল, তখন তাহার মনে পড়িল, এত রাত্রে বাড়ি ঢোকা যাইবে না, ফটক বন্ধ করিয়া দিয়াছে, বড়োলোকের বাড়ির দারোয়ানেরা কেহ তাহার জন্য গরজ করিয়া ফটক খুলিয়া দিবে না। সঙ্গে সঙ্গে বড়ো ভয়ও হইল। রাত্রিতে এ রকম একা সে বাড়ির বাহিরে কাটায় নাই। কোথায় এখন সে থাকে? মা-ই বা কি বলিবে!

আসরের সব লোক চলিয়া গেল। আসরের কোণে একটা পান-লেমনেডের দোকানে তখনও বেচা-কেনা চলিতেছে। সেখানে একটা কাঠের বাক্সের উপর সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে জানে না, ঘুম ভাঙিয়া দেখিল ভোর হইয়া গিয়াছে, পথে লোক চলাচল আরম্ভ হইয়াছে।

সে একটু বেলা করিয়া বাড়ি ফিরিল। ফটকের কাছে বাড়ির গাড়ি দুইখানি তৈয়ার হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেউড়িতে ঢুকিয়া খানিকটা আসিয়া দেখিল বাড়ির তিন-চার জন ছেলে সাজিয়া গুজিয়া কোথায় চলিয়াছে। নিজেদের ঘরের সামনে নিস্তারিণী ঝিকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মাসিমা, এত সকালে গাড়ি যাচ্ছে কোথায়? মেজবাবুরা কি আজকে আসবে?

নিস্তারিণী বলিল, তাই তো শুনছি। কাল চিঠি এসেচে—শুধু মেজবাবু আর বৌরানী আসবে,

লীলা দিদিমণি এখন আসবেন না—ইস্কুলের এগজামিন। সেই বড়োদিনের সময় তবে আসবে। গিন্নিমা বলছিলেন বিকেলে—

অপুর মনটা একমুহূর্তে দমিয়া গেল। লীলা আসিবে না! বড়োদিনের ছুটিতে আসিলেই বা কি—সে তো তাহার আগে এখান হইতে চলিয়া যাইবে। যাইবার আগে একবার দেখা হইয়া যাইত এই সময় আসিলে। কতদিন সে আসে নাই।

তাহার মা বলিল, বেশ ছেলে তো, কোথায় ছিলি রাত্তিরে? আমার ভেবে সারারাত চোখের পাতা বোজেনি কাল।

অপু বলিল, রাত বেশি হয়ে গেল, ফটক বন্ধ করে দেবে জানি, তাই আমার এক বন্ধু ছিল, আমার সঙ্গে পড়ে, তাদেরই বাড়িতে—। পরে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, না মা, সেখানে পানের দোকানে একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স পড়ে ছিল, তার উপব শুয়ে—

সর্বজয়া বলিল, ওমা, আমার কি হবে! এই সারারাত ঠাণ্ডায় সেখেনে—লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, যেয়ো তুমি ফের কোনদিন সন্দেব পর কোথাও—তোমার বড়ো ইয়ে হয়েচে, না?

অপু হাসিয়া বলিল—তা আমি কি করে ঢুকবো বলো না? ফটক ভেঙে ঢুকবো?

রাগটা একটু কমিয়া আসিলে সর্বজয়া বলিল—তারপর জ্যাঠামশায় তো কাল এসেচেন। তুই বেরিয়ে গেলে একটু পরেই এলেন, তোর খোঁজ করলেন, আজ ওবেলা আবার আসবেন। বললেন, এখেনে কোথায় তাঁর জানাশুনো লোক আছে, তাদের বাড়ি থাকবেন। এদের বাড়ি থাকবার অসুবিধে—পবশু নিয়ে যেতে চাচ্চেন।

অপু বলিল, সত্যি? কি কি বলো না মা, কি সব কথা হল?

আগ্রহে অপু মায়ের পাশে চৌকির ধারে বসিয়া পড়িয়া মায়েব মুখের দিকে চাহিল। দু-জনের অনেক কথাবার্তা হইল। জ্যাঠামশায় বলিয়াছেন, তাঁহার আর কেহ নাই, ইহাদেবই উপর সব ভার দিয়া তিনি কাশী যাইবেন। অনেকদিন পরে সংসার পাতিবার আশায় সর্বজয়া আনন্দে উৎফুল্ল। ইহাদের বাড়ি হইতে নানা টুকটাক গৃহস্থালিব প্রয়োজনীয় জিনিস নানা সময় সংগ্রহ করিযা সযত্নে বাখিযা দিয়াছে। একটা বড়ো টিনের টেমি দেখাইয়া বলিল, সেখেনে রান্নাঘবে জ্বালবো—কত বড়ো লম্পটা দেখেচিস? দু-পয়সাব তেল ধবে।

দুপুরের পব সে মায়ের পাতে ভাত খাইতে বসিয়াচে, এমন সময় দুয়ারের সামনে কাহার ছায়া পড়িল। চাহিয়া দেখিয়া সে ভাতের গ্রাস আর মুখে তুলিতে পারিল না।

লীলা!

পরক্ষণেই লীলা হাসিমুখে ঘরে ঢুকিল; কিন্তু অপুর দিকে চাহিয়া সে যেন একটু অবাক হইযা গেল। অপুকে যেন আর চেনা যায় না।—সে তো দেখিতে বরাববই সুন্দব, কিন্তু এই দেড় বৎসরে কি হইয়া উঠিয়াছে সে? কি গায়ের রং, কি মুখের শ্রী, কি সুন্দর স্বপ্ন-মাখা চোখদুটি! লীলার যেন একটু লজ্জা হইল। বলিল, উঃ, আগের চেয়ে মাথাতে কত বড়ো হয়ে গিয়েচ!

লীলার সম্বন্ধেও অপুর ঠিক সেই কথাই মনে হইল। এ যেন সে লীলা নয়, যাহার সঙ্গে সে দেড় বৎসর পূর্বে অবাধে মিলিয়া মিশিয়া কত গল্প ও খেলা করিয়াছে। তাহার তো মনে হয় না লীলার মতো সুন্দরী মেয়ে সে কোথাও দেখিয়াছে—রানুদিও নয়। খানিকক্ষণ সে যেন চোখ ফিরাইতে পারিল না।

দু-জনেই যেন একটু সংকোচ বোধ করিতে লাগিল।

অপু বলিল, তুমি কি করে এলে? আমি আজ সকালেও জিজ্ঞেস করিচি। নিস্তারিণী মাসি বললে, তুমি আসবে না, এখন স্কুলের ছুটি নেই—সেই বড়োদিনের সময় নাকি আসবে?

লীলা বলিল, আমার কথা তোমার মনে ছিল?

—না, তা কেন? তারপর এতদিন পরে বুঝি—বেশ—একেবারে ডুমুরের ফুল—

—ডুমুরের ফুল আমি, না তুমি? খোকামণির ভাতের সময় তোমাকে যাওয়ার জন্যে চিঠি লেখালাম ঠাকুরমায়ের কাছে, এ বাড়ির সবাই গেল, যাও নি কেন?

অপু এসব কথা কিছুই জানে না। তাহাকে কেহ বলে নাই। জিজ্ঞাসা করিল, খোকামণি কে?

লীলা বলিল, বাঃ, আমার ভাই! জানো না?...এই এক বছরের হলো।

লীলার জন্য অপুর মনে একটু দুঃখ হইল। লীলা জানে না যাহাকে সে এত আগ্রহ করিয়া ভাইয়ের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, এ বাড়িতে তাহার স্থান কোথায় বা অবস্থা কি। সে বলিল—দেড় বছর আসো নি—না? পড়চ কোন্ ক্লাসে?

লীলা তক্তপোশের কোণে বসিয়া পড়িল। বলিল, আমি আমার কথা কিছু বলবো না আগে—আগে তোমার কথা বলো। তোমার মা ভালো আছেন? তুমিও তো পড়ো—না?

—আমি এবারে মাইনর ক্লাসে উঠবো—পরে একটু গর্বিতমুখে বলিল, আর বছর ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠেচি, প্রাইজ দিয়েচে।

লীলা অপুর দিকে চাহিল। বেলা তিনটার কম নয়। এত বেলায় সে খাইতে বসিয়াছে! বিস্ময়ের সুরে বলিল, এখন খেতে বসেচ, এত বেলায়?

অপুর লজ্জা হইল। সে সকালে সরকারদের ঘরে বসিয়া খাইয়া স্কুলে যায়—শুধু ডাল-ভাত,—তাও শ্রীকণ্ঠ ঠাকুর বেগার-শোধ ভাবে দিয়া যায়, খাইয়া পেট ভরে না, স্কুলেই ক্ষুধা পায়, সেখান হইতে ফিরিয়া মায়ের পাতে ভাত ঢাকা থাকে, বৈকালে তাহাই খায়। আজ ছুটির দিন বলিয়া সকালেই মায়ের পাতে খাইতে বসিয়াছে।

অপু ভালো করিয়া উত্তর দিতে পারিল না বটে, কিন্তু লীলা ব্যাপারটা কতক না বুঝিল এমন নহে। ঘরের হীন আসবাব-পত্র, অপুর হীন বেশ—অবেলায় নিরুপকরণ দুটি ভাত সাগ্রহে খাওয়া—লীলার কেন যেন মনে বড়ো বিঁধিল। সে কোন কথা বলিল না।

অপু বলিল, তোমার সব বই এনেচ এখেনে? দেখাতে হবে আমাকে। ভালো গল্প কি ছবির বই নেই?

লীলা বলিল, তোমার জন্যে কিনে এনেচি আসবার সময়। তুমি গল্পের বই ভালোবাসো বলে একখানা 'সাগরের কথা' এনেচি, আরও দু-তিনখানা এনেচি, আনচি, তুমি খেয়ে ওঠো।

অপুর খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছিল, খুশিতে বাকিটা কোনোরকমে শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল। লীলা লক্ষ করিয়া দেখিল, সে পাতের সবটা এমন করিয়া খাইয়াছে, পাতে একটা দানাও পড়িয়া নাই। সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর লীলার কেমন একটা অপূর্ব মনের ভাব হইল—সে ধরনের অনুভূতি লীলার জীবনে এই প্রথম, আর কাহারও সম্পর্কে সে ধরনের কিছু তো কখনও হয় নাই।

একটু পরে লীলা অনেক বই আনিল। অপুর মনে হইল, লীলা কেমন করিয়া তাহার মনের কথাটি জানিয়া, সে যাহা পড়িতে জানিতে ভালোবাসে সেই ধরনের বইগুলি আনিয়াছে। 'সাগরের কথা' বইখানাতে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প। সাগরের তলায় বড়ো বড়ো পাহাড় আছে, আগ্নেয়গিরি আছে, প্রবাল নামক এক প্রকার প্রাণী আছে, দেখিতে গাছপালার মতো—কোথায় এক মহাদেশ নাকি সমুদ্রের গর্ভে ডুবিয়া আছে—এই সব।

লীলা একখানা পুরাতন খাতা দেখাইল। তাহার ঝোঁক ছবি আঁকিবার দিকে; বলিল—সেই তোমায় একবার ফুলগাছ এঁকে দেখতে দিলাম মনে আছে? তারপর কত এঁকেচি দেখবে?

অপুর মনে হইল লীলার হাতের আঁকা আগের চেয়ে এখন ভালো হইয়াছে। সে নিজে একটা রেখা কখনও সোজা করিয়া টানিতে পারে না—ড্রইংগুলি দেখিতে দেখিতে লীলার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বেশ এঁকেচো তো। তোমাদের ইস্কুলে করায়, না এমনি আঁকো?

এতক্ষণ পরে অপুর মনে পড়িল লীলা কোন্ স্কুলে পড়ে, কোন্ ক্লাসে পড়ে সে কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। বলিল—তোমাদের কি ইস্কুল? এবার কোন্ ক্লাসে পড়চো?

—এবার মাইনর সেকেন্ড ক্লাসে উঠেছি—গিরীন্দ্রমোহিনী গার্লস স্কুল—আমাদের বাড়ির পাশেই—

অপু বলিল, জিজ্ঞেস করবো?

লীলা হাসি মুখে ঘাড় নাড়িয়া চুপ করিয়া রহিল।

অপু বলিল, আচ্ছা বলো—চট্টগ্রাম কর্ণফুলির মোহনায়—কি ইংরেজি হবে?

লীলা ভাবিয়া বলিল, চিটাগং ইজ্ অন্ দি মাউথ অফ্ দি কর্ণফুলি।

অপু বলিল, ক'জন মাস্টার তোমাদের সেখেনে?

—আটজন, হেড মিস্ট্রেস্ এন্ট্রান্স পাশ, আমাদের গ্রামার পড়ান। পরে সে বলিল—মা'র সঙ্গে দেখা করবে না?

—এখন যাবো, না একটু পরে যাবো? বিকেলে যাবো এখন, সেই ভালো।

তাহার পরে সে একটু থামিয়া বলিল, তুমি শোনো নি লীলা, আমরা যে এখান থেকে চলে যাচ্চি!

লীলা আশ্চর্য হইয়া অপুর দিকে চাহিল। বলিল—কোথায়?

—আমার এক দাদামশায় আছেন, তিনি এতদিন পরে আমাদের খোঁজ পেয়ে তাঁদের দেশের বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছেন।

অপু সংক্ষেপে সব বলিল।

লীলা বলিয়া উঠিল—চলে যাবে? বাঃ রে!

হয়তো সে কি আপত্তি করিতে যাইতেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিল, যাওয়া না-যাওয়ার উপর অপুর তো কোনও হাত নাই, কোনও কথাই এক্ষেত্রে বলা চলিতে পারে না।

খানিকক্ষণ কেহই কথা বলিল না।

লীলা বলিল, তুমি বেশ এখানে থেকে ইস্কুলে পড়ো না কেন? সেখানে কি ইস্কুল আছে? পড়বে কোথায়? সে তো পাড়াগাঁ।

—আমি থাক্‌তে পারি কিন্তু মা তো আমায় এখেনে রেখে থাকতে পারবে না, নইলে আর কি—

—না হয় এক কাজ করো না কেন? কলকাতায় আমাদের বাড়ি থেকে পড়বে। আমি মাকে বলবো, অপূর্ব আমাদের বাড়িতে থাকবে; বেশ সুবিধে—আমাদের বাড়ির সামনে আজকাল ইলেকট্রিক ট্রাম হয়েছে—এঞ্জিনও নেই, ঘোড়াও নেই, এমনি চলে—তারের মধ্যে বিদ্যুৎ পোরা আছে, তাতে চলে।

—কি রকম গাড়ি? তারের ওপর দিয়ে চলে?

—একটা ডাণ্ডা আছে। তারে ঠেকে থাকে, তাতেই চলে। কলকাতা গেলে দেখবে এখন—ছ-সাত বছর হল ইলেকট্রিক ট্রাম হয়েছে, আগে ঘোড়ায় টানতো—

আরও অনেকক্ষণ দু-জনের কথাবার্তা চলিল।

বৈকালে সর্বজয়ার জ্যাঠামশায় ভবতারণ চক্রবর্তী আসিলেন। অপুকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। ঠিক করিলেন, দুইদিন পরে বুধবারের দিন লইয়া যাইবেন। অপু দু-একবার ভাবিল লীলার প্রস্তাবটা একবার মায়ের কাছে তোলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথাটা আর কার্যে পরিণত হইল না।

সকালের রৌদ্র ফুটিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই উলা স্টেশনে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। এখান

হইতেই মনসাপোতা যাইবার সুবিধা। ভবতারণ চক্রবর্তী পূর্ব হইতেই পত্র দিয়া গোরুর গাড়ির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাল রাত্রে একটু কষ্ট হইয়াছিল। এক্সপ্রেস ট্রেনখানা দেরিতে পৌঁছানোর জন্য ব্যান্ডেল হইতে নৈহাটির গাড়িখানা পাওয়া যায় নাই। ফলে বেশি রাত্রে নৈহাটিতে আসিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

সারারাত্রি জাগরণের ফলে অপু কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সে জানে না। চক্রবর্তী মহাশয়ের ডাকে উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল একটা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গাড়ি লাগিয়াছে। সেখানেই তাদের নামিতে হইবে। কুলিরা ইতিমধ্যে তাহাদের কিছু জিনিসপত্র নামাইয়াছে।

গোরুর গাড়িতে উঠিয়া চক্রবর্তী মহাশয় অনবরত তামাক টানিতে লাগিলেন। বয়স সত্তরের কাছাকাছি হইবে, একহারা পাতলা চেহারা, মুখে দাড়ি গোঁফ নাই, মাথার চুল সব পাকা। বলিলেন—জয়া, ঘুম পাচ্ছে না তো?

সর্বজয়া হাসিয়া বলিল, আমি তো নৈহাটিতে ঘুমিয়ে নিইচি আধঘণ্টা, অপুও ঘুমিয়েচে। আপনারই ঘুম হয় নি—

চক্রবর্তী মহাশয় খুব খানিকটা কাশিয়া লইয়া বলিলেন,—ওঃ, সোজা খোঁজটা করেছি তোদের! আর-বছর বোশেখে মেয়েটা গেল মারা, হরিধন তো তার আগেই। এই বয়সে হাত পুড়িয়ে রেঁধেও খেতে হয়েছে,—কেউ নেই সংসারে। তাই ভাবলাম হরিহর বাবাজীর তো নিশ্চিন্দিপুর থেকে উঠে যাবার ইচ্ছে ছিল অনেকদিন থেকেই, যাই এখানেই নিয়ে আসি। একটু ধানের জমি আছে, গৃহদেবতার সেবাটাও হবে। গ্রামে ব্রাহ্মণ তেমন নেই,—আর আমি তো এখানে থাকব না। আমি একটু কিছু ঠিক করে দিয়েই কাশী চলে যাবো। একরকম করে হরিহর নেবেন চালিয়ে। তাই গেলাম নিশ্চিন্দিপুর—

সর্বজয়া বলিল, আপনি বুঝি আমাদের কাশী যাওয়ার কথা শোনেননি?

—তা কি করে শুনবো? তোমাদের দেশে গিয়ে শুনলাম তোমরা নেই সেখানে। কেউ তোমাদের কথা বলতে পারে না—সবাই বলে তারা এখান থেকে বেচে-কিনে তিন-চার বছর হল কাশী চলে গিয়েছে। তখন কাশী যাই। কাশী আমি আছি আজ দশ বছর। খুঁজতেই সব বেরিয়ে পড়লো। হিসেব করে দেখলাম হরিহর যখন মারা যান, তখন আমিও কাশীতেই আছি, অথচ কখনও দেখাশুনো হয় নি, তা হলে কি আর—

অপু আগ্রহের সুরে বলিল, নিশ্চিন্দিপুরে আমাদের বাড়িটা কেমন আচে, দাদামশায়?

—সেদিকে আমি গেলাম কই! পথেই সব খবর পেলাম কি-না। আমি আর সেখানে দাঁড়াই নি। কেউ ঠিকানা দিতে পারলে না। ভুবন মুখুজ্যে মশায় অবিশ্যি খাওয়া-দাওয়া করতে বললেন, আর তোমার বাপের একশো নিন্দে—বুদ্ধি নেই, সাংসারিক জ্ঞান নেই—হেন তেন। যাক্ সেসব কথা, তোমরা এলে ভালো হল। যে ক'ঘর যজমান আছে তোমাদের বছর তাতে কেটে যাবে। পাশেই তেলিরা বেশ অবস্থাপন্ন, তাদের ঠাকুর প্রতিষ্ঠা আছে। আমি পুজোটুজো করতাম অবিশ্যি, সেটাও হাতে নিতে হবে ক্রমে। তোমাদের নিজেদের জিনিস দেখে শুনে নিতে হবে—

উলা গ্রামের মধ্যেও খুব বন, গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠের পথেও বনঝোপ। সূর্য আকাশে অনেকখানি উঠিয়া গিয়াছে। চারিধারে প্রভাতী রৌদ্রের মেলা, পথের ধারে বনতুলসীর জঙ্গল, মাঠের ঘাসে এখনও স্থানে স্থানে শিশির জমিয়া আছে, কোন্ রূপকথার দেশের মাকড়সা যেন রূপালি জাল বুনিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে কিসের একটা গন্ধ, বিশেষ কোনও ফুল ফলের গন্ধ নয় কিন্তু। শিশিরসিক্ত ঘাস, সকালের বাতাস, অড়হরের ক্ষেত, এখানে ওখানে বনজ গাছপালা, সবসুদ্ধ মিলাইয়া একটা সুন্দর সুগন্ধ।

অনেকদিন পরে এই সব গাছপালার প্রথম দর্শনে অপুর প্রাণে একটা উল্লাসের ঢেউ উঠিল। অপূর্ব, অদ্ভুত, সুতীব্র; মিনমিনে ধরনের নয়, পান্‌সে প্যান্‌সে জোলো ধরনের নয়। অপুর মন সে

শ্রেণীরই নয় আদৌ, তাহা সেই শ্রেণীর যাহা জীবনের সকল অবদানকে, ঐশ্বর্যকে প্রাণপণে নিংড়াইয়া চুষিয়া আঁটিসার করিয়া খাইবার ক্ষমতা রাখে। অল্পেই নাচিয়া ওঠে, অল্পে দমিয়াও যায়—যদিও পুনরায় নাচিয়া উঠিতে বেশি বিলম্ব করে না।

মনসাপোতা গ্রামে যখন গাড়ি ঢুকিল তখন বেলা দুপুর। সর্বজয়া ছইয়ের পিছন দিকের ফাঁক দিয়া চাহিয়া দেখিতেছে তাহার নূতনতম জীবনযাত্রা আরম্ভ করিবার স্থানটা কি রকম। তাহার মনে হইল গ্রামটাতে লোকের বাস একটু বেশি, একটু যেন বেশি ঠেসাঠেসি, ফাঁকা জায়গা বেশি নাই, গ্রামের মধ্যে বেশি বনজঙ্গলের বালাইও নাই। একটা কাহাদের বাড়ি, বাহির-বাটীর দাওয়ায় জনকয়েক লোক গল্প করিতেছিল, গোরুর গাড়িতে কাহারা আসিতেছে দেখিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। উঠানে বাঁশের আলনায় মাছ ধরিবার জাল শুকাইতে দিয়াছে। বোধ হয় গ্রামের জেলেপাড়া।

আরও খানিক গিয়া গাড়ি দাঁড়াইল। ছোট্ট উঠানের সামনে একখানি মাঝারি গোছের চালাঘর, দু-খানা ছোট্ট দোচালা ঘর, উঠানে একটা পেয়ারা গাছ ও একপাশে একটা পাতকুয়া। বাড়ির পিছনে একটা তেঁতুল গাছ—তাহার ডালপালা বড়ো চালাঘরখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সামনের উঠানটা বাঁশের জাফরি দিয়া ঘেরা। চক্রবর্তী মহাশয় গাড়ি হইতে নামিলেন। অপু মা'কে হাত ধরিয়া নামাইল।

চক্রবর্তী মহাশয় আসিবার সময় যে তেলিবাড়ির উল্লেখ করিয়াছিলেন, বৈকালের দিকে তাহাদের বাড়ির সকলে দেখিতে আসিল। তেলি-গিন্নি খুব মোটা, রং বেজায় কালো। সঙ্গে চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে, দুটি পুত্রবধূ। প্রায় সকলেরই হাতে মোটা মোটা সোনার অনন্ত দেখিয়া সর্বজয়ার মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ঘরের ভিতর হইতে দু-খানা কুশাসন বাহির করিয়া আনিয়া সলজ্জ ভাবে বলিল, আসুন আসুন, বসুন।

তেলি-গিন্নি পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিলে ছেলেমেয়ে ও পুত্রবধূরাও দেখাদেখি তাহাই করিল। তেলি-গিন্নি হাসিমুখে বলিল, দুপুরবেলা এলেন মা-ঠাকরুন একবার বলি যাই। এই যে পাশেই বাড়ি, তা আসতে পেলাম না। মেজছেলে এলো গোয়াড়ী থেকে—গোয়াড়ীতে দোকান আছে কি-না! মেজ বৌমার মেয়েটাও ন্যাওটো, মা দেখতে ফুরসত পায় না, দুপুরবেলা আমাকে একেবারে পেয়ে বসে—ঘুম পাড়াতে পাড়াতে বেলা দুটো। ঘুঙড়ি কাশি, গুপী কবরেজ বলেছে ময়ূরপুচ্ছ পুড়িয়ে মধু দিয়ে খাওয়াতে। তাই কি সোজাসুজি পুড়ুলে হবে মা, চৌষট্টি ফৈজং—কাঁসার ঘটির মধ্যে পোরো, তা ঘুঁটের জ্বাল করো, তা ঢিমে আঁচে চড়াও। হ্যাঁরে হাজরী, ভোঁদা গোয়াড়ী থেকে কাল মধু এনেছে কি-না জানিস?

আঠারো-উনিশ বছরের একটি মেয়ে ঘাড় নাড়িয়া কথাব উত্তর দিবার পূর্বেই তেলি-গিন্নি তাহাকে দেখাইয়া বলিল, ওইটি আমার মেজ মেয়ে—বহরমপুরে বিয়ে দিয়েচি। জামাই বড়োবাজারে এদের দোকানে কাজকর্ম করেন। নিজেদেরও গোলা, দোকান রয়েচে কালনা—বেয়াই সেখানে দেখেন শোনেন। কিন্তু হলে হবে কি মা—এমন কথা ভূভারতে কেউ কখনও শোনে নি। দুই ছেলে, নাতি নাতনী, বেয়ান মারা গেলেন ভাদ্দর মাসে, মাঘ মাসে বুড়ো আবার বিয়ে করে আনলে। এখন ছেলেদের সব দিয়েছে ভেন্ন করে। জামাইয়ের মুশকিল, ছেলেমানুষ—তা উনি বলেছেন, তা এখন তুমি বাবা আমাদের দোকানেই থাকো, কাজ দেখো শোনো শেখো, ব্যবসাদারের ছেলে, তারপর একটা হিল্লে লাগিয়ে দেওয়া যাবে।

বড়ো পুত্রবধূ এতক্ষণ কথা বলে নাই। সে ইহাদের মতো হুড় বার্নিস নয়, বেশ টকটকে রং। বোধ হয় শহর-অঞ্চলের মেয়ে। এ-দলের মধ্যে সে-ই সুন্দরী, বয়স বাইশ-তেইশ হইবে। সে নিচের ঠোঁটের কেমন চমৎকার এক প্রকার ভঙ্গি করিয়া বলিল, এঁরা এসেছেন, সারাদিন খাওয়া-দাওয়া হয় নি, এঁদের আজকের সব ব্যবস্থা তো করে দিতে হবে? বেলাও তো গিয়েছে, এঁরা আবার রান্না করবেন!

এই সময় অপু বাড়ির উঠানে ঢুকিল। সে আসিয়াই গ্রামখানা বেড়াইয়া দেখিতে বাহিরে গিয়াছিল। তেলি-গিন্নি বলিল—কে মা-ঠাকরুন? ছেলে বুঝি? এই এক ছেলে? বাঃ, চেহারা যেন রাজপুত্তুর।

সকলেরই চোখ তাহার উপর পড়িল। অপু উঠানে ঢুকিয়াই এতগুলি অপরিচিতের সম্মুখে পড়িয়া কিছু লজ্জিত ও সংকুচিত হইয়া উঠিল। পাশ কাটাইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিতেছিল, তাহার মা বলিল, দাঁড়া না এখেনে। ভারি লাজুক ছেলে মা—এখন ওইটুকুতে দাঁড়িয়েচে—আর এক মেয়ে ছিল, তা—সর্বজয়ার গলার স্বর ভারী হইয়া আসিল। গিন্নি ও বড়ো পুত্রবধূ একসঙ্গে বলিল, নেই, হ্যাঁ মা? সর্বজয়া বলিল, সে কি মেয়ে মা! আমায় ছলতে এসেছিল, কি চুল, কি চোখ, কি মিষ্টি কথা? বকো-ঝকো, গাল দাও, মা'র মুখে উঁচু কথাটি কেউ শোনে নি কোনদিন।

ছোটবউ বলিল, কত বয়সে গেল মা?

—এই তেরোয় পড়েই—ভাদ্র মাসে তেরোয় পড়ল, আশ্বিন মাসের ৭ই—দেখতে দেখতে চার বছর হয়ে গেল।

তেলি-গিন্নি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিল—আহা মা, তা কি করবে বলো, সংসারে থাকতে গেলে সবই...তাই উনি বললেন—আমি বললাম আসুন তাঁরা—চক্কতি মশায় পূজা-আচ্চা করেন—তা উনি মেয়েজামাই মারা যাওয়ার পর থেকে বড়ো থাকেন না। গাঁয়ে একঘর বামুন নেই—কাজকর্মে সেই গোয়াড়ী দৌড়তে হয়—থাকলে ভালো! বীরভূম না বাঁক্‌ড়ো জেলা থেকে সেবার এলো কি চাটুজ্যে। কি নামটা রে পাঁচী? বললে বাস করবো। বাড়ি থেকে চালডাল সিধে পাঠিয়ে দিই। তিন মাস রইল, বলে আজ ছেলেপিলে আন্‌ব—কাল ছেলেপিলে আন্‌ব—ও মা, এক মাগী গোয়ালার মেয়ে উঠোন ঝাঁট দিত আমাদের, তা বলি বামুন মানুষ এসেছে, ওঁরও কাজটা করে দিস। ঘেন্নার কথা শোনো মা, আব বছর শিবরাত্রির দিন—তাকে নিয়ে—

বউ-দুটি ও মেয়েরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সর্বজয়া অবাক হইয়া বলিল, পালালো নাকি?

—পালালো কি এমন তেমন পালালো মা? সেই সঙ্গে আমাদের এক প্রস্থ বাসন। কিছুই জানি নে মা, সব নিজের ঘর থেকে...বলি আহা বামুন এসেচে,—সরুক, আছে বাড়তি। তা সেই বাসন সবসুদ্ধ নিয়ে দুজনে নিউদ্দিশ। যাক সে সব কথা মা, উঠি তাহলে আজ। রান্নার কি আছে না-আছে বলো মা, সব দিই বন্দোবস্ত করে।

আট-দশ দিন কাটিয়া গেল; সর্বজয়া ঘরবাড়ি মনের মতো করিয়া সাজাইয়াছে। দেওয়াল উঠান নিকাইয়া পুঁছিয়া লইয়াছে। নিজস্ব ঘরদোর অনেকদিন ছিল না, নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া অবধিই নাই—এতদিন পরে একটা সংসারের সমস্ত ভার হাতে পাইয়া সে গত চার বৎসরের সঞ্চিত সাধ মিটাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

জ্যাঠামশায় লোক মন্দ নহেন বটে, কিন্তু শীঘ্রই সর্বজয়া দেখিল তিনি একটু বেশি কৃপণ। ক্রমে ইহাও বোঝা গেল—তিনি যে নিছক পরার্থপরতার ঝোঁকেই ইহাদের এখানে আনিয়াছেন তাহা নহে, অনেকটা আনিয়াছেন নিজের গরজে। তেলিদের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরটি পূজা না করিলে সংসার ভালো রূপ চলে না, তাহাদের বার্ষিক বৃত্তিও বন্ধ হইয়া যায়। এই বার্ষিক বৃত্তি সম্বল করিয়াই তিনি কাশী থাকেন। পাকা লোক, অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তবে তিনি ইহাদের আনিয়া তুলিয়াছেন। সর্বজয়াকে প্রায়ই বলেন—জয়া, তোর ছেলেকে বল কাজকর্ম সব দেখে নিতে। আমার মেয়াদ আর কতদিন? ওদের বাড়ির কাজটা দিক না আরম্ভ করে—সিধের চালেই তো মাস চলে যাবে।

সর্বজয়া তাহাতে খুব খুশি।

সকলের তাগিদে শীঘ্রই অপু পূজার কাজ আরম্ভ করিল—দুটি একটি করিয়া কাজকর্ম আরম্ভ

হইতে হইতে ক্রমে এপাড়ায় ওপাড়ায় অনেক বাড়ি হইতেই লক্ষ্মীপূজায় মাকালপূজায় তাহার ডাক আসে। অপু মহা উৎসাহে প্রাতঃস্নান করিয়া উপনয়নের চেলির কাপড় পরিয়া নিজের টিনের বাক্সের বাংলা নিত্যকর্মপদ্ধতিখানা হাতে লইয়া পূজা করিতে যায়। পূজা করিতে বসিয়া আনাড়ির মতো কোন্ অনুষ্ঠান করিতে কোন্ অনুষ্ঠান করে। পূজার কোন পদ্ধতি জানে না—বার বার বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে কি লেখা আছে—'বজ্রায় হুং' বলিবার পর শিবের মাথায় বজ্রের কি গতি করিতে হইবে—'ওঁ ব্রহ্মপৃষ্ঠ ঋষি সুতলছন্দঃ কূর্মো দেবতা' বলিয়া কোন্ মুদ্রায় আসনের কোণ কি ভাবে ধরিতে হইবে—কোনরকমে গোঁজামিল দিয়া কাজ সারিবার মতো পটুত্বও তাহার আয়ত্ত হয় নাই, সুতরাং পদে পদে আনাড়িপনাটুকু ধরা পড়ে।

একদিন সেটুকু বেশি করিয়া ধরা পড়িল ওপাড়ার সরকারদের বাড়ি। যে ব্রাহ্মণ তাহাদের বাড়িতে পূজা করিত, সে কি জন্য রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, গৃহদেবতা নারায়ণের পূজার জন্য তাহাদের লোক অপুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। বাড়ির বড়ো মেয়ে নিরুপমা পূজার জোগাড় করিয়া দিতেছিল, চৌদ্দ বৎসরের ছেলেকে চেলি পরিয়া পুঁথি বগলে গম্ভীর মুখে আসিতে দেখিয়া সে একটু অবাক হইল। জিজ্ঞাসা করিল, তুমি পুজো করতে পারবে? কি নাম তোমার? চক্কত্তি মশায় তোমার কে হন?

মুখচোরা অপুর মুখে বেশি কথা জোগাইল না, লাজুক মুখে সে গিয়া আনাড়ির মতো আসনের উপর বসিল।

পূজা কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতে নিরুপমার কাছে পূজারির বিদ্যা ধরা পড়িয়া গেল। নিরুপমা হাসিয়া বলিল, ওকি? ঠাকুর নামিয়ে আগে নাইয়ে নাও, তবে তো তুলসী দেবে?—

অপু থতমত খাইয়া ঠাকুর নামাইতে গেল।

নিরুপমা বসিয়া পড়িয়া বলিল—উঁহু, তাড়াতাড়ি কোরো না। এই টাটে আগে ঠাকুর নামাও—আচ্ছা, এখন বড়ো তাম্রকুণ্ডুতে জল ঢালো—

অপু ঝুঁকিয়া পড়িয়া বইয়ের পাতা উলটাইয়া স্নানের মন্ত্র খুঁজিতে লাগিল। তুলসীপত্র পরাইয়া শালগ্রামকে সিংহাসনে উঠাইতে যাইতেছে, নিরুপমা বলিল, ওকি? তুলসীপাতা উপুড় করে পরাতে হয় বুঝি? চিৎ করে পরাও—

ঘামে রাঙামুখ হইয়া কোনরকমে পূজা সাঙ্গ করিয়া অপু চলিয়া আসিতেছিল, নিরুপমা ও বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে আসন পাতিয়া বসাইয়া ভোগের ফলমূল ও সন্দেশ জলযোগ করাইয়া তবে ছাড়িয়া দিল।

মাসখানেক কাটিয়া গেল।

অপুর কেমন মনে হয় নিশ্চিন্দিপুরের সে অপূর্ব মায়ারূপ এখানকার কিছুতেই নাই। এই গ্রামে নদী নাই, মাঠ থাকিলেও সে মাঠ নাই, লোকজন বেশি, গ্রামের মধ্যেও লোকজন বেশি। নিশ্চিন্দিপুরের সেই উদার স্বপ্নমাখানো মাঠ, সে নদীতীর এখানে নাই, তাদের দেশের মতো গাছপালা, কত ফুলফল, পাখি, নিশ্চিন্দিপুরের সে অপূর্ব বন-বৈচিত্র্য, কোথায় সে সব? কোথায় সে নিবিড় পুষ্পিত ছাতিম বন, ডালে ডালে সোনার সিঁদুর ছড়ানো সন্ধ্যা?

সরকার-বাড়ি হইতে আজকাল প্রায়ই পূজা করিবার ডাক আসে। শান্তস্বভাব, সুন্দর ও চেহারার গুণে অপুকেই আগে চায়। বিশেষ বারব্রতের দিনে পূজাপত্র সারিয়া অনেক বেলায় সে ধামা করিয়া নানাবাড়ির পূজার নৈবেদ্য ও চাল-কলা বহিয়া বাড়ি আনে। সর্বজয়া হাসিমুখে বলে, ওঃ, আজ চাল তো অনেক হয়েচে!—দেখি! সন্দেশ কাদের বাড়ির নৈবিদ্যিতে দিল রে!

অপু খুশির সহিত দেখাইয়া বলে, কুণ্ডুবাড়ি থেকে কেমন একছড়া কলা দিয়েচে, দেখেচো মা?

সর্বজয়া বলে, এবার বোধহয় ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, এদের ধরে থাকা যাক, গিন্নি

লোক বড়ো ভালো। মেজছেলের শ্বশুরবাড়ি থেকে তত্ত্ব পাঠিয়েচে—অসময়ের আম—অমনি আমার এখানে পাঠিয়ে দিয়েচে—খাস্ এখন দুধ দিয়ে।

এত নানারকমের ভালো জিনিস সর্বজয়া কখনও নিজের আয়ত্তের মধ্যে পায় নাই। তাহার কতকালের স্বপ্ন! নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িতে কত নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে, উঠানের উপর ঝুঁকিয়া-পড়া বাঁশবনের পত্রস্পন্দনে, ঘুঘুর ডাকে, তাহার অবসন্ন অন্যমনস্ক মন যে অবাস্তব সচ্ছলতার ছবি আপন মনে ভাঙিত গড়িত—হাতে খরচ নাই, ফুটা বাড়িতে জল পড়ে বৃষ্টির রাত্রে, পাড়ায় মুখ পায় না, সকলে তুচ্ছ করে, তাচ্ছিল্য করে, মানুষ বলিয়াই গণ্য করে না—সে সব দিনের স্মৃতির সঙ্গে, আমরুল শাকের বনে পুরানো পাঁচিলের দীর্ঘছায়ার সঙ্গে যে সব দূরকালের দুরাশার রঙে রঙিন ভবিষ্যৎ জড়ানো ছিল—এই তো এতদিনে তাহারা পৃথিবীর মাটিতে নামিয়া আসিয়াছে।

পূজার কাজে অপুর অত্যন্ত উৎসাহ। রোজ সকালে উঠিয়া সে কলুপাড়ার একটা গাছ হইতে রাশীকৃত কচি কচি বেলপাতা পাড়িয়া আনে। একটা খাতা বাঁধিয়াছে, তাহাতে সর্বদা ব্যবহারের সুবিধার জন্য নানা দেব-দেবীর স্তবের মন্ত্র, স্নানের মন্ত্র, তুলসীদান প্রণালী লিখিয়া লইয়াছে। পাড়ায় পূজা করিতে নিজের তোলা ফুল-বেলপাতা লইয়া যায়, পূজার সকল পদ্ধতি নিখুঁতভাবে জানা না থাকিলেও উৎসাহ ও একাগ্রতায় সে সকল অভাব পূরণ করিয়া লয়।

বর্ষাকালের মাঝামাঝি অপু একদিন মাকে বলিল যে, সে স্কুলে পড়িতে যাইবে। সর্বজয়া আশ্চর্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কোন্ ইস্কুল রে?

—কেন, এই তো আড়বোয়ালেতে বেশ ইস্কুল রয়েচে।

—সে তো এখেন থেকে যেতে-আসতে চার ক্রোশ পথ। সেখেনে যাবি হেঁটে পড়তে?

সর্বজয়া কথাটা তখনকার মতো উড়াইয়া দিল বটে, কিন্তু ছেলের মুখে কয়েকদিন ধরিয়া বার বার কথাটা শুনিয়া সে শেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, যা খুশি করো অপু, আমি জানি নে। তোমরা কোনো কালে কারুর কথা তো শুনলে না? শুনবেও না—সেই একজন নিজের খেয়ালে সারাজন্ম কাটিয়ে গেল, তোমারও তো সে ধারা বজায় রাখা চাই! ইস্কুলে পড়বো! ইস্কুলে পড়বি তো এদিকে কি হবে? দিব্যি একটা যাহোক দাঁড়াবার পথ তবু হয়ে আসছে—এখন তুমি দাও ছেড়ে—তারপর ইদিকেও যাক্, ওদিকেও যাক—

মায়ের কথায় সে চুপ করিয়া গেল। চক্রবর্তী মহাশয় গত পৌষ মাসে কাশী চলিয়া গিয়াছেন, আজকাল তাহাকেই সমস্ত দেখিতে শুনিতে হয়। সামান্য একটু জমি-জমা আছে, তাহার খাজনা আদায়, ধান কাটাইবার বন্দোবস্ত, দশকর্ম, গৃহদেবতার পূজা। গ্রামে ব্রাহ্মণ নাই, তাহারাই একঘর মোটে। চাষি কৈবর্ত ও অন্যান্য জাতির বাস, তাহা ছাড়া এ-পাড়ার কুণ্ডুরা ও ও-পাড়ার সরকারেরা। কাজে কর্মে ইহাদের সকলেরই বাড়ি অপুকে ষষ্ঠীপূজা, মাকালপূজা করিয়া বেড়াইতে হয়। সবাই মানে, জিনিসপত্র দেয়।

সেদিন কি একটা তিথি উপলক্ষে সরকার-বাড়ি লক্ষ্মীপূজা ছিল। পূজা সারিয়া খানিক রাত্রে জিনিসপত্র একটা পুঁটুলি বাঁধিয়া লইয়া সে পথ বাহিয়া বাড়ির দিকে আসিতেছিল; খুব জ্যোৎস্না, সরকার বাড়ির সামনে নারিকেল গাছে কাঠঠোকরা শব্দ করিতেছে। শীত বেশ পড়িয়াছে; বাতাস খুব ঠাণ্ডা, পথে ক্ষেত্র কাপালির বেড়ায় আমড়া গাছে বউল ধরিয়াছে। কাপালিদের বাড়ির পিছনে বেগুনক্ষেতের উঁচুনিচু জমিতে এক জায়গায় জ্যোৎস্না পড়িয়া চক চক করিতেছে—পাশের খাদটাতেই অন্ধকার। অপু মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে যাইতেছিল যে, উঁচু জায়গাটা একটা ভালুক, নিচুটা জলের চৌবাচ্চা, তার পরের উঁচুটা নুনের ঢিবি। মনে মনে ভাবিল—কমলালেবু দিয়েচে, বাড়ি গিয়ে কমলালেবু খাবো। মনের সুখে শহরে-শেখা একটা গানের একটা চরণ সে গুন্ গুন্ করিয়া ধরিল—

সাগর-কূলে বসিয়া বিরলে হেরিব লহরীমালা—

অনেকদিনের স্বপ্ন যেন আবার ফিরিয়া আসে। নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে ইছামতীর তীরের বনে, মাঠে কত ধূসর অপরাহ্ণের, কত জ্যোৎস্না-রাতের সে-সব স্বপ্ন! এই ছোট্ট চাষাগাঁয়ে চিরকালই এ রকম ষষ্ঠীপূজা মাকালপূজা করিয়া কাটাইতে হইবে?

সারাদিনের রোদে-পোড়া মাটি নৈশ শিশিরে স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে, এখন শীতের রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাহারই সুগন্ধ।

অপুর মনে হইল রেলগাড়ির চাকায় চাকায় যেন শব্দ হয়—ছোট্‌ঠাকুর-পো—বট্‌ঠাকুর-পো—ছোট্‌ঠাকুর-পো—বট্‌ঠাকুর-পো—

দুই-এক দিনের মধ্যে সে মায়ের কাছে কথাটা আবার তুলিল। এবার শুধু তোলা নয়, নিতান্ত নাছোড়বান্দা হইয়া পড়িল। আড়বোয়ালের স্কুল দুই ক্রোশ দূরে, তাই কি? সে খুব হাঁটিতে পারিবে এটুকু। সে বুঝি চিরকাল এই রকম চাষাগাঁয়ে বসিয়া বসিয়া ঠাকুরপূজা করিবে? বাহিরে যাইতে পাবিবে না বুঝি?

তবু আরও মাস দুই কাটিল। স্কুলের পড়াশোনা সর্বজয়া বোঝে না, সে যাহা বোঝে তাহা পাইয়াছে। তবে আবার ইস্কুলে পড়িয়া কি লাভ? বেশ তো সংসার গুছাইয়া উঠিতেছে। আর বছর কয়েক পরে ছেলের বিবাহ—তারপরই একঘর মানুষের মতো মানুষ।

সর্বজয়ার স্বপ্ন সার্থক হইয়াছে।

কিন্তু অপুর তাহা হয় নাই। তাহাকে ধরিয়া রাখা গেল না—শ্রাবণের প্রথমে সে আড়বোয়ালের মাইনর স্কুলে ভর্তি হইয়া যাতায়াত শুরু করিল।

এই পথের কথা সে জীবনের কোনোদিন ভোলে নাই—এই একটি বৎসর ধরিয়া কি অপরূপ আনন্দই পাইয়াছিল—প্রতিদিন সকালে-বিকালে এই পথ হাঁটিবার সময়টাতে। ...নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া অবধি এত আনন্দ আর হয় নাই।

ক্রোশ দুই পথ। দুধারে বট, তুঁতের ছায়া, ঝোপঝাপ, মাঠ, মাঝে মাঝে অনেকখানি ফাঁকা আকাশ। স্কুলে বসিয়া অপুর মনে হইত সে যেন একা কতদূর বিদেশে আসিয়াছে, মন চঞ্চল হইয়া উঠিত—ছুটির পরে নির্জন পথে বাহির হইয়া পড়িত।—বৈকালের ছায়ায় ঢ্যাঙা তাল-খেজুরগাছগুলা যেন দিগন্তের আকাশ ছুঁইতে চাহিতেছে—পিড়িং পিড়িং পাখির ডাক—হু হু মাঠের হাওয়ায় পাকা ফসলের গন্ধ আনিতেছে—সর্বত্র একটা মুক্তি, একটা আনন্দের বার্তা।...

কিন্তু সর্বাপেক্ষা সে আনন্দ পাইত পথচলতি লোকজনের সঙ্গে কথা কহিয়া। কত ধরনের লোকের সঙ্গে পথে দেখা হইত—কত দূর-গ্রামের লোক পথ দিয়া হাঁটিত, কত দেশের লোক কত দেশে যাইত। অপু সবেমাত্র একা পথে বাহির হইয়াছে, বাহিরের পৃথিবীটার সহিত নতুন ভাবে পরিচয় হইতেছে, পথে ঘাটে সকলেব সঙ্গে আলাপ কবিয়া তাহাদের কথা জানিতে তাহার প্রবল আগ্রহ। পথ চলিবার সময়টা এইজন্য বড়ো ভালো লাগে, সাগ্রহে সে ইহার প্রতীক্ষা করে, স্কুলের ছুটির পর পথে নামিয়াই ভাবে—এইবার গল্প শুনবো। পরে ক্ষিপ্রপদে আগাইয়া আসিয়া কোনো অপরিচিত লোকের নাগাল ধরিয়া ফেলে। প্রায়ই চাষালোক, হাতে হুঁকোকল্কে। অপু জিজ্ঞাসা কবে—কোথায় যাচ্ছ, হ্যাঁ কাকা? চলো আমি মনসাপোতা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে যাবো। মামজোয়ান গিইছিলে? তোমাদের বাড়ি বুঝি? না? শিক্‌ড়ে? নাম শুনেচি, কোন্‌দিকে জানি নে। কি খেয়ে সকালে বেরিয়েছ, হ্যাঁ কাকা?...

তারপর সে নানা খুঁটিনাটি কথা জিজ্ঞাসা করে—কেমন সে গ্রাম, ক'ঘর লোকের বাস, কোন নদীর ধারে? ক'জন লোক তাদের বাড়ি, কত ছেলেমেয়ে, তারা কি করে?...

কত গল্প, কত গ্রামের কিংবদন্তি, সেকাল-একালের কত কথা, পল্লী-গৃহস্থের কত সুখদুঃখের কাহিনী—সে শুনিয়াছিল এই এক বৎসরে। সে চিরদিন গল্প-পাগলা, গল্প শুনিতে শুনিতে আহার-

নিদ্রা ভুলিয়া যায়—যত সামান্য ঘটনাই হোক, তাহার ভালো লাগে। একটা ঘটনা মনে কি গভীর রেখাপাতই করিয়াছিল!

কোন্ গ্রামের এক ব্রাহ্মণবাড়ির বৌ এক বাগদীর সঙ্গে কুলের বাহির হইয়া গিয়াছিল—আজ অপুর সঙ্গীটি এইমাত্র তাকে শামুকপোতার বিলে গুগ্‌লি তুলিতে দেখিয়া আসিয়াছে। পরনে ছেঁড়া কাপড়, গায়ে গহনা নাই, ডাঙায় একটি ছোটছেলে বসিয়া আছে, বোধ হয় তাহারই। অপু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার দেশের মেয়ে? তোমায় চিনতে পারলে?

হ্যাঁ, চিনিতে পারিয়াছিল। কত কাঁদিল, চোখের জল ফেলিল, বাপ-মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল। অনুরোধ করিল যেন এসব কথা দেশে গিয়া সে না বলে। বাপ-মা শুনিয়া কষ্ট পাইবে। সে বেশ সুখে আছে। কপালে যাহা ছিল, তাহা হইয়াছে।

সঙ্গীটি উপসংহারে বলিল, বামুন-বাড়ির বৌ, হর্তেলের মতো গায়ের রঙ—যেন ঠাকরুনের পির্‌তিমে!

দুর্গা-প্রতিমার মতো রূপসী একটি গৃহস্থবধূ ছেঁড়া কাপড় পরনে, শামুকপোতার বিলে হাঁটুজল ভাঙিয়া চুপড়ি হাতে গুগ্‌লি তুলিতেছে—কত কাল ছবিটা তাহার মনে ছিল!

সেদিন সে স্কুলে গিয়া দেখিল স্কুলসুদ্ধ লোক বেজায় সন্ত্রস্ত! মাস্টারেরা এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছেন। স্কুল-ঘর গাঁদা ফুলের মালা দিয়া সাজানো হইতেছে, তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় খামোখা একটি সুবৃহৎ সিঁড়ি-ভাঙা ভগ্নাংশ কষিয়া নিজের ক্লাসের বোর্ড পুরাইয়া রাখিয়াছেন। হঠাৎ আজ স্কুল-ঘরের বারান্দা ও কম্পাউন্ড এত সাফ করিয়া রাখা হইয়াছে যে, যাহারা বারোমাস এস্থানের সহিত পরিচিত, তাহাদের বিস্মিত হইবার কথা। হেডমাস্টার ফণীবাবু খাতাপত্র, অ্যাডমিশন বুক, শিক্ষকগণের হাজিরা বই লইয়া মহা ব্যস্ত। সেকেন্ড পণ্ডিতকে ডাকিয়া বলিলেন, ও অমূল্যবাবু, চৌঠো তারিখে খাতায় যে নাম সই করেন নি? আপনাকে বলে বলে আর পারা গেল না। দেরিতে এসেছিলেন তো খাতায় সই করে ক্লাসে গেলেই হত? সব মনে থাকে, এইটের বেলাতেই—

অপু শুনিল একটার সময় ইন্সপেক্টর আসিবেন স্কুল দেখিতে। ইন্সপেক্টর আসিলে কি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে, তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসের ছেলেদের সে বিষয়ে তালিম দিতে লাগিলেন।

বারোটার কিছু পূর্বে একখানা ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া স্কুলের সামনে থামিল। হেডমাস্টার তখনও ফাইল দুরস্ত শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই বোধ হয়—তিনি এত সকালে ইন্সপেক্টর আসিয়া পড়াটা প্রত্যাশা করেন নাই, জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া গাড়ি দেখিতে পাইয়াই উঠি-পড়ি অবস্থায় ছুটিলেন। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় হঠাৎ তড়িৎস্পৃষ্ট ভেকের মতো সজীব হইয়া উঠিয়া তারস্বরে ও মহা উৎসাহে (অন্যদিন এই সময়টাই তিনি ক্লাসে বসিয়া মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাটুকু উপভোগ করিয়া থাকেন) দ্রব পদার্থ কাহাকে বলে তাহার বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। পাশের ঘরে সেকেন্ড পণ্ডিত মহাশয়ের হুঁকোর শব্দ অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত বন্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উচ্চকণ্ঠ শোনা যাইতে লাগিল। শিক্ষক বলিলেন, মতি, তোমরা অবশ্যই কমলালেবু দেখিয়াছ, পৃথিবীর আকার—এই হরেন—কমলালেবুর ন্যায় গোলাকার—

হেডমাস্টারের পিছনে পিছনে ইন্সপেক্টর স্কুল ঘরে ঢুকিলেন। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বৎসর হইবে, বেঁটে, গৌরবর্ণ, সাটিন জিনের লম্বা কোট গায়ে, সিল্কের চাদর গলায়, পায়ে সাদা ক্যাম্বিশের জুতা, চোখে চশমা। গলার স্বর ভারী। প্রথমে তিনি অফিস-ঘরে ঢুকিয়া খাতাপত্র অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখার পরে বাহির হইয়া হেডমাস্টারের সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাসে গেলেন। অপুর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল। এইবার তাহাদের ক্লাসে আসিবার পালা। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় গলার সুর আর এক গ্রাম চড়াইলেন।

ইন্সপেক্টর ঘরে ঢুকিয়া বোর্ডের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এরা কি ভগ্নাংশ ধরেছে?

তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয়ের মুখ আত্মপ্রসাদে উজ্জ্বল দেখাইল; বলিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, দু-ক্লাসে আমি অঙ্ক কষাই কি না। ও ক্লাসেই অনেকটা এগিয়ে দিই—সরল ভগ্নাংশটা শেষ করে ফেলি—

ইন্সপেক্টর এক এক করিয়া বাঙলা রিডিং পড়িতে বলিলেন। পড়িতে উঠিয়াই অপুর গলা কাঁপিতে লাগিল। শেষের দিকে তাহার পড়া বেশ ভালো হইতেছে বলিয়া তাহার নিজেরই কানে ঠেকিল। পরিষ্কার সতেজ বাঁশির মতো গলা। রিনরিনে মিষ্টি।

—বেশ, বেশ রিডিং। কি নাম তোমার?

তিনি আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। তারপর সবগুলি ক্লাস একে একে ঘুরিয়া আসিয়া জলের ঘরে ডাব সন্দেশ খাইলেন। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় অপুকে বলিলেন, তুই হাতে করে এই ছুটির দরখাস্তখানা নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাক, তোকে খুব পছন্দ করেছেন, যেমন বাইরে আসবেন, অমনি দরখাস্তখানা হাতে দিবি—দু-দিন ছুটি চাইবি—তোর কথায় হয়ে যাবে—এগিয়ে যা।

ইন্সপেক্টর চলিয়া গেলেন। তাঁহার গাড়ি কিছুদূর যাইতে না যাইতে ছেলেরা সমস্বরে কলরব করিতে করিতে স্কুল হইতে বাহির হইয়া পড়িল। হেডমাস্টার ফণীবাবু অপুকে বলিলেন, ইন্সপেক্টরবাবু খুব সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন তোমার ওপর। বোর্ডের একজামিন দেওয়াব তোমাকে দিয়ে—তৈরি হও, বুঝলে?

বোর্ডের পরীক্ষা দিতে মনোনীত হওয়ার জন্য যত না হউক, ইন্সপেক্টরের পরিদর্শনের জন্য দুদিন স্কুল বন্ধ থাকিবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সে বাড়ির দিকে রওনা হইল। অন্যদিনের চেয়ে দেরি হইয়া গিয়াছে। অর্ধেক পথ চলিয়া আসিয়া পথের ধারে একটা সাঁকোর উপর বসিয়া মায়ের দেওয়া খাবারের পুঁটুলি খুলিয়া রুটি, নারিকেলকোরা ও গুড় বাহির করিল। এইখানটাতে বসিয়া রোজ সে স্কুল হইতে ফিরিবার পথে খাবার খায়। রাস্তার বাঁকের মুখে সাঁকোটা, হঠাৎ কোনো দিক হইতে দেখা যায় না, একটা বড়ো তুঁত-গাছের ডালপালা নত হইয়া ছায়া ও আশ্রয় দুই-ই জোগাইতেছে। সাঁকোর নিচে আমরুল শাকের বনের ধারে একটু একটু জল বাধিয়াছে, মুখ বাড়াইলেই জলে ছায়া পড়ে। অপুর কেমন একটা অস্পষ্ট ভিত্তিহীন ধারণা আছে যে, জলটা মাছে ভর্তি, তাই সে একটু একটু রুটির টুক্‌রা উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখে মাছে ঠোক্‌রাইতেছে কি না।

সাঁকোর নিচের জলে হাত মুখ ধুইতে নামিতে গিয়া হঠাৎ তাহার চোখ পড়িল একজন ঝাঁকড়া-চুল কালোমতো লোক রাস্তার ধারের মাঠে নামিয়া লতা-কাঠি কুড়াইতেছে। অপু কৌতূহলী হইয়া চাহিয়া রহিল। লোকটা খুব লম্বা নয়, বেঁটে ধরনের, শক্ত হাত পা, পিঠে একগাছা বড়ো ধনুক, একটা বড়ো বোঁচকা, মাথার চুল লম্বা লম্বা, গলায় রাঙা সবুজ হিংলাজের মালা। সে অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া ডাকিয়া বলিল, ওখানে কি খুঁজচো? পরে লোকটির সঙ্গে তাহার আলাপ হইল। সে জাতিতে সাঁওতাল, অনেক দূরে কোথায় দুমকা জেলা আছে, সেখানে বাড়ি। অনেক দিন বর্ধমানে ছিল, বাঁকা বাঁকা বাংলা বলে, পায়ে হাঁটিয়া সেখান হইতে আসিতেছে। গন্তব্য স্থান অনির্দেশ্য—এরূপে যতদূর যাওয়া যায় যাইবে, সঙ্গে তীর ধনুক আছে, পথের ধারে বনে মাঠে যাহা শিকার মেলে—তাহাই খায়। সম্প্রতি একটা কি পাখি মারিয়াছে, মাঠের কোন্ ক্ষেত হইতে গোটাকয়েক বড়ো বড়ো বেগুনও তুলিয়াছে—তাহাই পুড়াইয়া খাইবার জোগাড়ে শুকনো লতা-কাঠি কুড়াইতেছে। অপু বলিল, কি পাখি দেখি? লোকটা ঝোলা হইতে বাহির করিয়া দেখাইল একটা বড়ো হড়িয়াল ঘুঘু। সত্যিকারের তীর ধনুক—যাহাতে সত্যিকারের শিকার সম্ভব হয়—অপু কখনও দেখে নাই। বলিল, দেখি একগাছা তীর তোমার? পরে হাতে লইয়া দেখিল, মুখে শক্ত লোহার ফলা, পিছনে বুনোপাখির পালক বাঁধা—অদ্ভুত কৌতূহলপ্রদ ও মুগ্ধকর জিনিস!

—আচ্ছা এতে পাখি মরে, আর কি মরে?

লোকটা উত্তর দিল, সবই মারা যায়—খরগোশ, শিয়াল, বেজি, এমন কি বাঘ পর্যন্ত। তবে বাঘ মারিবার সময় তীরের ফলায় অন্য একটা লতার রস মাখাইয়া লইতে হয়।...তাহার পর সে

তুঁতগাছতলায় শুক্‌না পাতা লতার আগুন জ্বালিল। অপুর পা আর সেখান হইতে নড়িতে চাহিল না—মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, লোকটা পাখিটার পালক ছাড়াইয়া আগুনে ঝলসাইতে ছিল, বেগুনগুলাও পুড়াইতে দিল।

বেলা অত্যন্ত পড়িলে অপু বাড়ি রওনা হইল। আহার শেষ করিয়া লোকটা তখন তাহার বোঁচকা ও তীর ধনুক লইয়া রওনা হইয়াছে। এ রকম মানুষ সে তো কখনও দেখে নাই। বাঃ—যেদিকে দুই চোখ যায় সেদিকে যাওয়া—পথে পথে তীর ধনুক দিয়া শিকার করা, বনের লতাপাতা কুড়াইয়া গাছতলায় দিনের শেষে বেগুন পুড়াইয়া খাওয়া! গোটা আষ্টেক বড়ো বড়ো বেগুন সামান্য একটু নুনের ছিটা দিয়া গ্রাসের পর গ্রাস তুলিয়া কি করিয়াই নিমেষের মধ্যে সাবাড় করিয়া ফেলিল!...

মাস কয়েক কাটিয়া গেল। সকালবেলা স্কুলের ভাত চাহিতে গিয়া অপু দেখিল রান্না চড়ানো হয় নাই। সর্বজয়া বলিল, আজ যে কুলুইচণ্ডী পুজো—আজ স্কুলে যাবি কি করে?...ওরা বলে গিয়েচে ওদের পুজোটা সেরে দেওয়ার জন্যে—পুজোবারে কি আর স্কুলে যেতে পারবি? বড্ড দেরি হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, তাই বইকি? আমি পুজো করতে গিয়ে স্কুল কামাই করি আর কি? আমি ওসব পারবো না, পুজোটুজো আমি আর করবো কি করে, রোজই তো পুজো লেগে থাকবে আর আমি বুঝি রোজ রোজ—তুমি ভাত নিয়ে এসো আমি ওসব শুনছিনে—।

—লক্ষ্মী বাবা আমার। আচ্ছা, আজকের দিনটা পুজোটা সেরে নে। ওরা বলে গিয়েছে ওপাড়াসুদ্ধ পুজো হবে। চাল পাওয়া যাবে এক ধামার কম নয়, মানিক আমার, কথা শোনো, শুনতে হয়!

অপু কোন মতেই শুনিল না। অবশেষে না খাইয়াই স্কুলে চলিয়া গেল। সর্বজয়া ভাবে নাই যে, ছেলে সত্যসত্যই তাহার কথা ঠেলিয়া না খাইয়া স্কুলে চলিয়া যাইবে। যখন সত্যই বুঝিতে পারিল, তখন তাহার চোখের জল আর বাধা মানিল না। ইহা সে আশা করে নাই।

অপু স্কুলে পৌঁছিতেই হেডমাস্টার ফণীবাবু তাহাকে নিজের ঘরে ডাক দিলেন। ফণীবাবুর ঘরেই স্থানীয় ব্রাঞ্চ পোস্ট-অফিস, ফণীবাবুই পোস্ট-মাস্টার। তিনি তখন ডাকঘরের কাজ করিতেছিলেন। বলিলেন, এসো অপূর্ব, তোমার নম্বর দেখবে? ইন্সপেক্টর অফিস থেকে পাঠিয়ে দিয়েচে—বোর্ডের এগজামিনে তুমি জেলার মধ্যে প্রথম হয়েচ—পাঁচ টাকার একটা স্কলারশিপ পাবে যদি আরও পড়ো'তবে। পড়বে তো?

এই সময়ে তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় ঘরে ঢুকিলেন। ফণীবাবু বলিলেন, ওকে সে কথা এখন বললাম পণ্ডিতমশাই। জিজ্ঞাসা করচি আরও পড়বে তো? তৃতীয় পণ্ডিত বলিলেন, পড়বে না, বাঃ! হীরের টুকরো ছেলে, স্কুলের নাম রেখেছে। ওরা যদি না পড়ে তো পড়বে কে, কেষ্ট তেলির বেটা গোবর্ধন? কিচ্ছু না, আপনি ইন্সপেক্টর অফিসে লিখে দিন যে, ও হাই স্কুলে পড়বে। ওর আবার জিজ্ঞেসটা কি?—ওঃ, সোজা পরিশ্রম করিচি মশাই ওকে ভগ্নাংশটা শেখাতে?

প্রথমটা অপু যেন ভালো করিয়া কথাটা বুঝিতে পারিল না। পরে যখন বুঝিল তখন তাহার মুখে কথা জোগাইল না। হেডমাস্টার একখানা কাগজ বাহির করিয়া তাহার সামনে ধরিয়া বলিলেন—এইখানে একটা নাম সই করে দাও তো। আমি কিন্তু লিখে দিলাম যে, তুমি হাই স্কুলে পড়বে। আজই ইন্সপেক্টর অফিসে পাঠিয়ে দেবো।

সকাল সকাল ছুটি লইয়া বাড়ি ফিরিবার পথে মায়ের করুণ মুখচ্ছবি বার বার তাহার মনে আসিতে লাগিল। পথের পাশে দুপুরের রৌদ্রভরা শ্যামল মাঠ, প্রাচীন তুঁত বটগাছের ছায়া, ঘন শালপত্রের অন্তরালে ঘুঘুর উদাস কণ্ঠ, সব যেন করুণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে এই অপূর্ব করুণ

ভাবটি বড়ো গভীর ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল। আজিকার দুপুরটির কথা উত্তর জীবনে বড়ো মনে আসিত তাহার। কত—কতদিন পরে আবার এই শ্যামচ্ছায়াভরা বীথি, বাল্যের অপরূপ জীবনানন্দ, ঘুঘুর ডাক, মায়ের মনের একদিনের দুঃখটি—অনন্তের মণিহারে গাঁথা দানাগুলির একটি, পশ্চিম দিগন্তে প্রতি সন্ধ্যায় ছিঁড়িয়া-পড়া, বহুবিস্মৃত মুক্তাবলীর মধ্যে কেমন করিয়া অক্ষয় হইয়া ছিল।

বাড়িতে তাহার মাও আজ সারাদিন খায় নাই। ভাত চাহিয়া না পাইয়া ছেলে না খাইয়াই চলিয়া গিয়াছে স্কুলে—সর্বজয়া কি করিয়া খাবারের কাছে বসে? কুলুইচণ্ডীর ফলার খাইয়া অপু বৈকালে বেড়াইতে গেল।

গ্রামের বাহিরে ধঞ্চেক্ষেতের ফসল কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। চারি ধারে খোলা মাঠ পড়িয়া আছে। আবার সেই সব রঙিন কল্পনা; সে পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছে! তার স্বপ্নের অতীত! মোটে এক বছর পড়িয়াই বৃত্তি পাইল!...সুমুখের জীবনের কত ছবিই আবার মনে আসে। ওই মাঠের পারে রক্ত-আকাশটার মতো রহস্যস্বপ্নভরা যে অজানা অকূল জীবন-মহাসমুদ্র!...পুলকে সারাদেহ শিহরিয়া উঠে। মাকে এখনও সব কথা বলা হয় নাই। মায়ের মনের বেদনার রঙে যেন মাঠ, ঘাট, অস্তদিগন্তের মেঘমালা রাঙানো। গভীর ছায়াভরা সন্ধ্যায় মায়ের দুঃখভরা মনটার মতো ঘুলি-ঘুলি অন্ধকার।

দালানের পাশের ঘরে মিটি মিটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। সর্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় ছেলেকে ওবেলার কুলুইচণ্ডী-ব্রতের চিঁড়ে-মুড়কির ফলার খাইতে দিল। নিকটে বসিয়া চাঁপাকলার খোসা ছাড়াইয়া দিতে দিতে বলিল, ওরা কত দুঃখু করলে আজ। সরকারবাড়ি থেকে বলে গেল তুই পুজো করবি—তারা খুঁজতে এলে আমি বললাম, সে স্কুলে চলে গিয়েছে। তখন তারা আবার ভৈরব চক্কত্তিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ওই অত বেলায়—তুই যদি যেতিস্—

—আজ না গিয়ে ভালো করিচি মা। আজ হেডমাস্টার বলেচে আমি এগ্‌জামিনে স্কলারশিপ পেইচি। বড়ো স্কুলে পড়লে মাসে পাঁচ টাকা করে পাবো। স্কুলে যেতেই হেডমাস্টার ডেকে বললে—

সর্বজয়ার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কোথায় পড়তে হবে?

—মহকুমার বড়ো স্কুলে।

—তা তুই কি বললি?

—আমি কিছু বলি নি। পাঁচটা করে টাকা মাসে মাসে দেবে, যদি না পড়ি তবে তো আর দেবে না। ওতে মাইনে ফ্রি করে নেবে আর ওই পাঁচ টাকাতে বোর্ডিং-এ থাকবার খরচও কুলিয়ে যাবে।

সর্বজয়া আর কোন কথা বলিল না। কি কথা সে বলিবে? যুক্তি এতই অকাট্য যে, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। ছেলে স্কলারশিপ পাইয়াছে, শহরে পড়িতে যাইবে, ইহাতে মা-বাপের ছেলেকে বাধা দিয়া বাড়ি বসাইয়া রাখিবার পদ্ধতি কোথায় চলিত আছে? এ যেন তাহার বিরুদ্ধে কোন দণ্ডী তার নির্মম অকাট্য দণ্ড উঠাইয়াছে তাহার দুর্বল হাতের সাধ্য নাই যে ঠেকাইয়া রাখে। ছেলেও ওইদিকে ঝুঁকিয়াছে! আজকার দিনটিই যেন কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল সে। ভবিষ্যতের সহস্র সুখস্বপ্ন কুয়াশার মতো অনন্তে বিলীন হইয়া যাইতেছে কেন আজকের দিনটিতে বিশেষ করিয়া?

মাসখানেক পরে বৃত্তি পাওয়ার খবর কাগজে পাওয়া গেল।

যাইবার পূর্বদিন বৈকালে সর্বজয়া ব্যস্তভাবে ছেলের জিনিসপত্র গুছাইয়া দিতে লাগিল। ছেলে কখনও একা বিদেশে বাহির হয় নাই, নিতান্ত আনাড়ী, ছেলে-মানুষ ছেলে। কত জিনিসের দরকার হইবে, কে থাকিবে তখন সেখানে যে মুখে মুখে সব অভাব জোগাইয়া ফিরিবে, সব জিনিস হাতে লইয়া বসিয়া থাকিবে? খুঁটিনাটি—একখানা কাঁথা পাতিবার, একখানি গায়ের—একটি জল খাইবার

গ্লাস, ঘরের তৈরি এক শিশি সরের ঘি, এক পুঁটুলি নারিকেল নাড়ু; অপু ফুলকাটা একটা মাঝারি জামবাটিতে দুধ খাইতে ভালোবাসে—সেই বাটিটা, ছোট একটা বোতলে মাখিবার চৈ-মিশানো নারিকেল তৈল, আরও কত কি। অপুর মাথার বালিশের পুরানো ওয়াড় বদলাইয়া নূতন ওয়াড় পরাইয়া দিল। দধি-যাত্রার আবশ্যকীয় দই একটা ছোট পাথরবাটিতে পাতিয়া রাখিল। ছেলেকে কি করিয়া বিদেশে চলিতে হইবে সে বিষয়ে সহস্র উপদেশ দিয়াও তাহার মনে তৃপ্তি হইতেছিল না। ভাবিয়া দেখিয়া যেটি বাদ দিয়াছে মনে হয় সেটি তখনই আবার ডাকিয়া বলিয়া দিতেছিল।

—যদি কেউ মারে-টারে, কত দুষ্টু ছেলে তো আচে, অমনি মাস্টারকে বলে দিবি—বুঝলি? রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়িস নে যেন ভাত খাবার আগে! এ তো বাড়ি নয় যে কেউ তোকে ওঠাবে—খেয়ে তবে ঘুমুবি—নয়তো তাদের বলবি, যা হয়েচে তাই দিয়ে ভাত দাও—বুঝলি তো?

সন্ধ্যার পর সে কুণ্ডুদের বাড়ি মনসার ভাসান শুনিতে গেল। অধিকারী নিজে বেহুলা সাজিয়া পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া নাচে—বেশ গানের গলা। খানিকটা শুনিয়া তাহার ভালো লাগিল না। শুধু ছড়া কাটা ও নাচ সে পছন্দ করে না,—যুদ্ধ নাই, তলোয়ার খেলা নাই, যেন পান্‌সে-পান্‌সে।

তবুও আজিকার রাতটি বড়ো ভালো লাগিল তাহার। এই মনসা ভাসানোর আসর, এই নূতন জায়গা, এই অচেনা গ্রাম্য বালকের দল, ফিরিবার পথে তাহাদের পাড়ার বাঁকে প্রস্ফুটিত হেনা ফুলেব গন্ধ-ভরা নৈশ বাতাস জোনাকি-জ্বলা অন্ধকারে কেমন মায়াময় মনে হয়।...

রাত্রে সে আরও দু-একটা জিনিস সঙ্গে লইল। বাবার হাতের লেখা একখানা গানের খাতা, বাবার উদ্ভট শ্লোকের খাতাখানা বড়ো পেঁটরাটা হইতে বাহির করিয়া রাখিল—বড়ো বড়ো গোটা গোটা ছাঁদের হাতের লেখাটা বাবার কথা মনে আনিয়া দেয়। গানগুলির সঙ্গে বাবার গলার সুর এমনভাবে জড়াইয়া আছে যে, সেগুলি পড়িয়া গেলেই বাবাব সুর কানে বাজে। নিশ্চিন্দিপুরের কত ক্রীড়াক্লান্ত শান্ত সন্ধ্যা, মেঘমেদুর বর্ষামধ্যাহ্ন, কত জ্যোৎস্না-ভরা রহস্যময়ী রাত্রি বিদেশ-বিভুঁই-এব সেই দুঃখ-মাখানো দিনগুলির সঙ্গে এই গানের সুর যেন জড়াইয়া আছে—সেই দশাশ্বমেধ ঘাটের রানা, কাশীর পরিচিত সেই বাঙাল কথকঠাকুর।

সর্বজয়ার মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে, হয়তো ছেলে শেষ পর্যন্ত বিদেশে যাইবার মত করিবে না। কিন্তু তাহার অপু যে পিছনেব দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না। সে যে এত খাটিয়া, একে-ওকে বলিয়া কহিয়া তাহার সাধ্যমতো যতটা কুলায়, ছেলেব ভবিষ্যৎ জীবনের অবলম্বন একটা খাড়া করিয়া দিয়াছিল—ছেলে তাহার পায়ে দলিয়া যাইতেছে—কি জানি কিসের টানে! কোথায়? তাহার স্নেহদুর্বল দৃষ্টি তাহাকে দেখিতে দিতেছিল না যে, ছেলের ডাক আসিয়াছে বাহিরের জগৎ হইতে। সে জগৎটা তাহার দাবি আদায় করিতে তো ছাড়িবে না—সাধ্য কি সর্বজয়ার যে চিরকাল ছেলেকে আঁচলে লুকাইয়া রাখে?

যাত্রার পূর্বে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের দধির ফোঁটা অপুর কপালে পরাইয়া দিতে দিতে বলিল—বাড়ি আবার শিগগির শিগগির আসবি কিন্তু, তোদের ইতুপুজোর ছুটি দেবে তো?

—হ্যাঁ, ইস্কুলে বুঝি ইতুপুজোয় ছুটি হয়? তাতে আবার বড়ো ইস্কুল। সেই আবার আসবো গরমের ছুটিতে।

ছেলের অকল্যাণের আশঙ্কায় উচ্ছ্বসিত চোখের জল বহু কষ্টে সর্বজয়া চাপিয়া রাখিল।

অপু মায়ের পায়ের ধুলা লইয়া ভারী বোঁচকাটা পিঠে ঝুলাইয়া লইয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

মাঘ মাসের সকাল। কাল একটু একটু মেঘ ছিল, আজ মেঘ-ভাঙা রাঙা রোদ কুণ্ডুবাড়ির দো-ফলা আম গাছের মাথায় ঝলমল করিতেছে—বাড়ির সামনে বাঁশবনের তলায় চকচকে সবুজ পাতার আড়ালে বুনোআদার রঙিন ফুল যেন দূর ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্নের মতো সকালের বুকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সবে ভোর হইয়াছে। দেওয়ানপুর গবর্নমেন্ট মডেল ইনস্টিটিউশনের ছেলেদের বোর্ডিং-ঘরের সব দরজা এখনও খুলে নাই। কেবল স্কুলের মাঠে দুইজন শিক্ষক পায়চারি করিতেছেন। সম্মুখের রাস্তা দিয়া এত ভোরেই গ্রাম হইতে গোয়ালারা বাজারে দুধ বেচিতে আনিতেছিল, একজন শিক্ষক আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—দাঁড়াও, ও ঘোষের পো, কাল দুধ দিয়ে গেলে তো নিছক জল, আজ দেখি কেমন দুধটা!

অপর শিক্ষকটি পিছু পিছু আসিয়া বলিলেন, নেবেন না সত্যেনবাবু, একটু বেলা না গেলে ভালো দুধ পাওয়া যায় না। আপনি নতুন লোক, এসব জায়গার গতিক জানেন না, যার-তার কাছে দুধ নেবেন না—আমার জানা গোয়ালা আছে, কিনে দেবো বেলা হলে।

বোর্ডিং-বাড়ির কোণের ঘরে দরজা খুলিয়া একটি ছেলে বাহির হইয়া আসিল ও দূরের করোনেশন ক্লক-টাওয়ারের ঘড়িতে কয়টা বাজিয়াছে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। সত্যেনবাবুর সঙ্গী শিক্ষকটির নাম রামপদবাবু, তিনি ডাকিয়া বলিলেন—ওহে সমীর, ওই যে ছেলেটি এবার ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছে, সে কাল রাত্রে এসেছে না?

ছেলেটি বলিল, এসেছে স্যার, ঘুমুচ্ছে এখনও। ডেকে দেবো?—পরে সে জানালার কাছে গিয়া ডাকিল, অপূর্ব, ও অপূর্ব!

ছিপছিপে পাতলা চেহারা, চোদ্দ-পনেরো বৎসরের একটি খুব সুন্দর ছেলে চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসিল। রামপদবাবু বলিলেন, তোমার নাম অপূর্ব! ও!—এবার আড়বোয়ালের স্কুল থেকে স্কলারশিপ পেয়েছ?—বাড়ি কোথায়? ও! বেশ বেশ, আচ্ছা, স্কুলে দেখা হবে।

সমীর জিজ্ঞাসা করিল, স্যার, অপূর্ব কোন্ ঘরে থাকবে এখনও সেকেন্ মাস্টার মশায় ঠিক করে দেন নি। আপনি একটু বলবেন?

রামপদবাবু বলিলেন, কেন, তোর ঘরে তো সীট খালি রয়েছে—ওখানেই থাকবে।

সমীর বোধ হয় ইহাই চাহিতেছিল, বলিল—আপনি একটু বলবেন তাহলে সেকেন্—

রামপদবাবু চলিয়া গেলে অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে? পরে পরিচয় শুনিয়া সে একটু অপ্রতিভ হইল। হয়তো বোর্ডিং-এর নিয়ম নাই এত বেলা পর্যন্ত ঘুমানো, সে না জানিয়া শুনিয়া প্রথম দিনটাতেই হয়তো একটা অপরাধের কাজ করিয়া বসিয়াছে।...

একটু বেলা হইলে সে স্কুল-বাড়ি দেখিতে গেল। কাল অনেক রাত্রে আসিয়া পৌছিয়াছিল, ভালো করিয়া দেখিবার সুযোগ পায় নাই। রাত্রের অন্ধকারে আবছায়া-দেখিতে-পাওয়া সাদা রং-এর প্রকাণ্ড স্কুল বাড়িটা তাহার মনে একটা আনন্দ ও রহস্যের সঞ্চার করিয়াছিল।

এই স্কুলে সে পড়িতে পাইবে!...কতদিন শহরে থাকিতে তাহাদের ছোট স্কুলটা হইতে বাহির হইয়া বাড়ি ফিরিবার পথে দেখিতে পাইত—হাই স্কুলের প্রকাণ্ড কম্পাউন্ডে ছেলেরা সকলেই এক ধরনের পোশাক পরিয়া ফুটবল খেলিতেছে। তখন কতদিন মনে হইয়াছে এত বড়ো স্কুলে পড়িতে যাওয়া কি তাহার ঘটিবে কোন কালে—এসব বড়োলোকের ছেলেদের জন্য। এতদিনে তাহার আশা পূর্ণ হইতে চলিল।

বেলা দশটার কিছু আগে বোর্ডিং-সুপারিন্টেন্ডেন্ট বিধুবাবু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে কোন্ ঘরে আছে, নাম কি, বাড়ি কোথায়, নানা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বলিলেন, সমীর ছোকরা ভালো,

একসঙ্গে থাকলে বেশ পড়াশুনো হবে। এখানকার পুকুরের জলে নাইবে না কখনও—জল ভালো নয়, স্কুলের ইন্দারার জলে ছাড়া—আচ্ছা যাও, এদিকে আবার ঘণ্টা বাজবার সময় হল।

সাড়ে দশটায় ক্লাস বসিল। প্রথম বই খাতা হাতে ক্লাস-রুমে ঢুকিবার সময় তাহার বুক আগ্রহের ঔৎসুক্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল। বেশ বড়ো ঘর, নিচু চৌকির উপর মাস্টারের চেয়ার পাতা—খুব বড়ো ব্ল্যাকবোর্ড। সব ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিখুঁতভাবে সাজানো। চেয়ার, বেঞ্চি, টেবিল, ডেস্ক সব ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, কোথাও একটু ময়লা বা দাগ নাই।

মাস্টার ক্লাসে ঢুকিলে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। এ নিয়ম পূর্বে সে যেসব স্কুলে পড়িত সেখানে দেখে নাই। কেহ স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিলে উঠিয়া দাঁড়াইবার কথা মাস্টার শিখাইয়া দিতেন। সত্য সত্যই এতদিন পরে সে বড়ো স্কুলে পড়িতেছে বটে।...

জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল পাশের ক্লাসরুমে একজন কোট-প্যান্টপরা মাস্টার বোর্ডে কি লিখিতে দিয়া ক্লাসের এদিক-ওদিক পায়চারি করিতেছেন—চোখে চশমা, আধপাকা দাড়ি বুকেব উপর পড়িয়াছে, গম্ভীর চেহারা। সে পাশের ছেলেকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল,—উনি কোন্ মাস্টার ভাই?

ছেলেটি বলিল—উনি মিঃ দত্ত, হেডমাস্টার—ক্রিশ্চান, খুব ভালো ইংরিজি জানেন।

অপূর্ব শুনিয়া নিরাশ হইল যে, তাহাদের ক্লাসে মিঃ দত্তের কোন ঘণ্টা নাই। থার্ড ক্লাসের নিচে কোন ক্লাসে তিনি নাকি নামেন না।

পাশেই স্কুলের লাইব্রেরি, ন্যাপ্থ্যালিনের গন্ধ-ভরা পুবোনো বই-এর গন্ধ আসিতেছিল। ভাবিল এ ধরনের ভরপুর লাইব্রেরির গন্ধ কি কখনও ছোটখাটো স্কুলে পাওয়া যায়?

ঢং ঢং করিয়া ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ে—আড়বোয়ালের স্কুলের মতো একখণ্ড রেলেব পাটির লোহা বাজায় না, সত্যিকারের পেটা ঘড়ি।—কি গম্ভীর আওয়াজটা!...

টিফিনের পরের ঘণ্টায় সত্যেনবাবুর ক্লাস। চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের যুবক, বেশ বলিষ্ঠ গড়ন, ইঁহার মুখ দেখিয়া অপুর মনে হইল ইনি ভারি বিদ্বান, বুদ্ধিমানও বটে। প্রথম দিনেই ইঁহাব উপব কেমন এক ধরনের শ্রদ্ধা তাহার গড়িয়া উঠিল! সে শ্রদ্ধা আরও গভীর হইল ইঁহার মুখের ইংবিজি উচ্চারণে।

ছুটির পর স্কুলের মাঠে বোর্ডিং-এব ছেলেদের নানা ধরনের খেলা শুরু হইল। তাহাদেব ক্লাসের ননী ও সমীর তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া অন্য সকল ছেলেদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। সে ক্রিকেট খেলা জানে না, ননী তাহার হাতে নিজের ব্যাটখানা দিয়া তাহাকে বল মারিতে বলিল ও নিজে উইকেট হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া খেলার আইনকানুন বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

খেলার অবসানে যে-যাহাব স্থানে চলিয়া গেল। খেলার মাঠে পশ্চিম কোণে একটা বড়ো বাদাম গাছ, অপু গিয়া তাহার তলায় বসিল। একটু দূরে গবর্নমেন্টের দাতব্য ঔষধালয়। বৈকালেও সেখানে একদল বোগীর ভিড় হইয়াছে, তাহাদের নানা কলরবের মধ্যে একটি ছোট মেয়ের কান্নার সুর শোনা যাইতেছে। অপূর্ব কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেল। চৌদ্দ-পনেরো বৎসর বয়সের মধ্যে এই আজ প্রথম দিন, যেদিনটি সে মায়ের নিকট হইতে বহু দূরে আত্মীয়-বন্ধুহীন প্রবাসে একা কাটাইতেছে। সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে আজ তাহার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন।

কত কথা মনে ওঠে, এই সুদীর্ঘ পনেরো বৎসরের জীবনে কি অপূর্ব বৈচিত্র্য, কি ঐশ্বর্য।

সমীর টেবিলে আলো জ্বালিয়াছে। অপুর কিছু ভালো লাগিতেছিল না—বিছানায় গিয়া শুইয়া রহিল। খানিকটা পরে সমীর পিছনে চাহিয়া তাহাকে সে অবস্থায় দেখিয়া বলিল, পড়বে না?

অপু বলিল, একটু পরে—এই উঠচি।

—আলোটা জ্বালিয়ে রাখো, সুপারিন্টেন্ডেন্ট এখুনি দেখতে আসবে, শুয়ে আছ দেখলে বকবে।

অপু উঠিয়া আলো জ্বালিল। বলিল, রোজ আসেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট? সেকেন্ড মাস্টার তো—না?

সমীরের কথা ঠিক। অপু আলো জ্বালিবার একটু পরেই বিধুবাবু ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রকম লাগলো আজ ক্লাসে? পড়াশুনো সব দেখে নিয়েচ তো? সমীর, ওকে একটু দেখিয়ে দিস তো কোথায় কিসের পড়া। ক্লাসের রুটিনটা ওকে লিখে দে বরং—সব বই কেনা হয়েচে তো তোমার?...জিওমেট্রি নেই? আচ্ছা, আমার কাছে পাওয়া যাবে, এক টাকা সাড়ে পাঁচ আনা, কাল সকালে আমার ঘর থেকে গিয়ে নিয়ে এসো একখানা।

বিধুবাবু চলিয়া গেলে সমীর পড়িতে বসিল; কিন্তু পিছনে চাহিয়া পুনরায় অপূর্বকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া সে কাছে আসিয়া বলিল, বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে—না?

তাহার পর সে খাটের ধারে বসিয়া তাহাকে বাড়ির সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বলিল, তোমার মা একা থাকেন বাড়িতে? আর কেউ না? তাঁর তো থাকতে কষ্ট হয়।

অপূর্ব বলিল, ও কিসের ঘণ্টা ভাই?

—বোর্ডিং-এর খাওয়ার ঘণ্টা—চলো যাই।

খাওয়া-দাওয়ার পর দুই-তিনজন ছেলে তাহাদের ঘরে আসিল। এই সময়টা আর সুপারিন্টেন্ডেন্টের ভয় নাই, তিনি নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। শীতের রাত্রে আর বড়ো একটা বাহির হন না। ছেলেরা এই সময়ে এঘর-ওঘর বেড়াইয়া গল্পগুজবের অবকাশ পায়। সমীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, এসো নৃপেন, এই আমার খাটে বসো—শিশির যাও ওখানে—অপূর্ব জানো তাস খেলা?

নৃপেন বলিল, হেডমাস্টার আসবে না তো?

শিশির বলিল, হ্যাঁ, এত রাত্তিরে আবার হেডমাস্টার—

অপূর্বও তাস খেলিতে বসিল বটে কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিল, মায়ের ও দিদির সঙ্গে কত কাল আগে খেলার সে বিদ্যা লইয়া এখানে তাসখেলা খাটিবে না। তাসখেলায় ইহারা সব ঘুণ, কোন্ হাতে কি তাস আছে সব ইহাদের নখদর্পণে। তাহা ছাড়া এতগুলি অপরিচিত ছেলের সম্মুখে তাহাকে তাহার পুরাতন মুখচোরা রোগে পাইয়া বসিল; অনেক লোকের সামনে সে মোটেই স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলিতে পারে না। মনে হয়, কথা বলিলেই হয়তো ইহারা হাসিয়া উঠিবে। সে সমীরকে বলিল, তোমরা খেলো, আমি দেখি। শিশির ছাড়ে না। বলিল, তিনদিনে শিখিয়ে দোব, ধরো দিকি তাস।

বাহিরে যেন কিসের শব্দ হইল। শিশির সঙ্গে সঙ্গে চুপ করিয়া গেল এবং হাতের তাস লুকাইয়া পরের পাঁচ মিনিট এমন অবস্থায় রহিল যে সেখানে একটা কাঠের পুতুল থাকিলে সেটাও তাহার অপেক্ষা বেশি নড়িত। সকলেরই সেই অবস্থা। সমীর টেবিলের আলোটা একটু কমাইয়া দিল। আর কোন শব্দ পাওয়া গেল না। নৃপেন একবার দরজার ফাঁক দিয়া বাহিরের বারান্দাতে উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসিয়া নিজের তাস সমীরের তোশকের তলা হইতে বাহির করিয়া বলিল, ও কিছু না, এসো এসো—তোমার হাতের খেলা শিশির।

রাত এগারোটার সময় পা টিপিয়া টিপিয়া যে যাহার ঘরে চলিয়া গেলে অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের রোজ এমনি হয় নাকি? কেউ টের পায় না? আচ্ছা, চুপ করে বসেছিল, ও ছেলেটা কে?

ছেলেটাকে তাহার ভালো লাগিয়াছে। ঘরে ঢুকিবার পর হইতে সে বেশি কথা বলে নাই, তাহার কাঠের কোণটিতে নীরবে বসিয়া ছিল। বয়স তেরো-চৌদ্দ হইবে, বেশ চেহারা। ইহাদের দলে থাকিয়াও সে এতদিনে তাসখেলা শেখে নাই, ইহাদের কথাবার্তা হইতে অপূর্ব বুঝিয়াছিল।

পরদিন শনিবার। বোর্ডিং-এর বেশির ভাগ ছেলেই সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে ছুটি লইয়া বাড়ি চলিয়া গেল। অপূর্ব মোটে দুই দিন হইল আসিয়াছে; তাহা ছাড়া, যাতায়াতে খরচপত্রও আছে, কাজেই তাহার যাওয়ার কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু তবু তাহার মনে হইল, এই শনিবারে একবার

মাকে দেখিয়া আসিলে মন্দ হইত না—সারা শনিবারের বৈকালটা কেমন খালি-খালি ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকিতেছিল।

সন্ধ্যার সময় সে ঘরে আসিয়া আলো জ্বালিল। ঘরে সে একা, সমীর বাড়ি চলিয়া গিয়াছে, এ রকম চুনকাম-করা ঘরে একা থাকিবার সৌভাগ্য কখনও তাহার হয় নাই, সে খুশি হইয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া নিজের খাটে বসিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিল, এইবার সমীরের মতো একটা টেবিল আমার হয়? একটা টেবিলের দাম কত, সমীরকে জিজ্ঞাসা করব।

পরে সে আলোটা লইয়া গিয়া সমীরের টেবিলে পড়িতে বসিল। রুটিনে লেখা আছে—সোমবারে পাটিগণিতের দিন। অঙ্ককে সে বাঘ বিবেচনা করে। বইখানা খুলিয়া সভয়ে প্রশ্নাবলীর অঙ্ক কয়েকটি দেখিতেছে, এমন সময় দরজা দিয়া ঘরে কে ঢুকিল। কাল রাত্রের সেই শান্ত ছেলেটি। অপূর্ব বলিল—এসো, এসো, বোসো।

ছেলেটি বলিল, আপনি বাড়ি যান নি?

অপু বলিল, না, আমি তো মোটে পরশু এলাম, বাড়িও দূরে। গিয়ে আবার সোমবারে আসা যাবে না।

ছেলেটি অপুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অপু বলিল—বোর্ডিং-এ যে আজ একেবারেই ছেলে নেই, সব শনিবারেই কি এমনই হয়? তুমি বাড়ি যাও নি কেন? তোমার নামটা কি জানি নে ভাই।

—দেবব্রত বসু—আপনার মনে থাকে না। বাড়ি গেলাম না ইচ্ছে করে? সেকেন্ মাস্টার ছুটি দিলে না। ছুটি চাইতে গেলাম, বললে, আর শনিবারে গেলে আবার এ শনিবারে কি? হবে না, যাও।

তাহার পর সে বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করিল। তাহার বাড়ি শহর হইতে মাইল বারো দূরে, ট্রেনে যাইতে হয়। সে শনিবারে বাড়ি না গিয়া থাকিতে পারে না, মন হাঁপাইয়া উঠে, অথচ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছুটি দিতে চায় না। তাহার কথাবার্তার ধরনে অপু বুঝিতে পারিল যে, বাড়ি না যাইতে পারিয়া মন আজ খুবই খারাপ, অনবরত বাড়ির কথা ছাড়া অন্য কথা সে বড়ো একটা বলিল না।

দেবব্রত খানিকটা বসিয়া থাকিয়া অপুর বালিশটা টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। অনেকটা আপন মনে বলিল, সামনের শনিবারে ছুটি দিতেই হবে, সেকেন্ মাস্টার না দেয় হেডমাস্টারেব কাছে গিয়ে বলবো।

অপু এ ধরনের দূর প্রবাসে একা রাত্রিবাস করিতে আদৌ অভ্যস্ত নয়, চিরকাল মা-বাপের কাছে কাটাইয়াছে, আজকার রাত্রিটা তাহার সম্পূর্ণ উদাস ও নিঃসঙ্গ ঠেকিতেছিল।

দেবব্রত হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া বসিল, আপনি দেখেন নি বুঝি? জানেন না? আসুন না আপনাকে দেখাই, আসুন উঠে!

পরে সে অপুর হাত ধরিয়া পিছনের দেওয়ালের বড়ো জানালাটার কাছে লইয়া গিয়া দেখাইল, সেটার পাশাপাশি দুটি গরাদে তুলিয়া ফেলিয়া আবার বসানো চলে। একটা লোক অনায়াসে সেই ফাঁকটুকু দিয়া ঘরে যাতায়াত করিতে পারে। বলিল, শুধু সমীরদা আর গণেশ জানে, কাউকে যেন বলবেন না।

একটু পরে বোর্ডিং-এর খাওয়ার ঘণ্টা পড়িল।

খাওয়ার আগে অপু বলিল, আচ্ছা ভাই, এ কথাটার মানে জানো?

একখণ্ড ছাপা কাগজ সে দেবব্রতকে দেখিতে দিল। বড়ো বড়ো অক্ষরে কাগজখানাতে লেখা আছে—Literature. এত বড়ো কথা সে এ পর্যন্ত কমই পাইয়াছে, অর্থটা জানিবার খুব কৌতূহল। দেবব্রত জানে না, বলিল, চলুন, খাওয়ার সময় মণিদাকে জিজ্ঞেস করবো।

মণিমোহন সেকেন্ড ক্লাসের ছাত্র, দেবব্রত কাগজখানা দেখাইলে সে বলিল, এর মানে সাহিত্য। এ ম্যাক্‌মিলান কোম্পানির বইয়ের বিজ্ঞাপন, কোথায় পেলে?

অপু হাত তুলিয়া দেখাইয়া বলিল, ওই লাইব্রেরির কোণটায় কুড়িয়ে পেয়েছি, লাইব্রেরির ভেতর থেকে কেমন করে উড়ে এসেছে বোধ হয়। কাগজখানার আঘ্রাণ লইয়া হাসিমুখে বলিল, কেমন ন্যাপথলিনের গন্ধটা।

কাগজখানা সে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিল।

হেডমাস্টারকে অপু অত্যন্ত ভয় করে। প্রৌঢ় বয়স, বেশ লম্বা, মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ—অনেকটা যাত্রার দলের মুনির মতো। ভারি নাকি কড়া মেজাজের লোক, শিক্ষকেরা পর্যন্ত তাঁহাকে ভয় করিয়া চলেন। অপু এতদিন তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া আসিতেছিল। একদিন একটা বড়ো মজা হইল। সত্যেনবাবু ক্লাসে আসিয়া বাংলা হইতে ইংরেজি করিতে দিয়াছেন, এমন সময় হেডমাস্টার ক্লাসে ঢুকিতেই সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। হেডমাস্টার বইখানা সত্যেনবাবুর হাত হইতে লইয়া একবার চোখ বুলাইয়া দেখিয়া লইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন—আচ্ছা, এই যে এতে ভিক্টর হিউগো কথাটা লেখা আছে, ভিক্টর হিউগো কে ছিলেন জানো?—ক্লাস নীরব। এ নাম কেহ জানে না। পাড়াগাঁয়ের স্কুলের ফোর্থ ক্লাসের ছেলে, কেহ নামও শোনে নাই।—

কে বলিতে পারো—তুমি—তুমি?

ক্লাসে সূচ পড়িলে তাহার শব্দ শোনা যায়।

অপুর অস্পষ্ট মনে হইল নামটা—যেন তাহার নিতান্ত অপরিচিত নয়, কোথাও যেন সে পাইয়াছে ইহার আগে। কিন্তু তাহার পালা আসিল ও চলিয়া গেল, তাহার মনে পড়িল না। ওদিকের বেঞ্চিটা ঘুরিয়া যখন প্রশ্নটা তাহাদের সম্মুখের বেঞ্চের ছেলেদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন তাহার হঠাৎ মনে পড়িল, নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে সেই পুরাতন 'বঙ্গবাসী'গুলার মধ্যে কোথায় সে এ-কথাটা পড়িয়াছে—বোধ হয়, সেই 'বিলাত যাত্রীর চিঠি'র মধ্যে হইবে। তাহার মনে পড়িয়াছে! পরক্ষণেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ফরাসী দেশের লেখক, খুব বড়ো লেখক। প্যারিসে তাঁর পাথরের মূর্তি আছে, পথের ধারে।

হেডমাস্টার বোধ হয় এ ক্লাসের ছেলের নিকট এ ভাবের উত্তর আশা করেন নাই, তাহার দিকে চশমা-আঁটা জ্বলজ্বলে চোখে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেই অপু অভিভূত ও সংকুচিত অবস্থায় চোখ নামাইয়া লইল। হেডমাস্টার বলিলেন, আচ্ছা, বেশ। পথের ধারে নয়, বাগানের মধ্যে মূর্তিটা আছে—বসো, বসো সব।

সত্যেনবাবু তাহার উপর খুব সন্তুষ্ট হইলেন। ছুটির পর তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। ছোটখাটো বাড়ি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একাই থাকেন। স্টোভ জ্বালিয়া চা ও খাবার করিয়া তাহাকে দিলেন, নিজেও খাইলেন। বলিলেন, আর একটু ভালো করে গ্রামারটা পড়বে—আমি তোমাকে দাগ দিয়ে দেখিয়ে দেবো!

অপুর লজ্জাটা অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল, সে আলমারিটার দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওতে আপনার অনেক বই আছে?

সত্যেনবাবু আলমারি খুলিয়া দেখাইলেন। বেশির ভাগই আইনের বই, শীঘ্রই আইন পরীক্ষা দিবেন। একখানা বই তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—এখানা তুমি পড়ো—বাংলা বই, ইতিহাসের গল্প।

অপুর আরও দু-একখানা বই নামাইয়া দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিল না।

মাস দুই-তিনের মধ্যে বোর্ডিং-এর সকলের সঙ্গে তাহার খুব জানাশোনা হইয়া গেল।

হয়তো তাহা ঘটিত না, কারণ তাহার মতো লাজুক ও মুখচোরা প্রকৃতির ছেলের পক্ষে সকলের সহিত মিশিয়া আলাপ করিয়া লওয়াটা একরূপ সম্ভবের বাহিরের ব্যাপার, কিন্তু প্রায় সকলেই তাহার সহিত যাচিয়া আসিয়া আলাপ করিল। তাহাকে কে খুশি করিতে পারে—ইহা লইয়া দিনকতক যেন বোর্ডিং-এর ছেলেদের মধ্যে একটা পাল্লা দেওয়া চলিল। খাবার-ঘরে খাইতে বসিবার

সময় সকলেরই ইচ্ছা—অপু তাহার কাছে বসে, এ তাড়াতাড়ি বড়ো পিঁড়িখানা পাতিয়া দিতেছে, ও ঘি খাইবার নিমন্ত্রণ করিতেছে। প্রথম প্রথম সে ইহাতে অস্বস্তিবোধ করিত, খাইতে বসিয়া তাহার ভালো করিয়া খাওয়া ঘটিত না, কোনরকমে খাওয়া সাবিয়া উঠিয়া আসিত। কিন্তু যেদিন ফার্স্ট ক্লাসের রমাপতি পর্যন্ত তাহাকে নিজের পাতের লেবু তুলিয়া দিয়া গেল, সেদিন সে মনে মনে খুশি তো হইলই, একটু গর্বও অনুভব করিল। রমাপতি বয়সে তাহার অপেক্ষা চার-পাঁচ বৎসরের বড়ো, ইংরেজি ভালো জানে বলিয়া হেডমাস্টারের প্রিয়পাত্র, মাস্টারেরা পর্যন্ত খাতির করিয়া চলেন, একটু গম্ভীর প্রকৃতির ছেলেও বটে। খাওয়া শেষ করিয়া আসিতে আসিতে সে ভাবিল, আমি কি ওই শ্যামলালের মতো? রমাপতিদা পর্যন্ত সেধে লেবু দিল! দেয় ওদের? কথাই বলে না।

দেবব্রত অন্ধকারের মধ্যে কাঁঠালতলাটায় তাহারই অপেক্ষা করিতেছিল। বলিল—আপনার ঘরে যাব অপূর্বদা, একটা টাস্ক একটু বলে দেবেন?

পরে সে হাসিমুখে বলিল, আজ বুধবার, আর চারদিন পরেই বাড়ি যাব। শনিবারটা ছেড়ে দিন, মধ্যে আর তিনটে দিন। আপনি বাড়ি যাবেন না, অপূর্বদা?

প্রথম কয়েকমাস কাটিয়া গেল। স্কুল-কম্পাউন্ডের সেই পাতাবাহার ও চীনা-জবার ঝোপটা অপুর বড়ো প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। সে রবিবারের শান্ত দুপুরে রৌদ্রে পিঠ দিয়া শুক্‌না পাতার রাশির মধ্যে বসিয়া বসিয়া বই পড়ে। ক্লাসের বই পড়িতে তাহার ভালো লাগে না, সে সব বই-এর গল্পগুলি সে মাসখানেকের মধ্যেই পড়িয়া শেষ করিয়াছে। কিন্তু মুশকিল এই যে, স্কুল লাইব্রেরিতে ইংরেজি বই বেশি; যে বইগুলার বাঁধাই চিত্তাকর্ষক, ছবি বেশি, সেগুলা সবই ইংরেজি। ইংরেজি সে ভালো বুঝিতে পারে না, কেবল ছবির তলাকার বর্ণনাটা বোঝে মাত্র।

একদিন হেডমাস্টারের অফিসে তাহার ডাক পড়িল। হেডমাস্টার ডাকিতেছেন শুনিয়া তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। ভয়ে ভয়ে অফিস ঘরের দুয়ারের কাছে গিয়া দেখিল, আর একজন সাহেবি পোশাক-পরা ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে বসিয়া আছেন। হেডমাস্টারের ইঙ্গিতে সে ঘরে ঢুকিয়া দুজনের সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

ভদ্রলোকটি ইংরেজিতে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন ও সামনের একখানা পাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি দেখিয়া লইয়া একখানা ইংরেজি বই তাহার হাতে দিয়া ইংরেজিতে বলিলেন, এই বইখানা তুমি পড়তে নিয়েছিলে?

অপু দেখিল, বইখানা The World of Ice, মাসখানেক আগে লাইব্রেরি হইতে পড়িবার জন্য সে লইয়াছিল। সবটা ভালো বুঝিতে পারে নাই।

সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, ইয়েস—

হেডমাস্টার গর্জন করিয়া বলিলেন, ইয়েস স্যর!

অপুর পা কাঁপিতেছিল, জিভ শুকাইয়া আসিতেছিল, থতমত খাইয়া বলিল, ইয়েস স্যর—

ভদ্রলোকটি পুনরায় ইংরেজিতে বলিলেন, স্লেজ কাহাকে বলে?

অপু ইহার আগে কখনও ইংরেজি বলিতে অভ্যাস করে নাই, ভাবিয়া ভাবিয়া ইংরেজিতে বানাইয়া বলিল, এক ধরনের গাড়ি কুকুরে টানে। বরফের উপর দিয়া যাওয়ার কথাটা মনে আসিলেও হঠাৎ সে ইংরেজি করিতে পরিল না।

—অন্য গাড়ির সঙ্গে স্লেজের পার্থক্য কি?

অপু প্রথমে বলিল, স্লেজ হ্যাজ—তারপরই তাহার মনে পড়িল—আর্টিকল-সংক্রান্ত কোন গোলযোগ এখানে উঠিতে পারে। 'এ' বা 'দি' কোন্‌টা বলিতে হইবে তাড়াতাড়ির মাথায় ভাবিবার সময় না পাইয়া সোজাসুজি বহুবচনে বলিল, স্লেজেস হ্যাভ নো হুইল্‌স্—

—অরোরা বোরিয়ালিস কাহাকে বলে?

অপুর চোখমুখ উজ্জ্বল দেখাইল। মাত্র দিন কতক আগে সত্যেনবাবুর কি একখানা ইংরেজি

বইতে সে ইহার ছবি দেখিয়াছিল। সে জায়গাটা পড়িয়া মানে না বুঝিলেও এ-কথাটা খুব গাল-ভরা বলিয়া সত্যেনবাবুর নিকট উচ্চারণ জানিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিল। তাড়াতাড়ি বলিল, অরোরা বোরিয়ালিস ইজ এ কাইন্ড অব অ্যাটমোসফেরিক ইলেকট্রিসিটি—

ফিরিয়া আসিবার সময় শুনিল, আগন্তুক ভদ্রলোকটি বলিতেছেন, আন্‌ইউজুয়াল ফর এ বয় অব্ ফোর্থ ক্লাস। কি নাম বললেন? এ স্ট্রাইকিংলি হ্যান্ডসাম বয়—বেশ বেশ!

অপু পরে জানিয়াছিল তিনি স্কুল-বিভাগের বড়ো ইন্সপেক্টর, না বলিয়া হঠাৎ স্কুল দেখিতে আসিয়াছিলেন।

পরে সে রমাপতির ঘরে আঁক বুঝিতে যায়। রমাপতি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, নিজের সীট বেশ সাজাইয়া রাখিয়াছে। টেবিলের উপর পাথরের দোয়াতদানি, নতুন নিব পরানো কলমগুলি সাফ করিয়া গুছাইয়া রাখিয়াছে, বিছানাটি ধবধবে, বালিশের ওপর তোয়ালে। অপুর সঙ্গে পড়াশুনার কথাবার্তা মিটিবার পর সে বলিল, এবার তোমায় সরস্বতী পুজোতে ছোট ছেলেদের লীডার হতে হবে, আর তো বেশি দেরিও নেই, এখন থেকেই চাঁদা আদায়ের কাজে বেরুনো চাই।

উঠিবার সময় ভাবিল, রমাপতিদার মতো এইরকম একটা দোয়াতদানি হয় আমার? চমৎকার ফুলকাটা? লিখে আরাম আছে। হ্যাঁ, চাঁদা চাইতে যাব বইকি! ওসব হবে না আমায় দিয়ে।—আসল কথা সে বেজায় মুখচোরা, কাহারও সহিত কথা বলিতে পারিবে না।

সে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, দেবব্রত সমীরের টেবিলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া আছে। অপু বলিল, কি দেবু, বাড়ি যাও নি আজ?

দেবব্রত মাথা না তুলিয়াই বলিল, দেখুন না কাণ্ড সেকেন্ মাস্টারের, ছুটি দিলে না—ও শনিবারে বাড়ি যাই নি, আপনি তো জানেন অপূর্বদা! বললে, তুমি ফি শনিবারে বাড়ি যাও, তোমার ছুটি হবে না—

দেবব্রতর জন্য অপুর মনে বড়ো কষ্ট হইল। বাড়ির জন্য তাহার মনটা সারা সপ্তাহ ধরিয়া কি রকম তৃষিত থাকে অপু সে সন্ধান রাখে। মনে ভাবিল, ওরই ওপর সুপারিন্টেন্ডেন্টের যত কড়াকড়ি। থাকতে পারে না, ছেলেমানুষ—আচ্ছা লোক!

অপু বলিল, রমাপতিদাকে দিয়ে আমি একবার বিধুবাবুকে বলাবো?

দেবব্রত ম্লান হাসিয়া বলিল, কাকে বলাবেন? তিনি আছেন বুঝি? মেয়ের জন্যে নিধে বেহারাকে দিয়ে বাজার থেকে কমলালেবু আনালেন, কপি আনালেন। তিনি বাড়ি চলে গিয়েছেন কোন্ কালে, সে দুটোর ট্রেনে—আর এখন বলেই বা কি হবে, আমাদের লাইনের গাড়িও তো চলে গিয়েছে—আজ আর গাড়ি নেই।

অপু তাহাকে ভুলাইবার জন্য বলিল, এসো একটা খেলা করা যাক। তুমি হও চোর, একখানা বই চুরি করে লুকিয়ে থাকো, আমি ডিটেকটিভ হবো, তোমাকে ঠিক খুঁজে বার করবো—কিংবা ওইটে যেন একটা নকশা, তুমি ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে পালাবে, আমি তোমাকে খুঁজে বার করব—পড়ো নি 'নিহিলিস্ট রহস্য'? চমৎকার বই—উঃ, কি সে কাণ্ড? প্রতুলের কাছে আছে, চেয়ে দেবো।

দেবব্রতের খেলাধুলা ভালো লাগিতেছিল না, তবুও অপুর কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া মাথা তুলিয়া বসিল। বলিল, আমি লাইব্রেরির ওই কোণটায় গিয়ে লুকিয়ে থাকব?

—লুকিয়ে থাকতে হবে না, এই কাগজখানা একটা দরকারি নকশা, তুমি পকেটের মধ্যে নিয়ে যেন রেলগাড়িতে যাচ্চো, আমি বার করে দেখে নেবো, তুমি পিস্তল বার করে গুলি করতে আসবে—

দেবব্রতকে লইয়া খেলা জমিল না, একে সে 'নিহিলিস্ট রহস্য' পড়ে নাই, তাহার উপর তাহার মন খারাপ। নূতন ধরনের যুদ্ধ-জাহাজের নকশাখানা সে বিনা বাধায় ও এত সহজে বিপক্ষের গুপ্তচরকে চুরি করিতে দিল যে, তাহাকে এসব কার্যে নিযুক্ত করিলে রুশীয় সম্রাটকে পতনের অপেক্ষায় ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিদ্রোহের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হইত না।

বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে। বোর্ডিং-এর পিছনে দেওয়ানি আদালতের কম্পাউন্ডে অর্থী-প্রত্যর্থীর ভিড় কমিয়া গিয়াছে। দেবব্রত জানালার দিকে চাহিয়া বলিল, ক্লক টাওয়ারের ঘড়িতে কটা বেজেছে দেখুন না একবার? কাউকে বলবেন না অপূর্বদা, আমি এখুনি বাড়ি যাব।

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল, এখন যাবে কিসে? এই যে বললে ট্রেন নেই?

দেবব্রত সুর নিচু করিয়া বলিল—এগার মাইল তো রাস্তা মোটে, হেঁটে যাব, একটু রাত যদি হয়ে পড়ে জ্যোৎস্না আছে, বেশ যাওয়া যাবে।

—এগারো মাইল রাস্তা এখন এই পড়ন্ত বেলায় হেঁটে যেতে কত রাত হবে জানো? রাস্তা কখনও হেঁটেচো তুমি? তা ছাড়া না বলে যাওয়া—যদি কেউ টের পায়?

কিন্তু দেবব্রতকে নিবৃত্ত করা গেল না। সে কখনও রাস্তা হাঁটে নাই তাহা ঠিক, রাত্রি হইবে তাহা ঠিক, বিধুবাবুর কানে কথাটা উঠিলে বিপদ আছে, সবই ঠিক কিন্তু বাড়ি সে যাইবেই—সে কিছুতেই থাকিতে পারিবে না—যাহা ঘটে ঘটিবে। অবশেষে অপু বলিল, তা হলে আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

দেবব্রত বলিল, তা হলে সবাই টের পেয়ে যাবে, আপনি তিন-চার মাস বোর্ডিং ছেড়ে কোথাও যান নি, খাবার-ঘরে না দেখতে পেলে সবাই জানতে পারবে।

দেবব্রত চলিয়া গেলে অপু কাহারও নিকট সে কথা বলিল না বটে, কিন্তু পরদিন সকালে খাওয়ার ঘরে দেখা গেল দেবব্রতের অনুপস্থিতি অনেকে লক্ষ করিয়াছে। রবিবার বৈকালে সমীর আসিলে তাহাকে সে কথাটা বলিল। পরদিন সোমবার দেবব্রত সকলের সম্মুখে কি করিয়া বোর্ডিং-এর কম্পাউন্ডে ঢুকিবে বা ধরা পড়িলে কৃতকার্যের কি কৈফিয়ত দিবে এই লইয়াই দুজনে অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করিল।

কিন্তু সকালে উঠিয়া দেবব্রতকে সমীরের বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতে দেখিয়া সে দস্তুরমতো অবাক হইয়া গেল। সমীর বাইরে মুখ ধুইতে গিয়াছিল, আসিলে জানা গেল যে, কাল অনেক রাত্রে দেবব্রত আসিয়া জানালায় শব্দ করিতে থাকে। পাছে কেউ টের পায় এজন্য পিছনের জানালাব খোলা-গরাদটা তুলিয়া সমীর তাহাকে ঘরে ঢুকাইয়া লইয়াছে।

অপু আগ্রহের সঙ্গে শুনিতে বসিল। কখন সে বাড়ি পৌছিল? রাত কত হইয়াছিল, তাহাব মা তখন কি করিতেছিলেন?—ইত্যাদি।

রাত অনেক হইয়াছিল। বাড়িতে রাতের খাওয়া প্রায় শেষ হয় হয়। তাহার মা ছোট ভাইকে প্রদীপ ধরিয়া রান্নাঘর হইতে বড়োঘরের রোয়াকে পৌছাইয়া দিতেছেন এমন সময়—

অপু কত দিন নিজে বাড়ি যায় নাই। মাকে কত দিন সে দেখে নাই। ইহার মতো হাঁটিয়া যাতায়াতের পথ হইলে এতদিনে কতবার যাইত। রেলগাড়ি, গহনার নৌকা, আবার খানিকটা হাঁটা-পথও। যাতায়াতে দেড় টাকা খরচ, তাহার এক মাসের জলখাবার। কোথায় পাইবে দেড় টাকা যে, প্রতি শনিবার তো দূরের কথা, মাসে অন্তত একবারও বাড়ি যাইবে! জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া আনা আষ্টেক পয়সা হইয়াছে, আর এক টাকা হইলেই—বাড়ি। হয়তো এক টাকা জমিতে জমিতে গরমের ছুটিই বা আসিয়া যাইবে, কে জানে?

পরদিন স্কুলে হৈ হৈ ব্যাপার। দেবব্রত যে লুকাইয়া কাহাকেও না বলিয়া বাড়ি চলিয়া গিয়াছিল এবং রবিবার রাত্রে লুকাইয়া বোর্ডিং-এ ঢুকিয়াছে, সে কথা কি করিয়া প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। বিধুবাবু সুপারিন্টেন্ডেন্ট—সে কথা হেডমাস্টারের কানে তুলিয়াছেন। ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝিয়া সমীরের প্রাণ ভয়ে উড়িয়া গেল, সে-ই যে জানালার ভাঙা গরাদ খুলিয়া দেবব্রতকে তাহাদের ঘরে ঢুকাইয়া লইয়াছে, সে কথা হেডমাস্টার জানিতে পারিলে কি আর রক্ষা থাকিবে? সমীর রমাপতির ঘরে গিয়া অবস্থাটা বুঝিয়া আসিল। দেবব্রত নিজেই সব স্বীকার করিয়াছে, সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় নাই, কিন্তু সমীরের জানালা খুলিয়া দেওয়ার কথা কিছুই বলে নাই। বলিয়াছে, সে

সোমবার খুব ভোরে চুপি চুপি লুকাইয়া বোর্ডিং-এ ঢুকিয়াছে, কেহ টের পায় নাই। স্কুল বসিলে ক্লাসে ক্লাসে হেডমাস্টারের সার্কুলার গেল যে, টিফিনের সময় স্কুলের হলে দেবব্রতকে বেত মারা হইবে, সকল ছাত্র ও টিচারদের সে সময় সেখানে উপস্থিত থাকা চাই।

সমীর গিয়া রমাপতিকে বলিল, আপনি একবার বলুন না রমাপতিদা হেডমাস্টারকে, ও ছেলেমানুষ, থাকতে পারে না বাড়ি না গিয়ে, আপনি তো জানেন ও কি রকম home-sick? মিথ্যে মিথ্যে ওকে তিন শনিবার ছুটি দিলে না সেকেন্ মাস্টার, ওর কি দোষ?

উপর-ক্লাসের ছাত্রদের ডেপুটেশনকে হেডমাস্টার হাঁকাইয়া দিলেন। টিফিনের সময় সকলে হলে একত্র হইলে দেবব্রতকে আনা হইল। ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে। হেডমাস্টার বজ্রগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন যে, এই প্রথম অপরাধ বলিয়া তিনি শুধু বেত মারিয়াই ছাড়িয়া দিতেছেন নতুবা স্কুল হইতে তাড়াইয়া দিতেন।—রীতিমতো বেত চলিল। কয়েক ঘা বেত খাইবার পরই দেবব্রত চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হেডমাস্টার গর্জন করিয়া বলিলেন, চুপ। Bend this way, bend ! মার দেখিয়া বিশেষ করিয়া দেবব্রতের কান্নায় অপুর চোখে জল আসিয়া গেল। মনে পড়িল, লীলাদের বাড়ি এই রকম মার একদিন সেও খাইয়াছিল বড়োবাবুর কাছে, সেও বিনা দোষে।

অপু উঠিয়া বারান্দায় গেল। ফিরিয়া আসিতে সমীর ধমক দিয়া চুপি চুপি বলিল, তুই ও-রকম কাঁদছিস কেন অপূর্ব? থাম্ না—হেডমাস্টার বকবে—

সরস্বতী পূজার সময় তাহার আট আনা চাঁদা ধরাতে অপু বড়ো বিপদে পড়িল। মাসের শেষ, হাতেও পয়সা তেমন নাই, অথচ সে মুখে কাহাকেও 'না' বলিতে পারে না, সরস্বতী পূজার চাঁদা দিয়া হাত একেবারে খালি হইয়া গেল। বৈকালে সমীর জিজ্ঞাসা করিল, খাবার খেতে গেলি নে অপূর্ব?

সে হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

সমীর তাহার সব খবর রাখে, বলিল, আমি বরাবর দেখে আসচি অপূর্ব, হাতের পয়সা ভারি বে-আন্দাজি খরচ করিস্ তুই—বুঝেসুঝে চললে এরকম হয় না—আট আনা চাঁদা কে দিতে বলেছে?

অপু হাসিমুখে বলিল, আচ্ছা, আচ্ছা, যা তোকে আর শেখাতে হবে না—ভারি আমার গুরুঠাকুর—

সমীর বলিল, না হাসি নয়, সত্যি কথা বলছি। আর এই ননী, ভুলো, রাসবেহারী—ওদের ও রকম বাজারে নিয়ে গিয়ে খাবার খাওয়াস্ কেন?

অপু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলি, যাঃ বকিস নে—ওরা ধরে খাওয়াবার জন্যে, তা করব কি?

সমীর রাগ করিয়া বলিল, খাওয়াতে বললেই অমনি খাওয়াতে হবে? ওরাও দুষ্টুর ধাড়ি, তোকে পেয়েছে ওই রকম তাই। অন্য কারুর কাছে তো কই ঘেঁষে না। আড়ালে তোকে বোকা বলে তা জানিস!

—হ্যাঁ বলে বইকি!

—আমার মিথ্যে কথা বলে লাভ? সেদিন মণিদার ঘরে তোর কথা হচ্ছিল। ওই বদমায়েশ রাসবেহারীটা বলছিল—ফাঁকি দিয়ে খেয়ে নেয়,—আর ও-সব কলার লজেঞ্চুস কিনে এনে বিলিয়ে বাহাদুরি করতে কে বলেছে তোকে?

সমীর নিতান্ত মিথ্যা বলে নাই। জীবনে এই প্রথম নিজের খরচপত্র অপুকে নিজে বুঝিয়া করিতে হইতেছে, ইহার পূর্বে কখনও পয়সাকড়ি নিজের হাতের মধ্যে পাইয়া নাড়াচাড়া করে নাই—কাজেই সে টাকা-পয়সার ওজন বুঝিতে পারে না, স্কলারশিপের টাকা হইতে বোর্ডিং-এর খরচ মিটাইয়া টাকা-দুই হাতখরচের জন্য বাঁচে—এই দেড় টাকা দু-টাকাকে সে টাকার হিসাবে না দেখিয়া পয়সার হিসাবে দেখিয়া থাকে। ইতিপূর্বে কখনও আটটা পয়সা একত্র হাতের মধ্যে পায় নাই—

একশো কুড়িটা পয়সা তাহার কাছে কুবেরের ধনভাণ্ডারের সমান অসীম মনে হয়। মাসের প্রথমে ঠিক রাখিতে না পারিয়া সে দরাজ হাতে খরচ করে—বাঁধানো খাতা কেনে, কালি কেনে, খাবার খায়। প্রায়ই দু-চারজন ছেলে আসিয়া ধরে তাহাদিগকে খাওয়াইতে হইবে। তাহার খুব প্রশংসা করে, পড়াশুনার তারিফ করে! অপু মনে মনে অত্যন্ত গর্ব অনুভব করে, ভাবে—সোজা ভালো ছেলে আমি! সবাই কি খাতির করে! তবুও তো মোটে পাঁচ মাস এসিচি!

মহা খুশির সহিত তাহাদিগকে বাজারে লইয়া গিয়া খাবার খাওয়ায়। ইহার উপর আবার কেহ কেহ ধার করিতে আসে, অপু কাহাকেও 'না' বলিতে পারে না।

এরূপ করিলে কুবেরের ভাণ্ডার আর কিছু বেশি দিন টিকিতে পারে বটে, কিন্তু একশত কুড়িটা পয়সা দশদিনের মধ্যেই নিঃশেষে উড়িয়া যায়, মাসের বাকি দিনগুলিতে কষ্ট ও টানাটানির সীমা থাকে না। দু-দশটা পয়সা যে যাহা ধার লয়, মুখচোরা অপু কাহারও কাছে তাগাদা করিতে পারে না,—প্রায়ই তাহা আর আদায় হয় না।

সমীর ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট হাতে বাহির হইয়া গেল। অপু ভাবিল—বলুক বোকা, আমি তো আর বোকা নই! পয়সা ধার নিয়েচে কেন দেবে না—সবাই দেবে।

পরে সে একখানা বই হাতে লইয়া তাহার প্রিয় গাছপালা-ঘেরা সেই কোণটিতে বসিতে যায়। মনে পড়ে এতক্ষণ সেখানে ছায়া পড়িয়া গিয়াছে, চীনে-জবা গাছে কচি কচি পাতা ধরিয়াছে। যাইবার সময় ভাবে, দেখি আর কটা লজেঞ্চুস আছে?—পরে বোতল হইতে গোটাকতক বাহির করিয়া মুখে পুরিয়া দেয়।—ভাবে, আসছে মাসের টাকা পেলে ওই যে আনারসের একরকম আছে, তাই কিনে আনব এক শিশি—কি চমৎকার এগুলো খেতে! এ ধরনের ফলের আস্বাদযুক্ত লজেঞ্চুস সে আর কখনও খায় নাই!

কম্পাউন্ডে নামিয়া লাইব্রেরির কোণটা দিয়া যাইতে যাইতে সে হঠাৎ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। একজন বেঁটেমতো লোক ইঁদারার কাছে দাঁড়াইয়া স্কুলের কেরানী ও বোর্ডিং-এর বাজার সরকার গোপীনাথ দত্তের সঙ্গে আলাপ করিতেছে।

তাহার বুকের ভিতরটা কেমন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল...সে কিসের টানে যেন লোকটার দিকে পায়ে পায়ে আগাইয়া গেল...লোকটা এবার তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়াছে—হাতটা কেমন বাঁকাইয়া আছে, তখনই কথা শেষ করিয়া সে ইঁদারার পাড়ের গায়ে ঠেস-দেওয়ানো ছাতাটা হাতে লইয়া কম্পাউন্ডের ফটক দিয়া বাহির হইয়া গেল।

অপু খানিকক্ষণ একদৃষ্টে সেদিকে চাহিয়া রহিল। লোকটাকে দেখিতে অবিকল তাহার বাবার মতো।

কতদিন সে বাবার মুখ দেখে নাই। আজ চার বৎসর!

উদ্গত চোখের জল চাপিয়া জবাতলায় গিয়া সে গাছের ছায়ায় চুপ করিয়া বসিল।

অন্যমনস্কভাবে বইখানা সে উলটাইয়া যায়। তাহার প্রিয় সেই তিনরঙা ছবিটা বাহির করিল, পাশের পৃষ্ঠার সেই পদ্যটা।

স্বদেশ হইতে বহুদূরে, আত্মীয়স্বজন হইতে বহুদূরে, আলজিরিয়ার কর্কশ, বন্ধুর, জলহীন মরুপ্রান্তে একজন মুমূর্ষু তরুণ সৈনিক বালুশয্যায় শায়িত। দেখিবার কেহ নাই। কেবল অনেক সৈনিকবন্ধু পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মুখে চামড়ার বোতল হইতে একটু একটু জল দিতেছে। পৃথিবীর নিকট হইতে শেষ বিদায় লইবার সময় সম্মুখের এই অপরিচিত, ধূসর উঁচুনিচু বালিয়াড়ি, পিছনের আকাশে সান্ধ্যসূর্যরক্তচ্ছটা, দূরে খর্জুরকুঞ্জ ও ঊর্ধ্বমুখ উষ্ট্রশ্রেণীর দিকে চোখ রাখিয়া মুমূর্ষু সৈনিকটির কেবলই মনে পড়িতেছে বহুদূরে রাইন নদীতীরবর্তী তাহার জন্মপল্লীর কথা...তাহার মা আছেন সেখানে। বন্ধু, তুমি আমার মায়ের কাছে খবরটা পৌঁছাইয়া দিয়ো, ভুলিয়ো না।...

For my home is in distant Bingen, Fair Bingen on the Rhine!

মাকে অপু দেখে নাই আজ পাঁচ মাস:—সে আর থাকিতে পারে না...বোর্ডিং তাহার ভালো লাগে না, স্কুল আর ভালো লাগে না, মাকে না দেখিয়া আর থাকা যায় না।

এই সব সময়ে এই নির্জন অপরাহ্নগুলিতে নিশ্চিন্দিপুরের কথা কেমন করিয়া তাহার মনে পড়িয়া যায়। সেই একদিনের কথা মনে পড়ে।...

বাড়িতে পাশের পোড়ো ভিটার বনে অনেকগুলো ছাতারে পাখি কিচকিচ করিতেছিল, কি ভাবিয়া একটা ঢিল ছুঁড়িয়া মারিতেই দলের মধ্যে ছোট একটা পাখি ঘাড় মোচড়াইয়া টুপ করিয়া ঝোপের নিচে পড়িয়া গেল, বাকিগুলা উড়িয়া পলাইল। তাহার ঢিলে পাখি সত্য সত্য মরিবে ইহা সে ভাবে নাই, দৌড়িয়া গিয়া মহা আগ্রহে দিদিকে ডাকিল, ওরে দিদি, শিগগির আয় রে, দেখবি একটা জিনিস, ছুটে আয়—

দুর্গা আসিয়া দেখিয়া বলিল, দেখি, দে-দিকি আমার হাতে! পরে সে নিজের হাতে পাখিটিকে লইয়া কৌতূহলের সহিত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। ঘাড় ভাঙিয়া গিয়াছে, মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়াছে, দুর্গার আঙুলে রক্ত লাগিয়া গেল। দুর্গা তিরস্কারের সুরে বলিল, আহা, কেন মারতে গেলি তুই?

অপুর বিজয়গর্বে উৎফুল্ল মন একটু দমিয়া গেল।

দুর্গা বলিল, আজ কি বার রে? সোমবার না? তুই তো বামুনের ছেলে—চল্, তুই আর আমি একে নিয়ে গিয়ে গাঙের ধারে পুড়িয়ে আসি, এর গতি হয়ে যাবে।

তারপর দুর্গা কোথা হইতে একটা দেশলাই সংগ্রহ করিয়া আনিল, তেঁতুলতলার ঘাটের এক ঝোপেব ধারে শুকনো পাতার আগুনে পাখিটাকে খানিক পুড়াইল, পরে আধঝলসানো পাখিটা নদীর জলে ফেলিয়া দিয়া সে ভক্তিভাবে বলিল—হরিবোল হরি, হবি ঠাকুর ওর গতি করবেন, দেখিস্! আহা, কি করেই ঘাড়টা থেঁতলে দিয়েছিলি? কখ্খনো ওরকম করিস নে আর। বনে জঙ্গলে উড়ে বেড়ায়, কারুর কিছু করে না, মারতে আছে, ছিঃ!—

নদী হইতে অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিয়া দুর্গা চিতার জায়গাটা ধুইয়া দিল।

সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরিবার সময় কে জানে তাহারা কোন্ মুক্ত বিহঙ্গ আত্মার আশীর্বাদ লইয়া ফিবিয়াছিল!...

দেবব্রত আসিয়া ডাক দিতে অপুর নিশ্চিন্দিপুরের স্বপ্ন মিলাইয়া গেল।

দেবব্রত বলিল, অপূর্বদা এখানে বসে আছেন? আমি ঠিক ভেবেচি আপনি এখানেই আছেন—কি কথা ভাবচেন—মুখ ভার-ভার—

অপু হাসিয়া বলিল—ও কিছু না, এসো বোসো। কি? চলো দেখি রাসবেহারী কি করছে।

দেবব্রত বলিল, না, যাবেন না অপূর্বদা, কেন ওদের সঙ্গে মেশেন? আপনার নামে লাগিয়েচে, ধোপার পয়সা দেয় না, পয়সা বাকি রাখে এই সব! যাবেন না ওদের ওখানে—

—কে বলেচে এসব কথা?

—-ওই ওরাই বলে। বিনোদ ধোপাকে শিখিয়ে দিচ্ছিল আপনার কাছে পয়সা বাকি না রাখতে। বলছিল, ও আর দেবে না—তিনবারের পয়সা নাকি বাকি আছে?

অপু বলিল—বা রে, বেশ লোক তো সব! হাতে পয়সা ছিল না তাই দিই নি—এই সামনের মাসে প্রথমেই দিয়ে দেবো—তা আবার ধোপাকে শিখিয়ে দেওয়া—আচ্ছা তো সব।

দেবব্রত বলিল—আবার আপনি ওদের যান খাওয়াতে! আপনার সেই খাতাখানা নিয়ে ওই বদমাইশ হিমাংশুটা আজ কত ঠাট্টা তামাশা করছিল—ওদের দেখান কেন ওসব?

অপূর্ব বলিল—এসব কথা আমি জানি নে, আমি লিখছিলাম ননীমাধব এসে বলে—ওটা কি? তাই একটুখানি পড়ে শোনালাম। কি কি—কি বলছিল?

—আপনাকে পাগল বলে—যত রাজ্যির গাছপালার কথা নাকি শুধু শুধু খাতায় লেখা!

আবোল-তাবোল শুধু তাতেই ভর্তি? ওরা তাই নিয়ে হাসে। আপনি চুপ করে এইখানে মাঝে মাঝে এসে বসেন বলে কত কথা তুলেছে—

অপুর রাগ হইল, একটু লজ্জাও হইল। ভাবিল, খাতাখানা না দেখালেই হত সেদিন! দেখতে চাইলে তাই তো দেখালাম, নইলে আমি সেধে তো আর—

মাঝে মাঝে তাহার মনে কেমন একটা অস্থিরতা আসে, এসব দিনে বোর্ডিং-এর ঘরে আবদ্ধ থাকিতে মন চাহে না। কোথায় কোন্ মাঠ বৈকালের রোদে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, ছায়াভরা নদীজলে কোথায় নববধূর নাকছাবির মতো পানকলস শ্যাওলার কুচা কুচা সাদা ফুল ফুটিয়া নদীজল আলো করিয়া রাখিয়াছে, মাঠের মাঝে উঁচু ডাঙায় কোথায় ঘেঁটুফুলের বন...এই সবের স্বপ্নে সে বিভোর থাকে, মুক্ত আকাশ, মুক্ত মাঠ, গাছপালার জন্য মন কেমন করে। গাছপালা না দেখিয়া বেশীদিন থাকা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব! মনে বেশি কষ্ট হইলে একখানা খাতায় সে বসিয়া বসিয়া যত রাজ্যের গাছের ও লতাপাতার নাম লেখে এবং যে ধরনের ভূমিশ্রীর জন্য মনটা তৃষিত থাকে, তাহারই একটা কল্পিত বর্ণনায় খাতা ভরাইয়া তোলে। সেখানে নদীর পাশেই থাকে মাঠ, বাবলা বন, নানা বনজ গাছ, পাখিডাকা সকাল-বিকালের রোদ...ফুল। ফুলের সংখ্যা থাকে না। বোর্ডিং-এর ঘরটায় আবদ্ধ থাকিয়াও মনে মনে সে নানা অজানা মাঠে বনে নদীতীরে বেড়াইতে আসে। একখানা বাঁধা খাতাই সে এভাবে লিখিয়া পুরাইয়া ফেলিয়াছে!

অপু ভাবিল, বলুক গে, আর কখ্‌খনো কিছু দেখাচ্ছি নে। ওদের সঙ্গে এই আমার হয়ে গেল। দেবো আবার কখনও ক্লাসের ট্রানস্লেশন বলে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফাল্গুন মাসের প্রথম হইতেই স্কুল-কম্পাউন্ডের চারিপাশে গাছপালার নতুন পাতা গজাইল। ক্রিকেট খেলার মাঠে বড়ো বাদাম গাছটার রক্তাভ কচি সবুজ পাতা সকালের রৌদ্রে দেখিতে হইল চমৎকাব, শীত একেবারে নাই বলিলেই হয়।

বোর্ডিং-এর রাসবিহারীর দল পরামর্শ করিল মাম্‌জোয়ানে দোলের মেলা দেখিতে যাইতে হইবে। মাম্‌জোয়ানের মেলা এ অঞ্চলের বিখ্যাত মেলা।

অপু খুশির সহিত রাসবিহারীদের দলে ভিড়িল। মাম্‌জোয়ানের মেলার কথা অনেক দিন হইতে সে শুনিয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া পর্যন্ত কোথাও মেলা বা বারোয়ারি আর কখনও দেখা ঘটে নাই।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট বিধুবাবু দু-দিনের ছুটি দিলেন। অপু অনেকদিন পরে যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ক্রোশ তিনেক পথ—মাঠ ও কাঁচা মাটির রাস্তা। ছোট ছোট গ্রাম, কুমারেরা চাক ঘুরাইয়া কলসি গড়িতেছে। পথের ধারের ছোট দোকানে দোকানদার রেড়ির ফলের বীজ ওজন করিয়া লইতেছে—সজিনা গাছ সব ফুলে ভর্তি—এমন চমৎকার লাগে।...ছুটি-ছাটা ও শনি-রবিবারে সীমাবদ্ধ না হইয়া এই যে জীবনধারা পথের দুইপাশে, দিনে রাত্রে, শত দুঃখে সুখে আকাশ বাতাসের তলে, নিরাবরণ মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাইয়া চঞ্চল আনন্দে ছুটিয়া চলিয়াছে,—এই জীবনধারার সহিত সে নিজেকে পরিচিত করিতে চায়।

মাঠে কাহারা শুকনা খেজুর ডালের আগুনে রস জ্বাল দিতেছে দেখিয়া তাহার ইচ্ছা হইল—সে তাহাদের কাছে গিয়া খানিকক্ষণ রস জ্বাল দেওয়া দেখিবে, বসিয়া বসিয়া শুনিবে উহারা কি কথাবার্তা বলিতেছে।

ননী বলিল, তোকে পাগল বলি কি আর সাধে? দূর, দূর—আর কি দেখবি ওখানে?

অপু অপ্রতিভ মুখে বলিল, আয় না, ওরা কি বলছে শুনি? ওরা কত গল্প জানে, জানিস? আয় না—

রাজু রায়ের পাঠশালার সেই দিনগুলি হইতে বয়স্ক লোকের গল্পের ও কথাবার্তার প্রতি তাহার প্রবল মোহ আছে—একটা বিস্তৃততর, অপরিচিত জীবনের কথা ইহাদের মুখে শোনা যায়। অপু ছাড়িয়া যাইতে রাজি নয়—রাসবিহারীর দল অগত্যা তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

সুশ্রী চেহারার ভদ্রলোকের ছেলে দেখিয়া মুচিরা খুব খাতির করিল। খেজুর রস খাইতে আসিয়াছে ভাবিয়া মাটির নতুন ভাঁড় ধুইয়া জিরান কাঠের টাটকা রস লইয়া আসিল। ইহাদের কাছে অপু আদৌ মুখচোরা নয়। ঘণ্টাখানেকের উপর সে তাহাদের সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গুড় জ্বাল দেওয়া দেখিল।

মামজোয়ানের মেলায় পৌঁছিতে তাহার হইয়া গেল বেলা বারোটা। প্রকাণ্ড মেলা, ভয়ানক ভিড়; রৌদ্রে তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মুখ রাঙা হইয়া গিয়াছে, সঙ্গীদের মধ্যে কাহাকেও সে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দুই-ই পাইয়াছে, ভালো খাবার খাইবার পয়সা নাই, একটা দোকান হইতে সামান্য কিছু খাইয়া এক ঘটি জল খাইল। তাহার পর একটা পাখির খেলার তাঁবুর ফাঁক দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল—ভিতরে কি খেলা হইতেছে। একজন পশ্চিমা লোক হটাইয়া দিতে আসিল।

অপু বলিল, কত করে নেবে খেলা দেখতে?...দুপয়সা দেব—দেখাবে?

লোকটি বলিল, এখন খেলা শুরু হইয়া গিয়াছে, আধঘণ্টা পরে আসিতে।

একটা পানের দোকানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যাত্রা কবে বসবে জানো?

বৈকালে লোকের ভিড় খুব বাড়িল। দোকানে দোকানে, বিশেষ করিয়া পানের দোকানগুলিতে খুব ভিড়। খেলা ও ম্যাজিকের তাঁবুগুলির সামনে খুব ঘণ্টা ও জয়ঢাক বাজিতেছে। অপু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল—একটা বড়ো তাঁবুর বাহিরে আলকাতরা-মাখা জন দুই লোক বাঁশের মাচার উপর দাঁড়াইয়া কৌতূহলী জনতার সম্মুখে খেলার অত্যাশ্চর্যতা ও অভিনবত্বের নমুনাস্বরূপ একটা লম্বা লাল-নীল কাগজের মালা নানা অঙ্গভঙ্গিসহকারে মুখ হইতে টানিয়া বাহির করিতেছে।

সে পাশের একটা লোককে জিজ্ঞাসা করিল, এ খেলা ক'য়সা জানো?

নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে বাবার বইয়ের দপ্তরে একখানা পুরাতন বই ছিল, তাহার মনে আছে, বইখানার নাম 'রহস্য লহরী'। রুমাল উড়াইয়া দেওয়া, কাটামুণ্ডুকে কথা বলানো, এক ঘণ্টার মধ্যে আম-চারায় ফল ধরানো প্রভৃতি নানা ম্যাজিকের প্রক্রিয়া বইখানাতে ছিল। অপু বই দেখিয়া দু-একবার চেষ্টা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু নানা বিলাতি ঔষধের ফর্দ ও উপকরণের তালিকা দেখিয়া, বিশেষ করিয়া "নিশাদল" দ্রব্যটি কি বা তাহা কোথায় পাওয়া যায় ঠিক করিতে না পারিয়া, অবশেষে ছাড়িয়া দেয়।

সে মনে মনে ভাবিল—ওই সব দেখেই তো ওরা শেখে! বাবার সেই বইখানাতে কত ম্যাজিকের কথা লেখা ছিল!—নিশ্চিন্দিপুর থেকে আসবার সময় কোথায় যে গেল বইখানা!

চারিধারে বাজনার শব্দ, লোকজনের হাসি-খুশি, খেলো সিগারেটের ধোঁয়া, ভিড়, আলো, সাজানো দোকানের সারি, তাহার মন উৎসবের নেশায় মাতিয়া উঠিল।

একদল ছেলেমেয়ে একখানা গোরুর গাড়ির ছইয়ের ভিতর হইতে কৌতূহল ও আগ্রহে মুখ বাড়াইয়া ম্যাজিকের তাঁবুর জীবন্ত বিজ্ঞাপন দেখিতে দেখিতে যাইতেছে। সকল লোককেই সিগারেট খাইতে দেখিয়া তাহার ইচ্ছা হইল সেও খায়—একটা পানের দোকানে ক্রেতার ভিড়ের পিছনে খানিকটা দাঁড়াইয়া অবশেষে একটা কাঠের বাক্সের উপর উঠিয়া একজনের কাঁধের উপর দিয়া হাতটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, এক পয়সার দাও তো? এই যে এইদিকে—এক পয়সার সিগারেট—ভালো দেখে দিয়ো—যা ভালো।

একটা গাছের তলায় বইয়ের দোকান দেখিয়া সেখানে দাঁড়াইল। চটের থলের উপর বই বিছানো, দোকানী খুব বুড়া, চোখে সুতাবাঁধা চশমা। একখানা ছবিওয়ালা চটি আরব্য উপন্যাস অপুর পছন্দ হইল—সে পড়ে নাই—কিন্তু দোকানী দাম বলিল আট আনা। হাতে পয়সা থাকিলে সে কিনিত।

বইখানা আর একবার দেখিতে গিয়া হঠাৎ সম্মুখের দিকে চোখ পড়াতে সে অবাক হইয়া গেল। সম্মুখের একটা দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া আছে—পটু! তার নিশ্চিন্দিপুরের বাল্যসঙ্গী পটু!

অপু তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া গায়ে হাত দিতেই পটু মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিল—প্রথমটা যেন চিনিতে পারিল না—পরে প্রায় চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, অপুদা?...এখানে কি করে, কোথা থেকে অপুদা?

অপু বলিল, তুই কোথা থেকে?

—আমার তো দিদির বিয়ে হয়েচে এই লাউখালি। এইখেন থেকে দু-কোশ। তাই মেলা দেখতে এলাম—তুই কি করে এলি কাশী থেকে—

অপু সব বলিল। বাবার মৃত্যু, বড়োলোকের বাড়ি, মনসাপোতা স্কুল। জিজ্ঞাসা করিল, বিনিদির বিয়ে হয়েছে মামজোয়ানের কাছে? বেশ তো—

অপুর মনে পড়িল, অনেকদিন আগে দিদির চড়ুইভাতিতে বিনিদিব ভয়ে ভয়ে আসিয়া যোগ দেওয়া। গরিব অগ্রদানী বামুনের মেয়ে, সমাজে নিচু স্থান, নম্র ও ভীরু চোখ দুটি সর্বদাই নামানো, অল্পেই সন্তুষ্ট।

দু-জনেই খুব খুশি হইয়াছিল। অপু বলিল—মেলার মধ্যে বড্ড ভিড় ভাই, চল্ কোথাও একটু ফাঁকা জায়গাতে গিয়ে বসি—অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে।

বাহিরের একটা গাছতলায় দুজনে গিয়া বসিল—তাহাদের বাড়িটা কিভাবে আছে? ..রানুদি কেমন?...নেড়া, পটল, নীলু, সতুদা ইহারা?...ইছামতী নদীটা? পটু সব কথার উত্তর দিতে পারিল না, পটুও আজ অনেকদিন গ্রামছাড়া। পটুর আপন মা-নাই, সৎমা। অপুরা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার পর হইতে সে সঙ্গীহীন হইয়া পড়িয়াছিল, দিদির বিবাহের পরে বাড়িতে একেবারেই মন টিকিল না। কিছুদিন এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল পড়াশুনার চেষ্টায়। কোথাও সুবিধা হয় নাই। দিদিব বাড়ি মাঝে মাঝে আসে, এখানে থাকিয়া যদি পড়াশুনার সুযোগ হয়, সেই চেষ্টায় আছে। অনেকদিন গ্রামছাড়া, সেখানকার বিশেষ কিছু খবর জানে না। তবে শুনিয়া আসিয়াছিল—শীঘ্রই রানীদিব বিবাহ হইবে, সে তিন বছর আগেকার কথা, এতদিন নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে।

পটু কথা বলিতে বলিতে অপুর দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল।

রূপকথার রাজপুত্রের মতো চেহারা হইয়া উঠিয়াছে অপুদাব।...কি সুন্দর মুখ!...অপুদাব কাপড়চোপড়ের ধরনও একেবারে পরিবর্তিত হইয়াছে।

অপু তাহাকে একটা খাবারের দোকানে লইয়া গিয়া খাবার খাওয়াইল, বাহিরে আসিয়া বলিল, সিগারেট খাবি? তাহাকে ম্যাজিকের তাঁবুর সামনে আনিয়া বলিল, ম্যাজিক দেখিস নি তুই? আয় তোকে দেখাই—পরে সে আট পয়সার দুইখানা টিকিট কাটিয়া উৎসুক মুখে পটুকে লইয়া ম্যাজিকের তাঁবুতে ঢুকিল।

ম্যাজিক দেখিতে দেখিতে অপু জিজ্ঞাসা করিল, হাঁরে, আমরা চলে এলে রানুদি বলতো নাকি কিছু আমাদের—আমার কথা? নাঃ—

খুব বলিত। পটুর কাছে কতদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছে অপু তাহাকে কোনো পত্র লিখিয়াছে কি না, তাহাদের কাশীর ঠিকানা কি? পটু বলিতে পারে নাই। শেষে পটু বলিল, বুড়ো নরোত্তম বাবাজী তোর কথা ভারি বলতো!

অপুর চোখ জলে ভরিয়া আসিল। তাহার বোষ্টমদাদু এখনও বাঁচিয়া আছে?—এখনও তাহার

কথা ভুলিয়া যায় নাই? মধুর প্রভাতের পদ্মফুলের মতো ছিল দিনগুলা—আকাশ ছিল নির্মল, বাতাস কি শান্ত, নবীন উৎসাহ ভরা মধুচ্ছন্দ! মধুর নিশ্চিন্দিপুর! মধুর ইছামতীর কলমর্মর!...মধুর তাহার দুঃখী দিদি দুর্গার স্নেহভরা ডাগর চোখের স্মৃতি!...কতদূর, ক—ত দূরে চলিয়া গিয়াছে সে দিনের জীবন। খেলাঘরের দোকানে নোনা-পাতার পান বিক্রি, সেই সতুদার মাকাল ফল চুরি করিয়া দৌড় দেওয়া!...

একবার একখানা বইতে সে পড়িয়াছিল দেবতার মায়ায় একটা লোক স্নানের সময় জলে ডুব দিয়া পুনরায় উঠিবার যে সামান্য ফাঁকটুকু তাহারই মধ্যে ষাট বৎসরের সুদীর্ঘ জীবনের সকল সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছিল—যেন তাহার বিবাহ হইল, ছেলেমেয়ে হইল, তাহারা সব মানুষ হইল, কতক বা মরিয়া গেল, বাকিগুলির বিবাহ হইল, নিজেও সে বৃদ্ধ হইয়া গেল—হঠাৎ জল হইতে মাথা তুলিয়া দেখে—কোথাও কিছু নয়, সে যেখানে সেখানেই আছে, কোথায় বা ঘরবাড়ি, বা ছেলেমেয়ে!...

গল্পটা পড়িয়া পর্যন্ত মাঝে মাঝে সে ভাবে তাহারও ওরকম হয় না? এক-এক সময় তাহার মনে হয় হয়তো বা তাহার হইয়াছে। এ সব কিছু না—স্বপ্ন। বাবার মৃত্যু, এই বিদেশে, এই স্কুলে পড়া—সব স্বপ্ন। কবে একদিন ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া দেখিবে সে নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িতে তাহাদের সেই বনের ধারের ঘরটাতে আষাঢ়ের পড়ন্ত বেলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—সন্ধ্যার দিকে পাখির কলরবে জাগিয়া উঠিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ভাবিতেছে, কি সব হিজিবিজি অর্থহীন স্বপ্নই না সে দেখিয়াছে ঘুমের ঘোরে!...বেশ মজা হয় আবার তাহার দিদি ফিরিয়া আসে, তাহার বাবা, তাহাদের বাড়িটা।

একদিন ক্লাসে সত্যেনবাবু একটা ইংরেজ কবিতা পড়াইতেছিলেন, নামটা গ্রেভস্ অফ এ হাউসহোল্ড। নির্জনে বসিয়া সেটা আবৃত্তি করিতে করিতে তাহার চোখ দিয়া জল পড়ে। ভাইবোনেরা একসঙ্গে মানুষ, এক মায়ের কোলেপিঠে, এক ছেঁড়া কাঁথার তলে। বড়ো হইয়া জীবনের ডাকে কে কোথায় গেল চলিয়া—কাহারও সমাধি সমুদ্রে, কাহারও কোন্ অজানা দেশের অপরিচিত আকাশের তলে, কাহারও বা ফুল-ফোটা কোন্ গ্রাম্য বনের ধারে।

আপনা-আপনি পথ চলিতে চলিতে এই সব স্বপ্নে সে বিভোর হইয়া যায়। কত কথা যেন মনে ওঠে! যত লোকের দুঃখের দুর্দশার কাহিনী। নিশ্চিন্দিপুরের জানালার ধারে বসিয়া বাল্যের সে ছবি দেখা—সেই বিপন্ন কর্ণ, নির্বাসিতা সীতা, দরিদ্র বালক অশ্বত্থামা, পরাজিত রাজা দুর্যোধন, পল্লীবালিকা জোয়ান। বুঝাইয়া বলিবার বয়স তাহার এখনও হয় নাই; ভাবকে সে ভাষা দিতে জানে না—অল্পদিনের জীবনে অধীত সমুদয় পদ্য ও কাহিনী অবলম্বন করিয়া সে যেভাবে জগৎকে গড়িয়া তুলিয়াছে—অনাবিল তরুণ মনের তাহা প্রথম কাব্য—তার কাঁচা জীবনে সুখে দুঃখে, আশায় নিরাশায় গাঁথা বনফুলের হার।—প্রথম উচ্চারিত ঋক্‌মন্ত্রের কারণ ছিল যে বিস্ময় যে আনন্দ—তাহাদেরই সগোত্র, তাহাদেরই মতো ঋদ্ধিশীল ও অবাচ্য সৌন্দর্যময়।

রাগরক্ত সন্ধ্যার আকাশে সত্যের প্রথম শুকতারা।

কে জানে ওর মনের সে সব গহন গভীর গোপন রহস্য? কে বোঝে?

ম্যাজিকের তাঁবু হইতে বাহির হইয়া দুজনে মেলার মধ্যে ঢুকিল। বোর্ডিং-এর একটি ছেলের সঙ্গেও তাহার দেখা হইল না, কিন্তু তাহার আমোদের তৃষ্ণা এখনও মেটে নাই, এখনও ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিবার ইচ্ছা। বলিল—চল্ পটু, দেখে আসি যাত্রা বসবে কখন—যাত্রা না দেখে যাস্ নে যেন।

পটু বলিল, অপুদা কোন্ ক্লাসে পড়িস তুই?...

অপু অন্যমনস্কভাবে বলিল, ওই যে ম্যাজিক দেখলি, ও আমার বাবার একখানা বই ছিল, তাতে সব লেখা ছিল, কি করে করা যায়—জিনিস পেলে আমিও করতে পারি—

—কোন্ ক্লাসে তুই—

—ফোর্থ ক্লাসে। একদিন আমাদের স্কুলে চল্, দেখে আসবি—দেখবি কত বড়ো স্কুল—রাত্রে আমার কাছে থাকবি এখন—একটু থামিয়া বলিল—সত্যি এত জায়গায় তো গেলাম, নিশ্চিন্দিপুরের মতো আর কিছু লাগে না—কোথাও ভালো লাগে না—

—তোরা যাবি নে আর সেখানে? সেখানে তোদের জন্যে সবাই দুঃখ করে, তোর কথা তো সবাই বলে—পরে সে হাসিয়া বলিল, অপুদা, তোর কাপড় পরবার ধরন পর্যন্ত বদলে গেছে, তুমি আর সেই নিশ্চিন্দিপুরের পাড়াগেঁয়ে ছেলে নেই—

অপু খুব খুশি হইল। গর্বের সহিত গায়ের শার্টটা দেখাইয়া বলিল, কেমন রংটা, না? ফার্স্ট ক্লাসের রমাপতিদার গায়ে আছে, তাই দেখে এটা কিনেছি—দেড় টাকা দাম।

সে একথা বলিল না যে শার্টটা সে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া অপরের দেখাদেখি দরজির দোকান হইতে ধারে কিনিয়াছে, দরজির অনবরত তাগাদা সত্ত্বেও এখনও দাম দিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বেলা বেশ পড়িয়া আসিয়াছে। আলকাতরা মাখা জীবন্ত বিজ্ঞাপনটি বিকট চিৎকার করিয়া লোক জড়ো করিতেছে।

পটু সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দিদির বাড়ির দিকে রওনা হইল। অপুর সহিত এতকাল পরে দেখা হওয়াতে সে খুব খুশি হইয়াছে। কোথা হইতে অপুদা কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে! তবুও স্রোতের তৃণের মতো ভাসিতে ভাসিতে অপুদা আশ্রয় খুঁজিয়া পাইয়াছে, কিন্তু এই তিন বৎসরকাল সে-ও তো ভাসিয়াই বেড়াইতেছে একরকম, তাহার কি কোন উপায় হইবে না?

সন্ধ্যার পর বাড়ি পৌঁছিল। তাহার দিদি বিনির বিবাহ বিশেষ অবস্থাপন্ন ঘরে হয় নাই, মাটির বাড়ি, খড়ের চাল, খানদুই-তিন ঘর। পশ্চিমের ভিটায় পুরানো আমলের কোঠা ভাঙিয়া পড়িয়া আছে, তাহারই একটা ঘরে বর্তমানে রান্নাঘর, ছাদ নাই, আপাতত খড়ের ছাউনি, একখানা চাল ইটের দেওয়ালের গায়ে কাতভাবে বসানো।

বিনি ভাইকে খাবার খাইতে দিল। বলিল—কি রকম দেখলি মেলা?...সে এখন আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে, বিশেষ মোটাসোটা হয় নাই, সেই রকমই আছে। গলার স্বর শুধু বদলাইয়া গিয়াছে।

পটু হাসিমুখে বলিল, আজ কি হয়েচে জানিস দিদি, অপুর সঙ্গে দেখা হয়েচে—মেলায়।

বিনি বিস্ময়ের সুরে বলিল, অপু! সে কি করে—কোথা থেকে—

পরে পটুর মুখে সব শুনিয়া সে অবাক হইয়া গেল। বলি—বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে—আহা সঙ্গে করে আনলি নে কেন?...দেখতে বড়ো হয়েছে?...

—সে অপুই আর নেই। দেখলে চেনা যায় না। আরও সুন্দর হয়েচে দেখতে—তবে সেই রকম পাগলা আছে এখনও—ভারি সুন্দর লাগে—এমন হয়েচে!. .এতকাল পরে দেখা হয়ে আমার মেলায় যাওয়াই আজ সার্থক হয়েছে। খুড়িমা মনসাপোতা থাকে বললে।

—সে এখেন থেকে কত দূর?...

—সে অনেক, রেলে যেতে হয়। মামজোয়ান থেকে ন'দশ কোশ হবে।

বিনি বলিল, আহা একদিন নিয়ে আসিস না অপুকে, একবার দেখতে ইচ্ছে করে—

ছাদ-ভাঙা রান্নাবাড়ির রোয়াকে পটু খাইতে বসিল। বিনি বলিল, তোর চক্কত্তি মশায়কে একবার বলে দেখিস দিকি কাল? বলিস বছর তিনেক থাকতে দ্যাও, তার পর নিজের চেষ্টা নিজে করব—

পটু বলিল, বছর তিনেকের মধ্যে পড়া শেষ হয়ে যাবে না—ছ'সাত বছরের কমে কি পাশ দিতে পারব?...অপুদা বাড়িতে পড়ে কত লেখাপড়া জানত—আমি তো তাও পড়ি নি, তুমি একবার চক্কত্তি মশায়কে বলো না দিদি?

বিনি বলিল—আমিও বলব এখন। বড্ড ভয় করে—পাছে আবার বট্‌ঠাকুরঝি হাত-পা নেড়ে

ওঠে—বট্‌ঠাকুরঝিকে একবার ধরতে পারিস?—আমি কথা কইলে তো কেউ শুনবে না, ও যদি বলে তবে হয়—

পটু যে তাহা বোঝে না এমন নয়। অর্থাভাবে দিদিকে ভালো পাত্রের হাতে দিতে পারা যায় নাই, দোজবর, বয়স বেশি। ওপক্ষের গুটিকতক ছেলেমেয়েও আছে, দুই বিধবা ননদ বর্তমান, ইহারা সকলেই তাহার দিদির প্রভু। ভালোমানুষ বলিয়া সকলেই তাহার উপর দিয়া ষোল আনা প্রভুত্ব চালাইয়া থাকে। উদয়াস্ত খাটিতে হয়, বাড়ির প্রত্যেকেই বিবেচনা করে তাহাকে দিয়া ব্যক্তিগত ফরমাইশ খাটাইবার অধিকার উহাদের প্রত্যেকেরই আছে, কাজেই তাহাকে কেহ দয়া করে না।

অনেক রাত্রে বিনির স্বামী অর্জুন চক্রবর্তী বাড়ি ফিরিল। মাম্‌জোয়ানের বাজারে তাহার খাবারের দোকান আছে, আজকাল মেলার সময় বলিয়া রাত্রে একবার আহার করিতে আসে মাত্র। খাইয়াই আবার চলিয়া যায়, রাত্রেও কেনাবেচা হয়। লোকটি ভারি কৃপণ! বিনি রোজই আশা করে—ছোট ভাইটা এখানে কয়দিন হইল আসিয়াছে, এ পর্যন্ত কোন দিন একটা রসগোল্লাও তাহার জন্য হাতে করিয়া বাড়ি আসে নাই, অথচ নিজেরই তো খাবারের দোকান। এ রকম লোকের কাছে ভাইয়ের সম্বন্ধে কি কথাই বা সে বলিবে!

তবুও বিনি বলিল। স্বামীকে ভাত বাড়িয়া দিয়া সে সামনে বসিল, ননদেরা কেহ রান্নাঘরে নাই, এ ছাড়া আর সুযোগ ঘটিবে না। অর্জুন চক্রবর্তী বিস্ময়ের সুবে বলিল—পটল? এখানে থাকবে?...

বিনি মরীয়া হইয়া বলিল—ওই ওর সমান অপূর্ব ব'লে ছেলে—আমাদের গাঁয়ের, সেও পড়ছে। এখেনে যদি থাকে তবে এই মাম্‌জোয়ান ইস্কুলে গিয়ে পড়তে পারে—একটা হিল্লে হয়—

অর্জুন চক্রবর্তী বলিল—ওসব এখন হবে-টবে না, দোকানের অবস্থা ভালো নয়, দোলের বাজারে খাজনা বেড়ে গিয়েছে দুনো, অথচ দোকানে আয় নেই। মামজোয়ানে খটি খুলে চার আনা সের ছানা—তাই বিকুচ্ছে দশ আনায়, তা লাভ করব, না খাজনা দেব, না মহাজন মেটাব? মেলা দেখে বাড়ি চলে যাক—ও সব ঝক্কি এখন নেওয়া বল্‌লেই নেওয়া—!

বিনি খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—বোশেক মাসের দিকে আসতে বলবো?

অর্জুন চক্রবর্তী বলিল—বোশেখ মাসের বাকিটা আর কি—আর মাস দেড়েক বই তো নয়! ..ওসব এখন হবে না, ওসব নিয়ে এখন দিক্ কোরো না—ভালো লাগে না, সারাদিন খাটুনির পর—বলে নিজের জ্বালায় তাই বাঁচিনে তা আবার—হুঁ—

বিনি আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। মনে খুব কষ্ট হইল—ভাইটা আশা করিয়া আসিয়াছিল—দিদির বাড়ি থাকিয়া পড়িতে পাইবে! বলিল—আচ্ছা, অপু কেমন করে পড়ছে রে?

পটু বলিল--সে যে এস্কলারশিপ পেয়েচে—তাতেই খরচ চলে যায়।

বিনি বলিল—তুই তা পাস নে? তাহলে তোরও তো—

পটু হাসিয়া বলিল—না পড়েই এস্কলারশিপ পাবো—বা তো—পাশ দিলে তবে পাওয়া যাবে, সে সব আমার হবে না, অপুদা ভালো ছেলে—ও কি আর আমার হবে?...

বিনি বলিল—তুই অপুকে একবার বলে দেখবি? ও ঠিক একটা কিছু তোকে জোগাড় করে দিতে পারে।

দুজনে পরামর্শ করিয়া তাহাই অবশেষে যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল।

সর্বজয়া পিছু পিছু উঠিয়া বড়োঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতে আসিল, সম্মুখের উঠানে নামিয়া বলিল—মাঝে মাঝে এসো বৌমা, বাড়ি আগলে পড়ে থাকতে হয়, নইলে দুপুর বেলা এক একবার ভাবি তোমাদের ওখানে একটু বেড়িয়ে আসি। সেদিন বাপু গয়লাপাড়ায় চুরি হয়ে যাওয়ার পর বাড়ি ফেলে যেতে ভরসা পাই নে।

তেলি-বাড়ির বড়ো বধূ বেড়াইতে আসিয়াছিল, তিন বৎসরের ছোট মেয়েটির হাত ধরিয়া হাসিমুখে চলিয়া গেল।

এতক্ষণ সর্বজয়া বেশ ছিল। ইহারা সব দুপুরের পর আসিয়াছিল, গল্পগুজবে সময়টা তবুও একরকম কাটিল। কিন্তু একা একা সে তো আর থাকিতে পারে না। শুধুই সব সময়ই, দিন নাই রাত্রি নাই,—অপুর কথা মনে পড়ে। অপুর কথা ছাড়া অন্য কোন কথাই তাহার মনে স্থান পায় না।

আজ সে গিয়াছে এই পাঁচ মাস হইল। কত শনিবার কত ছুটির দিন চলিয়া গিয়াছে এই পাঁচ মাসের মধ্যে। সর্বজয়া সকালে উঠিয়া বসিয়াছে—আজ দুপুরে আসিবে। দুপুর চলিয়া গেলে ভাবিয়াছে বৈকালে আসিবে। অপু আসে নাই।

অপুর কত জিনিস ঘরে পড়িয়া আছে, কত স্থান হইতে কত কি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রাখিয়া গিয়াছে—অবোধ পাগল ছেলে!...শূন্য ঘরের দিকে চাহিয়া সর্বজয়া হাঁপায়, অপুর মুখ মনে আনিবার চেষ্টা করে। এক একবার তাহার মনে হয় অপুর মুখ সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। যতই জোর করিয়া মনে আনিবার চেষ্টা করে ততই সে মুখ অস্পষ্ট হইয়া যায়...অপুর মুখের আদলটা মনে আনিলেও ঠোঁটের ভঙ্গিটা ঠিক মনে পড়ে না, চোখের চাহনিটা মনে পড়ে না...সর্বজয়া একেবারে পাগলের মতো হইয়া ওঠে—অপুর, তাহার অপুর মুখ সে ভুলিয়া যাইতেছে!

কেবলই অপুর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। অপু কথা বলিতে জানিত না, কোন্ কথার কি মানে হয় বুঝিত না। মনে আছে...নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িতে থাকিতে একবার রান্নাবাড়ির দাওয়ায় কাঁঠাল ভাঙিয়া ছেলেমেয়েকে দিতেছিল। দুর্গা বাটি পাতিয়া আগ্রহের সহিত কাঁঠাল-ভাঙা দেখিতেছে, অপু দুর্গার বাটিটা দেখাইয়া হাসিমুখে বলিয়া উঠিল—দিদি কাঁটালের বড়ো প্রভু, না মা? সর্বজয়া প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই, শেষে বুঝিয়াছিল, দিদি কাঁঠালের বড়ো 'ভক্ত' এ কথাটা বুঝাইতে 'ভক্ত' কথাটার স্থানে 'প্রভু' ব্যবহার করিয়াছে। তখন অপুর বয়স নয় বৎসরের কম নয় অথচ তখনও সে কাজে-কথায় নিতান্ত ছেলেমানুষ।

একবার নতুন পরনের কাপড় কোথা হইতে ছিঁড়িয়া আসিবার জন্য অপু মার খাইয়াছিল। কতদিনের কথা, তবুও ঠিক মনে আছে। হাঁড়িতে আমসত্ত্ব, কুলচুর রাখিবার জো ছিল না, অপু কোন্ ফাঁকে ঢাকনি খুলিয়া চুরি করিয়া খাইবেই। এই অবস্থায় একদিন ধরা পড়িয়া যায়, তখনকার সেই ভয়ে ছোট হইয়া যাওয়া রাঙা মুখখানি মনে পড়ে। বিদেশে একা কত কষ্টই হইতেছে, কে তাহাকে সেখানে বুঝিতেছে!

আর একদিনের কথা সে কখনও ভুলিবে না। অপুর বয়স যখন তিন বৎসর, তখন সে একবার হারাইয়া যায়। খানিকটা আগে সম্মুখের উঠানের কাঁঠালতলায় বসিয়া খেলা করিতে তাহাকে দেখা গিয়াছে, ইহারই মধ্যে কোথায় গেল!...পাড়ায় কাহারও বাড়িতে নাই, পিছনের বাঁশবনেও নাই—চারিধারে খুঁজিয়া কোথাও অপুকে পাইল না। সর্বজয়া কাঁদিয়া আকুল হইল—কিন্তু যখন হরিহর বাড়ির পাশের বাঁশতলার ডোবাটা খুঁজিবার জন্য ও-পাড়া হইতে জেলেদের ডাকিয়া আনাইল, তখন তাহার আর কান্নাকাটি রহিল না। সে কেন কাঠের মতো হইয়া ডোবার পাড়ে দাঁড়াইয়া জেলেদের জাল ফেলা দেখিতে লাগিল! পাড়াসুদ্ধ লোক ভাঙিয়া পড়িয়াছিল—ডোবার পাড়ে অক্রুর জেলে টানাজালের বাঁধন খুলিতেছিল, সর্বজয়া ভাবিল অক্রুর মাঝিকে চিরকাল সে নিরীহ বলিয়া জানে, ভালো মানুষের মতো কতবার মাছ বেচিয়া গিয়াছে তাহাদের বাড়ি—সে সাক্ষাৎ যমের বাহন হইয়া আসিল কি করিয়া? শুধু অক্রুর মাঝি নয়, সবাই যেন যমদূত, অন্য অন্য লোকেরা যাহারা মজা দেখিতে ছুটিয়াছে, তাহারা—এমন কি তাহার স্বামী পর্যন্ত। সে-ই তো গিয়া ইহাদের ডাকিয়া আনিয়াছে। সর্বজয়ার মনে হইতেছিল যে, ইহারা সকলে মিলিয়া তাহার বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে কি একটা ষড়যন্ত্র আঁটিয়াছে—কোন হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র।

ঠিক সেই সময়ে দুর্গা অপুকে খুঁজিয়া আনিয়া হাজির করিল। অপু নাকি নদীর ধারের পথ

দিয়া হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া একা একা সোনাডাঙার মাঠের দিকে যাইতেছিল, অনেকখানি চলিয়া গিয়াছিল। তাহার পর ফিরিতে গিয়া বোধ হয় পথ চিনিতে পারে নাই। বাড়ির কাঁটাল-তলায় বসিয়া খেলা করিতে করিতে কখন কোন্ ফাঁকে বাহির হইয়া গিয়াছে, কেহ জানে না।

যখন সকলে যে-যাহার বাড়ি চলিয়া গেল, তখন সর্বজয়া স্বামীকে বলিল—এ ছেলে কোনদিন সংসারী হবে না, দেখে নিয়ো—

হরিহর বলিল—কেন?...তা ও-রকম হয়, ছেলেমানুষ গিয়েই থাকে—

সর্বজয়া বলিল—তুমি পাগল হয়েছ!...তিন বছর বয়েসে অন্য ছেলে বাড়ির বাইরে পা দেয় না, আর ও কিনা গাঁ ছেড়ে, বাঁশবন, মাঠ ভেঙে গিয়েছে সেই সোনাডাঙার মাঠের রাস্তায়। তাও ফেরবার নাম নেই—হন্ হন্ করে হেঁটেই চলেছে।—কখ্খনো সংসারে মন দেবে না, তোমাকে বলে দিলাম—এ আমার কপালেই লেখা আছে!

কত কথা সব মনে পড়ে—নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ির কথা, দুর্গার কথা। এ জায়গা ভালো লাগে না, এখন মনে হয়, আবার যদি নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইত! একদিন যে-নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া আসিতে উৎসাহের অবধি ছিল না, এখন তাহাই যেন রূপকথার রাজ্যের মতো সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারকার ধরা-ছোঁয়ার বাহিরের জিনিস হইয়া পড়িয়াছে! ভাবিতে ভাবিতে প্রথম বসন্তের পুষ্পসুবাসমধুর বৈকাল বহিয়া যায়, অলস অস্ত-আকাশে কত রং ফুটিয়া আবার মিলাইয়া যায়, গাছপালায় পাখি ডাকে। এ রকম একদিন নয়, কতদিন হইয়াছে।

কোন কিছু ভালোমন্দ জিনিস পাইলেই সেটুকু সর্বজয়া ছেলের জন্য তুলিয়া রাখে। কুণ্ডুদের বাড়ির বিবাহের তত্ত্বে সন্দেশ আসিলে সর্বজয়া প্রাণ ধরিয়া তাহার একটা খাইতে পারে নাই। ছেলের জন্য তুলিয়া রাখিয়া রাখিয়া অবশেষে যখন হাঁড়ির ভিতর পচিয়া উঠিল তখন ফেলিয়া দিতে হইল। পৌষপার্বণের সময় হয়তো অপু বাড়ি আসিবে, পিঠা খাইতে ভালোবাসে, নিশ্চয় আসিবে। সর্বজয়া চাল কুটিয়া সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিয়া বসিয়া রহিল—কোথায় অপু?

এক সময় তাহার মনে হয়, অপু আর সে অপু নাই। সে যেন কেমন হইয়া গিয়াছে, কই অনেকদিন তো সে মাকে হুঁ-উ-উ করিয়া ভয় দেখায় নাই, অকারণে আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরে নাই, একোণে ওকোণে লুকাইয়া দুষ্টুমি-ভরা হাসিমুখে উঁকি মারে নাই, যাহা তাহা বলিয়া কথা ঢাকিতে যায় নাই! ভাবিয়া কথা বলিতে শিখিয়াছে—এসব সর্বজয়া পছন্দ করে না। অপুর ছেলেমানুষির জন্য সর্বজয়ার মন তৃষিত হইয়া থাকে, অপু না বাড়ুক, সে সব সময়ে তাহার উপরে একান্ত নির্ভরশীল ছোট্ট খোকাটি হইয়া থাকুক—সবর্জয়া যেন মনে মনে ইহাই চায়। কিন্তু তাহার অপু যে একেবারে বদলাইয়া যাইতেছে!...

অপুর উপর মাঝে মাঝে তাহার অত্যন্ত রাগ হয়। সে কি জানে না—তাহার মা কি রকম ছটফট করিতেছে বাড়িতে! একবারটি কি এতদিনের মধ্যে আসিতে নাই? ছেলেবেলায় সন্ধ্যার পর এ-ঘর হইতে ও-ঘরে যাইতে হইলে মায়ের দরকার হইত, মা খাওয়াইয়া না দিলে খাওয়া হইত না—এই সেদিনও তো। এখন আর মাকে দরকার হয় না—না? বেশ—তাহারও ভাবিবার দায় পড়িয়া গিয়াছে, সে আর ভাবিবে না। বয়স হইয়া আসিল, এখন ইষ্টচিন্তা করিয়া কাল কাটাইবার সময়, ছেলে হইয়া স্বর্গে ধ্বজা তুলিবে কি না!

কিন্তু শীঘ্রই সর্বজয়া আবিষ্কার করিল—ছেলের কথা না ভাবিয়া সে একদণ্ড থাকিতে পারে না। এতদিন সে ছেলের কথা প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তে ভাবিয়া আসিয়াছে। অপুর সহিত অসহযোগ করিলে জীবনটাই যেন ফাঁকা, অর্থহীন, অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়ে—তাহার জীবনে আর কিছুই নাই—এক অপু ছাড়া!...

এক একদিন নির্জন দুপুর বেলা ঘরে বসিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদে।

সে দিন বৈকালে সে ঘরে বসিয়া কার্পাস তুলার বীজ ছাড়াইতেছিল, হঠাৎ সম্মুখের ছোট

ঘুলঘুলি জানালার ফাঁক দিয়া বাড়ির সামনের পথের দিকে তাহার চোখ পড়িল। পথ দিয়া কে যেন যাইতেছে—মাথার চুল ঠিক যেন অপুর মতো, ঘন কালো, বড়ো বড়ো ঢেউখেলানো, সর্বজয়ার মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল—এ অঞ্চলের মধ্যে এ রকম চুল তো কখনও কারও দেখি নি কোনদিন—সেই শত্তুরের মতো চুল অবিকল!...

তাহার মনটা কেমন উদাস অনামনস্ক হইয়া যায়, তুলার বীজ ছাড়াইতে আর আগ্রহ থাকে না।

হঠাৎ ঘরের দরজায় কে যেন টোকা দিল। তখনই আবার মৃদু টোকা। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দোর খুলিয়া ফেলে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারে না।

অপু দুষ্টুমি-ভরা হাসিমুখে দাঁড়াইয়া আছে। নিচু হইয়া প্রণাম করিবার আগেই সর্বজয়া পাগলের মতো ছুটিয়া গিয়া ছেলেকে জড়াইয়া ধরিল।

অপু হাসিয়া বলিল—টের পাও নি তুমি, না মা? আমি ভাবলাম আস্তে আস্তে উঠে দরজায় টোকা দেবো।

সে মাম্‌জোয়ানেব মেলা দেখিতে আসিয়া একবার বাড়িতে না আসিয়া থাকিতে পারে নাই। এত নিকটে আসিয়া মার সঙ্গে দেখা হইবে না! পুলিনের নিকট রেলভাড়া ধার লইয়া তবে আসিয়াছে। একটা পুঁটলি খুলিযা বলিল, তোমার জন্য ছুঁচ আর গুলিসুতো এনেচি—আর এই দ্যাখো কেমন কাঁচা পাঁপর এনেছি মুগের ডালের—সেই কাশীতে তুমি ভেজে দিতে!

অপুর চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। অন্য ধরনের জামা গায়ে—কি সুন্দর মানাইয়াছে! সর্বজয়া বলে, বেশ জামাটা—এবার বুঝি কিনেছিস?

মা'র দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া অপু খুব খুশি। জামাটা ভালো করিয়া দেখাইয়া বলিল—সবাই বলে জামাটার রং চমৎকার হয়েছে—চাঁপাফুলের মতো হবে ধুযে এলে—এই তো মোটে কোরা।

বোর্ডিং-এ গিয়া অপু এই কয় মাস মাস্টার ও ছাত্রদের মধ্যে যাহাকেই মনে মনে প্রশংসা করে, কতকটা নিজের জ্ঞাতসারে কতকটা অজ্ঞাতসারে তাহারই হাবভাব, কথা বলিবাব ভঙ্গি নকল করিয়াছে। সত্যেনবাবুর, রমাপতির, দেবব্রতের, নতুন আঁকের মাস্টারের! সর্বজয়ার যেন অপুকে নতুন নতুন ঠেকে। পুরাতন অপু যেন আর নাই। অপু তো এ রকম মাথা পিছনের দিকে হেলাইয়া কথা বলিত না? সে তো পকেটে হাত পুরিয়া এ ভাবে সোজা হইয়া দাঁড়াইত না?

সন্ধ্যার সময় মায়ের রাঁধিবার স্থানটিতে অপু পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া গল্প করে। সর্বজয়া আজ অনেকদিন পরে রাত্রে রাঁধিতে বসিয়াছে।—সেখানে কত ছেলে একসঙ্গে থাকে? এক ঘরে ক'জন? দু-বেলাই মাছ দেয়? পেট ভরিযা ভাত দেয় তো? কি খাবার খায় সে বৈকালে? কাপড় নিজে কাচিতে হয়? সে তাহা পাবে তো!—পড়াশুনার কথা সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিতে জানে না, শুধু খাওয়াব কথাই জিজ্ঞাসা করে। অপুর হাসিতে, ঘাড় দুলুনিতে, হাত-পা নাড়াতে, ঠোঁটের নিচের ভঙ্গিতে সর্বজয়া আবার পুরানো অপু, চিরপরিচিত অপুকে ফিরিয়া পায়। বুকে চাপিতে ইচ্ছা করে। সে অপুর গল্প শোনে না, শুধু মুখের দিকেই চাহিয়া থাকে।

—হাতে পায়ে বল পেলাম মা, এক এক সময় মনে হত—অপু বলে কেউ ছিল না, ও যেন স্বপ্ন দেখিচি, আবার ভাবতাম—না, সেই চোখ, টুকটুকে ঠোঁট, মুখের তিল—স্বপ্ন নয়, সত্যিই তো—রাঁধতে বসেও কেবল মনে হয় মা, অপুর আসা স্বপ্ন হয় তো, সব মিথ্যে—তাই কেবল ওর মুখেই চেয়ে ঠাউরে দেখি—

অপু চলিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে সর্বজয়া তেলিগিন্নির কাছে গল্প করিয়াছিল।

পরদিনটাও অপু বাড়ি রহিল।

যাইবার সময় মাকে বলিল—মা, আমাকে একটা টাকা দাও না? কতকগুলো ধার আছে এ মাসে, শোধ করব, দেবে?

সর্বজয়ার কাছে টাকা ছিল না, বিশেষ কখনও থাকে না। তেলিরা ও কুণ্ডুরা জিনিসপত্রটা, কাপড়খানা, সিধাটা—এই রকমই দিয়া সাহায্য করে। নগদ টাকাকড়ি কেহ দেয় না। তবু ছেলের পাছে কষ্ট হয় এজন্য সে তেলিগিন্নির নিকট হইতে একটা টাকা ধার করিয়া আনিয়া ছেলের হাতে দিল।

সন্ধ্যার আগে অপু চলিয়া গেল, ক্রোশ দুই দূরে স্টেশন, সন্ধ্যার পরেই ট্রেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৎসর দুই কোথা দিয়া কাটিয়া গেল।

অপু ক্রমেই বড়ো জড়াইয়া পড়িয়াছে, খরচে আয়ে কিছুতেই আর কুলাইতে পারে না। নানাদিকে দেনা—কতভাবে হুঁশিয়ার হইয়াও কিছু হয় না। এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া দুই বেলা খাইল, নিজে সাবান দিয়া কাপড় কাচিল, লজেঞ্চুস ভুলিয়া গেল।

পরদিনই আবার বোর্ডিং-এর ছেলেদের দল চাঁদা করিয়া হালুয়া খাইবে। অপু হাসিমুখে সমীরকে বলিল—দু-আনা ধাব দিবি সমীর, হালুয়া খাবো?—দু-আনা করে চাঁদা—ওই ওবা ওখানে করছে—কিশমিশ দিয়ে বেশ ভালো করে করচে—

সমীরেব কাছে অপুর দেনা অনেক। সমীর পয়সা দিল না।

প্রতিবার বাড়ি হইতে আসিবার সময় সে মায়ের যৎসামান্য আয় হইতে টাকাটা আধুলিটা প্রায়ই চাহিয়া আনে—মা না দিতে চাহিলে রাগ করে, অভিমান করে, সর্বজয়াকে দিতেই হয়।

ইহার মধ্যে আবার পটু মাঝে মাঝে আসিয়া ভাগ বসাইয়া থাকে। সে কিছুই সুবিধা করিতে পারে নাই পড়াশুনার। নানাস্থানে ঘুবিযাছে, ভগ্নিপতি অর্জুন চক্রবর্তী তো তাহাকে বাড়ি ঢুকিতে দেয না। বিনিকে এ সব লইয়া কম গঞ্জনা সহ্য করিতে হয় নাই বা কম চোখের জল ফেলিতে হয নাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পটু নিরাশ্রয় ও নিরবলম্ব অবস্থায় পথে পথেই ঘোরে, যদিও পড়াশুনাব আশা সে এখনও অবধি ছাড়ে নাই। অপু তাহার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সুবিধা করিতে পাবে নাই। দু-তিন মাস হয়তো দেখা নাই, হঠাৎ একদিন কোথা হইতে পুঁটলি বগলে করিয়া পটু আসিয়া হাজির হয়, অপু তাহাকে যত্ন করিয়া বাখে, তিন-চারদিন ছাড়ে না, সে না চাহিলেও যখন যাহা পাবে হাতে গুঁজিয়া দেয়—টাকা পারে না, সিকিটা দুয়ানিটা। পটু নিশ্চিন্দিপুরে আর যায না—তাহার বাবা সম্প্রতি মাবা গিয়াছেন—সৎমা দেশের বাড়িতে তাঁহার দুই মেয়ে লইয়া থাকেন, সেখানে ভাই বোন কেহই আর যায় না। পটুকে দেখিলে অপুর ভাবি একটা সহানুভূতি হয়, কিন্তু ভালো কবিবার তাহাব হাতে আর কি ক্ষমতা আছে?

একদিন রাসবিহারী আসিয়া দু-আনা পয়সা ধার চাহিল। রাসবিহারী গরিবের ছেলে, তাহা ছাড়া পড়াশুনায় ভালো নয় বলিয়া বোর্ডিং-এ খাতিরও পায না। অপুকে সবাই দলে নেয়, পয়সা দিতে না পারিলেও নেয়। কিন্তু তাহাকে পোঁছেও না। অপু এ সব জানিত বলিয়াই তাহাব উপর কেমন একটা করুণা। কিন্তু আজ সে নানা কারণে রাসবিহারীর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। বলিল, আমি কোথায় পাবো পয়সা?—আমি কি টাকার গাছ?—দিতে পারবো না যাও।—রাসবিহারী পীড়াপীড়ি শুরু করিল। কিন্তু অপু একেবারে বাঁকিয়া বসিল। বলিল, কক্ষনো দেবো না তোমায়—যা পারো করো।

রমাপতির কাছে ছেলেদের একখানা মাসিক পত্র আসে, তাহাতে সে একদিন 'ছায়াপথ' সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়িল। 'ছায়াপথ' কাহাকে বলে ইহার আগে জানিত না—এতবড় বিশাল কোন জিনিসের ধারণাও কখনও করে নাই—নক্ষত্রের সম্বন্ধেও কিছু জানা ছিল না। শরতের আকাশ রাত্রে

মেঘমুক্ত—বোর্ডিং-এর পিছনে খেলার কম্পাউন্ডে রাত্রে দাঁড়াইয়া ছায়াপথটা প্রথম দেখিয়া সে কী আনন্দ! জ্বলজ্বলে সাদা ছায়াপথটা কালো আকাশের বুক চিরিয়া কোথা হইতে কোথায় গিয়াছে—শুধু নক্ষত্রে ভরা!...

কাঁঠাল-তলাটায় দাঁড়াইয়া সে কতক্ষণ মুগ্ধনেত্রে আকাশের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—নবজাগ্রত মনের প্রথম বিস্ময়!...

পৌষ মাসের প্রথমে অপুর নিজের একটু সুবিধা ঘটিল। নতুন ডেপুটিবাবুর বাসাতে ছেলেদের জন্য একজন পড়াইবার লোক চাই। হেডপণ্ডিত তাহাকে ঠিক করিয়া দিলেন। দুটি ছেলে পড়ানো, থাকা ও খাওয়া।

দুই-তিনদিনের মধ্যেই বোর্ডিং হইতে বাসা উঠাইয়া অপু সেখানে গেল। বোর্ডিং-এ অনেক বাকি পড়িয়াছে, সুপারিন্টেন্ডেন্ট তলে তলে হেডমাস্টারের কাছে এসব কথা রিপোর্ট করিয়াছেন, যদিও অপু তাহা জানে না।

বাহিরের ঘরে থাকিবার জায়গা স্থির হইল। বিছানাপত্র গুছাইয়া পাতিয়া লইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যার পরে খানিকটা বেড়াইয়া আসিয়া রাঁধুনী ঠাকুরের ডাকে বাড়ির মধ্যে খাইতে গেল। দালানে ঘাড় গুঁজিয়া খাইতে খাইতে তাহার মনে হইল—একজন কে পাশের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ হইতে তাহার খাওয়া দেখিতেছেন। একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিতে তিনি সরিয়া আসিলেন। খুব সুন্দরী মহিলা, তাহার মায়ের অপেক্ষাও বয়স অনেক—অনেক কম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার বাড়ি কোথায়?

অপু ঘাড় না তুলিয়া বলিল, মনসাপোতা—অনেক দূর এখেন থেকে—

—বাড়িতে কে কে আছেন?

—শুধু মা আছেন, আর কেউ না।

—তোমার বাবা বুঝি—ভাই বোন ক'টি তোমরা?

—এখন আমি একা। আমার দিদি ছিল—সে সাত-আট বছর হল মারা গিয়েচে।—

কোনোরকমে তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া সে উঠিয়া আসিল। শীতকালেও সে যেন ঘামিয়া উঠিয়াছে।

পরদিন সকালে অপু বাড়ির ভিতর হইতে খাইয়া আসিয়া দেখিল, বছর তেরো বয়সের একটি সুন্দরী মেয়ে ছোট্ট একটি খোকার হাত ধরিয়া বাহিরের ঘরে দাঁড়াইয়া আছে। অপু বুঝিল—সে কাল রাত্রের পরিচিতা মহিলাটির মেয়ে। অপু আপন মনে বই গুছাইয়া স্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল, মেয়েটি একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ অপুর ইচ্ছা হইল, এ মেয়েটির সামনে কিছু পৌরুষ দেখাইবে—কেহ তাহাকে বলিয়া দেয় নাই, শিখায় নাই, আপনাআপনি তাহার মনে হইল। হাতের কাছে অন্য কিছু না পাইয়া সে নিজের অঙ্কের ইনস্ট্রুমেন্ট বাক্সটা বিনা কারণে খুলিয়া প্রোটেক্টর, সেট্‌স্কোয়ার, কম্পাসগুলোকে বিছানার উপর ছড়াইয়া ফেলিয়া পুনরায় সেগুলো বাক্সে সাজাইতে লাগিল। কি জানি কেন অপুর মনে হইল, এই ব্যাপারেই তাহার চরম পৌরুষ দেখানো হইবে। মেয়েটি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, কোনো কথা বলিল না, অপুও কোনো কথা বলিল না।

আলাপ হইল সেদিন সন্ধ্যায়। সে স্কুল হইতে আসিয়া সবে দাঁড়াইয়াছে, মেয়েটি আসিয়া লাজুক চোখে বলিল—আপনাকে মা খাবার খেতে ডাকছেন।

আসন পাতা—পরোটা, বেগুন ভাজা, আলুচচ্চড়ি, চিনি। অপু চিনি পছন্দ করে না, গুড়ের মতো জিনিস নাই, কেন ইহারা এমন সুন্দর গরম গরম পরোটা চিনি দিয়া খায়?...

মেয়েটি কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল—মাকে বলব আর দিতে?

—না; তোমরা চিনি খাও কেন?...গুড় তো ভালো—

মেয়েটি বিস্মিতমুখে বলিল—কেন, আপনি চিনি খান না?

—ভালোবাসি নে—রুগীর খাবার—খেজুর গুড়ের মতো কি আর খেতে ভালো?—মেয়েটির সামনে তাহার আদৌ লজ্জা ছিল না, কিন্তু এই সময়ে মহিলাটি ঘরে ঢোকাতে অপুর লম্বা লম্বা কথা বন্ধ হইয়া গেল। মহিলাটি বলিলেন—ওকে দাদা বলে ডাকবি নির্মলা, কাছে বসে খাওয়াতে হবে রোজ। ও দেখছি যে-রকম লাজুক, এ পর্যন্ত তো আমার সঙ্গে একটা কথাও বললে না—না দেখলে আধপেটা খেয়ে উঠে যাবে।

অপু লজ্জিত হইল। মনে মনে ভাবিল ইঁহাকে সে মা বলিয়া ডাকিবে। কিন্তু লজ্জায় পারিল না, সুযোগ কোথায়? এমনি খামকা মা বলিয়া ডাকা—সে বড়ো—সে তাহা পারিবে না।

মাসখানেক ইহাদের বাড়ি থাকিতে থাকিতে অপুর কতকগুলি নতুন বিষয়ে জ্ঞান হইল। সবাই ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আটপৌরে পোশাক-পরিচ্ছদও সুদৃশ্য ও সুরুচিসম্মত। মেয়েদের শাড়ি পরিবার ধরনটি বেশ লাগে, একে সবাই দেখিতে সুশ্রী, তাহার উপর সুদৃশ্য শাড়ি-সেমিজে আরও সুন্দর দেখায়। এই জিনিসটা অপু কখনও জানিত না, বড়োলোকের বাড়ি থাকিবার সময়ও নহে, কারণ সেখানে ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে তাহার অনভ্যস্ত চক্ষু ধাঁধিয়া গিয়াছিল—সহজ গৃহস্থ জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপারের পর্যায়ে তাহাকে সে ফেলিতে পারে নাই।

অপু যে-সমাজ, যে-আবহাওয়ায় মানুষ—সেখানকার কেহ এ ধরনের সহজ সৌন্দর্যময় জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নয়। নানা জায়গায় বেড়াইয়া নানা ধরনের লোকের সঙ্গে মিশিয়া তাহার আজকাল চোখ ফুটিয়াছে; সে আজকাল বুঝিতে পারে নিশ্চিন্দিপুরে তাহাদের গৃহস্থালি ছিল দরিদ্রের, অতি দরিদ্রের গৃহস্থালি। শিল্প নয়, শ্রী ছাঁদ নয়, সৌন্দর্য নয়, শুধু খাওয়া আর থাকা।

নির্মলা আসিয়া কাছে বসিল। অপু অ্যালজেব্রার শক্ত আঁক কষিতেছিল, নির্মলা নিজের বইখানা খুলিয়া বলিল—আমায় ইংরেজিটা একটু বলে দেবেন দাদা?

অপু বলিল—এসে জুটলে? এখন ওসব হবে না, ভারি মুশকিল, একটা আঁকও সকাল থেকে মিলল না!

নির্মলা নিজে বসিয়া পড়িতে লাগিল। সে বেশ ইংরেজি জানে, তাহার বাবা যত্ন করিয়া শিখাইয়াছেন, বাংলাও খুব ভালো জানে।

একটু পড়িয়াই সে বইখানা বন্ধ করিয়া অপুর আঁক কষা দেখিতে লাগিল। খানিকটা আপন মনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর আর একবার ঝুঁকিয়া দেখিয়া অপুর কাঁধে হাত দিয়া ডাকিয়া বলিল—এদিকে ফিরুন দাদা, আচ্ছা এই পদ্যটা মিলিয়ে—

অপু বলিল—যাও! আমি জানি নে, ওই তো তোমার দোষ নির্মলা, আঁক মিলছে না, এখন তোমার পদ্য মেলাবার সময়—আচ্ছা লোক—

নির্মলা মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল—এ পদ্যটা আর মেলাতে হয় না আপনার—বলুন দিকি—সেই গাছ গাছ নয়, যাতে নেই ফল—

অপু আঁক-কষা ছাড়িয়া বলিল—মিলবে না? আচ্ছা দ্যাখো—পরে খানিকটা আপন মনে ভাবিয়া বলিল—সেই লোক লোক নয়, যার নেই বল—হল না?

নির্মলা লাইন দুটি আপন মনে আবৃত্তি করিয়া বুঝিয়া দেখিল কোথায়ও কানে বাধিতেছে কি না। ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আচ্ছা এবার বলুন তো আর একটা—

—আমি আর বলব না—তুমি ওরকম দুষ্টুমি করো কেন? আমি আঁকগুলো কষে নিই, তারপর যত ইচ্ছা পদ্য মিলিয়ে দেবো—

—আচ্ছা এই একটা—সেই ফুল ফুল নয়, যার—

—মাকে এখুনি উঠে গিয়ে বলে আসবো, নির্মলা—ঠিক বলছি, ওরকম যদি—

নির্মলা রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। যাইবার সময় পিছন ফিরিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—ওবেলা কে খাবার বয়ে আনে বাইরের ঘরে দেখবো—

এরকম প্রায়ই হয়, অপু ইহাতে ভয় পায় না। বেশ লাগে নির্মলাকে।

পূজার পর নির্মলার এক মামা বেড়াইতে আসিলেন। অপু শুনিল, তিনি নাকি বিলাতফেরত—নির্মলার ছোট ভাই নন্তুর নিকট কথাটা শুনিল। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি নয়, রোগা শ্যামবর্ণ। এ লোক বিলাতফেরত!

বাল্যে নদীর ধারে ছায়াময় বৈকালে পুরাতন 'বঙ্গবাসী'তে পড়া সেই বিলাতযাত্রীর চিঠির মধ্যে পঠিত আনন্দভরা পুরাতন পথ বাহিয়া মরুভূমির পার্শ্বের সুয়েজ খালের ভিতর দিয়া, নীল ভূমধ্যসাগরমধ্যস্থ দ্রাক্ষাকুঞ্জবেষ্টিত কর্সিকা দূরে ফেলিয়া সেই মধুর স্বপ্নমাখা পথ-যাত্রা।

এই লোকটা সেখানে গিয়াছিল? এই নিতান্ত সাধারণ ধরনের মানুষটা—যে দিব্য নিরীহমুখে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া মোচার ঘণ্ট দিয়া ভাত খাইতেছে!

দু-এক দিনেই নির্মলার মামা অমরবাবুর সহিত তাহার খুব আলাপ হইয়া গেল।

বিলাতের কত কথা সে জানিতে চায়। পথের ধারে সেখানে কি সব গাছপালা? আমাদের দেশের পরিচিত কোন্ গাছ সেখানে আছে? প্যারিস খুব বড়ো শহর? অমরবাবু নেপোলিয়নের সমাধি দেখিয়াছেন? ডোভারের খড়ির পাহাড়? ব্রিটিশ মিউজিয়ামে নাকি নানা অদ্ভুত জিনিস আছে—কি কি? আর ভেনিস?—ইতালির আকাশ নাকি দেখিতে অপূর্ব?

পাড়াগাঁয়ের স্কুলের ছেলে, এত সব কথা জানিবার কৌতূহল হইল কি করিয়া অমরবাবু বুঝিতে পারেন না। এত আগ্রহ করিয়া শুনিবার মতো জিনিস সেখানে কি আর আছে! একঘেয়ে—ধোঁয়া—বৃষ্টি—শীত। তিনি পয়সা খরচ করিয়া সেখানে গিয়াছিলেন সাবান প্রস্তুত প্রণালী শিখিবার জন্য, পথের ধারের গাছপালা দেখিতে যান নাই বা ইতালির আকাশের রং লক্ষ করিয়া দেখিবার উপযুক্ত সময়ের প্রাচুর্যও তাঁর ছিল না।

নির্মলাকে অপুর ভালো লাগে, কিন্তু সে তাহা দেখাইতে জানে না। পরের বাড়ি বলিয়াই হউক বা একটু লাজুক প্রকৃতির বলিয়াই হউক, সে বাহিরের ঘরে শান্তভাবে বাস করে—কি তাহার অভাব, কোন্‌টা তাহার দরকার, সে কথা কাহাকেও জানায় না। অপুর এই উদাসীনতা নির্মলার বড়ো বাজে, তবুও সে না চাহিতেই নির্মলা তাহার ময়লা বালিশের ওয়াড় সাবান দিয়া নিজে কাচিয়া দিয়া যায়, গামছা পরিষ্কার করিয়া দেয়, ছেঁড়া কাপড় বাড়ির মধ্যে লইয়া গিয়া মাকে দিয়া সেলাইয়ের কলে সেলাই করিয়া আনিয়া দেয়। নির্মলা চায় অপূর্ব-দাদা তাহাকে ফাই-ফরমাশ করে, তাহার প্রতি হুকুমজারি করে; কিন্তু অপু কাহারও উপর কোনো হুকুম কোনোদিন করিতে জানে না—এক মা ছাড়া। দিদি ও মায়ের সেবায় সে অভ্যস্ত বটে, তাও সে-সেবা অযাচিতভাবে পাওয়া যাইত তাই। নইলে অপু কখনও হুকুম করিয়া সেবা আদায় করিতে শিখে নাই। তা ছাড়া সে সমাজের যে স্তরের মধ্যে মানুষ, ডেপুটিবাবুরা সেখানকার চোখে ব্রহ্মলোকবাসী দেবতার সমকক্ষ জীব। নির্মলা ডেপুটিবাবুর বড়ো মেয়ে—রূপে, বেশভূষায়, পড়াশুনায়, কথাবার্তায় একমাত্র লীলা ছাড়া সে এ পর্যন্ত যত মেয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছে—সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে কি করিয়া নির্মলার উপর হুকুমজারি করিবে? নির্মলা তাহা বোঝে না—সে দাদা বলিয়া ডাকে, অপুর প্রতি একটা আন্তরিক টানের পরিচয় তাহার প্রতি কাজে—কেন অপূর্ব-দাদা তাহাকে প্রাণপণে খাটাইয়া লয় না, নিষ্ঠুরভাবে অযথা ফাইফরমাশ করে না? তাহা হইলে সে খুশি হইত।

চৈত্র মাসের শেষে একদিন ফুটবল খেলিতে খেলিতে অপুর হাঁটুটা কি ভাবে মচকাইয়া গিয়া সে মাঠে পড়িয়া গেল। সঙ্গীরা তাহাকে ধরাধরি করিয়া আনিয়া ডেপুটিবাবুর বাসায় দিয়া গেল। নির্মলার মা ব্যস্ত হইয়া বাহিরের ঘরে আসিলেন, কাছে গিয়া বলিলেন—দেখি দেখি, কি হয়েছে? অপুর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুন্দর মুখ ঘামে ও যন্ত্রণায় রাঙা হইয়া গিয়াছে, ডান পা-খানা সোজা করিতে পারিতেছে না। মনিয়া চাকর নির্মলার মা'র স্লিপ লইয়া ডাক্তারখানায় ছুটিল। নির্মলা বাড়ি ছিল না, ভাইবোনদের লইয়া গাড়ি করিয়া মুন্সেফবাবুর বাসায় বেড়াইতে গিয়াছিল। একটু পরে সরকারি

ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। সন্ধ্যার আগে নির্মলা আসিল। সব শুনিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বলিল—কই দেখি, বেশ হয়েছে—দস্যিবৃত্তি করার ফল হবে না? ভারি খুশি হয়েছি আমি—

নির্মলা কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। অপু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া ভাবিল—যাক না, আর কখনও যদি কথা কই—

আধ ঘণ্টা পরেই নির্মলা আসিয়া হাজির। কৌতুকের সুরে বলিল—পায়ের ব্যথা-ট্যথা জানি নে, গরম জল আনতে বলে দিয়ে এলাম, এমন করে সেঁক দেবো—লাগে তো লাগবে—দুষ্টুমি করার বাহাদুরি বেরিয়ে যাবে—কমলালেবু খাবেন একটা?—না, তাও না?

মনিয়া চাকর গরম জল আনিলে নির্মলা অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া ব্যথার উপর সেঁক দিল, নির্মলার ভাইবোনেরা সব দেখিতে আসিয়া ধরিল—ও দাদা, এইবার একটা গল্প বলুন না।

অপুর মুখে গল্প শুনিতে সবাই ভালোবাসে।

নির্মলা বলিল—হ্যাঁ, দাদা এখন পাশ ফিরে শুতে পারছেন না—এখন গল্প না বললে চলবে কেন?...চুপ করে বসে থাকো সব—নয়তো বাড়ির মধ্যে পাঠিয়ে দোব।

পরদিন সকালটা নির্মলা আসিল না। দুপুরের পর আসিয়া বৈকাল পর্যন্ত বসিয়া নানা গল্প করিল, বই পড়িয়া শুনাইল। বাড়ির ভিতর হইতে থালায় করিয়া আখ ও শাঁখ-আলু কাটিয়া লইয়া আসিল। তাহার পর তাহাদের পদ্যমেলানোর আর অন্ত নাই! নির্মলার পদটি মিলাইয়া দিয়াই অপু তাহাকে আর একটা পদ মিলাইতে বলে—নির্মলাও অল্প কয়েক মিনিটে তাহার জবাব দিয়া অন্য একটা প্রশ্ন করে। ...কেহ কাহাকেও ঠকাইতে পারে না।

ডেপুটিবাবুর স্ত্রী একবার বাহিরের ঘরে আসিতে আসিতে শুনিয়া বলিলেন—বেশ হয়েছে, আর ভাবনা নেই—এখন তোমরা দু-ভাইবোনে একটা কবির দল খুলে দেশে দেশে বেড়িয়ে বেড়াও গিয়ে—

অপু লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। ডেপুটিবাবুর স্ত্রীর বড়ো সাধ অপু তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকে। সে যে আড়ালে তাঁহাকে মা বলে, তাহা তিনি জানেন—কিন্তু সামনাসামনি অপু কখনও তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকে নাই, এজন্য ডেপুটিবাবুর স্ত্রী খুব দুঃখিত।

অপু যে ইচ্ছা করিয়া করে না তাহা নহে। ডেপুটিবাবুর বাসায় থাকিবার কথা একবার সে বাড়িতে গিয়া মায়ের কাছে গল্প করাতে সর্বজয়া ভারি খুশি হইয়াছিল। ডেপুটিবাবুর বাড়ি! কম কথা নয়!...সেখানে কি করিয়া থাকিতে হইবে, চলিতে হইবে সে বিষয়ে ছেলেকে নানা উপদেশ দিয়া অবশেষে বলিয়াছিল—ডেপুটিবাবুর বউকে মা বলে ডাকবি—আর ডেপুটিবাবুকে বাবা বলে ডাকবি—

অপু লজ্জিত মুখে বলিয়াছিল—হ্যাঁ, আমি ওসব পারবো না—

সর্বজয়া বলিয়াছিল—তাতে দোষ কি?—বলিস, তাঁরা খুশি হবেন—কম একটা বড়োলোকের আশ্রয় তো নয়!—তাহার কাছে সবাই বড়ো মানুষ।

অপু তখন মায়ের নিকট রাজি হইয়া আসিলেও এখানে তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারে নাই। মুখে কেমন বাধে, লজ্জা করে।

একদিন—অপু তখন একমাস হইল সারিয়া উঠিয়াছে—নির্মলা বাহিরের ঘরে চেয়ারে বসিয়া কি বই পড়িতেছিল, ঘোর বর্ষা সারা দিনটা, বেলা বেশি নাই—বৃষ্টি একটু কমিয়াছে। অপু বিনা ছাতায় কোথা হইতে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া দৌড়াইয়া ঘরে ঢুকিতেই নির্মলা বই মুড়িয়া বলিয়া উঠিল—এঃ, আপনি যে দাদা ভিজে একেবারে—

অপুর মনে যে জন্যই হউক খুব স্ফূর্তি ছিল—তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—চট্ করে চা আর খাবার—তিন মিনিটে—

নির্মলা বিস্মিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দিত হইল। এ রকম তো কখনও হুকুমের সুরে অপূর্বদা বলে না! সে হাসিমুখে মুখ টিপিয়া বলিল—পারব না তিন মিনিটে—ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলেন কিনা একেবারে!

অপু হাসিয়া বলিল—আর তো বেশিদিন না—আর তিনটি মাস তোমাদের জ্বালাবো, তারপব চলে যাচ্ছি—

নির্মলার মুখ হইতে হাসি মিলাইয়া গেল। বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোথায় যাবেন!

—তিন মাস পরেই এগজামিন—দিয়েই চলে যাবো, কলকাতায় পড়বো পাস হলে—

নির্মলা এতদিন সম্ভবত এটা ভাবিয়া দেখে নাই, বলিল—আর এখানে থাকবেন না?

অপু ঘাড় নাড়িল। খানিকটা থামিয়া কৌতুকের সুরে বলিল—তুমি তো বাঁচো, যে খাটুনি—তোমার তো ভালো—ওকি? বা রে—কি হলো—শোন নির্মলা—

হঠাৎ নির্মলা উঠিয়া গেল কেন—চোখে কি কথায় তাহার এত জল আসিয়া পড়িল, বুঝিতে না পারিয়া সে মনে মনে অনুতপ্ত হইল। আপন মনে বলিল—আর ওকে ক্ষ্যাপাবো না—ভারী পাগল—আহা, ওকে সব সময় খোঁচা দিই—সোজা খেটেছে ও, যখন পা ভেঙে পড়েছিলাম পনেরো দিন ধরে, জানতে দেয় নি যে আমি নিজের বাড়িতে নেই—

ইহার মধ্যে আবার একদিন পটু আসিল। ডেপুটিবাবুর বাসাতে অপু উঠিয়া আসিবার পর সে কখনও আসে নাই। খানিকটা ইতস্তত করিয়া বাসায় ঢুকিল। এক-পা ধুলা, রুক্ষ চুল, হাতে পুঁটুলি। সে কোন সুবিধা খুঁজিতে আসে নাই, এদিকে আসিলে অপুর সঙ্গে দেখা না করিয়া সে যাইতে পারে না। পটুর মুখে অনেক দিন পর সে রানুদির খবর পাইল। পাড়াগাঁয়ের নিঃসহায় নিরুপায় ছেলেদের অভ্যাসমতো সে গ্রামের যত মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি ঘুরিয়া বেড়ানো শুরু করিয়াছে। বাপেব বাড়ির লোক, অনেকের হয়তো বা খেলার সঙ্গী, মেয়েরা আগ্রহ করিয়া রাখে, ছাড়িয়া দিতে চাহে না, যে কয়টা দিন থাকে খাওয়া সম্বন্ধে নির্ভাবনা। কোন স্থানে দু-দিন, কোথাও পাঁচদিন—মেয়েরা আবার আসিতে বলে, যাবার সময় খাবার তৈয়ারি করিয়া সঙ্গে দেয়। এ এক ব্যবসা পটু ধরিযাছে মন্দ নয়—ইহার মধ্যে সে তাহাদের পাড়ার সব মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে দু-চার বার ঘুরিয়া আসিযাছে।

এইভাবেই একদিন রানুদির শ্বশুববাড়ি সে গিয়াছে—সে গল্প কবিল। রানুদিব শ্বশুরবাড়ি রানাঘাটের কাছে—তাঁহারা পশ্চিমে কোথায় চাকুরি উপলক্ষে থাকেন—পূজার সময় বাড়ি আসিয়াছিলেন, সপ্তমী পূজার দিন অনাহূতভাবে পটু গিযা হাজির। সেখানে আট দিন ছিল। রানুদিব যত্ন কি! তাহার দুরবস্থা শুনিয়া গোপনে তিনটা টাকা দিয়াছিল, আসিবার সময় নতুন ধুতি চাদর, এক পুঁটুলি বাসি লুচি সন্দেশ।

অপু বলিল—আমার কথা কিছু বললে না?

—শুধুই তোর কথা। যে কয়দিন ছিলাম, সকালে সন্ধ্যাতে তোর কথা! তারা আবার একাদশীর দিনই পশ্চিমে চলে যাবে, আমাকে রানুদি বললে, ভাড়ার টাকা দিচ্ছি, তাকে একবার নিয়ে আয় এখানে—ছ'বচ্ছব দেখা হয় নি—তা আমার আবার জ্বর হল—দিদির বাড়ি এসে দশ-বারোদিন পড়ে রইলাম—তোর ওখানে আর যাওয়া হল না—ওরাও চলে গেল পশ্চিমে—

—ভাড়ার টাকা দেয় নি?

পটু লজ্জিত মুখে বলিল—হ্যাঁ, তোর আর আমার যাতায়াতের ভাড়া হিসেব করে—সেও খরচ হয়ে গেল, দিদি কোথায় আর পাবে, আমার সেই ভাড়ার টাকা থেকে নেবু ডালিম ওষুধ—সব হল। রানুদির মতন অমন মেয়ে আর দেখি নি অপুদা, তোর কথা বলতে তার চোখে জল পড়ে।

হঠাৎ অপুর গলা যেন কেমন আড়ষ্ট হইয়া উঠিল—সে তাড়াতাড়ি কি দেখিবার ভান করিয়া জানালার বাহিরের দিকে চাহিল।

—শুধু রানুদি না, যত মেয়ের শ্বশুরবাড়ি গেলাম, রানীদি, আশালতা, ওপাড়ার সুনয়নীদি—সবাই তোর কথা আগে জিজ্ঞেস করে—

ঘণ্টা দুই থাকিয়া পটু চলিয়া গেল।

দেওয়ানপুর স্কুলেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা গৃহীত হয়। খরচ-পত্র করিয়া কোথাও যাইতে হইল না। পরীক্ষার পর হেডমাস্টার মিঃ দত্ত অপুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন—বাড়ি যাবে কবে?

এই কয় বৎসরে হেডমাস্টারের সঙ্গে তাহার কেমন একটা নিবিড় সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে, দু-জনের কেহই এতদিনে জানিতে পারে নাই সে বন্ধন কতটা দৃঢ়।

অপু বলিল—সামনের বুধবার যাব ভাবছি।

—পাশ হলে কি করবে ভাবছো? কলেজে পড়বে তো?

—কলেজে পড়বার খুব ইচ্ছে, স্যর।

—যদি স্কলারশিপ না পাও?

অপু মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া থাকে।

—ভগবানের ওপর নির্ভর করে চলো, সব ঠিক হয়ে যাবে। দাঁড়াও, বাইবেলের একটা জায়গা পড়ে শোনাই তোমাকে—

মিঃ দত্ত খ্রিস্টান। ক্লাসে কতদিন বাইবেল খুলিয়া চমৎকার চমৎকার উক্তি তাহাদের পড়িয়া শুনাইয়াছেন, অপুর তরুণ-মনে বুদ্ধদেবের পীতবাসধারী সৌম্যমূর্তির পাশে, তাহাদের গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষীর পাশে, বোষ্টমদাদু নরোত্তম দাসের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের পাশে, দীর্ঘদেহ শান্তনয়ন যীশুর মূর্তি কোন্ কালে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল—তাহার মন যীশুকে বর্জন করে নাই, কাঁটার মুকুটপরা, লাঞ্ছিত, অপমানিত এক দেবোন্মাদ যুবককে মনেপ্রাণে বরণ করিতে শিখিয়াছিল।

মিঃ দত্ত বলিলেন—কলকাতাতেই পড়ো—অনেক জিনিস দেখবার শেখবার আছে—কোন কোন পাড়াগাঁয়ের কলেজে খরচ কম পড়ে বটে কিন্তু সেখানে মন বড়ো হয় না, চোখ ফোটে না, আমি কলকাতাকেই ভালো বলি।

অপু অনেকদিন হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, কলেজে পড়িবে এবং কলিকাতার কলেজেই পড়িবে।

মিঃ দত্ত বলিলেন—স্কুল লাইব্রেরির ‘লে মিজারেবল’-খানা তুমি খুব ভালোবাসতে—ওখানা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, আমি আর একখানা কিনে নেবো।

অপু বেশি কথা বলিতে জানে না—এখনও পারিল না— মুখচোরার মতো খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া হেডমাস্টারের পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

হেডমাস্টারের মনে হইল—তাঁহার দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের শিক্ষকজীবনে এ রকম আর কোন ছেলের সংস্পর্শে তিনি কখনও আসেন নাই।—ভাবময়, স্বপ্নদর্শী বালক, জগতে সহায়হীন, সম্পদহীন! হয়তো একটু নির্বোধ, একটু অপরিণামদর্শী—কিন্তু উদার, সরল, নিষ্পাপ, জ্ঞান-পিপাসু ও জিজ্ঞাসু। মনে মনে তিনি বালকটিকে বড়ো ভালোবাসিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনে এই একটি আসিয়াছিল, চলিয়া গেল। ক্লাসে পড়াইবার সময় ইহার কৌতূহলী ডাগর চোখ ও আগ্রহোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া ইংরেজির ঘণ্টায় কত নতুন কথা, কত গল্প, ইতিহাসের কাহিনী বলিয়া যাইতেন—ইহার নীরব, জিজ্ঞাসু চোখ দুটি তাঁহার নিকট হইতে যেরূপ জোর করিয়া পাঠ আদায় করিয়া লইয়াছে, সেরূপ আর কেহ পারে নাই, সে প্রেরণা সহজলভ্য নয়, তিনি তাহা জানেন।

গত চার বৎসরের স্মৃতি-জড়ানো দেওয়ানপুর হইতে বিদায় লইবার সময়ে অপুর মন ভালো ছিল না। দেবব্রত বলিল—তুমি চলে গেলে অপূর্বদা, এবার পড়া ছেড়ে দেবো।

নির্মলার সঙ্গে বাহিরের ঘরে দেখা। ফাল্গুন মাসের অপূর্ব অদ্ভুত দিনগুলি। বাতাসে কিসের যেন মৃদু স্নিগ্ধ, অনির্দেশ্য সুগন্ধ। আমের বউলের সুবাস সকালের রৌদ্রকে যেন মাতাল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু অপুর আনন্দ সে-সব হইতে আসে নাই—গত কয়েকদিন ধরিয়া সে রাইডার হ্যাগার্ডের 'ক্লিওপেট্রা' পড়িতেছিল। তাহার তরুণ কল্পনাকে অদ্ভুতভাবে নাড়া দিয়াছে বইখানা। কোথায় এই হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন সমাধি—জ্যোৎস্নাভরা নীলনদ, বিস্মৃত 'রা' দেবের মন্দির!—ঔপন্যাসিক হ্যাগার্ডের স্থান সমালোচকের মতে যেখানেই নির্দিষ্ট হউক তাহাতে আসে যায় না—তাহার নবীন, অবিকৃত মন একদিন যে গভীর আনন্দ পাইয়াছিল বইখানা হইতে—এইটাই বড়ো কথা তাহার কাছে।

নির্মলার সহিত দেখা অপুর মনের সেই অবস্থায়,—অপ্রকৃতিস্থ, মত্ত, রঙিন—সে তখন শুধু একটা সুপ্রাচীন রহস্যময়, অধুনালুপ্ত জাতির দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! ক্লিওপেট্রা? হউন তিনি সুন্দরী—তাঁহাকে সে গ্রাহ্য করে না! পিরামিডের অন্ধকার গর্ভগৃহে বহু হাজার বৎসরের সুপ্তি ভাঙিয়া সম্রাট মেঙ্কাউরা গ্রানাইট পাথরের সমাধি-সিন্দুকে যখন রোষে পার্শ্বপরিবর্তন করেন—মনুষ্য সৃষ্টির পূর্বেকার জনহীন আদিম পৃথিবীর নীরবতার মধ্যে শুধু সিহোর নদী লিবিয়া মরুভূমির বুকের উপর দিয়া বহিয়া যায়—অপূর্ব রহস্যে ভরা মিশর! অদ্ভুত নিয়তির অকাট্য লিপি! তাহার মন সারা দুপুর আর কিছু ভাবিতে চায় না।

গরম বাতাসে দমকা ধুলাবালি উড়াইয়া আনিতেছিল বলিযা অপু দরজা ভেজাইয়া বসিয়া ছিল, নির্মলা দরজা ঠেলিয়া ঘরে আসিল। অপু বলিল—এসো এসো, আজ সকালে তো তোমাদেব স্কুলে প্রাইজ হল—কে প্রাইজ দিলেন—মুন্সেফবাবুর স্ত্রী, না? ওই মোটামতো যিনি গাড়ি থেকে নামলেন, উনিই তো?

—আপনি বুঝি ওদিকে ছিলেন তখন? মাগো, কি মোটা?—আমি তো কখনও—পরে হঠাৎ যেন মনে পড়িল এইভাবে বলিল, তারপর আপনি তো যাবেন আজ, না দাদা?

—হ্যাঁ, দুটোর গাড়িতে যাব—রামধারিয়াকে একটু ডেকে নিয়ে এসো তো—জিনিসপত্তরগুলো একটু বেঁধে দেবে।

—রামধারিয়া কি আপনার চিরকাল করে দিয়ে এসেছে নাকি? কই, কি জিনিস আগে বলুন না।

দুইজনে মিলিয়া বইয়ের ধুলা ঝাড়িয়া গোছানো, বিছানা বাঁধা চলিল। নির্মলা অপুর ছোট টিনের তোরঙ্গটা খুলিয়া বলিল—মাগো! কি করে রেখেছেন বাক্সটা! কাপড়ে, কাগজে, বইয়ে হান্ডুল পান্ডুল—আচ্ছা এত বাজে কাগজ কি হবে দাদা? ফেলে দেবো?...

অপু বলিয়া উঠিল—হাঁ হাঁ—না না—ওসব ফেলো না।

সে আজ দুই-তিন বছরের চিঠি, নানা সময়ে নানা কথা লেখা কাগজের টুকরা সব জমাইয়া রাখিয়াছে। অনেক স্মৃতি জড়ানো সেগুলির সঙ্গে, পুরাতন সময়কে আবার ফিরাইয়া আনে—সেগুলি প্রাণ ধরিয়া অপু ফেলিয়া দিতে পারে না। কবে কোন্ কালে তাহার দিদি দুর্গা নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে আদর করিয়া তাহাকে কোন্ বন হইতে একটা পাখির বাসা আনিয়া দিয়াছিল, কতকালের কথা,—বাসাটা সে আজও বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে—বাবার হাতের লেখা একখানা কাগজ—আর কত কি।

নির্মলা বলিল—এ কি! আপনার মোটে দুখানা কাপড়, আর জামা নেই?

অপু হাসিয়া বলিল—পয়সাই নেই হাতে ও জামা! নইলে ইচ্ছা তো আছে সুকুমারের মতো একটা জামা করাবো—ওতে আমাকে যা মানায়—ওই রংটাতে—

নির্মলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—থাক থাক, আর বাহাদুরি করতে হবে না। এই রইল চাবি, এখুনি হারিয়ে ফেলবেন না যেন আবার। আমি মিশির ঠাকুরকে বলে দিয়েছি, এখুনি লুচি ভেজে আনবে—দাঁড়ান, দেখি গিয়ে আপনার গাড়ির কত দেরি?

—এখনও ঘণ্টা দুই। মা'র সঙ্গে দেখা করে যাবো, আবার হয়তো কতদিন পরে আসব তার ঠিক কি?

—আসবেনই না। আপনাকে আমি বুঝি নি ভাবছেন? এখান থেকে চলে গেলে আপনি আবার এ-মুখো হবেন?—কখ্‌খনো না।

অপু কি প্রতিবাদ করিতে গেল, নির্মলা বাধা দিয়া বলিল—সে আমি জানি! এই দু-বছর আপনাকে দেখে আসছি দাদা, আমার বুঝতে বাকি নেই, আপনার শরীরে মায়া দয়া কম।

—কম?—বা রে—এ তো তুমি—আমি বুঝি—

—দাঁড়ান, দেখি গিয়ে মিশির ঠাকুর কি করছে—তাড়া না দিলে সে কি আর—

নির্মলার মা যাইবার সময় চোখের জল ফেলিলেন। কিন্তু নির্মলা বাড়ির মধ্যে কি কাজে ব্যস্ত ছিল, মায়ের বহু ডাকাডাকিতেও সে কাজ ফেলিয়া বাহিরে আসিতে পারিল না। অপু স্টেশনের পথে যাইতে যাইতে ভাবিল—নির্মলা আচ্ছা তো! একবাব বার হল না—যাবার সময়টা দেখা হত—আচ্ছা খামখেয়ালি!

যখন তখন রেলগাড়িতে চড়াটা ঘটে না বলিয়াই রেলে চড়িলেই তাহার একটা অপূর্ব আনন্দ হয়। ছোট্ট তোরঙ্গ ও বিছানাটার মোট লইয়া জানালার ধারে বসিয়া চাহিয়া দেখিতে দেখিতে কত কথা মনে আসিতেছিল। এখন সে কত বড়ো হইয়াছে—একা একা ট্রেনে চড়িয়া বেড়াইতেছে। তারপর এমনি একদিন হয়তো নীল নদেব তীরে ক্লিওপেট্রার দেশে—এক জ্যোৎস্না রাতে শত শত প্রাচীন সমাধির বুকের উপর দিয়া অজানা সে যাত্রা!

স্টেশনে নামিয়া বাড়ি যাইবার পথে একটা গাছতলা দিয়া যাইতে যাইতে মাঝে মাঝে কেমন একটা সুগন্ধ—মাটির, ঝরা পাতার, কোন্ ফুলের। ফাল্গুনের তপ্ত রৌদ্র গাছে গাছে পাতা ঝরাইয়া দিতেছে, মাঠের ধারে অনেক গাছে নতুন পাতা গজাইয়াছে—পলাশের ডালে রাঙা রাঙা নতুন ফোটা ফুল যেন আবতির পঞ্চপ্রদীপের ঊর্ধ্বমুখী শিখার মতো জ্বলিতেছে। অপুর মন যেন আনন্দে শিহরিয়া ওঠে—যদিও সে ট্রেনে আজ সারা পথ শুধু নির্মলা আর দেবব্রতের কথা ভাবিয়াছে...কখনও শুধুই নির্মলা, কখনও শুধুই দেবব্রত—তাহার স্কুলজীবনে এই দুইটি বন্ধু যতটা তাহার প্রাণের কাছাকাছি আসিয়াছিল, অতটা নিকটে অমনভাবে আর কেহ আসিতে পারে নাই, তবুও তাহার মনে হয় আজকার আনন্দের সঙ্গে নির্মলার সম্পর্ক নাই, দেবব্রতের নাই—আছে তার নিশ্চিন্দিপুরের বাল্যজীবনের স্নিগ্ধস্পর্শ, আর বহুদূর-বিসর্পিত, রহস্যময় কোন্ অন্তরের ইঙ্গিত—সে মনে বালক হইলেও এ-কথা বোঝে।

প্রথম যৌবনের শুরু, বয়ঃসন্ধিকালে রূপ ফাটিয়া পড়িতেছে,—এই ছায়া, বকুলের গন্ধ, বনান্তরে অবসন্ন ফাল্গুনদিনে পাখির ডাক, ময়ূরকণ্ঠী রং-এর আকাশটা—রক্তে যেন এদের নেশা লাগে—গর্ব, উৎসাহ, নবীন জীবনের আনন্দভরা প্রথম পদক্ষেপে। নির্মলা তুচ্ছ! আর এক দিক হইতে ডাক আসে—অপু আশায় আশায় থাকে।

নিরাবরণ মুক্ত প্রকৃতির এ আহ্বান, রোমান্সের আহ্বান—তার রক্তে মেশানো, এ আসিয়াছে তাহার বাবার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে—বন্ধন-মুক্ত হইয়া ছুটিয়া বাহির হওয়া, মন কি চায় না-বুঝিয়াই তাহার পিছু পিছু দৌড়ানো, এ তাহার নিরীহ শান্তপ্রকৃতি ব্রাহ্মণপণ্ডিত পিতামহ রামহরি তর্কালঙ্কারের দান নয়—যদিও সে তাঁর নিস্পৃহ জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যয়ন-প্রিয়তাকে লাভ করিয়াছে বটে। কে জানে পূর্বপুরুষ ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের উচ্ছৃঙ্খল রক্ত কিছু আছে কি-না—

তাই তাহার মনে হয় কি যেন একটা ঘটিবে, তাহারই প্রতীক্ষায় থাকে।

অপূর্ব গন্ধে-ভরা বাতাসে, নবীন বসন্তের শ্যামলশ্রীতে, অস্তসূর্যের রক্তআভায় সে রোমান্সের বার্তা যেন লেখা থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাড়িতে অপু মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিল। কলিকাতায় যদি পড়িতে যায় স্কলারশিপ না পাইলে কি কোন সুবিধা হইবে? সর্বজয়া কখনও জীবনে কলিকাতা দেখে নাই—সে কিছু জানে না। পড়া তো অনেক হইয়াছে, আর পড়ার দরকার কি?—অপুর মনে কলেজে পড়িবার ইচ্ছা খুব প্রবল। কলেজে পড়িলে মানুষ বিদ্যার জাহাজ হয়। সবাই বলিবে কলেজের ছেলে।

মাকে বলিল—না যদি স্কলারশিপ পাই, তাই বা কি? একরকম করে হয়ে যাবে—রমাপতিদা বলে, কত গরিবের ছেলে কলকাতায় পড়চে, গিয়ে একটু চেষ্টা করলেই নাকি সুবিধা হয়ে যাবে, ও আমি করে নেবো মা—

কলিকাতায় যাইবার পূর্বদিন রাত্রে আগ্রহে উত্তেজনায় তাহার ঘুম হইল না। মাথার মধ্যে যেন কেমন করে, বুকের মধ্যেও। গলায় যেন কি আটকাইয়া গিয়াছে। সত্য সত্য সে কাল এমন সময় কলিকাতায় বসিয়া আছে?...কলিকাতায়!...কলিকাতা সম্বন্ধে কত গল্প, কত কি সে শুনিয়াছে। অতবড় শহর আর নাই। কত কি অদ্ভুত জিনিস দেখিবার আছে, বড়ো বড়ো লাইব্রেরি আছে, সে শুনিয়াছে বই চাহিলেই সেখানে বসিয়া পড়িতে দেয়।

বিছানায় শুইয়া সারারাত্রি ছটফট করিতে লাগিল। বাড়ির পিছনের তেঁতুল গাছের ডালপালা অন্ধকারকে আরও ঘন করিয়াছে, ভোর আর কিছুতেই হয় না। হয়তো তাহার কলিকাতা যাওয়া ঘটিবে না, কলেজে পড়া ঘটিবে না, কত লোক হঠাৎ মাবা গিয়াছে, এমন হয়তো সেও মরিয়া যাইতে পারে। কলিকাতা না দেখিয়া, কলেজে অন্তত কিছুদিন পড়ার আগে যেন সে না মরে!—দোহাই ভগবান!

কলিকাতায় সে কাহাকেও চেনে না, কোথায় গিয়া উঠিবে ঠিক জানা নাই, পথঘাটও জানা নাই। মাসকতক আগে দেবব্রত তাহাকে নিজের এক মেসোমশাইয়ের কলিকাতার ঠিকানা দিয়া বলিয়াছিল, দরকার হইলে এই ঠিকানায় গিয়া তাহার নাম করিলেই তিনি আদর করিয়া থাকিবার স্থান দিবেন। ট্রেনে উঠিবার সময় অপু সে-কাগজখানা বাহির করিয়া পকেটে রাখিল। রেলের পুরানো টাইমটেবলের পিছন হইতে ছিঁড়িয়া লওয়া একখানা কলিকাতা শহরের নকশা তাহার টিনের তোরঙ্গটার মধ্যে অনেকদিন আগে ছিল, সেখানাও বাহির করিয়া বসিল।

ইহার পূর্বেও অপু শহর দেখিয়াছে, তবুও ট্রেন হইতে নামিয়া শিয়ালদহ স্টেশনের সম্মুখের বড়ো রাস্তায় একবার আসিয়া দাঁড়াইতেই সে অবাক হইয়া গেল। এরকম কাণ্ড সে কোথায় দেখিয়াছে? ট্রামগাড়ি ইহার নাম? আর এক রকমের গাড়ি নিঃশব্দে দৌড়াইয়া চলিয়াছে, অপু কখনও না দেখিলেও মনে মনে আন্দাজ করিল, ইহারই নাম মোটর গাড়ি। সে বিস্ময়ের সহিত দু-একখানার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল; স্টেশনের অফিস ঘরে সে মাথার উপর একটা কি চাকার মতো জিনিস বন্ বন্ বেগে ঘুরিতে দেখিয়াছে, সে আন্দাজ করিল উহাই ইলেকট্রিক পাখা।

যে-ঠিকানা বন্ধু দিয়াছিল, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা তাহার পক্ষে এক মহা মুশকিলের ব্যাপার, পকেটে রেলের টাইমটেবলের মোড়ক হইতে সংগ্রহ করা কলিকাতার যে নকশা ছিল তাহা মিলাইয়া হ্যারিসন রোড খুঁজিয়া বাহির করিল। জিনিসপত্র তাহার এমন বেশি কিছু নহে, বগলে ছোট বিছানাটি ও ডান হাতে ভারী পুঁটুলিটা ঝুলাইয়া পথ চলিতে চলিতে সামনে পাওয়া গেল আমহার্স্ট স্ট্রীট। তাহার পর আরও খানিক ঘুরিয়া সে পঞ্চানন দাসের গলি বাহির করিল।

অখিলবাবু সন্ধ্যার আগে আসিলেন, কালো নাদুস নুদুস চেহারা; অপুর পরিচয় ও উদ্দেশ্য শুনিয়া খুশি হইলেন ও খুব উৎসাহ দিলেন। ঝিকে ডাকাইয়া তখনই খাবার আনাইয়া অপুকে খাইতে

দিলেন, সারাদিন খাওয়া হয় নাই জানিতে পারিয়া তিনি এত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন যে, নিজে সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্য আসনখানি মেসের ছাদে পাতিয়াও আহ্নিক করিতে ভুলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় সে মেসের ছাদে শুইয়া পড়িল। সারাদিন বেড়াইয়া সে বড়ো ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সে তো কলিকাতায় আসিয়াছে—মিউজিয়াম, গড়ের মাঠ দেখিতে পাইবে তো?...বায়োস্কোপ দেখিবে...এখানে খুব বড়ো বায়োস্কোপ আছে সে জানে। তাহাদের দেওয়ানপুরের স্কুলে একবার একটা ভ্রমণকারী বায়োস্কোপের দল গিয়াছিল, তাহাতেই সে জানে বায়োস্কোপ কি অদ্ভুত দেখিতে। তবে এখানে নাকি বায়োস্কোপে গল্পের বই দেখায়। সেখানে তাহা ছিল না—রেলগাড়ি দৌড়াইতেছে, একটা লোক হাত পা নাড়িয়া মুখভঙ্গি করিয়া লোক হাসাইতেছে—এই সব। এখানে বায়োস্কোপে গল্পের বই দেখিতে চায়। অখিলবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, বায়োস্কোপ যেখানে হয়, এখান থেকে কত দূর?

অখিলবাবুর মেসে খাইয়া অপু ইহার-উহার পরামর্শমতো নানাস্থানে হাঁটাহাঁটি করিতে লাগিল, কোথাও বা থাকিবার স্থানের জন্য, কোথাও বা ছেলে পড়াইবার সুবিধার জন্য, কাহারও কাছে বা কলেজে বিনা বেতনে ভর্তি হইবার যোগাযোগের জন্য। এদিকে কলেজে ভর্তি হইবার সময়ও চলিয়া যায়, সঙ্গে যে কয়টা টাকা ছিল তাহা পকেটে লইয়া একদিন সে ভর্তি হইতে বাহির হইল। প্রেসিডেন্সি কলেজের দিকে সে ইচ্ছা করিয়াই ঘেঁষিল না, সেখানে সবদিকেই খরচ অত্যন্ত বেশি। মেট্রোপলিটান কলেজ গলির ভিতর, বিশেষত পুরানো ধরনের বলিয়া সেখানেও ভর্তি হইতে ইচ্ছা হইল না। মিশনারিদের কলেজ হইতে একদল ছেলে বাহির হইয়া সিটি কলেজে ভর্তি হইতে চলিয়াছিল, তাহাদের দলে মিশিয়া গিয়া কেরানীর নিকট হইতে কাগজ চাহিয়া লইয়া নাম লিখিয়া ফেলিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাড়িটার গড়ন ও আকৃতি তাহার কাছে এত খারাপ ঠেকিল যে, কাগজখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অবশেষে রিপন কলেজের বাড়ি তাহার কাছে বেশ ভালো ও উঁচু মনে হইল। ভর্তি হইয়া সে আর একটি ছাত্রের সঙ্গে ক্লাস-রুমগুলি দেখিতে গেল। ক্লাসে ইলেকট্রিক পাখা। কি করিয়া খুলিতে হয়? তাহার সঙ্গী দেখাইয়া দিল। সে খুশির সহিত তাহার নিচে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল, এত হাতের কাছে ইলেকট্রিক পাখা পাইয়া বার বার পাখা খুলিয়া বন্ধ করিয়া দেখিতে লাগিল।

অখিলবাবুদের মেসে থাকা ও পড়াশুনা দুইয়ের ঘোর অসুবিধা। এক এক ঘরের মেজেতে তিনটি ট্রাঙ্ক, কতকগুলি জুতার বাক্স, কালি বুরুশ, তিনটি হুঁকা। ঘরে আর কোন আসবাবপত্র নাই, রাত্রে আলো সবদিন জ্বলে না। ঘর দেখিয়া মনে হয় ইহার অধিবাসিগণের জীবনে মাত্র দুইটি উদ্দেশ্য আছে—অফিসে চাকরি করা ও মেসে আসিয়া খাওয়া ও ঘুমানো। এক এক ঘরে যে তিনটি বাবু থাকেন তাঁহারা ছ'টার সময় অফিস হইতে আসিয়া হাত-মুখ ধুইয়া যে যাঁর বিছানায় শুইয়া পড়িয়া চুপ করিয়া তামাক টানিতে থাকেন, একটু আধটু গল্পগুজব যা হয়, প্রায়ই অফিস-সংক্রান্ত; তারপরেই আহারাদি সারিয়া নিদ্রা। অখিলবাবু কোথায় ছেলে পড়ান, অফিসের পর সেখান হইতে ফিরিতে দেরি হইয়া যায়। তিনিও সারাদিন খাটুনির পর মেসে আসিয়া শুইয়া পড়েন।

অপু এ রকম ঘরে এতগুলি লোকের সহিত এক বিছানায় কখনও শুইতে অভ্যস্ত নয়, রাত্রে তাহার যেন হাঁপ ধরে, ভালো ঘুম হয় না। কিন্তু অন্য কোথাও কোনরকম সুবিধা না হইলে সে যাইবে কোথায়? তাহা ছাড়া অপুর আর এক ভাবনা মায়ের জন্য। স্কলারশিপ পাইলে সেই টাকা হইতে মাকে কিছু কিছু পাঠাইবার আশ্বাস সে আসিবার সময় দিয়া আসিয়াছে কিন্তু কোথায় বা স্কলারশিপ, কোথায় বা কি। মা'র কিরূপে চলিতেছে, দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবনাই তাহার আরও প্রবল হইল।

মাসের শেষে অখিলবাবু অপুর জন্য একটা ছেলে পড়ানো ঠিক করিয়া দিলেন, দুইবেলা একটা ছোট ছেলে ও একটি মেয়েকে পড়াইতে হইবে, মাসে পনেরো টাকা।

অখিলবাবুর মেসে পরের বিছানায় শুইয়া থাকা তাহার পছন্দ হয় না। কিন্তু কলেজ হইতে ফিরিয়া পথে কয়েকটি মেসে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, পনেরো টাকা মাত্র আয়ে কোনো মেসে থাকা চলে না। তাহার ক্লাসের কয়েকটি ছেলে মিলিয়া একখানা ঘর ভাড়া করিয়া থাকিত, নিজেরাই রাঁধিয়া খাইত, অপুকে তাহারা লইতে রাজি হইল।

যে তিনটি ছেলে একসঙ্গে ঘর ভাড়া করিয়া থাকে, তাহাদের সকলেরই বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। ইহাদের মধ্যে সুরেশ্বরের আয় কিছু বেশি, এম.এ. ক্লাসের ছাত্র, চল্লিশ টাকার টিউশনি আছে। জানকী যেন কোথায় ছেলে পড়াইয়া কুড়ি টাকা পায়। নির্মলের আয় আরও কম। সকলের আয় একত্র করিয়া যে মাসে যাহা অকুলান হয়, সুরেশ্বর নিজেই তাহা দিয়া দেয়, কাহাকেও বলে না। অপু প্রথমে তাহা জানিত না, মাস দুই থাকিবার পর তাহার সন্দেহ হইল প্রতি মাসে সুরেশ্বর পঁচিশ-ত্রিশ টাকা দোকানের দেনা শোধ করে, অথচ কাহারও নিকট চায় না কেন? সুরেশ্বরের কাছে একদিন কথাটা তুলিলে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সে বেশি এমন কিছু দেয় না, যদিই বা দেয়—তাতেই বা কি? তাহাদের যখন আয় বাড়িবে তখন তাহারাও অনায়াসে দিতে পারিবে, কেহ বাধা দিবে না তখন।

নির্মল রবিঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ঘরে ঢুকিল। তাহার গায়ে খুব শক্তি, সুগঠিত মাংসপেশী, চওড়া বুক। অপুর মতই বয়স। হাতের ভিতর একটা কাগজের ঠোঙা দেখাইয়া বলিল—নূতন মটরশুঁটি, লঙ্কা দিয়ে ভেজে—

অপু হাত হইতে ঠোঙাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল—দেখি? পরে হাসিমুখে বলিল—সুরেশ্বরদা, স্টোভ ধরিয়ে নিন—আমি মুড়ি আনি—ক'পয়সার আনব? এক-দুই-তিন-চার—

—আমার দিকে আঙুল দিয়ে গুনো না ওরকম—

অপু হাসিয়া নির্মলের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—তোমার দিকেই আঙুল বেশি করে দেখাব—তিন-তিন-তিন—

নির্মল তাহাকে ধরিতে যাইবার পূর্বে সে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সুরেশ্বর বলিল—একরাশ বই এনেছে কলেজের লাইব্রেরি থেকে—এতও পড়তে পারে—মায় মম্‌সেনের রোমের হিস্ট্রি এক ভল্যুম—

অপুর গলা মিষ্টি বলিয়া সন্ধ্যার পর সবাই গান গাওয়ার জন্য ধরে। কিন্তু পুরাতন লাজুকপনা তাহার এখনও যায় নাই, অনেক সাধ্যসাধনার পর একটি বা দুটি গান গাহিয়া থাকে, আর কিছুতেই গাওয়ানো যায় না। কিন্তু রবিঠাকুরের কবিতার সে বড়ো ভক্ত, নির্মলের চেয়েও। যখন কেহ ঘরে থাকে না, নির্জনে হাত-পা নাড়িয়া আবৃত্তি করে—

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে
একদা ছিলেন সুপ্ত।

ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ বসুকে অপুর সবচেয়ে ভালো লাগে। সবদিন তাঁহার ক্লাস থাকে না—কলেজের পড়ায় কোন উৎসাহ থাকে না সেদিন। কালো রিবন-ঝোলানো পাঁশ-নে চশমা পরিয়া উজ্জ্বলচক্ষু মিঃ বসু ক্লাসরুমে ঢুকিলেই সে নড়িয়া চড়িয়া সংযত হইয়া বসে, বক্তৃতার প্রত্যেক কথা মন দিয়া শোনে। এম.এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। অপুর ধারণায় মহাপণ্ডিত।—গিবন বা মম্‌সেন বা লর্ড ব্রাইস্ জাতীয়। মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস—ঈজিপ্ট, ব্যাবিলন, আসিরিয়া, ভারতবর্ষীয় সভ্যতার উত্থানপতনের কাহিনী তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ছবির মতো পড়িয়া আছে।

ইতিহাসের পরে লজিকের ঘণ্টা। হাজিরা ডাকিয়া অধ্যাপক পড়ানো শুরু করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলে কমিতে শুরু করিল। অপু এ ঘণ্টায় পিছনের বেঞ্চিতে বসিয়া লাইব্রেরি হইতে লওয়া

ইতিহাস, উপন্যাস বা কবিতার বই পড়ে, অধ্যাপকের কথার দিকে এতটুকু মন দেয় না, শুনিতে ভালো লাগে না। সেদিন একমনে অন্য বই পড়িতেছে, হঠাৎ অধ্যাপক তাহাকে লক্ষ করিয়া কি প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নটা সে শুনিতে পায় নাই, কিন্তু ক্লাস হঠাৎ নীরব হইয়া যাওয়াতে তাহার চমক ভাঙ্গিল, চাহিয়া দেখিল সকলেরই চোখ তাহার দিকে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। অধ্যাপক বলিলেন—তোমার হাতে ওখানা লজিকের বই?

অপু বলিল—না স্যার, প্যালগ্রেভের গোল্ডেন ট্রেজারি—

—তোমাকে যদি আমার ঘণ্টায় পার্সেন্টেজ না দিই? পড়া শোনো না কেন?

অপু চুপ করিয়া রহিল। অধ্যাপক তাহাকে বসিতে বলিয়া পুনরায় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। জানকী চিমটি কাটিয়া বলিল—হল তো? রোজ রোজ বলি লজিকের ঘণ্টায় আমাদের সঙ্গে পালাতে—তা শোনা হয় না—আয় চলে—

দেড়শত ছেলের ক্লাস। পিছনের বেঞ্চের সামনের দরজাটি ছেলেরা ইচ্ছা করিয়া খুলিয়া রাখে পালাইবার সুবিধার জন্য। জানকী এদিক ওদিক চাহিয়া সুড়ুৎ করিয়া সরিয়া পড়িল। তাহার পরে বিরাজ। অপুও মহাজনদের পথ ধরিল। নিচে আসিলে লাইব্রেরিয়ান বলিল—কি রায় মশায়, আমাদের পার্বণীটা কি পাব না?

অপু খুব খুশি হয়। কে তাহাকে চিনিত পাঁচ মাস আগে! এতবড় কলিকাতা শহর, এতবড় কলেজ, এত ছেলে। এখানেও তাহাকে রায় মশায় বলিয়া খাতির করিতেছে, তাহার কাছে পার্বণী চাহিতেছে। হাসিয়া বলে—কাল এনে দোব সত্যবাবু, আজ ভুলে গেছি—আপনি এক ভল্যুম গিবন্ দেবেন কিন্তু আজ—

উৎসাহে পড়িয়া গিবন্ বাড়ি লইয়া যায় বটে কিন্তু ভালো লাগে না। এত খুঁটিনাটি বিরক্তিকর মনে হয়। পরদিন সেখানা ফেরত দিয়া অন্য ইতিহাস লইয়া গেল।

পূজার কিছু পূর্বে অপুদের বাসা উঠিয়া গেল। খরচে আয়ে অনেকদিন হইতেই কুলাইতেছিল না, সুরেশ্বরের ভালো টিউশনটি হঠাৎ হাতছাড়া হইল—কে বাড়তি খরচ চালায়? নির্মল ও জানকী অন্য কোথায় চলিয়া গেল, সুরেশ্বর গিয়া মেসে উঠিল। অপুর যে মাসিক আয়, কলেজের মাহিনা দিয়া তাহা হইতে বারো টাকা বাঁচে—কলিকাতা শহরে বারো টাকায় যে কিছুতেই চলিতে পারে না, অপুর সে জ্ঞান এতদিনেও হয় নাই। সুতরাং সে ভাবিল বারো টাকাতেই চলিবে, খুব চলিবে। বারো টাকা কি কম টাকা!

কিন্তু বারো টাকা আরও বেশি দিন রহিল না, একদিন পড়াইতে গিয়া শুনিল, ছেলের শরীর খারাপ বলিয়া ডাক্তার হাওয়া বদলাইতে বলিয়াছে, পড়াশুনা এখন বন্ধ থাকিবে। এক মাসের মাহিনা তাহারা বাড়তি দিয়া জবাব দিল।

টাকা কয়টি পকেটে করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া অপু আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে ফুটপাথ বাহিয়া চলিল। সুরেশ্বরের মেসে সে জিনিসপত্র রাখিয়া দিয়াছে, সেইখানেই গেস্ট-চার্জ দিয়া খায়, রাত্রে মেসের বারান্দাতে শুইয়া থাকে। টাকা যাহা আছে, মেসের দেনা মিটাইতে যাইবে। সামান্য কিছু হাতে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার পর?

সুরেশ্বরের মেসে আসিয়া নিজের নামের একখানি পত্র ডাকবাক্সে দেখিল। হাতের লেখাটা সে চেনে না—খুলিয়া দেখিল চিঠিখানা মায়ের, কিন্তু অপরের হাতে লেখা। হাতে ব্যথা হইয়া মা বড়ো কষ্ট পাইতেছেন, অপু কি তিনটি টাকা পাঠাইয়া দিতে পারে? মা কখনও কিছু চান না, মুখ বুজিয়া সকল দুঃখ সহ্য করেন, সে-ই বরং দেওয়ানপুরে থাকিতে নানা ছলছুতায় মাঝে মাঝে কত টাকা মায়ের কাছ হইতে লইয়াছে। হাতে না থাকিলেও তেলিবাড়ি হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া মা জোগাড় করিয়া দিতেন। খুব কষ্ট না হইলে কখনও মা তাহাকে টাকার জন্য লেখেন নাই।

পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া গুনিয়া দেখিল সাতাশটি টাকা আছে। মেসের দেনা সাড়ে পনেরো টাকা বাদে সাড়ে এগারো টাকা থাকে। মাকে কত টাকা পাঠানো যায়? মনে মনে ভাবিল—তিনটে টাকা তো চেয়েছেন, আমি দশ টাকা পাঠিয়ে দিই, মনিঅর্ডার পিওন যখন টাকা নিয়ে যাবে, মা ভাববেন বুঝি তিন টাকা কিংবা হয়তো দুটাকার মনিঅর্ডার—জিজ্ঞেস করবেন, কত টাকা? পিওন যেই বলবে দশ টাকা, মা অবাক হয়ে যাবেন। মাকে তাক্ লাগিয়ে দেবো—ভারি মজা হবে, বাড়িতে গেলে মা শুধু সেই গল্পই করবেন দিনরাত—

অপ্রত্যাশিত টাকা প্রাপ্তিতে মায়ের আনন্দোজ্জ্বল মুখখানা কল্পনা করিয়া অপু ভারি খুশি হইল। বৌবাজার পোস্টাফিস হইতে টাকাটা পাঠাইয়া দিয়া সে ভাবিল—বেশ হল! আহা, মাকে কেউ কখনও দশ টাকার মনিঅর্ডার একসঙ্গে পাঠায় নি—টাকা পেয়ে খুশি হবেন। আমার তো এখন রইল দেড় টাকা, তারপর একটা কিছু ঠিক হয়ে যাবেই।

কলেজের একটি ছেলের সঙ্গে তাহার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছে। সেও গরিব ছাত্র, ঢাকা জেলায় বাড়ি, নাম প্রণব মুখার্জি। খুব লম্বা, গৌরবর্ণ, দোহারা চেহারা, বুদ্ধিপ্রোজ্জ্বল দৃষ্টি। কলেজ-লাইব্রেরিতে একসঙ্গে বসিয়া বই পড়িতে পড়িতে দুজনের আলাপ। এমন সব বই দু-জনে লইয়া যায়, যাহা সাধারণ ছাত্রেরা পড়ে না, নামও জানে না। ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেকে মম্‌সেন লইতে দেখিয়া প্রণব তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়। আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে। .

অপু শীঘ্রই বুঝিতে পারিল, প্রণবের পড়াশুনা তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি। অনেক গ্রন্থকারের নামও সে কখনও শোনে নাই—নীটশে, এমার্সন, টুর্গেনিভ, ব্রেস্টেড্—প্রণবের কথায় সে ইহাদের বই পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহারই উৎসাহে সে পুনরায় ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সহিত গিবন শুরু করিল, ইলিয়াডের অনুবাদ পড়িল।

অপুর পড়াশুনার কোনও বাঁধাবাঁধি রীতি নাই। যখন যাহা ভালো লাগে, কখনও ইতিহাস, কখনও নাটক, কখনও কবিতা, কখনও প্রবন্ধ, কখনও বিজ্ঞান। প্রণব নিজে অত্যন্ত সংযমী ও শৃঙ্খলাপ্রিয়। সে বলিল—ওতে কিছু হবে না, ওরকম পড়ো কেন?

অপু চেষ্টা করিয়াও পড়াশুনায় শৃঙ্খলা আনিতে পারিল না। লাইব্রেরি ঘরের ছাদ পর্যন্ত উঁচু বড়ো বড়ো বইয়ে ভরা আলমারির দৃশ্য তাহাকে দিশাহারা করিয়া দেয়। সকল বই-ই খুলিয়া দেখিতে সাধ যায়,—Gases of the Atmosphere—স্যার উইলিয়াম র‍্যামজের! সে পড়িয়া দেখিবে কি কি গ্যাস! Extinct Animals—ই. রে. ল্যানকাস্টার, জানিবার তার ভয়ানক আগ্রহ! Worlds Around Us. —প্রক্টর! উঃ, বইখানা না পড়িলে রাত্রে ঘুম হইবে না। প্রণব হাসিয়া বলে—দূর! ও কি পড়া? তোমার তো পড়া নয়, পড়া পড়া খেলা—

এত বড়ো লাইব্রেরি, এত বই! নক্ষত্রজগৎ হইতে শুরু করিয়া পৃথিবীর জীবজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, আণুবীক্ষণিক প্রাণিকুল, ইতিহাস—সব সংক্রান্ত বই। তাহার অধীর উৎসুক মন চায় এই বিশ্বের সব কথা জানিতে। বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক—একবার বইগুলি খুলিয়া দেখিতেও সাধ যায়। লুপ্ত প্রাণিকুল সম্বন্ধে খানকতক ভালো বই পড়িল—অলিভার লজের Pioneers of science—বড়ো বড়ো নীহারিকাদের ফটো দেখিয়া মুগ্ধ হইল। নীট্‌শে ভালো বুঝিতে না পারিলেও দু-তিনখানা বই পড়িল। টুর্গেনিভ একেবারে শেষ করিয়া ফেলিল, বারোখানা না ষোলখানা বই। চোখের সামনে টুর্গেনিভ এক নতুন জগৎ খুলিয়া দিয়া গেল—কি অপূর্ব হাসি-অশ্রু মাখানো কল্পলোক!

প্রণবের কাছেই সে সন্ধান পাইল, শ্যামবাজারে এক বড়োলোকের বাড়ি দরিদ্র ছাত্রদের খাইতে দেওয়া হয়। প্রণবের পরামর্শে সে ঠিকানা খুঁজিয়া সেখানে গেল। এ পর্যন্ত কখনও কিছু সে চায় নাই, কাহারও কাছে চাহিতে পারে না; আত্মমর্যাদাবোধের জন্য নহে, লাজুকতা ও আনাড়িপনার জন্য এতদিন সে-সবের দরকারও হয় নাই, কিন্তু আর যে চলে না!

খুব বড়োলোকের বাড়ি; দারোয়ান বলিল—কি চাই?

অপু বলিল, এখানে গরিব ছেলেদের খেতে দেয়, তাই জানতে—কাকে বলবো জানো?

দারোয়ান তাহাকে পাশের দিকে একটা ছোট ঘরে লইয়া গেল।

ইলেকট্রিক পাখার তলায় একজন মোটাসোটা ভদ্রলোক বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া বলিলেন—এখানে কি দরকার আপনার?

অপু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—এখানে কি পুওর স্টুডেন্টদের খেতে দেওয়া হয়? তাই আমি—

—আপনি দরখাস্ত করেছিলেন?

কিসের দরখাস্ত অপু জানে না।

—জুন মাসে দরখাস্ত করতে হয় আমাদের, নাম্বার লিমিটেড কিনা, এখন আর খালি নেই। আবার আসছে বছর—তাছাড়া, আমরা ভাবছি ওটা উঠিয়ে দেবো, এস্টেট রিসিভারের হাতে যাচ্ছে, ও-সব আর সুবিধে হবে না।

ফিরিবার সময় গেটের বাহিরে আসিয়া অপুর মনে বড়ো কষ্ট হইল। কখনও সে কাহারও নিকট কিছু চায় নাই, চাহিয়া বিমুখ হইবার দুঃখ কখনও ভোগ করে নাই, চোখে তাহার প্রায় জল আসিল।

পকেটে মাত্র আনা দুই পয়সা অবশিষ্ট আছে—এই বিশাল কলিকাতা শহরে তাহাই শেষ অবলম্বন। কাহাকেই বা সে এখানে চেনে, কাহার কাছে যাইবে? অখিলবাবুর মেসে দুই মাস সে প্রথম খাইয়াছে, সেখানে যাইতে লজ্জা করে। সুরেশ্বরের নিজেরই চলে না; তাহার উপর সে কখনও জুলুম করিতে পারিবে না।

আরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল। কোনদিন সুরেশ্বরের মেসে এক বেলা খাইয়া, কোনদিন বা জানকীর কাছে কাটাইয়া চলিতেছিল। একদিন সারাদিন না খাওয়ার পর সে নিরুপায় হইয়া অখিলবাবুর মেসে সন্ধ্যার পর গেল। অখিলবাবু অনেকদিন পর তাহাকে পাইয়া খুশি হইলেন। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকক্ষণ গল্পগুজব করিলেন। বলি বলি করিয়াও অপু নিজের দুর্দশার কথা অখিলবাবুকে বলিতে পারিল না। তাহা হইলে হয়তো তিনি তাহাকে ছাড়িবেন না, সেখানে থাকিতে বাধ্য করিবেন। সে জুলুম করা হয় অনর্থক।

কিন্তু এদিকে আর চলে না! এক জায়গায় বই, এক জায়গায় বিছানা। কোথায় কখন রাত কাটাইবে কিছু ঠিক নাই—ইহাতে পড়াশুনা হয় না। পরীক্ষাও নিকটবর্তী। না খাইয়াই বা কয় দিন চলে!

অখিলবাবুর মেস হইতে ফিরিবার পথে একটা খুব বড়ো বাড়ি। ফটকের কাছে মোটর গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। এই বাড়ির লোকে যদি ইচ্ছা করে তবে এখনই তাহার কলিকাতায় থাকার সকল ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারে। সাহস করিয়া যদি সে বলিতে পারে, তবে হয়তো এখনই হয়। একবার সে বলিয়া দেখিবে?

কোথাও কিছু সুবিধা না হইলে তাহাকে বাধ্য হইয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া দেশে ফিরিতে হইবে। এই লাইব্রেরি, এত বই, বন্ধুবান্ধব, কলেজ—সব ফেলিয়া হয়তো মনসাপোতায় গিয়া আবার পুরাতন জীবনের পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। পড়াশুনা তাহার কাছে একটা রোমান্স, একটা অজানা বিচিত্র জগৎ দিনে দিনে চোখের সামনে খুলিয়া যাওয়া, ইহাকে সে চায়, ইহাই এতদিন চাহিয়া আসিয়াছে। কলেজ হইতে বাহির হইয়া চাকরি, অর্থোপার্জন—এসব কথা সে কোনদিন ভাবে নাই, তাহার মাথার মধ্যে কোনদিন এসব সাংসারিক কথা ঢোকে নাই—সে চায় এই অজানার রোমান্স—এই বিচিত্র ভাবধারার সহিত আরও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ। প্রাচীন দিনের জগৎ, অধুনালুপ্ত অতিকায় প্রাণীদল, বিশাল শূন্যের দৃশ্য, অদৃশ্য নক্ষত্ররাজি, ফরাসি বিদ্রোহ—নানা কথা। এই সব ছাড়িয়া শালগ্রাম হাতে মনসাপোতায় বাড়ি-বাড়ি ঠাকুর-পূজা...।

অপুর মনে হইল—এই রকমই বড়ো বাড়ি আছে লীলাদের, কলিকাতারই কোন জায়গায়। অনেকদিন আগে লীলা তাহাকে বলিয়াছিল, কলিকাতায় তাহাদের বাড়িতে থাকিয়া পড়িতে। সে ঠিকানা জানে না—কোথায় লীলাদের বাড়ি, কে-ই বা এখানে তাহাকে বলিয়া দিবে, তাহা ছাড়া সে-সব আজ ছয় সাত বছরের কথা হইয়া গেল, এতদিন কি-আর লীলা তাহার কথা মনে রাখিয়াছে? কোন্ কালে ভুলিয়া গিয়াছে।

অপু ভাবিল—ঠিকানা জানলেই কি আর আমি সেখানে যেতে পারতাম, না, গিয়ে কিছু বলতে—সে আমার কাজ নয়—তার ওপর এই অবস্থায়। দূর, তা কখনও হয়? তাছাড়া লীলার বিয়ে-থাওয়া হয়ে এতদিন সে শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছে। সে-সব কি আর আজকের কথা?

ক্লাসে জানকী একদিন একটা সুবিধার কথা বলিল। সে ঝামাপুকুরের কোন্ ঠাকুরবাড়িতে রাত্রে খায়। সকালে কোথায় ছেলে পড়াইয়া একবেলা তাহাদের সেখানে খায়। সম্প্রতি সে বোনের বিবাহে বাড়ি যাইতেছে, ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত অপু রাত্রে রাজবাড়িতে তাহার বদলে খাইতে পারে। বাড়ি যাইবার পূর্বে ঠাকুরবাড়ির সেবাইতকে বলিয়া কহিয়া সে সব ব্যবস্থা করিয়া যাইবে এখন। অপু রাজি আছে?

রাজি? হাতে স্বর্গ পাওয়া নিতান্ত গল্পকথা নয় তাহা হইলে!

ঠাকুরবাড়ির খাওয়া নিতান্ত মন্দ নয়, অপুর কাছে তাহা খুব ভালো লাগে। আলোচালের ভাত, টক, কোনও কোনও দিন ভোগের পয়সাও পাওয়া যায়, তবে মাছ-মাংসের সম্পর্ক নাই, নিরামিষ।

কিন্তু এ তো আর দু-বেলা নয়; শুধু রাত্রে। দিনমানটাতে বড়ো কষ্ট হয়। দুই পয়সার মুড়ি ও কলের জল। তবুও তো পেটটা ভরে! কলেজ হইতে বাহির হইয়া বৈকালে তাহার এত ক্ষুধা পায় যে গা ঝিম্ ঝিম্ করে, পেটে যেন এক ঝাঁক বোলতা হুল ফুটাইতেছে—পয়সা জুটাইতে পারিলে অপু এ সময়টা পথের ধারের দোকান হইতে এক পয়সার ছোলাভাজা কিনিয়া খায়।

সব দিন পয়সা থাকে না, সেদিন সন্ধ্যার পরেই ঠাকুরবাড়ি চলিয়া যায়, কিন্তু ঠাকুরের আরতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে খাইতে দিবার নিয়ম নাই—তাও একবার নয়, দুইবার দুটি ঠাকুরের আরতি। আরতির কোন নির্দিষ্ট সময় নাই, সেবাইত ঠাকুরের মর্জি ও সুবিধামতো রাত আটটাতেও হয়, নটাতেও হয়, দশটাতেও হয়, আবার এক-একদিন সন্ধ্যার পরেই হয়।

কলেজে যাইতে সেদিন মুরারি বলিল—সি.বি.বি.-র ক্লাসে কেউ যেয়ো না—আমরা সব স্ট্রাইক করেছি।

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল,—কেন, কি করেছে সি.সি.বি.?

মুরারি হাসিয়া বলিল,—করে নি কিছু, পড়া জিজ্ঞেস করবে বলেছে রোমের হিস্ট্রির। একপাতাও পড়ি নি, না পারলে বকুনি দেবে কি রকম জানো তো?

গজেন বলিল—আমার তো আরও মুশকিল। রোমের হিস্ট্রির বই-ই যে আমি কিনি নি!

মন্মথ আগে সেন্ট জেভিয়ারে পড়িত, সে বিলাতি নাচের ভঙ্গিতে হাত লম্বা করিয়া বার কয়েক পাক খাইয়া একটা ইংরাজি গানের চরণ বার দুই গাহিল। অপু বলিল—কিন্তু পার্সেন্টেজ যাবে যে?

প্রতুল বলিল—ভারি একদিনের পার্সেন্টেজ। তা আমি ক্লাসে নাম প্রেজেন্ট করেও পালিয়ে আসতে পারি—সে তো আর তুমি পারবে না?

অপু বলিল—খুব পারি। পারব না কেন?

প্রতুল বলিল—সে তোমার কাজ নয়, সি.সি.বি.-র চোখ ভারি ইয়ে—আমরা বলে তাই এক-একদিন সরষেফুল দেখি, তা তুমি। পারো পালিয়ে আসতে?

—এখ্‌খুনি। দ্যাখো সবাই দাঁড়িয়ে—পারি কি না পারি, কিন্তু যদি পারি খাওয়াতে হবে বলে দিলাম—

অপু উৎসাহে সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিয়া গেল। গজেন বলিল—কেন ওকে আবার ওসব শেখাচ্ছিস?

—শেখাচ্ছি মানে? ভাজা মাছখানা উলটে খেতে জানে না—ভারি সাধু!

মুরারি বলিল—না, না, তোমরা জানো না, অপূর্ব ভারি pure spirit! সেদিন—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি, ওরকম সুন্দর চেহারা থাকলে আমাদের কত সার্টিফিকেট আসতো—বাবা, বঙ্কিমবাবু কি আর সাধে সুন্দর মুখের গুণ গেয়ে গেছেন—

—কি বাজে বকছিস প্রতুল? দিন দিন ভারি ইতর হয়ে উঠছিস কিন্তু—

প্রিন্সিপালের গাড়ি কলেজের সামনে আসিয়া লাগাতে যে যেদিকে সুবিধা পাইল সরিয়া পড়িল।

মিঃ বসুর ক্লাসে নামটা প্রেজেন্ট করিয়াই আজ অপু পলাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। বাঁদিকের দরজাটা একদম খোলা, প্রোফেসারের চোখ অন্যদিকে। সুযোগ খুঁজিতে খুঁজিতে প্রোফেসারের চোখ আবার তাহার দিকে পড়িল, কাজেই খানিকক্ষণ ভালোমানুষের মতো নিরীহমুখে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইল। এইবার একবার অন্যদিকে চোখ পড়িলেই হয়! হঠাৎ প্রোফেসার তাহাকেই প্রশ্ন করিলেন,—Was Merius justified in his action?

সর্বনাশ! মেরিয়াস কে! একদিনও সে যে রোমের ইতিহাসের লেকচার শোনে নাই!

উত্তর না পাইয়া প্রোফেসার অন্য একটা প্রশ্ন করিলেন—What do you think of Sulla's—

অপু বিপন্নমুখে কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাস্কেল মণিলালটা মুখে কাপড় গুঁজিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতেছে!

প্রোফেসার বিরক্ত হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

—You, you there–you behind the pillar—

এবার মণিলালের পালা। সে থামের আড়ালে সরিয়া বসিবার বৃথা চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখা গেল সুল্লা বা মেরিয়াসের সম্বন্ধে অপুর সহিত তাহার মতের কোন পার্থক্য নাই, সমানই নির্বিকার। মণিলালের দুর্গতিতে অপু খুব খুশি হইয়া পাশের ছেলেকে আঙুলের খোঁচা দিয়া ফিস ফিস করিয়া বলিল—Rightly served! ভারি হাসি হচ্ছিল—

—চুপ চুপ—এখুনি আবার এদিকে চাইবে সি.সি.বি. কথা শুনলে—

—এবার আমি সোজা—

পিছন হইতে নৃপেন ব্যস্তস্বরে বলিল—এইবার আমায় জিজ্ঞেস করবে—ডেটটা ভাই দে না শিগগির বলে—শিগগির—

অপুর পাশের ছেলেটি বলিল—কে কাকে ডেট বলে দাদা—মেরিভেল পুলারের বইয়ের রং কেমন এখনও চাক্ষুষ দেখি নি—কেটে পড়ো না সোজা—

অপু খানিকক্ষণ হইতেই প্রোফেসারের দৃষ্টির গতি একমনে লক্ষ করিতেছিল, সে বুঝিতে পারিল ও-কোণ হইতে একবার এদিকে ফিরিলে পালানো অসম্ভব হইবে, কারণ এদিকে এখনও অনেক ছেলেকে প্রশ্ন করিতে বাকি। এই সুবর্ণ সুযোগ। বিলম্ব করিলে...।

দু-একবার উসখুস করিয়া, একবার এদিক ওদিক চাহিয়া অপু সাঁ করিয়া খোলা দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পিছু পিছু হরিদাস—অল্প পরেই নৃপেন।...

তিনজনেই উপরের বারান্দাতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া তর্ তর্ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া একেবারে একতলায় নামিয়া আসিল।

অপু পিছন ফিরিয়া সঙ্গীদের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—হি-হি-হি—উঃ—আর একটু হলেই—

নৃপেন বলিল—আমাকে তো—মিনিট-দুই দেরি—কাল হয়েছে কি বুঝলে?—

অপু বলিল—যাক, এখানে আর দাঁড়িয়ে খোশগল্প করার কোনও দরকার দেখছি নে। এখুনি প্রিন্সিপ্যাল নেমে আসবেন, গাড়ি লাগিয়েছে দরজায়—কমনরুমে বরং এসো—

একটু পরে সকলে বাহির হইয়া পড়িল। আজ আর ক্লাস ছিল না। কে গ্রাহ্য করে বুড়ো সি. বি. বি. ও তাঁহার রোমের ইতিহাসের যত বাজে প্রশ্ন?

অপু কিন্তু কিছু নিরাশ হইল। ক্লাস হইতে পালাইতে পারিলে প্রতুলের দল খাওয়াইবে বলিয়াছিল। কিন্তু লাইব্রেরিয়ানের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, তাহারা অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে।—কোন্ সকালে দুই পয়সার মুড়ি ও একটা ফুলুরি খাইয়া বাহির হইয়াছে—পেট যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, কিছু খাইতে পারিলে হইত! ক্লাসে এতক্ষণ বেশ ছিল, বুঝিতে পারে নাই, বাহিরে আসিয়া ক্ষুধার যন্ত্রণাই প্রবল হইয়া উঠিল। এদিকে পকেটে একটাও পয়সা নাই। সে ভাবিল—ওরা আচ্ছা তো? বললে খাওয়াব, তাই তো আমি পালাতে গেলাম। নিজেরা এদিকে সরে পড়েছে কোন্ কালে!..—এখন কিছু খেলে তবুও রাত অবধি থাকা যেত—আজ সোমবার, আটটার মধ্যেই আরতি হয়ে যাবে—উঃ, ক্ষিদে যা পেয়েছে!—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এ ধরনের কষ্ট করিতে অপু কখনও অভ্যস্ত নয়। বাড়ির এক ছেলে, চিরকাল বাপ-মায়ের আদরে কাটাইয়াছে। শহরে বড়োলোকের বাড়িতে অন্য কষ্ট থাকিলেও খাওয়ার কষ্টটা অন্তত ছিল না। তাছাড়া সেখানে মাথার উপর ছিল মা, সকল আপদবিপদে সর্বজয়া ডানা মেলিয়া ছেলেকে আড়াল করিয়া রাখিতে প্রাণপণ করিত, কোনও কিছু আঁচ লাগিতে দিত না। দেওয়ানপুরে স্কলারশিপের টাকায় বালক-বুদ্ধিতে যথেষ্ট শৌখিনতা করিয়াছে—খাইয়াছে, খাওয়াইয়াছে, ভালো ভালো জামা কাপড় পরিয়াছে,—তখন সেসব জিনিস সস্তাও ছিল।

কিন্তু শীঘ্রই অপু বুঝিল—কলিকাতা দেওয়ানপুর নয়। এখানে কেহ কাহাকেও পোঁছে না। ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়া গত কয়েক মাসের মধ্যে কাপড়ের দাম এত চড়িয়াছে যে কাপড় আর কেনা যায় না। ভালো কাপড় তাহার মোটে আছে একখানা, একটি টুইল শার্ট সম্বল। ছেলেবেলা হইতেই ময়লা কাপড় পরিতে সে ভালোবাসে না, দু-তিনদিন অন্তর সাবান দিয়া কাপড় কাচিয়া শুকাইলে, তাহাই পরিয়া বাহির হইতে পারে। সবদিন কাপড় ঠিক সময়ে শুকায় না, কাপড় কাচিবার পরিশ্রমে এক-একদিন আবার ক্ষুধা এত বেশি পায় যে, মাত্র দু-পয়সার খাবারে কিছুই হয় না—ক্লাসে লেকচার শুনিতে বসিয়া মাথা যেন হঠাৎ শোলার মতো হালকা বোধ হয়।

এদিকে থাকার কষ্টও খুব। সুরেশ্বর এম.এ. পরীক্ষা দিয়া বাড়ি চলিয়া গিয়াছে, তাহার মেসে আর থাকিবার সুবিধা নাই। যাইবার আগে সুরেশ্বর একটা ঔষধের কারখানার উপরে একটা ছোট ঘরে তাহার থাকিবার স্থান ঠিক করিয়া দিয়া গিয়াছে। ওই কারখানায় সুরেশ্বরের জানাশোনা একজন লোক কাজ করে ও রাত্রে ওপরের ঘরটাতে থাকে। ঠিক হইয়াছে, যতদিন কিছু একটা সুবিধা না হইতেছে, ততদিন অপু ওই ঘরটাতে লোকটার সঙ্গে থাকিবে। ঘরটা একে ছোট, তাহার উপর অর্ধেকটা ভর্তি ঔষধবোঝাই প্যাকবাক্সে। রাশীকৃত জঞ্জাল বাক্সগুলির পিছনে জমানো, কেমন একটা গন্ধ! নেংটি ইঁদুরের উৎপাতে কাপড়-চোপড় রাখিবার জো নাই, অপুর একমাত্র টুইল শার্টটার দু- জায়গায় কাটিয়া ফুটা করিয়া দিয়াছে। রাত্রে ঘরময় আরশোলার উৎপাত। ঘরের সে লোকটা যেমন নোংরা তেমনই তামাক-প্রিয়, রাত্রে উঠিয়া অন্তত তিনবার তামাক সাজিয়া খায়। তাহার কাশির শব্দে ঘুম হওয়া দায়। ঘরের কোণে তামাকের গুল রাশীকৃত করিয়া রাখিয়া দেয়। অপু নিজে

বার দুই পরিষ্কার করিয়াছিল। এক টুকরা রবারের ফিতার মতোই ঘরের নোংরামিটা স্থিতিস্থাপক—পূর্বাবস্থায় ফিরিতে এতটুকু দেরি হয় না। খাওয়া-পরা থাকিবার কষ্ট অপু কখনও করে নাই, বিশেষ করিয়া একলা যুঝিতে হইতেছে বলিয়া কষ্ট আরও বেশি।

অন্যমনস্কভাবে যাইতে যাইতে সে কৃষ্ণদাস পালের মূর্তির মোড়ে আসিল। যুদ্ধের নূতন খবর বাহির হইয়াছে বলিয়া কাগজওয়ালা হাঁকিতেছে। শেয়ালদার একটা ট্রাম হইতে লোকজন নামা-উঠা করিতেছে। একটি চোখে-চশমা তরুণ যুবকের দিকে একবার চাহিয়াই মনে হইল—চেনা-চেনা মুখ! একটু পরে সেও অপুর দিকে চাহিতে দুইজনে চোখাচোখি হইল। এবার অপু চিনিয়াছে—সুরেশদা! নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ির পাশের সেই পোড়ো ভিটার মালিক নীলমণি জ্যাঠামশায়ের ছেলে সুরেশ!

সুরেশও চিনিয়াছিল। অপু তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া হাসিমুখে বলিল, সুরেশদা যে!

যেবার দুর্গা মারা যায়, সে বৎসর শীতকালে ইহারা যা কয়েক মাসের জন্য দেশে গিয়াছিল, তাহার পর আর কখনও দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। সুরেশ আকৃতিতে যুবক হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ দেহ, সুগঠিত হাত পা। বাল্যের সে চেহারার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

সুরেশ সহজ-সুরেই বলিল—আরে অপূর্ব? এখানে কোথা থেকে?

সুরেশের খাঁটি শহুরে গলার সুরে ও উচ্চারণ-ভঙ্গিতে অপু একটু ভয় খাইয়া গেল।

সুরেশ বলিল—তারপর এখানে কি চাকরি-টাকরি করা হচ্ছে?

—না—আমি যে পড়ি ফার্স্ট ইয়ারে রিপনে—

—তাই নাকি? তা এখন যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

অপু সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়া আগ্রহের সুরে বলিল, জেঠিমা কোথায়?

—এখানেই, শ্যামবাজারে। আমাদের বাড়ি কেনা হয়েছে সেখানে—

সুরেশের সহিত সাক্ষাতে অপু ভারি খুশি হইয়াছিল। তাহাদের বাড়ির পাশের যে পোড়ো ভিটার বনঝোপের সহিত তাহার ও দিদি দুর্গার আবাল্য অতিমধুর পরিচয়, সেই ভিটারই লোক ইহারা। যদিও কখনও সেখানে ইহারা বাস করে নাই, শহরে শহরেই ঘোরে, তবুও তো সে ভিটারই লোক, তাহা ছাড়া দশরাত্রির জ্ঞাতি, অতি আপনার জন।

অপু বলিল—অতসীদি এখানে আছে? সুনীল? সুনীল কি পড়ে?

—এবার সেকেন ক্লাসে উঠেছে—আচ্ছা, যাই তাহলে, আমার ট্রাম আসছে—

সুরেশের সুরে কোনও আগ্রহ বা আন্তরিকতা ছিল না, সে এমন সহজ সুরে কথা বলিতেছিল, যেন অপুর সঙ্গে তাহার দুইবেলা দেখা হয়। অপু কিন্তু নিজের আগ্রহ লইয়া এত ব্যস্ত ছিল যে, সুরেশের কথাবার্তার সেদিকটা তাহার কাছে ধরা পড়িল না।

—আপনি কি করেন সুরেশদা?

—মেডিকেল কলেজে পড়ি, এবার থার্ড ইয়ার—

—আপনাদের ওখানে একদিন যাব সুরেশদা—জেঠিমার সঙ্গে দেখা করে আসব—

সুরেশ ট্রামের পা-দানিতে পা দিয়া উঠিতে উঠিতে অনাসক্ত সুরে বলিল, বেশ বেশ, আমি আসি এখন—

এতদিন পর সুরেশদার সহিত দেখা হওয়াতে অপুর মনে এমন বিস্ময় ও আনন্দ হইয়াছিল যে, ট্রামটা ছাড়িয়া দিলে তাহার মনে পড়িল—সুরেশদার বাড়ির ঠিকানাটা তো জিজ্ঞাসা করা হয় নাই! সে চলন্ত ট্রামের পাশে ছুটিতে ছুটিতে জিজ্ঞাসা করিল—আপনাদের বাড়ির ঠিকানাটা—ও সুরেশদা, ঠিকানাটা যে—

সুরেশ মুখ বাড়াইয়া বলিল—চব্বিশ-এর দুই সি, বিশ্বকোষ লেন, শ্যামবাজার—

পরের রবিবার সকালে স্নান করিয়া অপু শ্যামবাজারে সুরেশদার ওখানে যাইবার জন্য বাহির

হইল। আগের দিন টুইল শার্টটা ও কাপড়খানা সাবান দিয়া কাচিয়া শুকাইয়া লইয়াছিল, জুতার শোচনীয় দুরবস্থা ঢাকিবার জন্য একটি পরিচিত মেসে এক সহপাঠীর নিকট হইতে জুতার কালি চাহিয়া নিজে বুরুশ করিয়া লইল। সেখানে অতসীদি ইত্যাদি রহিয়াছেন, দীনহীন বেশে কি যাওয়া চলে?

ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করিতে দেরি হইল না। ছোটখাটো দোতলা বাড়ি, আধুনিক ধরনের তৈয়ারি। ইলেকট্রিট লাইট আছে, বাহিরে বৈঠকখানা, দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি। সুরেশ বাড়ি ছিল না, ঝিয়ের কাছে সে পরিচয় দিতে পারিল না, বৈঠকখানায় তাহাকে বসাইয়া ঝি চলিয়া গেল। ঘড়ি, ক্যালেন্ডার, একটা পুরোনো রোল-টপ ডেস্ক, খানকতক চেয়ার। ভারি সুন্দর বাড়ি তো! এত আপনার জনের কলিকাতায় এরকম বাড়ি আছে, ইহাতে অপু মনে মনে একটু গর্ব ও আনন্দ অনুভব করিল। টেবিলে একখানা সেদিনের অমৃতবাজার পড়িয়া ছিল, উলটাইয়া পালটাইয়া যুদ্ধের খবর পড়িতে লাগিল।

অনেক বেলায় সুরেশ আসিল।

তাহাকে দেখিয়া বলিল, এই যে অপূর্ব, কখন এলে?

অপু হাসিমুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আসুন সুরেশদা—আমি, আমি অনেকক্ষণ ধরে—বেশ বাড়িটা তো আপনাদের—

—এটা আমার বড়োমামা—যিনি পাটনার উকিল, তিনি কিনেছেন; তাঁরা তো কেউ থাকেন না, আমরাই থাকি। বসো, আমি আসি বাড়ির মধ্যে থেকে—

অপু মনে মনে ভাবিল—এবার সুরেশদা বাড়ির ভেতর গিয়ে বললেই জেঠিমা ডেকে পাঠাবে, এখানে খেতে বলবে—

কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সুরেশ বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইল না। সে যখন পুনরায় আসিল, তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িয়া নিশ্চিন্তি সুরে বলিল, তারপর?...বলিয়াই খবরের কাগজখানা হাতে তুলিয়া চোখ বুলাইতে লাগিল। অপু দেখিল সুরেশ পান চিবাইতেছে। খাওয়ার আগে এত বেলায় পান খাওয়া অভ্যাস, না-কি খাওয়া হইয়া গেল!

দুই চারিটা প্রশ্নের জবাব দিতে ও খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে একটা বাজিল। সুরেশের চোখ ঘুমে বুজিয়া আসিতেছিল। সে হঠাৎ কাগজখানা টেবিলে রাখিয়া দিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, তুমি না হয় বসে কাগজ পড়ো, আমি একটুখানি শুয়ে নি। একটা ডাব খাবে?—

ডাব খাইবে কি রকম, এত বেলায়, এ অবস্থায়? অপু ভালো বুঝিতে না পারিয়া বলিল, ডাব? না থাক, এত বেলায়—ইয়ে—না।

সেই যে সুরেশ বাড়ি ঢুকিল—একটা—দুইটা—আড়াইটা, আর দেখা নাই। ইহারা কত বেলায় খায়! রবিবার বলিয়া বুঝি এত দেরি? কিন্তু যখন তিনটা বাজিয়া গেল, তখন অপুর মনে হইল, কোথাও কিছু ভুল হইয়াছে নিশ্চয়। হয় সে-ই ভুল বুঝিয়াছে, না হয় উহারা ভুল করিয়াছে। তাহার এত ক্ষুধা পাইয়াছিল যে, সে আর বসিতে পারিতেছে না। উঠিবে কিনা ভাবিতেছে, কেমন সময় সুরেশের ছোট ভাই সুনীল বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। অপু ডাকিবার পূর্বেই সে সাইকেল লইয়া বাড়ির বাহিরে কোথায় চলিয়া গেল।

সেই সুনীল—যাহাকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণে ছাঁদা বাঁধিবার দরুন জেঠিমা তাহাকে ফলারে-বামুনের ছেলে বলিয়াছিলেন! ইঁহাদের যে এতদিন পর আবার দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহা যেন অপু ভাবে নাই। সুনীলকে দেখিয়া তাহার বিস্ময় ও আনন্দ দুই-ই হইল। এ যেন কেমন একটা ঠিক বুঝানো যায় না—

ইহাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবার মূলে অপুর কোন স্বার্থসিদ্ধি বা সুযোগসন্ধানের উদ্দেশ্য

ছিল না, বা ইহা যে নিতান্ত গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইবার মতো দেখাইতেছে—একবারও সেকথা তাহার মনে উদয় হয় নাই। এখানে তাহার আসিবার মূলে সেই বিস্ময়ের ভাব—যাহা তাহার জন্মগত। কে আবার জানিত, খাস কলিকাতা শহরে এতদিন পরে নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ির পাশের পোড়ো ভিটাটার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা হইয়া যাইবে। এই ঘটনাটুকু তাহাকে মুগ্ধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। এ যেন জীবনের কোন্ অপরিচিত বাঁকে পত্রপুষ্পে সজ্জিত অজানা কোন কুঞ্জবন—বাঁকের মোড়ে ইহাদের অস্তিত্ব যেন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

বিস্ময় মনের অতি উচ্চ ভাব এবং উচ্চ বলিয়াই সহজলভ্য নয়। সত্যকার বিস্ময়ের স্থান অনেক উপরে—বুদ্ধি যার খুব প্রশস্ত ও উদার, মন সব সময় সতর্ক—নূতন ছবি নূতন ভাব গ্রহণ করিবার ক্ষমতা রাখে—সে-ই প্রকৃত বিস্ময়-রসকে ভোগ করিতে পারে। যাদের মনের যন্ত্র অলস, মিনমিনে—পরিপূর্ণ, উদার বিস্ময়ের মতো উচ্চ মনোভাব তাদের অপরিচিত থাকিয়া যায়।

বিস্ময়কে যাঁহারা বলিয়াছেন Mother of philosophy, তাঁহারা একটু কম বলেন। বিস্ময়ই আসল Philosophy, বাকিটা তাহার অর্থসংগতি মাত্র।

তিনটার পর সুরেশ বাহির হইয়া আসিল। সে হাই তুলিয়া বলিল—কাল রাত্রে ছিল নাইট-ডিউটি, চোখ মোটে বোজে নি—তাই একটু গড়িয়ে নিলাম—চলো, মাঠে ক্যালকাটা টিমের হকি খেলা আছে—একটু দেখে আসা যাক—

অপু মনে মনে সুরেশদাকে ঘুমের জন্য অপরাধী ঠাওর করিবার জন্য লজ্জিত হইল। সারারাত কাল বেচারি ঘুমায় নাই—তাহার ঘুম আসা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই তো!...

সে বলিল—আমি মাঠে যাবো না সুরেশদা, কাল এগজামিন আছে, পড়া তৈরি হয় নি মোটে—আমি যাই—ইয়ে—জেঠিমার সঙ্গে একবার দেখা করে গেলে হতো—

সুরেশ বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ—বেশ তো—এসো না—

অপু সুরেশের সঙ্গে সংকুচিত ভাবে বাড়ির মধ্যে ঢুকিল। সুরেশের মা ঘরের মধ্যে বসিয়াছিলেন—সুরেশ গিয়া বলিল—এ সেই অপূর্ব মা—নিশ্চিন্দপুরের হরিকাকার ছেলে—তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—

অপূর্ব পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল—সুরেশের কথায় ভাবে তাহার মনে হইল, সে যে এতক্ষণ আসিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে সে কথা সুরেশ বাড়ির মধ্যে আদৌ বলে নাই।

জেঠিমার মাথার চুল অনেক পাকিয়া গিয়াছে বলিয়া অপুর মনে হইল। অপুর প্রণামের উত্তরে তিনি বলিলেন, এসো-এসো—থাক্, থাক্—কলকাতায় কি করো?

অপু ইতিপূর্বে কখনও জেঠিমার সম্মুখে কথা বলিতে পারিত না। গম্ভীর ও গর্বিত (যেটুকু সে ধরিতে পারিত না) চালচলনের জন্য জেঠিমাকে সে ভয় করিত। আনাড়ি ও অগোছালো সুরে বলিল, এই এখানে পড়ি, কলেজে পড়ি।

জেঠিমা যেন একটু বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, কলেজে পড়? ম্যাট্রিক পাশ দিয়েছ?

—আর বছর ম্যাট্রিক পাশ করেছি—

—তোমার বাবা কোথায়?—তোমরা তো সেই কাশী চলে গিয়েছিলে, না?

—বাবা তো নেই—তিনি তো কাশীতেই...

তারপর অপু সংক্ষেপে বলিল সব কথা। এই সময়ে পাশের ঘর হইতে একটি বাইশ-তেইশ বছরের তরুণী এ ঘরে ঢুকিতেই অপু বলিয়া উঠিল, অতসীদি না?...

অতসী অনেক বড়ো হইয়াছে, তাহাকে চেনা যায় না। সে অপুকে চিনিতে পারিল, বলি, অপূর্ব কখন এলে?

আর একটি মেয়ে ও-ঘর হইতে আসিয়া দোরের কাছে দাঁড়াইল। পনেরো ষোল বৎসর বয়স হইবে, বেশ সুশ্রী, বড়ো বড়ো চোখ। কথা বলিতে বলিতে সেদিকে চোখ পড়াতে অপু দেখিল,

মেয়েটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। খানিকটা পরে অতসী বলিল—মণি, দেখে এসো তো দিদি, কুর্শি-কাঁটাগুলো ও-ঘরের বিছানায় ফেলে এসেছি কি না?

মেয়েটি চলিয়া গেল এবং একটু পরেই আবার দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—না বড়দি, দেখলাম না তো?

জেঠিমা অল্প দুই চারিটা কথার পরই কোথায় উঠিয়া গেলেন। অতসী অনেকক্ষণ কথাবার্তা কহিল। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিল। তারপর সেও চলিয়া গেল। অপু ভাবিতেছিল, এবার সে উঠিবে কিনা। কেহই ঘরে নাই, এ সময় ওঠাটা কি উচিত হইবে?...ক্ষুধা একবার উঠিয়া পড়িয়া গিয়াছে, এখন ক্ষুধা আর নাই, তবে গা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। যাওয়ার কথা কাহাকেও ডাকিয়া বলিয়া যাইবে?...

দোরের কাছে গিয়া সে দেখিল সেই মেয়েটি বারান্দা দিয়া ও-ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ির দিকে যাইতেছে—আর কেহ কোথাও নাই, তাহাকেই না বলিলে চলে না। উদ্দেশে ডাকিয়া বলিল—এই গিয়ে—আমি যাচ্ছি, আমার আবার কাজ—

মেয়েটি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—চলে যাবেন? দাঁড়ান, পিসিমাকে ডাকি—চা খেয়েছেন?

অপু বলিল—চা তা—থাক্, বরং অন্য একদিন—

মেয়েটি বলিল—বসুন, বসুন—দাঁড়ান চা আনি—পিসিমাকে ডাকি দাঁড়ান।

কিন্তু খানিকটা পরে মেয়েটিই এক পেয়ালা চা ও একটা প্লেটে কিছু হালুয়া আনিয়া তাহার সামনে বসিল। অপু ক্ষুধার মুখে হালুয়াটুকু গোগ্রাসে গিলিল। গরম চা খাইতে গিয়া প্রথম চুমুকে মুখ পুড়াইয়া ফেলিয়া ঢালিয়া ঢালিয়া খাইতে লাগিল।

মেয়েটি বলিল—আপনি বুঝি ওদের খুড়তুতো ভাই? থাক্ প্লেটটা এখানেই—আর একটু হালুয়া আনব?

—হালুয়া? ...না—ইয়ে তেমন ক্ষিদে নেই—হ্যাঁ, সুরেশদার বাবা আমার জ্যাঠামশাই হতেন, জ্ঞাতি-সম্পর্ক—

এই সময় অতসী ঘরে ঢোকাতে মেয়েটি চায়ের বাটি ও প্লেট লইয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়িতে খাইয়া অনেক রাত্রে সে নিজের থাকিবার স্থানে ফিরিয়া দেখিল আরও একজন লোক সেখানে রাত্রের জন্য আশ্রয় লইয়াছে। মাঝে মাঝে এরকম আসে, কারখানার লোকের দু-একজন আত্মীয়স্বজন মাঝে মাঝে আসে ও দু-চার দিন থাকিয়া যায়। একে ছোট ঘব, থাকিবার কষ্ট, তাহাতে লোক বাড়িলে এইটুকু ঘরের মধ্যে তিষ্ঠানো দায় হইয়া উঠে। পরনেব কাপড় এমন ময়লা যে, ঘরের বাতাসে একটা অপ্রীতিকর গন্ধ। অপু সব সহ্য করিতে পারে, এক ঘরে এ-ধরনের নোংরা স্বভাবের লোকের ভিড়ের মধ্যে শুইতে পারে না, জীবনে সে তা কখনও করে নাই—ইহা তাহার অসহ্য। কোথায় রাত্রে আসিয়া নির্জনে একটু পড়াশুনা করিবে—না, ইহাদের বক্‌বকের চোটে সে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। নতুন লোকটি বড়োবাজারের আলু-পোস্তায় আলুর চালান লইয়া আসে—হুগলী জেলার কোন জায়গা হইতে, অপু জানে, আরও একবার আসিয়াছিল। লোকটি বলিল, কোথায় যান, ও মশায়? আবার বেরোন না-কি?

অপু বলিল, এইখানটাতে দাঁড়িয়ে—বেজায় গরম আজ...

একটু পরে লোকটা বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিছানাটা কি মহাশয়ের? আসুন, আসুন, সরিয়ে ন্যান্ একটু—এঃ—হুঁকোর জলটা গেল গড়িয়ে পড়ে—দুত্তোর—নাঃ—

অপু বিছানা সরাইয়া পুনরায় বাহিরে আসিল। সে কি বলিবে? এখানে তাহার কি জোর খাটে? উহারাই উপরোধে পড়িয়া দয়া করিয়া থাকিতে দিয়াছে এখানে।.মুখে কিছু না বলিলেও অপু অন্যদিন হয়তো মনে মনে বিরক্ত হইত, কিন্তু আজ সে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ছিল। বাহিরের বারান্দায়

জীর্ণ কাঠের রেলিং ধরিয়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল—সুরেশদাদের কেমন চমৎকার বাড়ি কলকাতায়! ইলেকট্রিক পাখা, আলো, ঘরগুলি কেমন সাজানো, মেয়েটির কেমন সুন্দর কাপড় পরনে। চারটা না বাজিতে চা, জলখাবার, চারিদিকে যেন লক্ষ্মীশ্রী, কিছুরই অভাব নাই।

তাহাদেরই যে কি হইয়াছে, কোথায় মা আছে একটেরে পড়িয়া, কলিকাতা শহরে, এই রকম ছন্নছাড়া অবস্থায় সে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পেট পুরিয়া আহার জোটে না, পরনে নাই কাপড়!...

দিন তিনেক পরে জগদ্ধাত্রী পূজা। কলিকাতায় এত উৎসব জগদ্ধাত্রী পূজায়, তা সে জানিত না। দেশে কখনও এ পূজা কোথাও হইত না—কোথাও দেখে নাই। গলিতে গলিতে, সর্বত্র উৎসবের নহবত বাজিতেছে, কত দুয়ারের পাশে কলাগাছ বসানো, দেবদারুর পাতার মালা টাঙানো।

কাঠের কারখানার পাশের গলিটার মধ্যে একজন বড়োলোকের বাড়িতে পূজা। সন্ধ্যার সময় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা সারি বাঁধিয়া বাড়িটার মধ্যে ঢুকিতেছে—অপু ভাবিল, সেও যদি যায়!...কতকাল নিমন্ত্রণ খায় নাই! কে তাহাকে চিনিবে?...খুব লোভও হইল, ভয়ও হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শীতকালের দিকে একদিন কলেজ ইউনিয়নে প্রণব একটা প্রবন্ধ পাঠ করিল। ইংরেজিতে লেখা, বিষয়—'আমাদের সামাজিক সমস্যা'; বাছিয়া বাছিয়া শক্ত ইংরেজিতে সে নানান সমস্যার উল্লেখ করিয়াছে; বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি। সে প্রত্যেক সমস্যাটি নিজের দিক হইতে দেখিতে চাহিয়াছে এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সনাতন প্রথার স্বপক্ষে মত দিয়াছে। প্রণবের উচ্চারণ ও বলিবার ভঙ্গি খুব ভালো, যুক্তির ওজন অনুসারে সে কখনও ডান হাতে ঘুঁষি পাকাইয়া, কখনও মুঠাদ্বারা বাতাস আঁকড়াইয়া, কখনও বা সম্মুখের টেবিলে সশব্দে চাপড় মারিয়া বাল্যবিবাহের প্রয়োজনীয়তা ও স্ত্রীশিক্ষার অসারত্ব প্রমাণ করিয়া দিল। প্রণবের বন্ধুদলের ঘন ঘন করতালিতে প্রতিপক্ষের কানে তালা লাগিবার উপক্রম হইল।

অপর পক্ষে উঠিল মন্মথ—সেই যে-ছেলেটি পূর্বে সেন্ট জেভিয়ারে পড়িত। লাটিন জানে বলিয়া ক্লাসে সকলে তাহাকে ভয় করিয়া চলে, তাহার সামনে কেহ ভয়ে ইংরেজি বলে না, পাছে ইংরেজির ভুল হইলে তাহার বিদ্রূপ শুনিতে হয়। সাহেবদের চালচলন, ডিনারের এটিকেট, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে ক্লাসের মধ্যে সে অথরিটি—তাহার উপর কাবুর কথা খাটে না। ক্লাসের এক হতভাগ্য ছাত্র সাহেবপাড়ার কোন রেস্তোরাঁতে তাহার সহিত খাইতে গিয়া ডান হাতে কাঁটা ধরিবার অপরাধে এক সপ্তাহকাল ক্লাসে, সকলের সামনে মন্মথর টিটকারি সহ্য করে। মন্মথর ইংরেজি আরও চোখা, কম আড়ষ্ট, উচ্চারণও সাহেবি ধরনের। কিন্তু একেই তাহার উপর ক্লাসের অনেকের রাগ আছে, এদিকে আবার সে বিদেশী বুলি আওড়াইয়া সনাতন হিন্দুধর্মের চিরাচরিত প্রথার নিন্দাবাদ করিতেছে; ইহাতে একদল ছেলে খুব চটিয়া উঠিল—চারিদিক হইতে 'shame shame,–withdraw, withdraw,' রব উঠিল—তাহার নিজের বন্ধুদল প্রশংসাসূচক হাততালি দিতে লাগিল—ফলে এত গোলমালের সৃষ্টি হইয়া পড়িল যে, মন্মথ বক্তৃতার শেষের দিকে কি বলিল সভার কেহই তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারিল না।

প্রণবের দলই ভারী। তাহারা প্রণবকে আকাশে তুলিল, মন্মথকে স্বধর্মবিরোধী নাস্তিক বলিয়া গালি দিল, সে যে হিন্দুশাস্ত্র একছত্রও না পড়িয়া কোন্ স্পর্ধায় বর্ণাশ্রম ধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সভায় কথা বলিতে সাহস করিল, তাহাতে কেহ কেহ আশ্চর্য হইয়া গেল। লাটিন-ভাষার সহিত তাহার

পরিচয়ের সত্যতায়ও দু-একজন তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিল (লাটিন জানে বলিয়া অনেকের রাগ ছিল তাহার উপর)। একজন দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—প্রতিপক্ষের বক্তার সংস্কৃতে যেমন অধিকার, যদি তাঁহার লাটিন ভাষার অধিকারও সেই ধরনের—

আক্রমণ ক্রমেই ব্যক্তিগত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সভাপতি—অর্থনীতির অধ্যাপক মিঃ দে বলিয়া উঠিলেন—Come, Come, Manmatha has never said that he is a Seneca or a Lucretius–have the goodness to come to the point.

অপু এই প্রথম এরকম ধরনের সভায় যোগ দিল—স্কুলে এসব ছিল না, যদিও হেডমাস্টার প্রতিবারই হইবার আশ্বাস দিতেন। এখানে এদিনকার ব্যাপারটা তাহার কাছে নিতান্ত হাস্যাস্পদ ঠেকিল। ওসব মামুলি কথা মামুলিভাবে বলিয়া লাভ কি? সামনের অধিবেশনে সে নিজে একটা প্রবন্ধ পড়িবে। সে দেখাইয়া দিবে—ওসব একঘেয়ে মামুলি বুলি না আওড়াইয়া কি ভাবে প্রবন্ধ লেখা যায়। একেবারে নূতন এমন বিষয় লইয়া সে লিখিবে, যাহা লইয়া কখনও কেহ আলোচনা করে নাই।

এক সপ্তাহ খাটিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিল। নাম—'নূতনের আহ্বান'; সকল বিষয়ে পুরাতনকে ছাঁটিয়া একেবারে বাদ। কি আচার-ব্যবহার, কি সাহিত্য, কি দেখিবার ভঙ্গি—সব বিষয়েই নূতনকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। অপু মনে মনে অনুভব করে, তাহার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা খুব বড়ো, খুব সুন্দর। তাহার উনিশ বৎসরের জীবনের প্রতিদিনের সুখদুঃখ, পথের যে-ছেলেটি অসহায়ভাবে কাঁদিয়া উঠিয়াছে, কবে এক অপরাহ্ণের ম্লান আলোয় যে পাখিটা তাহাদের দেশের বনের ধারে বসিয়া দোল খাইত, দিদির চোখের মমতা-ভরা দৃষ্টি, লীলার বন্ধুত্ব, রানুদি, নির্মলা, দেবব্রত, রৌদ্রদীপ্ত নীলাকাশ, জ্যোৎস্না রাত্রি—নানা কল্পনাব টুকরা, কত কি আশা-নিরাশাব লুকোচুরি—সবসুদ্ধ লইয়া এই যে উনিশটি বৎসর—ইহা তাহার বৃথা যায় নাই—কোটি কোটি যোজন দূর শূন্যপার হইতে সূর্যের আলো যেমন নিঃশব্দ জ্যোতির অবদানে শীর্ণ শিশু-চারাকে পত্রপুষ্পফলে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে, এই উনিশ বৎসরের জীবনের মধ্য দিয়া শাশ্বত অনন্ত তেমনি ওর প্রবর্ধমান তরুণ প্রাণে তাহার বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছে—ছায়ান্ধকার তৃণভূমির গন্ধে, ডালে ডালে সোনার সিঁদুর-মাখানো অপরূপ সন্ধ্যায়; উদার কল্পনায় ভরপুর নিঃশব্দ জীবনমায়ায়।—সে একটা অপূর্ব শক্তি অনুভব করে নিজের মধ্যে—এটা যেন বাহিরে প্রকাশ করিবার জিনিস—মনে-মনে ধরিয়া রাখার নয়। কোথায় থাকিবে প্রণব আর মন্মথ?...সবাই মামুলি কথা বলে। সকল বিষয়ে এই মামুলি ধরন যেন তাহাদের দেশের একচেটে হইয়া উঠিতেছে—যেমন গবুড়ের মতো ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়া সারা পৃথিবীটার রসভাণ্ডার গ্রাস করিতে ছুটিতেছে, সে তীব্র আগ্রহ ভরা পিপাসার্ত নবীন মনের সকল কল্পনা তাহাতে তৃপ্ত হয় না। ইহারই বিরুদ্ধে, ইহাদের সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে, সব ওলট-পালট করিয়া দিবার নিমিত্ত সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে তাহাদিগকে এবং সে-ই হইবে তাহার অগ্রণী।

দিন কতক ধরিয়া অপু ক্লাসে ছেলেদের মধ্যে তাহার স্বভাবসিদ্ধ ধরনে গর্ব করিয়া বেড়াইল যে, এমন প্রবন্ধ পড়িবে যাহা কেহ কোনদিন লিখিবার কল্পনা করে নাই, কেহ কখনও শোনে নাই ইত্যাদি। লজিকের ছোকরা-প্রোফেসার ইউনিয়নের সেক্রেটারি, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি বলে নোটিশ দেবো তোমার প্রবন্ধের হে, বিষয়টা কি?

পরে নাম শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন,—বেশ, বেশ! নামটা বেশ দিয়েছ—but why not—পুরাতনের বাণী? অপু হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। নির্দিষ্ট দিনে যদিও ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের সভাপতি হইবার কথা নোটিশে ছিল, তিনি কার্যবশত আসিতে পারিলেন না। ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ বসুকে সভাপতির আসনে বসিতে সকলে অনুরোধ করিল। ভিড় খুব হইয়াছে, প্রকাশ্য সভায় অনেক লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিছু করা অপুর এই প্রথম। প্রথমটা তাহার পা কাঁপিল, গলাও খুব কাঁপিল,

কিন্তু ক্রমে বেশ সহজ হইয়া আসিল। প্রবন্ধ খুব সতেজ—এ বয়সে যাহা কিছু দোষ থাকে—উচ্ছ্বাস, অনভিজ্ঞ আইডিয়ালিজম—ভালো মন্দ নির্বিশেষে পুরাতনকে ছাঁটিয়া ফেলিবার দম্ভ—বেপরোয়া সমালোচনা, তাহার প্রবন্ধে কোনটাই বাদ যায় নাই। প্রবন্ধ পড়িবার পরে খুব হৈ-চৈ হইল। খুব তীব্র সমালোচনা হইল। প্রতিপক্ষ কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়িল না। কিন্তু অপু দেখিল অধিকাংশ সমালোচকই ফাঁকা আওয়াজ করিতেছে। সে যাহা লইয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছে, সে বিষয়ে কাহারও কিছু অভিজ্ঞতাও নাই, বলিবার বিষয়ও নাই, তাহারা তাহাকে মন্মথর শ্রেণীতে ফেলিয়া দেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী বলিয়া গালাগালি দিতে শুরু করিয়াছে।

অপু মনে মনে একটু বিস্মিত হইল। হয়তো সে আরও পরিস্ফুট করিয়া লিখিলে ভালো করিত। জিনিসটা কি পরিষ্কার হয় নাই? এত বড়ো সভার মধ্যে তাহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ দু-একজন বন্ধু ছাড়া সকলেই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে,—টিটকারি গালাগালি অংশের জন্য মন্মথকে হিংসা করার তাহার কিছুই নাই। শেষে সভাপতি তাহাকে প্রতিবাদের উত্তর দিবার অধিকার দেওয়াতে সে উঠিয়া ব্যাপারটা আরও খুলিয়া বলিবার চেষ্টা করিল। দু-চারজন সমালোচক—যাহাদের প্রতিবাদ সে বসিয়া নোট করিয়া লইয়াছিল, তাহাদিগকে উত্তর দিতে গিয়া যুক্তির খেই হারাইয়া ফেলিল। অপর পক্ষ এই অবসরে আর এক পালা হাসিয়া লইতে ছাড়িল না। অপু রাগিয়া গিয়াছিল, এইবার যুক্তির পথ না ধরিয়া উচ্ছ্বাসের পথ ধরিল। সকলকে সংকীর্ণমনা বলিয়া গালি দিল, একটা বিদ্রুপাত্মক গল্প বলিয়া অবশেষে টেবিলের উপর একটা কিল মারিয়া এমার্সনের একটা কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে বক্তৃতার উপসংহার করিল।

ছেলেদের দল খুব গোলমাল করিতে করিতে হলের বাহির হইয়া গেল। বেশির ভাগ ছেলে তাহাকে যা তা বলিতেছিল—নিছক বিদ্যা জাহির করিবার চেষ্টা ছাড়া তাহার প্রবন্ধ যে অন্য কিছুই নহে, ইহাও অনেকের মুখে শোনা যাইতেছে। সে শেষের দিকে এমার্সনের এই কবিতাটি আবৃত্তি করিয়াছিল—

"I am the owner of the sphere
Of the seven stars and the solar year.'

তাহাতেই অনেকে তাহাকে দাম্ভিক ঠাওরাইয়া নানারূপ বিদ্রূপ ও টিটকারি দিতেও ছাড়িল না। কিন্তু অপু ও-কবিতাটায় নিজেকে আদৌ উদ্দেশ করে নাই, যদিও তাহার নিজেকে জাহির করার স্পৃহাও কিছু কম ছিল না বা মিথ্যা গর্ব প্রকাশে সে ক্লাসের কাহারও অপেক্ষা কম নহে, বরং বেশি।

তাহার নিজের দলের কেহ কেহ তাহাকে ঘিরিয়া কথা বলিতে বলিতে চলিল। ভিড় একটু কমিয়া গেলে সে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কলেজ হইতে বাহির হইতে যাইতেছিল, গেটের কাছে একটি সতেরো-আঠারো বছরের লাজুক প্রকৃতির ছেলে তাহাকে বলিল—একটুখানি দাঁড়াবেন?

অপু ছেলেটিকে চেনে না, কখনও দেখে নাই। একহারা, বেশ সুশ্রী, পাতলা সিল্কের জামা গায়ে, পায়ে জরির নাগরা জুতা।

ছেলেটি কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—আপনার প্রবন্ধটা আমায় একটু পড়তে দেবেন? কাল আবার আপনাকে ফেরত দেব।

অপুর আহত আত্মাভিমান পুনরায় হঠাৎ ফিরিয়া আসিল। খাতাখানা ছেলেটির হাতে দিয়া বলিল,—দেখবেন কাইন্ডলি, যেন হারিয়ে না যায়—আপনি বুঝি—সায়েন্স?—ও।

পরদিন কলেজ বসিবার সময় ছেলেটি গেটেই দাঁড়াইয়াছিল—অপুর হাতে খাতাখানা ফিরাইয়া দিয়া ছোট একটি নমস্কার করিয়াই ভিড়ের মধ্যে কোথায় চলিয়া গেল। অন্যমনস্ক ভাবে ক্লাসে বসিয়া অপু খাতাখানা উলটাইতেছিল, একখানা কি কাগজ খাতাখানার ভিতর হইতে বাহির হইয়া ইলেকট্রিক

পাখার হাওয়ায় খানিকটা উড়িয়া গেল। পাশের ছেলেটি সেখানা কুড়াইয়া তাহার হাতে দিলে সে পড়িয়া দেখিল, পেন্সিলে লেখা একটি কবিতা—তাহাকে উদ্দেশ করিয়া :—

শ্রীযুক্ত অপূর্বকুমার রায়

করকমলেষু—

বাঙ্গালী সমাজ যেন পঙ্কময় বদ্ধ জলাশয়
নাহি আলো স্বাস্থ্যভরা, বহে হেথা বায়ু বিষময়
জীবন-কোরকগুলি, অকালে শুকায়ে পড়ে ঝরি,
বাঁচাবার নাহি কেহ, সকলেই আছে যেন মরি।
নাহি চিন্তা, নাহি বুদ্ধি, নাহি ইচ্ছা, নাহি উচ্চ আশা,
সুখদুঃখহীন এক জড়পিণ্ড, নাহি মুখে ভাষা।
এর মাঝে দেখি যবে কোনো মুখ উজ্জ্বল সরল,
নয়নে আশার দৃষ্টি, ওষ্ঠপ্রান্তে জীবন হরষ—
অধরে ললাটে ভ্রূতে প্রতিভার সুন্দর বিকাশ,
স্থির দৃঢ় কণ্ঠস্বরে ইচ্ছাশক্তি প্রত্যক্ষ প্রকাশ,
সম্ভ্রমে হৃদয় পুরে আনন্দ ও আশা জাগে প্রাণে,
সম্ভাষিতে চাহে হিয়া বিমল প্রীতির অর্ঘ্যদানে।
তাই এই ক্ষীণ-ভাষা ছন্দে গাঁথি দীন উপহার
লজ্জাহীন অসংকোচে আনিয়াছি সম্মুখে তোমার,
উচ্চলক্ষ্য, উচ্চআশা বাঙ্গালায় এনে দাও বীর
সুযোগ্য সন্তান যে রে তোরা সবে বঙ্গ-জননীর।

গুণমুগ্ধ
শ্রী—
ফার্স্ট ইয়ার, সায়েন্স, সেকশন বি।

অপু বিস্মিত হইল। আগ্রহের ও ঔৎসুক্যের সহিত আর একবার পড়িল—তাহাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। একে চায় তো আরে পায়,—একেই নিজের কথা পরকে জাঁক করিয়া বেড়াইতে সে অদ্বিতীয়, তাহার উপর তাহারই উদ্দেশে লিখিত এক অপরিচিত ছাত্রের এই পত্র পাইয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে সে ভুলিয়া গেল যে, ক্লাসে স্বয়ং মিঃ বসু ইতিহাসের বক্তৃতায় কোন এক রোমান সম্রাটের অমানুষিক ঔদরিকতার কাহিনী সবিস্তারে বলিতেছেন। সে পাশের ছেলেকে ডাকিয়া পত্রখানা দেখাইতে যাইতেই জানকী খোঁচা দিয়া বলিল,—এই! সি.সি.বি. এক্ষুনি বকে উঠবে—তোর দিকে তাকাচ্ছে, সামনে চা—এই!

আঃ—কতক্ষণে সি.সি.বি.-র এই বাজে বকুনি শেষ হইবে!—বাহিরে গিয়া সকলকে চিঠিখানা দেখাইতে পারিলে যে সে বাঁচে!—ছেলেটিকেও খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

ছুটির পর গেটের কাছেই ছেলেটির সঙ্গে দেখা হইল। বোধ হয় সে তাহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। কলেজের মধ্যে এইরূপ একজন মুগ্ধ ভক্ত পাইয়া অপু মনে মনে গর্ব অনুভব করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই তাহার পুরাতন মুখচোরা রোগ! তবে তাহার পক্ষে একটু সাহসের বিষয় এই দাঁড়াইল যে, ছেলেটি তাহার অপেক্ষাও লাজুক। অপু গিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া তাহার হাত ধরিল। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হইল। কেহই কাগজে লেখা পদ্যটার কোনও উল্লেখ করিল না, যদিও দুজনেই বুঝিল যে, তাহাদের আলাপের মূলে কালকের সেই চিঠিখানা। কিছুক্ষণ পর ছেলেটি বলিল—চলুন কোথাও বেড়াতে যাই, কলকাতার বাইরে কোথাও মাঠে—শহরের মধ্যে হাঁপ ধরে—কোথাও একটা ঘাস দেখবার জো নেই—

কথাটা শুনিয়াই অপুর মনে হইল, এ ছেলেটি তো সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। ঘাস না দেখিয়া কষ্ট হয় এমন কথা তো আজ প্রায় এক বৎসর কলিকাতার অভিজ্ঞতায় কলেজের কোন বন্ধুর মুখে শোনে নাই।

সাউথ সেকশনের ট্রেনে গোটাচারেক স্টেশন পরে তাহারা নামিল। অপু কখনও এদিকে আসে নাই। ফাঁকা মাঠ, কেয়া ঝোপ, মাঝে মাঝে হোগলা বন। সরু মেঠো পথ ধরিয়া দুজনে হাঁটিয়া চলিতেছিল—ট্রেনের অল্প আধঘণ্টার আলাপেই দুজনের মধ্যে একটা নিবিড় পরিচয় জমিয়া উঠিল। মাঠের মধ্যে একটা গাছের তলায় ঘাসের উপরে দুজনে গিয়া বসিল।

ছেলেটি নিজের ইতিহাস বলিতেছিল—

হাজারিবাগ জেলায় তাহাদের এক অভ্রের খনি ছিল, ছেলেবেলায় সে সেখানেই মানুষ। জায়গাটার নাম বড়বনী, চারিধারে পাহাড় আর শাল-পলাশের বন, কিছু দূরে দারুকেশ্বর নদী। নিকটে পাহাড়ের গায়ে একটা ঝরনা...পড়ন্ত বেলায় শালবনের পিছনের আকাশটা কত কি রঙে রঞ্জিত হইত—প্রথম বৈশাখে শাল-কুসুমের ঘন সুগন্ধ দুপুরে রৌদ্রকে মাতাইত, পলাশবনে বসন্তের দিনে যেন ডালে ডালে আরতির পঞ্চপ্রদীপ জ্বলিত—সন্ধ্যার পরই অন্ধকারে গা ঢাকিয়া বাঘেরা আসিত ঝরনার জল পান করিতে—বাংলো হইতে একটু দূরে বালির উপর কতদিন সকালে বড়ো বড়ো বাঘের পায়ের থাবার দাগ দেখা গিয়াছে।

সেখানকার জ্যোৎস্না রাত্রি! সে রাত্রির বর্ণনা নাই, ভাষা জোগায় না। স্বর্গ যেন দূরের নৈশকুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্ট পাহাড়শ্রেণীর ওপারে—ছায়াহীন, সীমাহীন, অনন্তরসক্ষরা জ্যোৎস্না যেন দিক্‌চক্রবালে তাহারই ইঙ্গিত দিত।

এক-আধদিন নয়, শৈশবের দশ-দশটি বৎসর সেখানে কাটিয়াছে। সে অন্য জগৎ, পৃথিবীর মুক্ত প্রসারতার রূপ সেখানে চোখে কি মায়া-অঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছে—কোথাও আর ভালো লাগে না! অভ্রের খনিতে লোকসান হইতে লাগিল, খনি অপরে কিনিয়া লইল, তাহার পর হইতেই কলিকাতায়। মন হাঁপাইয়া উঠে—খাঁচার পাখির মতো ছটফট করে। বাল্যের সে অপূর্ব আনন্দ মন হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

অপু এ ধরনের কথা কাহারও মুখে এ পর্যন্ত শোনে নাই—এ যে তাহারই অন্তরের কথার প্রতিধ্বনি। গাছপালা, নদী, মাঠ ভালোবাসে বলিয়া দেওয়ানপুরে তাহাকে সবাই বলিত পাগল। একবার মাঘ মাসের শেষে পথে কোন গাছের গায়ে আলোকলতা দেখিয়া রমাপতিকে বলিয়াছিল,—কেমন সুন্দর! দেখুন দেখুন রমাপতিদা—

রমাপতি মুরুব্বিয়ানার সুরে বলিয়াছিল মনে আছে—ওসব যার মাথায় ঢুকেছে তার পরকালটি একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছে।

পরকালটা কি জন্য যে ঝরঝরে হইয়া গিয়াছে, একথা সে বুঝিতে পারে নাই—কিন্তু ভাবিয়াছিল রমাপতিদা স্কুলের মধ্যে ভালো ছেলে, ফার্স্ট ক্লাসের ছাত্র, অবশ্যই তাহার অপেক্ষা ভালো জানে। এ পর্যন্ত কাহারও নিকট হইতেই সে ইহার সায় পায় নাই, এই এতদিন পরে ইহাকে ছাড়া। তাহা হইলে তাহার মতো লোকও আছে!...সে একেবারে সৃষ্টিছাড়া নয়!...

অনিল বলিল—দেখুন, এই এত ছেলে কলেজে পড়ে, অনেকের সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি—ভালো লাগে না—dull, unimaginative mind. পড়তে হয় পড়ে যাচ্ছে, বিশেষ কোন বিষয়ে কৌতূহলও নেই, জানবার একটা সত্যিকার আগ্রহও নেই। তাছাড়া এত ছোট কথা নিয়ে থাকে যে, মন মোটে—মানে, কেমন যেন,—যেন মাটির উপর hop করে বেড়ায়! প্রথম সেদিন আপনার কথা শুনে মনে হল, এই একজন অন্য ধরনের, এ দলের নয়।

অপু মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। এসব সে-ও নিজের মনের মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করিয়াছে, অপরের সঙ্গে নিজের এ পার্থক্য মাঝে মাঝে তাহার কাছে ধরা পড়িলেও সে নিজের

সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নয় বলিয়া এ জিনিসটা বুঝিতে পারিত না। তাহা ছাড়া অপুর প্রকৃতি আরও শান্ত, উগ্রতাশূন্য ও উদার,—পরের তীব্র সমালোচনা ও আক্রমণের ধাতই নাই তাহার একেবারে।—কিন্তু তাহার একটা মহৎ দোষ এই যে নিজের বিষয়ে কথা একবার পাড়িলে সে আর ছাড়িতে চায় না—অপরেও যে নিজেদের সম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছা করিতে পারে, তরুণ বয়সের অনাবিল আত্মম্ভরিতা ও আত্মপ্রত্যয় সে বিষয়ে তাহাকে অন্ধ করিয়া রাখে। সুতরাং সে নিজের বিষয়ে একটানা কথা বলিয়া যায়—নিজের ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, নিজের ভালোমন্দ লাগা, নিজের পড়াশুনা। নিজের কোন দুঃখদুর্দশার কথা বলে না, কোন ব্যথা-বেদনার কথা তোলে না—জলের উপরকার দাগের মতো সে-সব কথা তাহার মনে মোটে স্থান পায় না। আনকোরা তাজা নবীন চোখের দৃষ্টি শুধুই সম্মুখের দিকে, সম্মুখের বহুদূর দিকচক্রবাল রেখারও ওপারে—আনন্দ ও আশায় ভরা এক অপূর্ব রাজ্যের দিকে।

সন্ধ্যার পরে বাসায় ফিরিয়া চিমনি-ভাঙা পুরোনো হিঙ্কসের লণ্ঠনটা জ্বালিয়া সে পকেট হইতে অনিলের চিঠিখানা বাহির করিয়া আবার পড়িতে বসিল। আমায় যে ভালো বলে, সে আমার পরম বন্ধু, আমার মহৎ উপকার করে, আমার আত্মপ্রত্যয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করে, আমার মনের গভীর গোপন কোনও লুকানো রত্নকে দিনের আলোয় মুখ দেখাইতে সাহস দেয়।

পড়িতে পড়িতে পাশের বিছানার দিকে চাহিয়া মনে পড়ে—আজ আবার তাহার ঘরের অপর লোকটির এক আত্মীয় কাঁচরাপাড়া হইতে আসিয়াছে এবং এই ঘরেই শুইবে। সে আত্মীয়টির বয়স বছর ত্রিশেক হইবে; কাঁচরাপাড়া লোকো অফিসে চাকরি করে, বেশি লেখাপড়া না জানিলেও অনবরত যা-তা ইংরেজি বলে, হরদম সিগারেট খায়, অত্যন্ত বকে, অকারণে গায়ে পড়িয়া ভাই ভাই বলিয়া কথা বলে, তাহার মধ্যে বারো আনা থিয়েটারের গল্প, অমুক অ্যাক্‌ট্রেস তারাবাঈ-এর ভূমিকায় যে রকম অভিনয় করে, অমুক থিয়েটারের বিধুমুখীর মতো গান—বিশেষ করিয়া 'হীরার দুল' প্রহসনে বেদেনীর ভূমিকায়, 'নয়ন জলের ফাঁদ পেতেছি' নামক সেই বিখ্যাত গানখানি সে যেমন গায়, তেমন আর কোথায়, কে গাহিতে পারে?—তিনি এজন্য বাজি ফেলিতে প্রস্তুত আছেন।

এসব কথা অপুর ভালো লাগে না, থিয়েটারের কথা শুনিতে তাহার কোনও কৌতূহল হয় না। এ লোকটির চেয়ে আলুর ব্যবসাদারটি অনেক ভালো। সে পাড়াগাঁয়ের লোক, অপেক্ষাকৃত সরল প্রকৃতির, আর এত বাজে কথা বলে না; অন্তত তাহার সঙ্গে তো নয়ই। এ ব্যক্তিটির যত গল্প তাহার সঙ্গে।

মনে মনে ভাবে—একটু ইচ্ছে করে—বেশ একা একটি ঘর হয়, একা বসে পড়াশুনো করি, টেবিল থাকে একটা, বেশ ফুল কিনে এনে গ্লাসের জলে দিয়ে সাজিয়ে রাখি। এ ঘরটায় না আছে জানালা, পড়তে পড়তে একটু খোলা আকাশ দেখবার জো নাই, তামাকের গুল রোজ পরিষ্কার করি, আর রোজ ওরা এইরকম নোংরা করবে—মা ওয়াড় করে দিয়েছিল, ছিঁড়ে গিয়েছে, কি বিশ্রী তেল-চিটচিটে বালিশটা হয়েছে—। এবার হাতে পয়সা হলে একটা ওয়াড় করব।

অনিলের সঙ্গে পরদিন বৈকালে গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গেল। চাঁদপাল ঘাটে, প্রিন্সেপ্‌স্‌ ঘাটে বড়ো বড়ো জাহাজ নোঙর করিয়া আছে, অপু পড়িয়া দেখিল ঃ কোনটার নাম 'বম্বে', কোনটার নাম 'ইদজ্জু মারু'। সেদিন বৈকালে নতুন ধরনের রং-করা একখানা বড়ো জাহাজ দেখিয়াছিল, নাম লেখা আছে 'শেনানডোয়া', অনিল বলিল, আমেরিকান মাল জাহাজ—জাপানের পথে আমেরিকায় যায়। অপু অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া জাহাজখানি দেখিল। নীল পোশাক-পরা একটা লস্কর রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া জলের মধ্যে কি দেখিতেছে। লোকটি কি সুখী। কত দেশবিদেশে বেড়ায়, কত সমুদ্রে পাড়ি দেয়, চীন সমুদ্রে টাইফুনে পড়িয়াছে, পিনাং-এর নারিকেলকুঞ্জের ছায়ায় কত দুপুর কাটাইয়াছে, কত ঝড়বৃষ্টির রাত্রে এই রকম রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া বাত্যাক্ষুব্ধ, উত্তাল, উন্মত্ত মহাসমুদ্রের রূপ দেখিয়াছে। কিন্তু ও লোকটা বোঝে কি? কিছুই না। ও কি দূর হইতে ফুজিয়ামা দেখিয়া আত্মহারা

হইয়াছে? দক্ষিণ আমেরিকার কোনও বন্দরে নামিয়া পথের ধারে কি গাছপালা আছে তাহা নিবিষ্ট মনে সাগ্রহে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে? হয়তো জাপানের পথের ধারে বাংলা দেশের পরিচিত কোনও ফুল আছে, ও লোকটি জানে না, হয়তো ক্যালিফোর্নিয়ার শহরবন্দর হইতে দূরে নির্জন Sierra-র ঢালুতে বনঝোপের নানা অচেনা ফুলের সঙ্গে তাহাদের দেশের সন্ধ্যামণি ফুলও ফুটিয়া থাকে, ও লোকটা কি কখনও সেখানে সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় বড়ো একখণ্ড পাথরের উপর আপন মনে বসিয়া নীল আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়াছে?

অথচ ও লোকটারই অদৃষ্টে ঘটিতেছে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ, সমুদ্রে-সমুদ্রে বেড়ানো—যাহার চোখ নাই, দেখিতে জানে না; আর সে যে শৈশব হইতে কত সাধ পুষিয়া রাখিয়া আসিতেছে মনের কোণে, তাহার কি কিছুই হইবে না? ...কবে যে সে যাইবে! ...কলিকাতার শীতের রাত্রের এ ধোঁয়া তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। চোখ জ্বালা করে, নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে, কিছু দেখা যায় না, মন তাহার একেবারে পাগল হইয়া ওঠে—এ এক অপ্রত্যাশিত উপদ্রব! কে জানিত শীতকালে কলিকাতার এ চেহারা হয়!

ওই লোকটার মতো জাহাজের খালাসী হইতে পারিলেও সুখ ছিল!

Ship ahoy ! ...কোথাকার জাহাজ?...

কলিকাতা হইতে পোর্ট মর্সবি, অস্ট্রেলেশিয়া,

ওটা কি উঁচুমতো দূরে?

প্রবালের বড়ো বাঁধ—The Great Barrier Reef–

এই সমুদ্রের ঠিক এই স্থানে, প্রাচীন নাবিক টাস্‌ম্যান ঘোর তুফানে পড়িয়া মাস্তুল ভাঙা পালছেঁড়া ডুবু ডুবু অবস্থায় অকূলে ভাসিতে ভাসিতে বারো দিনের দিন কূল দেখিতে পান—সেইটাই—সেকালে ভ্যান ডিমেন্‌স্‌ল্যান্ড, বর্তমানে টাসমেনিয়া।...কেমন দূরে নীল চক্রবালরেখা!...উড়ন্ত সিন্ধু-শকুনদলের মাতামাতি, প্রবালের বাঁধের উপর বড়ো বড়ো ঢেউয়ের সবেগে আছড়াইয়া পড়ার গম্ভীর আওয়াজ।

উপকূলরেখার অনেক পিছনে যে পাহাড়টা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ওটা হয়তো জলহীন দিক-দিশাহীন ধূ ধূ নির্জন মরুর মধ্যে...শুধুই বালি আর শুকনা বাবুল গাছের বন,...শত শত ক্রোশ দূরে ওর অজানা অধিত্যকায় লুকানো আছে সোনার খনি, কালো ওপ্যালের খনি...এই খর, জ্বলন্ত, মরুরৌদ্রে খনির সন্ধানে বাহির হইয়া কত লোক ওদিকে গিয়াছিল আর ফেরে নাই, মরুদেশের নানা স্থানে তাহাদের হাড়গুলা রৌদ্রে বৃষ্টিতে ক্রমে সাদা হইয়া আসিল।

অনিল বলিল, চলুন, আজ সন্ধে হয়ে গেল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাহাজ দেখে আর কি হবে?...

অপু সমুদ্র-সংক্রান্ত বহু বই কলেজ লাইব্রেরি হইতে পড়িয়া ফেলিয়াছে! কেমন একটা নেশা, কখনও কোন ছাত্র যাহা পড়ে না, এমন সব বই। বহু প্রাচীন নাবিক ও তাহাদের জলযাত্রার বৃত্তান্ত, নানা দেশ আবিষ্কারের কথা, সিবাস্টিয়ান ক্যাবট, এরিকসন, কর্টেজ ও পিজারো কর্তৃক মেক্সিকো ও পেরু বিজয়ের কথা। দুর্ধর্ষ স্পেনীয় বীর পিজারো ব্রেজিলের জঙ্গলে রূপার পাহাড়ের অনুসন্ধানে গিয়া কি করিয়া জঙ্গলের মধ্যে পথ হারাইয়া বেঘোরে অনাহারে সসৈন্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল—আরও কত কি।

পরদিন কলেজ পালাইয়া দু-জনে দুপুরবেলা স্ট্রান্ড রোডের সমস্ত স্টিমার কোম্পানির অফিসগুলি ঘুরিয়া বেড়াইল। প্রথমে 'পি. এন্ড. ও.'। টিফিনের সময় কেরানীবাবুরা নিচের জলখাবার ঘরে বসিয়া চা খাইতেছেন, কেহ বিড়ি টানিতেছেন। অপু পিছনে রহিল, অনিল আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আজ্ঞে, আমরা জাহাজে চাকরি খুঁজছি, এখানে খালি আছে জানেন?

একজন টাক-পড়া রোগা চেহারার বাবু বলিলেন,—চাকরি? জাহাজে...কোন্ জাহাজে?

—যে কোন জাহাজে—

অপুর বুক উত্তেজনায় ও কৌতূহলে ঢিপ ঢিপ করিতেছিল, কি বুঝি হয়।

বাবুটি বলিলেন, জাহাজের চাকরিতে তোমাদের চলবে না হে ছোকরা—দ্যাখো, একবার ওপরে মেরিন মাস্টারের ঘরে খোঁজ করো।

কিছুই হইল না। 'বি.আই.এস.এন' তথৈবচ। 'নিপন্-ইউশেন-কাইশা'ও তাই! টার্নার মরিসনের অফিসে তাহাদের সহিত কেহ কথাও কহিল না। বড়ো বড়ো বাড়ি, সিঁড়ি ভাঙিয়া ওঠা-নামা করিতে করিতে শীতকালেও ঘাম দেখা দিল। অবশেষে, মরীয়া হইয়া অপু গ্লাডস্টোন ওয়াইলির অফিসে চারতলায় উঠিয়া মেরিন মাস্টারের কামরায় ঢুকিয়া পড়িল। খুব দীর্ঘদেহ, অত বড়ো গোঁফ সে কখনও কাহারও দেখে নাই। সাহেব বিরক্ত হইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া কাহাকে ডাক দিল। অপুর কথা কানেও তুলিল না। একজন প্রৌঢ় বয়সের বাঙালিবাবু ঘরে ঢুকিয়া ইহাদের দেখিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—এ ঘরে কি? এসো, এসো, বাইরে এসো।

বাহিরে গিয়া অনিলের মুখে আসিবার উদ্দেশ্য শুনিয়া বলিলেন, কেন হে ছোকরা? বাড়ি থেকে রাগ করে পালাচ্ছ?

অনিল বলিল—না রাগ করে কেন পালাব?

—রাগ করে পালাচ্ছ না তো, এ মতি হল কেন? জাহাজে চাকরি খুঁজছো—কোন্ চাকরি হবে জানো? খালাসির চাকরি...এক বছরের এগ্রিমেন্টে জাহাজে উঠতে হবে। বাঙালির খাওয়া জাহাজে পাবে না...কষ্টের শেষ হবে, লস্করগুলো অত্যন্ত বদমায়েস, তোমাদের সঙ্গে বনবে না। আরও নানা কষ্ট—স্টোকারের কাজ পাবে, কয়লা দিতে দিতে জান হয়রান হবে—সে সব কি তোমাদের কাজ?

—এখন কোন জাহাজ ছাড়ছে নাকি?

—জাহাজ তো ছাড়ছে 'গোলকুণ্ডা'—আর সাতদিন পরে মঙ্গলবারে ছাড়বে মাল জাহাজ—কলম্বো হয়ে ডারবান যাবে—

দুজনেই মহা পীড়াপীড়ি শুরু করিল। তাহাদেব কোনও কষ্ট হইবে না, কষ্ট কবা তাহাদের অভ্যাস আছে। দয়া করিয়া তিনি যদি কোন ব্যবস্থা করেন। অপু প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল—তা হোক, দিন আপনি জোগাড় করে—ওসব কিছু কষ্ট না—দিন আপনি—গোরা লস্করে কি করবে আমাদের? কয়লা খুব দিতে পারব—

কেরানীবাবুটি হাসিয়া বলিলেন,—একি ছেলেখেলা হে ছোকরা! কয়লা দেবে তোমবা! বুঝতে তো পারছো না সেখানকার কাণ্ডকারখানা! বয়লারের গরম, হাওয়া নেই, দম বন্ধ হয়ে আসবে, চার শভেল কয়লা দিতে না দিতে হাতের শিরা দড়ির মতো ফুলে উঠবে—আর তাতে ওই ডেলিকেট হাত—হাঁপ জিরুতে দেবে না, দাঁড়াতে দেখলে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মারবে চাবুক—দশ হাজার ঘোড়ার জোরের এঞ্জিনের স্টিম বজায় রাখতে হবে সব সময়, নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পাবে না—আর গরম কি সোজা! কুম্ভীপাক নরকের গরম ফার্নেসের মুখে। সে তোমাদের কাজ?...

তবুও দুজনে ছাড়ে না।

ইহারা যে বাড়ি হইতে পালাইয়া যাইতেছে, সে ধারণা বাবুটির আরও দৃঢ় হইল। বলিলেন,—নাম ঠিকানা দিয়ে যাও তো তোমাদের বাড়ির। দেখি তোমাদের বাড়িতে না হয় নিজে একবার যাব।

কোনো রকমেই তাঁহাকে রাজি করাইতে না পারিয়া অবশেষে তাহারা চলিয়া আসিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

একদিন অপু দুপুরবেলা কলেজ হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া গায়ের জামা খুলিতেছে, এমন সময় পাশের বাড়ির জানালাটার দিকে হঠাৎ চোখ পড়িতে সে আর চোখ ফিরাইয়া লইতে পারিল না।

জানালাটার গায়ে খড়ি দিয়া মাঝারি অক্ষরে মেয়েলি ছাঁদে লেখা আছে—'হেমলতা আপনাকে বিবাহ করিবে।' অপু অবাক হইয়া খানিকটা সেদিকে চাহিয়া রহিল এবং পরক্ষণেই কৌতুকের আবেগে হাতের নোটখাতাখানা মেজেতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া আপন মনে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পাশের বাড়ি—তাহার ঘরটা হইতে জানালাটা হাত পাঁচ ছয় দূরে—মধ্যে একটা সরু গলি। অনেকদিন সে দেখিয়াছে, পাশের বাড়ির একটি মেয়ে জানালার গরাদে ধরিয়া এদিকে চাহিয়া আছে, বয়স চৌদ্দ-পনেরো। রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, বেশ মুখখানা, যদিও তাহাকে সুন্দরী বলিয়া কোনদিনও অপুর মনে হয় নাই। তাহার কলেজ হইতে আসিবার সময় হইলে প্রায়ই সে মেয়েটিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিত, ক্রমে শুধু দাঁড়ানো নয়, মেয়েটি তাহাকে দেখিলেই হঠাৎ হাসিয়া জানালার আড়ালে মুখ লুকায়, কখনও বা জানলাটার খড়খড়ি বারকতক খুলিয়া বন্ধ করিয়া মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে, দিনের মধ্যে দুবার, তিনবার, চারবার কাপড় বদলাইয়া ঘরটার মধ্যে অকারণে ঘোরাফেরা করে এবং ছুতা-নাতায় জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। কতদিন এরকম হয়, অপু মনে মনে ভাবে—মেয়েটা আচ্ছা বেহায়া তো! কিন্তু আজকের এ ব্যাপার একেবারে অপ্রত্যাশিত।

আজ ও-বেলা উড়ে ঠাকুরের হোটেলে খাইতে গিয়া সে দেখিয়াছিল, সুন্দর ঠাকুর মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে। দুই-তিন মাসের টাকা বাকি, সামান্য পুঁজির হোটেল, অপূর্ববাবু ইহার কি ব্যবস্থা করিতেছেন?...আর কতদিন এভাবে সে বাকি টানিয়া যাইবে?...সুন্দর ঠাকুরের কথায় তাহার মনে যে দুর্ভাবনার মেঘ জমিয়াছিল, সেটা কৌতুকের হাওয়ায় এক মুহূর্তে কাটিয়া গেল!—আচ্ছা তো মেয়েটা? দ্যাখো কি লিখে রেখেছে—ওদের—হো-হো—আচ্ছা—হি-হি—

সেদিন আর মেয়েটিকে দেখা গেল না, যদিও সন্ধ্যার সময় একবার ঘরে ফিরিয়া সে দেখিল, জানালার সে খড়ির লেখা মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। পরদিন সকালে ঘরের মধ্যে মাদুর বিছাইয়া পড়িতে পড়িতে মুখ তুলিতেই অপু দেখিতে পাইল, মেয়েটি জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। কলেজে যাইবার কিছু আগে মেয়েটি আর একবার আসিয়া দাঁড়াইল। সবে স্নান সারিয়া আসিয়াছে, লালপাড় শাড়ি পরনে, ভিজে চুল পিঠের উপর ফেলা, সোনার বালা পরা নিটোল ডান হাতটি দিয়া জানালার গরাদে ধরিয়া আছে। অল্পক্ষণের জন্য—

কথাটা ভাবিতে ভাবিতে সে কলেজে গেল। সেখানে অনেকের কাছে ব্যাপারটা গল্প করিল। প্রণব তো শুনিয়া হাসিয়া খুন, জানকীও তাই। সবাই আসিয়া দেখিতে চায়—এ যে একেবারে সত্যিকার জানালা-কাব্য! সত্যেন বলিল, নভেল ও মাসিকের পাতায় পড়া যায় বটে, কিন্তু বাস্তব জগতে এরকম যে ঘটে তাহা তো জানা ছিল না!...নানা হাসি তামাশা চলিল, সকলেই যে ভদ্রতাসঙ্গত কথা বলিয়াই ক্ষান্ত রহিল তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে।

তারপর দিনচারেক বেশ কাটিল, হঠাৎ একদিন আবার জানালায় লেখা—'হেমলতা আপনাকে বিবাহ করিবে'। জানালার খড়খড়ির গায়ে এমনভাবে লেখা যে, জানালা খুলিয়া লম্বা কব্জাটা মুড়িয়া ফেলিলে লেখাটা শুধু তাহার ঘর হইতেই দেখা যায়, অন্য কারুর চোখে পড়িবার কথা নহে। প্রণবটা যদি এ সময় এখানে থাকিত! তারপর আবার দিন-দুই সব ঠাণ্ডা।

সেদিন একটু মেঘলা ছিল—সকালে কয়েক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। দুপুরের পরই আবার খুব মেঘ করিয়া আসিল। কারখানার উঠানে মালবোঝাই মোটর লরিগুলার শব্দ একটু থামিলেও দুপুরের 'শিফ্‌ট'-এ মিস্ত্রিদের প্যাকবাক্সের গায়ে লোহার বেড় পরাইবার দুমদাম আওয়াজ বেজায়। এই বিকট আওয়াজের জন্য দুপুরবেলা এখানে তিষ্ঠানো দায়।

অপু ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া উঠিয়া বসিতেই দেখিল, মেয়েটি জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অল্পক্ষণের জন্য দুজনের চোখাচোখি হইল। মেয়েটি অন্য অন্য দিনের মতো আজও হাসিয়া ফেলিল। অপুর মাথায় দুষ্টুমি চাপিয়া গেল। সেও আগাইয়া গিয়া জানালার গরাদে ধরিয়া

দাঁড়াইল—তারপর সে নিজেও হাসিল। মেয়েটি একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল কেহ আসিতেছে কিনা—পরে সেও আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। অপু কৌতুকের সুরে বলিল,—কি গো হেমলতা, আমায় বিয়ে করবে?

মেয়েটি বলিল—করব। কথা শেষ করিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

অপু বলিল,—কি জাত তোমরা—বামুন?—আমি কিন্তু বামুন।

মেয়েটি খোঁপায় হাত দিয়া একটা কাঁটা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিতে দিতে বলিল—আমরাও বামুন।—পরে হাসিয়া বলিল—আমার নাম তো জেনেছেন, আপনার নাম কি?

অপু বলিল, ভালো নাম অপূর্ব, আমরা বাঙ্গাল দেশের লোক—শহরের মেয়ে তোমরা—আমাদের তো দুচোখে দেখতেই পারো না—তাই না? তোমায় একটা কথা বলি শোন।...ওরকম লিখো না জানালার গায়ে—যদি কেউ টের পায়?

মেয়েটি আর একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, কে টের পাবে? কেউ দেখতে পায় না ওদিক থেকে—আমি যাই, কাকিমা আসবে ঠাকুরঘর থেকে। আপনি বিকেলে রোজ থাকেন?

মেয়েটি চলিয়া গেলে অপুর হাসি পাইল। পাগল না তো? ঠিক—এতদিন সে বুঝিতে পারে নাই...মেয়েটি পাগল! মেয়েটির চোখে তাই কেমন একটা অদ্ভুত ধরনের দৃষ্টি। কথাটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর করুণা ও অনুকম্পায় তাহার সারা মন ভরিয়া গেল। মেয়ের বাপকে সে মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখে—প্রৌঢ়, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কোন অফিসের কেরানী বোধ হয়। সে কলেজে যাইবার সময় রোজ ভদ্রলোক ট্রামের অপেক্ষায় ফুটপাথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকেন। হয়তো মেয়েটির বাবাই, নয়তো কাকা বা জ্যাঠামশায়, কি মামা—মোটের উপর তিনিই একমাত্র অভিভাবক। খুব বেশি অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে হয় না। হয়তো তাহাকে দেখিয়া মেয়েটা ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছে—এরকম তো হয়!

তাহার ইচ্ছা হইল, এবার মেয়েটিকে দেখিতে পাইলে তাহাকে দুটা মিষ্ট কথা, দুটা সান্ত্বনাব কথা বলিবে। কেহ কিছু মনে করিবে? যদি নিতাইবাবু টের পায়?—পাইবে।

খবরের কাগজে সে মাঝে মাঝে ছেলে-পড়ানোর বিজ্ঞাপন খুঁজিত, একদিন দেখিল কোন একজন ডাক্তারের বাড়ির জন্য একজন প্রাইভেট টিউটর দরকার। গেল সে সেখানে। দোতলা বড়ো বাড়ি, নিচে বৈঠকখানা কিন্তু সেখানে বড়ো কেহ বসে না, ডাক্তারবাবুর কনসালটিং রুম দোতলার কোণের কামরায়, সেখানেই রোগীর ভিড়। অপু গিয়া দেখিল, নিচের ঘরটাতে অন্যূন জন পনেরো নানা বয়সের লোক তীর্থের কাকের মতো হাঁ করিয়া বসিয়া—সেও গিয়া একপাশে বসিয়া গেল। তাহার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, ওই বিজ্ঞাপনটা শুধু তাহারই চোখে পড়িয়াছে—এত সকালে, অত ছোট ছোট অক্ষরে এককোণে লেখা বিজ্ঞাপনটা—সেও ভাবিয়াছিল—উঃ...এ যে ভিড় দেখা যায় ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।

কাহাকে পড়াইতে হইবে; কোন্ ক্লাসের ছেলে, কত বড়ো, কেহই জানে না। পাশের একটি লোক জিজ্ঞাসা করিল—মশাই জানেন কিছু, কোন্ ক্লাসের—

অপু বলিল, সেও কিছুই জানে না। একটি আঠারো উনিশ বছরের ছোকরার সঙ্গে অপুর আলাপ হইল। ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করিয়া হোমিওপ্যাথি পড়ে, টিউশনির নিতান্ত দরকার, না হইলেই চলিবে না, সে নাকি কালও একবার আসিয়াছিল, নিজের দুরবস্থার কথা সব কর্তাকে জানাইয়া গিয়াছে, তাহার হইলেও হইতে পারে। ঘণ্টাখানেক ধরিয়া অপু দেখিতেছিল, কাঠের সিঁড়িটা বাহিয়া এক-একজন লোক উপরের ঘরে উঠিতেছে এবং নামিবার সময় মুখ অন্ধকার করিয়া পাশের দরজা দিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। যদি তাহারও না হয়। পড়া বন্ধ করিয়া মনসাপোতা—কিন্তু সেখানেই বা চলিবে কিসে?

চাকর আসিয়া জানাইল, আজ বেলা হইয়া গিয়াছে, ডাক্তারবাবু কাহারও সঙ্গে এখন আর দেখা করিবেন না। এক-একখানা কাগজে সকলে নিজের নিজের নামধাম ও যোগ্যতা লিখিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন, প্রয়োজন বুঝিলে জানানো যাইবে।

ছেঁদো কথা। সকলেই একবার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িল—প্রত্যেকেরই মনে মনে বিশ্বাস—একবার গৃহস্বামী তাহাকে চাক্ষুষ দেখিয়া তাহার গুণ শুনিলে আর চাকুরি না দিয়া থাকিতে পারিবেন না! অপুও ভাবিল সে উপরে যাইতে পারিলে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিত।—তবে সে নিজের দুরবস্থার কথা কাহারও কাছে বলিতে পারিবে না। তাহার লজ্জা করে, দৈন্যের কাঁদুনি গাহিয়া পরের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা—অসম্ভব! লোকে কি করিয়া যে করে! প্রথম প্রথম সে কলিকাতায় আসিয়া ভাবিয়াছিল, কত বড়লোকের বাড়ি আছে কলিকাতায়, চাহিলে একজন দরিদ্র ছাত্রের উপায় করিয়া দিতে কেহ কুণ্ঠিত হইবে না। কত পয়সা তো তাহাদের কত দিকে যায়! কিন্তু তখন সে নিজেকে ভুল বুঝিয়াছিল, চাহিবার প্রবৃত্তি, পরের চোখে নিজেকে হীন প্রতিপন্ন করিবার প্রবৃত্তি, এ-সব তাহার মধ্যে নাই। তাহার আছে—সে যাহা নয় তাহা হইতেও নিজেকে বড় বলিয়া জাহির করিবার, বাহাদুরি করিবার, মিথ্যা গর্ব করিয়া বেড়াইবার একটা কু-অভ্যাস। তাহার মায়ের নির্বুদ্ধিতা এই দিক দিয়া ছেলেতে বর্তাইয়াছে, একেবারে হুবহু—অবিকল। এই কলিকাতা শহরে মহা কষ্ট পাইলেও সে নিতান্ত অন্তরঙ্গ এক-আধজন ছাড়া কখনও কাহাকে—তাও নিজের মুখে কখনও—কিছু বলে না। পাছে ভাবে গরিব।

ইতস্ততঃ করিয়া সেও অপরের দেখাদেখি কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে গেল। নিচের উঠান হইতে চাকর হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—আরে কাহে আপলোক উপরমে যাতে হেঁ...বাত্ নেহি মান্‌তে হেঁ, এ বড়া মুশ্‌কিল—। অপু সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। প্রৌঢ় বয়সের একটি ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে বসিয়া, হোমিওপ্যাথি-পড়া ছোকরাটির সঙ্গে কি তর্ক চলিতেছে বাহির হইতে বুঝা গেল—ছোকরাটি কি বলিতেছে, ভদ্রলোকটি কি বুঝাইতেছেন! সে ছোকরা একেবারে নাছোড়বান্দা, টিউশনি তাহার চাই-ই। ভদ্রলোকটি বলিতেছেন, ম্যাট্রিকুলেশন ফেল টিউটর দিয়া তিনি কি করিবেন? ক্রমে সকলে একে একে বাহিরে আসিয়া চলিয়া গেল। অপু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সসংকোচে বলিল—আপনাদের কি একজন পড়াবার লোক দরকার—আজ সকালের কাগজে বেরিয়েছে—

যেন সে এত লোকের ভিড়, উপরে উঠার নিষেধাজ্ঞা, কাগজে নামধাম লিখিয়া রাখিবার উপদেশ কিছুই জানে না! আসলে সে ইচ্ছা করিয়া এরূপ ভালোমানুষ সাজে নাই—অপরিচিত স্থানে আসিয়া অপরিচিত লোকের সহিত কথা কহিতে গিয়া আনাড়িপনার দরুন কথার মধ্যে নিজের অজ্ঞাতসারে একটা ন্যাকা সুর আসিয়া গেল।

ভদ্রলোক একবার আপাদমস্তক তাহাকে দেখিয়া লইলেন, তারপর একটা চেয়ার দেখাইয়া বলিলেন, বসুন। আপনি কি পাশ?—ও, আই.এ. পড়ছেন,—দেশ কোথায়?...ও!...এখানে থাকেন কোথায়?—হুঁ!

তিনি আরও যেন খানিকক্ষণ তাহাকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। মিনিট পনেরো পরে—অপু বসিয়াই আছে—ডাক্তারবাবু হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—দেখুন, পড়ানো মানে—আমার একটি মেয়ে—তাকেই পড়াতে হবে। যাকে তাকে তো নিতে পারি নে—কিন্তু আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে—ওরে শোন্—তোর দিদিমণিকে ডেকে নিয়ে আয় তো—বল্‌গে আমি ডাকছি—

একটু পরে মেয়েটি আসিল। বছর পনেরো বয়স, তন্বী সুন্দরী, বড়ো বড়ো চোখ, আঙুলের গড়ন ভারি সুন্দর, রেশমী জামা গায়ে, চওড়া পাড় শাড়ি, গলায় সোনার সরু চেন, হাতে প্লেন বালা। মাথায় চুল এত ঘন যে দু-ধারের কান যেন ঢাকিয়া গিয়াছে—জাপানী মেয়েদের মতো ফাঁপানো খোঁপা!

—এইটি আমার মেয়ে, নাম প্রীতিবালা। বেথুন স্কুলে পড়ে, এইবার সেকেন্ড ক্লাসে উঠেছে। ইনি তোমার মাস্টার খুকি—আজ বাদ দিয়ে কাল থেকে উনি আসবেন—হ্যাঁ, এঁর মুখ দেখেই আমার মনে হয়েছে ইনিই ঠিক হবেন। বয়স আপনার আর কত হবে—এই উনিশ-কুড়ি, মুখ দেখেই তো মনে হয় ছেলেমানুষ, তাছাড়া একটা distinction-এর ছাপ রয়েছে। খুকি, বোসো মা—

টিউশান জোটার আনন্দে যত হোক-না-হোক, ভদ্রলোক যে বলিয়াছেন তাহার মুখে একটা distinction-এর ছাপ আছে—এই আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া সে সারাটা দিন কাটাইল ও ক্লাসে, পথে, বাসায়, হোটেলে—সর্বত্র বন্ধুবান্ধবদের কাছে কথাটা লইয়া নির্বোধের মতো খুব জাঁক করিয়া বেড়াইল। মাহিনা যত নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি বলিল, মেয়েটির সৌন্দর্য-ব্যাখ্যা অনেক বাড়াইয়া করিল।

কিন্তু পরদিন পড়াইতে গিয়া দেখিল—মেয়েটি দেওয়ানপুরের নির্মলা নয়। সেরকম সরলা, স্নেহময়ী, হাস্যমুখী নয়—অল্প কথা কয়, খাটাইয়া লইতে জানে, একটু যেন গর্বিত! কথাবার্তা বলে হুকুমের ভাবে। অমুক অঙ্কটা কাল বুঝিয়ে দেবেন, অমুকটা কাল করে আনবেন, আজ আরও একঘণ্টা বেশি পড়াবেন, পরীক্ষা আছে—ইত্যাদি! একদিন কোন কারণে আসিতে না পারিলে পরদিন কৈফিয়ত তলব করিবার সুরে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করে। অপু মনে মনে বড়ো ভয় খাইয়া গেল, যে রকম মেয়ে, কোন্‌দিন পড়ানোর কোন ত্রুটির কথা বাবাকে লাগাইবে, চাকরির দফা গয়া—পথে বসা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকিবে না। ছাত্রীর উপর অসন্তুষ্টি ও বিরক্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

মাসখানেক কাটিয়া গেল। প্রথম মাসের মাহিনা পাইয়াই মাকে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিল। বৌবাজার ডাকঘর হইতে টাকাটা পাঠাইয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, সঙ্গের বন্ধুটি বলিল, এসো তো ভাই একটু চোরাবাজারে, একটা ভালো অপেরাগ্লাস কাল দর করে রেখে এসেছি—নিয়ে আসি।

চোরাবাজারের নামও কখনও অপু শোনে নাই। ঢুকিয়া দেখিয়াই সে অবাক হইয়া গেল। নানা ধরনের জিনিসপত্র, খেলনা, আসবাবপত্র, ছবি, ঘড়ি, জুতা, কলের গান, বই, বিছানা, সাবান, কৌচ, কেদারা—সবই পুরানো মাল। অপুর মনে হইল—বেশ সস্তা দরে বিকাইতেছে। একটা ফুলের টব, দর বলিল ছ'আনা। একটা ভালো দোয়াতদান দশ আনা। এগারো টাকায় কলের গান মায় রেকর্ড! এত দিন কলিকাতায় আছে, এত সস্তায় এখানে জিনিসপত্র বেচা-কেনা হয়, তা তো সে জানে না। এত শৌখিন জিনিসের এত কম দাম!

তাহার মাথায় এক খেয়াল আসিয়া গেল। পরদিন সে বাকি টাকা হাতে বৈকালে আসিয়া চোরাবাজারে ঢুকিল। মনে ভাবিল—এইবার একটু ভালো ভাবে থাকব, ওরকম গোয়ালঘরে থাকতে পারি নে—যেমন নোংরা তেমনি অন্ধকার। প্রথমেই সে ফুলদানি-জোড়া কিনিল। দোয়াতদানের উপর অনেকদিন হইতে ঝোঁক, সেটিও কিনিল। একটা জাপানী পর্দা, খানচারেক ছবি, খানকতক প্লেট, একটা আয়না, ঝুটা পাথর-বসানো ছোট একটা আংটি! ছেলেমানুষের মতো আনন্দে শুধু জিনিসগুলিকে দখলে আনিবার ঝোঁকে যাহাই চোখে ভালো লাগিল, তাহাই কিনিল। দাঁও বুঝিয়া দু-একজন দোকানদার বেশ ঠকাইয়াও লইল। ডবল-উইকের একটা পিতলের টেবিলল্যাম্প পছন্দ হওয়াতে দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিল,—এটার দাম কত? দোকানী বলিল,—সাড়ে তিন টাকা। অপুর বিশ্বাস...এরকম আলোর দাম পনেরো-ষোল টাকা। এরূপ মনে হওয়ার একমাত্র কারণ এই যে, অনেকদিন আগে লীলাদের বাড়ি থাকিবার সময় সে এই ধরনের আলো লীলার পড়িবার ঘরে টেবিলে জ্বলিতে দেখিয়াছিল। সে বেশি দর কষিতে ভরসা করিল না, চার আনা মাত্র কমাইয়া তিন টাকা চার আনা মূল্যে সেই মান্ধাতার আমলের টেবিল ল্যাম্পটা মহা খুশির সহিত কিনিয়া ফেলিল! মুটের মাথায় জিনিসপত্র চাপাইয়া সে সোৎসাহে ও সাগ্রহে সব বাসায় আনিয়া হাজির করিল ও সারাদিন খাটিয়া ঘরদোর ঝাড়িয়া ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ছবিগুলি দেওয়ালে টাঙ্গাইল,

সস্তা জাপানী পর্দাটা দরজায় ঝুলাইল, আয়নাটাকে গজাল আঁটিয়া বসাইল, ফুলদানির জন্য ফুল কিনিয়া আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, সেগুলিকে ধুইয়া মুছিয়া আপাতত জানালার ধারে রাখিয়া দিল, দোয়াতদানটা তেঁতুল দিয়া মাজিয়া ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখিল। বাহিরে অনেকদিনের একটা খালি প্যাকবাক্স পড়িয়াছিল, সেটা ঝাড়িয়া মুছিয়া টেবিলে পরিণত করিয়া সন্ধ্যার পর টেবিল ল্যাম্পটা সেটার উপর রাখিয়া পড়িতে বসিল। বই হইতে মুখ তুলিয়া সে ঘন ঘন ঘরের চারিদিকে খুশির সহিত চাহিয়া দেখিতেছিল—ঠিক একেবারে যেন বড়োলোকদের সাজানো ঘর। ছবি, পর্দা ফুলদানি টেবিল-ল্যাম্প সব!—এতদিন পয়সা ছিল না, হয় নাই। কিন্তু এইবার কেন সে মহিষের মতো বিলের কাদায় লুটাইয়া পড়িয়া থাকিতে যাইবে?

বাহাদুরি করিবার ঝোঁকে পরদিন সে ক্লাসের বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া নিজের ঘরে খাওয়াইল—প্রণব, জানকী, সতীশ, অনিল এমন কি সেন্ট জেভিয়ার কলেজের সেই ভূতপূর্ব ছাত্র চালবাজ মন্মথকে পর্যন্ত।

মন্মথ ঘরে ঢুকিয়া বলিল—হুর্‌রে!—আরে আমাদের অপূর্ব এসব করেছে কি! কোত্থেকে বাজে রাবিশ এক পুরোনো পর্দা জুটিয়েছে দ্যাখো। এত খাবার কে খাবে?

অপু নিচের কারখানার হেড মিস্ত্রিকে বলিয়া তাহাদের বড়ো লোহার চায়ের কেটলিটা ও একটা পলিতা-বসানো সেকেলে লোহার স্টোভ ধার করিয়া আনিয়া চা চড়াইয়াছে; একরাশ কমলালেবু, সিঙ্গাড়া, কচুরি, পানতুয়া, কলা ও কাঁচা পাঁপর কিনিয়া আনিয়াছে—সবাই দেখিতে দেখিতে খাবার অর্ধেকের উপর কমাইয়া আনিল। কথায় কথায় অপু তাহাদের দেশের বাড়ির কথা তুলিল—মস্ত দোতলা বাড়ি নদীর ধারে, এখনও পূজার দালানটা দেখিলে তাক লাগে, এখনও খুব নাম—দেনার দায়ে মস্ত জমিদারি হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, তাই আজ এ অবস্থা—নহিলে ইত্যাদি।

প্রণব চা পরিবেশন করিতে গিয়া খানিকটা জানকীর পায়ের উপর ফেলিয়া দিল। ঘরসুদ্ধ সবাই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সতীশ আসিয়াই সটান শুইয়া পড়িয়াছিল অপুর বিছানায়, বলিল,—ওহে তোমরা কেউ আমার গালে একটা পানতুয়া ফেলে দাও তো! হাঁ করে আছি—

সতীশ বলিল,—হাঁ হে, ভালো কথা মনে পড়েছে! তোমার সেই জানালা-কাব্যের নায়িকা কোন্ দিকে থাকেন? এই জানালাটি নাকি?—

অনিল বাদে আর সকলেই হাসি ও কলরবের সঙ্গে সেদিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে গেল—অপু লজ্জামিশ্রিত সুরে বলিল—না না ভাই, ওদিকে যেয়ো না—সে কিছু না, সব বানানো কথা আমার—ওসব কিছু না—

মেয়েটি পাগল এই ধারণা হওয়া পর্যন্ত তাহার কথা মনে উঠিলেই অপুর মন করুণার্দ্র হইয়া উঠে। তাহাকে লইয়া এই হাসি-ঠাট্টা তাহার মনে বড়ো বিঁধিল। কথার সুর ফিরাইবার জন্য সে নতুন কেনা পর্দাটার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পরে হঠাৎ মনে পড়াতে সেই ঝুটা পাথরের আংটিটা বাহির করিয়া খুশির সহিত বলিল,—এটা দ্যাখো তো কেমন হয়েছে? কত দাম হবে!

মন্মথ দেখিয়া বলিল—এ কোথাকার একটা বাজে পাথর বসানো আংটি, কেমিকেল সোনার, এর আবার দামটা কি...দূর!

অনিলের এ কথাটা ভালো লাগিল না। মন্মথ ইতিপূর্বে অপুর পর্দাটা দেখিয়া নাক সিঁটকাইয়াছে, ইহাও তাহার ভালো লাগে নাই। সে বলিল—তুমি তো জহুরি নও, সব তাতেই চাল দিতে আস কেন? চেনো এ পাথর?

—জহুরি হবার দরকারটা কি শুনি—এটা কি এমারেল্ড, না হীরে, না—

—শুধু এমারেল্ড আর হীরের নাম শুনে রেখেছ বই তো নয়? এটা কর্নেলিয়ান—চেনো কর্নেলিয়ান? অভ্রের খনিতে পাওয়া যায়, আমাদের ছিল, আমি খুব ভালো জানি।

অনিল খুব ভালোই জানে অপুর আংটির পাথরটা কর্নেলিয়ান নয় কিছুই নয়—শুধু মন্মথর

কথার প্রতিবাদ করিয়া মন্মথর চালিয়াতি কথাবার্তায় অপুর মনে কোনও ঘা না লাগে সেই চেষ্টায় কর্নেলিয়ান ও টোপাজ পাথরের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে যা মুখে আসিল তাহাই বলিতে লাগিল। তার অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে মন্মথ সাহস করিয়া আর কিছু বলিতে পারিল না।

তাহার পর প্রণব একটা গান ধরাতে উভয়ের তর্ক থামিয়া গেল। আরও অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিখুশি, কথাবার্তা ও আরও বার-দুই চা খাইবার পর অন্য সকলে বিদায় লইল, কেবল অনিল থাকিয়া গেল, অপুও তাহাকে থাকিতে অনুরোধ করিল।

সকলে চলিয়া যাইবার পর অনিল ভর্ৎসনার সুরে বলিল—আচ্ছা, এসব আপনার কি কাণ্ড? (সে এতদিনের আলাপে এখনও অপুকে 'তুমি' বলে না) কেন এসব কিনলেন মিছে পয়সা খরচ করে?

অপু হাসিয়া বলিল,—কেন তাতে কি? এসব তো—ভালো থাকতে কি ইচ্ছে যায় না?

—খেতে পান না এদিকে, আর মিথ্যে এই সব—সে যাক, এই দামে পুরানো বইয়ের দোকানের সেই গিবনের সেটটা যে হয়ে যেত। আপনার মতো লোকও যদি এই ভুয়ো মালের পেছনে পয়সা খরচ করেন তবে অন্য ছেলের কথা কি? একটা পুরানো দূরবীন যে এই দামে হয়ে যেত, আমার সন্ধানে একটা আছে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের এক জায়গায়—একটা সাহেবের ছিল—স্যাটার্নের রিং চমৎকার দেখা যায়—কম টাকায় হত, মেম বিক্রি করে ফেলছে অভাবে—আপনি কিছু দিতেন, আমি কিছু দিতাম, দুজনে কিনে রাখলে ঢের বেশি বুদ্ধির কাজ হত—

অপু অপ্রতিভের হাসি হাসিল। দূরবীনেব উপর তাহার লোভ আছে অনেক দিন হইতে। অতএব তাহার মনে হইল—এ টাকার ইহা অপেক্ষাও সদ্ব্যয় হইতে পারিত বটে। কিন্তু সে যে ভালো থাকিতে চায়, ভালো ঘরে সুদৃশ্য সুরুচিসম্মত আসবাবপত্র রাখিতে চায়—সেটাও তো তার কাছে বড়ো সত্য—তাহাকেও বা সে মনে মনে অস্বীকার করে কি করিয়া?

অনিল আর কিছু বলিল না। পুরানো বাজারের এসব সস্তা খেলো মালকে তাহার বন্ধু যে এত খুশির সহিত ঘরে আনিয়া ঘর সাজাইয়াছে, ইহাতেই সে মনে মনে চটিয়াছিল—শুধু অপুর মনে আব বেশি আঘাত দিতে ইচ্ছা না থাকায় সে বিবক্তি চাপিযা গেল।

অপু বলিল—হুল্লোড়ে পড়ে তোমার খাওয়া হল না অনিল, আর খানকতক কাঁচা পাঁপর ভাজব?

অনিল আর খাইতে চাহিল না। অপু বলিল—তবে চলো, কোথাও বেরুই—গড়ের মাঠে কি গঙ্গার ধারে।

অনিলও তাই চায়, বলিল—দেখুন অপূর্ববাবু, উনিশ-কুড়ি-একুশ বছর থেকে পঞ্চাশ ষাট বছর বয়সের লোক পর্যন্ত কি রকম গলির মধ্যে বাড়ির সামনেকার ছোট্ট রোয়াকটুকুতে বসে আড্ডা দিচ্ছে—এমন চমৎকার বিকেল, কোথাও বেরুনো নেই, শরীরের বা মনের কোনও অ্যাডভেঞ্চার নেই, আসন-পিঁড়ি হয়ে সব ষষ্ঠী বুড়ি সেজে ঘরের কোণের কথা, পাড়ার গুজব, কি দরে কে ওবেলা বাজারে ইলিশ মাছ কিনেছে সেই সব—ওঃ হাউ আই হেট দেম্! আপনি জানেন না, এই সব র‍্যাঙ্ক স্টুপিডিটি দেখলে আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে—বরদাস্ত করতে পারি নে মোটে—গা যেন কেমন—

—কিন্তু ভাই, তোমার ও গড়ের মাঠে আমার মন ভোলে না—মোটরের শব্দ, মোটর বাইকের ফটফট আওয়াজ, পেট্রোল গ্যাসের গন্ধ, ট্রামের ঘড়ঘড়ানি—নামেই ভাই মাঠ, গঙ্গার কথা আর না-ই বা তুললাম!

—কাল আপনাকে নিয়ে যাব এক জায়গায়! বুঝতে পারবেন একটা জিনিস—একটা ছেলে—আমার এক বন্ধুর বন্ধু—ছেলেটা সাউথ আফ্রিকায় মানুষ হয়েছে, সেইখানেই জন্ম—সেখান থেকে তার বাবা তাদের নিয়ে চলে এসেছে কলকাতায়, ফিয়ার্স লেনে থাকে। তার মুখের কথা শুনে

এমন আনন্দ হয়! এমন মন! এখানে থেকে মরে যাচ্ছে—শুনবেন তার মুখে সেখানকার জীবনের বর্ণনা—হিংসে হয়, সত্যি!

অপু এখনই যাইতে চায়। অনিল বলিল, আজ থাক, কাল ঠিক যাব দুজনে! দেখুন অপূর্ববাবু, কিছু যেন মনে করবেন না, আপনাকে তখন কি সব বললাম বলে। আপনারা কি জন্যে তৈরি হয়েছেন জানেন? ওসব চিপ ফাইনারির খপ্পরে আপনারা কেন হবেন? দেখুন, এ পুরুষ তো কেটে গেল, এ সময়ের কবি, বৈজ্ঞানিক, দাতা, লেখক, ডাক্তার, দেশসেবক—এঁরা তো কিছুদিন পরে সব ফৌত হবেন, তাঁদের হাত থেকে কাজ তুলে নিতে হবে কাদের, না, যারা এখন উঠছে। একদল তো চাই এই জেনারেশনের হাত থেকে সেই সব কাজ নেবার? সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, আর্টে, দেশসেবায়, গানে—সব কিছুতে, নতুন দল যারা উঠছে, বিশেষ করে যাদের মধ্যে গিফ্‌ট্ আছে, তাদের কি হুল্লোড় করে কাটাবার সময়?

অপু মুখে হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিল বটে, কিন্তু মনে মনে ভারি খুশি হইল—কথার মধ্যে তাহারও যে দিবার কিছু আছে বা থাকিতে পারে সেদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে বুঝিয়া।

পরে দু-জনে বেড়াইতে বাহির হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

ছাত্রীকে পড়াইতে যাইবার সময় অপুর গায়ে যেন জ্বর আসে, ছুটি-ছাটার দিনটা না যাইতে হইলে সে যেন বাঁচিয়া যায়। অদ্ভুত মেয়ে! এমন কারণে-অকারণে প্রভুত্ব জাহির করার চেষ্টা, এমন তাচ্ছিল্যের ভাব—এই রকম সে একমাত্র অতসীদিতে দেখিয়াছে!

একদিন সে ছাত্রীর একটা রূপা-বাঁধানো পেন্সিল হারাইয়া ফেলিল। পকেটে ভুলিয়া লইয়া গিয়াছিল, কোথায় ফেলিয়াছে, তারপর আর কিছু খেয়াল ছিল না, পরদিন প্রীতি সেটা চাহিতেই তাহার তো চক্ষুস্থির! সংকুচিতভাবে বলিল—কোথায় যে হারিয়ে ফেললাম—কাল বরং একটা কিনে—

প্রীতি অপ্রসন্ন মুখে বলিল, ওটা আমার দাদুমণির দেওয়া বার্থ-ডে গিফ্‌ট্ ছিল—

ইহার পর আর কিনিয়া আনিবার প্রস্তাবটা উত্থাপিত করা যায় না, মনে মনে ভাবিল, কাল থেকে ছেড়ে দেবো।—এখানে আর চলবে না।

কি একটা ছুটির পরদিন সে পড়াইতে গিয়াছে, প্রীতি জিজ্ঞাসা করিল, কাল যে আসেন নি?

অপু বলিল, কাল ছিল ছুটির দিনটা—তাই আর আসি নি।

প্রীতি ফট করিয়া বলিয়া বসিল—কেন, কাল তো আমাদের সরকার, বাইরের দু-জন চাকর, ড্রাইভার সব এসেছিল? আমার পড়াশুনো কিছু হল না, আজ ডিটেন্ করে রাখলে পাঁচটা অবধি।

অপুর হঠাৎ বড়ো রাগ হইল, দুঃখও হইল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমি তোমাদের সরকার কি রাঁধুনীঠাকুর তো নই, প্রীতি! কাল স্কুল-কলেজ সব বন্ধ ছিল, এজন্য ভাবলাম আজ যাব না। আমার যদি ভুলই হয়ে থাকে—তোমার সেই রকম মাস্টার রেখো যিনি এখানে বাজার-সরকারের মতো থাকবেন। আমি কাল থেকে আর আসব না বলে যাচ্ছি।

বাড়ির বাহিরে আসিয়া মনে হইল—দেওয়ানপুরের নির্মলাদের কথা। তাহারাও তো অবস্থাপন্ন, তাহাদের বাড়িতেও সে প্রাইভেট মাস্টার ছিল, কিন্তু সেখানে সে ছিল বাড়ির ছেলের মতো—নির্মলার মা দেখিতেন ছেলের চোখে, নির্মলা দেখিত ভাইয়ের চোখে—সে স্নেহ কি পথেঘাটে সুলভ? নির্মলার মতো মমতাময়ীকে তখন সে চিনিয়াও চেনে নাই, আজ নতুন করিয়া

তাহাকে আর চিনিয়া লাভ কি? আর লীলা? সে কথা ভাবিতেই বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল—যাক সে সব কথা।

হাতের টাকায় কিছুদিন চলিল। ইতিমধ্যে কলেজে একটা বড়ো ঘটনা হইয়া গেল, প্রণব লেখাপড়া ছাড়িয়া কি নাকি দেশের কাজ করিতে চলিয়া গেল। সকলে বলিল, সে এনার্কিস্ট দলে যোগ দিয়াছে।

প্রণব চলিয়া যাওয়ার মাসখানেক পর একদিন অপু হোটেলে খাইতে গিয়া দেখিল, সুন্দর-ঠাকুর হোটেলওয়ালার মুখ ভার-ভার। দু-তিন মাসের টাকা বাকি, পাওনাদার আর কতদিন শোনে? আজ সে স্পষ্ট জানাইল, দেনা শোধ না করিলে আর সে খাইতে পাইবে না। বলিল—বাবু, অন্য খদ্দের হলে মাসের পয়লাটি যেতে দিই নে—ওই কৃষ্টোবাবু খায়, ওদের পাটের কলের হপ্তাটি পেলে দিয়ে দেয়—তুমি বলে আমি কিছু বলছি না—দু-মাসের ওপর আজ নিয়ে সাত দিন। যাক আর পারব না, আপুনি আর আসবেন না—আমার ভাত একজন ভদ্দরনোকের ছেলে খেয়েছে ভাবব, আর কি করব?

কথাগুলি খুব ন্যায্য এবং আদৌ অসংগত নয়, কিন্তু খাইতে গিয়া এরূপ রূঢ় প্রত্যাখ্যানে অপুর চোখে জল আসিল। তাহার তো একদিনও ইচ্ছা ছিল না যে, ঠাকুরকে সে ফাঁকি দিবে, কিন্তু সেই প্রীতির টিউশনিটা ছাড়িয়া দেওয়ার পর আজ দুই-তিন মাস একেবারে নিরুপায় অবস্থায় ঘুরিতেছে যে!

বিপদের উপর বিপদ। দিন-দুই পরে কলেজে দিয়া দেখিল নোটিশ বোর্ডে লিখিয়া দিয়াছে, যাহাদের মাহিনা বাকি আছে, এক সপ্তাহের মধ্যে শোধ না করিলে কাহাকেও বার্ষিক পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না। অপু চক্ষে অন্ধকার দেখিল। প্রায় গোটা এক বৎসরের মাহিনাই যে তাহার বাকি!—মাত্র মাস-দুইয়ের মাহিনা দেওয়া আছে—সেই প্রথম দিকে একবার, আর প্রীতির টিউশনির টাকা হইতে একবার—তাহার পর হইতে খাওয়াই জোটে না তো কলেজের মাহিনা!—দশ মাসেব বেতন ছ'টাকা হিসাবে ষাট টাকা বাকি। কোন দিক হইতে একটা কলঙ্কধরা নিকেলের সিকিও আসিবার সুবিধা নাই যাহার, ষাট টাকা সে এক সপ্তাহের মধ্যে কোথা হইতে জোগাড় করিবে? হয়তো তাহাকে পরীক্ষা দিতে দিবে না, গ্রীষ্মের ছুটির পর সেকেন্ড ইয়ারে উঠিতে দিবে না, সারা বছরের কষ্ট ও পরিশ্রম সব ব্যর্থ নিরর্থক হইয়া যাইবে।

কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সন্ধ্যার সময় সে হাত-খরচের পয়সা হইতে চাউল ও আলু কিনিয়া আনিয়া থাকিবার ঘরের সামনের বারান্দাতে রান্নার জোগাড় করিল। হোটেলে খাওয়া বন্ধ হইবার পর হইতে আজ কয়দিন নিজে রাঁধিয়া খাইতেছে। হিসাব করিয়া দেখিয়াছে ইহাতে খুব সস্তায় হয়, কাঠ কিনিতে হয় না। নিচের কারখানার মিস্ত্রিদের ঘর হইতে কাঠের চোঁচ ও টুকরা কুড়াইয়া আনে, পাঁচ-ছয় পয়সায় খাওয়া-দাওয়া হয়। আলুভাতে ডিমভাতে আর ভাত। ভাত চড়াইয়া ডাক দিল—ও বন্থ—বন্থ—নিয়ে এসো, আমার হয়ে গেল বলে—ছোট কাঁসিটাও এনো—

কারখানার দারোয়ান শম্ভুদত্ত তেওয়ারীর বৌ একখানা বড়ো পিতলের থালা ও কাঁসি লইয়া উপরে আসিল—এক লোটা জল ও গোটাকতক কাঁচা লঙ্কাও আনিল।

থালা বাসন নাই বলিয়া সে-ই দুই বেলা থালা আনিযা দেয়। হাসিমুখে বলিল, মছলিকা তরকারি হম নেহি ছুঁয়ে গা বাবুজি—

—কোথায় তোমার মছ্‌লি?—ও শুধু আলু—একটু হলুদবাটা এনে দ্যাও না বন্থ? রোজ রোজ আলুভাতে ভালো লাগে না—

বন্থকে ভালো বলিতে হইবে, রোজ উচ্ছিষ্ট থালা নামাইয়া লইয়া যায়, নিজে মাজিয়া লয়—হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ যাহা কখনও করে না—অপু বাধা দিয়াছিল, বন্থ বলে, তুম তো হামারে লেড়কাকে বরাবর হোগে বাবুজী—ইস্‌মে ক্যা হ্যায়?—

দিন কতক পর মায়ের একটা চিঠি আসিল, হঠাৎ পিছলাইয়া পড়িয়া সর্বজয়ার পায়ে বড়ো লাগিয়াছে, পয়সার কষ্ট যাইতেছে। মায়ের অভাবের খবর পাইলে অপু বড়ো ব্যস্ত হইয়া উঠে, মায়ের নানা কাল্পনিক দুঃখের চিন্তায় তাহার মনকে অস্থির করিয়া তোলে, হয়তো আজ পয়সার অভাবে মায়ের খাওয়া হইল না, হয়তো কেহ দেখিতেছে না, মা আজ দু-দিন উপবাস করিয়া আছে, এইসব নানা ভাবনা আসিয়া জোটে, নিজের আলুভাতে ভাতও যেন গলা দিয়া নামিতে চায় না।

এদিকে আর এক গোলমাল—কারখানার ম্যানেজার ইতিপূর্বে তাহাকে বার-দুই ডাকাইয়া বলিয়াছেন উপরে যে ঘরে সে আছে তার সমস্তটাই ঔষধের গুদাম করা হইবে—সে যেন অন্যত্র বাসা দেখিয়া লয়—বলিয়াছেন আজ মাস তিনেক আগে, তাহার পর আর কোনও উচ্চবাচ্য করেন নাই—অপুও থাকিবার স্থানের জন্য কোথায় কি ভাবে কাহার কাছে গিয়া চেষ্টা করিবে বুঝিতে না পারিয়া একরূপ নিশ্চেষ্টই ছিল এবং নিশ্চিন্ত ভাবে দিন যাইতে দেখিয়া ভাবিয়াছিল, ও-কথা হয়তো আর উঠিবে না—কিন্তু এইবার যেন সময় পাইয়াই ম্যানেজার বেশি পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন।

হাতের পয়সা ফুরাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে অপু এত সাধ করিয়া কেনা শখের আসবাবগুলি বেচিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে গেল প্লেটগুলি—তাও কেহই কিনিতে চায় না—অবশেষে চৌদ্দ আনায় এক পুরানো দোকানদারের কাছে বেচিয়া দিল। সেই দোকানদারই ফুলদানিটা আট আনায় কিনিল, দু-খানা ছবি দশ আনায়। তবু শেষ পর্যন্ত সে স্যান্ডোর ডাম্বেলটা ও জাপানী পর্দাটা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া রহিল।

সে শীঘ্রই আবিষ্কার করিল—ছাতু জিনিসটার অসীম গুণ—সস্তার দিক হইতেও বটে, অল্প খরচে পেট ভরাইবার দিক হইতেও বটে। আগে আগে চৈত্র বৈশাখ মাসে তাহার মা নতুন যবের ছাতু কুটিয়া তাহাদের খাইতে দিতেন—তখন ছাতু ছিল বৎসরের মধ্যে একবার পালা-পার্বণে শখ করিয়া খাইবার জিনিস, তাহাই এখন হইয়া পড়িল প্রাণধারণের প্রধান অবলম্বন। আগে একটু-আধটু গুড়ে তাহার ছাতু খাওয়া হইত না, গুড় আরও বেশি করিয়া দিবার জন্য মাকে কত বিরক্ত করিয়াছে, এখন খরচ বাঁচাইবার জন্য শুধু নুন ও তেওয়ারী-বধূর নিকট হইতে কাঁচা লঙ্কা আনাইয়া তাই দিয়া খায়। অভ্যাস নাই, খাইতে ভালো লাগে না।

কিন্তু ছাতু খুব সুস্বাদু না হউক, তাহাও বিনা পয়সায় পাওয়া যায় না। অপু বুঝিতেছিল—টানাটানি করিয়া আর বড়জোর দিন দশেক—তারপর কূলকিনারাহীন অজানা মহাসমুদ্র!...তখন কি উপায়?...

সে রোজ সকালে উঠিয়া নিকটবর্তী এক লাইব্রেরিতে গিয়া দৈনিক ইংরেজি বাংলা কাগজে ছেলে-পড়ানোর বিজ্ঞাপন খুঁজিয়া দেখে, গ্যাসপোস্টের গায়েও অনেক সময় এই ধরনের বিজ্ঞাপন মারা থাকে—চলিতে চলিতে গ্যাসপোস্টের বিজ্ঞাপন দেখিয়া বেড়ানো তাহার একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইল। প্রায়ই বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন।—আলো ও হাওয়াযুক্ত ভদ্র-পরিবারের থাকিবার উপযোগী দুইখানি কামরা ও রান্নাঘর, ভাড়া নামমাত্র। যদি বা কালেভদ্রে এক-আধটা ছেলে-পড়ানোর বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়, তার ঠিকানাটি আগে কেহ ছিঁড়িয়া দিয়াছে। কাপড় ময়লা হইয়া আসিল বেজায়, সাবানের অভাবে কাচিতে পারিল না। তেওয়ারীর স্ত্রী একদিন সোডা সাবান দিয়া নিজেদের কাপড় সিদ্ধ করিতে বসিয়াছে, অপু নিজের ময়লা শার্ট ও ধুতিখানা লইয়া গিয়া বলিল, বহু তোমার সাবানের বোল একটু দেবে, আমি এ দুটোয় মাখিয়ে রেখে দি—তারপর ওবেলা কলেজ থেকে এসে কলে জল এলে কেচে নেবো—দেবে?...

তেওয়ারী-বধূ বলিল, দে দিজিয়ে না বাবুজী, হাম্‌ হাঁড়ি মে ডাল দেগা।

অপু ভাবে—আহা, বহু কি ভালো লোক!—যদি কখনও পয়সা হয় ওর উপকার করবো—

এক একবার তাহার মনে হয়, যদি কিছু না জোটে, তবে এবার হয়তো কলেজ ছাড়িয়া দিয়া মনসাপোতা ফিরিতে হইবে—কিন্তু সেখানেও আর চলিবার কোনও উপায় নাই, তেলি ও কুণ্ডুরা

পূজার জন্য অন্যস্থান হইতে পূজারি-বামুন আনাইয়া জায়গা-জমি দিয়া বাস করাইয়াছে। আজ কয়েকদিন হইল মায়ের পত্রে সে-খবর জানিয়াছে, এখন তাহার মাকেও আর তেলিরা সাহায্য করে না, দেখেশোনে না! মায়ের একাই চলে না—তার মধ্যে সে আবার কোথায় গিয়া জুটিবে?—তাহা ছাড়া পড়াশুনা ছাড়া? অসম্ভব!

সে নিজে বেশ বুঝিতে পারে, এই এক বৎসরে তাহার মনের প্রসারতা এত বাড়িয়া গিয়াছে, এমন একটা নতুন ভাবে সে জগৎটাকে, জীবনটাকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে—যা কিনা দশ বৎসর মনসাপোতা কি দেওয়ানপুরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইলেও সম্ভব হইয়া উঠিত না। সে এটুকু বেশ বোঝে, কলেজে পড়িয়া ইহা হয় নাই, কোনও প্রফেসারের বক্তৃতাতেও না—যাহা কিছু হইয়াছে, এই বড়ো আলমারি-ভরা লাইব্রেরিটার জন্য, সে তাহার কাছে কৃতজ্ঞ।

যতক্ষণ সে লাইব্রেরিতে থাকে, ততক্ষণ তাহার খাওয়া-দাওয়ার কথা তত মনে থাকে না। এই সময়টা এক একটা খেয়ালের ঘোরে কাটে। খেয়ালমতো এক একটা বিষয়ে প্রশ্ন জাগে মনে, তাহার উত্তর খুঁজিতে গিয়া বিকারের রোগীর মতো অদম্য পিপাসায় সে সম্বন্ধে যত বই পাওয়া যায় হাতের কাছে—পড়িতে চেষ্টা করে। কখনও খেয়াল—নক্ষত্র জগৎ...কখনও প্রাচীন গ্রীস ও রোমের জীবনযাত্রা প্রণালীর সহিত একটা নিবিড় পরিচয়ের ইচ্ছা—কখনও কীট্‌স্, কখনও হল্যান্ড রোজের নেপোলিয়ন। কোনো খেয়াল থাকে দুদিন, কোনোটা আবার একমাস! তার কল্পনা সব সময়ই বড়ো একটা কিছুকে আশ্রয় করিয়া পুষ্টিলাভ করিতে চায়—বড়ো ছবি, জাতির উত্থান-পতনের কাহিনী, চাঁদের দেশের পাহাড়শ্রেণী, বর্তমান মহাযুদ্ধ, কোন বড়োলোকের জীবনী।

কারখানার ম্যানেজার আর একদিন তাগিদ দিলেন। খুব সুখের বাসা ছিল না বটে, কিন্তু এখন সে যায় কোথায়? হাতে কিছু না থাকায় সে এবার পর্দাটা একদিন বেচিতে লইয়া গেল। এটা তাহার বড়ো শখের জিনিস ছিল। পর্দাটাতে একটা জাপানী ছবি আঁকা—ফুলে ভরা চেরি গাছ, একটু জলরেখা, মাঝ-জলে বড়ো বড়ো ভিক্টোরিয়া রিজিয়া ফুটিয়া আছে, ওপারে ঢেউখেলানো কাঠের ছাদওয়ালা একটা দেবমন্দির, দূরে ফুজিসানের তুষারাবৃত শিখর একটু একটু নজরে পড়ে। এই ছবিখানার জন্যই সে পর্দাটা কিনিয়াছিল, এইজন্যই এত দিন হাতছাড়া করিতে পারে নাই—কিন্তু উপায় কি? সাড়ে তিন টাকা দিয়া কেনা ছিল, বহু দোকান ঘুরিয়া তাহার দাম হইল এক টাকা তিন আনা।

পর্দা বেচিয়া অনেকদিন পর সে ভাত রাঁধিবার ব্যবস্থা করিল। ছাতু খাইয়া খাইয়া অরুচি ধরিয়া গিয়াছে, বাজার হইতে এক পয়সার কলমি শাকও কিনিয়া আনিল। মনে পড়িল—সে কলমি শাক ভাজা খাইতে ভালোবাসিত বলিয়া ছেলেবেলায় দিদি যখন-তখন গড়ের পুকুর হইতে কত কলমি তুলিয়া আনিত! দিন সাতেক পর্দা-বেচা পয়সায় চলিল মন্দ নয়, তারপরই যে-কে সেই! আর পর্দা নাই, কিছুই নাই, একেবারে কানাকড়িটা হাতে নাই।

কলেজ যাইতে হইল না-খাইয়া। বৈকালে কলেজ হইতে বাহির হইয়া সত্যই মাথা ঘুরিতে লাগিল, আর সেই মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা, পা নড়িতে না চাওয়া। মুশকিল এই যে, ক্লাসে মিথ্যা গর্ব ও বাহাদুরির ফলে সকলেই জানে সে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, কাহারও কাছে বলিবার মুখও তো নাই। দু-একজন যাহারা জানে যেমন জানকী—তাহাদের নিজেদের অবস্থাও তথৈবচ।

সারাদিন না খাইয়া সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিয়াই শুইয়া পড়িল। রাত আটটার পরে আর না থাকিতে পারিয়া তেওয়ারী-বধূকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ছোলা কি অড়হরের ডাল আছে, বহু? আজ আর ক্ষিদে নেই তেমন, রাঁধবো না আর, ভিজিয়ে খেতাম।

সকালে উঠিয়াই প্রথমে তাহার মনে আসিল যে, আজ সে একেবারে কপর্দকশূন্য। আজও কালকার মতো না খাইয়া কলেজে যাইতে হইবে। কতদিন এভাবে চালাইবে সে? না খাইয়া থাকার

কষ্ট ভয়ানক—কাল লজিকের ঘন্টার শেষে সেটা সে ভালো করিয়া বুঝিয়াছিল—বিকালের দিকে ক্ষুধাটা পড়িয়া যাওয়াতে তত কষ্ট বোঝা যায় নাই—কিন্তু সেই বেলা দুটোর সময়টা! পেটে ঠিক যেন বোলতার ঝাঁক হুল ফুটাইতেছে—বার দুই জল খাইবার ঘরে গিয়া গ্লাসকতক জল খাইয়া কাল যন্ত্রণাটা অনেকখানি নিবারণ হইয়াছিল। আজ আবার সেই কষ্ট সম্মুখে!

হাতমুখ ধুইয়া বাহির হইয়া বেলা দশটা পর্যন্ত সে আবার নানা গ্যাসপোস্টের বিজ্ঞাপন দেখিয়া বেড়াইল, তাহার পর বাসায় না ফিরিয়া সোজা কলেজে গেল। অন্য কেহ কিছু লক্ষ না করিলেও অনিল দু-তিনবার জিজ্ঞাসা করিল—আপনার কোনও অসুখবিসুখ হয়েছে? মুখ শুকনো কেন? অপু অন্য কথা পাড়িয়া প্রশ্নটা এড়াইয়া গেল। বই লইয়া আজ সে কলেজে আসে নাই, খালি হাতে কলেজ হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় রাস্তায় খানিকটা ঘুরিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, মা আজ দিন-বারো আগে টাকা চাহিয়া পত্র পাঠাইয়াছিলেন—টাকাও দেওয়া হয় নাই, পত্রের জবাবও না।

কথাটা ভাবিতেই সে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল—না-খাওয়ার কষ্ট সে ভালো বুঝিয়াছে—মায়েরও হয়তো বা এতদিন না-খাওয়া শুরু হইয়াছে, কে জানে? তাহা ছাড়া মায়ের স্বভাবও সে ভালো বোঝে, নিজের কষ্টের বেলা মা কাহাকেও বলিবে না বা জানাইবে না, মুখ বুজিয়া সমুদ্র গিলিবে।

অপু অস্থির হইয়া পড়িল। এখন কি করে সে। জ্যাঠাইমাদের বাড়ি গিয়া সব খুলিয়া বলিবে?—গোটাকতক টাকা যদি এখন ধার পাওয়া যায় সেখানে, মাকে তো আপাতত পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে এখন।—কিন্তু খানিকটা ভাবিয়া দেখিল, সেখানে গিয়া সে টাকার কথা তুলিতেই পারিবে না—জ্যাঠাইমাকে সে মনে মনে ভয় করে। অখিলবাবু? সামান্য মাহিনা পায়, সেখানে গিয়া টাকা চাহিতে বাধে। তাহার এক সহপাঠীর কথা হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, খুব বেশি আলাপ নাই, কিন্তু শুনিয়াছে বড়োলোকের ছেলে—একবার যাইয়া দেখিবে কি? ছেলেটির বাড়ি বৌবাজারের একটা গলিতে, কলকাতার বনেদি ঘর, বড়ো তেতলা বাড়ি, পূজার দালান, সামনে বড়ো বড়ো সেকেলে ধরনের থাম, কার্নিসে একঝাঁক পায়রার বাসা; বাহিরের ফ্লোরের খোপটা একজন হিন্দুস্থানী ভুজাওয়ালা ভাড়া লইয়া ছাতুর দোকান খুলিয়াছে। একটু পরেই অপুর সহপাঠী ছেলেটি বাহিরে আসিয়া বলিল—কই, কে ডাকছে—ও—তুমি?—রোল টুএল্ভ্; এক্সকিউজ মি—তোমার নামটা জানি নে ভাই— sorry—এসো, এসো ভেতরে এসো।

খানিকক্ষণ বসিয়া গল্পগুজব হইল। খানিকক্ষণ গল্প করিতে করিতে অপু বুঝিল, এখানে টাকার কথা তোলাটা তাহার পক্ষে কতদূর দুঃসাধ্য ব্যাপার।—অসম্ভব—তাহা কি কখনও হয়? কি বলিয়া টাকা ধার চাহিবে সে এখানে? এই আমাকে এই—গোটাকতক টাকা ধার দিতে পারো ক'দিনের জন্যে? কথাটা কি বিশ্রী শোনাইবে! ভাবিতেও যেন লজ্জা ও সংকোচে তাহার মুখ ঘামিয়া রাঙা হইয়া উঠিল। ছেলেটি বলিল—বা রে, এখুনি উঠবে কি?—না না, বোসো, চা খাও—দাঁড়াও, আমি আসছি—

ঘিয়ে-ভাজা চিঁড়ে নিমকি, পেঁপে-কাটা, সন্দেশ ও চা। অপু ক্ষুধার মুখে লোভীর মতো সেগুলি ব্যগ্রভাবে গোগ্রাসে গিলিল। গরম চা কয়েক চুমুক খাইতে শরীরের ঝিম ঝিম ভাবটা কাটিয়া মনের স্বাভাবিক অবস্থা যেন ফিরিয়া আসিল এবং আসিবার সঙ্গে সঙ্গে এখানে টাকা ধার চাওয়াটা যে কতদূর অসম্ভব সেটাও বুঝিল। বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাহিরে আসিয়া ভাবিল—ভাগ্যিস—হাউ অ্যাব্‌সার্ড। তা কি কখনও আমি—দূর!

রাত্রিতে শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িল, আগামীকাল নববর্ষের প্রথম দিন! কাল কলেজের ছুটি আছে। কাল একবার শ্যামবাজারে জ্যাঠাইমাদের বাড়িতে যাইবে, নববর্ষের দিনটা জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করিয়া আসাও হইবে—সেটাও একটা কর্তব্য, তাহা ছাড়া—

মনে মনে ভাবিল—কাল গেলে জেঠিমা কি আর না খাইয়ে ছেড়ে দেবে? বছরকারের

দিনটা—সেদিন সুরেশদা তো আর বাড়ির মধ্যে বলে নি—বললে কি আর খেতে বলত না? সুরেশদা ওই রকম ভুলো মানুষ—

ভুল কাহার, পরদিন অপুর বুঝিতে দেরি হইল না। সকালে ন'টার সময় সুরেশদের বাড়ি গিয়া প্রথমে বাহিরে কাহাকেও পাইল না। বলা না, কওয়া না, হুপ্ করিয়া কি বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া যাইবে? কি সমাচার, না নববর্ষের দিন প্রণাম করিতে আসিয়াছি—ছুতাটা যে বড়ো দুর্বল! সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে সে খানিকক্ষণ পরে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া একেবারে জ্যাঠাইমাকে পাইল দরজার সামনের রোয়াকে। প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইল, জ্যাঠাইমার মুখে যে বিশেষ প্রীতি বিকশিত হইল না, তাহা অপু ছাড়া যে-কেহ বুঝিতে পারিত। তাহার সংবাদ লইবার জন্য তিনি বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, সে-ই নিজের সংকোচ ঢাকিবার জন্য অতসীদি কবে শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, সুনীল বুঝি কোথায় বাহির হইয়াছে প্রভৃতি ধরনের মামুলী প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিল।

তারপর জ্যাঠাইমা কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহ বাড়ি নাই, সে দালানের একটি বেঞ্চিতে বসিয়া একখানা এল. রায়ের ক্যাটালগ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার ভান করিল। বইখানার মধ্যে একখানা বিবাহের প্রীতি-উপহার, হাতে লইয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিল—সেখানা সুরেশের বিবাহের! সে দুঃখিতও হইল, আশ্চর্যও হইল, মাত্র মাসখানেক আগে বিবাহ হইয়াছে, সুরেশদা তাহার ঠিকানা জানে, সবই জানে, অথচ কি জ্যাঠাইমা, কি সুরেশদা, কেহই তাহাকে জানায় নাই।

'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় বেলা সাড়ে দশটা পর্যন্ত বসিয়া থাকিয়া সে জ্যাঠাইমার কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিল; জ্যাঠাইমা নির্লিপ্ত, অন্যমনস্ক সুরে বলিল—আচ্ছা তা এসো—থাক্ থাক্—আচ্ছা।

ফুটপাতে নামিয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মনে মনে ভাবিল—সুরেশদার বিয়ে হয়ে গিয়েছে ফাল্গুন মাসে, একবার বললেও না।—অথচ আমাদের আপনার লোক—আজ দ্যাখো না নববর্ষের দিনটা খেতেও বললে না—

খানিকদূরে আসিতে আসিতে তাহার কেমন হাসিও পাইল। আচ্ছা যদি বলতাম, জেঠিমা আমি এখানে এবেলা খাবো তাহলে—হি-হি—তাহলে কি হতো!

বাসার কাছে পথে সুন্দর-ঠাকুর হোটেলওয়ালার সঙ্গে দেখা। দু-দুবার নাকি সে অপুর বাসায় গিয়াছে, পায় নাই, আজ পয়লা বৈশাখ, হোটেলের নতুন খাতা—টাকা দেওয়া চাই-ই। সুন্দর-ঠাকুর চিৎকারের সুরে বলিল—ভাতের তো এক পয়সা দিলে না—আবার লুচি খেলে বাবু ন'দিন—সাত আনা হিসাবে সাত নং তেষট্টি আনা—তিন টাকা পনেরো আনা—আজ তিন মাস ঘোরাচ্ছো, আজ খাতা মহরত—না দিলে হবেই না বলে দিচ্ছি।

অপুর দোষ—লোভে পড়িয়া সে কোথা হইতে শোধ দিবে না ভাবিয়াই ধারে আট-নয় দিন লুচি খাইয়াছিল। সুন্দর-ঠাকুরের চড়া চড়া কথায় পথে লোক জুটিয়া গেল—পথে দাঁড়াইয়া অপদস্থ হওয়ার ভয়ে সে কোথা হইতে দিবে বিন্দুবিসর্গ না ভাবিয়াই বলিল, বৈকালে নিশ্চয়ই সব শোধ করিয়া দিবে।

বৈকালে একটা বিজ্ঞাপনে দেখিল কোন্ স্কুলে একজন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা শিক্ষক দরকার, টাট্‌কা মারিয়া দিয়া গিয়াছে, এখনও কেহ ছেঁড়ে নাই। খুঁজিয়া তখনই বাহির করিল, মেছুয়াবাজারের একটা গলির মধ্যে কাহাদের ভাড়া বাড়ির বাহিরের ঘরে স্কুল—আপার প্রাইমারি পাঠশালা। জনকতক বৃদ্ধ বসিয়া দাবা খেলিতেছেন, একজন তাহার মধ্যে নাকি স্কুলের হেডমাস্টার। অঙ্কের শিক্ষক—দশ টাকা মাহিনা—ইত্যাদি। বাজার যা তাতে ইহাই যথেষ্ট।

অপুর মন বেজায় দমিয়া গেল। এই অন্ধকার স্কুলঘরটা, দারিদ্র্য, এই ত্রিকালোত্তীর্ণ বৃদ্ধগণের মুখের একটা বুদ্ধিহীন সন্তোষের ভাব ও মনের স্থবিরত্ব, ইহাদের সাহচর্য হইতে তাহাকে দূরে হটাইয়া

লইতে চাহিল। যাহা জীবনের বিরোধী, আনন্দের বিরোধী, সর্বোপরি—তাহার অস্থিমজ্জাগত যে রোমাঞ্চের তৃষ্ণা—তাহার বিরোধী, অপু সেখানে একদণ্ড তিষ্ঠিতে পারে না। ইহারা বৃদ্ধ বলিয়া যে এমন ভাব হইল অপুর, তাহা নয়, ইহাদের অপেক্ষাও বৃদ্ধ ছিলেন, শৈশবের সঙ্গী নরোত্তম দাস বাবাজী। কিন্তু সেখানে সদাসর্বদা একটা মুক্তির হাওয়া বহিত, কাশীর কথকঠাকুরকেও এইজন্যই ভালো লাগিয়াছিল। অসহায়, দরিদ্র বৃদ্ধ একটা আশাভরা আনন্দের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিলেন তাহার মনে—যেদিন জিনিসপত্র বাঁধিয়া হাসিমুখে নতুন সংসার বাঁধিবার উৎসাহে রাজঘাটের স্টেশনে ট্রেনে চড়িয়া দেশে রওনা হইয়াছিলেন।

স্কুল হইতে যখন সে বাহির হইল, বেলা প্রায় গিয়াছে। তাহার কেমন একটা ভয় হইল—এ ভয়টা এতদিন হয় নাই। না খাইয়া থাকিবার বাস্তবতা ইতিপূর্বে এভাবে কখনও নিজের জীবনে সে অনুভব করে নাই—বিশেষ করিয়া যখন এখানে খাইতে পাওয়া নির্ভর করিতেছে নিজের কিছু একটা খুঁজিয়া বাহির করিবার সাফল্যের উপর। কিন্তু তাহার সকলের চেয়ে দুর্ভাবনা মায়ের জন্য। একটা পয়সা সে মাকে পাঠাইতে পারিল না, আজ এতদিন মা পত্র দিয়াছেন—কি করিয়া চলিতেছে মায়ের!—

কিন্তু এখানে তো কোনও কিছুই আশা দেখা যায় না—এত বড়ো কলিকাতা শহরে পাড়াগাঁয়ের ছেলে, সহায় নাই, চেনাশোনা নাই, সে কোথায় যাইবে—কি করিবে?

পথে একটা মারোয়াড়ির বাড়িতে বোধহয় বিবাহ। সন্ধ্যার তখনও সামান্য বিলম্ব আছে, কিন্তু এরই মধ্যে সামনের লাল-নীল ইলেকট্রিক আলোর মালা জ্বালাইয়া দিয়াছে, দু-চারখানা মোটর ও জুড়ি গাড়ি আসিতে শুরু করিয়াছে। লুচি-ভাজার মন মাতানো সুগন্ধে বাড়ির সামনেটা ভরপুর। হঠাৎ অপু দাঁড়াইয়া গেল। ভাবিল—যদি গিয়ে বলি আমি একজন পুওর স্টুডেন্ট—সারাদিন খাই নি—তবে খেতে দেবে না?—ঠিক দেবে—এত বড়োলোকের বাড়ি, কত লোক তো খাবে—বলতে দোষ কি? কে-ই বা চিনবে আমায় এখানে?...

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিল না। সে বেশ বুঝিল, মনে ষোল আনা ইচ্ছা থাকিলেও মুখ দিয়া এ কথা সে বলিতে পারিবে না কাহারও কাছে—লজ্জা করিবে। লজ্জা না করিলে সে যাইত। মুখচোরা হওয়ার অসুবিধা সে জীবনে পদে পদে দেখিয়া আসিতেছে।

কলিকাতা ছাড়িয়া মনসাপোতা ফিরিবে? কথাটা সে ভাবিতে পারে না—প্রত্যেক রক্তবিন্দু বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাহার জীবনসন্ধানী মন তাহাকে বলিয়া দেয় এখানে জীবন, আলো, পুষ্টি, প্রসারতা—সেখানে অন্ধকার, দৈন্য, নিভিয়া যাওয়া। কিন্তু উপায় কই তাহার হাতে? সে তো চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। সব দিকেই গোলমাল। কলেজের মাহিনা না দিলে, আপাতত পরীক্ষা দিতে দিলেও, বেতন শোধ না করিলে প্রমোশন বন্ধ। থাকিবার স্থানের এই দশা, দু-বেলা ওষুধের কারখানার ম্যানেজার উঠিয়া যাইবার তাগিদ দেয়, আহার তথৈবচ, সুন্দর-ঠাকুরের দেনা, মায়ের কষ্ট—একেই তো সে সংসারানভিজ্ঞ, স্বপ্নদর্শী প্রকৃতির—কিসে কি সুবিধা হয় এমনিই বোঝে না—তাহাতে এই কয় দিনের ব্যাপার তাহাকে একেবারে দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে।

বাসায় আসিয়া ছাদের উপর বসিল। একখানা খাপ্‌রা কুড়াইয়া আনিয়া ভাবিল—আচ্ছা, দেখি দিকি কোন্ পিঠটা পড়ে? পরে নিশ্চিন্দিপুরে বাল্যে দিদির কাছে যেমন শিখিয়াছিল, সেইভাবে চোখ বুজিয়া খাপ্‌রাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেখিল—একবার—দু-বার—কলিকাতা ছাড়িয়া যাওয়ার দিকটাই পড়ে। তৃতীয়বার ফেলিয়া দেখিতে তাহার সাহস হইল না।

বাল্যকাল হইতে নিশ্চিন্দিপুরের বিশালাক্ষী দেবীর উপর তাহার অসীম শ্রদ্ধা। করুণাময়ী দেবীর কথা কত সে শুনিয়াছে, সে তো তাঁর গ্রামের ছেলে—কলিকাতায় কি তাঁর শক্তি খাটে না?

পরীক্ষা হইবার দিনকয়েক পরে একদিন অনিল তাহাকে জানাইল সায়েন্স সেকশনের মধ্যে সে

গণিত ও বস্তুবিজ্ঞানে প্রথম হইয়াছে, প্রফেসরের বাড়ি গিয়া নম্বর জানিয়া আসিয়াছে। অপু শুনিয়া আন্তরিক সুখী হইল, অনিলকে সে ভারি ভালোবাসে, সত্যিকার চরিত্রবান বুদ্ধিমান ও উদারমতি ছাত্র। অনিলের যে জিনিসটা তাহার ভালো লাগে না, সেটা তাহার অপরকে তীব্রভাবে আক্রমণ ও সমালোচনা করিবার একটা দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন তুচ্ছ কাজে বা জিনিসে অপু তাহার আসক্তি দেখে নাই—কোনও ছোট কথা, কি সুবিধার কথা, কি বাজে খোশগল্প তাহার মুখে শোনে নাই।

অপু দেখিয়াছে সব সময় অনিলের মনে একটা চাঞ্চল্য, একটা অতৃপ্তি—তাহার অধীর মন মহাভারতের বকরূপী ধর্মরাজের মতো সব সময়ই ফাঁদিয়া বসিয়া আছে—কা চ বার্তা?

অপুর সহিত এইজন্যেই অনিলের মিলিয়াছিল ভালো। দুজনের আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি এক ধরনের। অপুর বাংলা ও ইংরেজি লেখা খুব ভালো, কবিতা-প্রবন্ধ, মায় একখানা উপন্যাস পর্যন্ত লিখিয়াছে। দু-তিনখানা বাঁধানো খাতা ভর্তি—লেখা এমন কিছু নয়, গল্পগুলি ছেলেমানুষি ধরনের উচ্ছ্বাসে ভরা, কবিতা—রবি ঠাকুরের নকল, উপন্যাসখানাতে—জলদস্যুর দল, প্রেম, আত্মদান, কিছুই বাদ যায় নাই—কিন্তু এইগুলি পড়িয়াই অনিল সম্প্রতি অপুর আরও ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সপ্তাহের শেষে দুজনে বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াইতে গেল। একটা ঝিলেব ধারের ঘন সবুজ লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে বসিয়া অনিল বন্ধুকে একটা সুসংবাদ দিল। বাগানে আসিয়া গাছের ছায়ায় এইভাবে বসিয়া বলিবে বলিয়াই এতক্ষণ অপেক্ষায় ছিল। তাহার বাবার এক বন্ধু তাহাকে খুব ভালোবাসেন, বড়বনীর অভ্রের খনির তিনি ছিলেন একজন অংশীদার, তিনি গত পরীক্ষার ফলে অনিলের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিজের খরচে বিদেশে পাঠাইতে চাহিতেছেন, আই.এসসি.-টা পাস দিলেই সোজা বিলাত বা ফ্রান্স।

—কেমব্রিজে কি ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে পড়ব, রাদারফোর্ড আছেন, টমসন আছেন—এঁদের সব দুবেলা দেখতে পাওয়া একটা পুণ্য—যুদ্ধ থামলে জার্মানিতে যাব, মস্ত জাত—বিরাট ভাইটালিটি—গয়টে, অর্স্টওয়াল্ডের দেশ—ওখানে কি আর না যাব?

অনিল অপুর বিদেশে যাইবার টান জানে—বলিল, আপনাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব। না-হয় দু-জনে আমেরিকায় চলে যাব—আমি সব ঠিক করব দেখবেন।

অনিলের প্রভাব যেমন অপুর জীবনে বিস্তার লাভ করিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে অপুর চরিত্রের পবিত্রতা, মনের ছেলেমানুষি ও ভাবগ্রাহিতা অনিলের কঠোর সমালোচনা ও অযথা আক্রমণ-প্রবৃত্তিকে অনেকটা সংযত করিয়া তুলিতেছিল। দূরের পিপাসা অপুর আরও অনেক বেশি, অনেক উদ্দাম—কলিকাতার ধোঁয়াভরা, সংকীর্ণ, ভ্যাপসা-গন্ধ সিওয়ার্ড ডিচের ভিতর হইতে বাহির হইয়া হঠাৎ যেন একটা উদার প্রান্তর, জ্যোৎস্নামাখা মুক্ত আকাশ, পাখিদের আনন্দভরা পক্ষ-সংগীতের, একটা বন-প্রান্তের রহস্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় অপুর কথার সুরে, জীবন-পিপাসু নবীন চোখের দৃষ্টিতে, অন্তত অনিলের তো মনে হয়।

কোন্ পথে যাওয়া হইবে সে কথা উঠিল। অপু উৎসাহে অনিলের কাছে ঘেঁষিয়া বলিল—এসো একটা প্যাক্ট করি—দেখি হাত? এসো আমরা কখ্খনো কেরানীগিরি করব না, পয়সা পয়সা করব না কখ্খনো—সামান্য জিনিসে ভুলব না কখনও—ব্যাস্?...পরে মাটিতে একটা ঘুঁষি মারিয়া বলিল—খুব বড় কিছু একটা করব জীবনে।

অনিল সাধারণত অপুর মতো নিজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠে না, তবুও আজ উৎসাহের মুখে অনেক কথা বলিয়া ফেলিল, বিলাতে পড়া শেষ করিয়া সে আমেরিকায় যাইবে, জাপান হইয়া দেশে ফিরিবে। বিদেশ হইতে ফিরিয়া সারাজীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণা লইয়াই থাকিবে।

অপু বলিল—যখন দেশে ছিলাম, তখন আমার একখানা 'প্রাকৃতিক ভূগোল' বলে ছেঁড়া,

পুরোনো বই ছিল—তাতে লেখা ছিল, এমন সব নক্ষত্র আছে, যাদের আলো আজও এসে পৃথিবীতে পৌঁছয় নি, সে-সব এত দূরে—মনে আছে, সন্ধ্যের সময় একটা নদীতে নৌকা ছেড়ে দিয়ে নৌকার ওপর বসে সে কথা ভাবতাম, ওপারে একটা কদম গাছ ছিল, তার মাথাতে একটা তারা উঠত সকলের আগে, তারাটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতাম—কি যে একটা ভাব হত মনে! একটা mystery, একটা uplift-এর ভাব—ছেলেমানুষ তখন, সে-সব বুঝতাম না, কিন্তু সেই থেকে যখনই মনে দুঃখ হয়েছে, কি কোনও ছোট কাজে গিয়েছে, তখনই আকাশের নক্ষত্রদের দিকে চাইলেই আবার ছেলেবেলার সেই uplift-এর ভাবটা, একটা joy, বুঝলে? একটা অদ্ভুত transcendental joy—সে ভাই মুখে তোমাকে—

বেলা পড়িলে দু-জনে স্টিমারে কলিকাতায় ফিরিল।

পরদিন কলেজের কমনরুমে অনেকক্ষণ আবার সেই কথা।

কলেজ হইতে উৎফুল্ল মনে বাহির হইয়া অনিল প্রথমে দোকানে এক কাপ চা খাইল, পরে ফুটপাতের ধারে দাঁড়াইয়া একটুখানি ভাবিল, কালীঘাটে মাসির বাড়ি যাওয়ার কথা আছে, এখন যাইবে কিনা। একখানা বই কিনিবার জন্য একবার কলেজ স্ট্রীটেও যাওয়া দরকার। কোথায় আগে যায়? অপূর্ব একমাত্র ছেলে, যার কথা তার সব সময় মনে হয়। যে কোনরূপে হউক অপূর্বকে সে নিশ্চয়ই বিদেশ দেখাইবে।

তলপেটে অনেকক্ষণ হইতে একটা কী বেদনা বোধ হইতেছিল, এইবার যেন একটু বাড়িয়াছে, হাঁটিয়া চৌরঙ্গির মোড় পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, সেটা আর না যাওয়াই ভালো। সম্মুখেই ডালহাউসি স্কোয়ারের ট্রাম, সে ভাবিল—পরেরটাতে যাব, বেজায় ভিড়, ততক্ষণ বরং চিঠিখানা ডাকে ফেলে আসি।

নিকটেই লাল রংয়ের গোল ডাকবাক্স ফুটপাথের ধারে, ডাকবাক্সটার গা ঘেঁষিয়া একজন মুসলমান ফেরিওয়ালা পাকা কাঁচকলা বিক্রি করিতেছে, তাহার বাজরায় পা না লাগে এইজন্য এক পায়ে ভর করিয়া অন্য পা-খানা একটু অস্বাভাবিক রকমে পিছনে বাঁকাভাবে পাতিয়া সে সবে চিঠিখানা ডাকবাক্সের মুখে ছাড়িয়া দিয়াছে—এমন সময় হঠাৎ পিছন হইতে যেন এক তীক্ষ্ণ বর্শা দিয়া তাহার দেহটা এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া দিল, এক নিমেষে, অনিল সেটাতে হাত দিয়া সামলাইতেও যেন অবকাশ পাইল না। হঠাৎ যেন পায়ের তলা হইতে মাটিটা সরিয়া গেল...চোখে অন্ধকাব—কাঁচকলার বাজরার কানাটা মাথায় লাগিতেই মাথাটায় একটা বেদনা—মুসলমানটি কি বলিয়া উঠিল—হৈ হৈ, বহু লোক—কি হয়েছে মশায়?...কি হল মশায়?...সরো সরো—বাতাস করো...বরফ নিয়ে এসো...এই যে আমার রুমাল নিন না...

অনিলের দুটি মাত্র কথা শুধু মনে ছিল—একবার সে অতিকষ্টে গোঙাইয়া গোঙাইয়া বলিল—রি—রিপন কলেজ—অপূর্ব রায়—রিপন—

আর মনে ছিল সামনের একটা সাইন বোর্ড—গণেশচন্দ্র দাঁ এন্ড কোং—কারবাইডের মশলা, তারপরেই সেই তীক্ষ্ণ বর্শাটা পুনরায় কে যেন সজোরে তলপেটে ঢুকাইয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার—

কতক্ষণ পরে সে জানে না, তাহার জ্ঞান হইল। একটা বাক্স বা ঘরের মধ্যে সে শুইয়া আছে, ঘরটা বেজায় দুলিতেছে—পেটে ভয়ানক যন্ত্রণা—কাহারা কি বলিতেছে, অনেক মোটরগাড়ির ভেঁপুর শব্দ—আবার ধোঁয়া ধোঁয়া...

পুনরায় যখন অনিলের জ্ঞান হইল, সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল একটা বড়ো সাদা দেওয়ালের পাশে একখানা খাটে সে শুইয়া আছে। পাশে তাহার বাবা ও ছোটকাকা বসিয়া, আরও তিনজন অপরিচিত লোক। নার্সের পোশাক-পরা দু-জন মেম। এটা হাসপাতাল? কোন্ হাসপাতাল?

কি হইয়াছে তাহার? তলপেটে যন্ত্রণা তখনও সমান, শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, সারা দেহ যেন অবশ।

পরদিন বেলা দশটার সময় অপু গেল। সে-ই কাল খবর পাইয়া তখনই ছুটিয়া শিয়ালদহের মোড়ে গিয়াছিল। সঙ্গে ছিল সত্যেন ও চার-পাঁচজন ছেলে। টেলিফোনে অ্যাম্বুলেন্সে গাড়ি আনাইয়া তখনই সকলে মিলিয়া তাহাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হয় ও বাড়িতে খবর দেওয়া হয়। ডাক্তার বলেন, হার্নিয়া....স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া, তখনই অস্ত্র করা হইয়াছে...

বৈকালেও সে গেল। কেবিন ভাড়া করা হইয়াছে, অনিলের মা বসিয়াছিলেন, অপু গিয়া পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। অনিল এখন অনেকটা ভালো আছে, অস্ত্র করার পরে বেজায় যন্ত্রণা পাইয়াছিল, সারারাত ও সারাদিন—দুপুরের পর সেটা একটু কম। মুখ রক্তশূন্য পাণ্ডুর। সে হাসিয়া অপুর হাত ধরিয়া কাছে বসাইল, বলিল—স্বাস্থ্যের মতন জিনিস আর নেই, যতই বলুন—এই তিনটে দিন যেন একেবারে মুছে গিয়েছে জীবন থেকে।

অপু বলিল—বেশি কথা বোলো না, যন্ত্রণা কেমন এখন?

অনিলের মা বলিলেন,—তোমার কথা সব শুনেছি, ভাগ্যিস তুমি ছিলে বাবা সেদিন!

অনিল বলিল,—দেখবেন মজা, ঘণ্টা নাড়লেই নার্স এখুনি ছুটে আসবে—বাজাবো দেখবেন?—সে হাসিয়া একটা হাত-ঘণ্টা বাজাইতেই লম্বা একজন নার্স আসিয়া হাজির। সে চলিয়া গেলে অনিলের মা বলিলেন—কি যে করিস মিছিমিছি? ছিঃ—

দুজনেই খুব হাসিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ গড়ের মাঠের দিকে বেড়াইয়া সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া অপু সবে আলোটি জ্বালিয়াছে, এমন সময় সত্যেন ও অনিলের পিসতুতো ভাই ফণী—অপু তাহাকে হাসপাতালে প্রথম দেখিয়াছে, সেখানেই প্রথম আলাপ—ব্যস্তসমস্ত অবস্থায় ঘরে ঢুকিল। সত্যেন বলিল—ওঃ, তোমাকে দু-বার এর আগে খুঁজে গেছি—এখুনি হাসপাতালে এসো—জানো না?...

অপু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে উহাদের মুখের দিকে চাহিতেই ফণী বলিল—অনিল মারা গিয়েছে এই সাড়ে ছয়টার সময়—হঠাৎ।

সকলে ছুটিতে ছুটিতে হাসপাতালে গেল। অনিলের মৃতদেহ খাট হইতে নামাইয়া সাদা চাদর দিয়া ঢাকিয়া মেজেতে রাখিয়াছে। বহু আত্মীয়স্বজনে কেবিন ভরিয়া গিয়াছে, ক্লাসের অনেক ছেলে উপস্থিত, একদল ছেলে এইমাত্র এসেন্স ও ফুলের তোড়া লইয়া কেবিনে ঢুকিল। অল্প পরেই মৃতদেহ নিমতলায় লইয়া যাওয়া হইল।

সব কাজ শেষ হইতে রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল।

অন্য সকলে গঙ্গাস্নান করিতে লাগিল। অপু বলিল, তোমরা নাও, আমি গঙ্গায় নাইবো না, কলের জলে সকালবেলা নাইবো। কলকাতাব গঙ্গায় নাইতে আমার মন যায় না।

অনিলের বাবার মতো লোক সে কখনও দেখে নাই। এত বিপদেও তিনি সারারাত বাঁধানো চাতালে বসিয়া ধীবভাবে কাঠের নল বসানো সট্‌কাতে তামাক টানিতেছেন! অপুকে বার-দুই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—বাবা তোমার ঘুম লাগে নি তো?...কোন কষ্ট হয় তো বলো বাবা।

অপু শুনিয়া চোখের জল রাখিতে পারে নাই।

সুনীল সিগারেট কেসটা তাহার জিম্মায় রাখিয়া জলে নামিলে সে ঘাটের ধাপের উপর বসিয়া রহিল। অন্ধকার আকাশে অসংখ্য জ্বলজ্বলে নক্ষত্র, রাত্রিশেষের আকাশে উজ্জ্বল সপ্তর্ষিমণ্ডল ওপারে জেসপ কোম্পানির কারখানার মাথায় ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, পূর্ব-আকাশে চিত্রা প্রত্যাসন্ন দিবালোকের মুখে মিলাইয়া যাইতেছে। অপু মনের মধ্যে কোনও শোক কি দুঃখের ভাব খুঁজিয়া পাইল না—কিন্তু মাত্র তিনদিন আগে কোম্পানির বাগানে বসিয়া যেমন অনিলের সঙ্গে গল্প করিয়াছিল, সারা

আকাশের অসংখ্য নক্ষত্ররাজির দিকে চাহিয়া বাল্যে নদীর ধারে বসিয়া সন্ধ্যার প্রথম নক্ষত্রটি দেখিবার দিনগুলির মতো এক অপূর্ব, অবর্ণনীয় রহস্যের ভাবে তাহার মন পরিপূর্ণ হইয়া গেল—কেমন মনে হইতে লাগিল, কি একটা অসীম রহস্য ও বিপুলতার আবেগে নির্বাক নক্ষত্রজগৎটা যেন মুহূর্তে মুহূর্তে স্পন্দিত হইতেছে।

অনিলের মৃত্যুর পর অপু বড়ো মুষড়াইয়া পড়িল। কেমন এক ধরনের অবসাদ শরীরে ও মনে আশ্রয় করিয়াছে, কোন কাজে উৎসাহ আসে না, হাত-পা উঠে না।

বৈকালে ঘুরিতে ঘুরিতে সে কলেজ স্কোয়ারের একখানা বেঞ্চির উপর বসিল। এতদিন তো এখানে রহিল, কিছুই স্থির হইল না, এভাবে আর কতদিন চলে? ভাবিল, না হয় অ্যাম্বুলেন্সে যেতাম, কলেজের অনেকে তো যাচ্ছে, কিন্তু মা কি তা যেতে দেবে?

পরে ভাবিল—বাড়ি চলে যাই, মাসখানেক অর্ডারলি রিট্রিট্ করা যাক।

পাশে একজন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক অনেকক্ষণ হইতে বসিয়া ছিলেন। মধ্যবয়সি লোক, চোখে চশমা, হাতের শিরগুলি দড়ির মতো মোটা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সাঁতারের ম্যাচ কবে হবে জানেন?

অপু জানে না, বলিতে পারিল না। ক্রমে দু-চার কথায় আলাপ জমিল। সাঁতারেরই গল্প। কথায় কথায় প্রকাশ পাইল—তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার বহুস্থান ঘুরিয়াছেন। অপু কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিল।

ভদ্রলোক বলিলেন,—আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক—

অনেকদিনের একটা কথা অপুর মনে পড়িয়া গেল, সে সোজা হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আমি আপনাকে চিনি, আপনি অনেকদিন আগে বঙ্গবাসীতে 'বিলাত-যাত্রীর চিঠি' লিখতেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ—ঠিক, সে দশ এগাবো বছর আগেকার কথা—তুমি কি করে জানলে? পড়তে নাকি?

—ওঃ, শুধু পড়তাম না, হাঁ করে বসে থাকতাম কাগজখানার জন্যে—তখন আমার বয়েস বছর দশ। পাড়াগাঁয়ে থাকতাম—কি inspiration যে পেতাম আপনার লেখা থেকে!...

ভদ্রলোকটি ভারি খুশি হইলেন। সে কি করে, কোথায় থাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। বলিলেন,—দ্যাখো কোথায় বসে কে লেখে আর কোথায় গিয়ে তার বীজ উড়ে পড়ে—বিলেতে হ্যাম্পস্টেডের একটা বোর্ডিং-এ বসে লিখতাম, আর বাংলায় এক obscure পাড়াগাঁয়ের এক ছোট ছেলে আমার লেখা পড়ে—বাঃ বাঃ—

ভদ্রলোকটির ব্যবসাবাণিজ্যে খুব উৎসাহ দেখা গেল। মাদ্রাজে সমুদ্রের ধারে জমি লইয়াছেন, নারিকেল ও ভ্যানিলার চাষ করিবেন। নিঃসম্বল তেরো বৎসরের নিগ্রো বালককে ইউরোপে আসিয়া নিজের উপার্জন নিজে করিতে দেখিয়াছেন, দেশের যুবকদের চাষবাস করিতে উপদেশ দেন।

ভদ্রলোকটিকে আর অপুর অপরিচিত মনে হইল না। তাহার বাল্যজীবনের কতকগুলি অবর্ণনীয়, আনন্দ-মুহূর্তের জন্য এই প্রৌঢ় ব্যক্তিটি দায়ী, ইহারই লেখার ভিতর দিয়া বাহিরের জগতের সঙ্গে সেই আনন্দভরা প্রথম পরিচয়—

সম্পূর্ণ নতুন ধরনের উৎসাহ লইয়া সে ফিরিল। কে জানিত বঙ্গবাসীর সে লেখকের সঙ্গে এভাবে দেখা হইয়া যাইবে!...শুধু বাঁচিয়া থাকাই এক সম্পদ, তোমার বিনা চেষ্টাতেই এই অমৃতময়ী জীবনধারা প্রতি পলের রসপাত্র, পূর্ণ করিয়া তোমার অন্যমনস্ক, অসতর্ক মনে অমৃত পরিবেশন করিবে...সে যে করিয়া হউক বাঁচিবে।

সন্ধ্যা ঠিক হয় নাই, উঠানে তেলি-বাড়ির বড়ো-বৌ দাঁড়াইয়া কি গল্প করিতেছিল, দূর হইতে

অপুকে আসিতে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল—কে আসছে বলুন তো মা-ঠাক্‌রুন?—সর্বজয়ার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল, অপু নয় তো—অসম্ভব—সে এখন কেন—

পরক্ষণেই সে ছুটিয়া আসিয়া অপুকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিল। সর্বজয়ার চোখের জলে তাহার জামার হাতটা ভিজিয়া উঠিল। মাকে যেন এবার নিজের অপেক্ষা মাথায় ছোট, দুর্বল ও অসহায় বলিয়া অপুর মনে হইতে লাগিল। তপঃকৃশ শবরীর মতো ক্ষীণাঙ্গী, আলুথালু, অর্ধরুক্ষ চুলের গোছা একদিকে পড়িয়াছে, মুখের চেহারা এখনও সুন্দর, গ্রীবা ও কপালের রেখাবলী এখনও অনেকাংশে ঋজু ও সুকুমার। তবে এবার মায়ের চুল পাকিয়াছে, কানের পাশের চুলে পাক ধরিয়াছে। নিজের সবল দৃঢ় বাহুবেষ্টনে, সরলা, চিরদুঃখিনী মাকে সংসারের সহস্র দুঃখ-বিপদ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে অপুর ইচ্ছা যায়। এ ভাবটা এইবার প্রথম সে মনের মধ্যে অনুভব করিল, ইতিপূর্বে কখনও হয় নাই।

বড়ো-বৌ একপাশে হাসিমুখে দাঁড়াইয়াছিল, সে অপুকে ছোট দেখিয়াছে, এখন আর তাহাকে দেখিয়া ঘোমটা দেয় না। সর্বজয়া বলিল,—এবার ও এসেছে বৌমা, এবার কালই কিন্তু—।

অপু নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি খুড়িমা, কাল কি?

বড়ো-বৌ হাসিয়া বলিল,—দেখো কাল,—আজ বলব না তো!

খিচুড়ি খাইতে ভালোবাসে বলিয়া সর্বজয়া অপুকে রাত্রে খিচুড়ি রাঁধিয়া দিল; পেট ভরিয়া খাওয়া ঘটিল, এই সাত-আটদিন পর আজ মায়ের কাছে। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হ্যাঁ রে, সেখানে খিচুড়ি খেতে পাস?

অপুর শৈশবে তাহার মা শত প্রতারণার আবরণে নগ্ন দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর রূপকে তাহাদের শিশুচক্ষুর আড়াল করিয়া রাখিতেন, এখন আবার অপুর পালা। সে বলিল,—হুঁ, বাদলা হলেই খিচুড়ি হয়।

—কি ডালের করে?

—মুগের বেশি, মসুরীরও করে, খাঁড়ি মসুরী।

—সকালে জলখাবার খেতে দেয় কি কি?

অপু প্রাতঃকালীন জলযোগের এক কাল্পনিক বিবরণ খুব উৎসাহের সহিত বিবৃত করিয়া গেল। মোহনভোগ, চা, এক-একদিন লুচিও দেয়। খাওয়ার বেশ সুবিধা!

প্রীতির টুইশানি কোনকালে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু অপু সে কথা মাকে জানায় নাই; সর্বজয়া বলিল—হাঁ রে, তুই যে সে মেয়েটিকে পড়াস—তাকে কি বলে ডাকিস? খুব বড়োলোকের মেয়ে, না?

—তার নাম ধরেই ডাকি—

—দেখতে-শুনতে বেশ ভালো?

—বেশ দেখতে—

—হ্যাঁ রে, তোর সঙ্গে বিয়ে দেয় না? বেশ হয় তা হলে—

অপু লজ্জারক্ত মুখে বলিল,—হ্যাঁ—তারা হল বড়োলোক—আমার সঙ্গে—তা কি কখনও—তোমার যেমন কথা!

সর্বজয়ার কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস অপুর মতো ছেলে পাইলে লোকে এখনি লুফিয়া লইবে। অপু ভাবে, তবুও তো মা আসল কথা কিছুই জানে না। প্রীতির টুইশানি থাকিলে কি আর না খাইয়া দিন যায় কলিকাতায়?

অপু দেখিল—সে যে টাকা পাঠায় নাই, মা একটিবারও সে-কথা উত্থাপন করিল না, শুধুই তাহার কলিকাতার অবস্থানের সুবিধা-অসুবিধা সংক্রান্ত নানা আগ্রহ-ভরা প্রশ্ন। নিজেকে এমনভাবে সর্বপ্রকারে মুছিয়া বিলোপ করিতে তাহার মায়ের মতো সে আর কাহাকেও এ পর্যন্ত দেখে নাই। সে জানিত বাড়ি গেলে এ লইয়া মা কোন কথা তুলিবে না।

সর্বজয়া একটা এনামেলের বাটি ও গ্লাস ঘরের ভিতর হইতে আনিয়া হাসিমুখে বলিল,—এই দ্যাখ্, এই দু-খানা ছেঁড়া কাপড় বদলে তোর জন্যে নিইচি—বেশ ভালো, না?...কত বড়ো বাটিটা দ্যাখ্।

অপু ভাবিল, মা যা দ্যাখে তাই বলে ভালো, এ আর কি ভালো, যদি আমার সেই পুরানো-দোকানে কেনা প্লেটগুলো মা দেখত!

কলিকাতায় সে দুরূহ জীবনসংগ্রামের পর এখানে বেশ আনন্দে ও নির্ভাবনায় দিন কাটে। রাত্রে মায়ের কাছে শুইয়া সে আবার নিজেকে ছেলেমানুষের মতো মনে করে—বলে, সেই গানটা কি মা, ছেলেবেলায় তুমি আর আমি শুয়ে শুয়ে রাত্রে গাইতাম—এক-একদিন দিদিও—সেই চিরদিন কখনও সমান না যায়—কভু বনে বনে রাখালেরি সনে, কভু বা রাজত্ব পায়—

পরে আবদারের সুরে বলে—গাও না মা, গানটা?

সর্বজয়া হাসিয়া বলে—হ্যাঁ, এখন কি আর গলা আছে—দূর—

—এসো দু-জনে গাই—এসো না মা—খুব হবে, এসো—

সর্বজয়ার মনে আছে—অপু যখন ছোট ছিল তখন কোনও কোনও মেয়ে-মজলিশে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গান হয়তো হইত, অপুর গলা ছিল খুব মিষ্ট, কিন্তু তাহাকে প্রথমে কিছুতেই গান গাওয়ানো যাইত না—অথচ যেদিন তাহার গাহিবার ইচ্ছা হইত, সেদিন মায়ের কাছে চুপি চুপি বার বার বলিত, আমি কিন্তু আজ গান গাইবো না, গাইতে বোলো না। অর্থাৎ সেদিন তাকে এক-আধবার বলিলেই সে গাহিবে। সর্বজয়া ছেলের মন বুঝিয়া অমনি বলিত—তা অপু এবার কেন একটা গান কর্ না?...দু-একবার লাজুক মুখে অস্বীকার করার পর অমনি অপু গান শুরু করিয়া দিত।

সে অপু এখন একজন মানুষের মতন মানুষ। এত রূপ এ অঞ্চলের মধ্যে কে কবে দেখিয়াছে? একহারা চেহারা বটে, কিন্তু সবল, দীর্ঘ, শক্ত হাত-পা। কি মাথার চুল, কি ডাগর চোখের নিষ্পাপ পবিত্র দৃষ্টি; রাঙা ঠোঁটের দু-পাশে বাল্যের সে সুকুমার ভঙ্গি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, শুধু সর্বজয়াই তাহা ধরিতে পারে।

অপু কিন্তু সে ছেলেবেলার অপু আর নাই। প্রায় সবই বদলাইয়া গিয়াছে, সে অপূর্ব হাসি, সে ছেলেমানুষি, সে কথায় কথায় মান অভিমান, আবদার, গলার সে রিনরিনে মিষ্টি সুর—এখনও অপুর স্বর খুবই মিষ্টি—তবুও সে অপরূপ বাল্যস্বর, সে চাঞ্চল্য—পাগলামি—সে সবের কিছুই নাই। সব ছেলেই বাল্যে সমান ছেলেমানুষ থাকে না কিন্তু অপু ছিল মূর্তিমান শৈশব। সরলতায়, দুষ্টামিতে, রূপে, ভাবুকতায়—দেবশিশুর মতো! এক ছেলে ছিল তাই কি, শত ছেলেতে কি হয়? সর্বজয়া মনে মনে বলে—বেশি চাই নে, দশটা পাঁচটা চাই নে ঠাকুর, ওকেই আর জন্মে আবার কোলজোড়া করে দিয়ো।

সর্বজয়ার জীবনের পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া অপু যে অমৃত শৈশবে পরিবেশন করিয়াছে, তারই স্মৃতি তার দুঃখভরা জীবন-পথের পাথেয়। আর কিছুই সে চায় না।

কোনও কোনও দিন রাত্রে অপু মায়ের কাছে গল্প শুনিতে চায়। সর্বজয়া বলে—তুই তো কত ইংরেজি বই পড়িস, কত কি—তুই একটা গল্প বল না বরং শুনি। অপু গল্প করে। দু-জনে নানা পরামর্শ করে; সর্বজয়া পুত্রের বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কাঁটাদহের সান্ডাল বাড়ি নাকি ভালো মেয়ে আছে সে শুনিয়াছে, অপু পাশটা দিলেই এইবার...

তারপর অপু বলিল,—ভালো কথা মা—আজকাল জেঠিমারা কলকাতায় বাড়ি পেয়েছে যে! সেদিন তাদের বাড়ি গেছলাম—

সর্বজয়া বলে,—তাই নাকি?...তোকে খুব যত্নটত্ন করলে?—কি খেতে দিলে—

অপু নানা কথা সাজাইয়া বানাইয়া বলে। সর্বজয়া বলে,—আমায় একবার নিয়ে যাবি—

কলকাতা কখনও দেখি নি, বট্‌ঠাকুরদের বাড়ি দুদিন থেকে মা-কালীর চরণ দর্শন করে আসি তা হলে?...

অপু বলে,—বেশ তো মা, নিয়ে যাব, যেয়ো সেই পুজোর সময়।

সর্বজয়া বলে,—একটা সাধ আছে অপু, বট্‌ঠাকুরদের দরুন নিশ্চিন্দিপুরের বাগানখানা তুই মানুষ হয়ে যদি নিতে পারতিস ভুবন মুখুজ্যেদের কাছ থেকে, তবে—

সামান্য সাধ, সামান্য আশা। কিন্তু যার সাধ, যার আশা, তার কাছে তা ছোটও নয়, সামান্যও নয়। মায়ের ব্যথা কোন্‌খানে অপুর তাহা বুঝিতে দেরি হয় না। মায়ের অত্যন্ত ইচ্ছা নিশ্চিন্দিপুরে গিয়া বাস করা, সে অপু জানে। সর্বজয়া বলে,—তুই মানুষ হলে, তোর একটা ভালো চাকরি হলে, তোর বৌ নিয়ে তখন আবার নিশ্চিন্দিপুরে গিয়ে ভিটেতে কোঠা উঠিয়ে বাস করব। বাগানখানা কিন্তু যদি নিতে পারিস—বড়ো ইচ্ছে হয়।

অপুর কিন্তু একটা কথা মনে হইল, মা আর বেশিদিন বাঁচিবে না। মায়ের চেহারা অত্যন্ত রোগা হইয়া গিয়াছে এবার, কেবলই অসুখে ভুগিতেছে। মুখে যত সান্ত্বনা দেওয়া, যত আশার কথা বলা—সব বলে। জানালার ধারে তক্তপোশে দুপুরেব পর মা একটু ঘুমাইয়া পড়ে, অনেক বেলা পড়িয়া যায়। অপু কাছে আসিয়া বসে, গায়ে হাত দিয়া বলে,—গা যে তোমার বেশ গরম, দেখি?

সর্বজয়া সেসব কথা উড়াইয়া দেয়। এ-গল্প ও-গল্প করে। বলে,—হ্যাঁ, অতসীর মা আমার কথা-টথা কিছু বলে?

অপু মনে মনে ভাবে—মা আর বাঁচবে না—বেশি দিন। কেমন যেন—কেমন—কি করে থাকব মা মারা গেলে?

অনেক বেলা পড়িয়া যায়—

জানালার পাশেই একটা আতা গাছ। আতা ফুলের মিষ্টি ভুরভুবে গন্ধ বৈকালের বাতাসে! একটু পোড়ো জমি। এক ঢিবি সুরকি। একটা চারা জামরুল গাছ। পুরোনো বাড়ির দেওয়ালের ধারে ধারে বনমূলার গাছ। কণ্টিকারির ঝাড়। একটা জায়গায় কঞ্চি দিয়া ঘিরিয়া সর্বজয়া শাকের ক্ষেত করিয়াছে।

একটা অদ্ভুত ধরনের মনের ভাব হয় অপুর। কেমন এক ধরনের গভীর বিষাদ...মায়ের এই সব ছোটখাটো আশা, তুচ্ছ সাধ—কত নিষ্ফল!...মা কি ওই শাকের ক্ষেতের শাক খাইতে পারিবে?—কালীঘাটের কালীদর্শন করিবে জ্যাঠাইমার বাসায় থাকিয়া!...নিশ্চিন্দিপুরের আমবাগান...

এক ধরনের নির্জনতা—সঙ্গীহীনতার ভাব...মায়ের উপর গভীর করুণা..রাঙা রোদ মিলাইতেছে চারা জামরুল গাছটাতে...সন্ধ্যা ঘনাইতেছে। ছাতারে ও শালিক পাখির দল কিচমিচ ও ঝটাপটি করিতেছে।...

অপুর চোখে জল আসিল...কি অদ্ভুত নির্জনতা-মাখানো সন্ধ্যাটা। মুখে হাসিয়া সস্নেহে মায়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—আচ্ছা, মা, বড়ো বৌয়ের সঙ্গে বাজি রেখেছিলে কি নিয়ে—বলো না—বললে না তো সেদিন?...

ছুটি ফুরাইলে অপু বাড়ি হইতে রওনা হইল।

স্টেশনে আসিয়া কিন্তু ট্রেন পাইল না, গহনার নৌকা আসিতে অত্যন্ত দেরি হইয়াছে, ট্রেন আধ ঘণ্টা পূর্বে ছাড়িয়া গিয়াছে।

সর্বজয়া ছেলের বাড়ি হইতে যাইবার দিনটাতে অন্যমনস্ক থাকিবার জন্য কাপড়, বালিশের ওয়াড় সাজিমাটি দিয়া সিদ্ধ করিয়া বাঁশবনের ডোবার জলে কাচিতে নামিয়াছে—সন্ধ্যার কিছু পূর্বে অপু বাড়ির দাওয়ায় জিনিসপত্র নামাইয়া ছুটিয়া ডোবার ধারে গিয়া পিছন হইতে ডাকিল,—মা!...

সর্বজয়া ভুলিয়া থাকিবার জন্য দুপুর হইতে কাপড় সিদ্ধ লইয়া ব্যস্ত আছে, চমকিয়া পিছন দিকে চাহিয়া আনন্দ-মিশ্রিত সুরে বলে,—তুই!—যাওয়া হল না?

অপু হাসিমুখে বলিল,—গাড়ি পাওয়া গেল না—এসো বাড়ি—

বাঁশবনের ছায়ায় মায়ের মুখে সেদিন যে অপূর্ব আনন্দের ও তৃপ্তির ছাপ পড়িয়াছিল, অপু পূর্বে কোনও দিন তাহা দেখে নাই—বহুকাল পর্যন্ত মায়ের এ মুখখানা তাহার মনে ছিল। সেদিন রাত্রে দু-জনে নানা কথা। অপু আবার ছেলেবেলাকার গল্প শুনিতে চায় মা'র মুখে—সর্বজয়া লজ্জিত সুরে বলে—হ্যাঁ, আমার আবার গল্প!...সেসব ছেলেবয়সের গল্প—বুঝি এখন শুনে তোর ভালো লাগবে? অপুকে আর সর্বজয়া বুঝিতে পারে না—এ সে ছোট্ট অপু নয়, সে ঠোঁট ফুলাইলেই সর্বজয়া বুঝিত ছেলে কি চাহিতেছে...এ কলেজের ছেলে, তরুণ অপু, এর মন, মতিগতি, আশা আকাঙ্ক্ষা—সর্বজয়ার অভিজ্ঞতার বাহিরে—অপু বলে—না মা, তুমি সেই ছেলেবেলার শ্যামলঙ্কার গল্পটা করো। সর্বজয়া বলে,—তা আবার কি শুনবি—তুই বরং তোর বইয়ের একটা গল্প বল্—কত ভালো গল্প তো পড়িস?...

পরদিন সে কলিকাতায় ফিরিল।

কলেজ সেই দিনই প্রথম খুলিয়াছে, প্রমোশন পাওয়া ছেলেদের তালিকা বাহির হইয়াছে, নোটিশ বোর্ডের কাছে রথযাত্রার ভিড়—সে অধীর আগ্রহে ভিড় ঠেলিয়া নিজের নামটা আছে কিনা দেখিতে গেল।

আছে! দু-তিনবার বেশ ভালো করিয়া দেখিল। আরও আশ্চর্য এই যে, পাশেই যে সব ছেলে পাশ করিয়াছে অথচ বেতন বাকি তাহার দরুন প্রমোশন পায় নাই, তাহাদের একটা তালিকা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে অপুর নাম নাই, অথচ অপু জানে তাহারই সর্বাপেক্ষা বেশি বেতন বাকি।

সে ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া ভিড়ের বাহিরে আসিল। কেমন করিয়া এরূপ অসম্ভব সম্ভব হইল, নানাদিক হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও তখন কিছু ঠাহর করিতে পারিল না।

দু-তিনদিন পরে তাহার এক সহপাঠী নিজের প্রমোশন বন্ধ হওয়ার কারণ জানিতে অফিসঘরে কেরানীর কাছে গেল, সে-ও গেল সঙ্গে। হেড ক্লার্ক বলিল—এ কি ছেলের হাতের মোয়া হে ছোকরা! কত রোল?...পরে একখানা বাঁধানো খাতা খুলিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—এই দ্যাখো রোল টেন—লাল কালির মার্কা মারা রয়েছে—দু-মাসের মাইনে বাকি—মাইনে শোধ না দিলে প্রমোশন দেওয়া হবে না, প্রিন্সিপালের কাছে যাও, আমি আর কি করবো?

অপু তাড়াতাড়ি ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে গেল—তাহার রোল নম্বর কুড়ি—একই পাতায়। দেখিল অনেক ছেলের নামের সঙ্গে সঙ্গে কালিতে 'ডি' লেখা আছে অর্থাৎ ডিফল্টার—মাহিনা দেয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে নামের উলটাদিকে মন্তব্যের ঘরে কোন্ কোন্ মাসের মাহিনা বাকি তাহা লেখা আছে। কিন্তু তাহার নামটাতে কোন কিছু দাগ বা আঁচড় নাই—একেবারে পরিষ্কার মুক্তার মতো হাতের লেখা জ্বলজ্বল করিতেছে—রায় অপূর্বকুমার—লাল কালির একটা বিন্দু পর্যন্ত নাই...

ঘটনা হয়তো খুব সামান্য, কিছুই না—হয়তো একটা সম্পূর্ণ কলমের ভুল, না হয় কেরানীর হিসাবের ভুল, কিন্তু অপুর মনে ঘটনাটা গভীর রেখাপাত করিল।

মনে আছে—অনেকদিন আগে ছেলেবেলায় তাহার দিদি যেবার মারা গিয়াছিল, সেবার শীতের দিনে বৈকালে নদীর ধারে বসিয়া ভাবিত, দিদি কি নরকে গিয়াছে? সেখানকার বর্ণনা সে মহাভারতে পড়িয়াছিল, ঘোর অন্ধকার নরকে শত শত বিকটাকার পাখি ও তাহাদের চেয়েও বিকটাকার যমদূতের হাতে পড়িয়া তাহার দিদির কি অবস্থা হইতেছে! কথাটা মনে আসিতেই বুকের কাছটায় কি একটা আটকাইয়া যেন গলা বন্ধ হইয়া আসিত—চোখের জলে কাশবন শিমুলগাছ

ঝাপসা হইয়া আসিত, কি জানি কেন, সে তাহার হাস্যমুখী দিদির সঙ্গে মহাভারতোক্ত নরকের পারিপার্শ্বিক অবস্থার যেন কোন মতেই খাপ খাইয়াইতে পারিত না। তাহার মন বলিত, না—না—দিদি সেখানে নাই—সে জায়গা দিদির জন্য নয়।

তারপর ওপারে কাশবনে ম্লান সন্ধ্যার রাঙা আলো যেন অপূর্ব রহস্য মাখানো মনে হইত—আপনা-আপনি তাহার শিশুমন কোন্ অদৃশ্য শক্তির নিকট হাতজোড় করিয়া প্রার্থনা করিত—আমার দিদিকে তোমরা কোন কষ্ট দিয়ো না—সে অনেক কষ্ট পেয়ে গেছে—তোমাদের পায়ে পড়ি, তাকে কিছু বোলো না—

ছেলেবেলার সে সহজ নির্ভরতার ভাব সে এখনও হারায় নাই। এই সেদিনও কলিকাতায় পড়িতে আসিবার সময়ও তাহার মনে হইয়াছিল—যাই না, আমি তো একটা ভালো কাজে যাচ্ছি—কত লোক তো কত চায়, আমি বিদ্যে চাইছি—আমায় এর উপায় ভগবান ঠিক করে দেবেন—। তাহার এ নির্ভরতা আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়াছিলেন দেওয়ানপুরের হেডমাস্টার মিঃ দত্ত। তিনি ছিলেন—ভক্ত ও বিশ্বাসী খ্রিস্টান। তিনি তাহাকে যে-সব কথা বলিতেন অন্য কোনও ছেলের সঙ্গে সে ভাবের কথা বলিতেন না। শুধু গ্রামার অ্যালজেব্রা নয়—কত উপদেশের কথা, গভীর বিশ্বাসেব কথা, ঈশ্বর, পরলোক, অন্তরতম অন্তরের নানা গোপনবাণী। হয়তো বা তাঁহার মনে হইয়াছিল, এ বালকের মনের ক্ষেত্রে এ-সকল উপদেশ সময়ে অঙ্কুরিত হইবে।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি, বাস্তার ফেরিওয়ালা হাঁকিতেছে, 'পেয়ারাফুলি আম', 'ল্যাংড়া আম'—দিনবাত টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি, পথঘাটে জল কাদা। এই সময়টার সঙ্গে অপুর কেমন একটা নিরাশ্রয়তা ও নিঃসম্বলতার ভাব জড়িত হইয়া আছে, আর-বছর ঠিক এই সময়টিতে কলিকাতায় নূতন আসিয়া অবলম্বন-শূন্য অবস্থায় পথে পথে ঘুরিতে হইয়াছিল, কি না জানি হয়, কোথায় না জানি কি সুবিধা জুটিবে—এবারও তাই।

ঔষধের কারখানায় এবার আর স্থান হয় নাই। এক বন্ধুর মেসে দিনকতক উঠিয়াছিল, এখন আবার অন্য একটি বন্ধুর মেসে আছে। নানাস্থানে ছেলে পড়ানোব চেষ্টা করিযা কিছুই জুটিল না, পরের মেসেই বা চলে কি কবিযা? তাহা ছাড়া এই বন্ধুর ব্যবহার তত ভালো নয়, কেমন যেন বিরক্তির ভাব সর্বদাই—তাহার অবস্থা সবই জানে অথচ একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, সে মেস খুঁজিয়া লইতে এত দেরি কেন করিতেছে—এ মাসটার পরে আর কোথাও সিট খালি পাওয়া যাইবে? অপু মনে বড়ো আহত হইল। একদিন তাহার হঠাৎ মনে হইল খবরের কাগজ বিক্রয় করিলে কেমন হয়? কলিকাতার খবচ চলে না? মাকেও তো...

অপু সব সন্ধান লইল। তিন পয়সা দিয়া নগদ কিনিয়া আনিতে হয় খবরের কাগজের অফিস হইতে, চার পয়সায় বিক্রি, এক পয়সা লাভ কাগজ পিছু; কিন্তু মূলধন তো চাই; কাহারও কাছে হাত পাতিতে লজ্জা করে, দিবেই বা কে? এই কলিকাতা শহরে এমন একজনও নাই যে তাহাকে টাকা দেয়? সে সুদ দিতে রাজি আছে। সমীবের কাছে যাইতে ইচ্ছা হয় না, সে ভালো করিয়া কথা কয় না। ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে কারখানাব তেওয়ারী-বৌয়ের কাছে গিয়া সব বলিল। তেওয়ারী-বৌ সুদ লইবে না। লুকাইয়া দুটা মাত্র টাকা বাহির করিয়া দিল, তবে আশ্বিন মাসে তাহারা দেশে যাইবে. তাহার পূর্বে টাকাটা দেওয়া চাই।

ফিরিবার পথে অপু ভাবিল...বহুর পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করে, মায়ের মতো দ্যাখে, আহা কি ভালো লোক!

পরদিন সকালে সে ছুটিল অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে। সেখানে কাগজ-বিক্রেতাদের মারামারি, সবাই আগে কাগজ চায়। অপু ভিড়ের মধ্যে ঢুকিতে পারিল না—কাগজ পাইতে বেলা হইয়া গেল। তাহার পর আর এক নূতন বিপদ—অন্য কাগজওয়ালাদের মতো কাগজ হাঁকিতে পারা

তো দূরের কথা, লোকে তাহার দিকে চাহিলে সে সংকুচিত হইয়া পড়ে, গলা দিয়া কথা বাহির হয় না। সকলেই তাহার দিকে চায়, সুশ্রী সুন্দর ভদ্রলোকের ছেলে কাগজ বিক্রয় করিতেছে, এ দৃশ্য তখনকার সময়ে কেহ দেখে নাই—অপু ভাবে—বা রে, আমি কি চড়কের নতুন সঙ নাকি? খানিক দূরে আর একটা জায়গায় চলিয়া যায়। কাহাকেও বিনীত ভাবে মুখের দিকে না চাহিয়া বলে—একখানা খবরের কাগজ নেবেন? অমৃতবাজার?

কলেজে যাইবার পূর্বে মাত্র আঠারোখানি বিক্রয় হইল। বাকিগুলি এক খবরের কাগজের ফেরিওয়ালা তিন পয়সা দরে কিনিয়া লইল। পরদিন লজ্জাটা অনেকটা কমিল, ট্রামে অনেকগুলি কাগজ কাটিল, বোধ হয় বাঙালি ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়াই তাহার নিকট হইতে অনেকে কাগজ লইল।

মাসের শেষে একদিন কলেজে হৈ-চৈ উঠিল। গিয়া দেখে কোথাকার এক ছেলে লাইব্রেরির একখানা বই চুরি করিয়া পালাইতেছিল, ধরা পড়িয়াছে—তাহারই গোলমাল। অপু তাহাকে চিনিল—একদিন আর বছর সে ঠাকুরবাড়িতে খাইতে যাইতেছিল, ওই ছেলেটিও বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের দত্তবাড়ি দরিদ্র ছাত্র হিসাবে খাইতে যাইতেছিল। শীতের রাত্রি, খুব বৃষ্টি আসাতে দুজনে এক গাড়িবারান্দার নিচে ঝাড়া দু-ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকে। ছেলেটি তখন অনেক দূর হইতে হাঁটিয়া অতদূর খাইতে যায় শুনিয়া অপুর মনে বড়ো দয়া হয়। সে নামও জানিত, মেট্রেপলিটন কলেজে থার্ড ইয়ারের ছেলে তাহাও জানিত, কিন্তু কোনও কথা প্রকাশ করিল না। কলেজ-সুপারিন্টেন্ডেন্ট পুলিশের হাতে দিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, দর্শনের অধ্যাপক বৃদ্ধ প্রসাদদাস মিত্র মধ্যস্থতা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

অপুর যেন বড়ো আঘাত লাগিল—সে পিছু পিছু গিয়া অখিল মিস্ত্রি লেনের মোড়ে ছেলেটিকে ধরিল। ছেলেটির নাম হরেন, সে দিশাহারার মতো হাঁটিতেছিল। অপুকে চিনিতে পারিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অত্যন্ত অচল হইয়াছে, ছেঁড়া কাপড়, চারিদিকে দেনা, দত্তবাড়ি আজকাল আর খাইতে দেয় না—বর্ধমান জেলায় দেশ, এখানে কোনও আত্মীয়স্বজন নাই। অপু মির্জাপুর পার্কে একখানা বেঞ্চিতে তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া বসাইল, ছেলেটার মুখে বসন্তের দাগ, রং কালো, চুল রুক্ষ, গায়ের শার্ট কব্জির অনেকটা উপর পর্যন্ত ছেঁড়া। অপুর চোখে জল আসিতেছিল, বলিল—তোমাকে একটা পরামর্শ দিই শোনো—খবরের কাগজ বিক্রি করবে? বাদামভাজা খাওয়া যাক এসো—এই বাদামভাজা—

পূজা পর্যন্ত দুজনের বেশ চলিল। পূজার পরই পুনর্মূষিক—তেওয়ারীবৌয়ের দেনা শোধ করিয়া যাহা থাকিল, তাহাতে মাসিক খরচের কিছু অংশ কুলান হয় বটে, বেশিটাই হয় না। সেকেন্ড ইয়ারের টেস্ট পরীক্ষাও হইয়া গেল, এইবারই গোলমাল—সারা বছরের মাহিনা ও পরীক্ষার ফী দিতে হইবে অল্পদিন পরেই।

উপায় কিছুই নাই। সে কাহারও কাছে কিছু চাহিতে পারিবে না। হয়তো পরীক্ষা দেওয়াই হইবে না। সত্যই তো, এত টাকা—এ তো আর ছেলেখেলা নয়? মন্মথকে একদিন হাসিয়া সব কথা খুলিয়া বলে। মন্মথ শুনিয়া অবাক হইয়া গেল, বলিল—এসব কথা আগে জানাতে হয় আমাকে। মন্মথ সত্যই খুব খাটিল। নিজের দেশের বার লাইব্রেরিতে চাঁদা তুলিয়া প্রায় পঞ্চাশ টাকা আনিয়া দিল, কলেজে প্রফেসারদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া ফেলিল, অল্পদিনের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে অনেকগুলি টাকা আসিতে দেখিয়া অপু নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেল। কিন্তু বাকি বেতন একরূপ শোধ হইলেও তখনও পরীক্ষার ফী-এর এক পয়সাও জোগাড় হয় নাই. মন্মথ ও বৌবাজারের সেই ছেলেটি বিশ্বনাথ—দু-জনে মিলিয়া ভাইস-প্রিন্সিপ্যালকে গিয়া ধরিল, অপূর্বকে কলেজের বাকি বেতন কিছু ছাড়িয়া দিতে হইবে।

এদিকে ঔষধের কারখানায় থাকিবার সুবিধার জন্য অপু পুনরায় কারখানার ম্যানেজারের নিকটে গেল। এই মাস তিনেক যদি সেখানে থাকিবার সুবিধা পায়, তবে পরীক্ষার পড়াটা করিতে পারে। এর-ওর-তার মেসে সারা বছর অস্থিতপঞ্চকভাবে থাকিয়া তেমন পড়াশুনা হয় নাই।

কারখানার আর সকলে অপুকে চিনিত, পছন্দও করিত, তাহারা বলিল—ওহে, তুমি একবার মিঃ লাহিড়ীর কাছে যেতে পারো? ওর কাছে বলাই ভুল—মিঃ লাহিড়ী কারখানার একজন ডিরেক্টর, তাঁর চিঠি যদি আনতে পার, ও সুড়সুড় করে রাজি হবে এখন। ঠিকানা লইয়া অপু উপরি উপরি তিন-চার দিন ভবানীপুরে মিঃ লাহিড়ীর বাড়ি গেল, দেখা পাইল না,—বড়োলোকের গাড়িবারান্দার ধারে বেঞ্চের উপর বসিয়া চলিয়া আসে। দিনকতক কাটিল।

সেদিন রবিবার। ভাবিল, আজ আর দেখা না করিয়া আসিবে না। মিঃ লাহিড়ী বাড়ি নাই বটে, তবে বেলা এগারোটার মধ্যে আসিবেন। খানিকক্ষণ বসিয়া আছে, এমন সময় একজন ঝি আসিয়া বলিল—আপনাকে দিদিমণি ডাকছেন—

অপু আশ্চর্য হইয়া গেল। কোন্ দিদিমণি তাহাকে ডাকিবেন এখানে? সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—আমাকে? না—আমি তো—

ঝি ভুল করে নাই, তাহাকেই ডানধারে একটা বড়ো কামরা, অনেকগুলো বড়ো বড়ো আলমারি, প্রকাণ্ড বনাত-মোড়া টেবিল, চামড়ার গদি-আঁটা আরাম চেয়ার ও বসিবার চেয়ার। সরু বারান্দা পার হইয়া একটা চকমিলানো ছোট পাথর-বাঁধানো উঠান; পাশের ছোট ঘরটায় হাতলহীন চেয়ারে একটি আঠারো-উনিশ বছর বয়সের তরুণী বসিয়া টেবিলে বই কাগজ ছড়াইয়া কি লিখিতেছে, পরনে সাদাসিদে আটপৌরে লালপাড় শাড়ি, ব্লাউজ, ঢিলে-খোঁপা, গলায় সরু চেন, হাতে প্লেন বালা—অপরূপ সুন্দরী! সে ঘরে ঢুকিতেই মেয়েটি হাসিমুখে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অপু স্বপ্ন দেখিতেছে না তো? সকালে সে আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছে! ..নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করিয়াও করা যায় না—আপনা-আপনি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—লীলা!

লীলা মৃদু মৃদু হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। বলিল—চিনতে পেরেছেন তো দেখছি? আপনাকে কিন্তু চেনা যায় না—ওঃ কতকাল পর—আট বছর খুব হবে—না?

অপু এতক্ষণ পর কথা ফিবিয়া পাইল। সম্মুখের এই অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী লীলাও বটে, না-ও বটে। কেবল হাসির ভঙ্গি ও এক ধরনের হাত রাখিবার ভঙ্গিটা পরিচিত পুরোনো।

সে বলিল, আট বছর—হ্যাঁ তা—তো—তোমাকেও দেখলে চেনা যায় না। অপু 'আপনি' বলিতে পারিল না, মুখে বাধিল, লীলাব সম্বোধনে সে মনে আঘাত পাইয়াছিল।

লীলা বলিল—আপনাকে দু-দিন দেখেছি, পবশু কলেজে যাবার সময গাড়িতে উঠছি, দেখি কে একজন গাড়িবারান্দার ধারে বেঞ্চিতে বসে—দেখে মনে হল কোথায দেখেছি যেন—আবাব কালও দেখি বসে—আজ সকালে বাহিরের ঘরে খবরের কাগজখানা এসেছে কিনা দেখতে জানালা দিয়ে দেখি আজও বসে—তখন হঠাৎ মনে হল আপনি. .তখন মাকে বলেছি, মা আসছেন—কি করছেন কলকাতায়? রিপনে?—বাঃ, তা এতদিন আছেন, একদিন এখানে আসতে নেই?

বাল্যের সেই লীলা!—একজন অত্যন্ত পরিচিত, অত্যন্ত আপনার লোক যেন দূরে চলিয়া গিয়া পর হইয়া পড়িয়াছে। 'আপনি' বলিবে না 'তুমি' বলিবে, দিশাহারা অপু তাহা ঠাহর করিতে পারিল না। বলিল,—কি করে আসব? আমি কি ঠিকানা জানি?

লীলা বলিল—ভালো কথা, আজ এখানে হঠাৎ কি করে এসে পড়লেন?

অপু লজ্জায় বলিতে পারিল না যে, সে এখানে থাকিবার স্থানের সুপারিশ ধরিতে আসিয়াছে। লীলা জিজ্ঞাসা করিল—মা ভালো আছেন? বেশ—আপনার বুঝি সেকেন্ড ইয়ার? আমার ফার্স্ট ইয়ার আর্টস্।

একটি মহিলা ঘরে ঢুকিলেন। অপু চিনিল, বিস্মিতও হইল। লীলার মা মেজ-বৌরানী, কিন্তু বিধবার বেশ। আট দশ বৎসর পূর্বের সে অতুলনীয় রূপরাশি এখন একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া না গেলেও দেখিলে হঠাৎ চেনা যায় না। অপু পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। মেজ-বৌরানী বলিলেন—এসো বাবা এসো, লীলা কালও বলেছে, কে একজন বসে আছে মা, ঠিক বর্ধমানের সেই

অপূর্বর মতো—আজ আমাকে গিয়ে বললে, ও আর কেউ নয় ঠিক অপূর্ব—তখনই আমি ঝিকে দিয়ে ডাকতে পাঠালাম—বসো। দাঁড়িয়ে কেন বাবা? ভালো আছ বেশ? তোমার মা কোথায়?

অপু সংকুচিতভাবে কথার উত্তর দিয়া গেল। মেজ-বৌরানীর কথায় কি আন্তরিকতার সুর! যেন কত কালের পুরাতন পরিচিত আত্মীয়তার আবহাওয়া। অপু কি করিতেছে, কোথায় থাকে, মা কোথায় থাকেন, কি করিয়া চলে, এবার পরীক্ষা দিয়া পুনরায় পড়িবে কি না, নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন। তারপর তিনি চা ও খাবারের বন্দোবস্ত করিতে বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলে অপু বলিল—ইয়ে, তোমার বাবা কি—

লীলা ধরা গলায় বলিল—বাবা তো, এই তিন বছর হল—এটা মামার বাড়ি—

অপু বলিল—ও! তাই ঝি বললে দিদিমণি ডাকছেন।—মানে উনি—না?...মিঃ লাহিড়ী কে হন তোমার?

—দাদামশায়—উনি ব্যারিস্টার, তবে আজকাল আর প্র্যাকটিস করেন না—বড়ো মামা হাইকোর্টে বেরুচ্ছেন। ও-বছর বিলেত থেকে এসেছেন।

চা ও খাবার খাইয়া অপু বিদায় লইল। লীলা বলিল—বড়ো মামার মেয়ের নেম্-ডে পার্টি, সামনের বুধবারে। এখানে বিকালে আসবেন অবিশ্যি অপূর্ববাবু—ভুলবেন না যেন—ঠিক কিন্তু ভুলবেন না।

পথে আসিয়া অপুর চোখে প্রায় জল আসিল। 'অপূর্ববাবু!'—

লীলাই বটে, কিন্তু ঠিক কি সেই এগারো বছরের কৌতুকময়ী সরলা স্নেহময়ী লীলা?...সে লীলা কি তাহাকে 'অপূর্ববাবু' বলিয়া ডাকিত? তবুও কি আন্তরিকতা ও আত্মীয়তা। আর নিজের আপনার লোক জ্যাঠাইমাও তো কলিকাতায় আছেন—মেজ-বৌরানী সম্পূর্ণ পর হইয়া আজ তাহার বিষয়েতে যত খুঁটিনাটি আন্তরিক আগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, জ্যাঠাইমা কোনও দিন তাহা করিয়াছেন?...

বাসায় ফিরিয়া কেবলই লীলার কথা ভাবিল। তাহার মনের যে স্থান লীলা দখল করিয়া আছে ঠিক সে স্থানটিতে আর কেহই তো নাই? কিন্তু সে এ লীলা নয়। সে লীলা স্বপ্ন হইয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে—আর কি তাহার দেখা মিলিবে কোনও কালে? সে ঠিক বুঝিতে পারিল না—আজকার সাক্ষাতে সে আনন্দিত হইয়াছে কি ব্যথিত হইয়াছে।

বুধবারে পার্টির জন্য সে টুইল শার্টটা সাবান দিয়া কাচিয়া লইল। ভাবিল, নিজের যাহা আছে তাহাই পরিয়া যাইবে, চাহিবার চিন্তিবার আবশ্যক নাই। তবুও যেন বড়ো হীনবেশ হইল। মনে মনে ভাবিল, হাতে যখন পয়সা ছিল, তখন লীলার সঙ্গে দেখা হল না—আর এখন একেবারে এই দশা, এখন কিনা—!

লীলার দাদামশায় মিঃ লাহিড়ী খুব মিশুক লোক। অপুকে বৈঠকখানায় বসাইয়া খানিকক্ষণ গল্পগুজব করিলেন। লীলা আসিল, সে ভারি ব্যস্ত, একবার দু-চার কথা বলিয়াই চলিয়া গেল। কোনও পার্টিতে কেহ কখনও তাহাকে নিমন্ত্রণ করে নাই। যখন এক এক করিয়া নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক ও মহিলাগণ আসিতে আরম্ভ করিলেন, তখন অপু খুব খুশি হইল। কলিকাতা শহরে এ রকম ধনী উচ্চ শিক্ষিত পরিবারে মিশিবার সুযোগ—এ বুঝি সকলের হয়? মাকে গিয়া গল্প করিবার মতো একটা জিনিস পাইয়াছে এতদিন পরে! মা শুনিয়া কি খুশিই যে হইবেন!

বৈঠকখানায় অনেক সুবেশ যুবকের ভিড়, প্রায় সকলেই বড়োলোকের ছেলে, কেহ বা নতুন ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া আসিয়াছে, কেহ বা ডাক্তার, বেশির ভাগ বিলাতফেরত। কি লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তর্ক হইতেছিল। কর্পোরেশন ইলেকশন লইয়া কথা কাটাকাটি। অপু এ বিষয়ে কিছু জানে না, সে একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পাড়াগাঁয়ের কোন একটা মিউনির্সিপ্যালিটির কথায় সেখানকার নানা অসুবিধার কথাও উঠিল।

একজন মধ্যবয়সি ভদ্রলোক, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চোখে সোনা-বাঁধানো চশমা, একটু টানিয়া টানিয়া কথা বলিবার অভ্যাস, মাঝে মাঝে মোটা চুরুটে টান দিয়া কথা বলিতেছিলেন—দেখুন মিঃ সেন, এগ্রিকালচারের কথা যে বলছেন, ও শখের ব্যাপার নয়—ও কাজ আপনার আমার নয়, ইট মাস্ট বি ব্রেড ইন্ দি বোন্—জন্মগত একটা ধাত গড়ে না উঠলে শুধু কলের লাঙল কিনলে ও হয় না—

প্রতিপক্ষ একজন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের যুবক, সাহেবি পোশাক-পরা, বেশ সবল ও সুস্থকায়। তিনি অধীরভাবে সামনে ঝুঁকিয়া বলিলেন—মাপ করবেন রমেশবাবু, কিন্তু এ-কথার কোনও ভিত্তি আছে বলে আমার মনে হয় না। আপনি কি বলতে চান তা হলে এডুকেশন, অর্গ্যানিজেশন, ক্যাপিটাল—এসবের মূল্য নেই এগ্রিকালচারে? এই যে—

—আছে, সেকেন্ডারি—

—তবে চাষার ছেলে ভিন্ন কোনও শিক্ষিত লোক কখনও ওসবে যাবে না?...কারণ ইট্ ইজ নট ব্রেড ইন হিজ বোন্? অদ্ভুত কথা আপনার—আমার সঙ্গে কেম্ব্রিজে একজন আইরিশ ছাত্র পড়ত—লম্বা লম্বা চুল মাথায়, সুন্দর চেহারা, ধরনধারনে ট্রু পোয়েট। হয়তো সারারাত জেগে হল্লা করছে, একটা বেহালা নিয়ে বাজাচ্ছে—আবার হয়তো দেখুন সারাদিন পড়ছে, বসে কি লিখছে—নয় তো ভাবছে—ডিগ্রি নিয়ে চলে গেল বেরিয়ে কানাডায়—গবর্নমেন্ট হোমস্টেড ল্যান্ডে জংলী জমি নিলে—ছোট্ট একটা কাঠের কুঁড়েঘরে সেই দুর্ধর্ষ শীতের মধ্যে তিন-চার বৎসর কাটালে—হোমস্টেড ল্যান্ডের নিয়ম হচ্ছে টাইটল্ হবার আগে পাঁচ বৎসর জমির ওপব বাস করা চাই—থেকে জমি পরিষ্কার করলে, নিজের হাতে রোজ জমি সাফ করে—লোকজন নেই, দুশো একর জমি, ভাবুন কতদিনে—

ওদিকে একদলের মধ্যে আলোচনা বেশ ঘনাইয়া আসিল। একজন কে বলিয়া উঠিল—ওসব মর‍্যালিটি, আপনি যা বলছেন, সেকেলে হয়ে পড়েছে—এটা তো মানেন যে, ওসব তৈবি হয়েছে বিশেষ কোনও সামাজিক অবস্থায়, সমাজকে বা ইনডিভিজুয়ালকে প্রোটেকশান দেবার জন্যে, সুতরাং—

—বটে, তাহলে সবাই সুবিধাবাদী আপনারা। নর্ম্যাটিভ ভ্যালু বলে কোনও কিছুর স্থান নেই দুনিয়ায়?...ধরুন যদি—

অপু খুব খুশি হইল। কলিকাতার বড়োলোকের বাড়ির পার্টিতে সে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা ছাড়া শিক্ষিত বিলাত-ফেরত দলের মধ্যে এভাবে। নাটক-নভেলে পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা কখনও হয় নাই। সে অতীব খুশির সহিত চারিধারে চাহিয়া একবার দেখিল—মার্বেলের বড়ো ইলেকট্রিক ল্যাম্প কড়ি হইতে ঝুলিতেছে, সুন্দর ফুলকাটা ছিটের কাপড়ে ঢাকা কৌচ, সোফা, দামি আয়না—বড়ো বড়ো গোলাপ, মোরাদাবাদের পিতলের গোলাপদানি। নিজের বসিবার কৌচখানা সে দু-একবার অপরের অলক্ষিতে টিপিয়া দেখিল। তাহা ছাড়া এ ধরনের কথাবার্তা—এই তো সে চায়! কোথায় সে ছিল পাড়াগাঁয়ের গরিব ঘরের ছেলে—তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মামজোয়ানের স্কুলে পড়িতে যাইত, সে এখন কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে! এ-ধরনের একটা উৎসবের মধ্যে তাহার উপস্থিতি ও পাঁচজনের একজন হইয়া বসিবার আত্মপ্রসাদে ঘরের যাবৎ উপকরণ ও অনুষ্ঠানকে যেন সে সারা দেহ-মন দ্বারা উপভোগ করিতেছিল।

কৃষিকার্যে উৎসাহী ভদ্রলোকটি অন্য কথা তুলিয়াছেন, কিন্তু অপুর দক্ষিণ ধারের দলটি পূর্ব আলোচনাই চালাইতেছেন এখনও। অপুর মনে হইল সে-ও এ-আলোচনায় যোগদান করিবে, আর হয়তো এ-ধরনের সম্ভ্রান্ত সমাজে মিশিবার সুযোগ জীবনে কখনও ঘটিবে না। এই সময় দু-এক কথা এখানে বলিলে সে-ও একটা আত্মপ্রসাদ। ভবিষ্যতে ভাবিয়া আনন্দ পাওয়া যাইবে। পাঁস-নে চশমাপরা যুবকটির নাম হীরক সেন। নতুন পাশ করা ব্যারিস্টার। মুখে বেশ বুদ্ধির ছাপ—কি কথায়

সে বলিল—ওসব মানি নে বিমলবাবু, দেহ একটা এঞ্জিন—এঞ্জিনের যতক্ষণ স্টিম থাকে, চলে—যেই কলকব্‌জা বিগড়ে যায়, সব বন্ধ—

অপু অবসর খুঁজিতেছিল, এই সময় তাহার মনে হইল এ-বিষয়ে সে কিছু কথা বলিতে পারে। সে দু-একবার চেষ্টা করিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া কতকটা আনাড়ি, কতকটা মরীয়ার মতো আরক্ত মুখে বলিল—দেখুন মাপ করবেন, আমি আপনার মতে ঠিক মত দিতে পারি নে—দেহটাকে এঞ্জিনের সঙ্গে তুলনা করুন ক্ষতি নেই, কিন্তু যদি বলেন দেহ ছাড়া আর কিছু নেই—

ঘরের সকলেই তাহার দিকে যে কতকটা বিস্ময়ে, কতকটা কৌতুকের সহিত চাহিতেছে, সেটুকু সে বুঝিতে পারিল—তাহাতে সে আরও অভিভূত হইয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে সেটুকু চাপিবার চেষ্টায় আরও মরীয়া হইয়া উঠিল।

একজন বাধা দিয়া বলিল—মশায় কি করেন, জানতে পারি কি?

—আমি এবার আই.এ. দেবো।

পাঁস-নে চশমা-পরা যে যুবকটি এঞ্জিনের কথা তুলিয়াছিল, সে বলিল,—ইউনিভার্সিটির আরও দু-এক ক্লাস পড়ে এ তর্কগুলো করলে ভালো হয় না?

সে এমন অতিরিক্ত শান্তভাবে কথাগুলি বলিল যে, ঘরসুদ্ধ লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অপুর মুখ দাড়িমের মতো লাল হইয়া উঠিল।

যদি সে পূর্ব হইতেই ধারণা করিয়া না লইত যে, সে এ-সভায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এবং উহারা দয়া করিয়া তাহার এখানে উপস্থিতি সহ্য করিতেছে—তাহা হইলে এমন উগ্র ও অভদ্র ভাবের প্রত্যুত্তরে হয়তো তাহার রাগ হইত—কিন্তু সে তো কোনও কিছুতেই এদের সমকক্ষ নয়!—রাগ করিবার মতো ভরসা সে নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। তার অত্যন্ত লজ্জা হইল—এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটা ঢাকিবার জন্য সে আরও মরীয়ার সুরে বলিল—ইউনিভার্সিটির ক্লাসে না পড়লে যে কিছু জানা যায় না একথা আমি বিশ্বাস করি নে—আমি একথা বলতে পারি কোনও ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র যে-কোনও কলেজের হিস্ট্রিতে কি ইংলিশ পোইট্রিতে—কিংবা জেনারেল নলেজে পারবে না আমার সঙ্গে।

নিতান্ত অপটু ধরনের কথা—সকলে আরও একদফা হাসিয়া উঠিল।

তারপর তাহারা নিজেদের মধ্যে অন্য কথাবার্তায় প্রবৃত্ত হইল। অপু আধঘণ্টা থাকিলেও তাহার অস্তিত্বই যেন সকলে ভুলিয়া গেল। উঠিবার সময় তাহারা নিজেদের মধ্যে করমর্দন ও পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল, তাহার দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না।

যেভাবে সকলে তাহাকে উড়াইয়া দিল বা মানুষের মধ্যে গণ্য করিল না, তাহাতে সত্যই অপু অপমান ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার পাশ কাটাইয়া সকলে চলিয়া গেল—কেহ একটা প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিল না, তাহার সম্বন্ধে কেহ কোন কৌতূহলও দেখাইল না। অপু মনে মনে ভাবিল—বেশ, না বলুক কথা—আমি কি জানি না-জানি, তার খবর ওরা কি জানে? সে জানত অনিল...

সে চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় লীলা আসিয়া তাহাকে নিজে বাড়ির মধ্যে লইয়া গেল। বলিল,—মা, অপূর্ববাবু না খেয়েই চুপি চুপি পালাচ্ছিলেন!

লীলা বৈঠকখানার ব্যাপারটা না জানিতে পারে...

একটি ছোট আট-নয় বৎসরের ছেলেকে দেখাইয়া বলিল—একে চেনেন অপূর্ববাবু? এ সেই খোকামণি, আমার ছোট ভাই, এর অন্নপ্রাশনেই আপনাকে একবার আসতে বলেছিলুম, মনে নেই?

লীলার কয়েকটি সহপাঠিনী সেখানে উপস্থিত, সে সকলকে বলিল—তোমরা জানো না, অপূর্ববাবুর গলা খুব ভালো, তবে গান গাইবেন কিনা জানি নে, মানে বেজায় লাজুক, আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, একটা অনুরোধ রাখবেন অপূর্ববাবু?

অপু অনেকের অনুরোধ-উপরোধে অবশেষে বলিল—আমি বাজাতে জানি নে—কেউ যদি বরং বাজান।—

খাওয়াটা ভালোই হইল। তবুও রাত্রে বাসায় ফিরিতে ফিরিতে তাহার মনে হইতেছিল—আর কখনও এখানে সে আসিবে না। বড়োলোকের সঙ্গে তাহার কিসের খাতির—দরকার কি আসিবার? দারুণ অতৃপ্তি।

যেদিন অপুর পরীক্ষা আরম্ভ হইবে তাহার দিন-পাঁচেক আগে অপু পত্রে জানিল মায়ের অসুখ, হস্তাক্ষর তেলি-বাড়ির বড়ো বৌয়ের।

সন্ধ্যার সময় অপু বাড়ি পৌছিল।

সর্বজয়া কাঁথা গায়ে দিয়া শুইয়া আছে, দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া মনে হয়। অপুকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। অনেক দিন হইতেই অসুখে ভুগিতেছে, পবীক্ষার পড়ার ব্যাঘাত হওয়ার ভয়ে খবর দেয় নাই, সেদিন তেলি-বৌ জোর করিয়া নিজে পত্র দিয়াছে। এমন যে কিছু শয্যাগত অবস্থা তাহা নয়, খায়-দায়, কাজকর্ম করে। আবার অসুখও হয়। সন্ধ্যা হইলেই শয্যা আশ্রয় করে, আবার সকালে উঠিয়া গৃহকর্ম শুরু করে। চিরদিনের গৃহিণীপনা এ অসুস্থ শরীরেও তাহাকে ত্যাগ করে নাই।

অপু বলিল—উঠো না বিছানা থেকে মা—শুয়ে থাকো—দেখি গা।

—তুই আয় বোস্—ও কিছু না—একটু জ্বর হয়, খাই-দাই—ও এমন সময়ে হযেই থাকে। বোশেখ মাসের দিকে সেরে যাবে—তুই যে মেয়েকে পড়াস, সে ভালো আছে তো?

সর্বজয়ার বোগশীর্ণ মুখের হাসিতে অপুর চোখে জল আসিল। সে পুঁটুলি খুলিয়া গোটাকতক কমলালেবু, বেদানা, আপেল বাহিব করিয়া দেখাইল। জিনিসপত্র সস্তায় কিনিতে পাবিলে সর্বজয়া ভারি খুশি হয়। অপু জানে মাকে আমোদ দিবার এটা একটা প্রকৃষ্ট পন্থা। কমলালেবু দেখাইযা বলে—কত সস্তায় কলকাতায় জিনিসপত্র পাওযা যায় দ্যাখো—লেবুগুলো দশপয়সা—

প্রকৃতপক্ষে লেবু কটির দাম ছ'আনা।

সর্বজয়া আগ্রহের সহিত বলিল—দেখি? ওমা, এখানে যে ওগুলোর দাম বারো আনাব কম নয়—এখানে সব ডাকাত।

চার পয়সার এক তাড়া পান দেখাইয়া বলিল—বৈঠকখানা বাজার থেকে দু-পয়সায়—দ্যাখো মা—

সর্বজয়া ভাবে—এবার ছেলের সংসারী হইবাব দিকে মন গিয়াছে, হিসাব করিয়া সে চলিতে শিখিয়াছে।

অপু ইচ্ছা করিয়াই লীলার সঙ্গে সাক্ষাতের কথাটা উঠায় না। ভাবে, মা মনে মনে দুরাশা পোষণ করে, হয়তো এখনই বলিয়া বসিবে—লীলার সঙ্গে তোর বিয়ে হয় না?. .দরকার কি, অসুস্থ মায়ের মনে সে-সব দুরাশার ঢেউ তুলিয়া?

এমন সব কথা কখনও অপু মায়ের সামনে বলে না, যাহা কিনা মা বুঝিবে না। জগৎ সংসারটাকে মায়ের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের উপযোগী করিয়াই সে মায়ের সম্মুখে উপস্থিত করে। দিন-তিনেক সে বাড়ি রহিল। রোজ দুপুরে জানলার ধারের বিছানাটিতে সর্বজয়া শুইয়া থাকে, পাশে সে বসিয়া নানা গল্প করে। ক্রমে বেলা যায়, রোদ প্রথমে ওঠে রান্নাঘরের চালায়, পরে বেড়ার ধারের পালতেমাদার গাছটার মাথায়, ক্রমে বাঁশঝাড়ের ডগায়। ছায়া পড়িয়া যায়—বৈকালের ঘন ছায়ায় অপুর মনে আবার একটা বিপুল নির্জনতা ও সঙ্গহীনতার ভাব আনে—গত গ্রীষ্মের ছুটির দিনের মতো।

সর্বজয়া হাসিয়া বলে—পাশটা হলে এবার তোর বিয়ের ঠিক করেছি এক জায়গায়। মেয়ের দিদিমা এসেছিল এখানে, বেশ লোক—

ঘরের কোণে একটা তাকে সংসারের জিনিসপত্র সর্বজয়া রাখিয়া দেয়—একটা হাঁড়িতে আমসত্ত্ব, একটা পাত্রে আচার। অপু চিরকালের অভ্যাস অনুসারে মাঝে মাঝে ভাঁড় হাঁড়ি খুঁজিয়া-পাতিয়া মাকে লুকাইয়া এটা-ওটা চুরি করিয়া খায়! এ কয়দিনও খাইয়াছে। সর্বজয়া বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকে, টের পায় না—সেদিন দুপুরে অপু জানালাটার কাছে দাঁড়াইয়া আছে—গায়ে মায়ের গামছাখানা। হঠাৎ সর্বজয়া চোখ চাহিয়া বলিল—আমার গামছাখানা আবার পিষচো কেন?—ওখানা তিলে বড়ি দেবো বলে রেখে দিইচি—কুণ্ডুদের বাড়ির গামছা ওখানা, ভারি ঠন্‌কো—আর সরে সরে তাকটার ঘাড়ে যাচ্ছ কেন?—ছুঁসনে তাক—তুমি এমন দুষ্টু হয়েচো, বাসি কাপড়ে ছুঁয়েছিলে তাকটা?

কথাটা অপুর বুকে কেমন বিঁধিল—মা সেরে উঠে তিলে বড়ি দেবে? তা দিয়েছে! মা আর উঠছে না—হঠাৎ তাহার মনে হইল, এই সেদিনও তো সে তাক হইতে আমসত্ত্ব চুরি করিয়াছে...মা, অসহায় মা বিছানায় জ্বরের ঘোরে পড়িয়া ছিল...একুশ বৎসর ধরিয়া মায়ের যে শাসন চলিয়াছিল আজ তাহা শিথিল হইয়া পড়িতেছে, দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, নিজের অধিকার আর বোধ হয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না কখনও...

অপু চতুর্থদিন সকালে চলিয়া গেল, কালই পরীক্ষা। চুকিয়া গেলেই আবার আসিবে। শেষরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া শোনে, সর্বজয়া রান্নাঘরে ইতিমধ্যে কখন ঘুম হইতে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে, ছেলের সঙ্গে গরম পরোটা দেওয়া যাইবে।

সর্বজয়ার এরকম কোনও দিন হয় নাই। অপু চলিয়া যাওয়ার দিনটা হইতে বৈকালে তাহার এত মন হু হু করিতে লাগিল, যেন কেহ কোথাও নাই, একটা অসহায় ভাব, মনের উদাস অবস্থা। কত কথা, সারা জীবনের কত ঘটনা, কত আনন্দ ও অশ্রুর ইতিহাস একে একে মনে আসিয়া উদয় হয়। গত একমাস ধরিয়া এসব কথা মনে হইতেছে। নির্জনে বসিলেই বিশেষ করিয়া ..। ছেলেবেলায় বুধী বলিয়া গাই ছিল বাড়িতে...বাল্যসঙ্গিনী হিমিদি ..দুজনে একসঙ্গে দো-পেটে গাঁদাগাছ পুঁতিয়া জল দিত। একদিন হিমিদি ও সে বন্যাব জলে মাঠে ঘড়া বুকে সাঁতার কাটিতে গিয়া ডুবিয়া গিয়াছিল আব একটু হইলেই...

বিবাহ...মনে আছে সেদিন দুপুরে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার ছোট ভাই তখন বাঁচিয়া, লুকাইয়া তাহাকে নাড়ু দিয়া গিয়াছিল হাতের মুঠায়। ছোট্ট ছেলেবেলার অপু...কাচের পুতুলের মতো রূপ...প্রথম স্পষ্ট কথা শিখিল, কি জানি কি করিয়া শিখিল 'ভিজে'। একদিন অপুকে কদ্‌মা হাতে বসাইয়া রাখিয়াছিল।—কেমন খেলি ও খোকা?

অপু দন্তহীন মুখে কদমা চিবাইতে চিবাইতে ফুলের মতো মুখটি তুলিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—'ভিজে'। হি-হি—ভাবিলে এখনও সর্বজয়ার হাসি পায়।

সেদিন দুপুর হইতেই বুকে মাঝে মাঝে ফিক-ধরা বেদনা হইতে লাগিল। তেলি-বৌ আসিয়া তেল গরম করিয়া দিয়া গেল। দু-তিনবার দেখিয়াও গেল। সন্ধ্যার পর কেহ কোথাও নাই। একা নির্জন বাড়ি। জ্বরও আসিল।

রাত্রে খুব পরিষ্কার আকাশে ত্রয়োদশীর প্রকাণ্ড বড়ো চাঁদ উঠিয়াছে। জীবনে এই প্রথম সর্বজয়ার একা থাকিতে ভয়-ভয় করিতে লাগিল। খানিক রাত্রে একবার যেন মনে হইল, সে জলের তলায় পড়িয়া আছে, নাকে মুখে জল ঢুকিয়া নিঃশ্বাস একেবারে বন্ধ হইয়া আসিতেছে...একেবারে বন্ধ। সে ভয়ে এক-গা ঘামিয়া ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। সে কি মরিয়া যাইতেছে? এই কি মৃত্যু?—সে এখন কাহাকে ডাকে? জীবনে সর্বপ্রথম এই তাহার জীবনের ভয় হইল—ইহার আগে কখনও তো এমন হয় নাই! পরে নিজের ভয় দেখিয়া তাহার আর একদফা ভয় হইল। ভয় কিসের? না—না—মৃত্যু, সে এরকম নয়। ও কিছু না।

কত চুরি, কত পাপ...চুরিই যে কত করিয়াছে তাহার কি ঠিক আছে? ছেলেমেয়েকে খাওয়াইতে অমুকের গাছের কলার কাঁদিটা, অমুকের গাছের শসাটা লুকাইয়া রাখিত তক্তপোশের তলায়—ভুবন মুখুজ্যেদের বাড়ি হইতে একবার দশ পলা তেল ধার করিয়া আনিয়া ভালোমানুষ রানুর মার কাছে পাঁচ পলা শোধ দিয়া আসিয়াছিল, মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিল—পাঁচ পলাই তো নিয়ে গিছলাম ন'দি—বোলো সেজ ঠাকুরঝিকে। সারাজীবন ধরিয়া শুধু দুঃখ ও অপমান। কেন আজ এসব কথা মনে উঠিতেছে?

ঘর অন্ধকার। ...খাটের তলায় নেংটি ইঁদুর ঘুট্ ঘুট্ করিতেছে। সর্বজয়া ভাবিল, ওদের বাড়ির কলটা না আনলে আর চলে না—নতুন মুগগুলো সব খেয়ে ফেললে। কিন্তু নেংটি ইঁদুরের শব্দ তো?—সর্বজয়ার আবার সেই ভয়টা আসিল, দুর্দমনীয় ভয়...সারা শরীর যেন ধীরে ধীরে অসাড় হইয়া আসিতেছে ভয়ে...পায়ের দিক হইতে ভয়টা সুড়সুড়ি কাটিয়া উপরের দিকে উঠিতেছে, যতটা উঠিতেছে, ততটা অসাড় করিয়া দিতেছে...না—পায়ের দিক হইতে না—হাতের আঙুলের দিক হইতে...কিন্তু তাহার সন্দেহ হইতেছে কেন? ইঁদুরের শব্দ নয় কেন? কিসের শব্দ? কখনও তো এমন সন্দেহ হয় না?...হঠাৎ সর্বজয়ার মনে হইল, না—পায়ের ও হাতের দিক হইতে সুড়সড়ি কাটিয়া যাহা উপরের দিকে উঠিতেছে তাহা ভয় নয়—তাহা মৃত্যু। মৃত্যু? ভীষণ ভয়ে সর্বজয়া ধড়মড় করিয়া আবার বিছানা হইতে উঠিতে গেল...চিৎকার করিতে গেল...খুব...খুব চিৎকার, আকাশফাটা চিৎকার—অনেকক্ষণ চিৎকার করিয়াছে, আর সে চেঁচাইতে পারে না...গলা ভাঙিয়া আসিয়াছে...কেউ আসিল না তো?...কিন্তু সে তো বিছানা হইতে...বিছানা হইতে উঠিল কখন?...সে তো উঠে নাই—ভয়টা সুড়সড়ি কাটিয়া সারা দেহ ছাইয়া ফেলিয়াছে, যেন খুব বড়ো একটা কালো মাকড়সা...শুঁড়ের বিষে দেহ অবশ...অসাড় হাতও নাড়ানো যায় না...পা-ও না...সে চিৎকার করে নাই... ভুল।..

সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিয়াছে...একজনের কথাই মনে হয়...অপু...অপু...অপুকে ফেলিয়া সে থাকিতে পারিতেছে না...অসম্ভব।...বিস্ময়ের সহিত দেখিল—সে নিজে অনেকক্ষণ কাঁদিতেছে!... এতক্ষণ তো টের পায় নাই!...আশ্চর্য! ...চোখের জলে বালিশ ভিজিয়া গিয়াছে যে!...

জ্যোৎস্না অপূর্ব, ভয় হয় না...কেমন একটা আনন্দ...আকাশটা, পুরাতন আকাশটা যেন স্নেহে প্রেমে জ্যোৎস্না হইয়া গলিয়া ঝরিয়া বিন্দুতে বিন্দুতে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দিতেছে...টুপ...টুপ...টুপ...টাপ। আবার কান্না পায়...জ্যোৎস্নার আলোয় জানালার গরাদে ধরিয়া হাসিমুখে ও কে দাঁড়াইয়া আছে?...সর্বজয়ার দৃষ্টি পাশের জানলাব দিকে নিবদ্ধ হইল.. বিস্ময়ে আনন্দে রোগশীর্ণ মুখখানা মুহূর্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল...অপু...দাঁড়াইয়া আছে।...এ অপু নয়...সেই ছেলেবেলাকার ছোট্ট অপু...এতটুকু অপু...নিশ্চিন্দিপুরের বাঁশবনের ভিটেতে এমন কত চৈত্র-জ্যোৎস্নারাতে ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িত যাহার দন্তহীন ফুলের কুঁড়ির মতো কচি মুখে...সেই অপু...ওর ছেলেমানুষ খঞ্জন পাখির মতো ডাগর ডাগর চোখের নীল চাহনি...চুল কোঁকড়া কোঁকড়া...মুখচোরা, ভালোমানুষ লাজুক বোকা, জগতের ঘোরপ্যাঁচ কিছুই একেবারে বোঝে না...কোথায় যেন সে যায়...নীল আকাশ বাহিয়া বহু দূরে...বহু দূরের দিকে, সুনীল মেঘপদবীর অনেক উপরে...যায়...যায়...যায়...যায়...মেঘের ফাঁকে যাইতে যাইতে মিলাইয়া যায়...

বুঝি মৃত্যু আসিয়াছে। ...কিন্তু তার ছেলের বেশে, তাকে আদর করিয়া আগু বাড়াইয়া লইতে...এতই সুন্দর...

কি হাসি!...কি মিষ্টি হাসি ওর মুখের!...

পরদিন সকালে তেলি-বাড়ির বড়ো-বৌ আসিল। দরজায় রাত্রে খিল দেওয়া হয় নাই, খোলাই আছে। বড়ো-বৌ আপন মনে বলিল—রাত্রে দেখছি মা-ঠাকরুনের অসুখ খুব বেড়েছে, খিলটাও দিতে পারেন নি।

বিছানার উপর সর্বজয়া যেন ঘুমাইতেছেন। তেলি-বৌ একবার ভাবিল—ডাকিবে না—কিন্তু পথ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়া উঠাইতে গেল। সর্বজয়া কোনও সাড়া দিলেন না, নড়িলেনও না। বড়ো-বৌ আরও দু-একবার ডাকাডাকি করিল, পরে হঠাৎ কি ভাবিয়া নিকটে আসিয়া ভালো করিয়া দেখিল।

পরক্ষণেই সে সব বুঝিল।

সর্বজয়ার মৃত্যুর পর কিছুকাল অপু এক অদ্ভুত মনোভাবের সহিত পরিচিত হইল। প্রথম অংশটা আনন্দ-মিশ্রিত—এমন কি মায়ের মৃত্যু-সংবাদ প্রথম যখন সে তেলি-বাড়ির তারের খবরে জানিল, তখন প্রথমটা তাহার মনে একটা আনন্দ, একটা যেন মুক্তির নিঃশ্বাস...একটা বাঁধন-ছেঁড়ার উল্লাস...অতি অল্পক্ষণের জন্য—নিজের অজ্ঞাতসারে। তাহার পরই নিজের মনোভাবে তাহার দুঃখ ও আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এ কি! সে চায় কি! মা যে নিজেকে একেবারে বিলোপ করিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহার সুবিধার জন্য। মা কি তাহার জীবনপথের বাধা?—কেমন করিয়া সে এমন নিষ্ঠুর, এমন হৃদয়হীন—। তবুও সত্যকে সে অস্বীকার করিতে পারিল না। মাকে এত ভালোবাসিত তো, কিন্তু মায়ের মৃত্যু-সংবাদটা প্রথমে যে একটা উল্লাসের স্পর্শ মনে আনিয়াছিল—ইহা সত্য—সত্য—তাহাকে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। তাহার পর সে বাড়ি রওনা হইল। উলা স্টেশনে নামিয়া হাঁটিতে শুরু করিল। এই প্রথম এ পথে সে যাইতেছে—যেদিন মা নাই! গ্রামে ঢুকিবার কিছু আগে আধমজা কোদলা নদী, এ সময়ে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়—এরই তীরে কাল মাকে সবাই দাহ করিয়া গিয়াছে! বাড়ি পৌঁছিল বৈকালে। এই সেদিন বাড়ি হইতে গিয়াছে, মা তখনও ছিলেন...ঘরে তালা দেওয়া, চাবি কাহাদের কাছে? বোধ হয় তেলি-বাড়ির ওরা লইয়া গিয়াছে। ঘরের পৈঠায় অপু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। উঠানের বাহিরে আগড়ের কাছে এক জায়গায় পোড়া খড় জড়ো করা। সেদিকে চোখ পড়িতেই অপু শিহরিয়া উঠিল—সে বুঝিয়াছে—মাকে যাহারা সৎকার করিতে গিয়াছিল, দাহ অন্তে তাহাবা কাল এখানে আগুন ছুঁইয়া নিমপাতা খাইয়া শুদ্ধ হইয়াছে—প্রথাটা অপু জানে...মা মারা গিয়াছেন এখনও অপুর বিশ্বাস হয় নাই...একুশ বৎসরের বন্ধন, মন এক মুহূর্তে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পাবে নাই.. কিন্তু পোড়া খড়গুলাতে নগ্ন, রূঢ় নিষ্ঠুর সত্যটা...মা নাই! মা নাই!...বৈকালের কি রূপটা! নির্জন, নিরালা, কোনও দিকে কেহ নাই। উদাস পৃথিবী, নিস্তব্ধ বিবাগী রাঙা রোদভরা আকাশটা।...অপু অর্থহীন দৃষ্টিতে পোড়া খড়গুলার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু মায়ের গায়ের কাঁথাখানা উঠানের আলনায় মেলিয়া দেওয়া কেন? কাঁথাখানা মায়ের গায়ে ছিল...সঙ্গেই তো যাওয়ার কথা। অনেক দিনের নিশ্চিন্দিপুরের আমলের, মায়ের হাতে সেলাই করা কল্কা-কাটা রাঙা সুতার কাজ। ...কতক্ষণ সে বসিয়া ছিল জানে না, রোদ প্রায় পড়িয়া আসিল। তেলি-বাড়ির বড়ো ছেলে নাদুর ডাকে চমক ভাঙিতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। ম্লান হাসিয়া বলিল—এই যে, আমার ঘরের চাবিটা তোমাদের বাড়ি?...

নাদু বলিল—কখন এলে, এখানে বসে একলাটি—বেশ তো দাদাঠাকুর—এসো আমাদের বাড়ি।

অপু বলিল, না ভাই, তুমি চাবিটা নিয়ে এসো—ঘরের মধ্যে দেখি জিনিসগুলোর কি ব্যবস্থা। চাবি দিয়া নাদু চলিয়া গেল।

—ঘর খুলে দ্যাখো, আমি আসছি এখুনি।

অপু ঘরে ঢুকিল। তক্তপোশের উপর বিছানা নাই, বালিশ, মাদুর কিছু নাই—তক্তপোশটা পড়িয়া আছে—তক্তপোশের তলায় একটা পাথরের খোরায় কি ভিজানো—খোরাটা হাতে তুলিয়া দেখিল। চিরতা না নিমছাল কি ভিজানো—মায়ের ওষুধ।

বাহিরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কে বলিল—ঘরের মধ্যে কে?—অপু খোরাটা তক্তপোশের

কোণে নামাইয়া রাখিয়া বাহিরের দাওয়ায় আসিল। নিরুপমা দিদি—নিরুপমাও অবাক—গালে আঙুল দিয়া বলিল—তুমি! কখন এলে ভাই?—কই কেউ তো বলে নি!...

অপু বলিল—না, এই তো এলাম,—এই এখনও আধঘণ্টা হয় নি।

নিরুপমা বলিল—আমি বলি রোদ পড়ে গিয়েছে, কাঁথাটা কেচে মেলে দিয়ে এসেছি বাইরে, যাই কাঁথাখানা তুলে রেখে আসি কুণ্ডুদের বাড়ি। তাই আসছি—

অপু বলিল—কাঁথাখানা মায়ের গায়ে ছিল, না নিরুদি?

—কোথায়?...পরশু রাতে তো তাঁর—পরশু বিকেলে বড়ো-বৌকে বলেছেন কাঁথাখানা সরিয়ে রাখো মা—ও আমার অপুর জন্যে, বর্ষাকালে কলকাতা পাঠাতে হবে—সেই পুরানো তুলো জমানো কালো কম্বলটা ছিল...সেইখানা গায়ে দিয়েছিলেন—তিনি আবার প্রাণ ধরে তোমার কাঁথা নষ্ট করবেন?...তাই কাল যখন ওরা তাঁকে নিয়ে-থুয়ে গেল তখন ভাবলাম রুগীর বিছানায় তো ছিল কাঁথাখানা, জলকাচা করে রোদে দিই—কাল আর পারি নি—আজ সকালে ধুয়ে আলনায় দিয়ে গেলাম—তা এসো—আমাদের বাড়ি—ওসব শুনবো না—মুখ শুকনো—হবিষ্যি হয় নি? এসো—

নিরুপমার আগে আগে সে কলের পুতুলের মতো তাদের বাড়ি গেল। সরকার মহাশয় কাছে ডাকিয়া বসাইয়া অনেক সান্ত্বনার কথা বলিলেন।

নিরুদি কি করিয়া মুখ দেখিয়া বুঝিল খাওয়া হয় নাই! নাদুও তো ছিল—কই কোনও কথা তো বলে নাই?

সন্ধ্যার পর নিরুপমা একখানা রেকাবিতে আখ ও ফলমূল কাটিয়া আনিল। একটা কাঁসার বাটিতে কাঁচামুগের ডাল-ভিজা, কলা ও আখের গুড় নিয়া নিজে একসঙ্গে মাখিয়া আনিয়াছে। অপু কারুর হাতে চটকানো জিনিস খায় না, ঘেন্না-ঘেন্না করে...প্রথমটা মুখে তুলিতে একটুখানি গা কেমন করিতেছিল। তারপর দুই-এক গ্রাস খাইয়া মনে হইল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আস্বাদই তো!...নিজের হাতে বা মায়ের হাতে মাখিলে যা হইত—তাই। পরদিন হবিষ্যের সময় নিরুপমা গোয়ালে সব জোগাড়পত্র করিয়া অপুকে ডাক দিল। উনুনে ফুঁ পাড়িয়া কাঠ ধরাইয়া দিল। ফুটিয়া উঠিলে বলিল—এইবার নামিয়ে ফ্যালো, ভাই।

অপু বলিল—আর একটু হবে না—নিরুদি?

নিরুপমা বলিল—নামাও দেখি, ও হয়ে গিয়েছে। ডালবাটাটা জুড়োতে দাও—

সব মিটিয়া গেলে সে কলিকাতায় ফিরিবার উদ্যোগ করিল। সর্বজয়ার জাঁতিখানা, সর্বজয়ার হাতে সইকরা খানদুই মনিঅর্ডারের রসিদ চালের বাতায় গোঁজা ছিল—সেগুলি, সর্বজয়ার নখ কাটিবার নরুণটা পুঁটলির মধ্যে বাঁধিয়া লইল। দোরের পাশে ঘরের কোণে সেই তাকটা—আসিবার সময় সেদিকে নজর পড়িল। আচারভরা ভাঁড়, আমসত্ত্বের হাঁড়িটা, কুলচুর, মায়ের গঙ্গাজলের পিতলের ঘটি, সবই পড়িয়া আছে...যে যত ইচ্ছা খুশি খাইতে পারে, যাহা খুশি ছুঁইতে পারে, কেহ বকিবার নাই, বাধা দিবার নাই। তাহার প্রাণ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে মুক্তি চায় না...অবাধ অধিকার চায় না—তুমি এসে শাসন করো, এসব ছুঁতে দিয়ো না, হাত দিতে দিয়ো না—ফিরে এসো মা...ফিরে এসো...

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, একটা তীব্র ঔদাসীন্য সব বিষয়ে, সকল কাজে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়ানক নির্জনতার ভাবটা। পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছিল, কলিকাতায় থাকিতে একদণ্ডও ইচ্ছা হয় না...মন পাগল হইয়া উঠে, কেমন যেন পালাই-পালাই ভাব হয় সর্বদা, অথচ পালাইবার স্থান নাই, জগতে সে একেবারে একাকী—সত্যসত্যই একাকী।

এই ভয়ানক নির্জনতার ভাব এক এক সময় অপুর বুকে পাথরের মতো চাপিয়া বসে, কিছুতেই সেটা সে কাটাইয়া উঠিতে পারে না, ঘরে থাকা তাহার পক্ষে তখন আর সম্ভব হয় না। গলিটার বাহিরে বড়ো রাস্তা, সামনে গোলদিঘি, বৈকালে গাড়ি, মোটর, লোকজন ছেলেমেয়ে। বড়ো

মোটরগাড়িতে কোন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের মেয়েরা বাড়ির ছেলেমেয়েদের লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, অপুর মনে হয় কেন সুখী পরিবার!—ভাই, বোন, মা, ঠাকুরমা, পিসিমা, রাঙাদি, বড়দা, ছোটকাকা। যাহাদের থাকে তাহাদের কি সব দিক দিয়াই এমন করিয়া ভগবান দিয়া দেন! অন্যমনস্ক হইবার জন্য এক-একদিন সে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরিতে গিয়া বিলাতি ম্যাগাজিনের পাতা উলটাইয়া থাকে। কিন্তু কোথাও বেশিক্ষণ বসিবার ইচ্ছা হয় না, শুধুই কেবল এখানে-ওখানে ফুটপাথ হইতে বাসায়, বাসা হইতে ফুটপাতে। এক জায়গায় বসিলেই শুধু মায়ের কথা মনে আসে, উঠিয়া ভাবে গোলদিঘিতে আজ সাঁতারের ম্যাচের কি হল দেখে আসি বরং—কলিকাতায় থাকিতে ইচ্ছা করে না, মনে হয় বাহিরে কোথাও চলিয়া গেলে শান্তি পাওয়া যাইত—যে কোনও জায়গায়, যে কোন জায়গায়—পাহাড়ে, জঙ্গলে, হরিদ্বারে কেদার-বদরীর পথে—মাঝে মাঝে ঝরনা, নির্জন অধিত্যকায় কত ধরনের বিচিত্র বন্যপুষ্প, দেওদার ও পাইন বনের ঘন ছায়া। সাধু সন্ন্যাসী দেবমন্দির, রামচটি, শ্যামচটি কত বর্ণনা তো সে বইয়ে পড়ে, একা বাহির হইয়া পড়া মন্দ কি?—কি হইবে এখানে শহরের ঘিঞ্জি ও ধোঁয়ার বেড়াজালের মধ্যে?

কিন্তু পয়সা কই? তাও তো পয়সার দরকার। তেলিরা কুড়ি টাকা দিয়াছিল মাতৃশ্রাদ্ধের দরুন, নিরুপমা নিজে হইতে পনেরো, বড়ো-বৌ আলাদা দশ। অপু সে টাকার এক পয়সাও রাখে নাই, অনেক লোকজন খাওয়াইয়াছে। তবু তো সামান্যভাবে তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ!

দশপিণ্ড দানের দিন সে কি তীব্র বেদনা! পুরোহিত বলিতেছেন—প্রেতা শ্রীসর্বজয়া দেবী—অপু ভাবে কাহাকে প্রেত বলিতেছে? সর্বজয়া দেবী প্রেত? তাহার মা, প্রীতি আনন্দ ও দুঃখ-মুহূর্তের সঙ্গিনী, এত আশাময়ী, হাস্যময়ী, এত জীবন্ত যে ছিল কিছুদিন আগেও, সে প্রেত? সে আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূত-নিরাশ্রয়ঃ?

তারপরই মধুর আশার বাণী—আকাশ মধুময় হউক, বাতাস মধুময় হউক, পথের ধূলি মধুময় হউক, ওষধি সকল মধুময় হউক, বনস্পতি মধুময় হউক, সূর্য চন্দ্র, অন্তরীক্ষস্থিত আমাদের পিতা মধুময় হউন।

সারাদিনব্যাপী উপবাস অবসাদ, শোকের পর এ মন্ত্র অপুর মনে সত্য সত্যই মধুবর্ষণ করিয়াছিল, চোখের জল সে রাখিতে পারে নাই। হে আকাশের দেবতা, বাতাসের দেবতা, তাই করো, মা আমার অনেক কষ্ট করে গিয়েছেন, তাঁর প্রাণে তোমাদের উদার আশীর্বাদের অমৃতধারা বর্ষণ করো।

এই অবস্থায় শুধুই ইচ্ছা করে যারা আপনার লোক, যারা তাহাকে জানে ও মাকে জানিত তাহাদের কাছে যাইতে। এক জ্যাঠাইমারা আছেন—কিন্তু তাঁহাদের সহানুভূতি নাই, তবু সেখানেই যাইতে ইচ্ছা করে। তবুও মনে হয়, হয়তো জ্যাঠাইমা মায়ের দু-পাঁচটা কথা বলিবেন এখন, দুটা সহানুভূতির কথা হয়তো বলিবেন—।

মাস-তিনেক এভাবে কাটিল। এ তিন মাসের কাহিনী তাহার জীবনের ইতিহাসে একটা একটানা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের কাহিনী। ভবিষ্যৎ জীবনে অপু এ গলিটার নিকট দিয়া যাইতে যাইতে নিজের অজ্ঞাতসারে একবার বড়ো রাস্তা হইতে গলির মোড়ে চাহিয়া দেখিত, আর কখনও সে ইহার মধ্যে ঢোকে নাই।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে সে একদিন খবরের কাগজে দেখিল—যুদ্ধের জন্য লোক লওয়া হইতেছে, পার্ক স্ট্রীটে তাহার অফিস। দুপুরে ঘুরিতে ঘুরিতে সে গেল পার্ক স্ট্রীটে।

টেবিলে একরাশ ছাপানো ফর্ম পড়িয়া ছিল, অপু একখানা তুলিয়া পড়িয়া রিক্রুটিং অফিসারকে বলিল—কোথাকার জন্য লোক নেওয়া হবে?

—মেসোপটেমিয়া, রেলওয়ে ও ট্রান্সপোর্ট বিভাগের জন্য। তুমি কি টেলিগ্রাফ জানো—না মোটর মিস্ত্রি?

অপু বলিল—সে কিছুই নহে। ও-সব কাজ জানে না, তবে অন্য যে কোন কাজ—কি কেরানীগিরি—

সাহেব বলিল—না, দুঃখিত আমরা শুধু কাজ জানা লোক নিচ্ছি—বেশির ভাগ মোটর ড্রাইভার, সিগন্যালার, স্টেশন মাস্টার সব।

এই অবস্থায় একদিন লীলার সঙ্গে দেখা। ইতস্তত লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন ডালহাউসি স্কোয়ারের মোড়ে সে রাস্তা পার হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সামনে একখানা হলদে রঙের বড়ো মিনার্ভা গাড়ি ট্রাফিক পুলিশে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল—হঠাৎ গাড়িখানার দিক হইতে তাহার নাম ধরিয়া কে ডাকিল।

সে গাড়ির কাছে গিয়া দেখিল, লীলা ও আর দুই-তিনটি অপরিচিত মেয়ে। লীলার ছোটভাই ড্রাইভারের পাশে বসিয়া। লীলা আগ্রহের সুরে বলিল—আপনি আচ্ছা তো অপূর্ববাবু? তিন-চার মাসের মধ্যে দেখা করলেন না, কেন বলুন তো? মা সেদিনও আপনার কথা—

অপুর আকৃতিতে একটা কিছু লক্ষ করিয়া সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—আপনার কি হয়েছে? অসুখ থেকে উঠেছেন নাকি, শরীর—মাথার চুল অমন ছোট-ছোট, কি হয়েছে বলুন তো?

অপু হাসিয়া বলিল—কই না, কি হবে—কিছু তো হয় নি?

—মা কেমন আছেন?

—মা? তা মা—মা তো নেই। ফাগুন মাসে মারা গিয়েছেন।

কথা শেষ করিয়া অপু আর এক দফা পাগলের মতো হাসিল।

হয়তো বাল্যের সে প্রীতি নানা ঘটনায়, বহু বৎসরের চাপে লীলার মনে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, হয়তো ঐশ্বর্যের আঁচ লাগিয়া সে মধুর বাল্যমন অন্যভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল ধীরে ধীরে, অপুর মুখের এই অর্থহীন হাসিটা যেন একখানা তীক্ষ্ণ ছুরির মতো গিয়া তাহার মনের কোন্ গোপন মণিমঞ্জুষার রুদ্ধ ঢাকনির ফাঁকটাকে হঠাৎ একটা সজোরে চাড়া দিল, এক মুহূর্তে অপুর সমস্ত ছবিটা তাহার মনের চোখে ভাসিয়া উঠিল—সহায়হীন, মাতৃহীন, আশ্রয়হীন, পথে-পথে বেড়াইতেছে—কে মুখের দিকে চাহিবার আছে?

লীলার গলা আড়ষ্ট হইয়া গেল, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—আপনি আমাদের ওখানে কবে আসবেন বলুন—না, ও রকম বললে হবে না। এ-কথা আমাদের জানানো আপনার উচিত ছিল না? অন্তত মাকেও বলা তো—কাল সকালে আসুন—ঠিক বলুন আসবেন? কেমন ঠিক তো—সেবারকার মতো করবেন না কিন্তু—ভালো কথা, আপনার ঠিকানাটা বলুন তো, কি—ভুলবেন না কিন্তু—।

গাড়ি চলিয়া গেল।

বাসায় ফিরিয়া অপু মনের মধ্যে অনেক তোলাপাড়া করিল। লীলার মুখে সে একটা কিসের ছাপ দেখিয়াছে, বর্তমান অবস্থায় মন তাহার এই আন্তরিকতার স্নেহস্পর্শটুকুরই কাঙ্গাল বটে—কিন্তু এই বেশে কোথাও যাইতে ইচ্ছা হয় না, এই জামায়, এই কাপড়ে, এই ভাবে। থাক বরং।

তিনদিন পর নিজের নামে একখানা পত্র আসিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল—মা ছাড়া আর তো কাহারও পত্র সে পায় নাই। কে পত্র দিল? পত্র খুলিয়া পড়িল ঃ—

অপূর্ববাবু,

আপনার এখানে আসবার কথা ছিল সোমবারে, কিন্তু আজ শুক্রবার হয়ে গেল আপনি এলেন না। আপনাকে মা একবার অবিশ্যি অবিশ্যি আসতে বলেছেন, না এলে তিনি খুব দুঃখিত হবেন। আজ বিকেলে পাঁচটার সময় আপনার আসা চাই-ই। নমস্কার নেবেন।

লীলা

কথাটা লইয়া মনের মধ্যে সে অনেক বোঝাপড়া করিল। কি লাভ গিয়া? ওরা বড়োমানুষ, কোন্‌ বিষয়ে সে ওদের সঙ্গে সমান যে, ওদের বাড়ি যখন-তখন যাইবে? মেজ-বৌরানী যে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেই কথাটা তাহার মনে অনেকবার যাওয়া-আসা করিল—সেইটা, আর লীলার আন্তরিকতা। কিন্তু মেজ-বৌরানী কি আর তার মায়ের অভাব দূর করিতে পারিবেন? তিনি বড়োলোকের মেয়ে, বড়োলোকের বধূ! তাহার মায়ের আসন হৃদয়ের যে স্থানটিতে, সে শুধু তাহার দুঃখিনী মা অর্জন করিয়াছে তাহার বেদনা, ব্যর্থতা, দৈন্য-দুঃখ, শত অপমান দ্বারা—ছয় সিলিন্ডারের মিনার্ভা গাড়িতে চড়িয়া কোনও ধনীবধূ—হউন তিনি স্নেহময়ী, হউন তিনি মহিমময়ী—তাঁহার সেখানে প্রবেশাধিকার কোথায়?

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। প্রথম বিভাগের প্রথম সতের জনের মধ্যে তাহার নাম, বাংলাতে সকলের মধ্যে প্রথম হইয়াছে, এজন্য একটা সোনার মেডেল পাইবে। এমন কেহ নাই যাহার কাছে খবরটা বলিয়া বাহাদুরি করা যাইতে পারে। কোনও পরিচিত বন্ধুবান্ধব পর্যন্ত এখানে নাই—ছুটিতে সব দেশে গিয়াছে। জ্যাঠাইমার কাছে যাইবে?...গিয়া জানাইবে জ্যাঠাইমাকে?...কি লাভ, হয়তো তিনি বিরক্ত হইবেন, দরকার নাই যাওয়ার।

দশম পরিচ্ছেদ

আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি সব কলেজ খুলিয়া গেল, অপু কোনও কলেজে ভর্তি হইল না। অধ্যাপক মিঃ বসু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ইতিহাসে অনার্স কোর্স লওয়াইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন! অপু ভাবিল—কি হবে আর কলেজে পড়ে? সে সময়টা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে কাটাব, বি.এ.-র ইতিহাসে এমন কোন নতুন কথা নেই যা আমি জানি নে। ও দু-বছর মিছিমিছি নষ্ট, লাইব্রেরিতে তার চেয়ে অনেক পড়ে ফেলতে পারব এখন। তা ছাড়া ভর্তির টাকা, মাইনে, এ সব পাই বা কোথায়?

একটা কিছু চাকুরি না খুঁজিলে চলে না। খবরের কাগজ বিক্রয়ের পুঁজি অনেকদিন ফুরাইয়া গিয়াছে, মায়ের মৃত্যুর পর সে কাজে আর উৎসাহ নাই। একটা ছোট ছেলে পড়ানো আছে, তাতে শুধু দুটো ভাত খাওয়া চলে দু-বেলা—কোনমতে ইক্‌মিক কুকারে আলুসিদ্ধ, ডালসিদ্ধ ও ভাত। মাছ, মাংস, দুধ, ডাল, তরকারি তো অনেকদিন-আগে-দেখা স্বপ্নের মতো মনে হয়—যাক সে-সব, কিন্তু ঘর-ভাড়া, কাপড়জামা, জলখাবার, এসব চলে কিসে? তাহা ছাড়া অপুর অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, কলিকাতায় ছেলে-পড়ানো বাবার মুখে শৈশবে শেখা উদ্ভট শ্লোকের পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর মতো চপল, আজ যদি যায় কাল দাঁড়াইবার স্থান নাই!

কয়েকদিন ধরিয়া খবরের কাগজ দেখিয়া দেখিয়া পাইওনিয়ার ড্রাগ স্টোর্সে একটা কাজ খালি দেখা গেল দিনকতক পরে। আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে বড়ো দোকান, পিছনে কারখানা, তখনও ভিড় জমিতে শুরু হয় নাই, অপু ঢুকিয়াই এক স্থূলকায় আধাবয়সি ভদ্রলোকের একেবারে সামনে পড়িল। ভদ্রলোক বলিলেন, কাকে চান?

অপু লাজুক মুখে বলিল—আজ্ঞে, চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখে—তাই—

—ও! আপনি ম্যাট্রিক পাশ?

—আমি এবার আই.এ.—

ভদ্রলোক পুনরায় তাকিয়ায় ভর দিয়া হাল ছাড়িয়া দিবার সুরে বলিলেন—ও আই.এ. পাশ নিয়ে আমরা কি করব, আমাদের লেবেলিং ও মাল বট্‌লিং করার জন্য লোক চাই। খাটুনিও খুব, সকাল সাতটা থেকে সাড়ে দশটা, মধ্যে দেড় ঘণ্টা খাবার ছুটি, আবার বারোটা থেকে পাঁচটা, কাজের চাপ পড়লে রাত আটটাও বাজবে—

—মাইনে কত?

—আপাতত পনেরো, ওভারটাইম খাটলে দু-আনা জলখাবার—সে-সব আপনাদের কলেজের ছোকরার কাজ নয় মশায়—আমরা এমনি মোটামুটি লোক চাই!

ইহার দিনকতক পর আর একটা চাকুরি খালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া গেল ক্লাইভ স্ট্রীটে। দেখিল, সেটা একটা লোহা-লক্কড়ের দোকান, বাঙালি ফার্ম। একজন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের অত্যন্ত চুল ফাঁপানো, টেরি-কাটা লোক ইস্ত্রিকরা কামিজ পরিয়া বসিয়া আছে, মুখের নিচের দিকের গড়নে একটা কর্কশ ও স্থূল ভাব, এমন ধরনের চোখের ভাবকে সে মাতাল ও কুচরিত্র লোকের সঙ্গে মনে মনে জড়িত করিয়া থাকে। লোকটি অত্যন্ত অবজ্ঞার সুরে বলিল—কি, কি এখানে?

অপুর নিজেকেই অত্যন্ত ছোট বোধ হইল নিজের কাছে। সে সংকুচিত সুরে বলিল—এখানে একটা চাকরি খালি দেখে আসছি।

লোকটার চেহারা বড়োলোকের বাড়ির উচ্ছৃঙ্খল, অসচ্চরিত্র, বড়ো ছেলের মতো। পূর্বে এ-ধরনের চরিত্রের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে, লীলাদের বাড়ি বর্ধমানে থাকিতে। এই টাইপটা সে চেনে।

লোকটা কর্কশ সুরে বলিল—কি করো তুমি?

—আমি আই.এ. পাশ—করি নে কিছু—আপনাদের এখানে—

—টাইপরাইটিং জানো? না?—যাও যাও, এখানে না—ও কলেজ-টলেজ এখানে চলবে না—যাও—

সেদিনকার ব্যাপারটা বাসায় আসিয়া গল্প করাতে ক্যাম্বেল স্কুলের ছাত্রটির এক কাকা বলিলেন—ওদের আজকাল ভারি দেমাক, যুদ্ধের বাজারে লোহার দোকানদার সব লাল হয়ে যাচ্ছে, দালালেরা পর্যন্ত দু-পয়সা করে নিলে।

অপু বলিল—দালাল আমি হতে পারি নে?

—কেন পারবেন না, শক্তটা কি? আমার শ্বশুর একজন বড়ো দালাল, আপনাকে নিয়ে যাব একদিন—সব শিখিয়ে দেবেন, আপনাদের মতো শিক্ষিত ছেলে তো আরও ভালো কাজ করবে—

মহা-উৎসাহে ক্লাইভ স্ট্রীট অঞ্চলে লোহার বাজারে দালালি করিতে বাহির হইয়া প্রথম দিন-চার-পাঁচ ঘোরাঘুরিই সার হইল; কেহ ভালো করিয়া কথাও বলে না, একদিন একজন বড়ো দোকানী জিজ্ঞাসা করিল,—বোলটু আছে? পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ জ? অপু বোলটু কাহাকে বলে জানে না, কোন্ দিকের মাপ পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ জ তাহাও বুঝিতে পারিল না। নোটবুকে টুকিয়া লইল, মনে মনে ভাবিল, একটা অর্ডার তো পাইয়াছে, খুঁজিবার মতোও একটা কিছু জুটিয়াছে এতদিন পরে।

পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ জ বোলটু এ-দোকান ও-দোকান দিনচারেক বৃথা খোঁজাখুঁজির পর তাহার ধারণা পৌঁছল যে, জিনিসটা বাজারে সুলভপ্রাপ্য নয় বলিয়াই দোকানী এত সহজে তাহাকে অর্ডার দিয়াছিল। একদিন একজন দালাল বলিল—মশাই সওয়া ইঞ্চি ঘেরের সীসের পাইপ দিতে পারেন জোগাড় করে আড়াই শো ফুট? যান না, অর্ডারটা নিয়ে আসুন এই পাশেই ইউনাইটেড মেশিনারি কোম্পানির অফিস থেকে।

পাশেই খুব বড়ো বাড়ি। অফিসের লোকে প্রথমে তাহাকে অর্ডার দিতে চায় না, অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল—মাল আমাদের এখানে ডেলিভারি দিতে পারবেন তো?...

এ কথার মানে ঠিক না বুঝিয়াই সে বলিল—হাঁ দিতে পারব।

বহু খুঁজিয়া কলেজ স্ট্রীটের যে দোকান হইতে মাল বাহির হইল, তাহারা মাল নিজের খরচে কোথাও ডেলিভারি দিতে রাজি নয়, অপু নিজের ঘাড়ে ঝুঁকি লইয়া গরুর গাড়িতে সীসার পাইপ বোঝাই দেওয়াইল—রাজা উডমান্ড স্ট্রীটে দুপুর রৌদ্রে মাল আনিয়া হাজিরও করিল। ইউনাইটেড

মেশিনারি কিন্তু গাড়ির ভাড়া দিতে একদম অস্বীকার করিল, মাল তো এখানে ডেলিভারি দিবার কথা ছিল, তবে গাড়ি-ভাড়া কিসের? অপু ভাবিল, না হয় নিজের দালালির টাকা হইতে গাড়ি ভাড়াটা মিটাইয়া দিবে এখন। এখন কাজে নামিয়া অভিজ্ঞতাটাই আসল, না-ই বা হইল বেশি লাভ।

সে বলিল—আমার ব্রোকারেজটা?

—সে কি মশাই, আপনি সাড়ে পাঁচ আনা ফুটে দর দিয়েছেন, আপনার দালালি নেন নি? তা কখনও হয়—

অপু জানে না যে, প্রথম দর দিবার সময় তাহার মধ্যে দালালি ধরিয়া দিবার নিয়ম, সবাই তাহা দিয়া থাকে, সেও যে তাহা দেয় নাই, এ কথা কেহই বিশ্বাস করিল না। বার-বার সেই কথা তাহাদের বুঝাইতে গিয়া নিজের আনাড়িপনাই বিশেষ করিয়া ধরা পড়িল। সীসার পাইপওয়ালা গোমস্তা তাহাদের বিল বুঝিয়া পাইয়া চলিয়া গেল—তিনদিন ধরিয়া রৌদ্রে ছুটাছুটি ও পরিশ্রম সার হইল, একটি পয়সাও তাহাকে দিল না কোন পক্ষই। খোট্টা গাড়োয়ান পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—হামারা ভাড়া কৌন দেগা?

একজন বৃদ্ধ মুসলমান দালানের এক পাশে দাঁড়াইয়া ব্যাপার দেখিতেছিল, অপু অফিস হইতে বাহিরে আসিলেই সে বলিল, বাবু, আপনি কতদিন এ কাজে নেমেছেন—কাজ তো কিছুই জানেন না দেখছি—

অপুকে সে-কথা স্বীকার করিতে হইল। লোকটি বলিল—আপনি লেখাপড়া জানেন, ও-সব খুচরো কাজ করে আপনার পোষাবে না। আপনি আমার সঙ্গে কাজে নামবেন?—বড়ো মেশিনারির দালালি, ইঞ্জিন, বয়লার এই সব। এক-একবারে পাঁচশো সাতশো টাকা রোজগার হবে—বাবু ইংরেজি জানি নে তাই, তা যদি জানতাম, বাজারে এতদিন গুছিয়ে...নামবেন আমার সঙ্গে?

অপু হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল। গাড়োয়ানকে ভাড়াটা যে দণ্ড দিতে হইল, আনন্দের আতিশয্যে সেটাও গ্রাহ্যের মধ্যে আনিল না। মুসলমানটির সঙ্গে তাহার অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইল—অপু নিজের বাসার ঠিকানা দিয়া দিল। স্থির হইল, কাল সকাল দশটার সময় এইখানে লোকটি তাহার অপেক্ষা করিবে।

অপু রাত্রে শুইয়া মনে মনে ভাবিল—এতদিন পরে একটা সুবিধে জুটেছে,—এইবার হয়তো পয়সার মুখ দেখবো।

কিন্তু মাসখানেক কিছুই হইল না—একদিন দালালটি তাহাকে বলিল—দুটোর পর আর বাজারে থাকেন না, এতে কি হয় কখনও বাবু? যান কোথায়?

অপু বলিল, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে পড়তে যাই—দুটো থেকে সাতটা পর্যন্ত থাকি। একদিন যেয়ো, দেখাবো কত বড়ো লাইব্রেরি।

লাইব্রেরিতে ইতিহাস খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ে, কোন এক দরিদ্র ঘরের ছোট ছেলের কাহিনী পড়িতে বড়ো ইচ্ছা যায়, সংসারে দুঃখকষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ—তাহাদের জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ ধরনের সংবাদ জানিতে মন যায়।

মানুষের সত্যকার ইতিহাস কোথায় লেখা আছে? জগতের বড়ো ঐতিহাসিকদের অনেকেই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজনৈতিক বিপ্লবের ঝাঁঝে, সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, মন্ত্রীদের সোনালি পোশাকের জাঁকজমকে, দরিদ্র গৃহস্থের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। পথের ধারের আমগাছে তাহাদের পুঁটুলিবাঁধা ছাতু কবে ফুরাইয়া গেল, সন্ধ্যায় ঘোড়ার হাট হইতে ঘোড়া কিনিয়া আনিয়া পল্লীর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ছেলে তাহার মায়ের মনে কোথায় আনন্দের ঢেউ তুলিয়াছিল—ছ'হাজার বছরের ইতিহাসে সে-সব কথা লেখা নাই—থাকিলেও বড়ো কম—রাজা যযাতি কি সম্রাট অশোকের শুধু রাজনৈতিক জীবনের গল্প সবাই শৈশব হইতে মুখস্থ করে—কিন্তু ভারতবর্ষের, গ্রীসের, রোমের যব, গম ক্ষেতের ধারে, ওলিভ, বন্যদ্রাক্ষা, মার্টল ঝোপের ছায়ায় ছায়ায় যে প্রতিদিনের জীবন হাজার হাজার বছর ধরিয়া

প্রতি সকালে সন্ধ্যায় যাপিত হইয়াছে—তাহাদের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার গল্প, তাহাদের বুকের স্পন্দনের ইতিহাস সে জানিতে চায়।

কেবল মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ঐতিহাসিকদের লেখা পাতায় সম্মিলিত সৈন্যব্যূহের এই আড়ালটা সরিয়া যায়, সারি বাঁধা বর্শার অরণ্যের ফাঁকে দূর অতীতের এক ক্ষুদ্র গৃহস্থের ছোট বাড়ি নজরে আসে। অজ্ঞাতনামা কোন লেখকের জীবন-কথা, কি কালের স্রোতে কূলে-লাগা এক টুকরা পত্র, প্রাচীন মিশরের কোন্ কৃষক পুত্রকে শস্য কাটিবার কি আয়োজন করিতে লিখিয়াছিল,—বহু হাজার বছর পর তাহাদের টুকরা ভূগর্ভে প্রোথিত মৃন্ময়পাত্রের মতো দিনের আলোয় বাহির হইয়া আছে।

কিন্তু আরও ঘনিষ্ঠ ধরনের, আরও তুচ্ছ জিনিসের ইতিহাস চায় সে। মানুষ—মানুষের বুকের কথা জানিতে চায়। আজ যা তুচ্ছ, হাজার বছর পরে তা মহা-সম্পদ। ভবিষ্যতের সত্যকার ইতিহাস হইবে এই কাহিনী, মানুষের মনের ইতিহাস, তার প্রাণের ইতিহাস।

আর একটা দিক তাহার চোখে পড়ে। একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠে তাহার কাছে—মহাকালের এই মিছিল। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাস গিবন ভ্রমশূন্য লিখিয়াছেন, কি অন্য কেহ ভ্রমশূন্য লিখিয়াছেন, এ বিষয়ে তাহার তত কৌতূহল নাই, সে শুধু কৌতূহলাক্রান্ত মহাকালের এই বিরাট মিছিলে। হাজার যুগ আগেকার কত রাজা, রানী, সম্রাট, মন্ত্রী, খোজা, সেনাপতি, বালক, যুবা, কত অশ্রুনয়না তরুণী, কত অর্থলিপ্সু রাজপুরুষ—যাহারা অর্থের জন্য অন্তরঙ্গ বন্ধুর গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া তাহাকে ঘাতকের কুঠারের মুখে নিক্ষেপ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই—অনন্ত কালসমুদ্রে ইহাদের ভাসিয়া যাওয়ার, বুদ্বুদের মতো মিলাইয়া যাওয়ার দিকটা। কোথায় তাহাদের বৃথা শ্রমের পুরস্কার, তাহাদের অর্থলিপ্সার সার্থকতা?

এদিকে ছুটাছুটিই সার হইতেছে—কাজ কিছুই হয় না। সে তো চায় না বড়োমানুষ হইতে—খাওয়া-পরা চলিয়া গেলেই সে খুশি—পড়াশুনা করার সে সময় পায় ও নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কিন্তু তাও তো হয় না, টুইশানি না থাকিলে একবেলা আহারও জুটিত না যে। তা ছাড়া এ সব জায়গার আবহাওয়াই তাহার ভালো লাগে না আদৌ। চারিধারে অত্যন্ত হুঁশিয়ারি, দর-কষাকষি...শুধু টাকা...টাকা...টাকা-সংক্রান্ত কথাবার্তা—লোকজনের মুখে ও চোখের ভাবে ইতর ও অশোভন লোভ যেন উগ্রভাবে ফুটিয়া বাহির হইতেছে—এদের পাকা বৈষয়িক কথাবার্তায় ও চালচলনে অপু ভয় খাইয়া গেল। লাইব্রেরির পরিচিত জগতে আসিয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে প্রতিদিন।

একদিন মুসলমান দালালটি বাজারে তাহার কাছে দুইটি টাকা ধার চাহিল। বড়ো কষ্ট যাইতেছে, পরের সপ্তাহেই দিয়া দিবে এখন। অপু ভাবিল—হয়তো বাড়িতে ছেলেমেয়ে আছে, রোজগার নাই এক পয়সা। অর্থাভাবের কষ্ট যে কি সে তাহা ভালো করিয়াই বুঝিয়াছে এই দুই বৎসর—নিজের বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য না থাকিলেও একটি টাকা বাসা হইতে আনিয়া পরদিন বাজারে লোকটাকে দিল।

ইহার দিন সাতেক পর অপু সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া ঘরের দোরে কাহার ধাক্কার শব্দ পাইল, দোর খুলিয়া দেখিল—মুসলমান দালালটি হাসিমুখে দাঁড়াইয়া।

—এসো, এসো আবদুল, তারপর খবর কি?

—আদাব বাবু, চলুন, ঘরের মধ্যে বলি। এ-ঘরে আপনি একলা থাকেন, না আর কেউ—ওঃ—বেশ ঘর তো বাবু।

—এসো—বসো। চা খাবে?

চা-পানের পর আবদুল আসিবার উদ্দেশ্য বলিল। বারাকপুরে একটা বড়ো বয়লারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, ঠিক সেই ধরনের বয়লারেরই আবার এদিকে একটা খরিদ্দার জুটিয়া গিয়াছে,

কাজটা লাগাইতে পারিলে তিনশো টাকার কম নয়—একটা বড়ো দাঁও। কিন্তু মুশকিল দাঁড়াইয়াছে এই যে, এখনই বারাকপুরে গিয়া বয়লারটি দেখিয়া আসা দরকার এবং কিছু বায়না দিবারও প্রয়োজন আছে—অথচ তাহার হাতে একটা পয়সাও নাই। এখন কি করা?

অপু বলিল—খদ্দের মাল ইনস্পেকশনে যাবে না?

—আগে আমরা দেখি, তবে তো খদ্দেরকে নিয়ে যাব?—দেড় পার্সেন্ট করে ধরলেও সাড়ে চারশো টাকা থাকবে আমাদের—খদ্দের হাতের মুঠোয় রয়েছে—আপনি নির্ভাবনায় থাকুন—এখন টাকার কি করি?

অপু পূর্বদিন টুইশানির টাকা পাইয়াছিল, বলিল—কত টাকার দরকার? আমি তো ছেলে-পড়ানোর মাইনে পেয়েছি—কত তোমার লাগবে বলো।

হিসাবপত্র করিয়া আট টাকা পড়িবে দেখা গেল। ঠিক হইল—আবদুল এবেলা বয়লার দেখিয়া আসিয়া ওবেলা বাজারে অপুকে খবর দিবে। অপু বাক্স খুলিয়া টাকা আনিয়া আবদুলের হাতে দিল।

বৈকালে সে পাটের এক্সচেঞ্জের বারান্দাতে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত আগ্রহের সহিত আবদুলের আগমন প্রতীক্ষা করিল। আবদুল সেদিন আসিল না, পরদিনও তাহার দেখা নাই। ক্রমে একে একে সাত-আটদিন কাটিয়া গেল—কোথায় আবদুল? সারা বাজার ও রাজা উডমান্ড স্ট্রীটের লোহার দোকান আগাগোড়া খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান মিলিল না। ক্লাইভ স্ট্রীটের একজন দোকানদার শুনিয়া বলিল—কত টাকা নিয়েছে আপনার মশাই! আবদুল তো! মশাই জোচ্চোরের ধাড়ি—আর টাকা পেয়েছেন,—টাকা নিয়ে সে দেশে পালিয়েছে—আপনিও যেমন!...

প্রথমে সে বিশ্বাস করিল না। আবদুল সে রকম মানুষ নয়, তাহা ছাড়া এত লোক থাকিতে তাহাকে কেন ঠকাইতে যাইবে?

কিন্তু এ ধারণা বেশিদিন টিকিল না! ক্রমে জানা গেল আবদুল দেশে যাইবে বলিয়া যাহার কাছে সামান্য যাহা কিছু পাওনা ছিল, সব আদায় করিয়া লইয়া গিয়াছে দিন সাতেক আগে! কাঁটাপেরেকের দোকানের বৃদ্ধ বিশ্বাস মহাশয় বলিলেন—আশ্চয্যি কথা মশাই, সবাই জানে আবদুলের কাণ্ডকারখানা আর আপনি তাকে চেনেন নি দু-তিন মাসেও? রাধে-কৃষ্ট! বেটা জুয়াচোরের ধাড়ি, হার্ডওয়ারের বাজারে সবাই চিনে ফেলেছে, এখানে আর সুবিধে হয় না, তাই গিয়ে আজকাল জুটেছে মেশিনারির বাজারে। কোনও দোকানে তো আপনার একবার জিজ্ঞেস করাও উচিত ছিল। হার্ডওয়ারের দালালি করা কি আপনার মতো ভালোমানুষের কাজ মশাই? আপনার অল্প বয়স, অন্য কাজ কিছু দেখে নিন গে। এখানে কথা বেচে খেতে হবে, সে আপনার কর্ম নয়, তবুও ভালো যে আটটা টাকার ওপর দিয়ে গিয়েছে—

আট টাকা বিশ্বাস মহাশয়ের কাছে যতই তুচ্ছ হউক অপুর কাছে তাহা নয়। ব্যাপার বুঝিয়া চোখে অন্ধকার দেখিল—গোটা মাসের ছেলে পড়ানোর দরুন সব টাকাটাই যে সে তুলিয়া দিয়াছে আবদুলের হাতে! এখন সারা মাস চলিবে কিসে! বাড়ি ভাড়ার দেনা, গত মাসের শেষে বন্ধুর কাছে ধার—এ সবের উপায়?

দিশাহারা ভাবে পথ চলিতে চলিতে সে ক্লাইভ স্ট্রীটে শেয়ার মার্কেটের সামনে আসিয়া পড়িল। দালাল ও ক্রেতাদের চিৎকার, মাড়োয়ারিদের ভিড় ও ঠেলাঠেলি, থর্নিক্রফ্‌ট ছ'আনা, নাগরমল সাড়ে পাঁচ আনা—বেজায় ভিড়, বেজায় হৈ-চৈ, লালদিঘির পাশ কাটাইয়া লাটসাহেবের বাড়ির সম্মুখ দিয়া সে একেবারে গড়ের মাঠের মধ্যে কেল্লার দক্ষিণে একটা নির্জন স্থানে একটা বড়ো বাদাম গাছের ছায়ায় আসিয়া বসিল।

আজই সকালে বাড়িওয়ালা একবার তাগাদা দিয়াছে, কাপড় একেবারে নাই, না কুলাইলেও ছেলে পড়ানোর টাকা হইতে কাপড় কিনিবে ঠিক করিয়াছিল, রুম-মেট তো নিত্য ধারের জন্য

তাগাদা করিতেছে। আবদুল শেষকালে এভাবে ঠকাইল তাহাকে? চোখে তাহার জল আসিয়া পড়িল—দুঃখদিনের সাথী বলিয়া কত বিশ্বাস যে করিত সে আবদুলকে!

অনেকক্ষণ সে বসিয়া রহিল। ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে দুপুর, বেলা দেড়টা আন্দাজ। কেহ কোন দিকে নাই, আকাশ মেঘমুক্ত, দূরপ্রসারী নীল আকাশের গায়ে কালো বিন্দুর মতো চিল উড়িয়া চলিয়াছে—দূর হইতে দূরে, সেই ছেলেবেলার মতো—ছোট হইতে ক্রমে মিলাইয়া চলিয়াছে। একজন ঘেসেড়া বর্ষার লম্বা লম্বা ঘাস কাটিতেছে। ছোট একটি খোট্টাদের মেয়ে ঝুড়িতে ঘুঁটে কুড়াইতেছে।...দূরে খিদিরপুরের ট্রাম যাইতেছে...গঙ্গার দিকে বড়ো একটা জাহাজের চোঙ—ফোর্টের বেতারের মাস্তুল—এক...দুই...তিন...চার...আকাশ কি ঘন নীল!—এই তো চারিধারের মুক্ত সৌন্দর্য...এই কম্পমান শ্রাবণ দুপুরের খররৌদ্র.. বিদ্যুৎ...সূর্য...রাত্রির তারা...প্রেম...মা...দিদি...অনিল...মাথার উপরে নিঃসীম নীল আকাশ...মৃত্যুপারের দেশ...চিররাত্রির অন্ধকারে যেখানে সাঁই সাঁই রবে ধূমকেতুর দল আগুনের পুচ্ছ দুলাইয়া উড়িয়া চলে—গ্রহ ছোটে, চন্দ্রসূর্য লাটিমের মতো আপনার বেগে আপনি ঘুরিয়া বেড়ায়...তুহিন শীতল ব্যোমপথে দূরে দূরে দেবলোকের মেরুপর্বতের ফাঁকে ফাঁকে তাহারা মিটমিট করে—এই পরিপূর্ণ মহিমার মধ্যে জন্ম লইয়া আটটা টাকা...তুচ্ছ আট টাকা...এ কোন্ বিচিত্র জগৎ!...কিসের থর্নিক্রফট্ আর নাগরমল?

কখন বেলা পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছিল, কখন একটু দূরে একটা ফুটবল টিমের খেলা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল—একটা বল দুম্ করিয়া তাহার একেবারে সামনে আসিয়া পড়াতে তাহার চমক ভাঙিল। উঠিয়া সে বলটা দু-হাতে ধরিয়া সজোরে একটা লাথি মারিয়া সেটাকে ধাবমান লাইনসম্যানের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।

একদিন পথে হঠাৎ প্রণবের সঙ্গে দেখা। দুজনেই ভারি খুশি হইল। সে কলিকাতায় আসিয়া পর্যন্ত অপুকে কত জায়গায় খুঁজিয়াছে, প্রথমটা সন্ধান পায় নাই, পরে জানিতে পারে অপূর্ব পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া কোথায় চাকুরিতে ঢুকিয়াছে। প্রণব রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বৎসরখানেক হাজতভোগের পর সম্প্রতি খালাস হইয়াছে, হাসিয়া বলিল—কিছুদিন গবর্নমেন্টের অতিথি হয়ে এলুম রে, এসেই তোর কত খোঁজ করেছি—তারপর, কোথায় চাকরি করিস, মাইনে কত?

অপু হাসিমুখে বলিল—খবরের কাগজের আফিসে, মাইনে সত্তর টাকা!

সর্বৈব মিথ্যা। টাকা চল্লিশেক মাইনে পায়, কি একটা ফন্ড বাবদ কিছু কাটিয়া লওয়ার পর হাতে পৌঁছায় তেত্রিশ টাকা ক' আনা। একটু গর্বের সুরে বলিল, চাকরি সোজা নয়, রয়টারের বাংলা করার ভার আমার ওপর—বুধবারের কাগজে 'আর্ট ও ধর্ম' বলে লেখাটা আমার, দেখিস পড়ে।

প্রণব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তুই ধর্মের সম্বন্ধে লিখতে গেলি কি নিয়ে রে! কি জানিস তুই—

—ওখানেই তোমার গোলমাল। ধর্ম মানে তুই যা বলতে চাইছিস, সেটা হচ্ছে collective ধর্ম, আমি বলি ওটার প্রয়োজনীয়তা ছিল আদিম মানুষের সমাজে, আর একটা ধর্ম আছে, যা কিনা নিজের নিজের, আমার ধর্ম আমার, তোমার ধর্ম তোমার, এইটের কথাই আমি—যে ধর্ম আমার নিজের তা যে আর কারও নয়, তা আমার চেয়ে কে ভালো বোঝে?

—বৌবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে ওসব কথা হবে না, আয় গোলদিঘিতে লেকচার দিবি।

—শুনবি তুই? চল তবে—

গোলদিঘিতে আসিয়া দুজনে একটা নির্জন কোণ বাছিয়া লইল। প্রণব বলিল—বেঞ্চের উপর দাঁড়া উঠে।

অপু বলিল—দাঁড়াচ্ছি, কিন্তু লোক জমবে না তো? তা হলে কিন্তু আর একটি কথাও বলব না।

তারপর আধঘণ্টাটাক অপু বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া ধর্ম সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিয়া গেল। সে নিষ্কপট ও উদার—যা মুখে বলে মনে মনে তাহা বিশ্বাস করে। প্রণব শেষ পর্যন্ত শুনিবার পর ভাবিল—এসব কথা নিয়ে খুব তো নাড়াচাড়া করেছে মনের মধ্যে! একটু পাগলামির ছিট আছে, কিন্তু ওকে ওইজন্যেই এত ভালোবাসি।

অপু বেঞ্চ হইতে নামিয়া বলিল—কেমন লাগল?—

—তুই খুব sincere, যদিও একটু ছিটগ্রস্ত—

অপু লজ্জামিশ্রিত হাস্যের সহিত বলিল—যাঃ—

প্রণব বলিল—কিন্তু কলেজটা ছেড়ে ভালো কাজ করিস নি, যদিও আমি জানি, তাই সেদিন বিনয়কে বলছিলাম যে অপূর্ব কলেজে না গিয়েও যা পড়াশুনা করবে, তোমরা দু-বেলা কলেজের সিমেন্ট ঘষে ঘষে উঠিয়ে ফেললেও তা হবে না! ওর মধ্যে একটা সত্যিকার পিপাসা রয়েছে যে—

নিজের প্রশংসা শুনিয়া অপু খুব খুশি—বালকের মতো খুশি। উজ্জ্বল মুখে বলিল—অনেকদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা, চল্ তোকে কিছু খাওয়াইগে—কলেজ-মেটদের আর কারুর দেখা পাই নে—আমোদ করা হয় নি কতদিন যে—মা মারা যাওয়ার পর থেকে তো...

প্রণব বিস্ময়ের সুরে বলিল—মাও মারা গিয়েছেন!

—ওঃ, সে কথা বুঝি বলি নি? সে তো প্রায় এক বছর হতে চলল—

সামনেই একটা চায়ের দোকান। অপু প্রণবের হাত ধরিয়া সেখানে ঢুকিল। প্রণবের ভারি ভালো লাগিল অপুর এই অত্যন্ত খাঁটি ও অকৃত্রিম, আগ্রহ-ভরা হাত ধরিয়া টানা। সে মনে মনে ভাবিল—এরকম warmth আর sincerity কজনের মধ্যে পাওয়া যায়? বন্ধু তো মুখে অনেকেই আছে—অপু একটা জুয়েল।

অপু বলিল—কি খাবি বল্?—এই বেয়ারা, কি আছে ভালো?

খাইতে খাইতে প্রণব বলিল—তারপর চাকরির কথা বল—যে বাজার—কি করে জোটালি?

অপু প্রথমে লোহার বাজারের দালালির গল্প করিল। হাসিয়া বলিল—তারপর আবদুলের মহাভিনিষ্ক্রমণের পরে হার্ডওয়ার আর জমলো না—ঘুরে ঘুরে বেড়াই চাকরি খুঁজে, বুঝলি—একদিন একজন বললে, বি.এন.আর. অফিসে অনেক নতুন লোক নেওয়া হচ্ছে—গেলুম সেখানে। খুব লোকের ভিড়, চাকরি অনেক খালি আছে, ইংরিজি লিখতে পড়তে পারলেই চাকরি হচ্ছে। ব্যাপার কি, শুনলাম মাস-দুই হল স্ট্রাইক চলছে—তাদের জায়গায় নতুন লোক নেওয়া হচ্ছে—

প্রণব চায়ে চুমুক দিয়া বলিল—চাকরি পেলি?

—শোন্ না, চাকরি তখুনি হয়ে গেল, প্রিন্সিপ্যালের সার্টিফিকেটটাই কাজের হল, তখুনি ছাপানো ফর্মে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়ে দিলে, বাইরে এসে ভারি আনন্দ হল মনটাতে। চল্লিশ টাকা মাইনে, যেতে হবে গঞ্জাম জেলায়, অনেক দূর, যা ঠিক চাই তাই—বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের মোড়ে একটা চায়ের দোকানে বসে মনের খুশিতে উপরি উপরি চার কাপ চা খেয়ে ফেললাম—ভাবলাম এতদিন পর পয়সার কষ্টটা তো ঘুচল?—আর কি খাবি? এই বেয়ারা, আর দুটো ডিম ভাজা—না-না—খা—

—দু-দিন চাকরি হয়েছে বলে বুঝি—তোর সেই পুরানো রোগ আজও—হ্যাঁ, তারপর?

—তারপর বাড়ি এসে রাতে শুয়ে শুয়ে মনটাতে ভালো বললে না—ভাবলাম, ওরা একটা সুবিধে আদায় করবার জন্য স্ট্রাইক করেছে, দু-মাস তাদেরও ছেলেমেয়ে কষ্ট পাচ্ছে, তাদের মুখের ভাতের থালা কেড়ে খাব শেষকালে?—আবার ভাবি, যাই চলে, অতদূর কখনও দেখি নি, তা ছাড়া মা মারা যাওয়ার পর কলকাতা আর ভালো লাগে না, যাইগে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত—ফের ওদের অফিসে গেলাম—ছাপানো ফর্মখানা ফেরত দিয়ে এলাম, বলে এলাম আমার যাওয়ার সুবিধে হবে না—

প্রণব বলিল—তোর মুখ আর চোখ look full of music and poetry—প্রথম থেকে আমি জানি যে একজন আইডিয়ালিস্ট ছোকরা—তোদের দিয়েই তো এসব হবে—তোর এ খবরের কাগজের কাজ কখন?

—রাত ন'টার পর যেতে হয়, রাত তিনটের পর ছুটি। ভারি ঘুম পায়, এখনও রাতজাগা অভ্যেস হয় নি, তবে সুবিধে আছে, সকাল দশটা-এগারোটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে নি, সারাদিন লাইব্রেরিতে কাটাতে পারি—

খাওয়া-দাওয়া ভালোই হইল। অপু বলিল—জল খাস নে—চল্ কলেজ স্কোয়ারে শরবৎ খাব—বেশ মিষ্টি লাগে খেতে।—লেমন স্কোয়াশ খেয়েছিস—আয়—

কলেজের অত ছেলের মধ্যে এক অনিল ও প্রণব ছাড়া সে আর কাহাকেও বন্ধু ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই, অনেকদিন পরে মন খুলিয়া আলাপের লোক পাইয়া তাহার গল্প আর ফুরাইতেছিল না। বলিল, গাছপালা যে কতদিন দেখি নি, ইট আর সিমেন্ট অসহ্য হয়ে পড়েছে। আমাদের অফিসে একজন কাজ করে, তার বাড়ি হাওড়া জেলা, সেদিন বলছে, বাড়ির বাগানে আগাছা বেড়ে উঠছে, তাই সাফ করছে রবিবারে-রবিবারে। আমি তাকে বলি, কি গাছ মিত্তির মশাই? সে বলে—কিছু না, ঝুপি গাছ। আমি বলি—বলুন না, কি কি গাছ? রোজ সোমবারে সে বাড়ি থেকে এলে তাকে এই কথা জিজ্ঞেস করি—সে হয়তো ভাবে, আচ্ছা পাগল!—রাত্রে, ভাই, সারারাত প্রেসের ঘড়ঘড়ানি, গরম, প্রিন্টারের তাগাদার মধ্যে আমার কেবল মিত্তির মশায়ের বাড়ির সেই ঝুপি বনের কথা মনে হয়—ভাবি কি না কি জানি গাছ। এদিকে চোখ ঘুমে ঢুলে আসে, রাত একটার পর শরীর এলিয়ে পড়তে চায়, শরীরের বাঁধন যেন ক্রমে আলগা হয়ে আসে, কুঁজোর জল চোখে মুখে ঝাপটা দিয়ে ফুলো-ফুলো রাঙা-রাঙা, জ্বালা-করা চোখে আবার কাজ করতে বসি—ইলেকট্রিক বাতিতে যেন চোখে ছুঁচ বেঁধে—আর এত গরমও ঘরটাতে!

পরে সে আগ্রহের সুরে বলিল—একদিন রবিবারে চল্ তুই আর আমি কোনও পাড়াগাঁয়ে গিয়ে মাঠে, বনের ধারে ধারে সারাদিন বেড়িয়ে কাটাব—বেশ সেখানেই লতাকাঠি কুড়িয়ে আমরা রাঁধব—বিকেল হবে—পাখির ডাক যে কতকাল শুনি নি! দোয়েল কি বৌ-কথা-কও, ওদের ডাক তো ভুলেই গিয়েছি, রবিবার দিনটা ছুটি, চল্ যাবি?—এখন কত ফুল ফোটাবও সময়—আমি অনেক বনের ফুলের নাম জানি, দেখিস চিনিয়ে দেব। যাবি প্রণব, চল্ আজ থিয়েটার দেখি? স্টারে 'সধবার একাদশী' আছে—যাবি?

নিজেই দু-খানা গ্যালারির টিকিট কিনিল—থিয়েটার ভাঙিলে অনেক রাত্রিতে ফিরিবার পথে অপু বলিল—কি হবে বাকি রাতটুকু ঘুমিয়ে; আজ বসে গল্প করে রাত কাটাই। কর্নওয়ালিস স্কোয়ারের কাছে আসিয়া অপু বন্ধুর হাত ধরিয়া রেলিং টপকাইয়া স্কোয়ারের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল—আয় আয়, এই বেঞ্চিটাতে বসি, আমি নিমচাঁদের পার্ট প্লে করব, দেখবি—

প্রণব হাসিয়া বলিল—তোর মাথা খারাপ আছে—এত রাত্রে বেশি চেঁচাস নি—পুলিশ এসে তাড়িয়ে দেবে—কিন্তু খানিকটা পর প্রণবও মাতিয়া উঠিল। দুজনে হাসিয়া আবোল-তাবোল বকিয়া আরও ঘণ্টাখানেক কাটাইল। অপু একটা বেঞ্চির উপরে গড়াগড়ি দিতেছিল ও মুখে নিমচাঁদের অনুকরণে ইংরাজি কি কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল—প্রণবের ভয়সূচক স্বরে উঠিয়া বসিয়া চাহিয়া দেখিল ফুটপাতের উপর একজন পাহারাওয়ালা। অমনি সে বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—Hail, Holy Light ! Heaven's First born !—পরে দু-জনেই ডাফ স্ট্রীটের দিকের রেলিং টপকাইয়া সোজা দৌড় দিল।

রাত্রি আর বেশি নাই। আমহার্স্ট স্ট্রীটের একটা বড়ো লাল বাড়ির পৈঠায় অপু গিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল—কোথায় আর যাবো—আয় বোস্ এখানে—

প্রণব বলিল—একটা গান ধর তবে—

অপু বলিল—বাড়ির লোকে দোর খুলে বেরিয়ে আসবে—কোনরকমে পুলিশের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছি—

—কেমন পাহারাওয়ালাটাকে চেঁচিয়ে বললুম—Hail, Holy Light !—হি-হি—টেরও পায় নি? কোথা দিয়ে পালালুম—নিমচাঁদের মতো হয় নি?—হি-হি—

প্রণব বলিল—তোর মাথায় ছিট আছে—যাঃ, সারা রাতটা ঘুম হল না তোর পাল্লায় পড়ে—গা একটা গানই গা—আস্তে আস্তে ধর্—আবার হাসে, যাঃ—

ইহার দিন-পনেরো পরে একদিন প্রণব আসিয়া বলিল—তোকে নিয়ে যাব বলে এলাম—আমার মামাতো বোনের বিয়ে হবে সোমবারে, শুক্রবার রাত্রে আমরা যাব, খুলনা থেকে স্টিমারে যেতে হয়, অনেকদিন কোথাও যাস নি, চল্ আমার সঙ্গে, দিন চার-পাঁচের ছুটি পাবি নে?

ছুটি মিলিল। ট্রেনে উঠিবার সময় তাহার ভারি আনন্দ। অনেকদিন কলিকাতা ছাড়িয়া যায় নাই, অনেকদিন রেলেও চড়ে নাই। সকালবেলা স্টিমারে উঠিবার সময় ভৈরবের ওপার হইতে তরুণ সূর্য ওঠার দৃশ্যটা তাহাকে মুগ্ধ করিল। নদী খুব বড়ো ও চওড়া, স্টিমার প্রণবের মামার বাড়ির ঘাটে ধরে না, পাশের গ্রামে নামিয়া নৌকায় যাইতে হয়। অপু এ অঞ্চলে কখনও আসে নাই, সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশ, নদীর ধারে সুপারির সারি, বাঁশ, বেতবন, অসংখ্য নারকেল গাছ। টিনের চালাওয়ালা গোলা গঞ্জ। অদ্ভুত ধরনের নাম, স্বরূপকাটি, যশাইকাটি।

দক্ষিণ-পূর্ব কোণ ও খাড়া পশ্চিম, দু-দিক হইতে প্রকাণ্ড দুটা নদী আসিয়া পরস্পরকে ছুঁইয়া অর্ধচন্দ্রাকারে বাঁকিয়া গিয়াছে, সেখানটাতে জলের রং ঈষৎ সবুজ এবং এই সঙ্গমস্থানেই ও-পারে আধ মাইলের মধ্যে প্রণবের মামার বাড়ির গ্রাম গঙ্গানন্দকাটি।

নদীর ঘাট হইতে বাড়িটা অতি অল্প দূরে। এ গ্রামের মধ্যে ইহারাই অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ।

অনেকবার অপু এ ধরনের বাড়ির ছবি কল্পনা করিয়াছে, এই ধরনের বড়ো নদীর ধারে, শহর-বাজারের ছোঁয়াচ ও আবহাওয়া হইতে বহু দূরে কোন এক অখ্যাত ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ের সম্ভ্রান্ত গৃহ, আগে অবস্থা ভালো ছিল, অথচ এখন নাই, নাটমন্দির, পূজার দালান, দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ সবই থাকিবে, অথচ সে-সব হইবে ভাঙা, শ্রীহীন—আর থাকিবে প্রাচীন ধনীবংশের ভ্রান্ত মর্যাদাবোধ, মানসম্মান, উদারতা। প্রণবের মামার বাড়ির সঙ্গে সব যেন হুবহু মিলিয়া গেল।

ঘাট হইতে দুই সারি নারিকেল গাছ সোজা একেবারে বাড়ির দেউড়িতে গিয়া শেষ হইয়াছে, বাঁয়ে প্রকাণ্ড পূজার দালান, ডাইনে হলুদ রঙের কলসি বসানো ফটক ও ফুলবাগান, দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ, নাটমন্দির। খুব জলুস নাই কোনটারই, কার্নিস খসিয়া পড়িতেছে, একরাশ গোলাপায়রা নাটমন্দিরের মেজেতে চরিয়া বেড়াইতেছে, এক-আধটা ঝটাপট করিয়া ছাদে উড়িয়া পালাইতেছে, একখানা ষোল-বেহারার সেকেলে হাঙরমুখো পালকি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। দেখিয়া মনে হয়—এক সময় ইহাদের অবস্থা খুব ভালো ছিল, বর্তমানে পসারহীন ডাক্তারের দ্বারে সংযুক্ত অনাদৃত পিতলের পাতের মতো শ্রীহীন ও মলিন।

'পুলু এসেছে, পুলু এসেছে'—'এই যে পুলু'—'এটি কে সঙ্গে?' 'ও! বেশ বেশ, স্টিমার কি আজ লেট? ওরে নিবারণকে ডাক, ব্যাগটা বাড়ির মধ্যে নিয়ে যা, আহা থাক, এসো এসো দীর্ঘজীবী হও।'

প্রণব তাহাকে একেবারে বাড়ির মধ্যে লইয়া গেল। অপু অপরিচিত বাড়ির মধ্যে অন্দরমহলে যথারীতি অত্যন্ত লাজুক মুখে ও সংকোচের সহিত ঢুকিল। প্রণবের বড়ো মামিমা আসিয়া কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। অপুকে দেখিয়া বলিলেন—এ ছেলেটিকে কোত্থেকে আনলি পুলু? এ মুখ যেন—

প্রণব হাসিয়া বলিল—কি করে চিনবেন মামিমা? ও কি আর বাঙ্গাল দেশের মানুষ?

প্রণবের মামিমা বলিলেন—তা নয় রে, কতবার পটে আঁকা ছবি দেখেছি, ঠাকুর-দেবতার মুখের মতো মুখ—এসো এসো দীর্ঘজীবী হও—

প্রণবের দেখাদেখি অপুও পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল।

—এসো এসো, বাবা আমার এসো—কি সুন্দর মুখ—দেশ কোথায় বাবা?

সন্ধ্যার পর সারাদিনের গরমটা একটু কমিল। দেউড়ির বাহিরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, চারদিকে শাঁখ বাজিল। উপরের খোলাছাদে শীতল পাটি পাতিয়া অপু একা বসিয়া ছিল, প্রণব ঘুম হইতে সন্ধ্যার কিছু আগে উঠিয়া কোথায় গিয়াছে। কেমন একটা নতুন ধরনের অনুভূতি—সম্পূর্ণ নতুন ধরনের—কি সেটা? কে জানে, হয়তো শাঁখের রব বা আরতির বাজনার দরুন—কিংবা হয়তো...

মোটের উপর এ এক অপরিচিত জগৎ। কলিকাতার কর্মব্যস্ত, কোলাহলমুখর ধূলিপূর্ণ আবহাওয়া হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এক ভিন্ন জীবনধারার জগৎ।

নারিকেলশ্রেণীর পত্রশীর্ষে নবমীর জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে, এইমাত্র ফুটিল, অপু লক্ষ করে নাই। কি কথা যেন সব মনে আসে। অনেকদিনের কথা।

পিছন হইতে প্রণব বলিল—কেমন, গাছপালা গাছপালা করে পাগল, দেখলি তো গাছপালা নদীতে আসতে? কি রকম লাগল বল্ শুনি—

অপু বলিল—সে যা লাগল তা লাগল—এখন কি মনে হচ্ছে জানিস এই আরতি শুনে? ছেলেবেলায়, আমার দাদু ছিল ভক্ত বৈষ্ণব, তাঁর মুখে শুনতাম, 'বংশী বটতট কদম্ব নিকট, কালিন্দী ধীর সমীর'—যেন—

সিঁড়িতে কাহাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল। প্রণব ডাকিয়া বলিল—কে রে? মেনী? শোন্—

একটি তেরো-চৌদ্দ বছরের বালিকা হাসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। প্রণব বলিল—কে, কে রে? মেয়েটি পিছন ফিরিয়া কাহাদের দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিল—সবাই আছে, ননীদি, দাসীদি, মেজদি, সরলা—তাস খেলব চিলেকোঠার ঘরে—

অপু মনে মনে ভাবিল—এ-বাড়ির মেয়ে-ছেলে সবাই দেখতে ভারি সুন্দর তো?

প্রণব বলিল—এটি মামার ছোট মেয়ে, এরই মেজ বোনের বিয়ে। ক'বোনের মধ্যে সে-ই সকলের চেয়ে সুশ্রী—মেনী ডাক তো একবার অপর্ণাকে?

মেনী সিঁড়িতে গিয়া কি বলিতেই একটা সম্মিলিত মেয়েলি কণ্ঠের চাপা হাস্যধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল, অল্পক্ষণ পরেই একটি ষোল-সতেরো বছরের নতমুখী সুন্দরী মেয়ে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রণব বলিল—ও আমার বন্ধু, তোরও সুবাদে দাদা—লজ্জা কাকে এখানে রে? এটি মামার মেজ মেয়ে অপর্ণা—এরই—

মেয়েটি চপলা নয়, মৃদু হাসিয়া তখনই সরিয়া গেল, কি সুন্দর একঢাল চুল! কিছু দিন আগে পড়া একটা ইংরাজি উপন্যাসের একটা লাইন বার বার তাহার মনে আসিতে লাগিল—Do they breed goddesses at Slocum Magna? Do...they...breed...goddesses...at...Slocum Magna?

এ রাতটার কথা অপুর চিরকাল মনে ছিল।

পরদিন প্রণবের সঙ্গে অপু তাহার মামার বাড়ির সবটা ঘুরিয়া দেখিল। প্রাচীন ধনীবংশ বটে। বাড়ির উত্তর দিকে পুরাতন আমলের আবাসবাটি ও প্রকাণ্ড সাতদুয়ারী পূজার দালান ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে, ওপারে অন্যতম শরিক রামদুর্লভ বাঁড়ুজ্যের বাড়ি। পুরাতন আমলের বসতবাটি বর্তমানে পরিত্যক্ত, রামদুর্লভের ছোট ভাই সেখানে বাস করিতেন। কি কারণে তাঁহার একমাত্র পুত্র নিরুদ্দেশ হইয়া যাওয়াতে তাঁহারা বেচিয়া-কিনিয়া কাশীবাসী হইয়াছেন।

এ সব কথা প্রণবের মুখেই ক্রমে ক্রমে শোনা গেল।

স্নানের সময়ে সে নদীতে স্নান করিতে চাহিলে সকলেই বারণ করিল—এখানকার নদীতে এ সময়ে কুমিরের উৎপাত খুব বেশি, পুকুরে স্নান করাই নিরাপদ।

বৈকালে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক কাছারি-বাড়ির বারান্দাতে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, দিন-পনেরো পূর্বে নিকটস্থ কোন গ্রামের জনৈক তাঁতির ছেলে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, সম্প্রতি তাহাকে রায়মঙ্গলের এক নির্জন চরে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ছেলেটি বলে, তাহাকে নাকি পরীতে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল, প্রমাণস্বরূপ সে আঁচলের খুঁট খুলিয়া কাঁচা লবঙ্গ, এলাচ ও জায়ফল বাহির করিয়া দেখাইয়াছে, এ-অঞ্চলের ত্রিসীমানায় এ সকলের গাছ নাই—পরী কোথাও হইতে আনিয়া উপহার দিয়াছে।

প্রণবের মামিমা দুপুরে কাছে বসিয়া দুজনকে খাওয়াইলেন, অনেকদিন অপুর অদৃষ্টে এত যত্ন আদর বা এত ভালো খাওয়া-দাওয়া জোটে নাই। চিনি, ক্ষীর, মশলা, কর্পূর, ঘৃত, জীবনে কখনও তাহাদের দরিদ্র গৃহস্থালিতে এ সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে নাই। মায়ের সংসারে চালের গুঁড়া, গুড় ও সরিষার তৈলের কারবার ছিল বেশি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন বিবাহ। সকাল হইতে নানা কাজে সে বাড়ির ছেলের মতো খাটিতে লাগিল। নাটমন্দিরে বরাসন সাজানোর ভার পড়িল তাহার উপর। প্রাচীন আমলের বড়ো জাজিম ও শতরঞ্চির উপর সাদা চাদর পাতিয়া ফরাস বিছানো, কাচের সেজ ও বাতির ডুম টাঙানো, দেবদারু পাতার ফটক বাঁধা, কাগজ কাটিয়া দম্পতির উদ্দেশে আশিসবাণী রচনা, সকাল আটটা হইতে বেলা তিনটা পর্যন্ত এসব কাজে কাটিল।

সন্ধ্যার সময় বর আসিবে। বরের গ্রাম এই নদীরই ধারে, তবে দশ বারো ক্রোশ দূরে, নদীপথেই আসিতে হইবে। বরের পিতা ও-অঞ্চলের নাকি বড়ো গাঁতিদার, তাহা ছাড়া বিস্তৃত মহাজনী কারবারও আছে।

বরের নৌকা আসিতে একটু বিলম্ব হইতে পারে, প্রথম লগ্নে বিবাহ যদি না হয় রাত্রি দশটার লগ্ন বাদ যাইবে না।

ব্যাপার বুঝিয়া অপু বলিল—রাত তো আজ জাগতেই হবে দেখছি, আমি এখন একটু ঘুমিয়ে নিই ভাই, বর এলে আমাকে ডেকে তুলো এখন।

প্রণব তাহাকে তেতলার চিলে-কোঠার ঘরে লইয়া গিয়া বলিল—এখানে হৈ-চৈ কম, এখানে ঘুম হবে এখন, আমি ঘণ্টা দুই পরে ডাকবো।

ঘরটা ছোট, কিন্তু খুব হাওয়া, দিনের শ্রান্তিতে সে শুইতে না শুইতে ঘুমাইয়া পড়িল।

কতক্ষণ পরে সে ঠিক জানে না, কাহাদের ডাকাডাকিতে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, বর এসেছে বুঝি? উঃ, রাত অনেক হয়েছে তো! কিন্তু প্রণবের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল—একটা কিছু যেন ঘটিয়াছে। সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—কি—কি প্রণব—কিছু হয়েছে নাকি?

উত্তরের পরিবর্তে প্রণব তাহার বিছানার পাশে বসিয়া পড়িয়া কাতর মুখে তাহার দিকে চাহিল, পরে ছল-ছল চোখে তাহার হাত দুটি ধরিয়া বলিল—ভাই আমাদের মান রক্ষার ভার তোমার হাতে আজ রাত্রে, অপর্ণাকে এখুনি তোমার বিয়ে করতে হবে, আর সময় বেশি নেই, রাত খুব অল্প আছে, আমাদের মান রাখো ভাই।

আকাশ হইতে পড়িলেও অপু এত অবাক হইত না।

প্রণব বলে কি?...প্রণবের মাথা খারাপ হইয়া গেল নাকি? না-কি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখিতেছে!

এই সময়ে দুজন গ্রামের লোকও ঘরে ঢুকিলেন, একজন বলিলেন—আপনার সঙ্গে যদিও আমার পরিচয় হয় নি, তবুও আপনার কথা সব পুলুর মুখে শুনেছি—এদের আজ বড়ো বিপদ, সব বলছি আপনাকে, আপনি না বাঁচালে আর উপায় নেই—

ততক্ষণে অপু ঘুমের ঘোরটা অনেকখানি কাটাইয়া উঠিয়াছে, সে না-বুঝিতে পারার দৃষ্টিতে একবার প্রণবের, একবার লোক দুইটির মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। ব্যাপারখানা কি!

ব্যাপার অনেক।

সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক পর বরপক্ষের নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগে। লোকজনের ভিড় খুব, তিনখানা গ্রামের প্রজাপত্র উৎসব দেখিতে আসিয়াছে। বরকে হাঙরমুখো সেকেলে বড়ো পালকিতে উঠাইয়া বাজনা-বাদ্য ও ধুমধামের সহিত মহা সমাদরে ঘাট হইতে নাটমন্দিরে বরাসনে আনা হইতেছিল—এমন সময় এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিল। বাড়ির উঠানে পালকিখানা আসিয়া পৌঁছিয়াছে, হঠাৎ বর নাকি পালকি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া চেঁচাইয়া বলিতে থাকে—হুক্কা বোলাও, হুক্কা বোলাও!

সে কি বেজায় চিৎকার!

এক মুহূর্তে সব গোলমাল হইয়া গেল। চিৎকার হঠাৎ থামে না, বরকর্তা স্বয়ং দৌড়িয়া গেলেন, বরপক্ষের প্রবীণ লোকেরা ছুটিয়া গেলেন,—চারিদিকে সকলে অবাক, প্রজারা অবাক, গ্রামসুদ্ধ লোক অবাক! সে এক কাণ্ড! চোখে না দেখিলে বুঝানো কঠিন—আর কি যে লজ্জা, সারা উঠান জুড়িয়া প্রজা, প্রতিবেশী, আত্মীয়কুটুম্ব, পাড়ার ও গ্রামের ছোট বড়ো সকলে উপস্থিত, সকলের সামনে—বাঁড়ুয্যে বাড়ির মেয়ের বিবাহে এ ভাবের ঘটনা ঘটিবে, তাহা স্বপ্নাতীত, এ উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, মেয়েদের মধ্যে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। বর যে প্রকৃতিস্থ নয়, একথা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না।

বরপক্ষ যদিও নানাভাবে কথাটা ঢাকিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কেহ বলিলেন গরমে ও সারাদিনের উপবাসের কষ্টে—ও কিছু নয়, ওরকম হইয়া থাকে...কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজে চাপা দেওয়া গেল না, ক্রমে ক্রমে নাকি প্রকাশ হইতে লাগিল যে, বরের একটু সামান্য ছিট আছে বটে,—কিংবা ছিল বটে, তবে সেটা সবসময় যে থাকে তা নয়, আজকার গরমে, বিশেষ উৎসবের উত্তেজনায়—ইত্যাদি। ব্যাপারটা অনেকখানি সহজ হইয়া আসিতেছিল, নানা পক্ষের বোঝানোতে আবার সোজা হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছিল, মেয়ের বাপ শশীনারায়ণ বাঁড়ুজ্যেও মন হইতে সমস্তটা ঝাড়িয়া ফেলিতে প্রস্তুত ছিলেন—তাহা ছাড়া উপায়ও অবশ্য ছিল না—কিন্তু এদিকে মেয়ের মা অর্থাৎ প্রণবের বড়ো মামিমা মেয়ের হাত ধরিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া খিল দিয়াছেন,—তিনি বলেন, জানিয়া-শুনিয়া তাঁহার সোনার প্রতিমা মেয়েকে তিনি ও পাগলের হাতে কখনই তুলিয়া দিতে পারিবেন না, যাহা অদৃষ্টে আছে ঘটিবে। সকলের বহু অনুনয়-বিনয়েও এই তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে তিনি আর ঘরের দরজা খোলেন নাই, নাকি তেমন তেমন বুঝিলে মেয়েকে রাম-দা দিয়া কাটিয়া নিজের গলায় দা বসাইয়া দিবেন এমনও শাসাইয়াছেন, সুতরাং কেহ দরজা ভাঙিতে সাহস করে নাই। অপর্ণাও এমনি মেয়ে, সবাই জানে, মা তাহার গলায় যদি সত্যিই রাম-দা বসাইয়া দেয়ও, সে প্রতিবাদে মুখে কখনও টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করিবে না, মায়ের ব্যবস্থা শান্তভাবেই মানিয়া লইবে।

পিছনের ভদ্রলোকটি বলিলেন, আপনি না রক্ষা করলে আর কেউ নেই, হয় এদিকে একটা খুনোখুনি হবে, না হয় সকাল হলেই ও-মেয়ে দো-পড়া হয়ে যাবে—এসব দিকের গতিক তো জানেন না, দো-পড়া হলে কি আর ও মেয়ের বিয়ে হবে মশাই?...আহা, অমন সোনার পুতুল মেয়ে, এত বড়ো ঘর, ওরই অদৃষ্টে শেষে কিনা এই কেলেঙ্কারি। এ রাত্রের মধ্যে আপনি ছাড়া এ অঞ্চলে ও-মেয়ের উপযুক্ত পাত্র কেউ নেই—বাঁচান আপনি—

অপুর মাথায় যেন কিসের দাপাদাপি, মাতামাতি...মাথার মধ্যে যেন চৈতন্যদেবের নগর-সংকীর্তন শুরু হইয়াছে!...এ কি সংকটে তাহাকে ভগবান ফেলিলেন! সকল প্রকার বন্ধনকে সে ভয় করে, তাহার উপর বিবাহের মতো বন্ধন! এই তো সেদিন মা তাহাকে মুক্তি দিয়া গেলেন...আবার এক বৎসর ঘুরিতেই—এ কি!

মেয়েটির মুখ মনে হইল...আজই সকালে নিচের ঘরে তাহাকে দেখিয়াছে...কি শান্ত, সুন্দর গতিভঙ্গি। সোনার প্রতিমাই বটে, তাহার অদৃষ্টে উৎসবের দিনে এই ব্যাপার!...তাহারা ছাড়া রাম-দা-এর কাণ্ডটা...কি করে সে এখন?

কিন্তু ভাবিবার অবসর কোথায়? পিছনে প্রণব দাঁড়াইয়া কি বলিতেছে, সেই ভদ্রলোক দুটি তার হাত ধরিয়াছেন—তাহাও সে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে পারিত—কিন্তু মেয়েটিও যেন শান্ত ডাগর চোখ দুটি তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, সেই যে কাল সন্ধ্যায় প্রণবের আহ্বানে ছাদের উপরে যেমন তাহার পানে চাহিয়াছিল—তেমনি অপরূপ স্নিগ্ধ চাহনিতে...নির্বাক মিনতির দৃষ্টিতে সেও যেন তাহার উত্তরের অপেক্ষা করিতেছে।...

সে বলিল, চলো ভাই, যা করতে বলবে, আমি তাই করব, এসো।

নিচে কোথাও কোন শব্দ নাই, উৎসব-কোলাহল থামিয়া গিয়াছে, বরপক্ষ এ বাড়ি হইতে সদলবলে উঠিয়া গিয়া ইঁহাদের শরিক রামদুর্লভ বাঁড়ুজ্যের চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় লইয়াছেন, এ-বাড়ির ঘরে-ঘরে খিল বন্ধ। কেবল নাটমন্দিরে উত্তর বারান্দার স্থানে স্থানে দু-চারজন জটলা করিয়া কি বলাবলি করিতেছে, আশ্চর্য এই যে, সম্প্রদানসভায় পুরোহিত মহাশয় এত গোলমালের মধ্যেও ঠিক নিজের কুশাসনখানির উপর বসিয়া আছেন, তিনি নাকি সেই সন্ধ্যার সময় আসনে বসিয়াছেন আর উঠেন নাই।

সকলে মিলিয়া লইয়া গিয়া অপুকে বরাসনে বসাইয়া দিল।

এসব ঘটনা পরবর্তী জীবনে অপুর তত মনে ছিল না, বাংলা খবরের কাগজের ছবির মতো অস্পষ্ট ধোঁয়া-ধোঁয়া ঠেকিত। তাহার মন তখন এত দিশাহারা ও অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিল, চারিধারে কি হইতেছে, তাহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না।

আবার দু-একটা যাহা লক্ষ করিতেছিল, যতই তুচ্ছ হোক গভীরভাবে মনে আঁকিয়া গিয়াছিল, যেমন—সামিয়ানার কোণের দিকে কে একজন ডাব কাটিতেছিল, ডাবটা গোল ও রাঙা, কাটারির বাঁটটা বাঁশের—অনেকদিন পর্যন্ত মনে ছিল।

রেশমি-চেলি-পরা সালংকারা কন্যাকে সভায় আনা হইল, বাড়ির মধ্যে হঠাৎ শাঁখ বাজিয়া উঠিল, উলুধ্বনি শোনা গেল, লোকে ভিড় করিয়া সম্প্রদান-সভার চারিদিকে গোল হইয়া দাঁড়াইল। পুরোহিতের কথায় অপু চেলি পরিল, নূতন উপবীত ধারণ করিল, কলের পুতুলের মতো মন্ত্রপাঠ করিয়া গেল। স্ত্রী-আচারের সময় আসিল, তখনও সে অন্যমনস্ক, নববধূর মতো সেও ঘাড় গুঁজিয়া আছে, যে ব্যাপারটা ঘটিতেছে চারিধারে তখনও যেন সে সম্যক ধারণা করিতে পারে নাই—কানের পাশ দিয়া কি একটা যেন শিরশির করিয়া উপরের দিকে উঠিতেছে—না, ঠিক উপরের দিকে নয়, যেন নিচের দিকে নামিতেছে।

প্রণবের বড়ো মামিমা কাঁদিতেছিলেন তাহা মনে আছে, তিনিই আবার গরদের শাড়ির আঁচল দিয়া তাহার মুখের ঘাম মুছাইয়া দিলেন, তাহাও মনে ছিল। কে একজন মহিলা বলিলেন—মেয়ের শিবপুজোর জোর ছিল বড়োবৌ তাই এমন বর মিললো। ভাঙা দালান যে রূপে আলো করেছে!

শুভদৃষ্টির সময় সে এক অপূর্ব ব্যাপার। মেয়েটি লজ্জায় ডাগর চোখ দুটি নত করিয়া আছে, অপু কৌতূহলের সহিত চাহিয়া দেখিল, ভালো করিয়াই দেখিল, যতক্ষণ কাপড়ের ঢাকাটা ছিল, ততক্ষণ সে মেয়েটির মুখ ছাড়া অন্যদিকে চাহে নাই—চিবুকের গঠন-ভঙ্গিটি এক চমক দেখিয়াই সুঠাম ও

সুন্দর মনে হইল। প্রতিমার মতো রূপই বটে, চূর্ণ অলকের দু-এক গাছা কানের আশেপাশে পড়িয়াছে, হিঙ্গুল রঙের ললাটে ও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কানে সোনার দুলে আলো পড়িয়া জ্বলিতেছে।

বাসর হইল খুব অল্পক্ষণ, রাত্রি অল্পই ছিল। মেয়েদের ভিড়ে বাসর ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। ইঁহাদের অনেকেই বিবাহ ভাঙিয়া যাইতে নিজের নিজের বাড়ি চলিয়া গিয়াছিলেন, কোথা হইতে একজনকে ধরিয়া আনিয়া অপর্ণার বিবাহ দেওয়া হইতেছে শুনিয়া তাঁহারা পুনরায় ব্যাপারটা দেখিতে আসিলেন। একরাত্রে এত মজা এ অঞ্চলের অধিবাসীর ভাগ্যে কখনও জোটে নাই—কিন্তু পথ-হইতে-ধরিয়া-আনা বরকে দেখিয়া সকলে একবাক্যে স্বীকার করিলেন—এইবার অপর্ণার উপযুক্ত বর হইয়াছে বটে।

প্রণবের বড়ো মামিমা তেজস্বিনী মহিলা, তিনি বাঁকিয়া না বসিলে ওই বায়ুরোগগ্রস্ত পাত্রটির সহিতই আজ তাঁহার মেয়ের বিবাহ হইয়া যাইত নিশ্চয়ই। এমন কি তাঁহার অমন রাশভারী স্বামী শশীনারায়ণ বাঁড়ুজ্যে যখন নিজে বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন—বড়োবৌ, কি করো পাগলের মতো, দোর খোলো, আমার মুখ রাখো—ছিঃ—তখনও তিনি অচল ছিলেন। তিনি বলিলেন—মা, যখনই একে পুলুর সঙ্গে দেখেছি, তখনই আমার মন যেন বলেছে এ আমার আপনার লোক—ছেলে তো আরও অনেক পুলুর সঙ্গে এসেছে গিয়েছে কিন্তু এত মায়া কারোর উপর হয়নি কখনও—ভেবে দ্যাখো মা, এ মুখ আর লোকালয়ে দেখাব না ভেবেছিলাম—ও ছেলে যদি আজ পুলুর সঙ্গে এ বাড়ি না আসত—

পূর্বের সেই প্রৌঢ়া বাধা দিয়া বলিলেন—তা কি করে হবে মা, ওই যে তোমার অপর্ণার স্বামী, তুমি আমি কেনারাম মুখুজ্যের ছেলের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ ঠিক করতে গেলে কি হবে, ভগবান যে ওদের দুজনের জন্যে দুজনকে গড়েছেন, ও ছেলেকে যে আজ এখানে আসতেই হবে মা—

প্রণবের মামিমা বলিলেন—আবার যে এমন করে কথা বলব তা আজ দুঘণ্টা আগেও ভাবিনি—এখন আপনারা পাঁচজনে আশীর্বাদ করুন, যাতে—যাতে—

চোখের জলে তাঁহার গলা আড়ষ্ট হইয়া গেল। উপস্থিত কাহারও চোখ শুষ্ক ছিল না, অপুও অতি কষ্টে উদগত অশ্রু চাপিয়া বসিয়া রহিল। প্রণবের মামিমার উপর শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে তাহার মন—মায়ের পরই বোধ হয় এমন আর কাহারও উপর—কেবল আর একজন আছেন—মেজ বৌরানী—তিনি লীলার মা।

তা ছাড়া মায়ের উপর তাহার মনোভাব, শ্রদ্ধা বা ভক্তির ভাব নয়, তাহা আরও অনেক ঘনিষ্ঠ, অনেক গভীর, অনেক আপন—বত্রিশ নাড়ীর বাঁধনের সঙ্গে সেখানে যেন যোগ—সে-সব কথা বুঝাইয়া বলা যায় না—যাক সে কথা।

বিশ্বাসঘাতক প্রণব কোথা হইতে আসিয়া সকলকে জানাইয়া দিল যে, নূতন জামাই খুব ভালো গাহিতে পারে। অপর্ণার মা তখনই বাসর হইতে চলিয়া গেলেন; বালিকা ও তরুণীর দল একে চায় তো আরে পায়, এদিকে অপু ঘামিয়া রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। না সে পারে ভালো করিয়া কাহারও দিকে চাহিতে, না মুখ দিয়া বাহির হয় কোন কথা। নিতান্ত পীড়াপীড়িতে একটা রবিবাবুর গান গাহিল, তারপর আর কেহ ছাড়িতে চায় না—সুতরাং আর একটা! মেয়েরাও গাহিলেন, একটি বধূর কণ্ঠস্বর ভারি সুমিষ্ট। প্রৌঢ়া ঠান্‌দি নববধূর গা ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—ওরে ও নাতনি, তোর বর ভেবেছে ও বাঙাল দেশে এসে নিজেই গান গেয়ে আসর মাতিয়ে দেবে—শুনিয়ে দে না তোর গলা—জারিজুরি একবার দে না ভেঙে—

অপু মনে মনে ভাবে—কার বর?...সে আবার কার বর?...এই সুসজ্জিতা সুন্দরী নতমুখী মেয়েটি তাহার পাশে বসিয়া, এ তার কে হয়?...স্ত্রী...তাহারই স্ত্রী?

পরদিন সকালে পূর্বতন বরপক্ষের সহিত তুমুল কাণ্ড বাধিল। উভয়পক্ষে বিস্তর তর্ক, ঝগড়া, শাপাশাপি, মামলার ভয় প্রদর্শনের পর কেনারাম মুখুজ্যে দলবলসহ নৌকা করিয়া স্বগ্রামের দিকে

যাত্রা করিলেন। প্রণব বড়োমামাকে বলিল—ওসব বড়োলোকের মুখ্যু জড়ভরত ছেলের চেয়ে আমি যে অপূর্বকে কত বড়ো মনে করি!...একা কলকাতা শহরে সহায়হীন অবস্থায় ওকে যা দুঃখের সঙ্গে লড়াই করতে দেখেছি আজ তিন বছর ধরে, ওকে একটা সত্যিকার মানুষ বলে ভাবি।

অপুর ঘর-বাড়ি নাই, ফুলশয্যা এখানেই হইল। রাত্রে অপু ঘরে ঢুকিয়া দেখিল ঘরের চারিধার ফুল ও ফুলের মালায় সাজানো, পালঙ্কের উপর বিছানায় মেয়েরা একরাশ বৈশাখী চাঁপাফুল ছড়াইয়া রাখিয়াছে, ঘরের বাতাসে পুষ্পসারের মৃদু সৌরভ। অপু সাগ্রহে নববধূর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। বাসরের রাত্রের পর আর মেয়েটির সহিত দেখা হয় নাই বা এ পর্যন্ত তাহার সঙ্গে কথাবার্তা হয় নাই আদৌ—আচ্ছা ব্যাপারটা কি রকম ঘটিবে? অপুর বুক কৌতূহলে ও আগ্রহে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল।

খানিক রাত্রে নববধূ ঘরে ঢুকিল। সঙ্গে সঙ্গে অপুর মনে আর একদফা একটা অবাস্তবতার ভাব জাগিয়া উঠিল। এ মেয়েটি তাহারই স্ত্রী!...স্ত্রী বলিতে যাহা বোঝায় অপুর ধারণা ছিল, তা যেন এ নয়...কিংবা হয়তো স্ত্রী বলিতে ইহাই বোঝায়, তাহার ধারণা ভুল ছিল। মেয়েটি দোরের কাছে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল—অপু অতিকষ্টে সংকোচ কাটাইয়া মৃদুস্বরে বলিল—আপনি—তু—তুমি দাঁড়িয়ে কেন? এখানে এসে বোসো—

বাহিরে বহু বালিকাকণ্ঠের একটা সম্মিলিত কলহাস্যধ্বনি উঠিল। মেয়েটিও মৃদু হাসিয়া পালঙ্কের একধারে বসিল—লজ্জায় অপুর নিকট হইতে দূরে বসিল। এই সময় প্রণবের ছোটমামিমা আসিয়া বালিকার দলকে বকিয়া-ঝকিয়া নিচে নামাইয়া লইয়া যাইতে অপু খানিকটা স্বস্তি বোধ করিল। মেয়েটির দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার নাম কি?

মেয়েটি মৃদুস্বরে নতমুখে বলিল—শ্রীমতী অপর্ণা দেবী—সঙ্গে সঙ্গে সে অল্প একটু হাসিল। যেমন সুন্দর মুখ তেমনি সুন্দর মুখের হাসিটা—কি রং!...কি গ্রীবার ভঙ্গি। চিবুকের গঠনটি কি অপরূপ—মুখের দিকে চাহিয়া উজ্জ্বল বাতির আলোয় অপুর যেন কিসের নেশা লাগিয়া গেল।

দু-জনেই খানিকক্ষণ চুপ। অপুর গলা শুকাইয়া আসিয়াছিল। কুঁজা হইতে জল ঢালিয়া এক গ্লাস জলই সে খাইয়া ফেলিল। কি কথা বলিবে সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না, ভাবিয়া ভাবিয়া অবশেষে বলিল—আচ্ছা, আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়াতে তোমার মনে খুব কষ্ট হয়েছে—না?

বধূ মৃদু হাসিল।

—বুঝতে পেরেছি ভারি কষ্ট হয়েছে—তা আমার—

—যান—

এই প্রথম কথা, তাহাকে এই প্রথম সম্বোধন। অপুর সারাদেহে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, অনেক মেয়ে তো ইতিপূর্বে তাহার সঙ্গে কথা বলিয়াছে, এ রকম তো কখনও হয় নাই?...

দক্ষিণের জানালা দিয়া মিঠা হাওয়া বহিতেছিল, চাঁপাফুলের সুগন্ধে ঘরের বাতাস ভরপুর। অপু বলিল—রাত দুটো বাজে, শোবে না? ইয়ে—এখানেই তো শোবে?

মা ও দিদির সঙ্গে ভিন্ন কখনও অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে এক বিছানায় সে শোয় নাই, একা একঘরে এতবড় অনাত্মীয়, নিঃসম্পর্কীয় মেয়ের পাশে এক বিছানায় শোওয়া—সেটা ভালো দেখাইবে? কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল। একবার তাহার হাতখানা মেয়েটির গায়ে অসাবধানতাবশত ঠেকিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে সারা গা শিহরিয়া উঠিল। কৌতূহলে ও ব্যাপারের অভিনবতায় তাহার শরীরের রক্ত টগ-বগ করিয়া ফুটিতেছিল—ঘরের উজ্জ্বল আলোয় অপুর সুন্দর মুখ রাঙা ও একটা অস্বাভাবিক দীপ্তিসম্পন্ন দেখাইতেছিল।

হঠাৎ সে কিসের টানে পাশ ফিরিয়া মেয়েটির গায়ে ভয়ে ভয়ে হাত তুলিয়া দিল। বলিল—সেদিন যখন আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হল, তুমি কি ভেবেছিলে?

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া তাহার হাতখানা আস্তে আস্তে সরাইয়া দিয়া বলিল—আপনি কি

ভেবেছিলেন আগে বলুন?...সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের সুঠাম, পুষ্পপেলব হাতখানি বাতির আলোয় তুলিয়া ধরিয়া হাসিমুখে বলিল—গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে—এই দেখুন কাঁটা দিয়েছে—কেন বলুন না?..কথা শেষ করিয়া সে আবার মৃদু হাসিল।

এতগুলি কথা একসঙ্গে এই প্রথম! কি অপূর্ব রোমান্স এ! ইহার অপেক্ষা কোন রোমান্স আছে আর এ জগতে, না চিনিয়া, না বুঝিয়া সে এতদিন কি হিজিবিজি ভাবিয়া বেড়াইয়াছে?...জীবনের জগতের সঙ্গে এ কি অপূর্ব ঘনিষ্ঠ পরিচয়...তাহার মাথার মধ্যে কেমন যেন করিতেছে, মদ খাইলে বোধ হয় এরকম নেশা হয়...ঘরের হাওয়া যেন ...ঘরের মধ্যে যেন আর থাকা যায় না...বেজায় গরম। সে বলিল—একটু বাইরের ছাদে বেড়িয়ে আসি, খুব গরম না? আসছি এখুনি—

বৈশাখের জ্যোৎস্না রাত্রি—রাত্রি বেশি হইলেও বাড়ির লোক এখনও ঘুমায় নাই, কাল এখানে বৌভাত হইবে, নিচে তাহারই উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। দালানের পাশে বড়ো রোয়াকে ঝিয়েরা কচুর শাক কুটিতেছে, রান্না-কোঠার পিছনে নতুন খড়ের চালা বাঁধা হইয়াছে, সেখানে এত রাত্রে পানতুয়া ভিয়ান হইতেছে—সে ছাদের আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া দেখিল।

ছাদে কেহ নাই, দূরের নদীর দিক হইতে একটা ঝিরঝিরে হাওয়া বহিতেছে। দু-দিন যে কি ঘটিয়াছে তাহা যেন সে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারে নাই—আজ বুঝিয়াছে। কয়েকদিন পূর্বেও সে ছিল সহায়শূন্য, বন্ধুশূন্য, গৃহশূন্য, আত্মীয়শূন্য, জগতে সম্পূর্ণ একাকী, মুখের দিকে চাহিবার ছিল না কেহই। কিন্তু আজ তো তাহা নয়, আজ ওই মেয়েটি যে কোথা হইতে আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছে, মনে হইতেছে যেন ও জীবনের পরম বন্ধু।

মা এ-সময় কোথায়?...মায়ের যে বড়ো সাধ ছিল...মনসাপোতার বাড়িতে শুইয়া শুইয়া কত রাত্রে সে-সব কত সাধ, কত আশার গল্প...মায়ের সোনার দেহ কোদলাতীরের শ্মশানে চিতাগ্নিতে পুড়িবার রাত্রি হইতে সে আশা-আকাঙ্ক্ষার তো সমাধি হইয়াছিল...মাকে বাদ দিয়া জীবনের কোন্ উৎসব...

তপ্ত আকুল চোখের জলে চারিদিক ঝাপসা হইয়া আসিল।

বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশী রাত্রির জ্যোৎস্না যেন তাহার পরলোকগত দুঃখিনী মায়ের আশীর্বাদের মতো তাহার বিভ্রান্ত হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া সরল শুভ্র মহিমায় স্বর্গ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতার কর্মকঠোর, কোলাহল-মুখর, বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্তন করিয়া গত কয়েকদিনের জীবনকে নিতান্ত স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল অপুর। একথা কি সত্য—গত শুক্রবাব বৈশাখী পূর্ণিমার শেষরাত্রে সে অনেক দূরের নদী-তীরবর্তী এক অজানা গ্রামের অজানা গৃহস্থবাটীর মেয়েকে বলিয়াছিল—আমি এ বছর যদি আর না আসি অপর্ণা?...

প্রথমবার মেয়েটি একটু হাসিয়া মুখ নিচু করিয়াছিল, কথা বলে নাই।

অপু আবার বলিয়াছিল—চুপ করে থাকলে হবে না, তুমি যদি বলো আসব, নইলে আসব না. সত্যি অপর্ণা। বলো কি বলবে?

মেয়েটি লজ্জারক্তমুখে বলিয়াছিল—বা রে, আমি কে? মা রয়েছেন, বাবা রয়েছেন, ওঁদের—আপনি ভারি—

—বেশ আসব না তবে। তোমার নিজের ইচ্ছে না থাকে—

—আমি কি সে কথা বলেছি?

—তা হলে?

—আপনার ইচ্ছে যদি হয় আসতে, আসবেন—না হয় আসবেন না, আমার কথায় কি হবে?

ও কথা ইহার বেশি আর অগ্রসর হয় নাই, অন্য সময় এ ক্ষেত্রে হয়তো অপুর অত্যন্ত অভিমান হইত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কৌতূহলটাই তাহার মনের অন্য সব প্রবৃত্তিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে—ভালোবাসার চোখে মেয়েটিকে সে এখনও দেখিতে পারে নাই, যেখানে ভালোবাসা নাই, সেখানে অভিমানও নাই।

সেদিন বৈকালে গোলদিঘির মোড়ে একজন ফেরিওয়ালা চাঁপাফুল বেচিতেছিল, সে আগ্রহের সহিত গিয়া ফুল কিনিল। ফুলটা আঘ্রাণের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মনের মধ্যে একটা বেদনা সে সুস্পষ্ট অনুভব করিল, একটা কিছু পাইয়া হারাইবার বেদনা, একটা শূন্যতা, একটা খালি-খালি ভাব...মেয়েটির মাথার চুলের সে গন্ধটাও যেন আবার পাওয়া যায়...

অন্যমনস্কভাবে গোলদিঘির এক কোণে ঘাসের উপর অনেকক্ষণ একা বসিয়া বসিয়া সেদিনের সেই রাতটি আবার সে মনে আনিবার চেষ্টা করিল। মেয়েটির মুখখানি কি রকম যেন?...ভারি সুন্দর মুখ...কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যেই সব যেন মুছিয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—মেয়েটির মুখ মনে আনিবার ও ধরিয়া রাখিবার যত বেশি চেষ্টা করিতেছে সে, ততই সে মুখ দ্রুত অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে। শুধু নতপল্লব কৃষ্ণতারা চোখ-দুটির ভঙ্গি অল্প অল্প মনে আসে, আর মনে আসে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সে স্নিগ্ধ হাসিটুকু। প্রথমে ললাটে লজ্জা ঘনাইয়া আসে, ললাট হইতে নামে ডাগর দুটি চোখে, পরে কপোলে...তারপরই যেন সারা মুখখানি অল্পক্ষণের জন্য অন্ধকার হইয়া আসে...ভারি সুন্দর দেখায় সে সময়! তারপরই আসে সেই অপূর্ব হাসিটি, ওরকম হাসি আর কারও মুখে অপু কখনও দেখে নাই। কিন্তু মুখের সব আদলটা তো মনে আসে না—সেটা মনে আনিবার জন্য সে ঘাসের উপর শুইয়া অনেকক্ষণ ভাবিল, অনেকক্ষণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিল—না কিছুতেই মনে আসে না—কিংবা হয়তো আসে অতি অল্পক্ষণের জন্য, আবার তখনই অস্পষ্ট হইয়া যায়। অপর্ণা—কেমন নামটি?...

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি প্রণব কলিকাতায় আসিল। বিবাহের পর এই তাহার সঙ্গে প্রথম দেখা। সে আসিয়া গল্প করিল, অপর্ণার মা বলিয়াছেন—তাঁহার কোন্ পুণ্যে এ রকম তরুণ দেবতার মতো রূপবান জামাই পাইয়াছেন জানেন না—তাহার কেহ কোথাও নাই শুনিয়া চোখের জল রাখিতে পারেন নাই।

অপু খুশি হইল, হাসিয়া বলিল—তবু তো একটা ভালো জামা গায়ে দিতে পারলাম না, সাদা পাঞ্জাবি গায়ে বিয়ে হল—দূর!...না খেয়ে-দেয়ে একটা সিল্কের জামা করালুম, সেটা গেল ছিঁড়ে-ছুটে, তখন তুমি এলে তোমার মামার বাড়িতে নিয়ে যেতে, তার আগে আসতে পারলে না—আচ্ছা সিল্কের জামাটাতে আমায় কেমন দেখাতো?

—ওঃ—সাক্ষাৎ অ্যাপোলো বেলভেডিয়ার:...ঢের ঢের হামবাগ দেখেছি, কিন্তু তোর জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার—বুঝলি?

—না—কিন্তু একটা কথা। অপর্ণার মা কি বলেন তাহা জানিতে অপুর তত কৌতূহল নাই—অপর্ণা কি বলিয়াছে—অপর্ণা?...অপর্ণা কিছু বলে নাই?...হয়তো কেনারাম মুখুজ্যের ছেলের সঙ্গে বিবাহ না হওয়াতে মনে মনে দুঃখিত হইয়াছে—না?

প্রণবের মামা এ বিবাহে তত সন্তুষ্ট হন নাই, স্ত্রীর উপরে মনে মনে চটিয়াছেন এবং তাঁহার মনে ধারণা—প্রণবই তাহার মামিমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া নিজের বন্ধুর সঙ্গে বোনের বিবাহ দেওয়াইয়াছে। নাম নাই, বংশ নাই, চালচুলা নাই—চেহারা লইয়া কি মানুষ ধুইয়া খাইবে...কিন্তু এসব কথা প্রণব অপুকে কিছু বলিল না।

একটা কথা শুনিয়া সে দুঃখিত হইল।—কেনারাম মুখুজ্যের ছেলেটি নিজে দেখিয়া মেয়ে পছন্দ করিয়াছিল। অপর্ণাকে বিবাহ করিবার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল তাহার—কিন্তু হঠাৎ বিবাহ-সভায়

আসিয়া কি যেন গোলমাল হইয়া গেল, সারারাত্রি কোথা দিয়া কাটিল, সকালবেলা যখন একটু হুঁশ হইল, তখন সে দাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—দাদা, আমার বিয়ে হল না?

এখনও তাহার অবশ্য ঘোর কাটে নাই...বাড়ি ফিরিবার পথেও তাহার মুখে ওই কথা—এখন নাকি সে বদ্ধ উন্মাদ! ঘরে তালা দিয়া রাখা হইয়াছে।

অপু বলিল—হাসিস কেন, হাসবার কি আছে?...পাগল তো নিজের ইচ্ছেয় হয় নি, সে বেচারির আর দোষ কি? ও নিয়ে হাসি ভালো লাগে না।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ঘুম হয় না—কেবলই অপর্ণার কথা মনে আসে। প্রণব এ কি করিয়া দিল তাহাকে? সে যে বেশ ছিল, এ কোন্ সোনার শিকল তাহার মুক্ত, বন্ধনহীন হাতে-পায়ে অদৃশ্য নাগপাশের মতো দিন দিন জড়াইয়া পড়িতেছে? লাইব্রেরিতে বসিয়া কেবল আজকাল বাংলা উপন্যাস পড়ে—দেখিল, তাহার মতো বিবাহ নভেলে অনেক ঘটিয়াছে, অভাব নাই।

পূজার সময় শ্বশুরবাড়ি যাওয়া ঘটিল না। একে তো অর্থাভাবে সে নিজের ভালো জামা-কাপড় কিনিতে পারিল না, শ্বশুরবাড়ি হইতে পূজার তত্ত্বে যাহা পাওয়া গেল, তাহা পরিয়া সেখানে যাইতে তাহার ভারি বাধ-বাধ ঠেকিল। তাহা ছাড়া অপর্ণার মা চিঠির উপর চিঠি দিলে কি হইবে, তাহার বাবার দিক হইতে জামাইকে পূজার সময় লইয়া যাইবার বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা গেল না বরং তাঁহার নিকট হইতে উপদেশপূর্ণ পত্র পাওয়া গেল যে, একটা ভালো চাকুরি যেন সে শীঘ্র দেখিয়া লয়, এখন অল্প বয়স, এই তো অর্থ উপার্জনের সময়, এখন আলস্য ও ব্যসনে কাটাইলে...এমনি ধরনের নানা কথা। এখানে বলা আবশ্যক, এ বিবাহে তিনি অপুকে একেবারে ফাঁকি দিয়াছিলেন, কেনারাম মুখুজ্যের ছেলেকে যাহা দিবার কথা ছিল তাহার সিকিও এ জামাইকে দেন নাই।

ছুটি পাওয়া গেল পুনরায় বৈশাখ মাসে। পূর্বদিন রাত্রে তাহার কিছুতেই ঘুম আসে না, কি রকম চুল ছাঁটা হইয়াছে, আয়নায় দশবার দেখিল। এই সাদা পাঞ্জাবিতে তাহাকে ভালো মানায়—না, এই তসরের কোটটাতে?

অপর্ণার মা তাহাকে পাইয়া হাতে যেন আকাশের চাঁদ পাইলেন। সেদিনটা খুব বৃষ্টি, অপু নৌকা হইতে নামিয়া বাড়ির বাহিরের উঠানে পা দিতেই কে পূজার দালানে বসিয়াছিল, ছুটিয়া গিয়া বাড়ির মধ্যে খবর দিল। এক মুহূর্তে বাড়ির উপরের নিচের সব জানালা খুলিয়া গেল, বাড়িতে ঝি-বৌয়ের সংখ্যা নাই, সকলে জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন—মুষলধারায় বৃষ্টিপাত অগ্রাহ্য করিয়া অপর্ণার মা উঠানে তাহাকে লইতে ছুটিয়া আসিলেন, সারা বাড়িতে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল।

ফুলশয্যার সেই ঘরে, সেই পালঙ্কেই রাত্রে শুইয়া সে অপর্ণার প্রতীক্ষায় রহিল।

এক বৎসরে অপর্ণার এ কি পরিবর্তন! তখন ছিল বালিকা—এখন ইহাকে দেখিলে যেন আর চেনা যায় না! লীলার মতো চোখ-ঝলসানো সৌন্দর্য ইহার নাই বটে, কিন্তু অপর্ণার যাহা আছে, তাহা উহাদের কাহারও নাই। অপুর মনে হইল দু-একখানা প্রাচীন পটে-আঁকা তরুণী দেবীমূর্তির, কি দশমহাবিদ্যা ষোড়শী মূর্তির মুখে এ-ধরনের অনুপম, মহিমময় স্নিগ্ধ সৌন্দর্য সে দেখিয়াছে। একটু সেকেলে, একটু প্রাচীন ধরনের সৌন্দর্য...সুতরাং দুষ্প্রাপ্য। যেন মনে হয় এ খাঁটি বাংলার জিনিস, এই দূর পল্লীপ্রান্তরের নদীতীরের সকল শ্যামলতা, সকল সরসতা, পথপ্রান্তে বনফুলের সকল সরলতা ছানিয়া ও মুখ গড়া, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাংলার পল্লীর চূত-বকুলবীথির ছায়ায় ছায়ায় কত অপরাহ্ণে নদীঘাটের যাওয়া-আসার পথে এই উজ্জ্বলশ্যামবর্ণা, রূপসী তরুণী বধূদের লক্ষ্মীর মতো আলতা-রাঙা পদচিহ্ন কতবার পড়িয়াছে, মুছিয়াছে, আবার পড়িয়াছে—ইহাদেরই স্নেহ-প্রেমের, দুঃখ-সুখের কাহিনী, বেহুলা-লখিন্দরের গানে, ফুল্লরার বারোমাস্যায়, সুবচনীর ব্রতকথায়, বাংলার বৈষ্ণব-কবিদের রাধিকার রূপবর্ণনায়, পাড়াগাঁয়ের ছড়ায়, উপকথায়, সুয়োরানী দুয়োরানীর গল্পে!...

অপু বলিল—তোমার সঙ্গে কিন্তু আড়ি, সারা বছরে একখানা চিঠি দিলে না কেন?

অপর্ণা সলজ্জ মৃদু একটু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। তারপর একবার ডাগর চোখ দুটি তুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। খুব মৃদুস্বরে মুখে হাসি টিপিয়া বলিল—আর আমার বুঝি রাগ হতে নেই?...

অপু দেখিল—এতদিন কলিকাতায় সে জারুল কাঠের তক্তপোশে শুইয়া অপর্ণার যে মুখ ভাবিত—আসল মুখ একেবারেই তাহা নহে—ঠিক এই অনুপম মুখই সে দেখিয়াছিল বটে ফুলশয্যার রাত্রে, এমন ভুলও হয়!

—পুজোর সময় আসি নি তাই?—তুমি ভাবতে কি না?—ও-সব মুখের কথা, ছাই ভাবতে!—

—না গো না, মা বললেন, তুমি আসবে ষষ্ঠীর দিন, ষষ্ঠী গেল, পুজো গেল, তখনও মা বললেন তুমি একাদশীর পর আসবে—আমি—

অপর্ণা হঠাৎ থামিয়া গেল, অল্প একটু চাহিয়া চোখ নিচু করিল।

অপু আগ্রহের সুরে বলিল—তুমি কি, বললে না?

অপর্ণা বলিল—আমি জানি নে, বলব না—

অপু বলিল—আমি জানি আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়াতে তুমি মনে মনে—

অপর্ণা স্নেহপূর্ণ তিরস্কারের সুরে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—আবার ওই কথা?...ওসব কথা বলতে আছে?—ছিঃ—বলো না—

—তা কই, তুমি খুশি হয়েছ, একথা তো তোমার মুখে শুনি নি অপর্ণা—

অপর্ণা হাসিমুখে বলিল—তারপর কতদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে গো শুনি?—সেই আর-বছর বোশেখ আর এ বোশেখ—

—আচ্ছা বেশ, এখন তো দেখা হল, এখন আমার কথার উত্তর দাও?

অপর্ণা কি-একটা হঠাৎ মনে পড়িবার ভঙ্গিতে তাহার দিকে চাহিয়া আগ্রহের সুরে বলিল—তুমি নাকি যুদ্ধে যাচ্ছিলে, পুলুদা বলছিল, সত্যি?—

—যাই নি, এবার ভাবছি যাবো—এখান থেকে গিয়েই যাবো—

অপর্ণা ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল—আচ্ছা থাক গো, আর রাগ করতে হবে না, আচ্ছা তোমার কথার কি উত্তর দেব বলো তো?—ওসব আমি মুখে বলতে পারব না—

—আচ্ছা, যুদ্ধ কাদের মধ্যে বেধেছে, জানো?...

—ইংরেজের সঙ্গে আর জার্মানির সঙ্গে—আমাদের বাড়িতে বাংলা কাগজ আসে! আমি পড়ি যে!

অপর্ণা রূপার ডিবাতে পান আনিয়াছিল, খুলিয়া বলিল—পান খাবে না?...

বাহিরে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। এতটুকু গরম নাই, ঠাণ্ডা রাতটির ভিজা মাটির সুগন্ধে ঝিরঝিরে দক্ষিণ হাওয়া ভরপুর, একটু পরে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিল।

অপু বলিল—আচ্ছা অপর্ণা, চাঁপাফুল পাওয়া যায় তো কাউকে কাল বলো না, বিছানায় রেখে দেবে? আছে চাঁপাগাছ কোথাও?...

—আমাদের বাগানেই আছে। আমি কাউকে বলতে পারব না কিন্তু—তুমি বলো কাল সকালে ওই নৃপেনকে, কি অনাদিকে...কি আমার ছোট বোনকে বলো—

—আচ্ছা কেন বল তো চাঁপাফুলের কথা তুললাম?...

অপর্ণা সলজ্জ হাসিল। অপুর বুঝিতে দেরি হইল না যে, অপর্ণা তাহার মনের কথা ঠিক ধরিয়াছে। তাহার হাসিবার ভঙ্গিতে অপু একথা বুঝিল। বেশ বুদ্ধিমতী তো অপর্ণা!...

সে বলিল—হ্যাঁ একটা কথা অপর্ণা, তোমাকে একবার কিন্তু নিয়ে যাব দেশে, যাবে তো?

অপর্ণা বলিল—মাকে বলো, আমার কথায় তো হবে না...

—তুমি রাজি কি না বলো আগে—সেখানে কিন্তু কষ্ট হবে। অপু একবার ভাবিল—সত্যি কথাটা খুলিয়াই বলে। কিন্তু সেই পুরাতন গর্ব ও বাহাদুরির ঝোঁক!—বলিল—অবিশ্যি একদিন আমাদেরও সবই ছিল। যেখানে থাকতুম—আমাদের পৈতৃক দেশ—এখন তো—দোতলা মস্ত বাড়ি—মানে সবই—তবে শরিকানী মামলা আর মানে ম্যালেরিয়ায়—বুঝলে না? এখন যেখানে থাকি, সেখানে দু-খানা মেটে চালাঘর, তাও মা মারা যাওয়ার পর আর সেখানে যাই নি, তোমাদের মতো ঝি-চাকর নেই, নিজের হাতে সব করতে হবে—তা আগে থেকেই বলে রাখি। তুমি হলে জমিদারের মেয়ে—

অপর্ণা কৌতুকের সুরে বলিল—আছিই তো জমিদারের মেয়ে। হিংসে হচ্ছে বুঝি? একটু থামিয়া শান্ত সুরে বলিল—কেন একশবার ওকথা বলো?...তুমি কাল মাকে বাবাকে বলে রাজি করাও, আমি তোমার সঙ্গে যেখানে নিয়ে যাবে যাবো, গাছতলাতেও যাবো, আমি তোমার সব কথা জানি, পুলুদা মায়ের কাছে বলছিল, আমি সব শুনেছি। যেখানে নিয়ে যাবে, নিয়ে চলো, তোমার ইচ্ছে, আমার তাতে মতামত কি?

রাত্রে দুজনে কেহ ঘুমাইল না।

বধূকে লইয়া সে রওনা হইল। শ্বশুর প্রথমটা আপত্তি তুলিয়াছিলেন—নিয়ে তো যেতে চাইছ বাবাজী, কিন্তু এখন নিয়ে গিয়ে তুলবে কোথায়? চাকরি-বাকরি ভালো কর, ঘর-দোর ওঠাও, নিয়ে যাবার এত তাড়াতাড়িটা কি?

সিঁড়ির ঘরে অপর্ণার মা স্বামীকে বলিলেন—হ্যাঁগা, তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে যাচ্ছে দিন দিন—না কি? জামাইকে ও-সব কথা বলেছ? আজকালকার ছেলেমেয়েদের ধরন আলাদা, তুমি জানো না। ছেলেমানুষ জামাই, টাকাকড়ি, চাকরি-বাকরি ভগবান যখন দেবেন তখন হবে। আজকালের মেয়েরা ও-সব বোঝে না, বিশেষ করে তোমার মেয়ে সে ধরনেরই নয়, ওর মন আমি খুব ভালো বুঝি। দাও গিয়ে পাঠিয়ে ওকে জামাইয়ের সঙ্গে—ওদের সুখ নিয়েই সুখ।

উৎসাহে অপুর রাত্রে ঘুম হয় না এমন অবস্থা, কাল সারাদিন অপর্ণাকে লইয়া রেল স্টিমারে কাটানো—উঃ!...শুধু সে আর অপর্ণা, আর কেউ না। রাত্রে অস্পষ্ট আলোকে অপর্ণাকে ভালো করিয়া দেখিবারই সুযোগ হয় না, দিনে দেখা হওয়া এ বাড়িতে অসম্ভব—কিন্তু কাল সকালটি হইতে তাহারা দুজনে—মাঝে আর কোন বাধা ব্যবধান থাকিবে না!

কিন্তু স্টিমারে অপর্ণা রহিল মেয়েদের জায়গায়। তিন ঘণ্টা কাল সেভাবে কাটিল! তার পরেই রেল।

এইখানেই অপু সর্বপ্রথম গৃহস্থালি পাতিল স্ত্রীর সঙ্গে। ট্রেনের তখনও অনেক দেরি। যাত্রীদের রান্না খাওয়ার জন্য স্টেশন হইতে একটু দূরে ভৈরবের ধারে ছোট ছোট খড়ের ঘর অনেকগুলি—তারই একটা চার আনায় ভাড়া পাওয়া গেল। অপু দোকানে খাবার কিনিতে যাইতেছে দেখিয়া বধূ বলিল—তা কেন? এই তো এখানে উনুন আছে, যাত্রীরা সব রেঁধে খায়, এখনও তো তিন-চার ঘণ্টা দেরি গাড়ির, আমি রাঁধব।

অপু ভারি খুশি। সে ভারি মজা হইবে! এ কথাটা এতক্ষণ তাহার মনে আসে নাই। মহা উৎসাহে বাজার হইতে জিনিসপত্র কিনিয়া আনিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখে ইতিমধ্যেই কখন বধূ স্নান সারিয়া ভিজা চুলটি পিঠের উপর ফেলিয়া, কপালে সিন্দুরের টিপ দিয়া লাল-জরিপাড় মটকার শাড়ি পরিয়া ব্যস্তসমস্ত অবস্থায় এটা-ওটা ঠিক করিতেছে। হাসিমুখে বলিল—বাড়িওয়ালি জিজ্ঞেস করছে উনি তোমার ভাই বুঝি? আমি হেসে ফেলতেই বুঝতে পেরেছে, বলেছে—জামাই! তাই তো বলি!—আরও কি বলিতে গিয়া অপর্ণা লজ্জায় কথা শেষ করিতে না পারিয়া হাসিয়া ফেলিল।

অপু মুগ্ধনেত্রে বধূর দিকে চাহিয়া ছিল। কিশোরীর তনুদেহটি বেড়িয়া স্ফুটনোন্মুখ যৌবন কি অপূর্ব সুষমায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সুন্দর নিটোল গৌর বাহু দুটি, চুলের খোঁপার ভঙ্গিটি কি অপরূপ! গভীর রাত্রে শোবার ঘরে এ পর্যন্ত দেখাশোনা, দিনের আলোয় স্নানের পরে এ অবস্থায় তাহার স্বাভাবিক গতিবিধি লক্ষ করিবার সুযোগ কখনও ঘটে নাই—আজ দেখিয়া মনে হইল অপর্ণা সত্যই সুন্দরী বটে।

কাঁচা কাঠ কিছুতেই ধরে না, প্রথমে বধূ, পরে সে নিজে, ফুঁ দিয়া চোখ লাল করিয়া ফেলিল। প্রৌঢ়া বাড়িওয়ালি ইহাদের জন্য নিজের ঘরে বাটনা বাটিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দুজনের দুর্দশা দেখিয়া বলিল—ওগো মেয়ে, সরো বাছা, জামাইকে যেতে বলো। তোমাদের কি ও কাজ মা? সরো আমি দি ধরিয়ে!

বধূ তাগিদ দিয়া অপুকে স্নানে পাঠাইল। নদী হইতে ফিরিয়া সে দেখিল—ইহার মধ্যে কখন বধূ বাড়িওয়ালিকে দিয়া বাজার হইতে রসগোল্লা ও ছানা আনাইয়াছে, রেকাবিতে পেঁপে কাটা, খাবার ও গ্লাসে নেবুর রস মেশানো চিনির শরবত। অপু হাসিয়া বলিল—উঃ, ভারি গিন্নিপনা যে!...আচ্ছা, তরকারিতে নুন দেওয়ার সময় গিন্নিপনার দৌড়টা একবার দেখা যাবে।

অপর্ণা বলিল—আচ্ছা গো দেখো—পরে ছেলেমানুষের মতো ঘাড় দুলাইয়া বলিল—ঠিক হলে কিন্তু আমায় কি দেবে?

অপু কৌতুকের সুরে বলিল—ঠিক হলে যা দেব, তা এখুনি পেতে চাও?

—যাও, আচ্ছা তো দুষ্টু!

একবার সে রন্ধনরত বধূর পিছনে আসিযা চুপি চুপি দাঁড়াইল। দৃশ্যটা এত নতুন, এত অভিনব ঠেকিতেছিল তাহার কাছে! এই সুঠাম, সুন্দরী পরের মেয়েটি তাহার নিতান্ত আপনার জন—একমাত্র পৃথিবীতে আপনার জন! পরে সে সন্তর্পণে নিচু হইয়া পিঠের উপরে এলানো চুলের গিঁঠটা ধরিয়া অতর্কিতে এক টান দিতেই বধূ পিছনে চাহিয়া কৃত্রিম কোপের সুরে বলিল—উঃ! আমার লাগে না বুঝি?...ভারি দুষ্টু তো ...রান্না থাকবে পড়ে বলে দিচ্ছি যদি আবার চুল ধরে টানবে—

অপু ভাবে, মা ঠিক এই ধরনের কথা বলিত—এই ধরনের স্নেহ-প্রীতি-ঝরা চোখ। সে দেখিয়াছে, কি দিদি, কি রানুদি, কি লীলা, কি অপর্ণা—সকলেরই মধ্যে মা যেন অল্পবিস্তর মিশাইয়া আছেন—ঠিক সময়ে ঠিক অবস্থায় ইহারা একই ধরনের কথা বলে, চোখে মুখে একই ধরনের স্নেহ ফুটিয়া ওঠে।

একটি ভদ্রলোক অনেকক্ষণ হইতে প্লাটফর্মে পায়চারি করিতেছিলেন। ট্রেনে উঠিবার কিছু পূর্বে অপু তাঁহাকে চিনিতে পারিল, দেওয়ানপুরের মাস্টার সেই সত্যেনবাবু। অপু থার্ড ক্লাসে পড়িবার সময়ই ইনি আইন পাশ করিয়া স্কুলের চাকুরি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, আর কখনও দেখা হয় নাই। পুরাতন ছাত্রকে দেখিয়া খুশি হইলেন, অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন, অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে কে কি করিতেছে শুনিবার আগ্রহ দেখাইলেন।

তিনি আজকাল পাটনা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন, চালচলন দেখিয়া অপুর মনে হইল—বেশ দু-পয়সা উপার্জন করেন। তবুও বলিলেন, পুরানো দিনই ছিল ভালো, দেওয়ানপুরের কথা মনে হইলে কষ্ট হয়। ট্রেন আসিলে তিনি সেকেন্ড ক্লাসে উঠিলেন।

অপর্ণাকে সব ভালো করিয়া দেখাইবার জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে নামিয়া অপু একখানা ফিটন গাড়ি ভাড়া করিয়া খানিকটা ঘুরিল।

অপু একটা জিনিস লক্ষ করিল; অপর্ণা কখনও কিছু দেখে নাই বটে, কিন্তু কোনও বিষয়ে কোনও অশোভন ব্যগ্রতা দেখায় না। ধীর, স্থির, সংযত, বুদ্ধিমতী—এই বয়সেই চরিত্রগত একটা কেমন সহজ গাম্ভীর্য—যাহার পরিণতি সে দেখিয়াছে ইহারই মায়ের মধ্যে; উছলিয়া-পড়া মাতৃত্বের সঙ্গে চরিত্রের সে কি দৃঢ় অটলতা।

মনসাপোতা পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। অপু বাড়িঘরের বিশেষ কিছু ঠিক করে নাই, কাহাকেও সংবাদ দেয় নাই, কিছু না—অথচ হঠাৎ স্ত্রীকে আনিয়া হাজির করিয়াছে। বিবাহের পর মাত্র একবার এখানে দুদিনের জন্য আসিয়াছিল, বাড়িঘর অপরিষ্কার, রাত্রিবাসের অনুপযুক্ত, উঠানে ঢুকিয়া পেয়ারা গাছটার তলায় সন্ধ্যার অন্ধকারে বধূ দাঁড়াইয়া রহিল, অপু গরুর গাড়ি হইতে তোরঙ্গ ও কাঠের হাতবাক্সটা নামাইতে গেল। উঠানে পাশের জঙ্গলে নানা পতঙ্গ কুস্বর করিয়া ডাকিতেছে, ঝোপে ঝোপে জোনাকির ঝাঁক জ্বলিতেছে।

কেহ কোথাও নাই, কেহ তরুণ দম্পতিকে সাদরে বরণ ও অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে তুলিয়া লইতে ছুটিয়া আসিল না, তাহারাই দুজনে টানাটানি করিয়া নিজেদের পেঁটরা তোরঙ্গ মাত্র দেশলাইয়ের কাঠির আলোর সাহায্যে ঘরের দাওয়ায় তুলিতে লাগিল। সে আজ কাহাকেও ইচ্ছা করিয়াই খবর দেয় নাই, ভাবিয়াছিল—মা যখন বরণ করে নিতে পারলেন না আমার বৌকে, অত সাধ ছিল মার—তখন আর কাউকে বরণ করতে হবে না, ও অধিকার আর কাউকে বুঝি দেব?

অপর্ণা জানিত তাহার স্বামী দরিদ্র কিন্তু এ রকম দরিদ্র তাহা সে ভাবে নাই। তাহাদেব পাড়ার নাপিত-বাড়ির মতো নিচু, ছোট চালাঘব। দাওয়ার একধারে গরু বাছুর উঠিয়া ভাঙিযা দিয়াছে...ছাঁচতলায় কাঁই-বীচি ফুটিয়া বর্ষাব জলে চারা বাহির হইয়াছে...একস্থানে খড় উড়িয়া চালের বাখারি ঝুলিয়া পড়িয়াছে...বাড়ির চারিধারে কি পোকা একঘেয়ে ডাকিতেছে...এরকম ঘবে তাহাকে দিন কাটাইতে হইবে?...অপর্ণার মন দমিয়া গেল। কি করিয়া থাকিবে সে এখানে? মায়ের কথা মনে হইল...খুড়িমাদের কথা মনে হইল...ছোট ভাই বিনুর কথা মনে হইল. .কান্না ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল...সে মরিয়া যাইবে এখানে থাকিলে...

অপু খুঁজিয়া-পাতিযা একটা লণ্ঠন জ্বালিল। ঘবের মাটির মেঝেতে পোকায খুঁড়িযা মাটি জড়ো করিয়াছে। তক্তপোশের একটা পাশ ঝাড়িয়া তাহাব উপর অপর্ণাকে বসাইল...সবে অপর্ণাকে অন্ধকাব ঘবে বসাইয়া লণ্ঠনটা হাতে বাহিরে হাতবাক্সটা আনিতে গেল ..অপর্ণার গা ছম ছম করিয়া উঠিল অন্ধকারে...পরক্ষণেই অপু নিজের ভুল বুঝিযা আলো হাতে ঘবে ঢুকিয়া বলিল—দ্যাখো কাণ্ড, তোমাকে একা অন্ধকারে বসিয়ে রেখে—থাক লণ্ঠনটা এখানে—

অপর্ণার কান্না আসিতেছিল।...

আধঘণ্টা পরে ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া ঘরটা একরকম রাত্রি কাটানোর মতো দাঁড়াইল। কি খাওয়া যায় রাত্রে?—রান্নাঘর ব্যবহারের উপযোগী নাই তো বটেই, তা ছাড়া চাল, ডাল, কাঠ কিছুই নাই। অপর্ণা তোরঙ্গ খুলিয়া একটা পুঁটুলি বার করিয়া বলিল—ভুলে গিয়েছিলাম তখন, মা নাড়ু দিয়েছিলেন এতে বেঁধে—অনেক আছে—এই খাও।

অপু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল। সংসার কখনও করে নাই—এই নতুন—নিতান্ত আনাড়ি—অপর্ণাকে এ অবস্থায় এখানে আনা ভালো হয় নাই, সে এতক্ষণে বুঝিয়াছে। অপ্রতিভের সুরে বলিল—রানাঘাট থেকে কিছু খাবার নিলেই হত—তোমাকে একলা বসিয়ে রেখে যাই কি করে—নইলে ক্ষেত্র কাপালির বাড়ি থেকে চিঁড়ে আর দুধ—যাব?...

অপর্ণা ঘাড় নাড়িয়া বারণ করিল।

তেলিদের বাড়িতে কেউ ছিল না, তিন-চারি মাস হইতে তাহারা কলিকাতায় আছে, বাড়ি তালাবন্ধ, নতুবা কাল রাত্রে ইহাদের কথাবার্তা শুনিয়া সে-বাড়ির লোক আসিল। সকালে সংবাদ পাইয়া ও-পাড়া হইতে নিরুপমা ছুটিয়া আসিল। অপু কৌতুকের সুরে বলিল—এসো, এসো নিরুদিদি, এখন মা নেই, তোমরা কোথায় বরণ করে ঘরে তুলবে, দুধে-আলতার পাথরে দাঁড় করাবে, তা না তুমি সকালে পান চিবুতে চিবুতে এলে। বেশ যা হোক!

নিরুপমা অনুযোগ করিয়া বলিল—তুমি ভাই সেই চৌদ্দ বছরে যেমন পাগলটি ছিলে, এখনও

ঠিক সেই আছো। বৌ নিয়ে আসছো তা একটা খবর না, কিছু না। কি করে জানব তুমি এ অবস্থায় একজন ভদ্রলোকের মেয়েকে এই ভাঙা ঘরে হুপ্ করে এনে তুলবে? ছি ছি, দ্যাখ তো কাণ্ডখানা? রাত্রে যে রইলে কি করে এখানে, সে কেবল তুমিই পারো।

নিরুপমা গিনি দিয়া বৌ-এর মুখ দেখিল।

অপু বলিল—তোমাদের ভরসাতেই কিন্তু ওকে এখানে রেখে যাব নিরুদি। আমাকে সোমবার চাকুরিতে যেতেই হবে। নিরুপমা বৌ দেখিয়া খুব খুশি, বলিল—আমি আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখে দেব বৌকে, এখানে থাকতে দেব না! অপু বলিল—তা হবে না, আমার মায়ের ভিটেতে সন্ধে দেবে কে তাহলে? রাত্রে তোমাদের ওখানে শোবার জন্যে নিয়ে যেয়ো। নিরুপমা তাতেই রাজি। চৌদ্দ বছরের ছেলে যখন প্রথম চেলি পরিয়া তাহাদের বাড়ি পূজা করিতে গিয়াছিল, তখন হইতে সে অপুকে সত্য সত্য স্নেহ করে, তাহার দিকে টানে। অপু ঘরবাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায় সে মনে মনে খুব দুঃখিত হইয়াছিল। মেয়েরা গতিকে বোঝে না, বাহিরকে বিশ্বাস করে না, মানুষের উদ্দাম ছুটিবার বহির্মুখী আকাঙ্ক্ষাকে শান্ত সংযত করিয়া তাহাকে গৃহস্থালি পাতাইয়া, বাসা বাঁধাইবার প্রবৃত্তি নারীমনের সহজাত ধর্ম, তাহাদের সকল মাধুর্য, স্নেহ, প্রেমের প্রয়োগনৈপুণ্য এখানে। সে শক্তিও এত বিশাল যে খুব কম পুরুষই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া জয়ী হইবার আশা করিতে পারে। অপু বাড়ি ফিরিয়া নীড় বাঁধাতে নিরুপমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

কলিকাতায় ফিরিয়া অপুর আর কিছু ভালো লাগে না, কেবল শনিবারের অপেক্ষায় দিন গুনিতে থাকে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাহারা নব-বিবাহিত তাহাদের সঙ্গে কেবল বিবাহিত জীবনের গল্প করিতে ও শুনিতে ভালো লাগে। কোনওরকমে এক সপ্তাহ কাটাইয়া শনিবার দিন সে বাড়ি গেল। অপর্ণার গৃহিণীপনায় সে মনে মনে আশ্চর্য না হইয়া পারিল না। এই সাত-আট দিনের মধ্যেই অপর্ণা বাড়ির চেহারা একেবারে বদলাইয়া ফেলিয়াছে। তেলি-বাড়ির বুড়ি ঝিকে দিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে ঘরের দেওয়াল লেপিয়া ঠিক করাইয়াছে। দাওয়ায় মাটি ধরাইয়া দিয়াছে, রাঙা এলামাটি আনিয়া চারিধারে রঙ করাইয়াছে, নিজের হাতে এখানে তাক, ওখানে কুলুঙ্গি গাঁথিয়াছে, তক্তপোশের তলাকার রাশীকৃত ইঁদুরের মাটি নিজেই উঠাইয়া বাহিরে ফেলিয়া গোবর-মাটি লেপিয়া দিয়াছে। সারা বাড়ি যেন ঝকঝক তক তক করিতেছে। অথচ অপর্ণা জীবনে এই প্রথম মাটির ঘরে পা দিল। পূর্ব গৌরব যতই ক্ষুণ্ণ হউক, তবুও সে ধনীবংশের মেয়ে, বাপ-মায়ের আদরে লালিত, বাড়ি থাকিতে নিজের হাতে তাহাকে কখনও বিশেষ কিছু করিতে হইত না।

মাসখানেক ধরিয়া প্রতি শনিবারে বাড়ি যাতায়াত করিবার পর অপু দেখিল তাহার যাহা আয় ফি শনিবার বাড়ি যাওয়ার খরচ তাহাতে কুলায় না। সংসারে দশ-বারো টাকার বেশি মাসে এ পর্যন্ত সে দিতে পারে নাই। সে বোঝে—ইহাতে সংসার চালাইতে অপর্ণাকে দস্তুরমতো বেগ পাইতে হয়। অতএব ঘন ঘন বাড়ি যাওয়া বন্ধ করিল।

ডাকপিয়নের খাকির পোশাক যে বুকের মধ্যে হঠাৎ এরূপ ঢেউ তুলিতে পারে, ব্যগ্র আশার আশ্বাস দিয়াই পরমুহূর্তে নিরাশা ও দুঃখের অতলতলে নিমজ্জিত করিয়া দিতে পারে, পনেরো টাকা বেতনের আমহার্স্ট স্ট্রীট পোস্টাফিসের পিওন যে একদিন তাহার দুঃখ-সুখের বিধাতা হইবে, এ কথা কবে ভাবিয়াছিল? পূর্বে কালেভদ্রে মায়ের চিঠি আসিত, তাহার এজন্য এরূপ ব্যগ্র প্রতীক্ষার প্রয়োজন ছিল না। পরে মায়ের মৃত্যুর পর বৎসরখানেক তাহাকে একখানি পত্রও কেহ দেয় নাই। উঃ, কি দিনই গিয়াছে সেই এক বৎসর! মনে আছে, তখন রোজ সকালে চিঠির বাক্স বৃথা আশায় একবার করিয়া খোঁজ করিয়া হাসিমুখে পাশের ঘরের বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিত—আরে, বীরেন বোসের জন্যে তো এ বাসায় আর থাকা চলে না দেখছি!—রোজ রোজ যত চিঠি আসে তার অর্ধেক বীরেন বোসের নামে!

বন্ধু হাসিয়া বলিত—ওহে পাঁচজন থাকলেই চিঠিপত্র আসে পাঁচদিক থেকে। তোমার নেই কোনও চুলোয় কেউ, দেবে কে চিঠি?

বোধ হয় কথাটা রূঢ় সত্য বলিয়াই অপুর মনে আঘাত লাগিত কথাটায়। বীরেন বোসের নানা ছাঁদের চিঠিগুলি লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত—সাদা খাম, সবুজ খাম, হলদে খাম, মেয়েলি হাতের লেখা পোস্টকার্ড, এক-একবার হাতে তুলিয়া লোভ দমন করিতে না পারিয়া দেখিয়াছেও—ইতি তোমার দিদি, ইতি তোমার মা, আপনার স্নেহের ছোট বোন সুশী, ইত্যাদি। বীরেন বোস মিথ্যা বলে নাই, চারিদিকে আত্মীয় বন্ধু থাকিলেই রোজ পত্র আসে—তাহার চিঠি তো আর আকাশ হইতে পড়িবে না? আজকাল আর সে দিন নাই। পত্র লিখিবার লোক হইযাছে এতদিনে।

জন্মাষ্টমীর ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার কথা, কিন্তু দিনগুলো মাসের মতো দীর্ঘ।

অবশেষে জন্মাষ্টমীর ছুটি আসিয়া গেল। এডিটারকে বলিয়া বেলা তিনটার সময় আফিস হইতে বাহির হইয়া সে স্টেশনে আসিল। পথে নব-বিবাহিত বন্ধু অনাথবাবু বৈঠকখানা বাজার হইতে আম কিনিয়া উর্ধ্বশ্বাসে ট্রাম ধরিতে ছুটিতেছেন। অপুর কথার উত্তরে বলিলেন—সময় নেই, তিনটে পনেরো ফেল করলে আবার সেই চারটে পঁচিশ, দুঘণ্টা দেরি হয়ে যাবে বাড়ি পৌছতে—আচ্ছা আসি, নমস্কার!

দাড়িটা ঠিক কামানো হইয়াছে তো?

মুখ রৌদ্রে, ধুলায় ও ঘামে যে বিবর্ণ হইয়া যাইবে তাহার কি? কি গাধা-বোট গাড়িখানা, এতক্ষণে মোটে নৈহাটি? বাড়ি পৌছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইতে পারে। খুশির সহিত ভাবিল, চিঠি লিখে তো যাচ্ছি নে, হঠাৎ দেখে অপর্ণা একেবারে অবাক হয়ে যাবে এখন—

বাড়ি যখন পৌছিল, তখনও সন্ধ্যার কিছু দেরি। বধূ বাড়ি নাই, বোধ হয় নিবুপমাদেব বাড়ি কি পুকুরের ঘাটে গিয়াছে। কেহ কোথাও নাই। অপু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পুঁটলি নামাইয়া রাখিয়া সাবানখানা খুঁজিয়া বাহির করিয়া আগে হাত মুখ ও মাথা ধুইয়া ফেলিযা তাকের আয়না ও চিরুনির সাহায্যে টেরি কাটিল। পরে নিজের আগমনের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

আধঘণ্টা পরেই সে ফিরিল। বধূ ঘরের মধ্যে প্রদীপের সামনে মাদুব পাতিয়া বসিয়া কি বই পড়িতেছে। অপু পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। এটা অপুর পুরানো রোগ, মায়ের সঙ্গে কতবার এরকম করিয়াছে। হঠাৎ কি একটা শব্দে বধূ পিছন ফিরিয়া চাহিয়া ভয়ে ধড়মড় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে অপু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বধূ অপ্রতিভেব সুরে বলিল—ওমা তুমি! কখন—কই—তোমার তো—

অপু হাসিতে হাসিতে বলিল—কেমন জব্দ! আচ্ছা তো ভীতু!

বধূ ততক্ষণে সামলাইয়া লইয়া হাসি মুখে বলিল—বা রে, ওই রকম করে বুঝি আচমকা ভয় দেখাতে আছে? ক'টার গাড়িতে এলে এখন—তাই বুঝি আজ ছ-সাত দিন চিঠি দেওয়া হয় নি—আমি ভাবছি—

অপু বলিল—তারপর, তুমি কি রকম আছ, বলো? মায়ের চিঠিপত্র পেয়েছ?

—তুমি কিন্তু রোগা হয়ে গিয়েছ, অসুখ-বিসুখ হয়েছিল বুঝি?

—আমার এবারকার চিঠির কাগজটা কেমন? ভালো না? তোমার জন্যে এনেছি পঁচিশখানা। তারপর রাত্রে কি খাওয়াবে বলো?

—কি খাবে বলো? ঘি এনে রেখেছি, আলুপটলের ডালনা করি—আর দুধ আছে—

পরদিন সকালে উঠিয়া অপু দেখিয়া অবাক হইল, বাড়ির পিছনের উঠানে অপর্ণা ছোট ছোট বেড়া দিয়া শাকের ক্ষেত, বেগুনের ক্ষেত করিয়াছে। দাওয়ার ধারে ধারে গাঁদার চারা বসাইয়াছে।

রান্নাঘরের চালায় পুঁইলতা লাউলতা উঠাইয়া দিয়াছে। দেখাইয়া বলিল,—আজ পুঁইশাক খাওয়াব আমার গাছের! ওই দোপাটিগুলো দ্যাখো? কত বড়ো, না? নিরুপমা দিদি বীজ দিয়েছেন। আর একটা জিনিস দ্যাখো নি? এসো দেখাব—

অপুর সারা শরীরে একটা আনন্দের শিহরণ বহিল। অপর্ণা যেন তাহার মনের গোপন কথাটি জানিয়া বুঝিয়াই কোথা হইতে একটা ছোট চাঁপা গাছের ডাল আনিয়া মাটিতে পুঁতিয়াছে, দেখাইয়া বলিল—দ্যাখো কেমন—হবে না এখানে?

—হবে না আর কেন? আচ্ছা, এত ফুল থাকতে চাঁপা ফুলের ডাল যে পুঁততে গেলে?

অপর্ণা সলজ্জমুখে বলিল—জানি নে—যাও!

অপু তো লেখে নাই, পত্রে তো এ কথা অপর্ণাকে জানায় নাই যে, মিত্তির-বাড়ির কম্পাউন্ডের চাঁপা ফুল গাছটা তাহাকে কি কষ্টই না দিয়াছে এই দু-মাস! চাঁপা ফুল যে হঠাৎ তাহার এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, এ কথাটি মনে মনে অনুমান করিবার জন্য এই কর্মব্যস্ত, সদা হাসিমুখ মেয়েটির উপর তাহার মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল।

অপর্ণা বলিল—এখানে একটু বেড়া দিয়ে ঘিরে দেবে? মাগো, কি ছাগলের উৎপাতই তোমাদের দেশে! চারাগাছ থাকতে দেয় না, রোজ খেয়েদেয়ে সারা দুপুর কঞ্চি হাতে দাওয়ায় বসে ছাগল তাড়াই আর বই পড়ি—দুপুরে রোজ নিরুদি আসেন, ও বাড়ির মেয়েরা আসে, ভারি ভালো মেয়ে কিন্তু নিরুদিদি।

আজ সারাদিন ছিল বর্ষা। সন্ধ্যার পর একটানা বৃষ্টি নামিয়াছে, হয়তো বা সারা রাত্রি ধরিয়া বর্ষা চলিবে। বাহিরে কৃষ্ণাষ্টমীর অন্ধকার মেঘে ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। বধূ বলিল—রান্নাঘরে এসে বসবে? গরম গরম সেঁকে দি—। অপু বলিল—তা হবে না, আজ এসো আমরা দুজনে একপাতে খাবো! অপর্ণা প্রথমটা রাজি হইল না, অবশেষে স্বামীর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া একটা থালায় রুটি সাজাইয়া খাবার ঠাঁই করিল।

অপু দেখিয়া বলিল,—ও হবে না, তুমি আমার পাশে বসো, ওরকম বসলে চলবে না। আরও একটু—আরও—পরে সে বাঁ-হাতে অপর্ণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—এবার এসো দু-জনে খাই—

বধূ হাসিয়া বলিল—আচ্ছা তোমার বদখেয়ালও মাথায় আসে, মাগো মা! দেখতে তো খুব ভালোমানুষটি!

লাভের মধ্যে বধূর একরূপ খাওয়াই হইল না সেরাত্রে। অন্যমনস্ক অপু গল্প করিতে করিতে থালার রুটি উঠাইতে উঠাইতে প্রায় শেষ করিয়া ফেলিল—পাছে স্বামীর কম পড়িয়া যায় এই ভয়ে সে বেচারি খান-তিনের বেশি নিজের জন্য লইতে পারিল না। খাওয়া-দাওয়ার পর অপর্ণা বলিল—কই, কি বই এনেছ বললে, দেখি?

দু-জনেই কৌতুকপ্রিয় সমবয়সি সুস্থমন, বালকবালিকার মতো আমোদ করিতে, গল্প করিতে, সারারাত জাগিতে, অকারণে অর্থহীন বকিতে দুজনেরই সমান আগ্রহ সমান উৎসাহ। অপু একখানা নতুন-আনা বই খুলিয়া বলিল—পড়ো তো এই পদ্যটা?

অপর্ণা প্রদীপের সলতেটা চাঁপার কলির মতো আঙুল দিয়া উসকাইয়া দিয়া পিলসুজটা আরও নিকটে টানিয়া আনিল। পরে সে লজ্জা করিতেছে দেখিয়া অপু উৎসাহ দিবার জন্য বলিল—পড়ো না, কই দেখি?

অপর্ণা যে কবিতা এত সুন্দর পড়িতে পারে অপুর তাহা জানা ছিল না। সে ঈষৎ লজ্জাজড়িত স্বরে পড়িতেছিল—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা—

অপু পড়ার প্রশংসা করিতেই অপর্ণা বই মুড়িয়া বন্ধ করিল। স্বামীর দিকে উজ্জ্বলমুখে চাহিয়া কৌতুকের ভঙ্গিতে বলিল—থাকগে পড়া, একটা গান করো না!

অপু বলিল, একটা টিপ পরো না খুকি! ভারি সুন্দর মানাবে তোমার কপালে—

অপর্ণা সলজ্জ হাসিয়া বলিল—যাও—

—সত্যি বলছি অপর্ণা, আছে টিপ?—

—আমার বয়সে বুঝি টিপ পরে? আমার ছোট বোন শান্তির এখন টিপ পরবার বয়স তো—

কিন্তু শেষে তাহাকে টিপ পরিতেই হইল। সত্যই ভারি সুন্দর দেখাইতেছিল, প্রতিমার চোখের মতো টানা, আয়ত সুন্দর চোখ দুটির উপর দীর্ঘ, ঘনকালো, জোড়াভুরুর মাঝখানটিতে টিপ মানাইয়াছে কি সুন্দর! অপুর মনে হইল—এই মুখের জন্যই জগতের টিপ সৃষ্টি হইয়াছে—প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোয় এই টিপ-পরা মুখখানি বার-বার সতৃষ্ণ চোখে চাহিয়া দেখবার জন্যই।

অপর্ণা বলে—ছাই দেখাচ্ছে, এ বয়সে কি টিপ মানায়? কি করি পরের ছেলে, বললে তো আর কথা শুনবে না তুমি!

—না গো পরের মেয়ে, শোনো একটু সরে এসো তো—

—ভারি দুষ্টু—এত জ্বালাতনও তুমি করতে পার!...

অপু বলিল—আচ্ছা, আমায় দেখতে কেমন দেখায় বলো না সত্যি—কেমন মুখ আমার? ভালো, না পেঁচার মতো?

অপর্ণার মুখ কৌতুকে উজ্জ্বল দেখাইল—নাক সিঁটকাইল, বলিল—বিশ্রী, পেঁচার মতো।

অপু কৃত্রিম অভিমানের সুরে বলিল—আর তোমার মুখ তো ভালো, তা হলেই হয়ে গেল। যাই, শুইগে যাই—রাত কম হয় নি—কাল ভোরে আবার—

বধূ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এই রাত্রিটা গভীর দাগ দিয়া গিয়াছিল অপুর মনে। মাটির ঘরের আনাচে-কানাচে, গাছপালায় বাঁশবনে, ঝিম্ ঝিম্ নিশীথের একটানা বর্ষার ধারা। চারিধারই নিস্তব্ধ। পূর্বদিকের জানালা দিয়া বর্ষাসজল বাদল রাতের দমকা হাওয়া মাঝে মাঝে আসে—মাটির প্রদীপের আলোতে, খড়ের ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছাইয়া সে ও অপর্ণা!

অপু বলিল—দ্যাখো আজ রাত্রে মায়ের কথা মনে হয়—মা যদি আজ থাকতেন?

অপর্ণা শান্ত সুরে বলিল—মা সবই জানেন, যেখানে গিয়েছেন, সেখান থেকে সবই দেখছেন। পরে সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চোখ তুলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—দ্যাখো, আমি মাকে দেখেছি।

অপু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিল। অপর্ণার মুখে শান্ত, স্থির বিশ্বাস ও সরল পবিত্রতা ছাড়া আর কিছু নাই।

অপর্ণা বলিল—শোনো, একদিন কি মাসটায়, তোমার সেদিন চিঠি এলো দুপুর বেলা। বিকেলে আঁচল পেতে পানচালার পিঁড়েতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি—সেদিন সকালে উঠোনের ওই লাউগাছটাকে পুঁতেছি, কঞ্চি কেটে তাকে উঠিয়েছি, খেতে অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে, বুঝলে? স্বপ্নে দেখছি—একজন কে দেখতে বেশ সুন্দর, লালপেড়ে শাড়িপরা, কপালে সিঁদুর, তোমার মুখের মতো আদল, আমায় আদর করে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বলছেন—ও আবাগীর মেয়ে, অবেলায় শুয়ো না, ওঠো, অসুখ-বিসুখ হবে আবার? তারপর তিনি তাঁর হাতের সিঁদুরের কৌটো থেকে আমার কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিতেই আমি চমকে জেগে উঠলাম—এমন স্পষ্ট আর সত্যি বলে মনে হল যে, তাড়াতাড়ি কপালে হাত দিয়ে দেখতে গেলাম সিঁদুর লেগে আছে কিনা—দেখি কিছুই না—বুক ধড়াস্ করে উঠল—চারদিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখি সন্ধে হয়ে গিয়েছে—বাড়িতে কেউ

নেই—খানিকক্ষণ না পারি কিছু করতে—হাত পা যেন অবশ—তারপরে মনে হল, এ মা—আর কেউ না, ঠিক মা। মা এসেছিলেন এয়োতির সিঁদুর পরিয়ে দিতে। কাউকে বলি নি, আজ বললাম তোমায়।

বাহিরের বর্ষাধারার অবিশ্রান্ত রিম্ ঝিম্ শব্দ, একটা কি পতঙ্গ বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে তান রাখিয়া একটানা ডাকিয়া চলিয়াছে, মাঝে মাঝে পুবে-হাওয়ার দমকা, অপর্ণার মাথার চুলের গন্ধ। জীবনের এই সব মুহূর্ত বড়ো অদ্ভুত। অনভিজ্ঞ হইলেও অপু তাহা বুঝিল। হঠাৎ ক্ষণিক বিদ্যুৎচমকে যেন অন্ধকার পথের অনেকখানি নজরে পড়ে। এমন সব চিন্তা মনে আসে, সাধারণ অবস্থায়, সুস্থ মনে সারা জীবনেও সে-সব চিন্তা মনে আসিত না।...কেমন একটা রহস্য...আত্মার অদৃষ্টলিপি...একটা বিরাট অসীমতা...।

কিন্তু পরক্ষণেই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে কোনও কথা বলিল না। কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না, কেহই কোন কথা বলিল না।

খানিকটা পরে সে বলিল, আর একটা কবিতা পড়ো—শুনি বরং।

অপর্ণা বলিল—তুমি একটা গান করো—

অপু রবিঠাকুরের গান গাহিল একটা, দুইটা, তিনটা। তারপর আবার কথা, আবার গল্প। অপর্ণা হাসিয়া বলিল—আর রাত নেই কিন্তু—ফরসা হয়ে এল—

—ঘুম পাচ্ছে?

—না। তুমি একটা কাজ করো না? কাল আর যেয়ো না—

—অফিস কামাই করব? তা কি কখনও চলে?

ভোর হইয়া গেল। অপর্ণা উঠিতে যাইতেছিল, অপু কোন্ সময় ইতিমধ্যে তাহার আঁচলের সঙ্গে নিজের কাপড়ের সঙ্গে গিঁট বাঁধিয়া রাখিয়াছে, উঠিতে গিয়া টান পড়িল। অপর্ণা হাসিয়া বলিল—ওমা তুমি কি! আচ্ছা দুষ্টু তো...এখুনি হারানের মা কাজ করতে আসবে—বুড়ি কি ভাববে বলো দিকি? ভাববে, এত বেলা অবধি ঘরের মধ্যে—মাগো মা, ছাড়ো, লজ্জা করে—ছিঃ!

অপু ততক্ষণে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

—ছাড়ো, ছাড়ো, লক্ষ্মী—ছিঃ—এখুনি এলো বলে বুড়ি, পায়ে পড়ি তোমার ছাড়ো—

অপু নির্বিকার।

এমন সময় বাহিরে হারানের মায়ের গলা শোনা গেল। অপর্ণা ব্যস্তভাবে মিনতির সুরে বলিল—ওই এসেছে বুড়ি—ছাড়ো ছিঃ—লক্ষ্মীটি—ওরকম দুষ্টুমি করে না—লক্ষ্মী—

হারানের মা কপাটের গায়ে ধাক্কা দিয়া বলিল—ও বৌমা, ভোর হয়ে গিয়েছে। ওঠো, ওঠো, ঘড়া ঘটিগুলো বার করে দেবে না?

অপু হাসিয়া উঠিয়া আঁচলের গিঁট খুলিয়া দিল।

অফিস কামাই করিয়া সে-দিনটা অপু বাড়িতেই রহিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে স্বাস্থ্য প্রদর্শনী উপলক্ষে খুব ভিড়। অপু অনেকদিন হইতে ইনস্টিটিউটের সভ্য, তাহাদের জনকয়েকের উপর শিশুমঙ্গল ও খাদ্য-বিভাগের তত্ত্বাবধানের ভার আছে। দুপুর হইতে সে এই কাজে লাগিয়া আছে। মন্মথ বি.এ. পাস করিয়া অ্যাটর্নির আর্টিকল্‌ড্ ক্লার্ক হইয়াছে। তাহার সহিত একদিন ইনস্টিটিউটের বসিবার ঘরে ঘোর তর্ক। অপুর দৃঢ় বিশ্বাস—যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইবে। বিলাতে লয়েড জর্জ বলিয়াছেন, যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষকে আমরা আর

পদানত করিয়া রাখিব না। ভারতকে দিয়া আর ক্রীতদাসের কার্য করাইয়া লইলে চলিবে না। **Indians must not remain as hewers of wood and drawers of water.**

এই সময়েই একদিন ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরিতে কাগজ খুলিয়া একটা সংবাদ দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। জোয়ান অব আর্ককে রোমান ক্যাথলিক যাজকশক্তি তাঁহাদের ধর্মসম্প্রদায়ের সাধুর তালিকাভুক্ত করিয়াছেন।

তার শৈশবের আনন্দ-মুহূর্তের সঙ্গিনী সেই পল্লীবালিকা জোয়ান—ইছামতীর ধারে শান্ত বাবলা-বনের ছায়ায় বসিয়া শৈশবের সে স্বপ্নভরা দিনগুলিতে যাহার সঙ্গে প্রথম পরিচয়! ইহার পর সে একদিন সিনেমাতে জোয়ান অব আর্কের বাৎসরিক স্মৃতি উৎসব দেখিল। ডম্‌রেমির নিভৃত পল্লীপ্রান্তে ফ্রান্সের সকল প্রদেশ হইতে লোকজন জড়ো হইয়াছে—পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে কত নরনারী আসিয়াছে...সামরিক পোশাকে সজ্জিত ফরাসি সৈনিক কর্মচারীর দল...সবসুদ্ধ মিলিয়া এক মাইল দীর্ঘ বিরাট শোভাযাত্রা...জোয়ানের সঙ্গে তার নাড়ীর কি যেন যোগ...জোয়ানের সম্মানে তার নিজের বুক যেন গর্বে ফুলিয়া উঠিতেছিল...শৈশবের স্বপ্নের সে মোহ অপু এখনও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

বড়ো হইয়া অবধি সে এই মেয়েটিকে কি শ্রদ্ধার চোখে ভক্তির চোখে দেখিয়া আসিয়াছে এতদিন, সে-কথা জানিত এক অনিল—নতুবা কল্পনা যাহাদের পঙ্গু, মন মিনমিনে, পানসে—তাহাদের কাছে সে-কথা তুলিয়া লাভ কি? কলেজে পড়িবার সময় সে বড়ো ইতিহাসে জোয়ানের বিস্তৃত বিবরণ পড়িয়াছে—অতীত শতাব্দীর সেই অবুঝ নিষ্ঠুরতা, ধর্মমতের গোঁড়ামি, খুঁটিতে বাঁধিয়া হৃদয়হীন দাহন—সূর্যদেবের রথচক্রের দ্রুত আবর্তনে অসীম আকাশে যেমন দুপুর হয় বৈকাল, বৈকাল হয় রাত্রি, রাত্রি হয় প্রভাত—মহাকালের রথচক্রের আবর্তনে এক শতাব্দীর অন্ধকারপুঞ্জ তেমনি পরের শতাব্দীতে দূরীভূত হইয়া যাইতেছে। সত্যের শুকতারা একদিন যে প্রকাশ হইবেই, জীবনের দুঃখদৈন্যের অন্ধকার শুধু যে প্রভাতেরই অগ্রদূত—কলকাকলিময়, ফুলফোটা অমৃতঝরা প্রভাত।

অন্যমনস্ক মনে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সে খাদ্য-বিভাগের ঘরে ঢুকিতে যাইতেছে, কে তাহাকে ডাকিল। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া প্রথমটা চিনিতে পারিল না—পরে বিস্ময়ের সুরে বলিল—প্রীতি, না? এগজিবিশন দেখতে এসেছিলে বুঝি? ভালো আছ?

প্রীতি অনেক বড়ো হইয়াছে। দেখিয়া বুঝিল, বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সে সঙ্গিনী প্রৌঢ়া মহিলাকে ডাকিয়া বলিল—মা, আমার মাস্টার মশায় অপূর্ববাবু—সেই অপূর্ববাবু।

অপু প্রণাম করিল। প্রীতি বলিল—আচ্ছা আপনার রাগ তো? এক কথায় ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন, দেখুন! কত ছোট ছিলুম, বুঝতুম কি কিছু? তারপর আপনার কত খোঁজ করেছিলুম, আর কোনও সন্ধানই কেউ বলতে পারলে না। আপনি আজকাল কি করছেন মাস্টার মশায়?

—ছেলেও পড়াই, রাত্রে খবরের কাগজের আপিসে চাকরিও করি—

—আচ্ছা মাস্টার মশাই, আপনাকে যদি বলি, আমাদের বাড়ি কি আপনি আর যাবেন না?

অপুর মনে পূর্বতন ছাত্রীর উপর কেমন একটা স্নেহ আসিল। কথা গুছাইয়া বলিতে জানিত না, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছিল সে সময়—তাহারও অত সহজে রাগ করা ঠিক হয় নাই। সে বলিল—তুমি অত অপ্রতিভ ভাবে কথা বলছ কেন প্রীতি! দোষ আমারই, তুমি না হয় ছেলেমানুষ ছিলে, আমার রাগ করা উচিত হয় নি—

ঠিকানা বিনিময়ের পর প্রীতি পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

আবার অপুর এ-কথা মনে না হইয়া পারিল না—কাল, মহাকাল, সবারই মধ্যে পরিবর্তন আনিয়া দিবে...তোমার বিচারের অধিকার কি?

আরও মাস দুই কোন রকমে কাটাইয়া অপু পূজার সময় দেশে গেল। সেদিন ষষ্ঠী, বাড়ির

উঠানে পা দিয়া দেখিল পাড়ার একদল মেয়ে ঘরের দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া হাসিকলরব করিতেছে—অপু উপস্থিত হইতে অপর্ণা ঘোমটা টানিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। পাড়ার মেয়েদের সে আজ ষষ্ঠী উপলক্ষে বৈকালিক জলযোগের নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের হাতে সকলকে আলতা সিঁদুর পরাইয়াছে। হাসিয়া বলিল—ভাগ্যিস এলে! ভাবছিলাম এমন কলার বড়াটা আজ ভাজলাম—

—সত্যি, কই দেখি?

—বা রে, হাত মুখ ধোও—ঠাণ্ডা হও—অমন পেটুক কেন তুমি?...পেটুক গোপাল কোথাকার!

পরে সে রেকাবিতে খাবার আনিয়া বলিল, এগুলো খেয়ে ফেলো, তারপর আরও দেব—দ্যাখো তো খেয়ে, মিষ্টি কম হয় নি তো?—তোমার তো আবার একটুখানি গুড়ে হবে না!

খাইতে খাইতে অপু ভাবিল—বেশ তো শিখেছে করতে! বেশ—

পরে দেওয়ালের দিকে চোখ পড়াতে বলিল—বাঃ, ও-রকম আলপনা দিয়েছে কে? ভারি সুন্দর তো!

অপর্ণা মৃদু হাসিয়া বলিল—ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপুজোতে তো এলে না! আমি বাড়িতে পুজো করলাম,—মা করতেন, সিঁদুরমাখা কাঠা দেখি তোলা রয়েছে, তাতে নতুন ধান পেতে—বামুন খাওয়ালাম। তুমি এলেও দুটি খেতে পেতে গো—তারই ওই আলপনা—

—তাই তো! তুমি ভারি গিন্নি হয়ে উঠেছ দেখছি! লক্ষ্মীপুজো, লোক খাওয়ানো—আমার কিন্তু এসব ভারি ভালো লাগে অপর্ণা—সত্যি, মাও খুব ভালোবাসতেন—একবার তখন আমরা এখানে নতুন এসেছি—একজন বুড়োমতো লোক আমাদের উঠোনের ধারে এসে দাঁড়িয়ে বলে—খোকা ক্ষিদে পেয়েছে, দুটো মুড়ি খাওয়াতে পারো?—আমি মাকে গিয়ে বললাম, মা, একজন মুড়ি খেতে চাচ্ছে, ওকে খানকতক রুটি করে খাওয়ালে ভারি খুশি হবে—খাওয়াবে মা? মা কি করলেন বলো তো?

—রুটি তৈরি করে বুঝি—

—তা নয়। মা একটু করে সরের ঘি করে রাখতেন, আমি বোর্ডিং থেকে বাড়ি-টাড়ি এলে পাতে দিতেন। আমায় খুশি করবার জন্য মা সেই ঘি দিয়ে আট-দশখানা পরোটা ভেজে লোকটাকে ডেকে, দাওয়ার কোলে পিঁড়ি পেতে খেতে দিলেন। লোকটা তো অবাক, তার মুখের এমন ভাব হল!

রাত্রে অপর্ণা বলিল—দ্যাখো, মা চিঠি লিখেছেন,—পুজোর পর মুরারিদা আসবেন নিতে, পাঁচ-ছ'মাস যাই নি, তুমি যাবে আমাদের ওখানে?

অপুর বড়ো অভিমান হইল। সে তো আশা করিয়া পূজার সময় বাড়ি আসিল, আর এদিকে কিনা অপর্ণা বাপের বাড়ি যাইবার জন্য পা বাড়াইয়া আছে! সে-ই তাহা হইলে ভাবিয়া মরে, অপর্ণার কাছে বাপের বাড়ি যাওয়াটাই অধিকতর লোভনীয়!

অপু উদাস সুরে বলিল—বেশ, যাও। আমার যাওয়া ঘটবে না, ছুটি নেই এখন। কথাটা শেষ করিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া বই পড়িতে লাগিল।

অপর্ণা খানিকক্ষণ পরে বলিল—এবারে যে বইগুলো এনেছ আমার জন্যে, ওর মধ্যে একখানা 'চয়নিকা' তো আনলে না? সেই যে সে-বার বলে গেলে জন্মাষ্টমীর সময়? এক-আধ কথার জবাব পাইয়া ভাবিল সারা দিনের কষ্টে স্বামীর হয়তো ঘুম আসিতেছে। তখন সেও ঘুমাইয়া পড়িল।

দশমীর পরদিনই মুরারি আসিয়া হাজির। জামাইকেও যাইতে হইবে, অপর্ণার মা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, ইত্যাদি নানা পীড়াপীড়ি শুরু করিল। অপু বলিল—পাগল! ছুটি কোথায় যে যাব আমি? বোনকে নিতে এসেছ, বোনকেই নিয়ে যাও ভাই—আমরা গরিব চাক্‌রে লোক, তোমাদের মতো জমিদার নই—আমাদের কি গেলে চলে?

অপর্ণা বুঝিয়াছিল স্বামী চটিয়াছে, এ অবস্থায় তাহার যাইবার ইচ্ছা ছিল না আদৌ, কিন্তু বড়ো

ভাই লইতে আসিয়াছে সে কি করিয়াই বা 'না' বলে? দোটানার মধ্যে সে বড়ো মুশকিলে পড়িল। স্বামীকে বলিল—দ্যাখো আমি যেতাম না। কিন্তু মুরারিদা এসেছেন, আমি কি কিছু বলতে পারি?...রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি, তুমি এখন না যাও, কালীপুজোর ছুটিতে অবিশ্যি করে যেয়ো—ভুলো না যেন।

অপর্ণা চলিয়া যাইবার পর মনসাপোতা আর একদিনও ভালো লাগিল না। কিন্তু বাধ্য হইয়া সে রাত্রিটা সেখানে কাটাইতে হইল, কারণ অপর্ণারা গেল বৈকালের ট্রেনে। কোনদিন লুচি হয় না কিন্তু দাদার কাছে স্বামীকে ছোট হইতে না হয়, এই ভাবিয়া অপর্ণা দুইদিনই রাত্রে লুচির ব্যবস্থা করিয়াছিল—আজও স্বামীর খাবার আলাদা করিয়া ঘরের কোণে ঢাকিয়া রাখিয়া গিয়াছে। লুচি কখানা খাইয়াই অপু উদাস মনে জানালার কাছে আসিয়া বসিল। খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, বাড়ির উঠানের গাছে গাছে এখনও কি পাখি ডাকিতেছে, শূন্য ঘর, শূন্য শয্যাপ্রান্ত—অপুর চোখে প্রায় জল আসিল। অপর্ণা সব বুঝিয়া তাহাকে এই কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া গেল। বড়োলোকের মেয়ে কিনা?...আচ্ছা বেশ।...অভিমানের মুখে সে এ কথা ভুলিয়া গেল যে, অপর্ণা আজ ছ'মাস এই শূন্য বাড়িতে শূন্য শয্যায় তাহারই মুখ চাহিয়া কাটাইয়াছে!

পরদিন প্রত্যুষে অপু কলিকাতা রওনা হইল। সেখানে দিনচারেক পরেই অপর্ণার এক পত্র আসিল—অপু সে পত্রের কোনও জবাব দিল না। দিন পাঁচ-ছয় পরে অপর্ণার আর একখানা চিঠি। উত্তর না পাইয়া ব্যস্ত আছে, শরীর ভালো আছে তো? অসুখ-বিসুখের সময়, কেমন আছে পত্রপাঠ যেন জানায়, নতুবা বড়ো দুর্ভাবনার মধ্যে থাকিতে হইতেছে। তাহারও কোন জবাব গেল না।

মাসখানেক কাটিল।

কার্তিক মাসের শেষের দিকে একদিন একখানা দীর্ঘ পত্র আসিল। অপর্ণা লিখিয়াছে—ওগো আমার বুকে এমন পাষাণ চাপিয়ে আর কতদিন রাখবে, আমি এত কি অপরাধ করেছি তোমার কাছে?...আজ একমাসের ওপর হল তোমার একছত্র লেখা পাই নি, কি করে দিন কাটাচ্ছি, তা কাকে জানাব? দ্যাখো, যদি কোন দোষই করে থাকি, তুমি যদি আমার উপর রাগ করবে তবে ত্রিভুবনে আর কার কাছে দাঁড়াই বলো তো?

অপু ভাবিল—বেশ জব্দ, কেন, যাও বাপের বাড়ি!—আমাকে চাইবার দরকার কি, কে আমি? সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব পুলকের ভাব মনের কোণে দেখা দিল—পথে, ট্রামে, আপিসে, বাসায়, সব সময় সকল অবস্থাতেই মনে না হইয়া পারিল না যে পৃথিবীতে একজন কেহ আছে, যে, সর্বদা তাহার জন্য ভাবিতেছে, তাহারই চিঠি না পাইলে সে-জনের দিন কাটিতে চাহে না, জীবন বিস্বাদ লাগে। সে যে হঠাৎ এক সুন্দরী তরুণীর নিকট এতটা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে—এ অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অভিনব ও অদ্ভুত তাহার কাছে। অতএব তাহাকে আরও ভাবাও, আরও কষ্ট দাও, তাহার রজনী আরও বিনিদ্র করিয়া তোল।

সুতরাং অপর্ণার মিনতি বৃথা হইল। অপু চিঠির জবাব দিল না।

এদিকে অপুদের আপিসের অবস্থা বড়ো খারাপ হইয়া আসিল। কাগজ উঠিয়া যাইবার জোগাড়, একদিন স্বত্বাধিকারী তাহাদের কয়েকজনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কি করা উচিত সে-সম্বন্ধে পরামর্শ। কথাবার্তার গতিকে বুঝিল কাগজের পরমায়ু আর বেশি দিন নয়। তাহার একজন সহকর্মী বাহিরে আসিয়া বলিল—এ বাজারে চাকরিটুকু গেলে মশাই দাঁড়াবার জো নেই একেবারে—বোনের বিয়েতে টাকা ধার, সুদে-আসলে অনেক দাঁড়িয়েছে, সুদটা দিয়ে থামিয়ে রাখার উপায় যদি না থাকে, মহাজন বাড়ি ক্রোক করে দেবে মশাই, কি যে করি।

ইতিমধ্যে সে একদিন লীলাদের বাড়ি গেল। যাওয়া সেখানে ঘটে নাই প্রায় বছর দুই, হঠাৎ

অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাকে দেখিয়া লীলা আনন্দ ও বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিল—এ কি আপনি! আজ নিতান্তই পথ ভুলে বুঝি এদিকে এসে পড়লেন?

অপু যে শুধু অপ্রতিভ হইল তাহা নয়, কোথায় কেন সে নিজেকে অপরাধী বিবেচনা করিল। একটুখানি আনাড়ির মতো হাসি ছাড়া লীলার কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। লীলা বলিল—এবার না হয় আপনার পরীক্ষার বছর, তার আগে তো অনায়াসেই আসতে পারতেন?

অপু মৃদু হাসিয়া বলিল—কিসের পরীক্ষা? সে সব তো আজ বছর দুই ছেড়ে দিয়েছি। এখন খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করি।

লীলা প্রথমটা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কথাটা যেন বিশ্বাস করিল না, পরে দুঃখিতভাবে বলিল,—কেন, কি জন্য ছাড়লেন পড়া, শুনি? আ-প-নি পড়া ছেড়েছেন!

লীলার চোখের এই দৃষ্টিটা অপুর প্রাণে কেমন একটা বেদনার সৃষ্টি করিল—অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার দৃষ্টি, তবুও সে হাসিমুখে কৌতুকের সুরে বলিল—এমনি দিলুম ছেড়ে, ভালো লাগে না আর, কি হবে পড়ে?

তাহার এই হালকা কৌতুকের সুরে লীলা মনে আঘাত পাইল, অপূর্ব কি ঠিক সেই পুরানো দিনের অপূর্বই আছে? না যেন—?

অপু বলিল—তুমি তো পড়ছ, না?

লীলা নিজের সম্বন্ধে কোন কথা হঠাৎ বলিতে চায় না, অপুর প্রশ্নের উত্তরে সহজভাবে বলিল—এবার আই.এ. পাশ করেছি, থার্ড ইয়ারে পড়ছি। আপনি আজকাল পুরোনো বাসায় থাকেন, না, আর কোথাও উঠে গিয়েছেন?

লীলার মা ও মাসিমা আসিলেন। লীলা নিজের আঁকা ছবি দেখাইল। বলিল—এবার আপনার মুখে 'স্বর্গ হইতে বিদায়'টা শুনব, মা আর মাসিমা সেই জন্য এসেছেন।

আরও খানিক পরে অপু বিদায় লইয়া বাহিরে আসিল, লীলা বৈঠকখানার দোর পর্যন্ত সঙ্গে আসিল, অপু হাসিয়া বলিল—লীলা, আচ্ছা ছেলেবেলায় তোমাদের বাড়িতে কোন বিয়েতে তুমি একটা হাসির কবিতা বলেছিলে, মনে আছে? মনে আছে সে কবিতাটা?

—উঃ! সে আপনি মনে করে রেখেছেন এতদিন! সে সব কি আজকের কথা?

অপু অনেকটা আপনমনেই অন্যমনস্কভাবে বলিল—আর একবার তুমি তোমার জন্যে আনা দুধ অর্ধেকটা খাওয়ালে আমায় জোর করে, শুনলে না কিছুতেই—ওঃ, দেখতে দেখতে কত বছর হয়ে গেল!

বলিয়া সে হাসিল, কিন্তু লীলা কোনও কথা বলিল না। অপু একবার পিছন দিকে চাহিল, লীলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কি যেন দেখিতেছে।

ফিরিবার পথে একটা কথা তাহার বারবার মনে আসিতেছিল। অপর্ণা সুন্দরী বটে, কিন্তু লীলার সঙ্গে এ পর্যন্ত দেখা কোন মেয়ের তুলনা হয় না, হওয়া অসম্ভব। লীলার রূপ মানুষের মতো নয় যেন, দেবীর মতো রূপ, মুখের অনুপম শ্রীতে, চোখের ও ভ্রূর ভঙ্গিতে, গায়ের রং-এ, গলার সুরে, গতির ছন্দে।

অপু বুঝিল সে লীলাকে ভালোবাসে, গভীর ভাবে ভালোবাসে, কিন্তু তা আবেগহীন, শান্ত, ধীর ভালোবাসা। মনে তৃপ্তি আনে, স্নিগ্ধ আনন্দ আনে, কিন্তু শিরায় উপশিরায় রক্তের তাণ্ডব নর্তন তোলে না। লীলা তাহার বাল্যের সাথী, তাহার উপর মায়ের পেটের বোনের মতো একটা মমতা, স্নেহ ও অনুকম্পা, একটা মাধুর্য-ভরা ভালোবাসা।

দিন কয়েক পরে, একদিন লীলার দাদামশায়ের এক দারোয়ান আসিয়া তাহাকে একখানা পত্র দিল, উপরে লীলার হাতের ঠিকানা লেখা। পত্রখানা সে খুলিয়া পড়িল। দু-লাইনের পত্র, একবার বিশেষ প্রয়োজনে আজ বা কাল ভবানীপুরের বাড়িতে যাইতে লিখিয়াছে।

লীলা সাদাসিধা লালপাড় শাড়ি পরিয়া মাঝের ছোট ঘরে তাহার সঙ্গে দেখা করিল। যাহাই সে পরে, তাহাতেই তাহাকে কি সুন্দর না মানায়! সকাল আটটা, লীলা বোধহয় বেশিক্ষণ ঘুম হইতে উঠে নাই, রাত্রির নিদ্রালুতা এখনও যেন ডাগর ডাগর সুন্দর চোখ হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই, মাথার চুল অবিন্যস্ত, ঘাড়ের দিকে ঈষৎ এলাইয়া পড়িয়াছে, প্রভাতের পদ্মের মতো মুখের পাশে চূর্ণকুন্তলের দু-এক গাছা। অপু হাসি-মুখে বলিল—থার্ড ইয়ার বলে বুঝি লেখাপড়া ঘুচেছে? আটটার সময় ঘুম ভাঙল? না, এখনও ঠিক ভাঙে নি?

লীলা যে কত পছন্দ করে অপুকে তাহার এই সহজ আনন্দ, খুশি ও হালকা হাসির আবহাওয়ার জন্য! ছেলেবেলাতেও সে দেখিয়াছে, শত দুঃখের মধ্যেও অপুর আনন্দ, উজ্জ্বলতা ও কৌতুকপ্রবণ মনের খুশি কেহ আটকাইয়া রাখিতে পারিত না, এখনও তাই, একরাশ বাহিরের আলো ও তারুণ্যের সজীব জীবনানন্দ সে সঙ্গে করিয়া আনে যেন, যখনই আসে—আপনা-আপনিই এসব কথা লীলার মনে হইল। তাহার মনে পড়িল, মায়ের মৃত্যুর খবরটা সে এই রকম হাসিমুখেই দিয়াছিল লালদিঘির মোড়ে।

—আসুন, বসুন, বসুন। কুড়েমি করে ঘুমুই নি, কাল রাত্রে বড়ো মামিমার সঙ্গে বায়োস্কোপে গিয়েছিলাম সাড়ে-ন'টার শো'তে। ফিরতে হয়ে গেল পৌনে বারো, ঘুম আসতে দেড়টা। বসুন চা আনি।

জাপানী গালার সুদৃশ্য চায়ের বাসনে সে চা আনিল। সঙ্গে পাঁউরুটি-টোস্ট, খোলাসুদ্ধ ডিম, কি এক প্রকার শাক, আধখানা ভাঙা আলু—সব সিদ্ধ, ধোঁয়া উঠিতেছে। অপু বলিল—এসব সাহেবি বন্দোবস্ত বোধ হয় তোমার দাদামশায়ের, লীলা? ডিম, তা আবার খোলাসুদ্ধ, এ শাকটা কি?

লীলা হাসিমুখে বলিল—ওটা লেটুস্। দাঁড়ান ডিম ছাড়িয়ে দি। আপনার দাড়ির কাছে ও কাটা দাগটা কিসের? কামাবার সময় কেটে ফেলেছিলেন বুঝি?

অপু বলিল—ও কিছু না, এমনি কিসের। বোসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, তুমি চা খাবে না?

লীলার ছোট ভাই ঘরে ঢুকিয়া অপুর দিকে চাহিয়া হাসিল, নাম বিমলেন্দু, দশ-এগারো বছরের সুশ্রী বালক। লীলা তাহাকে চা ঢালিয়া দিল, পরে তিনজনে নানা গল্প করিল। লীলা নিজের আঁকা কতকগুলি ছবি দেখাইল, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলিল। সে এম.এ. পাশ করিবে, নয় তো বি.এ. পাশ করিয়া বিদেশে যাইতে চায়, দাদামশায়কে রাজি করাইয়া লইবে, ইউরোপের বড়ো আর্ট গ্যালারিগুলির ছবি দেখিবে, ফিরিয়া আসিয়া অজন্তা দেখিতে যাইবে, তার আগে নয়। একটা আলমারি দেখাইয়া বলিল—দেখুন না এই বইগুলো?...ভ্যাসারির লাইভস্. .এডিশনটা কেমন?...ছবিগুলো দেখুন—সেন্ট অ্যান্টনির ছবিটা আমার বড়ো ভালো লাগে, কেমন একটা তপস্যাস্তব্ধ ভাব, না?—ইনস্টলমেন্ট সিসটেমে এগুলো কিনছি—আপনি কিনবেন কিছু? ওদের ক্যানভাসার আমাদের বাড়ি আসে, তা হলে বলে দি—।

অপু বলিল—কত করে মাসে?...ভ্যাসারির এডিশনটা তাহলে না হয়—

—এটা কেন কিনবেন? এটা তো আমার কাছেই রয়েছে—আপনার যখন দরকার হবে, নেবেন—আমার কাছে যা যা আছে, তা আপনাকে কিনতে হবে কেন?—দাঁড়ান, আর একটা বইয়ের একখানা ছবি দেখাই—

অপু ছবিটার দিক হইতে আর একবার লীলার দিকে চাহিয়া দেখিল—বতিচেল্লির প্রিন্সেস দেস্ত্ খুব সুন্দরী বটে, কিন্তু বতিচেল্লির বা দ্য-ভিঞ্চির প্রতিভা লইয়া যদি লীলার এই অপূর্ব সুন্দর মুখ, এই যৌবন-পুষ্পিত দেহলতা ফুটাইয়া তুলিতে পারিত কেউ!...

কথাটা সে বলিয়াই ফেলিল—আমি কি ভাবছি বলব লীলা? আমি যদি ছবি আঁকতে পারতাম, তোমাকে মডেল করে ছবি আঁকতাম—

লীলা সে কথার কোন জবাব না দিয়া হঠাৎ বলিল—ভালো কথা, আচ্ছা অপূর্ববাবু, একটা চাকরি কোথাও যদি পাওয়া যায়, তো করবেন?

অপু বলিল—কেন করব না; কিসের চাকরি?

লীলা বিবরণটা বলিয়া গেল। তাহার দাদামশায় একটা বড়ো স্টেটের অ্যাটর্নি, তাঁদের অফিসে একজন সেক্রেটারি দরকার—মাইনে দেড়শো টাকা, চাকরিটা দাদামশায়ের হাতে, লীলা বলিলে এখনই হইয়া যায়, সেই জন্যই আজ তাহাকে এখানে ডাকিয়া আনা!

অপুর মনে পড়িল, সেদিনকার কথায় সে লীলার কাছে নিজের বর্তমান চাকুরির দুরবস্থা ও খবরের কাগজখানা উঠিয়া যাওয়ার কথাটা অন্য কি সম্পর্কে একবারটি তুলিয়াছিল।

লীলা বলিল—সেদিন রাত্রে আমি তাঁর মুখে কথাটা শুনলাম, আজ সকালেই আপনাকে পত্র পাঠিয়ে দিয়েছি, আপনি রাজি আছেন তো? আসুন, দাদামশায়ের কাছে আপনাকে নিয়ে যাই, ওঁর একখানা চিঠিতে হয়ে যাবে।

কৃতজ্ঞতায় অপুর মন ভরিয়া গেল। এত কথার মধ্যে লীলা চাকুরি যাওয়ার কথাটাই কি ভাবে মনে ধরিয়া বসিয়াছিল।

লীলা বলিল—আপনি আজ দুপুরে এখানে না খেয়ে যাবেন না! আসুন,—পাখাটা দয়া করে টিপে দিন না।

কিন্তু চাকুরি হইল না। এসব ব্যাপারের অভিজ্ঞতা না থাকায় লীলা একটু ভুল করিয়াছিল, দাদামশায়কে বলিয়া রাখে নাই অপুর কথা। দিন দুই আগে লোক লওয়া হইয়া গিয়াছে। সে খুব দুঃখিত হইল, একটু অপ্রতিভও হইল। অপু দুঃখিত হইল লীলার জন্য। বেচারি লীলা! সংসারের কোন অভিজ্ঞতা তাহার কি আছে? একটা চাকুরি খালি থাকিলে যে কতখানা উমেদারির দরখাস্ত পড়ে, বড়োলোকের মেয়ে, তাহার খবর কি করিয়া জানিবে?

লীলা বলিল—আপনি এক কাজ করুন না, আমার কথা রাখতে হবে কিন্তু, ছেলেবেলার মতো একগুঁয়ে হলে কিন্তু চলবে না—প্রাইভেটে বি.এ.টা দিয়ে দিন। আপনার পক্ষে সেটা কঠিন না কিছু।

অপু বলিল—বেশ দেব।

লীলা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—ঠিক? অনার ব্রাইট?

—অনার ব্রাইট।

শীতের অনেক দেরি, কিন্তু এরই মধ্যে লীলাদের গাড়িবারান্দার পাশে জাফরিতে ওঠানো মার্শালনীলের লতায় ফুল দেখা দিয়াছে, বারান্দার সিঁড়ির দু-পাশের টবে বড়ো বড়ো পল নিরোন ও ব্ল্যাক প্রিন্স ফুটিয়াছে। বর্ষাশেষে চাইনিজ ফ্যান-পামের পাতাগুলো ঘন সবুজ।

পদ্মপুকুর রোডে পা দিয়া অপুর চোখ জলে ভরিয়া আসিল। লীলা, ছেলেমানুষ লীলা—সে কি জানে সংসারের রূঢ়তা ও নিষ্ঠুর সংঘর্ষের কাহিনী? আজ তাহার মনে হইল, লীলার পায়ে একটা কাঁটা ফুটিলে সেটা তুলিয়া দিবার জন্য সে নিজের সুখ শান্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য কবিতে পারে।

বিবাহের পর লীলার সঙ্গে এই প্রথম দেখা, কিন্তু দু-একবার বলি বলি করিয়াও অপু বিবাহের কথা বলিতে পারিল না, অথচ সে নিজে ভালোই বোঝে যে, না বলিতে পারিবার কোন সংগত কারণ নাই।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। পুনরায় পূজার বিলম্ব অতি সামান্যই।

শনিবার। অনেক অফিস আজ বন্ধ হইবে, অনেকগুলি সম্মুখের মঙ্গলবারে বন্ধ। দোকানে দোকানে খুব ভিড়—ঘণ্টাখানেক পথ হাঁটিলে হ্যান্ডবিল হাত পাতিয়া লইতে লইতে ঝুড়িখানেক হইয়া উঠে। একটা নতুন স্বদেশী দেশলাইয়ের কারখানা পথে পথে জাঁকালো বিজ্ঞাপন মারিয়াছে।

আমড়াতলা গলির বিখ্যাত ধনী ব্যবসাদার নকুলেশ্বর শীলের প্রাসাদোপম সুবৃহৎ অট্টালিকার নিম্নতলেই ইঁহাদের আফিস। অনেকগুলি ঘর ও দুটা বড়ো হল কর্মচারীতে ভর্তি। দিনমানেও ঘরগুলির মধ্যে ভালো আলো যায় না বলিয়া বেলা চারটা না বাজিতেই ইলেকট্রিক আলো জ্বলিতেছে।

ছোকরা টাইপিস্ট নৃপেন সন্তর্পণে পর্দা ঠেলিয়া ম্যানেজারের ঘরে ঢুকিল। ম্যানেজার নকুলেশ্বর শীলের বড়ো জামাই দেবেন্দ্রবাবু। ভারি কড়া মেজাজের মানুষ। বয়স পঞ্চাশ ছাড়াইয়াছে, দোহারা ধরনের চেহারা। বেশ ফরসা, মাথায় টাক। এক কলমের খোঁচায় লোকের চাকরি খাইতে এমন পারদর্শী লোক খুব অল্পই দেখা যায়। দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন—কি হে নৃপেন?

নৃপেন ভূমিকাস্বরূপ দুইখানা টাইপ-ছাপা কি কাগজ মঞ্জুর করাইবার ছলে তাঁহার টেবিলের উপর রাখিল।

সহি শেষ হইলে নৃপেন একটু উশখুশ করিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া আরক্তমুখে বলিল—আমি—এই—আজ বাড়ি যাব—একটু সকালে, চারটেতে গাড়ি কি না? সাড়ে তিনটেতে না গেলে—

—তুমি এই সেদিন তো বাড়ি গেলে মঙ্গলবারে। রোজ রোজ সকালে ছেড়ে দিতে গেলে অফিস চলবে কেমন করে? এখনও তো একখানা চিঠি টাইপ করো নি দেখছি—

এ আপিসে শনিবারে সকালে ছুটির নিয়ম নাই। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার পূর্বে কোনদিন আপিসের ছুটি নাই। কি শনিবার কি অন্যদিন। কোনও পালপার্বণে ছুটি নাই, কেবল পূজার সময় এক সপ্তাহ, শ্যামাপূজায় একদিন ও সরস্বতী পূজায় একদিন। অবশ্য রবিবারগুলি বাদ। ইহাদের বন্দোবস্ত এইরূপ—চাকরি করিতে হয় করো, নতুবা যাও চলিয়া। এ ভয়ানক বেকার সমস্যার দিনে কর্মচারীগণ নবমীর পাঁঠার মতো কাঁপিতে কাঁপিতে চাণক্য-শ্লোকের উপদেশ মতো চাকুরিকে পুরোভাগে বজায় ও ছুটিছাটা, অপমান অসুবিধাকে পশ্চাদ্দিকে নিক্ষেপ করত কায়ক্লেশে দিন অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছেন।

নৃপেন কি বলিতে যাইতেছিল—দেবেনবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—মল্লিক অ্যান্ড চৌধুরীদের মর্টগেজখানা টাইপ করেছিলে?

নৃপেন কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল—আজ্ঞে, কই ওদের আপিস থেকে তো পাঠিয়ে দেয় নি এখনও?

—পাঠিয়ে দেয় নি তো ফোন করো নি কেন? আজ সাতদিন থেকে বলছি—কচি খোকা তো নও?...যা আমি না দেখব তাই হবে না?

নৃপেনের ছুটির কথা চাপা পড়িয়া গেল এবং সে বেচারি পুনরায় সাহস করিয়া সে-কথা উঠাইতেও পারিল না।

সন্ধ্যার অল্প পূর্বে ক্যাশ ও ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের কেরানীরা বাহির হইল—অন্য অন্য কেরানীগণ আরও ঘণ্টাখানেক থাকিবে। অত্যন্ত কম বেতনের কেরানী বলিয়া কেহই তাহাদের মুখের দিকে চায় না, বা তাহারা নিজেরাও আপত্তি উঠাইতে ভয় পায়।

দেউড়িতে দারোয়ানেরা বসিয়া খৈনি খাইতেছে, ম্যানেজার ও সুপারিন্টেন্ডেন্টের যাতায়াতের সময় উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফৌজের কায়দায় সেলাম করে, ইহাদিগকে পোঁছেও না।

ফুটপাথে পা দিয়া নৃপেন বলিল—দেখলেন অপূর্ববাবু, ম্যানেজারবাবুর ব্যাপার? একদিন সাড়ে তিনটের সময় ছুটি চাইলাম, তা দিলে না—অন্য সব আপিস দেখুন গিয়ে, দুটোতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তারা সব এতক্ষণে ট্রেনে যে যার বাড়ি পৌঁছে চা খাচ্ছে আর আমরা এই বেরুলাম—কি অত্যাচারটা বলুন দিকি?

প্রবোধ মুহুরি বলিল—অত্যাচার বলে মনে করো ভায়া, কাল থেকে এসো না, মিটে গেল। কেউ তো অত্যাচার পোয়াতে বলে নি। ওঃ, ক্ষিদে যা পেয়েছে ভায়া, একটা মানুষ পেলে ধরে খাই এমন অবস্থা। রোজ রোজ এমনি—হার্টের রোগ জন্মে গেল ভায়া, শুধু না খেয়ে খেয়ে—

অপু হাসিয়া বলিল—দেখবেন প্রবোধ-দা, আমি পাশে আছি, এ যাত্রা আমাকে না হয় রেহাই দিন। ধরে খেতে হয় রাস্তার লোকের ওপর দিয়ে আজকের ক্ষিদেটা শান্ত করুন। আমি আজ তৈরি হয়ে আসি নি। দোহাই দাদা!

তাহার দুঃখের কথা লইয়া এরূপ ঠাট্টা করাতে প্রবোধ মুহুরি খুব খুশি হইল না। বিরক্তমুখে বলিল—তোমাদের তো সব তাতেই হাসি আর ঠাট্টা, ছেলেছোকরার কাছে কি কোন কথা বলতে আছে—আমি যাই, তাই বলি! হাসি সোজা ভাই, কই দাও দিকি ম্যানেজারকে বলে পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে? হুঁ, তার বেলা—

অপুকে হাঁটিতে হয় রোজ অনেকটা। তার বাসা শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মধ্যে, গোলদিঘির কাছে। তেরো টাকা ভাড়াতে নিচু একতলা ঘর, ছোট রান্নাঘর। সামান্য বেতনে দু-জায়গায় সংসার চালানো অসম্ভব বলিয়া আজ বছরখানেক হইল সে অপর্ণাকে কলিকাতায় আনিয়া বাসা করিয়াছে। তবু এখানে চাকরিটি জুটিয়াছিল তাই রক্ষা!

শৈশবের স্বপ্ন এ ভাবেই প্রায় পর্যবসিত হয়। অনভিজ্ঞ তরুণ মনের উচ্ছ্বাস, উৎসাহ—মাধুর্যভরা রঙিন ভবিষ্যতের স্বপ্ন—স্বপ্ন থাকিয়া যায়। যে ভাবে বড়ো সওদাগর হইবে, দেশে দেশে বাণিজ্যের কুঠি খুলিবে, তাহাকে হইতে হয় পাড়াগাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তার, যে ভাবে ওকালতি পাস করিয়া রাসবিহারী ঘোষ হইবে, তাহাকে হইতে হয় কয়লার দোকানী, যাহার আশা থাকে সারা পৃথিবী ঘুরিয়া দেখিয়া বেড়াইবে, কি দ্বিতীয় কলম্বস হইবে, তাহাকে হইতে হয় চল্লিশ টাকা বেতনের স্কুলমাস্টার।

শতকরা নিরানব্বই জনের বেলা যা হয়, অপুর বেলাও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। যথানিয়মে সংসার-যাত্রা, গৃহস্থালি, কেরানীগিরি, ভাড়া বাড়ি, মেলিন্‌স ফুড ও অয়েলক্লথ। তবে তাহার শেষোক্ত দুটির এখনও আবশ্যক হয় নাই—এই যা।

অপর্ণা ঘরের দোরের কাছে বঁটি পাতিয়া কুটনা কুটিতেছে, স্বামীকে দেখিয়া বলিল—আজ এত সকাল সকাল যে! তারপর সে বঁটিখানা ও তরকারির চুপড়ি একপাশে সরাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অপু বলিল, খুব সকাল আর কই, সাতটা বেজেছে, তবে অন্যদিকের তুলনায় সকাল বটে। হ্যাঁ, তেলওয়ালা আর আসে নি তো?

—এসেছিল একবার দুপুরে, বলে দিয়েছি বুধবারে মাইনে হলে আসতে, তোমার আসবার দেরি হবে ভেবে এখনও আমি চায়ের জল চড়াই নি।

কলের কাছে অন্য ভাড়াটেদের ঝি-বৌয়েরা এ সময় থাকে বলিয়া অপর্ণা স্বামীর হাত-মুখ ধুইবার জল বারান্দার কোণে তুলিয়া রাখে। অপু মুখ ধুইতে গিয়া বলিল, রজনীগন্ধা গাছটা হেলে পড়েছে কেন বলো তো? একটু বেঁধে দিয়ো।

চা খাইতে বসিয়াছে, এমন সময়ে কলের কাছে কোন প্রৌঢ় কণ্ঠের কর্কশ আওয়াজ শোনা গেল—তা হলে বাপু একশো টাকা বাড়িভাড়া দিয়ে সায়েবপাড়ায় থাকো গে। আজ আমার মাথা ধরেছে, কাল আমার ছেলের সর্দি লেগেছে—পালার দিন হলেই যত ছুতো। নাও না, সারা ওপরটাই তোমরা ভাড়া নাও না; দাও না পঁযষট্টি টাকা—আমরা না হয় আর কোথাও উঠে যাই, রোজ রোজ হাঙ্গামা কে সহ্যি করে বাপু!

অপু বলিল—আবার বুঝি আজ বেধেছে গাঙ্গুলি-গিন্নির সঙ্গে?

অপর্ণা বলিল—নতুন করে বাধবে কি, বেধেই তো আছে। গাঙ্গুলি-গিন্নিরও মুখ বড়ো খারাপ, হালদারদের বৌটা ছেলেমানুষ, কোলের মেয়ে নিয়ে পেরে ওঠে না, সংসারে তো আর মানুষ নেই, তবুও আমি এক-একদিন গিয়ে বাটনা বেটে দিয়ে আসি।

সিঁড়ি ও রোয়াক ধুইবার পালা লইয়া উপরের ভাড়াটেদের মধ্যে এ রেষারেষি, দ্বন্দ্ব—অপু আসিয়া অবধি এই এক বৎসরের মধ্যে মিটিল না। সকলের অপেক্ষা তাহার খারাপ লাগে ইহাদের

এই সংকীর্ণতা, অনুদারতা। কট্ কট্ করিয়া শক্ত কথা শুনাইয়া দেয়—বাঁচিয়া, বাঁচাইয়া কথা বলে না, কোন্ কথায় লোকের মনে আঘাত লাগে, সে কথা ভাবিয়াও দেখে না।

বাড়িটাতে হাওয়া খেলে না, বারান্দাটাতে বসিলে হয়তো একটু পাওয়া যায়, কিন্তু একটু দূরেই ঝাঁঝরি-ড্রেন, সেখানে সারা বাসার তরকারির খোসা, মাছের আঁশ, আবর্জ্জনা, বাসি ভাত-তরকারি পচিতেছে, বর্ষার দিনে বাড়িময় ময়লা ও আধময়লা কাপড় শুকাইতেছে, এখানে তোবড়ানো টিনের বাক্স, ওখানে কয়লার ঝুড়ি। ছেলেমেয়েগুলা অপরিষ্কার, ময়লা পেনি বা ফ্রক পরা। অপুদের নিজেদের দিকটা ওরই মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিলে কি হয়, এই ছোট্ট বারান্দার টবে দু-চারটে রজনীগন্ধা, বিদ্যাপাতার গাছ রাখিলে কি হয়, এই এক বৎসর সেখানে আসিয়া অপু বুঝিয়াছে, জীবনের সকল সৌন্দর্য, পবিত্রতা, মাধুর্য এখানে পলে পলে নষ্ট করিয়া দেয়, এই আবহাওয়ার বিষাক্ত বাষ্পে মনের আনন্দকে গলা টিপিয়া মারে। চোখে পীড়া দেয় যে অসুন্দর, তা ইহাদের অঙ্গের আভরণ। থাকিতে জানে না, বাস করিতে জানে না, শূকরপালের মতো খায় আর কাদায় গড়াগড়ি দিয়া মহা আনন্দে দিন কাটায়। এত কুশ্রী বেষ্টনীর মধ্যে দিন দিন যেন তার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু উপায় নাই, মনসাপোতায় থাকিলেও আর কুলায় না, অথচ তেরো টাকা ভাড়ায় এর চেয়ে ভালো ঘর শহরে কোথাও মেলে না। তবুও অপর্ণা এই আলো-হাওয়াবিহীন স্থানেও শ্রীছাঁদ আনিয়াছে, ঘরটা নিজের হাতে সাজাইয়াছে, বাক্স-পেঁটরাতে নিজের হাতে বোনা ঘেরাটোপ, জানলায় ছিটের পর্দা, বালিশ মশারি সব ধপ ধপ করিতেছে, দিনে দু-তিনবার ঘর ঝাঁট দেয়।

এই বাড়ির উপরের তলার ভাড়াটে গাঙ্গুলিদের একজন দেশস্থ আত্মীয় পীড়িত অবস্থায় এখানে আসিয়া দু-তিন মাস আছেন। আত্মীয়টি প্রৌঢ়, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে। দেখিয়া মনে হয় অতি দরিদ্র, বড়োলোক আত্মীয়ের আশ্রয়ে এখানে রোগ সারাইতে আসিয়াছেন ও চোরের মতো একপাশে পড়িয়া আছেন। বৌটি যেমন শান্ত তেমনি নিরীহ,—ইতিপূর্বে কখনও কলিকাতায় আসে নাই—দিনরাত জুজুর মতো হইয়া আছে। সারাদিন সংসারের খাটুনি খাটে, সময় হইলেই রুগ্ণ স্বামীর মুখের দিকে উদ্বিগ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া থাকে। তাহার উপর গাঙ্গুলি বৌয়ের ঝংকার, বিরক্তি প্রদর্শন, মধুবর্ষণ তো আছেই। অত্যন্ত গরিব, অপু রোগী দেখিতে যাইবার ছলে মাঝে মাঝে বেদানা, আঙুর, লেবু দিয়া আসিয়াছে। সেদিনও বড়ো ছেলেটিকে জামা কিনিয়া দিয়াছে।

এদিকে তাহারও চলে না। এ সামান্য আয়ে সংসার চালানো একরূপ অসম্ভব। অপর্ণা অন্যদিকে ভালো গৃহিণী হইলেও পয়সা-কড়ির ব্যাপারটা ভালো বোঝে না—দুজনে মিলিয়া মহা আমোদে মাসের প্রথম দিকটা খুব খরচ করিয়া ফেলে—শেষের দিকে কষ্ট পায়।

কিন্তু সকলের অপেক্ষা কষ্টকর হইয়াছে আপিসের এই ভূতগত খাটুনি। ছুটি বলিয়া কোনও জিনিস নাই এখানে। ছোট ঘরটিতে টেবিলের সামনে ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া থাকা সকাল এগারোটা হইতে বৈকাল সাতটা পর্যন্ত। আজ দেড় বৎসর ধরিয়া এই চলিতেছে। এই দেড় বৎসরের মধ্যে সে শহরের বাহিরে কোথাও যায় নাই। আপিস আর বাসা, বাসা আর আপিস। শীলবাবুদের দমদমার বাগান-বাড়িতে সে একবার গিয়াছিল, সেই হইতে তাহার মনের সাধ নিজের মনের মতো গাছপালায় সাজানো বাগানবাড়িতে বাস করা। আপিসে যখন কাজ থাকে না, তখন একখানা কাগজে কাল্পনিক বাগানবাড়ির নক্শা আঁকে। বাড়িটা যেমন তেমন হউক, গাছপালার বৈচিত্র্যই থাকিবে বেশি। গেটের দুধারে দুটো চীনা বাঁশের ঝাড় থাকুক। রাঙা সুরকির পথের ধারে ধারে রজনীগন্ধা ল্যাভেন্ডার ঘাসের পাড় বসানো বকুল ও কৃষ্ণচূড়ার ছায়া।

বাড়িতে ফিরিয়া চা ও খাবার খাইয়া স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করে—হ্যাঁ, তারপর কাঁটালি চাঁপার পারগোলাটা কোন্ দিকে হবে বলো তো?

অপর্ণা স্বামীকে এই দেড় বছরে খুব ভালো করিয়া বুঝিয়াছে। স্বামীর এইসব ছেলেমানুষিতে

সেও সোৎসাহে যোগ দেয়। বলে,—শুধু কাঁটালি চাঁপা? আর কি কি থাকবে, জানলার জাফরিতে কি উঠিয়ে দেব বলো তো?

যে আমড়াতলার গলির ভিতর দিয়া সে আপিস যায় তাহার মতো নোংরা স্থান আর আছে কিনা সন্দেহ। ঢুকিতেই সুঁটকি চিংড়ি মাছের আড়ত সারি সারি দশ-পনেরোটা। চড়া রৌদ্রের দিনে যেমন তেমন, বৃষ্টির দিনে কার সাধ্য সেখান দিয়া যায়? স্থানে স্থানে মাড়োয়ারিদের গরু ও ষাঁড় পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া—পিচপিচে কাদা, গোবর, পচা আপেলের খোলা।

নিত্য দুবেলা আজ দেড় বৎসর এই পথে যাতায়াত।

তা ছাড়া রোজ বেলা এগারোটা হইতে সাতটা পর্যন্ত এই দারুণ বদ্ধতা! আপিসে অন্য যাহারা আছে, তাহাদের ইহাতে তত কষ্ট হয় না। তাহারা প্রবীণ, বহুকাল ধরিয়া তাহাদের খাকের কলম শীলবাবুদের সেরেস্তায় অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছে, তাহাদের গর্বও এইখানে। রোকড়-নবীশ রামধনবাবু বলেন—হেঁ হেঁ, কেউ পারবে না মশাই, আজ এক কলমে বাইশ বছর হল বাবুদের এখানে—কোন ব্যাটার ফুঁ খাটবে না বলে দিয়ো—চার সালের ভূমিকম্প মনে আছে? তখন কর্তা বেঁচে, গদি থেকে বেরুচ্ছি, ওপর থেকে কর্তা হেঁকে বললেন, ওহে রামধন, পোস্তা থেকে ল্যাংড়া আমের দরটা জেনে এসো দিকি চট করে। বেরুতে যাবো মশাই—আর যেন মা বাসুকি একেবারে চৌদ্দ হাজার ফণা নাড়া দিয়ে উঠলেন—সে কি কাণ্ড মশাই? হেঁ হেঁ, আজকের লোক নই—

কষ্ট হয় অপুর ও ছোকরা টাইপিস্ট নৃপেনের। সে বেচারী উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসে ম্যানেজার ঘরে বসিয়া আছে কিনা। অপুর কাছে টুলের উপর বসিয়া বলে, এখনও ম্যানেজার হাইকোর্ট থেকে ফেরেন নি বুঝি, অপূর্ববাবু—ছটা বাজে, ছুটি সেই সাতটায়—

অপু বলে, ওকথা আর মনে করিয়ে দেবেন না, নৃপেনবাবু। বিকেল এত ভালোবাসি, সেই বিকেল দেখি নি যে আজ কত দিন। দেখুন তো বাইরে চেয়ে, এমন চমৎকার বিকেলটি, আর এই অন্ধকার ঘরে ইলেকট্রিক আলো জ্বেলে ঠায় বসে আছি সেই সকাল দশটা থেকে।

মাটির সঙ্গে যোগ অনেকদিনই তো হারাইয়াছে, সে সব বৈকাল তো এখন দূরের স্মৃতি মাত্র। কিন্তু কলিকাতা শহরের যে সাধারণ বৈকালগুলি তাও তো সে হারাইতেছে প্রতিদিন। বেলা পাঁচটা বাজিলে এক-একদিনে লুকাইয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখের বাড়ির উঁচু কার্নিশের উপর যে একটুখানি বৈকালের আকাশ চোখে পড়ে তারই দিকে বুভুক্ষুর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

সামনেই উপরের ঘরে মেজবাবু বন্ধুবান্ধব লইয়া বিলিয়ার্ড খেলিতেছেন, মার্কারটা রেলিংয়ের ধারে দাঁড়াইয়া সিগারেট খাইয়া পুনরায় ঘরে ঢুকিল। মেজবাবুর বন্ধু নীলরতনবাবু একবার বারান্দায় আসিয়া কাহাকে হাঁক দিলেন। অপুর মনে হয় তাহার জীবনের সব বৈকালগুলি এরা পয়সা দিয়া কিনিয়া লইয়াছে, সবগুলি এখন ওদের জিম্মায়, তাহার নিজের আর কোন অধিকার নাই উহাতে।

প্রথম জীবনের সে-সব মাধুরীভরা মুহূর্তগুলি যৌবনের কলকোলাহলে কোথায় মিলাইয়া গেল? কোথায় সে নীল আকাশ, মাঠ, আমের বউলের গন্ধভরা জ্যোৎস্নারাত্রি? পাখি আর ডাকে না, ফুল আর ফোটে না, আকাশ আর সবুজ মাঠের সঙ্গে মেলে না—ঘেঁটুফুলের ঝোপে সদ্যফোটা ফুলের তেতো গন্ধ আর বাতাসকে তেতো করে না। জীবনে সে যে রোমান্সের স্বপ্ন দেখিয়াছিল—যে স্বপ্ন তাহাকে একদিন শত দুঃখের মধ্য দিয়া টানিয়া আনিয়াছে, তার সন্ধান তো কই এখনও মিলিল না? এ তো একরঙা ছবির মতো বৈচিত্র্যহীন, কর্মব্যস্ত, একঘেয়ে জীবন—সারাদিন এখানে আপিসের বদ্ধজীবন, রোকড়, খতিয়ান, মর্টগেজ, ইনকামট্যাক্সের কাগজের বোঝার মধ্যে পক্ককেশ প্রবীণ ঝুনো সংসারাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সঙ্গে সৃপিনা ধরানোর প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে পরামর্শ করা, অ্যাটর্নিদের নামে বড়ো বড়ো চিঠি মুশাবিদা করা—সন্ধ্যায় পায়রার খোপের মতো অপরিষ্কার নোংরা বাসাবাড়িতে ফিরিয়াই তখনই আবার ছেলে পড়াইতে ছোটা।

কেবল এক অপর্ণাই এই বদ্ধ জীবনের মধ্যে আনন্দ আনে। আপিস হইতে ফিরিলে সে যখন হাসিমুখে চা লইয়া কাছে দাঁড়ায়, কোনদিন হালুয়া, কোনদিন দু-চারখানা পরোটা, কোনদিন বা মুড়ি নারিকেল রেকাবিতে সাজাইয়া সামনে ধরে, তখন মনে হয় এ যদি না থাকিত! ভাগ্যে অপর্ণাকে সে পাইয়াছিল! এই ছোট্ট পায়রার খোপকে যে গৃহ বলিয়া মনে হয় সে শুধু অপর্ণা এখানে আছে বলিয়া, নতুবা চৌকি, টুল, বাসন-কোসন, জানালার পর্দা এসব সংসার নয়; অপর্ণা যখন বিশেষ ধরনের শাড়িটি পরিয়া ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করে, অপু ভাবে, এ স্নেহনীড় শুধু ওরই চারিধারে ঘিরিয়া, ওরই মুখের হাসি বুকের স্নেহ যেন পরম আশ্রয়, নীড় রচনা সে ওরই ইন্দ্রজাল।

আপিসে সে নানা স্থানের ভ্রমণকাহিনী পড়ে, ডেস্কের মধ্যে পুরিয়া রাখে। পুরানো বইয়ের দোকান হইতে নানা দেশের ছবিওয়ালা বর্ণনাপূর্ণ বই কেনে—নানা দেশের রেলওয়ে বা স্টিমার কোম্পানি যে সব দেশে যাইতে সাধারণকে প্রলুব্ধ করিতেছে—কেহ বলিতেছে, হাওয়াই দ্বীপে এসো একবার—এখানকার নারিকেল কুঞ্জে, ওয়াকিকির বালুময় সমুদ্রবেলায় জ্যোৎস্নারাত্রে যদি তারাভিমুখী উর্মিমালার সংগীত না শুনিয়া মরো, তবে তোমার জীবন বৃথা।

এলো-পাশো দেখো নাই। দক্ষিণ কালিফোর্নিয়ার চুনাপাথরের পাহাড়ের ঢালুতে, শান্ত রাত্রির তারাভরা আকাশের তলে কম্বল বিছাইয়া একবারটি ঘুমাইয়া দেখিয়ো ..শীতের শেষে নুড়িভরা উঁচুনিচু প্রান্তরে কর্কশ ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে দু-এক ধরনের মাত্র বসন্তের ফুল প্রথম ফুটিতে শুরু করে, তখন সেখানকার সোডা-আলকালির পলিমাটি-পড়া রৌদ্রদীপ্ত মুক্ত তরুবলয়ের রহস্যময় রূপ—কিংবা ওয়ালোয়া হ্রদের তীবে উন্নত পাইন ও ডগলাস ফারেব ঘন অবণ্য, হ্রদের স্বচ্ছ বরফগলা জলে তুষারকিরী" মাজামা আগ্নেয়গিরির প্রতিচ্ছায়াব কম্পন—উত্তর আমেরিকার ঘন, স্তব্ধ, নির্জন আরণ্যভূ'িমর নিয়ত পরিবর্তনশীল দৃশ্যরাজি, কর্কশ বন্ধুর পর্বতমালা, গম্ভীরনিনাদী জলপ্রপাত, ফেনিল প'াহাড়ি নদীতীরে বিচরণশীল বলগা হরিণের দল, ভালুক, পাহাড়ি ছাগল, ভেড়ার দল, উষ্ণপ্রস্রবণ, তুষারপ্রবাহ, পাহাড়ের ঢালুর গায়ে সিডার ও মেপল গাছের বনের মধ্যে বুনো ভ্যালেরিয়ান ও ভায়োলেট ফুলের বিচিত্র বর্ণসমাবেশ—দেখো নাই এসব? এসো এসো।

টাহিটি! টাহিটি! কোথায় কত দূরে, কোন্ জ্যোৎস্নালোকিত রহস্যময় কূলহীন স্বপ্নসমুদ্রের পারে, শুভরাত্রে গভীর জলের তলায যেখানে মুক্তার জন্ম হয়, সাগরগুহায় প্রবালের দল ফুটিয়া থাকে, কানে শুধু দূরশ্রুত সংগীতের মতো তাহাদের অপূর্ব আহ্বান ভাসিয়া আসে। আপিসের ডেস্কে বসিয়া এক-একদিন সে স্বপ্নে ভোর হইয়া থাকে—এই সবের স্বপ্নে। এই রকম নির্জন স্থানে, যেখানে লোকালয় নাই, ঘন নারিকেল কুঞ্জের মধ্যে ছোট কুটিরে, খোলা জানালা দিয়া দূরের নীল সমুদ্র চোখে পড়িবে—তার ওপারে মরকতশ্যাম ছোট ছোট দ্বীপ, বিচিত্র পক্ষীরাজি, অজানা দেশের অজানা আকাশের তলে তারার আলোয় উজ্জ্বল মাঠটা একটা রহস্যের বার্তা বহিয়া আনিবে—কুটিরের ধারে ফুটিয়া থাকিবে ছোট ছোট বনফুল—শুধু সে আর অপর্ণা।

এই সব বড়োলোকের টাকা আছে, কিন্তু জগৎকে দেখিবার, জীবনকে বুঝিবার পিপাসা কই এদের? এ সিমেন্ট বাঁধানো উঠান, চেয়ার, কোচ, মোটর—এ ভোগ নয়, এই শৌখিন বিলাসিতার মধ্যে জীবনের সবদিক আলো-বাতাসের বাতায়ন আটকাইয়া এ মরিয়া থাকা—কে বলে ইহাকে জীবন? তাহার যদি টাকা থাকিত? কিছুও যদি থাকিত, সামান্য কিছু! অথচ ইহারা তো লাভ-ক্ষতি ছাড়া আর কিছু শেখে নাই, বোঝেও না, জানে না, জীবনে আগ্রহও নাই কিছুতেই, ইহাদের সিন্দুক-ভবা নোটের তাড়া।

এই আপিস-জীবনের বদ্ধতাকে অপু শান্তভাবে, নিরুপায়ের মতো দুর্বলের মতো মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। ইহার বিরুদ্ধে, এই মানসিক দারিদ্র্য ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তাহার মনে একটা যুদ্ধ চলিতেছে অনবরত, সে হঠাৎ দমিবার পাত্র নয় বলিয়াই এখনও টিকিয়া আছে,—ফেনোচ্ছল সুরার মতো জীবনের প্রাচুর্য ও মাদকতা তাহার সারা অঙ্গের শিরায় উপশিরায়—ব্যগ্র,

আগ্রহভরা তরুণ জীবন বুকের রক্তে উন্মত্ততালে স্পন্দিত হইতেছে দিনরাত্রি—তাহার স্বপ্নকে আনন্দকে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া মারিয়া ফেলা খুব সহজসাধ্য নয়।

কিন্তু এক এক সময় তাহারও সন্দেহ আসে। জীবন যে এই রকম হইবে, সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রতি দণ্ড পল যে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বৈচিত্র্যহীন ঘটনায় ভরিয়া উঠিবে, তাহার কল্পনা তো তাহাকে এ আভাস দেয় নাই। তবে কেন এমন হয়! তাহাকে কাঁচা, অনভিজ্ঞ পাইয়া নিষ্ঠুর জীবন তাহাকে এতদিন কি প্রতারণাই করিয়া আসিয়াছে? ছেলেবেলায় মা যেমন নগ্ন দারিদ্র্যের রূপকে তাহার শৈশবচক্ষু হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিত তেমনই!...

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিয়া গেল। আজ দু-বৎসর এখানে সে চাকরি করিতেছে, পূজার পূর্বে প্রতিবারই সে ও নৃপেন টাইপিস্ট কোথাও না কোথাও যাইবার পরামর্শ আঁটিয়াছে, নক্শা আঁকিয়াছে, ভাড়া কষিয়াছে, কখনও পুরুলিয়া, কখনও পুরী—যাওয়া অবশ্য কোথাও হয় না। তবুও যাইবার কল্পনা করিয়াও মনটা খুশি হয়। মনকে বোঝায় এবার না হয় আগামী পূজায় নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—কেহ বাধা দিতে পারিবে না।

শনিবার আপিস বন্ধ হইয়া গেল। অপুর আজকাল এমন হইয়াছে—বাড়ি ফিরিয়া অপর্ণার মুখ দেখিতে পারিলে যেন বাঁচে, কতক্ষণে সাতটা বাজিবে, ঘন ঘন ঘড়ির দিকে সতৃষ্ণ চোখে চায়। পাঁচটা বাজিয়া গেলে অকূল সময়-সমুদ্রে যেন থই পাওয়া যায়—আর মোটে ঘণ্টা দুই। ছ'টা—আর এক। হোক পায়রার খোপের মতো বাসা, অপর্ণা যেন সব দুঃখ ভুলাইয়া দেয়। তাহার কাছে গেলে আর কিছু মনে থাকে না।

অপর্ণা চা খাবার আনিল। এ সময়টা আধঘণ্টা সে স্বামীর কাছে থাকিতে পায়, গল্প করিতে পায়, আর সময় হয় না, এখনই আবার অপুকে ছেলে পড়াইতে বাহির হইতে হইবে। অপু এ-সময় তাহাকে সব দিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখিয়াছে, ফরসা লাল পাড় শাড়িটি পরা, চুলটি বাঁধা, পায়ে আলতা, কপালে সিঁদুরের টিপ—মূর্তিমতী গৃহলক্ষ্মীর মতো হাসিমুখে তাহার জন্য চা আনে, গল্প করে, রাত্রে কি রান্না হইবে রোজ জিজ্ঞাসা করে, সারাদিনের বাসার ঘটনা বলে। বলে, ফিরে এসো, দুজনে আজ মহারানী ঝিন্দন আর দিলীপ সিংহের কথাটা পড়ে শেষ করে ফেলব।

বার-দুই অপু তাহাকে সিনেমায় লইয়া গিয়াছে, ছবি কি করিয়া নড়ে অপর্ণা বুঝিতে পারে না, অবাক হইয়া দেখে, গল্পটাও ভালো বুঝিতে পারে না। বাড়ি আসিয়া অপু বুঝাইয়া বলে।

চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া অপু বলিল—এবার তো তোমায় নিয়ে যেতে লিখেছেন শ্বশুরমশায়, কিন্তু আপিসের ছুটির যা গতিক—রাম এসে কেন নিয়ে যাক না? তার পর আমি কার্তিক মাসের দিকে না হয় দু-চারদিনের জন্য যাব? তাছাড়া যদি যেতেই হয় তবে এ সময় যত সকালে যেতে পারা যায়—এ সময়টা বাপ-মায়ের কাছে থাকা ভালো, ভেবে দেখলাম।

অপর্ণা লজ্জারক্তমুখে বলিল—রাম ছেলেমানুষ, ও কি নিয়ে যেতে পারবে? তা ছাড়া মা তোমায় কতদিন দেখেন নি, দেখতে চেয়েছেন।

—তা বেশ চলো আমিই যাই। রামের হাতে ছেড়ে দিতে ভরসা হয় না, এ অবস্থায় একটু সাবধানে ওঠা-নামা করতে হবে কি না। দাও তো ছাতাটা, ছেলে পড়িয়ে আসি। যাওয়া হয় তো চলো কালই যাই।—হ্যাঁ একটা সিগারেট দাও না?

—আবার সিগারেট! আটটা সিগারেট সকাল থেকে খেয়েছো—আর পাবে না—আবার পড়িয়ে এলে একটা পাবে।

—দাও দাও লক্ষ্মীটি—রাতে আর চাইব না—দাও একটি।

অপর্ণা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া হাসিমুখে বলিল—আবার রাত্রে তুমি কি ছাড়বে আর একটা না নিয়ে? তেমন ছেলে তুমি কি না!...

বেশি সিগারেট খায় বলিয়া অপুই সিগারেটের টিন অপর্ণার জিম্মায় রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিল।

অপর্ণার কড়াকাড়ি বন্দোবস্ত সব সময় খাটে না, অপু বরাদ্দ অনুয়ায়ী সিগারেট নিঃশেষ করিবার পর আরও চায়, পীড়াপীড়ি করে, অপর্ণাকে শেষকালে দিতেই হয়। তবে ঘরে সিগারেট না মিলিলে বাহিরে গিয়া সে পারতপক্ষে কেনে না—অপর্ণাকে প্রবঞ্চনা করিতে মনে বড়ো বাধে—কিন্তু সবদিন নয়, ছুটি-ছাটার দিন বাড়তি প্রাপ্য আদায় করিয়াও আরও দু-এক বাক্স কেনে, যদিও সে কথা অপর্ণাকে জানায় না।

ছেলে পড়াইয়া আসিয়া অপু দেখিল উপরের রুগ্ণ্ ভদ্রলোকটির ছোট মেয়ে পিন্টু তাহাদের ঘরের এককোণে ভীত, পাংশু মুখে বসিয়া আছে। বাড়িসুদ্ধ হৈ-চৈ! অপর্ণা বলিল, ওগো এই পিন্টু গাঙ্গুলিদের ছোট খুকিকে নিয়ে গোলদিঘিতে বেড়াতে বেরিয়েছিল। ও-বুঝি চিনেবাদাম খেয়ে কলে জল খেতে গিয়েছে, আর ফিরে এসে দ্যাখে খুকি নেই, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওর মা তো একেই জুজু হয়ে থাকে, আহা সে বেচারি তো নবমীর পাঁঠার মতো কাঁপছে আর মাথা কুটছে। আমি পিন্টুকে এখানে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি, নইলে ওর মা ওকে আজ গুঁড়ো করে দেবে। আর গাঙ্গুলি-গিন্নি যে কি কাণ্ড করছে, জানোই তো তাকে, তুমিও একটু দেখো না গো!

গাঙ্গুলি-গিন্নী মরাকান্নার আওয়াজ করিতেছেন, কানে গেল।—ওগো আমি দুধ দিয়ে কি কালসাপ পুষেছিলাম গো! আমার এ কি সর্বনাশ হল গো মা; ওগো তাই আপদেরা বিদেয় হয় না আমার ঘাড় থেকে—এতদিনে মনোবাঞ্ছা—ইত্যাদি।

অপু তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল, বলিল—পিন্টু খেয়েছে কিছু?

—খাবে কি? ও-কি ও-তে আছে? গাঙ্গুলি-গিন্নি দাঁতে পিষছে, আহা, ওর কোন দোষ নেই, ও কিছুতেই নিয়ে যাবে না, সেও ছাড়বে না, তাকে আগলে রাখা কি ওর কাজ।

সকলে মিলিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে খুকিকে কলুটোলা থানায় পাওয়া গেল। সে পথ হারাইয়া ঘুরিতেছিল, বাড়ির নম্বর, বাস্তার নাম বলিতে পারে না, একজন কনস্টেবল এ অবস্থায় তাহাকে পাইয়া থানায় লইয়া গিয়াছিল।

বাড়ি আসিলে অপর্ণা বলিল—পাওয়া গিযেছে ভালোই হল, আহা বৌটাকে আব মেয়েটাকে কি করেই গাঙ্গুলি-গিন্নি দাঁতে পিষছে গো! মানুষ মানুষকে এমনও বলতে পারে! কাল নাকি এখান থেকে বিদেয় হতে হবে—হুকুম হয়ে গিয়েছে।

অপু বলিল—কিছু দরকার নেই। কাল আমরা তো চলে যাচ্ছি, আমার তো আসতে এখনও চার-পাঁচদিন দেরি। ততদিন ওঁরা রুগি নিয়ে আমাদেব ঘরে এসে থাকুন, আমি এলেও অসুবিধে হবে না, আমি না হয় এই পাশেই বরদাবাবুদেব মেসে গিয়ে রাত্রে শোব। তুমি গিয়ে বলো বৌ-ঠাকরুনকে। আমি বুঝি, অপর্ণা! আমার মা আমার বাবাকে নিয়ে কাশীতে আমার ছেলেবেলায় ওই রকম বিপদে পড়েছিলেন—তোমাকে সে সব কথা কখনও বলি নি, অপর্ণা। বাবা মাবা গেলেন, হাতে একটা সিকি-পয়সা নেই আমাদের, সেখানে দু-একজন লোক কিছু কিছু সাহায্য করলে, হবিষ্যির খরচ জোটে না—মা-তে আমাতে রাত্রে শুধু অড়রের ডাল ভিজে খেয়ে কাটিয়েছি। আমি তখন ছেলেমানুষ, বছর দশেক মোটে বয়েস—গরিব হওয়ার কষ্ট যে কি, তা আমার বুঝতে বাকি নেই—কাল সকালেই ওঁরা এখানে আসুন।

অপর্ণা যাইবার সময় পিন্টুর মা খুব কাঁদিল। এ বাড়িতে বিপদে-আপদে অপর্ণা যথেষ্ট করিয়াছে। রোগীর সেবা করিয়া ছেলেমেয়েকে দেখিতে সময় পাইত না, তাহাদের চুল বাঁধা, টিপ পরানো, খাবার খাওয়ানো, সব নিজের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া অপর্ণা করিত। পিন্টু তো মাসিমা বলিতে অজ্ঞান, সকলের কান্না থামে তো পিন্টুকে আর থামানো যায় না। বউয়ের বয়স অপর্ণার চেয়ে অনেক বেশি। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, চিঠি দিয়ো ভাই, দুটো দু-ঠাঁই ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলে আমি মায়ের পুজো দেবো।

ঘরের চাবি পিন্টুর মায়ের কাছে রহিল।

রেলে ও স্টিমারে অনেক দিন পর চড়া। দুজনেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। দুজনেই খুব খুশি। অপর্ণাও পল্লীগ্রামের মেয়ে, শহর তাহার ভালো লাগে না। অতটুকু ঘরে কোনদিন থাকে নাই, সকাল ও সন্ধ্যাবেলা যখন সব বাসাড়ে মিলিয়া একসঙ্গে কয়লার উনুনে আগুন দিত, ধোঁয়ায় অপর্ণার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিত, চোখ জ্বালা করিত, সে কি ভীষণ যন্ত্রণা। সে নদীর ধারের মুক্ত আলো বাতাসে প্রকাণ্ড বাড়িতে মানুষ হইয়াছে। এসব কষ্ট জীবনে এই প্রথম—এক একদিনে তাহার তো কান্না পাইত। কিন্তু এই দুই বৎসরে সে নিজের সুখ-সুবিধার কথা বড়ো একটা ভাবে নাই। অপুর উপর তাহার একটা অদ্ভুত স্নেহ গড়িয়া উঠিয়াছে, ছেলের উপর মায়ের স্নেহের মতো। অপুর কৌতুকপ্রিয়তা, ছেলেমানুষি খেয়াল, সংসারনভিজ্ঞতা, হাসিখুশি, এসব অপর্ণার মাতৃত্বকে অদ্ভুতভাবে জাগাইয়া তুলিয়াছে। তাহার উপর স্বামীর দুঃখময় জীবনের কথা, ছাত্রাবস্থায় দারিদ্র্য, অনাহারের সঙ্গে সংগ্রাম—সে সব শুনিয়াছে। সে-সব অপু বলে নাই, সে-সব বলিয়াছে প্রণব। বরং অপু নিজের অবস্থা অনেক বাড়াইয়া বলিয়াছিল—নিশ্চিন্দিপুরের নদীর ধারের পৈতৃক বৃহৎ দোতলা বাড়িটার কথাটা আরও দু-একবার না তুলিয়াছিল এমন নহে—নিজে কলেজ-হোস্টেলে ছিল এ কথাও বলিয়াছে। বুদ্ধিমতী অপর্ণার স্বামীকে চিনিতে বাকি নাই। কিন্তু স্বামীর কথা সে যে সর্বৈব মিথ্যা বলিয়া বুঝিয়াছে এ ভাব একদিনও দেখায় নাই। বরং সস্নেহে বলে—দ্যাখো, তোমাদের দেশের বাড়িটাতে যাবে যাবে বললে, একদিনও তো গেলে না—ভালো বাড়িখানা—পুলুদার মুখে শুনেছি জমিজমাও বেশ আছে—একদিন গিয়ে বরং সব দেখে-শুনে এসো। না দেখলে কি ও-সব থাকে?...

অপু আমতা আমতা করিয়া বলে—তা যেতামই তো, কিন্তু বড়ো ম্যালেরিয়া। তাতেই তো সব ছাড়লাম কিনা? নইলে আজ অভাব কি?...

কিন্তু অসতর্ক মুহূর্তে দু-একটা বেফাঁস কথা মাঝে মাঝে বলিয়াও ফেলে, ভুলিয়া যায় আগে কি বলিয়াছিল কোন্ সময়ে। অপর্ণাও কখনও দেখায় নাই যে, এ সব কথার অসামঞ্জস্য সে বুঝিতে পারিয়াছে। না খাইয়া যে কষ্ট পায় অপর্ণার এ কথা জানা ছিল না। সচ্ছল ঘরের আদরে লালিতা মেয়ে, দুঃখ-কষ্টের সন্ধান সে জানে না। মনে মনে ভাবে, এখন হইতে স্বামীকে সে সুখে রাখিবে।

এটা একটা নেশার মতো তাহাকে পাইয়াছে। অল্পদিনেই সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, অপু কি কি খাইতে ভালোবাসে। তালের ফুলুরি সে করিতে জানিত না, কিন্তু অপু খাইতে ভালোবাসে বলিয়া মনসাপোতায় নিরুপমার কাছে শিখিয়া লইয়াছিল।

এখানে সে কতদিন অপুকে কিছু না জানাইয়া বাজার হইতে তাল আনাইয়াছে, সব উপকরণ আনাইয়াছে। অপু হয়তো বর্ষার জলে ভিজিয়া আপিস হইতে বাসায় ফিরিয়া হাসিমুখে বলিত—কোথায় গেলে অপর্ণা? এত সকালে রান্নাঘরে কি, দেখি? পরে উঁকি দিয়া দেখিয়া বলিত, তালের বড়া ভাজা হচ্ছে বুঝি! তুমি জানলে কি করে—বা রে!...

অপর্ণা উঠিয়া স্বামীর শুকনো কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়া দিত, বলিত, এসো না, ওখানেই বসে খাবে, গরম গরম ভেজে দি—। অপুর বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিত। ঠিক এইভাবেই কথা বলিত মা। অপুর অদ্ভুত মনে হয়, মায়ের মতো স্নেহশীলা, সেবাপরায়ণা, সেইরকমই অন্তর্যামিনী। বার্ধক্যের কর্মক্লান্ত মা যেন ইহারই নবীন হাতে সকল ভার সঁপিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মেয়েদের দেখিবার চোখ তাহার নতুন করিয়া ফোটে, প্রত্যেককে দেখিয়া মনে হয়, এ কাহারও মা, কাহারও স্ত্রী, কাহারও বোন। জীবনে এই তিন রূপেই নারীকে পাইয়াছে, তাহাদের মঙ্গল হস্তের পরিবেশনে এই ছাব্বিশ বৎসরের জীবন পুষ্ট হইয়াছে, তাহাদের কি চিনিতে বাকি আছে তাহার?

স্টিমার ছাড়িয়া দুজনে নৌকায় চড়িল। অপর্ণার খুড়তুতো ভাই মুরারি উহাদের নামাইয়া লইতে আসিয়াছিল। সে-ও গল্প করিতে করিতে চলিল। অপর্ণা ঘোমটা দিয়া একপাশে সরিয়া বসিয়াছিল। হেমন্ত-অপরাহ্ণের স্নিগ্ধ ছায়া নদীর বুকে নামিয়াছে, বাঁ দিকের তীরে সারি সারি গ্রাম, একখানা বড়ো হাঁড়ি-কলসি বোঝাই ভড় যশাইকাটির ঘাটে বাঁধা।

অপুর মনে একটা মুক্তির আনন্দ—আর মনেও হয় না যে জগতে শীলেদের আপিসের মতো ভয়ানক স্থান আছে। তাহার সহজ আনন্দ-প্রবণ মন আবার নাচিয়া উঠিল, চারিধারের এই শ্যামলতা, প্রসার, নদীজলের গন্ধের সঙ্গে তাহার যে নাড়ীর যোগ আছে।

কৌতুক দেখিবার জন্য অপর্ণাকে লক্ষ করিয়া হাসিমুখে বলিল—ওগো কলাবৌ, ঘোমটা খোলো, চেয়ে দ্যাখো, বাপের বাড়ির দ্যাশটা চেয়ে দ্যাখো গো—

মুরারি হাসিমুখে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। অপর্ণা লজ্জায় আরও জড়সড় হইয়া বসিল। আরও খানিকটা আসিয়া মুরারি বলিল—তোমরা যাও, এইখানের হাটে যদি বড়ো মাছ পাওয়া যায়, জ্যাঠাইমা কিনতে বলে দিয়েছেন! এইটুকু হেঁটে যাব এখন।

মুরারি নামিয়া গেলে অপর্ণা বলিল—আচ্ছা তুমি কি? দাদার সামনে ওইরকম করে আমায়—তোমার সেই দুষ্টুমি এখনও গেল না? কি ভাবলে বলো তো দাদা—ছিঃ। পরে রাগের সুরে বলিল—দুষ্টু কোথাকার, তোমার সঙ্গে আমি আর কোথাও কখনও যাবো না—কখ্খনো না, থেকো একলা বাসায়!

—বয়েই গেল! আমি তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে সেধেছিলুম কিনা! আমি নিজে মজা করে রেঁধে খাব!

—তাই খেয়ো। আহা-হা, কি রান্নার ছাঁদ, তবু যদি আমি না জানতাম! আলু ভাতে, বেগুন ভাতে, সাত রকম তরকারি সব ভাতে—কি রাঁধুনী!

—নিজের দিকে চেয়ে কথা বলো। প্রথম যেদিন খুলনার ঘাটে রেঁধেছিলে, মনে আছে সব আলুনি?

—ওমা আমার কি হবে! এত বড়ো মিথ্যেবাদী তুমি, সব আলুনি! ওমা আমি কোথায়—

—সব। বিলকুল। মায় পটলভাজা পর্যন্ত।

অপর্ণা রাগ করিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল—তুমি ভাঙন মাছ খাও নি? আমাদের এ নোনা গাঙের ভাঙন মাছ ভারি মিষ্টি। কাল মাকে বলে তোমায় খাওযাব।

—লজ্জা করবে না তার বেলায়? কি বলবে মাকে—ও মা, এই আমাব—

অপর্ণা স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল—চুপ।

ঠিক সন্ধ্যার সময় অপর্ণাদের ঘাটে নৌকা লাগিল। দুজনেরই মনে এক অপূর্ব ভাব। শটিবনের সুগন্ধভরা স্নিগ্ধ হেমন্ত-অপরাহু তার সবটা কারণ নয়, নদীতীরেব ঝুপ্‌সি হইয়া থাকা গোলগাছের সবুজ সারিও নয়, কারণ—তাহাদের আনন্দ-প্রবণ অনাবিল যৌবন—ব্যগ্র, নবীন, আগ্রহভবা যৌবন।

জ্যোৎস্নারাত্রে উপরের ঘরে ফুলশয্যার সেই পালঙ্কে বাতি জ্বালিয়া বসিয়া পড়িতে পড়িতে সে অপর্ণার প্রতীক্ষায় থাকে। নারিকেলশাখায় দেবীপক্ষের বকের পালকের মতো শুভ্র চাঁদের আলো পড়ে, বাইরের রাত্রির দিকে চাহিয়া কত কথা মনে আসে, কত সব পুবাতন স্মৃতি—কোথায় যেন এই ধরনের সব পুরানো দিনের কত জ্যোৎস্না-ঝরা রাত। এ যেন সব আরব্য-উপন্যাসের কাহিনী, সে ছিল কোন্ কুঁড়েঘরে, পেট পুরিয়া সব দিন খাইতেও পাইত না—সে আজ এত বড়ো প্রাচীন জমিদার ঘরের জামাই, অথচ আশ্চর্য এই যে, এইটাই মনে হইতেছে সত্য। পুরানো দিনের জীবনটা অবাস্তব, অস্পষ্ট, ধোঁয়া ধোঁয়া মনে হয়।

হেমন্তের রাত্রি। ঠাণ্ডা বেশ। কেমন একটা গন্ধ বাতাসে, অপুর মনে হয় কুয়াশার গন্ধ। অনেক রাত্রে অপর্ণা আসে। অপু বলে—এত রাত যে!—আমি কতক্ষণ জেগে বসে থাকি।

অপর্ণা হাসে। বলে—নিচে কাকাবাবুর শোবার ঘর। আমি সিঁড়ি দিয়ে এলে পায়ের শব্দ ওঁর কানে যায়—এই জন্য উনি ঘরে খিল না দিলে, আসতে পারি নে। ভারী লজ্জা করে।

অপু জানালার খড়খড়িটা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল। অপর্ণা লাজুক মুখে বলিল—এই শুরু হল বুঝি দুষ্টুমি ? তুমি কী!—কাকাবাবু এখনও ঘুমোন নি যে!...

অপু আবার খটাস্ করিয়া খড়খড়ি খুলিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চসুরে বলিল—অপর্ণা, এক গ্লাস জল আনতে ভুলে গেলে যে!...ও অপর্ণা—অপর্ণা?...

অপর্ণা লজ্জায় বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িয়া রহিল!

ভোর রাত্রেও দুজনে গল্প করিতেছিল।

সকালের আলো ফুটিল। অপর্ণা বলিল—তোমার কটায় স্টিমার?...সারারাত তো নিজেও ঘুমুলে না, আমাকেও ঘুমুতে দিলে না—এখন খানিকটা ঘুমিয়ে থাকো—আমি অনাদিকে পাঠিয়ে তুলে দেব'খন বেলা হলে। গিয়েই চিঠি দিয়ো কিন্তু। জানালার পর্দাগুলো ধোপার বাড়ি দিয়ো—আমি না গেলে আর সাবান কে দেবে? সস্নেহে স্বামীর গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—কি রকম রোগা হয়ে গিয়েছ—এখন তোমাকে কাছছাড়া করতে ইচ্ছে করে না—কলকাতায় না মেলে দুধ, না মেলে কিছু। এখানে এ-সময়ে কিছুদিন থাকলে শরীরটা সারত। রোজ আপিস থেকে এসে মোহনভোগ খেয়ো—পিন্টুর মাকে বলে এসেছি—সে-ই করে দেবে। এখন তো খরচ কমল? বেশি ছেলে পড়ানোতে কাজ নেই। যাই তাহলে?

অপু বলিল—বোসো বোসো—এখনও কোথায় তেমন ফরসা হয়েছে?—কাকার উঠতে এখনও দেরি!

অপর্ণা বলিল—হ্যাঁ আর একটা কথা—দ্যাখো, মনসাপোতার ঘরটা এবার খুঁচি দিয়ে রেখো। নইলে বর্ষার দিকে বড্ড খরচ পড়ে যাবে, কলকাতার বাসায় তো চিরদিন চলবে না—ওই হল আপন ঘরদোর। এবার মনসাপোতায় ফিরব, বাস না করলে খড়ের ঘর টেঁকে না। যাই এবার, কাকা এবার উঠবেন। যাই?

অপর্ণা চলিয়া গেলে অপুর মন খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। এখনও বাড়ির কেহই উঠে নাই—কেন সে অপর্ণাকে ছাড়িয়া দিল? কেন বলিল—যাও! তাহার সম্মতি না পাইলে অপর্ণা কখনই যাইত না।

কিন্তু অপর্ণা আর একবার আসিয়াছিল ঘণ্টাখানেক পরে, চা দেওয়া হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিতে—অপু তখন ঘুমাইতেছে। খোলা জানালা দিয়া মুখে রৌদ্র লাগিতেছে। অপর্ণা সন্তর্পণে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বামীকে এমন দেখায়!—এমন একটা মায়া হয় ওর ওপরে! সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় ভাবিল, মা সত্যিই বলে বটে, পটের মুখ—পটে আঁকা ঠাকুর-দেবতার মতো মুখ—

চলিয়া আসিবার সময়ে কিন্তু অপর্ণার সঙ্গে দেখা হইল না। অপুর আগ্রহ ছিল, কিন্তু আত্মীয় কুটুম্ব পরিজনে বাড়ি সরগরম—কাহাকে যে বলে অপর্ণাকে একবার ডাকিয়াই দিতে? মুখচোরা অপু ইচ্ছাটা কাহাকেও জানাইতে পারিল না। নৌকায় উঠিয়া মুরারির ছোট ভাই বিশু বলিল—আসবার সময় দিদির সঙ্গে দেখা করে এলেন না কেন, জামাইবাবু? দিদি সিঁড়ির ঘরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, আপনি যখন চলে আসেন—

কিন্তু নৌকা তখন জোর ভাঁটার টানে যশাইকাটির বাঁকের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

এবার কলিকাতায় আসিয়া অনেকদিন পরে দেওয়ানপুরের বাল্যবন্ধু দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হইল। সে আমেরিকা যাইতেছে। পরস্পরের দেখাসাক্ষাৎ না হওয়ায় কেহ কাহারও ঠিকানা জানিত না। অথচ দেবব্রত এখানেই কলেজে পড়িতেছিল, এবার বি.এসসি. পাস করিয়াছে।...অপুর কাছে ব্যাপারটা আশ্চর্য ঠেকিল, আনন্দ হইল, হিংসাও হইল। প্রতি শনিবারে বাড়ি না যাইয়া যে থাকিতে পারিত না, সেই ঘর-পাগলা দেবব্রত আমেরিকা চলিয়া যাইতেছে!

মাস দুই-তিন বড়ো কষ্টে কাটিল। আজ এক বছরের অভ্যাস—আপিস হইতে বাসায় ফিরিয়া অপর্ণার হাসিভরা মুখ দেখিয়া কর্মক্লান্ত মন শান্ত হইত। আজকাল এমন কষ্ট হয়! বাসায় না ফিরিয়াই সোজা ছেলে পড়াইতে যায় আজকাল, বাসায় মন লাগে না, খালি খালি ঠেকে।

লীলারা কেহ এখানে নাই। বর্ধমানের বিষয় লইয়া কি সব মামলা-মকদ্দমা চলিতেছে, অনেকদিন হইতে তাহারা সেখানে।

একদিন রবিবারে সে বেলুড় মঠ বেড়াইয়া আসিয়া অপর্ণাকে এক লম্বা চিঠি দিল, ভারি ভালো লাগিয়াছিল জায়গাটা, অপর্ণা এখানে আসিলে একদিন বেড়াইয়া আসিবে। এসব পত্রের উত্তর অপর্ণা খুব শীঘ্র দেয়, কিন্তু পত্রখানার কোন জবাব আসিল না—দু-দিন, চারদিন, সাতদিন হইয়া গেল। তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিল—কি ব্যাপার? অপর্ণা হয়তো নাই, সে মারা গিয়াছে—ঠিক তাই। রাত্রে নানা রকম স্বপ্ন দেখে—অপর্ণা ছলছল চোখে বলিতেছে—তোমায় তো বলেছিলাম আমি বেশিদিন বাঁচব না, মনে নেই? ...সেই মনসাপোতায় একদিন রাত্রে?—আমার মনে কে বলত। যাই—আবার আর জন্মে দেখা হবে।

পরদিন পড়িবে শনিবার। সে আপিসে গেল না, চাকুরির মায়া না করিয়াই সুটকেস গুছাইয়া বাহির হইয়া যাইতেছে এমন সময় শ্বশুরবাড়ির পত্র পাইল। সকলেই ভালো আছে। যাক—বাঁচা গেল! উঃ, কি ভয়ানক দুর্ভাবনার মধ্যে ফেলিয়াছিল উহারা! অপর্ণার উপর একটু অভিমানও হইল। কি কাণ্ড, মন ভালো না থাকিলে এমন সব অদ্ভুত কথাও মনে আসে। কয়দিন সে ক্রমাগত ভাবিয়াছে, 'ওগো মাঝি তরী হেথা' গানটা কলিকাতায় আজকাল সবাই গায়। কিন্তু গানটার বর্ণনার সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ির এত হুবহু মিল হয় কি করিয়া? গানটা কি তাহার বেলায় খাটিয়া যাইবে?

শনিবার আপিস হইতে ফিরিয়া দেখিল, মুরারি তাহার বাসায় বার-বারান্দায় চেয়ারখানাতে বসিয়া আছে। শ্যালককে দেখিয়া অপু খুশি হইল—হাসিমুখে বলিল, এ কি, বাস রে! সাক্ষাৎ বড়োকুটুম যে। কার মুখ দেখে না জানি যে আজ সকালে—

মুরারি খামে-আঁটা একখানা চিঠি তাহার হাতে দিল—কোন কথা বলিল না। অপু পত্রখানা হাত বাড়াইয়া লইতে গিয়া দেখিল, মুরারির মুখ কেমন হইয়া গিয়াছে। সে যেন চোখের জল চাপিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

অপুর বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন হিম হইয়া গেল। কেমন করিয়া আপনা-আপনি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—অপর্ণা নেই?

মুরারি নিজেকে আর সামলাইতে পারিল না।

—কি হয়েছিল?

—কাল সকালে আটটার সময় প্রসব হল—সাড়ে ন'টার সময়—

—জ্ঞান ছিল?

—আগাগোড়া। ছোট কাকিমার কাছে চুপি চুপি নাকি বলেছিল ছেলে হওয়ার কথা তোমাকে তার করে জানাতে। তখন ভালোই ছিল। হঠাৎ নটার পর থেকে—

ইহার পরে অপু অনেক সময় ভাবিয়া আশ্চর্য হইত—সে তখন স্বাভাবিক সুরে অতগুলি প্রশ্ন একসঙ্গে করিয়াছিল কি করিয়া! মুরারি বাড়ি ফিরিয়া গল্প করিয়াছিল—অপূর্বকে কি করে খবরটা শোনাব, সারা রেল আর স্টিমারে শুধু তাই ভেবেছিলাম—কিন্তু সেখানে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম, আমায় বলতে হল না—ও-ই খবর টেনে বার করলে।

মুরারি চলিয়া গেলে সন্ধ্যার দিকে একবার অপুর মনে হইল, নবজাত পুত্রটি বাঁচিয়া আছে, না নাই? সে কথা তো মুরারিকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই বা সে-ও কিছু বলে নাই। কে জানে, হয়তো নাই।

কথাটা ক্রমে বাসার সকলেই শুনিল। পরদিন যথারীতি আপিসে গিয়াছে, আপিস হইতে

ফিরিয়া হাতমুখ ধুইতেছে, উপরের ভাড়াটে বন্ধু সেন মহাশয় অপুদের ঘরের বারান্দাতে উঠিলেন। অপু বলিল—এই যে সেন মশায়, আসুন, আসুন।

সেন মহাশয় জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে একটা দুঃখসূচক শব্দ উচ্চারণ করিয়া টুলখানা টানিয়া হতাশভাবে বসিয়া পড়িলেন।

—আহা-হা, রূপে সরস্বতী গুণে লক্ষ্মী! কলের কাছে সেদিন মা আমার সাবান নিয়ে কাপড় ধুচ্ছেন, আমি সকাল সকাল স্নান করব বলে ওপরের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি। বললাম—কে বৌমা! তা মা আমার একটু হাসলেন—বলি তা থাক, মায়ের কাপড় কাচা হয়ে যাক! স্নানটা না হয় নটার পরেই করা যাবে এখন—একদিন ইলিশ মাছের দইমাছ রেঁধেছেন, অমনি তা বাটি করে ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছেন—আহা কি নরম কথা, কি লক্ষ্মীশ্রী,—সবই শ্রীহরির ইচ্ছে! সবই তাঁর—

তিনি উঠিয়া যাইবার পব আসিলেন গাঙ্গুলি-গৃহিণী। বয়সে প্রবীণা হইলেও ইনি কখনও অপুর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কথাবার্তা বলেন নাই। আধ-ঘোমটা দিয়া তিনি দোরের আড়াল হইতে বলিতে লাগিলেন—আহা, জলজ্যান্ত বৌটা, এমন হবে তা তো কখনও জানি নি, ভাবি নি—কাল আমায় আমার বড়ো ছেলে নবীন বলছে রাত্তিবে, যে, মা শুনেছ এইবকম, অপূর্ববাবুর স্ত্রী মারা গিয়েছেন এই মাত্তর খবর এল—তা বাবা আমি বিশ্বাস করি নি। আজ সকালে আবার বাঁটুল বললে—তা বলি, যাই জেনে আসি—আসব কি বাবা, দুই ছেলেব আপিসেব ভাত, বাঁটুলের আজকাল আবার দমদমার গুলির কারখানায় কাজ, দুটো নাকে-মুখে গুঁজেই দৌড়ায়, এখন আড়াই টাকা হপ্তা, সাহেব বলেছে বোশেখ মাস থেকে দেড় টাকা বাড়িয়ে দেবে। ওই এক ছেলে বেখে ওব মা মারা যায়, সেই থেকে আমারই কাছে—আহা তা ভেবো না বাবা—সবারই ও কষ্ট আছে,—তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার ভাবনা কি বাবা? বলে—

বজায় থাকুক চুড়ো-বাঁশি
মিলবে কত সেবাদাসী—

—একটা ছেড়ে দশটা বিয়ে করো না কেন?—তোমার বয়েসটাই বা কি এমন—

অপু ভাবিল—এরা লোক ভালো তাই এসে এসে বলছে। কিন্তু আমায় কেন একটু একা থাকতে দেয় না? কেউ না আসে ঘরে সেই আমার ভালো। এবা কি বুঝবে?

সন্ধ্যা হইযা গেল। বাবান্দার যে কোণে ফুলেব টব সাজানো, দু-একটা মশা সেখানে বিন্ বিন্ করিতেছে। অন্যদিন সে সেই সময়ে আলো জ্বালে, স্টোভ জ্বালিয়া চা ও হালুয়া করে, আজ অন্ধকারের মধ্যে বারান্দার চেয়াবখানাতে বসিযাই রহিল, একমনে সে কি একটা ভাবিতেছিল—গভীরভাবে ভাবিতেছিল।

ঘরের মধ্যেই দেশলাই জ্বালার শব্দে সে চমকিয়া উঠিল। বুকেব ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল—মুহূর্তের জন্য মনে হইল যেন অপর্ণা আছে। এখানে থাকিলে এই সময় সে স্টোভ ধরাইত, সন্ধ্যা দিত। ডাকিয়া বলিল—কে?

পিন্টু আসিয়া বলিল—ও কাকাবাবু—মা আপনাদেব কেরোসিনের তেলের বোতলটা কোথায় জিজ্ঞেস করলে—

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—ঘরে কে রে, পিন্টু? তোর মা?...ও! বউ-ঠাকরুন?—বলিতে বলিতে সে উঠিয়া দেখিল পিন্টুর মা মেজেতে স্টোভ মুছিতেছে।

—বউ-ঠাকরুন, তা আপনি আবার কষ্ট করে কেন মিথ্যে—আমিই বরং ওটা—

তেলের বোতলটা দিয়া সে আবার আসিয়া বারান্দাতে বসিল। পিন্টুর মা স্টোভ জ্বালিয়া চা ও খাবার তৈরি করিয়া পিন্টুর হাতে পাঠাইয়া দিল ও রাত্রি নয়টার পর নিজের ঘর হইতে ভাত বাড়িয়া আনিয়া অপুদের ঘরের মেজেতে খাইবার ঠাঁই করিয়া ভাতের থালা ঢাকা দিয়া রাখিয়া গেল।

পিন্টুর বাবা সারিয়া উঠিয়াছেন, তবে এখনও বড়ো দুর্বল, লাঠি ধরিয়া সকালে বিকালে

একটু-আধটু গোলদিঘিতে বেড়াইতে যান, নিচের একঘর ভাড়াটে উঠিয়া যাওয়াতে সেই ঘরেই আজকাল ইঁহারা থাকেন। ডাক্তার বলিয়াছে, আর মাসখানেকের মধ্যে দেশে ফেরা চলিবে। পরদিন সকালেও পিন্টুর মা ভাত দিয়া গেল। বৈকালে আপিস হইতে আসিয়া কাপড় জামা না ছাড়িয়াই বাহিরে বারান্দাতে বসিয়াছে। বউটি স্টোভ ধরাইতে আসিল।

অপু উঠিয়া গিয়া বলিল—রোজ রোজ আপনাকে এ কষ্ট করতে হবে না, বউদি। আমি এই গোলদিঘির ধারের দোকান থেকে খেয়ে আসব চা।

বউদি বলিল—আপনি অত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন ঠাকুরপো, আমার আর কি কষ্ট? টুলটা নিয়ে এসে এখানে বসুন, দেখুন চা তৈরি করি।

এই প্রথম পিন্টুর মা তাহার সহিত কথা কহিল। পিন্টু বলিল—কাকাবাবু, আমাকে গোলদিঘিতে বেড়াতে নিয়ে যাবে? একটা ফুলের চারা তুলে আনব, এনে পুঁতে দেব।

বউটির বয়স ত্রিশের মধ্যে, পাতলা একহারা গড়ন, শ্যামবর্ণ, মাঝামাঝি দেখিতে, খুব ভালোও নয়, মন্দও নয়। অপু টুলটা দুয়ারের কাছে টানিয়া বসিল। বউটি চায়ের জল নামাইয়া বলিল—এক কাজ করি ঠাকুরপো, একেবারে চাট্টি ময়দা মেখে আপনাকে খানকতক লুচি ভেজে দি—কখানাই বা খান—একেবারে রাতের খাবারটা এই সঙ্গেই খাইয়ে দি—সারাদিন ক্ষিদেও তো পেয়েছে।

মেয়েটির নিঃসংকোচ ব্যবহারে তাহার নিজের সংকোচ ক্রমে চলিয়া যাইতেছিল। সে বলিল—বেশ। করুন মন্দ কি। ওরে পিন্টু, ওই পেয়ালাটা নিয়ে আয়—

—থাক, থাক ঠাকুরপো, আমি ওকে আলাদা দিচ্ছি। কেটলিতে এখনও চা আছে—আপনি খান। আপনাদের বেলুনটা কোথায় ঠাকুরপো?

—সত্যি আপনি বড্ড কষ্ট করছেন, বউ-ঠাকরুন—আপনাকে এত কষ্ট দেওয়াটা—

পিন্টুর মা বলিল—আপনি বার বার ওরকম বলছেন কেন? আপনারা আমার যা উপকার করেছেন, তা নিজের আত্মীয়ও করে না আজকাল। কে পরকে থাকবার জন্যে ঘর ছেড়ে দেয়? কিন্তু আমার সে বলবার মুখ তো দিলেন না ভগবান, কি কবি বলুন। আমি রুগী সামলে মেয়েকে যদি খাওয়াতে না পারি, তাই সে দুবেলা আপনি খেয়ে আপিসে গেলেই পিন্টুকে নিজে গিয়ে ডেকে এনে আপনার পাতে খাওয়াত। এক-একদিন—

কথা শেষ না করিয়াই পিন্টুর মা হঠাৎ চুপ করিল। অপুর মনে হইল ইহার সঙ্গে অপর্ণাব কথা কহিয়া সুখ আছে, এ বুঝিবে, অন্য কেহ বুঝিবে না।.

সারাদিন অপু কাজকর্মে ভুলিয়া থাকিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে, যখনই একটু মনে আসে অমনি একটা কিছু কাজ দিয়া সেটাকে চাপা দেয়। আগে সে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া কি ভাবিত, খাতাপত্রে গল্প কবিতা লিখিত—কাজ ফাঁকি দিয়া অন্য বই পড়িত। কিন্তু অপর্ণার মৃত্যুর পব হইতে সে দশগুণ খাটিতে লাগিল, সকলের কাছে কাজের তাগাদা করিয়া বেড়ায়, সারাদিনের কাজ দু-ঘণ্টায় করিয়া ফেলে, তাহার লেখা চিঠি টাইপ করিতে করিতে নৃপেন বিরক্ত হইয়া উঠিল।

পূর্ণিমা তিথিটা...অপর্ণা ছাদের আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া, এই তো গত কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে লক্ষ্মীর মতো মহিমময়ী, কি সুন্দর ডাগর চোখ দুটি, কি সুন্দর মুখশ্রী। অপুর মনে হইয়াছিল, ওর ঘাড় ফেরাইবার ভঙ্গিটা যেন রানীর মতো—এক এক সময় সম্ভ্রম আসে মনে। অপর্ণা হাসিয়া বলে—আমার যে লজ্জা করে, নইলে সকালে তোমার খাবার করে দিতে ইচ্ছে করে, আমার ছোট বোন লুচি ভাজতে জানে না,—সেজ খুড়িমা ছেলে সামলে সময় পান না—মা থাকেন ভাঁড়ারে, তোমার খাবার কষ্ট হয়—না? হঠাৎ অপুর মনে হয়—দূর ছাই—কি লিখে যাচ্ছি মিছে—কি হবে আর এসবে?

কি বিরাট শূন্যতা—কি যেন এক বিরাট ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, জীবনে আর কখনও তাহা পূর্ণ

হইবার নহে—কখনও না, কাহারও দ্বারা না—সম্মুখে বৃক্ষ নাই, লতা নাই, ফুলফল নাই—শুধু এক রুক্ষ, ধূসর বালুকাময় বহুবিস্তীর্ণ মরুভূমি!

মাসখানেক পরে পিন্টুর মা বলিল—কখনও ভাই দেখি নি, ঠাকুরপো। আপনাকে সেই ভাইয়ের মতো পেলুম, কিন্তু করতে পারলাম না কিছু—দিদি বলে যদি মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে যান—তবে জানব সত্যিই আমি ভাই পেয়েছি।

অপু সংসারের বহু দ্রব্য পিন্টুদের জিনিসপত্রের সঙ্গে বাঁধিয়া দিল—ডালা, কুলো, ধামা, বঁটি, চাকি, বেলুন। পিন্টুর মা কিছুতেই সে সব লইতে রাজি নয়—অপু বলিল, কি হবে বউদি, সংসার তো উঠে গেল, ওসব আর হবে কি, অন্য কাউকে বিলিয়ে দেওয়ার চেয়ে আপনারা নিয়ে যান, আমার মনে তৃপ্তি হবে তবুও।

মৃত্যুর পর কি হয় কেহই বলিতে পাবে না? দু-একজনকে জিজ্ঞাসাও করিল—ওসব কথা ভাবিয়া তো তাহাদের ঘুম নাই। মেসে বরদাবাবুর উপর তাহার শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহার কাছেও একদিন কথাটা পাড়িল। বরদাবাবু তাহাকে মামুলি সান্ত্বনাব কথা বলিয়া কর্তব্য সমাপন করিলেন। একদিন পল ও ভার্জিনিয়ার গল্প পড়িতে পড়িতে দেখিল মৃত্যুর পর ভার্জিনিয়া প্রণয়ী পলকে দেখা দিয়াছিল—হতাশ মন একটুকু সূত্রকেই ব্যগ্র আগ্রহে আঁকড়াইয়া ধরিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তবুও তো এতটুকু আলো!—সে আপিসে, মেসে, বাসায় যেসব লোকের সঙ্গে কারবাব করে—তাহারা নিতান্ত মামুলি ধরনের সাংসারিক জীব—অপুর প্রশ্ন শুনিযা তাহারা আড়ালে হাসে, চোখ টেপাটেপি করে—করুণার হাসি হাসে। এইটাই অপু বরদাস্ত করিতে পারে না আদৌ। একদিন একজন সন্ন্যাসীর সন্ধান পাইয়া দরমাহাটার এক গলিতে তাঁহার কাছে সকালের দিকে গেল। লোকের খুব ভিড়, কেহ দর্শনপ্রার্থী, কেহ ঔষধ লইতে আসিয়াছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর অপুর ডাক পড়িল। সন্ন্যাসী গেরুয়াধারী নহেন, সাদা ধুতি পরনে, গায়ে হাত-কাটা বেনিয়ান, জলচৌকিব উপব আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন। অপুর প্রশ্ন শুনিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—আপনার স্ত্রী কতদিন মারা গেছেন? মাস দুই?—তাঁর পুনর্জন্ম হয়ে গিয়েছে।

অপু অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি করে আপনি—মানে—

সন্ন্যাসীজী বলিলেন—মৃত্যুব সঙ্গে সঙ্গেই হয়। এতদিন থাকে না—আপনাকে বলে দিচ্ছি, বিশ্বাস করতে হয় এসব কথা। ইংরিজি পড়ে আপনারা তো এ সব মানেন না। তাই হতে হবে।

অপুর একথা আদৌ বিশ্বাস হইল না। অপর্ণা, তাহার অপর্ণা, আর মাস আট-নয় পরে অন্য দেশে কোন গৃহস্থের ঘরে সব ভুলিয়া ছোট খুকি হইযা জন্মিবে?...এত স্নেহ, এত প্রেম, এত মমতা—এসব ভুয়োবাজি? অসম্ভব।...সারারাত কিন্তু এই চিন্তায় সে ছটফট করিতে লাগিল—একবার ভাবে, হয়তো সন্ন্যাসী ঠিকই বলিযাছেন—কিন্তু তাব মন সায় দেয় না, মন বলে, ও-কথাই নয়—মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা...স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেও সে-কথা বিশ্বাস করিবে না। দুঃখের মধ্যে হাসিও পাইল।—ভাবিল অপর্ণার পুনর্জন্ম হয়ে গেছে, ওর কাছে টেলিগ্রাম এসেছে! হাম্‌বাগ কোথাকার—দ্যাখো না কাণ্ড!

এত ভয়ানক সঙ্গীহীনতার ভাব গত দশ-এগারো মাস তাহার হয় নাই। পিন্টুরা চলিয়া যাওয়ার পর বাসা ভালো লাগে না, অপর্ণার সঙ্গে বাসাটা এতখানি জড়ানো যে, আর সেখানে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তদুপরি বিপদ, গাঙ্গুলি-গিন্নি তাঁহাব কোন্ বোনঝির সঙ্গে তাহার বিবাহের যোগাযোগের জন্য একেবারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাহাকে একা একটু বসিতে দেখিলে সংসারের অসারত্ব, কথিত বোনঝিটির রূপগুণ, সম্মুখের মাঘ মাসে মেয়েটিকে একবার দেখিয়া আসিবার প্রস্তাব, নানা বাজে কথা।

নিজে রাঁধিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা—অবশ্য ইতিপূর্বে সে বরাবরই রাঁধিয়া খাইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু এবার যেন রাঁধিতে গিয়া কাহার উপর একটা সুতীব্র অভিমান। ঘরটাও বড়ো নির্জন, রাত্রিতে

প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে। পাষাণভারের মতো দারুণ নির্জনতা সব সময় বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া থাকে। এমন কি, শুধু ঘরে নয়, পথে-ঘাটে, আপিসেও তাই—মনে হয় জগতে কেহ কোথাও আপনার নাই।

তাহার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে ঠিকানা নাই—প্রণবও নাই এখানে। মুখের আলাপী দু-চারজন বন্ধু আছে বটে কিন্তু ও-সব বে-দরদী লোকের সঙ্গ ভালো লাগে না। রবিবার ও ছুটির দিনগুলি তো আর কাটেই না—অপুর মনে পড়ে বৎসরখানেক পূর্বেও শনিবারের প্রত্যাশায় সে-সব আগ্রহভরা দিন গণনা—আর আজকাল? শনিবার যত নিকটে আসে তত ভয় বাড়ে।

বৌবাজারের এক গলির মধ্যে তাহার এক কলেজ বন্ধুর পেটেন্ট ঔষধের দোকান। অপর্ণার কথা ভুলিয়া থাকিবার জন্য সে মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া বসে। এ রবিবার দিনটাও বেড়াইতে বেড়াইতে গেল। কারবারের অবস্থা খুব ভালো নয়। বন্ধুটি তাহাকে দেখিয়া বলিল—ও, তুমি?—আমার আজকাল হয়েছে ভাই—'কে আসিল বলে চমকিয়ে চাই, কাননে ডাকিলে পাখি'—সকাল থেকে হরদম পাওনাদার আসছে আর যাচ্ছে—আমি বলি বুঝি কোন্ পাওনাদার এলো, বোসো বোসো।

অপু বসিয়া বলিল—কাবুলীর টাকাটা শোধ দিয়েছ?

—কোথা থেকে দেব দাদা? সে এলেই পালাই, নয় তো মিথ্যে কথা বলি। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের দেনার দরুন—ছোট আদালতে নালিশ করেছিল, পরশু এসে বাক্সপত্র আদালতের বেলিফ্ সীল করে গিয়েছে। তোমার কাছে বলতে কি, এবেলার বাজার খরচটা পর্যন্ত নেই—তার ওপর ভাই বাড়িতে সুখ নেই। আমি চাই একটু ঝগড়াঝাঁটি হোক, মান-অভিমান হোক—তা নয়, বৌটা হয়েছে এমন ভালো মানুষ সাত চড়ে রা নেই—

অপু হাসিয়া উঠিয়া বলিল—বলো কি হে, সে তোমার ভালো লাগে না বুঝি?...

—রামোঃ—পান্‌সে লাগে, ঘোর পান্‌সে। আমি চাই একটু দুষ্টু হবে, একগুঁয়ে হবে—স্মার্ট হবে—তা নয় এত ভালো মানুষ, যা বলছি তাই করছে—সংসারের এই কষ্ট, হয়তো একবেলা খাওয়াই হল না—মুখে কথাটি নেই! কাপড় নেই—তাই সই, ডাইনে বললে তক্ষুনি ডাইনে, বাঁয়ে বললে বাঁয়ে—নাঃ, অসহ্য হয়ে পড়েছে।—বৈচিত্র্য নেই রে ভাই। পাশের বাসার বৌটা সেদিন কেমন স্বামীর উপর রাগ করে কাচের গ্লাস, হাতবাক্স দুমদাম করে আছাড় মেরে ভাঙলে, দেখে হিংসে হল, ভাবলুম হায় রে, আর আমার কি কপাল! না, হাসি না—আমি তোমাকে সত্যি সত্যি প্রাণের কথা বলছি ভাই—এরকম পান্‌সে ঘরকন্না আর আমার চলছে না—বিলিভ মি—অসম্ভব! ভালোমানুষ নিয়ে ধুয়ে খাব?...একটা দুষ্টু মেয়ের সন্ধান দিতে পারো?

—কেন আবার বিয়ে করবে নাকি?—একটাকে পারো না খেতে দিতে—তোমার দেখছি সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—

—না ভাই, এ সুখ আমার আর—জীবনটা এখন দেখছি একেবারে ব্যর্থ হল, মনের কোনও সাধ মিটল না।—এক এক সময় ভাবি ওর সঙ্গে আমার ঠিক মিলন হয়নি—মিলন যদি ঘটত তা হলে দ্বন্দ্বও হত—বুঝলে না?...কে, টেঁপি?—এই আমার বড়ো মেয়ে—শোন্, তোর মা'র কাছ থেকে দুটো পয়সা নিয়ে দু-পয়সার বেগুনি কিনে নিয়ে আয় তো আমাদের জন্যে, আর অমনি চায়ের কথা বলে দে—

—আচ্ছা মরণের পর মানুষ কোথায় যায় জানো? বলতে পারো?

—ওসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই নি কখনও। পাওনাদার কি করে তাড়ানো যায় বলতে পারো? এখুনি কাবুলিওয়ালা একটা আসবে নেবুতলা থেকে। আঠারো টাকা ধার নিয়েছি, চার আনা টাকা পিছু সুদ হপ্তায়। দু হপ্তার সুদ বাকি, কি যে আজ তাকে বলি?—স্কাউন্ড্রেলটা এলো বলে—দিতে পারো দুটো টাকা ভাই?

—এখন তো নেই কাছে, একটা আছে রেখে দাও। কাল সকালে আর একটা টাকা দিয়ে যাব এখন। এই যে টেঁপি, বেশ বেগুনি এনেছিস—না না, আমি খাব না, তোমরা খাও, আচ্ছা এই একখানা তুলে নিলাম, নিয়ে যা টেঁপি।

বন্ধুর দোকান হইতে বাহির হইয়া সে খানিকটা লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিল। লীলা এখানে আছে? একবার দেখিয়া আসিবে? প্রায় একবৎসর লীলারা এখানে নাই, তাহার দাদামহাশয় মামলা করিয়া লীলার পৈতৃক-সম্পত্তি কিছু উদ্ধার করিয়াছেন, আজকাল লীলা মায়ের সঙ্গে আবার বর্ধমানের বাড়িতেই ফিরিয়া গিয়াছে। থার্ড ইয়ারে ভর্তি হইয়া এক বৎসর পড়িয়াছিল—পরীক্ষা দেয় নাই, লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ভবানীপুরে লীলাদের ওখানে গেল। রামলগন বেয়ারা তাহাকে চেনে, বৈঠকখানায় বসাইল, মিঃ লাহিড়ী এখানে নাই, রাঁচি গিয়াছেন। লীলা দিদিমণি? কেন, সেকথা কিছু বাবুর জানা নাই? দিদিমণির তো বিবাহ হইয়া গিয়াছে গত বৈশাখ মাসে। নাগপুরে জামাইবাবু বড়ো ইঞ্জিনিয়ার, বিলাত-ফেরত—একেবারে খাঁটি সাহেব, দেখিলে চিনিবার জো নাই। খুব বড়োলোকের ছেলে—এদের সমান বড়োলোক। কেন, বাবুর কাছে নিমন্ত্রণেব চিঠি যায় নাই?

অপু বিবর্ণমুখে বলিল—কই না, আমার কাছে, হ্যাঁ—না আর বসব না—আচ্ছা।

বাহিরে আসিয়া জগৎটা যেন অপুর কাছে একেবারে নির্জন, সঙ্গীহীন, বিস্বাদ ও বৈচিত্র্যহীন ঠেকিল। কেন এরকম মনে হইতেছে তাহার? লীলা বিবাহ করিবে ইহার মধ্যে অসম্ভব তো কিছু নাই। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তবে তাহাতে মন খারাপ করিবার কি আছে? ভালোই তো। জামাই ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন—লীলার উপযুক্ত বব জুটিয়াছে, ভালোই তো।

রাস্তা ছাড়িয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সম্মুখের মাঠটাতে অর্ধ অন্ধকারের মধ্যে সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল।

লীলার বিবাহ হইয়াছে, খুবই আনন্দের কথা, ভালো কথা। ভালোই তো।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতা আর ভালো লাগে না, কিছুতেই না—এখানকার ধরাবাঁধা রুটিনমাফিক কাজ, বদ্ধতা, একঘেয়েমি—এ যেন অপুর অসহ্য হইয়া উঠিল। তা ছাড়া একটা যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন অস্পষ্ট ধারণা তাহার মনের মধ্যে ক্রমেই গড়িয়া উঠিতেছিল—কলিকাতা ছাড়িলেই যেন সব দুঃখ দূর হইবে—মনের শান্তি আবার ফিরিয়া পাওয়া যাইবে!

শীলেদের আফিসের কাজ ছাড়িয়া দিয়া অবশেষে সে চাঁপদানির কাছে একটা গ্রাম্য স্কুলের মাস্টারি লইয়া গেল। জায়গাটা না-শহর, না-পাড়াগাঁ গোছের—চারিধারে পাটের কল ও কুলিবস্তি, টিনের চালাওয়ালা দোকানঘর ও বাজার, কয়লার গুঁড়োফেলা রাস্তায় কালো ধুলা ও ধোঁয়া, শহরের পারিপাট্যও নাই, পাড়াগাঁয়ের সহজ শ্রীও নাই।

বড়োদিনের ছুটিতে প্রণব ঢাকা হইতে কলিকাতায় অপুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। সে জানিত অপু আজকাল কলিকাতায় থাকে না—সন্ধ্যার কিছু আগে সে গিয়া চাঁপদানি পৌঁছিল।

খুঁজিয়া খুঁজিয়া অপুর বাসাও বাহির করিল। বাজারের একপাশে একটা ছোট্ট ঘর—তার অর্ধেকটা একটা ডাক্তারখানা, স্থানীয় একজন হাতুড়ে ডাক্তার সকালে বিকালে রোগি দেখেন। বাকি অর্ধেকটাতে অপুর একখানা তক্তপোশ, একটা আধময়লা বিছানা, খানকতক কাপড় ঝুলানো। তক্তপোশের নিচে অপুর স্টিলের তোরঙ্গটা।

অপু বলিল—এসো এসো, এখানকার ঠিকানা কি করে জানলে?

—সে কথায় দরকার নেই। তারপর কলকাতা ছেড়ে এখানে কি মনে করে?—বাস্! এমন জায়গায় মানুষ থাকে?

—খারাপ জায়গাটা কি দেখলি? তাছাড়া কলকাতায় যেন আর ভালো লাগে না—দিনকতক এমন হল যে, বাইরে যেখানে হয় যাব, সেই সময় এখানকার মাস্টারিটা জুটে গেল, তাই এখানে এলুম। দাঁড়া, তোর চায়ের কথা বলে আসি—।

পাশেই একটা বাঁকুড়ানিবাসী বামুনের তেলেভাজা পরোটার দোকান। রাত্রে তাহারই দোকানে অতি অপকৃষ্ট খাদ্য কলঙ্ক-ধরা পিতলের থালায় আনীত হইতে দেখিয়া প্রণব অবাক হইয়া গেল—অপুর রুচি অন্তত মার্জিত ছিল চিরদিন, হয়তো তাহা সরল ছিল, অনাড়ম্বর ছিল, কিন্তু অমার্জিত ছিল না। সেই অপুর এ কি অবনতি! এ-রকম একদিন নয়, রোজই রাত্রে নাকি এই তেলেভাজা পরোটাই অপুর প্রাণধারণের একমাত্র উপায়। এত অপরিষ্কারও তো সে অপুকে কস্মিন্‌কালে দেখিয়াছে এমন মনে হয় না।

কিন্তু প্রণবের সবচেয়ে বুকে বাজিল যখন পরদিন বৈকালে অপু তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া পাশের এক স্যাকরার দোকানে নীচ-শ্রেণীর তাসের আড্ডায় অতি ইতর ও স্থূল ধরনের হাস্য পরিহাসের মধ্যে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া মহানন্দে তাস খেলিতে লাগিল।

অপুর ঘরটাতে ফিরিয়া আসিয়া প্রণব বলিল—কাল আমার সঙ্গে চল্ অপু—এখানে তোকে থাকতে হবে না—এখান থেকে চল্।

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল, কেন রে, কি খারাপ দেখলি এখানে? বেশ জায়গা তো, বেশ লোক সবাই। ওই যে দেখলি বিশ্বম্ভর স্বর্ণকার—উনি এদিকের একজন বেশ অবস্থাপন্ন লোক, ওঁর বাড়ি দেখিস নি? গোলা কত! মেয়ের বিয়েতে আমায় নেমন্তন্ন করেছিল, কি খাওয়ানোটাই খাওয়ালেন—উঃ! পরে খুশির সহিত বলিল—এখানে ওঁরা সব বলেছেন আমায় ধানের জমি দিয়ে বাস করাবেন—নিকটেই বেগমপুরে ওঁদের—বেশ জায়গা—কাল তোকে দেখাব চল্—ওঁরাই ঘরদোর বেঁধে দেবেন বলেছেন—আপাতত মাটির, মানে, বিচুলির ছাউনি; এদেশে উলুখড় হয় না কিনা!

প্রণব সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করিল—অপু তর্ক করিল, নিজের অবস্থার প্রাধান্য প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে নানা যুক্তির অবতারণা করিল, শেষে রাগ করিল, বিরক্ত হইল—যাহা সে কখনও হয় না। প্রকৃতিতে তাহার রাগ বা বিরক্তি ছিল না কখনও। অবশেষে প্রণব নিরুপায় অবস্থায় পরদিন সকালের ট্রেনে কলিকাতায় ফিবিয়া গেল।

যাইবার সময় তাহার মনে হইল, সে অপু যেন আর নাই—প্রাণশক্তির প্রাচুর্য একদিন যাহার মধ্যে উছলিয়া উঠিতে দেখিয়াছে, আজ সে যেন প্রাণহীন নিষ্প্রভ। এমনতর স্থূল তৃপ্তি বা সন্তোষ-বোধ, এ ধরনের আশ্রয় আঁকড়াইয়া ধরিবার কাঙালপনা কই অপুর প্রকৃতিতে তো ছিল না কখনও?

স্কুল হইতে ফিরিয়া রোজ অপু নিজের ঘরের রোয়াকে একটা হাতলভাঙা চেয়ার পাতিয়া বসিয়া থাকে। এখানে সে অত্যন্ত একা ও সঙ্গীহীন মনে করে, বিশেষ করিয়া সন্ধ্যাবেলা। সেটা এত অসহনীয় হইয়া ওঠে, কোথাও একটু বসিয়া গল্প-গুজব করিতে ভালো লাগে, মানুষের সঙ্গ স্পৃহণীয় মনে হয়, কিন্তু এখানে অধিকাংশই পাটকলের সর্দার, বাবু বাজারের দোকানদার, তাও সবাই তাহার পরিচিত। বিশু স্যাকরার দোকানের সান্ধ্য আড্ডা সে নিজে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে, তবুও নটা-দশটা পর্যন্ত রাত একরকম কাটে ভালোই।

অপুর ঘরের রোয়াকটার সামনেই মার্টিন কোম্পানির ছোট লাইন, সেটা পার হইয়া একটা পুকুর, জল যেমন অপরিষ্কার, তেমনি বিস্বাদ। পুকুরের ওপারে একটা কুলিবস্তি, দু-বেলা যত ময়লা কাপড় সবাই এই পুকুরেই কাচিতে নামে। রৌদ্র উঠিলেই কুলি লাইনের ছাপমারা খয়েরি রংয়ের

বারো-হাতি শাড়ি পুকুরের ও-পারের ঘাসের উপর রৌদ্রে মেলানো অপুর রোয়াক হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কুলিবস্তির ওপাশে গোটাকতক বাদাম গাছ, একটা ইটখোলা, খানিকটা ধানক্ষেত, একটা পাটের গাঁটবন্দী কল। এক এক দিন রাত্রে ইটের পাঁজার ফাটলে ফাটলে রাঙা ও বেগুনি আলো জ্বলে, মাঝে মাঝে নিভিয়া যায়, আবার জ্বলে, অপু নিজের রোয়াকে বসিয়া বসিয়া মনোযোগের সঙ্গে দেখে। রাত দশটায় মার্টিন লাইনের একখানা গাড়ি হাওড়ার দিক হইতে আসে—অপুর রোয়াক ঘেঁষিয়া যায়—পোঁটলা-পুঁটুলি, লোকজন, মেয়েরা—পাশেই স্টেশনে গিয়া থামে, একটু পরেই বাঁকুড়াবাসী ব্রাহ্মণটি তেলেভাজা পরোটা ও তরকারি আনিয়া হাজির করে, খাওয়া শেষ করিয়া শুইতে অপুর প্রায় এগারোটা বাজে। দিনের পর দিন একই রুটিন। বৈচিত্র্যই নাই, বদলও নাই।

অপু কাহারও সহিত গায়ে পড়িয়া আত্মীয়তা করিতে চায় যে, কোন মতলব আঁটিয়া তাহা নহে, ইহা সে যখনই করে, তখনই সে করে নিজের অজ্ঞাতসারে—নিঃসঙ্গতা দূর করিবার অচেতন আগ্রহে। কিন্তু নিঃসঙ্গতা কাটিতে চায় না সব সময়! যাইবার মতো জায়গা নাই, করিবার মতো কাজও নাই—চুপচাপ বসিয়া বসিয়া সময় কাটে না। ছুটির দিনগুলি তো অসম্ভব-রূপ দীর্ঘ হইয়া পড়ে।

নিকটেই ব্রাঞ্চ পোস্টাফিস। অপু রোজ বৈকালে ছুটির পরে সেখানে গিয়া বসিয়া প্রতিদিনের ডাক অতি আগ্রহের সহিত দেখে। ঠিক বৈকালে পাঁচটার সময় সাব্ অফিসের পিওন চিঠিপত্রভরা সীলকরা ডাক ব্যাগটি ঘাড়ে করিয়া আনিয়া হাজির করে, সীল ভাঙিয়া বড়ো কাঁচি দিয়া সেটার মুখের বাঁধন কাটা হয়। এক একদিন অপুই বলে—ব্যাগটা খুলি চরণবাবু?

চরণবাবু বলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, খুলুন না, আমি ততক্ষণ ইস্টাম্পের হিসেবটা মিলিয়ে ফেলি —এই নিন কাঁচি!

পোস্টকার্ড, খাম, খবরের কাগজ, পুলিন্দা, মনি-অর্ডার। চরণবাবু বলেন—মনি-অর্ডার সাতখানা? দেখেছেন কাণ্ডটা মশাই, এদিকে টাকা নেই মোটে। টোটালটা দেখুন না একবার দয়া করে—সাতান্ন টাকা ন আনা? তবেই হয়েছে—রইল পড়ে, আমি তো আর ইস্ত্রির গয়না বন্ধক দিয়ে টাকা এনে মনি-অর্ডার তামিল করতে পারি না মশাই? এদিকে ক্যাশ বুঝে নেওয়া চাই বাবুদের রোজ রোজ—

প্রতিদিন বৈকালে পোস্টমাস্টারের টহলদারি করা অপুর কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক কাজ। সাগ্রহে স্কুলের ছুটির পর পোস্টাফিসে দৌড়ানো চাই-ই তাহার। তাহার সবচেয়ে আকর্ষণের বস্তু খামের চিঠিগুলি। প্রতিদিনের ডাকে বিস্তর খামের চিঠি আসে—নানাধরনের খাম, সাদা, গোলাপী, সবুজ। চিঠি-প্রাপ্তিটা চিরদিনই জীবনের একটি দুর্লভ ঘটনা বলিয়া চিরদিনই চিঠির, বিশেষ করিয়া খামের চিঠির প্রতি তাহার কেমন একটা বিচিত্র আকর্ষণ। মধ্যে দু-বৎসর অপর্ণা সে পিপাসা মিটাইয়াছিল—এক একখানা খাম বা তাহার উপরের লেখাটা এতটা হুবহু সে রকম, যে প্রথমটা হঠাৎ মনে হয় বুঝি বা সেই-ই চিঠি দিয়াছে। একদিন শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাসায় এই রকম খামের চিঠি তাহারও কত আসিত।

তাহার নিজের চিঠি কোনদিন থাকে না, সে জানে তাহা কোথাও হইতে আসিবার সম্ভাবনা নাই—কিন্তু শুধু নানা ধরনের চিঠির বাহ্যদৃশ্যের মোহটাই তাহার কাছে অত্যন্ত প্রবল।

একদিন কাহার একখানি মালিকশূন্য সাকিমশূন্য পোস্টকার্ডের চিঠি ডেড-লেটার অফিস হইতে ঘুরিয়া সারা অঙ্গে ভক্ত বৈষ্ণবের মতো বহু ডাকমোহরের ছাপ লইয়া এখানে আসিয়া পড়িল। বহু সন্ধান করিয়াও তাহার মালিক জুটিল না। সেখানা রোজ এ-গ্রাম ও-গ্রাম হইতে ঘুরিয়া আসে—পিওন কৈফিয়ত দেয়, এ নামে কোন লোকই নাই এ অঞ্চলে। ক্রমে—চিঠিখানা অনাদৃত অবস্থায় এখানে-ওখানে পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল—একদিন ঘরঝাঁট দিবার সময় জঞ্জালের সঙ্গে কে সামনের মাঠে ঘাসের উপর ফেলিয়া দিয়াছিল, অপু কৌতূহলের সঙ্গে কুড়াইয়া লইয়া পড়িল—

শ্রীচরণকমলেষু,

মেজদাদা, আজ অনেকদিন যাবৎ আপনি আমাদের নিকট কোন পত্রাদি দেন না এবং আপনি কোথায় আছেন, কি ঠিকানা না জানিতে পারায় আপনাকেও আমরা পত্র লিখি নাই। আপনার আগের ঠিকানাতেই এ পত্রখানা দিলাম, আশা করি উত্তর দিতে ভুলিবেন না। আপনি কেন আমাদের নিকট পত্র দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন, তাহার কারণ বুঝিতে সক্ষম হই নাই। আপনি বোধ হয় আমাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহা না হইলে আপনি আমাদের এখানে না আসিলেও একখানা পত্র দিতে পারেন। এতদিন আপনার খবর না জানিতে পারিয়া কি ভাবে দিন যাপন করিতেছি তাহা সামান্য পত্রে লিখিলে কি বিশ্বাস করিবেন মেজদাদা? আমাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি একেবারেই ফুরাইয়া গিয়াছে? সে যা হোক, যেরূপ অদৃষ্ট নিয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেইরূপ ফল। আপনাকে বৃথা দোষ দিব না। আশা করি আপনি অসন্তোষ হইবেন না। যদি অপরাধ হইয়া থাকে, ছোট বোন বলিয়া ক্ষমা করিবেন। আপনার শরীর কেমন আছে, আপনি আমার সভক্তি প্রণাম জানিবেন, খুব আশা করি পত্রের উত্তর পাইব। আপনার পত্রের আশায় পথ চাহিয়া রহিলাম। ইতি—

সেবিকা

কুসুমলতা বসু

কাঁচা মেয়েলি হাতের লেখা, লেখায় অপটুত্ব ও বানান ভুলে ভরা। সহোদর বোনের চিঠি নয়, কারণ পত্রখানা লেখা হইতেছে জীবনকৃষ্ণ চক্রবর্তী নামের কোন লোককে। এত আগ্রহপূর্ণ, আবেগভরা পত্রখানার শেষকালে এই গতি ঘটিল? মেয়েটি ঠিকানা জানে না, নয় তো লিখিতে ভুলিয়াছে। অপটু লেখার ছত্রে ছত্রে যে আন্তরিকতা ফুটিয়াছে তাহার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য পত্রখানা সে তুলিয়া লইয়া নিজের বাক্সে আনিয়া রাখিল। মেয়েটির ছবি চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে—পনেরো-ষোল বৎসর বয়স, সুঠাম গঠন, ছিপছিপে পাতলা, একরাশ কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল মাথায়। ডাগর চোখ। ...কোথায় সে তাহার মেজদার পত্রের উত্তরের অপেক্ষায় বৃথাই পথ চাহিয়া আছে! মানবমনের এত প্রেম, এত আগ্রহভরা আহ্বান, পবিত্র বালিকাহৃদয়ের এ অমূল্য অর্ঘ্য কেন জগতে এভাবে ধুলায় অনাদরে গড়াগড়ি যায়, কেহ পোঁছে না, কেহ তা লইয়া গর্ব করে না?

বিশ্বম্ভর স্যাক্‌রার দোকানে সেদিন রাত এগারোটা পর্যন্ত জোর তাসের আড্ডা চলিল—সবাই উঠিতে চায়, সবাই বলে রাত বেশি হইয়াছে, অথচ অপু সকলকে অনুরোধ করিয়া বসায়, কিছুতেই খেলা ছাড়িতে চায় না। অবশেষে অনেক রাত্রে বাসায় ফিরিতেছে, কলুদের পুকুরের কাছে স্কুলের থার্ড পণ্ডিত আশু সান্যাল লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে চলিয়াছেন। অপুকে দেখিয়া বলিলেন, কি অপূর্ববাবু যে, এত রাত্রে কোথায়?

—কোথাও না; এই বিশু স্যাকরার দোকানে তাসের—

থার্ড পণ্ডিত এদিক-ওদিক চাহিয়া ভিন্নসুরে বলিলেন—একটা কথা আপনাকে বলি, আপনি বিদেশী লোক—পূর্ণ দীঘ্‌ড়ীর খপ্পরে পড়ে গেলেন কি করে বলুন তো?

অপু বুঝিতে না পারিয়া বলিল, খপ্পরে-পড়া কেমন বুঝতে পারছি নে—কি ব্যাপারটা বলুন তো?

পণ্ডিত আরও সুর নিচু করিয়া বলিল—ওখানে অত ঘন ঘন যাওয়া-আসা আপনার কি ভালো দেখাচ্ছে, ভাবছেন? ওদের টাকাকড়ি দেওয়া ও-সব? আপনি হচ্ছেন ইস্কুলের মাস্টার, আপনাকে নিয়ে অনেক কথা উঠেছে, তা বোধ করি জানেন না?

—না! কি কথা!

—কি কথা তা আর বুঝতে পারছেন না মশাই? হুঁ—পরে কিছু থামিয়া বলিলেন—ওসব ছেড়ে দিন, বুঝলেন? আরও একজন আপনার আগে ওই রকম ওদের খপ্পরে পড়েছিল, এখানকার নন্দ গুঁইয়ের আবগারি দোকানে কাজ করত, ঠিক আপনার মতো অল্প বয়স—মশাই, টাকা শুষে শুষে

তাকে একেবারে—ওদের ব্যবসাই ওই। সমাজে একঘরে করবার কথা হচ্ছে—থার্ড পণ্ডিত একটু থামিয়া একটু অর্থসূচক হাস্য করিয়া বলিলেন,—আর ও-মেয়ের এমন মোহই বা কি, শহর অঞ্চলে বরং ওর চেয়ে ঢের—

অপু এতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতের কথাবার্তার গতি ও বক্তব্য-বিষয়ের উদ্দেশ্য কিছুই ধরিতে পারে নাই—কিন্তু শেষের কথাটাতে সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোন্ মেয়ে, পটেশ্বরী?

—হ্যা হ্যা হ্যা, থাক্ থাক্, একটু আস্তে—

—কি করেছে বলছেন—পটেশ্বরী?

—আমি আর কি বলছি কিছু, সবাই যা বলে আমিও তাই বলছি। নতুন কথা আর কিছু বলছি কি? যাবেন না ও-সবে, তাতে বিদেশী লোক, সাবধান করে দি। ভদ্রলোকের ছেলে, নিজের চরিত্রটা আগে রাখতে হবে ভালো, বিশেষ যখন ইস্কুলের শিক্ষক এখানকার।

থার্ড পণ্ডিত পাশের পথে নামিয়া পড়িলেন, অপু প্রথমটা অবাক হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাসায় ফিরিতে ফিরিতে সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল।

পূর্ণ দীঘ্ড়ির বাড়িতে যাওয়া-আসার ইতিহাসটা এইরূপ—

প্রথমে এখানে আসিয়া অপু কয়েকজন ছাত্র লইয়া এক সেবা-সমিতি স্থাপন করিয়াছিল। একদিন সে স্কুল হইতে ফিরিতেছে, পথে একজন অপরিচিত প্রৌঢ় ব্যক্তি তাহার হাত দুটি জড়াইয়া ধরিয়া প্রায় ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, আপনারা না দেখলে আমার ছেলেটা মারা যেতে বসেছে—আজ পনেরো দিন টাইফয়েড, তা আমি কলের চাকরি বজায় রাখব, না রুগীর সেবা করব? আপনি দিন-মানটার জন্যে জনকতক ভলান্টিয়ার যদি আমার বাড়ি—আর সেই সঙ্গে যদি দু-একদিন আপনি—

তেত্রিশ দিনে রোগী আরাম হইল। এই তেত্রিশ দিনের অধিকাংশ দিনই অপু নিজে ছাত্রদেব সঙ্গে প্রাণপণে খাটিয়াছে। রাত্রি তিনটায় ঔষধ খাওযাইতে হইবে, অপু ছাত্রদিগকে জাগিতে না দিয়া নিজে জাগিয়াছে, তিনটা না বাজা পর্যন্ত বাহিরের দাওয়ার একপাশে বই পড়িয়া সময় কাটাইয়াছে, পাছে এমনি বসিয়া থাকিলে ঘুমাইয়া পড়ে।

একদিন দুপুরে টাল খাইয়া রোগী যায়-যায় হইয়াছিল। দীঘ্ড়ী মশায় পাটকলে, সে দিন ভলান্টিয়ার দলের আবার কেহই ছিল না, দুপুরে ভাত খাইতে গিয়াছিল। অপু দীঘ্ড়ী মহাশয়ের স্ত্রীকে ভরসা দিয়া বুঝাইয়া শান্ত রাখিয়া মেয়ে দুটির সাহায্যে গরম জল করাইয়া বোতলে পুরিয়া সেঁক-তাপ ও হাত-পা ঘষিতে ঘষিতে আবার দেহের উষ্ণতা ফিরিয়া আসে।

ছেলে সারিয়া উঠিলে দীঘ্ড়ী মশায় একদিন বলিলেন—আপনি আমার যা উপকারটা করেছেন মাস্টার মশায়—তা এক মুখে আর কি বলব। আমার স্ত্রী বলছিল, আপনাব তো রেঁধে খাওয়ার কষ্ট—এই একমাসে আপনি তো আমাদের লোক হয়ে পড়েছেন—তা আপনি কেন আমাদের ওখানেই খান না? আপন বাড়ির ছেলের মতো থাকবেন, খাবেন, কোনও অসুবিধে আপনার হবে না।

সেই হইতেই অপু এখানে একবেলা করিয়া খায়।

পরিচয় অল্প দিনের বটে কিন্তু বিপদের দিনের মধ্য দিয়া সে পরিচয়—কাজেই ঘনিষ্ঠতা ক্রমে আত্মীয়তায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। অপু পূর্ণ দীঘ্ড়ীর স্ত্রীকে শুধু 'মাসিমা' বলিয়া ডাকে তাহাই নয়, মাসের বেতন পাইলে সবটা আনিয়া নতুন-পাতানো মাসিমার হাতে তুলিয়া দেয়। সে-টাকার হিসাব প্রতি মাসের শেষে মাসিমা মুখে বুঝাইয়া দিয়া আরও চার-পাঁচ টাকা বেশি খরচ দেখাইয়া দেন এবং পরের মাসের মাহিনা হইতে কাটিয়া রাখেন। বাজারে বিশু স্যাকরা একদিন বলিয়াছিল—দীঘ্ড়িবাড়ি টাকা রাখবেন না অমন করে, ওরা অভাবী লোক, বিশেষ করে দীঘ্ড়ী-গিন্নি ভারি খেলোয়াড় মেয়েছেলে, বিদেশী লোক আপনি, আপনাকে বলে রাখি, ওদের সঙ্গে অত মেলামেশার দরকার কি আপনার?

মেয়ে দুইটিরও সঙ্গে সে মেশে বটে। বড়ো মেয়েটির নাম পটেশ্বরী, বয়স বছর চৌদ্দ-পনেরো হইবে, রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তবে তাহাকে দেখিয়া সুন্দরী বলিয়া কোনদিনই মনে হয় নাই অপুর। তবে এটুকু সে লক্ষ করিয়াছে, তাহার সুবিধা-অসুবিধার দিকে বাড়ির এই মেয়েটিই একটু বেশি লক্ষ্য রাখে। পটেশ্বরী না রাঁধিয়া দিলে অর্ধেক দিন বোধহয় তাহাকে না খাইয়াই স্কুলে যাইতে হইত। তাহার ময়লা রুমালগুলি নিজে চাহিয়া লইয়া সাবান দিয়া রাখে, ছোট ভাইয়ের হাতে টিফিনের সময় তাহার জন্য আটার রুটি পাঠাইয়া দেয়, অপু খাইতে বসিলে পান-সাজিয়া তাহার রুমালে জড়াইয়া রাখে। কি একটা ব্রতের সময় বলিয়াছিল, আপনার হাত দিয়ে ব্রতটা নেব মাস্টার মশায়! এ সবের জন্য সে মনে মনে মেয়েটির উপর কৃতজ্ঞ—কিন্তু এ সব জিনিস যে বাহিরের দিক হইতে এরূপ ভাবে দেখা যাইতে পারে, এ-কথা পর্যন্ত তাহার মনে কখনও উদয় হয় নাই—সে জানেই না, এ ধরনের সন্দিগ্ধ ও অশুচি মনোভাবের খবর।

সে বিস্মিত হইল, রাগও করিল। শেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া পরদিন হইতে পূর্ণ দীঘড়ীর বাড়ি যাওয়া-আসা বন্ধ করিল। ভাবিল—কিছু না, মাঝে পড়ে পটেশ্বরীকে বিপদে পড়তে হবে।

ইতিমধ্যে বাঁকুড়াবাসী বামুনটি রাশীকৃত বাজার-দেনা ফেলিয়া একদিন ঝাঁঝরা, হাতা এবং বেলুনখানা মাত্র সম্বল করিয়া চাঁপদানির বাজার হইতে রাতারাতি উধাও হইয়াছিল, সুতরাং আহারাদির খুবই কষ্ট হইতে লাগিল।

দীঘড়ী-বাড়ি হইতে ফিরিয়া সে মনে মনে ভাবিল, এ-রকম বাবা-মা তো কখনও দেখি নি? বেচারিকে এভাবে কষ্ট দেওয়া—ছিঃ—যাক ওদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আর রাখব না।

সেদিন ছুটির পর অপু একখানা খবরের কাগজ উলটাইতে উলটাইতে দেখিতে পাইল একটা শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধের লেখক তাহার বন্ধু জানকী এবং নামের তলায় ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা আছে—

On deputation to England.

জানকী ভালো করিয়া এম.এ. ও বি.টি. পাস করিবার পর গভর্নমেন্ট স্কুলে মাস্টারি করিতেছে এ-সংবাদ পূর্বেই সে জানিত কিন্তু তাহার বিলাত যাওয়ার কোন খবরই তাহার জানা ছিল না। কে-ই বা দিবে? দেখি দেখি—বা রে! জানকী বিলাত গিয়াছে, বাঃ—

প্রবন্ধটা কৌতূহলের সহিত পড়িল। বিলাতের একটা বিখ্যাত স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী ও ছাত্রজীবনের দৈনন্দিন ঘটনা সংক্রান্ত আলোচনা। বাহির হইয়া পথ চলিতে চলিতে ভাবিল, উঃ, জানকী যে জানকী সেও গেল বিলেত!

মনে পড়িল কলেজে জীবনের কথা—বাগবাজারের সেই শ্যামরায়ের মন্দির ও ঠাকুরবাড়ি—গরিব ছাত্রজীবনে জানকীর সঙ্গে কতদিন সেখানে খাইতে যাওয়ার কথা। ভালোই হইয়াছে, জানকী কম কষ্টটা করিয়াছিল কি একদিন! বেশ হইয়াছে, ভালোই হইয়াছে।

এ-অঞ্চলের রাস্তায় বড়ো ধুলো, তাহার উপর আবার কয়লার গুঁড়া দেওয়া—পথ হাঁটা মোটেই প্রীতিকর নয়। দুধারে কুলিবস্তি; ময়লা দড়ির চারপাই পাতিয়া লোকগুলা তামাক টানিতেছে ও গল্প করিতেছে। এ-পথে চলিতে চলিতে অপরিচ্ছন্ন, সংকীর্ণ বস্তিগুলির দিকে চাহিয়া সে কতবার ভাবিয়াছে, মানুষ কোন্ টানে, কিসের লোভে এ-ধরনের নরককুণ্ডে স্বেচ্ছায় বাস করে? জানে না, বেচারিরা জানে না, পলে পলে এই নোংরা আবহাওয়া তাহাদের মনুষ্যত্বকে, রুচিকে, চরিত্রকে, ধর্মস্পৃহাকে গলা টিপিয়া খুন করিতেছে। সূর্যের আলো কি ইহারা কখনও ভোগ করে নাই! বন্য-বনানীর শ্যামলতাকে ভালোবাসে নাই! পৃথিবীর মুক্ত রূপকে প্রত্যক্ষ করে নাই!

নিকটে মাঠ নাই, বেগমপুরের মাঠ অনেক দূরে, রবিবার ভিন্ন সেখানে যাওয়া চলে না। সুতরাং খানিকটা বেড়াইয়াই সে ফিরিল।

অনেকদিন হইতে এ-অঞ্চলের মাঠে ও পাড়াগাঁয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এদিকের গাছপালা ও বনফুলের একটা তালিকা ও বর্ণনা সে একখানা বড়ো খাতায় সংগ্রহ করিয়াছে। স্কুলের দু-একজন

মাস্টারকে দেখাইলে তাঁহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। ও-সবের কথা লইয়া আবার বই! পাগল আর কাকে বলে!

বাসায় আসিয়া আজ আর সে বিশু স্যাকরার আড্ডায় গেল না। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে জানকীর কথা মনে পড়িল। বিলাতে—তা বেশ। কতদিন গিয়াছে কে জানে? ব্রিটিশ মিউজিয়ম-টিউজিয়ম এতদিনে সব দেখা হইয়া গিয়াছে নিশ্চয়। পুরানো নর্ম্যান দুর্গ দু-একটা, পাশে পাশে, জুনিপারের বন, দূরে ঢেউ খেলানো মাঠের সীমায় খড়িমাটির পাহাড়ের পিছনে সন্ধ্যাধূসর আটলান্টিকের উদার বুকে অস্ত আকাশের রঙিন প্রতিচ্ছায়া, কি কি গাছ, পাড়াগাঁয়ের মাঠের ধারে বনের কি কি ফুল? ইংল্যান্ডের বনফুল নাকি ভারি দেখিতে সুন্দর—পপি, ক্লিম্যাটিস, ডেজি।

বিশু স্যাকরার দোকান হইতে লোক ডাকিতে আসে, আসিবার আজ এত দেরি কিসের? খেলুড়ে ভীম সাধুখাঁ, মহেশ সাঁবুই, নীলু ময়রা, ফকির আড্ডি—ইহারা অনেকক্ষণ আসিয়া বসিয়া আছে—মাস্টার মশায়ের যাইবার অপেক্ষায় এখনও খেলা যে আরম্ভ হয় নাই।

অপু যায় না—তাহার মাথা ধরিয়াছে—না—না—আজ সে আর খেলায় যাইবে না।

ক্রমে রাত্রি বাড়ে, পদ্মপুকুরের ওপারে কুলিবস্তির আলো নিবিয়া যায়, নৈশবায়ু শীতল হয়, রাত্রি সাড়ে দশটায় আপ ট্রেন হেলিতে-দুলিতে ঝক্‌ঝক্ শব্দে রোয়াকের কোল ঘেঁষিয়া চলিয়া যায়, পয়েন্টস্‌ম্যান আঁধারলণ্ঠন হাতে আসিয়া সিগন্যালের বাতি নামাইয়া লইয়া যায়। জিজ্ঞাসা করে—মাস্টারবাবু, এখনও বসিয়ে আছেন?

—কে ভজুয়া? হ্যাঁ—সে এখনও বসিয়া আছে।

কিসের ক্ষুধা! কিসের যেন একটা অতৃপ্ত ক্ষুধা।

ও-বেলা একখানা পুরানো জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল—একখানা খুব ভালো বই এ-সম্বন্ধে। শীলদের বাড়ির চাকরি জীবনে কিনিয়াছিল—এখান-হইতে অপর্ণাকে কতদিন নীহারিকা ও নক্ষত্রপুঞ্জের ফটোগ্রাফ দেখাইয়া বুঝাইয়া দিত—ও-বেলা যখন সেখানা লইয়া পড়িতেছিল, তখন তাহার চোখে পড়িল, অতি ক্ষুদ্র, সাদা রংয়ের—খালি চোখের খুব তেজ না থাকিলে দেখা প্রায় অসম্ভব—এরূপ একটা পোকা বইয়ের পাতায় চলিয়া বেড়াইতেছে। ওর সম্বন্ধে ভাবিয়াছিল—এই বিশাল জগৎ, নক্ষত্রপুঞ্জ, উল্কা, নীহারিকা, কোটি কোটি দৃশ্য-অদৃশ্য জগৎ লইয়া এই অনন্ত বিশ্ব—ও-ও তো এরই একজন অধিবাসী—এই যে চলিয়া বেড়াইতেছে পাতাটার উপরে, ও-ই ওর জীবনানন্দ—কতটুকু ওর জীবন, আনন্দ কতটুকু?

কিন্তু মানুষেরই বা কতটুকু? ওই নক্ষত্র-জগতের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধই বা কি? আজকাল তাহার মনে একটা নৈরাশ্য সন্দেহবাদের ছায়া মাঝে মাঝে যেন উঁকি মারে। এই বর্ষাকালে সে দেখিয়াছে, ভিজা জুতার উপর এক রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাতা গজায়—কতদিন মনে হইয়াছে মানুষও তেমনি পৃথিবীর পৃষ্ঠে এই রকম ছাতার মতো জন্মিয়াছে—এখানকার উষ্ণ বায়ুমণ্ডল ও তাহার বিভিন্ন গ্যাসগুলো প্রাণপোষণের অনুকূল একটা অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া। এরা নিতান্তই এই পৃথিবীর, এরই সঙ্গে এদের বন্ধন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো, ব্যাঙের ছাতার মতোই হঠাৎ গজাইয়া উঠে, লাখে লাখে পালে পালে জন্মায়, আবার পৃথিবীর বুকেই যায় মিলাইয়া। এরই মধ্য হইতে সহস্র ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনার আনন্দ, হাসি-খুশিতে দৈন্য-ক্ষুদ্রতাকে ঢাকিয়া রাখে—গড়ে চল্লিশটা বছর পরে সব শেষ। যেমন ওই পোকার সব শেষ হইয়া গেল তেমনি।

এই অবোধ জীবগণের সঙ্গে ওই বিশাল নক্ষত্রজগতের ওই গ্রহ, উল্কা, ধূমকেতু—ওই নিঃসীম নাক্ষত্রিক বিরাট শূন্যের কি সম্পর্ক? সুদূরের পিপাসাও যেমন মিথ্যা, অনন্ত জীবনের স্বপ্নও তেমনি মিথ্যা—ভিজা জুতার বা পচা বিচালি-গাদার ব্যাঙের ছাতার মতো যাহাদের উৎপত্তি—এই মহনীয় অনন্তের সঙ্গে তাহাদের কিসের সম্পর্ক?

মৃত্যুপারে কিছুই নাই, সব শেষ। মা গিয়াছেন—অপর্ণা গিয়াছে—অনিল গিয়াছে—সব দাঁড়ি পড়িয়া গিয়াছে—পূর্ণচ্ছেদ।

ওই জ্যোতির্বিজ্ঞানের বইখানাতে যে বিশ্বজগতের ছবি ফুটিয়াছে, ওই পোকাটার পক্ষে যেমন তাহার কল্পনা ও ধারণা অসম্ভব, এমন সব উচ্চতর বিবর্তনের প্রাণী কি নাই যাহাদের জগতের তুলনায় মানুষের জগৎটা ওই বইয়ের পাতায় বিচরণশীল প্রায় আণুবীক্ষণিক পোকাটার জগতের মতই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, নগণ্য?

হয়তো তাহাই সত্য, হয়তো মানুষের সকল কল্পনা, সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান মিলিয়া যে বিশ্বটার কল্পনা করিয়াছে সেটা বিরাট বাস্তবের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ নয়—তাহা নিতান্ত এ পৃথিবীর মাটির...মাটির...মাটির।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতের তুলনায় ওই পোকাটা এই জগতের মতো! হয়তো তাহাই, কে বলিবে হ্যাঁ কি না?

মানুষ মরিয়া কোথায় যায়? ভিজা জুতাকে রৌদ্রে দিলে তাহার উপরকার ছাতা কোথায় যায়?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

স্কুলের সেক্রেটারি স্থানীয় বিখ্যাত চাউল ব্যবসায়ী রামতারণ গুঁইয়ের বাড়ি এবার পূজার খুব ধুমধাম। স্কুলের বিদেশী মাস্টার মহাশয়েরা কেহ বাড়ি যান নাই, এই বাজারে চাকুরিটা যদি বা জুটিয়া গিয়াছে, এখন সেক্রেটারির মনস্তুষ্টি করিয়া সেটা তো বজায় রাখিতে হইবে! তাঁহারা পূজার কয়দিন সেক্রেটারির বাড়িতে প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া লোকজনের আদর-অভ্যর্থনা, খাওয়ানোর বিলি-বন্দোবস্ত প্রভৃতিতে মহাব্যস্ত, সকলেই বিজয়া দশমীর পরদিন বাড়ি যাইবেন। অপুর হাতে ছিল ভাঁড়ার ঘরের চার্জ—কয়দিন রাত্রি দশটা-এগারোটা পর্যন্ত খাটিবার পর বিজয়া দশমীর দিন বৈকালে সে ছুটি পাইয়া কলিকাতায় আসিল।

প্রায় এক বৎসরের একঘেয়ে, ওই পাড়াগেঁয়ে জীবনের পর বেশ লাগে শহরের এই সজীবতা! এই দিনটার সঙ্গে বহু অতীত দিনের নানা উৎসব-চপল আনন্দস্মৃতি জড়ানো আছে, কলিকাতায় আসিলেই যেন পুরানো দিনের সে-সব উৎসবরাজি তাহাকে পুরাতন সঙ্গী বলিয়া চিনিয়া ফেলিয়া প্রীতিমধুর কলহাস্যে আবার তাহাকে ব্যগ্র আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিবে। পথে চলিতে চলিতে নিজের ছেলের কথা মনে হইতে লাগিল বারবার। তাহাকে দেখা হয় নাই—কি জানি কি রকম দেখিতে হইয়াছে। অপর্ণার মতো, না তাহার মতো?...ছেলের উপর অপু মনে মনে খুব সন্তুষ্ট ছিল না, অপর্ণার মৃত্যুর জন্য সে মনে মনে ছেলেকে দায়ী করিয়া বসিয়াছিল বোধ হয়। ভাবিয়াছিল, পূজার সময় একবার সেখানে গিয়া দেখিয়া আসিবে—কিন্তু যাওয়ার কোন তাগিদ মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। চক্ষুলজ্জার খাতিরে খোকার পোশাকের দরুন পাঁচটি টাকা শ্বশুরবাড়িতে মনি-অর্ডার করিয়া পাঠাইয়া পিতার কর্তব্য সমাপন করিয়াছে।

আজিকার দিনে শুধু আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু তাহার কোনও পূর্বপরিচিত বন্ধু আজকাল আর কলিকাতায় থাকে না, কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়াইয়া প্রতিমা দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিল—কোথায় যাওয়া যায়?

তার পরে সে লক্ষ্যহীনভাবে চলিল। একটা সরু গলি, দুজন লোকে পাশাপাশি যাওয়া যায় না, দুধারে একতলা নিচু স্যাঁতসেঁতে ঘরে ছোট ছোট গৃহস্থেরা বাস করিতেছে—একটা রান্নাঘরে ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের একটি বৌ লুচি ভাজিতেছে, দুটি ছোট মেয়ে ময়দা বেলিয়া দিতেছে—অপু ভাবিল এক বৎসর পর আজ হয়তো ইহাদের লুচি খাইবার উৎসব-দিন। একটা উঁচু রোয়াকে অনেকগুলি

লোক ঝেলাকুলি করিতেছে, গোলাপি সিল্কের ফ্রকপরা কোঁকড়াচুল একটি ছোট মেয়ে দরজার পর্দা তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। একটা দৃশ্যে তাহার ভারি দুঃখ হইল। এক মুড়ির দোকানে প্রৌঢ়া মুড়িওয়ালীকে একটি অল্পবয়সি নীচশ্রেণীর পতিতা মেয়ে বলিতেছে—ও দিদি—দিদি? একটু পায়ের ধুলো দ্যাও। পরে পায়ের ধুলা লইয়া বলিতেছে, একটু সিদ্ধি খাওয়াবে না, শোনো—ও দিদি? মুড়িওয়ালী তাহার কথায় আদৌ কান না দিয়া সোনার মোটা অনন্ত-পরা ঝিয়ের সহিত কথাবার্তা কহিতেছে—মেয়েটি তাহার মনোযোগ ও অনুগ্রহ আকর্ষণ করিবার জন্য আবার প্রণাম করিতেছে ও আবার বলিতেছে—দিদি, ও দিদি?...একটু পায়ের ধুলো দ্যাও। পরে হাসিয়া বলিতেছে—একটু সিদ্ধি খাওয়াবে না, ও দিদি?

অপু ভাবিল, এ রূপহীনা হতভাগিনীও হয়তো কলকাতায় তাহার মতো একাকী, কোন খোলার ঘরের অন্ধকার গর্ভগৃহ হইতে আজিকার দিনের উৎসবে যোগ দিতে তাহার চুনুরি শাড়িখানা পরিয়া বাহির হইয়াছে। পাশের দোকানের অবস্থাপন্ন মুড়িওয়ালীর অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছে, উৎসবের অংশ হইতে যাহাতে সে বঞ্চিত না হয়। ওর চোখে ওই মুড়িওয়ালীই হয়তো কত বড়োলোক!

ঘুরিতে ঘুরিতে সেই কবিরাজ বন্ধুটির দোকানে গেল। বন্ধু দোকানেই বসিয়া আছে, খুব আদর করিয়া বলিল—এসো, এসো ভাই, ছিলে কোথায় এতদিন? বন্ধুর অবস্থা পূর্বাপেক্ষাও খারাপ, পূর্বের বাসা ছাড়িয়া নিকটের একটা গলিতে সাড়ে তিন টাকা ভাড়াতে এক খোলার ঘর লইয়াছে—নতুবা চলে না। বলিল—আর পারি নে, এখন হয়েছে দিন-আনি দিন-খাই অবস্থা। আমি আর স্ত্রী দুজনে মিলে বাড়িতে আচার-চাটনি, পয়সা প্যাকেট চা—এই সব করে বিক্রি করি—অসম্ভব স্ট্রাগল করতে হচ্ছে ভাই, এসো বাসায় এসো।

নিচু স্যাঁতসেতে ঘর। বন্ধুর বৌ বা ছেলেমেয়ে কেহই বাড়ি নাই—পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গলির মুখে বড়ো রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া প্রতিমা দেখিতেছে। বন্ধু বলিল—এবার আর ছেলেমেয়েদের কাপড়-টাপড় দিতে পারি নি—বলি ওই পুরানো কাপড়ই ধোপার বাড়ি থেকে কাচিয়ে পর্। বৌটার চোখে জল দেখে শেষকালে ছোট মেয়েটার জন্য এক খানা ডুরে শাড়ি—তাই। বোসো বোসো, চা খাও, বাঃ, আজকের দিনে যদি এলে। দাঁড়াও ডেকে আনি ওকে।

অপু ইতিমধ্যে গলির মোড়ের দোকান হইতে আট আনার খাবার কিনিয়া আনিল। খাবারের ঠোঙা হাতে যখন সে ফিরিয়াছে তখন বন্ধু ও বন্ধুপত্নী বাসায় ফিরিয়াছে।—বাঃ রে, আবার কোথায় গিয়েছিলে—ওতে কি? খাবার? বাঃ রে, খাবার তুমি আবার কেন—

অপু হাসিমুখে বলিল—তোমার আমার জন্য তো আনি নি? খুকি রয়েছে, ওই খোকা রয়েছে—এসো তো মানু—কি নাম? রমলা? ও বাবা, বাপের শখ দ্যাখো—রমলা! বৌ-ঠাকরুন—ধরুন তো এটা।

বন্ধুপত্নী আধঘোমটা টানিয়া প্রসন্ন হাসিভরা মুখে ঠোঙাটি হাত হইতে লইলেন। সকলকে চা ও খাবার দিলেন। সেই খাবারই।

আধঘণ্টাটাক পর অপু বলিল—উঠি ভাই, আবার চাঁপদানিতেই ফিরব—বেশ ভালো ভাই—কষ্টের সঙ্গে তুমি এই যে লড়াই করছ—এতে তোমাকে ভালো করে চিনে নিলাম—কিন্তু বৌ ঠাকরুনকে একটা কথা বলে যাই—অত ভালো মানুষ হবেন না—আপনার স্বামী তা পছন্দ করেন না। দু-একদিন একটু-আধটু চুলোচুলি, হাতা-যুদ্ধ, বেলুন-যুদ্ধ—জীবনটা বেশ একটু সরস হয়ে উঠবে—বুঝলেন না? এ আমার মত নয় কিন্তু, আমার এই বন্ধুটির মত—আচ্ছা আসি, নমস্কার।

বন্ধুটি পিছু পিছু আসিয়া হাসিমুখে বলিল—ওহে তোমার বৌ-ঠাকরুন বলছেন, ঠাকুরপোকে জিজ্ঞেস করো, উনি বিয়ে করবেন, না, এই রকম সন্ন্যিসি হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন?...উত্তর দাও।

অপু হাসিয়া বলিল—দেখে শুনে আর ইচ্ছে নেই ভাই, বলে দাও। বাহিরে আসিয়া ভাবে—আচ্ছা, তবুও এরা আজ ছিল বলে বিজয়ার আনন্দটা করা গেল। সত্যিই শান্ত বৌটি। ইচ্ছে করে এদের কোনও হেল্প করি—কি করে হয়, হাতে এদিকে পয়সা কোথায়?

তাহার পর কিসের টানে সে ট্রামে উঠিয়া একেবারে ভবানীপুরে লীলাদের বাড়ি গিয়া হাজির হইল। রাত তখন প্রায় সাড়ে-আটটা। লীলার দাদামশায়ের লাইব্রেরি-ঘরটাতে লোকজন কথাবার্তা বলিতেছে, গাড়িবারান্দাতে দুখানা মোটর দাঁড়াইয়া আছে—পোকার উপদ্রবের ভয়ে হলের ইলেকট্রিক আলোগুলিতে রাঙা সিল্কের ঘেরাটোপ বাঁধা। মার্বেলের সিঁড়ির ধাপ বাহিয়া হলের সামনের চাতালে উঠিবার সময় সেই গন্ধটা পাইল—কিসের গন্ধ ঠিক সে জানে না, হয়তো দামি আসবাবপত্রের গন্ধ, হয়তো লীলার দাদামশায়ের দামি চুরুটের গন্ধ—এখানে আসিলেই ওটা পাওয়া যায়।

লীলা—এবার হয়তো লীলা...অপুর বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

লীলার ছোট ভাই বিমলেন্দু তাহাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া হাত ধরিল।

এই বালকটিকে অপুর বড় ভালো লাগে—মাত্র বার দুই ইহার আগে সে অপুকে দেখিয়াছে, কিন্তু কি চোখেই যে দেখিয়াছে! একটু বিস্ময়-মাখানো আনন্দের সুরে বলিল—অপূর্ববাবু, আপনি এতদিন পর কোথা থেকে? আসুন আসুন, বসবেন। বিজয়ার প্রণামটা, দাঁড়ান।

—এসো এসো, কল্যাণ হোক, মা কোথায়?

—মা গিয়েছেন বাগবাজারের বাড়িতে—আসবেন এখুনি—বসুন।

—ইয়ে—তোমার দিদি এখানে তো?—না?—ও।

এক মুহূর্তে সারা বিজয়া দশমীর উৎসবটা, আজিকার সকল ছুটাছুটি ও পরিশ্রমটা অপুর কাছে বিস্বাদ, নীরস, অর্থহীন হইয়া গেল। শুধু আজ বলিয়া নয়, পূজা আরম্ভ হইবার সময় হইতেই সে ভাবিতেছে—লীলা পূজার সময় নিশ্চয় কলিকাতায় আসিবে—বিজয়ার দিন গিয়া দেখা করিবে। আজ চাঁপদানির চটকলে পাঁচটার ভোঁ বাজিয়া প্রভাত সূচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে অসীম আনন্দের সহিত বিছানায় শুইয়া ভাবিয়াছিল—বৎসর দুই পরে আজ লীলার সঙ্গে ওবেলা দেখা হইবে এখন। সেই লীলাই নাই এখানে!...

বিমলেন্দু তাহাকে উঠিতে দিল না। চা ও খাবার আনিয়া খাওয়াইল। বলিল—বসুন, এখন উঠতে দেব না, নতুন আইসক্রিমের কলটা এসেছে—বড়ো মামার বন্ধুদের জন্যে সিদ্ধির আইসক্রিম হচ্ছে—খাবেন সিদ্ধির আইসক্রিম? রোজ্ দেওয়া—আপনার জন্যে এক ডিশ আনতে বলে এলুম। আপনার গান শোনা হয় নি কতদিন, না সত্যি, একটা গান করতেই হবে—ছাড়ছি নে।

—লীলা কি সেই রায়পুরেই আছে? আসবে-টাসবে না?...

—এখন তো আসবে না দিদি—দিদির নিজের ইচ্ছেতে তো কিছু হবার জো নেই—দাদামশায় পত্র লিখেছিলেন, জামাইবাবু উত্তর দিলেন, এখন নয়, দেখা যাবে এর পর।

তাহার পর সে অনেক কথা বলিল। অপু এসব জানিত না।—জামাইবাবু লোক ভালো নয়, খুব রাগী, বদমেজাজী। দিদি খুব তেজী মেয়ে বলিয়া পারিয়া উঠে না—তবু ব্যবহার আদৌ ভালো নয়। নিচু সুরে বলিল—নাকি খুব মাতালও—দিদি তো সব কথা লেখে না, কিন্তু এবার বড়দিদির ছেলে কিছুদিন বেড়াতে গিয়েছিল নাকি গরমের ছুটিতে, সে এসে সব বললে। বড়দিদিকে আপনি চেনেন না? সুজাতাদি? এখানেই আছেন, এসেছেন আজ—ডাকব তাঁকে।

অপুর মনে পড়িল সুজাতাকে। বড়োবৌরানির মেয়ে বাল্যের সেই সুন্দরী, তন্বী সুজাতা—বর্ধমানের বাড়িতে তাহারই যৌবনপুষ্পিত তনুলতাটি একদিন অপুর অনভিজ্ঞ শৈশবচক্ষুর সম্মুখে নারী-সৌন্দর্যের সমগ্র ভাণ্ডার যেন নিঃশেষে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিল—বারো বৎসর পূর্বের সে উৎসবের দিনটা আজও এমন স্পষ্ট মনে পড়ে।

একটু পরে সুজাতা হাসিমুখে পর্দা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল, কিন্তু একজন অপরিচিত, সুদর্শন, তরুণ

যুবককে ঘরের মধ্যে দেখিয়া প্রথমটা সে তাড়াতাড়ি পিছু হটিয়া পর্দাটা পুনরায় টানিতে যাইতেছিল—বিমলেন্দু হাসিয়া বলিল—বাঃ রে, ইনিই তো অপূর্ববাবু, বড়দি চিনতে পারেন নি?

অপু উঠিয়া পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। সে সুজাতা আর নাই, বয়স ত্রিশ পার হইয়াছে, খুব মোটা হইয়া গিয়াছে, তার সামনের দিকে দু-এক গাছা চুল উঠিতে শুরু হইয়াছে, যৌবনের চটুল লাবণ্য গিয়া মুখে মাতৃত্বের কোমলতা। বর্ধমানে থাকিতে অপুর সঙ্গে একদিনও সুজাতার আলাপ হয় নাই—রাঁধুনীর ছেলের সঙ্গে বাড়ির বড়ো মেয়ের কোন্ আলাপই বা সম্ভব ছিল? সবাই তো আর লীলা নয়! তবে বাড়ির রাঁধুনী বাম্‌নীর ছেলেটিকে ভয়ে ভয়ে বড়োলোকের বাড়ির একতলা দালানের বারান্দাতে অনেকবার সে বেড়াইতে, ঘোরাফেরা করিতে দেখিয়াছে বটে।

সুজাতা বলিল—এসো এসো, বোসো। এখানে কি করো? মা কোথায়?

—মা তো অনেকদিন মারা গিয়াছেন।

—তুমি বিয়ে-থাওয়া করেছ তো—কোথায়?

সে সংক্ষেপে সব বলিল। সুজাতা বলিল—তা আবার বিয়ে করো নি? না, বিয়ে করে ফেলো, সংসারে থাকতে গেলে ওসব তো আছেই, বিশেষ যখন তোমাব মা-ও নেই। সে বাড়ির আর মেয়ে-টেয়ে নেই?

অপুর মনে হইল লীলা থাকলে, সে 'তোমার মা' এ কথা না বলিয়া শুধু 'মা' বলিত, তাহাই সে বলে। লীলার মতো আর কে এমন দয়াময়ী আছে যে তাহার জীবনে, তাহার সকল দারিদ্র্যকে, সকল হীনতাকে উপেক্ষা করিয়া পরিপূর্ণ করুণার ও মমতার স্নেহপাণি সহজ বন্ধুত্বের মাধুর্যে তাহার দিকে এমন প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল? সুজাতার কথার উত্তর দিতেই এ-কথাটা ভাবিয়া সে কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেল।

সুজাতা ভিতরে চলিয়া গেলে অপুর মনে হইল, শুধু মাতৃত্বের শান্ত কোমলতা নয়, সুজাতার মধ্যে গৃহিণীপনার প্রবীণতাও আসিয়া গিয়াছে। বলিল—আসি ভাই বিমল, আমার আবার সাড়ে দশটায় গাড়ি।

বিমলেন্দু তাহাকে আগাইয়া দিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূরে আসিল। বলিল—আর বছর ফাল্গুন মাসে দিদি এসেছিল, দিন পনেরো ছিল। কাউকে বলবেন না, আপনার পুরানো আপিসে একবার আমায় পাঠিয়েছিল আপনার খোঁজে—সবাই বললে তিনি চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছেন, কোথায় কেউ জানে না। আপনার কথা আমি লিখব, আপনার ঠিকানা দিন না?...দাঁড়ান, লিখে নি।

মাঘীপূর্ণিমার দিনটা ছিল ছুটি। সারাদিন সে আশেপাশের গ্রামগুলো পায়ে হাঁটিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। সন্ধ্যার অনেক পরে সে বাসায় আসিয়া শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল। কত রাত্রে জানে না, তক্তপোশের কাছের জানলাতে কাহার মৃদু করাঘাতের শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। শীত এখনও বেশি বলিয়া জানালা বন্ধই ছিল, বিছানার উপর বসিয়া সে জানলাটা খুলিয়া ফেলিল। কে যেন বাহিরের রোয়াকে জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়াইয়া। কে?...উত্তর নাই। সে তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিয়া বাহিরের রোয়াকে আসিয়া অবাক হইয়া গেল—কে একটি স্ত্রীলোক এত রাত্রে তাহার জানালার কাছে দেয়াল ঘেঁষিয়া বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

অপু আশ্চর্য হইয়া কাছে গিয়া বলিল—কে ওখানে? পরে বিস্ময়ের সুরে বলিল—পটেশ্বরী! তুমি এখানে এত রাত্রে? কোথা থেকে—তুমি শ্বশুরবাড়ি ছিলে, এখানে কি করে—

পটেশ্বরী নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল, কথা বলিল না—অপু চাহিয়া দেখিল, তাহার পায়ের কাছে একটা ছোট পুঁটুলি পড়িয়া আছে। বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেঁদো না পটেশ্বরী, কি হয়েছে বলো। আর এখানে এ-ভাবে দাঁড়িয়েও তো—শুনি কি হয়েছে? তুমি এখন আসছ কোত্থেকে বলো তো?

পটেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—রিষ্‌ড়ে থেকে হেঁটে আসছি—অনেক রাত্তিরে বেরিয়েছি, আমি আর সেখানে যাব না—

—আচ্ছা, চলো চলো, তোমায় বাড়িতে দিয়ে আসি—কি বোকা মেয়ে! এত রাত্তিরে কি এ ভাবে বেরুতে আছে? ছিঃ—আর এই কনকনে শীতে, গায়ে একখানা কাপড় নেই, কিছু না—এ কি ছেলেমানুষি!

—আপনার পায়ে পড়ি মাস্টারমশাই, আপনি বাবাকে বলবেন, আর যেন সেখানে না পাঠায়—সেখানে গেলে আমি মরে যাব—পায়ে পড়ি আপনার—

বাড়ির কাছাকাছি গিয়া বলিল—বাড়িতে যেতে বড্ড ভয় করছে, মাস্টারমশায়—আপনি একটু বলবেন বাবাকে মাকে বুঝিয়ে—

সে এক কাণ্ড আর কি অত রাত্রে! ভাগ্যে রাত অনেক, পথে কেহ নাই!

অপু তাহাকে সঙ্গে লইয়া দীঘড়ী-বাড়ি আসিয়া পটেশ্বরীর বাবাকে ডাকিয়া তুলিয়া সব কথা বলিল। পূর্ণ দীঘড়ী বাহিরে আসিলেন, পটেশ্বরী আমগাছের তলায় বসিয়া পড়িয়া হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে ও হাড়ভাঙা শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে—না একখানা শীতবস্ত্র, না একখানা মোটা চাদর।

বাড়ির মধ্যে গিয়া পটেশ্বরী কাঁদিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল—একটু পরে পূর্ণ দীঘড়ী তাহাকে ডাকিয়া বাড়ির মধ্যে লইয়া গিয়া দেখাইলেন পটেশ্বরীর হাতে, পিঠে, ঘাড়ের কাছে প্রহারের কালশিরার দাগ, এক এক জায়গায় রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছে—মাকে ছাড়া দাগগুলি সে আর কাহাকেও দেখায় নাই, তিনি আবার স্বামীকে দেখাইয়াছেন। ক্রমে জানা গেল পটেশ্বরী নাকি রাত বারোটা হইতে পুকুরের ঘাটে শীতের মধ্যে বসিয়া ভাবিয়াছে কি করা যায়—দু ঘণ্টা শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিবার পরও সে বাড়ি আসিবার সাহস সঞ্চয় করিতে না পারিয়া মাস্টার মহাশয়ের জানালায় শব্দ করিয়াছিল।

মেয়েকে আর সেখানে পাঠানো চলিতে পারে না এ কথা ঠিক। দীঘড়ী মশায় অপুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কোন উকিল বন্ধু আছে কি-না, এ সম্বন্ধে একটা আইনের পরামর্শ বিশেষ আবশ্যক—মেয়ের ভরণপোষণের দাবি দিয়া তিনি জামাইয়ের নামে নালিশ করিতে পারেন কিনা। অপু দিন দুই শুধুই ভাবিতে লাগিল এক্ষেত্রে কি করা উচিত।

সুতরাং স্বভাবতই সে খুব আশ্চর্য হইয়া গেল, যখন মাঘীপূর্ণিমার দিন পাঁচেক পবে সে শুনিল পটেশ্বরীর স্বামী আসিয়া পুনরায় তাহাকে লইয়া গিয়াছে।

কিন্তু তাহাকে আরও বেশি আশ্চর্য হইতে হইল, সম্পূর্ণ আর এক ব্যাপারে। একদিন সে স্কুল হইতে ছুটির পরে বাহিরে আসিতেছে, স্কুলেব বেহারা তাহার হাতে একখানা খামের চিঠি দিল—খুলিয়া পড়িল, স্কুলের সেক্রেটারি লিখিতেছেন, তাহাকে আর বর্তমানে আবশ্যক নাই—এক মাসের মধ্যে সে যেন অন্যত্র চাকুরি দেখিয়া লয়।

অপু বিস্মিত হইল—কি ব্যাপার! হঠাৎ এ নোটিশের মানে কি? সে তখনই হেডমাস্টারের কাছে গিয়া চিঠিখানি দেখাইল। তিনি নানা কারণে অপুর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। প্রথম, সেবাসমিতির দলগঠন অপুই করিয়াছিল, নেতৃত্বও করিত সে। ছেলেদের সে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, তাহার কথায় ছেলেরা ওঠে বসে। জিনিসটা হেডমাস্টারের চক্ষুশূল। অনেকদিন হইতেই তিনি সুযোগ খুঁজিতেছিলেন—ছিদ্রটা এত দিন পান নাই—পাইলে কি আর একটা অনভিজ্ঞ ছোকরাকে জব্দ করিতে এতদিন লাগিত?

হেডমাস্টার কিছু জানেন না—সেক্রেটারির ইচ্ছা, তাঁহার হাত নাই। সেক্রেটারি জানাইলেন, কথাটা এই যে, অপূর্ববাবুর নামে নানা কথা রটিয়াছে, দীঘড়ী-বাড়ির মেয়েটির এই সব ঘটনা লইয়া। অনেকদিন হইতেই এ লইয়া তাঁহার কানে কোন কোন কথা গেলেও তিনি শোনেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি ছেলেদের অভিভাবকদের মধ্যে অনেকে আপত্তি করিতেছেন যে, ওরূপ চরিত্রের শিক্ষককে কেন রাখা হয়। অপুর প্রতিবাদ সেক্রেটারি কানে তুলিলেন না।

—দেখুন, ওসব কথা আলাদা। আমাদের স্কুলের ও ছাত্রদের দিক থেকে এ ব্যাপারটা অন্যভাবে আমরা দেখব কিনা! একবার যাঁর নামে কুৎসা রয়েছে, তাঁকে আর আমরা শিক্ষক হিসাবে রাখতে পারি নে—তা সে সত্যিই হোক, বা মিথ্যাই হোক।

অপুর মুখ লাল হইয়া গেল এই বিরাট অবিচারে। সে উত্তেজিত সুরে বলিল—বেশ তো মশায়, এ বেশ জাস্টিস হল তো! সত্যি মিথ্যে না জেনে আপনারা একজনকে এই বাজারে অনায়াসে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিচ্ছেন—বেশ তো?

বাহিরে আসিয়া রাগে ও ক্ষোভে অপুর চোখে জল আসিয়া গেল। মনে ভাবিল এসব হেডমাস্টারের কারসাজি—আমি যাব তাঁর বাড়ি খোশামোদ করতে? যায় যাক চাকরি! কিন্তু এদের অদ্ভুত বিচার বটে—ডিফেন্ড করার একটা সুযোগ তো খুনী আসামিকেও দেওয়া হয়ে থাকে, তাও এরা আমায় দিলে না!

কয়দিন সে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এখানকার চাকুরির মেয়াদ তো আর এই মাসটা—তারপর কি করা যাইবে? স্কুলের এক নতুন মাস্টার কিছুদিন পূর্বে কোন এই মাসিক পত্রিকায় গল্প লিখিয়া দশটা টাকা পাইয়াছিলেন। গল্পটা সেই ভদ্রলোকের কাছে অপু অনেকবার শুনিয়াছে। আচ্ছা, সেও এখানে বসিয়া বসিয়া খাতায় একটা উপন্যাস লিখিতে শুরু করিয়াছিল—মনে মনে ভাবিল—দশ-বারো চ্যাপটার তো লেখা আছে, উপন্যাসখানা যদি লিখে শেষ করতে পারি, তার বদলে কেউ টাকা দেবে না? কেমন হচ্ছে কে জানে; একবার রামবাবুকে দেখাব।

নোটিশ-মতো অপুর কাজ ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই, একদিন পোস্টাফিসের ডাকব্যাগ খুলিয়া খাম ও পোস্টকার্ডগুলি নাড়িতে-চাড়িতে একখানা বড়ো, চৌকা সবুজ রংয়ের মোটা খামের ওপর নিজের নাম দেখিয়া বিস্মিত হইল—কে তাহাকে এত বড়ো শৌখিন খামে চিঠি দিল! প্রণব নয়, অন্য কেহ নয়, হাতের লেখাটা সম্পূর্ণ অপরিচিত।

খুলিয়া দেখিলেই তো তাহার সকল রহস্য এখনই চলিয়া যাইবে, কেন থাক, বাসায় গিয়া পড়িবে এখন। এই অজানার আনন্দটুকু যতক্ষণ ভোগ করা যায়।

রান্না খাওয়ার কাজ শেষ হইতে মার্টিন কোম্পানির রাত দশটার গাড়ি আসিয়া পড়িল, বাজারের দোকানে দোকানে ঝাঁপ পড়িল। অপু পত্রখানা খুলিয়া দেখিল—দুখানা চিঠি, একখানা ছোট চার-পাঁচ লাইনের, আর একখানা মোটা সাদা কাগজে—পরক্ষণেই আনন্দে, বিস্ময়ে, উত্তেজনায় তার বুকের রক্ত যেন চলকাইয়া উঠিয়া গেল মাথায়—সর্বনাশ, কার চিঠি এ! চোখকে যেন বিশ্বাস করা যায় না—লীলা তাহাকে লিখিতেছে! সঙ্গের চিঠিখানা তার ছোট ভাইয়ের—সে লিখিতেছে, দিদির এ-পত্রখানা তাহাদের পত্রের মধ্যে আসিয়াছে, অপুকে পাঠাইবার অনুরোধ ছিল দিদির, পাঠানো হইল।

অনেক কথা, ন'পৃষ্ঠা ছোট ছোট অক্ষরের চিঠি! খানিকটা পড়িয়া সে খোলা হাওয়ায় আসিয়া বসিল। কি অবর্ণনীয় মনোভাব, বোঝানো যায় না, বলা যায় না! আরম্ভটা এই রকম—

ভাই অপূর্ব,

অনেকদিন তোমার কোন খবর পাই নি—তুমি কোথায় আছ, আজকাল কি করো, জানবার ইচ্ছে হয়েছে অনেকবার কিন্তু কে বলবে, কার কাছেই বা খবর পাব? সেবার কলকাতায় গিয়ে বিনুকে একদিন তোমার পুরানো ঠিকানায় তোমার সন্ধানে পাঠিয়েছিলাম—সে বাড়িতে অন্য লোকে আজকাল থাকে, তোমার সন্ধান দিতে পারে নি, কি করেই বা পারবে? একথা বিনু বলে নি তোমায়?

আমি বড়ো অশান্তিতে আছি এখানে, কখনও ভাবি নি এমন আমার হবে। কখনও যদি দেখা হয় তখন সব বলব। এই সব অশান্তির মধ্যে যখন আবার মনে হয় তুমি হয়তো মলিনমুখে কোথায় পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ—তখন মনের যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায়। এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন বিনুর পত্রে জানলাম বিজয়া দশমীর দিন তুমি ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়েছিলে, তোমার ঠিকানাও পেলাম।

বর্ধমানের কথা মনে হয়? অত আদরের বর্ধমানের বাড়িতে আজকাল আর যাবার জো নেই।

জ্যাঠামশায় মারা যাওয়ার পর থেকেই রমেনদা বড়ো বাড়াবাড়ি করে তুলেছিল। আজকাল সে যা করছে, তা তুমি হয়তো কখনও শোনও নি। মানুষের ধাপ থেকে সে যে কত নিচে নেমে গিয়েছে, আর যা কীর্তিকারখানা, তা লিখতে গেলে পুঁথি হয়ে পড়ে। কোন্ মারোয়াড়ির কাছে নিজের অংশ বন্ধক রেখে টাকা ধার করেছিল—এখন তার পরামর্শে পার্টিশন স্যুট আরম্ভ করেছে—বিনুকে ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে। এ-সব তোমার মাথায় আসবে কোনও দিন?

কত রাত পর্যন্ত অপু চোখের পাতা বুজাইতে পারিল না। লীলা যাহা লিখিয়াছে তাহার অপেক্ষা বেশি যেন লেখে নাই। সারা পত্রখানিতে একটা শান্ত সহানুভূতি, স্নেহপ্রীতি, করুণা। এক মুহূর্তে আজ দু বৎসরব্যাপী এই নির্জনতা অপুর যেন কাটিয়া গেল—এইমাত্র সে ভাবিতেছিল সংসারে সে একা—তাহার কেহ কোথাও নেই। লীলার পত্রে জগতের চেহারা যেন এক মুহূর্তে বদলাইয়া গেল। কোথায় সে—কোথায় লীলা!..বহুদূরের ব্যবধান ভেদ করিয়া তাহার প্রাণের উষ্ণ প্রেমময় স্পর্শ অপুর প্রাণে লাগিয়াছে—কিন্তু কি অপূর্ব রসায়ন এ স্পর্শটা—কোথায় গেল অপুব চাকরি যাইবার দুঃখ—কোথায় গেল গোটা-দুই বৎসরের পাষাণভারের মতো নির্জনতা—নারীহৃদয়ের অপূর্ব রসায়নের প্রলেপ তাহার সকল মনে, সকল অঙ্গে, কী যে আনন্দ ছড়াইয়া দিল। লীলা যে আছে!...সব সময় তাহার জন্য ভাবে—দুঃখ করে! জীবনে অপু আর কি চায়?—সাক্ষাতের আবশ্যক নাই, জন্মজন্মান্তর ব্যাপিয়া এই স্পর্শটুকু অক্ষয় হইয়া বিরাজ করুক।

লীলার পত্র পাইবার দিন-বারো পরে তাহার যাইবার দিন আসিয়া গেল।

ছেলেরা সভা করিয়া তাহাকে বিদায় সম্বর্ধনা দিবার উদ্দেশ্যে চাঁদা উঠাইতেছিল—হেডমাস্টার খুব বাধা দিলেন। যাহাতে সভা না হইতে পারে সেইজন্য দলের চাঁইদিগকে ডাকিয়া টেস্ট পরীক্ষার সময় বিপদে ফেলিবেন বলিয়া শাসাইলেন—পরিশেষে স্কুল-ঘরে সভার স্থানও দিতে চাহিলেন না, বলিলেন—তোমরা ফেয়ারওয়েল দিতে যাচ্ছ, ভালো কথা, কিন্তু এসব বিষয়ে আয়রন ডিসিপ্লিন চাই—যার চরিত্র নেই, তার কিছুই নেই, তাব প্রতি কোনও সম্মান তোমরা দেখাও, এ আমি চাই নে, অন্তত স্কুল-ঘরে আমি তার জায়গা দিতে পাবি নে।

সেদিন আবার বড়ো বৃষ্টি। মহেন্দ্র সাঁবুই-এর আটচালায় জনত্রিশেক উপবেব ক্লাসেব ছেলে হেডমাস্টারের ভয়ে লুকাইয়া হাতে লেখা অভিনন্দনপত্র পড়িয়া ও গাঁদাফুলের মালা গলায় দিয়া অপুকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানাইল, সভা ভঙ্গের পর জলযোগ কবাইল। প্রত্যেকে পায়ের ধুলা লইযা, তাহার বাড়ি আসিয়া বিছানাপত্র গুছাইয়া দিযা, নিজেবা তাহাকে বৈকালে ট্রেনে তুলিযা দিল।

অপু প্রথমে আসিল কলিকাতায়।

একটা খুব লম্বা পাড়ি দিবে—যেখানে সেখানে—যেদিকে দুই চোখ যায়—এতদিনে সত্যিই মুক্তি। আর কোনও জালে নিজেকে জড়াইবে না—সব দিক হইতে সতর্ক থাকিবে—শিকলের বাঁধন অনেক সময় অলক্ষিতে জড়ায় কিনা পায়ে!

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে গিয়া সাবা ভারতবর্ষের ম্যাপ ও অ্যাটলাস কয়দিন ধরিয়া দেখিয়া কাটাইল—ডানিয়েলের ওরিয়েন্টাল সিনারি ও পিঙ্কার্টনের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের নানাস্থান নোট করিয়া লইল—বেঙ্গল নাগপুর ও ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলের নানাস্থানের ভাড়া ও অন্যান্য তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইল। সত্তর টাকা হাতে আছে, ভাবনা কিসের?

কিন্তু যাওয়ার আগে একবার ছেলেকে চোখের দেখা দেখিয়া যাওয়া দরকার না? সেই দিনই বিকালের ট্রেনে সে শ্বশুরবাড়ি রওনা হইল। অপর্ণার মা জামাইকে এতটুকু তিরস্কার করিলেন না, এতদিন ছেলেকে না দেখিতে আসার দরুন একটি কথাও বলিলেন না। বরং এত আদর-যত্ন করিলেন যে অপু নিজেকে অপরাধী ভাবিয়া সংকুচিত হইয়া রহিল। অপু বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা

কহিতেছে, এমন সময়ে তাহার খুড়শাশুড়ি একটি সুন্দর খোকাকে কোলে করিয়া সেখানে আসিলেন। অপু ভাবিল—বেশ খোকাটি তো! কাদের? খুড়শাশুড়ি বলিলেন—যাও তো খোকন, এবার তোমার আপনার লোকের কাছে! ধন্যি যা হোক, এমন নিষ্ঠুর বাপ কখনও দেখি নি! যাও তো একবার কোলে—

ছেলে তিন বৎসর প্রায় ছাড়াইয়াছে—ফুটফুটে সুন্দর গায়ের রং—অপর্ণার মতো ঠোঁট ও মুখের নিচেকার ভঙ্গি, চোখ বাপের মতো ডাগর ডাগর। কিন্তু সবসুদ্ধ ধরিলে অপর্ণার মুখের আদলই বেশি ফুটিয়া উঠে খোকার মুখে। প্রথমে সে কিছুতেই বাবার কাছে আসিবে না, অপরিচিত মুখ দেখিয়া ভয়ে দিদিমাকে জড়াইয়া রহিল—অপুর মনে ইহাতে আঘাত লাগিল। সে হাসিমুখে হাত বাড়াইয়া বার বার খোকাকে কোলে আনিতে গেল—ভয়ে শেষকালে খোকা দিদিমার কাঁধে মুখ লুকাইয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় খানিকটা ভাব হইল। তাহাকে দু-একবাব 'বাবা' বলিযা ডাকিলও। একবার কি একটা পাখি দেখিয়া বলিল—ফাখি, ফাখি, উই এত্তা ফাখি নেবো বাবা—

'প'কে কচি জিব ও ঠোঁটের কি কৌশলে 'ফ' বলিয়া উচ্চারণ করে, কেমন অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। আর এত কথাও বলে খোকা!

কিন্তু বেশির ভাগই বোঝা যায় না—উলটো-পালটা কথা, কোন্ কথার উপর জোর দিতে গিয়া কোন্ কথাব উপর দেয়—কিন্তু অপুর মনে হয় কথা কহিলে খোকার মুখ দিয়া মানিক ঝরে—সে যাহাই কেন বলুক না, প্রত্যেক ভাঙা, অশুদ্ধ, অপূর্ণ কথাটি অপুব মনে বিস্ময় জাগায়। সৃষ্টিব আদিম যুগ হইতে কোন শিশু যেন কখনও 'বাবা' বলে নাই, 'জল' বলে নাই,—কোন্ অসাধ্য সাধনই না তাহার খোকা করিতেছে!

পথে বাবার সঙ্গে বাহির হইয়াই খোকা বকুনি শুরু করিল। হাত পা নাড়িয়া কি বুঝাইতে চায় অপু না বুঝিয়াই অন্যমনস্ক সুরে ঘাড় নাড়িযা বলে—ঠিক ঠিক। তারপব কি হল বে খোকা?

একটা বড়ো সাঁকো পথে পড়ে, খোকা বলে—বাবা যাব—ওই দেখব।

অপু বলে—আস্তে আস্তে নেমে যা—নেমে গিয়ে একটা কু-উ করবি—

খোকা আস্তে আস্তে ঢালু বাহিয়া নিচে নামে—জলনিকাশেব পথটার ফাঁকে ওদিকের গাছপালা দেখা যাইতেছে—না বুঝিযা বলে—বাবা, এই মধ্যে একতা বাগান—

—কু করো তো খোকা, একটা কু করো।

খোকা উৎসাহের সহিত বাঁশির মতো সুরে ডাকে—কু-উ-উ—পবে বলে—তুমি কলুন বাবা?—

অপু হাসিয়া বলে—কু-উ-উ-উ-উ—

খোকা আমোদ পাইয়া নিজে আবার করে—আবার বলে—তুমি কলুন?—বাড়ি ফিরিবার পথে বলে, খবিছাক এনো বাবা—দিদিমা খবিছাক আঁড়্‌বে—খবিছাক ভালো—।

সন্ধ্যাবেলা খোকা আরও কত গল্প করে। এখানকার চাঁদ গোল। মাসিমার বাড়ি একবার গিয়াছিল, সেখানকার চাঁদ ছোট্ট—এত্তটুকু! অতটুকু চাঁদ কেন বাবা? শীঘ্রই অপু দেখিল, খোকা দুষ্টুও বড়ো। অপু পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া গুনিতেছে, খোকা দেখিতে পাইয়া চিৎকার করিয়া সবাইকে বলে—দ্যাখ, কত তাকা!—আয় আয়—

পরে একটা টাকা তুলিয়া লইয়া বলে—এতা আমি কিছুতি দেবো না।—হাতে মুঠো বাঁধিয়া থাকে—আমি কাঁচের ভাঁতা কিনব—

অপু ভাবে খোকাটা দুষ্টুও তো হয়েছে—না—দে—টাকা কি করবি?

—না কিছুতি দেবো না—হি-হি—ঘাড় দুলাইয়া হাসে।

অপুর টাকাটা হাত হইতে লইতে কষ্ট হয়—তবু লয়। একটা টাকার ওর কি দরকার? মিছিমিছি নষ্ট।

কলিকাতা ফিরিবার সময়ে অপর্ণার মা বলিলেন—বাবা আমার মেয়ে গিয়েছে, যাক—কিন্তু তোমার কষ্টই হয়েছে আমার বেশি! তোমাকে যে কি চোখে দেখেছিলাম বলতে পারি নে, তুমি যে এ-রকম পথে পথে বেড়াচ্ছ, এতে আমার বুক ফেটে যায়, তোমার মা বেঁচে থাকলে কি বিয়ে না করে পারতে? খোকনের কথাটাও তো ভাবতে হবে, একটা বিয়ে করো বাবা।

নৌকায় আবার পীরপুরের ঘাটে আসা। অপর্ণার ছোট খুড়তুতো ভাই ননী তাহাকে তুলিয়া দিতে আসিতেছিল।

খররৌদ্রে বড়দলের নোনাজল চক্‌চক্ করিতেছে। মাঝনদীতে একখানা বাদামতোলা মহাজনী নৌকা, দূরে বড়দলের মোহনার দিকে সুন্দরবনের ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট সীমারেখা।

আশ্চর্য! এরই মধ্যে অপর্ণা যেন কত দূরের হইয়া গিয়াছে। অসীম জলরাশির প্রান্তের ওই অনতিস্পষ্ট বনরেখার মতই দূরের—অনেক দূরের।

অপুদের ডিঙিখানা দক্ষিণতীর ঘেঁষিয়া যাইতেছিল, নৌকার তলায় ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ঢেউ লাগিতেছে, কোথাও একটা উঁচু ডাঙা, কোথাও পাড় ধ্বসিয়া নদীগর্ভে পড়িয়া যাওয়ায় কাশঝোপের শিকড়গুলা বাহির হইয়া ঝুলিতেছে। একটা জায়গায় আসিয়া অপুর হঠাৎ মনে হইল, জায়গাটা সে চিনিতে পারিয়াছে—একটা ছোট খাল, ডাঙার উপরে একটা হিজল গাছ। এই খালটিতেই অনেকদিন আগে অপর্ণাকে কলিকাতা হইতে আনিবার সময়ে সে বলিয়াছিল—ও কলা-বৌ, ঘোমটা খোল, বাপের বাড়ির দ্যাশটা চেয়েই দ্যাখ—

তারপর স্টিমার চড়িয়া খুলনা, বাঁ দিকে সে একবার চাহিয়া দেখিয়া লইল। ওই যে ছোট্ট খড়ের ঘরটি—প্রথম যেখানে সে ও অপর্ণা সংসার পাতে।

সেদিনকার সে অপূর্ব আনন্দমুহূর্তটিতে সে কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল যে, এমন একদিন আসিবে, যেদিন শূন্যদৃষ্টিতে খড়ের ঘরখানার দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সমস্ত ঘটনাটা মনে হইবে মিথ্যা স্বপ্ন?

নির্নিমেষ, উৎসুক, অবাক চোখে সেদিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অপুর কেমন এক দুর্দমনীয় ইচ্ছা হইতে লাগিল—একবার ঘরখানার মধ্যে যাইতে, সব দেখিতে। হয়তো অপর্ণার হাতের উনুনেব মাটির ঝিকটা এখনও আছে—আর যেখানে বসিয়া সে অপর্ণাব হাতের জলখাবার খাইয়াছিল। প্রথম যেখানটিতে অপর্ণা ট্রাঙ্ক হইতে আয়না চিরুনি বাহির করিয়া তাহাব জন্য রাখিয়া দিয়াছিল...

ট্রেনে উঠিয়া জানালার ধারে বসিয়া থাকে। স্টেশনের পর স্টেশন আসে ও চলিয়া যায়, অপু শুধুই ভাবে বড়দলের তীর, চাঁদাকাঁটাব বন, ভাঁটার জল কল কল করিয়া নাবিয়া যাইতেছে...একটি অসহায় ক্ষুদ্র শিশুব অবোধ হাসি—অন্ধকার রাত্রে বিকীর্ণ জলরাশির ওপারে কোথায় দাঁড়াইয়া অপর্ণা যেন সেই মনসাপোতার বাড়ির পুরাতন দিনগুলির মতো দুষ্টুমিভরা চোখে হাসিমুখে বলিতেছে—আর কক্ষনো যাবো না তোমার সঙ্গে। আর কক্ষনো না—দেখে নিয়ো।

ফাল্গুন মাস। কলিকাতায় সুন্দর দক্ষিণ হাওয়া বহিতেছে, সকালে একটু শীতও, বোর্ডিংয়ের বারান্দাতে অপু বিছানা পাতিয়া শুইয়াছিল। খুব ভোরে ঘুম ভাঙিয়া বিছানায় শুইয়া তাহার মনে হইল, আজ আর স্কুল নাই, টিউশনি নাই—আর বেলা দশটায় নাকে-মুখে গুঁজিয়া কোথাও ছুটিতে হইবে না—আজ সমস্ত সময়টা তাহার নিজের, তাহা লইয়া সে যাহা খুশি করিতে পারে—আজ সে মুক্ত!...মুক্ত!...মুক্ত!—আর কাহাকেও গ্রাহ্য করে না সে!...কথাটা ভাবিতেই সারা দেহ অপূর্ব উল্লাসে শিহরিয়া উঠিল—বাঁধন-ছেঁড়া মুক্তির উল্লাস। বহুকাল পর স্বাধীনতার আস্বাদন আজ পাওয়া গেল। ওই আকাশের ক্রমবিলীয়মান নক্ষত্রটার মতই আজ সে দূর পথের পথিক—অজানার উদ্দেশে সে যাত্রার আরম্ভ হয়তো আজই হয়, কি কালই হয়!

পুলকিত মনে বিছানা হইতে উঠিয়া নাপিত ডাকাইয়া কামাইল, ফরসা কাপড় পরিল। পুরাতন

শৌখিনতা আবার মাথাচাড়া দিয়া উঠার দরুন দরজির দোকানে একটা মটকার পাঞ্জাবি তৈয়ারি করিতে দিয়াছিল, সেটা নিজে গিয়া লইয়া আসিল। ভাবিল—একবার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখে আসি নতুন বই কি এসেছে, আবার কতদিনে কলকাতায় ফিরি কে জানে? বৈকালে মিউজিয়ামে রকফেলার ট্রাস্টের পক্ষ হইতে মশক ও ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা ছিল। অপুও গেল। বক্তৃতাটি সচিত্র। একটি ছবি দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। মশকের জীবনেতিহাসের প্রথম পর্যায়ে সেটা থাকে কীট—তারপর হঠাৎ কীটের খোলস ছাড়িয়া সেটা পাখা গজাইয়া উড়িয়া যায়। ঠিক যে সময়ে কীটদেহটা অসাড় প্রাণহীন অবস্থায় জলের তলায় ডুবিয়া যাইতেছে—নব-কলেবরধারী মশকটা পাখা ছাড়িয়া জল হইতে শূন্যে উড়িয়া গেল।

মানুষের তো এমন হইতে পারে! জলের তলায় সন্তরণকারী অন্যান্য মশক কীটের চোখে তাদের সঙ্গী তো মরিয়াই গেল—তাদের চোখের সামনে দেহটা তলাইয়া যাইতেছে। কিন্তু জলের উর্ধ্বে যে জগতে মশক নবজন্ম লাভ করিল, এরা তো তার কোনও খবরই রাখে না, সে জগতে প্রবেশের অধিকার তখনও তারা তো অর্জন করে নাই—মৃত্যুর দ্বারা, অন্তত তাদের চোখে তো মৃত্যু, তার দ্বারা। এই মশক নিম্নস্তরের জীব, তার পক্ষে যা বৈজ্ঞানিক সত্য, মানুষের পক্ষে তা কি মিথ্যা?

কথাটা সে ভাবিতে ভাবিতে ফিরিল।

যাইবার আগে একবার পরিচিত বন্ধুদের সহিত দেখা করিতে বাহির হইয়া পরদিন সকালে সে সেই কবিরাজ বন্ধুটির দোকানে গেল। দোকানে তাহার দেখা পাওয়া গেল না, উড়িয়া ছোকরা চাকরকে দিয়া খবর পাঠাইয়া পরে সে বাসার মধ্যে ঢুকিল।

সেই খোলার-বাড়ি—সেই বাড়িটাই আছে। সংকীর্ণ উঠানের একপাশে দুখানা বেলেপাথরের শিল পাতা। বন্ধুটি নোড়া দিয়া কি পিষিতেছে, পাশে বড়ো একখানা খবরের কাগজের উপর একরাশ ধূসর রংয়ের গুঁড়া। সারা উঠান জুড়িয়া কুলায় ডালায় নানা শিকড়-বাকড় রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে।

বন্ধু হাসিয়া বলিল—এসো এসো, তারপর এতদিন কোথায় ছিলে? কিছু মনে কোরো না ভাই, খারাপ হাত, মাজন তৈরি করছি—এই দ্যাখো না ছাপানো লেবেল—চন্দ্রমুখী মাজন, মহিলা হোম ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিন্ডিকেট—আজকাল মেয়েদের নাম না দিলে পাবলিকের সিমপ্যাথি পাওয়া যায় না, তাই ওই নাম দিয়েছি। বোসো বোসো—ওগো, বার হয়ে এসো না! অপূর্ব এসেছে, একটু চা-টা করো।

অপু হাসিয়া বলিল, সিন্ডিকেটের সভ্য তো দেখছি আপাতত মোটে দুজন, তুমি আর তোমার স্ত্রী এবং খুব যে অ্যাকটিভ সভ্য তাও বুঝছি।

হাসিমুখে বন্ধু-পত্নী ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অপুর মনে হইল, অন্য শিলখানাতে তিনিও কিছু পূর্বে মাজন-পেষা-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার আসিবার সংবাদ পাইয়া শিল ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে পলাইয়াছিলেন। হাত-মুখের গুঁড়া ধুইয়া ফেলিয়া সভ্য-ভব্য হইয়া বাহির হইলেও মাথার এলোমেলো উড়ন্ত চুলে ও কপালের পাশের ঘামে সে কথা জানাইয়া দেয়।

বন্ধু বলিল—কি করি বলো ভাই, দিনকাল যা পড়েছে, পাওনাদারের কাছে দুবেলা অপমান হচ্ছি, ছোট আদালতে নালিশ করে দোকানের ক্যাশবাক্স সীল করে রেখেছে। দিন একটা টাকা খরচ—বাসায় কোন দিন খাওয়া হয়, কোন দিন—

বন্ধু-পত্নী বাধা দিয়া বলিলেন, তুমি ও-কাঁদুনি গেয়ো অন্য সময়। এখন উনি এলেন এতদিন পর, একটু চা খাবেন, ঠাণ্ডা হবেন, তা না তোমার কাঁদুনি শুরু হল।

—আহা, আমি কি পথের লোককে ধরে বলতে যাই? ও আমার ক্লাসফ্রেন্ড, ওদের কাছে দুঃখের কথাটা বললেও—ইয়ে, পাতা চায়ের প্যাকেট একটা খুলে নাও না? আটা আছে নাকি? আর দ্যাখো, না হয় ওকে খানচারেক রুটি অন্তত—

—আচ্ছা, সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। পরে অপুর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—আপনি সেই বিজয়া দশমীর পর আর একদিনও এলেন না যে বড়ো?

চা ও পরোটা খাইতে খাইতে অপু নিজের কথা সব বলিল—শীঘ্রই বাহিরে যাইতেছে সে কথাটাও বলিল। বন্ধু বলিল—তবেই দ্যাখো ভাই, তবু তুমি একা আর আমি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এই কলকাতা শহরের মধ্যে আজ পাঁচ-পাঁচটি বছর যে কি করে দিন কাটাচ্ছি তা আর—এই সব নিয়ে একরকম চালাই, পয়সা-প্যাকেট চা আছে, খদিরাদি মোদক আছে। মাজনের লাভ মন্দ না, কিন্তু কি জানো, এই কৌটোটা পড়ে যায় দেড় পয়সার ওপর, মাজনে, লেবেলে, ক্যাপসুলে তাও প্রায় দু-পয়সা—তোমার কাছে আর লুকিয়ে কি করব, স্বামী-স্ত্রীতে খাটি কিন্তু মজুরী পোষায় কি? তবুও তো দোকানীর কমিশন ধরি নি হিসেবের মধ্যে। এদিকে চার পয়সার বেশি দাম করলে কম্‌পিট করতে পারব না।

খানিক পরে বন্ধু বলিল—ওহে তোমার বৌঠাকরুন বলছেন, আমাদের তো একটা খাওয়া পাওনা আছে, এবার সেটা হয়ে যাক না কেন? বেশ একটা ফেয়ারওয়েল ফিস্ট হয়ে যাবে এখন, তবে উলটো, এই যা—

অপু মনে মনে ভারি কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিল বন্ধু-পত্নীর প্রতি। ইহাদের মলিন বেশ ছেলেমেয়েগুলির শীর্ণ চেহারা হইতে ইহাদের ইতিহাস সে ভালোই বুঝিয়াছিল। কিছু ভালো খাবার আনাইয়া খাওয়ানো, একটু আমোদ আহ্লাদ করা—কিন্তু হয়তো সেটা দরিদ্র সংসারে সাহায্যের মতো দেখাইবে। যদি ইহারা না লয় বা মনে কিছু ভাবে? ও-পক্ষ হইতে প্রস্তাবটা আসাতে সে ভারি খুশি হইল।

ভোজের আয়োজনে ছ-সাত টাকা ব্যয় করিয়া অপু বন্ধুর সঙ্গে ঘুরিয়া বাজার করিল। কইমাছ, গলদা-চিংড়ি, ডিম, আলু, ছানা, দই, সন্দেশ।

হয়তো খুব বড়ো ধরনের কিছু ভোজ নয়, কিন্তু বন্ধু-পত্নীর আদরে হাসিমুখে তাহা এত মধুর হইয়া উঠিল। এমন কি এক সময়ে অপুর মনে হইল আসলে তাহাকে খাওয়ানোর জন্যই বন্ধু-পত্নীর এ ছল। লোকে ইষ্টদেবতাকেও এত যত্ন করে না বোধ হয়। পিছনে সব সময় বন্ধুর বৌটি পাখা হাতে বসিয়া তাহাদের বাতাস করিতেছিলেন, অপু হাত উঠাইতেই হাসিমুখে বলিলেন—ও হবে না, আপনি আর একটু ছানার ডালনা নিন—ও কি, মোচার চপ পাতে রাখলেন কার জন্যে? সে শুনব না—

এই সময় একটি পনেরো-ষোল বছরের ছেলে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। বন্ধু বলিল—এসো, এসো কুঞ্জ, এসো বাবা, এইটি আমার শালীর ছেলে, বাগবাজারে থাকে। আমার সে ভায়েরা-ভাই মারা গেছে গত শ্রাবণ মাসে। পাটের প্রেসে কাজ করত, গঙ্গার ঘাটে রেললাইন পেরিয়ে আসতে হয়। তা রোজই আসে, সেদিন একখানা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তা ভাবলে, আবার অতখানি ঘুরে যাবে? যেমন গাড়ির তলা দিয়ে গলে আসতে গিয়েছে আর অমনি গাড়িখানা দিয়েছে ছেড়ে। তারপর চাকায় কেটে-কুটে একেবারে আর কি—দুটি মেয়ে, আমার শালী আর এই ছেলেটি, একরকম করে বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে চলছে। উপায় কি?...তাই আজ ভালো খাওয়াটা আছে, কাল স্ত্রী বললে, যাও কুঞ্জকে বলে এসো—ওরে বসে যা বাবা, থালা না থাকে পাতা একখানা পেতে। হাত-মুখটা ধুয়ে আয় বাবা—এত দেরি করে ফেললি কেন?

বেলা বেশি ছিল না। খাওয়াদাওয়ার পর গল্প করিতে করিতে অনেক রাত হইয়া গেল। অপু বলিল, আচ্ছা, আজ উঠি ভাই, বেশ আনন্দ হল আজ অনেকদিন পরে—

বন্ধু বলিল, ওগো, অপূর্বকে আলোটা ধরে গলির মুখটা পার করে দাও তো? আমি আর উঠতে পারি নে—

একটা ছোট কেরোসিনের টেমি হাতে বউটি অপুর পিছনে পিছনে চলিল।

অপু বলিল, থাক বৌ-ঠাকরুন, আর এগোবেন না, এমন আর কি অন্ধকার, যান আপনি—

—আবার কবে আসবেন?

—ঠিক নেই, এখন একটা লম্বা পাড়ি তো দি—

—কেন, একটা বিয়ে-থা করুন না? পথে পথে সন্ন্যাসী হয়ে এ রকম বেড়ানো কি ভালো? মাও তো নেই শুনেছি। কবে যাবেন আপনি?...যাবার আগে একবার আসবেন না, যদি পারেন।

—তা হয়ে উঠবে না বৌ-ঠাকরুন। ফিরি যদি আবার তখন বরং—আচ্ছা নমস্কার।

বউটি টেমি হাতে গলির মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

পরদিন সে সকালে উঠিয়া ভাবিয়া দেখিল, হাতের পয়সা নানারকমে উড়িয়া যাইতেছে, আর কিছুদিন দেরি করিলে যাওয়াই হইবে না। এখানেই আবার চাকরির উমেদার হইয়া দোরে দোরে ঘুরিতে হইবে। কিন্তু আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও কিছু ঠিক হইল না। একবার মনে হয় এটা ভালো, আবার মনে হয় ওটা ভালো। অবশেষে স্থির করিল স্টেশনে গিয়া সম্মুখে যাহা পাওয়া যাবে, তাহাতেই উঠা যাইবে। জিনিসপত্র বাঁধিয়া গুছাইয়া হাওড়া স্টেশনে গিয়া দেখিল, আর মিনিট পনেরো পরে চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম হইতে গয়া প্যাসেঞ্জার ছাড়িতেছে। একখানা থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনিয়া সোজা ট্রেনে উঠিয়া জানালার ধারের একটা জায়গায় সে নিজের বিছানাটি পাতিয়া বসিল।

অপু কি জানিত এই যাত্রা তাহাকে কোন্ পথে চালিত করিয়া লইয়া চলিয়াছে? এই চারটা বিশ মিনিটের গযা প্যাসেঞ্জার—পরবর্তী জীবনে সে কতবার ভাবিয়াছে যে সে তো পাঁজি দেখিয়া যাত্রা শুরু করে নাই, কিন্তু কোন্ মহাশুভ মাহেন্দ্রক্ষণে সে হাওড়া স্টেশনে থার্ড ক্লাস টিকিট ঘরের ঘুলঘুলিতে ফিবিঙ্গি মেয়ের কাছে গিয়া একখানা টিকিট চাহিয়াছিল—দশ টাকার একখানী নোট দিয়া সাড়ে পাঁচ টাকা ফেরত পাইয়াছিল। মানুষ যদি তাহার ভবিষ্যৎ জানিতে পারিত!

অপু বর্তমানে এসব কিছুই ভাবিতেছিল না। এত বয়স হইল, কখনও সে গ্র্যান্ডকর্ড লাইনে বেড়ায় নাই, সেই ছোটবেলায় দুটিবার ছাড়া ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলেও আর কখনও চড়ে নাই, রেলে চড়িয়া দূরদেশে যাওয়ার আনন্দে সে ছেলেমানুষের মতই উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।

রাস্তার ধাবে গাছপালা ক্রমশ কিরূপ বদলাইয়া যায়, লক্ষ করিবার ইচ্ছা অনেকদিন হইতে তাহার আছে, বর্ধমান পর্যন্ত দেখিতে দেখিতে গেল কিন্তু পরেই অন্ধকারে আর দেখা গেল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন বৈকালে গয়ায় নামিয়া সে বিষ্ণুপাদমন্দিরে পিণ্ড দিল। ভাবিল, আমি এসব মানি বা না মানি, কিন্তু সবটুকু তো জানি নে? যদি কিছু থাকে, বাপ-মায়ের উপকারে লাগে! পিণ্ড দিবার সময়ে ভাবিয়া ভাবিয়া ছেলেবেলায় বা পরে যে যেখানে মারা গিয়াছে বলিয়া জানা ছিল, তাহাদের সকলেরই উদ্দেশে পিণ্ড দিল। এমন কি, পিসিমা ইন্দির ঠাকরুনকে সে মনে করিতে না পারিলেও দিদির মুখে শুনিয়াছে, তাঁর উদ্দেশে—আতুরী ডাইনি বুড়ির উদ্দেশেও।

বৈকালে বুদ্ধগয়া দেখিতে গেল। অপুর যদি কাহারও উপর শ্রদ্ধা থাকে তবে তাহার আবাল্য শ্রদ্ধা এই সত্যদ্রষ্টা মহাসন্ন্যাসীর উপর। ছেলের নাম তাই সে রাখিয়াছে অমিতাভ।

বামে ক্ষীণস্রোতা ফল্গু কটা রংয়ের বালুশয্যায় ক্লান্তদেহ এলাইয়া দিয়াছে, ওপারে হাজারিবাগ জেলার সীমান্তবর্তী পাহাড়শ্রেণী, সারাপথে ভারি সুন্দর ছায়া, গাছপালা, পাখির ডাক, ঠিক যেন বাংলাদেশ, সোজা বাঁধানো রাস্তাটি ফল্গুর ধারে ধারে ডালপালার ছায়ায় ছায়ায় চলিয়াছে, সারাপথ অপু স্বপ্নাভিভূতের মতো এক্কার উপর বসিয়া রহিল। একজন হালফ্যাশানের কাপড়পরা তরুণী মহিলা

ও সম্ভবত তাঁহার স্বামী মোটরে বুদ্ধগয়া হইতে ফিরিতেছিলেন, অপু ভাবিল হাজার হাজার বছর পরেও এ কোন্ নূতন যুগের ছেলেমেয়ে প্রাচীনকালের সেই পীঠস্থানটি এমন সাগ্রহে দেখিতে আসিয়াছিল? মনে পড়ে সেই অপূর্ব রাত্রি, নবজাত শিশুর চাঁদমুখ...ছন্দক...গয়ার জঙ্গলে দিনের পর দিন সে কি কঠোর তপস্যা। কিন্তু এ মোটর গাড়ি? শতাব্দীর ঘন অরণ্য পার হইয়া এমন একদিন নামিয়াছে পৃথিবীতে পুরাতনের সবই চূর্ণ করিয়া, উলটাইয়া-পালটাইয়া নরযুগের পত্তন করিয়াছে। রাজা শুদ্ধোদনের কপিলাবস্তুও মহাকালের স্রোতের মুখে ফেনার ফুলের মতো কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, কোন চিহ্নও রাখিয়া যায় নাই—কিন্তু তাঁহার দিগ্বিজয়ী পুত্র দিকে দিকে যে বৃহত্তর কপিলাবস্তুর অদৃশ্য সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার প্রভুত্বের নিকট এই আড়াই হাজার বৎসর পরেও কে না মাথা নত করিবে?

গয়া হইতে পরদিন সে দিল্লি এক্সপ্রেসে চাপিল—একেবারে দিল্লির টিকিট কাটিয়া। পাশের বেঞ্চিতেই একজন বাঙালি ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রী যাইতেছিলেন। কথায় কথায় ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ হইয়া গেল। গাড়িতে আর কোন বাঙালি নাই, কথাবার্তার সঙ্গী পাইয়া তিনি খুব খুশি। অপুর কিন্তু বেশি কথাবার্তা ভালো লাগিতেছিল না। এরা এ-সময় এত বকবক করে কেন? মারোয়াড়ি দুটি তো সাসারাম হইতে নিজেদের মধ্যে বকুনি শুরু করিয়াছে, মুখের আর বিরাম নাই।

খুশিভরা, উৎসুক, ব্যগ্র মনে সে প্রত্যেক পাথরের নুড়িটি, গাছপালাটি লক্ষ করিয়া চলিয়াছিল। বামদিকের পাহাড়শ্রেণীর পেছনে সূর্য অস্ত গেল, সারাদিন আকাশটা লাল হইয়া আছে, আনন্দেব আবেগে সে দ্রুতগামী গাড়ির দরজা খুলিয়া দরজার হাতল ধরিয়া দাঁড়াইতেই ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন, উঁহু, পড়ে যাবেন, পাদানিতে স্লিপ করলেই—বন্ধ করুন মশাই।

অপু হাসিয়া বলিল, বেশ লাগে কিন্তু, মনে হয় যেন উড়ে যাচ্ছি।

গাছপালা, খাল, নদী, পাহাড়, কাঁকর-ভরা জমি, গোটা শাহাবাদ জেলাটা তাহার পায়েব তলা দিয়া পলাইতেছে। অনেক দূর পর্যন্ত শোণ নদের বালুর চড়া জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত দেখাইতেছে। নীলনদ? ঠিক এটা যেন নীলনদ। ওপারে সাত-আট মাইল গাধার পিঠে চড়িয়া গেলে ফ্যারাও রামেসিসের তৈরি আবু সিম্বেলের বিরাট পাষাণ মন্দির—ধূসর অস্পষ্ট কুযাশায় ঘেরা মরুভূমিব মধ্যে অতীতকালের বিস্মৃত দেবদেবীর মন্দির, এপিস, আইসিস, হোরাস, হাথর, রা—নীলনদ যেমন গতির মুখে উপলখণ্ড পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া পলাইয়া চলে—মহাকালের বিরাট রথচক্র তাণ্ডব নৃত্যচ্ছন্দে সব স্থাবর অস্থাবর জিনিসকে পিছু ফেলিয়া মহাবেগে চলিবার সময়ে এই বিরাট গ্র্যানাইট মন্দিরকে পথের পাশে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে, জনহীন মরুভূমির মধ্যে বিস্মৃত সভ্যতার চিহ্ন—মন্দিরটা কোন বিস্মৃত ও বাতিল দেবদেবীর উদ্দেশে গঠিত ও উৎসর্গীকৃত।

একটু রাত্রে ভদ্রলোকটি বলিলেন, এ লাইনে ভালো খাবার পাবেন না, আমার সঙ্গে খাবার আছে, আসুন খাওয়া যাক।

তাঁহার স্ত্রী কলার পাতা চিরিয়া সকলকে বেঞ্চির উপর পাতিয়া দিলেন—লুচি, হালুয়া ও সন্দেশ—সকলকে পরিবেশন করিলেন। ভদ্রলোকটি বলিলেন, আপনি খানকতক বেশি লুচি নিন, আমরা তো আজ মোগলসরাইয়ে ব্রেকজার্নি করব, আপনি তো সোজা দিল্লি চলেছেন।

এ-ও অপুর এক অভিজ্ঞতা। পথে বাহির হইলে এত শীঘ্রও এমন ঘনিষ্ঠতা হয়! এক গলির মধ্যে শহরে শত বর্ষ বাস করিলেও তো তাহা হয় না? ভদ্রলোকটি নিজের পরিচয় দিলেন, নাগপুরের কাছে কোন গবর্নমেন্ট রিজার্ভ ফরেস্টে কাজ করেন, ছুটি লইয়া কালীঘাটে শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছিলেন, ছুটি অন্তে কর্মস্থানে চলিয়াছেন। অপুকে ঠিকানা দিলেন। বার বার অনুরোধ করিলেন, সে যেন দিল্লি হইতে ফিরিবার পথে একবার অতি অবশ্য যায়, বাঙালির মুখ মোটে দেখিতে পান না—অপু গেলে তাঁহারা তো কথা কহিয়া বাঁচেন। মোগলসরাই-এ গাড়ি দাঁড়াইল। অপু মালপত্র

নামাইতে সাহায্য করিল। হাসিয়া বলিল—আচ্ছা বৌ-ঠাকরুন, নমস্কার, শীগগিরই আপনাদের ওখানে উপদ্রব করছি কিন্তু।

দিল্লিতে ট্রেন পৌঁছাইল রাত্রি সাড়ে এগারোটায়।

গাজিয়াবাদ স্টেশন হইতেই সে বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া চাহিয়া দেখিল যে দিল্লিতে গাড়ি আসিতেছিল তাহা এস. কাপুর কোম্পানির দিল্লি নয়, লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেমব্লির মেম্বারদের দিল্লি নয়, এসিয়াটিক পেট্রোলিয়মের এজেন্টের দিল্লি নয়—সে দিল্লি সম্পূর্ণ ভিন্ন—বহুকালের বহুযুগের নরনারীদের—মহাভারত হইতে শুরু করিয়া রাজসিংহ ও মাধবীকঙ্কণ,—সমুদয় কবিতা, উপন্যাস, গল্প, নাটক, কল্পনা ও ইতিহাসের মালমশলায় তাহার প্রতি ইটখানা তৈরি, তার প্রতি ধূলিকণা অপুর মনের রোমান্সে সকল নায়ক-নায়িকার পুণ্য-পাদপূত—ভীষ্ম হইতে আওরঙ্গজেব ও সদাশিব রাও পর্যন্ত—গান্ধারী হইতে জাহানারা পর্যন্ত—সাধারণ দিল্লি হইতে সে দিল্লির দূরত্ব অনেক!—দিল্লি হনৌজ দূর অস্ত্, বহুদূর—বহু শতাব্দীর দূর পারে, সে দিল্লি কেহ দেখে নাই।

আজ নয়, মনে হয় শৈশবে মায়ের মুখে মহাভারত শোনার দিন হইতে ছিরের পুকুরের ধারের বাঁশবনের ছায়ায় কাঁচা শেওড়ার ডাল পাতিয়া 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' ও 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' পড়িবার দিনগুলি হইতে, সকল ইতিহাস, যাত্রা, থিয়েটার, কত গল্প, কত কবিতা, এই দিল্লি, আগ্রা, সমগ্র রাজপুতানা ও আর্যাবর্ত—তাহার মনে এক অতি অপরূপ, অভিনব, স্বপ্নময় আসন অধিকার করিয়া আছে—অন্য কাহারও মনে সে রকম আছে কিনা সেটা প্রশ্ন নয়, তাহার মনে আছে এইটাই বড়ো কথা।

কিন্তু বাহিরে ঘন অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না—অনেকক্ষণ চাহিয়া কেবল কতকগুলো সিগ্‌ন্যালের বাতি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না, একটা প্রকাণ্ড ইয়ার্ড কেবিন, লেখা আছে 'দিল্লি জংশন ইস্ট'—একটা গ্যাসোলিনের ট্যাঙ্ক—তাহার পরই চারিদিকে আলোকিত প্ল্যাটফর্ম—প্রকাণ্ড দোতলা স্টেশন—সেই পিয়ার্স সোপ, কিটিংস পাউডার, হলস্ ডিসটেম্পার, লিপটনের চা। আবদুল আজিজ হাকিমের রৌশনেসেকাৎ, উৎকৃষ্ট দাদের মলম।

নিজের ছোট ক্যানভাসের সুটকেস ও ছোট বিছানাটা হাতে লইয়া অপু স্টেশনে নামিল—রাত অনেক, শহর সম্পূর্ণ অপরিচিত, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ওয়েটিংরুম দোতলায়, রাত্রি সেখানে কাটানোই নিরাপদ মনে হইল।

সকালে উঠিয়া জিনিসপত্র স্টেশনে জমা দিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অর্ধমাইল-ব্যাপী দীর্ঘ শোভাযাত্রা করিয়া সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে সোনার হাওদায় কোন শাহাজাদী নগরভ্রমণে বাহির হইয়াছেন কি? দুধারে আবেদনকারী ও ওমরাহ দল আভূমি তসলিম করিয়া অনুগ্রহভিক্ষার অপেক্ষায় করজোড়ে খাড়া আছে কি? নব আগন্তুক নরেন্দ্রনাথ পাৎশাবেগমের কোন্ সবাইখানায় ধূমপানরত বৃদ্ধ পারস্যদেশীয় শেখের নিকট পথের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল?

কিন্তু এ যে একেবারে কলকাতার মতই সব! এমন কি মণিলাল জুয়েলার্সের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত। দুজন লোক কলিকাতা হইতে বেড়াইতে আসিয়াছিল, টাঙাভাড়া সস্তা পড়িবে বলিয়া তাহাকে তাহারা সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিল। কুতবের পথে একজন বলিল, মশাই, আরও বার-দুই দিল্লি এসেছি, কুতবের মুরগির কাটলেট—আঃ, সে যা জিনিস, খান নি কখনও, না? চলুন, এক ডজন কাটলেট অর্ডার দিয়ে তবে উঠব কুতবমিনারে।

বাল্যকালে দেওয়ানপুরে পড়িবার সময় পুরোনো দিল্লির কথা পড়িয়া তাহার কল্পনা করিতে গিয়া বার বার স্কুলের পাশের একটা পুরাতন ইটখোলার ছবি অপুর মনে উদয় হইত, আজ অপু দেখিল পুরাতন দিল্লি বাল্যের সে ইটের পাঁজাটা নয়। কুতবমিনার নতুন দিল্লি শহর হইতে যে এতদূর তাহা সে ভাবে নাই। তদুপরি সে দেখিয়া বিস্মিত হইল এই দীর্ঘ পথের দুধারে মরুভূমির মতো

অনুর্বর কাঁটাগাছ ও ফণিমনসার ঝোপে ভরা রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের এখানে-ওখানে সর্বত্র ভাঙা বাড়ি, মিনার-মসজিদ, কবর, খিলান, দেওয়াল। সাতটা প্রাচীন মৃত রাজধানীর মূক কঙ্কাল পথের দুধারে উঁচুনিচু জমিতে বাবলাগাছ ও ক্যাকটাস গাছের ঝোপ-ঝাপের আড়ালে হৃতগৌরব নিস্তব্ধতায় আত্মগোপন করিয়া আছে—পৃথ্বীরায় পিথৌরার দিল্লি, লালকোট, দাসবংশের দিল্লি, তোগলকদের দিল্লি, আলাউদ্দীন খিলজির দিল্লি, শিরি ও জাহানপনাহ্, মোগলদের দিল্লি। অপু জীবনে এ রকম দৃশ্য দেখে নাই, কখনও কল্পনাও করে নাই, সে অবাক হইল, অভিভূত হইল, নীরব হইয়া গেল, গাইড-বুক উলটাইতে ভুলিয়া গেল, ম্যাপের নম্বর মিলাইয়া দেখিতে ভুলিয়া গেল—মহাকালের এই বিরাট শোভাযাত্রা একটার পর একটা বায়োস্কোপের ছবির মতো চলিয়া যাইবার দৃশ্যে সে যেন সম্বিৎহারা হইয়া পড়িল। আরও বিশেষ হইল এইজন্য যে মন তাহার নবীন আছে। কখনও কিছু দেখে নাই, চিরকাল আঁস্তাকুড়ের আবর্জনায় কাটাইয়াছে অথচ মন হইয়া উঠিয়াছে সর্বগ্রাসী, বুভুক্ষু। তাই সে যাহা দেখিতেছিল, তাহা যেন বাহিরের চোখটা দিয়া নয়, সে কোন তীক্ষ্নদর্শী তৃতীয় নেত্র, যেটা না খুলিলে বাহিরের চোখের দেখাটা নিষ্ফল হইয়া যায়।

ঘুরিতে ঘুরিতে দুপুরের পর সে গেল কুতব হইতে অনেক দূরে গিয়াসউদ্দিন তোগলকের অসমাপ্ত নগর—তোগলকাবাদে। গ্রীষ্ম দুপুরের খররৌদ্রে তখন চারিধারের ঊষরভূমি আগুন-রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। দূর হইতে তোগলকাবাদ দেখিয়া মনে হইল যেন কোন দৈত্যের হাতে গাঁথা এক বিরাট পাষাণদুর্গ! তৃণবিরল ঊষরভূমি, পত্রহীন বাবলা ও কণ্টকময় ক্যাক্টাসের পটভূমিতে খরবৌদ্রে সে যেন এক বর্বর-অসুরবীর্য সুউচ্চ পাষাণ দুর্গপ্রাচীর হইতে সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, মালব, পাঞ্জাব,—সারা আর্যাবর্তকে ভ্রূকুটি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও সূক্ষ্ম কারুকার্যের প্রচেষ্টা নাই বটে, নিষ্ঠুর বটে, রুক্ষ বটে, কিন্তু সবটা মিলিয়া এমন বিশালতার সৌন্দর্য, পৌরুষের সৌন্দর্য, বর্ববতাব সৌন্দর্য—যা মনকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে, হৃদয়কে বজ্রমুষ্টিতে আঁকড়াইয়া ধরে। সব আছে, কিন্তু দেহে প্রাণ নাই, চারিধারে ধ্বংসস্তূপ, কাঁটাগাছ,, বিশৃঙ্খলতা, বড়ো বড়ো পাথর গড়াইয়া উঠিবার পথ বুজাইয়া রাখিয়াছে—মৃতমুখের ভ্রূকুটি মাত্র।

সাধু নিজামউদ্দিনের অভিশাপ মনে পড়িল—ইয়ে বসে গুজর, ইয়ে রাহে গুজর—

পৃথ্বীরায়ের দুর্গের চবুতরার উপর যখন সে দাঁড়াইয়া—হি-হি, কি মুশকিল, কি অদ্ভুতভাবে নিশ্চিন্দিপুরের সেই বনেব ধারের ছিরে পুকুরটা এ দুর্গের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে, বাল্যে তাহারই ধারের শেওড়াবনে বসিয়া 'জীবনপ্রভাত' পড়িতে পড়িতে কতবার কল্পনা করিত, পৃথ্বীরায়ের দুর্গ ছিরে পুকুরের উঁচু ও-দিকের পাড়টার মতো বুঝি!..এখনও ছবিটা দেখিতে পাইতেছে—কতকগুলি গুগ্‌লি শামুক, ও-পারের বাঁশঝাড়। যাক, চবুতরার উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে দূর পশ্চিম আকাশের চারিধারের মহাশ্মশানের উপর ধূসর ছায়া ফেলিয়া সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনী আকাশের পটে আগুনের অক্ষরে লিখিয়া সূর্য অস্ত গেল। সে সব অতি পবিত্র গোপনীয় মুহূর্ত অপুর জীবনে—দেবতারা তখন কানে কানে কথা বলেন, তাহার জীবনে এরূপ সূর্যাস্ত আর কটা বা আসিয়াছে? ভয় ও বিস্ময় দুই-ই হইল, সারা গায়ে যেন কাঁটা দিয়া উঠিল, কি অপূর্ব অনুভূতি! জীবনের চক্রবালনেমি এতদিন যে কত ছোট অপরিসর ছিল, আজকার দিনটির অপু তাহা জানিত না।

নিজামউদ্দীন আউলিয়ার মসজিদপ্রাঙ্গণে সম্রাট-দুহিতা জাহানারার তৃণাবৃত পবিত্র কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মসজিদদ্বারে ক্রীত দু-চার পয়সার গোলাপফুল ছড়াইতে ছড়াইতে অপুর অশ্রু বাধা মানিল না। ঐশ্বর্যের মধ্যে, ক্ষমতার দম্ভের মধ্যে লালিত হইয়াও পুণ্যবতী শাহাজাদীর এ দীনতা, ভাবুকতা, তাহার কল্পনাকে মুগ্ধ রাখিয়াছে চিরদিন। এখনও যেন বিশ্বাস হয় না যে, সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেটা সত্যই জাহানারার কবরভূমি। পরে সে মসজিদ হইতে একজন প্রৌঢ় মুসলমানকে ডাকিয়া আনিয়া কবরের শিরোদেশের মার্বেল ফলকের সেই বিখ্যাত ফারসি কবিতাটি দেখাইয়া বলিল, মেহেরবানি করকে পড়িয়ে, হাম লিখ লেঙ্গে।

প্রৌঢ়টি কিঞ্চিৎ বকশিশের লোভে খামখেয়ালী বাঙালী বাবুটিকে খুশি করার জন্য জোরে জোরে পড়িল—

বিজুস গ্যাহ্ কসে ন-পোশদ্ মজার-ইমা-রা।
কি কবরপোষ্-ই-গরীবান্ হামিন্ মীগ্যাহ বস্ অস্ত্।

পরে সে কবি আমীর খসরুর কবরের উপরেও ফুল ছড়াইল।

পরদিন বৈকালে শাহজাহানের লাল পাথরের কেল্লা দেখিতে গিয়া অপরাহ্নের ধূসর ছায়ায় দেওয়ান-ই-খাসের পাশের খোলা ছাদে একখানা পাথরের বেঞ্চিতে বহুক্ষণ বসিয়া রহিল। মনে হইল এসব স্থানের জীবনধারার কাহিনী কেহ লিখিতে পারে নাই। গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, কবিতায় যাহা পড়িয়াছে, সে সবটাই কল্পনা, বাস্তবের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। সে জেবউন্নিসা, সে উদিপুরী বেগম, সে মমতাজমহল, সে জাহানারা—আবাল্য যাহাদের সঙ্গে পরিচয়, সবগুলিই কল্পনাসৃষ্ট প্রাণী, বাস্তবজগতের মমতাজ বেগম, উদিপুরী, জেবউন্নিসা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক! কে জানে এখানকার সে সব রহস্যভরা ইতিহাস? মূক যমুনা তাহার সাক্ষী আছে, গৃহভিত্তির প্রতি পাষাণ-খণ্ড তার সাক্ষী আছে, কিন্তু তাহারা তো কথা বলিতে পারে না।

তিনদিন পরে সে বৈকালের দিকে কাটনী লাইনের একটা ছোট্ট স্টেশনে নিজের বিছানা ও সুটকেসটা লইয়া নামিয়া পড়িল। হাতে পয়সা বেশি ছিল না বলিয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনে এলাহাবাদ আসিতে বাধ্য হয়—তাই এত দেরি। কয়দিন স্নান নাই, চুল রুক্ষ উসকো-খুসকো—জোর পশ্চিমা বাতাসে ঠোঁট শুকাইয়া গিয়াছে।

ট্রেন ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ক্ষুদ্র স্টেশন, সম্মুখে একটা ছোট পাহাড়। দোকানবাজারও চোখে পড়িল না।

স্টেশনের বাহিরের বাঁধানো চাতালে একটু নির্জন স্থানে সে বিছানার বান্ডিলটা খুলিয়া পাতিল। কিছুই ঠিক নাই, কোথায় যাইবে, কোথায় শুইবে, মনে এক অপূর্ব অজানা আনন্দ।

শতরঞ্চির উপর বসিয়া সে খাতা খুলিযা খানিকটা লিখিল, পরে একটা সিগারেট খাইয়া সুটকেসটা ঠেস দিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিল। টোকা মাথায় একজন গোঁড় যুবককে কাঁচা শালপাতার পাইপ খাইতে খাইতে কৌতূহলী চোখে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া অপু বলিল, উমেরিয়া হিয়াসে কেত্তা দূর হোগা?

প্রথমবার লোকটা কথা বুঝিল না। দ্বিতীয়বারে ভাঙা হিন্দিতে বলিল, তিশ মীল্।

ত্রিশ মাইল রাস্তা! এখন সে যায় কিসে? মহামুশকিল! জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ত্রিশ মাইল পথের দুধারে শুধু বন আর পাহাড়। কথাটা শুনিয়া অপুব ভারি আনন্দ হইল। বন, কি রকম বন? খুব ঘন? বাঘ পর্যন্ত আছে! বাঃ—কিন্তু এখন কি করিয়া যাওয়া যায়?

কথায় কথায় গোঁড় লোকটি বলিল, তিন টাকা পাইলে সে নিজের ঘোড়াটা ভাড়া দিতে রাজি আছে।

অপু রাজি হইয়া ঘোড়া আনিতে বলাতে লোকটা বিস্মিত হইল। আর বেলা কতটুকু আছে, এখন কি জঙ্গলের পথে যাওয়া যায়? অপু নাছোড়বান্দা। সামনের এই সুন্দর জ্যোৎস্নাভরা রাত্রে জঙ্গলের পথে ঘোড়ায় চাপিয়া যাওয়ার একটা দুর্দমনীয় লোভ তাহাকে পাইয়া বসিল—জীবনে এ সুযোগ কটা আসে, এ কি ছাড়া যায়?

গোঁড় লোকটি জানাইল, আরও একটাকা খোরাকি পাইলে সে তল্‌পি বহিতে রাজি আছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে অপু ঘোড়ায় চড়িয়া রওনা হইল—পিছনে মোটমাথায় লোকটা।

স্নিগ্ধ রাত্রি—স্টেশন হইতে অল্পদূরে একটি বস্তি, একটা পাহাড়ি নালা, বাঁক ঘুরিয়াই পথটা শালবনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। চারিধারে জোনাকি পোকা জ্বলিতেছে—রাত্রির অপূর্ব নিস্তব্ধতা,

ত্রয়োদশীর চাঁদের আলো শাল-পলাশের পাতার ফাঁকে ফাঁকে মাটির উপর যেন আলো-আঁধারের বুটি-কাটা জাল বুনিয়া দিয়াছে। অপু পাহাড়ি লোকটার নিকট হইতে একটা শালপাতার পাইপ ও সে-দেশী তামাক চাহিয়া লইয়া ধরাইল বটে, কিন্তু দু-টান দিতেই মাথা কেমন ঘুরিয়া উঠিল—শালপাতার পাইপটা ফেলিয়া দিল।

বন সত্যই ঘন—পথ আঁকা-বাঁকা, ছোট ঝরনা এখানে-ওখানে, উপল বিছানো পাহাড়ি নদীর তীরে ছোট ফার্নের ঝোপ, কি ফুলের সুবাস, রাত্রিচর পাখির ডাক। নির্জনতা, গভীর নির্জনতা!

মাঝে মাঝে সে ঘোড়াকে ছুটাইয়া দেয়, ঘোড়া-চড়া অভ্যাস তাহার অনেকদিন হইতে আছে। বাল্যকালে মাঠের ছুটা ঘোড়া ধরিয়া কত চড়িয়াছে, চাঁপদানিতেও ডাক্তারবাবুটির ঘোড়ায় প্রায় প্রতিদিনই চড়িত।

সারারাত্রি চলিয়া সকাল সাড়ে সাতটায় উমেরিয়া পৌঁছিল। একটা ছোট গ্রাম—পোস্টাফিস, ছোট বাজার ও কয়েকটা গালার আড়ত। ফরেস্ট রেঞ্জার ভদ্রলোকটির নাম অবনীমোহন বসু। তিনি তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—আসুন, আসুন, আপনি পত্র দিলেন না, কিছু না, ভাবলুম বোধ হয় এখনও আসবার দেরি আছে—এতটা পথ এলেন রাতারাতি? ভয়ানক লোক তো আপনি!

পথেই একটা ছোট নদীর জলে স্নান করিয়া চুল আঁচড়াইয়া সে ফিটফাট হইয়া আসিয়াছে। তখনই চা খাবারের বন্দোবস্ত হইল। অপু লোকটিকে নিজের মনিব্যাগ শূন্য করিয়া চাব টাকা দিয়া বিদায় দিল।

দুপুরের আহারের সময় অবনীবাবুর স্ত্রী দুজনকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইলেন। অপু হাসিমুখে বলিল, এখানে আপনাদের জ্বালাতন করতে এলুম বৌঠাকরুন!

অবনীবাবুর স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, না এলে দুঃখিত হতাম—আমরা কিন্তু জানি আপনি আসবেন। কাল ওঁকে বলছিলাম আপনার আসবার কথা, এমন কি আপনার থাকবার জন্যে সাহেবেব বাংলোটা ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে রাখার কথাও হল—ওটা এখন খালি পড়ে আছে কিনা।

—এখানে আর কোন বাঙালি কি অন্য কোন দেশের শিক্ষিত লোক নিকটে নেই?

অবনীবাবু বলিলেন, আমাব এক বন্ধু খুরিয়ার পাহাড়ে তামাব খনির জন্যে প্রসপেক্টিং করছেন—মিঃ রায়চৌধুরী, জিওলজিস্ট, বিলেতে ছিলেন অনেকদিন—তিনি ওইখানে তাঁবুতে আছেন—মাঝে মাঝে তিনি আসেন।

অল্প দিনেই ইঁহাদের সঙ্গে কেমন একটা সহজ মধুর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিল—যাহা কেবল এই সব স্থানে, এই সব অবস্থাতেই সম্ভব, কৃত্রিম সামাজিকতার হুমকি এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষেব স্বাভাবিক বন্ধুত্বের দাবিকে ঘাড় গুঁজিয়া থাকিতে বাধ্য করে না বলিয়াই। একদিন বসিয়া বসিযা সে খেয়ালের বশে কাগজে একটা কথকতার পালা লিখিয়া ফেলিল। সেদিন সকালে চা খাইবার সময় বলিল, দিদি, আজ ওবেলা আপনাদের একটা নতুন জিনিস শোনাব।

অবনীবাবুর স্ত্রীকে সে দিদি বলিতে শুরু করিয়াছে। তিনি সাগ্রহে বলিলেন,—কি, কি বলুন না? আপনি গান জানেন—না? আমি অনেকদিন ওঁকে বলেছি আপনি গান জানেন।

—গানও গাইব, কিন্তু একটা কথকতার পালা শোনাব, আমার বাবার মুখে শোনা জড়ভরতের উপাখ্যান।

দিদির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি হাসিয়া স্বামীকে কহিলেন, দেখ্‌লে গো—দ্যাখো। বলি নি আমি, গলার স্বর অমন, নিশ্চয়ই জানেন—খাট্‌ল না কথা?

দুপুরবেলা দিদি তাহাকে তাস খেলার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করিলেন।

—লেখা এখন থাক। তাস জোড়াটা না খেলে খেলে পোকায় কেটে দিলে—এখানে খেলার লোক মেলে না—যখন ওঁর বন্ধু মিঃ রায়চৌধুরী আসেন তখন মাঝে মাঝে খেলা হয়—আসুন আপনি। উনি, আর আপনি—

—আর একজন?

—আর কোথায়? আমি আর আপনি বসব—উনি একা দুহাত নিয়ে খেলবেন।

জ্যোৎস্না রাত্রে বাংলোর বারান্দাতে সে কথকতা আরম্ভ করিল। জড়ভরতের বাল্যজীবনের করুণ কাহিনী নিজেরই শৈশব-স্মৃতির ছায়াপাতে সত্য ও পূত হইয়া উঠে, কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে বাবার গলার স্বর কেমন করিয়া অলক্ষিতে তাহার গলায় আসে—শালবনের পত্রমর্মরে, নৈশ পাখির গানের মধ্যে রাজর্ষি ভরতের সরল বৈরাগ্য ও নিস্পৃহ আনন্দ যেন প্রতি সুর-মূর্ছনাকে একটি অতি পবিত্র মহিমাময় রূপ দিয়া দিল। কথকতা থামিলে সকলেই চুপ করিয়া রহিল। অপু খানিকটা পর হাসিয়া বলিল—কেমন লাগল?

অবনীবাবু একটু ধর্মপ্রাণ লোক, তাঁহার খুবই ভালো লাগিয়াছে—কথকতা দু-একবার শুনিয়াছেন বটে, কিন্তু এ কি জিনিস! ইহার কাছে সে সব লাগে না।

কিন্তু সকলের চেয়ে মুগ্ধ হইলেন অবনীবাবুর স্ত্রী। জ্যোৎস্নাব আলোতে তাঁহার চোখে ও কপোলে অশ্রু চিক্‌চিক্ করিতেছিল। অনেকক্ষণ তিনি কোন কথা বলিলেন না। স্বদেশ হইতে দূরে এই নিঃসন্তান দম্পতির জীবনযাত্রা এখানে একেবারে বৈচিত্র্যহীন, বহুদিন এমন আনন্দ তাঁহাদের কেহ দেয় নাই।

দিন দুই পরে অবনীবাবুর বন্ধু মিঃ রায়চৌধুরী আসিলেন, ভাবি মনখোলা ও অমায়িক ধরনের লোক, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, কানের পাশে চুলে পাক ধরিয়াছে, বলিষ্ঠ গঠন ও সুপুরুষ। একটু অতিরিক্ত মাত্রায় মদ খান। জব্বলপুর হইতে হুইস্কি আনাইয়াছেন কিরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া, খানিকক্ষণ তাহার বর্ণনা করিলেন। অবনীবাবুও যে মদ খান, অপু তাহা ইতিপূর্বে জানিত না। মিঃ রায়চৌধুরী অপুকে বলিলেন, আপনার গুণের কথা সব শুনলাম, অপূর্ববাবু। সে আপনাকে দেখেই আমাব মনে হয়েছে। আপনার চোখ দেখলে যে কোন লোক আপনাকে ভাবুক বলবে। তবে কি জানেন, আমরা হয়ে পড়েছি ম্যাটার-অফ-ফ্যাক্ট। আজ আপনাকে আর একবার কথকতা করতে হবে, ছাড়চি নে আজ!

কথাবার্তায়, গানে, হাসিখুশিতে সেদিন প্রায় সারারাত কাটিল। মিঃ রায়চৌধুরী চলিয়া যাইবার দিন তিনেক পবে একজন চাপরাশী তাঁহার নিকট হইতে অপুর নামে একখানি চিঠি আনিল। তাঁহার ওখানে একটা ড্রিলিং তাঁবুর তত্ত্বাবধানের জন্য একজন লোক দরকার। অপূর্ববাবু কি আসিতে রাজি আছেন? আপাতত মাসে পঞ্চাশ টাকা ও বাসস্থান। অপুর নিকট ইহা একেবারে অপ্রত্যাশিত। ভাবিয়া দেখিল, হাতে আনা দশেক পয়সা মাত্র অবশিষ্ট আছে, উঁহাবা অবশ্য যতই আত্মীয়তা দেখান, গান ও কথকতা করিয়া চিরদিন তো এখানে কাটানো চলিবে না? আশ্চর্যের বিষয়, এতদিন কথাটা আদৌ তাহার মনে উদয় হয় নাই যে কেন!

মিঃ রায়চৌধুরীর বাংলো প্রায় মাইল কুড়ি দূর। তিনদিন পরে ঘোড়া ও লোক আসিল। অবনীবাবু ও তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাহাকে বিদায় দিলেন। পথ অতি দুর্গম, উমেরিয়া হইতে তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমদিকে গেলেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে হয়। দুই-তিনটা ছোট ছোট পাহাড়ি নদী, আবার ছোট ছোট ফার্ন ঝোপ, ঝরনা—একটার জলে অপু মুখ ধুইয়া দেখিল জলে গন্ধকের গন্ধ। পাহাড়িয়া করবী ফুটিয়া আছে, বাতাস নবীন মাদকতায় ভরা, খুব স্নিগ্ধ, এমন কি যেন একটু গা শিরশির করে—এই চৈত্র মাসেও।

সন্ধ্যার পূর্বে সে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া গেল। খনির কার্যকারিতা ও লাভালাভের বিষয় এখনও পরীক্ষাধীন, মাত্র খান চার-পাঁচ চওড়া খড়ের ঘর। দুইটা বড়ো বড়ো তাঁবু, কুলিদের থাকিবার ঘর, একটা অফিস ঘর। সর্বসুদ্ধ আট-দশ বিঘা জমির উপর সব। চারিধার ঘেরিয়া ঘন দুর্গম অরণ্য, পিছনে পাহাড়, আবার পাহাড়।

মিঃ রায়চৌধুরী বলিলেন—খুব সাহস আছে আপনার তা আমি বুঝেছি যখন শুনলাম

আপনি রাত্রে ঘোড়ায় চড়ে উমেরিয়া এসেছিলেন, ও পথে রাত্রে এদেশের লোকও যেতে সাহস পায় না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অপুর এক সম্পূর্ণ নতুন জীবন শুরু হইল এ-দিনটি হইতে। এমন এক জীবন, যাহা সে চিরকাল ভালোবাসিয়াছে, যাহার স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কোনদিন যে হাতের মুঠায় নাগাল পাওয়া যাইবে তাহা ভাবে নাই।

তাহাকে যে ড্রিল তাঁবুর তত্ত্বাবধানে থাকিতে হইবে, তাহা এখান হইতে আরও সতেরো-আঠারো মাইল দূরে। মিঃ রায়চৌধুরী নিজের একটা ঘোড়া দিয়া তাহাকে পরদিনই কর্মস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। নতুন স্থানে আসিয়া অপু অবাক হইয়া গেল। বন ভালোবাসিলে কি হইবে, এ ধরনের বন কখনও দেখে নাই। নিবিড় বনানীর প্রান্তে উচ্চ তৃণভূমি, তারই মধ্যে খড়ের বাংলোঘর, একটা পাতকুয়া, কুলিদের বাসের খুপড়ি, পিছনে ও দক্ষিণে পাহাড়, সেদিকের ঘন বন কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত তাহা চোখে দেখিয়া আন্দাজ করা যায় না—ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া পাহাড়, একটার পিছনে আর একটা, আর গভীর জনমানবহীন অরণ্য, সীমা নাই, কূল-কিনারা নাই। চারিদিকের দৃশ্য অতি গম্ভীর। তাঁবুর পিছনেই ঠিক পাহাড়শ্রেণীর একটা স্থান আবার অনাবৃত, বেজায় খাড়া ও উঁচু—বিরাটকায় নগ্ন গ্রানাইট চূড়াটা বৈকালের শেষ রোদে কখনও দেখায় রাঙা, কখনও ধূসর, কখনও ঈষৎ তাম্রাভ কালো রংয়ের—এরূপ গম্ভীর-দৃশ্য অবণ্যভূমির কল্পনাও জীবনে সে করে নাই কখনও।

অপুর সারাদিনের কাজও খুব পরিশ্রমের, সকালে স্নানের পর কিছু খাইয়াই ঘোড়ায় উঠিতে হয়, মাইল চারেক দূরের একটা জায়গায় কাজ তদাবক করিবাব পব প্রায়ই মিঃ রায়চৌধুবীর ষোলো মাইল দূরবর্তী তাঁবুতে গিয়া রিপোর্ট করিতে হয়—তবে সেটা রোজ নয়, দু-দিন অন্তর অন্তর। ফিরিতে কোন দিন হয় সন্ধ্যা, কোন দিন বা রাত্রি এক প্রহর দেড়প্রহব। সবটা মিলিয়া কুড়ি-পঁচিশ মাইলের চক্র, পথ কোথাও সমতল, কোথাও ঢালু, কোথাও দুর্গম। ঢালুটাতে জঙ্গল আছে তবে তাব তলা অনেকটা পরিষ্কার, ইংরেজিতে যাকে বলে Open forest—কিন্তু পোয়াটাক পথ যাইতে না যাইতে সে মানুষের জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া ঘন অরণ্যেব নির্জনতাব মধ্যে একেবারে ডুবিয়া যায়—সেখানে জন নাই, মানুষ নাই, চারিপাশে বড়ো বড়ো গাছ, ডালে পাতায় নিবিড় জড়াজড়ি, পথ নাই বলিলেও হয়, কখনও ঘোড়া চালাইতে হয় পাহাড়ি নদীর শুষ্ক খাত বাহিয়া, কখনও গভীর জঙ্গলের দুর্ভেদ্য বেত-বন ঠেলিয়া—যেখানে বন্যশূকর বা সম্বর হরিণের দল যাতায়াতের সুঁড়ি পথ তৈরি করিয়াছে—সে পথে। কত ধরনের গাছ, লতা, গাছের ডালে এখানে-ওখানে বিচিত্র রঙয়ের অর্কিড, নিচে অ্যাজোলিয়ার হলুদ ফুল ফুটিয়া প্রভাতের বাতাসকে গন্ধভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। ঘোড়া চালাইতে চালাইতে অপুর মনে হয় সে যেন জগতে সম্পূর্ণ একা, সারা দুনিয়ার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই—শুধু আছে সে, আর আছে তাহার ঘোড়াটি ও চারিপাশের এই অপূর্বদৃষ্ট বিজন বন! আর কি সে নির্জনতা! কলিকাতার বাসায় নিজের বন্ধ-দুয়ার ঘরটার কৃত্রিম নির্জনতা নয়, এ ধরনের নির্জনতার সঙ্গে তাহার কখনও পরিচয় ছিল না। এ নির্জনতা বিরাট, অদ্ভুত, এমন কিছু যাহা পূর্ব হইতে ভাবিয়া অনুমান করা যায় না, অভিজ্ঞতার অপেক্ষা রাখে।

ভারি পছন্দ হয় এ জীবন, গল্পের বইয়ে-টইয়ে যে রকম পড়িত, এ যেন ঠিক তাহাই। খোলা জায়গা পাইলেই ঘোড়া ছাড়িয়া দেয়, গতির আনন্দে সারাদেহে একটা উত্তেজনা আসে; খানাখন্দ, শিলা, পাইওরাইটের স্তূপ কে মানে? নত শাল-শাখা এড়াইয়া দোদুল্যমান অজানা লতার পাশ কাটাইয়া পৌরুষভরা উদ্দামতার আনন্দে তীরবেগে ঘোড়া উড়াইয়া চলে।

ঠিক এই সব সময়েই তাহার মনে পড়ে—প্রায়ই মনে পড়ে—শীলেদের অফিসের সেই

তিনবৎসর-ব্যাপী বদ্ধ, সংকীর্ণ, অন্ধকার কেরানী-জীবনের কথা। এখনও চোখ বুজিলে অফিসটা সে দেখিতে পায়, বাঁয়ে নৃপেন টাইপিস্ট বসিয়া খটখট করিতেছে, রামধন নিকাশনবিস বসিয়া খাতাপত্র লিখিতেছে, সেই বাঁধানো মোটা ফাইলের দপ্তরটা—নিকাশনবিসের পিছনের দেওয়ালের চুন-বালি খসিয়া দেখিতে হইয়াছে যেন একটি পূজানিরত পুরুতঠাকুর। রোজ সে ঠাট্টা করিয়া বলিত,'ও রামধনবাবু, আপনার পুরুতঠাকুর আজ ফুল ফেললেন না?' উঃ, সে কি বদ্ধতা—এখন যেন সেসব একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়।

সারাদিনের পরিশ্রমের পর সে বাংলোয় ফিরিয়া পাতকুয়ার ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া এক প্রকার বন্য লেবুর রস মিশানো চিনির শরবত খায়—গরমের দিনে শরীর যেন জুড়াইয়া যায়—তার পরই রামচরিত মিশ্র আসিয়া রাত্রের খাবার দিয়া যায়—আটার রুটি, কুমড়া বা ট্যাঁড়সের তরকারি ও অড়হরের ডাল। বারো-তেরো মাইল দূরের এক বস্তি হইতে জিনিসপত্র সপ্তাহ অন্তর কুলিরা লইয়া আসে—মাছ একেবারেই মেলে না, মাঝে মাঝে অপু পাখি শিকার করিয়া আনে। একদিন সে বনের মধ্যে এক হরিণকে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে পাইয়া অবাক হইয়া গেল—বড়শিঙ্গা কিংবা সম্বর হরিণ ভারি সতর্ক, মানুষের গন্ধ পাইলে তার ত্রিসীমানায় থাকে না—কিন্তু তাহার ঘোড়ার বারো-গজের মধ্যে এ হরিণটা আসিল কিরূপে? খুশি ও আগ্রহের সহিত বন্দুক উঠাইয়া লক্ষ করিতে গিয়া সে দেখিল লতাপাতার আড়াল হইতে শুধু মুখটা বাহিব করিয়া হবিণটিও অবাক চোখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে—ঘোড়ায় চড়া মানুষ দেখিয়া ভাবিতেছে হয়তো, এ আবার কোন্ জীব! হঠাৎ অপুর বুকের মধ্যটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল—হরিণের চোখ দুটি যেন তাহার খোকার চোখের মতো! অমনি ডাগর ডাগর, অমনি অবোধ, নিষ্পাপ; সে উদ্যত বন্দুক নামাইয়া তখনই টোটাগুলি খুলিয়া লইল। এখানে যতদিন ছিল, আর কখনও শিকারের চেষ্টা করে নাই।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হয় সন্ধ্যার পরেই, তার পরে সে নিজের খড়ের বাংলোর কম্পাউন্ডে চেয়ার পাতিয়া বসে।—অপূর্ব নিস্তব্ধতা! অস্পষ্ট জ্যোৎস্না ও আঁধারে পিছনকার পাহাড়ের গম্ভীরদর্শন অনাবৃত গ্রানাইট প্রাচীরটা কি অদ্ভুত দেখায়। শালকুসুমের সুবাসভরা অন্ধকার, মাথার উপরকার আকাশে অগণিত নৈশ নক্ষত্র। এখানে অন্য কোন সাথী নাই, তাহার মন ও চিন্তার উপর অন্য কাহারও দাবিদাওয়া নাই, উত্তেজনা নাই, উৎকণ্ঠা নাই—আছে শুধু সে, আর এই বিশাল অরণ্যপ্রকৃতির কর্কশ, বন্ধুর বিরাট সৌন্দর্য—আর আছে এই নক্ষত্রভরা নৈশ আকাশটা।

বাল্যকাল হইতেই সে আকাশ ও গ্রহনক্ষত্রের প্রতি আকৃষ্ট। কিন্তু এখানে তাদের এ কি রূপ! কুলিরা সকাল সকাল খাওয়া সারিয়া ঘুমাইয়া পড়ে—রামচরিত মিশ্র মাঝে মাঝে অপুকে সাবধান করিয়া দেয়, তাম্বুকা বাহার মৎ বৈঠিয়ে বাবুজী—শেরকা বড়া ডর হ্যায়—পরে সে কাঠকুটা জ্বালিয়া প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড করিয়া গ্রীষ্মের রাত্রেও বসিয়া আগুন পোহায়—অবশেষে সেও যাইয়া শুইয়া পড়ে, তাহার অগ্নিকুণ্ড নিভিয়া যায়—স্তব্ধ রাত্রি, আকাশ অন্ধকার...পৃথিবী অন্ধকার...আকাশে বাতাসে অদ্ভুত নীরবতা, আবলুসের তালপাতার ফাঁকে দু-একটা তারা যেন অসীম রহস্যভরা মহাব্যোমের বুকের স্পন্দনের মতো দিপ্‌দিপ্ করে, বৃহস্পতি স্পষ্টতর হন, উত্তর-পূর্ব কোণের পর্বতসানুর বনের উপরে কালপুরুষ উঠে, এখানে-ওখানে অন্ধকারের বুকে আগুনের আঁচড় কাটিয়া উল্কাপিণ্ড খসিয়া পড়ে। রাত্রি গভীর হইবার সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রগুলো কি অদ্ভুতভাবে স্থান পরিবর্তন করে! আবলুস ডালের ফাঁকে তারাগুলা ক্রমশ নিচে নামে, কালপুরুষ ক্রমে পর্বতসানুর দিক হইতে মাথার উপরকার আকাশে সরিয়া আসে, বিশালকায় ছায়াপথটা তেরছা হইয়া ঘুরিয়া যায়, বৃহস্পতি পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়ে। রাত্রির পর রাত্রি এই গতির অপূর্ব লীলা দেখিতে দেখিতে এই শান্ত সনাতন জগৎটা যে কি ভয়ানক রুদ্র গতিবেগ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে তাহার স্নিগ্ধতা ও সনাতনত্বের আড়ালে, সে সম্বন্ধে অপুর মন সচেতন হইয়া উঠিল—অদ্ভুতভাবে সচেতন হইয়া উঠিল।...জীবনে কখনও তাহার এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নাই বিশাল নক্ষত্রজগৎটার সঙ্গে, এ-ভাবে হইবার আশাও কখনও কি ছিল?

অপুর বাংলো-ঘরের পিছনে ও দক্ষিণে পাহাড়, পিছনকার পাহাড়তলী আধ মাইলের কম, দক্ষিণের পাহাড় মাইল দুই দূরে। সামনের বহুদূর বিস্তৃত উঁচুনিচু জমিটা শাল ও পপরেল চারা ও একপ্রকার অর্ধশুষ্ক তৃণে ভরা—অনেক দূর পর্যন্ত খোলা। সারা পশ্চিম দিকচক্রবাল জুড়িয়া বহুদুরে, বিন্ধ্য পর্বতের নীল অস্পষ্ট সীমারেখা, ছিন্দওয়ারা ও মহাদেও শৈলশ্রেণী—পশ্চিমা বাতাসের ধুলা-বালি যেদিন আকাশকে আবৃত না করে, সেদিন বড়ো সুন্দর দেখায়। মাইল এগারো দূরে নর্মদা বিজন বনপ্রান্তরের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, খুব সকালে ঘোড়ায় উঠিয়া স্নান করিতে গেলে বেলা নয়টার মধ্যে ফিরিয়া আসা যায়।

দক্ষিণে পর্বতসানুর ঘন বন নিবিড়, জনমানবহীন, রুক্ষ ও গম্ভীর। দিনের শেষে পশ্চিম গগন হইতে অস্ত-সূর্যের আলো পড়িয়া পিছনের পাহাড়ের যে অংশটা খাড়া ও অনাবৃত, তাহার গ্রানাইট দেওয়ালটা প্রথমে হয় হলদে, পরে হয় মেটে সিঁদুরের রং, পরে জরদা রঙের হইতে হইতে হঠাৎ ধূসর ও তারপরেই কালো হইয়া যায়। ওদিকে দিগন্তলক্ষ্মীর ললাটে আলোর টিপের মতো সন্ধ্যাতারা ফুটিয়া উঠে, অরণ্যানী ঘন অন্ধকারে ভরিয়া যায়, শাল ও পাহাড়ি বাঁশের ডালপালায় বাতাস লাগিয়া একপ্রকার শব্দ হয়—রামচরিত ও জহুরী সিং নেকড়ে বাঘের ভয়ে আগুন জ্বালে, চারিধারে শিয়াল ডাকিতে শুরু করে, বন মোরগ ডাকে, অন্ধকার আকাশে দেখিতে দেখিতে গ্রহ, তারা, জ্যোতিষ্ক, ছায়াপথ একে একে দেখা দেয়। পৃথিবী, আকাশ-বাতাস অপূর্ব রহস্যভরা নিস্তব্ধতায় ভরিয়া আসে, তাঁবুর পাশের দীর্ঘ ঘাসের বন দুলাইয়া এক-একদিন বন্যবরাহ পলাইয়া যায়, দূরে কোথায় হায়েনা উন্মাদের মতো হাসিয়া উঠে, গভীর রাত্রে কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ পাহাড়ের পিছন হইতে ধীরে ধীরে উঠিতে থাকে, এ যেন সত্যই গল্পের বইয়ে-পড়া জীবন।

এক এক দিন বৈকালে সে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে যায়। শুধুই উঁচু-নিচু অর্ধশুষ্ক তৃণভূমি, ছোট বড়ো শিলাখণ্ড ছড়ানো, মাঝে মাঝে শাল ও বাদাম গাছ। আর এক জাতীয় বড়ো বন্য গাছের কি অপূর্ব আঁকাবাঁকা ডালপালা, চৈত্রের রৌদ্রে পাতা ঝরিয়া গিয়াছে, নীল আকাশের পটভূমিতে পত্রশূন্য ডালপালা যেন ছবির মতো দেখা যায়। অপুর তাঁবু হইতে মাইলতিনেক দূরে একটা ছোট পাহাড়ি নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, অপু তাহার নাম রাখিয়াছে বক্রতোয়া। গ্রীষ্মকালে জল আদৌ থাকে না, তাহারই ধারে একটা শাল-ঝাড়ের নিচের একখানা পাথরের উপর সে এক-একদিন গিয়া বসে, ঘোড়াটা গাছের ডালে বাঁধিয়া রাখে—স্থানটি ঠিক ছবির মতো।

স্বর্ণাভ বালুর উপর অন্তর্হিত বন্যনদীর উপল-ঢাকা চরণ-চিহ্ন—হাত কয়েক মাত্র প্রশস্ত নদীখাত, উভয় তীরই পাষাণময়, ওপারে কঠিন ও দানাদার কোয়ার্টজাইট ও ফিকে হলদে রঙের বড়ো বড়ো পাথরের চাঁইয়ে ভরা, অতীত কোন্ হিম-যুগের তুষার নদীর শেষ প্রবাহে ভাসিয়া আসিয়া এখানে হয়তো আটকাইয়া গিয়াছে, সোনালি রংয়ের নদীবালু হয়তো সুবর্ণরেণু মিশানো, অস্তসূর্যের রাঙা আলোয় অত চক্‌চক্ করে কেন নতুবা? নিকটে সুগন্ধ লতাকস্তুরীর জঙ্গল, খর বৈশাখী রৌদ্রে শুষ্ক শুঁটিগুলি ফাটিয়া মৃগনাভির গন্ধে অপরাহ্নের বাতাস ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। বক্রতোয়া হইতে খানিকটা দূরে ঘন বনের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট ঝরনা, যেন উঁচু চৌবাচ্চা ছাপাইয়া জল পড়িতেছে এমন মনে হয়। নিচের একটা খাতে গ্রীষ্মদিনেও জল থাকে। রাত্রে ওখানে হরিণদের দল জল খাইতে আসে শুনিয়া অপু কতবার দেড় প্রহর রাত্রে ঘোড়ায় চড়িয়া সেখানে গিয়াছে, কখনও দেখে নাই। গ্রীষ্ম গেল, বর্ষাও কাটিল, শরৎকালে বন্য শেফালী বনে অজস্র ফুল ফুটিল, বক্রতোয়ার শাল-ঝাড়টার কাছে বসিলে তখনও ঝরনার শব্দ পাওয়া যায়—এমন সময়ের এক জ্যোৎস্নারাত্রে সে জহুরী সিংকে সঙ্গে লইয়া জায়গাটাতে গেল। দশমীর জ্যোৎস্না ডালে-পাতায় পাহাড়ি বাদাম বনের মাথায়—স্নিগ্ধ বাতাসে শেফালীর ঘন মিষ্টি গন্ধ। এই জ্যোৎস্না-মাখা বনভূমি, এই রাত্রির স্তব্ধতা, এই শিশিরার্দ্র নৈশ বায়ু—এরা যেন কত কালের কথা মনে করাইয়া দেয়, যেন দূর কোনও জন্মান্তরের কথা।

হরিণের দল কিন্তু দেখা গেল না।

এই সব নির্জন স্থানে অপু দেখিল মনের ভাব সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়। শহরে বা লোকালয়ে যে-মন আত্মসমস্যা লইয়া ব্যাপৃত থাকে, ambition লইয়া ব্যস্ত থাকে, এখানকার উদার নক্ষত্রখচিত আকাশের তলায় সে-সব আশা, আকাঙ্ক্ষা, সমস্যা অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। মন আরও ব্যাপক হয়, উদার হয়, দ্রষ্টা হয়, angle of vision একদম বদলাইয়া যায়। এইজন্য অনেক অনেক বই-ই—গার্হস্থ্য সমাজে যা খুব ঘোরতর সমস্যামূলক ও প্রয়োজনীয় ও উপাদেয়—এখানকার নিঃসঙ্গ ও বিশ্বতোমুখী জীবনে তা অতি খেলো, রসহীন ও অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। এখানে ভালো লাগে সেই সব, যাহা শাশ্বত কালের। এই অনন্তের সঙ্গে যাহার যোগ আছে। অপুর সেই গ্রহবিজ্ঞানের বইখানা যেমন—এখন যেন তাদের নতুন অর্থ হয়। এত ভাবিতে শেখায়! চৈতন্যের কোন নতুন দ্বার যেন খুলিয়া যায়।

ফাল্গুন মাসে একজন ফরেস্ট সার্ভেয়ার আসিয়া মাইল দশেক দূরে বনের মধ্যে তাঁবু ফেলিলেন। অপু তাঁহার সহিত ভাব করিযা ফেলিল। মাদ্রাজী ভদ্রলোক, বেশ লেখাপড়া জানা। অপু প্রাযই সন্ধ্যাটা সেখানে কাটাইত, চা খাইত, গল্পগুজব করিত, ভদ্রলোক থিওডোলাইট পাতিয়া এ-নক্ষত্র ও-নক্ষত্র চিনাইয়া দিতেন, এক একদিন আবার দুপুরে নিমন্ত্রণ করিয়া একরকম ভাতের পিঠা খাওয়াইতেন, অপু সকালে উঠিয়া যাইত, দুপুরের পর খাওয়া সারিয়া ঘোড়ায় নিজের তাঁবুতে ফিরিত।

ফিরিবার পথে ডানদিকের পাহাড়ি ঢালুতে বহুদূর ব্যাপিযা শীতের শেষে লোহিয়া ও বিজনির ফুলের বন, ঘোড়া থামাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিত, তাঁবুতে ফিরিবার কথা ভুলিয়া যাইত। যে কখনও এমন নির্জন অরণ্যভূমিতে—যেখানে ক্রোশের পর ক্রোশ যাও লোক নাই, জন নাই, গ্রাম নাই, বস্তি নাই—সে-সব স্থানের মুক্ত আকাশের তলে কঠিন ব্যাসাল্ট কি গ্রানাইটেব রুক্ষ পর্বত-প্রাচীরেব ছায়ায়, নিম্নভূমিতে, ঢালুতে, ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে রাশি রাশি অগণিত বেগুনি, জরদা ও শ্বেতাভ হলুদ রঙের বন্য লোহিয়া ও বিজনির ফুলেব বন না দেখিয়াছে—তাহাকে এ দৃশ্যের ধারণা কবানো অসম্ভব হইবে। এমন কত শত বৎসর ধবিয়া প্রতি বসন্তে রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া ঝরিতেছে, কেহ দেখিবার নাই, শুধু ভোমরা ও মৌমাছিদের মহোৎসব।

একদিন অমরকণ্টক দেখিতে যাইবার জন্য অপু মিঃ রায়চৌধুরীর নিকট ছুটি চাহিল।

মনটা ইহার আগে অত্যন্ত উতলা হইয়াছিল, কেন যে উতলা হইল, কারণটা কিছুতেই ভালো ধরিতে পারিল না। ভাবিল এই সময় একবার ঘুরিয়া আসিবে।

মিঃ রায়চৌধুরী শুনিয়া বলিলেন—যাবেন কিসে? পথ কিন্তু অত্যন্ত খারাপ, এখান থেকে প্রায় আশি মাইল দূর হবে, এর মধ্যে ষাট মাইল ডেন্‌স ভার্জিন ফরেস্ট—বাঘ, ভালুক, নেকড়ের দল সব আছে। বিনা বন্দুকে যাবেন না, ঘোড়াসহিস নিয়ে যান—রাত হবার আগে আশ্রয় নেবেন কোথাও—সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ার বাঘ, রসগোল্লাটির মতো লুফে নেবে। ওই জন্যে কত দিন আপনাকে বারণ করেছি এখানেও সন্ধের পর তাঁবুর বাইরে বসবেন না বা অন্ধকারে বনের পথে একা ঘোড়া চালাবেন না—তা আপনি বড্ড রেক্‌লেস।

তখন সে উৎসাহে পড়িয়া বিনা ঘোড়াতেই বাহির হইল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিল—ধারালো পাথরের নুড়িতে জুতার তলা কাটিয়া চিরিয়া গেল, অতদূর পথ হাঁটিবার অভ্যাস নাই, পায়ে এক বিরাট ফোস্কা উঠিয়াছে। পিছনে রামচরিত বোঁচকা লইয়া আসিতেছিল, সে সমানে পথ হাঁটিয়া চলিয়াছে, মুখে কথাটি নাই। বহু দূরের একটা পাহাড় দেখাইয়া বলিল, ওর পাশ দিয়া পথ। পাহাড়টা ধোঁয়া ধোঁয়া দেখা যায়, বোঝা যায় না, মেঘ না পাহাড়—এত দূরে। অপু ভাবিল পায়ে হাঁটিয়া অতদূর সে যাইবে কদিনে?

এ ধরনের ভীষণ অরণ্যভূমি, অপুর মনে হইল এ অঞ্চলে এতদিন আসিয়াও সে দেখে নাই। সে যেখানে থাকে, সেখানকার বন ইহার তুলনায় শিশু, নিতান্ত অবোধ শিশু। দুপুরের পর যে বন শুরু হইয়াছে তাহা এখনও শেষ হয় নাই, অথচ সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

অন্ধকার নামিবার আগে একটা উঁচু পাহাড়ের উপরকার চড়াই পথে উঠিতে হইল—উঠিয়াই দেখা গেল—সর্বনাশ, সামনে আবার ঠিক এমনি আর একটা পাহাড়। অপুর পায়ের ব্যথাটা খুব বাড়িয়াছিল, তৃষ্ণাও পাইয়াছিল বেজায়—অনেকক্ষণ হইতে জলের সন্ধান মেলে নাই, আবলুস গাছের তলা বিছাইয়া অম্লমধুর কেঁদফল পড়িয়া ছিল—সারা দুপুর তাহাই চুষিতে চুষিতে কাটিয়াছে—কিন্তু জল অভাবে আর চলে না।

দূরে দূরে, উত্তরে ও পশ্চিমে নীল পর্বতমালা। নিম্নের উপত্যকার ঘন বনানী সন্ধ্যার ছায়ায় ধূসর হইয়া আসিতেছে, সরু পথটা বনের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া নামিয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, সম্মুখে পাহাড়টার ওপারে এক মাইলের মধ্যে বন-বিভাগের একটা ডাকবাংলো পাওয়া গেল। চারিধারে নিবিড় শাল বন, মধ্যে ছোট্ট খড়ের ঘর। খনি ও বনবিভাগের লোকেরা মাঝে মাঝে রাত্রি কাটায়।

এ রাত্রির অভিজ্ঞতা ভারি অদ্ভুত ও বিচিত্র। বাংলোতে অপুরা একটি প্রৌঢ় লোককে পাইল, সে ইহারই মধ্যে ঘরে খিল দিয়া বসিয়া কি পড়িতেছিল, ডাকাডাকিতে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, লোকটা মৈথিলী ব্রাহ্মণ, নাম আজবলাল ঝা। বয়স ষাট বা সত্তর হইবে। সে সেই রাত্রে নিজের ভাণ্ডার হইতে আটা ও ঘৃত বাহির করিয়া আনিয়া অপুর নিষেধ সত্ত্বেও উৎকৃষ্ট পুরি ভাজিয়া আনিল—পরে অতিথিসৎকার সারিয়া সে ঘরের মধ্যে বসিযা সুস্বরে সংস্কৃত রামায়ণ পড়িতে আরম্ভ করিল। কিছু পরেই অপু বুঝিল লোকটা সংস্কৃত ভালো জানে—নানা কাব্য উত্তমরূপে পড়িয়াছে। নানা স্থান হইতে শ্লোক মুখস্থ বলিতে লাগিল—কাব্যচর্চায় অসাধারণ উৎসাহ, তুলসীদাসী রামায়ণ হইতেই অনর্গল দোঁহা আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমে ওঝাজী নিজের কাহিনী বলিল। দেশ ছিল দ্বারভাঙা জেলায়। সেখানেই শৈশব কাটে, তেরো বৎসর বয়সে উপনয়নের পর এক বেনিয়ার কাছে চাকরি লইয়া কাশী আসে। পড়াশুনা সেইখানেই—তারপরে কয়েক জায়গায় টোল খুলিয়া ছাত্র পড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল—কোথাও সুবিধা হয় নাই। পেটের ভাত জুটে না, নানা স্থানে ঘুরিবার পর এই ডাকবাংলোয় আজ সাত আট বছর বসবাস করিতেছে। লোকজন বড়ো এখানে কেহ আসে না, কালেভদ্রে এক-আধজন, সে-ই একা থাকে, মাঝে মাঝে তেরো মাইল দূরের বস্তি হইতে খাবার জিনিস ভিক্ষা করিয়া আনে, বেশ চলিয়া যায়। সে আছে আর আছে তাহার কাব্যগ্রন্থগুলি—তাহার মধ্যে দুখানা হাতে লেখা পুঁথি, মেঘদূত ও কয়েক সর্গ ভট্টি।

অপুর এত সুন্দর লাগিল এই নিরীহ, অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটির কথাবার্তা ও তাহার আগ্রহভরা কাব্যপ্রীতি—এই নির্জন বনবাসেও একটা শান্ত সন্তোষ। তবে লোকটি যেন একটু বেশি বকে, বিদ্যাটা যেন বেশি জাহির করিতে চায়—কিন্তু এত সরলভাবে করে যে, দোষ ধরাও যায় না। অপু বলিল—পণ্ডিতজী, আপনাকে থাকতে দেয়, কেউ কিছু বলে না?

—না বাবুজী, নাগেশ্বরপ্রসাদ বলে একজন ইঞ্জিনীয়ার আছেন, তিনি আমাকে খুব মানেন, সেই জন্যে কেউ কিছু বলে না।

কথায় কথায় সে বলিল—আচ্ছা পণ্ডিতজী, এ বন কি অমরকণ্টক পর্যন্ত এমনি ঘন?

—বাবুজী, এই হচ্ছে প্রসিদ্ধ বিন্ধ্যারণ্য। অমরকন্টক ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বন এমনি ঘন—চিত্রকূট ও দণ্ডকারণ্য এই বনের পশ্চিমদিকে। এর বর্ণনা শুনুন তবে নৈষধচরিতে—দময়ন্তী রাজ্যভ্রষ্ট নলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পরে এই বনে পথ হারিয়ে ঘুরেছিলেন—ঋক্ষবান্ পর্বতের পাশের পথ দিয়ে তিনি বিদর্ভ দেশে যান। রামায়ণেও এই বনের বর্ণনা শুনবেন আরণ্যকাণ্ডে। শুনুন তবে।

অপু ভাবিল লোকটা বর্তমানের কোনও ধার ধারে না, প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষায় একেবারে ডুবিয়া আছে—সব কথায় পুরাণের কথা আনিয়া ফেলে। লোকটিকে ভারি অদ্ভুত লাগিতেছিল—সারাজীবন এখানে-ওখানে ঘুরিয়া কিছুই করিতে পারে নাই—এই বনবাসে নিজের প্রিয় পুঁথিগুলা লইয়া বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়া চলিয়াছে, কোন দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। ঐ ধরনের লোকের দেখা মেলে না বেশি।

ওঝাজী সুস্বরে রামায়ণের বনবর্ণনা পড়িতেছিল। কি অদ্ভুতভাবে যে চারিপাশের দৃশ্যের সঙ্গে খাপ খায়। নির্জন শালবনে অস্পষ্ট জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, তেন্দু ও তিরপ্পী গাছের পাতাগুলি এক এক জায়গায় ঘন কালো দেখাইতেছে, বনের মধ্যে শিয়ালের দল ডাকিয়া উঠিয়া প্রহর ঘোষণা করিল।

কোথায় রেল, মোটর, এরোপ্লেন, ট্রেড-ইউনিয়ন? ওঝাজীর মুখে আরণ্যকাণ্ডের শ্লোক শুনিতে শুনিতে সে যেন অনেক দূরের এক সুপ্রাচীন জাতির অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে গিয়া পড়িল একেবারে। অতীতের গিরিতরঙ্গিণী-তীরবর্তী তপোবন, হোমধূমপবিত্র গোধূলির আকাশতলে বিস্তৃত অগ্নিশালা, স্রুগ্‌ভাণ্ড, অজিন, কুশ, সমিধ্, জলকলস, চীর ও কৃষ্ণাজিন পরিহিত সজপা মুনিগণের বেদপাঠধ্বনি...শান্ত গিরিসানু...বনজ কুসুমের সুগন্ধ...গোদাবরীতটে পুন্নাগ নাগকেশরের বনে পুষ্পআহরণরতা সুমুখী আশ্রমবালিকাগণ—কৃশাঙ্গী রাজবধূগণ—ক্ষীণজ্যোৎস্নায় নদীজল আলো হইয়া উঠিযাছে, তীরে স্থলবেতসের বনে ময়ূর ডাকিতেছে.

সে যেন স্পষ্ট দেখিল, এই নিবিড় অজানা অরণ্যানীর মধ্য দিযা নির্ভীক, কবাটবক্ষ, ধনুষ্পাণি প্রাচীন রাজপুত্রগণ সকল বিপদকে অতিক্রম করিয়া চলিযাছেন। দূরে নীল মেঘের মতো পরিদৃশ্যমান ময়ূর-নিনাদিত ঘন বন, দুর্গম পথের নানা স্থানে শ্বাপদ রাক্ষসে পূর্ণ খন্দ, গুহা, গহ্বর, মহাগজ ও মহাব্যাঘ্র দ্বারা অধ্যুষিত—অজানা মৃত্যুসংকুল—চারিধারে পর্বতরাজির ধাতুরঞ্জিত শৃঙ্গসকল আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে—কুন্দগুল্ম, সিন্দুবার, শিরীষ, অর্জুন, শাল, নীপ, বেতস, তিনিশ ও তমাল তরুতে শ্যামায়মান গিরিসানু....শরদ্বারা বিদ্ধ রুরু ও পৃষত মৃগ আগুনে ঝলসাইয়া খাওয়া, বিশাল ইঙ্গুদী তরুমূলে সতর্ক রাত্রি যাপন ..

ওঝাজী উৎসাহ পাইযা অপুকে একটা পুঁটলি খুলিযা একরাশ সংস্কৃত কবিতা দেখাইলেন, গর্বের সহিত বলিলেন, বাবুজী, ছেলেবেলা থেকেই সংস্কৃত কবিতায় আমার হাত আছে, একবাব কাশী-নরেশের সভায় আমার গুরুদেব ঈশ্বরশরণ আমায় নিয়ে যান। একজোড়া দোশালা বিদায় পেয়েছিলাম, এখনও আছে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা।—তারপর তিনি অনেকগুলি কবিতা শুনাইলেন, বিভিন্ন ছন্দের সৌন্দর্য ও তাহাতে তাঁহার রচিত শ্লোকের কৃতিত্ব সকল উৎসাহে বর্ণনা করিলেন। এই ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ওঝাজী বহু কবিতা লিখিয়াছেন, ও এখনও লেখেন, সবগুলি সযত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াও দিয়াছেন, একটিও নষ্ট হইতে দেন নাই, তাহাও জানাইলেন।

একটি অদ্ভুত ধরনের দুঃখ ও বিষাদ অপুর হৃদয় অধিকার করিল। কত কথা মনে আসিল, তাহার বাবা এই রকম গান ও পাঁচালি লিখিতেন তাহার ছেলেবেলায়। কোথায় গেল সে সব? যুগ যে বদল হইয়া যাইতেছে, ইহারা তাহা ধরিতে পারে না। ওঝাজীর এত আগ্রহের সহিত লেখা কবিতা কে পড়িবে? কে আজকাল ইহার আদর করিবে? কোন্ আশা ইহাতে পুরিবে ওঝাজীর? অথচ কত ঐকান্তিক আগ্রহ ও আনন্দ ইহাদের পিছনে আছে। চাঁপদানির পোস্টাফিসে কুড়াইয়া পাওয়া সেই ছোট মেয়েটির নামঠিকানা-ভুল পত্রখানার মতোই তাহা ব্যর্থ ও নিরর্থক হইয়া যাইবে!

সকালে উঠিয়া সে ওঝাজীকে একখানা দশটাকার নোট দিয়া প্রণাম করিল। নিজের একখানা ভালো বাঁধানো খাতা লিখিবার জন্য দিল—কাছে আর টাকা বেশি ছিল না, থাকিলে হয়তো আরও দিত। তাহার একটা দুর্বলতা এই যে, যে একবার তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিয়াছে তাহাকে দিবার বেলায় সে মুক্তহস্ত, নিজের সুবিধা-অসুবিধা তখন সে দেখে না।

ডাকবাংলো হইতে মাইল খানেক পরে পথ ক্রমে উপরের দিকে উঠিতে লাগিল, ক্রমে আরও

উপরে, উচ্চ মালভূমির উপর দিয়া পথ—শাল, বাঁশ, খয়ের, আবলুসের ঘন অরণ্য—ডাইনে বামে উঁচুনিচু ছোট বড়ো পাহাড় ও টিলা—শালপুষ্পসুরভি সকালের হাওয়া যেন মনের আয়ু বাড়াইয়া দেয়। চতুর্থ দিন বৈকালে অমরকণ্টক হইতে কিছু দূরে অপরূপ সৌন্দর্যভূমির সঙ্গে পরিচয় হইল—পথটা সেখানে নিচের দিকে নামিয়াছে, দুই দিকে পাহাড়ের মধ্যে সিকি মাইল চওড়া উপত্যকা, দু-ধারের সানুদেশের বন অজস্র ফুলে ভরা—পলাশের গাছ যেন জ্বলিতেছে। হাত দুই উঁচু পাথরের পাড়, মধ্যে গৈরিক বালু ও উপল-শয্যায় শিশু শোণ—নির্মল জলের ধারা হাসিয়া খুশিয়া আনন্দ বিলাইতে বিলাইতে ছুটিয়া চলিয়াছে—একটা ময়ূর শিলাখণ্ডের আড়াল হইতে নিকটের গাছের ডালে উঠিয়া বসিল। অপুর পা আর নড়িতে চায় না—তার মুগ্ধ ও বিস্মিত চোখের সম্মুখে শৈশব কল্পনার স্বর্গকে কে আবার এভাবে বাস্তবে পরিণত করিয়া খুলিয়া বিছাইয়া দিল!

এত দূরবিসর্পিত দিগ্‌বলয় সে কখনও দেখে নাই, এত নির্জনতার কখনও ধারণা ছিল না তাহার—বহুদূরে পশ্চিম আকাশের অনতিস্পষ্ট সুদীর্ঘ নীল শৈলরেখার উপরকার আকাশটাতে সে কি অপরূপ বর্ণসমুদ্র!

কি অপূর্ব দৃশ্য চোখের সম্মুখে যে খুলিয়া যায়! এমন সে কখনও দেখে নাই—জীবনে কখনও দেখে নাই।

এ বিপুল আনন্দ তাহার প্রাণে কোথা হইতে আসে!

এই সন্ধ্যা, এই শ্যামলতা, এই মুক্ত প্রসারের দর্শনে যে অমৃত মাখানো আছে, সে মুখে তাহা কাহাকে বলিবে?....কে তাহার এ চোখ ফুটাইল, এক সাঁঝ-সকালের, সূর্যাস্তের, নীল বনানীর শ্যামলতার মায়া-কাজল তাহার চোখে মাখাইয়া দিল?

দূরবিসর্পিত চক্রবালরেখা দিগন্তের যতটুকু ঘিরিয়াছে, তাহারই কোন কোন অংশে, বহুদূরে নেমির শ্যামলতা অনতিস্পষ্ট সান্ধ্যদিগন্তে বিলীন, কোন কোন অংশে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখা-যাওয়া বনরেখায় পরিস্ফুট, কোন দিকে সাদা সাদা বকের দল আকাশের নীলপটে ডানা মেলিয়া দূর হইতে দূরে চলিয়াছে...মন কোথাও বাধে না। অবাধ উদার দৃষ্টি, পরিচয়ের গণ্ডি পার হইয়া অদৃশ্য অজানার উদ্দেশে ভাসিয়া চলে...

তাহার মনে হইল সত্য, সত্য, সত্য—এই শান্ত নির্জন আরণ্যভূমিতে মনের ডালপালার আলোছায়ার মধ্যে পুষ্পিত কোবিদারের সুগন্ধে দিনের পর দিন ধরিয়া এক একটি নব জগতের জন্ম হয়—ওই দূর ছায়াপথের মতো তাহা দূরবিসর্পিত, এটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নয়—তাহাকে ধরা যায় না অথচ এই সব নীরব জীবনমুহূর্তে অনন্ত দিগন্তের দিকে বিস্তৃত তাহার রহস্যময় প্রসার মনে মনে বেশ অনুভব করা যায়। এই এক বৎসরের মধ্যে মাঝে মাঝে সে তাহা অনুভব করিয়াছেও—এই অদৃশ্য জগৎটার মোহস্পর্শ মাঝে মাঝে বৈশাখী শালমঞ্জরীর উন্মাদ সুবাসে, সন্ধ্যা-ধূসর অনতিস্পষ্ট গিরিমালার সীমারেখায়, নেকড়ে বাঘের ডাকে ভরা জ্যোৎস্নাস্নাত শুভ্র জনহীন আরণ্যভূমির গাম্ভীর্যে, অগণিত তারাখচিত নিঃসীম শূন্যের ছবিতে। বৈকালে ঘোড়াটি বাঁধিয়া যখনই বক্রতোয়ার ধারে বসিয়াছে, যখনই অপর্ণার মুখ মনে পড়িয়াছে, কতকাল ভুলিয়া যাওয়া দিদির মুখখানা মনে পড়িয়াছে, একদিন শৈশব-মধ্যাহ্নে মায়ের-মুখে-শোনা মহাভারতের দিনগুলোর কথা মনে পড়িয়াছে—তখনই সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইহাও মনে হইয়াছে যে, যে-জীবন যে-জগৎকে আমরা প্রতিদিনের কাজকর্মে হাটে-ঘাটে হাতের কাছে পাইতেছি জীবন তাহা নয়, এই কর্মব্যস্ত অগভীর একঘেয়ে জীবনের পিছনে একটি সুন্দর পরিপূর্ণ, আনন্দভরা সৌম্য জীবন লুকানো আছে—সে এক শাশ্বত রহস্যভরা গহন গভীর জীবন-মন্দাকিনী, যাহার গতি কল্প হইতে কল্পান্তরে; দুঃখকে তাহা করিয়াছে অমৃতত্বের পাথেয়, অশ্রুকে করিয়াছে অনন্ত জীবনের উৎসধারা...

আজ তাহার বসিয়া বসিয়া মনে হয়, শীলেদের বাড়ি চাকুরি তাহার দৃষ্টিতে আরও শক্তি দিয়াছিল, অন্ধকার অফিস ঘরে একটুখানি জায়গায় দশটা হইতে সাতটা পর্যন্ত আবদ্ধ থাকিয়া

একটুখানি খোলা জায়গার জন্য সে কি তীব্র লোলুপতা, বুভুক্ষা, দুই টিউশনির ফাঁকে গড়ের মাঠের দিকের বড়ো গির্জাটার চূড়ার পিছনকার আকাশের দিকে তৃষিত চোখে চাহিয়া থাকার সে কি হ্যাংলামি! কিন্তু সেই বদ্ধ জীবনই পিপাসাকে আরও বাড়াইয়া দিয়াছিল, শক্তির অপচয় হইতে দেয় নাই, ধরিয়া বাঁধিয়া সংহত করিয়া রাখিয়াছিল। আজ মনে হয় চাঁপদানির হেড মাস্টার যতীশবাবুও তাহার বন্ধু—জীবনের পরম বন্ধু—সেই নিষ্পাপ দরিদ্র ঘরের উৎপীড়িতা মেয়ে পটেশ্বরীও। ভগবান তাহাকে নিমিত্তস্বরূপ করিয়াছিলেন—তাহারা সকলে মিলিয়া চাঁপদানির সেই কুলিবস্তির জীবন হইতে তাহাকে জোর করিয়া দূর করিয়া না দিলে আজও সে সেখানেই থাকিয়া যাইত। এমন সব অপরাহ্নে সেখানে বিশু স্যাক্‌রার দোকানের সান্ধ্য আড্ডায় মহা খুশিতে আজও বসিয়া তাস খেলিত।

একথাও প্রায়ই মনে হয়, জীবনকে খুব কম মানুষেই চেনে। জন্মগত ভুল সংস্কারের চোখে সবাই জীবনকে বুঝিবার চেষ্টা করে, দেখিবার চেষ্টা করে, দেখাও হয় না, বোঝাও হয় না। তা ছাড়া সে চেষ্টাই বা কজন করে?...

অমরকণ্টক তখনও কিছু দূর। অপু বলিল, রামচরিত, কিছু শুকনো ডাল শালপাতা কুড়িয়ে আন, চা করি। রামচরিতের ঘোর আপত্তি তাহাতে। সে বলিল, হুজুর, এসব বনে বড়ো ভালুকের ভয়। অন্ধকার হবার আগে অমরকণ্টকের ডাকবাংলোয় যেতে হবে। অপু বলিল, তাড়াতাড়ি চা হয়ে যাবে, যাও না তুমি। পরে সে বড়ো লোটাটায় শোনের জল আনিয়া তিন টুকরা পাথরের উপর চাপাইয়া আগুন জ্বালিল। হাসিয়া বলিল, একটা ভজন গাও রামচরিত, যে আগুন জ্বলেছে, এর কাছে তোমার ভালুক এগোবে না, নির্ভয়ে গাও।

জ্যোৎস্না উঠিল। চারিধারে অদ্ভুত, গম্ভীর শোভা। কল্যকার কাব্যপুরাণের রেশ তাহার মন হইতে এখনও যায় নাই। বসিয়া বসিয়া মনে হইল সত্যই যেন কোন সুন্দরী, চারুনেত্রা রাজবধূ—নব-পুষ্পিতা মল্লীলতার মতো তন্বী লীলাময়ী—এই জনহীন নিষ্ঠুর আরণ্যভূমিতে পথ হারাইয়া বিপন্নার মতো ঘুরিতেছেন—তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত স্বামী ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে—দূরে ঋক্ষবান্ পর্বতের পার্শ্ব দিয়া বিদর্ভ যাইবার পথটি কে তাঁহাকে বলিয়া দিবে!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

নন্‌-কো-অপারেশনের উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলি তখন বছর তিনেক পিছাইয়া পড়িয়াছে, এমন সময়ে একদিন প্রণব রাজসাহী জেল হইতে খালাস পাইল।

জেলে তাহার স্বাস্থ্যহানি হয় নাই, কেবল চোখের কেমন একটা অসুখ হইয়াছে, চোখ কর্‌কর্ করে, জল পড়ে। জেলের ডাক্তার মিঃ সেন চশমা লইতে বলিয়াছেন এবং কলিকাতার এক চক্ষুরোগবিশেষজ্ঞের নামে একটি পত্রও দিয়াছেন।

জেল হইতে বাহির হইয়া সে ঢাকা রওনা হইল এবং সেখান হইতে গেল স্বগ্রামে। এক প্রৌঢ়া খুড়িমা ছাড়া তাহার আর কেহ নাই, বাপ-মা শৈশবেই মারা গিয়াছেন, এক বোন ছিল সেও বিবাহের পর মারা যায়।

সন্ধ্যার কিছু আগে সে বাড়ি পৌঁছিল। খুড়িমা ভাঙা রোয়াকের ধারে কম্বলের আসন পাতিয়া বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন, তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। খুড়িমার নিজের ছেলেটি মানুষ নয়, গাঁজা খাইয়া বেড়ায়, প্রণবকে ছেলেবেলা হইতে মানুষ করিয়াছেন, ভালোওবাসেন, কিন্তু লেখাপড়া জানিলে কি হইবে, তাঁহার পুনঃপুনঃ সদুপদেশ সত্ত্বেও সে কেবলই নানা হাঙ্গামায় পড়িতেছে, ইচ্ছা করিয়া পড়িতেছে!

এ বৃদ্ধবয়সে শুধু তাঁহারই মরণ নাই, ইত্যাদি নানা কথা ও তিরস্কার প্রণবকে রোয়াকের ধারে

দাঁড়াইয়া শুনিতে হইল। বাগানের বড়ো কাঁঠাল গাছের একটা ডাল কে কাটিয়া লইয়া গিয়াছে, খুড়িমা চৌকি দিয়া বেড়ান কখন, তিনি ও-সব পারিবেন না, তাঁহাকে যেন কাশী পাঠাইয়া দেওয়া হয়, কারণ কর্তাদের অত কষ্টের বিষয়-সম্পত্তি চোখের উপর নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এ দৃশ্য দেখাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

দিনচারেক বাড়ি থাকিয়া খুড়িমাকে একটু শান্ত করিয়া চশমার ব্যবস্থার দোহাই দিয়া সে কলিকাতায় রওনা হইল। সোদপুরে খুড়িমার একজন ছেলেবেলায়-পাতানো গোলাপফুল আছেন, তাঁহারা প্রণবকে দেখিতে চান একবার, সেখানে যেন সে অবশ্য যায়, খুড়িমার মাথার দিব্য। প্রণব মনে মনে হাসিল। বৎসর-চার পূর্বে গোলাপফুলের বড়ো মেয়েটির যখন বিবাহের বয়স হইয়াছিল, তখন খুড়িমা এই কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রণব যাওয়ার সময় করিয়া উঠিতে পারে নাই। তারপরই আসিল নন্-কো-অপারেশনের ঢেউ, এবং নানা দুঃখ-দুর্ভোগ। সেটির বিবাহ হইয়াছে, এবার বোধ হয় ছোটটির পালা।

কলিকাতায় আসিয়া সে প্রথমে অপুর খোঁজ করিল, পরিচিত স্থানগুলিতে গিয়া দেখিল, দু-একদিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি খুঁজিল, কারণ যদি অপু কলিকাতায় থাকে তবে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না। চাঁপদানিতে যে অপু নাই তাহা তিন বৎসর আগে জেলে ঢুকিবার সময় জানিত, কারণ তাহারও প্রায় এক বৎসর আগে অপু সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে।

একদিন সে মন্মথদের বাড়ি গেল। তখন রাত প্রায় আটটা, বাহিরের ঘরে মন্মথ বসিয়া কাগজপত্র দেখিতেছে, সে আজকাল অ্যাটর্নি, খুড়-শ্বশুরের বড়ো নামডাক ও পশারের সাহায্যে নতুন বসিলেও দু-পয়সা উপার্জন করে। মন্মথ যে ব্যবসায় উন্নতি করিবে, তাহার প্রমাণ প্রণব সেদিনই পাইল।

ঘণ্টাখানেক কথাবার্তার পরে রাত সাড়ে সাতটার কাছাকাছি মন্মথ যেন একটু উসখুস করিতে লাগিল—যেন কাহার প্রতীক্ষা কবিতেছে। একটু পরেই একখানা বড়ো মোটরগাড়ি আসিয়া দরজায় লাগিল, একটি পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের যুবকের হাত ধরিয়া দু-জন লোক ঘরে প্রবেশ করিল। প্রণব দেখিয়াই বুঝিল, যুবকটি মাতাল অবস্থায় আসিয়াছে। সঙ্গের লোক দুইটির মধ্যে একজনের একটা চোখ খারাপ, ঘোলাটে ধরনের—বোধ হয় সে চোখে দেখিতে পায় না, অপর লোকটি বেশ সুপুরুষ। মন্মথ হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, এই যে মল্লিক মশায়, আসুন, ইনিই মিঃ শর্মা?...বসুন, নমস্কার। গোপালবাবু, বসুন এইখানে। আর ওঁকে আমাদের কনডিশন্স্ সব বলেছেন তো?

ধরনে প্রণব বুঝিল মল্লিক মশায় বড়ো পাকা লোক। উত্তর দিবার পূর্বে তিনি একবার প্রণবের দিকে চাহিলেন। প্রণব উঠিতে যাইতেছিল, মন্মথ বলিল—না, না, বসো হে। ও আমার ক্লাসফ্রেন্ড, একসঙ্গে কলেজে পড়তুম—ও ঘরের লোক, বলুন আপনি। মল্লিক মশায় একটা পুঁটুলি খুলিয়া কি সব কাগজ বাহির করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নসুরে খানিকক্ষণ কি কথাবার্তা হইল। সঙ্গের অন্য লোকটি দু'বার যুবকটির কানে-কানে ফিস-ফিস করিয়া কি বলিল, পরে যুবক একটা কাগজে নাম সই করিল। মন্মথ দু-বার সইটা পরীক্ষা করিয়া কাগজখানা একটা খামের মধ্যে পুরিয়া টেবিলে রাখিয়া দিল ও একরাশ নোটের তাড়া মল্লিক মশায়কে গুনিয়া দিল। পরে দলটি গিয়া মোটরে উঠিল।

প্রণব অপুর মতো নির্বোধ নয়, সে ব্যাপারটা বুঝিল। যুবকটির নাম অজিতলাল সেনশর্মা, কোনও জমিদারের ছেলে। যে-জন্যই হউক, সে দুই হাজার টাকার হ্যান্ডনোট কাটিয়া দেড় হাজার টাকা লইয়া গেল এবং মল্লিক মশায় তাহার দালাল, কারণ, সকলকে মোটরে উঠাইয়া দিয়া তিনি আবার ফিরিয়া আসিলেন ও পুনরায় প্রণবের দিকে বিরক্তির দৃষ্টিতে চাহিয়া মন্মথর সঙ্গে নিম্নসুরে

কিসের তর্ক উঠাইলেন—সাড়ে সাত পার্সেন্টের জন্য তিনি যে এতটা কষ্ট স্বীকার করেন নাই, এ কথা কয়েকবার শুনাইলেন। ঠিক সেই সময়েই প্রণব বিদায় লইল।

পরদিন মন্মথর সঙ্গে আবার দেখা। মন্মথ হাসিয়া বলিল—কালকের সেই কাপ্তেন বাবুটি হে—আবার শেষরাত্রে তিনটের সময় মোটরে এসে হাজির। আবার চাই হাজার টাকা,—থোকে থার্টিফাইভ পার্সেন্ট লাভ মেরে দিলুম। মল্লিক লোকটা ঘুঘু দালাল। বড়োলোকের কাপ্তেন ছেলে যখন শেষরাতে হ্যান্ডনোট কাটছেন, তখন আমরা যা পারি করে নিতে—আমার কি, লোকে যদি দেড়হাজার টাকার হ্যান্ডনোট কেটে এক হাজার নেয় আমার তাতে কি? দোষ কি? এই-সব চরিয়েই তো আমাদের খেতে হবে! কত রাত এমন আসে দ্যাখ না, টাকার যা বাজার কলকাতায়, কে দেবে?

প্রণব খুব আশ্চর্য হইল না। ইহাদের কার্যকলাপ সে কিছু কিছু জানে, এক অপ্রকৃতিস্থ মাতাল যুবকের নিকট হইতে ইহারা এক রাত্রিতে হাজার টাকা অসৎ উপায়ে উপার্জন করিয়া বড়ো গলায় সেইটাই আবার বাহাদুরি করিয়া জাহির করিতেছে! হতভাগ্য যুবকটির জন্য প্রণবের কষ্ট হইল—মত্ত অবস্থায় সে যে কি সই করিল, কত টাকা তাহার বদলে পাইল, হয়তো বা তাহা সে বুঝিতেও পারিল না।

কলিকাতা হইতে সে মামার বাড়ি আসিল। মাতৃসমা বড়ো মামিমা আর ইহজগতে নাই, গত বৎসর পূজার সময় তিনি—প্রণব তখন জেলে। সেখানেই সে সংবাদটা পায়। গঙ্গানন্দকাটির ঘাটে নৌকা ভিড়িতে তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। কাল ট্রেনে সারা রাত ঘুম হয় নাই আদৌ, তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া দোতলায় কোণের ঘরে বিশ্রামের জন্য যাইয়া দেখিল, বিছানার উপর একটি পাঁচ ছয় বৎসরের ছেলে চুপ করিয়া শুইয়া! দেখিয়া মনে হইল, একরাশ বাসি গোলাপফুল কে যেন বিছানার উপর উপুড় করিয়া ঢালিয়া রাখিয়াছে—হ্যাঁ, সে যাহা ভাবিয়াছে তাই—জ্বরে ছেলেটির গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে, মুখ জ্বরের ধমকে লাল, ঠোঁট কাঁপিতেছে, কেমন যেন দিশেহারা ভাব। মাথার দিকে একখানা রেকাবিতে দুখানা আধ-খাওয়া ময়দার রুটি ও খানিকটা চিনি। প্রণব জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কাজল, না?

খোকা যেন হঠাৎ চমক ভাঙিয়া কতকটা ভয় ও কতকটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, কোনও কথা বলিল না।

প্রণবের মনে বড়ো কষ্ট হইল—ইহাকে ইহারা এভাবে একা উপরের ঘরে ফেলিয়া রাখিয়াছে! অসহায় বালক একলাটি শুইয়া মুখ বুজিয়া জ্বরের সঙ্গে যুঝিতেছে, পথ্য দিয়াছে কি—না, দুখানা ময়দার হাতে-গড়া রুটি ও খানিকটা লাল চিনি। আর কিছু জোটে নাই ইহাদের? জ্বরের ঘোরে তাহাই বালক যাহা পারিয়াছে খাইয়াছে। প্রণব জিজ্ঞাসা করিল—খোকা রুটি কেন, সাবু দেয় নি তোমায়?

খোকা বলিল—ছাবু নেই।

—নেই কে বললে?

—মা—মামিমা বললে ছাবু নেই।

সে জ্বরে হাঁপাইতেছে দেখিয়া প্রণব ঠাণ্ডা জল আনিয়া তাহার মাথাটা বেশ করিয়া ধুইয়া দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এরূপ করিতেই জ্বরটা একটু কমিয়া আসিল, বালক একটু সুস্থ হইল। দিশেহারা ও হাঁস-ফাঁস ভাবটা কাটিয়া গেল। প্রণব বলিল—বলো তো আমি কে?

খোকা বলিল—জা-জা-জা-জানি নে তো?

প্রণব বলিল—আমি তোমার মামা হই খোকা। তোমার বাবা বুঝি আসে নি এর মধ্যে?

কাজল ঘাড় নাড়িয়া বলিল—ন্-ন্া-না তো, বাবা কতদিন আসে নি।

প্রণব কৌতুকের সুরে বলিল—তুমি এত তোৎলা হলে কি করে, কাজল?

সে অপুর ছেলেকে খুব ছোটবেলায় দেখিয়াছিল। আজ দেখিয়া মনে হইল, অপুর ঠোঁটের সুকুমার রেখাটুকু ও গায়ের সুন্দর রংটি বাদে ইহার মুখের বাকি সবটুকু মায়ের মতো।

কাজল ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল—আমার বাবা আসবে না?

—আসবে না কেন? বাঃ!

—ক-ক-কবে আসবে?

—এই এলো বলে। বাবার জন্যে মন কেমন করে বুঝি?

কাজল কিছু বলিল না।

অপুর উপরে প্রণবের খুব রাগ হইল। ভাবিল—আচ্ছা পাষণ্ড তো! মা-মরা কচি বাচ্চাটাকে বেঘোরে ফেলে রেখে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে বসে আছে! ওকে এখানে কে দেখে তার নেই ঠিক—দয়া মায়া নেই শরীরে?

শশীনারায়ণ বাঁড়ুজ্যে প্রণবের নিকট জামাইয়ের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন—বন্ধুর সঙ্গে বিয়ের যোগাযোগটি তো ঘটিয়েছিলে, ভেবে দ্যাখো তো সে আজ পাঁচ বছরের মধ্যে নিজের ছেলেকে একবার চোখের দেখা দেখতে এলো না, ত্রিশ-চল্লিশ টাকার মাইনের চাকরি করছেন আর ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভবঘুরের মতো, চাল নেই চুলো নেই, কোন জন্মে যে করবেন সে আশাও নেই—বোলো না, হাড়ে চটেছি আমি—এদিকে ছেলেটি কি অবিকল তাই!...এই বয়েস থেকেই তেমনি নির্বোধ, অথচ যেমনি চঞ্চল তেমনি একগুঁয়ে। চঞ্চল কি একটু-আধটু? ওইটুকু তো ছেলে, একদিন করেছে কি, একদল গরুর গাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে চলে গিয়েছে সেই পীরপুরের বাজারে—এদিকে আমরা খুঁজে পাই নে, চারিদিকে লোক পাঠাই—শেষে মাখন মুহুরির সঙ্গে দেখা, সে ধরে নিয়ে আসে। খাওয়াও, দাওয়াও, মেয়ের ছেলে কখনও আপনার হয় না, যে পর সে-ই পর।

খোকা বাপের মতো লাজুক ও মুখচোরা—কিন্তু প্রণবের মনে হইল, এমন সুন্দর ছেলে সে খুব কম দেখিয়াছে। সারা গা বাহিয়া যেন লাবণ্য ঝরিতেছে, সদাসর্বদা মুখ টিপিযা কেমন এক করুণ, অপ্রতিভ ধরনেব হাসি হাসে—মুখখানা এত লাজুক ও অবোধ দেখায় সে সময়...কেমন যে একটা করুণা হয়! এখানে কয়েক দিন থাকিয়া প্রণব বুঝিয়াছে, দিদিমা মারা যাওয়ার পর এ বাড়িতে বালককে যত্ন করিবার আর কেহ নাই—সে কখন খায, কখন শোয়, কি পরে—এ সব বিষযে বাড়ির কাহারও দৃষ্টি নাই। শশীনারায়ণ বাঁড়ুজ্যে তো নাতিকে দু-চক্ষে দেখিতে পারেন না, সর্বদা কড়া শাসনে রাখেন। তাঁহাব বিশ্বাস এখন হইতে শাসন না করিলে এ-ও বাপের মতো ভবঘুরে হইযা যাইবে, অথচ বালক বুঝিয়া উঠিতে পারে না, দাদামহাশয় কেন তাহাকে অমন উঠিতে-তাড়া বসিতে-তাড়া দেন—ফলে সে দাদামহাশয়কে যমের মতো ভয় করে, তাঁহাব ত্রিসীমানা দিয়া হাঁটিতে চায না।

কলিকাতায় ফিরিয়া প্রণব দেবব্রতের সঙ্গে দেখা করিল। দেবব্রত একটু বিষণ্ণ—বিলাত যাইবার পূর্বে সে একটি মেয়েকে নিজের চোখে দেখিয়া বিবাহের জন্য পছন্দ করিয়াছিল—কিন্তু তখন নানা কারণে সম্বন্ধ ভাঙিয়া যায়—সে আজ তিন বৎসর পূর্বের কথা। এবার বিদেশ হইতে ফিরিয়া সে নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া সন্ধান লইয়া জানে মেয়েটির এখনও বিবাহ হয় নাই। মেয়েটির ডান পায়ের হাঁটুতে নাকি কি হইয়াছে, ডাক্তারে সন্দেহ করিতেছেন বোধ হয তাহাতে চিরজীবনের জন্য ওই পা খাটো হইয়া থাকিবে—এ অবস্থায় কেই-বা বিবাহ করিতে অগ্রসব হইবে? শুনিবামাত্র দেবব্রত ধরিয়া বসিয়াছে সে ওই মেয়েকেই বিবাহ করিবে—মায়ের ঘোর আপত্তি, পিসেমহাশয়ের আপত্তি, মামাদের আপত্তি—সে কিন্তু নাছোড়বান্দা। হয় ওই মেয়েকে বিবাহ করিবে, নতুবা দরকার নাই বিবাহে।

দেবব্রতের সঙ্গে প্রণবের খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল না, অপুর সঙ্গে ইতিপূর্বে বার-দুই-তিন তাহার কাছে গিয়াছিল এই মাত্র। এবার সে যায় অপুর কোন সন্ধান দিতে পারে কিনা তাহাই জানিবার জন্য। কিন্তু এই বিবাহ-বিভ্রাটকে অবলম্বন করিয়া মাস-দুইয়ের মধ্যে দু-জনের একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিল।

দেবব্রত এই সব গোলমালের দরুন পিসেমহাশয়ের বাসা ছাড়িয়া কলিকাতায় হোটেলে

উঠিয়াছিল—বৈকালে সেখানে একদিন প্রণব বেড়াইতে গিয়া শুনিল, দেবব্রতের মা এ বিবাহে মত দিয়াছেন। দেবব্রত বলিল—ঠিক সময়ে এসেছেন, আমি ভাবছিলুম আপনার কথা—কাল পিসেমশায় আর বড়ো মামা যাবেন মেয়েকে আশীর্বাদ করতে, আপনিও যান ওঁদের সঙ্গে। ঠিক বিকেল পাঁচটায় এখানে আসবেন।

মেয়ের বাড়ি গোয়াবাগানে। ছোট দোতলা বাড়ি, নিচে একটা প্রেস। মেয়ের বাপ গভর্নমেন্টের চাকরি করেন। মেয়েটিকে দেখিয়া খুব সুন্দরী বলিয়া মনে হইল না প্রণবের, গায়ের রং যে খুব ফরসা তাও নয়, তবে মুখে এমন কিছু আছে যাতে একবার দেখিলে বার বার চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। ঘাড়ের কাছে একটা জতুকচিহ্ন, চুল বেশ বড়ো বড়ো ও কোঁকড়ানো। বিবাহের দিনও উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে ধার্য হইয়া গেল।

দেবব্রত সংগতিপন্ন গৃহস্থ-ঘরের ছেলে। দুঃখ কষ্ট কাহাকে বলে জানে না, এ পর্যন্ত বরাবর যথেষ্ট পয়সা হাতে পাইয়াছে, তাহার পিসেমহাশয় অপুত্রক, তাঁহার সম্পত্তি ও কলিকাতায় দু-খানা বাড়ি দেবব্রতই পাইবে। কিন্তু পয়সা অপব্যয় করার দিকে দেবব্রতের ঝোঁক নাই, সে খুব হিসাবী ও সতর্ক এ বিষয়ে। সাংসারিক বিষয়ে দেবব্রত খুব হুঁশিয়ার—পাটনায় যে চাকরিটা সে সম্প্রতি পাইয়াছে, সে শুধু তাহার জোগাড়-যন্ত্র ও সুপারিশ ধরিবার কৃতিত্বের পুরস্কার—নতুবা কুড়ি-বাইশ জন বিলাতফেরত অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারের দরখাস্তের মধ্যে তাহার মতো তরুণ ও অনভিজ্ঞ লোকের চাকুরি পাইবার কোনই আশা ছিল না। শাঁখারিটোলায় দেবব্রতের পিসেমহাশয় তারিণী মিত্রের বাড়ি হইতেই দেবব্রত বিবাহ করিতে গেল। পিসিমার ইচ্ছা ছিল খুব বড়ো একটা মিছিল করিয়া বর রওনা হয়, কিন্তু পিসেমহাশয় বুঝাইলেন ওসব একালের ছেলে—বিশেষ করিয়া দেবব্রতের মতো বিলাতফেরত ছেলে—পছন্দ করিবে না। মায়ের নিকট বিবাহ করিতে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিবার সময় দেবব্রতের চোখ ভিজিয়া উঠিল—স্বর্গগত স্বামীকে স্মরণ করিয়া দেবব্রতর মা-ও চোখের জল ফেলিলেন—সবাই বকিল, তিরস্কার করিল। একজন প্রতিবেশিনী হাসিয়া বলিলেন—দোর-ধরুণীর টাকা কই?...

দেবব্রতর পিসিমা বলিলেন—আমার কাছে গুনে নিয়ো মেজবৌ। ও-কি দোর-ধরা হল? আমার ছেলেবেলায় আমাদের বাঙাল দেশে নিয়ম ছিল দেখেছি সাতজন এয়ো আর সাতজন কুমারী এই চোদ্দজনকে দোর-ধরুণীর টাকা দিয়ে তবে বর বেরুতে পেত বাড়ি থেকে। একালে তো সব দাঁড়িয়েছে—

দেবব্রত একটুখানি দাঁড়াইল। ফিরিয়া বলিল—মা শোন একটু।...

আড়ালে গিয়া চুপি চুপি বলিল—চাটুজ্যে বাড়ির মেয়েটা দোর ধরার জন্যে দাঁড়িয়েছিল, আমি জানি, ছোট পিসিমা তাকে সরিয়ে দিয়েছেন—এ-সবেতে আমার মনে বড়ো কষ্ট হয়, মা। এই দশ টাকার নোটটা রাখো, তাকে তুমি দিয়ো—কেন তাকে সরালে বলো তো—আমি জানি অবিশ্যি কেন সরিয়েছে—কিন্তু এতে লোকের মনে কষ্ট হয় তাও ওরা বোঝে না!

মা বলিলেন—ও-কথা তোর ওদের বলবার দরকার নেই—টাকা দিলি আমি দেবো এখন। ছোট ঠাকুরঝির দোষ কি, বিধবা মেয়েকে কি বলে আজ সামনে রাখে বলো না? হিঁদুর নিয়মগুলো তো মানতে হবে, সবাই তো তোমার মতো বেহ্মজ্ঞানী হয়নি এখনও। মেয়েটার দোষ দিইনে, তার আর বয়স কি—ছেলেমানুষ—সে না-হয় অত বোঝে না, আমোদে নেচে দোর ধরবে বলে দাঁড়িয়েছে—তার বাপ-মায়ের তো এটা দেখতে হয়। শুভকাজের দিন বিধবা মেয়েকে কেন এখানে পাঠানো বাপু? তা নয়—গরিব কিনা, পাঠিয়েছে—যা কিছু ঘরে আসে—যাক। আমি দেবো এখন—তা হ্যাঁ রে, পাঁচটা দিলেই তো হত—এত কেন?...

—না মা ওই থাক, দিয়ো। ছোটপিসিমাকে বলো বুঝিয়ে, ওতে শুভকাজ এগোয় না, আরও পিছিয়ে যায়।

দু-তিনখানা বাড়ির মোড়ে চাটুজ্যে বাড়িটা। ইহারা সবাই ছাপাখানায় কাজ করে, বৃদ্ধ চাটুজ্যেমশায়ও আগে কম্পোজিটরের কাজ করিতেন, আজকাল চোখে দেখেন না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। আজকাল তাঁহার কাজ প্রতিবেশীদের নিকট অভাব জানাইয়া আধুলি ধার করিয়া বেড়ানো। দেবব্রত ইঁহাদের সকলকেই অনেক দিন হইতে চেনে। তাহার গোলাপফুল সাজানো মোটরখানা চাটুজ্যেবাড়ির সম্মুখে মোড় ঘুরিবার সময় দেবব্রত কেবলই ভাবিতেছিল, কোনও জানালার ফাঁক দিয়া তেরো বৎসরের বিধবা মেয়েটা হয়তো কৌতূহলের সহিত তাহাদেব মোটর ও ফিটন গাড়ির সারির দিকে চাহিয়া আছে।

রাত্রের গোড়ার দিকেই বিবাহ ও বরযাত্রীভোজন মিটিয়া গেল।

দেবব্রত বাসরে গিয়া দেখিল, সেখানে অত্যন্ত ভিড়—বাসরের ঘর খুব বড়ো নয়—সামনের দালানেও স্থান নাই, অন্য অন্য ঘরের বাক্সতোরঙ্গ সব দালানে বাহির করা হইয়াছে, অথচ মেয়েদের ভিড় এত বেশি যে বসা তো দূরের কথা, সকলের দাঁড়াইবার জায়গাও নাই। সে বড়ো শালাকে বলিল—দেখুন, যদি অনুমতি করেন, একটু ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যে জাহির করি। এই ট্রাঙ্কগুলো এখানে বাখার কোন মানে নেই—লোক ডাকিয়ে দেওয়ালের দিকে এক সারি, এখানে আর এক সারি করে দিন সিঁড়ির ধাপে ধাপে—বুঝলেন না?...যাবার আসবারও কষ্ট হবে না অথচ এদের জায়গা হবে এখন।

তাহার ছোট শালীরা ব্যাপারটা লইয়া তাহাকে কি একটা ঠাট্টা করিল। সবাই হাসিয়া উঠিল।

রাত্রি একটার পর কিন্তু যে-যাহার স্থানে চলিয়া গেল। দেবব্রত বাসর হইতে বাহির হইয়া দালানের একটা স্টিলের তোরঙ্গের উপর বসিয়া একটা সিগারেট ধরাইল। তাহার মনে আনন্দের সঙ্গে কেমন একটা উত্তেজনা।...মনে মনে খুব একটা তৃপ্তিও অনুভব করিল।...জীবন এখন সুনির্দিষ্ট পথে চলিবে—লক্ষ্মীছাড়ার জীবন শেষ হইল। পাটনার চাকুরিতে একটা সুবিধা এই যে, জায়গা খুব স্বাস্থ্যকর, বাড়িভাড়া সস্তা, বছরে পঞ্চাশ টাকা করিয়া মাহিনা বাড়িবে—তবে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদ কিছু কম। সে ভাবিল—যাই তো আগে, ফৈজুদ্দীন হোসেনকে একটু হাতে রাখতে হবে, ওর হাতেই সব—অন্য সব ডিরেক্টার তো কাঠের পুতুল। ক্যান্টনমেন্টের ক্লাবে গিয়েই ভর্তি হয়ে যাবো—ওবা আবার ওসব দেখলে ভেজে কিনা!

নববধূ এখনও ঘুমায় নাই, দেবব্রত গিয়া বলিল—বাইরে এসো না সুনীতি, কেউ নেই। আসবে?

নববধূ চেলির পুঁটুলি নয়, কিন্তু পায়ের জন্য তার উঠিতে কষ্ট হয়—দেবব্রত তাহাকে সযত্নে ধরিয়া দালানে আনিয়া তোরঙ্গটার উপর ধীবে ধীরে বসাইয়া দিল। নববধূ হাসিয়া বলিল—ওই দোরটা বন্ধ করে দাও—সিঁড়ির ওইটে—শেকল উঠিয়ে দাও—হাঁ—ঠিক হয়েছে—নইলে এক্ষুনি কেউ এসে পড়বে।

দেবব্রত পাশে বসিয়া বলিল—রাত জেগে কষ্ট হচ্ছে খুব—না?

—কি এমন কষ্ট, তা ছাড়া দুপুরবেলা আমি ঘুমিয়েছি খুব।

—আচ্ছা, তুমি কনে-চন্দন পরো নি কেন সুনীতি? এখানে সে চলন নেই?

মেয়েটি সলজ্জমুখে বলিল—মা পরাতে বলেছিলেন—

—তবে?

—জ্যাঠাইমা বললেন, তুমি নাকি পছন্দ করবে না।

দেবব্রত হাসিয়া উঠিয়া বলিল—কেন বল তো—বিলেত-ফেরত বলে? বা তো—

পরে সে বলিল—আমি সাত তারিখে পাটনায় যাব, বুঝলে, তোমাকে আর মাকে এসে নিয়ে যাব মাস-দুই পরে, সুনীতি। তোমার বাবাকে বলে রেখেছি।

মেয়েটি নতমুখে বলিল—আচ্ছা একটা কথা বলব? কিছু মনে করবে না?...

—বলো না, কি মনে করব?—

—আচ্ছা, আমার এই পা নিয়ে তুমি যে বিয়ে করলে, যদি আমার পা না সারে? দ্যাখো,

তোমার গা ছুঁয়ে সত্যি বলছি আমার ইচ্ছে ছিল না বিয়ের। মাকে কতবার বুঝিয়ে বলেছি, মা, এই তো আমার পায়ের দশা, পরের ওপর অনর্থক কেন বোঝা চাপানো সারাজীবন—তা মা বললেন—তুমি নাকি খুব—তোমার নাকি খুব ইচ্ছে। আচ্ছা কেন বলো তো এ মতি তোমার হল?

দেবব্রত বলিল—স্পষ্ট কথা বললে তুমিও কিছু মনে করবে না তো সুনীতি? তাহলে বলি শোন, তোমার এই পায়ের দোষ যদি না হত তবে আমি অন্য জায়গায় বিয়ে করে ফেলতুম—যেদিন থেকে শুনেছি পায়ের দোষের জন্য তোমার বিয়ে এই তিন বছরের মধ্যে হয় নি—সেদিন থেকে আমার মন বলেছে ওখানেই বিয়ে করব, নয় তো নয়। অন্য জায়গায় বিয়ে করলে মনে শান্তি পেতাম না সুনীতি। সেই যে তোমাকে দেখে গিয়েছিলুম, তারপর বিয়ে তখন ভেঙে গেল, কিন্তু তোমার মুখখানা কতবার যে মনে হয়েছে!...কেন কে জানে—আমি কাব্যি করছি নে সুনীতি, ওসব আমার আসে না, আমি সত্যি কথা বলছি।

তারপর সে আজ ওবেলার চাটুজ্যে-বাড়ির বিধবা মেয়েটির কথা বলিল। বলিল—দ্যাখ, এও তো কাব্যের কথা নয়—আজ বিয়ের আসনে বসে কেবলই সেই ছোট মেয়েটার কথা মনে হয়েছে। ছোট পিসিমা তাকে তাড়িয়ে দিয়ে আজ আমার অর্ধেক আনন্দ মাটি করেছেন সুনীতি—তোমার কাছে বলছি, আর কাউকে বোলো না যেন! এ কেউ বুঝবে না, আমার মা-ও বোঝেন নি।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া রাত্রি দুইটা বাজিল।

কাজলের মুশকিল বাধে রোজ সন্ধ্যার সময়। খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে তাহার মামিমা বলেন, ওপরে চলে যাও, শুয়ে পড়ো গিয়ে। কাজল বিপন্নমুখে রোয়াকের কোণে দাঁড়াইয়া শীতে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে থাকে। ওপরে কেউ নাই, মধ্যে একটা অন্ধকার সিঁড়ি, তাহার উপর দোতলার পাশের ঘবটাতে আলনায় একরাশ লেপকাঁথা বাঁধা আছে। আধ-অন্ধকারে সেগুলো এমন দেখায়!

আগে আগে দিদিমা সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া আসিতেন। দিদিমা আর নাই, মামিমারা খাওয়াইয়া দিয়াই খালাস। সেদিন সে সেজ দিদিমাকে বলিয়াছিল। তিনি ঝংকার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, আমার তো আব খেয়েদেয়ে কাজ নেই, এখন তোমায় যাই শোওয়াতে! একা এটুকু আর যেতে পারেন না, সেদিন তো পীরপুরের হাটে একা পালিয়ে যেতে পেরেছিলে? ছেলের ন্যাক্‌রা দেখে বাঁচিনে!

নিরুপায় হইয়া ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি বাহিয়া সে উপরে উঠে। কিন্তু ঘরে ঢুকিতে আর সাহস না করিয়া প্রথমটা দোরের কাছে দাঁড়াইয়া থাকে। কোণে কড়ির আলনার নিচে দাদামহাশয়ের একরাশ পুরোনো হুঁকার খোল ও হুঁকাদান। এককোণে মিটমিটে তেলের প্রদীপ, তাতে সামান্য একটুখানি আলো হয় মাত্র, কোণের অন্ধকার তাহাতে আরও যেন সন্দেহজনক দেখায়। এখানে একবার আসিলে আর কেহ কোথাও নাই, ছোটমামিমা নাই, ছোটদিদিমা নাই, দলু নাই, টাটি নাই—শুধু সে আর চারিপাশের এই সব অজানা বিভীষিকা। কিন্তু এখানেই বা সে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবে? ছোটমাসিমা ও বিন্দু-ঝি এ ঘরে শোয়, তাহাদের আসিতে এখনও বহু দেরি, শীতের হাওয়ায় হাড়-কাঁপুনি ধরিয়া যায় যে! অগত্যা সে অন্যান্য দিনের মতো চোখ বুজিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নিজের বিছানার উপর উঠিয়া ছোট লেপটা একেবারে মুড়ি দিয়া ফেলে। কিন্তু বেশিক্ষণ লেপ-মুড়ি দিয়া থাকিতে পারে না—ঘরের মধ্যে কোন কিছু নাই তো? মুখ খুলিয়া একবার ভীতচোখে চারিধারে চাহিয়া দেখিয়া আবার লেপ-মুড়ি দেয়—আর যত রাজ্যের ভূতের গল্প কি ঠিক ছাই এই সময়টাতেই মনে আসে?

দিদিমা থাকিতে এসব কষ্ট ছিল না। দিদিমা তাহাকে ঘুম না পাড়াইয়া নামিতেন না। কাজল উপরে আসিয়াই বিছানার উপরকার সাজানো লেপকাঁথার স্তূপের উপর খুশি ও আমোদের সহিত বার বার লাফাইয়া পড়িয়া চেঁচাইতে থাকিত—আঁমি জলে ঝাঁপাই—হি-হি—আমি জলে ঝাঁপাই—ও দিদিমা—হি-হি—

কোনোরকমে দিদিমা তাহার লাফানো হইতে নিবৃত্ত করিয়া শোয়াইতে কৃতকার্য হইলে সে

দিদিমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিত,—এইবার এক্‌তা গ-গ-অ-প্প।—কথার শেষের দিকে পাতলা রাঙা ঠোঁট দুটি ফুলের কুঁড়ির মতো এক জায়গায় জড়ো করিয়া না আনিলে কথা মুখ দিয়া বাহির হইত না। তাহার দিদিমা হাসিয়া বলিত—যে গুড় খাস, খেয়ে খেয়ে এমনি তোতলা। গল্প বলব, কিন্তু তুমি পাশ ফিরে চুপটি করে শোবে, নড়বেও না, চড়বেও না। কাজল ভ্রূ কুঁচকাইয়া ঘাড় সামনের দিকে নামাইয়া থুতনি প্রায় বুকের উপর লইয়া আসিত। পরে চোখের ভুরু উপরের দিকে উঠাইয়া হাসি-ভরা চোখে চুপ করিয়া দিদিমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। দিদিমা বলিত, দুষ্টুমি কোরো না দাদাভাই, আমার এখন অনেক কাজ, তোমার দাদু আবার এখুনি পাশার আড্ডা থেকে আসবেন, তাঁকে খেতে দেব। ঘুমোও তো লক্ষ্মী ভাইটি!

কাজল বলিত, ইল্লি!...দা-দা-দাদুকে খাবার দেবে তো ছোট মামীমা, তু-তুমি এখন যাবে বইকি?—একতা গ-গ-অ-প্প করো, হ্যাঁ দিদিমা—

এ ধরনের কথা সে শিখিয়াছে বড়ো মাসতুতো ভায়েদের কাছে। তাহার বড়ো মাসিমার ছেলে দলু কথায় কথায় বলে—ইল্লি! কাজলও শুনিয়া শুনিযা তাহাই ধরিয়াছে।

তাহার পর দিদিমা গল্প করিতেন, কাজল জানালার বাহিরে তারাভরা, স্তব্ধ, নৈশ আকাশের দিকে চাহিয়া একবার মুখ ফুলাইত আবার হাঁ করিত, আবার ফুলাইত আবার হাঁ করিত। দিদিমা বলিত, আঃ, ছিঃ দাদু। ওরকম দুষ্টুমি করলে ঘুমুবে কখন? এখুনি তোমার দাদু ডাকবেন আমায, তখন তো আমায় যেতে হবে। চুপটি করে শোও। নইলে ডাকব তোমাব দাদুকে?

দাদামশায়কে কাজল বড়ো ভয় করে, এইবার সে চুপ হইয়া যাইত। কোথায় গেল সেই দিদিমা! সে আরও বছর দেড় আগে, তখন তাহার বয়স সাড়ে-চার বছব—একদিন ভারি মজার ব্যাপার ঘটিয়াছিল। সে রাত্রে ঘুমাইতেছিল, সকালে উঠিলে অবু চুপি চুপি বলিল—ঠাকুমা কাল রাতে মারা গিয়েছে, জানিস নে কাজল?

—কো-কোথায় গিয়েছে?

—মারা গিয়েছে, সত্যি আজ শেষরাত্রে নিয়ে গিয়েছে। তুই ঘুমুচ্ছিলি তখন।

—আবার ক-কবে আসবে?

অবু বিজ্ঞের সুরে বলিল—আর বুঝি আসে? তুই যা বোকা! ঠাকুরমাকে তো পোড়াতে নিয়ে চলে গেছে ওই দিকে।—সে হাত তুলিয়া নদীর বাঁকের দিকে দেখাইয়া দিল।

অবু ভারি চালবাজ। সব তাতেই ওইরকম চাল দেয়, ভারি তো এক বছরের বড়ো, দেখায় যে সব জানে সব বোঝে। ওই চালবাজির জন্যই তো কাজল অবুকে দেখিতে পারে না।

সে খুব বিস্মিতও হইল। দিদিমা আর আসিবে না! কেন?...কি হইয়াছে দিদিমার?...বা রে!

কিন্তু সেই হইতে দিদিমাকে আর সে দেখিতে পায় নাই। গোপনে গোপনে অনেক কাঁদিয়াছে, কোথায় দিদিমা এরকম একরাত্রের মধ্যে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে অনেক ভাবিয়াছে, কিছু ঠিক করিতে পারে নাই।

আজকাল আর কেহ কাছে বসিয়া খাওয়ায় না, সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া আসে না, গল্প করে না। একলাই এই অন্ধকারের মধ্য দিয়া আসিয়া উপরের ঘরে শুইতে হয়। সকলের চেয়ে মুশকিল হইয়াছে এইটাই বেশি কি-না!

বিংশ পরিচ্ছেদ

আরও এক বৎসর কাটিয়া গিযাছে। চৈত্র মাস যায়-যায়।

অপু অনেকদিন পরে দেশে ফিরিতেছিল। গাড়ির মধ্যে একজন মুসলমান ভদ্রলোক

লক্ষ্ণৌ-এর খরমুজার গুণবর্ধনা করিতেছিলেন, অনেকে মন দিয়া শুনিতেছিল—অপু অন্যনস্কভাবে জানালার বাহিরে চাহিয়া ছিল। কতক্ষণে গাড়ি বাংলা দেশে আসিবে? সাতসমুদ্র তেরো নদী পারের রূপকথার রাজ্য বাংলা! আজ দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বৎসর সে বাংলার শান্ত, কমনীয় রূপ দেখে নাই, এই বৈশাখে বাঁশের বনে বনে শুকনো বাঁশখোলার তলা-বিছাইয়া-পড়িয়া-থাকা, কাঞ্চনফুলে-ভরা সান-বাঁধানো পুকুরের ঘাটে সদ্যস্নাত নতমুখী তরুণীর মূর্তি—কলিকাতার মেস-বাটী, দালানের রেলিং-এ কাপড় মেলিয়া দেওয়া, বাবুরা সব আপিসে, নিচের বালতিতে বৈকাল তিনটার সময় কলের মুখ হইতে জল পড়িতেছে—এসব সুপরিচিত এই প্রিয় দৃশ্যগুলি আর একবার দেখিবার জন্য—উঃ, মন কি ছটফটই না করিয়াছে গত ছ'বছর! বাংলা ছাড়িয়া সে ভালো করিয়া বাংলা চিনিয়াছে, বুঝিয়াছে। বাংলাকে দেখা যাইবে আজ। সন্ধ্যা ঠিক সাতটার সময়।

রানীগঞ্জ ছাড়িয়া অনেক দূর আসিবার পরে, বালুময় মাঠের মধ্যে সিঙ্গারণ নদীর গ্রীষ্মের জল খররৌদ্রে শুকাইয়া গিয়াছে—দূর গ্রামের মেয়েরা আসিয়া নদীখাতের বালু খুঁড়িয়া সেই জলে কলসী ভর্তি করিয়া লইতেছে—একটি কৃষক-বধূ জলভরা কলসি কাঁখে রেলের ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া গাড়ি দেখিতেছে—অপু দৃশ্যটা দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল—সাবা শরীরে একটা অপূর্ব আনন্দ-শিহরণ! কতদিন বাংলার মেয়ের এ পরিচিত ভঙ্গিটি সে দেখে নাই! চোখ, মন জুড়াইয়া গেল।

বর্ধমান ছাড়াইয়া নিদাঘ অপরাহ্ণের ঘন ছায়ায় একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়িল। একটা ছোট পুকুর ফুটন্ত পদ্মফুলে একেবারে ভরা, ফুলে পাতায় জল দেখা যায় না—ওপারে বিচালি-ছাওয়া গৃহস্থের বাটী, একটা প্রাচীন সজিনা গাছ জলের ধারে ভাঙিয়া পড়িয়া গলিয়া খসিয়া যাইতেছে, একটা গোবরগাদা—আজ সারাদিনের আগুনবৃষ্টির পরে, বিহার ও সাঁওতাল পরগণার বন্ধুর, আগুন-রাঙা ভূমিশ্রীর পরে, ছায়াভরা পদ্মপুকুরটা যেন সারা বাংলার কমনীয় রূপের প্রতীক হইয়া তাহার চোখে দেখা দিল।

হাওড়া স্টেশনে ট্রেনটা আসিয়া দাঁড়াইতেই সে যেন খানিকটা অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—এত আলো, এত লোকজন, এত ব্যস্ততা, এত গাড়ি-ঘোড়া জীবনে যেন সে এই প্রথম দেখিতেছে, হাওড়া পুল পার হইবার সময় ওপারের আলোকোজ্জ্বল মহানগরীর দৃশ্যে সে যেন মুগ্ধ হইয়া গেল—ওগুলো কি? মোটর বাস? কই আগে তো ছিল না কখনও? কি বড়ো বড়ো বাড়ি কলিকাতায়, ফুটপাতে কি লোকজনের ভিড়! বাড়ির মাথায় একটা কিসের বিজ্ঞাপনের বিজলী আলোর রঙিন হরপ একবার জ্বলিতেছে, আবার নিভিতেছে—উঃ, কী কাণ্ড!

হ্যারিসন রোডের একটা বোর্ডিং-এ উঠিয়া একা একটা ঘর লইল—স্নানের ঘর হইতে সাবান মাখিয়া স্নান সারিয়া সারাদিনের ধুম-ধূলি ও গরমের পর ভারি আরাম পাইল। ঘরের আলোর সুইচ টিপিয়া ছেলেমানুষের মতো আনন্দে আলোটাকে একবার জ্বালাইতে একবার নিভাইতে লাগিল—সবই নতুন মনে হয়। সবই অদ্ভুত লাগে।

পরদিন সে কলিকাতার সর্বত্র ঘুরিল—কোন পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখা হইল না। বৌবাজারের সেই কবিরাজ বন্ধুটি বাসা উঠাইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, পূর্বপরিচিত মেসগুলিতে নতুন লোকেরা আসিয়াছে, কলেজ স্কোয়ারের সেই পুরাতন চায়ের দোকানটি উঠিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার সময় সে একটা নতুন বাংলা থিয়েটারে গেল শুধু বাংলা গান শোনার লোভে। বেশি দামের টিকিট কিনিয়া রঙ্গমঞ্চের ঠিক সম্মুখের সারির আসনে বসিয়া পুলকিত ও উৎসুক চোখে সে চারিদিকের দর্শকের ভিড়টা দেখিতেছিল। একটা অঙ্কের শেষে সে বাহিরে আসিল, ফুটপাতে একজন বুড়ি পান বিক্রি করিতেছে, অপুকে বলিল, বাবু, পান নেবেন না? নেন না! অপু ভাবিল, সবাই মিঠে পান কিনছে বড়ো আয়নাওয়ালার দোকান থেকে। এ বুড়ির পান বোধ হয় কেউ কেনে না—আহা, নিই এর কাছ থেকে।

সকলেরই উপর কেমন একটা করুণার ভাব, সবারই উপর কেমন একটা ভালোবাসা,

সহানুভূতির ভাব—অপুর মনের বর্তমান অবস্থায় বুড়ি পানওয়ালী হাত পাতিয়া দশটা টাকা চাহিয়া বসিলেও সে তৎক্ষণাৎ তাহা দিতে পারিত।

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে সে বাহির হইয়া বুড়িটার কাছে পান কিনিতে যাইতেছে, এমন সময় পিছনের আসনের দিকে তাহার নজর পড়িল।

সে একটু আগাইয়া গিয়া কাঁধে হাত দিয়া বলিল—সুরেশ্বরদা, চিনতে পারেন?

কলিকাতায় প্রথম ছাত্র-জীবনের সেই উপকারী বন্ধু সুরেশ্বরদা, সঙ্গে একটি তরুণী মহিলা। সুরেশ্বর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—গুডনেস্ গ্রেসাস্। আমাদের সেই অপূর্ব না?

অপূর্ব হাসিয়া বলিল—কেন, সন্দেহ হচ্ছে নাকি? ওঃ, কত দিন পরে আপনার সঙ্গে, ওঃ?

—দেখে সন্দেহ হবার কথা বটে। মুখের চেহারা বদলেছে, রঙটা একটু তামাটে—যদিও you are as handsome as ever—ও, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি—ইনি আমার বেটার-হাফ—আর ইনি আমার বন্ধু অপূর্ববাবু—কবি, ভাবুক, লেখক, ভবঘুরে অ্যান্ড হোয়াট নট—তারপর, কোথায় ছিলে এতদিন?

—কোথায় ছিলুম না তা বরং জিজ্ঞেস করুন—in all sorts of places—তবে সভ্যজগৎ থেকে দূরে—ছ'বছর পর কাল কলকাতায় এসেছি। ও ড্রপ উঠল বুঝি, এখন থাক, বলব এখন।

—মোস্ট বাজে প্লে। তার চেয়ে চলো, তোমার সঙ্গে বাইরে যাই—

অপু বন্ধুকে সিগারেট দিয়া নিজে সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল—আপনার এ-সব দেখে একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে, তাই ভালো লাগছে না বোধ হয়। আমার চোখ নিয়ে যদি দেখতেন, তবে ছ'বছর বনবাসের পর উড়িয়াদের রামযাত্রাও ভালো লাগত। জানেন সুরেশ্বরদা, সেখানে আমার ঘর থেকে কিছু দূরে এক জায়গায় একটা গিরগিটি থাকত—সেটা এবেলা-ওবেলা রঙ বদলাত, দুটি বেলা তাই শখ করে দেখতে যেতুম—তাই ছিল একমাত্র তামাশা, তাই দেখে আনন্দ পেতুম।

রাত সাড়ে ন'টায় থিয়েটার ভাঙিল। তারপর সে থিয়েটার-ঘর হইতে নিঃসৃত সুবেশ নরনারীর স্রোতের দিকে চাহিয়া রহিল—এই আলো, লোকজন, সাজানো দোকান-পসার—এসব সে ছেলেমানুষের মতো আনন্দে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল।

স্ত্রীকে মানিকতলায় শ্বশুরবাড়িতে নামাইয়া দিয়া সুরেশ্বর অপুর সহিত কর্পোরেশন স্ট্রীটের এক রেস্তোরাঁয় গিয়া উঠিল। অপুর কথা সব শুনিয়া বলিল—এই পাঁচ বছর ওখানে ছিলে? মন-কেমন করত না দেশের জন্য?

–Oh, at times I felt so terribly homesick–homesick for Bengal—শেষ দু-বছর দেশ দেখবার জন্য পাগল হয়েছিলুম—।

ফুটপাত বাহিয়া কয়েকটি ফিরিঙ্গি মেয়ে হাসি কলরব করিতে করিতে পথ চলিতেছে, অপু সাগ্রহে সেদিকে চাহিয়া রহিল। মানুষের গলার সুর মানুষের কাছে এত কাম্যও হয়। রাস্তাভরা লোকজন, মোটর গাড়ি, পাশের একটি একতলা বাড়িতে সাজানো গোছানো ছোট্ট ঘরে কয়েকটি সাহেবের ছেলেমেয়ে ছুটোছুটি করিয়া খেলা করিতেছে—সবই অদ্ভুত, সবই সুন্দর বলিয়া মনে হয়। আলোকোজ্জ্বল রেস্তোরাঁটায় অনবরত লোকজন ঢুকিতেছে, বাহির হইতেছে, মোটর হর্নের আওয়াজ, মোটর বাইকের শব্দ, একখানা রিকশা গাড়ি ঠুং ঠুং করিতে করিতে চলিয়া গেল—অপু চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল—যেন এসব সে কখনও দেখে নাই।

সুরেশ্বরকে বলিল—দেখুন জানলার ধারে এসে—ওই যে নক্ষত্রটা দেখছেন, আজ ক'বছর ধরে ওটাকে উঠতে দেখেছি ঘন বন-জঙ্গল-ভরা পাহাড়ের মাথার ওপরে। আজ ওটাকে হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল'র বাড়ির মাথার ওপরে উঠতে দেখে কেমন নতুন নতুন ঠেকছে। এই তো পৌনে দশটা রাত? এ সময় গত পাঁচ বৎসর শুধু আমি জঙ্গল পাহাড়—আর ভেড়িয়ার ডাক, কখনও কখনও বাঘের ডাকও—। আর কি loneliness! শহরে বসে সে সব বোঝা যাবে না।

সুরেশ্বরও নিজের কথা বলিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোন্ কলেজের অধ্যাপক, বিবাহ করিয়াছে কলিকাতায়। সম্প্রতি শালীর বিবাহ উপলক্ষে আসিয়াছে। বলিল—দ্যাখো ভাই, তোমার ও জীবন একবার আস্বাদ করতে ইচ্ছে হয়—কিন্তু তখন কি জানতুম বিয়ে এমন জিনিস হয়ে দাঁড়াবে? যদি কিছু করতে চাও জীবনে, বিয়ে কোরো না কখনও, বলে দিলুম। বিয়ে করো নি তো?

অপু হাসিয়া বলিল—ওঃ, আমি ভাবছি আপনার এ লেকচার যদি বউদি শুনতেন!...

—না না, শোনো। সত্যি বলছি, সে উনিশ-শো পনেরো সালের সুরেশ্বর আর নই আমি। সংসারের হাড়িকাঠে যৌবন গিয়েছে, শক্তি গিয়েছে, স্বপ্ন গিয়েছে, জীবনটা বৃথা খুইয়েছি—কত কি করবার ইচ্ছে ছিল—ওঃ, যেদিন এম.এ. ডিপ্লোমাটা নিয়ে কনভোকেশন হল থেকে বেরুলাম, মনে আছে মাঘের শেষ, গোলদিঘির দেবদারু গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে, সবে দখিনা হাওয়া শুরু হয়েছে, গাউন সমেত এক দোকানে গিয়ে ফটো ওঠালুম, কি খুশি! মনে হল, সারা পৃথিবীটা আমার পায়ের তলায়! ফটোখানা আজও আছে—চেয়ে দেখে ভাবি, কি ছিলুম, কি হয়ে দাঁড়িয়েছি! পাড়াগাঁয়ের কলেজে তিনশো চব্বিশ দিন একই কথা আওড়াই, দলাদলি করি, প্রিন্সিপালের মন জোগাই, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করি, ছেলেদের ডাক্তার দেখাই, এর মধ্যে মেয়ের বিয়ের ভাবনাও ভাবি—না না, তুমি হেসো না, এসব ঠাট্টা নয়।

অপু বলিল—এত সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়লেন কেন হঠাৎ সুরেশ্বরদা—এক পেয়ালা কফি—

—না না, তোমাকে পেয়ে সব বললুম, কারুর কাছে বলি নে, কে বুঝবে, তারা সবাই দেখছে, দিব্যি চাকরি করছি, মাইনে বাড়ছে, তবে তো বেশ‌ই আছি। আমি যে মরে যাচ্ছি, তা কেউ বুঝবে না।

রেস্তোরাঁ হইতে বাহির হইয়া পরস্পর বিদায় লইল। অপু বলিল—জানেন তো বলেছে—। In each of us a child has lived and a child has died–a child of promise, who never grew up–কিন্তু জীবনটা অদ্ভুত জিনিস সুরেশ্বরদা—অত সহজে তাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আচ্ছা আসি, বড়ো আনন্দ পেলুম আজ। যখন প্রথম কলকাতায় পড়তে আসি, জায়গা ছিল না, তখন আপনারা জায়গা দিয়েছিলেন, সে কথা ভুলি নি এখনও।

পরদিন দুপুর পর্যন্ত সে ঘুমাইয়া কাটাইল। বৈকালের দিকে ভবানীপুরে লীলার মামার বাড়ি গেল। অনেক দিন সে লীলার কোন সংবাদ জানে না—দূর হইতে লাল ইটের বাড়িটা চোখে পড়িতেই একটা আশা ও উদ্বেগে বুক টিপ্ টিপ্ করিয়া উঠিল, লীলা এখানে আছে, না নাই—যদি গিয়া দেখে সে আছে! সেই একদিন দেখা হইয়াছিল অপর্ণার মৃত্যুর পূর্বে! আজ আট বৎসর হইতে চলিল—এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর কোন দিন দেখা হয় নাই।

প্রথমেই দেখা হইল লীলার ভাই বিমলেন্দুর সঙ্গে। সে আর বালক নাই, খুব লম্বা হইয়া পড়িয়াছে, মুখের চেহারা অন্য রকম দাঁড়াইয়াছে। বিমলেন্দু প্রথমটা যেন অপুকে চিনিতে পারিল না, পরে চিনিয়া বৈঠকখানার পাশের ঘরে লইয়া বসাইল। দু-পাঁচ মিনিট এ কথা ওকথার পরে অপু যতদূর সম্ভব সহজ স্বরে বলিল—তারপর তোমার দিদির খবর কি—এখানে, না শ্বশুরবাড়ি?

বিমলেন্দু কেমন একটা আশ্চর্য সুরে বলিল—ও, ইয়ে আসুন আমার সঙ্গে—চলুন।

কেমন একটা অজানা আশঙ্কায় অপুর মন ভরিয়া উঠিল, ব্যাপার কি? একটু পরে গিয়া বিমলেন্দু রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া নিচু সুরে বলিল—দিদির কথা কিছু শোনেন নি আপনি?

অপু উদ্বিগ্নমুখে বলিল—না—কি? লীলা আছে তো?

—আছেও বটে, নেইও বটে। সে সব অনেক কথা, আপনি ফ্যামিলির ফ্রেন্ড বলে বলছি। দিদি ঘর ছেড়েছে। স্বামী গোড়া থেকেই ঘোর মাতাল—অতি কু-চরিত্র। বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের এক ইহুদি মেয়েকে নিয়ে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করে দিলে—তাকে নিজের বাসাতে রাত্রে নিয়ে যেতে শুরু করলে।

দিদিকে জানেন তো? তেজী মেয়ে, এ সব সহ্য করার পাত্রী নয়—সেই রাত্রেই ট্যাক্সি ডাকিয়ে পদ্মপুকুরে চলে আসে নিজের ছোট মেয়েটাকে নিয়ে। মাস দুই পর একদিন দাদাবাবু এল, মেয়েকে সিনেমা দেখাবার ছুতো করে নিয়ে গেল জব্বলপুরে—আর দিদির কাছে পাঠায় না। তারপর দিদি যা করেছে—সে যে আবার দিদি করতে পারত তা কখনও কেউ ভাবে নি। হীরক সেনকে মনে আছে? সেই যে ব্যারিস্টার হীরক সেন, আমাদের এখানে পার্টিতে দেখেছেন অনেকবার। সেই হীরক সেনের সঙ্গে দিদি একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। এক বৎসর কোথায় রইল—আজকাল ফিরে এসেছে, কিন্তু হীরক সেনকে ছেড়েছে। একা আলিপুরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে। এ বাড়িতে তার নাম আর করার উপায় নেই। মা কাশীবাসিনী হয়েছেন, আর আসবেন না।

কথা শেষ করিয়া বিমলেন্দু নিজেকে একটু সংযত করার জন্য বোধ হয় একটু চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল,—হীরক সেন কিছু না—এ শুধু তার একটা শোধ তোলা মাত্র, সেন তো শুধু উপলক্ষ। আচ্ছা, তবে আসি অপূর্ববাবু, এখন কিছু দিন থাকবেন তো এখানে?—

বিমলেন্দু চলিয়া যায় দেখিয়া অপু কথা খুঁজিয়া পাইল, তাড়াতাড়ি তাহার হাতখানা ধরিয়া অকারণে বলিল,—শোনো, শোনো, লীলা আলিপুরে আছে তা হলে?

এ প্রশ্ন সে করিতে চাহে নাই, সে জানে এ প্রশ্নের কোন অর্থ নাই। কিন্তু একসঙ্গে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছিল—কোন্‌টা সে জিজ্ঞাসা করিবে?

বিমলেন্দু বলিল,—এতে আমাদের যে কি মর্মান্তিক—বর্ধমানে আমাদের বাড়ির সেই নিস্তারিণী ঝিকে মনে আছে? সে দিদিকে ছেলেবেলায় মানুষ করেছে, পুজোর সময় বাড়ি গেলুম, সে ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে লাগল। সে-বাড়িতে দিদির নাম পর্যন্ত করার জো নেই। রমেনদা আজকাল বাড়ির মালিক, বুঝলেন না? দিদিও সুখে নেই, বলবেন না কাউকে, আমি লুকিয়ে যাই, এত কাঁদে মেয়ের জন্যে! হীরক সেন দিদির টাকাগুলো দু হাতে উড়িয়েছে, আবার বলেছিল বিলেতে বেড়াতে নিয়ে যাবে। সেই লোভ দেখিয়েই নাকি টানে—দিদি আবার তাই বিশ্বাস করত। জানেন তো দিদিরও ঝোঁক আছে, চিরকাল।

বিমলেন্দু চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, অপু আবার গিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল—তুমি মাঝে মাঝে কোন্ সময়ে যাও—বিমলেন্দু বলিল,—রোজ যে যাই তা নয়, বিকেলে দিদি মোটরে বেড়াতে আসে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের মাঠে, ওইখানে দেখা করি।

বিমলেন্দু চলিয়া গেলে অপু অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে রসা রোডে আসিয়া পড়িল—কি ভাবিতে ভাবিতে সে শুধুই হাঁটিতে লাগিল। পথের ধারে একটা পার্ক, ছেলেমেয়েরা খেলা করিতেছে। দড়ি ঘুরাইয়া ছোট মেয়েরা লাফাইতেছে, সে পার্কটায় ঢুকিয়া একটা বেঞ্চের উপর বসিল। লীলার উপর রাগ বা অভিমান কোনটাই হইল না, সে অনুভব করিল, এত ভালোবাসে নাই সে কোনদিনই লীলাকে। এই আট বৎসরে লীলা তো তাহার কাছে অবাস্তব হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মুখ পর্যন্ত ভালো মনে হয় না, অথচ মনের কোন্ গোপন অন্ধকার কোণে এত ভালোবাসা সঞ্চিত হইয়াছিল তাহার জন্য! ভাবিল, ওর দাদামশায়েরই যত দোষ, কে এ বিয়ে দিতে মাথার দিব্যি দিয়েছিল তাঁকে? বেচারি লীলা! সবাই মিলে ওর জীবনটা নষ্ট করে দিলে!

কিছুদিন কলিকাতায় থাকিবার পরে সে বাসা বদলাইয়া অন্য এক বোর্ডিং-এ গিয়া উঠিল। পুরানো দিনের কষ্টগুলো আবার সবই আসিয়া জুটিয়াছে—একা একঘরে থাকিবার মতো পয়সা হাতে নাই, অথচ দুই-তিনটি কেরানীবাবুর সঙ্গে একঘরে থাকা আজকাল তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব মনে হয়। লোক তাঁহারা ভালোই, অপুর চেয়ে বয়স অনেক বেশি, সংসারী, ছেলেমেয়ের বাপ। ব্যবহারও তাঁহাদের ভালো। কিন্তু হইলে কি হয়, তাঁহাদের মনের ধারা যে-পথ অবলম্বনে গড়িয়া উঠিয়াছে অপু তাহার সহিত আদৌ পরিচিত নয়। সে নির্জনতাপ্রিয়, একা চুপ করিয়া বসিয়া

থাকিতে চায়, সেইটাই এখানে হইবার জো নাই। হয়তো সে বৈকালের দিকে বারান্দাটাতে সবে আসিয়া বসিয়াছে—কেশববাবু হুঁকা হাতে পিছন হইতে বলিয়া উঠিলেন—এই যে অপূর্ববাবু, একাটি বসে আছেন? চৌধুরী ব্রাদার্স বুঝি এখনও আপিস থেকে ফেরেন নি? আজ শোনেন নি বুঝি মোহনবাগানের কাণ্ডটা? আরে রামোঃ—শুনুন তবে—

কলিকাতা তাহার পুরাতন রূপে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই ধুলা, ধোঁয়া, গোলমাল, একঘেয়েমি, সংকীর্ণতা, সব দিনগুলা এক রকমের হওয়া—সেই সব।

সে চলিয়া আসিত না, কিংবা হয়তো আবার এতদিনে চলিয়া যাইত, মুশকিল এই যে, মিঃ রায়চৌধুরীও ওখানকার কাজ শেষ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি গড়িবার চেষ্টায় আছেন, অপুকে তাঁহার আপিসে কাজ দিতে রাজি হইয়াছেন। কিন্তু অপু বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, গত ছ'বছরের জীবনের পরে আবার কি সে আপিসের ডেস্কে বসিয়া কেরানীগিরি করিতে পারিবে? এদিকে পয়সা ফুরাইয়া আসিল যে! না করিলেই বা চলে কিসে?

সেখানে থাকিতে এই ছয় বৎসরে যা হইয়াছিল, অপু বোঝে এখানে তা চব্বিশ বৎসরেও হইত না। আর্টের নতুন স্বপ্ন সেখানে সে দেখিয়াছে।

ওখানকার সূর্যাস্তের শেষ আলোয়, জনহীন প্রান্তরে, নিস্তব্ধ আরণ্যভূমির মায়ায়, অন্ধকারভরা নিশীথ রাত্রির আকাশের নিচে, শালমঞ্জরীর ঘন সুবাসভরা দুপুরের রোদে সে জীবনেব গভীর রহস্যময় সৌন্দর্যকে জানিয়াছে।

কিন্তু কলিকাতার মেসে তাহা তো মনে আসে না—সে ছবিকে চিন্তা ও কল্পনায় গড়িয়া তুলিতে গভীরভাবে নির্জন চিন্তার দরকার হয়—সেইটাই তাহার হয় না এখানকার মেস-জীবনে। সেখানে তাহার নির্জন প্রাণের গভীর, গোপন আকাশে সত্যের যে নক্ষত্রগুলি স্বতঃস্ফূর্ত জ্যোতিষ্মান হইয়া দেখা দিয়াছিল, এখানকার তরল জীবনানন্দের পূর্ণ জ্যোৎস্নায় হয়তো তাহারা চিরদিনই অপ্রকাশ রহিয়া যাইত।

মনে আছে সে ভাবিয়াছিল, ওই সৌন্দর্যকে, জীবনের ওই অপূর্ব রূপকে সে যতদিন কালিকলমে বন্দী করিয়া দশজনের চোখের সামনে না ফুটাইতে পারিবে—ততদিন সে কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না।

আর একদিন সেখানে সে কি অদ্ভুত শিক্ষাই না পাইয়াছিল।

ঘোড়া করিয়া বেড়াইতেছিল। এক জায়গায় বনের ধারে ঝোপের মধ্যে অনেক লতাগাছে গা লুকাইয়া একটা তেলাকুচা গাছ। তেলাকুচা বাংলার ফল—অপরিচিত মহলে একমাত্র পরিচিত বন্ধু, সেখানে দাঁড়াইয়া গাছটাকে দেখিতে বড়ো ভালো লাগিতেছিল।...তেলাকুচা লতার পাতাগুলা সব শুকাইয়া গিয়াছে, কেবল অগ্রভাগে ঝুলিতেছিল একটা আধ-পাকা ফল। তারপর দিনের পর দিন সে ওই লতাটার মৃত্যু-যন্ত্রণা লক্ষ করিয়াছে। ফলটা যতই পাকিয়া উঠিতেছে, বোঁটার গোড়ায় যে অংশ সবুজ ছিল, সেটুকু যতই রাঙা সিঁদুরের রং হইয়া উঠিতেছে, লতাটা ততই দিন দিন হলদে শীর্ণ হইয়া শুকাইয়া আসিতেছে।

একদিন দেখিল, গাছটা সব শুকাইয়া গিয়াছে, ফলটা বোঁটা শুকাইয়া গাছে ঝুলিতেছে, তুলতুলে পাকা, সিঁদুরের মতো টুকটুকে রাঙা—যে কোন পাখি, বনের বানর কি কাঠবেড়ালীর অতি লোভনীয় আহার্য। যে লতাটা এতদিন ধরিয়া ন' কোটি মাইল দূরের সূর্য হইতে তাপ সংগ্রহ করিয়া, চারিপাশের বায়ুমণ্ডল হইতে উপাদান লইয়া মৃত, জড়পদার্থ হইতে এ উপাদেয় খাবার তৈয়ারি করিয়াছিল, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য শেষ হইয়া গিয়াছে—ওই পাকা টুকটুকে ফলটাই তাহার জীবনের চরম পরিণতি! ফলটা পাখিতে কাঠবেড়ালীতে খাইবে, এজন্য গাছটাকে তাহারা ধন্যবাদ দিবে না; তেলাকুচা লতাটা অজ্ঞাত, অখ্যাতই থাকিয়া যাইবে। তবুও জীবন তাহার সার্থক হইয়াছে,—ওই টুকটুকে ফলটাতে ওর জীবন সার্থক হইয়াছে। যদি ফলটা কেউ না-ই খায় তাহাতেও ক্ষতি নাই,

মাটিতে ঝরিয়া পড়িয়া আরও কত তেলাকুচার জন্ম ঘোষণা করিবে, আরও কত লতা কত ফুল-ফল কত পাখির আহার্য।

মন তখন ছিল অদ্ভুত রকমের তাজা, সবল, গ্রহণশীল, সহজ আনন্দময়। তেলাকুচালতার এই ঘটনাটা তাহার মনে বড়ো ধাক্কা দিয়াছিল—সে কি ওই সামান্য বন-ঝোপের তেলাকুচা-লতাটার চেয়েও হীন হইবে? তাহার জীবনের কি উদ্দেশ্য নাই? সে জগতে কি কিছু দিবে না?

সেখানে কতদিন শালবনের ছায়ায় পাথরের উপর বসিয়া দুপুরে এ প্রশ্ন মনে জাগিয়াছে।...কত নিস্তব্ধ তারাভরা রাত্রে গভীর বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাঁবুর বাহিরের ঘন নৈশ অন্ধকারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া এই সব স্বপ্নই মনে জাগিত। বহু দূর, দূর ভবিষ্যতের শিরীষফুলের পাপড়ির মতো নরম ও কচি মুখ কত শত অনাগত বংশধরদের কথা মনে পড়িত, খোকার মুখখানা কি অপূর্ব প্রেরণা দিত সে সময়!—ওদেরও জীবনে কত দুঃখরাত্রের বিপদ আসিবে, কত সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইবে—তখন যুগান্তের এপার হইতে দৃঢ়হস্ত বাড়াইয়া দিতে হইবে তোমাকে—তোমার কত শত বিনিদ্র রজনীর মৌন জনসেবা, হে বিস্মৃত পথের মহাজন পথিক, একদিন সার্থক হইবে—অপরের জীবনে।

দুঃখের নিশীথে তাহার প্রাণের আকাশে সত্যের যে নক্ষত্ররাজি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে—তা সে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাইবে, জীবনকে সে কি ভাবে দেখিল তাহা লিখিয়া রাখিয়া যাইবে।

নিজের প্রথম বইখানির দিনে দিনে প্রবর্ধমান পাণ্ডুলিপিকে সে সস্নেহ প্রতীক্ষার চোখে দেখে—বইয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত কথা তাহার আগ্রহভরা বক্ষস্পন্দনে আশা, আনন্দের সংগীত জাগায়—মা যেমন শিশুকে চোখের সম্মুখে কান্নাহাসির মধ্য দিয়া বাড়িতে দেখেন, দুরু-দুরু বক্ষে তাহাব ভবিষ্যতের কথা ভাবেন—তেমনি।

বই-লেখার কষ্টটুকু করার চেয়ে বইয়ের কথা ভাবিতে ভালো লাগে। কাদের কথা বইয়ে লেখা থাকিবে?—কত লোকের কথা। গরিবদের কথা। ওদের কথা ছাড়া লিখিতে ইচ্ছা হয় না।

পথে-ঘাটে, হাটে, গ্রামে, শহরে, রেলে কত অদ্ভুত ধরনের লোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়াছে জীবনে—কত সাধু-সন্ন্যাসী, দোকানী, মাস্টার, ভিখারি, গায়ক, পুতুল-নাচওয়ালা, আম-পাড়ানি, ফেরিওয়ালা, লেখক, কবি, ছেলেমেয়ে—এদের কথা।

আজিকাব দিন হইতে অনেক দিন পরে—হয়তো শত শত বৎসব পরে তাহার নাম যখন এ বছরের-ফোটা-শালফুলের মঞ্জরীর মতো—কিংবা তাহার ঘরের কোণের মাকড়সার জালেব মতো—কোথায় মিলাইয়া যাইবে, তখন তাহার কত অনাগত বংশধর কত সকালে সন্ধ্যায়, মাঠে, গ্রাম্য নদীতীরে, দুঃখের দিনে, শীতের সন্ধ্যায় অথবা অন্ধকার গহন নিস্তব্ধ দুপুর-রাত্রে, শিশিরভেজা ঘাসের উপর তারার আলোর নিচে শুইয়া শুইয়া তাহার বই পড়িবে—কিংবা বইয়ের কথা ভাবিবে!

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত আশঙ্কাও জাগে। যদি কেউ না পড়ে? আবার ভাবে, পৃথিবীর কোন্ অতীতে আদিম যুগের শিল্পীদল দুর্গম গিরিগুহার অন্ধকারে বৃষ, বাইসন, ম্যামথ আঁকিয়া গিয়াছিল—প্রাচীনদিনের বিস্মৃত প্রতিভা এতকাল পর তাহার দাবি আদায় করিতেছে—নতুবা ক্যান্টাব্রিয়া, দর্দঞ্ ও পিরেনিজের পর্বতগুহাগুলায় দেশবিদেশের মনীষী ও ভ্রমণকারীদের এত ভিড় কিসেব? তেলাকুচা লতাটা শুকাইয়া গিয়াছে; কিন্তু সে জীবন দিয়া ফলটাকে মানুষ করিয়া গিয়াছে যে! আত্মদানের ফল বৃথা যাইবে না। কত গাছ গজাইবে ওর বীজে—

নিজের প্রথম বইখানি—মনে কত চিন্তাই আসে। অনভিজ্ঞ মন সবতাতেই অবাক হইয়া যায়, সবতাতেই গাঢ় পুলক অনুভব করে।

এই তাহার বই লেখার ইতিহাস।

কিন্তু প্রথম ধাক্কা খাইল বইখানার পাণ্ডুলিপি হাতে দোকানে দোকানে ঘুরিয়া। অজ্ঞাতনামা

লেখকের বই কেহ লওয়া দূরে থাকুক, ভালো করিয়া কথাও বলে না। একটা দোকানে খাতা রাখিয়া যাইতে বলিল। দিন পাঁচেক পরে তাহাদের একখানা পোস্টকার্ড পাইয়া অপু ভালো কাপড় পরিয়া, জুতা বুরুশ করিয়া বন্ধুর চশমা ধার করিয়া দুরুদুরু বক্ষে সেখানে গিয়া হাজির হইল। অত ভাল বই তাহার—পড়িয়া হয়তো উহারা অবাক হইয়া গিয়াছে।

দোকানের মালিক প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিল না, পরে চিনিয়া বলিল—ও! ওহে সতীশ, এঁর সেই খাতাখানা ওঁকে দিয়ে দাও তো—বড়ো আলমারির দেরাজে দেখো।

অপুর কপাল ঘামিয়া উঠিল। খাতা ফেরত দিতে চায় কেন? সে বিবর্ণ মুখে বলিল—আমার বইখানা কি—

না। নতুন লেখকের বই নিজের খরচে তাহারা ছাপাইবে না। তবে যদি সে পাঁচশত টাকা খরচ দেয়, তবে সে অন্য কথা। অপু অত টাকা কখনও এক জায়গায় দেখে নাই।

পরদিন সকালে বিমলেন্দু অপুর বাসায় আসিয়া হাজির। বৈকালে পাঁচটার সময় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের মাঠে লীলা আসিবে, বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছে তাহাকে লইয়া যাইতে।

বৈকালে বিমলেন্দু আবার আসিল। দু-জনে মাঠে গিয়া ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করিবার পর বিমলেন্দু একটা হলদে রঙের মোটর দেখাইয়া বলিল, ওই দিদি আসছে—আসুন, গাছতলায় গাড়ি পার্ক করবে, এখানে ট্রাফিক পুলিশে আজকাল বড়ো কড়াকড়ি করে।

অপুর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল। কি বলিবে, কি বলিবে সে লীলাকে?

বিমলেন্দু আগে আগে, অপু পিছনে পিছনে। লীলা গাড়ি হইতে নামে নাই, বিমলেন্দু গাড়ির জানালার কাছে গিয়া বলিল,—দিদি, অপূর্ববাবু এসেছেন, এই যে—পরক্ষণেই অপু গাড়িব পাশে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল—এই যে, কেমন আছ, লীলা?

সত্যই অপূর্ব সুন্দরী! অপুর মনে হইল, যে-কবি বলিযাছেন, সৌন্দর্যই একটা মহৎ গুণ, যে সুন্দর তাহার আর কোন গুণের দরকার করে না, তিনি সত্যদর্শী, অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার উক্তি সত্য।

তবুও আগের লীলা নাই, একটু মোটা হইয়া পড়িয়াছে, মুখের সে তরুণ লাবণ্য আর কই? মুখের পরিণত সৌন্দর্য ঠিক তাহার মা মেজবৌরানীর এ বয়সে যাহা ছিল তাই, সেই ছেলেবেলায় বর্ধমানের বাটীতে দেখা মেজবৌরানীর মুখের মতো। উদ্দাম লালসামাখা সৌন্দর্য নয়—শান্ত, বরং যেন কিছু বিষণ্ণ।

বাড়ির বাহির হইয়া গিয়াছে যে-মেয়ে, তাহার ছবির সঙ্গে অপু কিছুতেই এই বিষণ্ণনয়না দেবীমূর্তিকে খাপ খাওয়াইতে পারিল না। লীলা ব্যস্ত হইয়া হাসিমুখে বলিল—এসো, অপূর্ব এসো। তুমি তো আমাদের ভুলেই গিয়েচ একেবারে। উঠে এসে বসো। চলো, তোমাকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি। শোভা সিং, লেক—

লীলা মধ্যে বসিল, ও-পাশে বিমলেন্দু, এ-পাশে অপু, অপুর মনে পড়িল বাল্যকাল ছাড়া লীলার এত কাছে সে আর কখনও বসে নাই। বার বার লীলার মুখেব দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। এতকাল পরে লীলাকে আবার এত কাছে পাইয়াছে—বার বার দেখিয়াও যেন তৃপ্তি হইতেছিল না। লীলা অনর্গল বকিতেছিল, নানা রকম মোটরগাড়ির তুলনামূলক সমালোচনা করিতেছিল, মাঝে মাঝে অপুর সম্বন্ধে এটা-ওটা প্রশ্ন করিতেছিল। লেক দেখিয়া অপু কিন্তু নিরাশ হইল। সে মনে মনে ভাবিল—এই লেক! এরই এত নাম! এ কলকাতার বাবুদের ভালো লাগতে পারে—ভারি তো! লীলা আবার এরই এত সুখ্যাতি করছিল—আহা, বেচারি কলকাতা ছেড়ে বিশেষ কোথাও তো যায় নি!—লীলা পাছে অপ্রতিভ হয় এই ভয়ে সে নিজের মতটা আর ব্যক্ত করিল না। একটা নারিকেল গাছের তলায় বেঞ্চ পাতা—সেখানে দু-জনে বসিল। বিমলেন্দু মোটর লইয়া লেক ঘুরিতে গেল। লীলা হাসিমুখে বলিল—তারপর, তুমি নাকি দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলে?

—তোমার শ্বশুরবাড়ির দেশে গিয়েছিলুম—জব্বলপুরের কাছে।—বলিয়া ফেলিয়া অপু ভাবিল—কথাটা বলা ভালো হয় নাই, হয়তো লীলার মনে কষ্ট হইবে—ছিঃ—

কথাটা ঘুরাইয়া ফেলিয়া বলিল—আচ্ছা ওই দ্বীপ-মতন ব্যাপারগুলো—ওতে যাবার পথ নেই...

—সাঁতার দিয়ে যাওয়া যায়। তুমি তো ভালো সাঁতার জানো—না? ওসব কথা যাক—এতদিন কোথায় ছিলে, কি করছিলে বলো। তোমাকে দেখে আজ এত খুশি হয়েছি!...আমার বাসায় এসো আলিপুরে—চা খাবে। একটু তামাটে রঙ হয়েছে কেন?...রোদে ঘুরে-ঘুরে বুঝি—আচ্ছা, আমার কথা তোমার মনে ছিল?

অপু একটু হাসিল। কোন নাটুকে ধরনের কথা সে মুখে বলিতে পারে না। আর এই সময়েই যত মুখচোরা রোগ আসিয়া জোটে! কতকাল পরে তো লীলাকে একা কাছে পাইয়াছে—কিন্তু মুখে কথা জোগায় কই?...কত কথা লীলাকে বলিবে ভাবিয়াছিল—এখন লীলাকে কাছে পাইয়া সে-সব কথা মুখ দিয়া তো বাহির হয়ই না—বরং নিতান্ত হাস্যকর বলিয়া মনে হয়।

হঠাৎ লীলা বলিল—হ্যাঁ ভালো কথা, তুমি নাকি বই লিখেছ? একদিন আমাকে দেখাবে না, কি লিখলে? আমি জানি—তুমি একদিন বড়ো লেখক হবে, তোমার সেই ছেলেবেলার গল্প লেখার কথা মনে আছে? তখন থেকেই জানি।

পরে সে একটা প্রস্তাব করিল। বিমলেন্দুর মুখে সে সব শুনিয়াছে, বইওয়ালারা বই লইতে চায় না—ছাপাইতে কত খরচ পড়ে? এ বই ছাপাইয়া বাহির করিবার সমুদয় খরচ দিতে সে রাজি।

অপ্রত্যাশিত আনন্দে অপুর সারা শরীরে যেন একটা বিদ্যুতের ঢেউ খেলিয়া গেল। সব খরচ' যত লাগে! তবুও আজ সে মুখে কিছু বলিল না।

অপুর মনে লীলার জন্য একটা করুণা ও অনুকম্পা জাগিয়া উঠিল, ঠিক পুরাতন দিনের মতো। লীলারও কত আশা ছিল আর্টিস্ট হইবে, ছবি আঁকিবে, অনভিজ্ঞ তরুণ বয়সে তাহারই মতো কি স্বপ্নের জাল বুনিত! এখন শুধু নতুন নতুন মোটর গাড়ি কিনিতেছে, সাহেবি দোকানে লেস কিনিয়া বেড়াইতেছে—পুরাতন দিনের যজ্ঞবেদীতে আগুন কই, নিভিয়া গিয়াছে। যজ্ঞ কিন্তু অসমাপ্ত। কৃপার পাত্র লীলা' অভাগিনী লীলা!

ঠিক সেই পুরাতন দিনের মতো মনটি আছে কিন্তু। তাহাকে সাহায্য করিতে মায়ের পেটের মমতাময়ী-বোনের মতোই হাত বাড়াইয়া দিয়াছে অমনি। আশৈশব তাহার বন্ধু...তাহার সম্বন্ধে অন্তত ওর মনের তারটি খাঁটি সুরেই বাজিল চিরদিন। এখানেও হয়তো করুণা, মমতা, অনুকম্পা—ওদেরই বাড়িতে না তাহার মা ছিল রাঁধুনী, কে জানে হয়তো কোন্ শুভ মুহূর্তে তাহার হীনতা, দৈন্য, অসহায় বাল্যজীবন বড়োলোকের মেয়ে লীলার কোমল বাল্যমনে ঘা দিয়াছিল, সহানুভূতি, করুণা, মমতা জাগাইয়াছিল। সকল সত্যকার ভালোবাসার মশলা এরাই—এরা যেখানে নাই, ভালোবাসা সেখানে মাদকতা আনিতে পারে, মোহ আনিতে পারে, কিন্তু চিরস্থায়িত্বের স্নিগ্ধতা আনে না।

সে ভাবিল, লীলার মনটা ভালো বলে সেই সুযোগে সবাই ওর টাকা নিচ্ছে। ও বেচারি এখনও মনে সেই ছেলেমানুষটি আছে—আমি ওকে exploit করতে পারব না। দরকার নেই আমার বই ছাপানোয়।

এদিকে মুশকিল। হাতের টাকা ফুরাইল। চাকুরিও জোটে না।

মিঃ রায়চৌধুরী অনবরত ঘুরাইতে ও হাঁটাইতে লাগিলেন। অপু যেখানে ছিল সেখানে আবার এঁরা ম্যাঙ্গানিজের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, অপু ধরিয়া পড়িল তাহাকে আবার সেখানে পাঠানো হউক। অনেকদিন ঘোরানোর পর মিঃ রায়চৌধুরী একদিন প্রস্তাব করিলেন, সে আরও কম টাকার বেতনে সেখানে যাইতে রাজি আছে কি না? অপমানে অপুর চোখে জল আসিল, মুখ রাঙা হইয়া

উঠিল। একথা বলিতে উহারা আজ সাহস করিল শুধু এইজন্য যে, উহারা জানে যতই কমে হউক না কেন সে সেখানে ফিরিয়া যাইতে রাজি হইবে, অর্থের জন্য নয়—অর্থের জন্য এ অপমান সে সহ্য করিবে না নিশ্চয়।

কিন্তু...

শরতের প্রথম—নিচের অধিত্যকায় প্রথম আবলুস ফল পাকিতে শুরু করিয়াছে বটে, কিন্তু মাথার উপরে পর্বতসানুর উচ্চস্থানে এখনও বর্ষা শেষ হয় নাই। টেঁপারি বনে এখন ফল পাকিয়া হলদে হইয়া আছে, ভালুকদল এখনও সন্ধ্যার পরে টেঁপারি খাইতে নামে, টিয়াপাখির ঝাঁক সারাদিন কলরব করে, আরও উপরে যেখান হইতে বাদাম ও সেগুন বনের শুরু, সেখানে অজস্র সাদা মাজু ফল, আরও উপরে রিঠাগাছে থোলো-থোলো ফল ধরিয়াছে, এমন কি ভালো করিয়া খুঁজিয়া দেখিলে, দু-একটা রিঠাগাছে এখনও দু-এক ঝাড় দেরিতে ফোটা রিঠা ফুলও পাওয়া যাইতে পারে।

সেখানকার সেই বিরাট রুক্ষ আরণ্যভূমি, নক্ষত্রালোকিত আলো-আঁধার, উদার জনহীন বিশাল তৃণভূমি, সেই টানা একঘেয়ে পশ্চিমে হাওয়া, সেই অবাধ জ্যোৎস্না, স্বাধীনতা, প্রসারতা, সেই বিরাট নির্জনতা তাহাকে আবার ডাকিতেছে।

এক এক সময় তাহার মনে হয় কানাডায়, অস্ট্রেলিয়ায়, নিউজিল্যান্ডে, আফ্রিকায় মানুষ প্রকৃতির এই মুক্ত সৌন্দর্যকে ধ্বংস করিতেছে সত্য, গাছপালাকে দূর করিয়া দিতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি একদিন প্রতিশোধ লইবে। ট্রপিক্‌স্‌-এর অরণ্য আবার জাগিবে, মানুষকে তাহারা তাড়াইবে, আদিম অরণ্যানী আবার ফিরিবে। ধরাবিদ্রাবণকারী সভ্যতাদর্পী মানুষ যে স্থানে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, পর্বতমালার নাম দিয়াছে নিজের দেশের রাজার নামে, হ্রদের নাম দিয়াছে রাজমন্ত্রীর নামে; ওর শুশুক, পাখি, শিল, বল্‌গা হরিণ, ভালুককে খুন করিয়াছে—তেল ব্যবসা, চামড়ার লোভে, ওর মহিমময় পাইন অরণ্য ধূলিসাৎ করিয়া কাঠের কারখানা খুলিয়াছে, এ সবের প্রতিশোধ একদিন আসিবে।

এ যেন এমন একটা শক্তি যা বিপুল, বিশাল, বিরাট। অসীম ধৈর্যের ও গাম্ভীর্যের সহিত সে সংহত শক্তিতে চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, কারণ সে জানে তাহার নিজ শক্তির বিপুলতা। অপু একবার ছিন্দওয়ারার জঙ্গলে একটা খনির সাইডিং লাইন তৈরি হওয়ার সময়ে অরণ্যভূমির তপস্যাস্তব্ধ, দূরদর্শী, রুদ্রদেবের মতো এই মৌন গম্ভীর ভাব লক্ষ করিয়াছিল। ওই শক্তিটা ধীরভাবে শুধু সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে মাত্র।

অপুর কিন্তু চাকরি হইল না। এবার একা মিঃ রায়চৌধুরীর হাত নয়। জয়েন্ট স্টক কোম্পানির অন্যান্য ডাইরেক্টররা নাকি রাজি হইল না। হয়তো বা তাহারা ভাবিল, এ লোকটার সেখানে ফিরিবার এত আগ্রহ কেন? পুরানো লোক, চুরির সুলুকসন্ধান জানে, সেই লোভেই যাইতেছে। তা ছাড়া ডাইরেক্টররাও মানুষ, তাহাদেরও প্রত্যেকেরই বেকার ভাগনে, ভাইপো, শালীর ছেলে আছে।

সে ভাবিল চাকরি না হয় বইখানা বাহির করিয়া দেখিবে চলে কিনা। মাসিক পত্রিকায় দু-একটা গল্পও দিল, একটা গল্পের বেশ নাম হইল, কিন্তু টাকা কেহ দিল না। হঠাৎ তাহার মনে হইল—অপর্ণার গহনাগুলি শ্বশুরবাড়িতে আছে, সেগুলি সেখান হইতে এই সাত-আট বৎসর সে আনে নাই। সেগুলি বেচিয়া তো বই বাহির করার খরচ জোগাড় হইতে পারে! এই সহজ উপায়টা কেন এতদিন মাথায় আসে নাই?

সে লীলার কাছে আরও কয়েকবার গেল, কিন্তু কথাটা প্রকাশ করিল না। উপন্যাসের খাতাখানা লইয়া গিয়া পড়িয়া শোনাইল। লীলা খুব উৎসাহ দেয়। একদিন লীলা হিসাব করিতে বসিল বই ছাপাইতে কত লাগিবে। অপু ভাবিল—অন্য কেউ যদি দিত হয়তো নিতুম, কিন্তু লীলা বেচারির টাকা নেব না।

একদিন সে হঠাৎ খবরের কাগজে তাহার সেই কবিরাজ বন্ধুটির ঔষধের দোকানের বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইল। সেইদিনই সন্ধ্যার পর সে ঠিকানা খুঁজিয়া সেখানে গেল, সুকিয়া স্ট্রীটের একটা গলিতে দোকান। বন্ধুটি বাহিরেই বসিয়া ছিল, দেখিয়া বলিয়া উঠিল—বাঃ--তুমি! তুমি বেঁচে আছ দাদা?

অপু হাসিয়া বলিল—উঃ, কম খুঁজি নি তোমায়! ভাগ্যিস আজ তোমার শিল্পাশ্রমের বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল, তাই তো এলুম। তারপর কি খবর বলো? দোকানের আসবাবপত্র দেখে মনে হচ্ছে, অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছ!

বন্ধু খানিকটা চুপ করিয়া রহিল। খানিকটা এ-গল্প ও-গল্প করিল। পরে বলিল—এসো, বাসায় এসো।

ছোট সাদা রঙের দোতলা বাড়ি, নিচের উঠানে একটা টিনের শেডের তলায় আট-দশটি লোক কি সব জিনিস প্যাক করিতেছে, লেবেল আঁটিতেছে, অন্যদিকে একটা কল ও চৌবাচ্চা, আর একটা টিনের শেডে গুদাম। উপরে উঠিয়াই একটা মাঝারি হলঘর, দু-পাশে দুটো ছোট ছোট ঘর, বেশ সাজানো। একটা সেঠ্ টমাসের বড়ো ক্লক ঘড়ি দালানে টকটক করিতেছে। বন্ধু ডাকিয়া বলিল—ওরে বিন্দু, শোন্, তোর মাকে বল্, এক্ষুনি দু-পেয়ালা চা দিতে।

অপু উৎসুকভাবে বলিল—তার আগে একবার বৌঠাকরুনের সঙ্গে দেখাটা করি—বিন্দুকে বলো তাঁকে এদিকে একবার আসতে বলতে? না কি, এখন অবস্থা ফিরেছে বলে তিনি আর আমার সঙ্গে দেখা করবেন না?

কবিরাজ বন্ধু ম্লানমুখে চুপ করিয়া রহিল—ফের নিম্নসুরে অনেকটা যেন আপন মনেই বলিল—সে আর তোমার সঙ্গে দেখা করবে না ভাই। তাকে আর কোথায় পাবে? রমলা আর সে দুজনেই ফাঁকি দিয়েছে!

অপু অবাক মুখে তাহার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

—এক মাঘে রমলা গেল, পরের শ্রাবণে সে গেল। ওঃ, সে কি সোজা কষ্ট গিয়েছে ভাই? তখন ওদিকে কাবুলীর দেনা, এদিকে মহাজনের দেনা—যমে-মানুষে টানাটানি চলছে। তোমার কথা কত বলত। এই শ্রাবণে পাঁচ বচ্ছর হয়ে গিয়েছে' তারপরে বিয়ে করব না, করব না,—আজ বছর তিনেক হল বদ্যিবাটীতে—

তারপর বন্ধুর কথায় নতুন-বৌ চা ও খাবার লইয়া অপুর সামনেই আসিল। শ্যামবর্ণ, স্বাস্থ্যবতী, কিশোরী মেয়েটি, চোখ মুখ দেখিয়া মনে হয় খুব চটপটে, চতুর। খাবার খাইতে গিয়া খাবারের দলা যেন অপুর গলায় আটকাইয়া যায়। বন্ধুটি নিজের কোন্ কালির বড়ি ও পাতা চায়ের প্যাকেটের খুব বিক্রি ও ব্যবসায়ের দিক হইতে এ-দুটি দ্রব্যের সাফল্যের গল্প করিতেছিল।

উঠিবার সময় বাহিরে আসিয়া অপু জিজ্ঞাসা করিল—নতুন বৌটি দেখতে তো বেশ, এ দিকেও বেশ গুণবতী, না?

—মন্দ না। কিন্তু বড়ো মুখরা ভাই। আগের তাকে তো জানতে? সে ছিল ভালো মানুষ। এর পান থেকে চুন খসলেই—কি কবি ভাই, আমার ইচ্ছে ছিল না যে আবার—

ফুটপাথে একা পড়িয়াই অপুর মনে পড়িল, পটুয়াটোলার সেই খোলার বাড়ির দরজায় প্রদীপ-হাতে হাস্যমুখী, নিরাভরণা, দরিদ্র গৃহলক্ষ্মীকে—আজ ছ'বছর কাটিয়া গেলেও মনে হয় যেন কালকার কথা!

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কাজল বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, আজকাল গ্রামের সীতানাথ পণ্ডিত সকালে একবেলা করিয়া পড়াইয়া যান, কিন্তু একটু ঘুমকাতুরে বলিয়া সন্ধ্যার পর দাদামশায়ের অনেক বকুনি সত্ত্বেও সে পড়িতে পারে

না, চোখের পাতা যেন জুড়াইয়া আসে, অনেক সময় যেখানে-সেখানে ঘুমাইয়া পড়ে—রাত্রে কেহ যদি ডাকিয়া খাওয়ায়, তবেই খাওয়া হয়। তা ছাড়া, বেশি রাত্রে খাইতে হইলে দাদামশায়ের সঙ্গে বসিয়া খাইতে হয়—সে এক বিপদ।

দাদামশায়ের সহিত পারতপক্ষে কাজল খাইতে বসিতে চাহে না। বড়ো ভাত ফেলে, ছড়ায়—গুছাইয়া খাইতে জানে না বলিয়া দাদামশায় তাকে খাইতে বসিয়া সহবৎ শিক্ষা দেন।

কাজল আলুভাতে দিয়া শুকনা ভাত খাইতেছে—দাদামশায় হাঁকিয়া বলিলেন—ডাল দিয়ে মাখো—শুধু ভাত খাচ্ছ কেন?—মাখো—মেখে খাও—

তাড়াতাড়ি কম্পিত ও আনাড়ি হাতে ডাল মাখিতে গিয়া থালার কানা ছাড়াইয়া কিছু ডাল-মাখা ভাত মাটিতে পড়িয়া গেল। দাদামশায় ধমক দিয়া উঠিলেন—পড়ে গেল, পড়ে গেল—আঃ, ছোঁড়া ভাতটা পর্যন্ত যদি গুছিয়ে খেতে জানে!—তোল্ তোল্—খুঁটে খুঁটে তোল্—

কাজল ভয়ে ভয়ে মাটি-মাখা ভাতগুলি থালার পাশ হইতে আবার থালায় তুলিয়া লইল।

—বেগুন পটোল ফেলেছিস্ কেন?—ও খাবার জিনিস না?—সব একসঙ্গে মেখে নে—

খানিকটা পরে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, কাজল উচ্ছেভাজা খায় নাই—তখন অম্বল দিয়া খাওয়া হইয়া গিয়াছে—তিনি বলিলেন—উচ্ছেভাজা খাস্নি?—খাও—ও অম্বলমাখা ভাত ঠেলে রাখো। উচ্ছেভাজা তেতো বলিয়া কাজলের মুখে ভালো লাগে না—সে তাতে হাতও দেয় নাই। দাদামশায়ের ভয়ে অম্বলমাখা ভাত ঠেলিয়া রাখিয়া তিক্ত উচ্ছেভাজা একটি একটি কবিয়া খাইতে হইল—একখানি ফেলিবার জো নাই—দাদামশায়ের সতর্ক দৃষ্টি। ভাত খাইবে কি কান্নায় কাজলের গলায় ভাতের দলা আটকাইয়া যায়। খাওয়া হইয়া গেলে মেজ মামিমার কাছে গিয়া বলিয়া কহিয়া একটা পান লয়—পান খুলিয়া দেখে কি কি মশলা আছে, পরে মিনতিব সুরে একবার মেজ মামিমার কাছে একবার ছোট মামিমার কাছে বলিয়া বেড়ায়—ইতি একটু কাৎ, ও মামিমা তোমাব পায়ে পড়ি। একটু কাৎ দাও না—। কাঠ অর্থাৎ দাবুচিনি। মামিমারা ঝংকাব দিয়া বলেন—রোজ রোজ ডালচিনি চাই—ছেলে আবার শৌখিন কত!..উঃ, তায় আবার জিব দেখা চাই—মুখ রাঙা হল কিনা—

তবে পড়াশুনার আগ্রহ তাহার বেশি ছাড়া কম নয়। বিশ্বেশ্বর মুহুরির হাতবাক্সে কেশবঞ্জনেব উপহারের দরুন গল্পের বই আছে অনেকগুলি। খুনী আসামী কেমন করিয়া ধবা পড়িল, সেই সব গল্প। আর পড়িতে ইচ্ছা করে আরব্য উপন্যাস, কি ছবি! কি গল্প! দাদামশায়ের বিছানার উপব একদিন পড়িয়া ছিল—সে উলটাইয়া দেখিতেছে, টের পাইয়া বিশ্বেশ্বর মুহুরি কাড়িয়া লইয়া বলিল, এঃ, আট বছরের ছেলের আবার নভেল পড়া? এইবার একদিন তোমাব দাদামশায় শুনতে পেলে দেখো কি করবে!

কিন্তু বইখানা কোথায় আছে সে জানে—দোতলার শোবার ঘবেব সেই কাঁটাল কাঠের সিন্দুকটার মধ্যে—একবার যদি চাবিটা পাওয়া যাইত! সারারাত জাগিয়া পড়িয়া ভোরের আগেই তাহা হইলে তুলিয়া রাখে।

এ কয়েকদিন বৈকালে দাদামশায় বসিয়া বসিয়া তামাক খান, আর সে পণ্ডিতমশায়েব কাছে বসিয়া বসিয়া পড়ে। সেই সময় পণ্ডিতমশায়ের পেছনকার অর্থাৎ চণ্ডীমণ্ডপের উত্তর-ধারের সমস্ত ফাঁকা জায়গাটা অদ্ভুত ঘটনার রঙ্গভূমিতে পরিণত হয়, ঘটনাটাও হয়তো খুব স্পষ্ট নয়, সে ঠিক বুঝাইয়া বলিতে তো পারে না! কিন্তু দিদিমার মুখে শোনা নানা গল্পের রাজপুত্র ও পাত্রের পুত্রেরা নাম-না-জানা নদীর ধারে ঠিক এই সন্ধ্যাবেলাটাতেই পৌছায়—কোন্ রাজপুরীকে কাঁপাইয়া রাজকন্যাদের সোনার রথ বৈকালের আকাশপানে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়—সে অন্যমনস্ক হইয়া দেওয়ালের পাশে ঝুঁকিয়া আকাশটার দিকে চাহিয়া থাকে, কেমন যেন দুঃখ হয়—ঠিক সেই সময় সীতানাথ পণ্ডিত বলেন—দেখুন, দেখুন, বাঁড়ুয্যেমশায়, আপনার নাতির কাণ্ডটা দেখুন, স্লেটে বুড়কে

লিখতে দিলাম, তা গেল চুলোয়—হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছে দেখুন—এমন অমনোযোগী ছেলে যদি—

দাদামশায় বলেন—দিন না ধাঁ করে এক থাপ্পড় বসিয়ে গালে—হতভাগা ছেলে কোথাকার—হাড় জ্বালিয়েছে, বাবা করবে না খোঁজ, আমার ঘাড়ে এ বয়সে যত ঝুঁকি।

তবে কাজল যে দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এ কথা সবাই বলে। একদণ্ড সুস্থির নয়, সর্বদা চঞ্চল, একদণ্ড চুপ কবিয়া থাকে না, সর্বদা বকিতেছে। পণ্ডিতমশায় বলেন—দেখ্ তো দলু কেমন অঙ্ক কষে? ওর মধ্যে অনেক জিনিস আছে—আর তুই অঙ্কে একেবারে গাধা।—

পণ্ডিত পিছন ফিরিতেই কাজল মামাতোভাই দলুকে আঙুল দিয়া ঠেলিয়া চুপি চুপি বলে,—তো-তোর মধ্যে অনেক জিনিস আছে, কি জিনিস আছে রে, ভাত ডাল খি-খিচুড়ি..খিচুড়ি? হি-হি ইল্লি! খিচুড়ি খাবি, দলু?

দাদামশায়ের কাছে আবার নালিশ হয়।

তখন দাদামশায় ডাকিয়া শাস্তি স্বরূপ বানান জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করেন—বানান কর সূর্য। কাজল বানানটা জানে, কিন্তু ভয়জনিত উত্তেজনার দরুন হঠাৎ তাহার তোতলামিটা বেশি করিয়া দেখা দেয়—দু-একবার চেষ্টা করিয়াও 'দন্ত স্য' কথাটা কিছুতেই উচ্চারণ করিতে পারিবে না বুঝিয়া অবশেষে বিপন্নমুখে বলে—তা-তালব্য শয়ে দীঘ্য-উকার—

ঠাস্ করিয়া এক চড় গালে। ফরসা গাল, তখনই দালিমের মতো রাঙা হইয়া ওঠে, কান পর্যন্ত রাঙা হইয়া যায়। কাজলের ভয় হয় না, একটা নিষ্ফল অভিমান হয়—বাঃ রে, বানানটা তো সে জানে, কিন্তু মুখে যে আটকাইয়া যায় তা তার দোষ কিসের? কিন্তু মুখে অত কথা বলিয়া বুঝাইয়া প্রতিবাদ বা আত্মপক্ষ সমর্থন কবিবার মতো এতটা জ্ঞান তাহার হয় নাই—সবটা মিলিয়া অভিমানেব মাত্রাটাই বাড়াইয়া তোলে। কিন্তু অভিমানটা কাহাব উপব সে নিজেও ভালো বোঝে না।

এই সময়ে কাজলের জীবনে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল।

সীতানাথ পণ্ডিতমহাশয় একটু-আধটু জ্যোতিষের চর্চা কবিতেন। কাজলের পড়িবার সময় তাহার দাদামশায়ের সঙ্গে সীতানাথ পণ্ডিত সে সংম্বন্ধে আলোচনা করিতেন—পাঁজি দেখিযা ঠিকুজি তৈয়ারি, জন্মের লগ্ন ও যোগ গণনা, আয়ুষ্কাল নির্ণয ইত্যাদি। আজ বছরখানেক ধরিয়া কাজল প্রাযই এসব শুনিয়া আসিতেছে—যদিও সেখানে সে কোন কথা বলে না।

কার্তিক মাসের শেষ, শীত তখনও ভালো পড়ে নাই। বাড়ির চারিপাশে অনেক খেজুরবাগান, শিউলিরা কার্তিকের শেষে গাছ কাটিযাছে। শীতের ঠাণ্ডা সান্ধ্য বাতাসে টাটকা খেজুর রসের গন্ধ মাখানো থাকে।

কাজলদেব পাড়ার ব্রহ্মঠাকরুন এই সময় কি রোগে পড়িলেন। ব্রহ্মঠাকরুনের বয়স কত তা নির্ণয় করা কঠিন—মুড়ি ভাজিয়া বিক্রয় করিতেন, পতি-পুত্র কেহই ছিল না—কাজল অনেকবার মুড়ি কিনিতে গিয়াছে তাঁহার বাড়ি। অত্যন্ত খিটখিটে মেজাজের লোক, বিশেষ করিয়া ছেলেপিলেদের দু-চক্ষু পড়িয়া দেখিতে পারিতেন না—দূর দূর করিতেন, উঠানে পা দিলে পাছে গাছটা ভাঙে, উঠানটা খুঁড়িয়া ফেলে—এই ছিল তাঁহার ভয়। কাজলকে বাড়ির কাছাকাছি দেখিলে বলিতেন—একটা যেন মগ—মগ একটা—বাড়ি যা বাপু—কঞ্চি-টঞ্চির খোঁচা মেরে বসবি—যা বাপু এখান থেকে। ঝালের চারাগুলো মাড়াস নে—

সেদিন দুপুরের পর তাহার মামাতো-বোন অরু বলিল—বেহ্ম-ঠাকুমা মরমর হয়েছে, সবাই দেখতে যাচ্ছে—যাবি কাজল?

ছোট্ট একতলা বাড়ির ঘর, পাড়ার অনেকে দেখিতে আসিয়াছে—মেজেতে বিছানা পাতা, কাজল ও অরু দোরের কাছে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। ব্রহ্মঠাকরুনকে আর চেনা যায় না, মুখের

চেহারা যেমন শীর্ণ তেমনি ভয়ঙ্কর, চক্ষু কোটরগত, তাহার ছোটমামা কাছে বসিয়া আছে, হারু কবিরাজ দাওয়ায় বসিয়া লোকজনের সঙ্গে কি কথা বলিতেছে।

বৈকালে দু-তিনবার শোনা গেল ব্রহ্মঠাকরুনের রাত্রি কাটে কিনা সন্দেহ।

কাজল কিছু বিস্মিত হইল। এমন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রহ্মঠাকরুন, যাঁহাকে গামছা পরিয়া উঠানে গোবরজল ছিটাইতে দেখিয়া সে তখনই ভাবিত—তাহার দাদামশায়ের মতো লোক পর্যন্ত যাঁহাকে মানিয়া চলে—তাঁহার এ কি দশা হইয়াছে আজ!...এত অসহায়, এত দুর্বল তাঁহাকে কিসে করিয়া ফেলিল?...

ব্রহ্মঠাকরুন সন্ধ্যার আগে মারা গেলেন। কাজলের মনে হইল পাড়াময় একটা নিস্তব্ধতা—কেমন একটা অবোধ্য বিভীষিকার ছায়া যেন সারা পাড়াকে অন্ধকারের মতো গ্রাস করিতে আসিতেছে...সকলেরই মুখে যেন একটা ভয়ের ভাব।

শীতের সন্ধ্যা ঘনাইয়াছে। পাড়ার সকলে ব্রহ্মঠাকরুনের সৎকারের ব্যবস্থা করিতে তাঁহার বাড়ির উঠানে সমবেত হইয়াছে। কাজলের দাদামশায়ও গিয়াছেন। কাজল ভয়ে ভয়ে খানিকটা দূরে অগ্রসর হইয়া দেখিতে গেল—কিন্তু ব্রহ্মঠাকরুনের বাড়ি পর্যন্ত যাইতে পারিল না—কিছু দূরে একটা বাঁশঝাড়ের নিচে দাঁড়াইয়া রহিল। সেখান হইতে উঠানটা বা বাড়িটা দেখা যায় না—কথাবার্তার শব্দও কানে আসে না। বাতাস লাগিয়া বাঁশঝাড়ের কঞ্চিতে কঞ্চিতে শব্দ হইতেছে—চারি ধার নির্জন...কাজলের বুক দুরু-দুরু করিতেছিল...একটা অদ্ভুত ধরনের ভাবে তাহার মন পূর্ণ হইল—ভয় নয়, একটা বিস্ময়-মাখানো রহস্যের ভাব...অন্ধকারে গা লুকাইয়া দু-একটা বাদুড় আকাশ দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে...অন্যদিন এমন সময়ে বাদুড় দেখিলেই কাজল বলিয়া উঠে—বাদুড বাদুড় মেথর, যা খাবি তা তেঁতর।

আজ উড়নশীল বাদুড়ের দৃশ্য তাহার মনে কৌতুক না জাগাইয়া সেই অজানা রহস্যের ভাবই যেন ঘনীভূত করিয়া তুলিল।—

ব্রহ্মঠাকরুন মারা গেলেন বটে—কিন্তু মৃত্যুকে কাজল এই প্রথম চিনিল। দিদিমা মারা গিয়াছিলেন কাজলের পাঁচবছর বয়সে—তাহাও গভীর রাত্রে, কাজল তখন ঘুমাইয়া ছিল—কিছু দেখে নাই—বোঝেও নাই, এবার মৃত্যুর বিভীষিকা, এই অপূর্ব রহস্য তাহার শিশু-মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। একা একা বেড়ায়, তেমন সঙ্গী-সেজুড় নাই—আর ওই সব কথা ভাবে। একদিন তাহার মনে হইল যদি সেও ব্রহ্মঠাকরুনের মতো মরিয়া যায়!...হাত-পায়ে যেন সে বল হারাইয়া ফেলিল,—সত্য, সে-ও হয়তো মারা যাইবে!...

দিনের পর দিন ভয়টা বাড়িতে লাগিল। একলা শুইয়া শুইয়া কথাটা ভাবে—নদীর বাঁধা ঘাটের পৈঠায় সন্ধ্যার সময় বসিয়া ওই কথাই মনে ওঠে।...এই বড়দলের তীরে দিদিমার মতো, ব্রহ্মঠাকরুনের মতো তার দেহও একদিন পুড়াইতে—

কথাটা ভাবিতেই ভয়ে সর্বশরীর যেন অবশ হইয়া আসে...

কাজল তাহার জন্মের সালটা জানিত; কিছুদিন আগে তাহার দাদামশায় সীতানাথ পণ্ডিতের কাছে কাজলের ঠিকুজি করাইয়াছিলেন—সে সে-সময় সেখানে ছিল। কিন্তু তাবিখটা জানে না—তবে মাঘ মাসের শেষের দিকে, তা জানে।

একদিন সে দুপুরে চুপি চুপি কাছারি ঘরে ঢুকিল। তাকের উপরে রাশীকৃত পুরানো পাঁজি সাজানো থাকে। চুপি চুপি সবগুলি নামাইয়া ১৩৩০ সালের পাঁজিখানা বাছিয়া লইয়া মাঘ মাসের শেষের দিকের তারিখগুলা দেখিতে লাগিল—কি সে বুঝিল সে-ই জানে—তাহার মনে হইল ২৫শে মাঘ বড়ো খারাপ দিন। ওই দিন জন্মিলে আয়ু কম হয়, খুব কম। তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল—ওই দিনটাতেই হয়তো সে জন্মিয়াছে।...ঠিক।

বড়ো মামিকে বৈকালে জিজ্ঞাসা করিল—আমি জন্মেছি কত তারিখে মামিমা?...বড়ো

মামিমার তো তাহা ভাবিয়া ঘুম নাই! তিনি জানেন না। বড়ো মামাতো ভাই পটলকে জিজ্ঞাসা করিল—আমি কবে জন্মেছি জানিস পটলদা?...পটলের বয়স বছর দশেক, সে কি করিয়া জানিবে? দাদামশায়ের কাছে ঠিকুজি আছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা হয় না। একদিন সীতানাথ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন—কেন, সে খোঁজে তোমার কি দরকার?

সে থাকিতে না পারিয়া সোজাসুজি বলিয়াই ফেলিল—আ-আমি ক-কতদিন বাঁচব পণ্ডিতমশায়?

সীতানাথ পণ্ডিত অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—এমন কথা কোন ছেলের মুখে কখনও তিনি শুনেন নাই। শশীনারায়ণ বাঁড়ুজ্যেকে ডাকিয়া কহিলেন—শুনেছেন ও বাঁড়ুজ্যেমশায়, আপনার নাতি কি বলছে?

শশীনারায়ণ শুনিয়া বলিলেন—এদিকে তো বেশ ইঁচড়-পাকা? দু-মাসের মধ্যে আজও তো দ্বিতীয় নামতা রপ্ত হল না—বলো বারো পোনেরং কত?

কাজলের ভয়কে কেহই বুঝিল না। কাজল ধমক খাইল বটে, কিন্তু ভয় কি তাতে যায়? এক এক সময়ে তাহার মন হাঁপাইয়া ওঠে—কাহাকেও বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না...এখন সে কি করে? এখানে তাহার কথা কেহ শুনিবে না, রাখিবে না তাহা সে বোঝে। তাহার বাবাকে বলিতে পারিলে হয়তো উপায় হইত।

বর্ষাকালের শেষের দিকে সে দু-একবার জ্বরে পড়ে। জ্বর আসিলে উপরের ঘরে একলাটি একটা কিছু টানিয়া গায়ে দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে। কাহারও পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া বলে—ও মামিমা, জ্বর হয়েছে আমার—একটা লে-এ-এ-প বে-বের করে দাও না?—ইচ্ছা করে কেহ কাছে বসে, কিন্তু বাড়ির এত লোক সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। জ্বরের প্রথম দিকে কিন্তু চমৎকার লাগে, কেমন যেন একটা নেশা, সব কেমন অদ্ভুত লাগে। ওই জানালার গরাদটাতে একটা ডেও-পিঁপড়ে বেড়াইতেছে, চুনেকালিতে মিশাইয়া জানালার কবাটে একটা দাড়িওয়ালা মজার মুখ। জানালার বাহিরের নারিকেল গাছে নারিকেলসুদ্ধ একটা কাঁদি ভাঙিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। নিচে তাহার ছোট মামাতো বোন অরু, 'ভাত ভাত' করিয়া চিৎকার শুরু করিয়াছে—বেশ লাগে। কিন্তু শেষের দিকে বড়ো কষ্ট, গা জ্বালা করে, হাত-পা ব্যথা করে, সারা শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে, মাথা যেন ভার বোঝা, এ সময়টা কেহ কাছে আসিয়া যদি বসে!

কাছারির উত্তর গায়ে পথের ধারে এক বুড়ির খাবারের দোকান, বারো মাস খুব সকালে উঠিয়া সে তেলেভাজা বেগুনি ফুলুরি ভাজে। কাজল তাহার বাঁধা খরিদ্দার। অনেকবার বকুনি খাইয়াও সে এ লোভ সামলাইতে সমর্থ হয় না। সারিবার দিন-দুই পরেই কাজল সেখানে গিয়া হাজির। অনেকক্ষণ সে বসিয়া বসিয়া ফুলুরিভাজা দেখিল, পুঁইপাতার বেগুনি, জবাপাতার তিল পিটুলি। অবশেষে সে অপ্রতিভ মুখে বলে—আমায় পুঁইপাতার বেগুনি দাও না দিদিমা? দেবে? এই নাও পয়সা। বুড়ি দিতে চায় না, বলে—না খোকা দাদা, সেদিন জ্বর থেকে উঠেছ, তোমার বাড়ির লোকে শুনলে আমায় বকবে—কিন্তু কাজলের নির্বন্ধাতিশয্যে অবশেষে দিতে হয়।

একদিন বিশ্বেশ্বর মুহুরির কাছে ধরা পড়িয়া যায়। বুড়ির দোকান হইতে বাহির হইয়া জবাপাতার তিল-পিটুলির ঠোঙা হাতে খাইতে খাইতে পুকুরপাড় পর্যন্ত গিয়াছে—বিশ্বেশ্বর আসিয়া ঠোঙাটি কাড়িয়া লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—আচ্ছা পাজি ছেলে তো? আবার ওই তেলেভাজা খাবারগুলো রোজ রোজ খাওয়া?

কাজল বলিল—আমি খা-খা-খাচ্ছি তা তো-তোমার কি?

বিশ্বেশ্বর মুহুরি হঠাৎ আসিয়া তাহার কান ধরিয়া একটা ঝাঁকুনি দিয়া বলিল—আমার কি, বটে?

রাগে অপমানে কাজলের মুখ রাঙা হইয়া গেল। ইহাদের হাতে মার খাওয়ার অভিজ্ঞতা

তাহার এই প্রথম। সে ছেলেমানুষি সুরে চিৎকার করিয়া বলিল—মুখপুড়ি, হতচ্ছাড়া তু-তুমি মারলে কেন?

বিশ্বেশ্বর তাহার গালে জোরে এক চড় বসাইয়া দিয়া বলিল—আমি কেন, এসো তো কর্তার কাছে একবার—এসো।

কাজল পাগলের মতো যা-তা বলিয়া গালি দিতে লাগিল। চড়ের চোটে তখন তাহার কান মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে, এবং বোধ হয় এ অপমানের কোনও প্রতিকার এখানকার কাহারও নিকট হইতে হইবার আশা নাই, মুহূর্ত মধ্যে ঠাওরাইয়া বুঝিয়া চিৎকার করিয়া বলিল—আমার বা-বাবা আসুক, বলে দেব, দেখো—দেখো তখন—

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া বলিল—আচ্ছা যাও, তোমার বাবার ভয়ে আমি একেবারে গর্তের মধ্যে যাব আর কি? আজ পাঁচ বছরের মধ্যে খোঁজ নিলে না, ভারি তো—। হয়তো একথা বলিতে বিশ্বেশ্বর সাহস করিত না, যদি সে না জানিত তাঁহার এ জামাইটির প্রতি কর্তার মনোভাব কিরূপ।

কাজল রাগের মাথায় ও কতকটা পাছে বিশ্বেশ্বর দাদামশায়ের কাছে ধরিয়া লইয়া যায় সেই ভয়ে, পুকুরের দক্ষিণ পাড়ের নারিকেল বাগানের দিকে ছুটিয়া যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল—দেখো না, দেখো তুমি, বাবা আসুক না—পরে পিছন দিকে চাহিয়া খুব কড়া কথা শুনানো হইতেছে, এমন সুরে বলিল—তোমার পেটে খি-খিচুড়ি আছে, খি-খিচুড়ি খাবে—খিচুড়ি?

নদীর বাঁধাঘাটে সেদিন সন্ধ্যাবেলা বসিয়া বসিয়া সে অনেকক্ষণ দিদিমার কথা ভাবিল। দিদিমা থাকিলে বিশ্বেশ্বর মুহুরি গায়ে হাত তুলিতে পারিত? সে জবাপাতার বেগুনি খায় তো ওর কি?

ওই একটা নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। দিদিমা বলিত নক্ষত্র খসিয়া পড়িলে সেই সময় পৃথিবীতে কেউ না কেউ জন্মায়। মরিয়া কি নক্ষত্র হয়? সে যদি মারা যায়, হয়তো অমনি আকাশেব গায়ে নক্ষত্র হইয়া ফুটিয়া থাকিবে।

আরও মাস কয়েক পরে ভাদ্রমাসেব শেষের দিকে। দাদামশায়ের বৈকালিক মিছরির পানা খাওয়ার শ্বেত পাথরেব গেলাসটা তাহার বড়ো মামিমা মাজিয়া ধুইয়া উপরের ঘরের বাসনের জলচৌকিতে রাখিতে তাহাব হাতে দিল। সিঁড়িতে উঠিবার সময় কেমন করিয়া গেলাস হাত হইতে পড়িয়া চুরমাব হইয়া গেল ভাঙিযা। কাজলের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহার ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ডের গতি যেন মিনিটখানেকের জন্য বন্ধ হইয়া গেল, যাঃ, সর্বনাশ! দাদামশায়ের মিছরিপানার গেলাসটা যে! সে দিশেহারা অবস্থায় টুকরাগুলো তাড়াতাড়ি খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিল; পরে অন্য জায়গায় ফেলিলে পাছে কেহ টের পায়, তাই তাড়াতাড়ি আরব্য উপন্যাস যাহার মধ্যে আছে সেই বড়ো কাঠের সিন্দুকটার পিছনে গোপনে বাখিয়া দিল। এখন সে কি করে! কাল যখন গেলাসের খোঁজ পড়িবে বিকালবেলা, তখন সে কি জবাব দিবে?

কাহারও কাছে কোন কথা বলিল না, বাকি দিনটুকু ভাবিয়া ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতেও পারিল না; এক জায়গায় বসিতে পারে না, উদ্বিগ্ন মুখে ছটফট করিয়া বেড়ায়—ওই রকম একটা গেলাস আর কোথাও পাওয়া যায় না? একবার সে এক খেলুড়ে বন্ধুকে চুপি চুপি বলিল,—ভাই তো-তোদের বাড়ি একটা পাথরের গে-গেলাস আছে?

কোথায় সে এখন পায় একটা শ্বেত পাথরের গেলাস? রাত্রে একবার তাহার মনে হইল সে বাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে। কলিকাতা কোন্ দিকে? সে বাবার কাছে চলিয়া যাইবে কলিকাতায়—কাল বৈকালের পূর্বেই।

কিন্তু রাত্রে পালানো হইল না। নানা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিল, দুই-তিন বার কাঠের সিন্দুকটার পিছনে সন্তর্পণে উঁকি মারিয়া দেখিল, গেলাসের টুকরাগুলা সেখান হইতে কেহ বাহির করিয়াছে কিনা। বড়ো মামিমার সামনে আর যায় না, পাছে গেলাসটা কোথায় জিজ্ঞাসা

করিয়া বসে। দুপুরের কিছু পর বাড়ির রাস্তা দিয়া কে একজন সাইকেল চড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া সে নাট-মন্দিরের বেড়ার কাছে ছুটিয়া দেখিতে গেল—কিন্তু সাইকেল দেখা তাহার হইল না, নদীর বাঁধাঘাটে একখানা কাহাদের ডিঙিনৌকা লাগিয়াছে, একজন ফরসা চেহারার লোক একটা ছড়ি ও ব্যাগ হাতে ডিঙি হইতে নামিয়া ঘাটের সিঁড়িতে পা দিয়া মাঝির সঙ্গে কথা কহিতেছে—কাজল অবাক হইয়া ভাবিতেছে, লোকটা কে, এমন সময় লোকটা মাঝির সঙ্গে কথা শেষ করিয়া এদিকে মুখ ফিরাইল। সঙ্গে সঙ্গে কাজল অল্পক্ষণের জন্য চোখে যেন ধোঁয়া দেখিল, পরক্ষণেই সে নাটমন্দিরের বেড়া গলাইয়া বাহিরের নদীর ধারে রাস্তাটা বাহিয়া বাঁধাঘাটের দিকে ছুটিল। যদিও অনেক বছর পরে দেখা, তবুও কাজল চিনিয়াছে লোকটিকে—তাহার বাবা!

অপু খুলনার স্টিমার ফেল করিয়াছিল। নতুবা সে কাল রাত্রেই এখানে পৌঁছিত। সে মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিতেছিল, পরশু ভোরে নৌকা এখানে আনিয়া তাহাকে বরিশালের স্টিমার ধরাইয়া দিতে পারিবে কিনা। কথা শেষ করিয়াই ফিরিয়া চাহিয়া সে দেখিল একটি ছোট সুশ্রী বালক ঘাটের দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। পরক্ষণেই সে চিনিল। আজ সারা পথ নৌকায় সে ছেলের কথা ভাবিয়াছে, না জানি সে কত বড়ো হইয়াছে, কেমন দেখিতে হইয়াছে, তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে, না মনে রাখিয়াছে! ছেলের আগেকার চেহারা তাহার মনে ছিল না। এই সুন্দর বালকটিকে দেখিয়া সে যুগপৎ প্রীত ও বিস্মিত হইল—তাহার সেই তিন বছরের ছোট্ট খোকা এমন সুদর্শন লাবণ্যভরা বালকে পরিণত হইল কবে?

সে হাসিমুখে বলিল—কি রে খোকা, চিনতে পারিস?

কাজল ততক্ষণে আসিয়া অসীম নির্ভরতার সহিত তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিয়াছে—ফুলের মতো মুখটি উঁচু করিয়া হাসি-ভরা চোখে বাবার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—না বই কি? আমি বেড়ার ধার থেকে দেখেই ছুট দিইছি—এতদিন আসনি কে-কেন? বাবা?

একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। এতদিন তো ভুলিয়া ছিল, কিন্তু আজ এইমাত্র—হঠাৎ দেখিবামাত্রই—অপুর বুকের মধ্যে একটা গভীর স্নেহসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য, এই ক্ষুদ্র বালকটি তাহারই ছেলে, জগতে নিতান্ত অসহায় হাত-পা হারা, অবোধ—জগতে সে ছাড়া ওর আর কেউ তো নাই! কি করিয়া এতদিন সে ভুলিয়া ছিল!

কাজল বলিল—ব্যাগে কি বাবা?

—দেখবি? চল্ দেখাব এখন। তোর জন্য কেমন পিস্তল আছে, একসঙ্গে দুম্ দুম্ আওয়াজ হয়, ছবির বই আছে দুখানা। কেমন একটা রবারের বেলুন—

—তো-তো-তোমাকে একটা কথা বলব বাবা? তো-তোমার কাছে একটা পাথরের গে-গেলাস আছে?

—পাথরের গেলাস? কেন রে, পাথরের গেলাস কি হবে?

কাজল চুপি চুপি বাবাকে গেলাস ভাঙার কথা সব বলিল। বাবার কাছে কোন ভয় হয় না। অপু হাসিয়া ছেলের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—আচ্ছা চল্, কোনো ভয় নেই।

সঙ্গে সঙ্গে কাজলের সব ভয়টা কাটিয়া গেল, একজন অসীম শক্তিধর বজ্রপাণি দেবতা যেন হঠাৎ বাহুদ্বয় মেলিয়া তাহাকে আশ্রয় ও অভয়দান করিয়াছে—মাভৈঃ।

রাত্রে কাজল বলিল—আমি তোমার সঙ্গে যাব বাবা!

অপুর অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু কলিকাতায় এখন নিজেই অচল। সে ভুলাইবার জন্য বলিল—আচ্ছা হবে, হবে। শোন্ একটা গল্প বলি খোকা।

কাজল চুপ করিয়া গল্প শুনিল। বলিল—নিয়ে যাবে তো বাবা? এখানে সবাই বকে, মারে বাবা! তুমি নিয়ে চল, তোমার কত কাজ করে দেব।

অপু হাসিয়া বলে—কাজ করে দিবি? কি কাজ করে দিবি রে খোকা?

তারপর সে ছেলেকে গল্প শোনায়—একবার চাহিয়া দেখে, কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

খানিক রাত্রি পর্যন্ত সে একখানা বই পড়িল, পরে আলো নিভাইবার পূর্বে ছেলেকে ভালো করিয়া শোয়াইতে গেল। ঘুমন্ত অবস্থায় বালককে কি অদ্ভুত ধরনের অবোধ, অসহায়, দুর্বল পরাধীন মনে হইল অপুর! কি অসহায় ও পরাধীন! সে ভাবে, এই যে ছেলে, পৃথিবীতে এ তো কোথাও ছিল না যাচিয়াও তো আসে নাই—অপর্ণা ও সে, দুজনে যে উহাকে কোন্ অনন্ত হইতে সৃষ্টি করিয়াছে—তাহার পর সংসারে আসিয়া অবোধ নিষ্পাপ বালককে একা এভাবে সংসারে ছাড়িয়া দিয়া পালানো কি অপর্ণাই সহ্য করিবে? কিন্তু এখন কোথায়ই বা লইয়া যায়?

প্রাচীন গ্রীসের এক সমাধির উপরে সেই যে স্মৃতিফলকটির কথা সে পড়িয়াছিল ফ্রেডরিক হ্যারিসনের বই-এ—

This child of ten years
Philip, his father laid here
His great hope, Nikoteles.

সে দূর কালের ছোট বালকটির সুন্দর মুখ, সুন্দর রং, দেব-শিশুর মতো সুন্দর দশ বৎসরের বালক নিকোটিলিসকে আজ রাত্রে সে যেন নির্জন প্রান্তরে খেলা করিতে দেখিতে পাইতেছে—সোনালি চুল, ডাগর চোখ। তাহার স্নেহস্মৃতি গ্রীসের সে নির্জন প্রান্তবের সমাধিক্ষেত্রেব বুকে অমর হইয়া আছে! শত শতাব্দী পূর্বে সেই বিরহী পিতৃ-হৃদয়ের সঙ্গে সে যেন আজ নিজের নাড়ীব যোগ অনুভব করিল। মনে হইল, মানুষ সব কালে সব অবস্থায় এক, এক। কিংবা দেবতার মন্দির দ্বারে আরোগ্যকামী বহু যাত্রী জড়ো হইয়াছে নানা দিক দেশ হইতে. ছোট ছেলেটির গরিব বাবা তাহাকে আনিয়াছে...ছেলেটি অসুখে ভোগে, রুগ্ণ, স্বপ্নে দেবতা আসিয়া বলিলেন—যদি তোমাব রোগ সারিয়ে দিই, আমায় কি দেবে ইউফেনিস? উঃ, সত্যি! অসুখ সারিলে সে বাঁচে! ছেলেটি উৎসাহের সুরে বলিল—দশটা মার্বেল আমার আছে, সব কটাই দিয়ে দেব—দেবতা খুশিব সুরে বলিলেন—স—ব ক—টা! বলো কি? বেশ বেশ, রোগ সারিয়ে দেব তোমাব।

বাৎসল্যরসের এমন গভীর অনুভূতি জীবনে তাহাব এই প্রথম ..

অনেকদিন পরে উপরের ঘরটাতে শুইল। সেই তাহাব ফুলশয্যার খাটটাতে। কাজল পাশেই ঘুমাইতেছে—কিন্তু কত রাত পর্যন্ত তাহার নিজেব ঘুম আসিল না। জানালাব বাহিরে চাহিয়া চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। গত পাঁচ ছয় বৎসর বিদেশে সম্পূর্ণ অন্য ধবনের জীবনযাত্রা ও নবতর অনুভূতিরাজির ফলে পুরাতন দিনের অনেক অনুভূতিই অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—এখানকার তো আরও, কারণ আট নয় বৎসর এখানকার জীবনেব সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নাই। তাই আজ এই চিলে-কোঠার বহু পরিচিত ঘবটা, এই পালঙ্কটা, ওই সুপারি বনের সারি—এসব যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। ঠিক আবার পুরানো দিনের মতো জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, ঠিক সেই সব দিনের মতো নাটমন্দির হইতে নৈশ কীর্তনের খোলেব আওয়াজ আসিতেছে—কিন্তু সে অপু নাই—বদলাইয়া গিয়াছে—বেমালুম বদলাইয়া গিয়াছে।

স্ত্রীর গহনা বেচিয়া বই ছাপাইয়া ফেলিল পূজার পরেই।

কেবল হার ছড়াটা বেচিতে পারিল না। অপর্ণার অন্যান্য গহনার অপেক্ষা সে এই হার ছড়াটার সঙ্গে বেশি পরিচিত। তাই হারটা সামনে খুলিয়া খানিকক্ষণ ভাবিল, অপর্ণার সেই হাসি-হাসি মুখখানা যেন ঝাপসামতো মনে পড়ে—প্রথমটাতে হঠাৎ যেন খুব সুস্পষ্ট মনে আসে—আধ সেকেন্ড কি সিকি সেকেন্ড মাত্র সময়ের জন্য—তারপরেই ঝাপসা হইয়া যায়। ওই আধ সেকেন্ডের জন্য মনে হয়, সে-ই সেরকম ঘাড় বাঁকাইয়া মুখে হাসি টিপিয়া সামনে দাঁড়াইয়া আছে।

ছাপানো বই-এর প্রথম কপিখানা দপ্তরির বাড়ি হইতে আনাইয়া দেখিয়া সে দুঃখ ভুলিয়া গেল। কিছু না, সব দুঃখ দূর হইবে। এই বই-এ সে নাম করিবে।

আজ বিশ বৎসরের দূর জীবনের পার হইতে সে নিশ্চিন্দিপুরের পোড়ো ভিটাকে অভিনন্দন পাঠাইল মনে মনে। যেখানেই থাকি, ভুলি নি! যাহাদের বেদনার রঙে তাহার বইখানা রঙিন, কত স্থানে, কত অবস্থায় তাহাদের সঙ্গে পরিচয়, হয়তো কেউ বাঁচিয়া আছে, কেউ বা নাই। তাহারা আজ কোথায় সে জানে না, এই নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার শান্তির মধ্য দিয়া সে মনে মনে সকলকেই আজ তাহার ধন্যবাদ জানাইতেছে।

মাসকয়েকের জন্য একটা ছোট অফিসে একটা চাকরি জুটিয়া গেল তাই রক্ষা। এক জায়গায় আবার ছেলে পড়ায়। এসব না করিলে খরচ চলে বা কিসে, বই-এর বিজ্ঞাপনের টাকাই বা আসে কোথা হইতে। আবার সেই সাড়ে নয়টার সময় আফিসে দৌড়, সেখান হইতে বাহির হইয়া একটা গলির মধ্যে একতলা বাসার ছোট্ট ঘরে দুটি ছেলে পড়ানো। বাড়ির কর্তার কিসের ব্যবসা আছে, এই ঘরে তাঁহাদের বড়ো বড়ো প্যাকবাক্স ছাদের কড়ি পর্যন্ত সাজানো। তাহারই মাঝখানে ছোট তক্তপোশে মাদুর পাতিয়া ছেলে-দুটি পড়ে—সন্ধ্যার পরে অপু যখনই পড়াইতে গিয়াছে, তখনই দেখিয়াছে কয়লার ধোঁয়ায় ঘরটা ভরা।

শীতকাল কাটিয়া পুনরায় গ্রীষ্ম পড়িল। বই-এর অবস্থা খুব সুবিধা নয়, নিজে না খাইয়া বিজ্ঞাপনের খরচ জোগায়, তবু বই-এর কাটতি নাই! বইওয়ালারা উপদেশ দেয়, এডিটারদের কাছে, কি বড়ো বড়ো সাহিত্যিকদের কাছে যান, একটু জোগাড়যন্ত্র করে ভালো সমালোচনা বার করুন, আপনাকে চেনে কে, বই কি হাওয়ায় কাটবে মশাই? অপু সে সব পারিবে না, নিজের লেখা বই বগলে করিয়া দোরে দোরে ঘুরিয়া বেড়ানো তাহার কর্ম নয়। এতে বই কাটে ভালো, না কাটে সে কি করিবে?

অতএব জীবন পুরাতন পরিচিত পথ ধরিয়াই বহিয়া চলিল—আপিস আর ছেলে পড়ানো। রাত্রে আর একটা নতুন বই লেখে। ও যেন একটা নেশা, বই বিক্রি হয়-না-হয়, কেউ পড়ে-না-পড়ে, তাহাকে যেন লিখিয়া যাইতেই হইবে।

মেসে লেখার অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া সে একটা ছোট একতলা বাড়ির নিচেকার একটা ঘর আট টাকায় ভাড়া লইয়া সেখানে উঠিয়া গেল। মেসের বাবুরা লোক বেশ ভালোই—কিন্তু তাঁহাদের মানসিক ধারা যে পথ অবলম্বনে চলে অপুর পথ তা নয়—তাঁহাদের মূর্খতা, সংস্কার, সীমাবদ্ধতা ও সর্বরকমের মানসিক দৈন্য অপুকে পীড়া দেয়। খানিকক্ষণ মিষ্টালাপ হয়তো এঁদের সঙ্গে চলিতে পারে—কিন্তু বেশিক্ষণ আড্ডা দেওয়া অসম্ভব—বরং কারখানার ননী মিস্ত্রি, কি চাঁপদানির বিশু স্যাকরার আড্ডার লোকজনকে ভালোই লাগিত—কারণ তাহারা যে জগৎটাতে বাস করিত—অপুর কাছে সেটা একেবারেই অপরিচিত—তাহাদের মোহ ছিল, সেই অজানা ও অপরিচয়ের মোহ, কাশীর কথক ঠাকুর কি অমরকণ্টকের আজবলাল ঝা-কে যে কারণে ভালো লাগিয়াছিল। কিন্তু এঁরা সে ধরনের অনন্যসাধারণ নন, নিতান্তই সাধারণ ও নিতান্ত ক্ষুদ্র। কাজেই বেশিক্ষণ থাকিলেই হাঁপ ধরে—অপুর নতুন ঘরটাতে দরজা জানালা কম, দক্ষিণ দিকের ছোট জানালাটা খুলিলে পাশের বাড়ির ইট-বার-করা দেওয়ালটা দেখা যায় মাত্র। ভাবিল—তবুও তো একা থাকতে পারব—লেখাটা হবে।

বাড়ি বদল করার দিনটা জিনিসপত্র সরাইতে ও ঘর গুছাইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। হাত-পা ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিল।

আজ রবিবার ছেলে-পড়ানো নাই। বাপ্! নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সেই অতটুকু ঘর, কয়লার ধোঁয়া আর রাজ্যের প্যাকবাক্সের টার্পিন তেলের মতো গন্ধ। আজ কয়েক দিন হইল কাজলের চিঠি পাইয়াছে, এই প্রথম চিঠি, কাটাকুটি বানান ভুলে ভর্তি। আর একবার পত্রখানা বাহির করিয়া পড়িল—বার-পনেরো হইল এইবার লইয়া। বাবার জন্য তাহার মন কেমন করে, একবার যাইতে লিখিয়াছে, একখানা আরব্য উপন্যাস ও একটা লণ্ঠন লইয়া যাইতে লিখিয়াছে, যেন বেশি দেরি না হয়! অপু ভাবে, ছেলেটা পাগল, লণ্ঠন কি হবে? লণ্ঠন?...দ্যাখো তো কাণ্ড। উঠিয়া ঘরে আলো জ্বালিয়া ছেলের পত্রের জবাব লিখিল। সে আগামী শনিবার তাহাকে দেখিতে যাইতেছে।

সোম ও মঙ্গলবার ছুটি, ট্রেনে স্টিমারে বেজায় ভিড়। খুলনার স্টিমার এবারও ফেল করিল! শ্বশুরবাড়ি পৌঁছিতে বেলা দুপুর গড়াইয়া গেল।

নৌকা হইতে দেখে কাজল ঘাটে তাহার অপেক্ষায় হাসিমুখে দাঁড়াইয়া—নৌকা থামিতে-না-থামিতে সে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। মুখ উঁচু করিয়া বলিল—বাবা,—আমার আরব্য উপন্যাস?—অপু সে-কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। কাজল কাঁদ-কাঁদ সুরে বলিল—হুঁ-উঁ-বাবা, এত করে লিখলাম, তুমি ভুলে গেলে—লণ্ঠন?. .অপু বলিল,—আচ্ছা তুমি পাগল নাকি—লণ্ঠন কি করবি?—কাজল বলিল, সে লণ্ঠন নয় বাবা!...হাতে ঝুলানো যায়, রাঙা কাচ, সবুজ কাচ বের করা যায় এমনি ধারা। হুঁ-উঁ, তুমি আমার কোন কথা শোনো না। একটা আরশি আনবে বাবা?

—আরশি?—কি করবি আরশি?

—আমি আরশিতে ছিঁয়া দেখ্‌বো—

অপর্ণার দিদি মনোরমা অনেকদিন পরে বাপের বাড়ি আসিয়াছেন। বেশ সুন্দরী, অনেকটা অপর্ণার মতো মুখ। ছোট ভগ্নীপতিকে পাইয়া খুব আহ্লাদিত হইলেন, স্বর্গগত মা ও বোনের নাম করিয়া চোখের জল ফেলিলেন। অপু তাঁহাব কাছে একটা সত্যকার স্নেহ-ভালোবাসা পাইল। সন্ধ্যাবেলা অপু বলিল—আসুন দিদি, ছাদের উপর বসে আপনার সঙ্গে একটু গল্প করি।

ছাদ নির্জন, নদীর ধারেই, অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়।

অপু বলিল—আমার বিয়ের রাতের কথা মনে হয় মনোবমাদি?

মনোরমা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—সেও যেন এক স্বপ্ন। কোথা থেকে কি যেন সব হয়ে গেল ভাই—এখন ভেবে দেখলে—সেদিন তাই এই ছাদের উপর বসে অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলুম—তোমাকেও তো আমি সেই বিয়ের পর আর কখনও দেখি নি। এবার এসেছিলুম ভাগ্যিস, তাই দেখাটা হল।

হাসির ভঙ্গি ঠিক অপর্ণাব মতো, মুখের কত কি ভাব, ঠিক তাহারই মতো—বিস্মৃতির জগৎ হইতে সে-ই যেন আবাব ফিরিয়া আসিয়াছে!

মনোবমা অনুযোগ করিয়া বলিলেন—তুমি তো দিদি বলে খোঁজও করো না ভাই। এবার পুজোর সময় বরিশালে যেয়ো—বলা রইল, মাথার দিব্যি। আর তোমার ঠিকানাটা আমায় লিখে দিয়ো তো।

কোথা হইতে কাজল আসিয়া বলিল—বাবা একটা অর্থ জানো?. .

—অর্থ? কি অর্থ?

কাজলের মুখ তাহার অপূর্ব সুন্দর মনে হয়—কেমন একধরনের ঘাড় একধারে বাঁকাইয়া চোখে খুশির হাসি হাসিয়া কথাটা শেষ করে, আবার তখন বোকাব মতোই হাসে—হঠাৎ যেন মুখখানা করুণ ও অপ্রতিভ দেখায়। ঠিক এই সময়েই অপুব মনে ওই স্নেহেব বেদনাটা দেখা দেয়—কাজলের ওই ধরনের মুখভঙ্গিতে।

—-বলো দেখি, বাবা, ‘এখান থেকে দিলাম সাড়া, সাড়া গেল সেই বামুনপাড়া?’ কি অর্থ?

অপু ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল—পাখি।

কাজল ছেলেমানুষি হাসির খই ফুটাইয়া বলিল, ইল্লি! পাখি বুঝি? শাঁক তো—শাঁকের ডাক। তুমি কিচ্ছু জানো না বাবা।

অপু বলিল—ছিঃ বাবা, ওরকম ইল্লি-টিল্লি বোলো না, বলতে নেই ও-কথা, ছিঃ।

—কেন বলতে নেই বাবা?...

—ও ভালো কথা নয়।

আসিবার আগের দিন রাত্রে কাজল চুপি চুপি বলিল—এবার আমায় নিয়ে যাও বাবা, আমার এখানে থাকতে একটুও ভালো লাগে না।

অপু ভাবিল—নিয়েই যাই এবারে, এখানে ওকে কেউ দেখে না, তাছাড়া লেখাপড়াও এখানে থাকলে যা হবে!

পরদিন সকালে ছেলেকে লইয়া সে নৌকায় উঠিল। অপর্ণার তোরঙ্গ ও হাতবাক্সটা এখানে আট-নয় বৎসর পড়িয়া আছে, তাহার বড়ো শালী সঙ্গে দিয়া দিলেন। ইহাদের তুলিয়া দিতে আসিয়া ঘাটে দাঁড়াইয়া চোখের জল ফেলিলেন। অপুকে বার বার বরিশালে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সকালের নবীন রোদ ভাঙা নাটমন্দিরের গায়ে পড়িয়াছে। নদীজল হইতে একটা আমিষ গন্ধ আসিতেছে। শ্বশুর মহাশয়ের তামাক খাওয়ার কয়লা পোড়ানোর জন্য শুকনা ডালপালায় আগুন দেওয়া হইয়াছে নদীর ধারটাতেই। কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়ার রাশ উপরে উঠিতেছে। সকালের বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা। আজ বহু বৎসর আগে যেদিন বন্ধু প্রণবের সঙ্গে বিবাহের নিমন্ত্রণে এ বাটী আসিয়াছিল তখন সে কি ভাবিয়াছিল এই বাড়িটার সহিত তাহার জীবনে এমন একটি অদ্ভুত যোগ সাধিত হইবে, আজও সেদিনটার কথা বেশ স্পষ্ট মনে হয়। মনে আছে, আগের দিন একটা গ্রামোফোনের দোকানে গান শুনিয়াছিল—'বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি।' শুনিযা গানটা মুখস্থ করিয়াছিল ও সারাপথে ও স্টিমারে আপন মনে গাহিয়াছিল। এখনও গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিলে সেই দিনটা আবার ফিরিয়া আসে।

ছেলেকে সঙ্গে লইয়া অপু প্রথমে মনসাপোতা আসিল। বছর ছয়-সাত এখানে আসা ঘটে নাই। এই সময়ে দিনকয়েকের ছুটি আছে, এইবার একবার না দেখিয়া গেলে আর আসা ঘটিবে না অনেকদিন।

ঘরদোরের অবস্থা খুব খারাপ। অপুর মনে পড়িল, ঠিক এই রকম অপরিষ্কার ভাঙা ঘরে এই বালকের মাকে সে একদিন আনিয়া তুলিয়াছিল। তেলিদের বাড়ি হইতে চাবি আনিয়া ঘরের তালা খুলিয়া ফেলিল। খড় নানাস্থানে উড়িয়া পড়িয়াছে, ইঁদুরের গর্ত, পাড়ার গরু-বাছুর উঠিয়া দাওয়া ভাঙিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, উঠানে বনজঙ্গল।

কাজল চারদিকে চাহিয়া চাহিয়া অবাক হইয়া বলিল—বাবা, এইটে তোমাদের বাড়ি!

অপু হাসিয়া বলিল—তোমাদেরও বাড়ি বাবা। মামার বাড়ির কোটা দেখেছ জন্মে অবধি, তাতে তো চলবে না, পৈতৃক সম্পত্তি তোমার এই।

সকালে উঠিয়া একটি খবরে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। নিরুপমা আর নাই। সে গত পৌষ মাসে তীর্থ করিতে গিয়াছিল, পথে কলেরা হয়, সেখানেই মারা যায়। নিরুপমার জ্যাঠা বৃদ্ধ সরকার মহাশয় বলিতেছেন—আর দাদাঠাকুর, তোমরা লেখাপড়া শিখে দেশে তো আর আসবে না? মেয়েটার কথা মনে হলে আর অন্ন মুখে ওঠে না। হল কি জানো, বললে কুড়ুলের পাটে মেলা দেখতে যাব। তার তো জানো পুজো-আচ্চা এক বাতিক ছিল। পাড়ার সবাই যাচ্ছে, আমি বলি, তা যাও। ওমা, তিন দিন পর সকালে খবর এলো নিরু-মা মরো-মরো, শান্তিপুবের পথে একটা দোকানে—কি সমাচার, না কলেরা। গেলুম সবাই ছুটে। পৌঁছুতে সন্ধে হয়ে গেল। আমরা যখন গেলুম তখন বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছে, চিনতে পারলে, চোখ দিয়ে হু-হু জল পড়তে লাগল। দাদাঠাকুর—মা আমার পাড়াসুদ্ধ সবারই উপকার করে বেড়াত—তুমি সবই জানো—আর অসুখ দেখে সেই পাড়ার লোকই...যারা সঙ্গে ছিল, পথের ধারের একটা দোচালা ভাঙা ঘরে মাকে আমার ফেলে সবাই পালিয়েছে। পাশের দোকানীটা লোক ভালো—সেই একটু দেখাশুনা করেছে। চিকিৎসে হয়নি, পত্তরও হয়নি, বেঘোরে নিরু-মাকে হারালুম।

সরকার-বাড়ি হইতে ফিরিতে একটু বেলা হইয়া গেল। উঠানে পা দিয়া ডাকিল—ও খোকা—কাজল দুপুরে ঘুমাইতেছিল, কখন ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াছে এবং তেলি-বাড়ি হইতে আঁকশি জোগাড় করিয়া আনিয়া উঠানের গাছের চাঁপা ফুল পাড়িবার জন্য নিচের একটা ডালে আঁকশি বাধাইয়া টানাটানি করিতেছে।

দৃশ্যটা তাহার কাছে অদ্ভুত মনে হইল। অপর্ণার পোঁতা সেই চাঁপাফুল গাছটা। কবে তাহার ফুল ধরিয়াছে, কবে গাছটা মানুষ হইয়াছে, গত সাত বৎসরের মধ্যে অপুর সে খোঁজ লওয়ার অবকাশ ছিল না—কিন্তু কেমন করিয়া—

সে বলিল—খোকা ফুল পাড়ছিস তো, গাছটা কে পুঁতেছিল জানিস?

কাজল বাবার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—তুমি এসো না বাবা, ওই ডালটা চেপে ধরো না! মোটে দুটো পড়েছে।

অপু বলিল—কে পুঁতেছিল জানিস গাছটা? তোর মা!

কিন্তু মা বলিলে কাজল কিছুই বোঝে না। জ্ঞান হইয়া অবধি সে দিদিমা ছাড়া আর কাহাকেও চিনিত না, দিদিমাই তাহার সব। মা একটা অবাস্তব কাল্পনিক ব্যাপার মাত্র। মায়ের কথায় তার মনে কোনও বিশেষ সুখ বা দুঃখ জাগায় না।

অনেকদিন পরে মনসাপোতা আসা। সকলেই বাড়িতে ডাকে, নানা সদুপদেশ দেয়। ক্ষেত্র কাপালি অপুকে ডাকিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তা কহিল, দুধ পাঠাইয়া দিল—ঘর ছাইবার জন্য ভড়েরা একগাড়ি উলুখড় দিতে চাহিল।

রাত্রে আবার কি কাজে সরকার-বাড়ির সামনের পথ দিয়া আসিতে হইল। বাড়িটার দিকে যেন চাওয়া যায় না। গোটা মনসাপোতাটা নিরুদির অভাবে ফাঁকা হইয়া গিয়াছে তাহার কাছে। নিরুদি, আজ খোকাকে নিয়ে এসেছি, তুমি এসে ওকে দেখবে না, আদর করবে না, খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেবে না?

রাত্রে অপু আর কিছুতেই ঘুমাইতে পারে না। চোখের সামনে নিরুপমার সেই হাসি-হাসি মুখ, সেই অনুযোগের সুর কানে। আর একটি বার দেখা হয় না তাহার সঙ্গে?

কাজলকে সে কলিকাতায় লইয়া আসিল পরদিন বৈকালের ট্রেনে। সন্ধ্যার পর গাড়িখানা শিয়ালদহ স্টেশনে ঢুকিল। এত আলো, এত বাড়িঘর, এত গাড়িঘোড়া—কি কাণ্ড এ সব! কাজল বিস্ময়ে একেবারে নির্বাক হইয়া গেল। সে শুধু বাবার হাত ধরিয়া চারিদিকে ডাগর চোখে চাহিতে চাহিতে চলিল।

হ্যারিসন রোডের বড়ো বড়ো বাড়িগুলা দেখাইয়া একবার সে বলিল—ওগুলো কাদের বাড়ি, বাবা? অত বাড়ি?

আবার বাসাটায় ঢুকিয়া কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া সে গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া বড়ো রাস্তার গাড়িঘোড়া দেখিতে লাগিল। অবাক-জলপান জিনিসটা কি? বাবার দেওয়া দুটা পয়সা কাছে ছিল, এক পয়সার অবাক-জলপান কিনিয়া খাইয়া সে সত্যই অবাক হইয়া গেল। মনে হইল, এমন অপূর্ব জিনিস সে জীবনে আর কখনও খায় নাই। চাল-ছোলা ভাজা সে অনেক খাইয়াছে। কিন্তু কি মশলা দিয়া ইহারা তৈরি করে এই অবাক-জলপান?

অপু তাহাকে ডাকিয়া বাসার মধ্যে লইয়া গেল—ওরকম একলা কোথাও যাস নে খোকা। হারিয়ে যাবি, কি, কি হবে। যাওয়ার দরকার নেই।

কাজলের দুঃস্বপ্ন কাটিয়া গিয়াছে। আর দাদামশায়ের বকুনি খাইতে হইবে না, একা গিয়া দোতলার ঘরে রাত্রিতে শুইতে হইবে না, মামিমাদের ভয়ে পাতের প্রত্যেক ভাতটি খুঁটিয়া গুছাইয়া খাইতে হইবে না। একটি ভাত পাতের নিচে পড়িয়া গেলে বড়ো মামিমা বলিত—পেয়েছ পরের, দেদার ফেলো আর ছড়াও—বাবার অন্ন তো খেতে হল না কখনও?

ছেলেমানুষ হইলেও সব সময় এই বাবার খোঁটা কাজলের মনে বাজিত—

অপু বাসায় আসিয়া দেখিল, কে একখানা চিঠি দিয়াছে তাহার নামে—অপরিচিত হস্তাক্ষর। আজ পাঁচ-ছয় দিন পত্রখানা আসিয়া চিঠির বাক্সে পড়িয়া আছে। খুলিয়া পড়িয়া দেখিল একজন অপরিচিত ভদ্রলোক তাহাকে লিখিতেছেন তাহার বই পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, শুধু তিনি নহেন, তাঁহার

বাড়িসুদ্ধ সবাই—প্রকাশকের নিকট হইতে ঠিকানা জানিয়া এই পত্র লিখিতেছেন, তিনি তাহার সহিত দেখা করিতে চাহেন।

দু-তিনবার চিঠিখানা পড়িল। এতদিন পরে বোঝা গেল যে, অন্তত একটি লোকেরও ভালো লাগিয়াছে তাহার বইখানা!...

পরের প্রশংসা শুনিতে অপু চিরকালই ভালোবাসে, তবে বহু দিন তাহার অদৃষ্টে সে জিনিসটা জোটে নাই—প্রথম যৌবনের সেই সরল হাম্‌বড়া ভাব বয়সের অভিজ্ঞতার ফলে দূর হইয়া গিয়াছিল, তবুও সে আনন্দের সহিত বন্ধুবান্ধবের নিকট চিঠিখানা দেখাইয়া বেড়াইল।

পরের দিন কাজল চিড়িয়াখানা দেখিল, গড়ের মাঠ দেখিল। মিউজিয়ামের অধুনালুপ্ত সেকালের কচ্ছপের প্রস্তরীভূত বৃহৎ খোলা দুটি দেখিয়া সে অনেকক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। পরে অপু ফিরিয়া যাইতেছে, কাজল বাবার কাপড় ধরিয়া টানিয়া দাঁড় করাইয়া বলিল—শোনো বাবা!—কচ্ছপ দুটোর দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—আচ্ছা, এ দুটোর মধ্যে যদি যুদ্ধ হয় তবে কে জেতে বাবা?...

অপু গম্ভীর মুখে ভাবিয়া ভাবিয়া বলে—ওই বাঁ দিকেরটা জেতে।—কাজলের মনের দ্বন্দ্ব দূর হয়।

কিন্তু গোলদিঘিতে মাছের ঝাঁক দেখিয়া সে সকলের অপেক্ষা খুশি । এত বড়ো বড়ো মাছ আর এত একসঙ্গে! মেলা ছেলেমেয়ে মাছ দেখিতে জুটিয়াছে বৈকালে, সেও বাবার কথায় এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া জলে ছড়াইয়া দিয়া অধীর আগ্রহে মাছের খেলা দেখিতে লাগিল।

—তুমি ছিপে ধরবে বাবা? কত বড়ো বড়ো মাছ?

অপু বলিল—চুপ্ চুপ্—ও মাছ ধরতে দেয় না।

ফুটপাতে একজন ভিখারি বসিয়া। কাজল ভয়ের সুরে বলিল—শিগ্‌গির একটা পয়সা দাও বাবা, নইলে ছুঁয়ে দেবে।—তাহার বিশ্বাস, কলিকাতার যেখানে যত ভিখারি বসিয়া আছে ইহাদেব পয়সা দিতেই হইবে, নতুবা ইহারা আসিয়া ছুঁইয়া দিবে, তখন তোমাকে বাড়ি ফিবিয়া স্নান করিতে হইবে—সে এক মহা হাঙ্গামা।

বর্ষাকালের মাঝামাঝি অপুর চাকরিটি গেল। অর্থের এমন কষ্ট সে অনেক দিন ভোগ কবে নাই। ভালো স্কুলে দিতে না পারিয়া সে ছেলেকে কর্পোরেশনের ফ্রি স্কুলে ভর্তি করিয়া দিল। ছেলেকে দুধ পর্যন্ত দিতে পারে না। বইয়ের বিশেষ কিছু আয় নাই। হাত এদিকে কপর্দক-শূন্য।

কাজলের মধ্যে অপু একটা পৃথক জগৎ দেখিতে পায়। দুটা টিনের চাকতি, গোটা দুই মার্বেল, একটা কল-টেপা খেলনা, মোটর গাড়ি, খান দুই বই—হইতে যে মানুষ কিসে এত আনন্দ পায়—অপু তাহা বুঝিতে পারে না। চঞ্চল ও দুষ্ট ছেলে—পাছে হারাইয়া যায়, এই ভয়ে অপু তাহাকে মাঝে মাঝে ঘরে চাবি দিয়া রাখিয়া নিজের কাজে বাহির হইয়া যায়—এক-একদিন চার-পাঁচ ঘণ্টাও হইয়া যায়—কাজলের কোনো অসুবিধা নেই—সে রাস্তার ধারের জানালাটায় দাঁড়াইয়া পথের লোকজন দেখিতেছে—না হয়, বাবার বইগুলো নাড়িয়া চাড়িয়া ছবি দেখিতেছে—মোটের উপর আনন্দেই আছে।

এই বিরাট নগরীর জীবনস্রোত কাজলের কাছে অজানা দুর্বোধ্য। কিন্তু তাহার নবীন মন ও নবীন চক্ষু যে-সকল জিনিস দেখে ও দেখিয়া আনন্দ পায়—বয়স্ক লোকের ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাহা অতি তুচ্ছ। হয়তো আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলে—দ্যাখো বাবা, ওই চিলটা কিসের ডাল মুখে করে নিয়ে যাচ্ছিল, সামনের ছাদের আলসেতে লেগে ডালটা—ওই দ্যাখো বাবা রাস্তায় পড়ে গিয়েচে—

বাবার সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়া এত ট্রাম, মোটর, লোকজনের ভিড়ের মাঝখানে কোথায় একটা কাক ফুটপাতের ধারে ড্রেনের জলে স্নান করিতেছে তাই দেখিয়া তাহার মহা আনন্দ—তাহা আবার বাবাকে না দেখাইলে কাজলের মনে তৃপ্তি হইবে না। সব বিষয়েই বাবাকে আনন্দের ভাগ না দিতে পারিলে, কাজলের আনন্দ পূর্ণ হয় না। খাইতে খাইতে বেগুনিটা, কি তেলে-ভাজা কচুরিখানা

এক কামড় খাইয়া ভালো লাগিলে বাকি আধখানা বাবার মুখে গুঁজিয়া দিবে—অপুও তাহা তখনই খাইয়া ফেলে—ছিঃ, আমার মুখে দিতে নেই—একথা বলিতে তার প্রাণ কেমন করে—কাজেই পিতৃত্বের গাম্ভীর্যভরা ব্যবধান অকারণে গড়িয়া উঠিয়া পিতা-পুত্রের সহজ সরল মৈত্রীকে বাধা দান করে নাই, কাজল জীবনে বাবার মতো সহচর পায় নাই—এবং অপুও বোধহয় কাজলের মতো বিশ্বস্ত ও একান্ত নির্ভরশীল তরুণ বন্ধু খুব বেশি পায় নাই জীবনে।

আর কি সরলতা!...পথে হয়তো দুজনে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, কাজল বলিল—শোনো বাবা, একটা কথা—শোনো, চুপি চুপি বলব—পরে পথের এদিক ওদিক চাহিয়া লাজুক মুখে কানে কানে বলে—ঠাকুর বড়ো দুটোখানি ভাত দ্যায় হোটেলে—আমার খেয়ে পেট ভরে না—তুমি বলবে বাবা? বললে আর দুটো দেবে না?

দিনকতক গলির একটা হোটেলে পিতাপুত্রে দুজনে খায়—হোটেলের ঠাকুর হয়তো শহরের ছেলের হিসেবে ভাত দেয় কাজলকে—কিন্তু পাড়াগাঁয়ের ছেলে কাজল বয়সের অনুপাতে দুটি বেশি ভাতই খাইয়া থাকে।

অপু মনে মনে হাসিয়া ভাবে—এই কথা আবার কানে কানে বলা! ..রাস্তার মধ্যে ওকে চেনেই বা কে আর শুনছেই বা কে!...ছেলেটা বেজায় বোকা।

আর একদিন কাজল লাজুক মুখে বলিল—বাবা একটা কথা বলব?..

—কি?

—নাঃ বাবা—বলব না—

—বল্ না কি?

কাজল সরিয়া আসিয়া চুপি চুপি লাজুক সুরে বলিল—তুমি মদ খাও বাবা?

অপু বিস্মিত হইয়া বলিল—মদ?...কে বলেছে তোকে?

—সেই যে সেদিন খেলে? সেই রাস্তার মোড়ে একটা দোকান থেকে? পান কিনলে আর সেই যে—

অপু প্রথমটা অবাক হইয়া গিয়াছিল—ফের বুঝিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—দূর বোকা—সে হল লেমনেড্—সেই পানের দোকানে তো?...তোর ঠাণ্ডা লেগেছিল বলে তোকে দিই নি।...খাওয়াব তোকে একদিন, ও একরকম মিষ্টি শরবৎ। দূর—

কাজলের কাছে অনেক ব্যাপার পরিষ্কার হইয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া সে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল যে এখানে মোড়ে মোড়ে মদের দোকান—পান ও মদ একসঙ্গে বিক্রয় হয় প্রায় সর্বত্র। সোডা লেমনেড সে কখনও দেখে নাই ইহার আগে, জানিত না—কি করিয়া সে ধরিয়া লইয়াছে বোতলে ওগুলো মদ। তাই তো সেদিন বাবাকে খাইতে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল—এত দিন লজ্জায় বলে নাই। সেই দিনই অপু তাহাকে লেমনেড খাওয়াইয়া তাহার ভ্রম ঘুচাইয়া দিল।

এই অবস্থায় একদিন সে বিমলেন্দুর পত্র পাইল, একবার আলিপুরে লীলার ওখানে পত্রপাঠ আসিতে। লীলার ব্যাপার সুবিধা নয়। তাহারও আর্থিক অবস্থা বড়ো শোচনীয়। নিজের যাহা কিছু ছিল গিয়াছে, আর কেহ দেয়ও না, বাপের বাড়িতে তাহার নাম করিবার পর্যন্ত উপায় নাই। ইদানীং তাহার মা কাশী হইতে তাহাকে টাকা পাঠাইতেন। বিমলেন্দু নিজের খরচ হইতে বাঁচাইয়া কিছু টাকা দিদির হাতে দিয়া যাইত। তাহার উপর মুশকিল এই যে, লীলা বড়োমানুষের মেয়ে, কষ্ট করা অভ্যাস নাই, হাত ছোট করিতে জানে না।

এই রকম কিছুদিন গেল। লীলা যেন দিন দিন কেমন হইয়া যাইতেছিল। অমন হাস্যমুখী লীলা, তাহার মুখে হাসি নাই, মনমরা বিষণ্ণ ভাব। শরীরও যেন দিন দিন শুকাইয়া যাইতে থাকে। গত বর্ষাকাল এইভাবেই কাটে, বিমলেন্দু পূজার সময় পীড়াপীড়ি করিয়া ডাক্তার দেখায়। ডাক্তারে বলেন, থাইসিসের সূত্রপাত হইয়াছে, সতর্ক হওয়া দরকার।

বিমলেন্দু লিখিয়াছে—লীলার খুব জ্বর। ভুল বকিতেছে, কেহই নাই, সে একা ও একটি চাকর সারারাত জাগিয়াছে, আত্মীয়স্বজন কেহ ডাকিলে আসিবে না, কি করা যায় এ অবস্থায়। অপু এখানে আজকাল তত আসিতে পারে না, অনেকদিন লীলাকে দেখে নাই। লীলার মুখ যেন রাঙা, অস্বাভাবিকভাবে রাঙা ও উজ্জ্বল দেখাইতেছে।

বিমলেন্দু শুষ্কমুখে বলিল—কাল রঘুয়ার মুখে খবর পেয়ে এসে দেখি এই অবস্থা। এখন কি করি বলুন তো? বাড়ির কেউ আসবে না, আমি কাউকে বলতেও যাব না, মাকে একখানা টেলিগ্রাম করে দেব?

অপু বলিল—মা যদি না আসেন?

—কি বলেন? এক্ষুনি ছুটে আসবেন—দিদি-অন্ত প্রাণ। তিনি যে আজ চার বছর কলকাতামুখো হন নি, সে এই দিদির কাণ্ডেই তো। মুশকিল হয়েছে কি জানেন, কাল রাত্রেও বকেছে, শুধু খুকি, খুকি, অথচ তাকে আনানো অসম্ভব।

অপু বলিল,—আর এক কাজ করতে হবে, একজন নার্স আমি নিয়ে আসি ঠিক করে। মেয়েমানুষের নার্সিং পুরুষ দিয়ে হয় না। বোসো তোমরা।

দুই তিন দিনে সবাই মিলিয়া লীলাকে সাবাইয়া তুলিল। জ্ঞান হইলে সে একদিন কেবল অপুকে ঘরের মধ্যে দেখিতে পাইয়া কাছে ডাকিয়া ক্ষীণ সুরে বলিল—কখন এলে অপূর্ব?

রোগ হইতে উঠিয়াও লীলার স্বাস্থ্য ভালো হইল না। শুইয়া আছে তো শুইয়াই আছে, বসিয়া আছে তো বসিয়াই আছে। মাথাব চুল উঠিয়া যাইতে লাগিল। আপন মনে গুম্ হইয়া বসিয়া থাকে, ভালো করিয়া কথাও বলে না, হাসেও না। কোথাও নড়িতে চড়িতে চায় না। ইতিমধ্যে কাশী হইতে লীলার মা আসিলেন। বাপের বাড়ি থাকেন, রোজ মোটরে আসিয়া দু-তিন ঘণ্টা থাকেন—আবার চলিয়া যান। ডাক্তার বলিযাছে, স্বাস্থ্যকর জায়গায় না লইযা গেলে রোগ সারিবে না।

দুপুর বেলাটা—কিন্তু একটু মেঘ করার দরুন রৌদ্র নাই কোথাও। অপু লীলার বাসায় গিযা দেখিল লীলা জানালার ধারে বসিয়া আছে। সে সব সময় আসিতে পারে না, কাজলকে একা বাসায় রাখিয়া আসা চলে না। ভারি চঞ্চল ও রীতিমতো নির্বোধ ছেলে। তাহা ছাড়া রান্নাবান্না ও সমুদয় কাজ করিতে হয় অপুর, কাজলকে দিয়া কুটাগাছটা ভাঙিবার সাহায্য নাই, সে খেলাধুলা লইয়া সারাদিন মহা ব্যস্ত—অপু তাহাকে কিছু করিতে বলেও না, ভাবে—আহা, খেলুক একটু। পুওর মাদারলেস্ চাইল্ড।

লীলা ম্লান হাসিয়া বলিল—এসো।

—এরা কোথায়? বিমলেন্দু কোথায়? মা এখনও আসেন নি?

—বসো। বিমলেন্দু এই কোথায় গেল। নার্স তো নিচে, বোধ হয় খেয়ে একটু ঘুমুচ্ছে।

—তারপর কোথায় যাওয়া ঠিক হল—সেই ধরমপুরেই? সঙ্গে যাবেন কে—

—মা আর বিমল।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করিয়া রহিল। পরে লীলা তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—আচ্ছা অপূর্ব, বর্ধমানের কথা মনে হয় তোমার?

অপু ভাবিল, আহা, কি হয়ে গিয়েছে লীলা!

মুখে বলিল—মনে থাকবে না কেন—খুব মনে আছে।

লীলা অন্যমনস্কভাবে বলিল—তোমরা সেই ওদিকের একটা ঘরে থাকতে—সেই আমি যেতুম—

—তুমি আমাকে একটা ফাউন্টেন পেন দিয়েছিলে মনে আছে লীলা? তখন ফাউন্টেন পেন নতুন উঠেছে।—মনে নেই তোমার?

লীলা হাসিল।

অপু হিসাব করিয়া বলিল—তা ধরো প্রায় আজ বিশ-বাইশ বছর আগেকার কথা।

লীলা খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—অপূর্ব, কেউ মোটরটা কিনবে বলতে পারো, তোমার সন্ধানে আছে?

লীলার অত সাধের গাড়িটা...এত কষ্টে পড়িয়াছে সে!—

লীলা বলিল—আমি সে সব গ্রাহ্য করি নে কিন্তু মা-ও ভাবেন—যাক সে সব কথা। তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে যাবে অপূর্ব?

—কোথায়?

—যেখানে হোক। তোমার সেই পোর্তো প্লাতায়—মনে নেই, সেই যে সমুদ্রের মধ্যে কোন্ ডুবো জাহাজ উদ্ধার করে বলেছিলে সোনা আনবে? সেই যে 'মুকুল'এ পড়ে বলেছিলে?

কথাটা অপুর মনে পড়িল। হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ সেই—ঠিক। উঃ, সে কথা মনে আছে তোমার!

—আমি বলেছিলাম, কেমন করে যাবে? তুমি বলেছিলে, জাহাজ কিনে সমুদ্রে যাবে।

অপু হাসিল। শৈশবের সাধ-আশার নিষ্ফলতা সম্বন্ধে সে কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, লীলাও এ ধরনেব নানা আশা পোষণ করিত, বিদেশে যাইবে, বড়ো আর্টিস্ট হইবে ইত্যাদি—ওর সামনে আর সে কথা বলাব আবশ্যক নাই।

কিন্তু লীলাই আবাব খানিকটা চুপ করিযা থাকিয়া বলিল—যাবে না? যাও যাও—পবে—হি-হি করিয়া হাসিয়া কেমন একটা অদ্ভুত সুরে বলিল—সমুদ্র থেকে সোনা আনবে তো তোমরাই—পোর্তো প্লাতা থেকে, না?...দ্যাখো, এখনও ঠিক মনে কবে রেখেছি—রাখি নি? হি-হি—একটু চা খাবে?

লীলার মুখেব শীর্ণ হাসি ও তাহার বাঁধুনিহারা উদ্‌ভ্রান্ত আলগা ধবনের কথাবার্তা অপুর বুকে তীক্ষ্ণ তীরের মতো বিঁধিল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিল এত ভালোবাসে নাই সে লীলাকে আর কোনো দিন আজ যত বাসিয়াছে।

—দুপুর বেলা চা খাব কি?—সেজন্যে ব্যস্ত হয়ো না লীলা।

লীলা বলিল—তোমার মুখে সেই পুরোনো গানটা শুনি নি অনেকদিন—সেই 'আমি চঞ্চল হে'—গাও তো?

মেঘলা দিনেব দুপুর। বাহিরের দিকে একটা সাহেব-বাড়িব কম্পাউন্ডে গাছের ডালে অনেকগুলি পাখি কলরব করিতেছে। অপু গান আরম্ভ করিল, লীলা জানালার ধারেই বসিয়া বাহিরের দিকে মুখ রাখিয়া গানটা শুনিতে লাগিল। লীলার মনে আনন্দ দিবাব জন্য অপু গানটা দু-তিনবার ফিরাইয়া ফিরাইয়া গাহিল। গান শেষ হইয়া গেল, তবু লীলা জানালাব বাহিরেই চাহিয়া আছে, অন্যমনস্কভাবে যেন কি জিনিস লক্ষ করিতেছে।

খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল। দুজনেই চুপ করিয়া ছিল। হঠাৎ লীলা বলিল—একটা কথার উত্তব দেবে?

লীলার গলার স্বরে অপু বিস্মিত হইল। বলিল—কি কথা?. .

—আচ্ছা, বেঁচে লাভ কি?

অপু এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না—বলিল—এ কথার কি—এ কথা কেন?

—বলো না?...

—না লীলা। এ ধরনের কথাবার্তা কেন? এর দরকার নেই।

—আচ্ছা, একটা সত্যি কথা বলবে?...

—কি বলো?

—আচ্ছা, আমাকে লোকে কি ভাবে?

সেই লীলা! তাহার মুখে এ রকম দুর্বল ধরনের কথাবার্তা, সে কি কখনও স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল! অপু এক মুহূর্তে সব বুঝিল—অভিমানিনী তেজস্বিনী লীলা আর সব সহ্য করিতে পারে, লোকের ঘৃণা তাহার অসহ্য। গত কয়েক বৎসরে ঠিক তাহাই জুটিয়াছে তাহার কপালে। এতদিন সেটা বোঝে নাই—সম্প্রতি বুঝিয়াছে—জীবনের উপর টান হারাইতে বসিয়াছে।

অপুর গলায় যেন একটা ডেলা আটকাইয়া গেল। সে যতদূর সম্ভব সহজ সুরে বলিল—এ ধরনের কথা সে এ পর্যন্ত কোনো দিন লীলার কাছে বলে নাই, কোনও দিন না—দ্যাখো লীলা, অন্য লোকের কথা জানি নে, তবে আমার কথা শুনবে?...আমি তোমাকে আমার চেয়ে অনেক বড়ো তো ভাবিই—অনেকের চেয়ে বড়ো ভাবি—তোমাকে কেউ চেনে নি, চিনলে না, এই কথা ভাবি।—আজ নয় লীলা, এতটুকু বেলা থেকে তোমায় আমি জানি, অন্য লোকে ভুল করতে পারে, কিন্তু আমি—

লীলা যেন অবাক হইয়া গেল, কখনও সে এরকম দেখে নাই অপুকে। সে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল—সত্যি বলছ?—কিন্তু অপুর মুখ দেখিয়া হয়তো বুঝিল প্রশ্নটা অনাবশ্যক। পরক্ষণেই খেয়ালী অপু আর একটা কাজ করিয়া বসিল—এটাও সে ইহার আগে কখনও করে নাই—লীলার খুব কাছে সরিয়া গিয়া তার ডান হাতখানা নিজের দুহাতের মধ্যে লইয়া লীলাকে নিজের দিকে টানিয়া তার মুখ ফিরাইল। পরে গভীর স্নেহে তার উত্তপ্ত ললাটে, কানের পাশের চূর্ণ কুন্তলে হাত বুলাইতে বুলাইতে দৃঢ়স্বরে বলিল—তুমি আমি ছেলেবেলার সাথী, লীলা—আমরা কেউ কাউকে ভুলব না—কোনো অবস্থাতেই না। এতদিন ভুলি নি-ও কখনও লীলা।

লীলার সারাদেহ শিহরিয়া উঠিল...যাহা আজ অপুর মুখে, কথার সুরে ডাগর চোখের অকপট দৃষ্টিতে পাইল—জীবনে কোনো দিন কাহারও কাছ হইতে তাহা সে কখনও পায় নাই—আজ সে দেখিল অপুকে সে চিরকাল ভালোবাসিয়া আসিয়াছে—বিশেষ করিয়া অপুর মাতৃবিয়োগের পর লালদীঘির সামনের ফুটপাতে তাকে যেদিন শুষ্কমুখে নিরাশ্রয় ভাবে বেড়াইতে দেখিয়াছিল—সেদিনটি হইতে।

...অপুর চমক ভাঙিল—লীলা কখন তাহার বক্ষে মুখ লুকাইয়াছিল—তাহার অশ্রুপ্লাবিত পাণ্ডুর মুখখানি।...

অপু বাহিরে চলিয়া আসিল—সে অনুভব করিতেছিল, লীলার মতো সে কাহাকেও ভালোবাসে না—সেই গভীর অনুকম্পামিশ্রিত ভালোবাসা, যা মানুষকে সব ভুলাইয়া দেয়, আত্মবিসর্জনে প্রণোদিত করে।

লীলাকে যে করিয়া হউক সে সুখী করিবে। লীলাকে এতটুকু কষ্টে পড়িতে দিবে না; নিজেকে ছোট ভাবিতে দিবে না। যাহার ইচ্ছা লীলাকে ছাড়ুক, সে লীলাকে ছাড়িতে পারিবে না। সে লীলাকে কোথাও লইয়া যাইবেই—এ অবস্থায় কলিকাতায় থাকিলে লীলা বাঁচিবে না। বিশ্ব একদিকে—লীলার মুখের অনুরোধ আর একদিকে।

সারাপথ ভাবিতে ভাবিতে ফিরিল।

দিন তিনেক পরে।

বেলা আটটা। অপু সকালে স্নান সারিয়া কাজলকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইবে—এমন সময়ে মিঃ লাহিড়ীর ছোট নাতি অরুণ ঘরে ঢুকিল—এককোণে ডাকিয়া লইয়া চুপি চুপি উত্তেজিত সুরে বলিল—শিগ্‌গির আসুন, দিদি কাল রাত্রে বিষ খেয়েছে।

বিষ! সর্বনাশ!—লীলা বিষ খাইয়াছে!

কাজলকে কি করা যায়?—খোকা তুই—বরং—ঘরে থাক একা। আমি একটা কাজে যাচ্ছি। দেরি হবে ফিরতে।

কিন্তু কাজলের চোখে ধুলা দেওয়া অত সহজ নয়। কেন বাবা? কি কাজ? কোথায়? কত

দেরি হইতে পারে?...কোনোমতে ভুলাইয়া তাহাকে রাখিয়া দুজনে ট্যাক্সি ধরিয়া লীলার বাসায় আসিল। আরও দুখানা মোটর দাঁড়াইয়া আছে। ঢুকিতেই লীলাদের বাড়ির ডাক্তার বৃদ্ধ কেদারবাবুর সঙ্গে দেখা। অরুণ ব্যস্তসমস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—কি অবস্থা এখন?

কেদারবাবু বলিলেন—অবস্থা তেমনি। আর একটা ইনজেকশান করেছি। হিলকক সাহেব এলে যে বুঝতে পারি। অপুর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—বড্ড স্যাড ব্যাপার—বড্ড স্যাড। জিনিসটা? মরফিয়া। রাত্রে কখন খেয়েছে, তা তো বোঝা যায় নি, আজ সকালে তাও বেলা হলে তবে টের পাওয়া গেল। কর্নেল হিলকককে আনতে লোক গিয়েছে—তিনি না আসা পর্যন্ত—

অরুণের সঙ্গে সঙ্গে উপরের সেই ঘরটাতে গেল—মাত্র দিন তিনেক আগে যেটাতে বসিয়া সে লীলাকে গান শুনাইয়া গিয়াছে। প্রথমটা কিন্তু সে ঘরে ঢুকিতে পারিল না, তাহার হাত কাঁপিতেছিল, পা কাঁপিতেছিল। ঘরটা অন্ধকার, জানালার পর্দাগুলো বন্ধ, ঘরে বেশি লোক নাই, কিন্তু বারান্দাতে আট-দশজন লোক। সবাই পদ্মপুকুরের বাড়ির।—সবাই চুপি চুপি কথা কহিতেছে, পা টিপিয়া টিপিয়া হাঁটিতেছে। কিছু বিশেষ অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটিয়াছে এখানে, এমন বলিয়া কিন্তু অপুর মনে হইল না। অথচ একজন—যে পৃথিবীর সুখকে এত ভালোবাসিত, আকাঙ্ক্ষা করিত, আশা করিত—উপেক্ষায় মুখ বাঁকাইয়া পৃথিবী হইতে ধীরে ধীরে বিদায় লইতেছে।

সেদিনকার সেই জানালার পাশের খাটেই লীলা শুইয়া। সংজ্ঞা নাই, পাণ্ডুর, কেমন যেন বিবর্ণ ঠোঁট ঈষৎ নীল। একখানা হাত খাটের বাহিরে ঝুলিতেছিল—সে তুলিয়া দিল। গায়ে রেশমের বরফি-কাটা বিলাতী লেপ। কি অপূর্ব যে দেখাইতেছে লীলাকে! ...মরণাহত মৃত্যুপাণ্ডুর মুখের সৌন্দর্য যেন এ পৃথিবীর নয়—কিংবা হরিদ্রাভ হাতির দাঁতে খোদাই মুখ যেন। দেবীর মতো সৌন্দর্য আরও অপার্থিব হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার মনে হইল লীলা ঘামিতেছে। তবে বোধ হয় আর ভয় নাই, বিপদ কাটিয়া গিযাছে। চুপি চুপি বলিল—ঘামছে কেন?

ডাক্তারবাবু বলিলেন—ওটা মরফিয়ার সিম্‌টম্‌।

মিনিট দশ কাটিল। অপু বাহিরের বারান্দাতে আসিয়া দাঁড়াইল। পাশেব ঘবে লোকেরা একবার ঢুকিতেছে, আবার বাহির হইতেছে, অনেকেই আসিয়াছে, কেবল মিঃ লাহিড়ী ও লীলার মা নাই। মিঃ লাহিড়ী দার্জিলিং-এ, লীলার মা মাত্র কাল এখান হইতে বর্ধমানে কি কাজে গিয়াছেন। লীলা সত্যই অভাগিনী!

এমন সময় নিচে একটা গোলমাল। একখানা গাড়ির শব্দ উঠিল। ডাক্তার সাহেব আসিয়াছেন—তিনি উপরে উঠিয়া আসিলেন, পিছনে কেদারবাবু ও বিমলেন্দু। অনেকেই ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিল, কেদারবাবু নিষেধ করিলেন। মিনিট সাতেক পরে ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন—Too late, কোনও আশা নাই।

আরও আধঘণ্টা। এত লোক।—অপু ভাবিল, ইহারা এতকাল কোথায় ছিল? আজ Too late,! Too late,!...

লীলা মারা গেল বেলা দশটায়। অপু তখন খাটের পাশেই দাঁড়াইয়া। এতক্ষণ লীলা চোখ বুজিয়াই ছিল, সে সময়টা হঠাৎ চোখ মেলিয়া চাহিল—তারাগুলা বড়ো বড়ো, তাহার দিকেও চাহিল, অপুর দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল—লীলা তাহাকে চিনিয়াছে বোধ হয়। ...কিন্তু পরক্ষণেই দেখিল—দৃষ্টি অর্থহীন, আভাহীন, উদাসীন, অস্বাভাবিক। তারপরই লীলা যেন চোখ তুলিয়া কড়িকাঠে, সেখান হইতে আরও অস্বাভাবিকভাবে মাথার শিয়রে কার্নিসের বিটের দিকে ইচ্ছা করিয়াই কি দেখিবার জন্য চোখ ঘুরাইল—স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ ওরকম চোখ ঘুরাইতে পারে না।

তারপরেই সবাই ঘরের বাহির হইয়া আসিল। কেবল বিমলেন্দু ছেলেমানুষের মতো চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অপুও ফিরিল। হায়রে পাপ, হায় পুণ্য! কে মানদণ্ডে তৌল করিবে? মূর্খ...মূর্খ...মূর্খ...মূর্খ লীলার বিচার করিবে কে? এই সব মূর্খের দল? দুঃখের মধ্যে তাহার হাসি আসিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কাজল এই কয়মাসেই বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছে। বাড়িতেই পড়ে—অনেক সময় নিজের বই রাখিয়া বাবার বইগুলির পাতা উলটাইয়া দেখে। আজকাল বাবা কি কাজে প্রায় সর্বদাই বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, এইজন্য বাবার কাজও সে অনেক করে।

বাসায় অনেকগুলো বিড়াল জুটিয়াছে। সে যখন প্রথম আসিয়াছিল তখন ছিল একটা মাত্র বিড়াল—এখন জুটিয়াছে আরও গোটা তিন। কাজল খাইতে বসিলেই পাতের কাছে সবগুলা আসিয়া জোটে। তাহারা ভাত খায় না, খায় শুধু মাছ। কাজল প্রথমে ভাবে কাহাকেও সে এক টুকরাও দিবে না—করুক মিউ মিউ। কিন্তু একটু পরে একটা অল্পবয়সের বিড়ালের উপর বড়ো দয়া হয়। এক টুকরা তাহাকে দিতেই অন্য সবগুলা করুণসুরে ডাক শুরু করে—কাজল ভাবে—আহা, ওরা কি বসে বসে দেখবে—দিই ওদেরও একটু একটু। একে ওকে দিতে কাজলের মাছ প্রায় সব ফুরাইয়া যায়। বাঁড়ুজ্যেদের ছেলে অনু একটা বিড়ালছানাকে রাস্তার উপর দিয়া যে ইঞ্জিন যায়, ওরই তলায় ফেলিয়া দিয়াছিল—ভাগ্যে সেটা মরে নাই—যে ইঞ্জিন চালায়, সে তৎক্ষণাৎ থামাইয়া ফেলে। কাজল আজকাল একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সে বিড়ালগুলির থাকিবার জায়গা করিয়া দিয়াছে।

রাত্রে শুইয়াই কাজল অমনি বলে,—গল্প বলো বাবা। আচ্ছা বাবা, ওই যে রাস্তায় ইঞ্জিন চালায় যারা, ওরা কি যখন হয় থামাতে পারে, যেদিকে ইচ্ছে চালাতে পারে? সে মাঝে মাঝে গলির মুখে দাঁড়াইয়া বড়ো রাস্তার স্টিম রোলার চালাইতে দেখিয়াছে। যে লোকটা চালায় তাহার উপর কাজলের মনে মনে হিংসা হয়। কি মজা ওই কাজ করা! যখন খুশি চালানো, যতদূর হয়, যখন খুশি থামানো। মাঝে মাঝে সিটি দেয়, একটা চাকা বসিয়া বসিযা ঘোরায়। সব চুপ কবিয়া আছে, সামনেব একটা ডাণ্ডা যাই টেপে অমনি ঘটাং ঘটাং বিকট শব্দ।

এই সময়ে অপুর হঠাৎ অসুখ হইল। সকালে অন্য দিনেব মতো আর বিছানা হইতে উঠিতেই পারিল না—বাবা সকালে উঠিয়া মাদুর পাতিয়া বসিয়া তামাক খায়, কাজলের মনে হয় সব ঠিক আছে—কিন্তু আজ বেলা দশটা বাজিল, বাবা এখনও শুইয়া—জগৎটা যেন আর স্থিতিশীল নয়, নিত্য নয়—সব কি যেন হইয়া গিয়াছে। সেই রোদ উঠিয়াছে, কিন্তু রোদের চেহারা অন্য রকম, গলিটার চেহারা অন্য রকম, কিছু ভালো লাগে না, বাবার অসুখ এই প্রথম, বাবাকে আর কখনও সে অসুস্থ দেখে নাই—কাজলের ক্ষুদ্র জগতে সব যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। সারা দিনটা কাটিল, বাবার সাড়া নাই, সংজ্ঞা নাই—জ্বরে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া। কাজল পাঁউরুটি কিনিয়া আনিয়া খাইল। সন্ধ্যা কাটিয়া গেল। কাজল পরমানন্দ পানওয়ালার দোকান হইতে তেল পুরিয়া আনিয়া লণ্ঠন জ্বালিল। বাবা তখনও সেই রকমই শুইয়া। কাজল অস্থির হইয়া উঠিল—তাহার কোনও অভিজ্ঞতা নাই এ-সব বিষয়ে, কি এখন সে করে? দু-একবার বাবার কাছে গিয়া ডাকিল, জ্বরের ঘোরে বাবা একবার বলিয়া উঠিল—স্টোভটা নিয়ে আয়, ধরাই খোকা—স্টোভটা—

অর্থাৎ সে স্টোভটা ধরাইয়া কাজলকে রাঁধিয়া দিবে।

কাজল ভাবিল, বাবাও তো সারাদিন কিছু খায় নাই—স্টোভ ধরাইয়া বাবাকে সাবু তৈরি করিয়া দিবে। কিন্তু স্টোভ সে ধরাইতে জানে না, কি করে এখন? স্টোভটা ঘরের মেঝেতে লইয়া দেখিল তেল নাই। আবার পরমানন্দের দোকানে গেল। পরমানন্দকে সব কথা খুলিয়া বলিল। পাশেই একজন নতুন-পাশকরা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের ডিসপেনসারি। ডাক্তারটি একেবারে নতুন, একা

ডাক্তারখানায় বসিয়া কড়িবরগা গুনিতেছিলেন, তিনি তাহাদের সঙ্গে বাসায় আসিলেন, অপুকে ডাকিয়া তাহার হাত ও বুক দেখিলেন, কাজলকে ঔষধ লইবার জন্য ডাক্তারখানায় আসিতে বলিলেন। অপু তখন একটু ভালো—সে ব্যস্তসমস্ত হইয়া ক্ষীণসুরে বলিল—ও পারবে না, রাত্তিরে এখন থাক, ছেলেমানুষ, এখন থাক—

এই সবের জন্য বাবার উপর রাগ হয় কাজলের। কোথায় সে ছেলেমানুষ, সে বড়ো হইয়াছে। কোথায় সে না যাইতে পারে, বাবা পাঠাইয়া দেখুক দিকি সে কেমন পারে না? বিশেষত অপরের সামনে তাহাকে কচি বলিলে, ছেলেমানুষ বলিলে, আদর করিলে বাবার উপর তাহার ভারি রাগ হয়।

বাবার সামনে স্টোভ ধরাইতে গেলে কাজল জানে বাবা বারণ করিবে, বলিবে—উঁহু। করিস নে খোকা, হাত পুড়িয়ে ফেলবি। সে সরু বারান্দাটার এক কোণে স্টোভটা লইয়া গিয়া কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও সেটা জ্বালিতে পারিল না। অপু একবার বলিল—কি কচ্ছিস্ ও খোকা, কোথায় গেলি ও খোকা?—আঃ, বাবার জ্বালায় অস্থির!...ঘরে আসিয়া বলিল—বাবা কি খাবে? মিছরি আর বিস্কুট কিনে আনব? অপু বলিল—না না, সে তুই পারবি নে। আমি খাবো না কিছু। লক্ষ্মী বাবু, কোথাও যেয়ো না ঘর ছেড়ে, রাত্তিরে কি কোথাও যায়? হাবিয়ে যাবি—

হ্যাঁ, সে হারাইয়া যাইবে! ছাড়িয়া দিলে সে সব জায়গায় যাইতে পারে, পৃথিবীর সর্বত্র একা যাইতে পারে, বাবার কথা শুনিলে তাহার হাসি পায়।

পরদিন সকালে উঠিয়া কাজল প্রথমে ঔষধ আনিল। বাবার জন্য ফুটপাতের দোকান হইতে খেজুর ও কমলালেবু কিনিল। একটু দূরের দুধের দোকান হইতে জ্বাল দেওয়া গরম দুধও কিনিয়া আনিল। দুধেব ঘটি হাতে ছেলে ফিরিলে অপু বলিল—কথা শুনবি নে খোকা? দুধ আনতে গেলি রাস্তা পাব হয়ে সেই আমহার্স্ট স্ট্রীটের দোকানে? এখন গাড়ি ঘোড়ার বড়ো ভিড়—যেযো না বাবা—দে বাকি পযসা।

খুচরা পযসা না থাকায ছেলেকে সকালে ঔষধের দামের জন্য একটা টাকা দিযাছিল, কাজল টাকাটা ভাঙাইযা এগুলি কিনিয়াছে, নিজে মাত্র এক পয়সাব বেগুনি খাইয়াছিল, (তেলে-ভাজা খাবাবেব উপব তাহার বেজায় লোভ) বাকি পয়সা বাবার হাতে ফেবত দিল।

অপু বলিল—একখানা পাঁউরুটি নিয়ে আয়, ওই দুধেব আমি অতটা তো খাবো না, তুই অর্ধেকটা রুটি দিয়ে খা—

—না বাবা, এই তো কাছেই হোটেল, আমি ওখানে গিয়ে—

—না, না, সেও তো রাস্তা পার হয়ে, আপিসের সময় এখন, মোটবেব ভিড়, এবেলা ওই খাও বাবা, আমি তোমাকে ওবেলা দুটো রেঁধে দেবো।

কিন্তু দুপুরের পর অপুর আবার খুব জ্বর আসিল। রাত্রের দিকে এত বাড়িল, আব কোনও সংজ্ঞা রহিল না। কাজল দোরে চাবি দিয়া ছুটিযা আবার ডাক্তারেব কাছে গেল। ডাক্তাব আবার আসিলেন, মাথায় জলপটির ব্যবস্থা দিলেন, ঔষধও দিলেন। জিজ্ঞাসা কবিলেন—এখানে—আর কেউ থাকে না? তোমরা দুজনে মোটে? অসুখ যদি বাড়ে, তবে বাড়িতে টেলিগ্রাম করে দিতে হবে। দেশে কে আছে?

—দেশে কেউ নেই। আমার মা তো নেই। ...আমি আর বাবা শুধু—

—মুশকিল। তুমি ছেলেমানুষ কি করবে? হাসপাতালে দিতে হবে তা হলে, দেখি আজ রাতটা—

কাজলের প্রাণ উড়িয়া গেল। হাসপাতাল! সে শুনিয়াছে সেখানে গেলে মানুষ আর ফেরে না! বাবার অসুখ কি এত বেশি যে, হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে?

ডাক্তার চলিয়া গেল। বাবা শুইয়া আছে—শিয়রের কাছে আধভাঙা ডালিম, গোটাকতক লেবুর কোয়া। পালং শাকের গোড়া বাবা খাইতে ভালোবাসে, বাজার হইতে সেদিন পালং শাকের

গোড়া আনিয়াছিল, ঘরের কোণে চুপড়িতে শুকাইতেছে—বাবা যদি আর না ওঠে? না রাঁধে? কাজলের গলায় কিসের একটা ডেলা ঠেলিয়া উঠিল। চোখ ফাটিয়া জল আসিল—ছোট বারান্দাটার এক কোণে গিয়া সে আকুল হইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। ভগবান বাবাকে সারাইয়া তোল, পালং শাকের গোড়া বাবাকে খাইতে না দেখিলে সে বুক ফাটিয়া মরিয়া যাইবে—ভগবান, বাবাকে ভালো করিয়া দাও।

মেজেতে তাহার পড়িবার মাদুরটা পাতিয়া সে শুইয়া পড়িল। ঘরে লণ্ঠনটা জ্বালিয়া রাখিল—একবার নাড়িয়া দেখিল কতটা তেল আছে, সারারাত জ্বলিবে কি না। অন্ধকারে তাহার বড়ো ভয়—বিশেষ বাবা আজ নড়ে না, চড়ে না, কথাও বলে না।

দেয়ালে কিসের সব যেন ছায়া! কাজল চক্ষু বুজিল।

মাসদেড় হইল অপু সারিয়া উঠিয়াছে। হাসপাতালে যাইতে হয় নাই, এই গলিরই মধ্যে বাঁড়ুজ্যেরা বেশ সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ, তাঁহাদের এক ছেলে ভালো ডাক্তার। তিনি অপুর বাড়িওয়ালার মুখে সব শুনিয়া নিজে দেখিতে আসিলেন—ইনজেকশনের ব্যবস্থা করিলেন, শুশ্রূষার লোক দিলেন, কাজলকে নিজের বাড়ি হইতে খাওয়াইয়া আনিলেন। উহাদের বাড়িব সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ হইয়া গয়াছে।

চৈত্রের প্রথম। চাকুরি অনেক খুঁজিয়াও মিলিল না। তবে আজকাল লিখিয়া কিছু আয় হয়।

সকালে একদিন অপু মেজেতে মাদুর পাতিয়া বসিয়া কাজলকে পড়াইতেছে, একজন কুড়ি-বাইশ বছরের চোখে-চশমা ছেলে দোরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আজ্ঞে আসতে পারি?—আপনারই নাম অপূর্ববাবু? নমস্কার—

—আসুন, বসুন বসুন। কোত্থেকে আসছেন?

—আজ্ঞে, আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। আপনার বই পড়ে আপনার সঙ্গে দেখা কবতে এলুম। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব সবাই এত মুগ্ধ হয়েছে, তাই আপনার ঠিকানা নিয়ে—

অপু খুব খুশি হইল—বই পড়িযা এত ভালো লাগিয়াছে যে, বাড়ি খুঁজিয়া দেখা কবিতে আসিয়াছে একজন শিক্ষিত তরুণ যুবক। এ তার জীবনে এই প্রথম!

ছেলেটি চাবিদিকে চাহিযা বলিল—আজ্ঞে, ইয়ে, এই ঘরটাতে আপনি থাকেন বুঝি?

অপু একটু সংকুচিত হইয়া পড়িল, ঘরের আসবাবপত্র অতি হীন, ছেঁড়া মাদুরে পিতাপুত্রে বসিয়া পড়িতেছে। খানিকটা আগে কাজল ও সে দুজনে মুড়ি খাইয়াছে, মেঝের খানিকটাতে তার চিহ্ন। সে ছেলের ঘাড়ে সব দোষটা চাপাইয়া সলজ্জ সুবে বলিল—তুই এমন দুষ্টু হয়ে উঠ্‌ছিস খোকা, রোজ রোজ তোকে বলি খেয়ে অমন করে ছড়াস নে—তা তোর—আর বাটিটা অমন দোরের গোড়ায়—

কাজল এ অকারণ তিরস্কারের হেতু না বুঝিয়া কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল—আমি কই বাবা, তুমিই তো বাটিটাতে মুড়ি—

—আচ্ছা, আচ্ছা, থাম্, লেখ, বানানগুলো লিখে ফেল্।

যুবকটি বলিল—আমাদের মধ্যে আপনার বই নিয়ে খুব আলোচনা—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওবেলা বাড়িতে থাকবেন? 'বিভাবরী' কাগজের এডিটার শ্যামাচরণবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, আমি—আরও তিন-চারজন সেই সঙ্গে আসব।—তিনটে? আচ্ছা, তিনটেতেই ভালো।

আরও খানিক কথাবার্তার পর যুবক বিদায় লইলে অপু ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল,—উস্-স্-স্-স্, খোকা?

ছেলে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কব না বাবা—

—না বাপ আমার, লক্ষ্মী আমার, রাগ কোরো না। কিন্তু কি করা যায় বল তো?

—কি বাবা?

—তুই এক্ষুনি ওঠ্, পড়া থাক এবেলা, এই ঘরটা ঝেড়ে বেশ ভালো করে সাজাতে হবে—আর ওই তোর ছেঁড়া জামাটা তক্তপোশের নিচে লুকিয়ে রাখ্ দিকি!—ওবেলা 'বিভাবরী'র সম্পাদক আসবে—

—বিভাবরী কি বাবা?

—'বিভাবরী' কাগজ রে পাগল, কাগজ—দৌড়ে যা তো পাশের বাসা থেকে বালতিটা চেয়ে নিয়ে আয় তো!

বৈকালের দিকে ঘরটা একরকম মন্দ দাঁড়াইল না! তিনটার পরে সবাই আসিলেন। শ্যামাচরণবাবু বলিলেন—আপনার বইটার কথা আমার কাগজে যাবে আসছে মাসে। ওটাকে আমিই আবিষ্কার করেছি মশাই! আপনার লেখা গল্পটল্প? দিন না।

পরের মাসে 'বিভাবরী' কাগজে তাহার সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার গল্পটাও বাহির হইল। শ্যামাচরণবাবু ভদ্রতা করিয়া পঁচিশটি টাকা গল্পের মূল্যস্বরূপ লোক মারফত পাঠাইয়া দিয়া আর একটা গল্প চাহিয়া পাঠাইলেন।

অপু ছেলেকে প্রবন্ধটি পড়িতে দিয়া নিজে চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া শুনিতে লাগিল। কাজল খানিকটা পড়িয়া বলিল—বাবা এতে তোমার নাম লিখেছে যে!

অপু হাসিয়া বলিল—দেখেছিস খোকা, লোকে কত ভালো বলেছে আমাকে? তোকেও একদিন ওই রকম বলবে, পড়াশুনো করবি ভালো করে, বুঝলি?

দোকানে গিয়া শুনিল 'বিভাবরী'-তে প্রবন্ধ বাহির হইবার পরে খুব বই কাটিতেছে—তাহা ছাড়া তিন বিভিন্ন স্থান হইতে তিনখানি পত্র আসিয়াছে। বইখানার অজস্র প্রশংসা!

একদিন কাজল বসিয়া পড়িতেছে, সে ঘরে ঢুকিয়া হাত দুখানা পিছনের দিকে লুকাইয়া বলিল,—খোকা, বল্ তো হাতে কি?...কথাটা বলিয়াই মনে পড়িয়া গেল, শৈশবে একদিন তাহার বাবা—সেও এমনি বৈকাল বেলাটা—তাহার বাবা এইভাবেই, ঠিক এই কথা বলিয়াই খবরের কাগজের মোড়কটা তাহার হাতে দিয়াছিল! জীবনের চক্র ঘুবিয়া ঘুরিয়া কি অদ্ভুতভাবেই আবর্তিত হইতেছে, চিরযুগ ধরিয়া! কাজল ছুটিয়া গিয়া বলিল,—কি বাবা, দেখি?—পরে বাবার হাত হইতে জিনিসটা লইয়া দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া উঠিল। অজস্র ছবিওয়ালা আরব্য উপন্যাস! দাদামশায়ের বইয়ে তো এত রঙিন ছবি ছিল না? নাকের কাছে ধরিয়া দেখিল কিন্তু তেমন পুরানো গন্ধ নাই, সেই এক অভাব।

অনেক দিন পরে হাতে পয়সা হওয়াতে সে নিজের জন্য একরাশ বই ও ইংরেজি ম্যাগাজিন কিনিয়া আনিয়াছে।

পরদিন সে বৈকালে তাহার এক সাহেব বন্ধুর নিকট হইতে একখানা চিঠি পাইয়া গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। সাহেবের বাড়ি কানাডায়, চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বয়স, নাম অ্যাশবার্টন। হিমালয়ের জঙ্গলে গাছপালা খুঁজিতে আসিয়াছে, ছবিও আঁকে। ভারতবর্ষে এই দুইবার আসিল। স্টেটসম্যানে তাঁহার লেখা হিমালয়ের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা পড়িয়া অপু হোটেলে গিয়া মাস-দুই পূর্বে লোকটির সঙ্গে আলাপ করে। এই দু-মাসের মধ্যে দুজনের বন্ধুত্ব খুব জমিয়া উঠিয়াছে।

সাহেব তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ফ্লানেলের ঢিলা সুট পরা, মুখে পাইপ, খুব দীর্ঘকায়, সুশ্রী মুখ, নীল চোখ, কপালের উপরের দিকের চুল খানিকটা উঠিয়া গিয়াছে। অপুকে দেখিয়া হাসিমুখে আগাইয়া আসিল, বলিল—দেখো, কাল একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। ওরকম কোনদিন হয় নি। কাল একজন বন্ধুর সঙ্গে মোটরে কলকাতার বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলুম। একটা জায়গায়

গিয়ে বসেছি, কাছে একটা পুকুর, ও-পারে একটা মন্দির, এক সার বাঁশগাছ, আর তালগাছ, এমন সময়ে চাঁদ উঠল, আলো আর ছায়ার কি খেলা! দেখে আর চোখ ফেরাতে পারিনে! মনে হল, Ah, this is the East !...The eternal East, অমন দেখি নি কখনও।

অপু হাসিয়া বলিল—And pray, who is the sun?...

অ্যাশবার্টন হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—না, শোন, আমি কাশী যাচ্ছি, তোমাকে না নিয়ে আমি যাব না কিন্তু। আসছে হপ্তাতেই যাওয়া যাক চলো।

কাশী! সেখানে সে কেমন করিয়া যাইবে! কাশীর মাটিতে সে পা দিতে পারিবে না। শত-সহস্র স্মৃতি-জড়ানো কাশী, জীবনের ভাণ্ডারের অক্ষয় সঞ্চয়—ও কি যখন-তখন গিয়া নষ্ট করা যায়!...সেবার পশ্চিম যাইবার সময় মোগলসরাই দিয়া গেল, কিন্তু কাশী যাইবার অত ইচ্ছা সত্ত্বেও যাইতে পারিল না কেন?...কেন, তাহা অপরকে সে কি করিয়া বুঝায়!...

বন্ধু বলিল, তুমি জাভায় এসো না আমার সঙ্গে?...বরোবুদরের স্কেচ আঁকব, তা ছাড়া মাউন্ট শ্যালাকের বনে যাব। ওয়েস্ট জাভাতে বৃষ্টি কম হয় বলে ট্রপিক্যাল ফরেস্ট তত জমকালো নয়, কিন্তু ইস্ট জাভার বন দেখলে তুমি মুগ্ধ হবে, তুমি তো বন ভালোবাস, এসো না!...

বন্ধুর কাছে লীলাদের বাড়ি অনেকদিন আগে দেখা বিয়াত্রিচে দান্তের সেই ছবিটা। অপু বলিল—বতিচেলির, না?

—না। আগে বলত লিওনার্ডোর—আজকাল ঠিক হয়েছে অ্যাম্ব্রোজো ডা প্রেডিস-এর, বতিচেলির কে বললে?

লীলা বলিয়াছিল। বেচারি লীলা!

সপ্তাহের শেষে কিন্তু বন্ধুটির আগ্রহ ও অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহাকে কাশী রওনা হইতে হইল। কাশীতে পরদিন বেলা বারোটার সময় পৌঁছিয়া বন্ধুকে ক্যান্টনমেন্টের এক সাহেবি হোটেলে তুলিয়া দিল ও নিজে একা করিয়া শহরে ঢুকিয়া গোধুলিয়ার মোড়ের কাছে 'পার্বতী আশ্রমে' আসিয়া উঠিল।

গোধুলিয়ার মোড় হইতে একটু দূরে সেই বালিকা বিদ্যালয়টা আজও আছে। ইহারই একটু দূরে তাহাদের সেই স্কুলটা! কোথায়? একটা গলির মধ্যে ঢুকিল। এখানেই কোথায় যেন ছিল। একটা বাড়ি সে চিনিল। তাহার এক সহপাঠী এই বাড়িতে থাকিত—দু-একবার তাহার সঙ্গে এখানে আসিয়াছিল। বাসা নয়, নিজেদের বাড়ি। একটি বাঙালি ভদ্রলোক শশা কিনিতেছিলেন—সে জিজ্ঞাসা করিল—এই বাড়িতে প্রসন্ন বলে একটা ছেলে আছে—জানেন?—ভদ্রলোক বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—প্রসন্ন? ছেলে! অপু সামলাইয়া বলিল—ছেলে না, মানে এই আমাদেরই বয়সি। কথাটা বলিয়া সে অপ্রতিভ হইল—প্রসন্ন বা সে আজ কেহই ছেলে নয়—আর তাহাদের ছেলে বলা চলে না—একথা মনে ছিল না। প্রসন্নর ছেলে-বয়সের মূর্তিই মনে আছে কি না! প্রসন্ন বাড়ি নাই, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল সে আজকাল চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ের বাপ।

স্কুলটা কোথায় ছিল চিনিতে পারিল না। একজন লোককে বলিল—মশায়, এখানে 'শুভঙ্করী পাঠশালা' বলে একটা স্কুল কোথায় ছিল জানেন?

—শুভঙ্করী পাঠশালা? কই না, আমি তো এই গলিতে দশ বছর আছি—

—তাতে হবে না, সম্ভবত বাইশ-তেইশ বছর আগেকার কথা।

—ও বসাক মশায়, বসাক মশায়, আসুন একবারটি এদিকে। ওঁকে জিজ্ঞেস করুন, ইনি চল্লিশ বছরের খবর বলতে পারবেন।

বসাক মশায় প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন—বিলক্ষণ! তা আর জানিনে! ওই হরগোবিন্দ শেঠের বাড়িতে স্কুলটা ছিল। ঢুকেই নিচুমতো তো! দুধারে উঁচু রোয়াক?

অপু বলিল—হাঁ—হাঁ ঠিক। সামনে একটা চৌবাচ্চা—

—ঠিক ঠিক—আমাদের আনন্দবাবুর স্কুল! আনন্দবাবু মারাও গিয়েছেন আজ আঠারো-উনিশ বছর। স্কুলও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে। আপনি এসব জানলেন কি করে?

—আমি পড়তুম ছেলেবেলায়। তারপর কাশী থেকে চলে যাই।

একটা বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিল। তাদের বাড়িব মোড়েই। ইহারা তখন সোলার ফুল ও টোপর তৈরি করিয়া বেচিত। অপু বাড়িটার মধ্যে ঢুকিয়া গেল। গৃহিণীকে চিনিল—বলিল, আমাকে চিনতে পারেন? ওই গলির মধ্যে থাকতুম ছেলেবেলায়—আমার বাবা মারা গেলেন?—গৃহিণী চিনিতে পারিলেন। বসিতে দিলেন, বলিলেন—তোমার মা কেমন আছেন?

অপু বলল—তাহার মা বাঁচিয়া নাই।

—আহা! বড়ো ভালোমানুষ ছিল! তোমার মার হাতে—সোডার বোতল খুলতে গিয়ে হাত কেটে গিয়েছিল, মনে আছে?

অপু হাসিয়া বলিল—খুব মনে আছে, বাবার অসুখের সময়!

গৃহিণীর ডাকে বত্রিশ-তেত্রিশ বছরের বিধবা মেয়ে আসিল। বলিলেন—একে মনে আছে? .

—আপনার মেয়ে না? উনি কি জন্যে রোজ বিকেলে জানলার ধারে খাটে শুয়ে কাঁদতেন! তা মনে আছে।

—ঠিক বাবা,—তোমার সব মনে আছে দেখছি। আমার প্রথম ছেলে তখন বছরখানেক মারা গিয়েছে—তোমরা যখন এখানে এলে। তার জন্যই কাঁদত। আহা, সে ছেলে আজ বাঁচলে চল্লিশ বছর বয়েস হত।

একবাব মণিকর্ণিকার ঘাটে গেল। পিতার নশ্বর দেহের রেণু-মেশানো পবিত্র মণিকর্ণিকা!

বৈকালে বহুক্ষণ দশাশ্বমেধ ঘাটে বসিয়া কাটাইল।

ওই সেই শীতলা মন্দিব—ওরই সামনে বাবার কথকতা হইত সে-সব দিনে—সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃদ্ধ বাঙাল কথক ঠাকুরের কথা মনে হইয়া অপুর মন উদাস হইয়া গেল। কোন্ জাদুবলে তাহার বালকহৃদয়েব দুর্লভ স্নেহটুকু সেই বৃদ্ধ চুরি করিয়াছিল—এখন এতকাল পরেও তাহার উপর অপুর সে স্নেহ অক্ষুণ্ণ আছে—আজ তাহা সে বুঝিল।

পরদিন সকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে সে স্নান করিতে নামিতেছে, হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল একজন বৃদ্ধা, একটা পিতলের ঘটিতে গঙ্গাজল ভর্তি করিয়া লইয়া স্নান সারিয়া উঠিতেছেন—চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া সে চিনিল—কলিকাতার সেই জ্যাঠাইমা! সুরেশের মা!...বহুকাল সে আর জ্যাঠাইমাদের বাড়ি যায় নাই, সেই নববর্ষের দিনটার অপমানের পর আর কখনও না। সে আগাইয়া গিয়া পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—চিনতে পারেন জ্যাঠাইমা? আপনারা কাশীতে আছেন নাকি আজকাল!—বৃদ্ধা খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—নিশ্চিন্দিপুরের হরি ঠাকুরপোর ছেলে না?—এসো, এসো, চিরজীবী হও বাবা—আর বাবা চোখেও ভালো দেখিনে—তার ওপর দেখো এই বয়সে একা বিদেশে পড়ে থাকা—ভারী ঘটিটা কি নিয়ে উঠতে পারি? ভাড়াটেদের মেয়ে জলটুকু বয়ে দেয়—তো তার আজ তিনদিন জ্বর—

—ও, আপনিই বুঝি একলা কাশীবাস—সুনীলদাদারা কোথায়?

বৃদ্ধা ভারী ঘটিটা ঘাটের রানার উপর নামাইয়া বলিলেন—সব কলকাতায়, আমায় দিয়েছে ভেন্ন করে বাবা! ভালো ঘর দেখে বিয়ে দিলুম সুনীলের, গুপ্তিপাড়ার মুখুজ্যে—ওমা, বৌ এসে বাবা সংসারের হল কাল—সে সব বলব এখন বাবা—তিন-এর-এক ব্রজেশ্বরের গলি—মন্দিরের ঠিক বাঁ গায়ে—একা থাকি, কারুর সঙ্গে দেখাশুনো হয় না। সুরেশ এসেছিল, পুজোর সময় দুদিন ছিল। থাকতে পারে না—তুমি এসো বাবা, আমার বাসায় আজ বিকেলে, অবিশ্যি অবিশ্যি।

অপু বলিল—দাঁড়ান জ্যাঠাইমা, চট করে ডুব দিয়ে নি, আপনি ঘটিটা ওখানে রাখুন, পৌঁছে দিচ্ছি।

—না বাবা, থাক, আমিই নিয়ে যাচ্ছি, তুমি বললে এই যথেষ্ট হল—বেঁচে থাকো।

তবুও অপু শুনিল না, স্নান সারিয়া ঘটি হাতে জ্যাঠাইমার সঙ্গে তাঁহার বাসায় গেল। ছোট্ট একতলা ঘরে থাকেন—পশ্চিম দিকের ঘরে জ্যাঠাইমা থাকেন, পাশের ঘরে আর একজন প্রৌঢ়া থাকেন—তাঁহার বাড়ি ঢাকা। অন্য ঘরগুলি একটি বাঙালি গৃহস্থ ভাড়া লইয়াছেন, যাঁদের ছোট মেয়ের কথা জ্যাঠাইমা বলিতেছিলেন।

তিনি বলিলেন—সুনীল আমার তেমন ছেলে না। ওই যে হাড়হাভাতে ছোটলোকের ঘরের মেয়ে এনেছিলাম, সংসারটাসুদ্ধ উচ্ছন্ন দিলে। কি থেকে শুরু হল শোন। ও বছর শেষ মাসে নবান্ন করেছি, ঠাকুরঘরের বারকোশে নবান্ন মেখে ঠাকুরদের নিবেদন করে রেখে দিইছি। দুই নাতিকে ডাকছি, ভাবলাম ওদের একটু একটু নবান্ন মুখে দি। বৌটা এমন বদমায়েস, ছেলেদের আমার ঘরে আসতে দিলে না—শিখিয়ে দিয়েছে, ও-ঘরে যাস নি, নবান্নর চাল খেলে নাকি ওদের পেট কামড়াবে। তাই আমি বললাম, বলি হ্যাঁ গা বৌমা, আমি কি ওদের নতুন চাল খাইয়ে মেরে ফেলবার মতলব করছি? তা শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, সেকেলে লোক ছেলেপিলে মানুষ করার কি বোঝে? আমার ছেলে আমি যা ভালো বুঝব করব, উনি যেন তার ওপর কথা না কইতে আসেন। এই সব নিয়ে ঝগড়া শুরু, তারপর দেখি ছেলেও তো বৌমার হয়ে কথা বলে। তখন আমি বললাম, আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও, আমি তোমার সংসারে থাকব না! বৌ রাত্রে কানে কি মন্তর দিয়েছে, ছেলে দেখি তাতেই রাজি। তাহলেই বোঝ বাবা, এত করে মানুষ করে শেষে কিনা আমার কপালে—জ্যাঠাইমার দুই চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

অপু জিজ্ঞাসা করিল—কেন, সুরেশদা কিছু বললেন না?

—আহা, সে আগেই বলি নি? সে শ্বশুরবাড়ির বিষয় পেয়ে সেখানেই বাস করছে, সেই রাজশাহী না দিনাজপুর। সে একখানা পত্র দিয়েও খোঁজ করে না, মা আছে কি মলো। তবে আব তোমাকে বলছি কি? সুরেশ কলকাতায় থাকলে কি আর কথা ছিল বাবা?

অপুকে খাইতে দিয়া গল্প করিতে করিতে তিনি বলিলেন, ও ভুলে গিয়েছি তোমাকে বলতে, আমাদের নিশ্চিন্দিপুরের ভুবন মুখুজ্যের মেয়ে লীলা যে কাশীতে আছে, জানো না?

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—লীলাদি! নিশ্চিন্দিপুরের? কাশীতে কেন?

জ্যাঠাইমা বলিলেন—ওর ভাসুর কি চাকরি করে এখানে। বড়ো কষ্ট মেয়েটার, স্বামী তো আজ ছ'সাত বছর পক্ষাঘাতে পঙ্গু, বড়ো ছেলেটা কাজ না পেয়ে বসে আছে, আরও চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে সবসুদ্ধ, ভাসুরের সংসারে ঘাড় গুঁজে থাকে। যাও না, দেখা করে এসো আজ বিকেলে, কালীতলার গলিতে ঢুকেই বাঁদিকে বাড়িটা।

বাল্যজীবনের সেই রানুদির বোন লীলাদি! নিশ্চিন্দিপুরের মেয়ে। বৈকাল হইতে অপুর দেরি সহিল না, জ্যাঠাইমার বাড়ি হইতে বাহির হইয়াই সে কালীতলার গলি খুঁজিয়া বাহির করিল—সরু ধরনের তেতলা বাড়িটা। সিঁড়ি যেমন সংকীর্ণ তেমনি অন্ধকার, এত অন্ধকার যে পকেট হইতে দেশলাই-এর কাঠি বাহির করিয়া না জ্বালাইয়া সে এই বেলা দুইটার সময়ও পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

একটা ছোট দুয়ার পার হইয়া সরু একটা দালান। একটি দশ-বারো বছরের ছেলের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, এখানে কি নিশ্চিন্দিপুরের লীলাদি আছেন? আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি বলো গিয়ে। অপুর কথা শেষ না হইতে পাশের ঘর হইতে নারীকণ্ঠের প্রশ্ন শোনা গেল, কে রে খোকা? সঙ্গে সঙ্গে একটি পাতলা গড়নের গৌরবর্ণ মহিলা দরজার চৌকাঠে আসিয়া দাঁড়াইলেন, পরনে আধময়লা শাড়ি, হাতে শাঁখা, বয়েস বছর সাঁইত্রিশ, মাথায় একরাশ কালো

চুল। অপু চিনিল, কাছে গিয়া পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিল, চিনতে পারো লীলাদি?

পরে লীলা তাহার মুখের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং চিনিতে পারে নাই দেখিয়া বলিল, 'আমার নাম অপু, বাড়ি নিশ্চিন্দিপুরে ছিল আগে—'

লীলা তাড়াতাড়ি আনন্দের সুরে বলিয়া উঠিল—ও! অপু, হরিকাকার ছেলে! এসো, এসো ভাই, এসো। পরে সে অপুর চিবুক স্পর্শ করিয়া আদর করিল এবং কি বলিতে গিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অদ্ভুত মুহূর্ত! এমন সব অপূর্ব, সুপবিত্র মুহূর্তও জীবনে আসে। লীলাদির ঘনিষ্ঠ আদরটুকু অপুর সারা শরীরে একটা স্নিগ্ধ আনন্দের শিহরণ আনিল। গ্রামের মেয়ে, তাহাকে ছোট দেখিয়াছে, সে ছাড়া এত আপনার জনের মতো অন্তরঙ্গতা কে দেখাইতে পারে? লীলাদি ছিল তাহাদের ধনী প্রতিবেশী ভুবন মুখুজ্যের মেয়ে, বয়সে তাহার অপেক্ষা অনেক বড়ো, অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, তারপরেই শ্বশুরবাড়ি চলিয়া আসিয়াছিল ও সেইখানেই থাকিত। শৈশবে অল্পদিন মাত্র উভয়ের সাক্ষাৎ কিন্তু আজ অপুর মনে হইল লীলাদির মতো আপনার জন সারা কাশীতে আর কেহ নাই। শৈশব স্বপ্নের সেই নিশ্চিন্দিপুর, তারই জলে বাতাসে দু-জনের দেহ পুষ্ট ও বর্ধিত হইয়াছে একদিন।

তারপর লীলা অপুর জন্য আসন আনিয়া পাতিয়া দিল, দালানেই পাতিল, ঘরদোর বেশি নাই, বিশেষ করিয়া পরের সংসার, নিজের নহে। সে নিজে কাছে বসিল, কত খোঁজখবর লইল। অপুর বারণ সত্ত্বেও ছেলেকে দিয়া জলখাবার আনাইল, চা করিয়া দিল।

তারপর লীলা নিজের অনেক কথা বলিল। বড়ো ছেলেটি চৌদ্দ বছরের হইয়া মারা গিয়াছে, তাহার উপর সংসারে এই দুর্দশা। উনি পক্ষাঘাতে পঙ্গু, ভাসুবেব সংসারে চোর হইয়া থাকা, ভাসুর লোক মন্দ নন, কিন্তু বড়ো জা—পায়ে কোটি কোটি দণ্ডবৎ। দুর্দশার একশেষ। সংসারের যত উঞ্ছ কাজ সব তাহার ঘাড়ে, আপন জন কেহ কোথাও নাই, বাপের বাড়িতে এমন কেহ নাই যাহার কাছে দুই দিন আশ্রয় লইতে পারে। সতু মানুষ নয়, লেখাপড়া শেখে নাই, গ্রামে মুদির দোকান করে, পৈতৃক সম্পত্তি একে একে বেচিয়া খাইতেছে—তাহার উপর দুইটি বিবাহ করিয়াছে, একরাশ ছেলেপিলে। তাহার নিজেরই চলে না, লীলা সেখানে আর কি কবিয়া থাকে।

অপু বলিল—দুটো বিয়ে কেন?

—পেটে বিদ্যে না থাকলে যা হয়। প্রথম পক্ষের বৌয়ের বাপের সঙ্গে কি ঝগড়া হল, তাকে জব্দ করার জন্যে আবার বিয়ে করলে। এখন নিজেই জব্দ হচ্ছেন, দুই বৌ ঘাড়ে—তার ওপর দুই বৌয়ের ছেলেপিলে। তার ওপর রানুও ওখানেই কিনা!

—রানুদি? ওখানে কেন?

—তারও কপাল ভালো নয়। আজ বছর সাত-আট বিধবা হয়েছে, তার আর কোনও উপায় নেই, সতুর সংসারেই আছে। শ্বশুরবাড়িতে এক দেওর আছে, মাঝে মাঝে নিয়ে যায়, বেশির ভাগ নিশ্চিন্দিপুরেই থাকে।

অপু অনেকক্ষণ ধরিয়া রানুদির কথা জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিতেছিল, কিন্তু কেন প্রশ্নটা করিতে পারে নাই সে-ই জানে। লীলার কথার পরে অপু অন্যমনস্ক হইয়া গেল। হঠাৎ লীলা বলিল—দ্যাখ্ ভাই অপু, নিশ্চিন্দিপুরের সেই বাঁশবাগানের ভিটে এত মিষ্টি লাগে, কি মধু যে মাখানো ছিল তাতে! ভেবে দ্যাখ্, মা নেই, বাবা নেই, কিছু তো নেই,—তবুও তার কথা ভাবি। সেই বাপের ভিটে আজ দেখি নি এগারো বছর। সেবার সতুকে চিঠি লিখলাম, উত্তর দিলে এখানে কোথায় থাকবে, থাকবার ঘরদোর নেই, পুবের দালান ভেঙে পড়ে গিয়েছে, পশ্চিমের কুঠুরি দুটোও নেই, ছেলেপিলে কোথায় থাকবে,—এই সব একরাশ ওজর। বলি থাক তবে, ভগবান যদি মুখ তুলে চান কোনদিন, দেখব—নয় তো বাবা বিশ্বনাথ তো চরণে রেখেইছেন—

আবার লীলা ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অপু বলিল, ঠিক বলেছ লীলাদি, আমারও গাঁয়ের কথা এত মনে পড়ে! সত্যিই, কি মধুমাখানো ছিল, তাই এখন ভাবি।

লীলা বলিল, পদ্মপাতায় খাবার খাস নি কতদিন বল্ দিকি? এ-সব দেশে শালপাতায় খাবার খেতে খেতে পদ্মপাতার কথা ভুলেই গিইছি, না? আবার এক একদিন এক একটা দোকানে কাগজে খাবার দেয়। সেদিন আমার মেজ ছেলে এনেছে, আমি বলি দূর দূর, ফেলে দিয়ে আয়, কাগজে আবার মিষ্টি খাবার কেউ দেয় আমাদের দেশে?

অপুর সারা দেহ স্মৃতির পুলকে যেন অবশ হইয়া গেল। লীলাদি মেয়েমানুষ কিনা, এত খুঁটিনাটি জিনিসও মনে রাখে। ঠিকই বটে, সেও পদ্মের পাতায় কতকাল খাবার খায় নাই, ভুলিয়াই গিয়াছিল কথাটা। তাহাদের দেশে বড়ো বড়ো বিল, পদ্মপাতা সস্তা, শালপাতার রেওয়াজ ছিল না। নিমন্ত্রণ বাড়িতেও পদ্মপাতাতে ব্রাহ্মণভোজন হইত, লীলাদির কথায় আজ আবার সব মনে পড়িয়া গেল।

লীলা চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তুই কতদিন যাস নি সেখানে অপু? তেইশ বছর? কেন, কেন? আমি না হয় মেয়েমানুষ—তুই তো ইচ্ছে করলেই যেতে—

—তা নয় লীলাদি, প্রথমে ভাবতুম বড়ো হয়ে যখন রোজগার করব মাকে নিয়ে আবার নিশ্চিন্দিপুরের ভিটেতে গিয়ে বাস করব, মার বড়ো সাধ ছিল। মা মারা যাওয়ার পরেও ভেবেছিলুম, কিন্তু তার পরে—ইয়ে—

স্ত্রীবিয়োগের কথাটা অপু বয়োজ্যেষ্ঠা লীলাদির নিকট প্রথমটা তুলিতে পারিল না। পরে বলিল। লীলা বলিল, বৌ কতদিন বেঁচেছিলেন?

অপু লাজুক সুরে বলিল—বছর চারেক—

—তা এ তোমার অন্যায় কাজ ভাই—তোমার এ বয়সে বিয়ে করবে না কেন?...তোমাকে তো এতটুকু দেখেছি, এখনও বেশ মনে হচ্ছে, ছোট্ট পাতলা টুকটুকে ছেলেটি—একটা কঞ্চি হাতে নিয়ে আমাদের ঘাটের পথের বাঁশতলাটায় বেড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ—কালকের কথা যেন সব, না না, ও কি, ছিঃ—বিয়ে করো ভাই। খোকাকে কলকাতায় রেখে এলে কেন—দেখতাম একবারটি।

লীলাও উঠিতে দেয় না—অপুও উঠিতে চায় না। লীলার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিল—ছেলেমেয়েগুলিকে আদর করিল। উঠিবার সময় লীলা বলিল—কাল আসিস অপু, নেমন্তন্ন রইল,—এখানে দুপুরে খাবি।

পরদিন নেমন্তন্ন রাখিতে গিয়া কিন্তু অপু লীলাদির পরাধীনতা মর্মে মর্মে বুঝিল—সকাল হইতে সমুদয় সংসারের রান্নার ভার একা লীলাদির উপর। কৈশোরে লীলাদি দেখিতে ছিল খুব ভালো—এখন কিন্তু সে লাবণ্যের কিছুই অবশিষ্ট নাই—চুল দু-চার গাছা এরই মধ্যে পাকিয়াছে, শীর্ণ মুখ, শিরা-বাহির-হওয়া হাত, আধময়লা শাড়ি পরনে, রাঁধিবার আলাদা ঘরদোর নাই, ছোট্ট দালানের অর্ধেকটা দরমার বেড়া দিয়া ঘেরা, তারই ও-ধারে রান্না হয়। লীলাদি সমস্ত রান্না সারিয়া তার জন্য মাছের ডিমের বড়া ভাজিতে বসিল, একবার কড়াখানা উনুন হইতে নামায়, আবার তোলে, আবার নামায়, আবার ভাজে! আগুনের তাপে মুখ তার রাঙা দেখাইতেছিল—অপু ভাবিল কেন এত কষ্ট করছে লীলাদি, আহা রোজ রোজ ওর এই কষ্ট, তার ওপর আমার জন্যে আর কেন কষ্ট করা?

বিদায় লইবার সময় লীলা বলিল—কিছুই করতে পারলুম না ভাই—এলি যদি এতকাল পরে, কি করি বল্, পরের ঘরকন্না, পরের সংসার, মাথা নিচু করে থাকা, উদয়াস্ত খাটুনিটা দেখলি তো? কি আর করি, তবুও একটা ধরে আছি। মেয়েটা বড়ো হয়ে উঠল, বিয়ে তো দিতে হবে? ওই বট্‌ঠাকুর ছাড়া আর ভরসা নেই। সন্ধেবেলাটা বেশ ভালো লাগে—দশাশ্বমেধ ঘাটে সন্ধের সময় বেশ কথা হয়, পাঁচালী হয়, গান হয়—বেশ লাগে। দেখিস নি?...আসিস্ না আজ ওবেলা—বেশ

জায়গা, আসিস্, দেখিস্ এখন। এসো, এসো, কল্যাণ হোক।—তারপর সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল—বলিল—তোদের দেখলে যে কত কথা মনে পড়ে—কি সব দিন ছিল—

এবার অপু অতিকষ্টে চোখের জল চাপিল।

আর একটি কর্তব্য আছে তাহার কাশীতে—লীলার মায়ের সঙ্গে দেখা করা। বাঙালিটোলার নারদ ঘাটে তাঁদের নিজেদের বাড়ি আছে—খুঁজিয়া বাড়ি বাহির করিল। মেজ-বৌরানী অপুকে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। চোখের জল ফেলিলেন।

কথাবার্তা চলিতেছে এমন সময় ঘরে একটি ছোট মেয়ে ঢুকিল—বয়স ছয়সাত হইবে, ফ্রক-পরা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল—অপু তাহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিল—লীলার মেয়ে। কি সুন্দর দেখিতে! এত সুন্দরও মানুষ হয়? স্নেহে, স্মৃতিতে, বেদনায় অপুর চোখে জল আসিল—সে ডাক দিল—শোনো খুকি, মা, শোনো তো।

খুকি হাসিয়া পলাইতেছিল, মেজ-বৌরানী ডাকিয়া আনিযা কাছে বসাইয়া দিলেন। সে তার দিদিমার কাছেই কাশীতে থাকে আজকাল। গত বৈশাখ মাসে তাহার বাবা মারা গিয়াছেন—লীলার মৃত্যুর পূর্বে। কিন্তু লীলাকে সে সংবাদ জানানো হয় নাই। দেখিতে অবিকল লীলা—এ বয়সে লীলা যা ছিল তাই। কেমন করিয়া অপুর মনে পড়িল শৈশবের একটি দিনে বর্ধমানে লীলাদের বাড়িতে সেই বিবাহ উপলক্ষে মেয়ে মজলিশের কথা—লীলা যেখানে হাসির কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে হাসাইয়াছিল—সে-ই লীলাকে সে প্রথম দেখে এবং লীলা তখন দেখিতে ছিল ঠিক এই খুকির মতো অবিকল!

মেজ-বৌরানী বলিলেন—মেয়ে তো ভালো, কিন্তু বাবা, ওর কি আর বিয়ে দিতে পারব? ওর মার কথা যখন সকলে শুনবে—আর তা না জানে কে—ওই মেয়ের কি আর বিয়ে হবে বাবা?

অপুর দুর্দমনীয় ইচ্ছা হইল একটি কথা বলিবার জন্য—সেটা কিন্তু সে চাপিয়া রাখিল। মুখে বলিল—দেখুন, বিয়ের জন্যে ভাববেন কেন? লেখাপড়া শিখুক, বিয়ে নাই বা হল, তাতে কি? মনে ভাবিল—এখন সে কথা বলব না, খোকা যদি বাঁচে, মানুষ হয়ে ওঠে—তবে সে কথা তুলব। যাইবার সময়ে অপু লীলার মেয়েকে আবার কাছে ডাকিল। এবার খুকি তাহার কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ডাগব ডাগর উৎসুক চোখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সেদিনের বাকি সময়টুকু অপু বন্ধুর সঙ্গে সারনাথ দেখিয়া কাটাইল। সন্ধ্যার দিকে একবার কালীতলার গলিতে লীলাদের বাসায় বিদায় লইতে গেল—কাল সকালেই এখান হইতে রওনা হইবে। নিশ্চিন্দিপুরের মেয়ে, শৈশব দিনের এক সুন্দর আনন্দমুহূর্তের সঙ্গে লীলাদির নাম জড়ানো—বার বার কথা কহিয়াও যেন তাহার তৃপ্তি হইতেছিল না।

আসিবার সময় অপু মুগ্ধ হইল লীলাদির আন্তরিকতা দেখিয়া। তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিয়া সে নিচে নামিয়া আসিল, আবার চিবুক ছুঁইয়া আদর করিল, চোখের জল ফেলিল। যেন মা, কি মায়ের পেটের বড়ো বোন। কতকগুলো কাঠেব খেলনা হাতে দিয়া বলিল—খোকাকে দিস্—তার জন্যে কাল কিনে এনেছি।

অপু ভাবিল—কি চমৎকার মানুষ লীলাদি!...আহা, পরের সংসারে কি কষ্টটাই না পাচ্ছে! মুখে কিছু বললুম না—তোমায় আমি বাপের ভিটে দেখাব লীলাদি, এই বছরের মধ্যেই।

ট্রেনে উঠিয়া সারাপথ কত কি কথা তাহার মনে যাওয়া-আসা করিতে লাগিল। রাজঘাটের স্টেশনে ট্রেনে উঠিল আজ কতকাল পরে! বাল্যকালে এই স্টেশনেই সে প্রথম জলের কল দেখে, কাশী নামিয়াই ছুটিয়া গিয়াছিল আগে জলের কলটার কাছে। চেঁচাইয়া বলিয়াছিল, দেখো দেখো মা, জলের কল!—সে সব কি আজ?

আজ কতদিন হইতে সে আর একটি অদ্ভুত জিনিস নিজের মনের মধ্যে অনুভব করিতেছে, কি

তীব্রভাবেই অনুভব করিতেছে। আগে তো সে এ রকম ছিল না? অন্তত এ ভাবে তো কই কখনও এর আগে—সেটা হইতেছে ছেলের জন্য মন কেমন করা।

কত কথাই মনে হইতেছে, এই কয়দিনে—পাশের বাড়ির বাঁড়ুজ্যে-গৃহিণী কাজলকে বড়ো ভালোবাসে, সেখানেই তাহাকে রাখিয়া আসিয়াছে। কখনও মনে হইতেছে, কাজল যে দুষ্টু ছেলে, হয়তো গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া ছিল, কোনও বদমাইস লোকে ভুলাইয়া কোথায় লইয়া গিয়াছে কিংবা হয়তো চুপি চুপি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া রাস্তা পার হইতে যাইতেছিল, মোটর চাপা পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি বাঁড়ুজ্যেরা একটা তার করিত না? হয়তো তার করিয়াছিল, ভুল ঠিকানায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। উহাদের আলিসাবিহীন নেড়া ছাদে ঘুড়ি উড়াইতে উঠিয়া পড়িয়া যায় নাই তো? কিন্তু কাজল তো কখনও ঘুড়ি ওড়ায় না? একটু আনাড়ি, ঘুড়ি ওড়ানো কাজ একেবারে পারে না। না—সে উড়াইতে যায় নাই, তবে বাঁড়ুজ্যেবাড়ির ছেলেদের দলে মিশিয়া উঠিয়াছিল, আশ্চর্য কি!

আর্টিস্ট বন্ধুর কথার উত্তরে সে খানিকটা আগে বলিয়াছিল—সে জাভা, বালি, সুমাত্রা দেখিবে, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ দেখিবে, আফ্রিকা দেখিবে—ওদের বিষয় লইয়া উপন্যাস লিখিবে। সাহেবরা দেখিয়াছে তাদের চোখে—সে নিজের চোখে দেখিতে চায়, তার মনের রঙে কোন্ রঙ ধরায়—ইউগান্ডার দিক্‌দিশাহীন তৃণভূমি, কেনিয়ার অরণ্য। বুড়ো বেবুন রাত্রে কর্কশ চিৎকার করিবে, হায়েনা পচা জীবজন্তুর গন্ধে উন্মাদের মতো আনন্দে হি-হি করিয়া হাসিবে, দুপুরে অগ্নিবর্ষী খররৌদ্রে কম্পমান উত্তাপতরঙ্গ মাঠে প্রান্তরে জনহীন বনের ধারে কতকগুলি উঁচুনিচু সদাচঞ্চল বাঁকা রেখার সৃষ্টি করিবে। সিংহেরা দল পাকাইয়া ছোট কণ্টকবৃক্ষের এতটুকু ক্ষুদ্র ছায়ায় গোলাকারে দাঁড়াইয়া অগ্নিবৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করে—পার্ক ন্যাশন্যাল আলবার্ত...wild celery-র বন...

কিন্তু খোকা যে টানিতেছে আজকাল, কোনও জায়গায় যাইতে মন চায় না খোকাকে ফেলিয়া। কাজল, খোকা, কাজল, খোকা, খোকন, ও ঘুড়ি উড়াইতে পারে না, কিছু বুঝিতে পারে না, কিছু পারে না, বড়ো নির্বোধ! কিন্তু ওর আনাড়ি মুঠাতে বুকের তার আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। টানিতেছে, প্রাণপণে টানিতেছে—ছোট্ট দুর্বল হাত দুটি নির্দয়ভাবে মুচড়াইয়া সরাইয়া লওয়া? সর্বনাশ! ধামা চাপা থাকুক বিদেশযাত্রা।

ট্রেন হু-হু চলিতেছে...মাঝে মাঝে আম বন, জলার ধারে লালহাঁস বসিয়া আছে, আখের ক্ষেতে জল দিতেছে, গম কাটিতেছে। রেলের ধারের বস্তিতে উদুখলে শস্য কুটিতেছে, মহিষের পাল চরিয়া ফিরিতেছে। বড়ো বড়ো মাঠে দুপুর গড়াইয়া গিয়া ক্রমে রোদ পড়িয়া আসিল। দূরে দূরে চক্রবাল-সীমায় এক-আধটা পাহাড় ঘন নীল ও কালো হইয়া উঠিতেছে।

কি জানি কেন আজ কত কথাই মনে পড়িতেছে, বিশেষ করিয়া নিশ্চিন্দিপুরের কথা। হয়তো এতকাল পরে লীলাদির সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্যই। ঠিক তাই। বহু দূরে আর একটি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের জীবনধারা, বাঁশবনের আমবনের ছায়ায় পাখির কলকাকলির মধ্য দিয়া, জানা-অজানা বন-পুষ্পের সুবাসের মধ্য দিয়া সুখে-দুঃখে বহুকাল আগে বহিত—এককালে যার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তার—আজ তা স্বপ্ন,—স্বপ্ন, কতকাল আগে দেখা স্বপ্ন! গোটা নিশ্চিন্দিপুর, তার ছেলেবেলাকার দিদি, মা ও রানুদি, মাঠ বন, ইছামতী সব অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, ধোঁয়া ধোঁয়া মনে হয়, স্বপ্নের মতই অবাস্তব। সেখানকার সব কিছুই অস্পষ্ট স্মৃতিতে মাত্র আসিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

এই তো ফাল্গুন-চৈত্র মাস—সেই বাঁশপাতা ও বাঁশের খোলার রাশি—শৈশবের ভাঙা জানালাটার ধারে বসিয়া বসিয়া কতকাল আগের সে সব কল্পনা, আনন্দপূর্ণ দিনগুলি, শীতরাত্রির সুখস্পর্শ কাঁথার তলা,—অনন্ত কালসমুদ্রে সে সব ভাসিয়া গিয়াছে, কত কাল আগে।...

কেবল স্বপ্নে, এক একদিন যেন বাল্যের সেই রূপো চৌকিদার গভীর রাত্রের ঘুমের মধ্যে কড়া হাঁক দিয়া যায়—ও রায় ম—শ—য়—য়, সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর ফিরিয়া আসে, আবার বাড়ির পাশেই সেই পোড়ো ভিটাতে বহুকাল আগের বসন্ত নামে, প্রথম চৈত্রের নানা জানা-অজানা ফুলে

বনভূমি ভরিয়া যায়, তাহাদের পুরানো কোঠাবাড়ির ভাঙা জানালার ধারে অতীত দিনের শত সুখদুঃখে পরিচিত পাখির দল কলকণ্ঠে গান গাহিয়া উঠে, ঠাকুরমাদের নারিকেল গাছে কাঠঠোক্‌রার শব্দ বিচিত্র গোপনতায় তন্দ্রারত হইয়া পড়ে...স্বপ্নে দশ বৎসরের শৈশবটি আবার নবীন হইয়া ফিরিয়া আসে...

এতদিন সে বাড়িটা আর নাই...কতকাল আগে ভাঙিয়া চুরিয়া ইট-কাঠ স্তূপাকার হইয়া আছে—তাহাও হয়তো মাটির তলায় চাপা পড়িতে চলিল—সে শৈশবের জানালাটার কোনও চিহ্ন নাই—দীর্ঘদিনের শেষে সোনালি রোদ যখন বনগাছের ছায়া দীর্ঘতর করিয়া তোলে, ফিঙে-দোয়েল ডাক শুরু করে—তখন আর কোনও মুগ্ধ শিশু জানালার ধারে বসিয়া থাকে না—হাত তুলিয়া অনুযোগের সুরে বলে না—আজ রাতে যদি মা ঘরে জল পড়ে, কাল কিন্তু ঠিক রানুদিদিদের বাড়ি গিয়ে শোবো—রোজ রোজ রাত জাগতে পারি নে বলে দিচ্ছি।

অপুর একটা কথা মনে হইয়া হাসি পাইল।

গ্রাম ছাড়িয়া আসিবার বছরখানেক আগে অপু একরাশ কড়ি পাইয়াছিল। তাহার বাবা শিষ্যবাড়ি হইতে এগুলি আনেন। এত কড়ি কখনও অপু ছেলেবেলায় একসঙ্গে দেখে নাই। তাহার মনে হইল সে হঠাৎ অত্যন্ত বড়োলোক হইয়া গিয়াছে—কড়ি খেলায় সে যতই হারিয়া যাক, তাহার অফুরন্ত ঐশ্বর্যের শেষ হইবে না। একটা গোল বিস্কুটের ঠোঙায় কড়ির রাশি রাখিয়া দিয়াছিল। সে ঠোঙাটা আবার তোলা থাকিত তাদের বনের ধারের দিকের ঘরটায় উঁচু কুলুঙ্গিটাতে।

তারপর নানা গোলমালে খেলাধুলায় অপুর উৎসাহ গেল কমিয়া, তার পরই গ্রাম ছাড়িয়া উঠিয়া আসিবার কথা হইতে লাগিল। অপু আর একদিনও ঠোঙার কড়িগুলি লইয়া খেলা করিল না, এমন কি দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসিবার সময়েও গোলমালে, ব্যস্ততায়, প্রথম দূর বিদেশে রওনা হইবার উত্তেজনার মুহূর্তে সেটার কথা মনেও উঠে নাই। অত সাধের কড়িভরা ঠোঙাটা সেই কড়িকাঠের নিচেকার বড়ো কুলুঙ্গিটাতেই রহিয়া গিয়াছিল।

তারপর অনেককাল পরে সে কথা অপুর মনে হয় আবার। তখন অপর্ণা মারা গিয়াছে। একদিন অন্যমনস্ক ভাবে ইডেন গার্ডেনের কেয়াঝোপে বসিয়া ছিল, গঙ্গার ও-পারের দিকে সূর্যাস্ত দেখিতে দেখিতে কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে।

আজও মনে হইল।

কড়ির কৌটো! একবার সে মনে মনে হাসিল...বহুকাল আগে নিশ্চিহ্ন হইয়া লুপ্ত হইয়া যাওয়া ছেলেবেলার বাড়ির উত্তর দিকের ঘরের কুলুঙ্গিতে বসানো সেই টিনের ঠোঙাটা!—দূরে সেটা যেন শূন্যে কোথায় এখনও ঝুলিতেছে, তাহার শৈশবজীবনের প্রতীকস্বরূপ...অস্পষ্ট, অবাস্তব, স্বপ্নময় ঠোঙাটা সে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে, পয়সায় চার গণ্ডা করিয়া মাকড়সার ডিমের মতো সেই যে ছোট ছোট বিস্কুট তারই ঠোঙাটি—উপরে একটা বিবর্ণপ্রায় হাঁ-করা রাক্ষসের মুখের ছবি...দূরে কোন্ কুলুঙ্গিতে বসানো আছে...তার পিছনে বাঁশবন, শিমুলবন, তার পিছনে সোনাডাঙার মাঠ, ঘুঘুর ডাক...তাদেরও পিছনে তেইশ বছর আগেকার অপূর্ব মায়ামাখানো নিঝুম চৈত্র-দুপুরের রৌদ্রভরা নীলাকাশ...

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

চৈত্র মাসের প্রথমে একটা বড়ো পার্টিতে সে নিমন্ত্রিত হইয়া গেল। খুব বড়ো গাড়িবারান্দা, সামনের 'লনে' ছোট ছোট টেবিল ও চেয়ার পাতা, খানিকটা জায়গা সামিয়ানা টাঙানো। নিমন্ত্রিত পুরুষ মহিলাগণ যাঁহারা যেখানে ইচ্ছা বেড়াইতেছেন। একটা মার্বেলের বড়ো চৌবাচ্চায় গোটাকতক কুমুদ ফুল, ঠিক মাঝখানে একটা মার্বেলের ফোয়ারা—গৃহকর্ত্রী তাহাকে লইয়া গিয়া জায়গাটা দেখাইলেন,

সেটা নাকি তাঁদের 'লিলি পন্ড'। জয়পুর হইতে ফোয়ারাটা তৈয়ারি করাইয়া আনিতে কত খরচ পড়িয়াছে, তাহাও জানাইলেন।

পার্টির সকল আমোদ-প্রমোদের মধ্যে একটি মেয়ের কণ্ঠসংগীত সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক মনে হইল। ব্রিজের টেবিলে সে যোগ দিতে পারিল না, কারণ ব্রিজ-খেলা সে জানে না, গান শেষ হইলে খানিকটা বসিয়া বসিয়া খেলাটা দেখিল। চা, কেক, স্যান্ডউইচ, সন্দেশ, রসগোল্লা, গল্প-গুজব, আবার গান! ফিরিবার সময় মনটা খুব খুশি ছিল। ভাবিল—এদের পার্টিতে নেমন্তন্ন পেয়ে আসা একটা ভাগ্যের কথা। আমি লিখে নাম করেছি, তাই আমার হল। যার-তার হোক দিকি? কেমন কাটল সন্ধেটা। আহা, খোকাকে আনলে হত, ঘুমিয়ে পড়বে এই ভয়ে আনতে সাহস হল না যে—খান-দুই কেক খোকার জন্য চুপিচুপি কাগজে জড়াইয়া পকেটে পুরিয়া রাখিয়াছিল, খুলিয়া দেখিল সেগুলি ঠিক আছে কি না।

খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ডাকিয়া উঠাইতে গিয়া বলিল, ও খোকা, খোকা, ওঠ্, খুব ঘুমুচ্ছিস যে—হি-হি—ওঠ্ রে।

কাজলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। যখনই সে বোঝে বাবা আদব কবিতেছে, মুখে কেমন ধবনের মধুর দুষ্টামির হাসি হাসিয়া ঘাড় কাত করিয়া কেমন এক অদ্ভুত ভঙ্গি করিয়া আদরের প্রতীক্ষায় থাকে, আর এত আদর খাইতেও পারে!

অপু বলিল, শোন্ খোকা গল্প করি,—ঘুমুস্‌নে—

কাজল হাসিমুখে বলে, বলো দিকি বাবা একটা অর্থ?

হাত কন্ কন্ মানিকলতা, এ ধন তুমি পেলে কোথা,
রাজাব ভাণ্ডারে নেই, বেনের দোকানে নেই—

অপু মনে মনে ভাবে—খোকা, তুই—তুই আমার সেই বাবা। ছেলেবেলায় চলে গিয়েছিলে, তখন তো কিছু বুঝি নি, বুঝতামও না—শিশু ছিলাম! তাই আবার আমার কোলে আদর কাড়াতে এসেছ বুঝি? মুখে বলে, কি জানি, জাঁতি বুঝি?

—আহা-হা, জাঁতি কি আব দোকানে পাওয়া যায় না! তুমি বাবা কিচ্ছু জানো না—

—ভালো কথা, কেক এনেছি, দ্যাখ্, বড়োলোকের বাড়ির কেক, ওঠ্—

—বাবা তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছে, ওই বইখানা তোলো তো।...

আর্টিস্ট বন্ধুটির পত্র। বন্ধু লিখিয়াছে,—সমুদ্রপারের বৃহত্তর ভারতবর্ষ শুধু কুলি আমদানির সার্থকতা ঘোষণা করিয়া নীরব থাকিয়া যাইবে? তোমাদের মতো আর্টিস্ট লোকের এখানে আসার যে নিতান্ত দরকার। চোখ থাকিয়াও নাই শতকরা নিরানব্বই জনের, তাই চক্ষুষ্মান মানুষদেব একবার এসব স্থানে আসিতে বলি। পত্রপাঠ এসো, ফিজিতে মিশনারীরা স্কুল খুলিতেছে, হিন্দি জানা ভারতীয় শিক্ষক চায়, দিনকতক মাস্টারি তো করো, তারপর একটা কিছু ঠিক হইয়া যাইবে, কারণ চিরদিন মাস্টারি করিবার মতো শান্ত ধাত তোমার নয়, তা জানি। আসিতে বিলম্ব করিয়ো না।

পত্র পাঠ শেষ করিয়া সে খানিকক্ষণ কি ভাবিল, ছেলেকে বলিল, আচ্ছা খোকা, আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যদি চলে যাই, তুই থাকতে পারবি নে? যদি তোকে মামার বাড়ি রেখে যাই?

কাজল কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল, হ্যাঁ, তাই যাবে বইকি! তুমি ভারি দেরি করো, কাশীতে বলে গেলে তিন দিন হবে, ক'দিন পরে এলে? না বাবা—

অপু ভাবিল—অবোধ শিশু! এ কি কাশী? এ বহুদূর, দিনের কথা কি এখানে ওঠে?—থাক, কোথায় যাইবে সে? কাহার কাছে রাখিয়া যাইবে খোকাকে? অসম্ভব!

কাজল ঘুমাইয়া পড়িলে ছাদে উঠিয়া সে অনেকক্ষণ একা বসিয়া রহিল।

দূরে বাড়িটার মাথায় সার্কুলার রোডের দিকে ভাঙা চাঁদ উঠিতেছে, রাত্রি বারোটার বেশি—নিচে একটা মোটর লরি ঘস্ ঘস্ আওয়াজ করিতেছে। এই রকম সময়ে এই রকম ভাঙা চাঁদ উঠিত

দূরে জঙ্গলের মাথায় পাহাড়ের একটা জায়গায়, যেখানে উটের পিঠের মতো ফুলিয়া উঠিয়াই পরে বসিয়া গিয়া একটা খাঁজের সৃষ্টি করিয়াছে—সেই খাঁজটার কাছে, পাহাড়ি ঢালুতে বাদাম গাছের বনে দিনমানে পাকা পাতায় বনশীর্ষ যেখানে রক্তাভ দেখায়। এতক্ষণে বন-মোরগেরা ডাকিয়া উঠিত, কক্ কক্ কক্—

সে মনে মনে কল্পনা করিবার চেষ্টা করিল, সার্কুলার রোড নাই, বাড়ি-ঘর নাই, মোটর লরির আওয়াজ নাই, ব্রিজের আড্ডা নাই, 'লিলি পন্ড' নাই, তার ছোট খড়ের বাংলো ঘরখানায় রামচরিত মিশ্র মেজেতে ঘুমাইতেছে, সামনে পিছনে ঘন অরণ্যভূমি, নির্জন নিস্তব্ধ, আধ-অন্ধকার রাত্রি। ক্রোশের পর ক্রোশ যাও, শুধু উঁচু-নিচু ডাঙা, শুকনা ঘাসের বন, সাজা ও আবলুসের বন, শালবন, পাহাড়ি চামেলি ও লোহিয়ার বন—বনফুলের অফুরন্ত জঙ্গল। সঙ্গে সঙ্গে মনে আসিল সেই মুক্তি, সেই রহস্য, সে সব অনুভূতি, ঘোড়ার পিঠে মাঠের পর মাঠ উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলা, সেই দৃঢ়পৌরুষ জীবন, আকাশের সঙ্গে, ছায়াপথের সঙ্গে, নক্ষত্র-জগতের সঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় প্রতি রাত্রে যে অপূর্ব মানসিক সম্পর্ক।

এ কি জীবন সে যাপন করিতেছে এখানে? প্রতিদিন একই রকম একঘেয়ে নীরস, বৈচিত্র্যহীন—আজও যা, কালও তা। অর্থহীন কোলাহলে ও সার্থকতাহীন ব্রিজের আড্ডার আবহাওয়ায়, টাকা রোজগারের মৃগতৃষ্ণিকায় লুব্ধ জীবননদীর স্তব্ধ, সহজ সাবলীল ধারা যে দিনে দিনে শুকাইয়া আসিতেছে, এ কি সে বুঝিয়াও বুঝিতেছে না?

ঘুমের ঘোরে কাজল বিছানাব মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে এক পাশে সরাইয়া শোয়াইল। একেই তো সুন্দর, তার উপর কি যে সুন্দর দেখাইতেছে খোকাকে ঘুমন্ত অবস্থায়।

কাশী হইতে ফিরিবার সপ্তাহ খানেকের মধ্যে অপু 'বিভাববী' ও 'বঙ্গ-সুহৃৎ' দুখানা পত্রিকার তরফ হইতে উপন্যাস লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিল। দুখানাই প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র, দুখানারই গ্রাহক সারা বাংলা জুড়িয়া এবং পৃথিবীর যেখানে যেখানে বাঙালি আছে, সর্বত্র। 'বিভাবরী' তাহাকে সম্প্রতি আগাম কিছু টাকা দিল—'বঙ্গসুহৃৎ'-এর নিজেদের বড়ো প্রেস আছে—তাহারা নিজের খরচে অপুর একখানা ছোট গল্পের বই ছাপাইতে রাজি হইল। অপুর বইখানির বিক্রয়ও হঠাৎ বাড়িয়া গেল, আগে যে-সব দোকানে তাহাকে পুঁছিতও না—সে-সব দোকান হইতে বই চাহিয়া পাঠাইতে লাগিল। এই সময়ে একটি বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক ফার্মের নিকট হইতে একখানা পত্র পাইল, অপু যেন একবাব গিয়া দেখা করে।

অপু বৈকালের দিকে দোকানে গেল। তাহারা বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ নিজেদের খরচে ছাপাইতে ইচ্ছুক—অপু কি চায়? অপু ভাবিয়া দেখিল। প্রথম সংস্করণ হু-হু কাটিতেছে—অপর্ণার গহনা বিক্রয় করিয়া বই ছাপাইয়াছিল, লাভটা তার সবই নিজের। ইহাদের দিলে লাভ কমিয়া যাইবে বটে, কিন্তু দোকানে দোকানে ছুটাছুটি, তাগাদা—এসব হাঙ্গামাও কমিবে। তা ছাড়া নগদ টাকার মোহ আছে, সাত পাঁচ ভাবিয়া সে রাজি হইল। ফার্মের কর্তা তখনই একটা লেখাপড়া করিয়া লইলেন—আপাতত ছ'শো টাকায় কথাবার্তা মিটিল, শ'-দুই সে নগদ পাইল।

দুশো টাকা খুচরা ও নোটে। এক গাদা টাকা! হাতে ধবে না। কি করা যায় এত টাকায়? পুরানো দিন হইলে সে ট্যাক্সি করিয়া খানিকটা বেড়াইত, রেস্টুরেন্টে খাইত, বায়োস্কোপ দেখিত। কিন্তু আজকাল আগেই খোকার কথা মনে হয়। খোকাকে কি আনন্দ দেওয়া যায় এ টাকায়? মনে হয় লীলার কথা। লীলা কত আনন্দ করিত আজ!

একটা ছোট গলি দিয়া যাইতে যাইতে একটা শরবৎ-এর দোকান। দোকানটাতে পান বিড়ি বিস্কুট বিক্রি হয়, আবার গোটা দুই তিন সিরাপের বোতলও রহিয়াছে! দিনটা খুব গরম, অপু শরবৎ খাওয়ার জন্য দোকানটাতে দাঁড়াইল। অপুর একটু পরেই দুটি ছেলেমেয়ে সেখানে কি কিনিতে আসিল। গলিরই কোন গরিব ভাড়াটে গৃহস্থ ঘরের ছোট ছেলে মেয়ে—মেয়েটির বছর সাত,

ছেলেটি একটু বড়ো। মেয়েটি আঙুল দিয়া সিরাপের বোতল দেখাইয়া বলিল—ওই দ্যাখ্ দাদা সবুজ—বেশ ভালো, না? ছেলেটি বলিল—সব মিশিয়ে দ্যায়। বরফ আছে, ওই যে—

—ক পয়সা নেয়?

—চার পয়সা।

অপুর জন্য দোকানী শরবৎ মিশাইতেছে, বরফ ভাঙিতেছে, ছেলেমেয়ে দুটি মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিল। মেয়েটি অপুর দিকে চাহিয়া বলিল—আপনাকে ওই সবুজ বোতল থেকে দেবে, না?

যেন সবুজ বোতলের মধ্যে শচীদেবীর পায়েস পোরা আছে।

অপুর মন করুণার্দ্র হইল। ভাবিল—এরা বোধ হয় কখনও কিছু দেখে নি—এই রং-করা টক চিনির রসকে কি ভাবছে, ভালো সিরাপ কি জানে না। বলিল—খুকি, খোকা শরবৎ খাবে? খাও না—ওদের দু গ্লাস শরবৎ দাও তো—

প্রথমটা তারা খাইতে রাজি হয় না, অনেক করিয়া অপু তাহাদের লজ্জা ভাঙিল। অপু বলিল—ভালো সিরাপ তোমার আছে? থাকে তো দাও, আমি দাম দোব। কোন জায়গা থেকে এনে দিতে পারো না?

বোতলে যাহা আছে তাহার অপেক্ষা ভালো সিরাপ এ অঞ্চলে নাকি কুত্রাপি মেলা সম্ভব নয়। অবশেষে সেই শরবৎই এক এক বড়ো গ্লাস দুই ভাই-বোন মহাতৃপ্তি ও আনন্দের সহিত খাইয়া ফেলিল, সবুজ বোতলের সেই টক চিনির রসই।

অপু তাহাদের বিস্কুট ও এক পয়সা মোড়কের বাক্সে চকলেট কিনিয়া দিল—দোকানটাতে ভালো কিছু যদি পাওয়া যায় ছাই। তবুও অপুর মনে হইল পয়সা তার সার্থক হইয়াছে আজ।

বাসায় ফিরিয়া তাহার মনে হইল বড়ো সাহিত্যের প্রেরণার মূলে এই মানববেদনা। ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার প্রজাস্বত্ব আইন, 'সার্ফ'নীতি, জার-শাসিত রাশিয়ার সাইবেরিয়া, শীত, অত্যাচার, কুসংস্কার, দারিদ্র্য—গোগোল, ডস্টয়ভস্কি, গোর্কি, টলস্টয় ও শেকভের সাহিত্য সম্ভব করিয়াছে। সে বেশ কল্পনা করিতে পারে, দাস-ব্যবসায়ের দুর্দিনে, আফ্রিকার এক মরু-বেষ্টিত পল্লীকুটির হইতে কোমল বয়স্ক এক নিগ্রো বালক পিতামাতার স্নেহকোল হইতে নিষ্ঠুরভাবে বিচ্যুত হইয়া বহু দূর বিদেশের দাসের হাটে ক্রীতদাসরূপে বিক্রিত হইল, বহুকাল আর সে বাপ-মাকে দেখিল না, ভাই-বোনেদের দেখিল না—দেশে দেশে তাহার অভিনব জীবনধারার দৈন্য, অত্যাচার ও গোপন অশ্রুজলের কাহিনী, তাহার জীবনের সে অপূর্ব ভাবানুভূতির অভিজ্ঞতা সে যদি লিখিয়া রাখিয়া যাইতে পারিত! আফ্রিকার নীরব নৈশ আকাশ তাহাকে প্রেরণা দিত, তাম্রবর্ণ মরুদিগন্তের স্বপ্নমায়া তাহার চোখে অঞ্জন মাখাইয়া দিত; কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের দুর্ভাগ্য, তাহারা নীরবে অত্যাচার সহ্য করিয়া বিশ্ব হইতে বিদায় লইল।

দিন দুই পরে একদিন সন্ধ্যার পর গড়ের মাঠ হইতে একা বেড়াইয়া ফিরিবার মুখে হোয়াটিওয়ে লেড্‌ল'র দোকানের সামনে একটুখানি দাঁড়াইয়াছে—একজন আধাবয়সি লোক কাছে আসিয়া বলিল—বাবু, প্রেমারা খেলবেন? খুব ভালো জায়গা। আমি নিয়ে যাব, এখান থেকে পাঁচ মিনিট। ভদ্র জায়গা, কোন হাঙ্গামায় পড়তে হবে না। আসবেন?

অপু বিস্মিতমুখে লোকটার মুখের দিকে চাহিল। আধময়লা কাপড় পরনে, খোঁচা খোঁচা কড়া দাড়ি-গোঁফ, ময়লা দেশী টুইলের শার্ট, কব্জির বোতাম নাই—পানে ঠোঁট দুটো কালো। দেখিয়াই চিনিল—সেই ছাত্রজীবনের পরিচিত বন্ধু হরেন—সেই যে ছেলেটি একবার তাহাদের কলেজ হইতে বই চুরি করিয়া পলাইতে গিয়া ধরা পড়ে। বহুকাল আর দেখা-সাক্ষাৎ নাই—অপু লেখাপড়া ছাড়িয়া দিবার পর আর কখনও নয়। লোকটাও অপুকে চিনিল, থতমত খাইয়া গেল। অপুও বিস্মিত হইয়াছিল—এসব ব্যাপারের অভিজ্ঞতা তাহার নাই—জীবনে কখনও না—তবুও সে বুঝিয়াছিল

তাহার এই ছাত্রজীবনের বন্ধুটি কোন্ পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কিছু উত্তর করিবার পূর্বে হরেন আসিয়া তাহার হাত দুটি ধরিল—বলিল, মাপ করো ভাই, আগে টের পাই নি। বহুকাল পরে দেখা—থাক কোথায়?—

অপু বলিল—তুমি থাক কোথায়—এখানেই আছ—কত দিন?...

—এই নিকটেই। তালতলা লেন—আসবে...অনেক কথা আছে—

—আজ আর হবে না; আসছে সোমবার পাঁচটার সময় যাব। নম্বরটা লিখে নিই।

—সে হবে না ভাই—তুমি আর আসবে না—তোমাব দেখা আর পাবার ভরসা রাখি নে। আজই চলো।

অতি অপরিচ্ছন্ন বাসা। একটি মাত্র ছোট ঘর।

অপু ঘরে ঢুকিতেই একটা কেমন ভ্যাপ্‌সা গন্ধ তাহার নাকে গেল। ছোট্ট ঘর, জিনিসপত্রে ভর্তি, মেজেতে বিছানা-পাড়া, তাহারই একপাশে হরেন অপুর বসিবার জায়গা করিয়া দিল। ময়লা চাদর, ময়লা কাঁথা, ময়লা বালিশ, ময়লা কাপড়, ছেঁড়া মাদুর—কলাই-করা গ্লাস, থালা, কালিপড়া হারিকেন লণ্ঠন, কাঁথার আড়াল হইতে তিন-চাবটি শীর্ণ কালো কালো ছোট হাত পা বাহির হইয়া আছে—একটি সাত-আট বছরের মেয়ে ওদিকের দালানে দুয়ারের চৌকাঠের উপর বসিয়া। দালানের ওপাশটা রান্নাঘর—হরেনের স্ত্রী সম্ভবত রাঁধিতেছে।

হরেন মেয়েটিকে বলিল—ওরে টেঁপি, তামাক সাজ তো—

অপু বলিল—ছোট ছেলেমেয়েকে দিয়ে তামাক সাজাও কেন?...নিজে সাজো—ও শিক্ষা ভালো নয়—

হরেন স্ত্রীব উদ্দেশে চিৎকার করিয়া বলিল—কোথায় রইলে গো, এদিকে এসো, ইনি আমার কলেজ আমলের সকলের চেয়ে বড়ো বন্ধু, এত বড়ো বন্ধু, আর কেউ ছিল না—এঁর কাছে লজ্জা করতে হবে না—একটু চা-টা খাওয়াও—এসো এদিকে।

তারপর হবেন নিজের কাহিনী পাড়িল। কলেজ ছাড়িয়াই বিবাহ হয—তাবপর এই দুঃখ-দুর্দশা—বড়ো জড়াইয়া পড়িয়াছে—বিশেষত এই সব লেণ্ডি-গেণ্ডি। কত বকম করিযা দেখিযাছে—কিছুতেই কিছু হয না। স্কুলমাস্টারি, দোকান, চালানী ব্যবসা, ফটোগ্রাফির কাজ, কিছুই বাকি রাখে নাই। আজকাল যাহা করে তা তো অপু দেখিয়াছে! বাসায় কেহ জানে না—উপায় কি!—এতগুলি মুখে অন্ন তো—এই বাজার ইত্যাদি।

হরেনের কথাবার্তার ধরন অপুর ভালো লাগিল না। চোখেমুখে কেমন যেন একটা—ঠিক বোঝানো যায় না —অপুর মনে হইল হরেন এই সব নীচ ব্যবসায়ে পোক্ত হইযা গিয়াছে।

হরেনের স্ত্রীকে দেখিয়া অপুর মন সহানুভূতিতে আর্দ্র হইযা উঠিল। কালো, শীর্ণ চেহাবা, হাতে গাছকতক কাচের চুড়ি। মাথায় সামনেব দিকে চুল উঠিয়া যাইতেছে, হাতে কাপড়ে বাটনার হলুদ-মাখা! সে এমন আনন্দ ও ক্ষিপ্রতার সহিত চা আনিয়া দিল যে, সে মনে করে যেন এতদিনে স্বামীর পরমহিতৈষী বন্ধুর সাক্ষাৎ যখন পাওয়া গিয়াছে—দুঃখ বুঝি ঘুচিল। উঠিবার সময় হরেন বলিল—ভাই, বাড়ি-ভাড়া কাল না দিলে অপমান হব—পাঁচটা টাকা থাকে তো দাও তো?

অপু টাকাটা দিয়া দিল। বাহির হইতে যাইতেছে, বড়ো ছেলেটিকে তার মা যেন কি শিখাইয়া দিল, সে দরজার কাছে আসিয়া বলিল—ও কাকাবাবু, আমাব দু-খানা ইস্কুলের বই এখনও কেনা হয় নি—কিনে দেবেন? বই না কিনলে মাস্টার মারবে—

হরেন ভানের সুরে বলিল—যা যা আবাব বই—হ্যাঁ, ইস্কুলও যত—ফি বছর বই বদলাবে—যা এখন—

অপু তাহাকে বলিল—এখন তো আর কিছু হাতে নেই খোকা, পকেট একেবারে খালি।

হরেন অনেক দূর পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে আসিল। সে চাষবাস করিবার জন্য উত্তরপাড়ায় জমি

দেখিয়া আসিয়াছে, দুই হাজার টাকা হইলে হয়—অপূর্ব কি টাকাটা ধার দিতে পারিবে? না হয়, আধাআধি বখরা—খুব লাভের ব্যবসা।

প্রথম দিনের সাক্ষাতেই এ সব?

কেমন একটা অপ্রীতিকর মনোভাব লইয়া অপু বাসায় ফিরিল। শেষে কিনা জুয়ার দালালি? প্রথম যৌবনে ছিল চোর, আরও কত কি করিয়াছে, কে খোঁজ রাখে? এ আর ভালো হইল না!

দিন তিনেক পর একদিন সকালে হরেন আসিয়া হাজির অপুর বাসায়। নানা বাজে কথার পর উত্তরপাড়ার জমি লওয়ার কথা পাড়িল। টিউবওয়েল বসাইতে হইবে। কারণ জলের সুবিধা নাই—অপূর্ব কত টাকা দিতে পারে? উঠিবার সময় বলিল—ওহে, তুমি মানিককে কি বই কিনে দেবে বলেছিলে, আমায় বলছিল!

অপু ভাবিয়া দেখিল এরূপ কোন কথা মানিককে সে বলে নাই—যাহা হউক, না হয় দিয়া দিবে এখন। মানিককে বইয়ের দরুন টাকা হরেনের হাতে দিয়া দিল।

তাহার পর হইতে হরেনের যাতায়াত শুরু হইল একটু ঘন ঘন। বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে ছেলে মানিকও আসিতে লাগিল। কখনও সে আসিয়া বলে, তাহারা বায়স্কোপ দেখিতে যাইবে, টাকা দিন কাকাবাবু। কখনও তাহার জুতা নাই, কখনও ছোট খোকার জামা নাই—কখনও তাহার বড়ো দিদি, ছোট দিদির বায়না। ইহারা আসিলেই দু-তিন টাকার কমে অপুর পার পাইবার উপায় নাই। হরেনও নানা ছুতায় টাকা চায়, বাড়ি ভাড়া—স্ত্রীর অসুখ।

একদিন কাজলের একটা সেলুলয়েডের ঘর-সাজানো জাপানী সামুরাই পুতুল খুঁজিযা পাওয়া গেল না। তার দিন-দুই আগে মানিকের সঙ্গে তার ছোট বোন টেঁপি আসিয়াছিল—অনেকক্ষণ পুতুলটা নাড়াচাড়া করিতেছিল, কাজল দেখিয়াছে। তারপর দিন দুই আর সেটার খোঁজ নাই, কাজল আজ দেখিল পুতুলটা নাই। ইহার দিন পনেরো পরে হরেনের বাসায় চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়া অপু দেখিল, কাজলের জাপানী পুতুলটা একেবারে সামনেই একটা হ্যারিকেন লণ্ঠনের পাশে বসানো। পাছে ইহারা লজ্জায় পড়ে তাই সেদিকটা পিছু ফিরিয়া বসিল ও যতক্ষণ রহিল, লণ্ঠনটার দিকে আদৌ চাহিল না। ভাবিল—যাক গে, খুকি লোভ সামলাতে না পেরে এনেছে, খোকাকে আর একটা কিনে দেবো!

উঠিয়া আসিবার সময় মানিক বলিল—মা বললেন, তোর কাকাবাবুকে বল্—একদিন আমাদের কালীঘাট দেখিয়ে আনতে—সামনের রবিবার চলুন কাকাবাবু, আমাদের ছুটি আছে, আমিও যাব।

অপুর বেশ কিছু খরচ হইল রবিবারে। ট্যাক্সিভাড়া, জলখাবার, ছেলেপিলেদের খেলনা ক্রয়, এমন কি বড়ো মেয়েটির একখানা কাপড় পর্যন্ত। কাজলও গিয়াছিল, সে এই প্রথম কালীঘাট দেখিয়া খুব খুশি।

সেদিন নিজের অলক্ষিতে অপুর মনে হইল, তাহার কবিরাজ বন্ধুটি ও তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কথা—তাদের প্রথম জীবনের সেই দারিদ্র্য—সেই পরিশ্রম—কখনও বিশেষ কিছু তো চাহে নাই কোনদিন—বরং কিছু দিতে গেলে ক্ষুণ্ন হইত। কিন্তু আন্তরিক স্নেহটুকু ছিল তাহার উপর। এখনও ভাবিলে অপুর মন উদাস হইয়া পড়ে।

বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, একটি সতেরো-আঠারো বছরের ছোকরা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দেখিতে শুনিতে বেশ, সুন্দর চোখ-মুখ, একটু লাজুক, কথা বলিতে গেলে মুখ রাঙা হইয়া যায়।

অপু তাহাকে চিনিল—চাঁপদানির পূর্ণ দিঘড়ীর ছেলে রসিকলাল—যাহাকে সে টাইফয়েড হইতে বাঁচাইয়াছিল। অপু বলিল—রসিক, তুমি আমার বাসা জানলে কি করে?

—আপনার লেখা বেরুচ্ছে 'বিভাবরী' কাগজে—তাঁদের অফিস থেকে নিয়েছি—

—তারপর, অনেককাল পর দেখা—কি খবর বলো।

—শুনুন, দিদিকে মনে আছে তো? দিদি আমায় পাঠিয়ে দিয়েছে—বলে দিয়েচে যদি কলকাতায় যাস, তবে মাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা করিস। আপনার কথা বড্ড বলে, আপনি একবার আসুন না চাঁপদানিতে।

—পটেশ্বরী? সে এখনও মনে করে রেখেছে আমার কথা?

রসিক সুর নিচু করিয়া বলিল—আপনার কথা বলে না এমন দিন নেই—আপনি চলে এসেছেন আট-দশ বছর হল—এই আট-দশ বছরের মধ্যে আপনার কথা বলে না—এমন একটা দিনও বোধ হয় যায় নি। আপনি কি কি খেতে ভালোবাসতেন—সে-সব দিদির এখনও মুখস্থ। কলকাতায় এলেই আমায় বলে, মাস্টারমশায়ের খোঁজ করিস না রে? আমি কোথায় জানব আপনার খোঁজ—কলকাতা শহর কি চাঁপদানি? দিদি তা বোঝে না। তাই এবার 'বিভাবরী'তে আপনার লেখা—

—পটেশ্বরী কেমন আছে? আজকাল আর সে-সব শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার—

—শাশুড়ি মারা গিয়েচে, আজকাল কোন অত্যাচার নেই, দু-তিনটি ছেলেমেয়ে হয়েছে,—সে-ই আজকাল গিন্নি, তবে সংসারের বড়ো কষ্ট। আমাকে বলে দেয় বোতলের চাটনি কিনতে—দশ আনা দাম—আমি কোথা থেকে পাব—তাই একটা ছোট বোতল আজ এই দেখুন কিনে নিয়ে যাচ্ছি ছ-আনায়। টেঁপারির আচার। ভালো না?

—এক কাজ করো। চলো আমি তোমাকে আচার কিনে দিচ্ছি, আমের আচার ভালোবাসে? চলো দেশী চাটনি কিনি। ভিনিগার দেওয়া বিলিতি চাটনি হয়তো পছন্দ করবে না।

—আপনি কবে আসবেন? আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে অথচ আপনাকে নিয়ে যাই নি শুনলে দিদি আমাকে বাড়িতে তিষ্ঠুতে দেবে না কিন্তু, আজই আসুন না?

—সে এখন হবে না, সময় নেই। সুবিধে মতো দেখব।

অপু অনেকগুলি ছেলেমেয়ের খেলনা, খাবার চাটনি কিনিয়া দিল। রসিককে স্টেশনে তুলিয়া দিয়া আসিল। রসিক বলিল—আপনি কিন্তু ঠিক যাবেন একদিন এর মধ্যে—নইলে ওই বললাম যে—

কি চমৎকার নীল আকাশ আজ! গরম আজ একটু কম।

চৈত্র দুপুরের এই ঘন নীল আকাশের দিকে চাহিলেই আজকাল কেন শৈশবের কথাই তাহার মনে পড়ে?

একটা জিনিস সে লক্ষ করিয়াছে। বাল্যে যখন অন্য কোনও স্থানে সে যায় নাই—যখন যাহা পড়িত—মনে মনে তাহার ঘটনাস্থলের কল্পনা করিতে গিয়া নিশ্চিন্দিপুরেরই বাঁশবন, আমবাগান, নদীর ঘাট, কুটির মাঠের ছবি মনে ফুটিয়া উঠিত—তাও আবার তাদের পাড়ার ও তাদের বাড়ির আশেপাশের জায়গার। তাদের বাড়ির পিছনের বাঁশবন তো রামায়ণ মহাভারত মাখানো ছিল—দশরথের রাজপ্রাসাদ ছিল তাদের পাড়ার ফণি মুখুজ্যেদের ভাঙা দোতলা বাড়িটা—মাধবীকঙ্কণে পড়া একলিঙ্গের মন্দির ছিল ছিরে পুকুরের পশ্চিমদিকের সীমানার বড়ো বাঁশঝাড়টার তলায়—বঙ্গবাসীতে পড়া জোয়ান অব আর্ক মেষপাল চরাইত নদীপারের দেয়াড়ের কাশবনের চরে, শিমুলগাছের ছায়ায়...তারপর বড়ো হইয়া কত নতুন স্থানে একে একে গেল, মনের ছবি ক্রমশ পরিবর্তিত হইতে লাগিল—ম্যাপ চিনিল, ভূগোল পড়িল, বড়ো হইয়া যে সব বই পড়িল তাদের ঘটনা নিশ্চিন্দিপুরের মাঠে, বনে, নদীর পথেঘাটে থাকে না কিন্তু এতকালের পরেও বাল্যের যে ছবিগুলি একবার অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল তা অপরিবর্তিত আছে—এতকাল পরেও যদি রামায়ণ মহাভারতের কোনও ঘটনা কল্পনা করে—নিশ্চিন্দিপুরের সেই অস্পষ্ট, বিস্মৃতপ্রায় স্থানগুলিই তার রথীভূমি হইয়া দাঁড়ায়—অনেককাল পর সেদিন আর একবার পুরোনো বইয়ের দোকানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাধবীকঙ্কণ ও

জীবনসন্ধ্যা পড়িতেছিল—কি অদ্ভুত!—পাতায় পাতায় নিশ্চিন্দিপুর মাখানো, বাল্যের ছবি এখনও সেই অস্পষ্টভাবে-মনে-হওয়া জঙ্গলে-ভরা পোড়ো পুকুরটার পশ্চিম সীমানায় বাঁশঝাড়ের তলায়!...

এবার মাঝে মাঝে দু-একটি পূর্বপরিচিত বন্ধুর সঙ্গে অপুর দেখা হইতে লাগিল। প্রায়ই। কেহ উকিল, কেহ ডাক্তার—জানকী মফঃস্বলের একটা গবর্নমেন্টের স্কুলের হেডমাস্টার, মন্মথ অ্যাটর্নির ব্যবসায়ে বেশ উপার্জন করে। দেবব্রত একবার ইতিমধ্যে সস্ত্রীক কলিকাতা আসিয়াছিল, স্ত্রীর পা সারিয়া গিয়াছে, দুটি মেয়ে হইয়াছে। চাকরিতে সে বেশ নাম করিয়াছে, তবে চেষ্টায় আছে কন্ট্রাক্টরি ব্যবসায় স্বাধীনভাবে আরম্ভ করিতে। দেওয়ানপুরের বাল্যবন্ধু সেই সমীর আজকাল ইনসিওরেন্সের বড়ো দালাল। সে চিরকাল পয়সা চিনিত, হিসাবী ছিল—আজকাল অবস্থা ফিরাইয়া ফেলিয়াছে। কষ্টদুঃখ করিতে করিতে একবারও সে ইহাদিগকে হিংসা করে না। তারপর এবার জানকীর সঙ্গে একদিন কলিকাতায় দেখা হইল। মোটা হইয়া গিয়াছে বেজায়, মনের তেজ নাই, গৃহস্থালির কথাবার্তা—অপুর মনে হইল সে যেন একটা বদ্ধ ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে।

তাহার অ্যাটর্নি বন্ধু মন্মথ একদিন বলিল—ভাই, সকাল থেকে ব্রিফ নিয়ে বসি, সারাদিনের মধ্যে আর বিশ্রাম নেই—খেয়েই হাইকোর্ট, পাঁচটায় ফিরে একটা জমিদারি এস্টেটের ম্যানেজারি করি ঘণ্টা-তিনেক—তারপর বাড়ি ফিরে আবার কাজ—খবরের কাগজখানা পড়বাব সময় পাইনে, কিন্তু এত টাকা রোজগার করি, তবু মনে হয়, ছাত্রজীবনই ছিল ভালো। তখন কোন একটা জিনিস থেকে বেশি আনন্দ পেতুম—এখন মনে হয়, আই হ্যাভ লস্ট দি সস্ অফ্ লাইফ—

অপু নিজের কথা ভাবিয়া দেখে। কই, এত বিরুদ্ধ ঘটনার ভিতর দিয়াও তাহার মনেব আনন্দ—কেন নষ্ট হয় নাই? নষ্ট হয তো নাই-ই, কেন তাহা দিনে দিনে এমন অদ্ভুত ধরনের উচ্ছ্বসিত প্রাচুর্যে বাড়িয়া চলিয়াছে? কেন পৃথিবীটা, পৃথিবী নয়—সারা বিশ্বটা, সারা নাক্ষত্রিক বিশ্বটা এক অপরূপ বঙে তাহার কাছে রঙিন? আর দিনে দিনে এ কি গহন গভীর বহস্য তাহাকে মুগ্ধ করিয়া প্রতি বিষয়ে অতি তীব্রভাবে সচেতন কবিযা দিতেছে?..

সে দেখিতে পায তার ইতিহাস, তাব এই মনের আনন্দের প্রগতিব ইতিহাস, তাব ক্রমবর্ধমান চেতনাব ইতিহাস।

এই জগতেব পিছনে আর একটা যেন জগৎ আছে। এই দৃশ্যমান আকাশ, পাখির ডাক, এই সমস্ত সংসার-জীবন-যাত্রা—তারই ইঙ্গিত আনে মাত্র—দূর দিগন্তেব বহুদূর ওপাবে কোথায় যেন সে জগৎটা—পিঁয়াজের একটা খোসাব মধ্যে যেমন আব একটা খোসা, তার মধ্যে আব একটা খোসা, সেটাও তেমনি এই আকাশ, বাতাস, সংসারেব আববণে কোথায় যেন ঢাকা আছে, কোন্ জীবন-পারের মনেব পারের দেশে। স্থির সন্ধ্যায নির্জনে একা কোথাও বসিয়া ভাবিলেই সেই জগৎটা একটু একটু নজরে আসে।

সেই জগৎটার সঙ্গে যোগ-সেতু প্রথম স্থাপিত হয় তার বাল্যে—দিদি যখন মারা যায়। তারপর অনিল—মা—অপর্ণা—সর্বশেষে লীলা। দুস্তর অশ্রুর পারাবার সারাজীবন ধরিয়া পাড়ি দিয়া আসিয়া আজ যেন বহু দূরে সে দেশের তালীবনরেখা অস্পষ্ট নজরে আসে।

আজ গোলদিঘির বেঞ্চিখানায় বসিয়া তাই সে ভাবিয়া দেখিল, অনেক দিন আগে তার বন্ধু অনিল যে-কথা বলিয়াছিল, এ জেনাবেশনের হাত হইতে কাজের ভার লওয়া—আর সবাই তো লইয়াছে, তার সকল সহপাঠীই এখন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, দিকে দিকে জীবনের সকল কর্মক্ষেত্রে তারা নামিয়া পড়িয়াছে, কেবল ভবঘুরে হইয়াছে সে ও প্রণব। কিন্তু সত্য কথা সে বলিবে?...মন তার কি বলে?

তার মনে হয় সে যাহা পাইয়াছে জীবনে, তাহাতেই তার জীবন হইয়াছে সার্থক। সে চায় না অর্থ, চায় না—কি সে চায়?

সেটাও তো খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে না। সে কি অপরূপ জীবন-পুলক এক একদিন দুপুরের

রোদে ছাদটাতে সে অনুভব করে, তাকে অভিভূত, উত্তেজিত করিয়া তোলে, আকাশের দিকে উৎসুক চোখে চাহিয়া থাকে, যেন সে দৈববাণীর প্রত্যাশা করিতেছে।...

কাজল কি একটা বই আগ্রহের সঙ্গে পড়িতেছিল—অপু ঘরে ঢুকিতেই চোখ তুলিয়া ব্যগ্র উৎসাহের সুরে উজ্জ্বলমুখে বলিল—ওঃ, কি চমৎকার গল্পটা বাবা!—শোনো না বাবা—এখানে বোসো—। পরে সে আরও কি সব বলিয়া যাইতে লাগিল। অপু অন্যমনস্ক মনে ভাবিতেছিল—বিদেশে যাওয়ার ভাড়া সে জোগাড় করিতে পারে—কিন্তু খোকা—খোকাকে কোথায় রাখিয়া যায়?...মামার বাড়ি পাঠাইয়া দিবে? মন্দ কি? ..কিছুদিন না হয় সেখানেই থাকুক—বছর দুই তিন—তারপর সে তো ঘুরিয়া আসিবেই। তাই করিবে? মন্দ কি?

কাজল অভিমানের সুরে বলিল—তুমি কিছু শুনছ না, বাবা—

—শুনব না কেন রে, সব শুনছি। তুই বলে যা না?

—ছাই শুনছো, বলো দিকি শ্বেত পরী কোন্ বাগানে আগে গেল?

বলিল—কোন্ বাগানে?—আচ্ছা একটু আগে থেকে বল্ তো খোকা—ওটা ভালো মনে নেই!

খোকা অতশত ঘোরপ্যাঁচ বুঝিতে পারে না—সে আবার গোড়া হইতে গল্প বলা শুরু করিল—বলিল—এইবার তো রাজকন্যে শেকড় খুঁজতে যাচ্ছে, কেমন না! মনে আছে তো?—(অপু এক বর্ণও শোনে নাই) তারপর শোনো বাবা—

কাজলের মাথার চুলের কি সুন্দর ছেলেমানুষি গন্ধ!—দোলা, চুষিকাটি, ঝিনুকবাটি, মায়ের কোল—এই সব মনে করাইয়া দেয়—নিতান্ত কচি। সত্যি ওব দিকে চাহিয়া দেখিলে আর চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না—কি হাসে, কি চোখ দুটি—মুখ কি সুন্দর—ওইটুকু একরত্তি ছেলে—যেন বাস্তব নয়, যেন এ পৃথিবীর নয়—কোন্ সময় জ্যোৎস্নাপরী আসিয়া ওকে যেন উড়াইয়া লইয়া কোনও স্বপ্নপারের দেশে লইয়া যাইবে—দিনরাত কি চঞ্চলতা, কি সব অদ্ভুত খেয়াল ও আবদার—অথচ কি অবোধ ও অসহায়!—ওকে কি করিয়া প্রতারণা কবা যাইবে?—ও তো একদণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারে না—ওকে কি বলিয়া ভুলানো যায়? অপু মনে মনে সেই ফন্দিটাই ভাবিতে লাগিল।

ছেলেকে বলিল—চিনি নিয়ে আয় তো খোকা—একটু হালুয়া করি।

কাজল মিনিট দশেক মাত্র বাহিরে গিয়াছে—এমন সময় গলির বাহিরে রাস্তায় কিসের একটা গোলমাল অপুর কানে গেল। বাহির হইয়া ঘরেব দোরে দাঁড়াইল—গলির ভিতর হইতে লোক দৌড়াইয়া বাহিবেব দিকে ছুটিতেছে—

একজন বলিল—একটা কে লবি চাপা পড়েছে—

অপু দৌড়িয়া গলির মুখে গেল। বেজায় ভিড়, সবাই আগাইতে চায়, সবাই ঠেলাঠেলি করিতেছে। অপুর পা কাঁপিতেছিল, জিভ শুকাইয়া আসিয়াছে। একজন কে বলিল—কে চাপা পড়েছে মশাই—

—ওই যে ওখানে একটা ছেলে—আহা মশায়, তখনই হয়ে গিয়েছে—মাথাটা আর নেই—

অপু রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল—বয়স কত?

—বছর নয় হবে—ভদ্রলোকের ছেলে, বেশ ফরসা দেখতে—আহা!—

অপু এ প্রশ্নটা কিছুতেই মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না—তাহার গায়ে কি ছিল। কাজল তার নতুন তৈরি খদ্দরের শার্ট পরিয়া এইমাত্র বাহির হইয়া গিয়াছে—

কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ অপু হাতে পায়ে অদ্ভুত ধরনের বল পাইল—বোধ হয় যে খুব ভালোবাসে, সে ছাড়া এমন বল আর কেহ পায় না এমন সময়ে। খোকার কাছে এখনি যাইতে হইবে—যদি একটুও বাঁচিয়া থাকে—সে বোধ হয় জল খাইবে, হয়তো ভয় পাইয়াছে—

ওপারের ফুটপাতে গ্যাসপোস্টের পাশে ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, পুলিশ আসিয়াছে—

ট্যাক্সিতে ধরাধরি করিয়া দেহটা উঠাইতেছে। অপু ধাক্কা মারিয়া সামনের লোকজনকে হঠাইয়া খানিকটা জায়গা ফাঁকা করিয়া ফেলিল। কিন্তু ফাঁকায় আসিয়া সামনে ট্যাক্সিটার দিকে চাহিয়াই তাহার মাথাটা এমন ঘুরিয়া উঠিল যে, পাশের লোকের কাঁধে নিজের অজ্ঞাতসারে ভর না দিলে সে হয়তো পড়িয়াই যাইত। ট্যাক্সির সামনে যে ভিড় জমিয়াছে তারই মধ্যে দাঁড়াইয়া ডিঙি মারিয়া কাণ্ডটা দেখিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে—কাজল। অপু ছুটিয়া গিয়া ছেলের হাত ধরিল—কাজল ভীত অথচ কৌতূহলী চোখে মৃতদেহটা দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল—অপু তাহাকে হাত ধরিয়া লইয়া আসিল।—কি দেখছিলি ওখানে?...আয় বাসায়—

অপু অনুভব করিল, তাহার মাথা যেন ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছে—সারা দেহে যেন এইমাত্র কে ইলেকট্রিক ব্যাটারির শক লাগাইয়া দিয়াছে।

গলির পথে কাজল একটু ইতস্তত করিয়া অপ্রতিভের সুরে বলিল—বাবা, গোলমালে আমায় যে সিকিটা দিয়েছিলে চিনি আনতে, কোথায় পড়ে গিয়েচে খুঁজে পাই নি।

—যাক গে। চিনি নিয়ে চলে আসতে পারতিস কোন্‌কালে—তুই বড়ো চঞ্চল ছেলে খোকা।

দিন দুই পরে সে কি কাজে হ্যারিসন রোড দিয়া চিৎপুরের দিকে ট্রামে চড়িয়া যাইতেছিল, মোড়ের কাছে শীলেদের বাড়ির রোকড়নবিশ রামধনবাবুকে ছাতি মাথায় যাইতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি ট্রাম হইতে নামিল, কাছে গিয়া বলিল, কি রামধনবাবু, চিনতে পারেন?

রামধনবাবু হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, আরে অপূর্ববাবু যে! তারপর কোথা থেকে আজ এতকাল পরে! ওঃ, আপনি একটু অন্যরকম দেখতে হয়ে গিয়েছেন, তখন ছিলেন ছোকরা—

অপু হাসিয়া বলিল—তা বটে। এদিকেও চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হল—কতকাল আর ছোকরা থাকব—আপনি কোথায় চলেছেন?

—অফিস যাচ্ছি, বেলা প্রায় এগারোটা বাজে—না? একটু দেরি হয়ে গেল। একদিন আসুন না? কতদিন তো কাজ করেছেন, আপনার পুরানো অফিস, হঠাৎ চাকরিটা দিলেন ছেড়ে, তা নইলে আজ অ্যাসিসটান্ট ম্যানেজার হতে পারতেন, হরিচরণবাবু মারা গিয়েছেন কিনা।

সত্যিই বটে বেলা সাড়ে দশটা। রামধনবাবু পুরানো দিনের মতো ছাতি মাথায় লংক্লথের ময়লা ও হাত-ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে, ক্যাম্বিশের জুতা পায়ে দিয়া অপু দশ বৎসব পূর্বে যে অফিসটাতে কাজ করিত সেখানে গুটি গুটি চলিযাছেন।

অপু জিজ্ঞাসা করিল, রামধনবাবু, কতদিন কাজ হল ওদের ওখানে আপনার সবসুদ্ধ?

রামধনবাবু পুবানো দিনের মতো গর্বিত সুরে বলিলেন, এই সাঁইত্রিশ বছব যাচ্ছে। কেউ পারবে না বলে দিচ্ছি—এক কলমে এক সেরেস্তায়। আমার দ্যাখ্‌তায় পাঁচ-পাঁচটা ম্যানেজার বদল হল—কত এল, কত গেল—আমি ঠিক বজায় আছি। এ শর্মার চাকরি ওখান থেকে কেউ নড়াতে পারছেন না—যিনিই আসুন। হাসিয়া বলিলেন,—এবার মাইনে বেড়েছে, পঁয়তাল্লিশ হল।

অপুর মাথা কেমন ঘুরিয়া উঠিল—সাঁইত্রিশ বছর একই অন্ধকার ঘরে এই হাতবাক্সের উপর ভারী খেরো-বাঁধানো রোকড়ের খাতা খুলিয়া কালি ও স্টীলপেনের সাহায্যে শীলেদের সংসারের চালডালের হিসাব লিখিয়া চলা—চারিধারে সেই একই দোকান-পসার, একই পরিচিত গলি, একই সহকর্মীর দল, একই কথা ও আলোচনা—বারো মাস, তিনশো তিরিশ দিন! সে ভাবিতে পারে না—এই বদ্ধজল, পঙ্কিল, পচা পানা পুকুরের মতো গতিহীন, প্রাণহীন, ক্ষুদ্র জীবনের কথা ভাবিলেও তাহার গা কেমন করিয়া উঠে।

বেচারি রামধনবাবু—দরিদ্র, বৃদ্ধ, ওঁর দোষ নাই, তাও সে জানে। কলিকাতার বহু শিক্ষিত সমাজে, আড্ডায়, ক্লাবে সে মিশিয়াছে। বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবন—অর্থহীন, ছন্দহীন, ঘটনাহীন দিনগুলি। শুধু টাকা, টাকা—শুধু খাওয়া—পানাসক্তি, ব্রিজখেলা, ধূমপান, একই তুচ্ছ বিষয়ে

একঘেয়ে অসার বকুনি—তরুণ মনের শক্তি নষ্ট করিয়া দেয়, আনন্দকে ধ্বংস করে, দৃষ্টিকে সংকীর্ণ করে, শেষে ঘোর কুয়াশা আসিয়া সূর্যালোককে রুদ্ধ করিয়া দেয়—ক্ষুদ্র, পঙ্কিল অকিঞ্চিৎকর জীবন কোনরকমে খাত বাহিয়া চলে। সে শক্তিহীন নয়—এই পরিণাম হইতে সে নিজেকে বাঁচাইবে।

তারপর সে রামধনবাবুর অনুরোধে কতকটা কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া শীলেদের বাড়ি গেল। সেই আপিস, ঘরদোর, লোকের দল বজায় আছে। প্রবোধ মুহুরি বড়োলোক হইবার জন্য কোন লটারিতে প্রতি বৎসর একখানি টিকিট কিনিতেন, বলিতেন—ও পাঁচটা টাকা বাজে খরচের সামিল ধরে রেখেছি দাদা। যদি একবার লেগে যায়, তবে সুদে আসলে সব উঠে আসবে।

তাহা আজও আসে নাই, কারণ তিনি আজও দেবোত্তর এস্টেটের হিসাব কষিতেছেন।

খুব আদর-অভ্যর্থনা করিল সকলে। মেজবাবু কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। বেলা এগারোটা বাজে, তিনি এইমাত্র ঘুম হইতে উঠিয়াছেন—বিলিয়ার্ড ঘরের সামনের বারান্দাতে চাকর তাঁহাকে এখনই তৈল মাখাইবে, বড়ো রূপার গুড়গুড়িতে রেশমের গলাবন্ধওয়ালা নলে বেহারা তামাক দিয়া গেল।

এ বাড়ির একটি ছেলেকে অপু পূর্বে দিনকতক পড়াইয়াছিল, তখন সে ছোট ছিল, বেশ সুন্দর দেখিতে ছিল—ভারি পবিত্র মুখশ্রী, স্বভাবটিও ছিল ভারি মধুর। সে এখন আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে, কাছে আসিয়া পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল—অপু দেখিয়া ব্যথিত হইল যে, সে এই সকালেই অন্তত দশটা পান খাইয়াছে—পান খাইয়া ঠোঁট কালো—হাতে রূপার পানের কৌটা—পান জর্দা। এবার টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে, খানিকক্ষণ কেবল ফিল্মের গল্প করিল, বাস্টার কিটনকে মাস্টারমশায়ের কেমন লাগে?...চার্লি চ্যাপলিন? নর্মা শিয়ারার—ও সে অদ্ভুত!

ফিরিবার সময় অপুর মনটা বেদনায় পূর্ণ হইয়া গেল। বালক, ওর দোষ কি? এই আবহাওয়ার খুব বড়ো প্রতিভাও শুকাইয়া যায়—ও তো অসহায় বালক—

রামধনবাবু বলিলেন, চললেন অপূর্ববাবু? নমস্কার। আসবেন মাঝে মাঝে।

গলির বাহিরে সেই পচা খড় বিচালি, পচা আপেলের খোলা, শুঁটকি মাছের গন্ধ।

রাত্রিতে অপুর মনে হইল সে একটা বড়ো অন্যায় করিতেছে, কাজলের প্রতি একটা গুরুতর অবিচার করিতেছে। ওরও তো সেই শৈশব। কাজলের এই অমূল্য শৈশবের দিনগুলিতে সে তাহাকে এই ইট, কংক্রিট, সিমেন্ট ও বার্ডকোম্পানির পেটেন্ট স্টোনে বাঁধানো কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া দিনের পর দিন তাহার কাঁচা, উৎসুক, স্বপ্নপ্রবণ শিশুমন তুচ্ছ বৈচিত্র্যহীন অনুভূতিতে ভরাইয়া তুলিতেছে—তাহার জীবনে বন-বনানী নাই, নদীর মর্মর নাই, পাখির কলস্বর, মাঠ, জ্যোৎস্না, সঙ্গীসাথীদের সুখদুঃখ—এসব কিছুই নাই, অথচ কাজল অতি সুন্দর ভাবপ্রবণ বালক—তাহার পরিচয় সে অনেকবার পাইয়াছে।

কাজল দুঃখ জানুক, জানিয়া মানুষ হউক। দুঃখ তার শৈশবে গল্পে পড়া সেই সোনা-করা জাদুকর! ছোঁড়া-খোঁড়া কাপড়, ঝুলি ঘাড়ে বেড়ায়, এই চাপদাড়ি, কোণে-কাঁদাড়ে ফেরে, কারুর সঙ্গে কথা কয় না, কেউ পোঁছে না, সকলে পাগল বলে, দূর দূর করে, রাতদিন হাপর জ্বালায়; রাতদিন হাপর জ্বালায়।

পেতল থেকে, রাং থেকে, সীসে থেকে ও-লোক কিন্তু সোনা করিতে জানে, করিয়াও থাকে।

এই দিনটিতে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে সর্বপ্রথম এতকাল পরে একটা চিন্তা মনে উদয় হইল। নিশ্চিন্দিপুর একবারটি ফিরিলে কেমন হয়? সেখানে আর কেউ-না থাক, শৈশব-সঙ্গিনী রানুদিদি তো আছে। সে যদি বিদেশে চলিয়া যায়, তার আগে খোকাকে তার পিতামহের ভিটাটা দেখাইয়া আনাও তো একটা কর্তব্য?

পরদিনই সে কাশীতে লীলাদিকে পঁচিশটা টাকা পাঠাইয়া লিখিল, সে খোকাকে লইয়া একবার

নিশ্চিন্দিপুর যাইতেছে, খোকাকে পিতামহের গ্রামটা দেখাইয়া আনিবে। পত্রপাঠ যেন লীলাদি তার দেওরকে সঙ্গে লইয়া সোজা নিশ্চিন্দিপুর চলিয়া যায়।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

ট্রেনে উঠিয়াও যেন অপুর বিশ্বাস হইতেছিল না, সে সত্যই নিশ্চিন্দিপুরের মাটিতে আবার পা দিতে পারিবে—নিশ্চিন্দিপুর, সে তো শৈশবের স্বপ্নলোক! সে তো মুছিয়া গিয়াছে, মিলাইয়া গিয়াছে, সে শুধু একটা অনতিস্পষ্ট সুখস্মৃতি মাত্র, কখনও ছিল না, নাইও।

মাঝেরপাড়া স্টেশনে ট্রেন আসিল বেলা একটার সময়। খোকা লাফ দিয়া নামিল, কারণ প্ল্যাটফর্ম খুব নিচু। অনেক পরিবর্তন হইয়াছে স্টেশনটার, প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে জাহাজের মাস্তুলের মতো উঁচু যে সিগন্যালটা ছেলেবেলায় তাহাকে তাক লাগাইয়া দিয়াছিল সেটা আর এখন নাই। স্টেশনের বাইরে পথের উপর একটা বড়ো জাম গাছ, অপুর মনে আছে, এটা আগে ছিল না। ওই সেই বড়ো মাদার গাছটা, যেটার তলায় অনেককাল আগে তাহাদের এদেশ ছাড়িবার দিনটাতে মা খিচুড়ি রাঁধিয়াছিলেন। গাছের তলায় দুখানা মোটরবাস যাত্রীর প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া, অপুরা থাকিতে থাকিতে দুখানা পুরোনো ফোর্ড ট্যাক্সিও আসিয়া জুটিল। আজকাল নাকি নবাবগঞ্জ পর্যন্ত বাস ও ট্যাক্সি হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—জিনিসটা অপুর কেমন যেন ভালো লাগিল না। কাজল নবীন যুগের মানুষ, সাগ্রহে বলিল—মোটর কাটে করে যাব বাবা? অপু ছেলেকে জিনিসপত্রসমেত ট্যাক্সিতে উঠাইয়া দিল, বটের ঝুরি দোলানো, স্নিগ্ধ ছায়াভরা সেই প্রাচীন দিনের পথটা দিয়া সে নিজে মোটরে চড়িয়া যাইতে পারিবে না কখনই। এ দেশের সঙ্গে পেট্রোল গ্যাসের গন্ধ কি খাপ খায়?

চৈত্রমাসের শেষ। বাংলায় সত্যিকার বসন্ত এই সময়েই নামে। পথ চলিতে চলিতে পথের ধারে ফুলেভরা ঘেঁটুবনের সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ হইয়া গেল। এই কম্পমান চৈত্রদুপুরের রৌদ্রের সঙ্গে, আকন্দ ফুলের গন্ধের সঙ্গে শৈশব যেন মিশানো আছে—পশ্চিম বাংলার পল্লীতে এ কমনীয় বসন্তের রূপ সে তো ভুলিয়াই গিয়াছিল।

এই সেই বেত্রবতী! এমন মধুর স্বপ্নভরা নামটি কোন্ নদীর আছে পৃথিবীতে? খেয়া পার হইয়া আবার সেই আষাঢ়ুর বাজার। ভিডোল ডানলপ টায়ারের বিজ্ঞাপনওয়ালা পেট্রোলের দোকান নদীর উপরেই। বাজারেরও চেহারা অনেক বদল হইয়া গিয়াছে। তেইশ বছর আগে এত কোঠা বাড়ি ছিল না। আষাঢ়ু হইতে হাঁটিয়া যাওয়া সহজ, মাত্র দু মাইল, জিনিসপত্রের জন্য একটা মুটে পাওয়া গেল, মোটরবাস ও ট্যাক্সির দরুন ভাড়াটিয়া গরুর গাড়ি আজকাল নাকি এদেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। মুটে বলিল—ধঞ্চে-পলাশগাছির ওই কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে যাবেন তো বাবু? ধঞ্চেপলাশগাছি?...নামটাই তো কতকাল শোনে নাই, এতদিন মনেও ছিল না, উঃ, কতকাল পরে এই অতি সুন্দর নামটা সে আবার শুনিতেছে!

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে এমন সময়ে পথটা সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল—পাশেই মধুখালির বিল—পদ্মবনে ভরিয়া আছে। এই সেই অপূর্ব সৌন্দর্যভূমি, সোনাডাঙার স্বপ্নমাখানো মাঠটা—মনে হইল এত জায়গায় তো বেড়াইল, এমন অপরূপ মাঠ ও বন কই কোথাও তো দেখে নাই! সেই বনঝোপ, ঢিবি, বন, ফুলে ভর্তি বাব্‌লা—বৈকালের এ কী অপূর্ব রূপ!

তারপরই দূর হইতে ঠাকুরঝি পুকুরের সেই ঠ্যাঙাড়ে বটগাছটার উঁচু ঝাঁকড়া মাথাটা নজরে পড়িল—যেন দিক্‌সমুদ্রে ডুবিয়া আছে—ওর পরেই নিশ্চিন্দিপুর।—ক্রমে বটগাছটা পিছনে পড়িল— অপুর বুকের রক্ত চলকাইয়া যেন মাথায় উঠিতে চাহিতেছে, সারা দেহ এক অপূর্ব অনুভূতিতে যেন অবশ হইয়া আসিতেছে। ক্রমে মাঠ শেষ হইল, ঘাটের পথের সেই

আমবাগানগুলো—সে রুমাল কুড়াইবার ছলে পথের মাটি একটু তুলিয়া মাথায় ঠেকাইল। ছেলেকে বলিল—এই হল্গ তোমার ঠাকুরদার গাঁ, খোকা, ঠাকুরদাদার নামটা মনে আছে তো—বলো তো বাবা কি?

কাজল হাসিয়া বলিল—শ্রীহরিহর রায়, আহা, তা কি আর মনে আছে!

অপু বলিল, শ্রী নয় বাবা, ঈশ্বর বলতে হয়, শিখিয়ে দিলাম যে সেদিন?

বানুদির সঙ্গে দেখা হইল পরদিন বৈকালে।

সাক্ষাতের পূর্ব ইতিহাসটা কৌতুকপূর্ণ, কথাটা রানীর মুখেই শুনিল।

রানী অপু আসিবার কথা শুনে নাই, নদীর ঘাট হইতে বৈকালে ফিরিতেছে, বাঁশবনের পথে কাজল দাঁড়াইয়া আছে, সে একা গ্রামে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে।

রানী প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল—অনেককাল আগের একটা ছবি অস্পষ্ট মনে পড়িল—ছেলেবেলায় ওই ঘাটের ধারের জঙ্গলে-ভরা ভিটাটাতে হরিকাকারা বাস করিত, কোথায় যেন তাহারা উঠিয়া গিয়াছিল তারপরে। তাদের বাড়ির সেই অপু না?. .ছেলেবেলার সেই অপু! পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া সে কাছে গিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিল— অপুও বটে, নাও বটে। যে বয়সে সে গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছিল তার সে সময়ের চেহারাখানা রানীর মনে আঁকা আছে, কখনও ভুলিবে না—সেই বয়স, সেই চেহারা, অবিকল। রানী বলিল—তুমি কাদের বাড়ি এসেছ খোকা?

কাজল বলিল—গাঙ্গুলীদের বাড়ি—

বানী ভাবিল, গাঙ্গুলীরা বড়োলোক, কলিকাতা হইতে কেহ কুটুম্ব আসিয়া থাকিবে, তাদেরই ছেলে। কিন্তু মানুষের মতোও মানুষ হয়! বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিয়াছিল একেবারে। গাঙ্গুলীবাড়ির বড়ো মেয়ের নাম করিয়া বলিল—তুমি বুঝি কাদুপিসির নাতি?

কাজল লাজুক চোখে চাহিয়া বলিল—কাদুপিসি কে জানি নে তো? আমার ঠাকুরদাদাব এই গাঁয়ে বাড়ি ছিল—তাঁর নাম ঈশ্বর হরিহর রায়—আমার নাম অমিতাভ রায়।

বিস্ময়ে ও আনন্দে রানীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না অনেকক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে একটা অজানা ভয়ও হইল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলিল—তোমার বাবা—খোকা?...

কাজল বলিল—বাবার সঙ্গেই তো কাল এলাম। গাঙ্গুলীবাড়িতে এসে উঠলাম রাত্রে। বাবা ওদের বাইরের ঘরে বসে গল্প করছে, মেলা লোক দেখা করতে এসেছে কিনা তাই।...

রানী দুই হাতের তালুর মধ্যে কাজলের সুন্দর মুখখানা লইয়া আদরের সুরে বলিল—খোকন, খোকন, ঠিক বাবার মতো দেখতে—চোখ দুটি অবিকল! তোমার বাবাকে এ পাড়ায় ডেকে নিয়ে এসো খোকন। বলগে রানুপিসি ডাকচে।

সন্ধ্যার আগেই ছেলের হাত ধরিয়া অপু রানীদের বাড়ি ঢুকিয়া বলিল—কোথায় গেলে রানুদি, চিনতে পারো?...রানু ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল, অবাক হইয়া খানিকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, বলিল—মনে করে যে এলি এতকাল পরে?—তা ও-পাড়ায় গিয়ে উঠলি কেন? গাঙ্গুলীরা আপনার লোক হল তোর?...পরে লীলাদির মতো সেও কাঁদিয়া ফেলিল।

কি অদ্ভুত পরিবর্তন! অপুও অবাক হইয়া দেখিতেছিল, চোদ্দ বছরের সে বালিকা রানুদি কোথায়! বিধবার বেশ, বাল্যের সে লাবণ্যের কোনও চিহ্ন না থাকিলেও রানী এখনও সুন্দরী। কিন্তু এ যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত, শৈশব-সঙ্গিনী রানুদির সঙ্গে ইহার মিল কোথায়?...এই সেই রানুদি!

সে কিন্তু সকলের অপেক্ষা আশ্চর্য হইল ইহাদের বাড়িটার পরিবর্তন দেখিয়া। ভুবন মুখুজ্যেরা ছিলেন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, ছেলেবেলার সে আট-দশটা গোলা, প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ, গরুবাছুর, লোকজনের কিছু নাই। চণ্ডীমণ্ডপের ভিটা মাত্র পড়িয়া আছে, পশ্চিমের কোঠা ভাঙিয়া কাহারা ইট লইয়া গিয়াছে—বাড়িটার ভাঙা, ধ্বসা, ছন্নছাড়া চেহারা, এ কি অদ্ভুত পরিবর্তন?

রানী সজল চোখে বলিল—দেখছিস্ কি, কিছু নেই আর। মা বাবা মারা গেলেন, টুনু, খুড়িমা এঁরাও গেলেন, সতুর মা-ও মারা গেল, সতু মানুষ হল না তো, এতদিন বিষয় বেচে বেচে চালাচ্ছে। আমরাও—

অপু বলিল—হ্যাঁ, লীলাদির কাছে সব শুনলাম সেদিন কাশীতে—

—কাশীতে? দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছে তোর? কবে—কবে?...

পরে অপুর মুখে সব শুনিয়া সে ভারি খুশি হইল। দিদি আসিতেছে তাহা হইলে? কতকাল দেখা হয় নাই।

রানী বলিল—বৌ কোথায়? বাসায়—তোর কাছে?

অপু হাসিয়া বলিল—স্বর্গে।

—ও আমার কপাল! কতদিন? বিয়ে করিস নি আব?..

সেই দিনই আবার বৈকালে চড়ক। আর তেমন জাঁকজমক হয় না, চড়ক গাছ পুঁতিয়া কেহ ঘুরপাক খায় না। সে বাল্যমন কোথায়, মেলা দেখার অধীর আনন্দে ছুটিয়া যাওয়া—সে মনটা আর নাই, কেবল সে-সব অর্থহীন আশা, উৎসাহ, অপূর্ব অনুভূতির স্মৃতিটা মাত্র আছে। এখন যেন সে দর্শক আর বিচারক মাত্র, চব্বিশ বৎসরে মনটা কেমন বদলাইয়া গিয়াছে, বাড়িযাছে—তাহারই একটি মাপকাঠি আজ খুঁজিয়া পাইয়া দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। চড়কতলায় পুরানো আমলের কত পরিচিত বন্ধু নাই, নিবারণ গোয়ালা লাঠি খেলিত, ক্ষেত্র কাপালি বহুরূপীর সাজ দিত, হাবান মাল বাঁশের বাঁশি বাজাইয়া বিক্রয় করিত, ইহারা কেহ আর নাই, কেবল পুরাতনের সঙ্গে একটা যোগ এখনও আছে। চিনিবাস বৈরাগী এখনও তেলেভাজা খাবারের দোকান করে।

আজ চব্বিশ বছর আগে এই চড়কের মেলার পরদিনই তারা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল—তারপর কত ঘটনা, কত দুঃখ বিপদ, কত নূতন বন্ধুবান্ধব সব, গোটা জীবনটাই—কিন্তু কেমন করিয়া এত পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও সেই দিনটির অনুভূতিগুলির স্মৃতি এত সজীব, টাটকা, তাজা অবস্থায় আজ আবার ফিরিয়া আসিল!

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। চড়কের মেলা দেখিয়া হাসিমুখে ছেলেমেয়েরা ফিরিয়া যাইতেছে, কারও হাতে বাঁশের বাঁশি, কারও হাতে মাটির রং করা ছোবা পালকি। একদল গেল গাঙ্গুলীপাড়ার দিকে, একদল সোনাডাঙা মাঠের মাটির পথ বাহিয়া, ছাতিমবনের তলায় ধুলজুড়ি মাধবপুরের খেয়াঘাটে—চব্বিশ বছর আগে যাহারা ছিল ছোট, এই রকম মেলা দেখিয়া ভেঁপু বাজাইতে বাজাইতে তেলেভাজা, জিবেগজা হাতে ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহারা অনেকদিন বড়ো হইয়া নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—কেউ বা মারা গিয়াছে; আজ তাহাদের ছেলেমেয়েদের দল ঠিক আবার তাহাই করিতেছে, মনে মনে আজিকাল এই নিষ্পাপ দায়িত্বহীন জীবনকোরকগুলিকে সে আশীর্বাদ করিল।

বৈশাখের প্রথমেই লীলা তার দেওরের সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুরে আসিল। দুই বোনে অনেকদিন পরে দেখা, দুইজনে গলা জড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। অপুকে লীলা বলিল—তোর মনে যে এত ছিল, তা তখন কি জানি? তোর কল্যাণেই বাপের ভিটে আবার দেখলুম, কখনও আশা ছিল না যে আবার দেখব

খোকার জন্য কাশী হইতে একরাশ খেলনা ও খাবার আনিয়াছে, মহা খুশির সহিত পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া সকলের সঙ্গে দেখাশুনা করিল।

অপু বৈকালে ছেলেকে লইয়া নৌকায় খাবরাপোতার ঘাট পর্যন্ত বেড়াইতে গেল। তেঁতুলতলার ঘাটের পাশে দক্ষিণদেশের ঝিনুকতোলা বড়ো নৌকা বাঁধা ছিল, হাওয়ায় আলকাতরা ও গাবের রস মাখানো বড়ো ডিঙিগুলার শৈশবের সেই অতি পুরাতন বিস্মৃত গন্ধ...নদীর উত্তর পাড়ে ক্রমাগত নলবন, ওক্ড়া ও বন্যেবুড়োর গাছ, ঢালু ঘাসের জমি জলের কিনারা ছুঁইয়া আছে,

মাঝে মাঝে ঝিঙে পটলের ক্ষেতে উত্তুরে মজুরেরা টোকা মাথায় নিড়ান দেয়, এক এক স্থানে নদীর জল ঘন কালো, নিথর, কলার পাটির মতো সমতল—যেন মনে হয়, নদী এখানে গহন, গভীর, অতলস্পর্শ,—ফুলে ভরা উলুখড়ের মাঠ, আকন্দবন, ডাঁসা খেজুরের কাঁদি দুলানো খেজুর গাছ, উইটিবি, বকের দল, উঁচু শিমুল ডালে চিলের বাসা—সবাইপুরের মাঠের দিক হইতে বড়ো এক ঝাঁক শামকুট পাখি মধুখালির বিলের দিকে গেল—একটা বাবলাগাছে অজস্র বন-ধুঁধুল ফল দুলিতে দেখিয়া খোকা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওই দেখো বাবা, সেই যে কলকাতায় আমাদের গলির মোড়ে বিক্রি হয় গায়ে সাবান মাখবার জন্যে, কত ঝুলছে দেখো, ও কি ফল বাবা?

অপু কিন্তু নির্বাক হইয়া বসিয়া ছিল। কতকাল সে এসব দেখে নাই!...পৃথিবীর এই মুক্ত রূপ তাহাকে যে আনন্দ দেয়, সে আনন্দ উগ্রবীর্য সুরার মতো নেশার ঘোর আনে তাহার শিরার রক্তে, তাহা অভিভূত করিয়া ফেলে, আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তাহা অবর্ণনীয়। ইহাদের যে গোপন বাণী শুধু তাহারই মনের কানে কানে, মুখে তাহা বলিয়া বুঝাইবে সে কাহাকে?

দূর গ্রামের জাওয়া-বাঁশের বন অস্ত-আকাশের রাঙা পটে অতিকায় লায়ার পাখির পুচ্ছের মতো খাড়া হইয়া আছে, একধারে খুব উঁচু পাড়ে সারিবাঁধা গাঙশালিকের গর্ত, কি অপূর্ব শ্যামলতা, এই সান্ধ্য-শ্রী!

কাজল বলিল— বেশ দেশ বাবা—না?

—তুই এখানে থাক খোকা—আমি যদি রেখে যাই এখানে, থাকতে পারবি নে? তোর পিসিমার কাছে থাকবি, কেমন তো?

কাজল বলিল—হ্যাঁ, ফেলে রেখে যাবে বইকি! আমি তোমার সঙ্গে যাব বাবা।

অপু ভাবিতেছিল শৈশবে এই ইছামতী ছিল তার কাছে কি অপূর্ব কল্পনায় ভরা! গ্রামের মধ্যের বর্ষাদিনের জলকাদাভরা পথঘাট, বাঁশপাতা পচা আঁটাল মাটির গন্ধ থেকে নিষ্কৃতি পাইয়া সে মুক্ত আকাশের তলে নদীর ধারটিতে আসিয়া বসিত। কত বড়ো নৌকা ওর ওপর দিয়া দূর দেশে চলিয়া যাইত। কোথায় ঝালকাটি, কোথায় বরিশাল, কোথায় রায়মঙ্গল—অজানা দেশের কল্পনায় মুগ্ধ মনে কতদিন সে না ভাবিয়াছে, সেও একদিন ওই রকম নেপাল মাঝির বড়ো ডিঙিটা করিয়া নিরুদ্দেশ বাণিজ্যযাত্রায় বাহির হইয়া যাইবে।

ইছামতী ছিল পাড়াগাঁয়ের গরিব ঘরের মা। তার তীরের আকাশ-বাতাসের সংগীত মায়ের মুখের ঘুমপাড়ানি গানের মতো শত স্নেহে তার নব-মুকুলিত কচি মনকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল, তার তীরে সে সময়ের কত আকাঙ্ক্ষা, বৈচিত্র্য, রোমান্স,—তার তীর ছিল দূরের অদেখা বিদেশ, বর্ষার দিনে এই ইছামতীর কূলে-কূলে ভরা ঢলঢল গৈরিক রূপে সে অজানা মহাসমুদ্রের তীরহীন অসীমতার স্বপ্ন দেখিত—ইংরাজী বই-এ পড়া Cape Nun-এর ওদিকের দেশটা—যে দেশ হইতে লোক আর ফেরে না—He who passes Cape Nun, will either return or not—মুগ্ধচোখে কূল-ছাপানোর ইছামতী দেখিয়া তখন সে ভাবিত—ওঃ, কত বড়ো আমাদের এই গাঙটা!

এখন সে আর বালক নাই, কত বড়ো বড়ো নদীর দুকূল-ছাপানো লীলা দেখিয়াছে—গঙ্গা, শোণ, বড়দল, নর্মদা—তাদের অপূর্ব সন্ধ্যা, অপূর্ব বর্ণসম্ভার দেখিয়াছে—সে বৈচিত্র্য, সে প্রখরতা ইছামতীর নাই, এখন তার চোখে ইছামতী ছোট নদী। এখন সে বুঝিয়াছে তার গরিব ঘরের মা উৎসব-দিনের বেশভূষায় তার শৈশব-কল্পনাকে মুগ্ধ করিয়া দিত, এসব বনেদি বড়ো ঘরের মেয়েদের হীরামুক্তার ঘটা, বারাণসী শাড়ির রংঢং-এর কাছে তার মায়ের সেই কাচের চুড়ি, শাঁখা কিছুই নয়।

কিন্তু তা বলিয়া ইছামতীকে সে কি কখনও ভুলিবে?

দুপুরে সে ঘরে থাকিতে পারে না। এই চৈত্রদুপুরের রোদের উষ্ণ নিঃশ্বাস কত পরিচিত গন্ধ

বহিয়া আনে—শুকনো বাঁশের খোলার, ফুটন্ত ঘেঁটুবনের, ঝরাপাতার সোঁদা সোঁদা রোদপোড়া মাটির, নিম ফুলের, আরও কত কি কত কি,—বাল্যে এই সব দুপুর তাকে ও তাহার দিদিকে পাগল করিয়া দিয়া টো টো করিয়া শুধু মাঠে বাগানে, বাঁশতলায়, নদীর ধারে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইত—আজও সেই রকমই পাগল করিয়া দিল। গ্রামসুদ্ধ সবাই দুপুরে ঘুমায়—সে একা বাহির হয়—উদ্‌ভ্রান্তের মতো মাঠের ঘেঁটুফুলে ভরা উঁচু ডাঙায়, পথে পথে নিঝুম দুপুরে বেড়াইয়া ফেরে—কিন্তু তবু মনে হয়, বাল্যের স্মৃতিতে যতটা আনন্দ পাইতেছে, বর্তমানের আসল আনন্দ সে ধরনের নয়—আনন্দ আছে কিন্তু তাহার প্রকৃতি বদলাইয়া গিয়াছে। তখনকার দিনে দেবদেবীরা নিশ্চিন্দিপুরের বাঁশবনের ছায়ায় এই সব দুপুরে নামিয়া আসিতেন। এক একদিন সে নদীর ধারের সুগন্ধ তৃণভূমিতে চুপ করিয়া হাতে মাথা রাখিয়া শুইয়া থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কিছুই করে না, রৌদ্রভরা নীল আকাশের দিকে চাহিয়া শুধু চুপ করিয়া থাকে—কিছু ভাবেও না...সবুজ ঘাসের মধ্যে মুখ ডুবাইয়া মনে মনে বলে—ওগো মাতৃভূমি, তুমি ছেলেবেলায় যে অমৃতদানে মানুষ করেছিলে, সেই অমৃত হল আমার জীবনপথের পাথেয়—তোমার বনের ছায়ায় আমার সকল স্বপ্ন জন্ম নিয়েছিল একদিন, তুমি আবার শক্তি দাও, হে শক্তিরূপিণী!

দুঃখ হয় কলিকাতার ছাত্রটির জন্য। এদের বাপের বাড়ি বৌবাজারে, মামার বাড়ি পটুয়াটোলায়, পিসির বাড়ি বাগবাজারে—বাংলাদেশকে দেখিল না কখনও। এরা কি মাধবপুর গ্রামের উলুখড়ের মাঠের ওপারের আকাশে রং-ধরা দেখিল? স্তব্ধ শরৎদুপুরের ঘন বনানীর মধ্যে ঘুঘুর ডাক শুনিয়াছে? বন-অপরাজিতা ফুলের নীরব মহোৎসব ওদের শিশু-আত্মায় তার আনন্দের স্পর্শ দিয়াছে কোনও কালে? ছোট্ট মাটির ঘরের দাওয়ায় আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া নারিকেল পত্রশাখায় জ্যোৎস্নার কাঁপন দেখে নাই কখনও—এরা অতি হতভাগ্য।

রানীর যত্নে আদরে সে মুগ্ধ হইয়া গেল। সতুদের বাড়ির সে-ই আজকাল কর্ত্রী, নিজের ছেলেমেয়ে হয় নাই, ভাইপোদের মানুষ করে। অপুকে রানী বাড়িতে আনিয়া রাখিল—কাজলকে দু-দিনে এমন আপন করিয়া লইয়া ফেলিয়াছে যে, সে পিসিমা বলিতে অজ্ঞান। রানীর মনে মনে ধারণা, অপু শহরে থাকে যখন, তখন খুব চায়ের ভক্ত,—দুটি বেলা ঠিক সময়ে চা দিবার জন্য তাহার প্রাণপণ চেষ্টা। চায়ের কোন সরঞ্জাম ছিল না, লুকাইয়া নিজের পয়সায় সতুকে দিয়া নবাবগঞ্জের বাজার হইতে চায়ের ডিস পেয়ালা আনাইয়া লইয়াছে—অপু চা তেমন খায় না কখনও, কিন্তু এখানে সে সে কথা বলে না। ভাবে—যত্ন করছে রানুদি, করুক না। এমন যত্ন আর জুটবে কোথাও? তুমিও যেমন!

দুপুরে একদিন খাইতে বসিয়া অপু চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে। রানীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাসিয়া বলিল—একটা বড়ো চমৎকার ব্যাপার হল—দেখো, এই টকে-যাওয়া এঁচড়-চচ্চড়ি কতকাল খাই নি—নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে আর কখনও নয়—তাই মুখে দিয়েই ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল রানুদি—

রানুদি বোঝে এসব কথা—তাই রানুদির কাছে বলিয়াও সুখ।

এ কয়দিন আকাশটা ছিল মেঘ-মেঘ। কিন্তু হঠাৎ কখন মেঘ কাটিয়া গিয়াছে সে জানে না—বৈকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া সে অবাক চোখে চুপ করিয়া বাহিরের রোয়াকে বসিয়া রহিল—বাল্যের সেই অপূর্ব বৈকাল—যাহার জন্য প্রথম প্রথম বিরহী বালক-মন কত হাঁপাইয়াছে বিদেশে, ক্রমে একটা অস্পষ্ট মধুর স্মৃতিমাত্র মনে আঁকিয়া রাখিয়া যেটা কবে মন হইতে বেমালুম অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল—

মনে পড়ে, ছেলেবেলায় এই সব সময়ে ঘুম ভাঙিয়া তাহার মনটা কেমন অকারণে খারাপ হইত—এক একদিন এমন কান্না আসিত, বিছানায় বসিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিত—তাহার মা ঘাট হইতে আসিয়া বলিত—ও-ওই উড়ে গেল—ও-ও ওই!...কেঁদো না খোকা, বাইরে এসে পাখি

দেখসে। আহা-হা তোমার বড়ো দুখ্খু খোকন—তোমার নাতি মরেছে, পুতি মরেছে, সাত ডিঙে ধন সমুদ্দুরে ডুবে গিয়েছে, তোমার বড়ো দুখ্খু—কেঁদো না, কেঁদো না, আহা হা!...

রানী পাতকুয়া হইতে জল তুলিয়া আনিতে যাইতেছে, অপু বলিল—মনে পড়ে রানুদি, এই উঠানে এমন সব বিকেলে বৌ-চুরি খেলা খেলতুম কত, তুমি, আমি, দিদি, সতু, নেড়া—?

রানী বলিল—আহা, তাই বুঝি ভাবছিস্ বসে বসে! কত মালা গাঁথতুম মনে আছে বকুলতলায়? সারাদিন বকুলতলাতেই পড়ে আছি, আমি, দুগ্‌গা—আজকাল ছেলেমেয়েরা আর মালা গাঁথে না, বকুল ফুলও আর তেমন পড়ে থাকে না—কালে কালে সবই যাচ্চে।

কিছু পরে জল লইয়া ফিরিবার সময়ে বলিল—এক কাজ কর না কেন অপু, সতু তো তোদের নীলমণি জ্যাঠার দরুন জমাটা ছেড়ে দেবে, তুই কেন গিয়ে বাগানটা নিগে যা না? তোদেরই তো ছিল—ও যা, নিজের জমি-জমাই বিক্রি করে ফেললে সব, তা আবার জমার বাগান রাখবে—নিবি তুই?

অপু বলিল,—মায়ের বড়ো ইচ্ছে ছিল, রানুদি। মরবার কিছুদিন আগেও বলত বড়ো হলে বাগানখানা নিস অপু। আমার আপত্তি নেই, যা দাম হবে আমি দেব।

প্রতি সন্ধ্যায় সতুদের রোয়াকে মাদুর পাতা হয়, বানী, লীলা, অপু, ছেলেপিলেদের মজলিশ বসে। সতুও যোগ দেয়, তবে তামাকেব দোকান বন্ধ কবিয়া আসিতে তাহাব রাত হইয়া যায়। অপু বলে—আচ্ছা, আজকাল তোমরা ঘাটেব পথে ষাঁড়াতলায় পিঠে দাও না রানুদি? কই সেই ষাঁড়াগাছটা তো নেই সেখানে? রানী বলে—সেটা মরে গিয়েছে—তার পাশেই একটা চারা, দেখিস নি সিঁদুব দেওয়া আছে?...নানা পুরানো কথা হয়। অপু জিজ্ঞাসা করে—ছেলেবেলায় একবাব পঙ্গপালের দল এসেছিল, মনে আছে লীলাদি?. .গ্রামেব একটি বিধবা যখন নববধূরূপে এ গ্রামে প্রথম আসেন, অপু তখন ছেলেমানুষ। তিনিও সন্ধ্যার পবে এ বাড়িতে আসেন। অপু বলে—খুড়িমা, আপনি নতুন এসে কোথায় দুধে-আলতার পাথরে দাঁড়িয়েছিলেন মনে আছে আপনার?

বিধবাটি বললেন—সে সব কি আব এ জন্মের কথা, বাবা? সে-সব কি আর মনে আছে?

অপু বলে—আমি বলি শুনুন, আপনাদের দক্ষিণের উঠোনে যে নিচু গোয়ালঘরটা ছিল, তারই ঠিক সামনে।

বিধবা মেয়েটি আশ্চর্য হইয়া বলেন—ঠিক, ঠিক, এখন মনে পড়েছে, এত দিনের কথা তোমার মনে আছে বাবা!

তাঁদেরই বাড়ির আর এক বিবাহে কোথা হইতে তাঁদেব এক কুটুম্বিনী আসেন, খুব সুন্দরী—এতকাল পর তাঁর কথা উঠে। সবাই তাঁকে দেখিয়াছিল সে সময়, কিন্তু নামটা কাহারও মনে নাই এখন। অপু বলে—দাঁড়াও রানুদি, নাম বলছি—তাঁর নাম সুবাসিনী।

সবাই আশ্চর্য হইয়া যায়। লীলা বলে—তোর তখন বয়েস আট কি নয়, তোর মনে আছে তাঁর নাম?—ঠিক, সুবাসিনীই বটে। সবারই মনে পড়ে নামটা।

অপু মৃদু মৃদু হাসিমুখে বলে—আরও বলছি শোনো, ডুরে শাড়ি পরত, রাঙা জমির ওপব ডুরে দেওয়া—না?

বিধবা বধূটি বলেন, ধন্যি বাপু যা হোক, রাঙা ডুরে পরত ঠিকই, বয়েস ছিল বাইশ-তেইশ। তখন তোমার বয়েস বছর আষ্টেক হবে। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগেকার কথা যে!

অপুর খুব মনে আছে, অত সুন্দরী মেয়ে তাদের গাঁয়ে আর আসে নাই ছেলেবেলায়। সে বলিল—রাঙা শাড়ি পরে আমাদের উঠোনের কাঁটালতলায় জল সইতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এখনও।

এখানকার বৈকালগুলি সত্যই অপূর্ব। এত জায়গায় তো সে বেড়াইল, মাসখানেক এখানে থাকিয়া মনে হইল এমন বৈকাল সে কোথাও দেখে নাই। বিশেষ করিয়া বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের

মেঘহীন এই বৈকালগুলিতে সূর্য যেদিন অস্ত যাইবার পথে মেঘাবৃত না হয়, শেষ রাঙা আলোটুকু পর্যন্ত বড়ো গাছের মগডালে, বাঁশঝাড়ের আগায় হালকা সিঁদুরের রং মাখাইয়া দেয়, সেদিনের বৈকাল। এমন বিল্বফুলের অপূর্ব সুরভিমাখানো, এমন পাখি-ডাকা উদাস বৈকাল—কোথায় এর তুলনা? এত বেলগাছও কি এদেশটায়, ঘাটে, পথে, এ-পাড়া, ও-পাড়া সর্বত্র বিল্বফুলের সুগন্ধ।

একদিন—জ্যৈষ্ঠের প্রথমটা, বৈকালে আকাশ অন্ধকার করিয়া ঈশান কোণ হইতে কালবৈশাখীর মেঘ উঠিল, তারপরেই খুব ঝড়, এ বছরের প্রথম কালবৈশাখী। অপু আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল—তাদের পোড়োভিটার বাঁশবনের মাথার উপরকার দৃশ্যটা কি সুপরিচিত! বাল্যে এই মাথাদুলানো বাঁশঝাড়ের উপরকারের নীলকৃষ্ণ মেঘসজ্জা মনে কেমন সব অনতিস্পষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগাইত, কত কথা যেন বলিতে চাহিত, আজও সেই মেঘ, সেই বাঁশবন, সেই বৈকাল সবই আছে, কিন্তু সে অপূর্ব জগৎটা আর নাই। এখন যা আনন্দ সে শুধু স্মৃতির আনন্দ মাত্র। এবার নিশ্চিন্দিপুর ফিরিয়া অবধি সে ইহা লক্ষ করিতেছে—এই বন, এই দুপুর এই গভীর রাত্রে চৌকিদারের হাঁকুনি, লক্ষ্মীপেঁচার ডাকের সঙ্গে কি এক অপূর্ব স্বপ্নমাখানো ছিল, দিগন্তরেখার ওপারের এক রহস্যময় কল্পলোক তখন সদা-সর্বদা হাতছানি দিয়া আহ্বান করিত—তাদের সন্ধান আর মেলে না।

সে পাখির দল মরিয়া গিয়াছে, তেমন দুপুর আর হয় না; যে চাঁদ এমন বৈশাখী রাত্রে খড়ের ঘরের দাওয়ার ধারের নারিকেল পত্রশাখায় জ্যোৎস্নার কম্পন আনিয়া এক ক্ষুদ্র কল্পনাপ্রবণ গ্রাম্য বালকের মনে মূলহীন, কারণহীন আনন্দের বান ডাকাইত, সে সব চাঁদ নিভিয়া গিয়াছে। সেই বালকটিই বা কোথায়? পঁচিশ বৎসব আগেকার এক দুপুরে বাপ-মায়ের সঙ্গে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, আর ফেরে নাই, জাওয়া-বাঁশেব বনের পথে তার ছোট ছোট পায়ের দাগ অস্পষ্ট হইয়া মুছিয়া গিয়াছে বহুদিন।

তার ও তার দিদির সে সব আশা পূর্ণ হইয়াছিল কি?

হায় অবোধ বালক-বালিকা!...

রোজ রোজ বৈকালে মেঘ হয়, ঝড় ওঠে। অপু বলে, রানুদি, আম কুড়িয়ে আনি? রানী হাসে। অপু ছেলেকে লইয়া নতুন কেনা বাগানে আসিয়া দাঁড়ায়—সবাইকে আম কুড়াইতে ডাকে, কাহাকেও বাধা দেয় না। বাল্যের সেই পটুলে, তেঁতুলতলী, নেকো, বাঁশতলা,—ঘন মেঘের ছায়ায় জেলেপাড়ার তো আবালবৃদ্ধবনিতা ধামা হাতে আম কুড়াইতে আসে। অপু ভাবে, আহা, জীবনে এই এদের কত আনন্দেব কত সার্থকতার জিনিস। চারিধারে চাহিয়া দেখে, সমস্ত বাগানের তলাটা ধাবমান, কৌতুকপর, চিৎকার-রত বালক-বালিকাতে ভরিয়া গিয়াছে!

দিদি দুর্গা, ছোট্ট মেয়েটি, এই কাজলের চেয়ে কিছু বড়ো, পরের বাগানে আম কুড়াইবার অপরাধে বকুনি খাওয়া কৃত্রিম উল্লাসভরা হাসিমুখে একদিন এই ফণিমনসার ঝোপের পাশের বেড়াটা গলিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল—বহুকালের কথাটা।

অপু কি করিবে আমবাগানে? এই সব গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা সাধ মিটাইয়া আম কুড়াইবে এ বাগানে, কেহ তাহাদের বারণ করিবার থাকিবে না, বকিবার থাকিবে না, অপমান করিবার থাকিবে না, ফণিমনসার ঝোপের আড়ালে অপমানিত ছোট্ট খুকিটি ধুলামাখা আঁচল গুছাইয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু তৃপ্তির হাসি হাসিবে...

এত দিন এখানে আসিলেও নিজেদের ভিটাটাতে ঢুকিতে পারে নাই, যদিও বাহির হইতে সেটা প্রতিদিনই দেখিত; কারণ ঘাটের পথটা তার পাশ দিয়াই। বৈকালের দিকে সে একদিন একা চুপি চুপি বনজঙ্গল ঠেলিয়া সেখানে ঢুকিল। বাড়িটা আর নাই, পড়িয়া ইট স্তূপাকার হইয়া আছে—লতাপাতা, শ্যাওড়াবন, বনচাল্‌তার গাছ, ছেলেবেলাকার মতো কালমেঘের জঙ্গল। পিছনের বাঁশঝাড়গুলা এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাড়িয়া চারিধারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

কোনও ঘরের চিহ্ন নাই, বনজঙ্গল, রাঙা রোদ বাঁশের মগডালে। পশ্চিমের পাঁচিলের গায়ে সেই কুলুঙ্গিটা আজও আছে, ছেলেবেলায় যে কুলুঙ্গিটাতে সে ভাঁটা, বাতাবিলেবুর বল, কড়ি রাখিত। এত নিচু কুলুঙ্গিটা তখন কত উঁচু বলিয়া মনে হইত, তাহার মাথা ছাড়াইয়া উঁচু ছিল, ডিঙাইয়া দাঁড়াইলে তবে নাগাল পাওয়া যাইত! ঠেস-দেওয়ালের গায়ে ছুরি দিয়া ছেলেবেলায় একটা ভূত আঁকিয়াছিল, সেটা এখনও আছে। পাশেই নীলমণি জ্যাঠামশায়ের পোড়োভিটা—সেও ঘন বনে ভরা, চারিধার নিঃশব্দ, নির্জন—এ পাড়াটাই জনহীন হইয়া গিয়াছে, এধার দিয়া লোকজনের যাতায়াত বড়ো কম। এই সে স্থানটি, কতকাল আগে যেখানে দিদি ও সে একদিন চড়ুইভাতি করিয়াছিল! কন্টকাকীর্ণ শেঁয়াকুল বনে দুর্গম দুর্ভেদ্য হইয়া পড়িয়াছে সারা জায়গাটা। পোড়োভিটার সে বেলগাছটা—একদিন যার তলায় ভীষ্মদেব শরশয্যা পাতিতেন তাহার নয় বৎসরের শৈশবে—সেটা এখনও আছে, পুষ্পিত শাখা-প্রশাখার অপূর্ব সুবাসে অপরাহ্নের বাতাস স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

পাঁচিলের ঘুলঘুলিটা কত নিচু বলিয়া মনে হইতেছে, এইটাতেই অপু আশ্চর্য হইল—বার বার কথাটা তার মনে হইতেছিল। কত ছোট ছিল সে তখন! খোকার মতো অতটুকু বোধ হয়।

কাঁচাকলাযের ডালের মতো সেই কি লতার গন্ধ বাহির হইতেছে!...কতদিন গন্ধটা মনে ছিল না, বিদেশে আর সব কথা হয়তো মনে পড়িতে পারে, কিন্তু পুরাতন দিনের গন্ধগুলা তো মনে পড়ে না—

এ অভিজ্ঞতাটা অপুর এতদিন ছিল না! সেদিন বাঁওড়ের ধারে বেড়াইতে গিয়া পাকা বটফলের গন্ধে অনেকদিনের একটা স্মৃতি মনে উদয় হইয়াছিল—ছোট্ট কাচের পরকলা বসানো মোমবাতির সেকেলে লণ্ঠন হাতে তাহার বাবা শশী যোগীর দোকানে আলকাতবা কিনিতে আসিয়াছে—সেও আসিয়াছে বাবাব কাঁধে চড়িয়া বাবার সঙ্গে—কাচের লণ্ঠনের ক্ষীণ আলো, আধ-অন্ধকার বাঁশবন, বাঁওড় হইতে নাল ফুল তুলিয়া বাবা তাহার হাতে দিয়াছে—কোন্ শৈশবের অস্পষ্ট ছবিটা, অবাস্তব, ধোঁয়া-ধোঁয়া! পাকা বটফলের গন্ধে কতকাল পরে তাহার সেই অত্যন্ত শৈশবের একটা সন্ধ্যা আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল সেদিন।

পোড়োভিটার সীমানায় প্রকাণ্ড একটা খেজুর গাছে কাঁদি কাঁদি ডাঁসা খেজুর ঝুলিতেছে—এটা সেই চারা খেজুর গাছটা, দিদি যার ডাল কাটারি দিয়া কাটিয়া গোড়ার দিকে দড়ি বাঁধিয়া খেলাঘবের গরু করিত—কত বড়ো ও উঁচু হইয়া গিয়াছে গাছটা!

এইখানে খিড়কিদোরটা ছিল, চিহ্নও নাই কোনও! এইখানে দাঁড়াইয়া দিদির চুরি-করা সেই সোনার কৌটাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল একদিন। কত সুপরিচিত জিনিস এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর আজও আছে! রাঙী গাইয়ের বিচালি খাওয়ার মাটির নাদাটা কাঁটালতলায় বাঁশপাতা ও মাটি বোঝাই হইয়া এখনও পড়িয়া আছে। ছেলেবেলায় ঠেস দেওয়াল গাঁথার জন্য বাবা মজুর দিয়া এক জায়গায় ইট জড়ো করিয়া রাখিয়াছিলেন...অর্থাভাবে গাঁথা হয় নাই। ইটগুলা এখনও বাঁশবনের ছায়ায় তেমনি পড়িয়া আছে। কতকাল আগে মা তাকের উপর জলদানে পাওয়া মেটে কলসী তুলিয়া রাখিয়াছিল, সংসারের প্রয়োজনের জন্য—পড়িয়া মাটিতে অর্ধপ্রোথিত হইয়া আছে। সকলের অপেক্ষা সে যেন অবাক হইয়া গেল...পাঁচিলের সেই ঘুলগুলিটা আজও নতুন অবিকৃত অবস্থায় দেখিয়া—বালিচুন একটুও খসে নাই, যেন কালকের তৈরি—এই জঙ্গল ও ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কি হইবে ও কুলুঙ্গিতে?

খিড়কিদোরের পাশে উঁচু জমিটাতে মায়ের হাতে পোঁতা সজনে গাছ এখনও আছে। যাইবার বছরখানেক আগে মাত্র মা ডালটা পুঁতিয়াছিল—এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গাছটা বাড়িয়া বুড়া হইয়া গিয়াছে—ফল খাইতে আর কেহ আসে না—জঙ্গলে ঢাকিয়া পড়িয়া আছে এতকাল—অপরাহ্নের রাঙা রোদ গাছটার গায়ে পড়িয়া কি উদাস, বিষাদ-মাখা দৃশ্যটা ফুটাইয়াছে যে...ছায়া ঘন হইয়া আসে, কাঁচাকলায়ের ডালের মতো সেই লতাটার গন্ধ আরও ঘন হয়—অপুর শরীর যেন শিহরিয়া ওঠে—এ গন্ধ তো শুধু গন্ধ নয়—এই অপরাহ্ন, এই গন্ধের সঙ্গে জড়ানো আছে মায়ের কত রাত্রের

আদরের ডাক, দিদির কত কথা, বাবার পদাবলী গানের সুর, বাল্যের ঘরকন্নার সুধাময় দারিদ্র্য— কত কি—কত কি—

ঘন বনে ঘুঘু ডাকে, ঘুঘু—ঘু—

সে অবাক চোখে রাঙারোদ মাখানো সজনে গাছটার দিকে আবার চায়—মনে হয় এ বন, এ স্তূপাকার ইটের রাশি, এ সব স্বপ্ন—এখনই মা ঘাট হইতে সন্ধ্যায় গা ধুইয়া ফিরিয়া ফরসা কাপড় পরিয়া ভিজা কাপড়খানা উঠানের বাঁশের আলনায় মেলিয়া দিবে, তারপরে প্রদীপ হাতে সন্ধ্যা দিতে দিতে তাহাকে দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া বিস্মিত অনুযোগের সুরে বলিয়া উঠিবে—এত সন্ধে করে বাড়ি ফিরলি অপু?

ভিটার চারিদিকে খোলামকুচি, ভাঙা কলসী; কত কি ছড়ানো—ঠাকুরমায়ের পোড়োভিটাতে তো পা রাখিবার স্থান নাই, বৃষ্টির ধোয়াটে কতদিনের ভাঙা খাপ্‌রা, খোলামকুচি বাহির হইয়াছে। এগুলি অপুকে বড়ো মুগ্ধ করিল, সে হাতে করিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিল। কতদিনের গৃহস্থ জীবনের সুখ দুঃখ এগুলার সঙ্গে জড়ানো! মা পিছনের বাঁশবনে এক জায়গায় সংসারের হাঁড়িকুড়ি ফেলিত, সেগুলি এখনও সেইখানেই আছে। একটা আস্কে-পিঠে গড়িবার মাটির মুচি এখনও অভগ্ন অবস্থায় আছে। অপু অবাক হইয়া ভাবে, কোন্ আনন্দভরা শৈশব সন্ধ্যার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ ছিল না জানি! উঠানের মাটির খোলামকুচির মধ্যে সবুজ কাচের চুড়ির টুকরা পাওয়া গেল। হয়তো তার দিদির হাতের চুড়ির টুকরা।—এ ধরনের চুড়ি ছোট মেয়েরাই পরে—টুকরাটা সে হাতে তুলিয়া লইল। এক জায়গায় আধখানা বোতল ভাঙা—ছেলেবেলায় এ ধরনের বোতলে মা নারিকেল তৈল রাখিত—হয়তো সেটাই।

একটা দৃশ্য তাকে বড়ো মুগ্ধ করিল। তাদের রান্নাঘরের ভিটার ঠিক যে কোণে মা রাঁধিবার হাঁড়িকুড়ি রাখিত—সেখানে একখানা কড়া এখনও বসানো আছে, মরিচা ধরিয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে, আংটা খসিয়া গিয়াছে, কিন্তু মাটিতে বসিয়া যাওয়ার দরুন একটুও নড়ে নাই।

তাহারা যেদিন রান্না খাওয়া সারিয়া এ গাঁ ছাড়িয়া রওনা হইয়াছিল—আজ চব্বিশ বৎসর পূর্বে, মা এঁটো কড়াখানাকে ওখানেই বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল—কে কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ওখানা ঠিক আছে এখনও।

কত কথা মনে ওঠে। একজন মানুষের অন্তরতম অন্তবের কাহিনী কি অন্য মানুষ বোঝে। বাহিরের মানুষের কাছে একটা জঙ্গলে ভরা পোড়োভিটা মাত্র—মশার ডিপো। তুচ্ছ জিনিস। কে বুঝিবে চব্বিশ বৎসর পূর্বের এক দরিদ্র ঘরের অবোধ বালকের জীবনের আনন্দ-মুহূর্তগুলির সহিত এ জায়গার কত যোগ ছিল?

ত্রিশ, পঞ্চাশ, একশো, হাজার, তিন হাজার বছর কাটিয়া যাইবে—তখন এ গ্রাম লুপ্ত হইবে, ইচ্ছামতই চলিয়া যাইবে, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সভ্যতা, নতুন ধরনের রাজনৈতিক অবস্থা—যাদের বিষয় এখন কল্পনা করিতেও কেহ সাহস করে না, তখন আসিবে জগতে! ইংরেজ জাতির কথা প্রাচীন ইতিহাসের বিষয়ীভূত হইয়া দাঁড়াইবে, বর্তমান বাংলা ভাষাকে তখন হয়তো আর কেহ বুঝিবে না, একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়া সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ভাষা এদেশে প্রচলিত হইবে।

তখনও এই রকম বৈকাল, এই রকম কালবৈশাখী নামিবে তিন হাজার বর্ষ পরের বৈশাখ দিনের শেষে! তখনও এই রকম পাখি ডাকিবে, এই রকম চাঁদ উঠিবে। তখন কি কেহ ভাবিবে তিনহাজার বছর পূর্বের এক বিস্মৃত বৈশাখী বৈকালের এক গ্রাম্যবালকের ক্ষুদ্র জগৎটি এই রকম বৃষ্টির গন্ধে, ঝোড়ো হাওয়ায় কি অপূর্ব আনন্দে দুলিয়া উঠিত—এই স্নিগ্ধ অপরাহ্ণ তার মনে কি আনন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিত? তিন হাজার বছরের প্রাচীন জ্যোৎস্না একদিন কোন্ মায়াস্বপ্ন তাহার শৈশবমনে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল? নিঃশব্দে শরৎ দুপুরে বনপথে ক্রীড়ারত সে ক্ষুদ্র নয় বৎসরের বালকের মনের বিচিত্র অনুভূতিরাজির ইতিহাস কোথায় লেখা থাকিবে? কোথায় লেখা

থাকিবে, বিস্মৃত অতীতে তার সে সব আনন্দভরা জীবনযাত্রা, বিদেশ হইতে বহুদিন পরে বাড়ি ফিরিয়া মায়ের হাতে বেলের শরবৎ খাওয়ার সে মধুময় চৈত্র অপরাহ্ণটি, বাঁশ বনের ছায়ায় অপরাহ্ণের নিদ্রা ভাঙিয়া পাপিয়ার সে মনমাতানো ডাক, কোথায় লেখা থাকিবে বর্ষাদিনের বৃষ্টিসিক্ত রাত্রিগুলির সে সব আনন্দকাহিনী।

দূর ভবিষ্যতের যেসব তরুণ বালকবালিকার মনে এই সব কালবৈশাখী নব আনন্দের বার্তা আনিবে, কোন্ পথে তারা আসিবে?

বাহির হইয়া আবার সে ফিরিয়া চাহিল।

সারা ভিটার উপর আসন্ন সন্ধ্যা এক অদ্ভুত, করুণামাখা ছায়া ফেলিয়াছে, মনে হয়, বাড়িটার এই অপূর্ব বৈকাল কাহার জন্য বহুকাল অপেক্ষা করিয়া ক্লান্ত জীর্ণ, অবসন্ন ও অনাসক্ত হইয়া পড়িয়াছে—আর সাড়া দেয় না, প্রাণ আর নাই।

বার বার করিয়া ঘুলঘুলিটার কথা মনে পড়িতেছিল। ঘুলঘুলি দুটা এত ভালো আছে এখনও, অথচ মানুষেরাই গেল চলিয়া!

সে নিশ্চিন্দিপুরও আর নাই। এখন যদি সে এখানে আবাব বাসও করে সে অপূর্ব আনন্দ আর পাইবে না—এখন সে তুলনা করিতে শিখিয়াছে, সমালোচনা করিতে শিখিয়াছে, ছেলেবেলায় যারা ছিল সাথী—এখন তাদের সঙ্গে আর অপুর কোনদিকেই মিশ খায় না—তাদের সঙ্গে কথা কহিয়া আর সে সুখ নাই, তারা লেখাপড়া শিখে নাই, এই পঁচিশ বৎসরে গ্রাম ছাড়িয়া অনেকেই কোথাও যায় নাই—সবারই পৈতৃক কিছু জমি-জমা আছে, তাহাই হইয়াছে তাদের কাল। তাদের মন, তাদের দৃষ্টি পঁচিশ বৎসর পূর্বের সেই বাল্যকালের কোঠায় আজও নিশ্চল। ...কোন দিক হইতেই অপুর আর কোন যোগ নাই তাহাদের সহিত। বাল্যে কিন্তু এসব দৃষ্টি খোলে নাই—সব জিনিসের উপর একটা অপরিসীম নির্ভরতার ভাব ছিল—সব অবস্থাকেই মানিয়া লইত বিনা বিচারে। সত্যকার জীবন তখনই যাপন করিয়াছিল নিশ্চিন্দিপুরে।

তাহা ছাড়া বাল্যের সুপরিচিত ও অতি প্রিয় সাথীদের অনেকে বাঁচিয়া নাই। বোষ্টম দাদু নাই, জ্যাঠাইমা—রানুদির মা নাই, আশালতাদি বিবাহের পর মরিয়া গিয়াছে, পটু এদেশ হইতে উঠিয়া গিয়া অন্য কোথায় বাস করিতেছে, নেড়া, রাজু রায়, প্রসন্ন গুরুমশায় কেহই আর নাই—স্বামী মারা যাওয়ার পরে গোকুলের বউ খুড়িমাকে তাঁহার ভাই আসিয়া লইয়া গিয়াছে—দশ বারো বৎসর তিনি এখানে আসেন নাই, বাঁচিয়া আছেন কিনা কেহ জানে না।

তবু মেয়েদের ভালো লাগে। রানুদি, ও-বাড়ির খুড়িমা, রাজলক্ষ্মী, লীলাদি, এরা স্নেহে, প্রেমে, দুঃখে, শোকে যেন অনেক বাড়িয়াছে, এতকাল পরে অপুকে পাইয়া ইহারা সকলেই খুশি, কথায় কাজে এদের ব্যবহার মধুর ও অকপট। পুরাতন দিনের কথা ওদের সহিত কহিয়া সুখ আছে—বহুকালের খুঁটিনাটি কথাও মনে রহিয়াছে—হয়তো বা জীবনের পরিধি ইহাদের সংকীর্ণ বলিয়াই, ক্ষুদ্র বলিয়াই এতটুকু তুচ্ছ জিনিসও আঁকড়াইয়া রাখিয়াছে।

আজ সে একথা বুঝিয়াছে, জীবনে অনবরত বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে লড়াই করিয়া চলিতে হইয়াছিল বলিয়াই আজ সে যাহা পাইয়াছে—এখানে পৈতৃক জমিজমার মালিক হইয়া নির্ভাবনায় বসিয়া থাকিলে তাহা পাইত না। আজ যদি সে বিদেশে যায়, সমুদ্রপারে যায়—যে চোখ লইয়া সে যাইবে, নিশ্চিন্দিপুরে গত পঁচিশ বৎসর নিষ্ক্রিয় জীবন-যাপন করিলে সে চোখ খুলিত না। একদিন নিশ্চিন্দিপুরকে যেমন সে সুখ-দুঃখ দ্বারা অর্জন করিয়াছিল—আজ তেমনি সুখ-দুঃখ দিয়া বাহিরকে অর্জন করিয়াছে।

নদীতে গা ধুইতে গিয়া নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় এইসব কথাই সে ভাবিতেছিল। সারাদিনটা আজ গুমট গরম, প্রতিপদ তিথি—কাল গিয়াছে পূর্ণিমা। আজ এখনই জ্যোৎস্না উঠিবে।

এই নদীতে ছেলেবেলায় যে-সব বধূ জল লইতে আসিত, তারা এখন প্রৌঢ়া, কত নাইও—

মরিয়া হাজিয়া গিয়াছে, যে-সব কোকিল সেই ছেলেবেলাকার রামনবমী দিনের পুলকমুহূর্তগুলি ভরাইয়া দুপুরে কু কু ডাক দিত, কচিপাতা-ওঠা বাঁশবনে তাদের ছেলেমেয়েরা আবার তেমনি গায়।

শুধু তাহার দিদি শুইয়া আছে। রায়পাড়ার ঘাটের ওধারে ওই প্রাচীন ছাতিম গাছটার তলায় তাহাদের গ্রামের শ্মশান, সেখানে। সে-দিদির বয়স আর বাড়ে নাই, মুখের তারুণ্য বিলুপ্ত হয় নাই—তার কাচের চুড়ি, নাটাফলের পুঁটুলি অক্ষয় হইয়া আছে এখনও। প্রাণের গোপন অন্তরে যেখানে অপুর শৈশবকালের কাঁচা শিশুমনটি প্রবৃদ্ধ জীবনের শত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, উচ্চাশা ও কর্মস্তূপের নিচে চাপা পড়িয়া মরিয়া আছে—সেখানে সে চিরবালিকা, শৈশব জীবনের সে সমাধিতে জনহীন অন্ধকার রাত্রে সে-ই আসিয়া নীরবে চোখের জল ফেলে—শিশু প্রাণের সাথীকে আবার খুঁজিয়া ফেরে।

আজ চব্বিশ বৎসর ধবিয়া সাঁঝ সকালে তার আশ্রয়স্থানটিতে সোনার সূর্যকিরণ পড়ে। বর্ষাকালের নিশীথ মেঘ ঝর ঝর জল ঢালে, ফাল্গুন দিনে ঘেঁটুফুল, হেমন্ত দিনে ছাতিমফুল ফোটে। জ্যোৎস্না উঠে। কত পাখি গান গায়। সে এ সবই ভালোবাসিত। এ সব ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই কোথাও।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে সে একবার কলিকাতা আসিল—ফিরিতে কুড়ি পঁচিশ দিন দেরি হইযা গেল—আষাঢ় মাসের শেষ, বর্ষা ইতিমধ্যে খুব পড়িয়াছিল, সম্প্রতি দু-একদিন একটু ধরিল, কখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, দিন ঠাণ্ডা, কোনদিন বা সারাদিন খরবৌদ্র।

এই কদিনে দেশের চেহারা বদলাইয়াছে, গাছপালা আরও ঘন সবুজ, উঁচু গাছের মাথা হইতে কচি মাকাললতা লম্বা হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে—বাল্যের অতীব পরিচিত দৃশ্য, এখনও বউ-কথা-কও ডাকে, কিন্তু কোকিল ও পাপিয়া আর নাই—এখনও বনে সোঁদালি ফুলের ঝাড় অজস্র, কচি পটপটি ফলের থোলো বাঁধিয়াছে গাছে গাছে—কটু গন্ধ ঘেঁটকোল রোজ বেলাশেষে কোন্ ঝোপঝাপের অন্ধকারে ফোটে, ঘাটের পথে ফিরিবার সময় মেয়েরা নাকে কাপড় চাপা দেয়—কি পবিচিত, কি অপূর্ব ধরনের পরিচিত সবই, অথচ বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছিল সবটা এতদিন। বাহিরেব মাঠ সবুজ হইয়াছে নবীন আউশ ধানে—এই সময় একদিন সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আর একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করিল।

খুব রৌদ্র, দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে, বেলা তিনটার কম নয়, অপু কি কাজে গ্রামের পিছনদিকের বনের পথ ধরিয়া যাইতেছিল। দুধারে বর্ষার বনঝোপ ঘন সবুজ, বাঁশবনে একটা কঞ্চি হইতে হলদে পাখি উড়িয়া আর একটা কঞ্চিতে বসিতেছে।

একটা জায়গায় ঘন বনের মধ্যে সুঁড়ি পথ, বড়োগাছের পাতার ফাঁক দিয়া ঝলমলে পরিপূর্ণ রৌদ্র পড়িয়া কচি, সবুজ পাতার রাশি স্বচ্ছ দেখাইতেছে, কেমন একটা অপূর্ব সুগন্ধ উঠিতেছে বনঝোপ হইতে—সে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল সেদিকে চাহিয়াই। তাহার সেই অপর্ব শৈশব জগৎটা!

ঠিক এইরকম সুঁড়ি বনের পথ বাহিয়া এমনি রৌদ্রালোকিত ঘুঘুডাকা দীর্ঘ শ্রাবণ দিনে দুপুর ঘুরিয়া বৈকাল আসিবার পূর্ব সময়টিতে সে ও দিদি চৌশালিকের বাসা, পাকা মাকালফল, মিষ্টি রাংচিতার ফল খুঁজিয়া বেড়াইত—দুপুর রোদের গন্ধমাখানো, কত লতা দোলানো, সেই রহস্যভরা, করুণ, মধুর আনন্দলোকটি!...মাইল বাহিয়া এ গতি নয়, সেখানে যাওয়ার যানবাহন নাই—পৃথিবীর কোথায় যেন একটি পথ আছে যাহা সময়ের বীথিতল বাহিয়া মানুষকে লইয়া চলে তার অলক্ষিতে। ঘন ঝোপের ভিতর উঁকি মারিতেই চক্ষের নিমেষে তাহার ছাব্বিশ বৎসর পূর্বের শৈশবলোকটিতে

আবার সে ফিরিয়া গেল, যখন এই বন, এই নীল আকাশ, উজ্জ্বল আনন্দভরা এই রৌদ্রমাখানো শ্রাবণ দুপুরটাই ছিল জগতের সবটুকু—বাহিরের বিশ্বটা ছিল অজানা, সে সম্বন্ধে কিছু জানিতও না, ভাবিতও না...রঙে রঙে রঙিন রহস্যঘন সেই তার প্রাচীন দিনের জগৎটা...

এ যেন নবযৌবনের উৎস-মুখ, মন বার বার এক ধারায় স্নান করিয়া হারানো নবীনত্বকে ফিরিয়া পায়—গাছপালার সবুজ, রৌদ্রালোকের প্রাচুর্য, দুর্গাটুনটুনির অবাধ কাকলি—ঘন সুঁড়ি পথের দূরপারে শৈশবসঙ্গিনী দিদির ডাক যেন শুনা যায়।...

কতক্ষণ সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—বুঝাইবার ভাষা নাই, এ অনুভূতি মানুষকে বোবা করিয়া দেয়! অপুর চোখ ঝাপসা হইয়া আসিল—কোন্ দেবতা তার প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন? তার নিশ্চিন্দিপুর আসা সার্থক হইল।

আজ মনে হইতেছে যৌবন তার স্বর্গের দেবতাদের মতো অক্ষয়, অনন্ত...সে জগৎটা আছে—তার মধ্যেই আছে। হয়তো কোনও বিশেষ পাখির গানের সুরে, কি কোনও বনফুলের গন্ধে শৈশবের সে হারানো জগৎটা আবার ফিরিবে। অপুর কাছে সেটা একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি, সৌন্দর্যের প্লাবন বহাইয়া ও মুক্তির বিচিত্র বার্তা বহন করিয়া তা আসে, যখনই আসে। কিন্তু ধ্যানে তাকে পাইতে হয়, শুধু অনুভূতিতেই সে রহস্যালোকের সন্ধান মিলে!

তার ছেলে কাজল বর্তমানে সেই জগতের অধিবাসী। এজন্য ওর কল্পনাকে অপু সঞ্জীবিত রাখিতে প্রাণপণ করে—শক ও হূণের মতো বৈষয়িকতা ও পাকাবুদ্ধির চাপে সে-সব সোনার স্বপ্নকে রূঢ়হস্তে কেহ পাছে ভাঙিয়া দেয়—তাই সে কাজলকে তার বৈষয়িক শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হইতে সরাইয়া আনিয়াছে—নিশ্চিন্দিপুরের বাঁশবনে, মাঠে, ফুলে ভরা বনঝোপে, নদীতীরের উলুখড়ের নির্জন চরে সেই অদৃশ্য জগৎটার সঙ্গে ওর সেই সংযোগ স্থাপিত হউক—যা একদিন বাল্যে তার নিজের একমাত্র পার্থিব ঐশ্বর্য ছিল...

নিশ্চিন্দিপুর
১০ আষাঢ়

ভাই প্রণব,

অনেকদিন তোমার কোনো সংবাদ পাই নি, কোনো সন্ধানও জানতুম না, হঠাৎ সেদিন কাগজে দেখলুম তুমি আদালতে কম্যুনিজম নিয়ে এক বক্তৃতা দিয়েছ, তা থেকেই তোমার বর্তমান অবস্থা জানতে পারি।

তুমি জানো না বোধহয় আমি অনেকদিন পর আমার গ্রামে ফিরেছি। অবশ্য দুদিনের জন্য, সে-সব কথা পরে লিখব। খোকাকেও এনেছি। সে তোমায় বড়ো মনে রেখেছে, তুমি ওর মাথায় জল দিয়ে বাতাস করে জ্বর সারিয়েছিলে সে-কথা ও এখনও ভোলে নি।

দেখো প্রণব, আজকাল আমার মনে হয়, অনুভূতি, আশা, কল্পনা, স্বপ্ন—এসবই জীবন! এবার এখানে এসে জীবনটাকে নতুন চোখে দেখতে পাই, এমন সুবিধে ও অবকাশ আর কোথাও হয় নি—এক নাগপুর ছাড়া! কত আনন্দের দিনের যাওয়া-আসা হল জীবনে। যেদিনটিতে ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে প্রথম কুঠির মাঠ দেখতে যাই সরস্বতী পুজোর বিকেলে—যেদিন আমি ও দিদি রেলরাস্তা দেখতে ছুটে যাই—যেদিন বিয়ের আগের রাত্রে তোমার মামার বাড়ির ছাদটিতে বসেছিলুম সন্ধ্যায়,—জন্মাষ্টমীর তিমিরভরা বর্ষণসিক্ত রাত জেগে কাটিয়েছিলুম আমি ও অপর্ণা মনসাপোতার খড়ের ঘরে, জীবনের পথে এরাই তো আনন্দের অক্ষয় পাথেয়—যে আনন্দ অর্থের উপর নির্ভর করে না, ঐশ্বর্যের ওপর নির্ভর করে না, মান-সম্মান বা সাফল্যের উপরও নির্ভর করে না, যা সূর্যের কিরণের মতো অকৃপণ, অপক্ষপাতী, উদার, ধনী-দরিদ্র বিচার করে না, উপকরণের স্বল্পতা বা বাহুল্যের উপর নির্ভর করে না। বড়োলোকের মেয়েরা নতুন মোটর কিনে যে আনন্দ পায়, মা অবিকল সেই আনন্দই পেতেন যদি নেমন্তন্ন থেকে আমি ভালো ছাঁদা বেঁধে আনতে পারতুম, আমার

দিদি সেই আনন্দই পেত যদি বনঝোপে কোথাও পাকা-ফলে ভরা মাকাললতা কি বৈঁচিগাছের সন্ধান পেত।

জীবনে সর্বপ্রথম যেবার একা বিদেশে গেলুম পিসিমার বাড়ি সিদ্ধেশ্বরী কালীর পূজা দিতে, বছর নয়েক বয়স তখন—হাজার বছর যদি বাঁচি, কে ভুলে যাবে সেদিনের সে আনন্দ ও অনুভূতির কথা? বহু পয়সা খরচ করে মেরু পর্যটকেরা তুষারবর্ষী শীতের রাত্রে, উত্তর-হিম-কটিবন্ধের বরফ-জমা নদী ও অন্ধকার আরণ্যভূমির নির্জনতার মধ্যে Northern light -জ্বলা আকাশের তলায়, অবাস্তব, হলুদরঙের চাঁদের আলোয়, শুভ্রতুষারাবৃত পাইন ও সিলভার স্প্রুসের অরণ্যে নেকড়ে বাঘের ডাক শুনে সে আনন্দ পান না—আমি সেদিন খালি পায়ে বালুমাটির পথে স্নিমুল সোঁদালি বনের ছায়ায় ছায়ায় ভিন্ গাঁয়ে যেতে যেতে যে আনন্দ পেয়েছিলুম, আমি তো বড়ো হয়ে জীবনে কত জায়গায় গেলুম, কিন্তু জীবনের উষায় মুক্তির প্রথম আস্বাদের সে পাগলকরা আনন্দের সাক্ষাৎ আর পাই নি—তাই রেবাতটের সেই বেতস তরুতলেই অবুঝ মন বার বার ছুটে ছুটে যায় যদি, তাকে দোষ দিতে পারি কই?...

আজ একথা বুঝি ভাই যে, সুখ ও দুঃখ দুই-ই অপূর্ব। জীবন খুব বড়ো একটা রোমান্স—বেঁচে থেকে একে ভোগ করাই রোমান্স—অতি তুচ্ছতম, হীনতম একঘেয়ে জীবনও রোমান্স। এ বিশ্বাসটা এতদিন আমার ছিল না—ভাবতুম লাফালাফি করে বেড়ালেই বুঝি জীবন সার্থক হয়ে গেল—তা নয় দেখলুম ভাই।

এর সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশা—আত্মার যে কি বিচিত্র, অমূল্য অ্যাডভেঞ্চার—তা বুঝে দেখতে ধ্যানদৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা আছে, তা আসে এই রহস্যমাখা যাত্রাপথের অমানবীয় সৌন্দর্যের ধারণা থেকে।...

শৈশবের গ্রামখানাতে ফিরে এসে জীবনের এই সৌন্দর্যরূপটাই শুধু চোখে দেখছি। এতদিনের জীবনটা এক চমকে দেখবার এমন সুযোগ আর হয় নি কখনও। এত বিচিত্র অনুভূতি, এত পরিবর্তন, এত রস—অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে চাবিধারের রৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্নের অপূর্ব শান্তির মধ্যে কত কথাই মনে আসে, কত বছর আগেকার সে শৈশব-সুরটা যেন কানে বাজে, এক পুরোনো শান্ত দুপুরের রহস্যময় সুব...কত দিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে এই শান্ত দুপুরে কত বটের তলা, রাখালের বাঁশির সুরের ওপারের যে দেশটি অনন্ত তার কথাই মনে ওঠে।

কিছুতেই আমাদের দেশের লোকে বিস্মিত হয় না কেন বলতে পারো, প্রণব? বিস্মিত হবার ক্ষমতা একটা বড়ো ক্ষমতা। যে মানুষ কোনও কিছু দেখে বিস্মিত হয় না, মুগ্ধ হয় না, সে তো প্রাণহীন। কলকাতায় দেখেছি কি তুচ্ছ জিনিস নিয়েই সেখানকার বড়ো বড়ো লোকে দিন কাটায়। জীবনকে যাপন করা একটা আর্ট—তা এরা জানে না বলেই অল্প বয়সে আমাদের দেশে জীবনের ব্যবসায়ে দেউলে হয়ে পড়ে।

দিনের মধ্যে খানিকটা অন্তত নির্জনে বসে থেকে ভাবতে হয়—উঃ, সে দেখেছিলুম নাগপুরে ভাই—সে কী অবর্ণনীয় আনন্দ পেতুম। বৈকালটিতে যখন কোনো শালবনের ছায়ায় পাথরের ওপর গিয়ে বসতুম—লোকাতীত যে বড়ো জীবন শত শত জন্মমৃত্যুর দূর পারে অক্ষুণ্ন, তার অস্তিত্বকে মন যেন চিনে নিত...ডি সিটারের, আইনস্টাইনের বিশ্বটার চেয়েও তা বড়ো।

এখানে এসেও তাই মনে হচ্ছে প্রণব।...এখানে বুঝেছি জগতে কত সামান্য জিনিস থেকে কত গভীর আনন্দ আসতে পারে। তুচ্ছ টাকা, তুচ্ছ যশ-মান। আমার জীবনে এরাই হোক অক্ষয়। এত ছায়া, এত ডাঁসা খেজুরের আতাফুলের সুগন্ধ, এত স্মৃতির আনন্দ কোথায় আর পাব? হাজার বছর কাটিয়ে দিতে পারি এখানে, তবু এ পুরোনো হবে না যেন।

লীলাকে জানতে? আমার মুখে দু-একবার শুনেছ। সে আর নেই। সে সব অনেক কথা। কিন্তু যখনই তার কথা ভাবি, অপর্ণার কথা ভাবি, তখন মনে হয় এদের দু-জনের সঙ্গ পেয়ে আমার জীবন

ধন্য হয়ে গিয়েছে—বাইবেলে পড়েছ তো—And I saw a new Heaven and a new Earth—এরা জীবন দিয়ে আমার সে চোখ খুলে দিয়েছে।

হ্যাঁ, তোমায় লিখি। আমি বাইরে যাচ্ছি। খুব সম্ভব যাব ফিজি ও সামোয়া—এক বন্ধুর কাছ থেকে ভরসা পেয়েছি। কাজলকে কোথা রেখে যাই এই ছিল সমস্যা। তোমার মামার বাড়ি রাখব না—তোমার মেজমামিমা লিখেছেন কাজলের জন্যে তাঁদের মন খারাপ, সে চলে গিয়ে বাড়ি অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। হোক অন্ধকার, সেখানে আর নয়। আমার এক বাল্যসঙ্গিনী এখানে আছেন। তাঁর কাছেই ওকে রেখে যাব। এঁর সন্ধান না পেলে বিদেশে যাওয়া কখনও ঘটে উঠত না, খোকাকে যেখানে-সেখানে ফেলে যেতে পারতুম না তো!

আজ আবার ত্রয়োদশী তিথি, মেঘশূন্য আকাশ সুনীল। খুব জ্যোৎস্না উঠবে—ইচ্ছা হয় তোমায় নিয়ে দেখাই এ-সব, তোমার ঋণ শোধ দিতে পাবব না জীবনে ভাই—তুমিই অপর্ণাকে জুটিয়ে দিয়েছিলে—কত বড়ো দান যে সে জীবনের, তা তুমিও হয়তো বুঝবে না।

তোমারই চিরদিনের বন্ধু
অপূর্ব

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

দুপুবে একদিন বানু বলিল, অপু, তোর কিছু দেনা আছে—

—কি দেনা রানুদি?

—মনে আছে আমাব খাতায একটা গল্প শেষ করিস নি?

রানু একটা খাতা বাহির কবিযা আনিল। অপু খাতাটা চিনিতে পারিল না। বানু বলিল—এতে একটা গল্প আধখানা লিখেছিলি মনে আছে ছেলেবেলায? শেষ লিখে দে এবার।. অপু অবাক হইয়া গেল। বলিল—রানুদি, সেই খাতাখানা এতকাল বেখে দিযেছ তুমি?

রানু মৃদু মৃদু হাসিল।

—বেশ দাও! এখন আমাব লেখা কাগজে বেবুচ্ছে, তোমার খাতাখানায় গল্পটা অর্ধেক রাখব না। কিন্তু কি ভেবে খাতাখানা রেখেছিলে রানুদি এতদিন?

—শুনবি? একদিন তোর সঙ্গে দেখা হবেই, গল্প শেষ করে দিবিই জানতুম।

অপু মনে ভাবিল—তোমাদের মতো বাল্যসঙ্গিনী জন্ম জন্ম যেন পাই বানুদি। মুখে বলিল—সত্যি? দেখি—দেখি খাতাটা।

খাতা খুলিয়া বাল্যের হাতের লেখাটা দেখিয়া কৌতুক বোধ করিল। রানীকে দেখাইয়া হাসিযা বলিল—একটা পাতে সাতটা বানান ভুল করে বসে আছি দ্যাখো।

সে এই মঙ্গলরূপিণী নারীকেই সারাজীবন দেখিয়া আসিয়াছে—এই স্নেহময়ী, করুণাময়ী নারীকে—হয়তো ইহা সম্ভব হইয়াছে এই জন্য যে, নারীর সঙ্গে তার পরিচয় অল্পকালেব ও ভাসা ভাসা ধরনের বলিয়া—অপর্ণা দু-দিনের জন্য তার ঘর করিয়াছিল—লীলাব সহিত যে পরিচয় তাহা সংসারের শত সুখ ও দুঃখ ও সদাজাগ্রত স্বার্থদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া নহে—পটেশ্বরী, রানুদি, নির্মলা, নিরুদি, তেওয়ারী-বধূ—সবাই তাই। তাই যদি হয় অপু দুঃখিত নয়—তাই ভালো, এই স্রোতের শ্যাওলার মতো ভাসিয়া বেড়ানো ভবঘুরে পথিক-জীবনে সহচর-সহচরীগণের যে কল্যাণপাণি ক্ষুধার সময় তাহাকে অমৃত পরিবেশন করিয়াছে—তাহাতেই সে ধন্য, আরও বেশি মেশামিশি করিয়া তাহাদের দুর্বলতাকে আবিষ্কার করিবার শখ তাহার নাই—সে যাহা পাইয়াছে, চিরকাল সে নারীর নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে ইহার জন্য।

ভাদ্রের শেষে আর একবার কলকাতায় আসিয়া খবরের কাগজে একদিন পড়িল, ফিজি-প্রত্যাগত কয়েকজন ভারতীয় আর্যমিশনে আসিয়া উঠিয়াছেন। তখনই সে আর্যমিশনে গেল। নিচে কেহ নাই, জিজ্ঞাসা করিলে একজন উপরের তলায় যাইতে বলিল।

ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরের একজন যুবক হিন্দিতে তাহার আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিল। অপু বলিল—আপনারা এসেছেন শুনে দেখা করতে এলুম। ফিজির সব খবর বলবেন দয়া করে? আমার খুব ইচ্ছে সেখানে যেতে।

যুবকটি একজন আর্যসমাজী মিশনারি। সে ইস্ট আফ্রিকা, ট্রিনিদাদ, মরিশস—নানা স্থানে প্রচারকার্য করিয়াছে। অপুকে ঠিকানা দিল, পোস্ট বক্স ১১৭৫, লউটোকা, ফিজি। বলিল, অযোধ্যা জেলায় আমার বাড়ি—এবার যখন ফিজি যাব একসঙ্গেই যাব।

অপু যখন আর্যমিশন হইতে বাহির হইল, বেলা তখন সাড়ে দশটা।

বাসায় আসিয়া টিকিতে পারিল না। কাজল সেখানে নাই, ঘরটার সর্বত্র কাজলের স্মৃতি, ওই জানালাতে কাজল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রাস্তার লোক দেখিত—দেওয়ালের ওই পেরেকটা সে-ই পুঁতিয়াছিল, একটা টিনের ভেঁপু ঝুলাইয়া বাখিত—ওই কোণটাতে টুলটার উপব বসিযা পা দুলাইয়া দুলাইয়া মুড়ি খাইত—অপুর যেন হাঁপ ধরে—ঘরটাতে সত্যই থাকা যায় না।

বৈকালে খানিকটা বেড়াইল। বাকি চারশ টাকা আদায় হইল। আব কিছুদিন পব কলকাতা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে—কত দূর, সপ্তসিন্ধু পারের দেশ...কে জানে আর ফিরিবে কিনা? ভিটা-লেভু, তানি-লেভু, নিউ হেব্রিডিস—সামোয়া!—অর্ধচন্দ্রাকৃতি প্রবালবাঁধে ঘেরা নিস্তরঙ্গ ঘন নীল উপসাগব, একদিকে সিন্ধু সীমাহারা, অকূল!—দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত—অন্যদিকে ঘরোয়া ছোট্ট পুকুরের মতো উপসাগরটির তীরে নারিকেল পত্র নির্মিত ছোট ছোট কুটির—মধ্যে লৌহ প্রস্তরের পাহাড়েব সূক্ষ্মাগ্র নাসা, উভয়কে দ্বিধাবিভক্ত করিতেছে—রৌদ্রালোকপ্লাবিত সাগরবেলা। পথিক জীবনের যাত্রা আবার নতুন দেশেব নতুন আকাশতলে শুরু হইবার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে!

পুরাতন দিনের সঙ্গে যে-সব জায়গার সম্পর্ক—আর একবার সে-সব দিকে ঘুবিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল...

মায়ের মৃত্যুর পূর্বে যে ছোট একতলা ঘরটাতে থাকিত অভয় নিয়োগী লেনের মধ্যে—সেটার পাশ দিয়াও গেল। বহুকাল এইদিকে আসে নাই।

গলির মুখে একটা গ্যাসপোস্টের কাছে সে চুপ করিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল—

একটি ছিপছিপে চেহারার উনিশ-কুড়ি বছরের পাড়াগাঁয়ের যুবক সামনের ফুটপাতে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—কিছু মুখচোরা, কিছু নির্বোধ—বোধ হয় নতুন কলিকাতায় আসিয়াছে—বোধহয় পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই—ক্ষুধাশীর্ণ মুখ—অপু ওকে চেনে—ওর নাম অপূর্ব রায়।—তেরো বছর আগে ও এই গলিটার মধ্যে একতলা বাড়িটাতে থাকিত। এক মুঠো হোটেলের রান্না ভাত-ডালের জন্য হোটেলওয়ালার কত মুখনাড়া সহ্য করিত—মায়ের সঙ্গে দেখা করিবার প্রত্যাশায় পাঁচিলের গায়ে দাগ কাটিয়া ছুটির আর কতদিন বাকি হিসাব রাখিত। দাগগুলি জামরুল গাছটার পাশে লোনাধরা পাঁচিলের গায়ে আজও হয়তো আছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্যাস জ্বলিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে যুবকের ছবি মিলাইয়া গেল...

বাসার নির্জন ছাদে একা আসিয়া বসিল। মনে কি অদ্ভুত ভাব!—কি অদ্ভুত অনুভূতি!—নবমীর জ্যোৎস্না উঠিয়াছে—কেমন সব কথা মনে উঠে—বিচিত্র সব কথা—বসিয়া বসিয়া ভাবে, এই রকম জ্যোৎস্না আজ উঠিয়াছে তাদের মনসাপোতার বাড়িতে, নাগপুরের বনে তার সেই খড়ের বাংলোর সামনের মাঠে, বাল্যে সেই একটিবার গিয়াছিল লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়ি, তাদের উঠানের পাশে সেই পুকুর পাড়টাতে, নিশ্চিন্দিপুরের পোড়ো-ভিটাতে, অপর্ণা ও সে শ্বশুরবাড়ির যে ঘরটাতে শুইত—তারই জানলার গায়ে—চাঁপদানিতে পটেশ্বরীদের বাড়ির উঠানে—দেওয়ানপুরের বোর্ডিংয়ের

কম্পাউন্ডে, জীবনের সহিত জড়ানো এই সব স্থানের কথা ভাবিতেই জীবনের বিচিত্রতা, প্রগাঢ় রহস্য তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল...

এবার কলিকাতা হইতে বাড়ি ফিরিবার সময় মাঝেরপাড়া স্টেশনে নামিয়া অপু আর হাঁটিয়া বাড়ি যাইতে পারিল না—খোকাকে আজ দেড়মাস দেখে নাই—ছ'ক্রোশ রাস্তা পায়ে হাঁটিয়া বাড়ি পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে—খোকার জন্য মন এত অধীর হইয়া উঠিয়াছে যে, এত দেরি করা একেবারেই অসম্ভব।—বাবার কথা মনে হইল—বাবাও ঠিক তাকে দেখিবার জন্য, দিদিকে দেখিবার জন্য এমনি ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন—প্রবাস হইতে ফিবিবার পথে তাদেব বাল্যে। আজকাল পিতৃহৃদয়ের এসব কাহিনী সে বুঝিয়াছে—কিন্তু তখন তো হাঁটিয়া যাওয়া ছাড়া পন্থা ছিল না, এখন আর সেদিন নাই, মোটরবাসে এক ঘণ্টার মধ্যেই নিশ্চিন্দিপুর। যা একটু দেরি সে কেবল বেত্রবতীর খেয়াঘাটে।

গ্রামে পৌঁছিতে অপুর প্রায় বেলা তিনটা বাজিয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মাদুর পাতিয়া রানুদিদের রোযাকে ছেলেকে লইয়া বসিল। লীলা আসিল, রানু আসিল, ও-বাড়ির রাজলক্ষ্মী আসিয়া বসিল। বানুদেব বাড়ির চারিধারে হেমন্ত অপরাহ্ন ঘনাইয়াছে—নানা লতাপাতার সুগন্ধ উঠিতেছে. .

কি অদ্ভুত ধরনের সোনালি রোদ এই হেমন্ত বৈকালেব। আকাশ ঘন নীল—তার তলে বানুদিদের বাড়ির পিছনে বাঁশের ঝাড়ে সোনালি সড়কির মতো বাঁশের সূচালো ডগায় রাঙা রোদ মাখানো, কোনটার উপর ফিঙে পাখি বসিয়া আছে—বাদুড়েব দল বাসায় ফিরিতেছে!...পাঁচিলের পাশের বনে এক একটা আমড়া গাছে থোলো থোলো কাঁচা আমড়া।

সন্ধ্যার শাঁখ বাজিল। জগতের কি অপূর্ব রূপ!...আবার অপুব মনে হয়, এদের পেছনে কোথায় আব একটা অসাধারণ জগৎ আছে—ওই বাঁশবনের মাথাব উপরকার সিঁদুরে মেঘভরা আকাশ, বাঁশের সোনালি সড়কির আগায বসা ফিঙে পাখির দুলুনি—সেই অপূর্ব, অচিন্ত্য জগৎটার সীমানায় মনকে লইযা গিয়া ফেলে। সন্ধ্যার শাঁখ কি তাদের পোড়োভিটাতেও বাজিল?. .পূজার সময় বাবাব খরচপত্র আসিত না, মা কত কষ্ট পাইত—দিদির চিকিৎসা হয় নাই।—সে সব কথা মনে আসিল কেন এখন?

অন্য সবাই উঠিয়া যায়। কাজল পড়িবার বই বাহির কবে। রানু বান্নাঘরে রাঁধে, কুটনো কোটে। অপুকে বলে—এইখানে আয় বসবি, পিঁড়ি পেতে দি—

অপু বলে, তোমার কাছে বেশ থাকি বানুদি। গাঁয়ের ছেলেদেব কথাবার্তা ভালো লাগে না।

রানু বলে—দুটি মুড়ি মেখে দি—খা বসে বসে। দুধটা জ্বাল দিয়েই চা করে দিচ্ছি।

—রানুদি সেই ছেলেবেলাকার ঘটিটা তোমাদের—না?

রানু বলে—আমার ঠাকুরমা জগন্নাথ থেকে এনেছিলেন তাঁর ছেলেবয়সে। আচ্ছা অপু, দুগ্‌গার মুখ তোর মনে পড়ে?

অপু হাসিয়া বলে—না রানুদি। একটু যেন আবছায়া—তাও সত্যি কিনা বুঝিনে।

রানু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আহা! সব স্বপ্ন হয়ে গেল।

অপু ভাবে, আজ যদি সে মারা যায়, খোকাও বোধ হয় তাহার মুখ এমনি ভুলিয়া যাইবে।

রানুর মেয়ে বলিল—ও মামা, আমাদের বাড়ির ওপর দিয়ে আজ এইলোপেলেন গিইল।

কাজল বলিল—হ্যাঁ বাবা, আজ দুপুরে। এই তেঁতুল গাছের ওপর দিয়ে গেল।

অপু বলিল—সত্যি রানুদি?

—হ্যাঁ তাই। কি ইংরেজি বুঝিনে—উড়ো জাহাজ যাকে বলে—কি আওয়াজটা!

নিশ্চিন্দিপুরের সাত বছরের মেয়ে আজকাল এরোপ্লেন দেখিতে পায় তাহা হইলে?

পরদিন সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্নারাত্রে অভ্যাসমতো নদীর ধারের মাঠে বেড়াইতে গেল।

কতকাল আগে নদীর ধারের ওইখানটিতে একটা সাঁইবাবলাতলায় বসিয়া এইরকম বৈকালে সে মাছ ধরিত—আজকাল সেখানে সাঁইবাবলার বন, ছেলেবেলার সে গাছটা আর চিনিয়া লওয়া যায় না।

ইছামতী এই চঞ্চল জীবনধারার প্রতীক। ওর দু-পাড় ভরিয়া প্রতি চৈত্র বৈশাখে কত বনকুসুম, গাছপালা, পাখ-পাখালি, গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কত ফুল ঝরিয়া পড়ে, কত পাখির দল আসে যায়, ধারে ধারে কত জেলেরা জাল ফেলে, তীরবর্তী গৃহস্থবাড়িতে হাসি-কান্নার লীলাখেলা হয়, কত গৃহস্থ আসে, কত গৃহস্থ যায়—কত হাসিমুখ শিশু মায়ের সঙ্গে নাহিতে নামে, আবার বৃদ্ধাবস্থায় তাহাদের নশ্বর দেহের রেণু কলস্বনা ইছামতীর স্রোতোজলে ভাসিয়া যায়—এমন কত মা, কত ছেলেমেয়ে, তরুণতরুণী মহাকালের বীথিপথে আসে যায়—অথচ নদী দেখায় শান্ত, স্নিগ্ধ, ঘরোয়া, নিরীহ।...

আজকাল নির্জনে বসিলেই তাহার মনে হয়, এই পৃথিবীর একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে, এর ফুলফল, আলোছায়ার মধ্যে জন্মগ্রহণ করার দরুন এবং শৈশব হইতে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার দরুন এর প্রকৃত রূপটি আমাদের চোখে পড়ে না। এ আমাদের দর্শন ও শ্রবণগ্রাহ্য জিনিসে গড়া হইলেও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও ঘোর রহস্যময়, এর প্রতি রেণু যে অসীম জটিলতায় আচ্ছন্ন—যা কিনা মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত, এ সত্যটা হঠাৎ চোখে পড়ে না। যেমন সাহেব বন্ধুটি বলিত, "ভারতবর্ষের একটা রূপ আছে, সে তোমরা জানো না। তোমরা এখানে জন্মেছ কিনা, অতি পরিচয়ের দোষে সে চোখ ফোটে নি তোমাদের।"

আকাশের রং আর এক রকম—দূরের সে গহন হিরাকসের সমুদ্র ঈষৎ কৃষ্ণাভ হইয়া উঠিয়াছে—তার তলায় সারা সবুজ মাঠটা, মাধবপুরের বাঁশবনটা কি অপূর্ব, অদ্ভুত, অপার্থিব ধবনের ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছে!...ও যেন পরিচিত পৃথিবীটা নয়, অন্য কোন অজানা জগতের কোনও অজ্ঞাত দেবলোকের...

প্রকৃতির একটা যেন নিজস্ব ভাষা আছে। অপু দেখিয়াছে, কতদিন বক্রতোয়ার উপল ছাওয়া-তটে শাল-ঝাড়ের নিচে ঠিক দুপুরে বসিয়া—দূরে নীল আকাশের পটভূমিতে একটা পত্রশূন্য প্রকাণ্ড কি গাছ—সেদিকে চাহিলেই এমন সব কথা মনে আসিত যা অন্য সময় আসার কল্পনাও করিতে পারিত না—পাহাড়ের নিচে বনফলের জঙ্গলেরও একটা কি বলিবার ছিল যেন। এই ভাষাটা ছবির ভাষা—প্রকৃতি এই ছবির ভাষায় কথা বলেন—এখানেও সে দেখিল গাছপালায়, উইটিপির পাশে শুকনো খড়ের ঝোপে, দূরের বাঁশবনের সাবিতে—সেই সব কথাই বলে—সেই সব ভাবই মনে আনে। প্রকৃতির এই ছবির ভাষাটা সে বোঝে। তাই নির্জন মাঠে, প্রান্তরে, বনের ধারে একা বেড়াইয়া সে যত প্রেরণা পায়—যে পুলক অনুভব করে তা অপূর্ব—সত্যিকার Joy of Life—পায়ের তলায় শুকনো লতা-কাটি, দেয়াড়ের চরে রাঙা-রোদ মাখানো কষাড় ঝোপ, আকন্দের বন, ঘেঁটুবন—তার আত্মাকে এরা ধ্যানের খোরাক জোগায়, এ যেন অদৃশ্য স্বাতী নক্ষত্রের বারি, তারই প্রাণে মুক্তার দানা বাঁধে।

সন্ধ্যার পূরবী কি গৌরীরাগিণীর মতো বিষাদ ভরা আনন্দ, নির্লিপ্ত ও নির্বিকার—বহুদূরের ওই নীল কৃষ্ণাভ মেঘরাশি, ঘন নীল, নিথর, গহন আকাশটা মনে যে ছবি আঁকে, যে চিন্তা জোগায়, তার গতি গোমুখী-গঙ্গার মতো অনন্তের দিকে, সে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কথা বলে, মৃত্যুপারের দেশের কথা কয়,—ভালোবাসা—বেদনা—ভালোবাসিয়া হারানো—বহুদূরের এক প্রীতিভরা পুনর্জন্মের বাণী...

এইসব শান্ত সন্ধ্যায় ইছামতীর তীরের মাঠে বসিলেই রক্তমেঘস্তূপ ও নীলাকাশের দিকে চাহিয়া চারিপাশের সেই অনন্ত বিশ্বের কথাই মনে পড়ে। বাল্যে এই কাঁটাভরা সাঁইবাবলার ছায়ায় বসিয়া

মাছ ধরিতে ধরিতে সে দূর দেশের স্বপ্ন দেখিত—আজকাল চেতনা তাহার বাল্যের সে ক্ষুদ্র গণ্ডি পার হইয়া ক্রমেই দূর হইতে দূরে আলোকের পাখায় চলিয়াছে—এই ভাবিয়া এক এক সময় সে আনন্দ পায়—কোথাও না যাক—যে বিশ্বের সে একজন নাগরিক, তা ক্ষুদ্র, দীন বিশ্ব নয়। লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ যার গণনার মাপকাঠি, দিকে দিকে অন্ধকারে ডুবিয়া ডুবিয়া নক্ষত্রপুঞ্জ, নীহারিকাদের দেশ, অদৃশ্য ঈথারের বিশ্ব যেখানে মানুষের চিন্তাতীত, কল্পনাতীত দূরত্বের ক্রমবর্ধমান পরিধিপানে বিস্তৃত—সেই বিশ্বে সে জন্মিয়াছে...

ওই অসীম শূন্য কত জীবলোকে ভরা—কি তাদের অদ্ভুত ইতিহাস! অজানা নদীতটে প্রণয়ীদের কত অশ্রুভরা আনন্দতীর্থ—সারা শূন্য ভরিয়া আনন্দস্পন্দনের মেলা—ঈথারের নীল সমুদ্র বাহিয়া বহু দূরের বৃহত্তর বিশ্বের সে-সব জীবনধারার ঢেউ প্রাতে, দুপুরে, রাতে, নির্জনে একা বসিলেই তাহারা মনের বেলায় আসিয়া লাগে—অসীম আনন্দ ও গভীর অনুভূতিতে মন ভরিয়া উঠে—পরে সে বুঝিতে পারে শুধু প্রসারতার দিকে নয়—যদিও তা বিপুল ও অপরিমেয়—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চেতনা স্তরের আর একটা Dimension যেন তার মন খুঁজিয়া পায়—এই নিস্তব্ধ শরৎ দুপুর যখন অতীতকালের এমনি এক মধুর মুগ্ধ শৈশব দুপুরের ছায়াপাতে স্নিগ্ধ ও করুণ হইয়া উঠে তখনই সে বুঝিতে পারে চেতনার এ স্তর বাহিয়া সে বহুদূর যাইতে পারে—হয়তো কোন অজ্ঞাত সৌন্দর্যময় রাজ্যে, দৈনন্দিন ঘটনার গতানুগতিক অনুভূতিরাজি ও একঘেয়ে মনোভাব যে রাজ্যের সন্ধান দিতে পারিতই না কোনদিন।

নদীর ধারে আজিকার এই আসন্ন সন্ধ্যায় মৃত্যুর নব রূপ সে দেখিতে পাইল। মনে হইল, যুগে যুগে এ জন্মমৃত্যুচক্র কোন্ বিশাল-আত্মা দেবশিল্পীর হাতে আবর্তিত হইতেছে—তিনি জানেন কোন্ জীবনের পর কোন্ অবস্থার জীবনে আসিতে হয়, কখনও বা সঙ্গতি, কখনও বা বৈষম্য—সবটা মিলিয়া অপূর্ব রসসৃষ্টি—বৃহত্তর জীবনসৃষ্টির আর্ট—

ছ'হাজার বছর আগে হয়তো সে জন্মিয়াছিল প্রাচীন ঈজিপ্টে—সেখানে নলখাগড়া প্যাপিরাসের বনে, নীলনদের রৌদ্রদীপ্ত তটে কোন্ দরিদ্রঘরের মা বোন বাপ ভাই বন্ধুবান্ধবদের দলে কবে সে এক ধূসর শৈশব কাটাইয়া গিয়াছে—আবার হয়তো জন্ম নিয়াছিল রাইন নদীর ধারে—কর্ক-ওক, বার্চ ও বীচবনের শ্যামল ছায়ায় বনেদী ঘরের প্রাচীন প্রাসাদে, মধ্যযুগের আড়ম্বরপূর্ণ আবহাওয়ায়, সুন্দরমুখ সখীদের দল। হাজার বছর পর আবার হয়তো সে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে—তখন কি মনে পড়িবে এবারকারের এই জীবনটা?—কিংবা কে জানে আর হয়তো এ পৃথিবীতে আসিবে না—ওই যে বটগাছের সারির মাথায় সন্ধ্যার ক্ষীণ প্রথম তারকাটি—ওদের জগতে অজানা জীবনধারার মধ্যে হয়তো এবার নবজন্ম!—কতবার যেন সে আসিয়াছে,....জন্ম হইতে জন্মান্তরে, মৃত্যু হইতে মৃত্যুর মধ্য দিয়া...বহু দূর অতীতে ও ভবিষ্যতে বিস্মৃত সে পথটা যেন বেশ দেখিতে পাইল...কত নিশ্চিন্দিপুর, কত অপর্ণা, কত দুর্গা দিদি—জীবনের ও জন্মমৃত্যুর বীথিপথ বাহিয়া ক্লান্ত ও আনন্দিত আত্মার সে কি অপরূপ অভিযান...শুধু আনন্দে, যৌবনে, জীবনে, পুণ্যে ও দুঃখে, শোকে ও শান্তিতে।..এই সবটা লইয়া যে আসল বৃহত্তর জীবন—পৃথিবীর জীবনটুকু যার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র—তার স্বপ্ন যে শুধুই কল্পনাবিলাস, এ যে হয় তা কে জানে—বৃহত্তর জীবনচক্র কোন্ দেবতার হাতে আবর্তিত হয় কে জানে?...হয়তো এমন সব প্রাণী আছেন যাঁরা মানুষের মতো ছবিতে, উপন্যাসে, কবিতায় নিজেদের শিল্পসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন না—তাঁরা এক এক বিশ্ব সৃষ্টি করেন—তার মানুষের সুখে-দুঃখে উত্থানে-পতনে আত্মপ্রকাশ করাই তাঁদের পদ্ধতি—কোন্ মহান বিবর্তনের জীব তাঁর অচিন্তনীয় কলাকুশলতাকে গ্রহে গ্রহে নক্ষত্রে নক্ষত্রে এ-রকম রূপ দিয়াছেন—কে তাঁকে জানে?...

একটি অবর্ণনীয় আনন্দে, আশায়, অনুভূতিতে, রহস্যে মন ভরিয়া উঠিল। প্রাণবন্ত তার আশা, সে অমর ও অনন্ত জীবনের বাণী বনলতার রৌদ্রদগ্ধ শাখাপত্রের তিক্ত গন্ধ আনে—নীলশূন্যে

বালিহাঁসের সাঁই সাঁই রব শোনায়। সে জীবনের অধিকার হইতে তাহাকে কাহারও বঞ্চনা করিবার শক্তি নাই—তার মনে হইল সে দীন নয়, দুঃখী নয়, তুচ্ছ নয়—ওটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নয়। সে জন্মজন্মান্তরের পথিক আত্মা, দূর হইতে কোন সুদূরের নিত্য নূতন পথহীন পথে তার গতি, এই বিপুল নীল আকাশ, অগম্য জ্যোতির্লোক, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ছায়াপথ, বিশাল অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকার জগৎ, বহির্বদ পিতৃলোক—এই শত সহস্র শতাব্দী, তার পায়ে-চলার পথ—তার ও সকলের মৃত্যুদ্বারা অস্পৃষ্ট সে বিরাট জীবনটা নিউটনের মহাসমুদ্রের মতো সকলেরই পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ ভাবে বর্তমান—নিঃসীম সময় বাহিয়া সে গতি সারা মানবের যুগে যুগে বাধাহীন হউক।...

অপু তাহাদের ঘাটের ধারে আসিল। ওইখানটিতে এমন এক সন্ধ্যার অন্ধকারে বনদেবী বিশালাক্ষী স্বরূপ চক্রবর্তীকে দেখা দিয়েছিলেন কতকাল আগে।

আজ যদি আবার তাহাকে দেখা দেন।

—তুমি কে?

—আমি অপু।

—তুমি বড়ো ভালো ছেলে। তুমি কি বর চাও?

—অন্য কিছুই চাই নে, এ গাঁয়ের বনঝোপ, নদী, মাঠ, বাঁশবনের ছায়ায় অবোধ, উদ্‌গ্রীব, স্বপ্নময় আমার সেই যে দশ বৎসর বয়সের শৈশবটি—তাকে আর একটিবার ফিরিয়ে দেবে দেবী?—

"You enter it by the Ancient way
Through Ivory Gate and golden"

ঠিক দুপুর বেলা।

রানী কাজলকে আটকাইয়া রাখিতে পারে না—বেজায় চঞ্চল। এই আছে, কোথা গিযা যে কখন বাহির হইয়া গিয়াছে—কেহ বলিতে পারে না।

সে রোজ জিজ্ঞাসা করে—পিসিমা, বাবা কবে আসবে? কতদিন দেরি হবে?—

অপু যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিল—রানুদি, খোকাকে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি, ওকে এখানে রাখবে, ওকে বোলো না আমি কোথা যাচ্ছি। যদি আমাব জন্য কাঁদে, ভুলিয়ে রেখো—তুমি ছাড়া ও-কাজ আর কেউ পারবে না।

রানু চোখ মুছিয়া বলিয়াছিল—ওকে এ-রকম ফাঁকি দিতে তোর মন সরছে? বোকা ছেলে তাই বুঝিয়ে গেলি—যদি চালাক হত?

অপু বলিয়াছিল, দেখ আর একটা কথা বলি। ওই বাঁশবনের জায়গাটা—তোমায় চল দেখিয়ে রাখি—একটা সোনার কৌটো মাটিতে পোঁতা আছে আজ অনেকদিন—মাটি খুঁড়লেই পাবে। আর যদি না ফিরি আর খোকা যদি বাঁচে—বৌমাকে কৌটোটা দিয়ো সিঁদুর রাখতে। খোকাও কষ্ট পেয়ে মানুষ হোক—এত তাড়াতাড়ি স্কুলে ভর্তি করবার দরকার নেই। যেখানে যায় যেতে দিয়ো—কেবল যখন ঘাটে যাবে, তুমি নিজে নাইতে নিয়ে যেয়ো—সাঁতার জানে না, ছেলেমানুষ ডুবে যাবে। ও একটু ভীতু আছে, কিন্তু সে ভয় এ নেই তা নেই বলে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা কোরো না—কি আছে কি নেই তা বলতে কেউ পারে না রানুদি। কোনোদিকই গোঁড়ামি ভালো নয়—তা ওর ওপর চাপাতে যাওয়ারও দরকার নেই। যা বোঝে বুঝুক, সেই ভালো।

অপু জানিত, কাজল শুধু তার কল্পনা-প্রবণতার জন্য ভীতু। এই কাল্পনিক ভয় সকল আনন্দ রোমাঞ্চ ও অজানা কল্পনার উৎস-মুখ। মুক্ত প্রকৃতির তলায় খোকার মনের সব বৈকাল ও রাত্রিগুলি অপূর্ব রহস্যে রঙিন হইয়া উঠুক—মনেপ্রাণে এই তাহার আশীর্বাদ।

ভবঘুরে অপু আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছে। হয়তো লীলার মুখের শেষ অনুরোধ রাখিতে

কোন্ পোর্তো প্লাতার ডুবো জাহাজের সোনার সন্ধানেই বা বাহির হইয়াছে। গিয়াছেও প্রায় ছ'সাত মাস হইল।

সতুও অপুর ছেলেকে ভালোবাসে। সে ছেলেবয়সের সেই দুষ্টু সতু আর নাই, এখন সংসারের কাছে ঠেকিয়া সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। এখন সে আবার খুব হরিভক্ত। গলায় মালা, মাথায় লম্বা চুল। দোকান হইতে ফিরিয়া হাত মুখ ধুইয়া রোয়াকে বসিয়া খোল লইয়া কীর্তন গায়। নীলমণি রায়ের দরুন জমার বাগান বিক্রয় করিয়া অপুর কাছে সত্তর টাকা পাইয়াছিল—তাহা ছাড়া কাটিহার তামাকের চালান আনিবার জন্য অপুর নিকট আরও পঞ্চাশটি টাকা ধার স্বরূপ লইয়াছিল। এটা রানীকে লুকাইয়া—কারণ রানী জানিতে পারিলে মহা অনর্থ বাধাইত—কখনই টাকা লইতে দিত না।

কাজলের ঝোঁক পাখির উপর। এত পাখি সে কখনও দেখে নাই—তাহার মামার বাড়ির দেশে ঘিঞ্জি বসতি, এত বড়ো বন, মাঠ নাই—এখানে আসিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছে। রাত্রে শুইয়া শুইয়া মনে হয় পিছনের সমস্ত মাঠ, বন রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দৈত্যদানো, ভূত ও শিয়ালের ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে—পিসিমার কাছে আরও ঘেঁষিয়া শোয়। কিন্তু দিনমানে আর ভয় থাকে না, তখন পাখির ডিম ও বাসা খুঁজিয়া বেড়াইবার খুব সুযোগ। রানু বারণ করিয়াছে—গাঙের ধারের পাখির গর্তে হাত দিয়ো না কাজল, সাপ থাকে। শোনে না, সেদিনও গিয়াছিল পিসিমাকে লুকাইয়া কিন্তু অন্ধকার হইয়া গেলেই তার যত ভয়।

দুপুরে সেদিন পিসিমাদের বাড়িব পিছনে বাঁশবনে পাখির বাসা খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। সবে শীতকাল শেষ হইয়া রৌদ্র বেজায় চড়িয়াছে, আকাশে বাতাসে বনে কেমন গন্ধ। বাবা তাহাকে কত বনের গাছ, পাখি চিনাইয়া দিয়া গিয়াছে, তাই সে জানে কোথায় বনমরিচাব লতায় থোকা থোকা সুগন্ধ ফুল ধরিয়াছে, কেলেকোঁড়ার লতার কচি ডগা ঝোপের মাথায় মাথায় সাপের মতো দুলিতেছে।

কখনও সে ঠাকুবদাদার পোড়ো ভিটাটাতে ঢোকে নাই। বাহির হইতে তাহার বাবা তাহাকে দেখাইয়াছিল, বোধ হয় ঘন বন বলিয়া ভিতরে লইয়া যায় নাই। একবাব ঢুকিয়া দেখিতে খুব কৌতূহল হইল।

জায়গাটা খুব উঁচু ঢিবিমতো। কাজল এদিক ওদিক চাহিয়া ঢিবিটার উপরে উঠিল—তারপরে ঘন কুঁচকাঁটা ও শ্যাওড়া বনের বেড়া ঠেলিযা নিচের উঠানে নামিল। চারিধারে ইট, বাঁশের কঞ্চি, ঝোপঝাপ। পাখি নাই এখানে? এখানে তো কেউ আসে না—কত পাখির বাসা আছে হয়তো—কে বা খোঁজ রাখে?

বসন্তবৌরী ডাকে—টুক্‌লি, টুক্‌লি—তাহার বাবা চিনাইয়াছিল, কোথায় বাসাটা? না, এমনি ডালে বসিয়া ডাকিতেছে?

মুখ উঁচু করিয়া খোকা ঝিক্‌ড়ে গাছের ঘন ডালপালার দিকে উৎসুক চোখে দেখিতে লাগিল।

এক ঝলক হাওয়া যেন পাশের পোড়ো ঢিবিটার দিক হইতে অভিনন্দন বহন করিয়া আনিল—সঙ্গে সঙ্গে ভিটার মালিক ব্রজ চক্রবর্তী, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়, ঠাকুরদাদা হরিহর রায়, ঠাকুরমা সর্বজয়া, পিসিমা দুর্গা—জানা-অজানা সমস্ত পূর্বপুরুষ দিবসের প্রসন্ন হাসিতে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—এই যে তুমি—আমাদের হয়ে ফিরে এসেছ, আমাদের সকলের প্রতিনিধি যে আজ তুমি—আমাদের আশীর্বাদ নাও, বংশের উপযুক্ত হও।

আরও হইল। সোঁদালি বনের ছায়া হইতে জল আহরণরত সহদেব, ঠাকুরমাদের বেলতলা হইতে শরশয্যাশায়িত ভীষ্ম, এ-ঝোপের ও-ঝোপের তলা হইতে বীর কর্ণ, গাণ্ডীবধারী অর্জুন, অভাগিনী ভানুমতী, কপিধ্বজ রথে সারথি শ্রীকৃষ্ণ, পরাজিত রাজপুত্র দুর্যোধন, তমসাতীরের পর্ণকুটিরে প্রীতিমতী তাপসবধূবেষ্টিতা অশ্রুমুখী ভগবতী দেবী জানকী, স্বয়ংবর সভায় বরমাল্যহস্তে ভ্রাম্যমাণা আনতবদনা সুন্দরী সুভদ্রা, মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে মাঠে মাঠে গোচারণরত সহায়-সম্পদহীন

দরিদ্র ব্রাহ্মণপুত্র ত্রিজট—হাতছানি দিয়া হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—এই যে তুমি, এই যে আবার ফিরে এসেছ! চেনো না আমাদের? কত দুপুরে ভাঙা জানলাটায় বসে বসে আমাদের সঙ্গে মুখোমুখি যে কত পরিচয়! এসো...এসো...এসো...

সঙ্গে সঙ্গে রানুর গলা শোনা গেল—ও খোকা, ওরে দুষ্টু ছেলে, এই একগলা বনের মধ্যে ঢুকে তোমার কি হচ্ছে জিজ্ঞেস করি—বেরিয়ে আয় বলছি! খোকা হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিল। সে পিসিমাকে মোটেই ভয় করে না। সে জানে পিসিমা তাকে খুব ভালোবাসে—দিদিমার পরে এক বাবা ছাড়া তাকে এমন ভালো আর কেউ বাসে নাই।

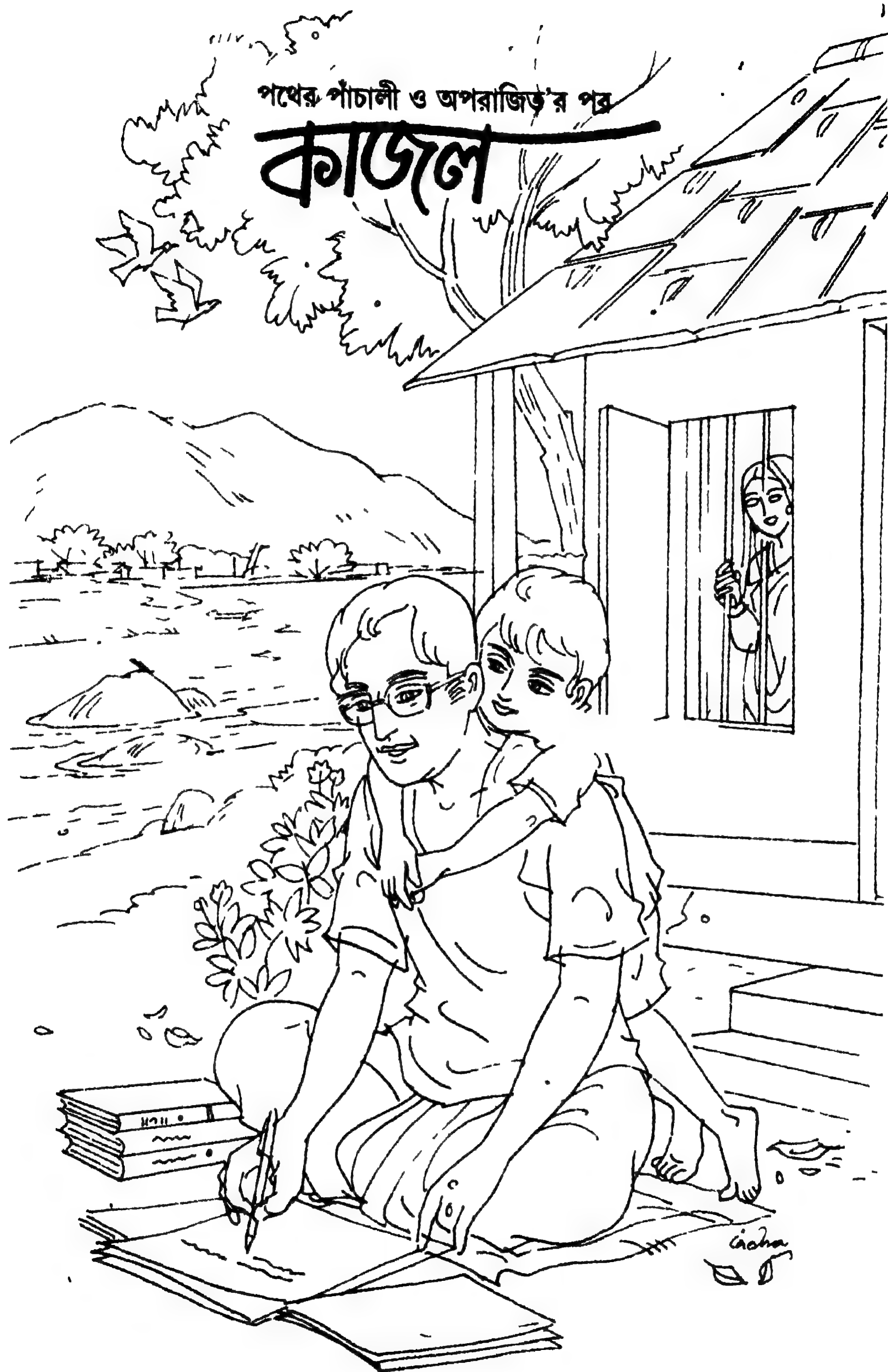
হঠাৎ সেই সময় রানুর মনে হইল, অপু ঠিক এমনি দুষ্টু মুখের ভঙ্গি করিত ছেলেবেলায়—ঠিক এমনটি।

যুগে যুগে অপরাজিত জীবন-রহস্য কি অপূর্ব মহিমাতেই আবাব আত্মপ্রকাশ করে!

খোকার বাবা একটু ভুল করিয়াছিল।

চব্বিশ বৎসরের অনুপস্থিতির পর অবোধ বালক অপু আবাব নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিয়া আসিয়াছে।

—ঃ ঃ—



প্রথম প্রকাশ

'মিত্র-ঘোষ' সংস্করণ আষাঢ়

উৎসর্গ

মাকে

উপন্যাস লেখার অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে যিনি আমার পিছনে মাভৈঃ বাণী নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন সেই মা আমাকে সর্বক্ষণ উৎসাহ দিয়েছেন, পাণ্ডুলিপি পড়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়েছেন। আমার এবং তাঁর পরিশ্রম সমান সমান।

অনেক বিনিদ্র রাত্রির ইতিহাস রয়ে গেল এ বইয়ের পেছনে। লিখতে লিখতে মনে হয়েছে পাঠকদের কথা, জানি না তাঁরা একে কেমন ভাবে নেবেন। তাঁদের জন্যই আমার পরিশ্রম, তাঁরা গ্রহণ করলে আমি ধন্য হবো।

আরণ্যক, ব্যারাকপুর — তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ ও কাজলের পশ্চাৎপট

১৯৪০ সনের ৩রা ডিসেম্বর আমার বিয়ে হয়। সে সময়ে উনি ৪১ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটের 'প্যারাডাইস লজে' থাকতেন। আমার বিয়ের প্রায় একবছর পরে ঐ মেসের বাস তিনি উঠিয়ে দেন।

ঐ মেসে ছিলেন উনি বহুদিন, কাগজপত্র বইখাতা জিনিসপত্র জমেছিল ওখানে অপর্যাপ্ত। মেসের বাস যখন তুলে দেন তখন তার কিছু জিনিস উনি পাঠিয়ে দেন ঘাটশিলায়, কিছু আমাদের দেশের বাড়ি গোপালনগর বারাকপুরে।

ঘাটশিলার যে ঘরে আমি শুতাম তার পায়ের দিকের দেওয়ালে টাঙানো ছিল ভারি সুন্দর একটি শিশুর ছবি, অপূর্ব ছবিটি। খয়েরী রংয়ের সঙ্গে সাদা মেশানো বিলিতি ছবি। নিচে ইংরেজিতে ছবিটির নাম লেখা ছিল—'বাবল্‌স্'। ছেলেটির কোলের উপর একটি বাটিতে কিছু সাবানগোলা জল। একটি কাঠিতে ফুঁ দিয়ে ছেলেটি বুদ্‌বুদ্ তৈরি করছে।

ওঁর কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম, কোনও বিলাতি কোম্পানির বিজ্ঞাপনের ক্যালেন্ডার ওটা। উনি ছবিটি আমাকে দেখিয়ে বলেছিলেন ঐ ছবি দেখেই নাকি উনি কাজলের চরিত্র কল্পনা করেছিলেন। অমন নিষ্পাপ, দেবদুর্লভ রূপবান, কোমল, সুন্দর ছেলেটি—কাজল নাকি ওঁর কল্পনায় ঐ রূপেই ছিল।

উনি নিজে আমাকে বহুদিন বলেছেন, একসময়ে নাকি উনি সন্তান-সন্তান করে ক্ষেপে গিয়েছিলেন। বহু লোকের কাছে শুনেছি, অনেককে উনি নাকি বলতেন—আমাকে বাবা ডাকবি?—ডাক্‌না।

আরও শুনেছি, এই পিতৃ-সম্বোধন শুনবার জন্য নানাপ্রকার ঘুষও দিতেন কাউকে কাউকে।

আজ আরও অনেক কথাই মনে পড়ছে। ওঁর ধর্ম মেয়ে, নাম তার রেণু। রেণুর উল্লেখ আছে ওঁর অনেক বইতে, ওঁর দিনপঞ্জিগুলিতে। ওঁর 'বিচিত্র জগৎ' বইখানা রেণুকে উৎসর্গ করেছিলেন। রেণুর সঙ্গে ওঁর স্নেহের সম্পর্ক গভীর ছিল। রেণুকে নিয়েই ওদের পরিবারের সঙ্গে ওঁর গভীর পরিণতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী কালে ওদের সকলের সঙ্গেই ওঁর আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় হয়েছিল।

আমার বিয়ের পরে রেণু এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে।

রেণু আমাকে ডাকত মা-মণি বলে, ওঁকে বলত বাবা। রেণুর সঙ্গে ওঁর মাঝে মাঝে দেখা হত কলকাতায়। রেণু তখন কলকাতাতেই ছিল।

বাবলু যখন একবছরের, সে সময় একদিন একটি নিরেট লোহার সুন্দর মোটরগাড়ি এনে বাবলুকে দেন। উনি বলেন, তোর দিদি দিয়েছে—রেণুদিদি।

কাজল সম্বন্ধে উনি কী লিখবেন, তার কিছু কিছু আভাস অপরাজিত বইতে পাওয়া যায়।

ওতেই বীজাকারে কাজল সম্বন্ধে সকল কথাই প্রায় বলা আছে। তারপর যে তাঁর কল্পনার কাজলকে বাস্তবে রূপ দেবে, প্রতিমার কাঠামোর ওপর খড়-বিচালি বেঁধে মাটি ধরিয়ে রং-তুলির স্পর্শে সেই প্রতিমাকে সঞ্জীবিত করবে, সে দায়িত্ব তার। গল্পকে টেনে নিয়ে যাবার, উপন্যাসকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব লেখকের, বিভূতিভূষণের অসমাপ্ত রচনা যে সমাপ্ত করবে তার। তিনি জানতেন না ভবিষ্যতে এই কাজ করবে তাঁরই পুত্র।

কাজল উপন্যাস সম্পর্কে কত নিভৃত মধ্যাহ্নে আকাশের নব নব ছায়ারূপ দেখতে দেখতে, সন্ধ্যাবেলায় বিলবিলের ধাবে ঠেসদেয়ালে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করতে করতে আলোচনা করেছেন। কাজল এখন কত বড় হয়েছে, কী করছে, কী ভাবছে, এসব আলোচনা করতেন। বাবলু (তারাদাস) হওযার পরে মুহূর্তে মুহূর্তে বাবলুকে দেখা চাই। বাবলু কী করছে, কেমন অঙ্গভঙ্গি করছে—সর্বদা বাড়িব সকলকে ডেকে দেখাতে ভালোবাসতেন। সর্দার খেলুড়ের সঙ্গে বাবলু যেন ছিল শিশু-খেলুড়ে। বুঝতে পাবতাম, কাজল উপন্যাসের পরিকল্পনা মাথায় ঘুরছে। কাজল উপন্যাস সম্বন্ধে বহু নোট নিতেন। কিছু কিছু লিখেও ছিলেন। ওঁর আকস্মিক মৃত্যুর জন্য, এবং এই উনিশ-কুড়ি বছরের ব্যবধানে বিশেষ কিছু রক্ষা করতে পারি নি।

বাবলু যখন একটু বড় হল এবং স্কুলে যেতে শুরু করল, তখন সে বাবার কথা শুনতে চাইত। তাঁর লেখার বিষয়, তাঁর ভালো-লাগা, তাঁর জীবনচর্চা ও জানতে চাইত। তন্ময় হয়ে শুনত এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইত সব কিছু। দীর্ঘদিন বাবলুর সঙ্গে ওঁর স্মৃতিতর্পণ করতে করতে 'কাজল' উপন্যাস সম্পর্কে খুঁটিনাটি আলোচনা করেছি। বাবলুর তখন থেকেই আগ্রহ ছিল 'কাজল' লিখবার। অন্তরে অন্তরে গভীর ইচ্ছা ছিল। তাব হাযার সেকেন্ডারি পরীক্ষার পরে একেবারে একটানা অবসব, সে অবসর কী করে কাটবে এই ভাবনায় যখন অস্থির হয়ে উঠেছিল, তখন নিজেই একদিন আমায বলল—মা, 'কাজল' লিখতে শুরু করি। তুমি কী বল? আমি সেদিন ওকে মুখে উৎসাহ দিয়েছিলাম, বলেছিলাম, লেখ, চেষ্টা কর। চেষ্টার অসাধ্য কী আছে।

সেই শুরু, তারপর তিনবছর পার হয়ে চারবছর চলছে। আজ কাজল সত্যিই শেষ হল।

আমাব শ্বশুরমশাই-এব অসমাপ্ত কার্যভার তুলে নিয়েছিলেন তাঁর পুত্র অসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে। আজ তাঁদের পায়েব তলায়, বঙ্গবাণীর পায়ের তলায় বাবলু কুণ্ঠিত অক্ষম পদক্ষেপে পূজার থালা নিয়ে দাঁড়াল। সামান্য উপচার, অতিসামান্য ওঁর পুঁজি। কিন্তু পূজায যার যেটুকু ক্ষমতা সে তাই নিয়েই সাঙ্গ করে, এও তাই। তাব নির্মল পূজাব আগ্রহটুকুই ভগবান গ্রহণ করুন।

১৩৫৭ সালের ২৮শে ভাদ্র ওঁর জীবিতাবস্থায় শেষ জন্মদিনের অনুষ্ঠান হয়েছিল আমার মামাব বাসাবাড়ি সুইনহো স্ট্রীটে। এই অনুষ্ঠানে বহু সাহিত্যিক বন্ধুবা এসেছিলেন ওঁর। শ্রদ্ধেয় উপেন-দা, বন্ধুবান্ধব মনোজ বসু, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, বেগম জাহান-আরা খান স্বামী সহ, গজেন ঠাকুরপো, সুমথ ঠাকুরপো ইত্যাদি।

এই জন্মদিনে গজেন ঠাকুরপোরা ওঁকে একখানা খাতা উপহার দেন— তার ওপর একটি কালো কভাব লাগানো ছিল। সুন্দর করে বাঁধানো, তাতে সোনালী অক্ষবে ইংরাজীতে লেখা ছিল— 'কাজল'। এ খাতাখানা আজও আমার কাছে আছে। সেই সময়েই ঠিক হয়ে যায়, কাজল উনি লিখতে শুরু করবেন অবিলম্বে এবং তা ধারাবাহিকভাবে বেরুবে কোন পত্রিকায়। আমি জানতাম 'কাজল' উনি লিখবেন, যেমন জানতাম 'ইছামতী' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড উনি লিখবেন। 'অথৈ জল'ও দ্বিতীয় খণ্ড লিখবার ইচ্ছে ছিল ওঁর। ওঁরই কাছে আরও শুনেছি ওঁর 'দেবযান' লিখবার ইচ্ছা ছিল পথের পাঁচালী লিখবারও আগে। কিন্তু লিখেছেন অনেক পরে। একটা খাতায় উনি দেবযানের খানিকটা লিখে রেখেছিলেন বহুদিন পর্যন্ত। এ লেখার বহু পরে উনি 'দেবযান' শেষ করেন—আমার বিয়েরও দু-তিন বছর পরে। তখন দেবযানের নাম ছিল 'দেবতার ব্যথা'। ওঁর রচনার প্লট লেখা থাকত ছোট ছোট বইতে। তাতে উনি কী লিখবেন সামান্য কথায় তার স্কেচ করে রাখতেন। পরে ঐ

স্কেচ দেখলেই ওঁর মনে পড়ত উনি কী লিখবেন। ঐ সব বিভিন্ন চরিত্রের বহু ঘটনার সামান্য টুকরো ও নানা লেখার খসড়া আজও আমি রেখে দিয়েছি যত্ন করে আমার কাছে। তাতে কত কী লিখবার, কত কী জানবার আগ্রহ ছিল ওঁর, তার পরিচয় পাওয়া যায়। আরও পাওয়া যায়, কত কী পড়েছিলেন উনি তার আভাস। উনি যেন ছিলেন চিরদিনের ছাত্র—প্রকৃতির এই মহিমময় অনন্ত ঐশ্বর্যভরা পরিবেশ, এর ভিতরে আত্মহারা ছিলেন তিনি। প্রকৃতিপাগল বিভূতিভূষণ। ঘাটশিলায় ওঁর মৃত্যুর পাঁচ-ছ দিন আগে বেলাশেষে আমি বসেছিলাম আমাদের বারান্দার চওড়া সিঁড়ির ওপর। উনি দাঁড়িয়ে ছিলেন সামনে। বাবলু উঠোনের ঘাসের ওপর ওর বাবাকে নিয়ে খেলছিল। আজও বড় বেশি করে সেই দিনটির কথা, সেই অপরাহ্ন বেলাটির কথা আমার মনে পড়ে।

উনি সেসময়ে আমাকে বললেন—তুমি আমার দিকে একদম নজর দাও না। আমি কখন কী করি বল তো? এদিকে আমার 'কাজল' শুরু করতে হবে। বাবলুকে নিয়ে কী যে করি! তুমি শুধু শুধু বাবলুকে আমার কাছে দাও।

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম! সে কী গো, আমিই বরং ছেলেটাকে কাছে পাই নে, শুধু তুমি ওকে নিয়ে ঘুরছ কোথায় কোথায়। ওর দুর্বল স্বাস্থ্য—কোথায় আমি ভাবছি, ওর কী স্বাস্থ্য টিকবে'

চট করে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন উনি।—আর বেড়ানো নয়, কী বল? খুবই বেড়ানো হয়েছে। পুজোর ভেতর অত্যন্ত বেড়ালাম, কী বল? বেড়ালাম না?

আমি চুপ করে রইলাম। এমন ভ্রমণ-বাতিকগ্রস্ত লোক আমি জীবনে দেখিনি। ছেলেপুলেদের যেমন মিষ্টি ও খেলনার লোভ দেখিয়ে বশীভূত করা যায়, এই বালকস্বভাব ভদ্রলোকটিকে বেড়ানোর নামে যেখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া যেত, যদি জানতে পারতেন সেখানে দেখবার কিছু আছে।

উনি নিজেই আবার বললেন—এইবার লেখা শুরু করি, কী বল? পুজোতে ওরকম সবাই একটু—বুঝলে না? সব বন্ধুবান্ধব এক জায়গায় হওয়া, আমোদ হয় না? কী বল? কাল আমাকে খুব ভোরে তুলে দেবে, বুঝলে?

আমি হাসলাম। তোমার চাইতে ভোরে উঠব আমি? তোমার চোখে কী ঘুম আছে? আমার তো মনে হয় না।

ওঁরই ডাকে ঘুম ভাঙল সেদিন আমার—ওঠো, ওঠো। গেট খুলে দাও। আমি 'কাজলে'র ছক তৈরি করব না আজ? মনে নেই? ওঠো, দেরি হয়ে যাবে।

আমি ঘুম-জড়ানো চোখে বাইরের দিকে তাকালাম।—রাত রয়েছে যে, আর একটু পরে যাও। যাবে বনে পাহাড়ে, ওখানে তো সদাই নির্জন।

উনি বললেন—না, উপাসনা সেরে নেব না আমার সেই শিলাসনে? তারপরে লেখা।

আমি জানতাম, উনি 'ফুলডুংরি'র পেছনে বনের ভেতর একটি বিরাট পাথরের ওপর বসে লিখতেন। আমাকেও নিয়ে যেতেন ওখানে মাঝে মাঝে, উপাসনা করতেন। সে সব কত কথা, কত স্মৃতি।

তখনও জানি না, কী করাল মেঘ ঝুলছে আমার মাথার ওপর—গর্ভে তার বজ্রাগ্নি লুকিয়ে নিয়ে। সেইদিনই যে আমার জীবনের চরম দিন, তার কিছুমাত্র আভাস পাইনি আমি।

সকাল সকাল ফেরা ওঁর হল না। উনি ফিরলেন একেবারে বেলা সাড়ে-দশটা এগারোটায়। আমি তখন রান্নায় ব্যস্ত। ওঁকে দোর খুলে দিলাম। উনি বললেন—প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছে আমার।

ওঁর খাবার করাই ছিল। বিছানার উপর বসলে ওঁকে খাবার এনে দিলাম।

উনি সেই খাবারটুকু খেয়ে আমাকে বললেন—আরও কিছু দাও। কী আছে তোমার?

আমি বললাম—নারকেল-চিঁড়ে খাও। তুমি ভালোবাস।

নারকেল-চিঁড়ে দিয়ে আমি আবার রান্নায় ফিরে গেলাম।

একটু বাদে ওঁর ডাক আবার কানে গেল—শুনে যাও।

আমি রান্নাঘর থেকে ছুটে গেলাম ওঁর কাছে।

এমন করে তো উনি ডাকেন না আমাকে! আমি যেতেই উনি বললেন—দেখ, আমার বুকে যেন চিঁড়ে আটকে গেছে।

আমি বললাম, শুকনো চিঁড়ে খেলে এমনিই হয়। ভিজিয়ে খেতে চাও না আম কলা না থাকলে। কত ঘুরে এসেছ, গলা শুকিয়ে আছে না?

আমি ওঁর গলায় বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম।

উনি বললেন, একটু কোরামিন দাও আমাকে।

আমার ঘরে কোরামিন থাকত। আমার দেওর নুটুবিহারী ডাক্তার ছিলেন। আমি ওঁকে ধরে আছি—আমার জা যমুনাকে ডেকে বললাম—দশ ফোঁটা কোরামিন দে তো।

আমি জীবনে ওঁকে খুব সামান্যই ওষুধ খেতে দেখেছি। কোরামিন চাওয়ায় আমি ঘাবড়ে গেলাম খুব। সেই সূচনা। তখন বুঝিনি আমি। স্বাস্থ্যবান লোক ছিলেন। একটু পরেই সামলে উঠলেন কিছুটা। আমিও তখন অনভিজ্ঞা। বুঝতে পারিনি কী কঠোর নিয়তি অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

উনি স্নান করতে যাবেন বললেন। বাড়িতে স্নান করতেন না কখনও। দেশে থাকলে নদীতে, ঘাটশিলায় নানা পুকুরে। আমাকেও মাঝে মাঝে নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে। ইদানীং বাবলুকে নিয়ে যেতেন রোজ—আমি না গেলেও।

সেদিন বললেন—আজ আর বাবলুকে নেব না, শবীরটা ভালো নেই।

অনেক বাধা দিলাম। শরীর ভালো নেই, বাইরে স্নান কবতে যেও না তুমি।

কিছুতেই শুনলেন না।

আমি বললাম—উঠোনের ধারে জল দিই তোমায়। বাথরুমে নাই বা নাইলে। বাথরুমে স্নান করতে একদম ভালবাসতেন না উনি। আমাদের ঘরের সামনের চওড়া সিঁড়িগুলিতে বসে স্নান করতে বলেছিলাম আমি।

উনি বললেন—কিছু হবে না। যাব আর আসব।

তখন কিছু হল না।

দুপুরে ভাত খেতে বসেছেন, তখন ধলভূমগড় বাজবাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ কবে গেল টি-পার্টির। উনি খুশী হয়ে বললেন—যাব ঠিক, বঙ্কিমবাবুকে গিয়ে বল। দু-একজন কাকে আরও নিমন্ত্রণ করতে বললেন। তখনও জানি না, কী আছে আমাদের কপালে।

একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। ঠাকুরপোর ডাকে ঘুম ভাঙল—দাদা কী সাজে যাচ্ছে উঠে দেখ বৌদি।

আমার দুরন্ত অভিমান হল। আমার কী একটুও ইচ্ছে করে না উনি একটু সাজুন?

আমি চুপ করে রইলাম। উনি হয়তো বুঝলেন আমার অন্তরের অভিমান। তাই বললেন—দাও কী দেবে। কী হবে সাজলে-গুজলে? দুখানা হাত বেরুবে আমার?

সেইদিন—আব তারপব তিনদিনের দিন ওঁকে মহাযাত্রায় সাজিয়ে দিয়েছিলাম।

আপনাদের আশীর্বাদে বাবলু 'কাজল' লিখেছে। আজ সকলের সঙ্গে ওঁর আশীর্বাদও বাবলুর মাথায় ঝরে পড়ুক।

বাণভট্টের পুত্র ভূষণভট্ট অসমাপ্ত 'কাদম্বরী' শেষ করেছিলেন। বাবলুর হাতে বিভূতিভূষণ পরিকল্পিত 'কাজল' প্রাণময় হয়ে উঠুক এই আমার মঙ্গলময়ের প্রতি প্রার্থনা।

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

(বিভূতিভূষণ 'কাজল' উপন্যাস শুরু করার পূর্বেই লোকান্তরিত হন। এই গ্রন্থের সমগ্র আখ্যানভাগই বিভূতিভূষণ-তনয় তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত।)

প্রথম পরিচ্ছেদ

শীত শেষ হইয়া বসন্তের বাতাস বহিতে শুরু করিয়াছে। পুরাতন পাতা ঝরিয়া গিয়া গাছে গাছে নতুন কচি পাতার সমারোহ। এই দিনগুলাতে কাজলের বেশিক্ষণ বাড়িতে মন বসে না—বিশেষত বৈকালের দিকে। সূর্য বাঁশবনের মাথা ছাড়াইয়া একটু নামিলেই রোদটা কেমন রাঙা আর আরামদায়ক হইয়া আসে। রানুপিসিদের গাইটা অলস মধ্যাহ্নে জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘাস লতা খায়। কাজল উত্তরের জানালায় বসিয়া লক্ষ করে। কিছুক্ষণ পরে তাহার আর মন টেঁকে না—বাহিরে যাইবার জন্য ছটফট করিতে থাকে। বন্য লতাপাতার যে বিশেষ ঘ্রাণটা বাতাসে বহিয়া আসে—সেটাই যেন তাহাকে আরও চঞ্চল করিয়া তোলে। গন্ধটার সহিত এই বাহিরে যাইবার ইচ্ছার যে কী সম্পর্ক—তাহা সে বুঝিতে পারে না, কেমন যেন রহস্যময় ভাব হয় মনে।

সন্তর্পণে দরজার খিল খুলিতে গেলে অসাবধানে আওয়াজ হয়। রানু আসিয়া বলে—ছেলেব বুঝি আবার বেরুনো হচ্ছে?

কাজল একটু অপ্রতিভ হয় বটে, কিন্তু ভয় পায় না। খিলটা হাতে ধরিয়াই দুষ্টামিব হাসি হাসিতে থাকে।

বাহির হইতে দিতে রানুব আপত্তি নাই। শুধু সাবধান করিয়া দেয়—খবরদার, নদীতে নামবি নে, নৌকোয় উঠবি নে কিন্তু—বল, উঠবি নে?

কাজল প্রতিজ্ঞা করিয়া তবে বাহিরে যাইবার অনুমতি পায়।

অপু বলিয়া গিয়াছিল—দেখো রানুদি, নদীতে যেন একলা না যায়। চান করবার সময় তুমি সঙ্গে নিয়ে যাবে। ছেলেমানুষ, সাঁতার জানে না—ডুবে যেতে পারে। কাজলও রানুপিসির কথার অবাধ্য হয় না—ইছামতীর ঘাটে জেলেদের মাছধরা নৌকাগুলি বাঁধা থাকে। এপাড়ার ওপাড়ার কিছু ছেলে জমা হইয়া তাহার উপর উঠিয়া খেলা করে। কাজলের পাড়ে বসিয়া দেখা ছাড়া গত্যন্তর নাই। পিসি বারণ করিয়াছে যে।

বাড়ি হইতে বাহির হইয়া কাজল বাবার নতুন কেনা আমবাগানের দিকে হাঁটিতে থাকে। বাগানের প্রান্তে কাহাদের একটা বাঁশঝাড়। সতুকাকা সেদিন বলিতেছিল বাঁশগাছ নাকি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। রাতারাতি নাকি বাঁশের কোঁড় একহাত লম্বা হইতে দেখা গিয়াছে। কথাটা শুনিযা কাজলের মনে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠিল। তাই এ জায়গাকেই সে উপযুক্ত স্থান হিসাবে নির্বাচিত করিয়াছে। বাগানের শেষ গাছটার নিচে একখানি বাঁশেব কোঁড় হইয়াছে। হাত দিযা মাপিয়া আমগাছের গুঁড়িতে সমান উচ্চতায় কাজল ঝামা ঘষিয়া একটা দাগ দিয়া রাখে প্রত্যেক দিন। পরের দিন গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে গাছ কতখানি বাড়িল। গাছটার কাছে পৌঁছিয়া কাজল ভালো একটা ঝামা খুঁজিতে লাগিল। কাছাকাছি পাওয়া গেল না। কাজলকে ঢুকিতে হইল বাঁশবনের মধ্যে। বাঁশবনের ভিতরকার আগাছা কেহ কোনদিন পরিষ্কার করে না—মালিকের দায় পড়ে নাই। নির্দিষ্ট সময়ের শেষে কয়েক গাড়ি বাঁশ কাটিয়া চালান দিয়া সিন্দুকে পয়সা তুলিলেই তাহার কাজ শেষ। বাঁশ তো বিনা যত্নেই বাড়ে। তাহার জন্য আবার কে—

কাজল একবার থামিতেই পায়ের নিচেব শুকনো বাঁশপাতার মচমচ শব্দও থামিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় লুকানো পাখিটার কুব্ কুব্ ডাক স্পষ্ট হইয়া ওঠে। বাঁশপাতা হইতে কেমন একটা গন্ধ ওঠে—কাজলের মন-কেমন-করা ভাবটা বাড়িয়া যায়। উপরে-নিচে কোনদিকেই পাখিটাকে দেখা যায় না। রানুপিসি ডাকটা চিনাইয়া দিয়া বলিয়াছিল—কুবোপাখি। কাজলের হাসি পাইয়াছিল নামটা শুনিয়া। কেমন নাম দ্যাখো—বলে কিনা কুবো পাখি—

খোকার মধু-ঝরা হাসি দেখিয়া রানির কী একটা পুরানো কথা মনে পড়ে। এক পলকের জন্য সে অন্যমনস্ক হইয়া যায়। পরমুহূর্তে হাসিয়া বলে—পাগল একটা, এত হাসবার হল কী নাম শুনে?

কাজলের একবার মনে হয় ডাক বাঁদিকের ঝোপ হইতে আসিতেছে। সেদিকেই বনটা বেশি ঘন। কিছুদিন আগে এই জঙ্গল হইতে কী একটা জন্তু শিকার করিয়া লইয়া গিয়াছে। কাজেই একেবারেই যে গা ছমছম করে না এমন নহে। কিন্তু পাখিটাকে দেখিবার কৌতূহলও কম নহে। রানুপিসি বলিয়াছে লাল লাল চোখ—সে দেখিবে কেমন লাল চোখ।

কিন্তু বিশেষ সুবিধা করা যায় না। কিছুটা বাঁদিকে হাঁটিলে মনে হয় ডানদিক হইতে আওয়াজ আসিতেছে। ডানদিকে একটু অগ্রসর হইলেই আওয়াজটা পিছনে ঘুরিয়া যায়। আবার খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরিয়া পরে কাজল হাল ছাড়িয়া দেয়।

ভারি তো পাখি—পরে দেখা যাইবে। আরও একটু সন্ধান করিলে কি দেখা হইত না? নিশ্চয় হইত। নেহাত কাজ আছে বলিয়া তাহাকে অন্যত্র যাইতে হইতেছে।

সন্ধ্যায় সতুকাকার দু-একজন বন্ধুবান্ধব এপাড়া-ওপাড়া হইতে আসিয়া জোটে। মোটা কালোমত একজন লোক—গলায় কণ্ঠি, ঠুকিয়া ঠুকিয়া খোলটাকে ঠিক সুরে বাঁধে। পবে সবাই মিলিয়া কীর্তন শুরু করে। একদিন কাজলের খুব মজা লাগিয়াছিল। গানের মাঝামাঝি—যেখানে 'কোথা যাও প্রভু নগর ছাড়িয়া' পদটা আছে সেখানে সবাই এমন হাঁ কবিয়া দীর্ঘ টান দিয়াছিল যে কাজল হাসি চাপিতে পারে নাই। এতগুলি বয়স্ক মানুষকে এক সারিতে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলে কাহার না হাসি পায়?

কীর্তন তাহার খুব ভালো লাগে নাই। গানের যে স্থানটিতে তাহার আমোদ হয়, সে স্থানটিতেই উহারা পরস্পরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে থাকে। ব্যাপার দেখিয়া প্রথম দিন সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। রানি তাহাকে খাওয়াইয়া বিছানায় শোওয়াইয়া আসার পরেও এক একদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত গান হয়। শুনিতে শুনিতে সে ঘুমাইয়া পড়ে। কখনও কখনও বিনা কারণে মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া যায়—দেখে জানালা দিয়া সুন্দর জ্যোৎস্না আসিয়া বিছানায় পড়িয়াছে। বাহিরের আতাগাছটা—ভূতোবোম্বাই আমগাছটা—উঠানটা অপূর্ব জ্যোৎস্নায় ভাসিয়া যাইতেছে। ঘুম-ঘুম চোখে সেদিকে তাকাইয়া থাকিলে বেশ লাগে। মনে হয়, কেহ যেন ওই জঙ্গল হইতে উঠানের জ্যোৎস্নায় আসিয়া দাঁড়াইবে। তাহার গায়ে রূপকথার দেশের পরিচ্ছদ, মৃদু চন্দ্রালোকে সে একবার কাজলের দিকে তাকাইয়া হাসিবে—পরে ইশাবায় ডাকিয়া আনিবে সঙ্গীদের। একদল পরীর দেশের লোকে উঠান ভরিয়া যাইবে। তাহাদের ভাষা বোঝা যায় না—কিন্তু তাহা সংগীতময়। উঠানের ধুলায় চাঁদের আলোয় ছায়া সৃষ্টি করিয়া তাহারা লীলায়িত ভঙ্গিতে নৃত্য করিবে। মাঝে মাঝে কাজল নিজে অবাক হইয়া যায় তাহার চিন্তার গতি দেখিয়া।

এই সময় বাবার কথা মনে পড়ে খুব। রানুপিসি পাশে ঘুমাইতেছে। পিসির নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাইতেছে। জানালার বাহিরে উঠানে সেই অপার্থিব চাঁদের আলোর দেশ। এ সময় বাবা থাকিলে বেশ হইত। মনের যে ভাবই হোক না কেন, বাবাকে বুঝাইয়া বলিবার দরকার পড়ে না—বাবা নিজেই কেমন সব বুঝিয়া লয়। বাবা হয়তো বলিতে পারিত কেন সে এমন অদ্ভুত চিন্তা করে। শুধু এ সব কারণেই নহে—অন্য কারণও আছে। হ্যাঁ, সে লুকাইবে না—বাবাকে দেখিতে ইচ্ছা করে, বাবার জন্য তাহার মন কেমন করিতেছে।

পরের দিন দুপুরে ললিতমোহন বাঁড়ুজ্যের ছেলে চনু আসিয়া তাহাকে এক্কা-দোক্কা খেলিতে ডাকে। চড়কতলার মাঠে খেলা জমিয়া ওঠে। অবশ্য কাজল খেলায় খুব পটু নহে। তাহার তাকও প্রশংসার অযোগ্য। তিন নম্বর ঘর টিপ করিয়া ঘুঁটি ছুঁড়িলে সেটা পাঁচ নম্বর ঘরে পড়িবেই। অবশ্য প্রত্যেকবারই কাজল এমন ভান করিয়া থাকে যেন সে ওটা পাঁচ নম্বর ঘরেই ফেলিবার চেষ্টা

করিতেছিল। খেলা সমাপ্ত হইলে সন্ধ্যার আবছা আঁধারে বাড়ি ফিরিবার সময় কাজল চনুকে প্রশ্নটা করিয়া ফেলে—তুই জানালার পাশে শুয়ে ঘুমোস?

চনু বাক্যালাপের গতি কোনদিকে বুঝিতে না পারিয়া সংক্ষেপে বলে—

—রাত্তিরে জাগিস নে কখনও? চাঁদনি রাত্তিরে?

—কত!

—কিছু দেখিস? মানে, ভাবিস কিছু?

—ভাবব আবার কী? দাদা গায়ে পা তুলে দেয় বলেই না ঘুম ভাঙে! পা-টা নামিয়ে দিয়েই আবার ঘুমিয়ে পড়ি। কেন রে?

—মনে হয় না কিছু? এই, কোন অদ্ভুত দেশের কথা, কী গল্পে পড়া কোন লোকের কথা?

গল্প বলিতে চনু পড়িয়াছে কথামালার 'ব্যাঘ্র ও পালিত কুকুর'। তাহা চাঁদনি রাত্রে স্বপ্ন দেখিবার জন্য খুব আদর্শ উপাদান নহে। কাজলটা কি পাগল নাকি? সন্ধ্যাবেলা যত উদ্ভট কথা! না, চন্দ্রালোকিত রাত্রে অগ্রজের তাড়নায় জাগিয়া তাহার বিশেষ কিছু মনে হয় না।

কাজলও যে বিশেষ কিছু দেখিতে পায়, তাহা নহে। কিন্তু একফালি চাঁদের আলো—একটি পাতা খসিয়া পড়া হইতে সে অনেক কিছু কল্পনা করিয়া লইতে পারে। নিজের বৈশিষ্ট্য বুঝিবার বয়স তাহার হয় নাই—তবুও তাহার সঙ্গীদের সহিত একটা চিন্তাগত পার্থক্য সে অনুভব করিতে পারে। যেমন দুর্গা পিসির কথা। বাবা ও রানুপিসির কাছে গল্প শুনিয়া সে দুর্গার চেহারা ও স্বভাব কিছুটা কল্পনা করিয়া লইয়াছে, নির্জনে বসিয়া ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছে, পিসি সামনে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে। এই একটা ফল কুড়াইয়া লইল কোন গাছতলা হইতে, এই আধখানা ভাঙিয়া তাহাকে দিল খাইতে। অপু ও রানি দুর্গার শৈশবের গল্পই করিয়াছে—এখন থাকিলে পিসির যে অনেক বয়স হইত, তাহা কাজলের কখনও মনে হয় নাই। শুধু এইটুকু সে বোঝে, পিসি বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে খুব ভালোবাসিত।

নিশ্চিন্দিপুরের সহিত কাজলের একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। অথচ কোথায় ছিল সে এক বৎসর আগে! দাদামশায়ের ভয়ে জুজু হইয়া থাকিতে হইত। প্রকৃত ভালোবাসার স্বাদ সে দাদামশায়ের কাছ হইতে পায় নাই কখনও—তাড়নাই জুটিত বেশি। কেবল দিদিমার কথা মনে পড়ে। বাবা যে তাহাকে মামাবাড়ি হইতে নিজের বাড়িতে লইয়া আসিল—দিদিমা পাইল না তাহা দেখিতে। দিদিমাই যা-একটু বাবার গল্প করিত। আর কাহারও জন্য মন খারাপ করে না তত। এখানে সে ভালোই আছে। বাবা নাই বটে—কিন্তু বাবা তো আসিবে। পিসি তাহাকে ভালোবাসে। সবার উপর তাহাকে আকর্ষণ করে গ্রামের একটা নীরব ভাষা। কেহ সঙ্গে থাকিলে অনেক সময় ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে যখন সে নিজেদের পুরাতন ভিটায় যায়—অন্তত তখন তো নয়ই। সম্পত্তির স্বত্ববোধ তাহার মধ্যে এখনও জন্মে নাই। কিন্তু নিজের পিতৃপুরুষের ভিটায় বসিয়া চিন্তা করার মধ্যে যে একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি আছে—তাহা মনকে দোলা দেয়। দুপুরে গিয়া জঙ্গল ঠেলিয়া চুপি চুপি সে উঠানে বসিয়া থাকে। চুপি চুপি বসিবার বিশেষ কারণ আছে। এদিকে বিশেষ লোকজন আসে না—আসিবেই বা কী প্রয়োজনে? একমাত্র আকর্ষণ সজিনাগাছটাও বুড়া হইয়া গিয়াছে, ফল ভালো হয় না তত। কাজেই সেজন্য সতর্ক হইবার প্রয়োজন নাই। আসলে এই জায়গায় উচ্ছলতা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে না একেবারে। অন্য জায়গা হইলে কাজল বটের ঝুরি ধরিয়া ঝুলিয়া, এখানে ওখানে লাফাইয়া এক তাণ্ডব বাধাইয়া তুলিত। কিন্তু এ ভিটায় আসিয়া বসিলে কে যেন তাহার ছোট্ট মনটাকে শান্ত করস্পর্শে স্নিগ্ধ করিয়া দেয়। এখানে তাহার ঠাকুমা রান্না করিয়াছে—পিসি পুতুল খেলিয়াছে—বাবা রাজা সাজিয়াছে আরশির সামনে—ঠাকুরদা বসিয়া বালি কাগজে পালা লিখিয়াছে। তাহাদের পুণ্যস্মৃতিমণ্ডিত স্থানে কি প্রগলভ হওয়া যায়? কেহ তাহাকে বলিয়া দেয় নাই। সে আপনি চুপ হইয়া থাকে। দুপুর গড়াইয়া বিকাল হইয়া যায়। কেমন একটা অদ্ভুত ছায়া

নামিয়া আসিতে থাকে। কাজলের মনে হয়, এই বুঝি কেহ পিছন হইতে কথা বলিয়া উঠিবে। যেন সে আমলটা শেষ হইয়া যায় নাই। সে মিথ্যা বলিবে না—ভূতপেত্নীতে তাহার একটু ভয় আছে। কিন্তু এই সময় যদি তাহার ঠাকুমা কী পিসি আসিয়া তাহার সহিত কথা বলে, তবে সে একটুও ভয় পাইবে না। সে তো তাহাদের একান্ত আপনার, কাহারও নাতি—কাহারও ভাইপো। কত আদর করিত সবাই বাঁচিয়া থাকিলে। একটু আগের রাঙা বাসন্তী রোদটার মতোই তাহারা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিবার সময় গাছের মাথায় সপ্তর্ষিমণ্ডল জ্বলজ্বল করিতে থাকে। বাবা তাহাকে চিনাইয়া দিয়াছিল সব। কালপুরুষ ঝুঁকিয়া থাকে পশ্চিম দিগন্তের কাছাকাছি। বাবা একবার বলিয়াছিল কালপুরুষের ছোরাটা যে তিনটি নক্ষত্র দিয়া তৈয়ারি—তাহার মধ্যে একটা দেখিতে নক্ষত্র বলিয়া মনে হইলেও আসলে নীহারিকা। সে একটা দূরবীন পাইলে দেখিবার চেষ্টা করিত। যাহা হউক, আপাতত আমবাগানটা তাড়াতাড়ি পার হইয়া যাওয়া ভালো। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে।

বাড়ি ঢুকিলে রানি বলে—এতক্ষণ ছিলি কোথায়, হ্যাঁরে—ও খোকন? এই রাতবিরেতে কি বাইরে বেড়াতে আছে বাবা? কোথায় ছিলি?

কাজল আরক্ত মুখে আমতা আমতা করিয়া বলে—এই, একটু ওই পুরানো ভিটেয়—

রানি আর প্রশ্ন করে না। তাহার হঠাৎ সমস্ত ব্যাপারটা কেমন সুন্দর লাগিতে থাকে। খোকন চিনিয়া লইয়াছে আপনার সঠিক স্থান। রক্তের ভিতরকার অমোঘ আকর্ষণ তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে পবিত্র তীর্থে। ঐতিহ্যের ধারার গতি ধীর—কিন্তু অনিবার্য। এ ভিটাকে ছাড়িয়া তাহারা কেহ কোথাও থাকিতে পারে নাই। অপু গিয়াছিল চলিয়া—সেও কি বেশিদিন পারিল দূরে থাকিতে? বংশের সন্তানের হাত ধরিয়া আবার তো সেই ফিরিয়া আসিতেই হইল। কী যেন টান রহিয়া যায়, তাহা রানি ব্যাখ্যা করিতে পারে না। হয়তো এতদিনে মণিকর্ণিকার ঘাট হইতে হরিহরের দেহাবশেষ বাতাসে ভাসিয়া অন্ধ সংস্কারে ফিরিয়া আসিয়াছে নিশ্চিন্দিপুরে। সর্বজয়ার অদৃশ্য উপস্থিতি হয়তো এখনও ভিটার অণুতে অণুতে। গোবৎস যেমন জন্মগ্রহণ করিয়াই ঠিক মাতৃস্তন্য খুঁজিয়া লয়—তাহাকে চিনাইয়া দিতে হয় না, কাজলকেও তেমনি কোন নির্দেশ দিতে হয় না। সমস্ত বিশ্বজগৎটা একটা নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। কাহাকেও কিছু বলিতে হয় না—করাইয়া দিতে হয় না। সব ঠিক ঠিক চলে।

মাস দুই পরের কথা। গরম বেশ পড়িয়াছে। আজ আহার করিতে একটু বেলা হইয়াছিল। রানি এখনও কাজলকে বাহির হইতে দেয় নাই, বিশ্রামের জন্য নিজের কাছে শোয়াইয়া রাখিয়াছে। কাজল কাত হইয়া শুইয়া পা দুইটা পিসির গায়ে তুলিয়া দিয়া গল্প শুনিতেছিল। রানির হইয়াছে বিপদ—যতই গল্প চলুক, কাজলও ঘুমায় না—তাহারও ঘুম হয় না। এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল—শ্রীমান অমিতাভ রায়, চিঠি আছে—অমিতাভ রায়! কাজল প্রথমটা বিশ্বাস করে নাই—নিশ্চয়ই ভুল শুনিয়াছে। তাহাকে চিঠি লিখিবে কে?

দৌড়াইয়া চিঠিটা নিতে গেল সে। বেশ মোটা কাগজে রঙীন খামের চিঠি। রানিও উঠিয়া আসিয়াছিল কাজলের পিছু পিছু। সে বলিল—খোল্ তো খোকন, কার চিঠি—।

রানির বুক ঢিব ঢিব করিতেছিল। হয়তো তাহারই ঠিক—কতদিন আর ভুলিয়া থাকিতে পারে!

কাজল খাম খুলিয়া চিঠিটা বাহির করিয়া প্রথমে যেন চোখে ধোঁয়া দেখিল। কিছু বুঝিতে পারিল না প্রথমটা। খুব চেনা, খুব পরিচিত হস্তাক্ষর, এ নিশ্চয়ই—। পরক্ষণেই রানির হৃৎস্পন্দনকে দ্রুতায়িত করিয়া মুখ তুলিয়া সে বলিল—বাবা দিয়েচে—বাবার চিঠি পিসি! এই দ্যাখো, বাবার হাতের লেখা।

উত্তেজনায় সে হাঁপাইতেছিল।

একটু পরেই রানি দেখিল, সে আর কাজল দুজনেই অঝোরধারে কাঁদিতেছে।

অপু রানিকে লিখিয়াছে—

'ফিজি থেকে আফ্রিকায় এসেছি। কখন কোথায় ঘুরছি কিছু ঠিক নেই। ফিজিতে একটা মিশনারী স্কুলে মাস্টারি করলাম কিছুদিন। অ্যাশবার্টন সাহেবই সব ঠিক করে দিয়েছিল। জীবনটাকে যেমন করে দেখতে চেয়েছিলাম—ঠিক তেমনি করেই দেখছি রানুদি। কোথাও ধাক্কা খেলাম না। আশ্চর্য একটা অসীমত্বের সন্ধান পেয়ে গেছি। মনে হয় যেন সময় অফুরন্ত—তা ফুরিয়ে যাবে না কোনদিন। জীবনও তাই বাঁধনহারা, অসীম। মহাকাল এত বিশাল—তার আঁচলটুকুই এত বড়ো যে সেই বিশালতাকে অনুভব করা বহু দূরের কথা, ধারণাটাকে কল্পনায় আনতেই মানুষের যুগযুগান্ত কেটে যাবে। এই জীবনকে—ত্রিকালকে বুকের পাঁজরে পাঁজরে ব্যথায়-বেদনায়, আনন্দে-উল্লাসে, স্বপ্নে-জাগরণে প্রতিক্ষণে অনুভব করছি। আমার আর ভয় কী রানুদি? এখন মনে হচ্ছে, ভক্তি ভাবটা শুধু মেয়েদেরই একচেটে নয়—আমার মনেও একটা ভক্তির ভাব জেগে উঠেছে। এ ঠিক ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি নয়। বর্তমানের ক্ষুদ্র গণ্ডী পেরিয়ে অতীত ও ভবিষ্যতে রহস্যের প্রদোষালোকে আলোকিত পরিসরে বিস্তৃত যে মহাজীবন—তার প্রতি ভক্তি। এ যেন কিছুটা নিজেরই প্রতি ভক্তি। নিজেকে, বিশেষ করে নিজের জীবনকে জানবার অদম্য স্পৃহায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখন মনে হচ্ছে যেন তা ছাড়িয়ে আরও বেশি কিছু জেনে ফেলেছি। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করা যায় না রানুদি—সে বোধ ভাষার অতীত। সে সকল জানার জানা—এক অনির্বচনীয় পরম পাওয়া।'

কাজলকে লিখিয়াছে—

'তোমার জন্যই হয়তো আমাকে ফিরে আসতে হবে। কতদিন ফিজিতে সমুদ্রের তীরে বসে আশ্চর্য সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে তোমার কথা ভেবেছি। তুমি আমার প্রাণের অংশ দিয়ে তৈরি স্বপ্ন, বাবা। চেষ্টা করছি তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে। তুমি পিসির কথা শুনে চলো তো? বেশি রাতে বেরুবে না। নদীর ধারে বেশি যেয়ো না। আমার যে ফার্স্ট বুকটা আছে—সেটা মনোযোগ দিয়ে পড়বে। এখানে অনেক মজার মজার জিনিস দেখছি—ফিরে তোমাকে গল্প বলবো। তোমাকে বড়ো দেখতে ইচ্ছে করে। আমার জন্য তোমার মন খারাপ হয় না?'

বাবার জন্য তাহার মন খারাপ হয় কিনা! এমন দিন কবে গিয়াছে যে, সকাল হইতে রাত্রির মধ্যে সে বাবার কথা ভাবে নাই? বরং বাবাই তো তাহাকে ফেলিয়া বেশ থাকিতে পারিতেছে। বাবা ফিরিয়া আসিলে সে বাঁচে।

দুপুরে অপুর রাখিয়া যাওয়া সুটকেস হইতে ডায়েরিখানা বাহির করিয়া সে পড়িতে বসে। ইহা সে মধ্যে মধ্যেই পড়িয়া থাকে। এক বৎসরের ঠাসবুনোট লেখায় ভর্তি ডায়েরি। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এক জায়গায় তাহার দৃষ্টি আটকাইয়া গেল। কাশীর কথা লেখা আছে কয়েক পাতা। বাবা তাহাকে রাখিয়া একবার কাশী গিয়াছিল বটে। কাজল পড়িয়া ফেলে পাতা কয়টা। এ কাহার কথা লেখা! লীলা কে? তাহার মেয়ের সহিত বাবা তাহার বিবাহে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে যে! বিবাহ! এ তো বড়ো মজার কথা হইল। কলিকাতায় থাকিতে গলির ওপারে একটা বাড়িতে সে বিবাহের উৎসব দেখিয়াছিল। বর মোটরগাড়ি করিয়া মালা-চন্দন পরিয়া আসে। পরে গাড়ি হইতে নামিলে একজন মেয়ে কুলোর উপর কী সব সাজাইয়া তাহাকে বরণ করে ও অন্যান্যরা জোরে হাতপাখা নাড়িয়া বাতাস করিয়া থাকে। ওপাড়ার চনুর দিদিরও তো বিবাহের কথা চলিতেছে। চনু বলিতেছিল, দিদি কালো বলিয়া নাকি পাত্রপক্ষ এক হাজার টাকা পণ চাহিয়াছে। বেশ মজা তো! বিবাহ করিলে সেও টাকা পাইবে তাহা হইলে। কিন্তু বাবা তো লিখিতেছে লীলার (এ কে?) মেয়ে ফরসা। ফরসা মেয়েকে বিবাহ করিলে টাকা দিবে তো? টাকা পাইলে সে সব টাকা বাবাকে দিবে। আচ্ছা, কত বৎসর বয়স হইলে বিবাহ হইয়া থাকে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়াছিল—কিন্তু বৃষ্টি হয় নাই। সুন্দর একটা ছায়াঘন আমেজে গ্রামটা ঝিমাইতেছিল। পাখির ডাক শোনা যাইতেছিল কম। কেবল বহু উঁচুতে প্রায় মেঘের গায়ে গায়ে কয়েকটা চিল উড়িতেছিল। কাদের মিঞার ক্ষেতের পাশে কাজল একবার থামিল। কাদের তাহার শালার সহিত নিড়ান দিতেছে ক্ষেতে। কাজলকে দেখিয়া কাদেরের শালা বলিল—বাড়ি চলে যাও কর্তাবাবা—বিষ্টি হতি পারে। কাদের আপত্তি করিয়া বলিল—পানি হবে না মোটে—দেখছো না চিল উড়ছে ওপরে। ডানায় পানি পালি নামি আসত নিচপানে। আবহাওয়াতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাদের আলাপ করিতে দিয়া কাজল হাঁটিতে লাগিল মেঠোপথ ধরিয়া। ওই পথটা গিয়াছে আষাঢ়ু—এই পথটা ঘুরিয়া গিয়াছে নদীর দিকে। একটা বড়ো গাছ রহিয়াছে দুইটা পথের সঙ্গমস্থলে। জায়গাটা কাজলের বড়ো ভালো লাগে। গ্রামের যাবতীয় লোক এই পথ দিয়া আষাঢ়ুব হাটে গিয়া থাকে। অচেনা লোকও যায় কত। ভিন-গাঁ হইতে মালপত্র কাঁধে করিয়া আলের পথ মাঠের পথ ধরিয়া এখানে আসে। এখান হইতে কাঁচা পথ ধরিয়া চলিয়া যায় হাটে। পণ্যাদি কাঁধে হাটমুখী জনস্রোত দেখিতে কাজলের বেশ লাগে।

খানিকক্ষণ সেখানে বসিয়া কাজল একবার নদীর পথে কিছুদূর হাঁটিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিতে আসিতে দেখিল একজন লোক আষাঢুর পথ হইতে নামিয়া গ্রামের দিকে চলিয়া গেল। বুকটা তাহার একবার কেমন করিয়া উঠিল। দৌড়াইয়া আগাইয়া গেল সে—এইবার লোকটাব পিছনে আসিয়া পড়িয়াছে। বহুদিনের অনভ্যাসের ফলে শব্দটা যেন জিভ দিয়া আর বাহির হইতেছে না। মাথার মধ্যে কেমন করিতেছে। পথের পাশে জঙ্গল হইতে বাতাস অজস্র বন্যপুষ্পের গন্ধ বহিয়া আনিতেছে। একটা ধাক্কা দিয়া কাজল শব্দটা বাহির করিল—বাবা!

অপু বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় ফিরিযা তাকাইল। এই ডাকটার জন্য সে ছুটিযা আসিতেছে পৃথিবীর আর এক প্রান্ত হইতে। সমুদ্রের ফেনোচ্ছল উর্মিমালা, বিষুব-মণ্ডলীব দেশেব তারকাখচিত তমিস্র বাত্রিব আকর্ষণ, উষ্ণ বালুকায় শুইয়া উপরে নারিকেল পাতায় বাতাসেব মর্মরধ্বনি শুনিবার অদ্ভুত অনুভূতি—সব সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। এই ডাকটা শুনিবার লোভেই তো। সে থাকিতে পাবে নাই।

অপুর হাত হইতে ব্যাগ আর বাক্স পড়িয়া গেল ধুলায়। পথের মধ্যে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সে দুই হাত সামনে বাড়াইয়া দিয়া চোখ বুজিল। পরক্ষণেই কাজল ঝাঁপাইয়া পড়িল অপুর বাহুবন্ধনে।

চিলগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামিয়া আসিতেছিল নিচে। এইবার বৃষ্টি নামিবে।

সন্ধ্যায় রানির রান্নাঘরের দরজায় পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া অপু গল্প করিতেছিল।

—আর প্যরলাম না থাকতে রানুদি! সে কী টান, তা যদি একবার বুঝতে! যা দেখি যা করি, সবই যেন কেমন ফাঁকা আর অর্থহীন লাগে। সেই বাড়িতে এনে তবে ছাড়ল।

রানি হাসিয়া বলে—আর আমরা বুঝি কেউ নই?

—কে বলেছে একথা রানুদি? তোমরা সবাই মিলে আমার জীবন সার্থক করে তুলেছ। কোথায় যেত আজ কাজল—তুমি না থাকলে? তোমার দান কি ভোলবার? মায়ের স্নেহ দিয়ে আমাদের দুজনকেই ঘিরে রেখেছ তুমি।

রানির গলার কাছে হঠাৎ একটা কী কুণ্ডলী পাকাইয়া ওঠে! এত সুখের দিনও ভগবান তাহার কপালে লিখিয়াছিলেন! পরে সামলাইয়া বলে—এই নে, এ দুটো পরোটা আগে খা, তারপর গরম গরম ভেজে দিচ্ছি—

রাত্রে ছেলেকে লইয়া শোয় অপু। অনেক রাত্রি পর্যন্ত কাহারও ঘুম আসে না। বৈকালে একবার খুব ঝড় হইয়া বৃষ্টি নামিয়াছিল। তাই গরম নাই তত। জানালার পাশে শুইয়া আকাশে নক্ষত্রগুলি দেখা যায় স্পষ্ট। মধ্যপ্রদেশ হইতে ফিরিয়া একই নক্ষত্র কলিকাতার আকাশে দেখিয়া তাহার কেমন অবাক লাগিয়াছিল। আবার ফিজি ঘুরিয়া আসিয়া এই নক্ষত্রগুলিকে কেমন চেনা-চেনা অথচ অনেক দূরের বলিয়া মনে হইতেছে। বিদেশে ইহারাই ছিল তাহার সঙ্গী—এই নক্ষত্র, মুক্ত উদার আকাশ, প্রান্তরের বুকের উপর দিয়া বহিয়া যাওয়া ভবঘুরে বাতাস। সেও সুন্দর জীবন—সে যে জীবন চাহিয়াছিল, সেই জীবন। কিন্তু এখন কাজলের পাশে শুইয়া তাহার উদ্দাম জীবনের গতিবেগ কিছুটা প্রশমিত করিতে ইচ্ছা করিল। কোথায় ফেলিয়া যাইবে একে? একবার গিয়া তো মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছে নাড়ির টান। শৈশবে বাবা অনেকদিন বাড়ি না আসিলে তাহার রাগ হইত—অভিমান হইত। বাড়ি ফিরিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া হরিহরকে অপুর রাগ ভাঙাইতে হইত। এখন বড়ো মমতা হয় হরিহরের প্রতি। বাবা কি আর ইচ্ছা করিয়া আসিত না! সংসার চালাইবার দুরূহ প্রয়াসে বাবাকে কোথায় না ঘুরিতে হইয়াছে—কী না করিতে হইয়াছে। বেচারী বাবা—তাহারও কত ইচ্ছা করিত অপুকে দেখিতে। আসিতে পারিত না শুধু কাজের চাপে। বই-খাতা বগলে তালিমারা ছাতা হাতে স্থান হইতে স্থানান্তরে বেড়াইত কাজেব সন্ধানে। আজ অপু লেখক হইয়াছে—বই বাজারে কাটিতেছে মন্দ নয়, তাহার চাইতে বেশি মিলিতেছে প্রশংসা। কত বৎসর পরে তাহাদের বাড়ির লোক আজ সচ্ছলতার মুখ দেখিতেছে। কিন্তু বাবাকে দেখানো গেল না এই সব দিন—বাবা বাঁচিয়া থাকিলে বৃদ্ধ হইয়া যাইত, তাহাকে অপু শিশুর মতো পরিচর্যা কবিত। থাক—কাজলেব মধ্য দিয়া সে তাহাব শৈশবে হারাইয়া যাওয়া পিতাকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। তাহাকে মনের মতো করিয়া মানুষ করিতে হইবে—ঠিক যেমন করিয়া সে চায়, তেমনি কবিবা। ভাবিয়াছিল, গ্রামে না রাখিয়া কাজলের প্রতি সে অন্যায় করিতেছে। গ্রামে হয়তো কাজলের শিশুমন পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে। তাই ছেলেকে কলিকাতার অসুন্দর পরিবেশ হইতে আনিয়া একেবারে প্রকৃতির মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছিল। এখন ভাবিল, এইভাবে রাখিলে উহার পড়াশুনা কিছুই হইবে না। বরং কোন একটা ছোট শহরে লইয়া যাই। মাঝে মাঝে গ্রামে লইয়া আসিব—মাঝে মাঝে বেড়াইতে লইয়া যাইব দূরে। তাহাতে উহার চোখ ভালো করিয়া ফুটিবে। সব দিক দিয়াই ছেলেকে চৌকস করিয়া তোলা প্রয়োজন।

পরের দিন সারাবেলা অত্যন্ত গরম ছিল—কোথাও বাহির হওয়া যায় নাই। বিকালের দিকে রোদ একেবারে কমিয়া গেলে অপু ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিল—বল্ দেখি কোথায় বেড়াতে যাওয়া যায়? পরে নিজেই খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল—চল্, আগে বেরুই তো, তারপর দেখা যাবে। নে, হাতমুখ ধুয়ে জামাটা পরে নে।

নিজের শার্টটা আনিবার জন্য ঘরে ঢুকিতে গিয়া কী মনে করিয়া ডেকে ডাকিল—রানুদি!

রানি ভিতরে ছিল, আসিয়া বলিল—কী? আবে, বেরুচ্ছিস বলে মনে হচ্ছে।

—রানুদি, একটা জিনিস খেতে বড়ো ইচ্ছে করচে, খাওয়াবে?

—ও মা? সে আবার কী কথা। খাওয়াবো না কেন। বল না—

—গরম পড়েছে খুব, একটু আমপোড়া-শরবৎ খাওয়াবে?

—আমপোড়া-শরবৎ! সে আবার কী রে! কখনও শুনি নি।

—আমাদের এদিকে খায় না। বাবা পশ্চিম থেকে শিখে এসেছিলেন। পশ্চিমে খুব খায়। বাবা মাঝে মাঝে মাকে করতে বলতেন। তুমি বানাও রানুদি, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

—করচি। এই সামান্য ব্যাপার, আমি ভাবি কী না কী খেতে চাইবি।

—এটা কিন্তু সামান্য ব্যাপার নয় রানুদি। কতদিন খাইনি বলো তো? ছোটবেলায় মাঝে মাঝে মা করে দিতেন। আমাদের অবস্থা কী ছিল সে তো তুমি জানোই। নিজেদের বাগান ছিল না, ঘরে

সব সময় চিনিও থাকত না—আমপোড়া-শরবৎ তখন একটা বিরাট বিলাসিতা। কালেভদ্রে হলে খুব ভালো লাগতো। আজ বানাও তো রানুদি। খেয়ে দেখি, ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে কি না। খোকাকেও একটু দিয়ো—কাঁচা আম আছে তো?

—সে তোকে ভাবতে হবে না। কাল এক ঝুড়ি আম দিয়ে গিয়েছে তুলসীর মা।

কাজল আসিয়া বলিল—বাবা, তোমার হয়েচে? আমার এই বোতামটা লাগিয়ে দাও, আমি পারচি নে—

অপু হাসিতে হাসিতে বলিল—দেখেচো কাণ্ড বানুদি? উল্‌টো ঘরে বোতাম লাগিয়ে বসে আছে। হ্যাঁরে, তোর বুদ্ধিসুদ্ধি কবে হবে?

একটু পরে বারান্দায় বসিয়া শরবতে প্রথম চুমুক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেবেলাটা ফিরিয়া আসিল। অপু চোখ বুজিয়া আমপোড়ার সোঁদা গন্ধ উপভোগ করিতেছিল। এই গন্ধটা কেমন পুরাতন দিনগুলিকে মনে পড়াইয়া দেয়। সেই দাওয়ায় চাটাই পাতিয়া বসিয়া তালের বড়া খাওয়া, সেই মাটির দোয়াত হাতে প্রসন্ন গুরুমশায়ের কাছে পড়িতে যাওয়া। কত কথা মনে পড়ে। রাত্রে প্রদীপের আলোয় বসিয়া পড়িতে পড়িতে কানে আসিত মায়ের খুন্তি নাড়িবার শব্দ। বিদেশ হইতে বাবা আসিলে অপুর অত্যন্ত আনন্দ হইত। রাত্রে বিছানায় শুইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত শুনিত বারান্দায় বসিয়া বাবা গান করিতেছে।

আর একজনের কথা মনে পড়ে!

বাংলা দেশ হইতে বহুদূরে তারকাখচিত আকাশেব নিচে সমুদ্রবেলায় শুইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ একসময় তাহার তন্দ্রার ঘোরে মনে হইয়াছে, সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বদলায় নাই, বয়স বাড়ে নাই। তাহার চোখের দৃষ্টির পরিবর্তন হয় নাই। তাহার আঁচলে বাঁধা নাটাফলগুলির সংখ্যা একটিও কমে নাই। সে অপুর সামনে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

তন্দ্রা ছুটিয়া গেলে অপু অবাক হইয়া আকাশের দিকে চাহিত। সমস্ত দুঃখের দিনে উদার আকাশ তাহাকে শান্ত করিয়াছে। দেখিত, বাংলার আকাশের সহিত বিদেশের আকাশের কোন প্রভেদ নাই। দেখিত, তাহার দিদির দৃষ্টি যেন ক্রমশঃ আনীহারিকাসৌরচরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। এইমাত্র এইখানে ছিল—তাহাব ঘুম ভাঙিতে দেখিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে।

—বেড়াতে যাবে না বাবা?

ছেলেকে কাছে টানিয়া লইয়া অপু বলিল—চলো বাবা, যাই।

পথে বাহির হইয়া বলিল—আমরা যদি এখান থেকে চলে গিয়ে অন্য জায়গায় থাকি, তবে তোর মন খারাপ হবে—না রে?

কাজল প্রথমে অবাক হইয়া গেল। চলিয়া যাইবাব কথা উঠিতেছে কেন? অবশ্য বাবা যেখানে আছে, এমন জায়গায় থাকিতে তাহার খারাপ লাগিবে না, কিন্তু পিসিকে ছাড়িয়া থাকা বড়ো কষ্টের।

—কোথায় যাবো বাবা?

কোথায় যাওয়া হইবে তাহা অপুও কিছু ভাবে নাই। গ্রাম ছাড়িয়া বেশিদূর যাওয়া হইবে না, আবার কলিকাতাও কাছে হইবে—এমন স্থানের সন্ধান সে মনে মনে করিতেছিল। ছেলের প্রশ্নের জবাবে সংক্ষেপে বলিল—আমিও তাই ভাবচি রে।

গ্রাম ছাড়িয়া বেশিদূর যাওয়া ঘটিবে না—সে যাইতে পারিবে না। বার বার তাহাকে ভিক্ষুকের মতো ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে নিশ্চিন্দিপুরে। এ গ্রামের প্রকৃতি তাহার কাছে জীবনধারণের জন্য বাতাসের মতো প্রয়োজনীয়। তবুও ছেলের কল্যাণের জন্য যাইতেই হইবে বাইরে। ভালো স্কুলে না পড়িলে কাজলের চোখ ফুটিবে না। দেওয়ানপুর স্কুলের মিঃ দত্ত-র কাছে সে নিজে ঋণী; বৃহত্তর জীবনে প্রবেশের মুখে তিনি তাহাকে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। কাজলকে সে নিজে তৈয়ারি করিয়া দিবে।

নদীর ধারে যাইবার পথে আধাবয়সী স্থূলবপু এক ভদ্রলোক ডাকিয়া নমস্কার করিলেন—আপনিই তো অপূর্ববাবু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকে তো আগে এ গ্রামে দেখি নি বলেই বোধ হচ্ছে। নতুন এসেছেন বুঝি?

—নতুনই বটে। তাও ধরুন গিয়ে খুব নতুন আর কী! বছর কয়েক তো হয়ে গেল। আমার নাম রাধারমণ চাটুজ্জে। বরাবরের নিবাস ঝাপড়দহর কাছে, গ্রামে, তা সে মশাই এমন ম্যালেরিয়া যে কী বলব। দেখ্ দেখ্ করে একেবারে গ্রাম উজাড়—

—ও।

—হ্যাঁ। তারপর আর সে গ্রামে ভরসা করে বাস করা—বুঝলেন না? তাও গিন্নি বলেছিলেন, যেখানে যাচ্ছ সেখানে কি আর জ্বরজারি নেই? কথাটা অবশ্য মন্দ বলে নি, কী বলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিক কথাই বলেছেন উনি।

—মশাই শুনলাম দেশ-বিদেশ অনেক ঘুরেছেন, একদিন গল্প শুনতে যাবো। সেজন্যেই মশায়ের সঙ্গে আলাপ করা।

—দেশ-বিদেশ আর কী, সে এমন কিছু নয়। তবে যাবেন নিশ্চয়ই, তার জন্য আর বলার কী আছে?

এই শুরু হইল। রাধারমণ তো আসিলই, সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম হইতে অন্যান্যরাও একে দুয়ে আসিয়া হাজির হইল। ঘরে প্রায়ই নতুন মুখ দেখা যাইতেছে। অনেকেই যাচিয়া আলাপ করিতেছে। অপু যেখানে গিয়াছিল, তাহার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান সকলেরই প্রায় একপ্রকার। সবাই জানিতে চায় দেশটা কেমন, পৌঁছাইলেই ধরিয়া তাহারা ম্লেচ্ছ করিয়া দেয় শোনা গিয়াছে, এ কথা কতদূর সত্য? একদিন সন্ধ্যাবেলা একজন প্রতিবেশী আসিয়া হাজির হইল, সে কাহার কাছে শুনিয়াছে বিলাতে অমাবস্যার রাত্রে রামধনু দেখা যায়। অপু সদ্য বিদেশ হইতে আসিয়াছে—অতএব সত্য-মিথ্যা যাচাই করিবার জন্য সে ছাড়া উপযুক্ততর লোক আর কই?

অপু শুনিয়া হাসিয়া বলিল—বিলেত যাকে বলে ঠিক সেখানে তো আমি যাই নি। আর তাছাড়া রাত্তিরে রামধনু কী করে দেখা সম্ভব? রামধনু তৈরি হয় কী ভাবে? জলকণার ওপর আলো—

একঘণ্টা সময় লাগিল। অনেক পরিশ্রম করিয়া বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দেওয়ার পর শ্রোতার মাথা নাড়ার ভাব দেখিয়া গত একঘণ্টার পরিশ্রমের সার্থকতা সম্বন্ধে অপুর কেমন একটা সন্দেহ জন্মিল। বুঝুক আর নাই বুঝুক, লোকটা ইহার মিনিট দুই পরে বিদায় লইল।

গ্রাম হইতে বিদায় লইতে হইবে বলিয়া অপু ছেলেকে লইয়া দুইবেলা পথে পথে বেড়ায়। রাস্তায় লোকে তাহার সহিত আলাপ করিয়া তাহার আশ্চর্য ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনিতে চায়। অপু কাহাকেও নিরাশ করে না। সে জানে ইহাদের মধ্যে অনেকেই সারাজীবনে বাংলাদেশের বাহিরে পা দেওয়ার সুযোগ পাইবে না। ভাবিয়া তাহার দুঃখ হয়। এই সহজ মমত্ববোধের ফলে সে কয়েকশতবার কথিত গল্প পুনরায় হাসিমুখে করিতে থাকে।

অপু বলি-বলি করিয়াও কথাটা রানিকে বলিতে পারিতেছিল না। চলিয়া যাইবার কথা শুনিলে রানি যে আদৌ সুখী হইবে না ইহা অপুর জানা ছিল বলিয়াই কথাটা সে সাহস করিয়া রানির নিকট তুলিতে পারিতেছিল না। যাইবার সময় আচমকা না বলিয়া এখন হইতে আভাস দিয়া রাখা ভালো।। অথচ সাহসের অভাব। দুই-চার দিন বলি বলি করিয়া অপু রান্নাঘরের সামনে ঘোরাফেরা করিল, তারপর, একসময় দুর্গানাম করিয়া কথা পাড়িয়া ফেলিল।

—একটা কথা ছিল রানুদি।

রানি তোরঙ্গ গোছাইতেছিল। অপুর গলার স্বরে এবং মুখভাবে বিস্মিত হইয়া তাকাইল।

—কী কথা রে?

অপু একটা ঢোক গিলিল।—এই, মানে—কাজলের পড়াশুনাটা এবার ভালোভাবে শুরু করে দেওয়ার দরকার।

—তাতে কী?

—না, বলছিলাম কী, ওকে এখন থেকে একটু—মানে একটু ভালো স্কুলে তো পড়াতে হবে। তাই রানুদি, ভাবছি কিছুদিনের জন্য শহর এলাকায় বাসাভাড়া করে থাকব। আগামী হপ্তায় হয়তো রওনা দিতে হবে। বুঝতেই পারছ, ছেলেটার পড়াশুনো তো হওয়া দরকার।

রানি কোনো কথা বলিল না, তোরঙ্গের ডালা খোলাই রাখিয়া বিছানায় আসিয়া বসিল, মুখটা রহিল খোলা জানালার দিকে। তাহার অত্যন্ত শান্ত ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতে পারিত অপুর কথা তাহার কানে যায় নাই, সে অন্যমনস্কভাবে বাহিরের কাঁঠালগাছটা দেখিতেছে মাত্র।

অপু জিজ্ঞাসা করিল—রাগ করলে রানুদি?

অপু ভাবিয়াছিল রানুদি কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবে, রানি মুখ ফিরাইলে দেখিল তাহার চোখে জল নাই।

হাত দিয়া বিছানার চাদরটা মসৃণ করিতে করিতে রানি বলিল—না রে, রাগ করিনি। রাগ করবো কেন? তুই কি পাগল হলি অপু? এতে তো কাজলেরই ভালো হবে, ওর লেখাপড়া কি কিছু হবে এখানে থাকলে?

একটু থামিয়া বলিল—তাছাড়া পরের জিনিস আর কতদিন নিজের কাছে রাখব? মায়া পড়ে গেলে ছাড়তে যে বড়ো কষ্ট হবে। তার চাইতে তুই এখনই নিয়ে যা—

এত সহজে ব্যাপার মিটিয়া যাইবে অপু আশা করে নাই। যাই হউক, রানুদি যে চলিয়া যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়াছে তাহাই যথেষ্ট। অপু বলিল—মাঝে মাঝে এখানে নিয়ে আসবো রানুদি, প্রত্যেক ছুটিতে আসবো। আমারই বা কে আছে বলো তুমি ছাড়া? বরং তখন তুমি বিরক্ত হয়ে উঠবে দেখো—

একটু পরেই হাতপাখা চাহিবার জন্য ঘরে ঢুকিতে গিয়া অপু চৌকাঠেই দাঁড়াইয়া গেল। বিছানার ওপর উপুড় হইয়া রানি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

অনেক ভাবিয়া অপু মালতীনগরে যাওয়া স্থির করিয়াছিল। মালতীনগর জায়গাটা এখনও পুরা শহর হইয়া উঠিতে পারে নাই, তবে শহরের সুবিধা মোটামুটি প্রায় সমস্ত পাওয়া যায়। অনেক বাড়ি-ঘর, মানুষ-জন ও হাট-বাজারের মধ্যে গ্রাম হইতে শহরের স্পর্শই বেশি। নিশ্চিন্দিপুর হইতে অবশ্য খুব কাছে হইল না। কিন্তু কী আর করা যায়। সব সুবিধা দেখিতে গেলে চলে না। কিছু দিন আগে অপু মালতীনগর স্কুলে গিয়া হেডমাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলিয়া আসিয়াছিল। সেখানকার ব্যবস্থা তাহার পছন্দ হইয়াছে। ভর্তি করাইবার যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া ফিরিতে ফিরিতে হঠাৎ একটা কথা ভাবিয়া তাহার খুব অবাক লাগিল। সে আজ ছেলেকে ভর্তি করাইবার জন্য ঘুরিতেছে, ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভাবিতেছে। আশ্চর্য, এই কিছুদিন আগে তাহার কথাই তাহার মা-বাবা চিন্তা করিয়াছে। সত্যই সে অনেক বড়ো হইয়া গিয়াছে। অথচ সন্তানের পিতার যতটা গম্ভীর ও রাশভারী হওয়া উচিত, তাহা সে বিস্তর চেষ্টা করিয়াও হইতে পারিতেছে না। রাশভারী মুখ করিবার চেষ্টা করিল, হইল না। খানিক পরে নিজেরই হাসি পাইল। আসলে সে বৃদ্ধ হয় নাই, তাহার পক্ষে বৃদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে।

বিদায় লইবার পালা বেশ কয়েকদিন ধরিয়া চলিল। রানি ভালোমন্দ রান্না করিতে লাগিল, পাড়ার মানুষ এবং গল্প-পিপাসুরা দল বাঁধিয়া আসিয়া বিদায় লইয়া গেল। কড়ার রহিল, অপুকে প্রায়ই আসিতে হইবে। কাজল সকাল-বিকাল একবার করিয়া বন্ধুদের নিকট হইতে বিদায় লইতে লাগিল।

সময়কে যাইতে দিব না বলিলে সময় অধিকতর তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়। ক্রমশ যাইবার দিন আসিয়া গেল। অপু মালতীনগরে একখানি বাসা ভাড়া করিয়াছে। সামান্য কিছু প্রয়োজনীয় আসবাব কিনিয়া সেখানে রাখা আছে। একসঙ্গে সমস্ত কেনা গেল না। দৈনন্দিন কাজে প্রয়োজন দেখা দিলে ক্রমশ কেনা হইবে। বহুকাল বাদে অপু সংসার পাতিতেছে—একা। কী কী জিনিস লাগিবে তাহা রানির সহিত পরমার্শ করিয়া কেনা হইয়াছে। অপুর একার উপর ভার থাকিলে হয়তো নূতন বাড়ি গিয়া প্রথম দিন উপবাস করিতে হইত।

যাইবার গোলমাল, বাক্স গোছানো, নানাবিধ উপদেশ এবং উত্তেজনায় কাজল কিছুটা দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল, নতুবা রওনা হইবার সময় সে নিশ্চয়ই একবার কাঁদিয়া ফেলিত। পরে তাহার মনে হইয়াছিল—পিসি অত কাঁদলে আর আমি দিব্যি চলে এলাম। পিসি হয়তো ভাবলে ছেড়ে আসতে আমার মন খারাপ হয়নি।

মন খারাপ তাহার অবশ্যই হইয়াছে, কিন্তু সেই গোলমালে তাহার কান্না আসে নাই।

অপুর মনটা কেমন ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল। রানির কাছে কাজলকে রাখিয়া তাহার যে সহজ নিশ্চিন্ততা ছিল, তাহা সে ফিরিয়া পাইতেছিল না। অনেক প্রতিজ্ঞা, অনেক পত্র লিখিবার প্রতিশ্রুতি, অনেক চোখের জলের মধ্য দিয়া তাহারা মাঝেরপাড়া স্টেশনে পৌঁছিয়া গেল।

ট্রেনে উঠিয়া কাজল বলিল—একটা কথা বলব বাবা?

—কী?

—আমবা মালতীনগরে যাচ্ছি, না?

—হ্যাঁ।

—সেখানে থাকতে কেমন লাগবে বাবা?

কঠিন প্রশ্ন। অপু জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর দেখিতে দেখিতে উত্তর খুঁজিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মালতীনগর জায়গাটা কাজলের খুব খারাপ লাগিল না। ঘনবসতি সে ভালোবাসে না, মালতীনগরে তাহা নাই। বাবা যে বাসা ভাড়া লইয়াছে সেটা শহরের অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায়। জানালায় দাঁড়াইলে অনেক দূর দেখা যায়, দৃষ্টির কোন প্রতিবন্ধক নাই। একটা জানালা আর মুক্ত আদর্শ কাজলের অত্যন্ত প্রয়োজন। দুপুরের আকাশে চিল ওড়া দেখিয়া সে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাইয়া দিতে পারে। তাই জানালা একটা অবশ্যই দরকার প্রান্তরের দিকে। সে যে শুধু চিল দেখিবার জন্যই দাঁড়াইয়া থাকে এমন নহে। আসলে চিলগুলা উঠিতে উঠিতে যখন বিন্দুবৎ হইয়া আসে তখন কাজলের মনটা হঠাৎ বিপুল একটা প্রসারলাভ করে। মনে মনে রোজ ভাবে—বাব্বাঃ, কোথায় উঠে গিয়েছে চিলগুলো, এই এতোটুকু দেখাচ্চে একেবারে! আচ্ছা, ওখান থেকে না জানি পৃথিবীটা কেমন দেখায়! সুদূরের কল্পনা তাহার শিশুমনে স্বপ্নের রঙ বুলাইয়া দেয়। আরও কী একটা মনের মধ্যে হয়, সেটা সে ঠিক বুঝাইয়া উঠিতে পারে না, সেটা বুঝাইবার উপযুক্ত ভাষা তার আয়ত্তে নাই। দূরের কথা ভাবিলে দুপুরের জানালায় বসিয়া মেঘস্পর্শী পাখি দেখিলে তাহার বুকের গভীরে কী একটা কথা গুমরাইয়া উঠে, সে তাহা ভাষায় অনুবাদ করিতে পারে না।

একদিন অপু বাহির হইতে আসিয়া কাজলকে জানালায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কী রে, কী দেখছিস হাঁ করে?

কী দেখিতেছিল তাহা সে বাবাকে মোটেই বুঝাইয়া উঠিতে পারে নাই, প্রকাশের চেষ্টায় তাহার

মুখ লাল হইয়া গিয়াছিল। চিলগুলি নহে, অগ্নিবর্ষী আকাশটা নহে, মাঠ-প্রান্তর নহে, মেঘ নহে, অথচ এই সবগুলি মিলিয়া যে গভীর ঐকতান সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার বাহিরে সর্বদাই বাজিতেছে, তাহা সে কেমন করিয়া শুনিয়া ফেলিয়াছে। অপু একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল। তাহার নিজের শৈশবের চিন্তা হুবহু কাজলের মনে প্রতিফলিত হইয়াছে—হুবহু। ছোটবেলায় সেও রোয়াকে বসিয়া গ্রীষ্মের দুপুরে অবাক হইয়া আকাশ দেখিত। প্রকৃতির আশ্চর্য নিয়মগুলির কাছে শ্রদ্ধায় তাহার মাথা নত হইয়া আসে। মানুষের মতামত, ইতিহাসের গতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া প্রকৃতি কঠোর হাতে পৃথিবী শাসন করিতেছে। প্রকৃতি স্পষ্ট, জড়তাশূন্য অথচ রহস্যময়। প্রকৃতির রহস্যময়তার প্রতি আকর্ষণ কাজলের রক্তেও সঞ্চারিত। আর মুক্তি নাই। সে মুক্তি পায় নাই, কাজলও পাইবে না।

রান্নাবান্না কোন রকমে হইতেছিল। সৌভাগ্যের কথা এই যে, কাজলের মুখে অপুর রান্না মোটামুটি খারাপ লাগে না।

কিন্তু এইভাবে বেশিদিন চলিবে না, তাহা অপু বুঝিতে পারিয়া একটি বুড়িকে রান্নার জন্য ধরিয়া আনিল। খুব বুড়ি নয়, দুইজনের রান্নার কাজ চালাইয়া লইতে পারে। বুড়িরও কোথাও আশ্রয় মিলিতেছিল না, বলিবামাত্র পোঁটলা হাতে করিয়া আসিয়া পড়িল। তাহার ব্যস্ততা দেখিয়া অপু মনে মনে ভাবিল—আহা, বুড়ি মানুষ, কোথাও কেউই নেই। একে তাড়াব না, রেখে দেব যতদিন থাকে। মুখে বলিল—তোমাকে কী বলে ডাকব বলো দেখি? তোমাব ছেলের নাম তো গোপাল? তাহলে গোপালের মা বলে ডাকব, কেমন?

—আর বাবা ছেলে! সে কী আমায় দেখে, না খেতে দেয়? তবুও কী জ্বালা, তার নাম ধবেই লোকে আমায় ডাকবে। যেখানে যাই, শুধু গোপালের মা আর গোপালের মা—

—তবে অন্য একটা কিছু বলো, সেভাবেই ডাকব'খন।

তাহাতেও বুড়ির আপত্তি। দেখা গেল যে ছেলে খাইতে বা পরিতে দেয় না, মুখে আপত্তি করা সত্ত্বেও বুড়ি তাহারই নামে পরিচিত হইতে চায়। অপুর কেমন মায়া পড়িয়া যাওয়ায় গোপালের মা থাকিয়া গেল।

মালতীনগরে আসিবার পরদিন অপু কাজলকে লইয়া বেড়াইতে বাহিব হইল। পথটা বাজারেব মধ্য দিয়া গিয়া রেললাইন পার হইয়াছে, সে পথ ধরিয়া দুজনে কিছুক্ষণ হাঁটিল। বাজার ছাড়াইবাব পর বাঁদিকে একটি দোকান হইতে অপু একটা সিগারেট কিনিল। লুঙ্গি পরা একজন মানুষ হাত-পা নাড়িয়া বলিতেছে—বেরিয়েছে কি এখন! সেই দুপুরের আগে একবার জাবনা খেয়ে বেরিযেছে। তা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি নে, কী করি বলো দেখি হরিধন? দুধেলো গাই—কোথাও বেঁধে রেখে দুধ-টুধ দুয়ে নিচ্ছে না তো?

হরিধন, দোকানের মালিক, অপুকে পয়সা ফেরত দিতে দিতে বলিল—খুঁজে দেখ পাবে'খন, এখনও তো সন্ধে লাগে নি। তুমি বড়ো বেশি ভাবো কামাল।

কামাল একটা বিড়ি ধরাইয়া বসিল।

বাজার ছাড়াইয়া কাজল বলিল—বাবা, শোনো।

—কী রে!

—আমায় আর একবার কলকাতায় নিয়ে যাবে?

—কেন রে? শহর বুঝি খুব ভালো লাগে? বায়োস্কোপ দেখবি?

—না।

—তবে?

একটু চুপ করিয়া কাজল বলিল—যাদুঘর আবাব দেখব।

অপু অবাক হইল, আনন্দিতও হইল।

—নিশ্চয় নিয়ে যাবো। আমারও দু-চার দিনের মধ্যে একবার কলকাতায় যেতে হবে। তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো'খন।

পথটা এখন নির্জন, ফাঁকা। শহরের এদিকে লোকবসতি কম। কাজল চারিদিকে তাকাইতে তাকাইতে চলিয়াছিল। সারাদিন রৌদ্রে পুড়িবার পর সন্ধ্যায় মাটি হইতে কেমন চমৎকার একটা গন্ধ বাহির হয়। গন্ধটার সহিত গরমকালের একটা যোগাযোগ আছে। শীতকালেও তো রৌদ্র ওঠে—কিন্তু তখন এমন গন্ধ বাহির হয় না। এক জায়গায় পথের ধারে অনেকগুলি রাধাচূড়া গাছ—হলদে ফুল ফুটিয়া আছে। অপু ছেলেকে চিনাইয়া দিল—ওই দেখ, ওই হচ্ছে রাধাচূড়া ফুল। কালকেই নাম করেছিলাম, মনে আছে?

বেশ শান্ত সুন্দর সন্ধ্যা। এইবার একটি একটি করিয়া নক্ষত্র উঠিবে। অপুব হঠাৎ মনে হইল—বেশ হতো, যদি বাড়ি গিয়ে দেখতাম অপর্ণা জলখাবার তৈরি করে বসে আছে। কাজলের হাতমুখ ধুইয়ে খাবার খাইয়ে পড়তে বসাতো। আমায় লুচি আর বেগুনভাজা এনে দিয়ে চা চড়াতে যেতো। মন্দ হয় না যদি সত্যিই—

অনেক দূর আসা হইয়াছে। সামনেই রেললাইন।

ফিরিবার জন্য অপু ছেলের হাত ধরিয়া টানিবে, এমন সময় কাজল মুখে একটা শব্দ করিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

অপু সবিস্ময়ে তাকাইয়া দেখিল কাজল রেললাইনেব ধাবে ঢালু জমিটার দিকে চাহিয়া ভয়ে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

রেললাইনের পাশে একটা গরু পড়িয়া রহিয়াছে—মৃত। ট্রেনের ধাক্কায় নিশ্চয় মাবা গিয়াছে। শিং দুইটা ভাঙিয়া কোথায় গিয়াছে কে জানে, মেরুদণ্ড ভাঙিয়া শবীরটাকে প্রায় একটা মাংসপিণ্ডে পরিণত করিয়াছে। পিঠের কাছে চামড়া ফুটা হইযা একটুকরা রক্তাক্ত মেরুদণ্ডের হাড় বাহির হইয়া আছে। ঘাড় ভাঙা, মুখের কোণে রক্তমাখা ফেনা।

—বাবা!

কাজল যেন কেমন হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উবু হইয়া বসিয়া পড়িল, তাহার মুখের ভাব দেখিয়া অপু ভয় পাইয়া গেল।

—কী রে? ভয় কী? ওঠো বাবা, মানিক আমার। কোন ভয় নেই।

কাজল রক্তশূন্য মুখে বলিল—সেই লোকটাব গরু। একেবাবে মবে গেছে বাবা? আমার খারাপ লাগছে।

বাড়ি আসিবার পথে কাজল কাঁদিয়া অস্থির। জোরে কাঁদে নাই, ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। অপু অনুভব করিতেছিল, তাহার হাতের ভিতর কাজলের হাত বরফের মতো ঠাণ্ডা। অপুর নিজেবও খারাপ লাগিতেছিল। বীভৎস দৃশ্যটা। কেন যে ওই পথে গেল তাহারা।

—তুই অত ভয় পেলি কেন? হ্যাঁ রে?

কাজল জবাব দিতে পারিল না। তাহার মনের মধ্যে ঘুরিতেছিল ঈষৎ ফাঁক হওয়া রক্তফেনামাখা মুখ, ভাঙা মেরুদণ্ডের বাহির হইয়া থাকা হাড়টা আর মৃত গরুর পড়িয়া থাকিবার অস্বাভাবিক ভঙ্গি।

অসুন্দর জিনিসের সহিত তাহার পরিচয় কম, সুন্দর সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হইয়া এই প্রথম সরাসরি অসুন্দরের সহিত পরিচয় হইয়া গেল।

এ দিনটা কাজল ভুলিতে পারে নাই।

মালতীনগরে যে স্কুলে কাজল ভর্তি হইয়াছে, সেটা অপুর বাসা হইতে খুব একটা দূর নহে। তবু অপু কাজলকে স্কুলে পৌঁছাইয়া দিয়া আসে। আবার ছুটি হইলে লইয়া আসে। বাদবাকি সময়

তাহার একাব, নিজস্ব। এই সময় সে একটি নূতন উপন্যাস লিখিয়া থাকে। প্রথম উপন্যাসের সাফল্য তাহাকে সাহসী কবিয়াছে। এক উপন্যাসেই তাহার বলিবার কথা শেষ হইয়া যায় নাই। অনেক বাকি রহিয়াছে। এই উপন্যাসে তাহা লিখিবে।

আশেপাশের দুই একজন প্রতিবেশী অপুর কাছে যাতায়াত করিয়া থাকেন। ইঁহারা জানিয়া গিয়াছেন, অপু লেখক। অপুর উপন্যাস এঁরা পড়েন নাই, কিন্তু লেখকের উপর এঁদের অবিচল ভক্তি। ফলে শহরে সাহিত্যিকের আগমন সংবাদ রটিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। তাহার বাসায় কয়েকটি ছোকরা যাতায়াত শুরু কবিল। ইহাদের রচনা অপুকে মনোযোগ দিয়া শুনিতে হইত—দরকার হইলে কলম চালাইয়া ঠিক কবিয়া দিতে হইত। অপুর উপন্যাস ইহারা পড়িয়াছে। অপু অবাক হইয়া লক্ষ করিল, তাহার নাম বেশ ছড়াইয়াছে। এত দ্রুত খ্যাতি আসিবে ইহা তাহার কল্পনার বাহিরে ছিল। একদিক দিযা ভালোই হইয়াছে। একা থাকিতে হয, এ ধরনের কিছু তরুণের সহিত আলাপ থাকা ভালো।

কাজলকে প্রতিবেশীব বাড়িতে রাখিয়া মাঝে মাঝে সে একদিনের জন্য কলিকাতায় যায়। বই হইতে আয় হইতেছে মন্দ নহে। পাবলিশারের কাছে গিয়া অপু টাকা লইয়া যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মালতীনগরে ফেবে। কাজলকে ছাড়িযা সে বেশিক্ষণ থাকিতে পারে না। আজকাল তাহার এই ভাবিয়া অবাক লাগে যে, কাজলকে ফেলিয়া কীভাবে এতদিন সে বাহিবে পড়িয়া ছিল। হৌক ফিজি সুন্দর স্থান, কাজল সুন্দবতর।

কলিকাতায় একদিন তাহাকে প্রকাশকেব দ্বাবে দ্বাবে পাণ্ডুলিপি লইয়া ফিবিতে হইয়াছে। নূতন লেখকের উপন্যাস কেউ ছাপিতে রাজি হয় নাই। এখন পরিস্থিতি কিছুটা অন্যবকম। প্রকাশক খাতিব করিতেছে যত্ন করিতেছে। পূর্বেব সে হেনস্থার দিন আব নাই।

একদিন প্রকাশকের দোকানে ঢুকিতেই প্রকাশক হাসিয়া বলিলেন, আসুন অপূর্ববাবু, বহুদিন বাঁচবেন। এইমাত্র আপনার কথাই হচ্ছিল; ইনি হচ্ছেন 'শববী' কাগজের সম্পাদক। আপনাব একটা উপন্যাস চান, তাই ঠিকানা চাইছিলেন। তা আপনাব নাম করতে কবতে আপনি এসে হাজিব।

পবে পার্শ্বস্থ স্থূলকায় ব্যক্তিটির দিকে ফিবিয়া বলিলেন—নিন, আর ঠিকানা দিতে হল না, একেবারে লেখক মশাইকে ধবে দিলাম।

কথার্বাতা ঠিক হইয়া গেল। আগামী সংখ্যা হইতে অপু লিখিবে। একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে। সম্পাদক ভদ্রলোক অপুব লেখাব অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন।

অগ্রিম টাকা পকেটে লইয়া অপু পুবাতন দিনের মতো খেয়ালে কিছুক্ষণ রাস্তায় বাস্তায় বেড়াইল। এখন সে হোটেলে ঢুকিয়া যাহা ইচ্ছা এবং যত ইচ্ছা খাইতে পারে, ইচ্ছা করিলে নোটগুলি একটা একটা কবিয়া হাওয়ায় উড়াইয়া দিতে পারে। আজ হইতে অনেকদিন আগে, অবশ্য খুব বেশিদিন আব কী, তাহাকে অভুক্ত অবস্থায় রাস্তায় বেড়াইতে হইয়াছে শুকনো মুখে। কেহ ভালোবাসিয়া বলে নাই, আহা, তোমার বুঝি খাওয়া হয় নি? এসো, যা হয় দুটো ডাল-ভাত—না, সেরূপ কেহ বলে নাই; ববং তেওয়ারী-বধূ বেশ ভালো ছিল, তাহার স্নেহে খাদ ছিল না। জীবনের পথে তেওয়ারী-বধূর মতো কয়েকজনেব নিকট হইতে স্নেহস্পর্শ পাইয়াই তো কষ্টের মধ্যেও মানুষ সম্বন্ধে সে হতাশ হইয়া পড়ে নাই। আজ টাকা কয়টা পকেটে করিয়া সে পরিচিত স্থানগুলিতে একবার করিয়া গেল। মনে মনে ভাবিল, মানুষ যেখানে কষ্ট পায়, ভগবান সেইখানেই আবার তাকে সুখ দেন। আমার সেই পুবোনো মেসের সামনেই পকেটে আজ একগাদা টাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কথাটা ভাবিয়া তাহার কেমন অদ্ভুত লাগিল। মনে হইল, রাস্তার ওপারের ওই দোকানে বসিয়া থাকা ধূমপানরত মানুষটিকে ডাকিয়া বলে—শুনুন, আমি ওই গলিতে থাকতাম অনেকদিন আগে। খেতে পেতাম না, কলেজের মাইনে দিতে পারতাম না। মা বাড়িতে কষ্ট পেতেন, টাকা পাঠাতে পারতাম না। আর এখন আমার পকেটে এই দেখুন, অনেক টাকা—অনেক। এ দিয়ে আমি কী করি বলুন তো?

কিছুদিনের মধ্যেই অপু আরও একটি পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাস লিখিতে শুরু করিল। বাজারে তাহার বেশ নাম। বিশেষ করিয়া তরুণদের কাছে তাহার নূতন দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত আদর পাইতেছে। মালতীনগরের সেই তরুণ বাহিনী রোজ তাহার দুর্গ আক্রমণ করে, সে মাঝে মাঝে বিরক্ত হইলেও মুখে কিছু বলিতে পারে না। ছেলেগুলোকে সে পছন্দ করে, কিন্তু বড়ো বেশি বক বক করে তাহারা। অপুর মাথা ধরিয়া যায়।

অপু প্রতি মাসে একগাদা পত্রিকা ও বই কিনিয়া থাকে। ছেলের জন্য ভালো শিশুসাহিত্য আনে। এমন বই আনে, যাহা কাজলের মনের গভীরে ঘুমন্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে জাগাইয়া তোলে। কূপমণ্ডুক হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার কোন অর্থ হয় না, ছেলেকে সে মধ্যবিত্ত মনের অধিকারী করিয়া গড়িবে না। অপু নিজে ওয়াইড ওয়ার্লড ম্যাগাজিন পড়িতে ভালোবাসে। সে পড়ে ও ভালো গল্প পাইলে তৎক্ষণাৎ ছেলেকে ডাকিয়া শোনায়। এইভাবে অপু ছেলের মনে একটা পিপাসা জাগায়।

কাজলের বিশেষ বন্ধু কেহ নাই। স্কুলে নাই, পাড়াতেও নাই। সে সমবয়সীদের মতো দৌড়ঝাঁপ করিতে পারে না—যেসব খেলায় শারীরিক কসরতের প্রয়োজন, সেগুলি কাজল সভয়ে এড়াইয়া চলে। চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে, সে পারে না। এই তো সেদিন বেণু আর শ্রীশ আম পাড়িবার জন্য মুখুজ্যেদের বাগানে পাঁচিল ডিঙাইয়া ঢুকিতেছিল। আম খাইতে কাজলের আপত্তি নাই, কিন্তু মধ্যে প্রাচীররূপী বড়ো একটা বাধা রহিয়াছে। অত উঁচু পাঁচিল তাহার পার হইবার সাধ্য নাই। বেণু আর শ্রীশ অদ্ভুত কৌশলে তর তর করিয়া পাঁচিলের মাথায় উঠিয়া গেল। শ্রীশ মিটিমিটি হাসিয়া বলিল—কী রে, পারবি নে?

তাহাদের উঠিবার কায়দা দেখিয়া কাজলের মনে হইতেছিল, ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি তাহারা এই কার্যের অনুশীলন করিয়াছে। মনে মনে নিজের অক্ষমতা বুঝিয়া কাজল ম্রিয়মাণ হইয়া বলিল- না ভাই, আমার ডান পায়ে ব্যথা। একটা ফেলে দে না ভাই, খাই।

শ্রীশ এবং বেণুরা দয়া করিয়া একটা দুইটা আম তাহাকে খাইতে দেয়। উপায় কী! নিজে উঠিয়া পাড়িবার সাধ্য তাহার নাই।

বাহিরের দুনিয়ায় লাফালাফি করিয়া বেড়াইবার সামর্থ্য নাই বলিয়া সে ঘরের মধ্যে অধিকাংশ সময় কাটায়। মাঝে মাঝে কাজল বাবার ওয়াইড ওয়ার্লড ম্যাগাজিনগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখে। গল্পগুলির আকর্ষণ তীব্র। ছবি দেখিয়া তাহার গায়ের লোম কাঁটা দিয়া ওঠে— যে ছবিটায় খুব রহস্যজনক ঘটনার আভাস পাওয়া যায়, বাবাকে বলিয়া গল্পটা কাজল শুনিয়া লয়।

অপু বুঝিতে পারে, কাজলের মানসিক বৃদ্ধি শুরু হইয়াছে। ঠিক এই একই জিনিস সেও করিত দেওয়ানপুরের স্কুলে। কঠিন ইংরাজি বুঝিতে না পারিলে ছবি দেখিয়া কিছুটা আভাস পাইবার চেষ্টা করিত, অনেক সময় রমাপতিদাকে ধরিয়া গল্পটা বুঝিয়া লইত। সেই একই জিনিস আবার ঘটিতেছে। রক্তের ভিতর অদৃশ্য বীজ রহিয়াছে—তাহাই এ সব সম্ভব করিতেছে।

ধারাবাহিক উপন্যাস দুইখানি শুরু করিবার কিছুদিন পরে অপু বিকালে বসিয়া ছেলের সঙ্গে জলখাবার খাইতেছিল। গোপালের মা পরোটা ভাজিয়া দিয়া রাস্তার ওপারের দোকানে দোক্তা আনিতে গিয়াছে। এমন সময় বসিবার ঘরের দরজার মুখে আসিয়া দাঁড়াইল একটি মেয়ে। কিশোরী বলাই অধিক সঙ্গত, মেয়েটির বয়স কোনমতেই পনেরো-ষোলর বেশি নহে। অপু অবশিষ্ট পরোটাসুদ্ধ থালাখানা তাড়াতাড়ি খাটের নিচে লুকাইবার চেষ্টা করিল।

আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য! মেয়েটি একা আসে নাই, তাহার পিছনে আরও একটি মেয়ে আসিয়াছে। এ মেয়েটি হয়তো প্রথমটির চেয়ে বৎসর দুই-তিনের বড়ো হইবে।

অপু উঠিয়া কোঁচা দিয়া খাটটা পরিষ্কার করিয়া মেয়ে দুটিকে বসিতে দিল। কাজল অবাক হইয়া ব্যাপারটা দেখিতেছে। অপেক্ষাকৃত কমবয়সী মেয়েটি লজ্জিত সুরে বলিল—আপনিই তো অপূর্বকুমার রায়, লেখক?

অপুর মনে ভারি আনন্দ হইল। সে লেখক বলিয়া মেয়ে দুটি দেখা করিতে আসিয়াছে। এ অভিজ্ঞতার স্বাদ তাহার নিকট একেবারে নূতন। প্রশংসা সে আগেও পাইয়াছে, কিন্তু মেয়েদের নিকট হইতে তাহা পাওয়ার একটা আলাদা আনন্দ রহিয়াছে।

মেয়ে দুটি মালতীনগরেই থাকে। ছোট মেয়েটির নাম হৈমন্তী, বড়টি তাহার দিদি, নাম—সরযূ। হৈমন্তীর সাহিত্যে গভীর অনুরাগ আছে, সে অপুর লেখা পড়িয়া অবাক হইয়াছে তাহার ক্ষমতায়। অপু কি তাহাকে একটা অটোগ্রাফ দিবে?

অপু সত্যই অবাক হইল। মফঃস্বলে মেয়েরা একা বেড়াইতেছে, ইহা বেশ নূতন দৃশ্য। তাহা ব্যতীত কলিকাতায় অটোগ্রাফ চাহিলে ততটা অবাক হইবার কারণ থাকে না, কিন্তু মালতীনগরে অটোগ্রাফ! নাঃ, মেয়ে দুটি দেখা যাইতেছে বেশ আলোকপ্রাপ্তা।

অটোগ্রাফ দেওয়ার পর অপু তাহাদের চা খাইতে অনুরোধ করিল। তাহারা লেখকের সহিত কথা বলিতেই আসিয়াছিল, অতএব বিশেষ আপত্তি করিল না।

কথায় কথায় প্রকাশ পাইল হৈমন্তী গল্প লিখিয়া থাকে। অপু বলিল— সেটা আগে বলেন নি কেন? বাঃ, খুব ভালো কথা। একদিন নিয়ে আসুন, পড়া যাক। দিদি কথাটা প্রকাশ করিয়াছিল। হৈমন্তী সরযূর দিকে কটমট করিয়া তাকাইল। অপুর মজা লাগিতেছিল। হৈমন্তীর ছেলেমানুষি তাহার মনের আনন্দকে হঠাৎ জাগাইয়া তুলিল। নারীর স্পর্শ না থাকিলে জীবনটা পানসে লাগে, নারীর কল্যাণ-হস্তই জীবনের রূপ পালটাইয়া দেয়।

হৈমন্তী একখানা চাঁপাফুল রঙের শাড়ি পরিয়া আসিযাছিল, শাড়ির আঁচল হাতে জড়াইতে জড়াইতে লজ্জিত মুখে বলিল—দিদির যেমন কাণ্ড! লেখা-টেখা কিছু নয়, ও এমনি—

সবযূ বাধা দিয়া বলিল—না অপূর্ববাবু বিশ্বাস করবেন না ওর কথা। এই সেদিনও ওব লেখা বেরিয়েছে কাগজে।

সরযূ যে পত্রিকার নাম করিল, সেটা শুনিযা অপু সত্যিই বিস্মিত হইল। বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রে যদি এই দুগ্ধপোষ্য বালিকার রচনা ছাপা হইয়া থাকে, তবে অবশ্যই একবার পড়িযা দেখিতে হইতেছে।

অপু বলিল—কোন আপত্তি শুনছি নে, কবে লেখা আনবেন বলুন। ফাঁকি দিলে চলবে না।

সরযূ বলিল—বাবাও শুনেছেন আপনি এখানে থাকেন। উনি বলেছিলেন একদিন আপনাকে দুপুরে খাবার কথা বলতে। না, আপনারও কোন আপত্তি শোনা হবে না। কবে যাবেন বলুন—যেদিন যাবেন, সেইদিন হৈমন্তী আপনাকে লেখা শোনাবে।

অপু বিশেষ আপত্তি করিল না। রবিবারে নিমন্ত্রণ রহিল। কাজলও সঙ্গে যাইবে। হৈমন্তী এবং সরযূ দুইজনে কাজলকে অনেক আদর করিয়া বিদায় লইল। ঠিকানাটা অপু রাখিয়া দিল।

মেয়ে দুটি বিদায় লইলে অপু বিছানার কাছে আসিয়া বসিতে যাইবে, চাদরের উপর নজর পড়িল—কয়েকটা বেলফুল। তখনও বেশ তাজা, বেশিক্ষণ তোলা হয় নাই। অপু মনে মনে ভাবিল—এখানটায় হৈমন্তী বসেছিল। ওই নিয়ে এসেছিল ফুলগুলো। ভুলে ফেলে গেছে, আচ্ছা মেয়ে যাহোক—

অপু ফুলগুলি তুলিয়া একবার গভীর ঘ্রাণ লইল।

রবিবারে ছেলেকে লইয়া অপু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেল। নিজে একটু বিলাসিতা করিতে ছাড়ে নাই, একটা শান্তিপুরী ধুতি পরিয়াছে। কিন্তু সেই তুলনায় জামাটা ভালো হইল না—ময়লা মতো। অথচ এই ধুতিটা পরিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবার তাহার বড়ো শখ। ফলে বিসদৃশ জামাকাপড় পরিহিত অপু নিমন্ত্রণ খাইতে গেল।

বাড়িতে পা দিতেই হৈমন্তীর বাবা আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। ভদ্রলোক

সরকারি কাজ করেন—বদলির চাকরি। তিনি অপুর উপন্যাসটি পড়িয়াছেন। সম্প্রতি যে পত্রিকা দুটিতে অপু উপন্যাস লিখিতেছে, সেগুলিও তাঁহার বাড়িতে রাখা হয়।

অপু অবাক হইয়া দেখিল, বাড়িময় সাহিত্যের আবহাওয়া। বাবা, ভাই, বোন সবাই বেশ শিক্ষিত ও উদার। বসিবার ঘরে প্রচুর বই রহিয়াছে—অগোছালোভাবে খাটের উপর ও টেবিলের উপর ছড়ানো। অপু নিজের অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছে যে বাড়িতে বই সাজানো থাকে, সে বাড়িতে পাঠক কম। পড়ুয়াদের বই কখনও গোছানো থাকিতে পারে না। যাহারা শখের আসবাবের মতো বই দিয়া ঘর সাজাইয়া সুরুচির পরিচয় দিতে চায়—তাহাদের বই সাজানো থাকিতে পারে। হৈমন্তীদের পরিবার সম্বন্ধে অপুর বেশ একটা শ্রদ্ধা জন্মিল। তাহার মনে বদ্ধমূল ধারণা আছে—যাহারা বই পড়িতে ভালোবাসে তাহারা কখনও খারাপ মানুষ হইতে পারে না। অনেকদিন পরে এই বাড়িতে আসিয়া অপুর মনে হইল, বেশ সহজ পছন্দসই আবেষ্টনীর মধ্যে আসিয়াছে। কাজল আসিবামাত্রই বই-এর কাছে গিয়া বসিয়াছে, বই পাইলে সে আর কিছু চায় না। অপু কিছুক্ষণ বাদে বলিল—তা, এবার লেখাগুলো পড়লে হতো না?

হৈমন্তী কিছুটা সঙ্কোচের সহিত খান দুই পত্রিকা আনিয়া অপুর হাতে দিল। অপু ব্যগ্রতার সহিত একটি হইতে সূচিপত্র দেখিয়া গল্প খুঁজিয়া পড়িতে শুরু করিল। ভাবিয়াছিল, মেয়েলি প্রেমের মিষ্টি মিষ্টি গল্প হইবে। একটি মেয়েকে একজন ছেলে দূর হইতে ভালোবাসিল, দুই-একটা চিঠি দিল। বাগানে একবার দেখাও হইল—পরে অভিভাবকগণ জানিতে পারিয়া মেয়েটিকে ঘরে বন্দী করিল। ইহার পর নায়ক দাড়ি কামানো বন্ধ করিল, বোগা হইতে লাগিল এবং স্কুল-মাস্টারিতে ঢুকিয়া বড়ো বড়ো কবিতা লিখিয়া পরে টিবি হইয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিল। ইহা ব্যতীত মেয়েরা আর লিখিবেই বা কী?

একটু তাচ্ছিল্যের সহিত পড়িতে শুরু করিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় ধাক্কাটা জোরে লাগিল। সাধারণ ন্যাকা-ন্যাকা ভাষায় লেখা নহে—প্রেমের গল্পও নহে। একটি মেয়ে গল্প লিখিতে ভালোবাসিত। বিবাহ হইয়া পতিগৃহে অজস্র সাংসারিক কাজের ভিড়ে তাহার লেখিকা-সত্তা গেল চাপা পড়িয়া। একদিন বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় মেয়েটি অবসর পাইয়া টিনের তোরঙ্গ খুলিয়া তাহার লেখাব খাতা বাহির করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ভিজা বাতাসের সহিত তাহার কুমারী জীবনের স্মৃতি যেন হু হু করিয়া ঢুকিয়া পড়িল ঘরেব ভিতর। এই গল্প। ভাষার উপর লেখিকার দখলের কথা সহজেই বোঝা যায়। অপু অবাক হইল। গল্প পড়িয়া মামুলি ধরনের কী প্রশংসা করিবে তাহা ঠিক ছিল, এখন গল্পটা সত্য সত্যই ভালো হইয়া পড়ায় সে কিছু বলিতে পারিল না।

খাইতে বসিয়া অপু বলিল—সত্যিই খুব ভালো লেখা আপনার। এতটা ভালো, মিথ্যে বলবো না, আমি আশা করতে পারি নি।

হৈমন্তী বলিল—আমাকে আর আপনি বলছেন কেন, তুমি বলুন।

—তোমার গল্প সত্যিই ভালো লাগল হৈমন্তী। এত সাধাবণ প্লট নিয়ে এত চমৎকাব কবে তা ফুটিয়ে তোলা—না, তোমার মধ্যে শিল্পীমন লুকিযে আছে।

হৈমন্তীর বাবা হাসিয়া বলিলেন—অত প্রশংসা করবেন না অপূর্ববাবু, মাথা বিগড়ে যাবে ওর। তবে হ্যাঁ, এ মেয়েটি আমার সত্যিই—পড়াশুনোতেও বড়ো ভালো ছিল। বরাবর ক্লাসে ফার্স্ট হতো। বড়ো অসুখে পড়েছিল বলে বছরখানেক পড়া বন্ধ আছে।

খাওয়া হইলে হৈমন্তী অপুর জন্য মশলা আনিল। মশলা লইতে লইতে অপু জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, সেদিন তুমি আমার খাটের ওপরে বেলফুল ফেলে এসেছিলে, না? তুমি যাবাব পর দেখি পড়ে আছে। আমার অবশ্য ভালোই হয়েছিল, সারা সন্ধে গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেশ কবিত্ব করা গেল।

মাথা নিচু করিয়া হৈমন্তী বলিল—ফেলে আসি নি, আপনার জন্যেই নিয়ে গিয়েছিলাম, রেখে এসেছি। আপনার লেখা পড়ে মনে হয়েছিল ফুল পেলে আপনি খুশি হবেন।

—আমার জন্য নিয়ে গিয়েছ তো আমাকেই দিলে না কেন?

উত্তরে হৈমন্তী কিছু বলিল না, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পরে মাথা তুলিয়া অপুর দিকে তাকাইয়া একটু সলজ্জ হাসি হাসিল।

—কই, বললে না তো দাওনি কেন?

—দিয়েই তো এসেছিলাম। আপনি বুঝতে পারেন নি, সে কি আমার দোষ?

বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে কাজল বলিল—বেশ লোক এরা, না বাবা! উত্তর না পাইয়া অভিযোগের সুরে বলিল—হুঁ বাবা, তুমি সেই থেকে শুনছো না কিছু!

অপু চমক ভাঙিয়া বলিল—অ্যাঁ, ও হ্যাঁ তা ভালো লোক। বেশ ভালো লোক—নাও, এখন তাড়াতাড়ি পা চালাও, বাড়ি গিয়ে তোমার ইংরাজি বানানগুলো—

হৈমন্তী প্রায়ই অপুর বাসায় আসে। অপু সম্প্রতি খ্যাতি পাইতেছে—কিন্তু এই মেয়েটি তাহাকে সত্য করিয়া চিনিয়াছে। পুস্তক সমালোচকদেব দায়সারা ভাসা ভাসা আলোচনা নহে, হৈমন্তী তার অন্তরে প্রবেশ করিয়া তার চোখ দিয়া বিচার করিয়াছে। অপুর লেখক এবং ব্যক্তিসত্তাকে এমন করিয়া আর কেহ আদর করে নাই—এক লীলা ছাড়া। হৈমন্তী তাহাকে বুঝিতে পারিয়াছে, চিনিতে পারিয়াছে।

অপুর মনে ধীরে ধীরে কেমন একটা বুভুক্ষা জাগিয়া উঠিল। ভালোবাসা পাইবার ক্ষুধা। তাব মনে হইল, সারাজীবন এইভাবে ভাসিয়া বেড়ানো সম্ভব নহে, জীবনেব মূল মাটির মধ্যে চালাইয়া নিজেকে মৃত্তিকার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার দিন আসিয়াছে। যতবার সে স্থায়ী হইবাব চেষ্টা করিয়াছে, দুর্ভাগ্যের ঝড়ে তাকে ভাসাইয়া লইয়াছে দূরে। এখন গৃহের শান্তি পাইতে ইচ্ছা করে। তবে সে স্থাণু হইয়া পড়িতে চায় না, গৃহকে সে পায়ের বেড়ি না ভাবিযা জীবনানন্দের একটি দিক হিসাবে পাইতে চায়।

একদিন বিকালে হৈমন্তী আসিল। সঙ্গে তাহার ভাই। অপু হাসিয়া বলিল—আরে, এসো, এসো। ভালোই হলো। বিকেলটা মোটে কাটছিল না, এখন বেশ গল্প কবা যাবে তোমাব সঙ্গে।

—তা তো করবেন। কিন্তু আজ আমার একটা গল্প শুনতে হবে আপনাকে। দেখছেন তো, একদিন প্রশ্রয় দিয়ে কী কাণ্ড করেছেন!

—বারে, সে কী কথা! নিশ্চয় শুনব গল্প। তোমার গল্প আমার সত্যিই ভালো লাগে হৈমন্তী, সেদিন তোমায় মিথ্যে বলিনি। মামুলি প্রশংসাও করিনি। সত্যিই তোমার মধ্যে অদ্ভুত গুণ আছে। কোত্থেকে পেলে বলো তো?

—বাড়িয়ে বলা আপনার অভ্যেস। আমার লেখা এমন কিছু নয়—

জোর তর্ক শুরু হইয়া গেল। অপু প্রমাণ করিবেই হৈমন্তী ভালো লিখিয়া থাকে। আধঘণ্টা বাগ্‌যুদ্ধের পর হৈমন্তী হার মানিল। অপু বলিল—চলো, উঠোনে মাদুর পেতে বসি, ভেতরে বড্ড গরম।

চারজনে উঠানে বসিল। কাজলের সহিত হৈমন্তীর আশ্চর্য সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথম প্রথম কাজল তাহাকে তত পছন্দ করিতে পারে নাই। কিন্তু পরে কী ভাবে যেন কাজলের মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এখন সে সর্বদা হৈমন্তীর কাছে কাছে ঘোরে। হৈমন্তী প্রথম দিন কাজলকে দেখিয়াই ভালোবাসিয়াছিল। কাজলের উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, মুখের গড়ন, সবটাই যেন অপুর ধাঁচে গড়া। দেখিলে আদর না করিয়া থাকা যায় না।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। কাজল হৈমন্তীর কোলের কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়াছে। প্রতাপ (হৈমন্তীর ভাই) হাঁটুর উপরে থুতনি রাখিয়া কী যেন ভাবিতেছে। উঠানের সন্ধ্যামালতীর ঝাড়ে ঝিঁঝির শব্দ। সমস্ত দিনের তাপের পর এখন চারিদিকে কেমন শান্ত স্তব্ধতা।

হঠাৎ একমুহূর্তের জন্য অপুর কেন যেন ফিজির সমুদ্রবেলার কথা মনে পড়িল। এই সময়

স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিয়া পাঁউরুটি ও সামুদ্রিক মাছের ঝোল দিয়া জলযোগ করিয়া সে বেলাভূমিতে আসিয়া বসিত। সমুদ্রের ওপরেই একটি ছোট শহরে সে মাস্টারি করিত। কোনদিনই তার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা হইত না। সে পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকিত। সামনে অবিশ্রান্ত গর্জন করিতেছে সমুদ্র। মাঝে মাঝে ঢেউগুলি তাহার কাছ বরাবর আসিয়া পড়িতেছে, চলিয়া যাইবার সময় ফেলিয়া যাইতেছে একটি টানা লম্বা সাদা রেখা আর কয়েকটি ঝিনুক। অপুর অদ্ভুত অনুভূতি হইত—একটা অপার রহস্যের অনুভূতি। সমুদ্রের প্রকাণ্ডত্বের সহিত নিজেকে একাত্ম করিবার মহৎ অনুভূতি। অথচ এই এখন সে মালতীনগরে বসিয়াও তো বেশ আনন্দ পাইতেছে। অত বিশাল দৃশ্যের সম্মুখীন যে হইয়াছে—তাহার এই ক্ষুদ্র স্থানে আবদ্ধ থাকিয়াও কি আনন্দ পাওয়া সম্ভব?

অপু মনে মনে নিজের আনন্দের কারণটা অনুভব করিল। উন্মত্তের মতো উল্কাবেগে পৃথিবীর এ প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া মরিলেই সার্থকতা লাভ হয় না। জীবনের আনন্দ রহিয়াছে অনুভূতির গাঢ়ত্বের ভিতর, জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার ভিতর। ফিজির সমুদ্রতীরে বসিয়া সে যেমন হইতে পারে—মালতীনগরেও হইতে পারে।

স্তব্ধতা ভাঙিয়া অপু বলিল—তুমি গান গাইতে পারো হৈমন্তী?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হৈমন্তী বলিল—পারি।

—একখানা গাও না, শুনি।

সামান্য পরেই হৈমন্তী গাহিল—'দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ওই ছায়া, ভুলালো রে ভুলালো মোব প্রাণ।'

অপু সামনের দিকে ঝুঁকিয়া শুনিতেছিল। হৈমন্তীর গলা ভালো। বিশেষ করিয়া গানেব কথা এবং উদাস সুব অপুর হৃদয় স্পর্শ করিল। পরিবেশের সঙ্গে গানটা যেন কেমন করিয়া মিলিয়া গেল।

'ঘবেও নহে পাবেও নহে
যে জন আছে মাঝখানে
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায—'

গান শেষ হইয়া গেল। অন্ধকার নামিয়াছে। বেশ বাতাস। অপু ওপরে তাকাইল—সব নক্ষত্র এখনও দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু বৃহস্পতি গ্রহ ঝকঝক করিতেছে। অপু বলিল—বৃহস্পতি চেনো? ওই দেখ। ওই যেটা ও-বাড়ির কার্নিসের ডানদিকে জ্বল জ্বল করছে—দেখছো?

—হ্যাঁ।

—ভাবো দেখি, ওটা পৃথিবীর চেয়ে কত বড়। অন্ধকারের বুকে দীর্ঘপথে সূর্যকে পরিক্রমা করছে সৃষ্টিব উষাকাল থেকে। ও বকম কত গ্রহ, কত নীহারিকা ধূমকেতু মহাশূন্যেব অকল্পনীয় ব্যাপ্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জীবনটা বড়ো অদ্ভুত, বড়ো সুন্দর, না? তুমি অনুভব কবো?

—করি। সেজন্যই তো আপনার লেখা আমার ভালো লাগে।

একটা দমকা বাতাস আসিল। সন্ধ্যামালতীর ঝাড়ে লাগিল দোলা। অনেক শুকনো পাতা খড়খড় শব্দ করিয়া উঠানের উপর দিয়া সরিয়া গেল। কাজল বলিল—সেই যে বাবা তুমি বলেছিলে, এদের দেবে সেই জিনিস—

অপু হাসিয়া বলিল—ওই দ্যাখো, একদম ভুলে বসে আছি। কলকাতা থেকে অরেঞ্জ ক্রীম দেওয়া বিস্কুট এনেছি। তাই কাজলকে বলেছিলাম, তোমরা এলে দেবার কথা। ভাগ্যিস তুই মনে করিয়ে দিলি খোকা—

অপু উঠিয়া ঘরে বিস্কুট আনিতে গেল।

হৈমন্তীদের বাড়িতে অপু প্রায়ই যাতায়াত করে আজকাল। হৈমন্তীর বাবা-মা তাহাকে পাইলে সত্যিই খুশি হন। সে গিয়া গল্পগুজব করিয়া জলখাবার খাইয়া বাড়ি ফেরে। কাজলও সঙ্গে যায়।

মাঝে মাঝে গানের আসর বসে, হৈমন্তী আগে হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া যায়। সাংস্কৃতিক আবহাওয়া অপু পছন্দ করে, ফলে এ বাড়ির সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠিতে বেশি দেরি হয় নাই।

অপু অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছে, একা সারাজীবন কাটানো তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। অপর্ণার কথা ভাবিয়াই সে অন্তর হইতে সায় পাইতেছিল না। কিন্তু পরে চিন্তা করিয়া দেখিল, অপর্ণার স্মৃতি তাহার মনের যে গোপন কন্দরে স্থায়ী রঙে আঁকা হইয়া গিয়াছে—সেখানে আর কাহারও স্থান নাই। কিন্তু হৈমন্তীকে সে অস্বীকার করিতে পারিবে না। সে যদি বলে—আমি হৈমন্তীকে ভালবাসি না, তবে তাহা মিথ্যা কথা বলিবে।

অপর্ণার স্মৃতিকে শ্রদ্ধার আলোয় বাঁচাইয়া রাখিয়াই সে বর্তমান সত্যকে মর্যাদা দিবে। একমাত্র ভয় ছিল কাজলকে লইয়া। কিন্তু কাজল ও হৈমন্তী পরস্পরকে নিকটবন্ধনে বাঁধিয়াছে। সেদিক দিয়া চিন্তার আর কারণ নাই।

একদিন অপু কথাটা হৈমন্তীর বাবার কাছে পাড়িল। ভদ্রলোক আপত্তি করিলেন না। অপু সজ্জন, সুপুরুষ, বাজারে নামডাক হইয়াছে। সম্প্রতি বই লিখিয়া ভালো উপার্জন করিতেছে। এমন পাত্রের সহিত বিবাহ না দিবার কোনো কারণ নাই। তিনি নিজেও বুদ্ধিমান এবং সাহিত্যরসিক। অপুর ব্যক্তিত্ব এবং রচনা-ক্ষমতা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি মত দিলেন।

দিনস্থির করিবার জন্য ভিতর বাড়ি হইতে পঞ্জিকা আনানো হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর মাস তিনেক কাটিয়াছে। বৃষ্টি তেমন হইতেছে না। আকাশেব বঙ কটা, তামাব মতো। গরমে দেশসুদ্ধ লোক হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। মাটিতে বড়ো বড়ো ফাটল, বৃষ্টির জন্য আকাশেব দিকে মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। গরমে কাকদের স্বরভঙ্গ হইয়াছে, ডাকিলে তীব্র কা-কা শব্দেব বদলে একটা ফ্যাসফ্যাস শব্দ বাহির হইতেছে মাত্র। লোকে প্রতি দণ্ডে একবার আকাশের দিকে তাকাইয়া মেঘ আসিল কিনা দেখিতেছে।

অপু স্ত্রী-পুত্রকে মালতীনগরে রাখিয়া নিশ্চিন্দিপুরে গেল। হৈমন্তীকে সে দেশের বাড়িতে রাখিবে। মালতীনগর ভালো জায়গা হইতে পারে, কিন্তু মালতীনগরের সহিত তাহার আত্মিক যোগাযোগ নাই। যদি গৃহী হইতে হয়, নিশ্চিন্দিপুরে সে গৃহী হইবে!

রাধারমণ চাটুজ্যের কাছে খোঁজ করিতে বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেল। তাহাদের পুরানো ভিটার কাছেই ছোট পাকাবাড়ি, মন্দ নহে। দামও অপুর কাছে সস্তা বলিয়া বোধ হইল। নিজেদের ভিটায় নূতন করিয়া বাড়ি তুলিতে গেলে যা খরচ পড়ে, তাহা এখন অপুর পক্ষে জোগাড় করা মুশকিল। বাড়ি একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে—তাহার উপর বাড়ি তোলা অনেক ঝামেলার কাজ। ফলে অপু এই বাড়ি কেনাই মনস্থ করিল।

রাধারমণ হাসিয়া বলিলেন—আমাদের বাড়ির কাছে হল। আমরা দু'ভাই ও বাড়ির একেবারেই পাশেই থাকি কিনা। বেশ গল্প-টল্প করা যাবে। আপনার মতো পড়শী পাওয়া, বুঝলেন কিনা, রীতিমত ভাগ্যের ব্যাপার।

অপু প্রথমে রাধারমণের গায়েপড়া ভাবটা পছন্দ করে নাই, কিন্তু পরে লোকটাকে ভালো লাগিয়া গেল। একটু বেশি কথা বলিলেও চাটুজ্যে লোক মন্দ নহে।

মালতীনগরে ফিরিবার আগে অপু একবার জঙ্গলাবৃত পুরানো ভিটার সামনে গিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে বলল—বৌ নিয়ে আবার আসছি তোমাদের কাছে ফিরে। দেখলে তো, কোথাও থাকতে পারলুম না। তোমরা আশীর্বাদ করো, কাজল যেন মানুষ হয়। যেন ওর জীবনে পূর্ণতা আসে।

হৈমন্তীকে লইয়া নিশ্চিন্দিপুরে আসিলে বেশ বড়ো রকমের হৈ-চৈ হইল। রানি আগে হইতেই অপুর কেনা বাড়িতে আসিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। আরও অনেকে আসিয়া ভিড় জমাইয়াছিল উঠানে। অপুরা আসিতেই রানি সবার আগে আসিয়া অভ্যর্থনা করিল, হৈমন্তীর পিঠে হাত দিয়া তাহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গেল।

গোলমাল মিটিলে অপু বলিল—বৌ কেমন লাগল রানুদি?

—সুন্দর হয়েচে। চমৎকার বৌ হয়েচে। তুই যে বিয়েথাওয়া করে আবার এসে গ্রামে উঠেছিস, তাতে যে কী খুশি হয়েচি, তা আর—এবার মন দিয়ে সংসারধর্ম কর। বড্ড বাউণ্ডুলে হয়ে গিয়েছিলি তুই।

সর্বাপেক্ষা খুশি হইয়াছে কাজল। এই কদিন তাহাকে স্কুলে যাইতে হইতেছে না, পড়া মুখস্থ করিতে হইতেছে না। বাবা বলিয়াছে, গ্রামের কাছেই স্কুলে ভর্তি করিবে। তাহাতে যে দু'একদিন লাগিবে, তাহা বেশ মজায় কাটিয়া যাইবে।

নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিবার সময় অপু ছেলের কথা ভাবিয়াছিল। শেষে ভাবিল—কী আর হবে, গ্রামের স্কুলেই ভর্তি করিয়ে দিই। বাদবাকি পড়া আমি নিজে দেখব'খন। আমি নিজেও তো একসময় গ্রাম্য স্কুলে পড়েচি, আমার কি পড়াশুনো কিছুই হয়নি?

প্রতিবেশীরা ফিরিয়া গিয়াছে। কাজল রানির সহিত তাহাদের বাড়ি গিয়াছে। দুপুরে অপু ঘরে ঢুকিয়া বলিল—প্রথম দিন আর বেশি কিছু রান্না করতে হবে না। যাহোক একটা ছেঁচকি-টেঁচকি কিছু নামিয়ে ফেলো। এমনিতেই আসার কষ্ট গেছে—রানুদি ডাল আর তরকারি পাঠিয়ে দেবে বলেছে। বলেছে, নতুন বৌ এল, তাকে খাটালে গাঁয়ের নিন্দে হবে যে।

হৈমন্তী মুখ তুলিয়া নতুন ঘরকন্না করিবার আনন্দে হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে অপুর মনে একটা আনন্দেব রেশ ছড়াইয়া পড়িল। সে সংসাব করিতেছে স্ত্রী-পুত্র লইয়া। সবাই খুশি। চারিদিক বেশ কেমন ভরিয়া উঠিয়াছে।

সে হৈমন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি অনেক বড়ো বড়ো জায়গায় ঘুরেচো বাবার সঙ্গে। এই অজ পাড়াগাঁয়ে থাকতে পারবে তো?

—পাববো মশাই, পারবো। আমি সে রকম মেয়ে নই, তা হলে তোমাকে বিয়ে করতাম না। ববং শহরই আমার ভালো লাগে না।

—বিকেলে তোমাকে নিয়ে নদীতে যাবো গা ধুতে। এই পেছন দিয়েই পথ, বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে। দেখো, খুব ভালো লাগবে।

—তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। বেলা পড়ে এলো যে, কাজল কই?

—সে রানুদির ওখানে খাবে। না, না, শুধু আমাকে নয়, তোমাবটাও বাড়ো—একসঙ্গে নিয়ে বসে যাই।

—তুমি খেয়ে ওঠো তো আগে, তারপর আমি বসবো।

বিকাল হইয়া আসিতেই অপু হৈমন্তীকে লইয়া পুরানো ভিটার কাছে গেল।

—এই আমার পৈতৃক ভিটে হৈমন্তী। এখানে আমার জন্ম। ওই যে আকন্দগাছ দেখছ—ওখানে একটা ঘর ছিল, সেই ঘরে। আমার বাবা-মার পুণ্যস্মৃতিমণ্ডিত মাটি এখানকার।

হৈমন্তী ভিটার দিকে মুখ করিয়া গলায় আঁচল দিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া প্রণাম করিল। বলিল—তাঁদের তো দেখলাম না। কপাল করে আসি নি শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে ঘর করবো। তাঁদের আশীর্বাদ যেন পাই। কাজলকে যেন মানুষ করে তুলতে পারি।

ব্যাপারটা আদৌ নাটকীয় হইল না। বরং হৈমন্তীর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবার মধ্যে অপু অনেক কিছু দেখিতে পাইল। সকাল হইতেই নানা মিশ্র অনুভূতিতে তাহার বুক ভরিয়া উঠিতেছিল। বৌ লইয়া জঙ্গলাকীর্ণ ভিটার সামনে দাঁড়াইয়া তাহার মনে হইল মায়ের স্নেহ, বাবার আশীর্বাদ যেন

তাহাদের দুইজনকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। এতদিন বাদে অতীতের দিনগুলির সহিত যেন একটা যোগাযোগ স্থাপিত হইল।

রানুপিসি নানা কাজে ব্যস্ত ছিল, তাহাকে বলিয়া কাজল বেড়াইতে বাহির হইল। রানি বলিয়া দিল—বেশি দেরি করিস নে, দূরে যাস নে।

গ্রামের প্রান্তে যে মাঠ আছে তাহার আল ধরিয়া পড়ন্ত বেলায় হাঁটিতে কাজলের খুব ভালো লাগে। মাঠের মধ্যে দূরে দূরে লোক থাকে, অধিকাংশ সময়েই মাঠ ফাঁকা। ওয়াইড ওয়ার্লড ম্যাগাজিন হইতে শোনা গল্পগুলির পটভূমি হিসাবে এই ফাঁকা মাঠ ও বন্য ঝোপ তাহার মনে আধিপত্য বিস্তার করে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রচণ্ড গরমে মরুভূমির ভিতর হীরকসন্ধানী দুইটি দলের মধ্যে যে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়াছিল, এই মাঠে সে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার গরমের সহিত সংগতি রাখিবার জন্য সে হাতের উলটা পিঠ দিয়া শক্ত আলের উপরকার উত্তাপ অনুভব করে। মনে মনে ভাবে, আফ্রিকার মরুভূমির বালিও এমনি গরম। বাবার কাছে গল্প শুনিয়া সে লক্ষ করিয়াছে, যাবতীয় রোমাঞ্চকর ঘটনা আফ্রিকাতেই ঘটিয়া থাকে। আফ্রিকা তাহার কাছে রহস্যের দেশ। বড়ো হইলে সে আফ্রিকায় যাইবে, বাওবাব গাছ (বাবার কাছে নাম শুনিয়াছে) দেখিবে।

সূর্য দিগন্তরেখা স্পর্শ করিয়াছে। কাজল তাকাইয়া দেখিল মস্ত লাল সূর্যটা আস্তে আস্তে দিগন্তের নিচে নামিয়া পড়িতেছে। ততক্ষণে একটু ঠাণ্ডা বাতাস ছাড়িয়াছে। আলের পাশে ছোট ছোট ঝোপের মধ্য দিয়া হালকা শব্দ তুলিয়া হাওয়া বহিতেছে। কেহ কোথাও নাই। যত দূর দৃষ্টি যায়, উদার বিশাল মাঠ পড়িয়া আছে। বিকালে কেমন একটা ছায়া ছায়া ভাব নামিতেছে। বাতাসের অদ্ভুত শব্দ। এর মধ্যে একলা দাঁড়াইয়া থাকিবার যে একটা ভয়মিশ্রিত আনন্দ আছে, তাহা কাজলকে অভিভূত করে। ঠিক ভয় নহে, একটা অচেনা অনুভূতি। এই সময়, দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে বাড়ি হইতে দূরে মাঠের ভিতর পৃথিবীটাকে যেন অচেনা বোধ হয়।

ফিরিবে বলিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই কাজলের সেই লোকটার সহিত দেখা হইয়া গেল। মানুষটার হাতে খঞ্জনী, পরনে আটহাত খাটো মোটা ধুতি। নাকে রসকলি, বগলে ছাতা—তাপ্পি মারা, কাঁধে ঝুলি। আপন মনে আসিতেছিল, সামনে কাজলকে দেখিয়া খঞ্জনীটা দ্রুত লয়ে একবার বাজাইয়া দিল। কাজল প্রথমে ভয় পাইয়াছিল। পরে লোকটার চোখের দিকে তাকাইয়া বুঝিল, এ চোখ যাহার, তাহাকে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই।

লোকটা হাসিয়া বলিল— বেড়াচ্ছেন বুঝি বাবাজি? ভালো, বেড়ানো ভালো। বেড়ালে মানুষের চোখ ফোটে—তাঁর দুনিয়াটার রূপ দেখতে পায় মানুষ—

—কার দুনিয়া?

লোকটা আর একবার দ্রুত খঞ্জনী বাজাইয়া ওপরে আকাশের দিকে দেখাইয়া বলিল—ওই ওখানে যিনি থাকেন, তাঁর। সবই তো তাঁর বাবাজি।

সম্পূর্ণটা না পারিলেও, কাজল লোকটার কথার খানিকটা অর্থ ধরিতে পারিল। বেশ কথা বলে মানুষটি। কাজল বলিল—তুমি বুঝি অনেক বেড়িয়েচ?

লোকটা মৃদু হাসিল।

—বেড়ানো আর হল কোথায়? অকাজেই বড্ড বেলা হয়ে গেল। হ্যাঁ, কিছু কিছু ঘুরেছি বাবাজি। বেশির ভাগটাই না-দেখা রইল।

খঞ্জনী বাজাইয়া লোকটা ভাঙা বেসুরো গলায় দু'কলি গান গাহিল—

ও মন তুই পোড়া সুখে রইলি ভুলে
যখন তোর মনের পদ্ম উঠল দুলে
প্রভুর পদপরশনে—

কাজল লোকটাকে ভালোবাসিয়া ফেলিল। সুন্দর মানুষ। গান গাহিতে পারে—গল্প করিতে

পারে, আর কী চাই? বলিল—তোমার কী তাড়াতাড়ি আছে? এইখানটায় বসে আমার সঙ্গে একটু গল্প করে যাও না।

লোকটা ছাতাটা আলের গায়ে হেলান দিয়া রাখিয়া বসিল।

—তুমি যদি থাকতে বলো, তবে আমার কোন তাড়া নেই।

অনেক গল্প হইল লোকটার সহিত। লোকটা সুন্দর গল্প করিতে জানে। সাধারণ ঘটনাও তাহার বলিবার গুণে চিত্তাকর্ষক হইয়া ওঠে। একটি মেয়ের বাপের বাড়ির গাঁয়ে সে ভিক্ষা করিতে যাইত প্রায়ই। মেয়েটির কবে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সে খবর পায় নাই। একদিন না জানিয়াই তাহার শ্বশুরবাড়িতে ভিক্ষা চাহিয়া দাঁড়াইতে বাপের বাড়ির চেনা বলিয়া মেয়েটি তাহাকে অনেক কথা লুকাইয়া বলিয়াছে। ইহাতে লোকটা খুব খুশি।

—জগতে কেউ কারুর নয় বাবাজি। আপন মনে করলেই আপন, পর ভাবলেই পর।

গল্প শেষ হইলে সে ঝুলির ভিতর হইতে একটি পাকা আম বাহির করিল।

—তুমি এটা নাও খোকন। বাড়ি গিয়ে খেয়ো।

—না, তোমার জিনিস আমি কেন নেবো?

—আমার আর কই? এটা তোমারই, আমি তোমাকে দিচ্ছি।

—নিশ্চিন্দিপুর এই তো কাছেই। একদিন যেয়ো না আমাদের বাড়ি।

—যাব, নিশ্চয় যাব।

খঞ্জনীতে আওয়াজ তুলিয়া গুনগুন করিতে করিতে সে বিদায় লইল। দুই পা হাঁটিয়াই কাজল তাহাকে ডাকিল— তোমার নাম তো বলে গেলে না?

সে ফিরিয়া বলিল—আমার নাম রামদাস বোষ্টম।

স্বল্প আলাপেই রামদাস কাজলের মনে গভীর ছাপ রাখিয়া গেল। কেমন সুন্দর জীবন, একা একা বেড়ায় মাঠে-ঘাটে, ঘরবাড়ির ঠিক নাই। কোন বন্ধন নাই—আবার পিছুটান নাই বলিয়া দুঃখও নাই। খোলা আকাশের নিচে একা খঞ্জনী বাজাইয়া ফেরে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে কাজল বাড়ির পথ ধরিল।

বিকালে নদীতে স্নান করিতে যাইবার কথা ছিল।

অপু আর হৈমন্তী গল্প করিতে করিতে অনেক দেরি করিয়া ফেলিল।

হঠাৎ খেয়াল হইতে অপু ধড়মড় করিয়া মাদুরের উপর উঠিয়া বসিল—ওই যাঃ, এ যে প্রায় অন্ধকার হয়ে এলো, চল চল, আর কথা নয়। দু'খানা গামছা, তোমার শাড়ি, আমার ধুতি, আর শিশিতে একটু তেল নাও—ওবেলা তেল মাথায় দিতে ভুলে গেছি একেবারে। ঘাটে মেখে নেব।

তাড়াতাড়ি গোছগাছ করিয়া বাহির হইতে আরও পনেরো মিনিট দেরি হইল। হৈমন্তী জিজ্ঞাসা করিল—কাজল এলো না যে?

—রানুদির ওখানে আছে, সন্ধে উতরে গেলে রানুদিই দিয়ে যাবে'খন।

অন্ধকার নামিতেছে। নদীর পথে ঝোপে-ঝাড়ে বেশ অন্ধকার ঘনাইয়াছে। বাগান দিয়া যাইবার সময় একটা কী জন্তু ঝরাপাতার উপর দিয়া খড় খড় শব্দ করিয়া দূরে সরিয়া গেল। হৈমন্তী বলিল—ও কী গো?

—ভয় পেয়েছ? কিছু না, শেয়াল-টেয়াল হবে হয়তো কিংবা বেজি!

—সুন্দর লাগছে কিন্তু, না ? শহরে এ সময় গোলমাল, গাড়ির ভেঁপু, মানুষের ভিড়। তার চেয়ে এই ভালো। মনের শান্তির চেয়ে বড়ো জিনিস নেই।

—তুমি যে একেবারে নাটুকে কথাবার্তা বলতে শুরু করলে।

—না গো, এই আমার মনের কথা। আমি এই চেয়েছিলাম। শহর আমার ভালো লাগে না। যখনই তোমার লেখা প্রথম পড়েছি, মনে হয়েছে—

—কী মনে হয়েছে?

হৈমন্তী অপুর দিকে তাকাইল।—না, সে আমার বলতে লজ্জা করে।

—আহা, বলোই না। আদ্দেকটা যখন বললে—

—প্রথম তোমার লেখা পড়েই মনে হয়েছিল—এ মানুষটার সঙ্গে আমার খুব মিল খাবে। প্রকৃতি যে এত ভালোবাসে—

দুইজনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া হাঁটিল। বেশ কেমন সন্ধ্যায় নদীতে স্নান করিতে যাওয়া বনপথ বাহিয়া এইসব শান্তি ছাড়িয়া সে কীসের অন্বেষণে ঘুরিতেছিল সমুদ্রপারে?

বাঁশবাগানের মধ্যে হৈমন্তী হঠাৎ থামিয়া গেল। চারিদিকে তাকাইয়া বলিল—শোনো।

—কী ?

—একটা মজার ব্যাপার হয়েছে।

—তোমার তো দেখি দুপুর থেকে খালি মজার ব্যাপারই ঘটছে। কী ব্যাপাব?

—মালতীনগর থেকে আসবার আগে পত্রিকায় একটা গল্প দিয়ে এসেছি না? সেই গল্পে একটা বাঁশবাগানের বর্ণনা আছে। মনে মনে একটা বাঁশঝাড়েব কল্পনা করে লিখেছিলাম। হঠাৎ এখানটায় দাঁড়িযে চারিদিক দেখে মনে হচ্ছে অবিকল যেন আমার কল্পনাব সেই বাগানটা। কেমন আশ্চর্য, না?

অপুর বেশ ভালো লাগিল ঘটনাটা। হৈমন্তী এ গ্রামের বউ হইয়া আসিবে, ইহা যেন ভগবানই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। নিজের অতীত জীবনটা এই আনন্দের মুহূর্তে গোটানো মানচিত্রের মতো চোখের সামনে খুলিয়া গেল। বহু কষ্ট গিয়াছে, জীবনযুদ্ধে বহু রণক্ষেত্রের সে সৈনিক। এখন পুরস্কারের দিন—সার্থকতার দিন।

অন্ধকার ঝোপে ঝোপে কীটপতঙ্গের ঐকতান শুরু হইয়াছে। বাতাসে দিনশেষের আমেজ আব একটা বন্য গন্ধ।

অপু বলিল—নাও, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল। সন্ধে উতরে গেল—

এক-একদিন রাত্রিতে চাঁদ থাকিলে মাদুব পাতিয়া তারা বারান্দায় শোয়। বাবার পাশে মাদুরে শুইয়া কাজল চাঁদ নক্ষত্র আকাশ পৃথিবী সম্বন্ধীয় অজস্র বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন কবিতে থাকে। অপুকে তাহাব উত্তর দিতে হয়। অপু মাঝে মাঝে কাজলকে বিশ্বসাহিত্যের গল্প শোনায়—কাজল মনোযোগ দিযা শোনে। বেশি রাত হইলে অপু ভাবে কাজল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে গল্প থামাইয়া বলে—কী রে, ঘুম পেয়েছে?

অমনি কাজল বলে, বাবা আমার ঘুম পায়নি। থামলে কেন? বলো—

অপুকে গল্প চালাইতে হয়। এইভাবে কিছুদিনের মধ্যেই কাজল বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি গ্রন্থ শুনিয়া ফেলিল।

একদিন অপু কাজলকে ডাকিয়া বলিল—নে, চল। কাল আমার সঙ্গে কলকাতা চল। যাদুঘর যাবি বলছিলি, কাল যাদুঘর দেখাব'খন। আমারও এমনি কাজ আছে কয়েকটা—সেই সঙ্গে সেরে ফেলব।

পরদিন সকালে অপু ছেলেকে লইয়া কলিকাতা রওনা দিল। কাজল একটা ঘিয়ে-রঙের হাফপ্যান্ট আর সাদা শার্ট পরিয়াছে। হৈমন্তী চুল আঁচড়াইয়া দিয়াছে পরিপাটি করিয়া। যাইবার সময় অপুকে বলিয়া দিয়াছে—ওকে ভালো করে দেখেশুনে নিয়ে যাবে। যা দুষ্টু—

কাজল অনেকদিন বাদে কলিকাতা আসিল। আবার সেই বড়ো বড়ো বাড়ি, লোকজন, হৈ-চৈ, রাস্তায় গাড়ির ভেঁপু, ট্রামের ঘণ্টা। সব মিলিয়া জিনিসটা মন্দ লাগে না। বাবা তাহাকে বলিয়াছে বড়ো হইলে তাহাকে কলিকাতার কলেজে পড়াইবে। কলিকাতার বড়ো বড়ো কলেজের গল্প

বাবা তাহার নিকট করিয়াছে, সেখানে লাইব্রেরিতে কত বই আছে—তাহা নাকি গণিয়া শেষ করা যায় না। ওই সমস্ত বই সে পড়িবে।

অপুর কাজ ছিল বিকালে। খুব সকালে রওনা হওয়ায় তাহারা বেশি বেলা হইবার আগেই কলিকাতা পৌঁছিয়াছিল। ট্রামে করিয়া অপু এসপ্লানেড আসিয়া নামিয়া বলিল—এইটুকু চল হেঁটে যাই। কেমন দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে।

যাদুঘরে ঢুকিতেই কাজলের সেই অদ্ভুত ভাবটা হইল—যাহা সে কিছুতেই কাহাকেও বুঝাইয়া উঠিতে পারে না। মাথার মধ্যে কেমন একটা ঝিম-ঝিম ভাব। যাদুঘরের একটা নিজস্ব গন্ধ আছে, তাহা কাজলকে পুরানো দিনের কথা মনে করাইয়া দেয়। নিজের জীবনের কথা নহে, বাবার কাছে শোনা ইতিহাসের কথা—মানবসৃষ্টির আগেকার পৃথিবীর কথা। সমস্ত আবেদনটা সে ঠিক ধরিতে পারে না। কিন্তু তাহার মনে হয়, এই জীবনের বাহিরে আর একটা বৃহত্তর জীবন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে।

সারাদিন ভারি আনন্দে কাটিল। প্রাচীন স্তূপ হইতে গুহামানবের মাথার খুলি পর্যন্ত সবকিছুই কাজলের কাছে সমান আকর্ষণীয়। প্রাচীন জীবজন্তুর কঙ্কালগুলি যে ঘরে আছে, সে ঘর ছাড়িয়া কাজল আর নড়িতে চায় না। উল্কাপিণ্ডটার সামনে দাঁড়াইয়া উত্তেজনায় তাহার চোখ কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়ে আর কী! ফসিলের ঘরে সে অপুকে জিজ্ঞাসা করে—তুমি যে বলেছিলে পলিমাটিতে তারামাছের ফসিল আছে, সে কই বাবা?

এ সমস্ত অত্যন্ত পক্কতার লক্ষণ সন্দেহ নাই—কিন্তু অপু কাজলকে এইভাবেই মানুষ করিয়াছিল। এই বয়সে অন্যরা যাদুঘরে গিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে চতুর্দিক একবার দেখিয়া আসে মাত্র। কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ঘুরিয়া পা ব্যথা করিয়া বেতের ঝুড়িতে আনা জলখাবার খাইযা মা-বাবার সহিত বাড়ি ফিরিয়া যায়। কিন্তু কাজল বুঝিতে চায়, কাজল অনুভব করে।

বিকালে যাদুঘর বন্ধ হইবার সময় অপু বলিল—চল, এবার আমার কাজটা সেরে আসি। বই-এর দোকানের দিকে যেতে হবে।

পাবলিশারের কাছে কিছু টাকা পাওনা ছিল। দোকানে ঢুকিতেই মালিক হাসিয়া বলিল—আসুন অপূর্ববাবু, বসুন। এবার তো অনেকদিন বাদে এলেন। আপনার ও বইটার স্টক প্রায় শেষ। নতুন এডিশন সম্বন্ধে একটু কথাবার্তা বলে নিতে হয়। এটি কে? বাঃ বেশ বেশ।

অপুর এসব আজ ভালো লাগিতেছিল না। সকালে খুব আনন্দ করিয়া বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু দুপুরের পব হইতেই শরীরটা ভালো বোধ হইতেছিল না। বুকের কাছটায় কেমন একটা ব্যথা-ব্যথা ভাব। এখন আবার নতুন এডিশন সম্বন্ধে বাক্যালাপের ঝামেলা আসিয়া জুটিল।

সমস্ত কথা মিটিতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগিল। অপুর মাথা ঘুরিতেছিল। বুকের যন্ত্রণাটাও বেশ বাড়িয়াছে। কেন যে হঠাৎ এমন হইল, বোঝা যাইতেছে না। শরীর লইয়া পূর্বে সে কখনও চিন্তায় পড়ে নাই। দোকান হইতে বাহির হইয়া সে কাজলের হাত ধরিয়া রাস্তা পার হইবার জন্য ফুটপাথ হইতে পিচের রাস্তায় নামিতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীটা যেন তাহার পায়ের নিচু হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল হু-হু করিয়া। সে যতই পা নামাইতেছে, পা আর রাস্তায় ঠেকিতেছে না। ফুটপাথ হইতে রাস্তা এত নিচু?

পরক্ষণেই বুকের বেদনাটা বাড়িয়া উঠিল। মাটিতে পড়িতে পড়িতে সে হাত বাড়াইয়া কাজলকে ধরিতে গেল। কাজল যেন অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর ধরা যাইতেছে না। সব দূরে সরিয়া গিয়াছে। সে একটা অন্ধকার অতল গহ্বরের মধ্যে পড়িতেছে।

প্রকাশক ভদ্রলোক দোকান হইতে ছুটিয়া আসিলেন, রাস্তায় লোক জমা হইয়া গেল। কাজলের হাত-পা কেমন ঝিমঝিম করিতেছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় সে হতবুদ্ধি হইয়া সাহায্যকারীদের মুখের দিকে কয়েকবার তাকাইয়া দেখিল মাত্র। বাবা পড়িয়া গিয়াছে! ব্যাপারটা তাহার বিশ্বাস

হইতেছিল না। তাহার কাছে বাবা সর্বশক্তিমান, বাবার ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য। বাবাকে মাটিতে পড়িতে দেখিয়া কাজলের সমস্ত হৃদয় আতঙ্কে সংকুচিত হইয়া আসিল। অপুকে উহারা ধরাধরি করিয়া দোকানের ভিতর তুলিয়া আনিল। কাজলকে কেহ ডাকিল না। সে নিজেই আস্তে আস্তে হাঁটিয়া সবার পিছন পিছন দোকানে ঢুকিয়া দেখিল, তাহার বাবাকে একটা বেঞ্চির উপর শোওয়াইয়া জলের ছিটা দিয়া বাতাস করা হইতেছে। কাঠের একটা টেবিলে হেলান দিয়া সে ভাবিবার চেষ্টা করিল, বাবার কিছুই হয় নাই—ঘটনাটা একটা দুঃস্বপ্ন। স্বপ্ন ভাঙিয়া গিয়া এখনই দেখিবে সে বাবার পাশে শুইয়া আছে, গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

মিনিট কুড়ি বাদে অপু তাকাইল। সে চিৎ হইয়া শুইয়া আছে, ওপরে যেন কালো কড়িকাঠ, চারপাশে লোকের কণ্ঠস্বর। বুকে কাহারা একটা ওজন চাপাইয়া দিয়াছে যেন। এটা কোন্ জায়গা? সে এখানে শুইয়া কেন? একটু বাদেই সমস্ত কিছু মনে পড়িতে সে আচ্ছন্নের মতো হাত বাড়াইয়া বলিল—খোকা কোথায় গেল? খোকা?

কলিকাতার সেদিনকার সেই ঘটনার পর হইতেই অপুর শরীর খুব ভালো যাইতেছে না। কলিকাতার ভালো স্পেশালিস্ট দেখাইয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছে, ব্লাডপ্রেসার আছে, কিডনিও ভালো কাজ করিতেছে না। খাওয়ার ব্যাপারে নজর রাখিতে হইবে। লবণ কম খাইতে বলিযাছে। অপু হাসিয়া বলিয়াছিল—এই বয়সে প্রেসার হয়? বলিযাই তাহার মনে হইয়াছিল, খুব একটা কম বয়স তাহার নয়, দেখিতে দেখিতে বয়স বেশ বাড়িয়াছে।

ডাক্তার বলিলেন—সাধারণত এই বয়সে প্রেসার হয় না। আমার মনে হয়, কিডনির জন্যে এরকম হচ্ছে। কতকগুলো ওষুধ দিলাম, খেয়ে দেখুন কেমন থাকেন।

ওষুধ খাইয়া অপু বিশেষ উপকারবোধ করিল না। মাঝে মাঝে শরীর খারাপ লাগে, সে আমল দেয় না। হৈমন্তীর কড়া পাহারার জন্য নিয়মের হেরফের হইতে পারে না, খাওয়া শোওযা ইত্যাদি বাঁধা সময়ে করিতে হয়। অপুর স্বাস্থ্যের জন্য হৈমন্তী বড়ো উদ্বিগ্ন—সে কোথাও বাহিব হইলে না ফেরা পর্যন্ত হৈমন্তী ঘর-বাহির করে। দেরি হইলে কাজলকে বলে—দেখ্ তো খোকা একটু এগিয়ে কাঁঠালতলার কাছে, তোর বাবা এলো নাকি—

অপু বেশিক্ষণ ঘরে থাকিতে পাবে না। তাহার ছেলেবেলা যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। বৈকালে রৌদ্র পড়িতে না পড়িতে ছেলেকে লইয়া বাহিব হইয়া পড়ে। মাঠে ঘাটে ঘুবিতে ঘুরিতে সন্ধ্যা উতরাইয়া যায়। কোনদিন একাই বেড়াইতে যায়। বিকালগুলি তাহার একান্ত নিজস্ব, ব্যক্তিগত। কোন কারণেই একটা বিকাল সে কাহাকেও দিয়া দিতে পারে না। অসুস্থ হইবার পর হইতেই অপুর কেমন একটা ভাব হইয়াছে। প্রায়ই সে বিষণ্ণ মুখে কী যেন ভাবে। প্রকাশকদের নিকট পাওনা টাকার আগে সে হিসাব রাখিত না, এখন বড় একটা খাতা বানাইয়াছে। তাহাতে টাকাকড়ির কথা লিখিয়া রাখে। নিশ্চিন্দিপুরে হৈমন্তীর নামে কিছু জমি কিনিয়াছে, নূতন উপন্যাসখানির টাকা দিয়া হৈমন্তীকে গহনা গড়াইয়া দিয়াছে। হৈমন্তী একদিন চটিয়া বলিল—এ সব শুরু করলে কী! নবাব-বাদশা হয়েছ নাকি? রাজ্যের জমি-জমা, গয়না-পত্তর—এসব তোমার কাছে আমি কবে চেয়েছিলাম?

—তুমি চাও নি হৈমন্তী, আমি দিচ্ছি।

হৈমন্তীর ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল—কেন দিচ্ছ? আমি এ সব চাই না।

—এ সবে তোমার প্রয়োজন নেই, আমি জানি। কিন্তু কাজলের তো ভবিষ্যৎ আছে। প্রথম জীবনটা যেন ওকে কষ্ট করতে না হয়। তারপর চাকরি-বাকরি করলে ও-ই তোমার ভার নেবে। অন্তত ততদিন—

হৈমন্তীর চোখে কিসের একটা ঝলক খেলিয়া গেল। সে অপুর কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—আমার ভার! শুধু আমার ভার। কেন, তুমি—তোমার ভার নেবে না? বলো?

অপু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর আস্তে বলিল—হ্যাঁ, আমার ভারও নেবে বইকি।

তাবপরই সে হাসিয়া ব্যাপারটা লঘু করিতে গেল বটে, কিন্তু নিজেই বুঝিল হাসিবাব জন্য তাহাকে চেষ্টা করিতে হইতেছে।

গম্ভীর হইয়া থাকে সে। মন তা বলিয়া খুব খারাপ নহে। কেমন একটা আনন্দে সে বুঁদ হইয়া অস্তিত্বকে উপভোগ করে। শত কোটি নক্ষত্র এবং নীহারিকার ভিতর নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করিবার তীব্র আনন্দ অন্য সমস্ত কিছু তুচ্ছ করিতে শিখাইয়াছে। মৃত্যুকে সে ভয় করে না। কারণ মৃত্যুর আগেই সে জানিতে পারিয়াছে জীবন কাহাকে বলে। জীবনকে যে জানিতে পারিয়াছে, মৃত্যুকে তাহার ভয় কী?

আকাশটা দুপুরে ধকধক করিয়া জ্বলে, বিকালের দিকে স্নিগ্ধ হইয়া আসে। সন্ধ্যায় বাতাসে দিনশেষের সুর বাজে। অন্ধকার ঘন হইলে অপু নদীর ধারে ঘাসে ছাওয়া ঢালু জমিতে শুইয়া দেখে আকাশে তারা ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহার ছোটবেলায় যেমন উঠিত। এ সময়টা সে নৌকায় কবিযা নদীর উপর বেড়াইত। ছোটবেলাটা কত দূরে চলিয়া গিয়াছে।

মনে কোন দুঃখ নাই, কেমন উদার আনন্দ। পাড়ের নিচে নদীর বহিয়া যাইবার সহজ ভঙ্গির মতো আনন্দ। নদীর ওপারে দিগন্তের উপর উল্কাপাত হইল। রূপালী আগুনের তীব্র শিখা সন্ধ্যা আকাশে একটা উজ্জ্বল সরলরেখা টানিয়া দিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অপুর মনে সুদূরেব চিন্তা জাগিযা উঠিল। উল্কাটি এক বিশাল বিশ্বের দূত—মহাজগতের সংবাদবাহক। তাহার মনটা হঠাৎ বড়ো হইযা, ব্যাপ্ত হইযা দেখিতে দেখিতে যেন সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অপু ডাক্তাব দেখাইতে গিযাছিল। ডাক্তাববাবু চশমাটা নাকের উপব ঠিকভাবে আঁটিয়া লইয়া বলিলেন—আসল কথা এই, বাংলাদেশের হিউমিড আবহাওয়া আপনার স্যুট করছে না। আপনি কিছুদিন বাংলার বাইরে থেকে দেখুন তো, মনে হয় সুস্থ হবেন।

কথাটা অপুর মনে ধরিল। মধ্যপ্রদেশে সে যে কয়েক বৎসর কাটাইয়াছে, সে সময তাহাব অসুখবিসুখ কিছু হয় নাই। প্রচণ্ড উল্লাসে হৈ হৈ করিযা প্রায় একটা বন্য জীবন যাপন কবিযাছে। বিহারের দিকে কোথাও গিয়া থাকিলে মন্দ হয় না।

রাত্রে শুইয়া একদিন সে হৈমন্তীর সঙ্গে পবামর্শ করিল। হৈমন্তী কিছুটা অবাক হইয়া বলিল—নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে চলে যাবে? অন্য কোথাও ভালো লাগবে তোমার?

—একেবারে যাবো না হৈমন্তী। আমাদের গাঁ ছেড়ে পৃথিবীতে কোথাও গিয়ে শান্তি পাব [illegible] এ বাড়িও রইল, ইচ্ছে হলেই চলে আসব।

আসল কথা, অপুর রক্তে ভবঘুরেমি আবার জাগিয়া উঠিতেছে। স্থবিরতার বিরুদ্ধে বি[illegible] করিতেছে। অসুখের জন্যই সে যাইতেছে, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। এক জায়গায় [illegible] কাটানো তাহাব পক্ষে অসম্ভব। এ তাহার পূর্বপুরুষদেব নিকট হইতে প্রাপ্ত। তাহাদের [illegible] তাহাকেও স্থির থাকিতে দিতেছে না। সে যাইবে, আমৃত্যু সে পৃথিবীর ধূলিতে পা ডুবাইয়া [illegible]

সামান্য সময়ের ভিতরেই অপু কিছু টাকা জোগাড় করিয়া ফেলিল। সবাই তাহাকে [illegible] টাকা দেয়, তাহার বই পাইবার জন্য হাঁটাহাঁটি করে। সকালে দুপুরে বিকালে প্রচুর চিঠি [illegible] পাঠকেরা মুগ্ধ হইয়া লিখিতেছে। অপু সবার চিঠির উত্তব দেয়, সামান্য এক লাইনে [illegible] প্রত্যেককে দীর্ঘ চিঠি দেওয়া সম্ভব নহে।

জীবন কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। আর কী প্রত্যাশা করিবার [illegible]

পাইতেছে এবং নাম করিয়াছে এটাই বড়ো কথা নহে—সে দুই চোখ ভরিয়া প্রাণ ভরিয়া জগৎটা দেখিয়া লইয়াছে। আরও দেখিবে। থামিবে না। গার্হস্থ্য তাহার কপালে লেখা নাই।

টাকা আনিতে পাবলিশারের কাছে গিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিল—আপনার সন্ধানে কোন ভালো জায়গা আছে বিহারের দিকে? ভাবছি কিছুদিন ওদিকে থাকবো—

প্রকাশক হাসিয়া বলিল—আপনার ঘোরা বাতিকটা আর গেল না। হ্যাঁ, জায়গার খোঁজ দিতে পারি। অল্প কয়েকদিন থাকবেন, না—

—ভাবছি একটা ছোটমতো বাড়ি পেলে কিনে নিতাম।

অপুকে তিনি একটা জায়গার কথা বলিলেন, কলিকাতা হইতে খুব দূর নহে, জামসেদপুরের কাছাকাছি। হাওড়া হইতে ট্রেনে মাত্র ঘণ্টা পাঁচেক লাগে। পাহাড়ি এলাকা—অপুর ভালো লাগিবে, তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন।

—জঙ্গল আছে? প্রাকৃতিক দৃশ্য কেমন?

—খুব ভালো। সে আপনি নিজের চোখে দেখবেন। আপনাকে তো চিনি। ভালো না হলে আমি আপনার কাছে ও জায়গার নাম করি কখনও!

অপু আরও দু'পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করিল। অনেকে বিশেষ কোন খবর দিতে পাবিল না। কেবল দুইজন লোক, যাদের কথার অপু মূল্য দেয়, জায়গাটার সম্বন্ধে প্রশংসা করিল।

প্রকাশকই খোঁজ করিয়া একটা বাড়ি বাহির করিলেন এবং অপু বিশেষ দেরি না করিয়া বাড়িটা কিনিয়া ফেলিল। কিনিবার জন্য সে নিজে যায় নাই, বাড়ির ছবি দেখিয়াছিল মাত্র। টালির ছাদওয়ালা ছোট সুন্দর বাড়ি। পাশে দুইটা ইউক্যালিপটাস গাছ পাশাপাশি যমজ ভাইয়ের মতো উঠিয়াছে। বহু পিছনে একটা পাহাড় দেখা যায়। ছবিতে বেশ একটা রহস্যের ভাব ফুটিয়াছিল। বিশেষত পিছনের পাহাড়টা অপুকে আকর্ষণ করিল। ছবিটা প্রকাশককে ফেরত দিয়া সে বলিল—আমি আর দেখতে যাবো না। আপনার ওপর ভরসা করে কিনছি। আপনি লোক পাঠিযে দিন টাকা সঙ্গে দিয়ে। দলিলপত্রে আমি একেবারে গিয়ে সই করব।

রাত্রে শুইয়া শুইয়া অপু বলিল—খোকা, তুই তো পাহাড় দেখিস নি? এবার দেখবি'খন।

কাজল পাহাড় দেখে নাই। বাবার কাছে শুনিয়া সে মনে মনে জিনিসটা সম্বন্ধে একটা ধারণা করিবার চেষ্টা করে। চড়কতলার ডাইনে যে'মাটির উঁচু ঢিবিটা আছে, অনেকটা সেইরূপ কি?

—সেখানে নদী নেই বাবা?

—আছে। কী নাম জানিস?

—কী বাবা?

—সুবর্ণরেখা।

নামটা তাহার পছন্দ হয়। সুবর্ণরেখা। এক নিঃশ্বাসে বলিবার মতো নাম। সাঁই করিয়া একবার তলোয়ার ঘুরাইবার মতো। কত নূতন জিনিস সে দেখিবে—পাহাড়, শালবন, সুবর্ণরেখা। সুবর্ণরেখা মিষ্টি নাম, সুন্দর নাম।

সুবর্ণরেখা। সু-ব-র্ণ-রেখা—নামটা কাজলকে ঘুম পাড়াইয়া ফেলে।

কাজল ঘুমাইলে অপু বলিল—ঠিক বুঝতে পারছিনে হৈমন্তী, কাজটা ভালো হল কিনা। সবে এসে নিশ্চিন্দিপুরে বসতে না বসতেই আবার রওনা দেওয়া—অবশ্য ডাক্তার বলল যেতে, তবু—

হৈমন্তী একটু ভাবিয়া বলিল—না, চলো কিছুদিন থেকেই দেখি তোমার শরীরটা সারে কিনা। এই ভালো, এক জায়গায় না থেকে বেশ ঘুরে ঘুরে বেড়ানো। ও রকম শেকড় গেড়ে সংসার করতে আমিও ভালোবাসিনে।

—আচ্ছা, তোমার পাহাড়ি দেশ ভালো লাগে, না আমাদের এই পাড়াগাঁ ভালো লাগে?

—দুই-ই। এক এক দেশের এক এক রকম সৌন্দর্য—

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অপু বলিল—তুমি তো সমুদ্র দেখনি, না?

—না। কী করে দেখবো বল? বরাবর তো বাবার সঙ্গেই ঘুরেছি, সমুদ্রের কাছাকাছি বাবা কখনও বদলি হননি।

—যাবে?

হৈমন্তী উৎসাহে বিছানায় উঠিয়া বসিল।

—সত্যি বলছো? কবে নিয়ে যাবে? চলো দু'এক দিনেব মধ্যেই যাই।

—কোথায় যাবে?

হৈমন্তী চিন্তা করিয়া বলিল—তুমি বলো।

—পুরী যাবে?

পুরী যাওয়াই ঠিক হইল। কাজলের কিছুদিন বাদেই পরীক্ষা। সে রানির কাছে থাকিবে। অপুরা কাজলের পরীক্ষার আগেই ফিরিবে। রানির কাছে থাকিতে কাজলের কোন অসুবিধা নাই। কাজল সঙ্গে যাইবে বলিয়া অবশ্য হাত-পা ছুঁড়িয়াছিল এবং অপু রাজিও হইয়াছিল। কিন্তু রানি আসিয়া বলিল—তোবা যাচ্ছিস যা। এ ছেলেটাব সামনে পবীক্ষা। এটাকে আবার দলে টানছিস কেন? ও আমাব কাছে থাকুক, দুবেলা পড়াতে বসাব এখন। তোবা একা যা—

কাজল রানির কাছে থাকিয়া গেল। অবশ্য অপুকে বাববার প্রতিশ্রুতি দিতে হইল যে, পরীক্ষাব পবেই কাজলকে লইয়া সে পুবী যাইবে।

অপু হাসিয়া হৈমন্তীকে বলিতেছিল—আমাকে কোথাও একদণ্ড তিষ্ঠোতে দিচ্চে না, বুঝলে? দুই জাযগায় তো সংসার পেতে ফেললাম, তাতেও দেখচি খালি ঘুরে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা কবচে। বেশিক্ষণ ঘবেব মধ্যে থাকলে মন কেমন হাঁপিয়ে ওঠে, জানো!

—তোমাব তো ওইবকমই। খালি বেড়ানো, খালি ঘুরে বেড়ানো! এখন তোমার যাযাবববৃত্তি একটু বন্ধ বাখতে হবে, নইলে ছেলেটার পড়াশুনো আব কিছু হবে ভেবেছ?

—হবে হবে। সে কি আমি ভাবিনি মনে করচো? কাজল এতে ভালো কবে মানুষ হয়ে উঠেচে। পড়াশুনায় ওর ঝোঁক বড়ো বেশি, সব সময় বই মুখে করে বসে আছে। নতুন বাড়িতে গিয়েই ওকে আবাব সেখানকার ইস্কুলে ভর্তি করে দেব।

হৈমন্তী বলিল—আচ্ছা, সমুদ্রে স্নান কবা যাবে তো? নাকি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ঢেউয়েব টানে?

—তা কেন, কত লোক স্নান কবচে দেখবে। সবাইকে কি জলে ভাসিযে নিযে যাচ্ছে? তা ছাড়া নুলিয়া আছে—

—নুলিয়াবা কখনও ডোবে না, না?

অপু হাসিয়া বলিল—তুমি বড়ো ছেলেমানুষ হৈমন্তী। একেবারে বাচ্চাদেব মতো প্রশ্ন করছো। এই জন্যেই তোমাকে এত ভালো লাগে।

—আর তুমি খুব বুড়ো হয়ে গেছ, না?

—হয়েছিই তো।

—উঃ, একেবারে তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অপু বলিল—কাপড়চোপড় গুছিয়ে নাও। শীগগিরই রওনা দেবো।

অপু আর হৈমন্তী পুরী যাইবার দিন চারেক পর নিশ্চিন্দিপুরে একদিন বৃষ্টি নামিল। রাস্তার ধুলা নিমেষের মধ্যে কাদায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। গ্রামের ভিতরের সমস্ত রাস্তা কাদায় ভর্তি, বালকের দল সেখানে আছাড় খাইতে লাগিল। বড়ো বড়ো আম কাঁঠাল গাছ হইতে টুপটাপ করিয়া

অবিশ্রান্ত জল পড়িতেছে নিচের কচুবনের উপর। বৃষ্টি এক-একবার ধরিয়া আসে, কিন্তু উঁচু গাছ হইতে জল পড়া থামে না।

মেঘাচ্ছন্ন দিনে কাজলের বড়ো মন কেমন করে। কেন করে, তা সে বোঝে না। ঘন মেঘে আকাশ কালো, গুম গুম করিয়া মেঘ ডাকিতেছে, ঝুপ ঝুপ করিয়া অবিরাম বৃষ্টির শব্দ। কেমন একটা মনখারাপ-করা চাপা আলো চারিদিকে—এই আলোটা কাজলকে উদাস করিয়া দেয়।

রানুপিসির উত্তরের জানালায় বসিয়া সে দেখে, বাহিরের অন্ধকার ক্রমশ ঘন হইতেছে, দুপুরটা সন্ধ্যাবেলার মতো দেখাইতেছে। রানি বৃষ্টিতে তাহাকে বাহির হইতে দেয় নাই। জানালায় বসিয়া সে দেখিল, চনু একটা পুঁটিমাছধরা ছিপ আর একটা চটের থলে হাতে কোথায় যাইতেছে।

কাজল তাহাকে ডাকিয়া বলিল—কোথায় যাচ্ছিস রে?

—মাছ ধরতে।

—কোথায়? নদীতে?

—দূর! নদীর পথে বেজায় কাদা। বামুনপুকুরে যাবো। যাবি?

কাজল মাথা নাড়িল।

—যাবি না?

—না।

—কেন রে, জ্বর হয়েছে?

—না।

—তবে?

—ইচ্ছে করছে না যেতে। তুই ধরগে যা মাছ।

ইচ্ছা খুবই করিতেছে। কিন্তু পিসি ঘরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে—এ কথা বলিলে চনুর কাছে দর কমিয়া যায়। চনুর মা-বাবা কেমন ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহার বেলা সবার যত কড়াকড়ি।

একটু পরে রানি ঘরে ঢুকিলে সে বলিল—চনু কেমন মাছ ধরতে গেল এই একটু আগে! ওকে তো বেশ ছেড়ে দিয়েছে, আমাকে তুমি একটু বেরুতে দাও না কোথাও—

—দিই না তো বেশ করি। ও সব হাভাতে ছোঁড়ারা তো ঘুরবেই—

অনুমতি মিলিল না। অতঃপর জানালায় বসিয়া শিকে গাল রাখিয়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে বাহিরে তাকাইয়া থাকা ছাড়া উপায় নাই।

বাহিরে জল জমিয়াছে। একটা চড়ুই পাখি হঠাৎ কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া রাস্তার ধারের জমা জলে স্নান করিতে লাগিল। মাথা ডুবাইয়া জল তুলিয়া গায়ে দেয়, কখনও সমস্ত শরীরটা ডুবাইয়া দেয় জলে। বৃষ্টি হওয়ায় মহাস্ফূর্তি—এদিকে ওদিকে অনেক পাখি ঝোপেঝাড়ে কিচমিচ করিতেছে। ভয়ানক গরম পড়িয়াছিল, তাহা হইতে মুক্তি পাইয়া সবাই খুশি। একটা শেয়াল সামনের বাগানটা পার হইয়া গিয়া একবারে রানুপিসিদের উঠানে আসিয়া পড়িল। কাজল দিনের বেলা এত কাছ হইতে কখনও শেয়াল দেখে নাই, উৎসাহে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। শেয়াল বড়ো চালাক, দিনমানে মনুষ্যবসতির নিকটে ঘোরাফেরা করিতে বড়ো দেখা যায় না। কাজলের চোখ বিস্ময়ে কোটর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল। শেয়ালটা মিনিটখানেক স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া হঠাৎ তীরবেগে পাশের কচুবনে ঢুকিয়া পড়িল।

বিকালের দিকে কাজলের মনটা খারাপ লাগিতেছিল। বাবা বাড়ি নাই। এ সময়টা সে সাধারণত বাবার সঙ্গে কাটায়। পড়ন্ত বেলার চাপা আলো তাহার মনে বেদনার একটা সুর ছড়াইয়া দিল। শুধুই কি বাবার জন্য মন খারাপ? কাজল অবাক হইয়া আবিষ্কার করিল, মায়ের জন্যও তাহার মন কেমন করিতেছে। কদিনই বা হইল মা তাহাদের দুইজনের সংসারে আসিয়াছে—তাহার জন্য মন খারাপ হয় তবুও।

জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া ভেজা গাছপালা দেখিতে দেখিতে কাজলের মনে হইল, মাকে সে সত্যই খুব ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছে।

পুরী হৈমন্তীর ভালো লাগিতেছিল। জীবনের প্রথম সমুদ্রদর্শনে তাহার মন অকস্মাৎ আকাশের মতো খোলামেলা হইয়া গেল।

সারাদিন বেশ গরম থাকে। বিকালে দুইজনে সমুদ্রের ধারে যায়। পায়ে পায়ে হাঁটিয়া হঠাৎ আবিষ্কার করে শহর অনেকটা পেছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। বাঁ-পাশে উঁচু বালির ডাঙা, এদিকে বিস্তৃত একখানি নীল আয়নার মতো সমুদ্র। প্রথম দিন রেল স্টেশন হইতে আসিবার সময় পথের বাঁক ফিরিয়াই হঠাৎ সামনে সমুদ্র দেখিয়া হৈমন্তী অবাক হইয়া গিয়াছিল। সমুদ্র সম্বন্ধে তাহার মনে যে ধারণাটা ছিল সেটাকে চুরমার করিয়া আসল সমুদ্র চোখের সামনে একটা অগাধ বিস্তৃতি খুলিয়া দিল।

সেদিন তাহারা বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক দূর গিয়াছিল। অপু বলিল—কেমন লাগছে?

—ভালো।

—শুধু ভালো? আর কিছু না?

—বিরাট ভালোর বর্ণনা কী করে দিই বলো তো? মোটামুটি ভালো লাগলে বেশ বড়ো করে বলা যায়। খুব বেশি ভালো লাগলে তখন আর প্রগল্‌ভ হওয়া যায় না।

অপু বলিল—ভালো করে অনুভব করে দেখো, সমুদ্রের সঙ্গে মানুষের জীবনের একটা আশ্চর্য সাদৃশ্য পাবে। জীবনও সমুদ্রের মতো বড়। জীবনেও সমুদ্রের মতো ঝড় ওঠে। সমুদ্র যেমন সৃষ্টির আদি থেকে অবিশ্রাম তীরে এসে আঘাত করছে, বাধা পেয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে— আবার নতুন করে আসছে, তেমনি জীবনও একটা লোহার পর্দায় বার বার আঘাত করছে যেন। কিছুতেই ভাঙতে পারছে না। কী একটা যেন জানবার কথা আছে--কিছুতেই জানা যাচ্ছে না--

অপু থামিতেই হৈমন্তীর কানে সমুদ্রের শোঁ শোঁ শব্দটা খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যা নামিয়াছে। দিগন্ত পর্যন্ত অন্ধকার—কেবল এখানে ওখানে সাদা ফেনা অন্ধকারেও দেখা যাইতেছে।

হৈমন্তী চুপি চুপি প্রশ্ন করিল—কী জানবার আছে মানুষের?

অপু ঘাড় ফিরাইয়া চোখ তীক্ষ্ণ করিয়া দূরে তাকাইয়া ছিল। অনেকক্ষণ বাদে ধীরে ধীরে বলিল—প্রশ্নটা জানা আছে, উত্তরটা কেউ জানি না।

ফিরিবার সময় হৈমন্তীর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া অপু বলিল—কেন চিন্তা করতে শিখলাম বল তো? জীবনটা তো এমনিতেই বেশ কাটিয়ে দেওয়া যেতো।

পরের দিন সকালে অপু বলিল—সব ঠিক করে ফেললাম। চল, কাল কোনারক থেকে ঘুরে আসি। পুরী এসে কোনারক না দেখে ফেরা যায় না।

হৈমন্তীর আপত্তির কোন কারণ ছিল না। আরও একটি পরিবার কোনারক দেখিতে যাইতেছে—অপুও তাহাদের সহিত যাইবে ঠিক করিয়াছে, কথাবার্তা সব ঠিক।

সারাদিন একটু একটু করিয়া কোনারকের ইতিহাসটা হৈমন্তী অপুর নিকট হইতে শুনিয়া লইল। ইতিহাস জানিবার পর কোনারক দেখিবার ইচ্ছা আরও বাড়িল। পরদিন সূর্যমন্দিরের চূড়াটা উঁচু গাছের পাতার ফাঁক দিয়া একটু একটু করিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিতেই আনন্দে হৈমন্তীর গলার কাছে কী একটা পাকাইয়া উঠিল।

বিরাট মন্দির। প্রশস্ত উঠানের অপর প্রান্তে বিশাল প্রধান দ্বার। মন্দিরের ভিত্তিতে রথচক্রের অনুকরণে বড়ো বড়ো পাথরের চক্র খোদাই করা। হু হু করিয়া বাতাস বহিতেছে। মন্দিরের ওপাশের

উঁচু গাছে হাওয়া লাগিয়া একটা মাতামাতি কাণ্ড হইতেছে। চারিদিক একেবারে স্তব্ধ। এত স্তব্ধ যে, হৈমন্তী নিজের শান্তিপুরী শাড়ির খস-খস শব্দ শুনিতে পাইতেছে স্পষ্ট।

সহযাত্রী পরিবারটি খাওয়ার ব্যবস্থায় লাগিল। তাহারা সঙ্গে লুচি-তরকারি ও মিষ্টি আনিয়াছে। শতরঞ্চি বিছাইয়া সেগুলিকে পাত্র হইতে বাহির করিয়া পাতায় সাজাইতে আরম্ভ করিল। কর্তাটি অপুকে ডাকিয়া বলিলেন—অপূর্ববাবু, খাবেন তো এখন? আমার মশাই, সত্যি বলতে কি, ভীষণ খিদে পেয়েছে—

—আপনারা শুরু করুন, আমরা একটু ঘবে আসি। আমাদেরটা রেখে দিন ববং।

অপু হৈমন্তীকে লইয়া মন্দিরটা ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। বিরাট প্রাঙ্গণের মধ্যে ধূসর পাথরের মন্দিরটা কেমন উদাস ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। মাটি হইতে ক্রমশ চুড়ার দিকে উঠিবার কয়েকটি সংকীর্ণ পথ আছে। তাহারই একটা দিয়া অপু হৈমন্তীকে লইয়া উঠিতেছিল। একদিকে মন্দিরের পাথর—অপবদিকে অনেক নিচে মাটি। হঠাৎ তাকাইলে মাথা ঘোরে। হৈমন্তী অপুকে ধরিয়া উঠিতেছিল।

অপু বলিল—ভালো করে ধরে থেকো। হাওয়া দিচ্ছে বেশ, বেসামাল হলে ঝুপ করে পড়ে যাবে।

অদ্ভুত! অদ্ভুত! শতাব্দীর ইতিহাসবাহী মৌন প্রান্তব, দূরে গাছের সারি, সুন্দর বাতাস। আকাশেব রঙ তাহাদেরই মনোলোকেব স্বপ্নের মতো নীল। ধীরে ধীবে হৈমন্তীব মনের ভিতর কেমন একটা ঘুম ঘুম ভাব ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বহু-তারবিশিষ্ট যন্ত্রেব বিমঝিম বাজনাব মতো আবেশ।

কিন্তু এত সব ভালো লাগিবার মধ্যে একটা কী চিন্তা যেন হৈমন্তীকে খোঁচা দিতেছে। অনেক আনন্দের মধ্যে একটু কী অতৃপ্তির আভাস। কযেকদিন হইতেই হৈমন্তী নিজের অতৃপ্তিব কারণ অনুসন্ধান কবিতে কবিতে আজ এই সূর্যমন্দিরেব ভগ্নসোপানে দাঁড়াইযা উত্তরটা পাইল। সে অনুচ্চকণ্ঠে বলিল—শুনছো?

—কী?

—এবার চলো বাড়ি ফিবে যাই।

—সে কী? এই তো সবে এলে। ভালো কবে সব দেখাও তো হল না। তোমাব জন্যেই তো আসা।

—তা হোক। আর ভালো লাগছে না।

—কেন?

একটু স্তব্ধ থাকিয়া হৈমন্তী বলিল—খোকাকে ছেড়ে থাকতে পারছি নে।

ফেবা হইল।

কাজলের যান্মাসিক পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। অপু ঠিক করিয়াছে এখন বিহারের নতুন বাড়িতে যাইবে না, কাজলের বাৎসরিক পরীক্ষা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কবিবে। নতুন জায়গায় একেবারে নতুন শ্রেণীতে ছেলেকে ভর্তি করিবে। এখন গেলে কাজলের একটা বৎসর নষ্ট হয়।

পরীক্ষার পর কাজল বেশ মজায় আছে। পড়ার চাপ কমিয়াছে। সারাদিন সে ঘুরিয়া কাটাইতেছে। বনজঙ্গল ভাঙিয়া মাঝে মাঝে চলিয়া যায় পাশের গ্রামে।

একদিন কাজল বেড়াইতে বেড়াইতে একটা বাড়ির উঠানে গিয়া হাজির হইল। বেশ সুন্দর ঝক্‌ঝকে বাড়ি, উঠানে ধানের গোলা, সিঁদুর দিয়া তাহাতে মঙ্গলচিহ্ন আঁকা। কয়েকটা ছেলে ছোটাছুটি করিতেছে। গোয়ালের একটা গরু বাছুরের গা চাটিতেছে। উঠানে ক্রীড়ারত চারটি কুকুরছানা। সে মুগ্ধ নয়নে হৃষ্টপুষ্ট বাচ্চাগুলির খেলা দেখিতেছিল। এমন সময় একটি ছেলে আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল।

—কী দেখছ?

সে আমতা আমতা করিয়া বলিল—না, এই—মানে—ওই বাচ্চাগুলো বেশ সুন্দর কিনা, তাই—

—তুমি নেবে একটা?

অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের সম্মুখীন হইয়া কাজল প্রথমটা কিছু বলিতে পারিল না। পরে বলিল—একেবারে দিয়ে দেবে? তোমার বাড়ির লোক কিছু বলবে না?

—দূর! আরও তো তিনটে রইল—তুমি একটা নাও।

প্রথমে কাজল ধরিতে ভয় পাইতেছিল। পরে গায়ে হাত বুলাইয়া বুঝিল তাহারা নিতান্তই নিরীহ।

একটা বাচ্চা বগলদাবা করিয়া দ্রুত সে স্থানত্যাগ করিল। প্রতি মুহূর্তে ভয় হইতেছিল, পেছন হইতে ছেলেটি ডাকিয়া বলিবে—না ভাই, বাচ্চা দেবো না। তুমি রেখে যাও।

দ্রুত বড়ো মাঠটা পার হইয়া কাজল নিশ্চিন্দিপুরে ঢুকিল।

হৈমন্তী রাগ করিয়া বলিল—এঃ, এটা আবার কোত্থেকে জুটিয়ে আনলি, নেড়ির বাচ্চা—

হাত-পা নাড়িয়া কাজল দুর্বল জীবটির পক্ষে অনেক ওকালতি করিল। অবশেষে অনুমতি মিলিল। এবারে বাচ্চাকে তো কিছু খাওয়ানো প্রয়োজন। কুকুরের বাচ্চা কী খায়, এ সম্বন্ধে ধারণা না থাকায় হৈমন্তীর কাছে আবার গিয়া দাঁড়াইতে হইল।

—মা!

—কী রে?

—ওটাকে কী খেতে দিই এখন?

রাগ করিতে গিয়া হৈমন্তী হাসিয়া ফেলিল। ছেলেকে কাছে টানিযা লইয়া বলিল—বড্ড বাচ্চা যে, দুধ ছাড়া কি অন্য কিছু খেতে পারবে? বরং রান্নাঘরের কড়া থেকে খানিকটা দুধ নারকোলের মালায় নিয়ে খাওয়াগে।

খাদ্যের প্রতি বাচ্চাটার একটা দার্শনিকসুলভ নিস্পৃহতা দেখা গেল। কাজল জোর করিয়া দুধের মধ্যে মুখ ডুবাইয়া দিলে নাকের মধ্যে দুধ ঢুকিয়া হাঁচিয়া সে অস্থির হইল। এক মালা দুধ খাওয়াইতে বেলা গড়াইয়া অন্ধকার নামিল।

দুই-তিনদিনের মধ্যে কুকুরছানা নূতন জায়গায় অভ্যস্ত হইয়া আসিল। কাজল বাবাকে বলিয়াছে, কলিকাতা হইতে কুকুরের গলার চেন আনিয়া দিতে। চেন গলায় দিয়া সকাল বিকাল কাজল তাহাকে লইয়া গ্রাম পরিক্রমা করিবে। ওয়াইড ওয়ার্লড ম্যাগাজিনে কুকুরেব বীরত্ব সম্বন্ধে ভালো ভালো গল্প ছাপা হয়—বাবার কাছে কাজল তেমন অনেক গল্প শুনিয়াছে। সেও ইহাকে সুশিক্ষিত করিয়া বীরত্বপূর্ণ অভিযানের সঙ্গী করিবে।

কুকুরের নাম রাখা হইল—কালু। সাতদিনের মধ্যেই কালু কাজলেব পরম ভক্ত হইয়া উঠিল। কাজল নিজে আসিয়া খাইতে না দিলে খায় না, সর্বদা কাজলের পেছনে পেছনে ঘোরে। বেশ ভালো চলিতেছিল, কিন্তু মাসখানেক বাদে হঠাৎ কালুর কী অসুখ করিল। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঝিমায়, খাওয়াদাওয়া একদম ছাড়িয়া দিয়াছে। প্রথমে কাজল আমল দেয় নাই, পরে দেখিল কালুর উঠিবার ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে। তিনদিন আগেও লাফালাফি করিয়া বেড়াইয়াছে, ইদানীং সর্বক্ষণ শুইয়া থাকে। কাজলের সাড়া পাইলে অতিকষ্টে একবার মাথা তুলিয়া তাকায়। অশক্ত ঘাড়ের উপর মাথাটা কাঁপে, কিছুক্ষণ বাদে আবার চটের উপর পড়িয়া যায়।

অপু দেখিয়া বলিল—আহা রে! কালু বোধ হয় আর বাঁচবে না।

সেদিন সারাটা বিকাল ধরিয়া কালু অস্পষ্ট আর্তনাদ করিল, রাত্রি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কাতর গোঙানি। কালু মারা যাইতেছে, কালু ভীষণ কষ্ট পাইতেছে, অথচ কাজলের কিছুই করিবার নাই। চাপা গোঙানির শব্দ তাহাকে কিছুতেই ঘুমাইতে দিল না। রাত্রে মায়ের বুকের কাছে শুইয়া তাহার

মনে হইল তাহার অসুখ করিলে মা-বাবা ব্যস্ত হইয়া সেবা করে, আর বেচারা কালু অন্ধকারের ভিতর একা একা কষ্ট পাইয়া মরিতেছে।

কাজল ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হৈমন্তী তাহাকে কাছে টানিয়া বলিল—কাঁদতে নেই মানিক আমার। ছিঃ—

আদরের কথা শুনিয়া কান্নাটা আরও বাড়িল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কাজল বলিল—কালু কত কষ্ট পাচ্ছে, অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে—

হৈমন্তী তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—একা কোথায় পাগলা! ওর কাছে ঠিক ভগবান এসে বসে আছেন, জানিস! যারা কষ্ট পেয়ে মারা যায়, তাদের আত্মাকে ভগবান নিজের হাতে স্বর্গে নিয়ে যান। ঠিক ওর পাশে ভগবান এসে বসেছেন—

কাজলের দুঃখের বেগটা একটু কমিয়া আসিল। এভাবে সে কখনও ভাবিয়া দেখে নাই। একথা যদি সত্য হয়, তবে দুঃখের কিছুই নাই। ভগবান যদি আসিয়া থাকেন—তবে ভালোই তো। কাজল স্পষ্ট দেখিল, কালুর পাশে এক জ্যোতির্ময়দেহ বিশাল পুরুষ—উন্নতললাট, দীপ্তনয়ন। তাঁহার হাতে পৃথিবীর শাসনের স্বর্ণদণ্ড। তিনি আসিয়াছেন ক্লিষ্ট আত্মাকে স্বহস্তে স্বর্গে লইয়া যাইবাব জন্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুবর্ণরেখা।

বালির চর বুকে কবিয়া নদীটা সারাদিন পড়িয়া থাকে। স্বল্প জল এখানে ওখানে বালিব মধ্য দিয়া বহিয়া যায়। নদীর মাঝখানে বড়ো বড়ো কালো পাথরের চাই প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো পড়িয়া আছে। উপরের প্রখব নীল আকাশ ধূসর দিগন্তের সহিত একটা অদ্ভুত বৈষম্য সৃষ্টি করিয়াছে। মাটির রঙ লাল। জমি সর্বত্র উঁচুনিচু। স্থানটিতে কেমন একটা বৈবাগ্যের ভাব আছে, মাটিব গৈবিক বঙটির মতো।

মৌপাহাড়িতে লোকজন কম। দিনেব বেলায় মনে হয় কিসের উপলক্ষে যেন ছুটি হইয়া গিয়াছে—সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যার সময় একটা কালো চাদব ক্রমশ সবকিছু ঢাকিয়া ফেলে। ঝিঁঝিঁ এবং অন্যান্য পতঙ্গের ডাকের মধ্যে দিয়া রাত্রি মৌপাহাড়িকে গ্রাস কবিয়া লয়। অপু ইহার ভিতরে কী একটা যেন খুঁজিয়া পাইয়াছে। মানুষের সঙ্গ—কেবল কাজল এবং হৈমন্তী ছাড়া—তাহার কাছে আর কাম্য নহে। বইখাতা বগলে দিনের প্রায় সময়টাই সে বাহিরে ঘুরিয়া কাটায়।

নদীর ধারে একখানি বড়ো পাথরের উপর বসিয়া সে লেখে। জীবনকে সে অলসভাবে একদিক হইতে দেখে নাই। তাহার দেখা বিচিত্র জীবনের কথা সে আগামী যুগের জন্য রাখিয়া যাইবে। লিখিতে লিখিতে কখনও মুখ তুলিয়া দেখে সামনে সুবর্ণরেখার বিস্তৃত বক্ষ, ওপারে প্রান্তরের গৈরিক প্রসার। পড়ন্ত সূর্যালোকে নদীর বালির মধ্যে মিশ্রিত অভ্রকণা চিক্ চিক্ করিতেছে। আকাশে বাতাসে কীসের একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত অপুকে বিচলিত করে। কী একটা এখনই করিতে হইবে, কী একটা করিবার আছে—কিন্তু কিছুতেই করা হইতেছে না। শরীরের মধ্যে একটা বিচলিত ভাব বাড়িয়া ওঠে। মনে হয়, সবটাই বাকি রহিল, নির্দিষ্ট কাজের ভগ্নাংশও করা হইল না। যাহা জানিবার ছিল, তাহার কণামাত্রের আস্বাদন হইল মাত্র।

শরীর লইয়া অপু খুবই বিব্রত। নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া আসার পর মৌপাহাড়িতে তিন-চার বৎসর কাটিল, কিন্তু স্বাস্থ্যের খুব একটা উন্নতি হয় নাই। প্রায়ই বুকে একটা যন্ত্রণা হয়। মাথা ভার ঠেকে, অম্বল হয়। এসব কথা সে কাহাকেও বলে না। অসুখ গা সওয়া হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা ঘনাইলে লেখা বন্ধ করিয়া নক্ষত্রের আলোয় বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে হঠাৎ ছোট টিলাটার গা ঘেঁষিয়া বিশাল বৃহস্পতি গ্রহটাকে উঠিতে দেখিয়া তাহার অসুখের কথা বিস্মরণ হইয়া যায়। সেতারের জলদের মতো

জীবনটা কাহার হাতের স্পর্শে যেন বাজিতেছে। কীসের স্পর্শে যেন জীবনের রঙ বদলাইতেছে, সুরের পরিবর্তন ঘটিতেছে।

সুবর্ণরেখার ধারে বসিয়া অপু নদীর সঙ্গে নিজের মিল খুঁজিয়া পায়। একা থাকিলেও মনে হয় না সে একা আছে। কাহারও উপস্থিতি যেন রহিয়াছে আশেপাশে, অনুভব করা যায় কেহ পেছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, চোখ ফিরাইলে সরিয়া যায় দূরে।

একদিন একটা কাণ্ড ঘটিল। অপু বসিয়া লিখিতেছে, একটা প্রজাপতি আসিয়া বসিল তাহার খাতার পাতায়। সে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলে সেটা উড়িয়া একটু দূরে একটা পুটুস গাছের উপর বসিল। অপুর কেমন মনে হইল, সুন্দর প্রজাপতিটাকে ধরিতেই হইবে। এক টুকরা পাথর খাতার উপর চাপা দিয়া সে উঠিল।

প্রজাপতিটা ধরা গেল না। গাঢ় লাল আব বাদামী ডানাওয়ালা পতঙ্গটা তাহাকে দূর হইতে দূরে লইয়া গেল। এক ঝোপ হইতে অন্য ঝোপ কবিতে কবিতে অপু আচ্ছন্নের মতো দৌড়াইল। বাতাস অপুর চুল অবিন্যস্ত কবিয়া দিল, তাহার ধুতিতে চোরকাঁটা লাগিয়া গেল। পাথরে লাগিয়া পায়ের এক জাযগা কাটিয়াও গেল, কিন্তু প্রজাপতিব নাগাল পাওযা গেল না।

মাইলখানেক দৌড়াদৌড়ি কবিয়া অপু নিজেব বসিবাব জায়গায ফিবিয়া আসিল। পাথরের উপর রাখা খাতাব পাতা বাতাসে অল্প অল্প উড়িতেছে, চাপা আছে বলিয়া একেবারে উড়িয়া যায় নাই।

অপু পাথবটার এক কোণে বসিযা শূন্যদৃষ্টিতে সুবর্ণরেখাব দিকে তাকাইয়া রহিল।

বয়স বাড়িবাব সঙ্গে সঙ্গে কাজলেব দুষ্টামি কমিযাছে। আগের মতো লাফালাফি করিতে আর ভালোবাসে না। মৌপাহাড়িতে তাহাব সমবযসী কম। সমবযসীদের সঙ্গে কখনই তাহার বন্ধুত্ব গড়িয়া ওঠে নাই। বযসে যাহারা অনেক বড়, তাহাদের সঙ্গেই বরং কাজলের জমে ভালো।

একদিন কয়েকটা ছেলে মিলিযা মাইলতিনেক দূরের একটা পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছিল। কাজলেব মনে হইয়াছিল ছেলেগুলি এক একটি আস্ত বর্বব। ঢিল কুড়াইয়া ভীষণ জোরে ছুঁড়িতেছে, লাফাইতেছে, চিৎকাব কবিতেছে, নিজেদেব মধ্যে তুচ্ছ কারণে মারামারি কবিতেছে। অথচ চারিপাশে কেমন সুন্দর পাহাড়ি পরিবেশ। নির্জন স্থানে স্তব্ধতা খাঁ খাঁ কবিতেছে। মাঝে মাঝে বাসায় ফেরা কী এক ধরনেব পাখি মাথার উপব দিযা মধুর সুবে ডাকিয়া যাইতেছে। সব মিলাইয়া বেশ ঘনিষ্ঠ আনন্দময় পরিবেশ। ছেলেরা এসব মোটেই বুঝিতেছে না। কাজল ক্রমশ বিরক্ত হইয়া উঠিল। বড়ো গোলমাল করে ইহারা। তাহাব মনের সঙ্গে ইহাদেব কোন যোগাযোগ নাই। থামাইবাব জন্য সে কিছুদিন আগে পড়া একটা গল্প শুরু করিল, কিন্তু সে গল্পে কেহ উৎসাহ পাইল না।

ধীরে ধীরে অল্প বয়সেই কাজলের ভিতব একটা বোধ জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহার সহিত অন্যের মনের মিল হয় না—হইবে না।

সে একা থাকে। অপু প্রচুর বই আনিযা দিযাছে। অনেক বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ সে পড়িয়া শেষ করিয়াছে। অপু তাহাকে নিজে ইংরাজি শিখাইতেছে, যাহাতে কাজল শীঘ্রই বিশ্বসাহিত্যে প্রবেশলাভ করিতে পারে, কাজলও অসাধারণ দক্ষতা দেখাইয়া ইংরাজি ভাষা শিক্ষায় অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টা তাহাকে বাবার কাছে বসিয়া পড়িতে হয়।

চোখের সামনে তাহার এ কী জগতের দ্বার খুলিয়া যাইতেছে! এ কী আনন্দ আর আলোব জগৎ। পৃথিবীর সাধারণ অকিঞ্চিৎকর বস্তুও এ আলোর স্পর্শে অসাধারণ হইয়া উঠিতেছে। এমনভাবে যাহারা তাহাকে পৃথিবীটা দেখিতে শিখাইয়াছে, তাহাদের কাছে সে কৃতজ্ঞ থাকিবে।

ফরাসী ছোটগল্পের অনুবাদ পড়িয়া প্রথম তাহার চোখ ফুটিয়াছিল। রোজকার জীবনে দেখা সামান্য ঘটনা লেখকদের হাতে এক গভীর তাৎপর্য লাভ করিয়াছে। এক জায়গায় একটি বৃষ্টির বর্ণনা

এবং অপর জায়গায় একটি জ্যোৎস্নারাত্রির বর্ণনা তাহাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। এখনও বর্ষার দিনে এবং জ্যোৎস্নারাত্রিতে গল্প দুটিকে সে মনে করিয়া থাকে।

একটু বয়স হওয়ায় সে বাবাকে চিনিতে পারিতেছে। বাবার কেমন একটা আলাদা অস্তিত্ব আছে, সে বুঝিতে পারে। সেটা বাবার সাংসারিক অস্তিত্ব নহে—অন্য কিছু। সবকিছুর ভিতরে থাকিয়াও বাবা সব কিছু হইতে আলাদা। একদিন বাবাকে বড়ো অদ্ভুত লাগিয়াছিল। বেড়াইতে যাইবে বলিয়া বাহির হইতে গিয়া সে দেখিল বাবা উঠানের প্রান্তে ইউক্যালিপটাস গাছটার নিচে শতরঞ্চি পাতিয়া বসিয়া লিখিতেছে। হয়তো কিছু মনে আসিতেছে না, কোন উপযুক্ত শব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, তাই বাবা কলমটা হাতে ধরিয়া উদাসভাবে দূরে তাকাইয়া আছে। ডানদিকের কাঁধটা একটু নিচু দেখাইতেছে। ফরসা, ঋজু দেহ বাবার। হঠাৎ বাবার জন্য ভীষণ মায়া হইল, ভীষণ—ভীষণ ইচ্ছা হইল বাবার কোলেব কাছে গিয়া মুখ গুঁজিয়া থাকে। শরীরের ভিতরের প্রতি শিরায় সে পিতার জন্য ভালোবাসার স্রোত অনুভব করিল। বাবার শরীর মোটে ভালো যাইতেছে না—বাবা কাহাকেও বলে না, কিন্তু কাজল জানে।

হৈমন্তীব বাবা সুরপতিবাবু একদিন মৌপাহাড়িতে আসিয়া হাজির হইলেন। কী কাজে জামসেদপুর আসিয়াছিলেন—পথে মৌপাহাড়ি ঘুরিয়া যাইতেছেন। হৈমন্তী দৌড়াইয়া আসিয়া প্রণাম করিল। অপু ব্যস্ত হইয়া পড়িল খাওয়াইবার আয়োজনের জন্য। কাজল প্রথমটা একটু থতমত খাইয়াছিল, কিন্তু লজ্জা কাটিয়া গেলে দেখিল দাদু খুব ভালোমানুষ। কাজলকে ডাকিযা তিনি বলিলেন, আজকে সারাদিন আমি তোমার সঙ্গে গল্প করব দাদু, কেমন?

হৈমন্তী বলিল—তুমি দু'একদিন থাকবে তো বাবা?

—না মা, সময় নেই হাতে একদম। পরের কাজে আসা—

আপত্তি টিকিল না। দুই দিন থাকিয়া যাইতে হইল। সারাদিন কাজল আর দাদুর গল্প চলিত, অপু যোগ দিতে পারিত না। সে একখানি বড়ো উপন্যাস লিখিতেছে। সন্ধ্যায উঠানে শতরঞ্চি পাতিয়া বসিয়া অপু শ্বশুরমহাশয়ের সহিত কথাবার্তা বলিত। সুরপতিবাবু জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ লোক। জীবনের তিক্ত এবং মধুব দুই দিকের সহিতই নিবিড় পরিচয় আছে। পরলোকে অত্যন্ত বিশ্বাসী। সন্ধ্যায় পরলোক লইয়া অপুর সহিত কথা হইল।

দুই দিনের বেশি সুবপতিবাবু থাকিতে পারিলেন না। যাইবার সময় অপুকে শবীরের প্রতি বিশেষ যত্ন লইতে বাব বার বলিয়া গেলেন। হৈমন্তীকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন—তোর কপাল ভালো হৈম যে এমন স্বামী পেয়েছিস।

জামাই সত্যিই বড়ো ভালো, এমন মানুষ দেখা যায় না। কাজলকে গোপনে দুইটি টাকা দিয়া তিনি ছাতা-ব্যাগ সহ রওনা হইলেন। অপু তাঁহাকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে গেল।

ট্রেনে তুলিয়া দিয়া ফিরিবার সময় অপুর বুকে কেমন একটা যন্ত্রণা বোধ হইল। বাঁদিকে একটা চিনচিনে ব্যথা, কমিতেছে না। বুকে হাত দিয়া অপু কিছুক্ষণ বসিল, কিছু হইল না। মাথাটা বেশ ঘুরিতেছে, অপু ঠিক করিল ডাক্তারের কাছে একবার ঘুরিয়া যাইবে।

স্থানীয় ডাক্তার বিশ্বনাথ সোম অপুকে দেখেন, ডিসপেনসারিতে ঢুকিতেই তিনি অপুর মুখ দেখিয়া অবাক হইয়া বলিলেন—কী হয়েছে অপূর্ববাবু? বসুন, ওই চেয়ারটাতে, হ্যাঁ—

যন্ত্রণা বাড়িতেছিল। মাথার মধ্যে যেন ঝিমঝিম বাজনা। বিশ্বনাথবাবু নাড়ি দেখিয়া কমপাউন্ডারকে ডাকিলেন—সুরেন, মেজার গ্লাসে পনেরো ড্রপ কোরামিন চট করে নিয়ে এসো।

কোরামিন খাইয়া অপু একটু সুস্থ বোধ করিল। বিশ্বনাথবাবু প্রেসার লইলেন। খুব হাই।

—কিছুদিন বিশ্রাম নিন। এরকম বারবার হওয়াটা তো ভালো নয় রায়মশায়। খাওয়াদাওয়া নিয়মমাফিক, আমাকে প্রতি হপ্তায় একবার করে দেখিয়ে যাবেন।

অপু বাহিরে আসিল। রাস্তায় লোক কম। মাথার ভিতরটা এখনও পুরাপুরি পরিষ্কার হয় নাই। একটু হাঁটিলেই মনে হইতেছে আবার মাথা ঘুরিয়া উঠিবে। ডাক্তার বিশ্রাম লইতে বলিয়াছে, এইবার তাহাকে বিশ্রাম লইতে হইবে। একটা উপন্যাস সে লিখিতেছে, শেষ হওয়ার পূর্বে বিশ্রাম নাই। উপন্যাসটা শেষ করিয়া তবে ছুটি।

ক্লান্ত শরীর—সামনে একটা উপন্যাস লিখিবার পরিশ্রম। হঠাৎ অপুর নিকট 'ছুটি' শব্দটা অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক বোধ হইল।

কলিকাতা হইতে প্রকাশকের পত্র আসিল, লেখাটা তাহাদের শীঘ্র প্রয়োজন। দেরি করিলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা।

সকালে জলখাবার খাইয়া অপু লেখা শুরু করে, দুপুরে খাইবার সময় বাদ দিয়া সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত ক্রমাগত লেখে। সন্ধ্যায় ক্লান্ত দেহে একটু নদীর দিকে বেড়াইতে যায়। ফিরিয়া আসিয়াই আবার রাত্রি বারোটা পর্যন্ত লেখে। শরীরের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইতেছে। উপন্যাসটি অপু হৃদয় উজাড় করিয়া লিখিবে। অপরিণত বয়সের ভাবাবেগ আর নাই, এখন জীবনসত্য উপলব্ধি করিবার সময়।

কোন সময় লিখিতে লিখিতে মাথা একেবারে ফাঁকা হইয়া যায়, হাত-পা অবশ হইয়া আসে। কলমটা টেবিলে নামাইয়া অপু অনুভব করে, শরীর ভাঙিয়া আসিতেছে—আচ্ছন্নের মতো সে কাজ করিয়া যাইতেছে। কিছুটা লোভে লোভেও বটে। কাজটা শেষ হইলে আপাতত ছুটি।

হৈমন্তী আসিয়া বকে—রেখে দাও তো! এরকম খাটলে শরীর দুদিনে ভেঙে পড়বে। শোবে চলো।

অপু চুলের ভিতর হাত চালাইতে চালাইতে বলে—আর একটু, এই চ্যাপ্টারটা শেষ করে ফেলি।

হৈমন্তী বুঝাইয়া পারে না।

একদিন অপু টেবিলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হাত হইতে কলম খসিয়া পড়িয়াছিল। খাতার উপব মাথা রাখিয়া অপু স্বপ্ন দেখিতেছিল, মধ্যপ্রদেশের সেই বন্যজীবনটা আবার ফিরিয়াছে। সে তেজী ঘোড়ার সওয়ার হইয়া আদিগন্ত হাঁটুসমান জঙ্গলে তীব্রবেগে ভ্রমণ করিতেছে। কালপুরুষ পশ্চিম দিগন্ত ছুঁই-ছুঁই করিয়াছে। বাতাসে সেই সজীব ভাবটা।

বাধা দিবার কেহ নাই, মহাশূন্যে গাঢ় অন্ধকারে ভীমবেগে ধাবমান উল্কার মতো জীবন আবার ফিরিয়াছে। চিন্তা নাই, দুঃখ নাই, ক্ষোভ নাই—স্বপ্নের মধ্যেই সব পাইবার তৃপ্তি তাহাকে আচ্ছন্ন করিতেছে। খুব জোরে ঘোড়া ছুটাইয়াছে সে। দৌড়—দৌড়—দৌড়। সামনে কালোমত কী একটা আসিতেছে, বিশাল পাহাড়ের মতো। সে ঘোড়ার রাশ টানিল।

ঘুম ভাঙিয়া সে কলমটা আবার তুলিয়া লইল, কিন্তু আর লিখিবার উৎসাহ নাই। স্বপ্ন এখনও মাথার মধ্যে ঘুরিতেছে। অর্থটা বোঝা যাইতেছে না বলিয়া অস্বস্তি হইতেছে। টেবিলের ওপাশে জানালা খোলা, হু-হু বাতাস আসিয়া কাগজ-পত্র এলোমেলো হইতেছে। সবাই ঘুমাইয়া, কেবল বহুদূরের কোন সাঁওতাল বস্তির ক্লান্ত মাদলের শব্দ এখনও শোনা যায়।

চিঠি লিখিবার প্যাডটা টানিয়া লইয়া অপু মনে করিয়া করিয়া বহু পুরাতন বন্ধু আর আত্মীয়দের এক-একখানা চিঠি লিখিল। অনেককে লেখা হইল না, তাহাদের ঠিকানা মনে নাই। লিখিল—ভালো আছো? অনেকদিন খবর নিতে পারিনি, স্বার্থপরের মতো নিজের ভেতরে নিজেকে গুটিয়ে বসে ছিলাম। কিন্তু মানুষ একা বাঁচে না, তোমাদের সবাইকে আমার জীবনে বড়ো দরকার। আমাকে মনে রেখো, একেবারে ভুলে যেয়ো না যেন। মানুষের মধ্যে বেঁচে আছি—এ বোধটা আমার জীবনে যেমন প্রয়োজন, তোমাদের জীবনেও তেমনি।

চিঠিগুলি লিখিতে রাত শেষ হইয়া গেল। পূর্বদিকের টিলাটার পাশের আকাশে লাল রঙ ধরিল। মেঘের লম্বা স্তরগুলিকে দেখাইতেছে যেন আঁকা ছবি। আলো ফুঁ দিয়া নিভাইয়া অপু বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

বিকালে অপু ছেলেকে ডাকিয়া বলিল—খোকা চল, বেবুই কোথাও।

উঁচুনিচু লালমাটির ডাঙা ধরিয়া দুইজনে কিছু হাঁটিল। অনুচ্চ একটি পাহাড়ের কাছে আসিয়া অপু বলিল—আয়, এখানে বসি।

দুইটা ছোট পাথরে দুইজনে বসিল। কাজল বলিল—বাবা, সেই যে গল্পটা। নির্জন দুর্গে একলা রাজকুমারী থাকতো, সেটা আজ শেষ করো—

সে কথা কানে না লইয়া অপু ডাকিল—খোকা।

—কী বাবা?

—আমার কাছে উঠে আয় তো একটু।

কাজল বাবার কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল।

—খোকা, তুই আমায় ভালোবাসিস?

উত্তর না দিয়া কাজল বাবার বুকে মুখ গুঁজিয়া রহিল। তাহার বয়সী ছেলের পক্ষে ইহা বিসদৃশ হইলেও, বাবা ও মায়ের আদর পাইলে সে এমনি করিয়া থাকে।

অপু ছেলের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। সূর্যাস্তের রঙে রঞ্জিত প্রান্তরে সে অনেকক্ষণ ছেলের সহিত বসিয়া রহিল। ক্রমে আলো কমিয়া কীটপতঙ্গের গুঞ্জন শুরু হইল। অপু উঠিয়া ছেলের হাত ধরিল।

—চল, বাড়ি চল, তোর মা ভাববে।

বাবার হাত ধরিয়া কাজল হাটিতেছিল। বাবা আজ এত গম্ভীর কেন?

কী একটা প্রাণী সুড়ৎ করিয়া রাস্তা পার হইল, অন্ধকারে দেখা গেল না। হয়তো মেঠো ইঁদুর। বাড়ি ফিরিতেই হৈমন্তী বলিল—তোমাকে বলে আর পারা গেল না। এত দেরি করে ফিরতে হয়। খাবার এদিকে জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল—

অপু কাজলের হাত ছাড়িয়া দিয়া অদ্ভুত ছেলেমানুষির সুরে বলিল— আর করবো না। হৈমন্তী, সত্যি বলছি—আর কখনও না—

রাত্রে শুইয়া অপু হৈমন্তীকে ডাকিল—হৈমন্তী।

—কী গো?

—বাইরে কেমন জ্যোৎস্না উঠেছে দেখেছ?

সুন্দর জ্যোৎস্নায় উঠান ভাসিতেছে। অষ্টমী তিথি, চাঁদ দিগন্তের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বিষণ্ণ অথচ সুন্দর জ্যোৎস্না।

হৈমন্তী বলিল—সুন্দর।

—চল, একটু বাইরে গিয়ে বসি। ঘরে ভালো লাগছে না।

ঘুমন্ত কাজলের চারপাশে মশারি গুঁজিয়া দিয়া দুইজনে উঠানে গিয়া বসিল। শব্দহীন রাত্রি। চাঁদের আলোয় একটু বসিতেই কেমন একটা আবেশ জড়াইয়া আসে দেহে-মনে।

—হৈমন্তী, কাল আমার উপন্যাস শেষ হয়ে যাবে। বড়ো ভালো লাগছে। যা লিখতে চেয়েছিলাম—ঠিক সেই রকমটি হল না, কিন্তু অনেকখানি পেরেছি বলে মনে হচ্ছে।

কাছেই কোথাও ঝিঁঝিঁ ডাকিতে শুরু করিল।

—ছোটবেলায় দূরে তাকিয়ে ভাবতাম, ওই যেখানে আকাশ আর মাটি মিলেছে, তার ওপারেই আছে রূপকথার ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর দেশ। তেমনি আমার লেখায় একটা দূর দিগন্তের ইঙ্গিত রয়েই গেল। সারাজীবন আমিও এগুলাম, স্বপ্নটাও মরীচিকার মতো পিছিয়ে গেল।

হৈমন্তী অপুর হাঁটুতে হাত রাখিয়া বলিল—তোমার জীবনে কি কোন দুঃখ আছে?

—না, আমি পরিপূর্ণ, আমি তৃপ্ত। কারণ আমি বুঝেছি সন্ধানেই আনন্দ, প্রাপ্তিতে পরিসমাপ্তি। আমি পথ চলতে ভালোবাসি হৈমন্তী। আমি পথের শেষ চাই না।

দুইজনে কোন কথা না বলিয়া বসিয়া রহিল। ঝিঁঝিঁ ডাকের বিরাম নাই। চাঁদ ইউক্যালিপটাস গাছ দুইটার মাঝখান দিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িতেছে। তাহাদের ছায়া ক্রমশ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া আসিল। চাঁদের আলো ম্লান হইবার সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রগুলি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। বাতাস একবার গাছের পাতায় হালকা দোলা দিল।

—হৈমন্তী।

—কী?

—না, থাক—

হৈমন্তী অপুর হাত ধরিয়া বলিল—বলো না, কী বলবে।

অপু একবার আকাশের দিকে তাকাইল, তারপর বলিল—বলা যায় না, বলা যায় না। ভাষা জানি নে—

পরের দিন সকালে যদু পিওন আসিল মনি অর্ডার দিতে। কিছুদিন আগে কাগজে হৈমন্তীর গল্প বাহির হইয়াছিল। তাহার পারিশ্রমিক পনেরোটি টাকা আসিয়াছে। যদু পিওন এমনি মনি অর্ডার আগেও কয়েকবার বিলি করিয়াছে। মৌপাহাড়ির নিরালায় হৈমন্তী বেশ কয়েকটি গল্প লিখিয়াছে।

মনি অর্ডার ফর্মে হৈমন্তী সই করিতেছে, অপু আসিয়া পিছনে দাঁড়াইল।

– বঙ্গবাণীর টাকাটা এলো বুঝি?

হৈমন্তী ফিরিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

যদু পিওন বলিল—এই তল্লাটে এমন রোজগেরে বৌ আর দেখিনি বাবু।

হৈমন্তী হাসিয়া বলিল—তোমাকে আর বকবক করতে হবে না যদুদা। এই টাকাটা নাও, বাচ্চাদের মিষ্টি কিনে দিয়ো।

টাকা দুইটি হাত পাতিয়া লইয়া বলিল—দিদির আরও অনেক মনি অর্ডার আসুক।

হাসিতে হাসিতে যদু চিঠির ব্যাগ তুলিয়া রওনা দিল।

সারাদিন অপু টেবিলেই বসিয়া রহিল। লিখিতে লিখিতে কখন যে দিন কাটিয়া গেল কে জানে। উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ের শেষ বাক্যটি লেখা হইয়া গেল। স্তূপাকার কাগজগুলির দিকে তাকাইয়া অপুর অবাক লাগিল। শেষ হইয়া গিয়াছে! বিনিদ্র রাত্রির বেদনা-অনুভূতির ফল ওই কাগজগুলি। এইবার প্যাকেটবন্দী হইয়া কলিকাতায় যাইবে, নাকের উপর চশমা নামিয়া আসা বৃদ্ধ কম্পোজিটার বানান করিয়া করিয়া কম্পোজ করিবে।

শরীরে ভীষণ ক্লান্তি। এত পরিশ্রম সে একসঙ্গে কখনও করে নাই। ডান হাত ব্যথায় টনটন করিতেছে, হৈমন্তীকে ডাকিয়া অপু বলিল—একটু গরমজল করে দাও তো, হাতটা বড্ড ব্যথা করছে, ডুবিয়ে রাখব।

কাজ মিটিয়া গেল। সামনে আর বড়ো কোন কাজ নাই। অপু আপনমনে বেড়াইতেছিল। ছেলেবেলাকার অভ্যাসমত হাতে সরু কঞ্চির মতো একটা লাঠি লইয়াছে। অনেকক্ষণ ঘুরিবার পর মনে হইল, সে আজ ভীষণ অন্যমনস্ক। অনেক পুরাতন কথা মনে পড়িতেছে। অনেক পুরাতন মুখ। অপর্ণার কথা বড়ো বেশি মনে আসিতেছে। তাহাকে কিছু দেওয়া হয় নাই—তখন অপুর পয়সা ছিল না। অথচ অপর্ণা হাসিমুখে অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া নিয়াছিল—কখনও অভিযোগ করে নাই। বড়ো সিঁদুরের টিপ পরা অপর্ণার সলজ্জ মুখখানি আজ অনেকদিন বাদে মনে পড়িয়া গেল। তাহার চিবুকের টোলটা সে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে।

কাশীতে যখন বাবা মারা যায়—উঃ কী দিন গিয়াছে! কনকনে শীতের রাত্রে সেই গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ি ফেরা।

সবার হইতে বেশি মনে পড়ে মাকে। কখনও কিছু চায় নাই, আশা করে নাই। অপু সুখে

থাকিলেই সুখী হইত। মনসাপোতার বাড়িতে ফিরিয়া তাহার প্রতি ছাত্রীর অভিভাবকদের সদয় ব্যবহারের কথা সে মাকে খুশি করিবার জন্য বানাইয়া বানাইয়া বলিত। মা সরল মনে সব বিশ্বাস করিত। ছিন্নবেশ-পরা মায়ের হাস্যময়ী চেহারা মনে পড়িয়া যায়।

ঘুরিতে ঘুরিতে সুবর্ণরেখার তীরে আসিয়া পড়িয়াছে অপু। বসিলে মন্দ হয় না। যে পাথরটার উপর বসিয়া সে লিখিত, জুতা ছাড়িয়া তাহার উপর অপু বসিল। জনপ্রাণী নাই কোনদিকে। সুবর্ণরেখার শূন্য বুকটা খাঁ-খাঁ করিতেছে। কয়েকটি বক একপায়ে নদীর চরে ধ্যানমগ্নের মতো দাঁড়াইয়া। সূর্য যেন জ্বলিতেছে। অপুর মনে হইল, সবদিকে কেমন একটা নাই-নাই ভাব। আকাশ রিক্ত। এতটুকু মেঘ নাই। নদীর বুক রিক্ত, জল নাই। দিগন্ত পর্যন্ত প্রান্তর রিক্ত, নদীর ওপারে কেবল একটিমাত্র পলাশ গাছ বিপুল একটি প্রাকৃতিক কবিতার যতিচিহ্নের মতো সোজা মাথা তুলিয়া আছে। গাছটার সর্বাঙ্গে যেন আগুন। নিঃস্ব প্রান্তরের পটভূমিতে পুষ্পিত পলাশগাছটাকে সামান্য এতটুকু সান্ত্বনার মতো দেখাইতেছে।

এমনি একটা দিনে কলিকাতা হইতে মায়ের জন্য সামান্য কিছু জিনিস কিনিয়া গ্রামের পথে হাঁটিয়া মনসাপোতায় ফিরিয়াছিল। দরজা খুলিয়া তাহাকে দেখিয়া মা কি খুশিই না হইয়াছিল! মাকে জড়াইয়া আদর করিলে কেমন সুন্দর গন্ধ পাওয়া যাইত মায়ের গায়ে।

মাকে মনে পড়িতেছে। ছোটবেলায় মা তাহাকে পাঠশালায় যাইবার জন্য খুব সকালে ঘুম হইতে তুলিয়া দিত, নিজের হাতে সাজাইয়া হাতে বই দিয়া বলিত—যাও বাবা, পাঠশালায় যাও। তুমি লেখাপড়া শিখে মানুষ হলে বংশের নাম উজ্জ্বল হবে।

সে কি মানুষ হইতে পারিয়াছে? অথবা মা কি অন্য কিছু চাহিয়াছিল, যা সে হইতে পারে নাই?

একদিন রাগ করিয়া সে মায়ের দেওয়া তালের বড়া ছুঁড়িয়া উঠানে ফেলিয়া দিয়াছিল। অনেকদিন আগের ঘটনাটা। মায়ের কত কষ্টে জোগাড় করা জিনিসে তৈয়ারি।

এসব মনে করিয়া তাহার চোখে জল আসিতেছে কেন? আশ্চর্য! ইহা কি কাঁদিবার সময় হইল? এমন সুন্দর পরিবেশে? কিছু দূরে নদীর বাঁকের মুখটায় বালির উপর তাপতরঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, আকাশে সূর্য, ধূ-ধূ- প্রান্তর—সব মিলাইয়া স্বরলিপির তীব্র মধ্যমের মতো।

একটা ঢিল তুলিয়া জোরে নদীর দিকে ছুঁড়িল, বেশ জোরে। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিল বুকের বাঁদিকে যন্ত্রণা শুরু হইয়াছে। সামনে হইতে জোরে ধাক্কা মারিলে যেমন হয়, তেমনি ভাবে বুকে হাত দিয়া কিছুটা ছিটকাইয়া পিছনে সরিয়া আসিল। মুহূর্তে মাথা কী রকম খালি হইয়া গেল। সূর্যটা যেন একবার কাছে আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে আবার দূরে সরিয়া যাইতেছে।

অপু অনুভব করিল, পা দুইটা তাহাকে আর দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। পাথরটার গায়ে হেলান দিয়া সে মাটিতে বসিয়া পড়িল। ব্যথাটা বাড়িতেছে—শ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছে। খুব গভীর ঘুম আসিবার আগে যেমন হয়, শরীরে তেমনি অবসাদের ভাব। দেহে-মনে অবসাদ মাকড়সার জালের মতো জড়াইয়াছে। সে কি এইখানে একটু ঘুমাইবে?

বাবা বাড়ি আসিয়া বলিতেছে—দুর্গা কই? তার জন্য শাড়ি কিনে এনেছি যে—

বাবা থলির ভিতর হইতে অনেক জিনিস বাহির করিতেছে। হঠাৎ অপুর মনে হইল—সত্যিই তো, দিদি কই? তাহাকে সবাই কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছে। দিদিকে খুঁজিতে হইবে।

ঘুম—ঘুম—ঘুম—। বুক বাহিয়া চিনচিনে ব্যথাটা উপরে উঠিতেছে। যন্ত্রণা ততটা আর বোধ হইতেছে না, তাহার খুব ঘুম পাইয়াছে। কানের কাছে তীক্ষ্ণস্বরে একটা পাখি ডাকিয়া উঠিল। নিশ্চিন্দিপুরে সেই পাখিটা যেমন ডাকিত। সামনের ওই ব্যাপ্তির ভিতর কোথায় যেন বাজনা বাজিতেছে। গম্ভীরনাদ বীণার উদারার তারে আলাপের মতো। তারের উপর এক-একটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সে একটু একটু ঘুমাইয়া পড়িতেছে। হাত-পায়ের সমস্ত শক্তি চলিয়া গিয়াছে। আর সে চলিতে পারিবে না, সমস্ত জীবনে অনেক ঘোরা হইয়াছে—এইবার সে একটু বিশ্রাম করিয়া লইবে। এইখানেই বিশ্রাম করিবে।

অ্যাশবার্টন সাহেব বলিতেছে—East opened my eyes, Roy. It really enthralls me, this call of the mysterious–this mystic span of the river—

অ্যাশবার্টনকে দেখিয়া সে উঠিবার চেষ্টা করিল। সে শুইবে না। সে অনড় হইয়া থাকিবে না—কিছুতেই না। কিন্তু শরীর তাহার কথা মান্য করিতেছে না। তাহাকে কেহ উঠাইয়া দিতেছে না কেন?

ওই বড়ো পাথরটার আড়ালে যে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে সে চিনিতে পারে নাই। এইবার সে বাহির হইয়া সামনে আসিয়াছে।

লীলা!

—পোর্তোপ্লাতায় যাবে না অপূর্ব? তুমি যে বলেছিলে সোনা উদ্ধার করে আনবে সমুদ্রের তলা থেকে?

হ্যাঁ, যাইতে হইবে বৈকি! অতল সমুদ্রের নিচে তাহাব জন্য যে বত্ন অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহাদের সে সূর্যের আলোয় বাহির করিয়া আনিবে।

—খোকা কোথায় গেল, খোকা? খোকা, আমার পাশে আয়—এইখানটায়। কোল ঘেঁষে বোস, উঠে যাসনে কোথাও। আমি তোকে কলকাতা থেকে সেই বইটা এনে দেবো এবার। উঠে যাস নে বাবা আমার—তোকে না দেখে আমি যে মোটে থাকতে পারি না।

তাহার মা বলিতেছে—ঘুমো অপু, ঘুমো। আহা বে, বড্ড খাটুনি গেছে তোর—

ঘুমাইয়া পড়িবার আগে অপু জোর করিয়া একবার তাকাইল। দেখিল, লাল ফুল ফুটিয়া থাকা পলাশ গাছটার পাশ দিয়া একটা পথ সমস্ত প্রান্তরকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া দূরে দিগন্তে মিশিয়া গিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বুধন সর্দার আর তার ছেলে সুবর্ণরেখার ধারে কী কাজে আসিয়াছিল। অপুকে বুধন চিনিত, বেড়াইতে বাহির হইয়া অপু বহুদিন তাহার বাড়িতে জল চাহিয়া খাইয়াছে। বুধন দেখিল, ঢালু পাড়ের উপর একখণ্ড পাথরে হেলান দিয়া বাবু ঘুমাইয়া রহিয়াছে। পাশেই চটিজোড়া খোলা রহিয়াছে। পাথরের উপর সরু কঞ্চি।

ছেলেকে দাঁড় করাইয়া বুধনই প্রথম লোক ডাকিয়া আনে।

বাড়িতে শহরের লোক ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার বিশ্বনাথ সোমও আসিয়াছেন। তখন আর কিছু করিবার ছিল না। বিশ্বনাথ বিষণ্ণমুখে বলিলেন—রায়মশায়কে এই জন্যই বলেছিলাম পরিশ্রম কম করতে, শুনলেন না সে কথা—

অপুর অনেক ভক্ত আসিয়াছিল। যোগাড় যন্ত্র করিয়া তাহারা দাহ করিবার ব্যবস্থা করিল। অনেক মানুষ, অনেক গোলমাল—তাহার মধ্যে অপু যেন চুপ করিয়া শুইয়া আছে। মুখ দেখিয়া হৈমন্তী স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, শেষ সময়ে অপু বেশি কষ্ট পায় নাই। মুখে একটি তৃপ্তির ভাব মাখানো।

পাড়ার লোকেই হৈমন্তীর বাপের বাড়ি টেলিগ্রাম কবিয়াছে। ঘটনাগুলি হৈমন্তীর চোখের সামনে ছায়াবাজির মতো ঘটিয়া যাইতেছিল। সে যেন ইহার সঙ্গে জড়িত নয়, সে শুধু দর্শক মাত্র।

দাহ শেষ করিয়া শেষরাত্রে সবাই ফিরিল। খাটের পায়ার কাছে হৈমন্তী একভাবে বসিয়া আছে, একটুও নড়ে নাই। দিন তাহার চোখের স্যামনেই রাত্রি হইয়াছিল, আবার রাত্রিও ভোর হইতে চলিল।

সবাই অবাক হইল কাজলকে দেখিয়া। শ্মশানে সে মুখাগ্নি করিয়াছে অত্যন্ত শান্তভাবে।

ফিরিয়া সেই যে জানালায় দাঁড়াইল, পরের দিন দুপুর পর্যন্ত আর সেখান হইতে নড়িল না। পাশের বাড়ির ওভারসিয়ারবাবুর স্ত্রী আসিয়া সারারাত হৈমন্তীর কাছে বসিয়া ছিলেন। তিনি পর্যন্ত কাজলের নিস্পৃহতা দেখিয়া অবাক হইলেন।

অকস্মাৎ বজ্রপাত হইয়া সব যেন বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। উনানে আগুন নাই, ঠাকুরের কাছে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই, পরের দিন সন্ধ্যা হইয়া গেল, তখনও কেহ ঘরে আলো জ্বালিল না। ওভারসিয়ারবাবুর স্ত্রী সমস্ত রাত জাগিয়া ক্লান্ত ছিলেন, বিশ্রাম করিতে তিনি বাড়ি চলিয়া গিয়াছেন। আবার সকালে আসিবেন বলিয়াছেন। কিছু ফল ও দুধ আনিয়া তিনি বার বার খাইতে বলিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ফলের থালা এবং দুধের ঘটি এখনও জলচৌকিটার উপর পড়িয়া আছে—কেহ তাহাতে হাত দেয় নাই।

দুপুরে কাজল অপুর লেখার ঘরে গিয়া বসিল। সমাপ্ত পাণ্ডুলিপিটা বড়ো খামের ভিতর টেবিলের উপর রাখা। টেবিলের এক কোণে বাবার চুল আঁচড়াইবার যশোরের চিরুনিখানা, তাহাতে বাবার কয়েকটা চুল এখনও জড়াইয়া আছে। ঘাড়ের কাছে মযলা হইয়া যাওয়া দুইটা জামা দেয়ালের পেরেকে ঝুলিতেছে। এসব দেখিতে দেখিতে কাজল জানালা দিযা বাহিরে তাকাইল। বেলা পড়িয়া আসিতেছে। সূর্যটা কেমন করুণাহীন—কাহারও দুঃখের সমব্যথী নহে, সমস্ত দিন কেবল ঘুরিতেছে। একটা মাকড়সাই দুই দেয়ালের কোণে জাল বুনিতেছে অখণ্ড মনোযোগে।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত কাজল টেবিলে এবং হৈমন্তী খাটের পায়ের কাছে বসিযা রহিল। ঝকঝক শব্দ করিয়া রাঁচি এক্সপ্রেস জামসেদপুরের দিকে রওনা হইয়া গেল। সমস্ত দিন গরমের পর একটু ঠাণ্ডা বাতাস দিতেছে। ঘরে আলো নাই, অন্ধকারের ভিতর সমস্ত বাড়ির শূন্যতাটা হৈমন্তীর কাছে বেশি করিয়া ফুটিল। হঠাৎ পায়ের শব্দ। একটা পরিচিত গলাব স্বর শোনা গেল। মানুষটি বারান্দায় উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ওভারসিয়াববাবুর গলা—রাঁচি একস্‌প্রেসেই এলেন বুঝি?

একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলিয়া উঠিল অন্ধকাবে। সেই আলোয কে পথ দেখিযা আসিতেছে। ঘরের মধ্যে আবার একটা কাঠি জ্বলিতে হৈমন্তী বিরক্তিব সহিত মুখ ফিরাইল। কে আসিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল—ভয় নেই মা, আমি এসেছি। বাড়ি অন্ধকার কেন?

সুরপতিবাবু আসিয়াছেন। মালতীনগরে যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। সুরপতিবাবু হৈমন্তী ও কাজলকে মালতীনগরে লইয়া যাইবেন। জিনিসপত্র প্রায় সবই এখানে রাখিযা যাওয়া হইতেছে, লইয়া যাওয়া খুব কষ্টকর এবং তাহাব প্রয়োজনও নাই। দুই-চারখানা কাপড় সঙ্গে যাইতেছে মাত্র।

সুরপতিবাবু দিন পাঁচেক মৌপাহাড়ি থাকিলেন। মেয়ে সদ্য শোক পাইয়াছে, একটু সামলাইয়া নিক। বিকালের দিকে শতরঞ্চি পাতিয়া তিনি উঠানে বসেন। অন্যমনস্ক হইয়া চাহিয়া থাকেন কোন একদিকে। কিছুদিন আগে এইখানে বসিয়াই অপুর সহিত গল্প হইয়াছিল। অপু বলিয়াছিল—আত্মার বিনাশ নেই বাবা। আত্মা একটা শক্তি। একটা ভীষণ শক্তি। শক্তির বিনাশ নেই, রূপান্তর আছে মাত্র।

পরলোকে বিশ্বাসী সুরপতিবাবু চারদিকে তাকাইয়া দেখেন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হইতেছে। তাঁহার মনে হয় এই মাটি জল বাতাসের ভিতর, ওই দূরের নক্ষত্রটার ভিতর অপুর আত্মা রূপান্তরিত হইয়া মিশিয়া গিয়াছে।

সারাদিন ধরিয়া মৌপাহাড়ি ছাড়িয়া যাওয়ার তোড়জোড়—অথচ সবাই জানে তোড়জোড় করিবার কিছু নাই। সঙ্গে বেশি জিনিসপত্র যাইতেছে না। মৌপাহাড়ির সহিত এতদিনে যে সম্পর্কটা বহু সুখস্মৃতির সঙ্গে জড়িত হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, আসল কষ্ট সেটাকে ছিন্ন করা।

রাত্রি ঝিমঝিম করিতে থাকে। তখনও আলোকবিন্দুহীন অন্ধকারের ভিতর হৈমন্তী কাজলের পাশে শুইয়া চুপ কবিয়া তাকাইয়া থাকে। দূরের থানায় ঘণ্টা বাজিয়া যায়। অনেকক্ষণ পরেও হৈমন্তী বুঝিতে পারে, কাজল জাগিয়া আছে।

পর পর কয়েক রাত জাগিয়া, চতুর্থদিন শেষরাত্রে হৈমন্তী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুমাইয়া সে

একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল। দেখিল সে বড়ো স্টিলের ট্রাঙ্কটা খুলিয়া তার সামনে দাঁড়াইয়া। কোথাও বেড়াইতে যাওয়া হইতেছে। পাশেই বই-এর আলমারি। অপু হাসিয়া বলিতেছে—শুধু জামাকাপড় নিলেই কি চলবে? আমি তো বই ছাড়া মোটে থাকতে পারি নে—

অপু তাহাকে বই আগাইয়া দিতেছে, সে সাজাইয়া লইতেছে ট্রাঙ্কের ভিতর। মন ভরা বেড়াইতে যাইবার আনন্দ। যেন সব ঠিক আছে। যেন কিছুই বদলায় নাই।

পরের দিন ঘুম হইতে উঠিয়া হৈমন্তী সুরপতিবাবুর কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

—বাবা!

—কী মা?

—এখান থেকে আর কিছু নয়—শুধু বইগুলো নিয়ে যাবো।

সুরপতি হৈমন্তীর দিকে তাকাইলেন। কোনো প্রশ্ন করিলেন না। কিছুক্ষণ তাকাইয়া মুখ নিচু করিয়া বলিলেন—তাই হবে মা। একটা বইও ফেলে যাবো না।

কয়েকটা প্যাকিং বাক্সে বইগুলি ভর্তি করিয়া সুবপতি মালতীনগরের ঠিকানায় রেলে বুক করিয়া দিলেন।

যাইবার দিন সকালে কাজল একবার সুবর্ণরেখাব ধাবে গেল। বাবা যে পাথরটার উপর বসিয়া লিখিত, সেটা একইভাবে পড়িয়া আছে। কাজলেব অবাক লাগিল। যখন কাজলও পৃথিবীতে থাকিবে না, তখনও এটা এইভাবে এখানে পড়িয়া থাকিবে। এই নদী, এই চব, ওই প্রান্তব—সবই একই রকম থাকিবে। আকাশটা নীল থাকিবে। কেবল সে থাকিবে না। যেমন এখন বাবা নাই।

কী-একটা পাখি মাথা সামনে পেছনে নাড়াইতে নাড়াইতে ক্রমশ চর বাহিয়া নদীব ভিতরে যাইতেছে। ওপারে বাঁদিকে টিলার মাথায় সূর্যটা যেন আটকা পড়িয়াছে। বাবা এই সময়ে অনেকদিন এইখানে বসিয়া লিখিত। সে কতদিন আসিয়া বাবাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে। একবার তাহার মনে হইল, পিছন ফিরিয়া তাকাইলে বাবা একটা ঝোপের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিবে।

—অমন লুকিয়ে ছিলে কেন বাবা?

অপু হাসিয়া বলিবে—দেখছিলুম, আমায় না দেখতে পেয়ে তুই ভয় পাস কি না।

এমন কতদিন ঘটিয়াছে। বাবা তাহার সহিত ছেলেমানুষের মতো খেলা করিত। লুকোচুরি খেলা শেষ হইলে খাতাপত্র গুটাইয়া তাহারা বাড়ির পথ ধরিত।

এবার বাবা বড়ো কঠিন জায়গায় লুকাইয়াছে। আর কেহ তাহাকে পাইতেছে না। আব তাহাকে কোনদিন কেহ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না।

খেলিতে খেলিতে খেলাটা হঠাৎ যেন ভারী রকমের হইয়া গিয়াছে।

হৈমন্তী জানালা খুলিয়া দিতেই প্রথম নজরে পড়িল ইউক্যালিপটাস গাছ দুইটা। সকালেও বাতাস তাহাদের পাতায় পাতায় সামান্য কাঁপন ধরাইয়াছে। এই গাছ দুইটার ফাঁক দিয়াই সেদিন রাত্রে চাঁদ ধীরে ধীরে দিগন্তের দিকে নামিতেছিল।

—এবার চল, আমার উপন্যাসটা শেষ হলে হরিদ্বার ঘুরে আসি।

—সত্যি বলছ?

—এমন ভাবে বলছ যেন কোনদিন কোথাও নিয়ে যাইনি। তৈরি হও, এবার বেরিয়ে পড়ব।

কথা রাখে নাই। একাই সে লম্বা পাড়ি জমাইয়াছে।

বেলা বাড়িয়া চলিয়াছে। বিকালের গাড়িতে চলিয়া যাইতে হইবে। বাড়িটার, ছোট্ট শহরটার প্রতি ধূলিকণায় তাহার স্মৃতি রহিল। সদর দরজায় তালা ঝুলাইয়া যাইবার পরেও বাড়ির ভিতরে সে থাকিবে একা। তখন হৈমন্তী থাকিবে না। সেই পরিচিত গলা শোনা যাইবে না—ভাত নেমেছে? না খাইয়ে আজ মারবার মতলব করেছ নাকি?

দিন কাটিয়া যাইবে, আসবাবপত্রে ধুলা জমিবে। মাস এবং বৎসর আপন খেয়ালে কাটিতেই

থাকিবে। একটা অর্থহীন অস্তিত্ব হৈমন্তীকে সারা জীবন ক্লান্ত করিতে করিতে এক নিরালম্ব অবস্থায় আনিয়া দিবে।

সত্যিই কি অর্থহীন অস্তিত্ব?

একটা কাজ অন্তত তাহার এখনও রহিয়াছে। অপু শুরু করিয়াছিল, তাহাকে শেষ করিতে হইবে। অনুচ্চারিত প্রতিজ্ঞায় সে অপুর কাছে সত্যবদ্ধ।

ঘরের দরজায় শব্দ হইল, কাজল ফিরিয়াছে।

হৈমন্তী বলিল—তোর পড়াশুনোর বইগুলো বেঁধে নিয়েছিস বুড়ো?

দরজায় তালা লাগানো হইয়া গেল। সুরপতি তালাটা ভালো করিয়া টানিয়া দেখিলেন, ঠিকমতো লাগিয়াছে কিনা। ওভারসিয়ারবাবুকে বলা রহিল, এদিকে একটু নজর রাখিবার জন্য।

কাজল বারান্দায় রেলিংয়ে হাত দিয়া গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার বিশ্বাস হইতেছিল না, এখনই এসব ছাড়িয়া অনেকদিনের জন্য—হয়তো বা চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইতে হইবে। যাইতেই হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহাদের ট্রেন এতক্ষণে জামসেদপুর ছাড়াইয়াছে।

হৈমন্তীর বুকের ভিতর কী একটা আবেগ কোন বাধা না মানিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিল। দরজা বন্ধ না হওয়া অবধি সে বারান্দায় দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে শুইবার ঘরের কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীর পটটার দিকে চাহিয়া ছিল। দরজার পাল্লা বন্ধ হইতে দৃশ্যটা আড়াল হইয়া গেল। কাজলের হাত ধরিয়া চলিতে শুরু করিয়াই হৈমন্তীর চোখের বাঁধ ভাঙিল, এতক্ষণে বিচ্ছেদটা যেন সম্পূর্ণ হইল। মৌপাহাড়ির মাটি হইতে পা তুলিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক মিটিয়া যাইবে।

কয়েকটা শুকনো পাতা বারান্দার উপর দিয়া খড়খড় শব্দে সরিয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া উঠানে নামিতে নামিতে কাজল অবাক হইয়া ফিরিয়া তাকাইল। ঠিক মনে হইয়াছিল, কাহার যেন পায়ের শব্দ।

উঁচু নিচু লালমাটির পথে রিকশা চলিল স্টেশনের দিকে। সেখানে তাহাদের বিদায় দিবার জন্য অনেকে অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহারা ভিড় করিয়া আসিল। এই কয়েক বৎসরে যাহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছিল, যাহারা অপুর লেখার ভক্ত—সবাই আসিয়াছিল। এত কলরবের মধ্যেও হৈমন্তী বার বার স্টেশনের লাল রাস্তাটার দিকে তাকাইতেছিল। কী একটা যেন ফেলিয়া আসিয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মামাবাড়িতে আসিবার আগে কাজলের মনে দ্বিধার ভাব ছিল। কিন্তু কয়েকমাস কাটিবার পর সে অনুভব করিল, এ বাড়ির সহিত তাহার মানসিকতা বেশ খাপ খাইয়াছে। মামাবাড়িতে সবসময়ই একটা সাহিত্য ও শিল্পের হাওয়া বহিতেছে। সেটাই তাহাকে ক্রমশ সুস্থ করিয়া তুলিল। প্রতাপ একটি গ্রন্থকীট। তাহার সহিত কাজলের চমৎকার সময় কাটে। দিদিমা তাহাকে খুব ভালোবাসেন, তাঁর সম্বন্ধে কাজলের অস্বস্তি দু'দিনেই চলিয়া গিয়াছিল। সর্বাপেক্ষা বেশি জমিয়াছে কিন্তু দাদুর সঙ্গে।

সুরপতি কাজলকে ছাড়া একটুও থাকিতে পারেন না। কাজলের জন্য প্রাইভেট টিউটর রাখেন নাই, নিজেই পড়ান। ধার্মিক মানুষ তিনি, কাজলের চারিত্রিক শিক্ষার জন্য তাহাকে শিষ্য বানাইয়া লইলেন। সন্ধ্যায় ঘরের বাতি নিভাইয়া দাদুর পাশে বসিয়া কাজলকে ধ্যান করিতে হয়। সুরপতি তাহাকে বলিয়াছেন মনঃসংযোগ ব্যতীত জীবনে সিদ্ধি আসে না, সন্ধ্যায় কাজল তাই মনঃসংযোগ অভ্যাস করে। দুইগাছা রুদ্রাক্ষের মালা কেনা হইয়াছে—তাহার একটা সুরপতি নিজের গলায় দেন, অন্যটা ধ্যান করিবার সময় কাজল পরে।

এই তিন-চার বৎসরে মালতীনগরে আরও অনেক উন্নতি হইয়াছে। নতুন দোকানপাট

বসিযাছে, বাস্তায গাড়িঘোড়াব ভিড় বাড়িযাছে, বাড়িঘব অনেক তৈযাবি হইযাছে। কলিকাতা খুব দূবে নহে, ব্যবসাপত্রেব বেশ প্রসাব হইতেছে।

মালতীনগবেব গোলমাল ছাড়িযা মাইল দুযেক গেলে কযেকটি সুন্দব গ্রাম আছে। পিচেব বাস্তা ছাড়িযা মাঠেব মধ্যে দিযা হাঁটিযা কিছুটা দূবে চমৎকাব বাঁশবন, পুকুব, কলসী-কাঁখে গ্রাম্যবধূ দেখা যায। ধুলাবালি মানুষজনে বিবক্ত হইযা কাজল মাঝে মাঝে হাঁটিযা গ্রামেব দিকে যায। নিশ্চিন্দিপুবে যাওয়া হইযা ওঠে না, এই ভাবেই কাজল প্রকৃতিব সহিত সম্পর্ক বাঁচাইযা বাখিযাছে।

এক ছুটিব দিনে কাজল দুপুবে বসিযা পড়িতেছে, এমন সময দবজাব কড়া নড়িযা উঠিল। দবজা খুলিযা দেখে গোঁফদাড়িওযালা এক বলিষ্ঠদেহ লোক দাঁড়াইযা, কাঁধে কাপড়েব ঝুলি, পাযে সস্তা দামেব চটি। কাজল প্রথমে চিনিতে পাবে নাই। তাবপবে সে অবাক হইযা বলিল—মামা?

প্রণব জেলে গিযাছিল। পুলিশ সন্দেহ কবিযাছিল, বিপ্লবীদেব সহিত তাহাব যোগাযোগ আছে। তিন বৎসব আগে সে গ্রেপ্তাব হয। জেলে বসিযাই সে অপুব মৃত্যু সংবাদ খববেব কাগজে পড়িযাছে। সব কাগজেই সাহিত্যিক অপূর্বকুমাব বাযেব মৃত্যুসংবাদ ছাপা হইযাছিল। নিশ্চিন্দিপুবে গিযা বানিব নিকট হইতে ঠিকানা সংগ্রহ কবিযা প্রণব এখানে আসিযাছে।

দৌড়াইযা কাজল হৈমন্তীকে ডাকিযা আনিল। হৈমন্তী প্রণবকে কখনও দেখে নাই। ঝুলিটা নামাইযা প্রণব বসিতে বসিতে বলিল—এ পৃথিবীতে অপূর্ব আমাব সবচেযে বড়ো বন্ধু ছিল। তা ছাড়া আবও একটা পবিচয আমাব আছে—আমি কাজলেব মামা।

বিকালে জলখাবাব খাইযা প্রণব কাজলেব বইপত্র দেখিতেছিল। কাজলেব আলমাবিতে বেশ কিছু বই জমিযাছে। কিছু অপু কিনিযা দিযাছিল, কিছু মালতীনগবে আসিবাব পব কাজল প্রতাপকে দিযা কিনাইযাছে। কাজল এখন বেশ ইংবাজি পড়িতে পাবে।

বইগুলি নাড়িতে নাড়িতে প্রণব বলিল—অনেক পড়ে ফেলেছিস খোকা। তুই আব সেই বাচ্চা খোকন নেই।

সত্যিই, অবাক হইযাছিল সে। বযসেব তুলনায কাজল বেশি পড়াশুনা কবিতেছে। তাব বযসী অন্য ছেলে এসব বইযেব নামও শোনে নাই।

—তুই বাপেব ধাবা পেযেছিস। বাব্বাঃ, অপু তো কলেজ লাইব্রেবি প্রায শেষ কবে ফেলেছিল।

—আমিও বিপন কলেজে পড়ব পুলুমামা।

প্রণব নিজেব ঘন দাড়িতে একবাব আঙুল চালাইল।

—বেশ তো, তাতে আপত্তি কী? স্কুলে ভালো বেজাল্ট কব—

—আজকে বাত্তিবে তোমাদেব কলেজেব গল্প বলবে?

প্রণব হাসিল।

—আমাকে আজকেই চলে যেতে হবে খোকন।

কাজলেব মুখ শুকনো হইযা গেল।

—সে কথা বললে শুনচি নে, তোমাকে থাকতেই হবে ক'দিন।

—আজকেব বাতটা নাহয থাকবো, কিন্তু বেশি তো থাকবাব উপায নেই খোকা।

—কেন?

প্রণব কাপড়েব ঝুলিটা দেখাইযা বলিল—কাবণ এইটে।

—কী আছে ওতে?

—ওতে একটা যাদুকাঠি আছে, মানুষেব দুঃখ দূব কবাব।

কাজল আবছাভাবে ব্যাপাবটা বুঝিল।—এটা নিযে কী কববে তুমি?

—আমি কিছু কবব না। ঝোলাটা যথাস্থানে পৌঁছে দিযে আমাব ছুটি।

সন্ধ্যাবেলা অনেক গল্পগুজব হইল। প্রতাপ, হৈমন্তী, কাজল, সরযূ সবাই বসিয়া প্রণবের গল্প শুনিল। জেলের নৃশংসতার কথা শুনিয়া সরযূ আর হৈমন্তী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। কাজল প্রণবের কাছে ঘেঁষিয়া বসিল।

—পুলুমামা, বলেছিলে তোমাদের কলেজ-জীবনের গল্প করবে?

—সে কি একদিনে হয় রে? কী মজাই না করতাম আমরা! তোর বাবা আর আমি ছিলাম দুটো পাগল। তবে আমার চেয়ে ও একটু উঁচু ধরনের পাগল ছিল। একবার তো মাঝরাতে আমাদের পুলিশে তাড়া করেছিল—

—কেন?

—পার্কে বসে মাতালের অভিনয় করছিলুম থিয়েটার দেখে বেরিয়ে। তাড়া করতেই দুজনে রেলিং টপকে দৌড়।

সরযূ বলিল—আপনি মানুষটিও দেখছি খুব শান্তশিষ্ট নন।

প্রণব কৌতুক বোধ করিয়া দাড়িতে ঘন ঘন আঙুল চালাইল, তারপর বলিল—শান্ত যে নই তা ভারত সরকারও জানে। দৌরাত্ম্য করার অভ্যেস একেবারে রক্তের ভেতরে মিশে গেছে।

পরের দিন সকালে প্রণব বিদায় লইল। যাইবার সময় হৈমন্তীকে বলিল—আপনাকে সান্ত্বনা দেবো না। অপু আমার জীবনেব একটা বড়ো অংশ জুড়ে ছিল। সে চলে যাওয়ায় নিজেই অনুভব করছি, এর সান্ত্বনা হয় না। তবে আপনি তার সঙ্গে ছিলেন, ভরসা করি শোক সহ্য করবার ক্ষমতা আপনি তার কাছ থেকে পেয়েছেন।

কথা থামাইয়া বার দুই দাড়িতে হাত বুলাইযা পরে কাজলকে দেখাইযা বলিল—ওকে দেখবেন। ওর চোখে ওর বাবার আগুন রয়েছে।

রাত্রে কাজল ছাদে একটা মাদুর পাতিয়া শোয়, যতক্ষণ না নিচে হইতে খাওয়ার ডাক আসে। আকাশে মেঘ না থাকিলে ছায়াপথটা দেখা যায়—আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিরাট সাদা নদীর মতো দুই দিগন্তকে যুক্ত করিতেছে। বাবাব জ্যোতির্বিজ্ঞানেব বইগুলি সে প্রায়ই নাড়াচাড়া করিযা দেখে, তাই আকাশের আকর্ষণ তার.কাছে অসীম। নক্ষত্রে গ্রহে নীহারিকায একটা রহস্য লুকাইয়া আছে, সে ছাদে শুইয়া রহস্যেব আমেজটা উপভোগ করে। বই দেখিযা দেখিয়া সে অনেক রাশি এবং নক্ষত্রমণ্ডলী চিনিযাছে।

একদিন হঠাৎ তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিয়াছিল। কোথায় অনন্ত শূন্যে ধূমকেতু গ্রহ-উপগ্রহ বিশাল নীহারিকা অনন্তকাল হইতে ভ্রমণ করিতেছে, আর কোথায় ক্ষুদ্র এক গ্রহ পৃথিবীর অতিক্ষুদ্র মালতীনগরে সে ছাদে শুইয়া তাহাদের কথা ভাবিতেছে। বিশ্বের বিশালত্বের নিকট তাহার তাৎপর্যহীনতা একেবারে স্পষ্ট হইয়া গেল।

পুরাতন সেই স্কুলেই সে আবার ভর্তি হইয়াছে। পড়াশুনায় সে সাধারণ ছাত্রদের অপেক্ষা অনেক আগাইয়া আছে বলিয়া কয়েকজন শিক্ষক তাহাকে স্নেহ করেন, কিন্তু বেশির ভাগই বিরূপ। পরীক্ষার খাতায় বা হোম টাস্কের খাতায় কাজলের লেখা উত্তর তাঁহাদের নিকট অকালপক্কতা বলিয়া মনে হয়। ছুটির দিনে দুপুরে সবাই ঘুমাইয়া পড়িলে বাবার বই যে আলমারিতে রাখা আছে, সেটা খুলিয়া বই নামাইয়া সে পড়ে। অনেক বই-এর বিষয়বস্তু বুঝিতে পারে না, কিন্তু সব বই সে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে। শুধুমাত্র বই নাড়াচাড়া করিয়া নীটসে, সোপেনহাওয়ার, ইমানুয়েল কান্ট, স্পিনোজা প্রভৃতির নাম মুখস্থ হইয়া গিয়াছে।

দুপুরবেলা কোথাও কোনো শব্দ নাই, রাস্তায় গাড়িঘোড়ার চলাচল কম, বাড়িটা যেন ঝিমাইতেছে। সময়টা পড়াশুনা করিবার অত্যন্ত উপযুক্ত। বই খুলিয়া কোলের উপর রাখিয়া পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে। দুপুরবেলার নির্জনতার সহিত তাহার মনটা একাত্ম

হইয়া আসে। বিভিন্ন বিষয়ের বই একটা অদ্ভুত জগৎকে হাতের কাছে আনিয়া দেয়—নীহারিকার জগৎ, প্রাণীজগৎ, বিভিন্ন দেশের বিচিত্র উদ্ভিদের জগৎ। ছোটবেলায় বাবা মুখে মুখে তাহাকে বিবর্তনবাদ বোঝাইত, এখন সে আলমারি হইতে বাবার নাম সই করা 'অরিজিন অব দি স্পিসিজ' বইটা নামাইয়া পড়িবার চেষ্টা করে। দাঁত ফুটাইতে পারে না, কিন্তু বইখানা খুব আকর্ষণ করে। চারিদিকে যেন শীতকালের শেষবেলার রৌদ্রের মতো একটা সুদূরের হাতছানি—অজানার আহ্বান।

সেদিন আকাশ দেখিয়া মনে হইতেছিল বৃষ্টি নামিবে। কিন্তু কাজলের মনটা সকাল হইতেই কী কারণে বেশ প্রসন্ন ছিল। বৃষ্টির আশঙ্কা উপেক্ষা করিয়া সে বিকালে বেড়াইতে বাহির হইল।

চারিদিকে যেন সন্ধ্যার ছায়া। মেঘ খুব নিচে নামিয়াছে। যে কোন সময়ে বৃষ্টি আসিতে পারে। আকাশে একটাও পাখি নাই, রাস্তায় লোক কম। গাছের ঘন সবুজ পাতা নীল মেঘের পটভূমিতে ভারি সুন্দর দেখাইতেছে। গুমগুম করিয়া একবার মেঘ ডাকিয়া উঠিল।

রাস্তার ধারে ঘন ঘাসের মধ্যে অজস্র ঘাসফুল ফুটিয়া আছে। কাজলের ইচ্ছা হইল ঘাসে একবার হাত লাগাইয়া দেখে। রাস্তা ছাড়িয়া নিচু হইয়া সে ঘাসের উপর হাত দিল। সুন্দর কার্পেটের মতো পুরু হইয়া ঘাস জন্মিয়াছে। নরম, সবুজ, সজীব। অসংখ্য ঘাসফুল কালো আকাশে নক্ষত্রের মতো ছড়াইয়া ফুটিয়াছে। কাজল লক্ষ করিয়া দেখিল, প্রত্যেকটি ফুলের তিন পাশে তিনটি করিয়া ঘাসের শীষ বাহির হইয়াছে। কোথাও নিয়মভঙ্গ হয় নাই। একটা করিয়া সাদা ফুল, পাশ দিয়া তিনটি করিয়া ঘাসের শীষ।

একটা ঘাসফুল হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া কাজলের মনে হইল—কী অদ্ভুত নিয়ম! কিছুতেই একটু এদিক ওদিক হয় না। এই ছোট সামান্য ফুলটাও সেই নিয়মের শিকল দিয়া আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। নীহারিকাময় বিশ্বের কত ক্ষুদ্র নাগবিক, তবু নিজেব স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে বিশ্বে একটা স্থান অধিকাব করিয়া আছে। কয়েকটা ঘাসফুল হাতে করিয়া লইল কাজল মাকে দেওযার জন্য। আর একটু হাঁটিয়া সে বাড়ি ফিরিবে।

কয়েক পা হাঁটিয়াই সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। সামনে রেললাইন। ডাইনে সেই ঘাসে ছাওয়া ঢালু জায়গাটা, সেখানে অনেকদিন আগে বাবার সঙ্গে বেড়াইতে আসিয়া মৃত গরু পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিল।

বুকের মধ্যে হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল। ভয় পাইয়াছিল বলিয়াই বাবা সেদিন সস্নেহে হাত ধরিয়া বাড়ি লইয়া গিয়াছিল, আজ কেহ নাই।

একটা ভয়ের ঢেউ তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। হনহন করিয়া হাঁটিয়া প্রায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে হৈমন্তীর কাছে পৌঁছিয়া মুঠা খুলিয়া বলিল—এই দ্যাখো মা, তোমার জন্যে কী এনেছি।

নবম পরিচ্ছেদ

কাজলের মনের গভীরে ছন্দপতনের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা আছে। জিনিসটা সে সব সময় ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। যে জিনিসটার যেমন থাকিবার কথা, যেখানে যে জিনিসটা মানায়, সেখানে তাহা না থাকিলে কাজল ভীষণ অস্বস্তি বোধ করে। অস্বস্তিটাও অদ্ভুত। ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি পিছলাইয়া কিঁ—চ্ করিয়া তীক্ষ্ণ শব্দ হয়—তাহা শুনিলে যেমন গা গুলাইয়া ওঠে, অনেকটা তেমনি। সুন্দর কিছুর মধ্যে সামান্যতম ত্রুটি, তাহার মতে, সমস্ত ব্যাপারটাকে একেবারে মাটি করিয়া দেয়। বাবার সঙ্গে বেড়াইতে গিয়া সুন্দর বিকেলবেলাটায় বেললাইনের পাশে বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া সে চমকাইয়া উঠিয়াছিল এই কারণেই। তখন কারণটা বুঝিতে পারে নাই, এখন আবছাভাবে আন্দাজ করিতে পারে। জগতে সমস্ত দিক ব্যাপিয়া এত অতিমানবিক সংগীত বাজিতেছে, তাহার মধ্যে

অসুন্দর কিছু মানায় না। সেতার বাজাইতে বাজাইতে ভুল তারে হাত পড়িয়া যাইবার মতো লাগে।

বাবা তাহাকে একখানি 'ডেভিড কপারফিল্ড' কিনিয়া দিয়াছিল। বইখানি শিশুদের জন্য সংক্ষিপ্ত করা। আজ তাহার ইচ্ছা হইল বইখানি নির্জনে কোন জায়গায় বসিয়া পড়িবে। এ জিনিসটা তাহার বাবাকে দেখিয়া শেখা। কোন ভালো বই অপু সাধারণত বাড়ির মধ্যে বসিয়া পড়িত না।

দুপুরে কাজল বাড়ি হইতে বাহির হইয়া সোজা গ্রামের পথ ধরিল। হাতে বইখানা, পকেটে আনা দুই পয়সা—সকালে সুরপতির নিকট হইতে লইয়াছে। পিচের রাস্তা যেখানে দূরের এক মহকুমা শহরের দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে, কাজল সেখানে রাস্তা ছাড়িয়া মাঠে নামিল। মাঠে ধান বুনিয়াছে—গাছ এখনও খুব লম্বা হয় নাই, কাজলের কোমর বরাবর হইবে। মাঠের মাঝখানে আসিয়া চারিদিকে তাকাইলে ব্যাপারটাকে একটা সবুজ ধাঁধা বলিয়া মনে হয়। সামান্য বাতাসেই মাঠ জুড়িয়া সবুজের ঢেউ শুরু হয়, ভারি ভালো লাগে দেখিতে। একদিক হইতে ঢেউ শুরু হয়, একেবারে অপর প্রান্তে গিয়া শেষ হয়।

মাঠ পার হইয়া সামনে একটা বড়ো বাঁশবন পড়ে। দিনের বেলাতেও তাহার ভিতরটা আধো অন্ধকার থাকে। লম্বা সরু বাঁশপাতা ঝরিয়া ঝরিয়া তলার মাটি একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছে। মাঠের উজ্জ্বল আলোক ছাড়িয়া বাঁশবনে ঢুকিলেই মনে হয়, হঠাৎ সন্ধ্যা নামিল। বেশ ঠাণ্ডা জায়গাটা। বাতাসে বাঁশ গাছ দুলিয়া আওয়াজ হইতেছে কট্—কট্, ক্যাঁ—চ।

বাঁশের গা হইতে কতকগুলি খোলা টানিয়া ছিঁড়িয়া কাজল তাহার উপর বসিল। বই খুলিয়া পড়িতে পড়িতে সে মগ্ন হইয়া যায়। ডেভিডের দুঃখ, ডেভিডের সংগ্রাম করিতে করিতে বড়ো হওয়া, সব তাহার মনে দাগ কাটে। মানুষের জন্য লেখকের সমবেদনার অশ্রু তাহাকে ডিকেন্সের প্রতি আকৃষ্ট করে। অন্য কে এমন ভাবে লিখিতে পারিত? অনাদৃত শুষ্কমুখ ডেভিডকে সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পায়।

একটা কঞ্চি সামনে বাঁকাভাবে মাটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর হঠাৎ এক টুনটুনি আসিয়া বসিল। কাজল তাকাইয়া দেখিতেছে, পাখিটা বসিয়া আছে—ভয় পাইয়া উড়িয়া যাইতেছে না। কঞ্চিটা অল্প অল্প দুলিতেছে।

কাজল অনুভব করিল তাহার মনে কোনো দুঃখ নাই, গতকাল রেললাইনের ধারে যে ভয়টা হৃৎপিণ্ড চাপিয়া ধরিয়াছিল, তাহাও অদৃশ্য। চারিদিকে শুধু ছায়াছায়া আলো, পাখির ডাক, ঘন বাঁশবনে নিঃঝুম দুপুরে বাঁশ দুলিবার শব্দ। আর সবকিছুর সঙ্গে মিলাইয়া রহিয়াছে—ডেভিডের জীবনচিত্র।

বইটি রাখিয়া কাজল চিত হইয়া শুইল। গতকাল বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, মাটি সামান্য ভিজা। উপরে বাঁশপাতা জড়াজড়ি করিয়া একটা সবুজ চাঁদোয়া বানাইয়াছে, তাহার ফাঁক দিয়া আকাশ দেখা যায়। মাটি হইতে সোঁদা গন্ধ আসিতেছে। আবার বোধহয় বৃষ্টি হইবে—এক সার পিঁপড়া মুখে ডিম লইয়া ছুটিতেছে। বৃষ্টি হইবার আগে পিঁপড়া নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ঘোরে। একটা বাছুর গলায় দড়ি এবং দড়ির প্রান্তে আটকানো খোঁটাসুদ্ধ তাহার সামনে আসিয়া পড়িল। ছোট্ট বাছুরটা, কাহাদের কে জানে—খোঁটা উপড়াইয়া এখানে হাজির হইয়াছে। বাছুরের চোখের শান্ত দৃষ্টি তাহাকে মুগ্ধ করিল। সে হাত বাড়াইয়া ডাকিল—আয়, আয়।

নাক উঁচু করিয়া বাতাসে কী শুঁকিয়া বাছুরটা উলটা পথ ধরিল।

কেমন আরামে তাহার সময় কাটিতেছে। কাজলের একবার দেবেশের কথা মনে পড়িল। সে এখনও মৌপাহাড়িতে তেমনই বন্ধুদের সহিত অকারণে হৈ হৈ করিয়া কাটাইতেছে। একটা বই পড়া নাই, দু'দণ্ড একলা বসিয়া চিন্তা করা নাই। এই ছায়ায় বসিয়া বই হাতে সে চিন্তা করিয়া যে আনন্দ পাইতেছে, সে আনন্দের সন্ধান কি সারা জীবনেও উহারা পাইবে?

বিকাল হইয়া আসায় সে বাঁশবাগান ছাড়িয়া গ্রামের ভিতরে চলিল। এক জায়গায় একটা পানাপুকুর টোপাপানায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে। পানা সরাইয়া এক কিশোরী থালা মাজিতেছিল। কাজলকে দেখিয়া ত্বরিতপদে তালগাছের গুঁড়ির তৈয়ারি ঘাট বাহিয়া উপরে উঠিয়া দৌড়াইল। একটা কুকুর, বেশ স্বাস্থ্যবান, তাহার দিকে পুকুরের ওপার হইতে তাকাইয়া আছে। কাজলের মনে হইল—আমার কালু বেঁচে থাকলে ঠিক অত বড়ো হত।

কালুর কথা মনে পড়িতে তাহার মন খারাপ হইয়া গেল। কালু মারা যাইবার পরেও তাহার গলার চেনটা উঠানের কাঠচাঁপার ডালে ঝুলিত।

সামনে একটা খোড়োচালের বাড়ি। কাজল উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিল—শুনছেন?

খাটো ধুতি পরা একজন বাহির হইয়া আসিল।

—কে? কী চাই?

—একটু খাবার জল দেবেন?

লোকটা কাজলকে আপাদমস্তক দেখিয়া বলিল—আমরা কিন্তু মুসলমান।

কাজল বলিল—হোক গে, আপনি দিন জল।

—ওখানে কেন? এই দাওয়ায় এসে বোসো খোকা।

—এই গ্রামে বুঝি সবাই মুসলমান?

লোকটা হাসিয়া বলিল—না, না। সবাই নয়, আমরা কয়েকঘব আছি আর কী?

তাহার পর যেন একটা খুব গোপনীয় কথা হইতেছে, এমনভাবে মুখটা কাজলেব কাছে আনিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল—মুড়ি খাবে দুটো?

ভাব জমিয়া গেল।

একটু পবেই কাজল দাওয়ায় বসিযা মুড়ি খাইতে খাইতে গল্প কবিতেছে, নাক দিযা সর্দি ঝবা একটা বাচ্চা পাশে রাখা ডেভিড কপারফিল্ডখানা লইয়া নাড়াচাড়া কবিতেছে।

লোকটা বলিল—আর দেবো মুড়ি?

—না, এই অনেক। তোমার নাম কী?

লোকটা নাম বলিবাব আগে গামছায় একবার মুখ মুছিয়া লইল, যেন তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে।

—আমার নাম আখের আলি।

ভিতব হইতে একটি বৌ আসিয়া তাহাব সামনে একটা বাটি নামাইয়া রাখিল। কাজল অবাক হইয়া বলিল—এ কী! দুধ কে খাবে?

বৌটি বলিল—খেয়ে নাও। আমাদের নিজেদের গরুব দুধ, ছিটেফোঁটাও পানি নেই। চিনি দেওয়া আছে, মুড়ি দিয়ে খাও। শুধু মুখে মুড়ি খেতে নেই।

কাজল আখেরকে জিজ্ঞাসা করিল—এ কে?

—আমার বৌ। ওর নাম রাবেয়া।

—এত দুধ খেতে হবে?

আখের আলি বলিল—উপায় নেই, রাবেয়া বিবি যখন ধরেছে, তখন আর—আমাকেই কেবল মোটে আদরযত্ন করে না।

রাবেয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল—আঃ!

কাজল ভাবিল, বড়ো হইয়া সে তাহার দেখা মানুষ লইয়া—ইহাদের জীবন লইয়া উপন্যাস লিখিবে ডিকেন্সের মতো। এমন সময় গলায়-খোঁটা সেই বাছুরটা গুটিগুটি আখেরের উঠানে আসিয়া ঢুকিল। আখের বলিল—ওই এতক্ষণে এসেছে! সারাদিন ঘুরে ফিরে এখন আসা হলো। আমি গিয়ে দেখি, বুঝলে, খোঁটা উপড়ে কোথায় হাওয়া হয়েছে। তারপর আসছে আসছে করে এই এলো—

কাজল এক চুমুকে কিছুটা দুধ খাইয়া বলিল—তোমাদের বাছুর?

খাওয়া হইলে আখের কাজলকে লইয়া তাহার পোষা হাঁস মুরগি ইত্যাদি দেখাইল। বলিল—কিছুদিন বাদে এসো, তোমাকে একটা হাঁসের বাচ্চা দেবো।

বইখানি বগলদাবা করিয়া কাজল আবার সেই বাঁশবন পার হইয়া মাঠে পড়িল। সূর্য ডুবিয়া গিয়াছে। বাঁশবাগানে ঘন ছায়া। সে যেখানটায় শুইয়াছিল, সেখানে বাঁশের খোলাগুলি এখনও পড়িয়া আছে। ছোটবেলায় নিশ্চিন্দিপুরে এই সময়টায় অন্ধকার বনের মধ্য দিয়া যাইতে ভয় করিত, ভাবিলে এখন হাসি পায়। গা ছমছমে অনুভূতি একটা হয় ঠিকই, তবে তাহা ভূতের ভয় নহে।

বাঁশবনটার মাঝখানে সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল। ঘনায়মান অন্ধকারে সে একা। জনপ্রাণী নাই কোথাও কোনোদিকে। সন্ধ্যার শব্দহীনতায় বাঁশ দুলিবার শব্দটা আরও স্পষ্ট লাগে।

মাঠের ভিতর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে কাজল দেখিল, দিগন্তে মেঘ জমিয়া বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। মনে অদ্ভুত আনন্দ। আখেরের সহিত সন্ধ্যাটা খুব ভালো কাটিয়াছে। অচেনা অজানা মানুষ কত তাড়াতাড়ি আপন হইয়া যায়। আবার সে এখানে আসিবে।

মাঠের উপরে সেই সন্ধ্যায় তাহার এক অপূর্ব অনুভূতি হইল। বুঝিল, তাহার জীবন অন্যদের বাঁচিবার প্রণালী হইতে একেবারে ভিন্ন রকম। অযথা সে পৃথিবীতে আসে নাই, তাহার একটা কিছু করিবার আছে। দিগন্তের ওই বিদ্যুচ্চমকের মতো সে জীবনের একঘেয়ে আকাশে চমক লাগাইয়া দিয়া যাইবে। উত্তেজনার প্রাবল্যে জোরে জোরে হাঁটিয়া কাজল বাড়ি পৌঁছিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিতেই সুরপতি ডাকিয়া বলিলেন—কোথায় ছিলি দাদু?

—বেড়াতে গিয়েছিলাম দাদু, ওই গ্রামের দিকে।

—রাত বিরেতে মাঠে-ঘাটে বেশি থাকিস নে, সাপ-খোপ বেরোয়।

কাজল হাসিয়া জামাকাপড় ছাড়িয়া মুখ ধুইতে গেল। সুরপতি ডাকিয়া বলিলেন—চট করে হাতমুখ ধুয়ে আয়। আজ একটু আলো নিভিয়ে বোস তো। বড়ো চঞ্চল হয়েছিস, তোর মনঃসংযোগ হবে না ইয়ে হবে—

মেঘ আকাশের অনেকখানি ঢাকিয়া ফেলিযাছে। বাতাস একদম বহিতেছে না। ঝড় আসিতে পারে।

আঃ! মনে কোনো ভার নাই, মালিন্য নাই। দুপুরেব দেখা সেই মাঠের মতো দিগন্তবিস্তৃত সবুজ জীবন।

ঘরে ফিরিয়া হৈমন্তীকে জড়াইয়া ধরিয়া কাজল বলিল—বড় ভালো লাগছে মা, আজ বড়ো ভালো লাগছে।

দশম পরিচ্ছেদ

হৈমন্তীর ঘরের দেওয়ালে দরজার মাথায় অপুর একখানা ছবি টাঙানো হইয়াছে। সারাজীবনে অপু ছবি তুলিয়াছে খুব কম। বিবাহের পরে পরেই হঠাৎ কী খেয়ালে কলিকাতার এক স্টুডিয়ো হইতে ছবিটা তুলিয়াছিল। রোজ স্কুলে যাইবার সময় কাজল বাবার ছবিকে প্রণাম করিয়া বাহির হয়। ছবিটা উঠিয়াছিল সুন্দর, মনে হয় অপু হাসিহাসি মুখে ফ্রেমের ভিতর হইতে তাকাইয়া আছে। পারতপক্ষে হৈমন্তী ছবির দিকে তাকায় না, তাকাইলে বুকটা কেমন করিয়া ওঠে।

স্কুলে মাঝে মাঝে সাপ্তাহিক পরীক্ষা লওয়া হয়। এক পরীক্ষায় কাজল বাংলা রচনা লিখিতে গিয়া বিদেশী উপন্যাস হইতে একটা উপমা দিয়াছিল, পরদিন তাহা লইয়া খুব হৈ-চৈ। বাংলার শিক্ষক অখিলবাবু ক্লাসে তাহার খাতাখানা লইয়া আসিলেন। প্রথমেই কাজলের খোঁজ করিলেন।

—অমিতাভ এসেছে? কোথায় সে?

কাজল ভীতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

—এসেটা তোমার নিজের লেখা?

—হ্যাঁ সার।

অখিলবাবু চোখ লাল করিলেন—আবোলতাবোল এসব কী লিখেছ?

আবোলতাবোল কোনখানটা কাজল ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

—কী সার?

—যে বইটার কথা তুমি লিখেছো, সেটা পড়া আছে তোমার? না জেনে লেখো কেন? নাকি অন্য কারুর লেখা মুখস্থ করে লিখেছো? সত্যি কথা বলো।

কাজল লেখার মধ্যে ডুমার 'থ্রি মাসকেটিযার্স'-এর উল্লেখ করিয়াছিল। ইংরাজিতে বইটির শিশুপাঠ্য সংস্করণ সে পড়িয়াছে।

—বইটা আমি পড়েছি সার।

—আবার তর্ক? মিছে কথা বলছো কেন? এই বই পড়েছো তুমি?

—মিছে কথা নয় সাব, গল্পটা আপনাকে আগাগোড়া বলতে পারি।

কাজলের বয়সী কোনো ছেলে 'থ্রি মাসকেটিয়ার্স পড়িয়া থাকিতে পারে, এ কথা অখিলবাবু বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল কাজল মিথ্যা কথা বলিয়াছে, এবং একবার বলিয়া ফেলিযা এখন আব কথা ঘুরাইতে পারিতেছে না।

অল্প বয়সে যাহা হয়—সে যে অনেক পড়িয়াছে, ইহা লোককে না জানাইয়া কাজল শান্তি পাইতেছিল না। বাহাদুরি দেখাইবাব জন্য সে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বইটাব কথা উল্লেখ করিয়াছিল। অখিলবাবু চটিয়া হেডমাস্টার মশাযেব কাছে গিয়ে নালিশ করিলেন। ললিতবাবু 'হেডমাস্টাব, তিনি কাজলকে ডাকিযা পাঠাইলেন। অন্য ছেলেরা ভয দেখাইল—যাও না, মজা দেখবে। ফিরে এসে পিঠে মলম লাগাতে হবে।

ললিতবাবু বলিলেন—অখিলবাবু বললেন, তুমি তাঁব সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার করেছ। সত্যি?

—না সার। উনি বললেন আমি মিথ্যে কথা বলছি, আমি নাকি বইটা পড়িনি। আমি বললাম যে গল্পটা ওঁকে শোনাতে পারি।

—সত্যি পড়েছো তুমি?

—সত্যি সাব।

—ইংরাজিতে?

—হ্যাঁ সার। বাবা আমাকে বইটা উপহার দিয়েছিলেন। আমি এমন অনেক বই পড়েছি সার। কেন আমি শুধু শুধু অখিলবাবুর কাছে মিথ্যে কথা বলবো?

—আর কী কী বই পড়েছো তুমি?

—'ডেভিড কপারফিল্ড' পড়েছি, 'গালিভারস্ ট্রাভেলস্', 'ববিনসন্ ক্রুসো', 'টলস্টয়ের গল্প'—

—'রবিনসন্ ক্রুসো' কার লেখা?

—ডানিয়েল ডিফো-র।

ললিতবাবু টেবিলের ওপরে রাখা পেপারওয়েটটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিলেন—তোমাকে ইংরাজি কে পড়ান বাড়িতে।

—আমার বাবা পড়াতেন সার। বাবা মারা যাওয়ার পর দাদু পড়ান।

—বেশ। পড়াশুনা করা ভালো, তবে মাস্টারমশাইদের মুখের ওপর তর্ক কোরো না। বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্। পড়ে যাও, পড়া ভালো।

কাজল চলিয়া গেলে হেডমাস্টার অখিলবাবুকে ডাকাইলেন।

—ছেলেটি মিথ্যে কথা বলেছে বলে তো মনে হলো না অখিলবাবু।

—বাচ্চা ছেলে ওইসব বই পড়েছে বলে আপনি বিশ্বাস করেন? তাছাড়া এই বয়সে ওইসব পাকামির বই পড়া কি ভালো?

—জিনিসটা ওভাবে দেখবেন না অখিলবাবু। বই তো খারাপ নয়। বিষয়বস্তুর কথা যদি বলেন, তবে বলতে হয়—

অখিলবাবু আলোচনা চাপা দিয়া দিলেন। বইটি তাঁহারও পড়া নাই।

বিকাল চারটায় স্কুলের ছুটি হয়। মসজিদের পাশের রাস্তা দিয়া কাজল রোজ বাড়ি ফেরে। আজ ছুটির পরে বেশ ক্ষুধা অনুভব হওয়ায় অন্যদিন হইতে বেশি জোরে হাঁটিয়া সে বাড়ি ফিরিতেছিল। পথে স্কুলের ইংরাজির শিক্ষক আদিনাথবাবু ডাকিয়া বলিলেন—অমিতাভ, শোন্।

আদিনাথবাবু কাজলকে খুব ভালোবাসেন। ক্লাসে ছেলেদের উপদেশ দেন তাহাকে অনুসরণ করিতে। পড়িতে পড়িতে কাজলের নিজস্ব একটা ইংরাজি লেখার ভঙ্গি তৈয়ারি হইয়াছে, তাহা আদিনাথবাবুর ভালো লাগে।

কাজল আগাইয়া গেল।—কী সার?

—আজ তোকে নিয়ে কী গোলমাল হয়েছে রে স্কুলে?

কাজল খানিকটা বলিতে তিনি বলিলেন—যে যা বলে বলুক। কারও কথায় আমল দিবি নে। পড়াশুনার অভ্যেস কখনও ছাড়বি নে, জীবনে উন্নতি হবে, দেখিস্।

হৈমন্তী বসিয়া কী-একটা বই পড়িতেছিল। কাজলকে ঢুকিতে দেখিয়া বলিল—আয়। আজ এত দেরি হল যে আসতে? হাতমুখ ধুয়ে আয়, খেতে দিই।

স্কুল হইতে ফিরিয়া কাজল ভাত খায়। হৈমন্তী আসন পাতিতে পাতিতে বলিল-- আজকে রাত্তিরে শুয়ে সেই গল্পটা বলবি কিন্তু—

রাত্রে মায়ের কাছে শুইয়া কাজল মাকে গল্প শুনাইয়া থাকে। অপুর একটা ইংরাজি বইতে সে একটা ভূতের গল্প পড়িয়াছিল, সেই গল্পটা সম্প্রতি হৈমন্তীকে বলিতেছে।

দাদুর কাছে পড়া সাঙ্গ হইলে হ্যারিকেন লইয়া সে শতরঞ্চির উপর বসিয়া গল্পের বই পড়ে। ভূতের গল্প হইলে পরিবেশটা অদ্ভুত জমিয়া উঠে। হ্যারিকেনের আলোর পরিধির বাইরে যেন অজানা রাজ্য—আলোকবৃত্তের সামান্য পরিসরের ভিতরেই তাহার থাকিতে ইচ্ছা করে। গল্প খুব জমিলে কাজল কল ঘুরাইয়া পলতে আর একটু বাড়াইয়া দেয়।

খাওয়ার পর কাজল বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। হৈমন্তী বলিল—আবার বেরুবি নাকি? তোর দেখা পাওয়া যায় না সারাদিন। এখন আবার টই টই করে বেরুবার কী দরকার? থাক, বাড়িতে থাক—

বোধহয় খুব একটা ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই কাজল এক কথায় রাজি হইয়া গেল। বলিল—তুমি খাটে শোও মা। আমি পাশে শুয়ে গল্প করি।

হৈমন্তী প্রায়ই ছেলেকে নিজের ছোটবেলার গল্প শোনায়। যে দিনগুলি কাজল দেখে নাই, কাজলের ধারণা সেগুলি বর্তমানের চেয়ে অনেক ভালো ছিল। অতীতের প্রতি তাহার যে স্বপ্নময় কল্পনা রহিয়াছে, তাহাই হৈমন্তীর গল্পকে তাহার নিকট বাস্তব করিয়া তোলে। সেই দুর্গাপূজার আগে শিউলি ফুল তুলিতে যাওয়া, শিউলি ফুলের বোঁটা দিয়া কাপড় রঙিন করা, দল বাঁধিয়া হৈ হৈ করিয়া ঠাকুর দেখিতে বাহির হওয়া। কাজলের ধারণা সে দিনগুলি অনেক ভালো ছিল—অনেক, অনেক ভালো। মাকে বলে—মা, সেই গল্পটা বলো, সেই ঢাকায় যা হয়েছিল।

ঢাকায় থাকার সময়, হৈমন্তী তখন খুব ছোট, কাজলের দিদিমা একবার গভীর রাত্রে উঠিয়া ঘুমের মধ্যেই দোতলা হইতে একতলায় আসিয়া গিয়াছিলেন। গভীর রাত, কেহ কোথাও নাই, হঠাৎ

দিদিমা বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, বাবা এসেছেন—আমি দরজা খুলে দিই গে যাই। সুরপতি উঠিয়া পেছন পেছন গেলেন। দরজা খুলিয়া দেখা গেল, কিছুই নাই। তখনও দিদিমার ঘুম ভালো করিয়া ভাঙে নাই।

গল্প শুরু হইল। এক গল্প হইতে অন্য গল্পে যাইতে যাইতে ক্রমশ সন্ধ্যা হইয়া আসিল। জানালার বাহিরে দিনের আলো শেষ হইয়া আসিতেছে, ঘরের ভিতর এখনই আবছা অন্ধকার। হৈমন্তী গল্প থামাইয়া বলিল—যাই, সন্ধেটা দেখিয়ে আসি। দিদি বোধহয় চা করে ফেলল এতক্ষণে।

কাজল চুপ করিয়া ছিল। পুরাতন দিনের গল্প, সন্ধ্যার বিষণ্ণ অন্ধকার তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। উঠিতে গিয়া হৈমন্তী কী একটা মনে পড়িয়া যাইবার ভঙ্গিতে বলিল—একটা ব্যাপার হয়েছে, জানিস?

—কী?

—আজ ক'দিন ধরে দেখছি, যার কথা খুব ভাবি সে এসে হাজির হয়। বিয়ের আগে বকুলের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল, যাকে বলে গলায়-গলায় বন্ধুত্ব। তার বিয়ে হয়েছে কোন্নগরে। আজ দুপুরে বকুলের কথা খুব মনে পড়ছিল। ওমা, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, দুপুরেই বকুল এসে হাজির। বললে—বেড়াতে এসেছি, তোমাদের এখান থেকে ঘুরে গেলাম। দু'দিন আগে এলো উমা, তার কথাও ভাবছিলাম সেদিন।

কাজল হৈমন্তীর দিকে তাকাইল।

—যাকে দেখতে ইচ্ছে করছে, সে-ই এসে হাজির হচ্ছে?

হৈমন্তী মাথা নাড়িল।

কাজল দরজার উপরে বাবার ছবিটার দিকে তাকাইল। যদিও ঘর অন্ধকার, তবুও বাবার মৃদু হাসি ঠিক ধরা যায়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কাজলের স্কুল হইতে ফিরিবার পথে একটা দোকান পড়ে। ছাত্রেরা দোকান হইতে চকোলেট বিস্কুট কিনিয়া খায়। সেদিন কাজল দোকানটায় ঢুকিল। উদ্দেশ্য, বিশেষ এক ধরনের লজেন্স ক্রয় করা। একদিন খাইয়া ভালো লাগিয়াছিল, আবার কিনিবার জন্য সুরপতির নিকট হইতে পয়সা লইয়া আসিয়াছে।

দোকানদারকে সবাই আন্টি বলিয়া ডাকে। ওষ্ঠদেশে প্রলম্বিত গুম্ফযুক্ত একজন দশাসই পুরুষের উদ্দেশে কেন যে উক্ত বিদেশী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দটি প্রযুক্ত হয় বোঝা মুশকিল। তবে মানুষটি ওই ডাকে সাড়া দিয়া থাকে কোনো উষ্মা প্রকাশ না করিয়াই।

আন্টি কাজলকে লজেন্স গণিযা দিতেছে, এমন সময় দোকানের পিছন হইতে বেশ ভাল গলায় গাওয়া গান ভাসিয়া আসিল। কাজল জিজ্ঞাসা করিল—কে গান গাইছে আন্টি?

আন্টি বলিল—আপনাদের ইস্কুলেরই ছেলে, এখানে এসে বসে মাঝে মাঝে।

আন্টি তর্জনী আর মধ্যমা একত্রে ঠোঁটের কাছে ধরিয়া হুশ হুশ করিয়া ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিল।

কৌতূহলী কাজল দোকানের পিছন দিকে ঢুকিল।

জায়গাটা আন্টির শুইবার স্থান। দরমার বেড়া দিয়া ঘেরা, উপরে টিনের চাল। মেঝেয় কালি পড়া মেটে হাঁড়ি, এনামেলের সানকি, তোলা-উনান এবং ঘরের কোণে রাখা একটা প্যাকিং বাক্সে তৈল-তণ্ডুলাদি। একপ্রান্তের দড়ির খাটিয়ায় ময়লা কুটকুটে বিছানা, তাহার উপর বসিয়া একটি ফরসামত ছেলে চোখ বুঁজিয়া হাত সামনে বাড়াইয়া রীতিমত ওস্তাদি ঢঙে গান গাহিতেছে। কোনো যষ্ঠেন্দ্রিয় দ্বারা কাজলের উপস্থিতি বুঝিয়া সে গান থামাইল এবং চোখ খুলিয়া তাকাইল।

কাজল এবং ফরসা ছেলেটি কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকাইয়া রহিল। নীরবতা অস্বস্তিকর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া কাজল বলিল—গাও না, বেশ তো গাইছিলে।

ছেলেটি হাসিল। ময়লা বিছানার এক প্রান্ত হাত দিয়া ঝাড়িয়া বলিল—এখানে বসো।

এতক্ষণে কাজলের মনে পড়িয়াছে, ছেলেটি তাহাদেরই ক্লাসে অন্য সেকশনে পড়ে। আলাপ হয় নাই, দূর হইতে বারকয়েক দেখিয়াছে। কাজল জিজ্ঞাসা করিল—তুমি তো বি-সেকশনে পড়ো, না? তোমার নাম কী?

ছেলেটি মাথা পিছনে হেলাইয়া, চোখ অর্ধনিমীলিত করিয়া গম্ভীর গলায় বলিল—আমার নাম ব্যোমকেশ চৌধুরী।

তাহার ভঙ্গি দেখিয়া সন্দেহ হইতে পারিত সে বলিতেছে—আমার নাম নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

কাজল বুঝিল একটি অদ্ভুত চরিত্রের সহিত তাহার পরিচয় হইতে চলিয়াছে। সে আন্টিব বিছানায় বসিল।

—তুমি কী গাইছিলে? সুন্দর সুর।

—মালকোষ গাইছিলাম, বেশ মেজাজ আসে গাইলে।

কাজল অবাক হইল। এ অঞ্চলে রবীন্দ্রসংগীতই কেহ গায় না, তার উপব রাগসংগীত।

—তুমি গান শেখো?

—ছোড়দা শেখে। ছোড়দা ওস্তাদেব কাছে শেখে, আমি ছোড়দাব কাছে শিখি। কাজেই আমিও শিখি বলতে পারো। তুমি সিগারেট খাও?

খাওয়া দূরেব কথা, কাজল কল্পনাও করিতে পাবে না।

—আমিই খাই তবে।

পকেট হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া আন্টিব বিছানার নিচ হইতে ব্যোমকেশ দেশলাই বাহির করিল। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল—আমাদেব দেশ বগুলায়। বগুলার নাম শুনেছো? বগুলার কাছেই কুমারী রামনগর গ্রামে আমাদেব বাড়ি। বাবা ডাক্তাব। তোমাব বাড়ি কোথায়?

—আমাদের দেশ নিশ্চিন্দিপুবে, সেও গ্রাম। বাবা মাবা যাওযাব পর এখানে মামাবাড়িতে থাকি।

—রবি ঠাকুরের কবিতা কেমন লাগে?

কাজল বিপদে পড়িল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাহার খুব বেশি পড়া নাই, দুই-একটা যাহা পড়িয়াছে, সম্পূর্ণ মানে বোঝে নাই। বলিল—বেশি তো পড়ি নি, যা পড়েছি বেশ লেগেছে।

অনেক কথাবার্তা হইল। কাজল দেখিল, ব্যোমকেশ একটু ছিটগ্রস্ত। মনের খুশিতে ঘোরে, গান গায়, বই পড়ে। মাঠে মাঠে ঘুরিয়া গাছপালা চিনিয়া বেড়ায়। এমন সব গাছপালাব নাম করিল, যাহা কাজল চিনিলেও অনেক শহুরে ছেলে নামও শোনে নাই। উঠিবার সময়ে আড়মোড়া ভাঙিয়া বলিল—তাও কতকিছু ভুলে যেতে বসেছি। গ্রামে থাকতে অনেক কিছু জানতাম—

—গ্রাম ছেড়ে এলে কেন?

—ছোড়দা এখানে চাকরি করে। ছোড়দার কাছে থেকে পড়ি। বাবার একার আয়ে চলে না। নতুন পাস-করা ভালো ভালো সব ডাক্তার গিয়ে বাবার পসার মাটি করেছে। বাবা খুব তেজী লোক ছিলেন, জানো? অনেকদিন আগে সেটেলমেন্টের লোক জমি জরিপ করতে গিয়েছিল—সঙ্গে ছিল এক সায়েব। সে কঠিন অসুখে পড়লে বাবা চিকিৎসা করে তাকে সারিয়ে তোলেন। সায়েব বলেছিল বাবাকে বিলেতে নিয়ে যাবে। এক রাত্তিরে বাবা তো পালিয়ে যাওয়ার মতলব করলেন। বাবার বয়স তখন সাতাশ-আটাশ, রক্ত গরম। কথা ছিল মাইল দশেক দূরে এক জায়গায় দেখা করার, সেখান থেকে সায়েব বাবাকে নিয়ে চলে যাবে। ঠাকুমা কী করে জানতে পেরে আগে থেকে রাস্তায় গিয়ে

দাঁড়ালেন। বাবা ঘোড়ায় চেপে বাড়ির পাশে বড়ো আমবাগানটা পার হচ্ছেন, ঠাকুমা এসে পড়লেন একেবারে ঘোড়ার সামনে। বললেন—হবু, যেতে হয় আমার উপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে যা। বাবার আর বিলেতে যাওয়া হল না।

পরের দিন আবার দেখা হইবে বলিয়া কাজল বিদায় লইল।

ব্যোমকেশের সহিত কাজলের ঘনিষ্ঠতা বেশ বাড়িয়া উঠিল। দুইজনে শহর ছাড়াইয়া গ্রামের দিকে বেড়াইতে যায়, কাঁঠালিয়া গ্রামের আখের আলির বাড়ি যায়। ব্যোমকেশ মাঠের মধ্যে হাত পা নাড়িয়া গান করিতে করিতে হাঁটে। কখনও বৃষ্টি আসিলে দুজনে দৌড়াইয়া চাষীদের ধান পাহারা দেওয়া চালার নিচে আশ্রয় নেয়। বৃষ্টি দেখিতে দেখিতে ব্যোমকেশ একটা সিগারেট ধরাইয়া বলে—' চমৎকার বৃষ্টি, গাইতে ইচ্ছে করছে। দেশ আর মল্লার—এ দুটো ঝম ঝম বৃষ্টিতে ভারি জমে, বুঝলে?

কোথায় একটা পাখি ডাকিয়া ওঠে—কুউ-কুউ-কুউ-কুউ। স্বরটা খাদ হইতে আরম্ভ হইয়া চড়ায় গিয়া শেষ হয়। ব্যোমকেশ বলে—বর্ষাকোকিল ডাকছে, শুনছো?

কাজল ডাকটা আগেও শুনিয়াছে, কিন্তু পাখির নামটা যে বর্ষাকোকিল তাহা জানিত না। সে বলিল—বর্ষার কোকিল আছে নাকি আবাব?

—নেই তো ওটা কী ডাকছে?

চারিদিকে বুক সমান ধানগাছ দেখাইযা ব্যোমকেশ বলে—রামনগরে এইরকম ধানক্ষেতে বর্ষার দিনে আমাকে একবার সাপে তাড়া করেছিল। টিপ টিপ বৃষ্টি হচ্ছে, আলের ওপর দিয়ে হাঁটছি, এমন সময় ধানগাছের ভেতর থেকে বিরাট এক কেউটে এসে আলের ওপর উঠল। কী তার ফোঁসফোঁসানি, কী তার কুলোপানা চক্কর! নেহাত আমার কাছে বেদের দেওয়া সাপের ওষুধ ছিল, তাই বেঁচে গেলাম।

—কী করলে ওষুধ দিয়ে?

—ওষুধ একরকম শেকড়। সাপের ভয়ে তাই সবসময পকেটে নিয়ে ঘুরতাম—আমাদের ওদিকে ভীষণ সাপের উপদ্রব কিনা। ছোবল মারবে বলে সাপটা যেই ফণা তুলেছে, অমনি শেকড়টা সামনে বাড়িয়ে দিলাম। সাপ মাথা নিচু করে চলে গেল, না কামড়ে।

স্কুল-জীবনে ব্যোমকেশ কাজলের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল—একমাত্র বন্ধু। পরে অবশ্য যোগাযোগ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিন দিন পরীক্ষা দিবার পর ব্যোমকেশ আর আসিল না। কে আসিয়া বলিল—স্কুলে আসিবার সময়ে সে দেখিয়াছে ব্যোমকেশ মাঠেব ধারে বসিয়া গান গাহিতেছে, পাশে খাতা-কলম-দোয়াত।

পরীক্ষা হইয়া যাইবার পব কাজল ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা কবিয়াছিল, তুই পরীক্ষা দিলি না কেন?

ব্যোমকেশ হাসিল। পরীক্ষা দিবে বলিয়াই খাতা-কলম লইয়া সে বাহির হইযাছিল, পথে মাঠের দৃশ্যটা এমন ভাল লাগিয়া গেল যে বসিয়া একটা গান না গাহিয়া সে পারে নাই। গানটা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হওয়ায় দেড়ঘণ্টা সময় পার হইয়া গিয়াছিল।

ব্যোমকেশ কোনদিনই প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করিতে পারে নাই। বৎসর চারেক বাদে একদিন কাজলের সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল—তখন ব্যোমকেশের খুব দুঃসময় যাইতেছে। পড়াশুনা হয় নাই, চাকরি পায় নাই। বাবা মারা গিয়াছেন, দাদার সংসারে অনটন—সেখানে বসিয়া বসিয়া খাওয়া ভাল দেখায় না। শুষ্ক মুখে চাকরির সন্ধানে ঘুরিতেছে। আর গান গায় না, আগের সে প্রাণোচ্ছলতা নাই। কাজলের খুব খারাপ লাগিতেছিল, কিন্তু করিবার কিছু ছিল না।

প্রথম আলাপের মাসখানেক বাদে একদিন বিকালে ব্যোমকেশ কাজলের বাড়িতে আসিল। কাজল ঘরে বসিয়া পড়িতেছে (পাঠ্য নহে—অপাঠ্য বই), হৈমন্তী আসিয়া বলিল—বুড়ো, তোকে কে ডাকছে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, ভেতরে আসতে বললাম, এলো না।

কাজল বাহির হইতেই ব্যোমকেশ বলিল—খুব বেশি হলে পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া যেতে পারে। চট করে একটা জামা গলিয়ে বেরিয়ে পড়বি। দেরি করিস্ না, যা—

—কিন্তু যাবোটা কোথায়?

—সে সব পরে। আগে বেরিয়ে আয়।

বাহির হইয়া ব্যোমকেশ বলিল—বিপুলগড়ের শিবমন্দিরে যাবো, চল্। যাবো যাবো করছিলাম, আজকে মনস্থির করে ফেলেছি।

—বিপুলগড়ে যাবি এখন? তোর কি মাথা খারাপ?

—মেলা বকিস না। খুব মজা হবে, দেখবি।

বিপুলগড় কাঁঠালিয়া ছাড়াইয়া অনেক দূর। গ্রামের বাহিরে জঙ্গলের ভিতরে একটা পোড়ো শিবমন্দির আছে। দিনের বেলাও কেহ সেখানে যায় না। কারণ প্রথমত ঘন জঙ্গল, দ্বিতীয়ত মন্দিরে আকর্ষণীয় কিছু নাই। বড়লোক জমিদার শখ করিয়া মন্দির বানাইয়াছিল—তাহারা সপরিবারে কলিকাতায় উঠিয়া গিয়াছে। সে প্রায় সত্তর বৎসর আগের কথা। তাহাদের বড়ো বাড়ির ভগ্নাবশেষ পাশেই পড়িয়া আছে—জঙ্গলাবৃত অবস্থায়।

কাজল একটু আপত্তি করিয়া বলিল—বৃষ্টি আসতে পারে, দেখছিস না আকাশে মেঘ। অমন জায়গায় যাওয়াটা উচিত হবে এখন?

—তবে থাক তুই।

ব্যোমকেশ সত্যই চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া কাজল দৌড়াইয়া তাহাকে ধরিল।

—রাগ করছিস কেন? চল, আমিও যাবো।

আকাশে মেঘ ছিল—আরও মেঘ চাপিয়া অন্ধকার হইয়া আসিল। ব্যোমকেশ বলিল—অ্যাড্‌ভেঞ্চারের পরিবেশ তো এই। মেঘলা দিন, জঙ্গলের ভেতরে পোড়ো মন্দির, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া। একেবারে পাঁচকড়ি দে'র গল্প, অ্যাঁ?

ততক্ষণে কাজলেরও ভাল লাগিতে শুরু করিয়াছে। ওয়াইড ওয়ার্লড ম্যাগাজিন পড়িয়া বহু দুর্গম দেশে সে মনে মনে অ্যাডভেঞ্চার করিয়াছে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা সুঁড়িপথে তাহারা ঢুকিল। বেলা আছে, কিন্তু মনে হইতেছে সন্ধ্যা নামিল বলিয়া। শিবমন্দিরের চাতালে উঠিয়া দুইজনে দাঁড়াইল। মন্দিরের মাথায় বটগাছ গজাইয়াছে, ভারি কাঠের দরজা ভাঙিয়া কব্জায় আটকাইয়া ঝুলিতেছে। চাতাল চৌকা টালি বসাইয়া তৈয়ারি, এতদিন বাদেও বেশ মসৃণ। একটুও শব্দ নাই কোন দিকে, বাতাসে একটা বন্য গন্ধ।

কাজল চাতালের উপর বসিয়া পড়িল। কয়েকটা কালো ডেয়ো পিঁপড়া এখানে ওখানে ঘুরিতেছে। ঠিক নিচেই কতকগুলি বনতুলসীর গাছ জড়াজড়ি করিয়া আছে। দূরে ভাঙা নাটমন্দির দেখা যাইতেছে। কাজল ভাবিতেছিল, এই জায়গাটা না জানি কত জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। দোলদুর্গোৎসবে কুলবধূরা ভিড় করিয়া পূজা দেখিত, ঝাড়লণ্ঠনের আলো প্রতিমার মুখে পড়িয়া ঘামতেল চকচক করিত। সন্ধ্যায় শাঁখ বাজিত, বৃদ্ধারা মালাজপ করিতেন। কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কেহ নাই, কিছু নাই। তাহাদের চিহ্ন পৃথিবী হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে সাক্ষী হিসাবে রহিয়াছে কেবল এই ভাঙা নাটমন্দির।

ব্যোমকেশ ডাকিল—অমিতাভ।

—কী?

—কী রকম একটা লাগছে না?

কাজল ব্যোমকেশের দিকে তাকাইল। ব্যোমকেশের মুখ গম্ভীর, যেন একটা ভয়ানক কিছুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

—কী রকম লাগছে মানে ?

—চারিদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব, তাই না? এমনি জায়গাতেই তো বহুদিনের মৃত আত্মারা নেমে আসে।

কাজল সমর্থন করিল। আসিয়াই জিনিসটা সে অনুভব করিয়াছে। বাতাসে রহস্যের গন্ধ। সাধারণত জীবনে যাহা ঘটে না, তাহা যেন এখানে এখনই ঘটিবে। কিছুদিন আগেই সে 'রিপ ভ্যান উইঙ্কল' পড়িয়াছে। ওই সুঁড়িপথটির বাঁক হইতে এখনি হাফমুন জাহাজের কোনো মৃত নাবিক বাহির হইয়া আসিলে সে বিন্দুমাত্র অবাক হইবে না।

ব্যোমকেশ বলিল—মন্দিরের ভেতরে ঢুকে দেখি চল—

ভিতরে বেশ অন্ধকার। ব্যোমকেশ পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া জ্বালিল। কাঠি পুড়িতে যতটা সময় লাগে তার মধ্যেই দেখা গেল, মন্দিরের ভিতরে কালো পাথরের শিবলিঙ্গ, তাহার মাথায় কয়েকটি ফুল। ঘরের ভিতরে আর কিছু নাই—দেওয়ালে একটা কুলুঙ্গি ছাড়া।

বাহিরে আসিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ব্যোমকেশ বলিল—একটু ভূপালী গাই।

কাজল হাঁটুর উপর থুতনি রাখিয়া শুনিতে লাগিল। ভূপালী রাগ ব্যোমকেশ ভালোই আয়ত্ত করিয়াছে। দরাজ গলায় ষড়জ লাগাইয়া আলাপ শুরু করিল। এমন সময় কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িল। গান থামাইয়া ব্যোমকেশ উপরদিকে তাকাইয়া বলি—বৃষ্টি এলো বলে মনে হচ্ছে।

কথা শেষ হইতে না হইতে ঝম ঝম বৃষ্টি নামিল। ব্যোমকেশ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—ঢোক মন্দিরে।

হুড়মুড় করিয়া তাহারা মন্দিরে ঢুকিল। বৃষ্টির তোড় প্রতি মুহূর্তে বাড়িতেছে। সাবধানে শিবলিঙ্গের স্পর্শ বাঁচাইয়া দুইজনে এক কোণে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। দরজার ফ্রেমে আটকানো বাহিরের বনজঙ্গল, মন্দিরের চাতালের কিয়দংশ প্রচণ্ড বৃষ্টিতে অদ্ভুত দেখাইতেছে। কাজল বলিল—মুশকিল হল, এখন ফিরবো কী করে?

—ফেরবার তাড়া কীসের ? বেশ তো লাগছে। ব্যোমকেশের গলা স্বপ্নালু।

বৃষ্টি কমিল না। জোলো হাওয়া এক একবার ভীষণ দাপটে দরজার ভাঙা পাল্লাটাকে খটখট করিয়া নাড়িতেছে। বাতাসের জোর খুব বাড়িয়াছে, অত ভারি পাল্লাটা নাড়িতেছে তখন। মাঝে মাঝে বৃষ্টির ছাঁট আসিয়া পড়িতেছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত শীত করিতে লাগিল।

ঘরের ভিতর কিছু দেখা যায় না, ঘন অন্ধকার। ব্যোমকেশ বলিল—যখন আলো জ্বাললাম, ঠাকুরের মাথায় ফুল দেখেছিলি অমিতাভ?

—হুঁ।

—তার মানে, রোজ কেউ পুজো করে যায়। কুলুঙ্গিতে কী আছে দেখি দাঁড়া, মানুষ এখানে আসে যখন—

একটু পরেই অন্ধকারের ভিতর আবার ব্যোমকেশের গলার স্বর—কী পেলাম বল তো?

—কী?

—মোমবাতি। দাঁড়া জ্বালি। মোমবাতির সঙ্গে আরও একটা জিনিস আছে। গাঁজার কল্‌কে।

মন্দিরে অতএব শিবভক্তদের আনাগোনা প্রমাণিত হইল। কাজলের হাসি পাইতেছিল। মোমবাতি জ্বালাইয়া সেটাকে কোণের দিকে রাখিয়া ব্যোমকেশ গান ধরিল—দেশ রাগে।

বাহিরে হাওয়ার মাতামাতি—অন্ধকার, ভিতরে মোমবাতির কাঁপা কাঁপা স্বল্প আলো, তাহার সহিত ব্যোমকেশের গান। কাজল ভুলিয়া গেল বাড়ি ফিরিতে আজ অনেক দেরি হইবে, মা ভাবনা করিবে। ভুলিয়ে গেল যে স্থানে তাহারা বসিয়া আছে, তাহা আদৌ নিরাপদ নহে। রোমাঞ্চকর পরিবেশ তাহাকে সব ভুলাইয়া দিয়াছিল।

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কাজল বাহিরে তাকাইল। ভাঙা নাটমন্দিরের দিকটা একেবারে ভূতের দেশ বলিয়া মনে হইতেছে। বিদ্যুৎ চমকাইলে চারিদিক পলকের জন্য আলোকিত হইয়া উঠিয়াই

আবার আবছা অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে। দরজার দুইদিকে হাত রাখিয়া সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

একনাগাড়ে প্রায় চার ঘণ্টা বৃষ্টি হইয়া তারপর থামিল। ব্যোমকেশ আর কাজল পাশাপাশি হাঁটিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল। কাহারও মুখে কথা নাই। এই চার ঘণ্টার অভিজ্ঞতা তাহাদের প্রাণ পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। মেঘ জমিয়া আছে, তবে বৃষ্টি নামিবার আপাতত আর আশঙ্কা নাই।

রাত্রে কাজল চোরের মতো বাড়িতে পা দিল, তখন তাহাকে খুঁজিবার জন্য লোক বাহির হইয়া গিয়াছে।

একদিন কানে আসিল খঞ্জনীর বাজনা—কে যেন খঞ্জনী বাজাইয়া গান গাহিতেছে। মানুষটাকে কাজলের চেনা লাগিল, তারপরই দৌড়াইয়া লোকটির কাছে গিয়া ডাকিল—রামদাস কাকা!

রামদাস প্রথমে কাজলকে চিনিতে পারে নাই। একটু পরেই প্রসন্ন হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া গেল। পুরাতন দিনের অভ্যাসমত খঞ্জনীটা একবার দ্রুত বাজাইয়া বলিল—খোকনবাবা না? তুমি এখানে কোথায়? তোমাকে মাধবপুরের মাঠে দেখেছিলাম—

কাজল তাহাকে সমস্ত ঘটনা বলিল, শুনিয়া রামদাস অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরে গলা সাফ করিয়া বলিল—বাবার সঙ্গে দেখা হলো না, আমারই দোষ। তোমাকে কথা দিয়েছিলাম তোমাদের বাড়ি যাবো—গিয়ে উঠতে পারি নি।

কাজল দেখিল রামদাস একই রকম আছে, বিশেষ বদলায় নাই। কথায় কথায় হাসে, কথায় কথায় খঞ্জনী বাজায়। অপুব মৃত্যুর কথা শুনিয়া সে একটুখানি গম্ভীর হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই হাসিয়া বলিল—আমারই বা আর ক'দিন খোকনবাবা? তাঁর নামেই জীবন, তাঁর নামেই মৃত্যু। নিজের নামে কিছু রাখলেই যত বখেড়া এসে জোটে। বেশ তো আমি তাঁর নাম করে—

কাজল বলিল—তুমি আজ আমাদের বাড়ি যাবে চলো, কোনো কথা শুনবো না।

—কিন্তু আজকাল আমি একবেলা আহার করি, ওবেলা একবার হয়ে গেছে।

—মিষ্টি খাবে চল, তাতে দোষ নেই। মা তো একাদশীর দিন মিষ্টি খান।

—মিষ্টি খাওয়া যায় হয়তো, কিন্তু অত হাঙ্গামায় কী দরকার ? খাওয়াটাই সব নয়, তার চেয়ে কোথাও বসে একটু কথা বলি তোমার সঙ্গে।

কাজল কিছুতেই শুনিল না, রামদাসকে ধরিয়া বাড়ি লইয়া গেল।

হৈমন্তী যত্ন করিয়া আসন পাতিয়া বসাইয়া তাহাকে খাওয়াইল। খাইতে পাইয়া রামদাস ছেলেমানুষের মতো খুশি হইল। খাইবে না খাইবে না করিয়া অনেকগুলি মণ্ডা খাইয়া ফেলিল। হৈমন্তী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—আর দেবো বাবা?

রামদাস ব্যস্ত হইয়া বলে—আর না, আর না। খোকনবাবা, এবার তুমি খাও—

—আমি খেয়েছি কাকা, চলো তোমার সঙ্গে বরং একটু ঘুরে আসি।

বাহির হইবার আগে হৈমন্তী রামদাসকে বেশ বড়রকমের একটা সিধা আনিয়া দিল। সিধার চালের উপর একটা টাকাও আনিয়াছে। রামদাস হাসিয়া বলিল—এত সব কার জন্যে?

—এ আপনাকে নিতে হবে বাবা, সামান্য দিয়েছি।

—শ্রদ্ধার দান মাত্রেই অসামান্য, সামান্য নয়। কিন্তু এ তো আমি নিতে পারবো না।

—কেন বাবা?

—প্রয়োজন মতো আমি ভিক্ষা করি, প্রয়োজনের অধিক কখনও নিই না। তাতে আর একজনের অন্নে ভাগ বসানো হয়। আজ ভিক্ষা করে কালকের মতো চাল পেয়ে গেছি—আজ আর নেবো না।

বহু অনুরোধেও রামদাস রাজি হইল না। রাস্তায় বাহির হইয়া কাজলকে বলিল—নিলে কেবল লোভ বাড়ে, লোভ বড়ো খারাপ জিনিস খোকনবাবা।

লোভ কথাটা উচ্চারণ করিবার সময় সে এমন ভাব করিল যেন সামনে সাপ দেখিয়াছে।

কাজল বলিল—তোমাকে যদি এখন কেউ এক লাখ টাকা দেয়, তাও নেবে না?

—কী করবো নিয়ে? তাতে আমার মনের শান্তি চলে যাবে, সব সময়ে ভালো খেতে ভালো পরতে ইচ্ছে হবে। রাত্তিরে জেগে বসে থাকতে হবে, পাছে চোরে টাকা নিয়ে যায়। এই করে করে যখন বুড়ো হব, তখন হঠাৎ একদিন দেখবো আমার এক লাখ টাকা কবে জমার খাতা থেকে খরচের খাতায় চলে গেছে, জমার খাতায় মস্ত বড়ো একটা শূন্য। না না, খোকনবাবা, তিনি আমাকে যেন কখনও টাকাপয়সা না দেন—সে আমি সহ্য করতে পারবো না, মরে যাবো।

কাজলের রামদাসের প্রতি শ্রদ্ধা হইল। সে বলিল—কিন্তু সারাজীবন এই ভাবে ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়াতে তোমার ভালো লাগবে? শেষ জীবনে একটা আশ্রয় তো দরকার—

রামদাস মৃদু মৃদু খঞ্জনী বাজাইতে বাজাইতে বলিল—ছন্নছাড়া! আমাকে ছন্নছাড়া বলছো, তোমার সাহস তো কম নয় বাবাজী। আমাকে তিনি যেমন রেখেছেন, তেমনি আছি। তিনি যেমনভাবে যেখানে খেলা শেষ করতে বলবেন, সেখানে তেমনিভাবে খেলা শেষ করে দেবো। তাঁর হাতে আছি—তার মধ্যে আবার খারাপ ভালো কী?

কাজলের পক্ষে যদিও রামদাসের দর্শনের গভীরে প্রবেশ করা সম্ভবপর হইল না, তবুও তাহার কথা কাজলের ভালো লাগিতেছিল। সহজ বিশ্বাসের সুরটি তাহার হৃদয় অধিকার করিতে বেশি সময় নেয় নাই।

কাজল বলিল—এর মধ্যে অনেক ঘুরেছ তুমি, না? গল্প বলো না শুনি।

হ্যাঁ, এই চার বৎসরে রামদাস অনেক ঘুরিয়াছে, অনেক নূতন জায়গা দেখিয়াছে। একস্থানে সে বেশিদিন থাকিতে পারে না, প্রাণ পালাই পালাই করে। দুনিয়াটা যদি ঘুরিয়াই না দেখিবে, তবে ঈশ্বর তাহাকে চোখ দুইটা দিয়াছেন কী প্রয়োজনে?

একবার তাহার এক সাকরেদ জুটিয়াছিল। সে জোগাড় করে নাই, লোকটা জুটিয়া গিয়াছিল। ভক্তিভাবের কথা বলে, গদ্‌গদ কণ্ঠস্বর। দিন সাতেক ছিল সঙ্গে। এক শহরে কোন এক বড়লোকের বাড়ি গান করিয়াছিল রামদাস। তাহারা খুশি হইয়া রামদাসকে একখানা নূতন কাপড় দিয়াছিল। রাত্রে সামান্য আহার করিয়া দুইজনে একটা হাটচালায় শুইয়াছিল। পরদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখে সাকরেদটি উধাও—নূতন কাপড়খানাও নাই।

কাজল বলিল—তুমি কী করলে তখন?

—কী আবার করবো? ভারি দুঃখ হল মনে। কাপড়টা চেয়ে নিতে পারতো আমার কাছ থেকে, আমি দিয়ে দিতাম। অনর্থক চুরি করে সে পাপের ভাগী হল।

—তোমার রাগ হল না?

—না বাবাজী। তার নিশ্চয়ই আমার চেয়ে বেশি দরকার ছিল, নইলে সে নেবে কেন? তবে আমাকে বললেই পারতো। মানুষের অসাধুতা দেখলে বড়ো কষ্ট পাই মনে। কী লাভ অসাধুতায়! সেই তো একদিন সবকিছু ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে চিরদিনের জন্য, তবে আর কেন পেছনে কুকীর্তি রেখে যাওয়া?

রামদাস বিদায় লইবার আগে কাজল তাহাকে বলিল—তুমি মাঝে মাঝে আসবে তো রামদাস কাকা? আমাদের বাড়ি তো চেনা হয়ে গেল।

—বলতে পারি না বাবাজী। কখন কোথায় থাকি তার তো ঠিক নেই। আজ এখানে আছি, কাল থাকব আর এক জায়গায়। দেখো না, সেই মাধবপুরের মাঠের পর আবার কতদিন বাদে আমাদের দেখা হল।

—তুমি বোধ হয় কাউকেই বেশি ভালোবাসো না রামদাস কাকা, তাহলে কি না দেখে থাকতে পারতে? খালি ঘুরে ঘুরে বেড়ালে আর একজনকে ভালোবাসা যায়?

প্রশ্নটা শুনিয়া রামদাস কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেল, আনমনে খঞ্জনীতে টিন-টিন আওয়াজ তুলিতে লাগিল। কাজল বলিল—সত্যি কথা বলিনি, কাকা?

মুখটা এদিকে ফিরাইয়া রামদাস বলিল—একজনকে ভালোবাসার জন্য তো জীবনটা নয় বাবাজী, আমি চেয়েছিলাম সবাইকে ভালোবাসতে। তা আর হল কই? একজনকে ভালোবাসলে জীবনটা বড়ো ছোট হয়ে যায়। কিন্তু সবাইকে ভালোবাসার মতো হৃদয়ও তো ভগবান আমাকে দেননি, কী করি তুমিই বলো?

একটু চুপ করিয়া রামদাস বলিল—এখন মনে হয় গাছ নদী ফুল ফল সবকিছুর ভেতরেই আলাদা করে দেখবার মতো রূপ আছে, এমন কী পাথবের মধ্যে মাটির মধ্যে আলাদা সত্তা—আমি তাই দেখি। কী পেলে চাওয়া আমার পূর্ণ হয় তা আমি এখনও জানি না, তারই সন্ধানে ঘুরে বেড়াই।

অপুর শেষ উপন্যাসটা পাঠকমহলে আলোড়ন আনিয়াছিল। জীবনকে এত বিচিত্রভাবে অন্য কোনো লেখক দেখেন নাই—এই বলিয়া বড়ো বড়ো কাগজে সমালোচনা বাহির হইল। নূতন উপন্যাসখানির কাটতি অত্যন্ত বেশি, অন্যান্য বইও ভালো চলিতেছে। অপুর মৃত্যুর পর পাঠকেরা হঠাৎ যেন তাহাকে লইয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে।

বইপত্র হইতে আয়ের হিসাব এবং টাকাকড়ি আদায় ইত্যাদি এখন সুরপতি ও প্রতাপ করিয়া থাকে। হৈমন্তীর ভাঙা সংসারের হাল সুরপতি এখন শক্ত হাতে ধবিয়াছেন। মেয়েকে অভয় দিয়া বলিয়াছেন—তোর কোন ভয় নেই, হৈম, কাজলের ভবিষ্যতের ভার আমার হাতে রইল।

গ্রীষ্মে প্রখর রৌদ্র পৃথিবীটাকে পোড়াইয়া খাক্ করে, বর্ষায় ঝর ঝর করিযা বৃষ্টি পড়ে অদৃশ্য হস্তনিষিক্ত শান্তিবারির মতো। হেমন্তে শিশির পড়ে, শীতে কুয়াশা পাক খায়—সমস্ত হৈমন্তী জানালায় বসিয়া দেখে। যে দেখিতে শিখাইয়াছিল, সে নাই।

কলিকাতা হইতে প্রথম প্রথম যখন প্রকাশকদেব নিকট হইতে অপুর লেখার জন্য মনি অর্ডার আসিত এবং হৈমন্তীকে সই করিয়া টাকা লইতে হইত, তখন হৈমন্তীর চোখে জল আসিত। সে যেন খালি টাকা চাহিয়াছিল! এ সব লইয়া সে কী করিবে? শেষ বইটা এত নাম করিল, অপু দেখিয়া গেল না। স্বামীর এত সুনাম এত যশ লইয়া সে এখন কী করিবে?

সুরপতির দৃঢ় বিশ্বাস কাজল বড়ো রকমেব একটা কিছু হইবে। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট করিবার দিকে তাঁহার তেমন ইচ্ছা নাই, তিনি চান অপুর মতো কাজলও একটা স্থায়ী কিছু করুক। সন্ধ্যায় পড়াইতে পড়াইতে তিনি ডাক দেন—হৈম, একবার শুনে যা এদিকে।

হৈমন্তী আসিয়া বলে—কী বাবা?

—দেখ্ কাজল এই ইংরেজি এসেটা কী সুন্দর লিখেছে! বানান ভুল, ব্যাকরণের ভুল একটাও নেই। আমি বলে দিচ্ছি হৈম, এ ছেলে বংশের নাম উজ্জ্বল করবে।

—আশীর্বাদ করো বাবা, তাই যেন হয়।

হৈমন্তী নিজের ঘরে ফিরিয়া জানালার কাছে দাঁড়ায়। বাহিরে ঘন অন্ধকার। ওই অন্ধকারের ভিতর সুরপতি আলোর প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কাজল মানুষ হইতেছে, সুরপতি বলিয়াছেন কাজল বড়ো হইবে।

ছেলেবেলা হইতে হৈমন্তী বাবাকে বড়ো বিশ্বাস করে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

স্কুল হইতে বাহির হইয়া কাজল রিপন কলেজে ভর্তি হইল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সে খুব ভালো ফল করিয়াছিল—বিশেষত ইংরেজিতে। যে কোনো অধিকতর অভিজাত কলেজে সহজেই সে ভর্তি হইতে পারিত, কিন্তু একরকম জিদ করিয়াই রিপনে ভর্তি হইল।

কাজল একদিন আদিনাথবাবুকে প্রণাম করিতে গেল। আদিনাথবাবু আদর করিয়া তাহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন। কাজল বলিল—আশীর্বাদ করুন সার, যেন মানুষ হতে পারি। সবাই বলছে রিপনে ভর্তি না হয়ে প্রেসিডেন্সি বা অন্য কোথাও যাওয়া উচিত ছিল।

আদিনাথবাবু চশমা খুলিয়া কোঁচার প্রান্তে কাচ পরিষ্কার করিতে করিতে বলিলেন—মানুষ হওয়া তোর কেউ আটকাতে পারবে না অমিতাভ। অনেকদিন ধরে শিক্ষকতা করছি, চুল পেকে গেছে—আমি মানুষ চিনি। তোর মধ্যে ক্ষমতা আছে, সেটা নষ্ট হতে দিস্ না। চশমা মুছিবার পর, না পরিয়া অনেকক্ষণ সেটা হাতে ধরিয়া রাখিলেন। অন্যদিকে তিনি তাকাইয়া আছেন। হঠাৎ তাঁহাকে যেন বেশি বৃদ্ধ দেখাইতে লাগিল। কাজল ভাবিল—বড্ড বুড়ো হয়ে গেছেন সার, বয়সের তুলনায়। চোখের নিচে কালি পড়ে গিয়েছে। একা মানুষ, কত আর খাটবেন!

মুখ ফিরাইয়া আদিনাথবাবু বলিলেন—কত আশা ছিল বড়ো হবো, নাম করবো। সেই ভাবেই জীবনটাকে তৈরি করবার চেষ্টা করেছিলাম। তারপর সংসারের ঘানিকলে বাঁধা পড়ে ঘুরছি তো ঘুরছিই। বিলেত যাবার খুব ইচ্ছে ছিল। সে কথা মনে পড়ে হাসি পায়। কত চিন্তা করেছি, রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে ভেবেছি পালিয়ে চলে যাই। কিন্তু ততদিনে বড় খোকা হয়েছে। আটকা পড়ে গেছি। আর যাওয়া হল না।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া আদিনাথবাবু বলিলেন—জীবন তো প্রায় শেষ হয়ে এলো অমিতাভ।

কাজল জানে মাস্টারমশাই খুব দুঃস্থ—মেয়ের বিবাহে সব টাকা জোগাড় করিতে না পারিয়া চড়া সুদে ধার করিয়াছিলেন, এখনও তাহা শোধ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বামুনপাড়ার মতি মুখুজ্যে টাকাটা মাসিক দুই আনা সুদে ধার দিয়াছিল মওকা বুঝিয়া। আদিনাথবাবু অনুরোধ করিয়াছিলেন সুদের হার এক আনা করিতে—মতি মুখুজ্যে শোনে নাই। ইস্কুলে কে যেন তাহাকে বলিয়াছিল কথাটা। মতি মুখুজ্যের পাশাপাশি তাহার রামদাস বোষ্টমের কথা মনে পড়িল—দুইটি চরিত্রের অদ্ভুত বৈপরীত্যের জন্য।

আদিনাথবাবু কাজলের আপত্তি না শুনিয়া তাহাকে পেট ভরিয়া জলযোগ করাইয়া ছাড়িলেন।

কলেজ সম্বন্ধে কাজলের বিরাট ধারণা ছিল। স্কুলে সে ব্যোমকেশ ছাড়া মনের মতো সঙ্গী পায় নাই। ভাবিয়াছিল কলেজে তো কত ভালো ছাত্র পড়িতে আসে দূর দূরান্ত হইতে, একজনও কি তাহার পছন্দমত হইবে না? প্রতাপ বলিয়াছিল, এই মফঃস্বলে তোর বন্ধু হবে না কাজল—কলকাতার কলেজে যখন পড়বি, দেখবি কত ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র আছে দেশে।

—ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র দিয়ে কী করবো মামা? আমি চাই এমন বন্ধু, যে আমার মনের কথা বুঝতে পারবে, আমার মতো যে চিন্তা করবে।

—হলে কলকাতাতেই হবে।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখিল তাহা হইতেছে না। ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই নিরীহ, গোবেচারা। দু'একটি বড়লোকের ছেলে আছে—তাহারা গরমে আদ্দির পাঞ্জাবি, শীতে সার্জের কোট পরিয়া কলেজে আসে, কথায় কথায় সিগারেট খায় এবং পরস্পরের পিতার কাজকর্ম লইয়া আলোচনা করে। তাহাদের সহিত কথা বলিতে গিয়া কাজল বোকা বনিয়া ফিরিয়াছে, কাজলকে তাহারা গ্রাহ্যের মধ্যে

আনে নাই। মোটের উপর কাজল দেখিল গত কয়েক বৎসরে তাহার মানসিক বৃদ্ধি জ্যামিতিক হারে হইয়াছে, ফলে তাহার চারিধারে বহুদূর অবধি লোকজন নাই। অগত্যা সে লাইব্রেরিতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ছেলেবেলায় বাবার কাছে রিপন কলেজের লাইব্রেরির গল্প শুনিয়াছিল। প্রত্যেকটা বইয়ে যেন বাবার স্পর্শ লাগিয়া আছে। নানা বিষয়ে কৌতূহল থাকার দরুন লাইব্রেরির ভিতর সে যেন দিশাহারা হইয়া ওঠে। কোন্ বইটা ছাড়িয়া কোন্‌টা পড়িবে ঠিক করিতে পারে না। কতকগুলি পছন্দসই বই-এর লিস্ট করিয়া ফেলিল সে, এক এক করিয়া পড়িবে। এই ব্যাপারে তাহার কিছু সুবিধা ছিল, এমন সব বইয়ের সে স্লিপ দিত, যাহা সাধারণত কেহ নেয় না। দপ্তরী তাক হইতে বই পাড়িয়া তাহার হাতে আনিয়া দিলে সে ফুঁ দিতে দিতে বলে, বাব্বাঃ, বেজায় ধুলো জমে গেছে দেখছি!

দপ্তরী হাসিয়া বলিত—বহুকাল বাদে বেরুলো তো বাবু।

কাজল অবাক হইয়া যায়। এত ভালো বই কেহ পড়ে না কেন? তাহাকে যদি লাইব্রেরিতে থাকিতে দিত, দিনরাত সে মাদুর পাতিয়া বসিয়া বই নামাইয়া নামাইয়া পড়িত। চাকরি হইলে সে টাকা জমাইয়া ভালো লাইব্রেরি করিবে—বাড়িতে। মৌপাহাড়িতে গিয়া থাকিবে তখন, সেখানকার স্কুলে মাস্টারি কবিবে। কলিকাতা হইতে বই কিনিয়া একটা ঘর সে ভর্তি করিয়া ফেলিবে। দেওয়াল দেখা যাইবে না, শুধু আলমারি। সারাদিন বইয়ের মধ্যে কাটানো—উঃ! এত বেশি আনন্দ আর কীসে পাওয়া যাইতে পারে?

একবার কাজলের উর্দু শিখিবার শখ হইল। কী একটা বই পড়িতে পড়িতে সে মির্জা গালিবের দুইটা লাইন পাইয়াছিল। লাইন দুইটা তাহার এত ভাল লাগিল যে, ক্রমশ উর্দু কবিতা সংগ্রহ করা তাহার বাতিকে দাঁড়াইয়া গেল। কলেজে এক সহপাঠীকে সে উর্দু কবিতা আবৃত্তি কবিয়া শোনাইতেছিল, ছেলেটি তাহাকে উর্দু শিখিবার উপদেশ দেয়। কথাটা মনে ধরিল। অনেক সন্ধানের পর এক বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোককে পাওয়া গেল, তিনি সপ্তাহে তিনদিন সন্ধ্যায় কাজলকে উর্দু পাঠ দিতে বাজি হইলেন। সন্ধ্যাবেলা খাতা হাতে কাজল তাঁর কাছে গিয়া হাজির হয়। মালতীনগরের প্রান্তে এক মসজিদে তিনি থাকেন, সবাই মৌলবী সাহেব বলিয়া ডাকে। কাজল গেলে মৌলবী সাহেব হাসিয়া বলেন—সেলাম আলেকম্। ইহার প্রত্যুত্তরও কাজল তাঁহার নিকট হইতে শিখিয়া লইয়াছে—সে মাথা ঝুঁকাইয়া বলে, ওআলেকম্ সেলাম। মৌলবী সাহেব বুঝাইয়া বলিলেন, এটা হচ্ছে শুভেচ্ছা জানানো, ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা। একজন বলছে—তোমার ওপর ভগবানের আশীর্বাদ নেমে আসুক। অন্যজন বলছে—তোমার ওপরও ভগবানের আশীর্বাদ নেমে আসুক।

মৌলবী সাহেবের ছোট ঘরে মোমবাতি জ্বলে, মাদুরের উপর বসিয়া কাজল মনোযোগ দিয়া আপাত-বৈসাদৃশ্যহীন উর্দু অক্ষরের পার্থক্য বুঝিবার চেষ্টা করে। মৌলবী সাহেব হাঁ-হাঁ করিয়া বলেন—নেহি, নেহি—এয়সা করকে লিখ্‌খো, ইয়ে হম্‌জা নেহি হুয়া।

কখনও কখনও তিনি মূল ফারসী হইতে কাজলকে ওমর খৈয়াম পড়িয়া শোনান। বলেন—এই কবিতা অনেক গোঁড়া মুসলমান অপছন্দ করে। এতে নাকি অধর্মের কথা, ভোগবিলাসের কথা লেখা আছে। আমি কিন্তু তা মানি না, যা ভালো কবিতা, তা না পড়ে আমি থাকতে পারি না।

ওমর খৈয়াম শুনিয়া কাজলের এত ভালো লাগিল যে, সে একখানা ফিটজেরাল্ড্ অনূদিত রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম কিনিয়া ফেলিল, কেননা ফারসী বুঝিবার ক্ষমতা তাহার নাই। ওমর খৈয়ামের স্বপ্নিল জীবনরহস্য, মধ্যপ্রাচ্যের অতীত দিনগুলির রোম্যান্টিক অনুভূতি কাজলকে মুগ্ধ করিল। কী সুন্দর এক একটি ছোট কবিতা—

> They say the Lion and the Lizard keep
> The Courts where Jamshyd gloried and drank deep;
> And Bahram, that great hunter–the Wild Ass
> Stamps o'er his Head, but cannot break his sleep.

অনিবার্যভাবে মৃত্যু আসিয়া দাম্ভিক নৃপতি এবং বলদর্পী শিকারীকে চিরকালের মতো ঘুম পাড়াইয়া গিয়াছে, তাহাদের সমাধির উপরে বাড়িয়া ওঠা জঙ্গলের বন্য গর্দভের মাতামাতিও আর তাহাদের ঘুম ভাঙাইতে পারে না।

মৌলবী সাহেব বলেন—তাড়াতাড়ি শিখতে চেষ্টা করো, উর্দু সাহিত্যের ভেতরে ঢুকলে মুগ্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া উর্দু হয়ে গেলে ফারসী শেখাও বিশেষ আর কষ্টকর হবে না।

মেজাজ ভালো থাকিলে তিনি বলেন—আজ পড়া থাক—এসো, তোমাকে কিছু শের শোনাই। সম্রাট বাহাদুব শাহের লেখা কবিতা শুনবে? একেবারে শেষ জীবনে লেখা, শোনো—

উম্‌রে দরাজ মাঙ্‌কর লায়ে থে ইয়ে চার রোজ।
দো আরজুমে কাট্‌গয়ে, দো ইন্ত্‌জারমে॥

*　　　*　　　*

কিতনা হ্যায় বদনসীব জাফর দফ্‌নেকে লিয়ে।
দো গজ জমিন না মিল সকি ইস্‌ কুয়েয়ার মে॥

কিছুদিন যাতায়াত করিয়া কাজলের উর্দু শিখিবার উৎসাহ চলিয়া গেল। জটিল ব্যাকরণ এবং ততোধিক জটিল লিখন প্রণালী সে কিছুতেই আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অবশ্য উর্দু সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ তাহার থাকিয়াই গেল।

কলেজ হইতে ফিরিবার সময় একদিন কাজল কী কাজে কলেজ স্ট্রীটে গিয়াছিল। একটা পুরাতন বইয়ের দোকানে নজরে পড়িল, ডস্টয়েভ্‌স্কির ব্রাদার্স কারামাজভ্‌খানা। কাজল নগদ দেড় টাকা মূল্যে বইখানি হস্তগত করিয়া বাড়ি ফিরিল। খুব নাম শুনিয়াছে বইখানার—কিন্তু পড়িয়া ওঠা হয় নাই। বাড়ি ফিরিয়া সন্ধ্যায় অন্যদিনের মতো বেড়াইতে বাহির না হইয়া সে বিছানায় শুইয়া হ্যারিকেন কাছে টানিয়া পড়া শুরু করিল।

সে ভাবিয়াছিল নাম করা উপন্যাস যখন, প্রথম পাতা হইতেই গল্প খুব জমিবে। তাহা হইল না। পাতার পর পাতা পড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু রস যাহাকে বলে, তাহা ঠিক জমিতেছে না। শতখানেক পৃষ্ঠা পড়িয়া সে বিরক্ত হইয়া বই মুড়িয়া তুলিয়া রাখিয়া দিল। মাস আটেকের মধ্যে আর সে হাত দেয় নাই। একদিন কি খেয়াল হওয়ায় তাক হইতে নামাইয়া নূতন করিয়া পড়িতে শুরু করিল।

জমিয়া গেল।

কষ্ট করিয়া, তেতো ওষুধ খাইবার মতো করিয়া দুইশত পৃষ্ঠা পড়িবার পর বই আর হাত হইতে নামাইতে পারিল না। বৃহৎ পটভূমিতে জীবনকে এমনভাবে অঙ্কন করিতে সে অন্য কোনো শিল্পীকে দেখে নাই। বিশেষত দিমিত্রির চরিত্র তাহার কাছে অসাধারণ সৃষ্টি বলিয়া মনে হইল।

দিমিত্রির উন্মত্ততা, জীবনকে আকুল হইয়া জড়াইয়া ধবিবার চেষ্টা—এসব সত্ত্বেও দিমিত্রির পরিণতিতে কাজল কেমন মুহ্যমান হইয়া পড়িল। মনে হইল, জীবনটা এক অদৃশ্য শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাহা ঈশ্বর না, মানবিক কিছু নহে—বরং মানবিকতা বিরোধী।

জীবনকে ভালোবাসিবার পরিণতি যদি এই হয়, তবে বাঁচিয়া লাভ কী? ব্রাদার্স কারামজভ্‌ জীবনকে নূতন এক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিতে শিখাইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শীত আসিতেছে। সকালে ঘাসে আলগা শিশির লাগিয়া থাকে, শেষরাতের দিকে চাদর গায়ে টানিয়া দিতে হয়। সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঘরে উনানে আঁচ পড়িলে ধোঁয়া জমিয়া যায়, বাতাস না থাকায় ধোঁয়া সরে না। রাত্রে আকাশ একেবারে পরিষ্কার হইয়া যায়, মেঘ আসিয়া নক্ষত্রদের ঢাকিয়া দেয় না।

পাড়ায় পাড়ায় ধুনুরীদের হাঁক শোনা যায়—লেপ বানাবে নাকি মা-ঠাকরুন, বাছাই করা ভালো তুলো ছিল—

তারপর শীত আসিয়া গেল। কাজল শীত ভালোবাসে, শীত পড়িলে তাহার মনের ভিতরে একটা বড়ো রকমের ওলটপালট হয়। যে মন লইয়া সে গ্রীষ্ম উপভোগ করে, তাহা লইয়া কখনই শীতের রিক্ত রূপ উপলব্ধি করা যায় না। শীত আসিবার আগে হইতেই সে মনে মনে প্রস্তুতি চালাইতে থাকে, মনের জানালা হইতে পুরাতন পর্দা খুলিয়া নূতন পর্দা লাগায়, ফ্রেম হইতে ছবি খুলিয়া দেয় সেখানে নূতন ছবি লাগাইবে বলিয়া। হেমন্তের মাঠে মাঠে হাঁটিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে শীতের জন্য মন তৈয়ারি হইয়া ওঠে। খাইতে বসিয়া রান্নায় ধনে পাতার গন্ধ পাইলেই বোঝা যায় আর দেরি নাই।

ঠাণ্ডার মধ্যে মাঠে ঘুরিতে আলাদা আমেজ। মৃদু রৌদ্রে পিঠ দিয়া দূরে তাকাইয়া থাকিলে ক্রমশ মনটা উদাস হইয়া যায়। কলিকাতার কলরবের ভিতর সে নিজেকে ঠিক মেলিয়া ধরিতে পারে না—নিজের মনে বসিয়া চিন্তা করিবার অবকাশও সেখানে নাই। সমস্ত সপ্তাহ নগর জীবনের কোলাহলের মধ্যে কাটাইয়া একটা দিন শীতের মাঠে কাটাইতে ভালো লাগে। আল ছাড়াইয়া মাঠে নামিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে পায়ের নিচে মাটির ঢেলা গুঁড়াইয়া যায়, রৌদ্রদগ্ধ মাটি হইতে কেমন গন্ধ আসিতে থাকে—যে গন্ধ নিশ্চিন্দিপুরে ছোটবেলায় সে পাইত।

একদিন হাতকাটা সোয়েটারটা লইয়া কাজল কাঁঠালিয়ার মাঠে বেড়াইতে গেল। রৌদ্র তখন পড়িয়া আসিয়াছে, ঠাণ্ডা কিছুক্ষণ বাদেই হাড়ের ভিতর ছুঁচ ফুটাইতে আরম্ভ করিবে।

কাঁঠালিয়ার বাঁশবনটায় ঢুকিতে মনে হইল সে যেন স্বপ্নের রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। উৎসবের দিনে বাড়ির ছাদে সামিয়ানা খাটাইলে তাহার নিচে দ্বিপ্রহরেও যেমন একটা নরম আলো থাকে, বাঁশবনের ভিতরও তেমনি। না নড়িয়া চুপ করিয়া থাকিলে বাঁশপাতা ঝরিয়া পড়ার হালকা শব্দ শোনা যায়। বাতাস ক্রমেই ঠাণ্ডা হইতেছে, কিন্তু শীতের আমেজ জমাইবার জন্য কাজল সোয়েটার পরে নাই। একটা বাঁশের গায়ে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া সে অনুভব করে এ সমস্ত ছাড়িয়া সে বাঁচিতে পারিবে না। কলিকাতা তাহাকে প্রিয় বস্তু হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে।

পানাপুকুরের পাশ দিয়া কাজল আখের আলির বাড়ি গেল। আখের উঠানের কিছু অংশ লইয়া একটা মুদির দোকান দিয়াছে। জিনিসপত্র বেশি নাই, নূতন দোকান। ব্যস্ত হইয়া আখের তাহাকে একটা নড়বড়ে কাঠের টুলে বসিতে দিল। কাজল বসিয়া বলিল—কেমন আছ আখের ভাই?

—আমাদের আবার থাকা না থাকা, তুমি কেমন আছ সেইটেই বড়ো কথা। তুমি তো এখন কলেজে পড়ো, না?

—হ্যাঁ, আই-এ পড়ি।

—ক'বছর লাগে এটা পড়তে?

—দু'বছর। তারপর পাস করলে আবার দু'বছর লাগে বি-এ পড়তে।

—বাব্বাঃ! তোমাদের দেখছি সারাজীবন ধরে পড়া আর পড়া! পড়া শেষ হতে হতে তো বুড়ো হয়ে যাবে।

—পড়াশুনো না শিখলে চলবে না আখের ভাই, চাকরি তো করতে হবে।

আখের একটা বড়ো রকমের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তা তো বটেই। আমার মতো নয়, সারাটা জীবন এখানেই কাটল—কিছুই শিখতে পারলাম না।

—কতদিন আছ তোমরা এখানে?

—অনেকদিন হয়ে গেল, আমার ঠাকুরদার বাবা প্রথমে এই জায়গায় এসে বসতি করেন। আমারও সারাজীবন এই গ্রামে কাটল—বারকয়েক কলকাতায় গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু দেশ বেড়ানো যাকে বলে তা কিছুই হয়নি আমার কপালে।

এরপর আখের তাহাকে খাওয়াইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কাজল খাইবে না, সেও ছাড়িবে না। দোকানের টিন হইতে একটা ঠোঙায় করিয়া মুড়কি তাহার হাতে দিয়া বলিল—খাও, ভালো মুড়কি। নিজেদের খাবার জন্য রয়েছে, বিক্রির নয়।

আখেরের দোকান হইতে উঠিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। কিছুতেই সে ছাড়িতে চায় না। শীঘ্রই আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া কাজল মাঠের দিকে রওনা দিল। ঠাণ্ডা আর সহ্য করা যায় না, সোয়েটার গায়ে দিতে দিতে কাজল দেখিল, গোধূলির শেষ আলোকচ্ছটাও আকাশের গা হইতে মিলাইয়া গিয়াছে।

অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়া রোমাঞ্চকর যাত্রা। আকাশে চুমকির মতো অজস্র নক্ষত্রের ভিড়। জীবনটা যেন হঠাৎ শরীরের সংকীর্ণ পরিসর হইতে বাহির হইয়া দিক্‌হীন মহাশূন্যে মিশিয়া যাইতে চাহিতেছে। কাজলের মনে হইল, জীবন পৃথিবীর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে—পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছে বটে, কিন্তু পৃথিবী শেষ কথা হইতে পারে না। আপন অস্তিত্বকে সে মহাবিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া অনুভব করিতেছে—তাহা কি মিথ্যা?

কাজল আজকাল বুঝিতে পারিতেছে বাবার সহিত তাহার মানসিকতার একটা আশ্চর্য মিল আছে। বাবার উপন্যাসগুলি পড়িতে পড়িতে সে অবাক হইয়া ভাবে, এমন নির্ভুলভাবে তাহার মনের কথা বাবা লিখিল কী করিয়া? ছোটবেলায় সে যাহা ভাবিত, আকাশের দিকে তাকাইলে তাহার মনে যে ভাব হইত, সব বাবা হুবহু লিখিয়াছে।

কাজল জানে, জীবন সাধারণভাবেই কাটিয়াছে। বাবা দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া, প্রতিপদে সংগ্রাম করিয়া তবে মানুষ হইয়াছিল। সে কিন্তু জন্মের পরে খুব একটা অসচ্ছলতা দেখে নাই, দারিদ্র্যের ভিতর যে কল্যাণস্পর্শ আছে তাহা সে কখনও অনুভব করে নাই। মাঝে মাঝে কাজলের মনে হয়, কিছুই তাহার বলিবার নাই। ইঁট-কাঠ-পাথরের ভিতর বাস করিয়া কিছু বলিবার থাকিতে পারে না। তবু এ কথাও মিথ্যা নয় যে তাহার তীক্ষ্ণ অনুভূতি তাহাকে অনেক রহস্যের সম্মুখীন করিয়াছে। জীবনের ভিতরও আর একটা গভীরতর জীবন আছে, তাহা সে বুঝিতে পারে। কী করিয়া সে এসব কথা না বলিয়া পারিবে?

একটা খাতায় দুইটি গল্প লিখিয়া সে বন্ধুদের পড়াইয়াছিল। কলেজের বন্ধুদের (মনের মিল বেশি না থাকা সত্ত্বেও দুই-একটি বন্ধু তাহার হইয়াছে) মধ্যে অনেকেই তাহার বাবার ভক্ত। তাহারা গল্প দুইটা আদ্যোপান্ত শুনিয়া বলিল—ভালোই হয়েছে, মন্দ কী। তবে ব্যাপার কী জানো, লেখার মধ্যে তোমার বাবার প্রভাব বড্ড বেশি।

কাজল মহা হাঙ্গামায় পড়িয়াছে। সে ইচ্ছা করিয়া বাবার বই দেখিয়া নকল করিতেছে না। তাহার চিন্তাধারার সহিত বাবার চিন্তাধারা মিলিয়া গেলে সে কী করিতে পারে?

প্রকাণ্ড মাঠের অর্ধেক পার হইয়াছে—এমন সময় কাজল দেখিল, কিছুদূরে মাঠের ভিতর বসিয়া কাহারা আগুন পোহাইতেছে। বেশ দৃশ্যটা। চারিদিকে শূন্য মাঠ, উপরে খোলা আকাশ, তাহার নিচে বসিয়া খড়-বিচালি জ্বালাইয়া কেমন আগুন পোহাইতেছে লোকগুলি। কীসের আকর্ষণে সে পায়ে পায়ে আগাইয়া গিয়া অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়াইল।

লোকগুলি দরিদ্র। এই ভয়ানক শীতে গায়ে একটা করিয়া সূতির জামা। তাহারা গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া হাত আগুনের উপর ছড়াইয়া নিজেদের মধ্যে কী গল্প করিতেছিল। কাজল আসিয়া দাঁড়াইতে লোকগুলি অবাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইল। কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে কাজল অপ্রস্তুত বোধ করিয়া বলিল—আগুন পোহাচ্ছেন বুঝি?

অবান্তর প্রশ্ন। শীতের রাতে আগুন জ্বালাইয়া তাহার উপর হাত ছড়াইয়া অতগুলি লোক আগুন পোহানো ছাড়া অন্য কী করিতে পারে?

একজন বলিল—হ্যাঁ বাবা, আপনি বুঝি শহরে থাকেন? এই বুধো, সরে যা ওদিকে। বসুন বাবু ওইখেনটায়, আগুনের কাছে এসে বসুন।

বুধো তাহাকে সম্মান দেখাইয়া সরিয়া বসিল, কিন্তু বাকি কয়জন কেমন আড়ষ্টভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহাদের চোখে শুধু বিস্ময় নহে, একটু যেন আতঙ্কও মিশ্রিত আছে।

প্রথম লোকটি বলিল—এই বুধোই গল্প বলছিল বাবু। শ্বশুরবাড়ি থেকে ফেরবার সময় মাঠের মধ্যে ওকে এলে-ভূতে পেয়েছিল। এলে-ভূত জানেন তো? মাঠের মধ্যে পথ ভুলিয়ে লোককে দূরে বেজায়গায় টেনে নিয়ে যায়, তারপর মেরে ফেলে। তা বুধো সন্ধেবেলা বেরিয়েচে শ্বশুরবাড়ি থেকে, আর ভূত লেগেছে তার পেছনে—

একজন অনুচ্চকণ্ঠে বলিল—নাম করিস্ না রাত্তিরে—

গল্পটা দীর্ঘ। কাজলকে সবটা শুনিতে হইল—কী করিয়া কাপড়টা ঝাড়িয়া উলটাইয়া পরিয়া তবে বুধো ভূতের হাত হইতে রক্ষা পায়। শুনিতে শুনিতে অনেকে পিঠের উপর দিয়া পিছনের মাঠের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল। এবং ক্রমাগত আগুনের কাছে অগ্রসর হইতেছিল। ইহাদের আতঙ্কের কারণ এইবার কাজল বুঝিল। অন্ধকার মাঠে বসিয়া প্রেতযোনির গল্প হইতেছিল—রীতিমত গা-শিরশির-করা পরিবেশ। এমনি সময় মাঠের ভিতর হইতে আচমকা কাজলের নিঃশব্দ আবির্ভাব। প্রথমটা তাহারা বেজায় চমকাইয়াছিল, আগুনের আলোয় কাজলের ছায়া পড়িতেছে ইহা না দেখা পর্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িতে পারে নাই।

ঠাণ্ডা ক্রমশ বাড়িতেছে। তাহারা আরও কাঠকুটা আনিয়া আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিল। শুকনা ডালপালা পুড়িবার পটপট শব্দ উঠিতেছে, বাতাসে পোড়া পাতার গন্ধ। হাত বাড়াইয়া আগুনের উত্তাপ উপভোগ করিতে করিতে কাজলের মনে হইল, এই লোকগুলি তাহার ভারি আপন।

(কাজলের ডায়েরি থেকে)

আমাব ডায়েরি লেখার অভ্যেস মোটেই পুরোনো নয়। ছোটবেলায় কিছুদিন লিখেছিলাম বটে, কিন্তু সে বাবাকে দেখে শখ করে। আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে আমার এ বয়সটাব একটা বেকর্ড বাখা দরকার—যাতে পরবর্তী সময়ে এর থেকে মানসিক প্রগতির হারটা ধরতে পারি।

কিছুদিন আগে কয়েকজন বন্ধু মিলে পুরী থেকে ঘুরে এলাম। কলেজে প্রথমে খুব খারাপ লাগছিল। পরে তিন-চার জন ছেলের সঙ্গে আলাপ হল, যাদের সঙ্গে এখন বেশ হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে। তারাই উদ্যোগ করে বেড়াতে যাবার আয়োজন করলে আমি তাদের সঙ্গী হয়ে পড়লাম।

মা'র এখনও ধারণা, আমি সেই ছেলেমানুষই আছি। ঘুমোলে আমার গায়ে চাদর টেনে দেন—সকালে উঠে টের পাই। তাছাড়া আমার বইপত্র গুছিয়ে রাখা, কলেজে বেরুনোর সময়ে কলম পেনসিল খুঁজে দেওয়া, এসব তাঁকেই করতে হয়। কাজেই স্বনির্ভরতার পথে খুব একটা এগিয়ে গেছি—এমন বলা চলে না। মার চোখে ছোটই রয়ে গেছি।

আমি, পরমেশ, অমল আর রমানাথ একদিন সন্ধেবেলা ট্রেনে চেপে বসলাম। সারারাত্তির জেগে বসেছিলাম। ছোট স্টেশনে গাড়ি থামছে না, হু হু করে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে যাচ্ছে। কখনও নদীর ওপর দিয়ে গুম গুম করে ব্রিজ পার হচ্ছে—কখনও নীরন্ধ্র অন্ধকারের ভেতর তাকিয়ে দেখছি এঞ্জিন থেকে ভেসে আসা জ্বলন্ত কয়লার কুচি।

সকালে কটক। আমার চোখ রাত্রি জাগরণক্লান্ত। তাকিয়ে দেখলাম অদ্ভুত পোশাক পরা রেলওয়ে পুলিশ প্ল্যাটফর্মে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। পরমেশ চা খাওয়ালে সবাইকে। জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে চায়ের ভাঁড় নিয়ে চুমুক দিতে দিতে মনে হলো সত্যিই একা বেড়াতে চলেছি তাহলে। জীবনে কখনও কোথাও একা বেরুই নি।

দুদিন আগে রাত্তিরে স্বপ্নে সমুদ্র দেখেছিলাম। তখন পুরী যাওয়ার কথা চলছে, দেখলাম

সমুদ্রের ধারে বালির উপর পায়চারি করছি। হলুদ বালির বেলাভূমি, তার ওপর শ্রেণীবদ্ধ নারকেলগাছ অশান্ত হাওয়ায় থরথর করে কাঁপছে। মাথার ওপরে দীপ্ত সূর্য। ভালো করে দেখতে পাইনি, কারণ সমুদ্র সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না।

কটক ছেড়ে কেয়াঝোপ দেখতে দেখতে চললাম। লাইনের দুদিক কেয়াঝোপে সবুজ হয়ে আছে। মনের মধ্যে উচ্চগ্রামে মাদল বাজছে যেন, একটু পরেই জীবনে প্রথম সমুদ্র দেখবো।

ট্রেন মালতীপাতপুর ছাড়াল, সামনে পুরী। কী সুন্দর নামটা—মালতীপাতপুর!

দু হাত পেছনে রেখে সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে মনে পড়ল বাবার কথা। অনেকদিন আগে, আমি তখন ছোট, বাবা এসেছিল পুরীতে মাকে নিয়ে। বেলাভূমিতে বাবার পায়ের ছাপ কবে মুছে গেছে ঢেউ-এর অক্লান্ত তাড়নায় কিন্তু তবু মনে হচ্ছে, পুরীর বাতাসে যেন বাবার গায়ের গন্ধ—ছোটবেলায় বাবার বুকে মুখ গুঁজে থাকলে যেমন পেতাম।

মৌপাহাড়িতে বিস্তৃত প্রান্তর দেখেছি, কিন্তু বিস্তৃতি যে কতদূর প্রসারলাভ করতে পারে তা আজ বুঝলাম। ভালো লাগছে বলার চেয়ে কষ্ট হচ্ছে বলাই বেশি সঙ্গত, কারণ সমস্ত সমুদ্রটা আমি একসঙ্গে বুকের ভেতর পুরে নিতে পারছি না। এত বিশালকে একই সঙ্গে সমস্ত দিক দিয়ে দেখা সম্ভব নয়। ভীষণ ছট্‌ফট্‌ করছি, কিছুতেই একজায়গায় মন বসাতে পারছি না। সমুদ্র যেন ক্রমশঃ রক্তের মধ্যে মিশে যাচ্ছে। প্রাণের স্পন্দন প্রথম জেগেছিল জলে। সূর্যের অনুকূল উত্তাপে প্রথম এককোষী প্রাণীর সৃষ্টি সমুদ্রের বুকে। সমুদ্র জীবনের ধাত্রী। জীবনসৃষ্টির কোটি কোটি বছর আগেও এই সমুদ্র এইরকম অশান্ত হয়ে ঝাঁপাঝাঁপি করত বেলাভূমিতে। অন্য সব কিছু থেকে সমুদ্র অনেক বেশি অভিজ্ঞ—বহুদর্শী। অন্ধকার ঢেউ-এর মাথায় মাঝে মাঝে স্বতঃপ্রভ আলো। দিনরাত ভীষণ শব্দ করে সমুদ্র যে কী একটা জানাতে চাইছে, আমি তার ভাষা বুঝতে পারছি না। বাবা হয়তো বুঝতে পেরেছিল। এখন বেঁচে থাকলে বাবার কাছ থেকে জেনে নিতাম।

মানুষ বড়ো অসহায়, তার বলবার কথা সে কিছুতেই গুছিয়ে বলতে পারে না। সামনে ওই elemental fury দেখে মনে একটা আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। সমস্ত বিশ্বটার মধ্যে যে একটা master plan আছে সেটা সমুদ্রের মতোই বিশাল, অতিমানবিক। কী রহস্য লুকিয়ে আছে আকাশে-মাটিতে-জলে-জীবনে! দর্শনগ্রন্থের সামনে সদ্য অক্ষরপরিচয়প্রাপ্ত শিশুর মতো আমাকে এই বিশালত্বের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

একটা জিনিস আমি বুঝেছি, আমার জীবনটা অন্যান্য মানুষের চেয়ে একেবারে আলাদা হয়ে গেছে। উত্তরাধিকারসূত্রে যেদিন থেকে চিন্তা করতে শিখেছি, সেদিন থেকে আমার ভেতরে সৃষ্টি এবং ধ্বংসের বীজ একই সঙ্গে উপ্ত হয়েছে। চিন্তা দিয়ে আমার নিজের জন্য একটা ভিন্নতর জগৎ তৈরি করে নিয়েছি। কিন্তু চিন্তা আমাকে আলোর পথ দেখাতে পারছে না, শুধুমাত্র একটা বৃত্তের মধ্যে ঘুরিয়ে ক্লান্ত করছে। মুক্তি চাইলেও পাবো না—যে চিন্তাশীল, তার মুক্তি নেই। বন্ধুরা আমার সান্নিধ্য থেকে আর যথেষ্ট আনন্দ পাচ্ছে না। তারা যেভাবে আনন্দ ভোগ করতে চায়, তা আমার আনন্দের ধারণা থেকে আলাদা। ফলে আমি অনেক মানুষের মধ্যেও একা বোধ করি। চেনা মুখের ভিড়ে একলা থাকা বড়ো কষ্টের। আমি প্রাণপণে চাইছি ওদের সবার সঙ্গে ওদের মতো হয়ে মিশে যেতে, ওদের মতো ভাবতে, কথা বলতে। প্রত্যেকবারই কে পেছন থেকে টানছে, বলছে—হবে না, আর তা হয় না। বাবার সহজ আনন্দটা আমার মধ্যে কমে আসছে, আমি শুধু চিন্তার কঠিন মাটিতে খালি পায়ে হাঁটছি।

কোনারক।

বন্ধুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিকওদিক, আমি চুপ করে বসে আছি। সমুদ্রের দিক থেকে হাওয়া এসে প্রাঙ্গণের ধুলো ওড়াচ্ছে। নোনা বাতাসে মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য দিন দিন ক্ষয়ে আসছে। বন্ধুদের গলার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, দূর থেকে ভেসে আসছে কানে। কী নিয়ে যেন ওরা খুব হাসাহাসি করছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে মন্দিরের চাতালে একটা কোণায় বসে আছি। এখানটা বেশ ছায়াচ্ছন্ন, কাছেপিঠে লোকজন নেই। মনে হয় শব্দের জগৎ থেকে আমি নির্বাসিত। বন্ধুরাও হাসি থামিয়েছে।

আমার ডানদিকে পাথরে উৎকীর্ণ একটা পদ্ম। তাতে কনুই রেখে ওপরে তাকিয়ে দেখলাম মন্দিরের চূড়ার কাছে দুই পাথরের দেওয়ালের ফাঁকে নীল আকাশ ঝকঝক করছে। ফাঁকটা দিয়ে একটুকরো সাদা মেঘ ত্বরিত গতিতে ভেসে গেল।

হঠাৎ দেখলাম, আমার মনে সেই বিশেষ ভাবটা জাগছে—বিপুলগড়ের শিব-মন্দিরে যেমন হয়েছিল। ইতিহাস যেন চাদরের মতো গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। বহু শতাব্দী আগে যখন রোজ পুজো হতো, পুরোহিতের উদাত্ত কণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণ শোনা যেতো, সেই আগেকার দিনগুলোকে বড্ড ফিরে পেতে ইচ্ছে করছে। আমার কাছে বর্তমান যেমন সত্য, উঠোনের ওই ধুলোর ঘূর্ণি যেমন সত্য—সেই সব অতীতের মানুষদের কাছেও তাদের বর্তমান তেমনই সত্য ছিল। কিছুই আমরা চিরদিন আঁকড়ে থাকতে পারি না। সমুদ্রের ঢেউ, সূর্যাস্তের রং সব কিছু একদিন আমাকে ছেড়ে দিতেই হবে।

পরমেশ ফিরে আসছে।

—কী রে অমিতাভ, আমাদের সঙ্গে না থেকে বড়ো যে এখানে একলা বসে আছিস?

কী-ই বা উত্তর আমি দিই? উঠে বললাম—চল, তোদের সঙ্গে যাই।

যেতে যেতে ওপরে তাকিয়ে চোখ-ধাঁধানো সূর্যটা দেখে মনে হলো, বছরের পর বছর ধরে সূর্য কর্কটক্রান্তি থেকে মকরক্রান্তি পর্যন্ত এইরকম ভাবে পরিক্রমা করবে, সমুদ্রে একবার জোয়ার একবার ভাঁটা আসবে। আমাদের স্মৃতিটুকুও উত্তরপুরুষদের মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে—কেবল মাথা তুলে সূর্যমন্দিরটা দাঁড়িয়ে থাকবে আরও অনেক শতাব্দী।

চর্তুদশ পরিচ্ছেদ

শীতের শেষে সুরপতি অসুখে পড়িলেন। শরীর খুবই মজবুত ছিল, বাগানের প্রিয় গাছগুলিতে নিজের হাতে পাম্প করিয়া জল তুলিয়া দিতেন। প্রত্যহ কয়েক মাইল হাঁটাহাঁটি চাকরিজীবনের অভ্যাসের মধ্যেই ছিল। তবুও কোন এক রন্ধ্রপথে দেহে অসুখ ঢুকিয়া পড়িল। অসুখ সুরপতি গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতেন না, জ্বরজারি হইলে তিনি আরও বেশি ঘোরাঘুরি করিতেন। মনে ভয় ছিল, শুইলেই অসুখ তাঁহাকে কাবু করিয়া ফেলিবে। কাজল দাদুকে কখনও কোন কারণে শুইয়া থাকিতে দেখে নাই। একদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলা সুরপতিকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া সে অবাক হইল। পাশে সরযূ বসিয়া হাওয়া করিতেছে, বাড়িতে থমথমে আবহাওয়া।

হৈমন্তী বলিল—জ্বরটা হঠাৎ বেড়েছে বুড়ো। দুপুরের দিকে আমায় ডেকে বললেন গায়ের ওপর চাদরটা এনে দিতে। নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে, বুকে খুব সর্দি। তুই খেয়ে নে, কী দরকার পড়ে কখন—

কাজল খাইতেছে, দিদিমা আসিয়া বলিলেন—খোকা, তুই খেয়ে সুরেশ ডাক্তারকে একটা খবর দিয়ে আসিস তো, তোর দাদুকে যেন দেখে যায়।

অসুখটা যে বেশি তাহাতে সন্দেহ নাই। বাড়ির সবাই সে কথা বুঝিতে পারিয়াছে। সুরেশবাবুও অনেকদিন হইতে সাবধান করিতেছিলেন, সিগারেট ছাড়িবার উপদেশ দিয়াছিলেন। সুরপতি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

সুরেশ ডাক্তার সুরপতিকে দেখিয়া গেলেন। প্রতাপ তাঁহাকে আগাইয়া দিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ভয়ের কিছু আছে নাকি ডাক্তারবাবু?

—ভয়ের তো বটেই। অনেক দিনের পোষা রোগ। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কেন, সেটা ঠিক বুঝতে পারছি নে। দেখি দু'দিন—

সকালে খবরের কাগজ আসিলে সুরপতি আগে পড়িতেন। প্লাস পাওয়ারের চশমা চোখে লাগাইয়া কাগজটা আদ্যোপান্ত পড়িয়া শেষ করিতেন। আজ কয়েক দিন কাগজ আসিয়া তাঁহার টেবিলে পড়িয়া থাকে, প্রতাপ সময় পাইলে বিকালের দিকে একবার দেখে। কলিকাতায় সে ভালো কাজ করিতেছে কোন একটা সওদাগরী অফিসে, খুব সকালে বাহির হইয়া যায়।

রান্নাবান্নার দিকটা হৈমন্তী দেখে। কাজলের দিদিমা এবং সরযূ সুরপতিকে দেখাশুনা করে। খাওয়াদাওয়ার হাঙ্গামা মিটিয়া গেলে হৈমন্তী আসিয়া বাবার কাছে বসে। সুরপতির শরীরের শক্তি একেবারে চলিয়া গিয়াছে, মাসাধিক কাল শয্যাগত থাকিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, রোগ কঠিন। হৈমন্তী আসিলে জিজ্ঞাসা করেন—ডাক্তার কী বললে রে?

—ভয় কী বাবা? বলে গেছেন কিছুদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—বলেছে এই কথা?

—নয় তো আমি কি মিথ্যে বলছি?

অসুখ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল, কমিবার লক্ষণ নাই। বুকে যেন কে দুই মণ পাথর চাপাইয়া রাখিয়াছে, নিঃশ্বাস লইতে কষ্ট হয়। সুরেশ ডাক্তার নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া বুকে টোকা মারিয়া বলিলেন—জল হয়েছে বুকে, ট্যাপ করতে পারলে ভালো হত। কিন্তু এত দুর্বল রোগী!

সবাই এখন স্পষ্ট বুঝিয়াছে, সুরপতির আর বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার আশা নাই। বোঝেন নাই কেবল সুরপতি নিজে। কঠিন অসুখ হইয়াছে ইহা অনুভব করেন, কিন্তু অসুখটা যে তাঁহাকে পরপারগামী খেয়ায় তুলিয়া দিয়াছে ইহা বুঝিতে পারেন নাই। দুর্বল গলায় প্রত্যেককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন, অবস্থার কিছু উন্নতি দেখিতেছে কিনা।

শেষের দিকে বাঁচিবার আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অন্য কাহারও কথা বিশ্বাস হইত না, দুপুরবেলা হৈমন্তী আসিয়া বসিলে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিতেন—হৈম, সত্যি বল। আমার কাছে লুকোস নে—আমি বাঁচবো তো?

কাজলের যেন কেমন লাগিল। দাদু ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, পরলোকে বিশ্বাস করেন, পুনর্জন্মের স্বপক্ষে অনেক কথা কাজলকে বলিয়াছেন, অথচ পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে তিনি এত কাতর কেন?

বিছানার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন সুরপতি—দুই মাস আগে যাহারা দেখিয়াছে, এখন দেখিলে তাহারা চিনতে পারিবে না। চোখ কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে, হাড়ের উপর চামড়াটা কোনমতে লাগিয়া আছে মাত্র। নিঃশ্বাস লইবার সময়ে পাঁজরাগুলি প্রকট হইয়া ওঠে।

দিদিমা সমস্ত জীবন দাদুর দেখাশোনা করিয়াছেন। খাইতে বসিলে পাশে বসিয়া হাওয়া করিয়াছেন। শীতকালে আদা-চা এবং গরমকালে বেলের পানা করিয়া দিয়াছেন, বোতাম ছিঁড়িয়া গেলে লাগাইয়া দিয়াছেন। কাজল বোঝে এখন দিদিমা অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। অথচ তাঁহাকে পরিষ্কার করিয়া কেহ কিছু বলে না। সকলের মুখের দিকে তিনি শঙ্কিতভাবে তাকান—যেটা তাহারা গোপন করিতেছে, মুখভাব হইতে সেটা বুঝিবার চেষ্টা করেন।

ডাক্তার একদিন বলিলেন—আর ভরসা দিতে পারছি না, আপনারা প্রস্তুত থাকুন।

প্রস্তুত সকলেই। সুরপতি মানুষ চিনিতে পারিতেছেন না। কষ্ট করিয়া শ্বাস লইবার সময় মুখ দিয়া হা-হা শব্দ হইতেছে। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, অর্থহীন। দুপুরে সবাইকে বিশ্রাম করিতে পাঠাইয়া হৈমন্তী বাবার কাছে বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অপুর মৃত্যুর পর সুরপতি বিরাট মহীরুহের নিচে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, সে আশ্রয় এইবার নষ্ট হইতে চলিল।

সুরপতি তাকাইয়া চিনিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন—কে? হৈম?

—হ্যাঁ বাবা, আমি।

সুরপতির কথা বলিতে কষ্ট হইতেছিল, অস্বাভাবিক স্বরে বলিলেন—কাঁদিস নে, তোদের কান্না দেখলে আমি মনে জোর পাই নে।

কান্নার বেগটা হৈমন্তী জোর করিয়া দমন করিল।

—তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবো বাবা?

মাথা নাড়িয়া সুরপতি সায় দিলেন। হৈমন্তী মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে, এমন সময় সুরপতি হঠাৎ বলিলেন—দাদু কই?

—কাজল কলেজে গিয়েছে বাবা।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুরপতি বলিলেন—হৈম, দাদু খুব বড়ো হবে, দেখে নিস। ও অন্য রকম—

—তুমি ঘুমোও বাবা, কথা বোলো না—

—আমি বলে গেলাম হৈম, তুই মিলিয়ে নিস!

একটু পরে সুরপতি বলিলেন—গায়ে চাদর দিয়ে দে, আমার শীত করছে।

একদিন মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া কাজল শুনিল, পাশের ঘর হইতে দাদুর ক্ষীণ গলার স্বর ভাসিয়া আসিতেছে। দাদু কী বলিতেছেন, কেহ উত্তর দিতেছে না।

মশারি তুলিয়া কাজল সুরপতির ঘরে গিয়ে দাঁড়াইল। প্রথম রাত্রে সরযূর জাগিয়া থাকার কথা, অতিরিক্ত ক্লান্তিতে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পরপর কয়েক রাত্রি জাগিয়া দিদিমাও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কোথাও কেহ নাই, সমস্ত বাড়িতে অপার্থিব নীরবতা খাঁ-খাঁ করিতেছে।

সুরপতির মাথা বালিশ হইতে নিচে বিছানার চাদরে গড়াইয়া পড়িয়াছে। মাথা তুলিবার বার বার চেষ্টা করিয়াও পারিতেছেন না। কাজলকে দেখিয়া বলিলেন—মাথাটা তুই বালিশে তুলে দিয়ে যা দাদু, কেউ তো আসছে না।

কাজলের বড়ো খারাপ লাগিল। জীবনের পরিণতি যদি এমন হয়, তবে মানুষ বাঁচে কীসের আশায়! যৌবন অতিক্রান্ত হইবার আগেই তো আত্মহত্যা করা উচিত পরবর্তী দুর্দশার হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য।

পরের দিন সকালে সুরেশ ডাক্তার বলিলেন, দিন কাটে কিনা সন্দেহ। কাজল কলেজ এবং প্রতাপ অফিস কামাই করিয়া বাড়িতে থাকিয়া গেল। দুপুরে অনেক মাছ রান্না হইয়াছিল—সরযূ আর হৈমন্তী পরামর্শ করিয়া কাজটা করিয়াছিল। অন্য দিন হইতে বেশি মাছ দেখিয়া দিদিমা বলিলেন—এত মাছ কেন রে?

সরযূ বলিল—খাও না মা। সস্তা পেয়ে প্রতাপ নিয়ে এসেছে।

দিদিমা হাঁটুর ওপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—আমাকে তোরা সবাই কেন ঠকাচ্ছিস্, আসল কথাটা কেন বলছিস নে?

কিছুতেই তাঁহাকে খাওয়ানো গেল না।

দুপুরবেলা সুরপতির শ্বাসকষ্ট ভীষণ বাড়িল। এক-একবার দম লইবার সময় মনে হইতেছিল, প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে।

হৈমন্তী কাজলকে বলিল—একবার তুই চট করে সুরেশবাবুর কাছে যা, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসবি অবস্থাটা বলে—

গায়ে একটা জামা গলাইয়া কাজল সুরপতির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সুরপতি তাকাইয়া আছেন, কিন্তু চিনিতে পারিতেছেন কিনা কাজল বুঝিল না। সে ঝুঁকিয়া বলিল—দাদু, আমি কাজল।

সুরপতি কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিলেন। বুকটা হাপরের মতো সমানে ওঠা-পড়া করিতেছে। গোঙানির স্বরে সুরপতি বলিলেন—দাদু, বুকে বড়ো কষ্ট—

দাদুর আর্তস্বর কাজলের ভীষণ খারাপ লাগিল, সে দৌড়াইল সুরেশবাবুর বাড়িতে। রিকশা

করিয়া সুরেশবাবুর সঙ্গে ফিরিবার সময় দেখিল প্রতাপ খালি পায়ে বাহির হইতেছে। তাহাদের দেখিয়া বলিল—বাবা মারা গেছেন ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবুর ঘড়িতে তখন তিনটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট। কুড়ি মিনিট আগেও কাজল দাদুর সহিত কথা বলিয়াছে।

সুরপতির সঙ্গে দেওয়ার জন্য কাজল পাঞ্জাবি কিনিতে গিয়াছে, একটা নামাবলী কিনিতে হইবে। পাড়ার ছেলেরা ফুলের মালা ধূপকাঠি ইত্যাদির জোগাড় করিয়া ফেলিয়াছে। দোকানী রেডিমেড পাঞ্জাবির স্তূপ সামনে আনিয়া বলিল, কী মাপের চাই?

কাজলের শুনিয়া অদ্ভুত লাগিল। গলা পরিষ্কার করিয়া সে বলিল—মাপের দরকার নেই, মাঝারি দেখে দিন। যার জন্যে যাচ্ছে, তিনি মারা গেছেন।

দোকানীর এই মাপ জানিতে চাওয়ার কথা কাজলের বহুদিন মনে ছিল।

দাহ অন্তে লোহা এবং আগুন স্পর্শ করিবার জন্য শ্মশানবন্ধুরা বাড়িতে ঢুকিতেই দিদিমা অনেকদিন বাদে কাঁদিয়া উঠিলেন—ওরে, তোবা কোথায় শীতের মধ্যে রেখে এলি বুড়োকে—ও যে মোটে একলা থাকতে পারে না—

(কাজলের ডায়েরি থেকে)

এখন অনেক রাত। সবাই ঘুমুচ্ছে, আমার পোষা বেড়ালটাও গুঁড়িসুড়ি মেরে মা'র ট্রাঙ্কের ওপর শুয়ে আছে। বহু দূরের রেলওয়ে সাইডিং থেকে শান্টিং-এর শব্দ শুনতে পাচ্ছি। পাশের বাড়ির মুকুলবাবুর পোষা কুকুরটা ঘুমের মধ্যেই স্বপ্ন দেখে গরগর করে উঠছে।

আমার কেন ভালো লাগছে না, জানি না। দাদু মারা যাবার পর থেকেই কেমন একটা চিন্তার পোকা মাথার ভেতরের সুস্থ কোষগুলি কুরে কুরে খেয়ে যাচ্ছে। বাবার মৃত্যুর পর আমার চিন্তাশক্তি বেশ কিছুদিন অবশ হয়ে ছিল, তাছাড়া আমার বয়সও তখন ছিল কম। কিন্তু দাদুর মৃত্যু আমি খুব কাছ থেকে দেখলাম, মৃত্যুর কালো পোশাক পরা অতিলৌকিক শরীরটা একেবারে আমার গা ছুঁয়ে গেল। সে চলে গেল বটে, কিন্তু তার ক্ষণিক উপস্থিতির নিদারুণ মুহূর্তগুলো আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

পাশের ঘরের দরজা খোলা। এ ঘরে এই একমাস আগেও দাদু শুয়ে থাকতেন। আলো পছন্দ করতেন না। বিশ্রামের সময় আলো নেভানো থাকতো। অন্ধকারে দাদুর সিগাবেটের আগুন দেখতে পেতাম। গরমকালে দাদু হাত-পা নাড়তে নাড়তে আপনমনে গাইতেন—ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এ কথা জানবার জন্য সন্ন্যাসী হওয়ার দরকার হয় না। কিন্তু মৃত্যু এসে একদিন সব কেড়ে নিয়ে বিষাণ বাজাতে বাজাতে চলে যাবে—এটা সহ্য করতে হলে দৃঢ় মন দরকার। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছি, আমার সে শক্তি নেই। মৃত্যু এসে অলক্ষ্যে আমার ঘরে দাঁড়াবে, তর্জনী তুলে ইঙ্গিত করে কঠিন আদেশ উচ্চারণ করবে—এসো। আমাকে চলে যেতে হবে। আমি পৃথিবীকে ভালোবাসি, জীবনকে শীতের রোদ্দুরের মতো ভালোবাসি। বৃষ্টির দিনে জানালায় বসে ক্রমঘনায়মান অন্ধকারে অবিশ্রাম বৃষ্টি দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার মনে হয়, মাটির পৃথিবী ছয় ঋতু সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত বর্ষণক্লান্ত আকাশের ময়ূরকণ্ঠী রঙ—এসব ছেড়ে কখনও আমি যেতে পারবো না। কবিতা লিখি না—কিন্তু আমি কবি, আমি রসিক। মাটির সঙ্গে যে নাড়ীর বন্ধন, তাকে ছিঁড়ে যেতে আমি পারবো না। অথচ সে আমার কথা শুনবে না। সে আমায় ছেড়ে যাবে না, প্রতিজ্ঞা শুনে নিঃশব্দে অট্টহাস্য করে দিকচিহ্নহীন অন্ধকারে আমাকে চিরকালের জন্যে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

বেঁচে থাকার তবে অর্থ কী? সমস্ত পৃথিবীটার সৃষ্টি না হলেও ক্ষতি ছিল না। আমি তো চিরদিনের জন্য তাকে নিজের কাছে রাখতে পারবো না, তবে সামান্য সময়ের জন্য ধরে রাখার কী অর্থ?

অথচ ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে মনে হয়, জীবনের কী যেন গূঢ় অর্থ আছে। জীবনের সার্থকতা কোথায়, কে যেন তা আমাকে কানে কানে বলে যায়। আধো ঘুমের মধ্যে আমি হাতড়ে বিছানায় খুঁজি—যেন সার্থকতার চাবিকাঠি কেউ আমার কাছেই রেখে গেছে। পাই না, হাতে ঠেকে মায়ের গা। শেষ রাত্রের তরল অন্ধকারে হঠাৎ জেগে যাওয়া চোখে মাকে আঁকড়ে শুয়ে থাকি। যেন মাকে ছেড়ে দিলেই আঁধার সমুদ্রের ঢেউ আমাকে ভাঙা পানসির মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কোথায়।

আমার স্বভাব বড়ো রুক্ষ হয়ে উঠছে। হয়তো মানসিক অসন্তুষ্টিই এর কারণ। আমি বুঝতে পারি না, সবাই কী করে একে অস্বীকার করে হাসিমুখে বেঁচে আছে। হয় তারা সবাই একযোগে বোকা, নয়তো আমার থেকে অনেক জ্ঞানী। আজকাল বেড়াতে গিয়ে মাঠের মধ্যে জঙ্গলের মধ্যে সব জায়গায় অতৃপ্তি অনুভব করি। কালো পোশাক পরা কে একজন আমার পেছন পেছন আসে—তাকে আমি দেখতে পাই না, তাকে অনুভব করি। জানি দিন যত কাটবে, তার আর আমার ব্যবধান ততই কমে আসতে থাকবে।

পরমেশের বোনের শ্বশুরবাড়ি ব্যারাকপুরে। বোনকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিতে সে ব্যারাকপুরে গিয়েছিল, সঙ্গে নিয়েছিল আমাকে। দুপুরবেলা তার ভগ্নীপতির বাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেবে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলাম। এধারে লোকজন কম, কাছেই মিলিটারি ব্যারাক। গঙ্গার পাড়ে বাবলার বন, দূর থেকেই দেখা যায় বাবলাগাছের ফাঁকে ফাঁকে নদীর জল চিকচিক করছে।

উঁচু পাড়ে বসে ওপারে শ্রীরামপুরের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছি, এমনি সময় নজরে পড়ল পাড়ের নিচেই কাদার ওপর পড়ে আছে একটা ছোট কাগজের বাণ্ডিল—নীল সুতো দিয়ে বাঁধা। কী রকম মনের ভাব হল—জুতো খুলে টপ করে নিচে নামলাম জলের কাছাকাছি। তখন ভাঁটা চলছে, জল এসে কাগজগুলোকে স্পর্শ করেনি। যে ফেলেছে, কিছুক্ষণ আগেও সে এখানে ছিল।

সুতোটা না খুলে ভাববার চেষ্টা করলাম, এগুলো কী হতে পারে। বাজে কাগজ? দলিল? বাড়িভাড়ার পুরোনো রসিদ? প্রেমপত্র?

খুলে দেখি প্রেমপত্রই বটে। ঘটনাটা উপন্যাসের মতো শোনাচ্ছে—ডায়েরির ছেঁড়া পাতায় কাঁচা হাতের লেখায় ভুল বানানে প্রায় পনেরো-কুড়িটি প্রেমপত্র নীল সুতো দিয়ে বাঁধা। যাকে লেখা, তার জীবনে হয়তো এগুলোর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এতদিন সযত্নে রাখা ছিল বাক্সের কোণে, বের করে আজ গঙ্গার বুকে ফেলে দিয়ে গেছে।

চিঠিগুলো তখন পড়িনি। বাড়ি এসে পড়বার ঘরে টেবিলল্যাম্প জ্বেলে এক-একখানা করে পড়ে ফেললাম। নাম দেওয়া নেই। তবে এটুকু বোঝা যায় কোনো মেয়ে তাব প্রেমিককে উদ্দেশ করে চিঠিগুলি লিখেছিল। চিঠির নিচে লেখা—'ইতি তোমার মিতা'। সম্বোধনেও 'প্রাণের মিতা'। কাজেই মিতা তার নাম নয়। এদের ভালোবাসা পরিণতি লাভ করেনি, চিঠি ফেলে দেওয়া থেকে তা বোঝা যাচ্ছে। একটিতে লেখা—তোমাকে অনেকদিন পর দেখলাম। মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। সত্যি, আজ সকাল থেকে দিনটা খুব ভালো যাচ্ছে। তোমার কাছ থেকে যা আশা করেছিলাম, তার থেকে অনেক বেশি পেলাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমাকে সারাজীবন যেন এমনি করেই পাই। ইতি—তোমার মিতা। আর একটিতে—তুমি চলে গেলে, কিন্তু একবারও তো বললে না—যাচ্ছি। হয়তো ভুল হয়ে গেছে, হয়তো তুমি দেখো নি, দরজার পাশে আমি দাঁড়িয়েছিলাম তোমার পছন্দসই সেই ডুরে শাড়িটা পরে। আমার এক বন্ধু বলেছিল ভালোবাসলে দুঃখ পেতে হয়। আমার ভাগ্যে তাই আছে। সারাজীবন হয়তো কেবল দুঃখই পাবো। কেন যে এমন ভুল করলাম। ইতি—তোমার অবুঝ মিতা।

অন্য কেউ পড়লে হয়তো মনে মনে বিরাট এক গল্প তৈরি করে নায়িকার দুঃখে সন্ধেটা মুহ্যমান হয়ে কাটাতো। একবছর আগে চিঠিগুলো পড়লে আমিই অচেনা মেয়েটির কথা ভেবে ঘণ্টা দুই কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু আজ আমার মনে এক উলটো প্রতিক্রিয়া হল। বাইরে থেকে বাতাস এসে বারবার টেবিল ল্যাম্পের আলো কাঁপিয়ে দিয়ে দেওয়ালের ক্যালেন্ডারের পাতা নিয়ে খেলা করছে, বাড়ির সামনে শম্ভু পাগলা এসে প্রতিদিনের মতো খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা মুখ তুলে টানা সুরে বলে যাচ্ছে—ভাত খাবো, ভাত খাবো, ভাত—ভাত—ভাত! পাশের বাড়ির ছাদে কে যেন দুমদুম করে কয়লা ভাঙছে। এর মধ্যে আমার মনে বিচিত্র অসন্তোষের ঝড়। চিঠিগুলোর প্রেরক এবং প্রাপককে যেমন আমি কোনোদিনই জানতে পারবো না, তেমনি আমার প্রশ্নের উত্তরও আমি কোনদিন পাবো না। আমার অস্থিরতার সঙ্গে চিঠির ব্যাপারটা হঠাৎ মিলেমিশে এক হয়ে গেল। বাতি নিভিয়ে দিতেই তারাদের ছায়া নিয়ে একরাশ জ্যোৎস্না লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপরে। বাতাস বাইরের গাছগুলোকে ধবে খুব করে এক-একবার ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেল। বাতিটা থেকে পোড়া সলতের কেমন একটা গন্ধ আসছে, নামিয়ে রাখতে গিয়ে নজবে পড়লো মেঝেয জ্যোৎস্নার ফালি। আমার মাথার ভেতরে চেতনাটা অতীতকে ভালোবাসে, নাম-না-জানা ফুলের গন্ধে ভারাক্রান্ত অতীতের সন্ধেগুলোয় ফিরে যেতে চায়—সেই চেতনা শেকল ছিঁড়ে হঠাৎ লাফালাফি শুরু কবে দিল। চাঁদের আলোটুকুর দিকে তাকিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম একশো বছর আগেকার স্বাভাবিক সুন্দব জীবনেব কথা, যেমনটি পড়েছি বই-এ। সে জীবনের সঙ্গে তুলনা কবে বর্তমানেব ওপর আমার বিতৃষ্ণা হল, অসন্তুষ্টি বেড়ে উঠে মনে হতে লাগলো—পাই নি, পাবো না।

তখনও শম্ভু পাগলা সমানে চিৎকার করে চলেছে ভাত—ভাত—ভাত!

একদিন মিউজিয়ামে গেলাম। বহুদিন আগে বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম, আব এই। সময়ের দিক দিয়ে দেখতে গেলে খুব বেশিদিন নয়—কিন্তু আমিই পালটে গেছি।

মিউজিয়ামেব ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ঘুম-ঘুম ভাবটা আমার ভালো লাগে। করিডোরের সাবি সারি ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি, অল্প আলোয় প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীব কঙ্কাল, মৃত্তিকাভ্যন্তর থেকে আনা বিচিত্র পাথব—এসবের মধ্যে, আমার মনে হয, কী যেন লুকিয়ে আছে। বহুদিন আগের হারিয়ে যাওয়া মানুষের উপস্থিতি আমার চোখের সামনে, আমার মনের ভেতরে অনুভব করতে পারি।

লম্বা ঘরগুলোর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চারপাশে তাকিয়ে মন বাধাবন্ধ মানতে চায় না—ইচ্ছে করে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে ফেটে পড়ি। ভূ-বিজ্ঞান প্রত্নতত্ত্ব জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞানের শাখাগুলোর মধ্যে লুকোনো আছে মানুষের জন্মের ইতিহাস। সবকিছু একসঙ্গে না জানতে পেরে খালি মনে হয়, ঠকে গেলাম—বোকা রয়ে গেলাম। একটি ঘরে বৌদ্ধযুগেব মূর্তিশিল্প সংগৃহীত। আমি আইকনোগ্রাফির ধার ধারি না, অথচ কী এক আকর্ষণে আজ ঢুকেছিলাম। ভালোই করেছিলাম, তার ফলে আমার এক চমৎকার অভিজ্ঞতা হল।

পাথরের এক নারীমূর্তি আমার বড়ো ভালো লেগে গেল। মূর্তিকারের নাম নেই। শুধু লেখা মূর্তিটি খ্রিস্ট-জন্মের আগে তৈবি, সম্ভবত শিল্পীর প্রেয়সীর প্রতিকৃতি। ঘরের আয়তনের তুলনায় আলো যথেষ্ট নয়। ফলে সব সময়ই কেমন আধো আলো আধো অন্ধকার ভাব ঘরের মধ্যে। সেই মৃদু আলোকিত স্বপ্ন-স্বপ্ন পরিবেশে মূর্তিটির সামনে দাঁড়িয়ে গেলাম।

স্পষ্ট দেখলাম মেয়েটি হাসছে।

তখন কাছাকাছি কোনো মানুষ ছিল না, খুব কাছে গিয়ে আমি মুখের দিকে তাকালাম। সে হাসি পাথরে উৎকীর্ণ বটে, কিন্তু আমার মনে হল মেয়েটি যেন এইমাত্র আমাকে দেখে হেসে উঠেছে।

আমার সে সময়কার মনের অবস্থা বোঝানো যায় না বলেই তেমন চেষ্টা করছি না। দরকারই বা কী, এ ডায়েরি আমি ছাড়া যখন অন্য কেউ পড়বে না। খালি মনে হতে লাগল, কবে যেন এর

সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। বহুদিন আগে উপহার পাওয়া আতরের শিশি বাক্স থেকে বার করে শুঁকলে তার গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে যেমন পুরোনো দিনটা আবার ফিরে আসে, তেমনি ওখানে দাঁড়িয়ে মনে হল অতীত আমার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। বাতাসে ধূপের মৃদু গন্ধ পেলাম, প্রাচীন যুগের মহিলারা ধূপের ধোঁয়ায় চুল শুকোতে বসলে যেমনটি পাওয়া যেতো। অনুভূতি এত তীব্র ও স্পষ্ট যে, আমি নিজেকে সরাসরি সে যুগটার সঙ্গে জড়িত বলে বোধ করলাম।

বাড়ি আসতে মনে হলো আমি এবং সে অস্তিত্বে একই সমতলে অবস্থিত নই—দেশকালের বিভিন্ন দুই স্তরে কবে থেকে আমরা পরস্পরকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই কোনো এক ধ্রুবকেন্দ্রে এসে মিলিত হতে পারছি না। শুধু খুঁজছি, শুধু খুঁজছি।

কবে যেন সে আমার জন্য কুটিরাঙ্গণে দাঁড়িয়ে উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে থাকত। সে কবেকার ভুলে যাওয়া অতীতের কথা।

সমস্ত মনে কী যেন হারানোর যন্ত্রণা, খুঁজে না পাওয়ার অতৃপ্তি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কলেজে যাইবে বলিয়া কাজল বইপত্র গোছাইতেছে, হৈমন্তী ডাকিয়া বলিল—হ্যাঁ রে, কলকাতার অবস্থা কেমন? শুনলাম লোকজন নাকি খুব পালাচ্ছে? ভট্টাচার্যপাড়ায় বকুলের বাবার যে বাড়িটা খালি পড়েছিল, সেটায় এক পরিবার এসে উঠেছে। এখানে থাকবে না বলেছে, আরও গাঁয়ের দিকে চলে যাবে।

কাজল বলিল—আমি তো এখন পর্যন্ত ভয়ের কিছু দেখলাম না। লোকজন কিছু গাঁয়ের দিকে পালিয়েছে ঠিকই, রাস্তাঘাট একটু ফাঁকা ঠেকে আগের চেয়ে। তবে অফিস কাছারি ঠিকই চলছে—

—আমাদের এদিকে ভয়ের কিছু নেই, না?

—দূর! কোথায় রইল যুদ্ধ, কোথায় আমরা! যারা পালিয়েছে তারাও ফিরলো বলে, দেখ না।

একদিন কলেজ হইতে ফিরিবার সময় কাজল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার খবর পায়। শেয়ালদহের মোড়ে খবরের কাগজের হকার হাঁকিতেছে—টেলিগ্রাম! টেলিগ্রাম! বহুলোক ভিড় করিয়া পড়িতেছে এবং সরব আলোচনা করিতেছে। একখানা কিনিয়া কাজল পড়িয়া দেখিল। পোলিশ করিডর দাবি করিয়া হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করিয়াছেন। যুদ্ধ শুরু হইয়াছে।

ক্রমে কলিকাতার চেহারা পালটাইল। ল্যাম্প পোস্টের আলোয় কালো ঠুলি পরাইয়া দেওয়া হইল। এ. আর. পি. বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া নাম ধাম লিখিয়া লইতে লাগিল, প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতে লাগিল। অন্ধকার রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতে কাজলের মনে একটা বিশ্রী ভাব যেন চাপিয়া বসিত। শীতকালে সন্ধ্যা হয় বিকাল শেষ হইতে না হইতেই। কলেজ হইতে বাহির হইয়া কাজল দেখিত, বিশাল শহরের উপরে দুঃস্বপ্নের মতো অন্ধকার চাপিয়া বসিতেছে।

মালতীনগরে বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। কাঁঠালিয়ার কাছে একটা বিরাট মাঠ সৈন্যেরা কাঁটাতারে ঘিরিয়া সেখানে রাইফেল প্র্যাকটিস করে। সাধারণের সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

সকালে উঠিয়া শোনা যায়। দূর হইতে রাইফেলের আওয়াজ আসিতেছে। সুন্দর সকাল। জানালার পাশে টগরগাছটায় সকালের রোদ্দুর আসিয়া পড়িয়াছে, একটা টুনটুনি পাখি বার বার ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার ডালে আসিয়া বসিতেছে। মিষ্টি আমেজের ভিতর রাইফেলের শব্দে কাজলের মেজাজ খারাপ হইয়া যায়। তাহার জীবনের সহিত বন্দুকের শব্দ মোটেই খাপ খায় না।

একদিন রাস্তায় আদিনাথবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। সে প্রণাম করিয়া বলিল—ভালো আছেন সার?

আদিনাথবাবু কাজলকে জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন—তুই কেমন আছিস অমিতাভ? তোর চেহারা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে, অসুখবিসুখ করেছিল নাকি?

—না সার।

—তবে এমন চেহারা কেন?

কাজলের মনে হইল আদিনাথবাবু তাহার মনের কথা বুঝিবেন, তিনি তাহাকে সমাধানের পথ বলিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু বলিতে গিয়া দেখিল, জিনিসটা সে সহজে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। জীবনের কোনো অর্থ নাই, একথা ভাবিয়া তাহার বয়সী একটি ছেলের রাত্রে ঘুম হইতেছে না, ইহা রীতিমত হাস্যকর। এই কথা ভাবিয়া শরীর খারাপ হওয়া নিঃসন্দেহে অন্যদের কাছে অবিশ্বাস্য। সে বলিল—আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না সার। ছোটবেলা থেকে যে পরিবেশে মানুষ হয়েছি, তার সঙ্গে আমার মন যেন আর খাপ খাচ্ছে না।

—পরিষ্কার করে বল।

—সার, এত দীর্ঘদিন ধরে বেঁচে থাকাব মানে কী? এত কষ্ট করে পড়াশুনা করা, জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, জীবনকে ভালোবাসা—এর কী অর্থ? মৃত্যুর পর তো একটা ভয়ানক অন্ধকার আমাদের গ্রাস করে নেবেই।

মালতীনগর স্টেশনের লোকের ভিড়ে ব্যাগ হস্তে আদিনাথবাবুর সামনে দাঁড়াইয়া কথাটা ভীষণ নাটকীয় শোনাইল। কাজল বুঝিতে পারল, বিষয়টা সে পরিষ্কার করিতে পারে নাই—কিছুটা ফাঁকা আওয়াজ হইয়াছে।

কিন্তু আদিনাথবাবুর মুখ আস্তে আস্তে গম্ভীর হইল। কাজলের কাঁধে হাত দিয়া বলিলেন—চল্, কোনো জায়গায় বসে কথা বলি।

স্টেশন ছাড়াইয়া নির্জন পথে পড়িয়া বাঁধানো কালভার্টের উপব আদিনাথবাবু বসিলেন। বলিলেন—বোস আমার পাশে।

কাজল বসিল।

কিছুক্ষণ আদিনাথবাবু কথা বলিলেন না, ব্যাগটা পায়ের কাছে নামাইয়া চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। কাজলও পাশে বসিয়া রহিল। সময় কাটিতেছে, কাহারও যেন কথা বলিবার চাড় নাই।

আদিনাথবাবু হঠাৎ কাজলের দিকে তাকাইয়া গম্ভীর স্বরে মন্ত্র পড়িবার মতো করিয়া বলিলেন—তোর জীবনের সুখ একেবারে চলে গেছে অমিতাভ, আর কখনও আসবে না।

কাজল চমকাইয়া উঠিল। কথাগুলি তাহার বুকের গভীরে যেন তীক্ষ্ণমুখ শলাকার মতো বিঁধিয়া গেল। মাস্টারমশাই ঠিকই বলিয়াছেন—তাহার মতো করিয়া আর কে বুঝিয়াছে যে সুখ আর কখনও আসিবে না? সঙ্গে সঙ্গে কাজলের মেরুদণ্ড বাহিয়া একটা ভয়ের স্রোত নিচে নামিয়া গেল। যে অসুখ শুরু হইয়াছে, তাহা কখনও সারে না।

—অমিতাভ!

—সার?

আদিনাথ বলিলেন—যে চিন্তা করে, তাব জীবনে কখনও সুখ আসে না। তুই জীবনের একেবারে আসল জায়গায় ঘা দিয়েছিস। ভাবতে অবাক লাগছে, এত অল্প বয়সে তুই এই চিন্তা পেলি কোথা থেকে।

—একটা কথা বলব সার?

—বল্?

—কী মনে হয় আপনার জীবন সম্বন্ধে? আপনি কি বিশ্বাস করেন মৃত্যুতেই জীবনের শেষ?

—সত্যি উত্তর দেবো?

—তা নইলে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো কেন?

—আমার কিছুই মনে হয় না। অনেকদিন আছি পৃথিবীতে, কিছুই বুঝতে পারলাম না। সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগেই আমার চিন্তাশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। এখন আমি দেনায় জর্জরিত—ভবিষ্যৎহীন বৃদ্ধ। আমার এই বর্তমানের চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর আর কী হতে পারে? তবুও অমিতাভ আমার মন চায়, একটা কিছু অর্থ থাকুক এ-সবের। কিন্তু আমি জানি, সমস্ত জিনিসটা signifies nothing— কেবল sound অমিতাভ, কেবল fury, আর কিছু নয়।

অকস্মাৎ আদিনাথবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন—ওসব চিন্তা একদম বাদ দিয়ে দিয়েছি। এককালে খুব ভাবতাম, বুঝলি? এখন তোদের জন্যই বেঁচে আছি বলতে পারিস। তোরা মানুষ হবি, বড়ো হবি—বিশ্বাস কর্, আমার খুব ভালো লাগবে দেখতে।

—আপনি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন সার?

—তুই বিশ্বাস করিস?

—করতে ইচ্ছা হয়, পারি না।

—কেন?

—বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে দেখলে কোনো মানে হয় না বলে।

—বুদ্ধি দিয়ে যা বোঝা যায় না, তা মিথ্যে?

—তাকে হৃদয় দিয়ে মেনে নেওয়া যায়, বাস্তবে স্বীকার করা যায় না।

—স্বীকার না করায় বাহাদুরি কী অমিতাভ? তাতে তো শুধু কষ্ট—

—কষ্ট তো বটেই মাস্টাবমশাই। স্বীকাব না করায় কিছু বাহাদুরি নেই, আমি বিশ্বাস করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। কিন্তু বুদ্ধিতে বাধা দেয় যে।

—অমিতাভ, আমি তোকে আশীর্বাদ কবি, তোব জীবনে যেন বিশ্বাস আসে, তুই যেন কখনও পরাজিত না হোস।

—শুধু বিশ্বাস দিয়ে কী হবে সার, যদি আসলে কোনো অর্থ না থাকে? শূন্যতায় বিশ্বাস কবা কি নিজেকে ঠকানো নয়?

আদিনাথবাবু কাজলের কাঁধে হাত দিয়া একটা ঝাঁকুনি দিলেন, তারপর বলিলেন—তবু সে নিছক sound আর fury থেকে ভালো। বড়ো হয়ে তোর মনে হবে, বিশ্বাসের একটা মূল্য আছে। মনে হবেই, দেখিস।

আদিনাথবাবুর সঙ্গে কাজলের এই শেষ দেখা। এর কিছুদিন বাদেই তাঁব মৃত্যু হয়। ব্যোমকেশ হঠাৎ আসিয়া খবরটা দিয়াই আবার চলিয়া গিয়াছিল।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া পরদিন আদিনাথবাবু আর ঘুম হইতে ওঠেন নাই। ঘুমের ভিতরেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। সংসারের জন্য এক পয়সাও বাখিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু দেনা পাই পয়সা পর্যন্ত মিটাইয়া দিয়াছিলেন।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের পয়লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব শুরু। ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রিটেন এবং ফ্রান্স যুদ্ধে নামিল। ১৮ই সেপ্টেম্বরের ভিতর পোল্যান্ডের পতন হইল। ওয়ারশ-তে নাজী বাহিনীর এমুনিশন বুটের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল।

প্রথমদিকে কাজল কলিকাতায় বিশেষ কিছু অস্বাভাবিকতা দেখে নাই। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, মানুষ ততই দিশাহারা হইয়া পড়িল। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে জাপান হঠাৎ পার্ল হারবার আক্রমণ করায় আমেরিকা যুদ্ধে নামিল। ইহার কিছুদিন বাদে ব্রহ্মদেশের পতন হওয়ায় ভারতবর্ষ অনুভব করিল, বিপদ একেবারে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। শুরু হইল বাক্স বিছানা ঘাড়ে গ্রামের দিকে সদলে পলায়ন। তাড়া খাওয়া প্রাণীর মতো অবস্থা।

অনেক সময় কাজলের ক্লাস করিতে ভালো লাগিত না। পরমেশের সঙ্গে রাস্তায় ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার মনে হইত, মানুষ খামোকা যুদ্ধ করে মরছে কেন? এমনিই তো মরবে ক'দিন বাদে।

সে বলিত—পরমেশ, যুদ্ধ বড়ো বীভৎস আর অর্থহীন, না?

—হয়তো তাই, কিন্তু যুদ্ধেরও যে অনেক সৃষ্টিশীল দিক আছে। কল-কারখানা বাড়ছে, নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে। কত প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি হবে হয়তো পরে। প্রথম মহাযুদ্ধের ফসল যেমন রেমার্ক, রুপার্ট ব্রুক—

—ভালো সাহিত্যের জন্য, নতুন আবিষ্কারের জন্য কি মানুষ মারতে হবে?

পরমেশ হাসিল। বলিল—তুমি নিজেই বলে থাকো জীবনের কোন অর্থ হয় না, জীবনটা দীর্ঘদিন ধরে ক্লান্ত হবার একটা পন্থা মাত্র। মানুষের জীবন থাকলো কী গেল, তাতে তোমার দুঃখিত হবার কারণ নেই।

কাজল ভাবিয়া দেখিল, পরমেশ ঠিকই বলিয়াছে। তাহার দর্শন অনুযায়ী যুদ্ধে মন-মরা হইবার কারণ নাই।

অথচ এ কথাও ঠিক যে, সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার আলোকহীন নিষ্প্রাণ সন্ধ্যা, লোকজনের পলায়ন, প্রতিদিন যুদ্ধের নূতন নূতন নারকীয় সংবাদ তাহার মনে এত অবসাদ আনিয়াছে যে, আই-এ পরীক্ষায় যেমন করা উচিত ছিল, তাহা সে পারে নাই। পরীক্ষার হলে বসিয়া অনেকবার কাগজ জমা দিয়া উঠিয়া আসিবার কথা ভাবিয়াছে, কিন্তু মায়ের কথা ভাবিয়া পারে নাই।

মায়ের আশা সে বড়ো হইবে। টাকার দিক দিয়া নহে, যশের দিক দিয়া। রাত্রে শুইয়া সে বাচ্চা ছেলের মতো মায়ের বুকে মুখ গুঁজিয়া থাকে। সারাদিনের চিন্তার পরিশ্রমে ক্লান্ত মস্তিষ্ক তাহাতে বিশ্রাম পায়। পৃথিবীর বড়ো বড়ো ফাঁকির ভিতরে মায়ের ভালোবাসাই তাহার কাছে একটুকু সার পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। প্রায় রাত্রে দুইজনে নিশ্চিন্দিপুরের গল্প করে, মৌপাহাড়ির গল্প করে। গল্প কিছুক্ষণ চলিবার পর কাজল টের পায়, মা কাঁদিতেছে। তখন সে বলে—মা, তোমার ছোটবেলার গল্প বলো।

হৈমন্তী কাজলকে বুকের কাছে লইয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহার রঙিন শৈশবের গল্প করে।

ভারি সুন্দর ছিল সে সমস্ত দিন। কত জায়গায় সে ঘুরিয়াছে বাবার সঙ্গে। এক জায়গায় সংসার পুরাতন হইতে না হইতেই সব কিছু গুটাইয়া আবার নূতন স্থানে যাত্রা শুরু হইত। জামালপুরে তাহাদের পাশের বাড়ির সেই সুমিত্রাদি কী ভালোই না বাসিত তাহাকে! স্বামী রাত্রে মদ খাইয়া বাড়ি ফিরিত, হুঁশ থাকিত না। সুমিত্রাদি জামাকাপড় ছাড়াইয়া বিছানায় শোয়াইয়া বাতাস করিয়া ঘুম পাড়াইত। একদিন অভিযোগ করিতে গিয়া কী মারটাই না খাইয়াছিল স্বামীর হাতে! হৈমন্তীকে ডাকিয়া সে একদিন গহনাপত্র দেখাইয়াছিল। শখ করিয়া কত কিছু গড়াইয়াছিল সুমিত্রাদি, খুব শখ ছিল ভালো করিয়া সংসার করিবে। হয় নাই। মাতাল, অপদার্থ স্বামী কোথা হইতে আর একজনকে বিবাহ করিয়া আনিল। কয়েকদিন বাদে সুমিত্রাদি গেল পাগল হইয়া। তাহাকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সুমিত্রাদি আর সারিয়া উঠে নাই, তাহার সংসার করিবার সাধ পূর্ণ হয় নাই।

—তখন ভারি টক খেতে ভালোবাসতাম, জানিস বুড়ো। আমি আর দিদি সারাদিন এ-বাগানে ও-বাগানে ঘুরতাম চালতে করমচার খোঁজে। এক বুড়োর বাগানে লুকিয়ে ঢুকেছিলাম। বুড়ো দেখতে পেয়ে আমাদের ডেকে বলল—লুকিয়ে নিচ্ছ কেন খুকিরা, যত ইচ্ছে নিয়ে যাও, কেউ কিছু বলবে না। কোথায় থাকো মা তোমরা?

মায়ের জন্য কাজলের দুঃখ হয়। মা জীবনে কিছু পায় নাই। কত অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে, এখন পুরাতন স্মৃতি মন্থন করিয়া দিন কাটায়। বাবা মারা যাইবার পর হইতে কী-ই বা রহিয়াছে! একটা বড়ো রকমের কিছু করিয়া মাকে খুশি করিতে হইবে। সে বলে—একটা গল্প শুনবে মা?

—কী গল্প রে খোকন?

সে ফিয়োদর সোলোগাব-এর 'দি হুপ' গল্পটা মাকে বলে। সোলোগাব এমন কিছু বড়ো

সাহিত্যিক নন। কিন্তু গল্পটা তাহার খুব ভালো লাগিয়াছিল। আশি বছরের এক বৃদ্ধের গল্প। মায়ের সহিত বাচ্চাকে হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়া বৃদ্ধের শিশু হইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। বাচ্চাটি বেশি দূরে গিয়া পড়িলেই মা ডাকিয়া বলিতেছে—ওদিকে যাস নে, পড়ে যাবি। পরের দিন বৃদ্ধ কাজ কামাই করিয়া সারাদিন বালকের মতো নির্জন পাহাড়ের ধারে খেলিয়া বেড়াইল। বৃদ্ধের কেহ ছিল না। শৈশবে সে মায়ের স্নেহ পায় নাই। অশক্ত শরীরে পাহাড়ের পথে দৌড়াইতে দৌড়াইতে কেবল তাহার মনে হইতেছিল, মা পিছন হইতে সাবধান করিয়া দিতেছে—ওদিকে যাস নে, পড়ে যাবি।

সম্বলহীন আত্মীয়হীন বৃদ্ধের গল্পটা কাজলের মনে দাগ কাটিয়াছিল। বলিতে বলিতে সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। শেষ দিকটায় তাহার গলার কাছটায় একটা কান্না আটকাইয়া যাইতেছিল। অবাক হইয়া সে লক্ষ করিল, জীবনের অর্থহীনতা আবিষ্কারের পরেও সে জীবনকে কত ভালোবাসে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—কত লোক জীবনে কিছু না পেয়েই মরে যায় মা!

হৈমন্তী তাহাকে কাছে টানিয়া বলিল—ওমা বুড়ো, তুই কাঁদছিস? তুই না বি. এ. পড়িস? বই পড়ে কান্না!

—আমি মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য একটা কিছু করবো, দেখে নিয়ো। সারাজীবন যারা কষ্ট পায়, চোখের জলে ডুবে থাকে, আমি তাদের নতুন পৃথিবী তৈরি করে দেবো।

—আমি জানি বাবা, তুই পারবি।

—বি. এ.-টা দিয়ে আমি চাকরি নিয়ে চলে যাবো কোনো নির্জন জায়গায়। মৌপাহাড়ি স্কুলে মাস্টারি করবো হয়তো। তুমি আমার সঙ্গে যাবে তো মা?

—তোকে ছেড়ে কোথায় থাকব বুড়ো? তুই তো আমার সব।

—আমি বেশি টাকাপয়সা দিতে পাববো না মা, কিন্তু তোমাকে শান্তি দিতে পারবো। তাতে তুমি তৃপ্তি পাবে না?

—আমার কিছু চাই নে। কীর্তিমান স্বামী পেয়েছি, পুত্র যদি বিদ্বান হয়, তবে আমার সমস্ত পাওয়া হবে।

কাজল আবার শুইল বটে, কিন্তু ঘুম আসিল না। বলিল—মা, আমাব একদম ভালো লাগছেন এই জীবন। পড়াশুনো হয়ে গেলেই বেরিয়ে পড়ব যেখানে হোক। এই তো আর ক'দিন পর থেকে মাঠে শিশির পড়তে শুরু করবে। বাস্তিবের পরিষ্কার আকাশে ঝকঝক করবে নক্ষত্র। পৃথিবীটা আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমি বাইরে বেরুব মা, আমি কিছুতেই ঘরের কোণে সারাজীবন কাটাব না।

—তোর বাবার রক্ত রয়েছে যে তোর শরীরে, কে তোকে আটকাবে খোকন?

—বাঁচতে গেলে বিশ্বাস লাগে, তা কেন পাই না?

—ঈশ্বরে বিশ্বাস?

—শুধু ঈশ্বরের নয়, জীবনের বিশ্বাস।

—বিশ্বাস আসবে, দেখতে পাবি। মনটা খুব উদার খুব বড়ো করে রাখিস, যাতে সুখ-দুঃখ সবই সেখানে ধরে। দেখবি, দুঃখ আর সুখ তুল্যমূল্য হয়ে গেছে—দুঃখের জন্য আর কষ্ট নেই।

কাজলের মনে হইল, মা এইভাবে দুঃখকে জয় করিয়াছে। সুখ আর দুঃখের বিরাট ভার মনের ভিতর জমা করিয়া দুইটাকে এক করিয়া দেখিতে সক্ষম হইয়াছে মা। এইটাই মায়ের স্থৈর্যের মূল কথা।

পরমেশ বলিল—কী অমিতাভ, চুপ করে আছ যে?

কাজল মুখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইতে সে অবাক হইল। পূর্বের সে আশাহত পাণ্ডুর ভাবটা কাটিয়া গিয়া নূতন একটা উদ্যমের আলো কাজলের মুখে প্রতিফলিত হইয়াছে। চোখ দুইটা চকচক করিতেছে।

—তোমাকে বেশ উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছে।

—পরমেশ, আমি বোধহয় ভুল করছিলাম। জীবনের অর্থ হয়তো সত্যিই নেই—আমার এক মাস্টারমশাই বলতেন, জীবন শুধুই sound আর fury, আর কিছু নয়। শেকস্‌পীয়রই হয়তো ঠিক, তবু বেঁচে থাকার মানে একটা খুঁজে বের করবোই পরমেশ। লোক ভুলোনো দর্শন নয়, বাস্তব একটা কিছু দিয়ে যাবো—

পরমেশ কাজলের হাত চাপিয়া ধরিল।

—আমি বিশ্বাস করি অমিতাভ, তা তুমি পারবে—

—আমাকে দূরে চলে যেতে হবে মানুষের থেকে, আরও বেশি করে মানুষের ভেতরে ফিরে আসার জন্য। আমি পেছনে হাঁটবো পরমেশ।

দুইজনে হাঁটিয়া মিউজিয়ামে গেল। পরমেশ জানে, কাজল সঙ্গে থাকিলে মিউজিয়াম দেখার আনন্দ আলাদা। বেলা গড়াইয়া বিকালের দিকে ঝুঁকিয়াছে। মিউজিয়ামে লোক প্রায় নাই বলিলেই হয়। বড়ো বড়ো মূর্তি এবং দুষ্প্রাপ্য অনেক বস্তু বোমার ভয়ে মাটির নিচে পুঁতিয়া ফেলা হইয়াছে। ঘরগুলি কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া লাগে।

পরমেশ বলিল—অনেক কিছু নেই, 'রিপ্লেসড' লেখা টিকিট পড়ে আছে।

—ইউনিভার্সিটিও বহরমপুরে উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে, জান না?

বহুদিন বাদে কাজলের মনে আবার পুরাতন আনন্দটা ফিরিয়াছে। মিউজিয়াম হইতে বাহির হইয়া দেখিল রৌদ্র পড়িয়া গিয়াছে, শীতকালের বেলা নাই বলিলেই চলে। গেটের সামনে ফুটপাতের উপর ইটের বেড় দিয়া ঘেরা কৃষ্ণচূড়া গাছ। তাহার ডালগুলি অস্তদিগান্তের পটে আঁকা বলিয়া মনে হইতেছে। বাতাস নাই, সব নিঝুম। সন্ধ্যার কেমন একটা বিষণ্ণতা—তাহাদের দিকে তাকাইয়া বুঝি ওষ্ঠে তর্জনী রাখিয়া চুপ করিতে সঙ্কেত করিতেছে।

পাতলা জামা গায়ে কাজলের শীত করিতেছিল। ফিরিতে এত দেরি হইবে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। পরমেশকে বলিল—চলো, রাত হয়ে এলো।

ধর্মতলার মোড়ে একটা বাচ্চা মেয়ে, নোংরা জামা পরা, কাজলের গায়ে ধাক্কা খাইল। কাজলের হাত হইতে বইখাতা ধুলায় পড়িয়া গেল। পালায় নাই মেয়েটি, ভয়ে পালাইতে পারে নাই। আতঙ্কে কেমন যেন হইয়া গিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। বয়স বেশি নহে, নয় কী দশ হইবে—হতদরিদ্রের চেহারা, কিন্তু চোখ দুটি উজ্জ্বল। কাজলের হঠাৎ 'ওল্ড কিউরিওসিটি শপ'-এর ডিক সুইভেলারের ছোট্ট বান্ধবীটির কথা মনে পড়িল। কাজল ভাবিল—ও ভেবেছে, আমি ওকে বকবো। কী সুন্দর চোখ দুটো ওর!

মেয়েটির হাতে একখানি একআনা দামের পাঁউরুটি, এইটি কিনিতেই সে আসিয়াছিল, রাস্তা পার হইয়া ফিরিবার সময় ধাক্কা লাগিয়াছে। পাঁউরুটি শক্ত করিয়া ধরিয়া মেয়েটি কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মেয়েটির চোখ, পাঁউরুটি আঁকড়াইয়া ধরিবার ভঙ্গি, সন্ধ্যাবেলার বিষণ্ণতা, সব মিলাইয়া কাজলের মনে একটা ঢেউ তুলিল—মেয়েটির চোখে চোখ রাখিয়া সে হাসিল। মেয়েটি হাসিল না।

কাজল বলিল—তোমার নাম কী খুকি? কোথায় থাকো?

উত্তর না দিয়া মেয়েটি রাস্তার ওপারে তাকাইল, সেখানে এক অন্ধ ভিখারি ঘোড়ার জল খাইবার চৌবাচ্চার কিনারায় বসিয়া আছে। কাজল বলিল—ও কে হয় তোমার—বাবা?

মেয়েটি ঘাড় নাড়িল। কাজল পকেট হইতে একটা আনি বাহির করিয়া বলিল—এটা তুমি নাও।

মেয়েটি কিছুতেই লইবে না। অনেক সাধ্যসাধনার পর হাত হইতে আনিটা লইয়া সে সংকুচিতভাবে হাসিল, তারপর হঠাৎ ফিরিয়া লোহার চৌবাচ্চাটা লক্ষ করিয়া দৌড় দিল।

ট্রেনে জানালার পাশে বসিয়া কাজল সমস্ত রাস্তা ভাবিতে ভাবিতে চলিল। ঠাণ্ডা বাতাসে

হাড়ের ভিতর কাঁপন ধরে। গলা বাড়াইলে দেখা যায় কালপুরুষমণ্ডলীর বেটেলজয়ুস নক্ষত্রটা লালচে আভায় ঝকঝক করিতেছে।

কাহারা গোপন ছাউনির নিচে আগুন করিয়া হাত-পাঁ সেঁকিতেছে। হাওয়ায় শীতের ঘ্রাণ, পোড়া ডালপালার ঘ্রাণ। বোমারু বিমানের ভয়ে উন্মুক্ত স্থানে আগুন জ্বালায় নাই।

ট্রেনের এঞ্জিন হইতে বারদুয়েক হুইস্‌লের শব্দ ভাসিয়া আসিল।

(কাজলের ডায়েরি থেকে)

গতকাল আমাদের একজন অধ্যাপক না আসায় একটা পিরিয়ড ছুটি পাওয়া গেল। পরমেশ লাইব্রেরিতে বসে পড়ছিল, তাকে না ডেকে আমি একাই একটু হাঁটছিলাম রাস্তায়।

অন্যমনস্ক ভাবে চলতে চলতে ভেবে দেখলাম, আমার ভেতরে যে দ্বন্দ্বটা চলছে সেটা মোটেই আকস্মিক নয়। ছোটবেলা থেকেই ধীরে ধীরে পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল, হঠাৎ একদিন বেরিয়ে পড়েছে। আমার সমস্যা অন্যের কাছে অবাস্তব, কিন্তু আমার কাছে অন্ধকারের ভেতর প্রজ্বলন্ত আগুনের মতো বাস্তব ও প্রত্যক্ষ। চিন্তার একটা বিশেষ ধাপ পর্যন্ত এসে আটকে গেছি আমি, মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারছি না। হয়তো কেউই তা পারে না।

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, চলা বন্ধ করে আমি সামনের তেতলা বাড়ির ছাদের ওপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছি। চোখ নামিয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করবো, দেখি রাস্তার ওপারে মিষ্টির দোকানে গোলমাল—রোগামতো একটা লোকের ঘাড় ধরে বিশালদেহ দোকানদার ঝাঁকুনি দিচ্ছে, আর একজন তার কাপড়চোপড়ের ভেতর হাতড়ে কী খুঁজছে। রোগা লোকটি হাতজোড় করে কী বলতে গেল—দোকানদার মারল তাকে এক রদ্দা, ছিটকে সে ফুটপাথে গিয়ে পড়ল।

ভারি খারাপ লাগল ব্যাপারটা। হাত জোড় করে লোকটা কী বলতে চাইছে, কেউ শুনছে না। রাস্তা পেরিয়ে ওপারে গেলাম—ততক্ষণে সে এক হাতে ভর দিয়ে উঠে বসেছে। থমকে গেলাম আমি, দেখলাম লোকটি রামদাস বৈষ্ণব। রামদাস বৈষ্ণবকে এরা মারছে!

—রামদাস কাকা!

রামদাস চমকে আমার দিকে তাকাল। কী চেহারা হয়ে গিয়েছে তার! চোখের নিচে গভীর কালি, চুল লালচে, উস্কোখুস্কো। শরীর শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। মারের চোটে এখনও সে অল্প অল্প কাঁপছে।

রামদাস আমায় চিনতে পেরেছে। পুরোনো দিনের মতোই খুশি-খুশি গলায় বলে উঠলো—বাবাজী, তুমি!

দোকানদার এবং তার দুই সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলাম—কী হয়েছে? আপনারা মারছেন কেন একে?

দোকানদার খিঁচিয়ে উঠল—মারবে না তো কি সিংহাসনে বসিয়ে পুজো করবে? চারআনার জিলিপি খেয়ে এখন বলছে পয়সা নেই! শালা ইয়ের বাচ্চা—

ইতর কথা এবং তাদের মুখচোখের ইতর ভাব দেখে আমার এত খারাপ লাগলো! বললাম—বৈষ্ণবকে মারতে হাত উঠলো আপনার? আবার গালগালও দিচ্ছেন—

—যান যান মশাই, অমন অনেক বোষ্টম দেখেছি। ভেক নিলেই বোষ্টম হয় না, ওসব লোক ঠকাবার ফন্দি—

রামদাসকে জিজ্ঞাসা করলাম—কী হয়েছে রামদাস কাকা?

রামদাস তখন দাঁড়িয়ে উঠেছে। বলল—গেঁজেতে পয়সা রেখেছিলাম। কখন পড়ে গেছে

বুঝতে পারিনি। সারাদিন ঘুরছি তো রাস্তায় রাস্তায়। তুমি তো জানো বাবাজী, পয়সা নেই জানলে আমি একদানাও মুখে দিতাম না এখানে—

দোকানদারের লোক বলল—ওরে আমার ধার্মিক যুধিষ্ঠির রে!

তাকে থামিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কত পয়সা আপনাদের? চার আনা? এই নিন, ছেড়ে দিন একে। চলো রামদাস কাকা—

রামদাস বলল—আমার একটা থলে ওরা রেখে দিয়েছে। একটা দোতারা ছিল সঙ্গে, সেটা ভেঙে দিয়েছে—

দোকানদার ভেতর থেকে দোতারা এবং একটা ছেঁড়া ক্যাম্বিসের থলে এনে দিলে। খানিকদূর এসে দোতারায় হাত বুলিয়ে রামদাস বললো—এটা একদম ভেঙে দিয়েছে বাবাজী। তারগুলো ছিঁড়ে দিয়েছে, আর বাজানো যাবে না—

থলের ভেতর হাতড়ে খঞ্জনীটা বের করল সে, হেসে বলল—এটা নেয় নি। যাক, একটা তবু রইলো—

খঞ্জনী বাজিয়ে সে তার অভ্যেসমতো হাসলো। বলল—জয় গুরু, জয় গুরু!

—তুমি হাসছ রামদাস কাকা! তোমাকে ওরা অপমান করল, মারল—তার পরেও হাসছো?

—হাসবো না কেন? দুঃখ করার সময় কোথায় আমার?

—ওদের ওপর রাগ হচ্ছে না?

—না বাবাজী, সত্যি বলছি—ওরা যদি বুঝতো খারাপ কাজ, তাহলে কি আর মারত আমাকে? না বুঝে যা করেছে তার জন্য ওদের আমি দোষ দেব না। গুরু ওদের ভালো করুন।

—তুমি বড়ো ভালো মানুষ রামদাস কাকা। আমরা হলে অপমান সইতে পারতাম না।

মার খাওয়াটা যেন ভারি একটা মজার ব্যাপার, রামদাস এমনিভাবে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল—একটা কথা তো তোমায় বলা হয়নি বাবাজী, আমার যক্ষ্মা হয়েছে।

যক্ষ্মা রামদাসের! সে কথা এতক্ষণ না বলে দিব্যি হাসছিল সে!

—কী বলছো রামদাস কাকা! যক্ষ্মা?

—হ্যাঁ, বাবাজী। ডাক্তার দেখাতে এসেছিলাম কলকাতায়। গাঁয়ের ডাক্তার বললো শহরে গিয়ে দেখাতে। হাসপাতালে হাঁ করে বসেছিলাম সারাদিন, আমার ডাক আসার আগেই ডাক্তারের রুগী দেখার সময় পেরিয়ে গেল। চাপরাসী বলেছে, কাল যেতে। কাল যাব আবার—

—রাত্তিরে থাকবে কোথায়?

—শুয়ে পড়ব রাস্তার ধারে কোথাও কাপড় মুড়ি দিয়ে। রাস্তায় শুলে তো মারবে না।

এই হিমবর্ষী রাতে রামদাস অচেনা শহরের ফুটপাতে শুয়ে থাকবে, খাওয়া মিলবে কিনা ঠিক নেই। তা সত্ত্বেও সে হাসছে।

—তুমি আমার সঙ্গে চলো রামদাস কাকা, আমাদের বাড়ি চলো। আমি তোমায় ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করে দেবো।

খঞ্জনী বাজাতে বাজাতে রামদাস বললো—তা হয় না। কালব্যাধি হয়েছে, বড্ড ছোঁয়াচে। এ রোগ আমি তোমার বাড়িতে ছড়াতে পারবো না। এই জন্য দোকানেও আজকাল শালপাতায় খেয়ে আঁজলা ভরে জল খাই। এঁটো গেলাসে থালায় খেয়ে অন্য লোকের যদি অসুখ করে!

কিছুতেই সে যেতে রাজি হলো না। পকেট থেকে তিনটে টাকা (এ ছাড়া আমার কাছে আর ছিল না) বের করে বললাম—টাকা ক'টা তোমায় নিতে হবে। কোনো আপত্তি শুনবো না—তোমার এখন টাকার দরকার।

আমার দিকে তাকিয়ে রামদাস একটুখানি ভেবে তারপর বলল—দাও।

—থলের ভেতরে কিছুতে বেঁধে রাখো, আবার না হারায়।

কাপড়ের খুঁটে সে শক্ত করে বেঁধে নিল। বাঁধবার সময় ফ্যাঁস করে একটু ছিঁড়ে গেল কাপড়টা। রামদাস মুখ তুলে অপ্রতিভ ভাবে হেসে বলল—বড্ড পুরোনো কিনা।

—আবার দেখা কোরো, আমাদের বাড়িতে যেয়ো কাকা।

—যদি গুরু টেনে না নেন, নিশ্চয়ই যাবো খোকন।

—আমাকে খোকন বলছো, আমি কিন্তু আর ছোট নেই।

রামদাস হেসে স্নেহপূর্ণ চোখে আমার দিকে তাকাল। একটা হাত আমার কাঁধে রেখে কী বলতে গিয়ে হাতটা সরিয়ে নিল। বলল—তোমাকে না ছোঁয়াই ভালো। যদি তোমার যক্ষ্মা হয়।

তাকিয়ে দেখলাম, ভবঘুরে রামদাস গুনগুন করে গান করতে করতে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। জানি না, তার সঙ্গে আর. দেখা হবে কিনা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

(কাজলের ডায়েরি থেকে)

আজ রাত্তিরে অপূর্ব জ্যোৎস্না উঠেছে। রাস্তার পাশের গাছে বাসা বেঁধে থাকা পাখিগুলো ডাকছে সকাল হয়ে গেছে মনে করে। চাঁদের আলোয় একবার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ঘাসের ওপর হালকা শিশির চক্ চক্ করছিল।

অনেকদিন আগে আমার পোষা কুকুর কালু যখন মারা যায়, মা বলেছিলেন—দেখিস বুড়ো, ভগবান ঠিক এসে বসে আছেন ওর কাছে। সেদিন আমি মার কথা বিশ্বাস করতে পেরেছিলাম, আজ হয়তো আর পারবো না। তবে এক নতুন বিশ্বাসে আমার মন ভরে উঠছে। ধর্মতলার মোড়ে সেদিনকার সেই খুকিটা, যে পাঁউরুটি শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়েছিল, সোলেগাব-এর গল্পের সেই আশি বছরের দুঃখী বুড়ো, সবাইকে আমার কত আপন বলে মনে হচ্ছে। এদের প্রতি ভালোবাসা আমার অন্ধকার ঘরে একটা নতুন জানালা খুলে দিয়েছে।

ক'দিন ধরে খুব নিশ্চিন্দিপুরে যেতে ইচ্ছে করছে। এখন সেখানেও শুকনো বাঁশপাতা ঝরে ঝরে বাঁশবাগানের পথ আচ্ছন্ন হয়ে আছে, সোঁদা গন্ধ উঠছে বাঁশতলা থেকে। দুধরঙের সজনেফুল ঘন নীল আকাশের পটে থোকা থোকা ফুটে আছে। আমাদের পুরোনো ভিটের সজনেগাছটা—সেটা ঠেলে উঠেছে আকাশে মাথা তুলে অনেকখানি। নদীতে নৌকোয় বসে থাকা মাঝি হঠাৎ বোঝে, জলে জোয়ারের টান লেগেছে। একটু একটু করে কর্দমময় তীর ঢেকে গিয়ে জল বাড়তে থাকে।

আমাদের পুরোনো ভিটে কি চিরকালই অমনি পড়ে থাকবে—চামচিকে আর বাদুড় বাসা বানাবে কেবল? বাবার স্মৃতি কি একেবারে মুছে যাবে আমাদের সুন্দর গাঁ নিশ্চিন্দিপুর থেকে? আমি তা হতে দেবো না। আমি মাকে নিয়ে আবার ফিরে যাবো গাঁয়ে। শহর আমার থেকে যা কেড়ে নিয়েছে, আমার গ্রাম আমাকে তা ফিরিয়ে দেবে।

বেচারি রামদাসের কথা বড়ো মনে পড়ছে এ সময়। এবার দেখা হলে বলবো—দুঃখ করো না রামদাস কাকা, আমি তোমাকে একটা নতুন দোতারা বানিয়ে দেবো

—ঃ ঃ—

তৃতীয় পুরুষ



পঁচিশ বছরের রজতজয়ন্তী সঙ্গিনী

মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

চিরপরিণীতাসু



ভূমিকা

'কাজল'-এর প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো সত্তর-এর জুলাই মাসে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। শুরু করেছিলাম আরো অনেক আগে, যখন একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। ত্রিশ কী বত্রিশ পাতা লিখে ফেলে রেখেছিলাম। এম.এ. পড়বার সময় সাহিত্যিক মনোজ বসুর প্রেরণায় গরমের ছুটিতে মাত্র দু মাসে লেখাটি শেষ করি।

তারপর সাতাশ বছর কেটেছে। এই দীর্ঘ আড়াই দশকেরও বেশি সময়ে অনেক চিঠি পেয়েছি, সভা-সমিতিতে বহু মানুষ জিজ্ঞাসা করেছেন—তারপরে কাজলের কী হল? সে কি ফিরে গেল নিশ্চিন্দিপুরে? কী পেশা গ্রহণ করল সে? কে কে তার জীবনে এল এবং গেল?

এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার একটা দায় অনুভব করেছি। তাই কাজলের এ দ্বিতীয় পর্ব। আমার জীবন, আমার উপলব্ধির প্রতিফলন কাজল। আমার বর্তমান বয়েস পর্যন্ত কাজলকে এনে বই শেষ করলাম। এর পরে কী হবে তা তো আর আমি জানি না।

প্রথম পর্বের ভূমিকা মা লিখেছিলেন। অনেক পাঠক বলেন ভূমিকাটি না কি মূল উপন্যাসের চেয়েও ভালো হয়েছিল। মা নেই, চলে গিয়েছেন গতবছর। আমার লেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কি বইটি পড়লেন? কেমন লাগল তাঁর?

এই পর্বও সাধুভাষায় লিখলাম। ভাল কি মন্দ করলাম জানি না, কিন্তু চলিত বাংলায় লিখলে পূর্বের তিনটি উপন্যাসের সঙ্গে মেজাজের মিল হত না। দীর্ঘ ছ বছর লাগল এই বই লিখতে। শুরু করবার পর এসে গিয়েছিল বিভূতিভূষণ জন্মশতবর্ষ। প্রায় তিনবছর কিছুই লিখিনি।

গল্প জমাবার প্রলোভনে লুব্ধ হইনি, প্রকৃত জীবনকে মর্যাদা দিয়েছি। তবে লেখক লেখেন বটে, কিন্তু গ্রন্থ আসলে পাঠকদের। শেষ বিচারও তাঁদেরই।

কৃতজ্ঞতা 'মিত্র ও ঘোষ' -এর সবার প্রতি। তাঁরা আজীবন আমার ওপর স্নেহবর্ষণের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ।।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

হেমন্তের পড়ন্ত হলুদ রৌদ্র বেলা যাইবার সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব মায়াময় হইয়া উঠিলে চিরকালের অভ্যাসমতো কাজল একটা খাতা বা বই হাতে বাহির হইয়া পড়ে। জীবনে এমন কিছু শিক্ষা আছে যাহা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুমহাশয়রা দান করিতে পারেন না, অথচ যাহার উপর নির্ভর করিয়াই মানুষের জীবন আবর্তিত হয়। প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য হইতে কাজল সেই একান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করিতেছিল। সদ্যোজাত শিশুকে যেমন মাতৃস্তন্য পান করিবার কৌশল শিখাইয়া দিতে হয় না, আপন ক্ষুধার তাড়নায় এবং সহজাত প্রবৃত্তিবশত সে নিজেই জীবনদায়িনী পীযূষধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়—তেমনি কাজলের হৃদয়ের একেবারে গভীরে যে বিপুল ক্ষুধা জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহারই নিবারণের জন্য সে ব্যগ্র দুই হাতে প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে বাঁচিবার উপাদান সংগ্রহ করিয়া লইতেছিল।

তার সহজাত প্রবৃত্তির দিকটা আসিয়াছিল বাবার কাছ হইতে। বাহিরে যতই আলো থাক, বন্ধ ঘরে সে আলো প্রবেশ করে না। বাবা তাহার মনের জানালাগুলি নিজের হাতে খুলিয়া দিয়া গিয়াছে।

বয়েস বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কাজল লক্ষ করিল অশৈশব লালিত সহজ বিশ্বাসগুলি একে একে বিদায় লইতেছে। দেবমূর্তি দেখিলে অভ্যাসবশত এখনও দুই হাত প্রণামের ভঙ্গিতে কপালের দিকে ওঠে বটে, কিন্তু তাহার সহিত বিশ্বাস ও প্রাণের যোগ থাকে না। মানুষের সারল্য এবং ভালো দিকের ওপর যে গভীর আস্থা ছিল, দুনিয়ার রকমসকম দেখিয়া তাহাও অনেকখানি ক্ষয় পাইয়াছে। বস্তুত এখন তাহার মনে হয় পৃথিবীর বেশির ভাগ লোক জীবনের গূঢ় রহস্য জানিবার জন্য বা সততাব পরীক্ষা দিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া নাই, তাহারা বাঁচিয়া আছে জীবনযাপনের খেলায় মোটারকম লাভ করিয়া সুখে কাল কাটাইবার জন্য। কেহ অন্যরকম কিছু করিলে তাহারা অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকে।

প্রকৃতির অনাদ্যন্ত প্রসারের মধ্যে এই হীনতা নাই। সেখানে সব কিছুই বড়ো মাপের। আকাঙ্ক্ষা, বিস্ময়, আনন্দ এবং বেদনা যত বড়ো মাপেরই হোক, প্রকৃতির বিস্তারের ভিতব তাহা বেশ খাপ খাইয়া যায়। বোধহয় এই কারণেই তীব্র হর্ষ বা বেদনার মুহূর্তে মানুষ উর্ধ্বমুখে আকাশের অসীমতার দিকে তাকায়। বোধহয় এইজন্যই কাজল জীবনের গূঢ় প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজিবার জন্য বই হাতে মাঠের দিকে চলিয়া যাইবার অভ্যাস করিয়াছিল।

কিছুই তুচ্ছ নয়, কিছুই ফেলিয়া দিবার মতো নয়। গ্রামের পথে চলিয়া যাইতে যাইতে বাঁশঝাড়ের পাশে কুড়াইয়া পাওয়া একটা পাখির পালক—তাই যেন কী অমূল্য সম্পদ! বহুদিন পরে পুরানো ডায়েরির পাতার ভাঁজ হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া পালকটা মনোরাজ্যে কী ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত করে। কবেকার বিস্মৃত প্রথম যৌবনের আনন্দমাখা দিনের স্পর্শ এখনও উহার গায়ে লাগিয়া আছে। কী হইয়াছিল সেদিন? কেমন করিয়া সূর্য উঠিয়াছিল? দক্ষিণ হইতে বহিয়া আসা সুরভিত বাতাস কোন্ স্বপ্নরাজ্যের সন্ধান দিয়াছিল?

সমস্তটা মনে পড়ে না। পাখিটাও মরিয়া গিয়াছে হয়তো কবেই। তবু ফেলিয়া দেওয়া যায় না। রেলওয়ে স্টেশনের সামনে হইতে পরবর্তী মহকুমা শহরের দিকে যে পাকা সড়ক চলিয়া গিয়াছে তাহা ধরিয়া মাইলখানেক হাঁটিলেই পথের দুইধারে ছোট ছোট সুন্দর গ্রাম পড়িতে থাকে। রঙ্গপুর, সাঁইবনা—ভারি মিষ্টি নাম গ্রামগুলির। এই সড়ক ধরিয়া মাইল তিনেক যাইবার পর বাঁদিকে নামিয়া গেলে একটা বিশাল বিলের প্রান্তে রাস্তা শেষ হইয়া যায়। গতবৎসর বসন্তকালে আমের বউল

দেখিবার জন্য বাহির হইয়া কাজল জায়গাটা আবিষ্কার করিয়াছে। সেই প্রথম দিনটার কথা সে কখনও ভুলিবে না। পাকা সড়ক হইতে নামিয়া প্রথমে চাষিদের কয়েকটি বাড়ি—খড়ের চাল, গোবর দিয়া উঠান নিকানো। শালিক চড়ুইয়ের দল মাটিতে ছড়ানো শস্যের দানা খুঁটিয়া খাইতেছে। উঠানের প্রান্তে মাচার উপর শসা, কুমড়া বা লাউয়ের লতা বাড়িয়া উঠিয়াছে। বাতাসে রৌদ্রদগ্ধ মাটির গন্ধ। সব মিলাইয়া চারদিকে কেমন একটা শান্তির ছবি। বাড়ি কয়খানা ছাড়াইলেই একটা বেশ বড়ো আমবাগান। সবগুলি গাছেই অসম্ভব বউল আসিয়াছে, পাতা দেখা যায় না। আশ্চর্য গভীর সুবাসে বসন্ত-অপরাহ্ণের বাতাস মদির হইয়া আছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'লাইনস্ রিট্ন্ ইন আর্লি সামার' মনে পড়াইয়া দেয়। কবিরা ঠিকই বলেন, এইরূপ গন্ধে মাতাল হইয়া মৌমাছিরা ফুলের উপর ঘুমাইয়া পড়িতে পারে বটে।

ওই বসন্তের রৌদ্র, ওই প্রস্ফুটিত আম্রমুকুলের সৌরভ আরও যেন কত কী কথা মনে আনিয়া দিয়াছিল। কবেকার হারাইয়া যাওয়া হাসিকান্না এবং জীবনযাপনের ইতিহাস—এই জন্মের কয়েকটা বৎসর মাত্র নয়, অতীত ও বর্তমানের সীমারেখার উর্ধ্বে কোন নিত্য আনন্দের রাজ্যে যে শাশ্বত জীবনপ্রবাহ চিরবহমান, সেদিনের আমের বউলের মাদকতাময় গন্ধ সেই দৈবী জীবনের স্পর্শ এক খণ্ডমুহূর্তের জন্য বহন করিয়া আনিয়াছিল।

তার পর হইতে কাজল মাঝে মাঝে এখানে বেড়াইতে আসে। নির্জন স্থান আরও আছে, কিন্তু দিগন্তপ্রসারী বিলের ধারে পিটুলি ফলের গাছের নিচে তাহার প্রিয় জায়গাটিতে বসিলেই চোখে কে যেন স্বপ্নের তুলি বুলাইয়া দেয়। অন্য স্থানে সহসা এমন হয় না। জায়গাটার গুণ আছে মানিতেই হইবে।

বিলের ধারে পৌঁছাইতে বৈকাল সাড়ে-তিনটা বাজিয়া গেল। এ বৎসর প্রায় কালীপূজা পর্যন্ত বেশ ভালোরকম বৃষ্টি হইয়াছে। ফলে অন্যান্য বৎসরের মতো হেমন্তের শেষে বিল শুকাইয়া যায় নাই, এখানে-ওখানে জল বাধিয়া আছে। পিটুলি গাছের তলায় যেখানে সে বসে তাহার কাছেই হাঁটুসমান জল ও কাদার মধ্যে দাঁড়াইয়া একটা লোক লম্বামতো অর্ধমগ্ন কী জিনিস লইয়া ভয়ানক ধস্তাধস্তি করিতেছে। ব্যাপার কী দেখিবার জন্য কাজল তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

রহস্যময় প্রচেষ্টায় সাময়িক ক্ষান্তি দিয়া লোকটা সোজা হইয়া কোমরে জড়ানো গামছা খুলিয়া কপালের ঘাম মুছিতে লাগিল। কাজল বলিল—কী করছো ভাই? ওটা কি জলের মধ্যে?

লোকটা মুখ তুলিয়া কাজলকে দেখিল—এবং কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না। কাজল কে, কোথা হইতে আসিয়া এই মাঠের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ না করিয়া এমন সহজ স্বরে কথা বলিতে আরম্ভ করিল যে, শুনিলে মনে হইতে পারে গত একঘণ্টা ধরিয়া সে কাজলের সহিত তাহার সমস্যার বিষয়ে গভীর আলোচনা করিতেছে।

—আর বলেন কেন দাদাবাবু! রোজই তো সাবধান করি, করি না? তবু এমন বজ্জাতি করলে ঠাণ্ডা মানুষের মাথায় রক্ত ওঠে কিনা আপনিই বলেন? বলি, পয়সা দিয়া কেনা জিনিস তো—নাকি মাগনার? আপনার কাছে আর মিথ্যে বলি কেন, গণেশ ছুতোর এখনও তিন গণ্ডা টাকা পাবে এর দরুন। পই-পই করে বারণ করি রোজ, রোজ তবু সেই একই কাণ্ড!

কাজল মাথা চুলকাইয়া বলিল—কিন্তু জলের মধ্যে ওটা কী?

—নৌকো দাদাবাবু, নৌকো! বিলের ভেতর মাছ ধরে যা দু-পয়সা পাই তাতে কষ্টেস্রেষ্টে সংসার চলে, আর গরমেন্টের রাস্তার ধারে নতুন গাঁয়ের ছেলেগুলো রোজ করবে কি, নৌকোখানা ডুবিয়ে রেখে যাবে! একবার ধরতে পারলে ঠেঙিয়ে বেন্দাবন দেখিয়ে দেব—

কোমরে গামছা জড়াইয়া লোকটা আবার কিছুক্ষণের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় জলমগ্ন নৌকাটি সোজা করিয়া ভাসাইয়া তুলিল। জিনিসটাকে নৌকা বলিলেও চলে, ডিঙি বলিলেও মিথ্যা বলা হয় না। পাড়ে রাখা ছোট হাতজাল, দুই-তিনটা মেটে কলসী আর একখানা দাঁড় গুছাইয়া লইয়া লোকটা

নৌকায় গিয়া উঠিল। দাঁড়ের ধাক্কায় সে পাড় হইতে দূরে সরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় কাজল বলিল—আমি উঠব তোমার নৌকোয়? নেবে আমায়?

লোকটার শরীরে কৌতূহল বলিয়া জিনিস নাই। কাজল কে, কেনই বা সে নৌকায় সঙ্গী হইতে চাহিতেছে এসব কালক্ষেপকারী অকারণ প্রশ্ন না তুলিয়া সে সহজ গলায় বলিল—উঠবেন? উঠে পড়ুন তাহলে—

—উলটে যাবে না তো?

গণেশ ছুতারের তৈয়ারি এই অপূর্ব শিল্পকীর্তি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করাতে লোকটা কিঞ্চিৎ চটিয়া গেল। বলিল—ডুবে যাবে জানলে কী উঠতে বলতাম?

আর বাক্যব্যয় না করিয়া কাজল সন্তর্পণে নৌকায় উঠিয়া পড়িল। নৌকা বিপজ্জনকভাবে দুইদিকে কয়েকবার দুলিয়া আবার সমান হইল বটে, কিন্তু কাজল দেখিল গৌরবার্থে নৌকা বলিয়া প্রচারিত এই সংকীর্ণ ডিঙিতে দাঁড়াইয়া থাকা সম্ভব নয়। সে সাবধানে উবু হইয়া বসিয়া দুইদিকের কানার কাঠ চাপিয়া ধরিল। লোকটা তাহা দেখিয়া বলিল—কী, ভয় করছে বুঝি?

কাজল হাসিয়া বলিল—না, ভয় করবে কেন? তবে অভ্যেস নেই তো, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না!

তারপর জলের দিকে তাকাইয়া বলিল—অবশ্য পড়ে গেলেই বা কী? এখানে জল বোধহয় এক কোমরও হবে না, তাই না? আমি শীতকালে এসে শুকনো মাঠ দেখে গিয়েছি।

—জল কম, কিন্তু কাদা বেশি। পড়লে থকথকে কাদায় গেঁথে যাবে বুক অবধি। তাছাড়া এ বিল বড়ো খারাপ জায়গা, এখানে জলের নিচে কালামনিষ আছে—

কাজল অবাক হইয়া বলিল—কালামনিষ আবার কী?

—তা জানিনে। তাকে তো কেউ দেখতে পায় না। কেবল জলে পড়ে গেলে, কিংবা নৌকো থেকে পা ঝুলিয়ে বসলে কালামনিষ সাঁই করে জলের নিচে টেনে নেয।

কাজল বলিল—বিলের এটুকু জল তো আর ক-দিনের মধ্যেই শুকিয়ে যাবে, তখন কালামনিষকে দেখতে পাওয়া যাবে না?

লোকটা একবার বক্রচোখে কাজলের দিকে তাকাইল, তারপর বলিল—না, জল শুকোনোর আগেই কালামনিষ মাটির তলায় চলে যায়। একবচ্ছর মাটির নিচে ঘুমোবার পর নতুন বর্ষার জল পেলেই তার ঘুম ভাঙে। সেজন্য প্রথম বর্ষার সময়টা বড্ড খারাপ দাদাবাবু—কালামনিষের পেটে তখন দারুণ খিদে, বছরভোর খায়নি কিনা। নির্জন বিলের মধ্যে একা পেলেই হল, সে মানুষকে আব ফিরতে হচ্ছে না।

—তোমার পরিচিত কাউকে কখনও কালামনিষ ধরেনি?

—ধরেনি আবার! এই তো তিনবছর আগেকার কথা, আষাঢ়ের শেষ, বুঝলেন? চার-পাঁচদিন ধরে উপুরঝান্ত বিষ্টি হচ্ছে, দুপুরবেলা মেঘে সন্ধের মতো অন্ধকার। আর কী বাজ পড়া! গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজে কানে তালা লেগে যায়! শোঁ শোঁ করে ভেজা বাতাস বইচে সারাদিন। এর মধ্যে দুপুরে কাঁচালঙ্কা আর পেঁয়াজ দিয়ে পান্তাভাত খেয়ে আমাদের গ্রামের নবীন হালদারের ছেলে হারাধন খ্যাপলা জাল আর পোলো নিয়ে বিলে গেল মাছ ধরতে। তার ঠাকুরমা বারণ করেছিল—'হারু, এই দুজ্জোগে বেরুস্ না মানিক আমার!' তা দাদাবাবু, হারাধনকে তখন কালে ধরেছে, সে ভালো কথা কানে তুলবে কেন? তারপর দুপুর যায়, বিকেল যায়, হারাধন আর ফেরে না। তার ঠাকুরমা কান্নাকাটি শুরু করাতে গ্রামের লোকজন দল বেঁধে খুঁজতে বেরিয়ে বিলের ওপারে হারাধনের দেহ দেখতে পায়। কাদাজলের ভেতর মুখ-গুঁজড়ে পড়ে ছিল, পোলোটা পাশে পড়ে, কিন্তু খ্যাপলা জালখানা আর পাওয়া যায়নি।

—বেঁচে ছিল?

—না দাদাবাবু, মরে কাঠ। শরীলে কোনো দাগ নেই, ঘা নেই—শুধু এমনি এমনি প্রাণটা বেরিয়ে গিয়েছে—

কাজল বলিল—সাপেও তো কামড়ে থাকতে পারে?

—সাপে কামড়ালে শরীলে তার দাগ থাকবে তো? তাছাড়া সাপে কাটলে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মরে যায় না। তেমন হলে গামছার বাঁধন দিয়ে বাড়ি পৌঁছে যেত হারাধন।

—শরীরটা যখন খায় না, তাহলে খামোকা কালামনিষ মানুষ ধরে কেন? তার পেটই বা ভরে কীভাবে?

লোকটা দাঁড় টানা বন্ধ করিয়া বলিল—কালামনিষ মাংস খায় না, রক্ত খায়। হারাধনের দেহটা ফ্যাকাসে মেরে গিয়েছিল।

বেলাশেষের আকাশ দিগন্তপ্রসারী বিলের ওপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বহুদূরে একটি গ্রামের সীমারেখা দেখা যায়। প্রান্তরের উপর আসন্ন সন্ধ্যায় হাল্‌কা কুয়াশা জমা হইতেছে। কোথা হইতে একটা পাখি ডাকিয়া উঠিল—ট্রি-ট্রি-ট্রি—

হারাধন সম্ভবত বজ্রাহত হইয়া মারা পড়িয়াছিল, ঝড়বৃষ্টির সময় খোলা মাঠে জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিলে যা হয়। কিন্তু এই সরল মানুষটিকে বিজ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াইয়া লাভ নাই। ইহার সরল জীবনযাত্রা, সামান্য দুই-একটা অপ্রাকৃতে বিশ্বাস ইহার জীবনকে সরস ও অর্থপূর্ণ করিয়াছে। যুগান্তের চর্চায় সঞ্চিত সেই জীবনদৃষ্টিকে আধুনিক বিজ্ঞানের আঘাতে ধ্বংস করিয়া তাহার বদলে কোন্ নতুন মূল্যবোধ সে ইহার হাতে তুলিয়া দিবে? না, কালামনিষই ভালো!

মুখে বিশ্বাস, ভয় এবং সম্ভ্রম একসঙ্গে ফুটাইবার চেষ্টা করিতে করিতে কাজল বলিল—সত্যি, এ ঘটনা শোনবার পরে আর অবিশ্বাস থাকে না বটে। তুমি অনেক কিছু দেখেছো, না? আমি মাঝে মাঝে এসে তোমার গল্প শুনে যাব।

প্রাজ্ঞতার অভিমানে লোকটি একখানা বিড়ি ধরাইল।

বিলের প্রায় অপর প্রান্তে জল শেষ হইয়া চাষের ক্ষেত শুরু হইয়াছে। সংকীর্ণ একটি নালা দিয়া বিলের জল বাহির হইয়া চাষের জমিতে পড়িবার ব্যবস্থা করা আছে। নালার মুখে বেতের একটি বাক্সমতো বসানো, জল তাহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। লোকটি জলের মধ্যে হাত দিয়া ছোট আর মাঝারি আকারের কয়েকটি মাছ সেই বাক্সের ভিতর হইতে বাহির করিয়া মেটে কলসীতে পুরিল।

আবার এপারে ফেরা। বিলের ধারে ধারে অগভীর জলকাদার মধ্যে লম্বা লম্বা ঘাস জন্মাইয়াছে। অনেক দূরে মাঠের উপর দিয়া সাদারঙের কয়েকটা গরু সন্ধ্যার আভাস পাইয়া বাড়ির দিকে ফিরিতেছে। জলের উপর দাঁড়ের ছপছপ শব্দ। পশ্চিম আকাশে মেঘের স্তূপে যেন অগ্নিকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি পড়িয়াছে। কাজলের মনে হইল—When barred clouds bloom the soft-dying day। এখানে সময়ের আলাদা কোন মূল্য নাই, মহাকাল এখানে মানুষের নির্মিত মানযন্ত্র দ্বারা কৃত্রিমভাবে খণ্ডিত নয়। আকাশের নিচে শুইয়া থাকা এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে, এই বিলের প্রসারে, দূরের ওই আবছা-দেখিতে-পাওয়া গ্রামে দ্রুতগতিতে ধাবমান কাল কোনও প্রভাব ফেলিতে পারে নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া শান্তভাবে দিন আসে যায়, বিলের ধারে জলজ ঘাসের সারি বাড়িয়া ওঠে—আবার ঋতুর অন্তে শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িয়া যায়। নদী দিক্‌পরিবর্তন করে, উদ্ধত রাজচক্রবর্তীর বিজয়স্বপ্ন শরতের মেঘের মতো কোথাও কিছুমাত্র চিহ্ন না রাখিয়া মিলাইয়া যায়—কেবল সরল, পরিশ্রমশীল সাধারণ মানুষের কালজয়ী জীবনপ্রবাহ সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করিয়া শাশ্বতধারায় বহিতে থাকে। সাক্ষী থাকে কেবল আকাশের নক্ষত্রেরা।

বিলের এপারে আসিয়া নামিতে নামিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। কাজল জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নাম কী ভাই? সেটাই তো জানা হল না—

লোকটি বলিল—আমার নাম কানাই। কানাই জেলে বললে, এখানে সবাই চিনবে।

—আমি কিন্তু সময় পেলেই আসব তোমার কাছে। গল্প শুনব।

কানাই জেলে গল্প বলিতে পারে বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত সংলাপ খুব বেশিক্ষণ চালাইবার ব্যাপারে তাহার পারদর্শিতা নাই। সে সংক্ষেপে বলিল—আসবেন।

কাজল পেছন ফিরিয়া কয়েক পা চলিয়া আসিয়াছে, কানাই জেলে পিছন হইতে ডাকিল—দাদাবাবু, ও দাদাবাবু!

কাজল তাকাইয়া দেখিল কানাই কী একটা হাতে লইয়া তাহার দিকে আগাইয়া আসিতেছে। সে বলিল—কী হয়েছে কানাই? কিছু বলবে?

তাহার হাতে কচুপাতায় জড়ানো একখানি আন্দাজ দেড়পোয়া ওজনের শোলমাছ দিয়া কানাই বলিল—নিয়ে যান, রান্না করে খাবেন—

সরল মানুষটির আর কিছু নাই। প্রথম পরিচয়ের নিদর্শনস্বরূপ তাই সে তাহার সারাদিনের পরিশ্রমের কিছু অংশ কাজলকে দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অপুর বইগুলি বিক্রি হইতেছে মন্দ না। সব বইয়ের একাধিক সংস্করণ হইয়া গিয়াছে, দু-একখানার তো পঞ্চম মুদ্রণ চলিতেছে। মোট বিক্রয়ের দিক হইতে দেখিলে অবশ্য এমন কিছু একটা হৈ-হৈ ব্যাপার নয়—কারণ বাজার-চলতি অনেক সস্তা নাটক-নভেল বা গোয়েন্দাকাহিনী ইহা অপেক্ষা বেশি বিক্রি হইয়া থাকে—কিন্তু নতুন একজন লেখকেব আত্মপ্রকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এমন বাজার পাওয়া একটু অদ্ভুত ব্যাপার বইকি। পৃথিবীর মহৎ উপন্যাসগুলির পটভূমি কাজল পড়িয়া দেখিয়াছে—অজস্র প্রকাশক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইবার পর কোনও ক্ষুদ্র সংস্থা অনাদরে ছাপিয়াছে। লেখকের জীবদ্দশাতে হয়তো প্রথম সংস্করণই শেষ হয় নাই। পঞ্চাশ বৎসর পরে সেই বই লইয়া সবাব কী মাতামাতি। কিন্তু সমস্তটা যাহার সাধনার ফল, সেই লেখক ততদিনে দারিদ্র্যে ভুগিয়া অনাহারে কষ্ট পাইয়া মারা পড়িয়াছে। তখন আর তাহার স্মৃতিতে প্রতিবছর সভা করিলে বা রাস্তার মোড়ে একশত ফিট উচ্চ স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিলে সে বেচারার কী লাভ? কাজল হারম্যান মেলভিল-এর জীবনী পড়িয়া দেখিয়াছে, মেলভিলের ঠিক এরূপ হইয়াছিল। 'মবি ডিক' মেলভিলের জীবৎকালে মাত্র তিন-চারশত কপি বিক্রয় হয়, চরম দারিদ্র্য এবং কষ্টের ভিতর লেখক মারা যান। সরকারের সৎকার সমিতি আসিয়া তাঁর দেহ সমাধিস্থ করিবার ব্যবস্থা করে। অনেকদিন পরে যখন সবাই 'মবি ডিক'-কে পৃথিবীর দশটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম বলিয়া মত দিল, প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ কপি বই বিক্রি হইতে লাগিল, তখন মেলভিলের সমাধিতে মালা দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ভক্তেরা আবিষ্কার করিল—সমাধিটাই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না! কবর দিবার সময়ে সরকারি লোকেরা তো আর ভাবে নাই যে, একদিন এই ভিখারিটা বিখ্যাত লোক হইবে! তাহারা মেলভিলের নামটা পর্যন্ত সমাধিপ্রস্তরে লিখিয়া রাখে নাই।

তুলনামূলক দিক দিয়া পাঠকেরা অপুর রচনাকে প্রথম হইতেই সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। কৃত্রিমতার স্পর্শহীন সরল ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবন ও বিশ্বের সহজ ভালোবাসার প্রকাশ সহৃদয় পাঠকদের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছিল। অপুর অকস্মাৎ মৃত্যু তাহাদের সহানুভূতিকে স্পর্শ করিল। রচনার স্বকীয় গুণ থাকা সত্ত্বেও যে মনোযোগ পাইতে একযুগ সময় লাগিত, মৃত্যুর প্রশান্ত মহিমা এক বৎসরের মধ্যেই বইগুলিকে সেই পরিচিতি দান করিল।

বইগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রয়োজনে কাজলকে মাঝে মাঝেই কলেজ স্ট্রীটে প্রকাশকদের কাছে যাইতে হয়। সেদিন বাবার বইয়ের নতুন এডিশন সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিয়া কাজল প্রেসিডেন্সি

কলেজের রেলিং-এ পুরাতন বইয়ের বাজারে বই দেখিতে গেল। বেশির ভাগই বাজে বই, কিন্তু ধৈর্য ধরিয়া খুঁজিতে পারিলে দু-একখানা ভালো বই বাহির হইয়া পড়ে। তবে সস্তায় সওদা করিবার উপায় নাই, দোকানীরা বিশেষ শিক্ষিত না হইলেও কোন বইয়ের কী দাম হইতে পারে তাহা বেশ ভালোই জানে।

একটা দোকানে এডগার ওয়ালেস এবং ওয়েস্টার্ন কিছু বইয়ের ফাঁকে কাজল জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা বই দেখিতে পাইয়া টানিয়া বাহির করিল। বইখানা রবার্ট এস. বল্‌ নামে কোনও লেখকের রচিত। আঠারোশ নিরানব্বই সালে লন্ডনে ছাপা। এ বইয়ের এখন আর খুব মূল্য নাই, কারণ গত চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছরে বিজ্ঞানের জগতে কত নতুন তথ্য আসিয়াছে, কত বৈপ্লবিক পরিবর্তন জানা ছিল না, আরও কত কী ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ছিল। তবু বইখানার প্রতি কাজল কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করিল। বৈজ্ঞানিক তথ্যের জন্য নহে, বইটির সহিত জড়িত রহস্যের বোধের জন্য। দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিল—এটার দাম কত ভাই?

দোকানী অভিজ্ঞ ব্যক্তি, সম্ভবত কাজলের জন্মেব আগে হইতে পুরাতন বই কেনাবেচা করিতেছে। সে কাজলের মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার আগ্রহের পরিমাণ আন্দাজ করিবার চেষ্টা করিল, তারপর গম্ভীরভাবে বলিল—ওখানা দেড়টাকা—

কাজল একটু অবাক হইল। এ বিষয়ের উপর নতুন বই-ই তো দু-টাকা আড়াই টাকায় পাওযা যায়। লোকটা এমন সৃষ্টিছাড়া দাম হাঁকিতেছে কেন? সে বলিল—এত? বারো আনা দেব?

দোকানদার উদাস ভঙ্গিতে সংস্কৃত কলেজের দিকে তাকাইয়া দেশলাইয়ের কাঠি দিযা কান চুলকাইতে লাগিল।

কাজল ভয়ানক অপমানিত বোধ করিল। কিন্তু বইয়েব লোভ বড়ো লোভ, সে মুখে সপ্রতিভতার ভাব ফুটাইয়া বলিল—আচ্ছা, না হয় একটাকাই পুরো দিচ্ছি—

দোকানদার পৃথিবীর কোনো ভাষায় কথা বলিতে জানে না। বর্তমানে সে চোখ বুজিযা তর্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে কাঠিটাকে কানের ফুটায কুবকুর কবিযা ঘুবাইতেছে। তাহার মুখে জগৎনিরপেক্ষ স্বর্গীয় তন্ময়তা প্রকাশিত।

পাঁচসিকা দাম উঠিবার পর দোকানী আর দার্শনিক নিবাসক্তি বজায় রাখিতে সাহস পাইল না। বেশি টানাটানিতে দড়ি ছিঁড়িয়া গেলেই বিপদ। সবাইকেই সংসার চালাইতে হয়।

বিছানায় শুইয়া অনেক রাত্রি অবধি কাজল বইটা পড়িল। ধূমকেতু, নক্ষত্র এবং সৌরজগৎ সম্বন্ধে খুব মামুলি প্রাথমিক তথ্য—এখনকার ক্লাস সেভেন-এইটের ছেলেরাও এসব জানে। প্রথম প্রকাশিত হইবার সময় এই বইটাই লোকে হয়তো কত আগ্রহের সহিত পড়িয়াছে। কিন্তু লেখকের ভাষা এবং মানসিকতা কাজলের ভালো লাগিল। সহজ অথচ কাব্যিক প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে পাঠককে ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতার মুখোমুখি দাঁড় করানো হইয়াছে। তথ্যের সঠিকত্ব বড়ো কথা, তাহা অপেক্ষাও বড়ো কথা হৃদয়ের গভীরে সঠিক প্রশ্নগুলি জাগাইয়া তোলা।

রাত দেড়টা পর্যন্ত পড়িবার পরও ঘুম আসিল না। একটা সিগারেট খাইলে বেশ হইত। কাজল বই রাখিয়া মশারির বাহিরে আসিয়া বুক-শেল্‌ফের পিছনের গোপন স্থান হইতে সিগারেট আর দেশলাই বাহির করিয়া ছাদে চলিয়া গেল। বাড়িতে সে সচরাচর সিগারেট খায় না, কিন্তু অসময়ের ভাণ্ডার হিসাবে বইয়ের তাকের পিছনে ধূমপানের সরঞ্জাম রাখা থাকে। মাঝে মাঝে কাজে লাগিয়া যায়। সিগারেট ধরাইয়া কাজল পাঁচিলে হেলান দিয়া দাঁড়াইল।

সুরপতি মারা যাইবার পর হৈমন্তী বাপের বাড়ির কাছেই এই ছোট একতলা বাড়িটা বানাইয়াছে। মা ও ছেলের অনাড়ম্বর সংসার চলিতেছে মন্দ নয়।

কালপুরুষ-মণ্ডলী পূব আকাশ বহিয়া অনেকদূর উঠিয়া আসিয়াছে। সমস্ত শহরের নিদ্রামগ্ন নৈশ প্রহরে অতি-পরিচিত দৃশ্যেরও যেন অর্থ বদলাইয়া যায়। যে শহর আগামীকাল সকালেই আবার

নিত্যদিনের বাঁধা কর্মসূচির মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া ভয়ানক বেগে চলিতে থাকিবে, রাত্রির নির্জনতা তাহারই উপর রূপকথার স্পর্শ বুলাইয়া দিয়াছে।

পরিবেশে শীতের আমেজ থাকিলেও আকাশ বেশ পরিষ্কার, কুয়াশার চিহ্নমাত্র নাই। কাজল জানে আবহাওয়া ভালো থাকিলে আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে আবছাভাবে অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকা দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও তাহা বৎসরের এই সময়ে কিনা সে কথা সে মনে করিতে পারিল না। উত্তর-পশ্চিম কোণের সন্ধান করিতে করিতে একটু বাদে দিগন্তের কিছু উপরে হাল্‌কা একখণ্ড মেঘের মতো কী চোখে পড়িল। ওই কি অ্যান্ড্রোমিডা? বাইশ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত ছায়াপথের সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ প্রতিবেশী? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই মুহূর্তে সে ওই নীহারিকা হইতে বিচ্ছুরিত যে আলো দেখিতেছে, বিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে সে আলো অসীম মহাবিশ্বের পথে যাত্রা শুরু করিয়াছিল। পৃথিবীতে পিথেক্যানথ্রপাস অর্ধবানরেরা তখন সবেমাত্র দুই পায়ে সোজা হইয়া দাঁড়ানো অভ্যাস করিতেছে। যাবতীয় ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতিসহ সমগ্র মানবজাতিটাই সুদূর ভবিষ্যতের ক্রোড়ে শায়িত। তাহার পর দুই-তিনটা হিমযুগ গেল, কত সমুদ্র শুকাইয়া গেল, কত পর্বত মাথা তুলিয়া উঠিল। কত অরণ্য মাটি চাপা পড়িয়া কয়লায় পরিণত হইল, পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র কতবার দিকপরিবর্তন করিল—বিপুল কালব্যবধানে অবস্থিত এইসব উত্থানপতনের মধ্য দিয়া এই আলোকরশ্মি মহাকাশপথে বাইশ লক্ষ বছর ধরিয়া ক্রমাগত পৃথিবীর নিকটবর্তী হইতেছিল।

আশ্চর্য অনুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। কী বিশাল এই গ্রহজগৎ, এই নাক্ষত্রিক বিশ্ব, এই জীবন। অর্থ ও প্রাচুর্যের প্রয়োজন নাই, সাধারণ গৃহস্থের মতো কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকাটাই একটা সুন্দর অভিজ্ঞতা। কিন্তু মন শক্ত করিতে হইবে, পৃথিবীর তাবৎ প্রলোভনকে উপেক্ষা করিতে শিখিতে হইবে। ঐহিক কামনা লইয়া এই আনন্দের ভোজে যোগ দিবার অধিকার লাভ করা যাইবে না।

বিশ্বের একদিক হইতে অন্যদিক পর্যন্ত আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষুদ্রতা নাই, বন্দীত্ব নাই—এই বিপুল প্রসারে সৌন্দর্যময় মুক্তির অনুভূতি প্রতিমুহূর্তে স্পন্দিত হইতেছে।

সেদিন প্রায় সমস্ত রাত্রি তাহার ঘুম আসিল না।

শীতের মাঝামাঝি কাজল কলেজের বন্ধুবান্ধবের সহিত কলিকাতা হইতে মাইল ত্রিশেক দূরের একটা বাগানবাড়িতে বনভোজন করিতে গেল। প্রভাত তাহার সহিত রিপনে পড়ে, ছেলেটি ভালো—ইংরাজি কবিতা পড়িতে খুব ভালোবাসে, থাকে পটুয়াটোলা লেনে। সেও বনভোজনে যাইবে। কাজলকে ডাকিয়া সে বলিল—অমিতাভ, পিকনিকের আগের দিন রাত্তিরে তুমি বরং আমার বাড়িতে এসে থাকো, নইলে অত সকালে কি তুমি এসে উঠতে পারবে? ভোরবেলাই তো রওনা দিতে হবে—

কাজল রাজি হইয়া আগের রাত্রে প্রভাতের বাড়ি চলিয়া আসিল। বাড়ির মানুষেরা খুব ভালো, বিশেষ করিয়া প্রভাতের বাবা কাজলের সহিত সমবয়েসী বন্ধুর মতো ব্যবহার করিলেন।

একতলার কোণের দিকে প্রভাতের ঘর। এইখানে সে পড়াশুনা করে এবং ঘুমায়। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া দুইবন্ধু খাটে আধশোয়া হইয়া গল্প শুরু করিল। প্রভাতের বাড়ির অন্যরা দোতলায় থাকেন, কাজেই আড্ডায় বাধা পড়িবার ভয় নাই।

প্রভাত বলিল—সিগারেট খাবে? যাই বলো, সিগারেট না হলে আড্ডা জমে না—

—এখানে খাবো? কেউ আসবে না তো?

—দূর! রাত্তিরে আর কেউ নামবে না। তাছাড়া সিঁড়ির মুখের দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসেছি। এই নাও, ধরাও—

দুইজনে সিগারেট ধরাইয়া কোলে একটি করিয়া বালিশ লইয়া বসিল।

প্রভাত বলিল—অনেকদিন থেকেই তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ভাবি, সুযোগ হয়ে ওঠে না। আমাদের ছেলেমানুষির বয়েস কিন্তু ফুরিয়ে এল, ভবিষ্যতে কী করবে কিছু ভেবেছো?

ভবিষ্যতের কথা কাজল কিছু ভাবে নাই। জীবনের যে দিকটায় আলো পড়ে, যে দিকটা জ্ঞানে, বিস্ময়ে এবং আনন্দে উজ্জ্বল, সেই দিকটাকেই সে বড়ো করিয়া দেখিয়াছে। জীবনের অবশ্যম্ভাবী সংগ্রামের বিষয়ে সে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নাই। সে বলিল—তুমি কি প্রফেশনের কথা বলছো?

—কিছুটা বটে। মানুষকে তো একটা বৃত্তি অবলম্বন করতেই হয়। কেউ কেউ যে কোনো বৃত্তিতেই নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিতে পারে, কিন্তু তুমি বোধহয় তা পারবে না। এখন না ভাবলে পরে কষ্ট পাবে—

কাজল বলিল—তুমি যাকে বৃত্তি বলছো তার একটাও আমার কাছে অনারেব্‌ল্ বলে মনে হয় না। দেখ আমার জীবনটা আমার নিজের, যে ভাবে ভালো লাগে সেভাবে বাঁচার অধিকার আমার থাকা উচিত, তাই না?

প্রভাত সিগারেটে একটা টান দিয়া বলিল—তোমার কীভাবে বাঁচতে ভালো লাগে?

—আমি বিশুদ্ধ, নির্মল আনন্দ লাভের জন্য বাঁচতে চাই।

—এটা তুমি কিছু নতুন কথা বললে না। আনন্দ হল একধরনের সুখানুভূতি, জীবমাত্রেই সেজন্য বাঁচে।

—সেটা অ্যানিমাল কমফর্ট, আমি সে ধরনের ফিজিক্যাল প্লেজারের কথা বলছি না। আমি বলছি ইন্‌টেলেকচুয়াল প্লেজারের কথা—

প্রভাত হাসিয়া বলিল—তুমি একটা হামবাগ, নিজেকেই নিজে ইন্‌টেলেকচুয়াল বলে জাঁক করছো?

কাজল লজ্জা পাইয়া বলিল—তুমি বুঝলে না। আমি মোটেও নিজেকে পণ্ডিত বা ওইরকম কিছু বলছি না। আমি বলছি, এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড আর জীবন সম্বন্ধে আমার মনে কতগুলো স্বাভাবিক প্রশ্ন আছে—সেগুলো সম্বন্ধে ভাবতে বা তাদের উত্তর খুঁজতে আমার ভালো লাগে। এটা হচ্ছে joy of pure learning, প্রফেশনের সঙ্গে এর সম্বন্ধ নেই। তাছাড়া নীরস নলেজ-এর কথা বাদ দাও, বিশ্বের অদ্ভুত সৌন্দর্যের দিকটা ভেবে দেখেছো? কে জানে মৃত্যুর পরে আর চেতনা থাকে কিনা, আবার জন্ম হয় কিনা! আমি যতটা সম্ভব এই জন্মেই দেখে যেতে চাই। দিস্ মে বি মাই অনলি অপারচুনিটি—

—না খেয়ে?

কাজল অন্য জগতে ছিল। বিস্মিত হইয়া বলিল—অ্যাঁ?

—বলছি, সেই জ্ঞান এবং সৌন্দর্য আহরণের কাজটা কি না খেয়ে খালি পেটে করবে? সাবসিস্‌টেন্সের দিকটাও তো ভাবা চাই।

কাজল রাগিয়া বলিল—তুমি বড়ো আনরোম্যান্টিক। বাস্তবের বিরাট বাধা তো আছেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও কি পৃথিবীতে বড়ো কাজ হয়নি? তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে—

—আমি তো এতক্ষণ সেই কথাই বলছি। সেই প্রস্তুত হবার কাজটা তোমার কতদূর এগিয়েছে?

কাজল কোনদিকেই কিছুমাত্র অগ্রসর হয় নাই। সে কেবল পড়াশুনা করিয়াছে এবং মাঠে বেড়াইতে গিয়া গাছের নিচে বসিয়া বই পড়িয়াছে। পৃথিবীর সঙ্গে তাহার পরিচয় পুঁথির পাতার ভিতর দিয়া।

কাজলকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রভাত হাসিতে হাসিতে বলিল—back to square

'A', কেমন? না অমিতাভ, যাই করতে চাও, তার জন্য জীবনটাকে একটু ছকে নেওয়া দরকার। নইলে তোমার মতো ট্যালেন্টেড ছেলে পরে কষ্ট পাবে।

কাজল কোণঠাসা হইয়া বলিল—তুমি কী ঠিক করেছো?

—আমি? আমার সব ঠিক করা আছে। এম.এ. পাশ করে আমি কলেজে পড়াব।

কাজল বলিল—আমি যা হতে চাই তা কী করে হওয়া যায় জানি নে। তুমি অরেল স্টাইনের জীবনী পড়েছো প্রভাত? ইউরোপ থেকে পিকিং অবধি প্রাচীন যুগে যে সিলক্ রুট ছিল, যে পথে মার্কো পোলো তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, সেই হারানো সিলক্ রুট নতুন করে খুঁজে বের করার জন্য অরেল স্টাইন প্রায় সারাটা জীবন ব্যয় করেছিলেন। ভাবো তো, মধ্য এশিয়ার সেই গোবি, তাকলামাকান মরুভূমি—পৃথিবীর ছাদ পামির, উত্তর মঙ্গোলিয়ার নিবিড় অরণ্য, কোথাও দিক্‌দিশাহীন মরুপ্রান্তরে দুরন্ত বালির ঝড়, কোথাও হাত-পা জমে-যাওয়া কনকনে শীত! সিলক্ রুটের খোঁজে খোলা প্রান্তরে তাঁবু খাটিয়ে থাকা, রাত্তিরে তাঁবুর বাইরে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে পাইপ খাওয়া—ওঃ! অমন পরিষ্কার আবহাওয়ায় কত নক্ষত্র দেখা যায় জানো? আমি ওইরকম জীবন চাই।

—স্কলার জিপসি হতে চাও? ম্যাথু আর্নল্ডের স্কলার জিপসি—যে জীবনের গভীর রহস্য খোঁজবার জন্য নিজের সমাজ-সংসার ফেলে উধাও হয়ে গিয়েছিল—

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। স্কলার জিপসি আমার খুব প্রিয় কবিতা। অমন জীবন পেলে আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়—

দুই বন্ধুতে গল্প করিয়া প্রায় সারারাত কাটাইয়া দিল। আলোচনা করিতে করিতে প্রভাত ক্রমে স্বীকার করিল তাহারও যে অ্যাড্‌ভেঞ্চারের স্বপ্ন নাই এমন নয়। বস্তুত একবার সে ভাবিয়াছিল ক্যাপটেন কুক্ যে পথে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন সেই পথে নৌকা লইয়া ভ্রমণে বাহির হইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার আগেই সে একটা খাতায় অভিযানের খসড়া পর্যন্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। গঙ্গার মোহনা দিয়া বঙ্গোপসাগর, তারপর পোর্ট ব্লেয়ার হইয়া রেঙ্গুন। সেখান হইতে জাভা, বোর্নিও এবং সুমাত্রা ছুঁইয়া নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া। ইহার পর উত্তরে ওশিয়ানিয়ার অজস্র ছোট ছোট দ্বীপ, নারিকেলশ্রেণী বেষ্টিত হলুদ তীবভূমি—পথে অবশ্য আঙ্কোর ভাট দেখিয়া লইতে হইবে। সব পরিকল্পনা করা আছে। কিন্তু আর তিনবছর পর তাহার বাবা চাকুরি হইতে অবসর লইবেন। ছোট বোনের বিবাহ এখনও হয় নাই। দিদির বিবাহের দেনার জন্য বাড়ির দলিল মহাজনের নিকট বন্ধক আছে, সেখানা ছাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আগামী চার বছরের মধ্যেই সংসারের যাবতীয় ভার তাহাকে লইতে হইবে। এ অবস্থায় পলিনেশিয়াব চন্দ্রালোকবিধৌত দ্বীপভূমির স্বপ্ন না দেখাই ভালো।

কাজল উৎসাহে বিছানায় উঠিয়া বসিল, কেন? এতই কি অসম্ভব? বেশ তো, প্রভাত বোনের বিবাহ দিক, বাড়িখানা মহাজনের হাত হইতে ফিরাইয়া আনুক—ততদিন চাকুরি করিলে ক্ষতি নাই। কত সময়ই বা লাগিবে? পাঁচবছর বড়ো জোর—তখনও তাহারা এমন কিছু বৃদ্ধ হইয়া পড়িবে না। ত্রিশও হইবে না বয়েস। বরং দায়িত্ব মিটাইয়া বাহির হওয়াই ভালো। অভিযান সারিয়া ফিরিতে বছরদেড়েক লাগিবে, তখন তাহারা বিখ্যাত হইয়া পড়িবে, চাকুরি পাওয়ার অসুবিধা থাকিবে না।

দুইজনেই তরুণ, সম্মুখে অনন্ত জীবনের ইশারা। প্রভাতও বেশিক্ষণ নিজের বাস্তববাদী চরিত্র বজায় রাখিতে পারিল না। দুইবন্ধুতে অভিযানের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিতে করিতে সকাল হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পিকনিক করিতে গিয়া কাজল এমন একটি অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হইল যাহা তাহার জীবনে এই প্রথম। মানবমনের এক বিশিষ্ট অনুভূতির সঙ্গে আজ পর্যন্ত তাহার পরিচয় ছিল না, মধ্য পৌষের

এক পড়ন্ত অপরাহ্নে সেই আশ্চর্য সুন্দর অনুভূতির ব্যঞ্জনা তাহার হৃদয়ের তন্ত্রীতে জাগিয়া উঠিল।

শেয়ালদহ হইতে ট্রেন ধরিতে হইবে, সকাল সাড়ে-সাতটার মধ্যে সকলের সেখানে একত্র হইবার কথা। একটি ছোট দল রান্নার ঠাকুর এবং অন্যান্য তৈজসপত্রাদি লইয়া আগের দিন চলিয়া গিয়াছে। তাহারা রান্নার কাজ আরম্ভ করিয়া দিবে। পৌঁছাইয়াই চা-টোস্ট-ডিম তৈয়ারি পাওয়া যাইবে আশা করা যায়।

জামাকাপড় পরিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া প্রভাত বলিল—আজ একটা মজার ব্যাপার হবে। নরেন্দ্রর পিসতুতো বোন আমাদের সঙ্গে পিকনিকে যাচ্ছে—

—আমাদের সঙ্গে? সে কী! আর কোনোও মেয়ে যাচ্ছে নাকি?

—নাঃ।

কাজল একটু অবাক হইয়া বলিল—তাহলে একা নরেনের বোন ছেলেদের সঙ্গে যাবে?

—হ্যাঁ হে, মিশনারী কলেজে পড়া মেয়ে। দেরাদুন না সিমলা কোথায় যেন থাকে, ছুটিতে বেড়াতে এসেছে। বাঙালি, মধ্যবিত্ত ঘরের ললিত-লবঙ্গলতা নয়, ছেলেদের ভয় পায় না।

কাজল কথা ঘুরাইবার জন্য বলিল—না হয় যাচ্ছেই, তাতে কী হয়েছে?

—কী হয়েছে একটু পরেই বুঝতে পারবে।

তারপর অর্থপূর্ণ হাসিয়া বলিল—একেবারে অগ্নিশিখা, জানো? দু-তিনদিন আগে পিকনিকের ব্যাপারে কথা বলতে নরেনের বাড়ি গিয়ে দেখে এলাম। আজ ছেলেমহলে একেবারে হৈ-হৈ পড়ে যাবে—

কাজলের একটু কৌতূহল হইলেও সে অন্য কথা পাড়িয়া তখনকার মতো প্রসঙ্গটা চাপা দিল। বলিল—এসো, দু-প্যাকেট সিগারেট কিনে নেওয়া যাক। যেখানে যাচ্ছি সেখানে কাছাকাছি সিগারেট কিনতে পাওয়া যাবে কিনা কে জানে—

গ্লোব নার্সারির সামনে দলটার জড়ো হইবার কথা। কাজল ও প্রভাত নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দেখিল তখনও আর কেহই পৌঁছায় নাই। তাহারা একটা করিয়া সিগারেট ধরাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গোপাল আসিল, তাহার একটু বাদেই জগন্ময় ও শরদিন্দু। এক এক করিয়া প্রায় সবাই আসিয়া গেল, ট্রেন ছাড়িতে আর মিনিটদশেক দেরি। কিন্তু নরেন্দ্র আর তাহার মিশনারী কলেজে পড়া পিসতুতো বোন কই? কাজল আড়চোখে একবার প্রভাতের দিকে তাকাইল। প্রভাতও একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুরা দলটাকে পিকনিকের জায়গায় পৌঁছাইয়া দেওয়ার ভার তাহারই উপর। সে স্টেশনের বড়ো ঘড়িটার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—ওহে, তোমরা সব গিয়ে ট্রেনে উঠে পড়। আমি আর অমিতাভ পাঁচমিনিট দেখে চলে আসছি—জায়গা রেখো আমাদের জন্য।

বন্ধুরা প্ল্যাটফর্মের দিকে চলিয়া গেলে প্রভাত বলিল—নরেনের বোনের যে যাবার কথা আছে সেটা আমি ছাড়া কেউ জানে না। এলে খুব মজা হত। কেন যে দেরি করছে—বলিতে বলিতেই প্রভাত সামনে তাকাইয়া কনুই দিয়া কাজলকে ঠেলা দিল। কাজল বলিল—কী?

—ওই যে, এসে গিয়েছে।

স্টেশনের সামনে স্টেট্‌স্‌ম্যানের ভ্যান হইতে খবরের কাগজ নামানো হইতেছে। তাহার পাশ দিয়া নরেন্দ্র এবং একটি মেয়ে আসিতেছে বটে। তাহাদের দেখিতে পাইয়া নরেন্দ্র হাত নাড়িল। কাছে আগাইয়া আসিতে প্রভাত বলিল—ব্যাপার কী, এত দেরি? আমরা তো আর মিনিট দুই দেখে চলে যাচ্ছিলাম। চল, চল—

ট্রাম না পাইয়া অবশেষে একটি ট্যাক্‌সি ধরিয়া নরেন্দ্র কীভাবে কোনোমতে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে সেকথা শুনিতে শুনিতে সবাই প্ল্যাটফর্মে ঢুকিল।

কাজল কয়েকবার লুকাইয়া মেয়েটির দিকে তাকাইয়া দেখিল। তাহার মতোই প্রভাতও কখনও মেয়েদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে নাই, ফলে আহ্লাদবশতঃ সে নরেন্দ্রর বোনকে উর্বশী বা ক্লিওপেট্রাব সমকক্ষ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছিল। অতটা না হইলেও মেয়েটি দেখিতে বেশ ভালো। শান্ত মুখশ্রী, সাধারণ বাঙালি মেয়েদের তুলনায় একটু লম্বা, চাঁপাফুল রঙের শিফনের শাড়িতে তাহাকে দেখাইতেছে মন্দ না।

কামরায় উঠিয়া বসিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ছাড়িয়া দিল। দলের অন্যরা নরেনের বোনকে দেখিয়া অবাক, তাহারা পূর্বে এ বিষয়ে কিছু জানিত না। নরেন সবার সঙ্গে মেয়েটির পরিচয় করাইয়া দিল—এ হচ্ছে আমার বোন অপালা। দেরাদুনে থাকে, ছুটিতে বেড়াতে এসেছে। ভাবলাম ওকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসি। বোস অপালা, একটু জায়গা করে নে—

সকলে মহাব্যস্ত হইয়া প্রায় পাঁচজনের বসিবার স্থান করিয়া দিল।

শান্টিং ইয়ার্ডের মাকড়সার জালের মতো রেললাইনের জটিলতা ছাড়াইয়া গাড়ি ধীবে ধীরে গতিসঞ্চয় করিতেছে। শীতের সকালের নিরুত্তাপ রৌদ্র কুয়াশার মধ্য দিয়া ক্রমে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কাজলকে কলেজ করিবার জন্য রোজই রেলগাড়ি চড়িতে হয়, কিন্তু আজ কোনও কাজের তাড়া নাই—এখনি কোথাও পৌঁছাইয়া ভয়ানক বেগে পড়াশুনা বা অন্য কাজ শুরু করিয়া দিতে হইবে না। তাহার মনে হঠাৎ খুব আনন্দ হইল, প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করিয়া আজ কেমন একটা দিন কাটানো যাইবে! ভালোমন্দ খাওয়াও হইবে!

নির্দিষ্ট স্টেশনে নামিয়া বাগানবাড়িটা মাইলখানেক দূরে। সবাই গান গাহিতে গাহিতে হাঁটিয়া চলিল। জায়গাটাকে প্রায় গ্রাম বলা যাইতে পারে, বসতি বিশেষ নাই। স্টেশনের ধারে দু-একটা চায়ের দোকান, একটা হোমিওপ্যাথিক ডিস্‌পেনসারি (বৃদ্ধ ডাক্তারবাবু বুক পর্যন্ত দাড়ি লইয়া রোগীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন), মুদিখানা—তার পরেই যেন জনপদ ফুরাইয়া গেল। চন্দনী রঙের মিহি ধুলায় পূর্ণ পথের দুইপাশে রাংচিতা আর ভেরেণ্ডা গাছের জঙ্গল। কাছে-দূরে কয়েকটি বড়ো চট্‌কা গাছ প্রশান্ত গাম্ভীর্যের সহিত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

বাগানবাড়িটি বেশ বড়ো, অন্ততঃ সাত-আট বিঘা জমি পাঁচিল দিয়া ঘেবা। তাহাতে আম-জাম-কাঁঠাল প্রভৃতি পরিচিত গাছ ছাড়াও অজানা বহু গাছেব সমারোহ। ফটক দিয়া ঢুকিয়াই ডানদিকে একটি একতলা বাড়ি। গোটাচারেক ঘর, বারান্দা ইত্যাদি। পিছনে পাতকুয়া আছে। বাগানের অপর প্রান্তে বাঁধানো ঘাটসমেত ছোট পুকুর। আগের দিন যাহাবা চলিয়া আসিয়াছে তাহারা বারান্দায় বসিয়া নিজেদের মধ্যে কথা বলিতেছিল, শহরাগত দলটি পৌঁছাইতেই চেঁচামেচি করিয়া অভ্যর্থনা কবিল। হরিনাথ, যাহার মামার বাগানবাড়ি, সে বলিল—এসো প্রভাত, এতক্ষণ আমাদের আড্ডাই জমছে না—পিকনিক করতে এসে কি আর এমন তিন-চারজন বসে কথা বলতে ভালো লাগে?

প্রভাত বলিল—বেশ তো বসে আড্ডা দিচ্ছিলে বাপু, কেন বাজে কথা বলো!

—আমরা মোটেও আড্ডা দিচ্ছিলাম না, আমরা মনের দুঃখ কাটানোর জন্য কড়াইশুঁটি খাচ্ছিলাম—

—সেরেছে! কিছু বাকি রেখেছ তো? কপির তরকারিতে কী দেবে?

রসিকতা করিয়া কী একটা উত্তর দিতে গিয়া হরিনাথ অপালাকে দেখিতে পাইয়া থতমত খাইয়া গেল।

নরেন বলিল—সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, আমার বোন অপালা—পিসিমার মেয়ে। বাইরে থাকে। ওকেও নিয়ে এলাম—

বারবার 'সে তো বেশ করেছো, খুব ভালো করেছো' বলিতে বলিতে হরিনাথ কেমন তোতলা মতো হইয়া গেল। রথীন অভিভূত হইয়া সাত-আটবার নমস্কার করিল। পরমেশ খামোকাই শার্টের ঝুল টানিয়া হাঁটুর দিকে নামাইতে লাগিল।

একটা বড়ো দল বনভোজন করিতে গেলে যেমন হয়, চা-জলখাবার খাইবার পর সকলে পছন্দমতো ছোট ছোট দলে ভাগ হইয়া এখানে-ওখানে ছড়াইয়া পড়িল। কাজল কোনোদিনই হাল্‌কা কথাবার্তায় যোগ দিতে পারে না, আজও সে কিছুটা একা হইয়া বাগানের মধ্যে আপনমনে ঘুরিতে লাগিল। শীতের দুপুরের একটা নিজস্ব রূপ আছে। রোদে তেমন তেজ নাই, গাছের পাতার ফাঁক দিয়া রোদ আসিয়া মাটির উপরে আলোছায়ার আলপনা তৈয়ারি করিয়াছে। কোথাও কোন শব্দ নাই কেবল একটা কী পাখি যেন ডাকিয়া ডাকিয়া স্তব্ধ দুপুবকে আরও নির্জন করিয়া তুলিতেছে। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রোদের রঙ্ বদলায়, পরিবেশে যেন স্বপ্নের মোহাঞ্জন মাখাইয়া দেয়। কল্পনার রাজ্যে দূরত্ব বলিয়া কিছু নাই—বাংলাদেশের আমবাগান আর পলিনেশিয়ার মার্কুয়েসাস্ আইল্যান্ডের অরণ্য একই ভূমিতে অবস্থিত। একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া বসিয়া সুদূরের কল্পনায় মগ্ন হইয়া যাইতে বেশ লাগে। কী প্রয়োজন বেশি বন্ধুবান্ধবের? কী প্রয়োজন অকারণ কোলাহলের? নিজের মনের গভীরে ডুব দিতে শিখিলে বহিরঙ্গ আনন্দ বাহুল্য মাত্র।

বেলা আড়াইটা নাগাদ খাইতে বসা হইল। বাগানের গাছ হইতে কলাপাতা কাটিয়া সবাই ঘাসের উপর বসিয়া গেল। মুখোমুখি দুই সারি, কাজলের ঠিক সামনে অপালা বসিয়াছে। জামরুল গাছের পাতার মধ্য দিয়া রোদ আসিয়া তাহার গায়ে পড়িয়াছে। কাজলেব হঠাৎই কেন যেন মেয়েটির মুখের দিকে বারবার তাকাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করিল। সুন্দরী মেয়ে তো সে কলিকাতায় পথে-ঘাটে কতই দেখিয়াছে। এই মেয়েটি হইতে বেশি সুন্দরী মেয়েও যে সে দেখে নাই এমন নয—তবু অপালার শাড়ির রঙ, বিশেষ একভাবে তাকাইবার ভঙ্গি, ঋজু শরীর ঘিরিয়া সংযত প্রাণময়তা—সব মিলাইয়া একটি মধুর ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করিয়াছে। একবার সে দেখিল অপালা কপির তবকারি দিয়া ভাত মাখিতেছে, সরু সুন্দর গঠনেব আঙুলগুলি। অনামিকায় একটি গোল্ডস্টোন সেট্ করা আংটি। পরক্ষণেই সে লজ্জা পাইযা চোখ নামাইযা লইল। ছিঃ, মেয়েটি দেখিতে পাইলে কী ভাবিবে!

ভাস্কর দলের মধ্যে একটু যণ্ডামতো, সে চেঁচাইয়া বলিল—ওহে নিখিল, এ কী বকম দেওযা হচ্ছে তোমাদের? মাংসটা আর একবার এদিকে ঘোরাও, আমাকে একটা ভালো আর মোটা দেখে হাড় দাও দেখি—

প্রভাত বলিল—নিখিল, ওকে ভালো দেখে মাংসেব টুকরো কয়েকটা দাও, হাড় দিয়ে কী হবে?

—না হাড় একটা চাই—জাস্ট টু স্যাটিস্‌ফাই মাই মিট্ টুথ্—

পরমেশ বলিল—আমাকে আরও হাঁড়িখানেক ভাত দাও তো ভাই—

হরিনাথ পংক্তির একেবারে শেষে পা লম্বা করিয়া কনুইয়ে ভর দিয়া আধশোয়া হইয়া ছিল, মাংস পরিবেশন করিতে গিয়া নিখিল তাহাকে বলিল—এ আবার কী রকম খেতে বসা? সোজা হয়ে বসো—

হরিনাথ রাজকীয় ভঙ্গিতে হাত নাড়িয়া বলিল—ডোন্ট বদার, সার্ভ জানো, প্রাচীনকালে রোমান সম্রাটরা এইভাবে শুয়ে শুয়ে খেতেন!

এদিক-ওদিক তাকাইয়া নিখিল অনুচ্চস্বরে বলিল—তাই নাকি? তা হবে। কিন্তু রোমান সম্রাটদের অন্ততঃ পাঞ্জাবির তলা দিয়ে পাজামার দড়ি বেরিয়ে ঝুলত না!

তড়াক করিয়া সোজা হইয়া হরিনাথ এক হাত দিয়া লজ্জাকর ত্রুটিটা সংশোধনের চেষ্টা করিতে লাগিল। অটোম্যান সাম্রাজ্যের সম্মিলিত সৈন্যদল রাজ্যের সীমানায় হানা দিয়াছে সংবাদ পাইলেও ভোজনরত রোমান সম্রাট বোধহয় এতটা চমকাইতেন না। এইভাবে হৈ-হুল্লোড়ের মধ্য দিয়া আহারপর্ব শেষ হইল।

পুকুরঘাটে সুপারিগাছের দীর্ঘ ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। খাওয়ার পর কাজল বাঁধানো ঘাটে

বসিয়া একটা সিগারেট ধরাইল। বন্ধুরা গুরুভোজনের অন্তে বারান্দায় পাতা শতরঞ্চির উপর শুইয়া খোশগল্প জুড়িয়া দিয়াছে। এদিকটা একেবারেই নির্জন। কাজল চোখ বুঁজিয়া শুনিতে লাগিল লঘুস্পর্শ বাতাস গাছের পাতায় উদাস ঝিরঝির শব্দ তুলিয়াছে। সুপারিগাছের গায়ে একটা কাঠঠোকরা বহুক্ষণ ধরিয়া ঠক্-র্-র্ আওয়াজ করিতেছে। শান্ত দ্বিপ্রহরের কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শব্দ আছে, আলাদা করিয়া তাহাদের খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। এমন কী সবগুলি কান দিয়া শুনিতে পাওয়া যায় এমন শব্দও নয়—কিন্তু পরস্পর মিশিয়া তাহারা চমৎকার আবহ তৈয়ারি করে, কাজল সিগারেট টানিতে টানিতে সেই আমেজটা উপভোগ করিতেছিল।

অকস্মাৎ তাহার মনে হইল ঘাটের উপর সে আর একা নয়, কে যেন কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার আসিবার কোন শব্দ সে পায় নাই, কিন্তু মানুষের কাছে মানুষ আসিয়া দাঁড়াইলে ইন্দ্রিয়াতীত এক অনুভূতি দ্বারা তাহা বুঝিতে পারা যায়।

আস্তে করিয়া চোখ খুলিতেই প্রথমে নজরে পড়িল রুপালি পাড় বসানো চাঁপাফুল রঙের শাড়ির নিচের দিকটা।

সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অপালা তাহার দিকে বিস্ময় ও কৌতুক মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। সে অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—আপনি কতক্ষণ—মানে, আমি একটু—বসুন না—

অপালা বলিল—আপনি কি রোজই দুপুরে ধ্যান করেন নাকি?

কাজল লজ্জিতমুখে বলিল—না না, ওসব কিছু নয়। আসলে শীতের দুপুরবেলায় একটু আলসেমি করতে ইচ্ছে করে, তাই চোখ বুঁজে ছিলাম—তারপর একটু ইতস্তত করিয়া যোগ করিল—এ রকম নির্জন জায়গায় দুপুরবেলা নানারকম আবছা শব্দ হয়, জানেন? চোখ বুঁজে থাকলে শোনা যায়—নিতান্ত ঘনিষ্ঠ দু-একজন বন্ধু ছাড়া কাজল নিজের মনের কথা এভাবে কাহাকেও বলে না। কিন্তু সদ্য পরিচিত এই মেয়েটিকে দেখিয়া হঠাৎ তাহার মনে হইল ইহাকে সব কথা বলা যাইতে পারে। কেন মনে হইল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। বলিয়াই তাহার কেমন লজ্জা করিতে লাগিল, বিব্রতভাব কাটাইবার জন্য সে বলিল—বসুন না, দাঁড়িয়েই থাকবেন বুঝি?

পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া কাজল ঘাটের একটা অংশ ঝাড়িয়া দিল। স্মিত হাসিয়া অপালা বসিল, বলিল—আপনিও বসুন।

সম্মানজনক দূরত্ব রাখিয়া কাজল বসিল।

—আমি কিন্তু আপনার পরিচয় জানতে পেরেছি।

কাজল একটু অবাক হইয়া বলিল—আমার? কী পরিচয়?

—আপনি বিখ্যাত সাহিত্যিক অপূর্বকুমার রায়ের ছেলে, তাই না?

কাজল হাসিয়া বলিল—ওটা তো আমার বাবার পরিচয়। তা যাই হোক, আপনি বুঝি আমার বাবার বই পড়েছেন?

অপালা মুখ নিচু করিয়া বলিল—সবচেয়ে লজ্জার কথা কি জানেন, আমি এখনও ভালো বাংলা পড়তে পারি না। বাবা সরকারি কাজ করেন তো, আমি ছোটবেলা থেকে বাইরে বাইরেই মানুষ হয়েছি। গত চার-পাঁচবছর ধরে বাবা বাড়িতে আলাদা করে বাংলা শেখাচ্ছেন, এখন অনেকটা রপ্ত হয়ে এসেছে—আর বছর দুইয়ের মধ্যেই নিজেকে পুরোপুরি বাঙালি বলতে পারব বলে বিশ্বাস রাখি।

তারপর একটু থামিয়া বলিল—বাবা খুব বই পড়েন। সম্প্রতি বাবা অর্ডার দিয়ে কলকাতা থেকে আপনার বাবার সব বই আনিয়েছেন। ছুটিতে এখানে আসার ক-দিন আগে রাত্তিরে খাবার টেবিলে বসে বলছিলেন—বাংলা ভাষায় এমন বই যে লেখা হয়েছে জানতাম না। সাহিত্যের দুর্ভাগ্য এমন লেখক অসময়ে চলে গেলেন।

কাজল চুপ করিয়া রহিল। বাবার কথা উঠিলে সে অন্যমনস্ক হইয়া যায়। তাহার জীবনে ধর্মীয়

ঈশ্বরের ছবি মুছিয়া গিয়ে সেখানে বাবার মূর্তি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ইষ্টনাম উচ্চারিত হইতে শুনিলে ভক্ত যেমন আবিষ্ট হইয়া পড়ে তাহারও তাই হয়।

—আমি আপনাকে কষ্ট দিলাম, না?

কাজল চমকাইয়া বলিল—না, তা নয়। বাবার মৃত্যুর কথা কেউ উল্লেখ করলে আমি প্রচলিত অর্থে দুঃখ পাই না। কারণ অনেক জীবিত মানুষের চেয়ে বাবা আমার কাছে অনেক বেশি করে জীবিত। অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম কেন জানেন? বাবাকে আমি দেবতার আসনে বসিয়েছি। সনাতন ধর্ম যাকে দেবতা বলে তা নয়—আমার জীবনদেবতা, আমার জীবনদর্শনের উৎস। ক্রীশ্চান পাদ্রীরা আচমকা ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত হতে শুনলে চমকে ওঠে, আমারও ওই ধরনের একটা রি-অ্যাকশন হয় আর কী—

—বাবার মতো আপনিও খুব প্রকৃতি ভালোবাসেন, তাই না?

—প্রকৃতিকে ভালোবাসার কোনও আলাদা অর্থ নেই। যা কিছু বিশ্বে রয়েছে বা ঘটছে, সবই প্রকৃতির অঙ্গ। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমরা যাই করি না কেন, সেটা নিজেদের মতো করে প্রকৃতিকে ভালোবেসেই করছি। তবে যদি বিশেষ অর্থে বলেন, যেমন গাছপালা, মাঠ বা আলো-বাতাসকে ভালোবাসা—সে অর্থেও আমি নিশ্চয় প্রকৃতিকে ভালোবাসি। আপনিও বুঝি তাই?

অপালা বলিল—আমার কোনও বন্ধু নেই, জানেন? এক জায়গায় কখনও বেশিদিন থাকিনি তো, বন্ধুত্ব গড়ে ওঠাব সুযোগই হয়নি। একা একা পাহাড়ে, জঙ্গলে, সমুদ্রের ধারে বেড়াতাম। বিশেষ করে প্রকৃতিকে ভালোবাসার অর্থ আমিও জানি না, বাইরে থেকে কখনও দেখিনি বলে।

কথা শুনিতে শুনিতে কাজল বিস্মিত চোখে অপালার দিকে তাকাইতেছিল। নারীদের সম্পর্কে কাজলের মোটামুটি ধারণা ছিল যে, তাহারা সচরাচর রান্নাবান্না এবং শিশুপালন করে, প্রায়শই দক্ষতার সহিত ঝগড়া করে এবং শাড়ি ও গহনা পাইলে সন্তুষ্ট থাকে। পুরুষের সঙ্গে সাহিত্য ও দর্শন লইয়া স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতে পারে এমন মেয়ে সে আগে দেখে নাই। অপালা বলিল—আপনিও বুঝি লেখেন?

—সে রকম কিছু নয়। লিখতে ইচ্ছে করে খুব—অনেক যেন বলবার কথা আছে বলেও মনে হয় মাঝে মাঝে—কিন্তু লিখলেই বন্ধুরা বলে আমার লেখা নাকি বাবার মতো হয়ে যায়।

—সত্যিই কি তাই?

—হতে পারে। আমার জন্মের সময়ে মা মারা গিয়েছিলেন, তাঁকে আমি দেখিনি। প্রথমে কিছুদিন মামাবাড়িতে, তারপর সমস্ত ছোটবেলাটা আমি বাবার কাছে মানুষ। যে সময়ে মানুষের প্রকৃত ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে যায়। বাবা আমাকে কখনও বকতেন না, তিক্ত শাসন করতেন না—কিন্তু তাঁর আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব সেই অবোধ শিশুবয়েসেই আমাকে স্পর্শ করেছিল। এ ধরণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন। হয়তো আমার অজান্তেই আমার লেখায় বাবার ছাপ এসে যায়—

হাঁটুর উপর থুতনি রাখিয়া অপালা জলের দিকে তাকাইয়া কাজলের কথা শুনিতেছিল। পুকুরের জলে অপরাহ্ণের ছায়া গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। সুপারি গাছের কাঠিন্যের কাছে সাময়িক হার মানিয়া কাঠঠোকরাটা বিশ্রামরত। জলের দিকে চাহিয়াই মৃদুস্বরে অপালা বলিল—একটা কথা বলব? কিছু মনে করবেন না তো? না থাক, আপনি রাগ করবেন—

কাজল বলিল—বা রে, রাগ করব কেন? আপনি তো আর আমাকে বকবেন না—

—আমি কিন্তু একটু বকতেই যাচ্ছিলাম—

কাজলের কৌতূহল হইল, কী বলিবে এই প্রায়-অপরিচিত মেয়েটি? কয়েকঘণ্টার পরিচয়ে একজন আর একজনকে রাগ করিবার মতো কী বলিতে পারে? সে বলিল—রাগ করব না, বিশ্বাস করুন—

—আমার এভাবে কথা বলার কোনও অধিকার নেই, তবু বলছি—বাবাকে আপনি খুব শ্রদ্ধা

করেন বটে, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করার সময়ে তাঁর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করুন। সত্যি হয়তো আপনার অনেক কিছু বলবার আছে, পৃথিবীকে অনেক কিছু দেবার আছে, don't let yourself be possessed—

কাজলের প্রথমে একটু বাগ হইল। তাহার বাবার সহিত তার সম্পর্ক অনুভূতির একটা প্রগাঢ়তম স্তরে প্রতিষ্ঠিত, অন্য কেহ তাহা বুঝিতে পারিবে বলিয়া সে বিশ্বাস করে না। এবং সেই পবিত্র সম্পর্কের বিষয়ে কাহারও সমালোচনা সহ্য করাও তাহার পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু কথা শেষ করিয়া অপালা তাহার দিকে সোজা তাকাইয়া আছে, সেই সরল অথচ গভীর দুই চোখের দিকে নজর পড়িতেই কাজল অপালার অকপট ঐকান্তিকতার সবটুকু একসঙ্গে দেখিতে পাইল।

কাজল অপালার কথার কোনও উত্তর দিল না। সামনে তাকাইয়া দেখিল পুকুরের জলে ঝিরঝিরে ঢেউ উঠিয়াছে, বিক্ষুব্ধ জলতলে গাছের প্রতিচ্ছবি শত শত খণ্ডে ভাঙিয়া যাইতেছে। বিকালবেলার একটা সুন্দর গন্ধ আছে। সারাদিন রৌদ্রে তপ্ত হইবার পর দিনশেষে ছায়ার স্পর্শে বন্য লতাপাতা একধরনের শান্তিমাখা সুঘ্রাণ বিতরণ করে। বাতাসে সেই গন্ধ ভাসিয়া আসিল। অপালা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—চলুন যাই—চা খাবেন না? আপনার বন্ধুরা তো সব চা খেয়ে তবে রওনা দেবে। আর হ্যাঁ, আপনার ঠিকানাটা দিন তো—আমি আপনাকে চিঠি দেব।

কাজল অবাক হইয়া বলিল—চিঠি দেবেন? ঠিকানা?

—হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে? ও, আমাদের বয়সি ছেলেমেয়েদের পরস্পরকে চিঠি লিখতে নেই, তাই না? সমাজে নিন্দে হয়? আপনি দিন ঠিকানা—আমি বাংলাদেশে মানুষ হইনি, ও ধরনের অকারণ সংস্কার আমার নেই। বাবাও খুব উদার, তিনি জানতে পারলেও আমার স্বাধীনতায় বাধা দেবেন না।

কাজল একটু ইতস্তত কবিয়া বলিল—আমার নোটবই আর কলম বন্ধুদের কাছে রেখে এসেছি। চলুন, দিয়ে দেব—

বাগানবাড়িব বারান্দায় ফিবিবার প্রস্তুতি হিসাবে জিনিসপত্র গোছানো হইতেছে। ঠাকুর উনানের পাশে উবু হইয়া বসিয়া চা ছাঁকিতেছে। কাজলকে দেখিয়া হরিনাথ বলিল—এই যে, ছিলে কোথায়? চা খাবে তো? নাও, এবার বেরিয়ে পড়তে হবে। ট্রেনের একঘণ্টা বাকি। এ গাড়ি মিস করলে কলকাতা পৌঁছতে রাত দশটা—

ধুলায় ভরা পথ দিয়া স্টেশনে আসা। সকালের দৃশ্যটাই যেন আবার উল্টা দিক হইতে বহিয়া যাইতেছে। পুব হইতে পশ্চিমের দিকে উড়িয়া যাইতেছে পাখির দল, দিনের শেষে মাঠ হইতে বিদায় লইয়াছে ক্লান্ত কৃষক। কত তাড়াতাড়ি একটা দিন নিঃশেষে ফুরাইয়া গেল! ছোটবেলায় এমন ছিল না—তখন এক একটা দিন যেন জগতের সবটুকু সময় দিয়া গঠিত ছিল। একটা বছর সম্পূর্ণ কাটিবার পর গতবছরের কথা আবছাভাবে মনে পড়িত। বয়েস বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সময় কাটিবার বেগও বাড়িয়াছে।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে কাজল অপালাকে বলিল—আপনার মধ্যেও বেশ কবিত্ব আছে, নইলে কলাবাগানের ধারে গিয়ে বসে ছিলেন কেন?

অপালা অবাক হইয়া বলিল—কী করে জানলেন? আমি তো একা বসে ছিলাম—

—কথাটা ঠিক কিনা?

—বসে ছিলাম সেটা ঠিক, কবিত্বের ব্যাপারটা আপনার মনগড়া। আপনি ওদিকে গিয়ে আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন, না?

—না।

—তবে?

কাজল হাসিয়া বলিল—আপনার সমস্ত শাড়িতে চোরকাঁটা লেগে আছে। বাগানে ওই জায়গা

ছাড়া আর কোথাও চোরকাঁটা নেই আমি দেখেছি। আর না বসলে শুধু পায়ের দিকে লাগত, সমস্ত কাপড়ে লাগত না। এ থেকেই অনুমান করলাম।

—আপনি বুঝি খুব ডিটেকটিভ বই পড়েন? গল্পের গোয়েন্দারা জুতোর তলায় সুরকির দাগ আর বেড়াবার ছড়ির ডগা দেখে সব বলে দিতে পারে—

কাজল বলিল—এটুকুর জন্য ডিটেকটিভ বই পড়তে হয় না, এমনিই বলা যায়। তবে হ্যাঁ, পড়ি বইকি—শার্লক হোমসের গল্প আমার খুব প্রিয়।

—চেস্টারটনের লেখা পড়েছেন? ফাদার ব্রাউন স্টোরিজ?

কাজল লজ্জিতমুখে বলিল—নাঃ, খুব প্রশংসা শুনেছি—

—পড়ে দেখবেন, খুব ভালো লাগবে। আপনি, এমনিতে কী ধরনের বই পড়তে ভালোবাসেন, বলুন তো দেখি—আমার সঙ্গে মেলে কিনা—

সমস্ত ট্রেনযাত্রার সময়টা তাহারা গল্প করিয়া কাটাইল। বিশেষ কোনও বিষয়ে আলোচনা নহে, মনে আনন্দ থাকিলে এই বয়েসটায় অকারণেই উচ্ছল হইয়া ওঠা যায়।

নোটবুক হইতে কাগজ ছিঁড়িয়া কাজল অপালাকে তাহার ঠিকানা লিখিয়া দিল। শেয়ালদা হইতেই পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া যে যাহাব বাড়ি চলিয়া গেল। কেবল কাজল জীবনে এই প্রথম বাড়ি ফিরিবার জন্য কোনও তাড়া অনুভব করিল না। হ্যারিসন রোড ধরিয়া সে অকারণেই হাঁটিয়া কলেজ স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত গিয়া আবার শেয়ালদায় ফিরিয়া আসিল। সবই ঠিক আছে—সেই অবিরাম জনস্রোত, বিদ্যুৎবাতির সমারোহ, কলিকাতা শহরটা। কেবল তাহার মধ্যে অকস্মাৎ যেন কী একটা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেদিন কী কারণে ছুটি ছিল, সকালে বাহির হইবার তাড়া নাই। কাজল পড়িবাব ঘরে চৌকির উপর আধশোয়া হইয়া খবরের কাগজে চোখ বুলাইতেছিল। সে এমন অনেক লোক দেখিয়াছে যাহারা সকালে উঠিয়া কোনরকমে দাঁতটা মাজিয়া লইয়া হিংস্রভাবে খবরের কাগজকে আক্রমণ করে এবং প্রাণপণে পড়িতে পড়িতে দুইঘণ্টার মধ্যে এমন কী বেহালার পাঁচনের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত নিঃশেষে চিবাইয়া ফেলে। কিন্তু সে নিজে খবরের কাগজ পড়িতে বিশেষ ভালোবাসে না। সমস্ত পাতাগুলি জুড়িয়া কেবল যুদ্ধের খবর, নয়তো আজেবাজে ছেঁদো গল্প—আর রাজ্যের বিজ্ঞাপন। এসব খবরের প্রয়োজন নাই এমন কথা সে বলে না, কিন্তু ইহা অপেক্ষাও মহত্তর ঘটনা কোথাও ঘটিতেছে না সে কথাও বিশ্বাস করা কঠিন। ভালো খাওয়া ভালো পরার প্রয়োজনের বাহিরে যে অতিরিক্ত কর্মোৎসাহ মানুষকে একদিন পশুত্বের স্তর হইতে টানিয়া উঠাইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সংবাদ কোথায়? এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে মানুষ কি কেবল যুদ্ধ করিতেছে? কেবল ক্ষমতালাভের চক্রান্ত করিতেছে? কেহ কি গোলাপফুলের নতুন প্রজাতি সৃষ্টির জন্য গবেষণা করিতেছে না? কোনও অখ্যাত, দরিদ্র মানুষ কি গত একবৎসরে কোথাও মহৎ উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ করে নাই? জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোনও নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় নাই? একঘেয়ে খবর পড়িয়া মানুষ কী যে আনন্দ পায়! কাজলের তো বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে।

এই সময়েই বাহিরের দরজায় কড়া নড়িয়া উঠিল।

দরজা খুলিয়া কাজল দেখিল ধুতি আর শার্ট পরা চোখে চশমা বছর ত্রিশ বয়েসের এক ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন। হাতে কয়েকখানা বই এবং একটি চামড়ায় বাঁধানো মোটা খাতা। চেহারায় পরিশীলিত বুদ্ধির ছাপ।

কাজল জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কাকে চাইছেন?

ভদ্রলোক মার্জিত গলায় বলিলেন—এইটে কি সাহিত্যিক অপূর্বকুমার রায়ের বাড়ি?

কাজলের বুকের মধ্যে হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল। কতদিন পরে আবার কেহ বাবার নাম করিয়া বাড়ির খোঁজ করিতেছে। বহুদিন পরে এমনটা হইল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কী দরকার যদি—

—দরকার সে অর্থে কিছুই না। আমি ওঁর লেখার একজন ভক্ত, পাবলিশারের কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে একবার ওঁর স্ত্রী আর ছেলের সঙ্গে কথা বলতে এলাম। শুধু শ্রদ্ধা নিবেদন ছাড়া আমার আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। একবার কি—

কাজল ভদ্রলোককে আনিয়া নিজের পড়িবার ঘরে বসাইল। ভদ্রলোক চারিদিকে তাকাইয়া দেয়ালে টাঙানো অপুর বড়ো ছবিখানা কিছুক্ষণ দেখিলেন, তারপর বলিলেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, কিছু মনে করবেন না। ভুল হলে মার্জনা করবেন। আচ্ছা, আপনি কি অপূর্ববাবুর ছেলে?

কাজল হাসিয়া ঘাড় হেলাইয়া জানাইল—হ্যাঁ।

—আমি ঠিকই ধরেছি তাহলে। আপনার বাবার সঙ্গে আপনার চেহারার খুব মিল রয়েছে, জানেন? আমার দেখেই মনে হয়েছিল—আপনার মাও তো এখানে আপনার সঙ্গেই থাকেন, তাই না? ওঁকে একবার প্রণাম করে যাব—

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। মা স্নান করছেন, আপনি বসুন। চা খাবেন তো?

—তা চা একটু হলে মন্দ হয় না—

ভদ্রলোকের চা-পানের মাঝপথে হৈমন্তী আসিয়া ঘরে ঢুকিল। ভদ্রলোক সম্ভ্রমে, ব্যস্ততায় তটস্থ হইয়া খটাখট্ শব্দে পেয়ালা-পিরিচ টেবিলের উপর রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—আমার নাম জগদীশ চৌধুরী, কলকাতায় ভবানীপুরে থাকি। কলেজে পড়ার সময় থেকেই অপূর্বকুমাব রায়ের লেখা আমার খুব ভালো লাগে। ওঁর সব বই-ই আমি বহুবার করে পড়েছি। আপনাদের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের। তাই ভাবলাম—

হৈমন্তী বলিল—খুব ভালো করেছেন, ওঁকে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁরা সবাই আমার আত্মীয়। বসুন না—

জগদীশ চৌধুরী অগ্রসর হইয়া হৈমন্তীর পায়ের ধুলা লইয়া বলিল—আপনি আমার মাতৃতুল্য, আমাকে 'তুমি' বলবেন। আমার পরম দুর্ভাগ্য, স্বয়ং লেখককে দেখতে পেলাম না। আমি ওঁকে কত শ্রদ্ধা করি তা বলে বোঝাতে পারব না—যদি আজ ওঁর পায়ের ধুলো নিতে পারতাম তাহলে আমার জীবন ধন্য হত—

চেয়ারে বসিয়া বাকি চা-টুকু শেষ করিয়া জগদীশ বলিল—হিসেব করে দেখেছি, যখন প্রথম ওঁর বই পড়ি তখনও উনি জীবিত। সে সময়ে চলে এলেও দেখাটা হত। আসলে তখন আমি সবে কলেজে ঢুকেছি, নিতান্ত লাজুক—এতবড় লেখকের বাড়ি এসে কী ভাবে কথা বলব তাই জানতাম না। পরে বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যখন একটু বুদ্ধি হল, তখন বুঝতে পারলাম কী অমূল্য সুযোগ হাত ফসকে গেছে—

তারপর উৎসাহে উজ্জ্বল মুখ হৈমন্তীর দিকে তুলিয়া বলিল—আমার কি মনে হয় জানেন? আমার মনে হয় অপূর্বকুমার রায়ের মতো লেখক শুধু বাংলাভাষায় কেন, পৃথিবীর সাহিত্যে বহু শতাব্দীতে একজনই আসে। গাছপালা আর প্রকৃতির বর্ণনা তো অনেকের লেখাতেই পাওয়া যায়—কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে এমন একাত্ম হয়ে যাওয়া কিংবা প্রকৃতিকে সচেতন চরিত্র হিসেবে কল্পনা করা—এ আমরা একমাত্র কবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ছাড়া—

অপরিসীম আবেগে জগদীশ আরও আধঘণ্টা অনেক কিছু বলিয়া গেল। শেষে বলিল—আমি অপূর্ববাবুর অমর স্মৃতির উদ্দেশে একখানা কবিতা লিখেছি। একটু শোনাবো?

হৈমন্তী বলিল—বেশ তো, শোনান না—

জগদীশ চামড়ায় বাঁধানো খাতাটা খুলিয়া পড়িতে লাগিল—চলিয়া গিয়াছো হে কবি, যদিও কবেই অমর ধামে—আমার হৃদয়তন্ত্রী তবু যে বাজিছে তোমার নামে।

কবিতাপাঠ শেষ করিয়া জগদীশ জিজ্ঞাসা করিল—কেমন হয়েছে? ভালো?

হৈমন্তী মাথা নিচু করিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল। কাজলের চোখেও জল আসিয়া গিয়াছিল। অবাক হইয়া দু-জনের দিকে তাকাইয়া অপ্রস্তুত জগদীশ বলিল—এ হে! আপনাদের মনে খামোকা দুঃখ দিলাম, আমাকে মাপ করবেন—

আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া হৈমন্তী বলিল—না না বাবা, তোমার কোনও দোষ নেই। খুব সুন্দর হয়েছে তোমার কবিতা—সেজন্যই তো চোখে জল এলো। বোসো, তোমাকে কিছু খেতে দিই—

জগদীশ ব্যস্ত হইয়া বলিল—আমি কিচ্ছু খাব না মাসিমা, আপনি উঠবেন না।

—তা কি হয় বাবা? মায়েব কাছে এসেছো, বাড়িতে যা আছে তাই দেব। বোসো তুমি—

হৈমন্তী খাবার আনিতে গেলে জগদীশ মিনিটখানেক লজ্জিতমুখে বসিয়া রহিল, তারপর কাজলের দিকে তাকাইয়া বলিল—আমারই বোঝা উচিত ছিল, এ ব্যাপারে আপনাদের একটা সেন্টিমেন্ট থাকা খুব স্বাভাবিক। বিনা ভূমিকায় কবিতাটা অমনভাবে পড়া উচিত হয়নি—

কাজল বলিল—ও ব্যাপারে আপনি আর কিছু ভাববেন না। বাবাকে আপনিও ভালোবাসেন বলেই না কবিতা লিখেছেন—এ আমাদের গৌরবের বিষয়।

হৈমন্তী একটা রেকাবিতে চিঁড়েভাজা আব নারকেলকোবা আনিয়া জগদীশেব সামনে টেবিলেব উপর রাখিয়া বলিল—সত্যিই বাড়িতে যা ছিল দিলাম। খাও বাবা—

খাইতে খাইতে জগদীশ বলিল—আমি আব একটা কথাও আপনাদেব জানাতে এসেছিলাম মাসিমা। অপূর্ববাবুব লেখা ভালোবাসি এমন ক-জন মিলে আমবা একটা গোষ্ঠী তৈবি কবতে চলেছি। কলকাতায় বিভিন্ন জায়গায় এই গোষ্ঠীর অনুষ্ঠান হবে। উদ্বোধনের দিন আমবা কিন্তু আপনাকে নিয়ে যাবো। যাবেন তো মাসিমা?

জগদীশ বিদায় লইবাব পর মা ও ছেলে অনেকক্ষণ বসিযা কথা বলিল। অপুকে লইযা কলিকাতায় দল গড়িয়া উঠিতেছে, তাহারা অপুর স্মৃতিসভা করিবে—ইহাতে তো আনন্দিত হওয়া উচিত, কিন্তু দুইজনের কেবল কান্না পাইতেছে কেন? কাজল বলিল—বাবা বেঁচে থাকলে খুব খুশি হত, বুঝলে মা? কেউ বাবাকে ভালো বললে বা লেখাব প্রশংসা করলে বাবা একেবাবে ছেলেমানুষের মতো আনন্দ পেত। তুমি জানো না, একবাব আমাদের কলকাতার ভাড়াবাড়িতে এক ভদ্রলোক এলেন। আমি তখন খুব ছোট, মুড়ি খেয়ে ঘরময় ছড়িয়ে মেঝে নোংরা করে রেখেছি। বাবার তখন সবে প্রথম বইখানা বেরিয়েছে। ভদ্রলোক বাবাব বই পড়ে মুগ্ধ, খবর দিতে এসেছেন বিকেলে বিভাবরী পত্রিকার সম্পাদক আসবেন বাবার সঙ্গে দেখা করতে। আমাকে বাবা বকলেন ঘর নোংরা করে রাখার জন্য—আসলে কিন্তু বাবাও আমাব সঙ্গে মুড়ি খাচ্ছিলেন, অতিথির সামনে লজ্জায় পড়ে বকেছিলেন। আমার খুব দুঃখ হয়েছিল, আগে তো কখনও বাবার কাছে বকুনি খাইনি। সে লোকটা চলে যাবার পর আমার অভিমান হয়েছে বুঝতে পেরে বাবা আমাকে কত করে আদর করে দিলেন। যাই হোক, যে কথা বলছিলাম—সেদিন বাবার মুখে যে খুশির আলো দেখেছিলাম তা কোনোদিনই ভুলবো না মা। অহংকার বা উদ্ধত গর্ব নয়—বাবা সে সব জানতেনই না। বাচ্চা ছেলেকে তার আঁকা ছবি বা তার গাওয়া গান সুন্দর হয়েছে বললে সে যেমন সরল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—বাবাকে তেমনি হতে দেখেছিলাম।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল—আর আজ বাবাকে নিয়ে সভা হতে চলেছে! সেদিন প্রকাশকের দোকানে দাঁড়িয়ে আছি, একজন লোক বাবার বই কিনতে এসে কি বললো জানো

মা? লোকটা বললো—অপূর্ববাবুর বই পড়লে আর অন্য উপন্যাস হাতে নিতে ইচ্ছে করে না। ওঁর যা যা বই আছে আমাকে দিন তো মশাই—

হঠাৎ কাজল হৈমন্তীর দিকে তাকাইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিল—মা, তুমি বাবার একটা জীবনী লেখো না কেন? তোমার চাইতে ভালো করে আর কে পারবে? আমি বলছি মা, এখনও কিছুই হয়নি, এই তো সবে শুরু—বাবার নাম নিয়ে পৃথিবীর লোক পুজো করবে একদিন, তুমি দেখে নিয়ো। তখন তোমার লেখা বই পড়ে সবাই বাবার কথা জানতে পারবে। লেখো না মা?

কলিকাতার মতো মালতীনগরেও কাজলের একটা বন্ধুর দল আছে। ইহাদের মধ্যে শিবদাস নামে একটি ছেলে একদিন কাজলকে বলিল—আমরা অকারণে জীবনটা ব্যয় করছি তা বুঝতে পারছিস কাজল?

বন্ধুর দলের ভবরঞ্জন ক্লাস এইটের একটি মেয়েকে বাড়িতে পড়ায়। তাহার বাবার বন্ধুর মেয়ে। গতকাল ভবরঞ্জন সিল্কের পাঞ্জাবি পরিয়া পড়াইতে গিয়াছিল—ছাত্রী নাকি বলিয়াছে, 'মাস্টারমশাই, এই জামাটাতে আপনাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।' এই কথার কি গূঢ় অর্থ হইতে পারে তাহা লইয়া এতক্ষণ তুমুল তর্ক চলিতেছিল। একপাশে স্বয়ং ভবরঞ্জন ঘাসের উপর চিৎ হইয়া ধরাশায়ী মহারথীর ন্যায় পড়িয়া ছিল এবং বন্ধুদের বাক্যস্রোতের ফাঁকে ফাঁকে যতিচিহ্নের মতো উদাস দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। এই রঙিন আবহাওয়ার মধ্যে শিবদাসের কঠিন দার্শনিক প্রশ্নজাল গানের আসরে মোহমুদ্গরের শ্লোকের মতো সবাইকে ভয়ানক চমকাইয়া দিল।

কাজল বলিল—তুই কী বলতে চাইছিস?

—আমি বলতে চাইছি যে, এই আড্ডা দেওয়া, মেয়েদের নিয়ে আলোচনা আর নাটক-নভেল পড়ে আমরা বৃথা সময় কাটিয়ে দিচ্ছি। একটা কাজের কাজ কিছু করা উচিত। এরপর বুড়ো হয়ে গেলে আর অনুশোচনা ছাড়া কিছু করার থাকবে না—

বার্ধক্যের কথা ভাবিয়া কেহ যে খুব একটা ভয় পাইল এমন নহে। যৌবন সময়টাই এমন, যখন কেবল জীবনের আশাব্যঞ্জক দিকটি চোখে পড়ে। কোনো কিছু যে ফুরাইয়া যাইবার সম্ভাবনাও আছে সেটা চট করিয়া মনে আসে না।

অভয় জিজ্ঞাসা করিল—তোর মাথায় কোনো প্ল্যান আছে?

শিবদাস বলিল—আছে।

—কি?

—আমরা গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য নাইট স্কুল খুলতে পারি। এই আমাদের শহরেই কত ছেলেমেয়ে ইস্কুলে যায় না, তাদের বাবা-মায়ের ছেলেপুলেকে পড়াশুনো শেখাবার পয়সা নেই। আমরা বন্ধুরা মিলে তাদের লেখাপড়া শেখাতে পারি—

কথাটা সবারই মনে ধরিল। বিকালে আড্ডা না দিয়া পড়াইলে মন্দ কি? সবাই মিলিয়া দেশের কাজও করা হইবে, আবার পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে গল্পগুজবও করা যাইবে।

কাজল বলিল—কাজটা ভালো। কিন্তু এর ইনিশিয়েটিভ্ কে নেবে?

শিবদাস বলিল—আমি নেবো। তুমি এবং অন্যরাও নেবে। আরে, এ কাজ শুরু করতে কী আর এমন হাতিঘোড়া লাগবে? আমরা সবাই দু-টাকা করে চাঁদা দিলেই একগাদা ধারাপাত, ফার্স্টবুক আর খাতা-পেনসিল হয়ে যাবে। ইস্কুলের ছেলেদের কাছে পুরোনো বইপত্রও কিছু চেয়ে নেবো—

সুভাষ বলিল—আর ব্ল্যাকবোর্ড? পুরোনো ব্ল্যাকবোর্ড তো আর চেয়ে আনা যায় না!

—ব্ল্যাকবোর্ড এখন কি হবে? শুরুতে ওসবের দরকার নেই। তোমরা শুধু বল প্রত্যেকে সপ্তাহে দু-দিন করে সন্ধেবেলা শ্রমদান করতে রাজি কিনা?

সকলেই রাজি। অভয় বলিল—কিন্তু জায়গা কোথায়? পড়াবো কোনখানে?

এটি জরুরি সমস্যা বটে। সেদিন বিতর্ক করিয়া কোনো সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। দিনপাঁচেক বাদে শিবদাস সান্ধ্যআড্ডায় ঘোষণা করিল—ওহে, নাইটস্কুলের জায়গা পাওয়া গিয়াছে—

অভয় বলিল—খুব ভালো কথা, কোথায়?

—সরকারদের বাড়ির বারান্দায়। দোমহলা বাড়ি, লোকজন সব ভেতরে থাকে। সদর বাড়ির বারান্দায় কেবল বুড়ো রামযদু সরকার, নেড়ার বাবা আর কানাই চাটুজ্যে—এরা মিলে দাবার আড্ডা বসায়। তা সে আসর বসে রাত্তির ন-টায়, চলে দেড়টা দুটো অবধি। আমরা স্কুল করবো সন্ধে ছটা থেকে সাড়ে-সাত কি আটটা পর্যন্ত। কাজেই তাদের অসুবিধে হবার কথা নয়। রামযদু সরকারকে বলে-কয়ে রাজি করিয়েছি। সামনের মাসের পয়লা তারিখ থেকে স্কুল চালু করে দাও—

খাতাপত্র ধারাপাত ইত্যাদির ব্যবস্থা হইয়া গেল এবং অচিরেই সরকারবাড়ির বারান্দায় নিয়মিত নাইটস্কুল বসিতে লাগিল।

প্রথম দিন একটি ছোটমতো সভা করিয়া স্কুলের উদ্বোধন হইল। রামযদু সরকারের বাড়ি, কাজেই তাঁহাকে সভাপতি করা হইল। আর আসিলেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের হেডপণ্ডিত। দু-একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকও আসিলেন। ছেলেরা আরও অনেককে বলিয়াছিল, কিন্তু প্রায় সবাই একটা না একটা কাজ দেখাইয়া এড়াইয়া গেলেন। হেডপণ্ডিত বলিলেন—বিদ্যাদান অতি পুণ্যকর্ম। তিনি স্বয়ং এই পথে বিগত পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া পুণ্যার্জন করিয়া আসিতেছেন। ছেলেরা যে গতানুগতিক প্রমোদে মত্ত না হইয়া দেশের মানুষকে শিক্ষাদানের ব্রত লইয়াছে, ইহাতে তিনি আনন্দিত বোধ করিতেছেন। ইস্কুলটি টিকিয়া থাকুক—ঈশ্বরের কাছে তাঁর এই প্রার্থনা।

রামযদু সরকার জীবনে জনসভায় কিছু বলেন নাই। তিনি বলিলেন—ছেলেগুলিকে তিনি চেনেন, ইহারা সবাই খুব ভালো। কাজেই যে কাজ তাহারা করিতে চলিয়াছে তাহাও যে ভালো তাহাতে তাঁহার সন্দেহ নাই। তবে রাত্রিতে তাঁহাদের দাবার আড্ডাটি বিশ বৎসরের—ছেলেরা আড্ডার সময় হইবার পূর্বেই যেন বারান্দা ছাড়িয়া দেয়।

সমবেত জনসাধারণকে হরি ময়রার দোকানের সিঙাড়া আর অমৃতি খাওয়াইয়া সভার সমাপ্তি হইল।

কাজল ও তাহার বন্ধুরা শহরের নিম্নবিত্ত অধিবাসীদের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া ইস্কুলের কথা প্রচার করিয়া আসিয়াছিল। প্রথমদিন জনা দশ-বারো ছাত্র-ছাত্রী পড়িতে আসিল। ইহাদের মধ্যে কেহ বর্ণপরিচয়হীন, কেহবা শহরের ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে পড়ে, গৃহশিক্ষক রাখিবার সঙ্গতি নাই বলিয়া নাইটস্কুলে পড়া দেখিয়া লইতে আসে।

প্রতি সপ্তাহেই দুই-একজন করিয়া ছাত্র বাড়িতে লাগিল। কাজল হিসাব করিয়া দেখিল এই হারে ছাত্রসংখ্যা বাড়িতে থাকিলে মাস দুয়েকের মধ্যে সরকারদের বারান্দায় আর কুলাইবে না। আচ্ছা, প্রয়োজন হইলে বরং তাহাদের বাড়ির বাহিরের ঘরে স্কুলের একটা ব্রাঞ্চ খোলা যাইবে।

একমাস সগৌরবে স্কুল চলিল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা সবে স্কুল বসিয়াছে, কাজল ছাত্রদের কী একটা টাস্‌ক্ দিয়া একটু পায়চারি করিবে বলিয়া বারান্দা হইতে নামিয়াছে, এমন সময় একজন লোক আসিয়া তাহাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

লোকটির চেহারা বিশাল, প্রথম দেখিলে মনে হয় একসঙ্গে বুঝিবা চার-পাঁচজন মানুষকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। পরনে খাটো ও মোটা ধুতি, গায়ে খাকি রঙের ফতুয়া জাতীয় জামা। হাত-পাগুলি মোটা শালের গুঁড়ির মতো। আঙুল দেখিলে মনে হয় যেন একছড়া মর্তমান কলা ঝুলিয়া আছে। মুখে প্রচুর দাড়িগোঁফের জঙ্গল।

লোকটি আবার কাজলকে হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিল।

কাজল জিজ্ঞাসা করিল—কি চাই ভাই তোমার?

লোকটা ভাঙা ভাঙা হেঁড়ে গলায় বলিল—শুনলাম শহরে লিখাপড়া জানা খোকাবাবুরা ইস্কুল খুলেছে—গরিব আর বুঢ্‌ঢা লোকেদের পড়া শিখাবে বলে, এইটা কি সেই ইস্কুল?

কাজল একটু অবাক হইল। এসব খোঁজে এই লোকটার কী প্রয়োজন? সে বলিল—হ্যাঁ, এটাই। তুমি কিছু বলবে?

লোকটা বিনয়ে ঘাড় নিচু করিয়া মৃদুস্বরে (সিংহের পক্ষে তাহার গর্জনকে যতটা মৃদু করা সম্ভব) বলিল—হাঁ বাবু। আমি লেখাপড়া শিখবো।

কাজল বিস্মিত হইয়া লোকটার দিকে তাকাইয়া রহিল। বলে কী! ইহার বয়েস দেখিয়া যতদূর মনে হয়, পঞ্চান্নর কম হইবে না। কথার টানে বোঝা যায় বাঙালিও নয়। তাহার উপর এই মনোহর আকৃতি! ইহাকে পড়াইতে রীতিমত বুকের পাটা দরকার। ছাত্র অবাধ্যতা করিলে পাড়াসুদ্ধ লোক ঠেকাইতে পারিবে কিনা সন্দেহ। সর্বনাশ! লোকটির এরূপ ভয়ানক দুর্বুদ্ধি হইল কেন? আরও কত কাজ তো করিতে পারিত?

কাজল একবার ঢোক গিলিযা বলিল—লেখাপড়া শিখবে? ইয়ে—সে তো খুব আনন্দের কথা। তবে হয়েছে কী—মানে, তোমার আবার একটু বয়েস হয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে কিনা—এই বয়েসে কী—

লোকটা কাজলেব দুই হাত ধরিয়া মিনতির স্বরে বলিল—খোখাবাবু, আমি বিন্‌তি কবছি—আমাকে পড়াও। বেশি না, থোড়া শিখলেই হবে। ভগওয়ান তোমার মঙ্গল করবেন—

কাজলের অদ্ভুত লাগিল। লোকটির বিশাল, কুদর্শন ও বৃঢ় প্রচ্ছদের অন্তরালে একটি সরল এবং কোমল অন্তঃকরণ যেন উঁকি দিতেছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নাম কী? কোথায় থাকো?

—বাবু, আমাব নাম সিংহাসন, বাড়ি চম্পারণ জিলা। এখানে আমি ইস্টেশনে কুলিব কাম করি—থাকি বুড়য়া সিংয়ের বস্তিতে। একা। বাড়ির সবাই থাকে দেশের গ্রামে। আমাকে পড়াও বাবু, আমি ধেয়ান্‌সে পঢ়বে—

কাজল ফাঁপরে পড়িল। অজ্ঞানতিমিরে নিমজ্জিতকে আলোকশিখা দেখাইবার জন্য স্কুল খুলিয়াছে, এখন এই বিদ্যোৎসাহী প্রৌঢ় ছাত্রকে বিমুখ করে কী কবিয়া? অথচ ইহার আকার-প্রকার দেখিয়া মনে হয় কাজলের, জীবদ্দশায় বর্ণপরিচয় শেষ হইয়া উঠিবে না।

সে বলিল—আচ্ছা. সে হবে এখন। তুমি এসে এইখানে বোসো আগে, তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করি—

সিংহাসন বারান্দার একপ্রান্তে সসঙ্কোচে বসিল। কাজল চেয়ারে এবং সিংহাসন মাটিতে বসিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও সিংহাসনেব মাথা প্রায় তাহার মাথার কাছে উঠিয়া আসিয়াছে। জোয়ান বটে লোকটা।

কাজল বলিল—তুমি হঠাৎ লেখাপড়া শিখতে চাও কেন?

কিছুক্ষণ কী ভাবিয়া শেষে সিংহাসন বলিল—আপনার কাছে শরম করে আর কী হবে? বলেই ফেলি। আমার দুই শাদি বাবু—পহ্‌লা অওরতের বাচ্চাকাচ্চা হল না। তখন আমি করলো কী, এটা একটু খারাপ কাম হয়েছিল—আমি আর একটা শাদি করলো। দুস্‌রা বিবির একটাই লেড়কা, তার বয়েস এখন পন্দ্রহ্‌ সাল। ছেলেটাকে বাবু আমি বুকে করে মানুষ করলাম, বচ্‌পন থেকে যা চাইলো তাই দিলাম—কিন্তু মহল্লার পাজি লৌণ্ডাদের সঙ্গে মিশে ছেলেটা বিগড়ে গেল। দু-মাস আগে মুলুক গিয়েছিলাম। একদিন ছেলে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে বলল—তোকে বাপ বলতে শরম হয়। তুই তো অন্‌পড় কুলি আছিস, ফালতু আদমি। ভাবুন খোখাবাবু, আমার নিজের লেড়কা আমাকে অন্‌পড় আর কুলি বলে গালি দিল। গুস্‌সা করে আমি মুলুক থেকে চলে এসেছি। এখন আমি

লিখাপড়া শিখে নিজের হাথ্‌সে ছেলেকে একটা চিঠ্‌ঠি লিখতে চাই। উফ্! আমার লিখা চিঠ্‌ঠি পেলে ছেলে কেমন অবাক হয়ে যাবে ভাবুন তো বাবু! তখন সে আর আমাকে ফাল্‌তু আদমি বলতে সাহস পাবে না—

কাজলের অবশ্য মনে হইল সিংহাসন অপেক্ষা তাহার ছেলেরই শিক্ষার প্রয়োজন বেশি এবং সিংহাসন নিজে বিদ্যার্জনের উদ্যোগ না করিয়া উক্ত পুত্রের দুইপাটি দাঁত ভাঙিয়া দিলে শিক্ষাটা সম্পূর্ণ হইত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে এই ভয়ালদর্শন অথচ নিরীহ ও সরল মানুষটির প্রতি কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করিল। সে বলিল—আচ্ছা, আমি তোমাকে পড়াবো। কাল সন্ধেবেলা শ্লেট আর পেনসিল নিয়ে চলে আসবে—

সিংহাসন যথার্থ খুশি হইয়া বলিল—রামজী আপনার মঙ্গল করুন। বেশি না বাবু, সির্ফ একটা চিঠ্‌ঠি লিখবার মতো শিখালেই হবে—

—তোমাকে কিন্তু বাংলা শিখতে হবে, আমি হিন্দি জানি না—

—ঠিক আছে বাবু। মহল্লায় বাঙালি মাস্টরবাবু আছে। ছেলে তাকে দিয়ে পড়িয়ে লিবে। সে আরও ভালো হোবে, আমার দেশে কোনো হিন্দুস্তানী বাংলা লিখতে জানে না—

পরের দিন হইতে সিংহাসন নিয়মিত স্কুলে আসিতে আরম্ভ করিল। তাহার অধ্যবসায় দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। পুরা দুইঘণ্টা সে একটুও নড়ে না, বসিয়া বসিয়া শ্লেটের ক-খ-এর উপর দাগা বুলায়। প্রথমদিকে তাহার অল্পবয়স্ক সহাধ্যায়ীরা ব্যাপার দেখিয়া হাসি চাপিতে পারে নাই। তাহাদের হাসি ও কোলাহলে পড়াশুনার অসুবিধা হয় বলিয়া আজকাল সিংহাসন স্কুলে একঠোঙা সস্তা লজেন্স লইয়া আসে। ছেলেপুলেরা গোলমাল শুরু করিলেই সিংহাসন দরাজ হাতে লজেন্স বিতরণ করিতে থাকে। কোলাহল অচিরেই থামিয়া যায়।

সিংহাসন এক হাঁটু পাতিয়া এবং এক হাঁটু তুলিয়া অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে। সামনে মাটির উপর শ্লেট রাখিয়া অবিচলিত ধৈর্যের সঙ্গে বর্ণমালা লেখা অভ্যাস করে। কখনও বা বর্ণপরিচয়ের পাতা খুলিয়া অক্ষরগুলির উপর মোটা মোটা আঙুল রাখিয়া ভারি গলায় পড়িতে থাকে—কো, ক্ষো, গো—

কিন্তু সবার সবকিছু হইবার নহে। কেবলমাত্র আগ্রহ থাকিলেই কেহ ইচ্ছামত শিক্ষালাভ করিতে পারে না—সেক্ষেত্রে প্রবণতার প্রশ্ন আছে। কিছুদিন যাইবাব পর কাজল বুঝিতে পারিল লেখাপড়া জিনিসটা সিংহাসনের হইবার নহে। কিন্তু বেচারার এমন আকুলতা—তাহাকে মুখেব উপর নিষ্ঠুর সত্য কথাটা বলিতে বাধে। বিশেষ করিয়া লজেন্স বিতরণের মাধ্যমে তরুণ সহপাঠীদের নিকট সিংহাসন যেরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে তাহাতে সে বিদায় লইলে ইস্কুল টিকিবে কিনা সন্দেহ। বরং যেমন চলিতেছে চলুক। মন্দ কী, ইহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। লোকটি নেশাভাঙ না করিয়া অন্তত একটা ভালো জিনিস লইয়া আছে।

একদিন কাজল সিংহাসনের বাড়ি দেখিতে গেল।

রেলওয়ে স্টেশনের পাশ দিয়া ফিডার রোড্ বাহির হইয়া জেলাশহরে যাইবার বড়ো রাস্তায় মিশিয়াছে। ফিডার রোডের ধারে বুড়ুয়া সিংয়ের বস্তি, সেখানে গিয়া সিংহাসনের নাম করিতেই একজন তাহার ঘরটা দেখাইয়া দিল। সমস্ত বস্তিটা ছোট ছোট নিচু খোলার চালের ঘর লইয়া প্রস্তুত, তাহারই একটায় সিংহাসন থাকে।

ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া নাম ধরিয়া ডাকিতেই সিংহাসন বাহির হইয়া কাজলকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

—খোখাবাবু আপনি! কী ব্যাপার খোখাবাবু?

—কিছু না সিংহাসন, এমনি, তোমার বাড়ি আসতে ইচ্ছে ছিল, চলে এলাম।

সিংহাসন খুশিতে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া সে কাজলকে একটা

জলচৌকির উপর বসিতে দিল। বস্তির মধ্যে হইলেও ঘরখানি বেশ পরিষ্কার। একদিকে একটি দড়ির চারপাই, তাহার উপর একটি চাদর ও বালিশ—দুইটিই ফরসা করিয়া কাচা। ঘরের অপর প্রান্তে অনুচ্চ কাঠের বেদির উপরে সিন্দুরলিপ্ত রামসীতার পট। এককোণে ঝকঝকে করিয়া মাজা একটি পেতলের ঘটি ও কয়েকটি থালাবাসন।

কাজল বলিল—বাঃ, বেশ ঘর তোমার। বেশ পরিষ্কার করে রেখেছো—

—আমি নোংরা দেখতে পারে না খোখাবাবু। বাইরেটা যার নোংরা, তার ভেতরটা সাফা হোয় না। উ বাত ছোড়ো, কী খাবে বোলো—

—আমি কিছু খাবো না সিংহাসন, তুমি ব্যস্ত হোয়ো না—

সিংহাসন সে কথা শুনিবার পাত্র নহে। ব্রাহ্মণ অতিথি, অন্য কিছু খাইতে আপত্তি করিবে ভাবিয়া পাড়ার একটা ছেলেকে দিয়া খাঁটি গরুর দুধ আনাইয়া নতুন মাটির ভাঁড়ে করিয়া খাইতে দিল। বলিল—আমি গরিব লোক, আজ এই দিলাম। এবার দেশে গেলে তোমার জন্য পেঁড়া নিয়ে আসবো—আমাদের দেহাতে খুব আচ্ছা পেঁড়া তৈরি হয়—

দুগ্ধপান করিতে কবিতে কাজল বলিল—তুমি রাত্তিরে কী খাবে সিংহাসন?

সিংহাসন একগাল হাসিয়া বলিল—আমি আর কী খাবে? সেরভর আটা দিয়ে ছ-খানা রোটি বানাবো, করেলার ভাজি করবো আর রহড়ের দাল—এই খাবো।

কাজল অবাক হইয়া বলিল—একসের আটায় ছ-খানা রুটি! বলো কী?

—হাঁ বাবু। বাঙালি রোটি না—হামাদের বেহারী রোটি, বহুৎ মোটা আর পয়দাওয়ালা। পাতলা বাঙালি রোটি খেলে হামার পেট ভরে না।

সিংহাসন অবিচল ধৈর্যের সঙ্গে পড়াশুনা চালাইতে লাগিল। দুই-তিনমাস কাটিয়া গেল, এখনও সে ক-খ লিখিতে শিখিল না। কিন্তু তাহার নিষ্ঠা দেখিয়া কাজলের আশঙ্কা হইল, একদিন হয়তো বা সে সত্যই লেখাপড়া শিখিয়া ফেলিবে!

অকস্মাৎ একদিন সিংহাসন পড়িতে আসিল না।

ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত, কারণ অসহ্য গরম বা ঝমঝম বৃষ্টি কোনোটাই এতদিন সিংহাসনকে ঠেকাইতে পারে নাই। বগলে স্লেট-পেন্সিল লইয়া সে নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে আসিয়া হাজির হয়। প্রথমদিন কাজল ভাবিল বোধহয় তাহার অসুখ করিয়াছে। কিন্তু পরপর দুই তিনদিন তাহার অনুপস্থিতির পর কাজল চিন্তিত হইয়া পড়িল। কী হইল মানুষটার? একবার খোঁজ করা দরকার!

সেদিন সন্ধ্যায় স্কুলে কাজলের ক্লাস ছিল না, হাঁটিতে হাঁটিতে সে বুড়ুয়া সিংয়ের বস্তিতে গিয়া হাজির হইল। হ্যাঁ, ওই তো নিজের ঘরের সামনে হাঁটুর উপর থুতনি রাখিয়া সিংহাসন বসিয়া আছে—তাহার গায়ে লাল কুর্তা, লাইসেন্সওয়ালা কুলিদের ইউনিফর্ম। কাছে গিয়া সে বলিল—কী সিংহাসন, পড়তে যাচ্ছ না যে?

সিংহাসন ঘোলাটে লাল চোখে একবার কাজলের দিকে তাকাইয়া আবার পূর্ববৎ বসিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইল না সে কাজলকে চিনিয়াছে।

এ আবার কী কাণ্ড! লোকটা নেশা করিয়াছে নাকি? কিন্তু এ কয়দিনে সে যতটা বুঝিয়াছে তাহাতে সিংহাসন নেশা করিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। তবে?

আরও দুই-একবার ডাকাডাকি করিয়াও কাজল সাড়া পাইল না।

—বাবুজি!

কাজল দেখিল, বস্তিরই একজন প্রৌঢ় হিন্দুস্থানী অধিবাসী তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকটা বলিল—বাবুজি, আপনি আমার সঙ্গে এদিকে আসুন—

ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া কাজল তাহার সঙ্গে একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইল।

—বাবুজি, আপনি কী সিংহাসনের কাছে এসেছেন?

—হ্যাঁ। কী হয়েছে ওর? কথা বলছে না কেন?

প্রৌঢ় লোকটি মাথা নিচু করিয়া বলিল—সিংহাসনের দেশ থেকে খবর এসেছে। চেচক হয়ে ওর ছেলেটা মারা গিয়েছে। আজ চারদিন ওইরকম বসে আছে বাবুজি, খাচ্ছে না, শুচ্ছে না—

কাজলের বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি দিয়া আঘাত করিল। চেচক—মানে বসন্ত হইয়া সিংহাসনের ছেলে মারা গিয়াছে! বেচারা সিংহাসন, প্রৌঢ় বয়েসের সন্তান—এ ধাক্কা সামলাইয়া ওঠা কঠিন হইবে। সে দূর হইতে তাকাইয়া দেখিল—সিংহাসন পাথরের মূর্তির মতো চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

কয়েকদিন পরে কাজল খবর পাইল দেশ হইতে লোক আসিয়া সিংহাসনকে বাড়িতে লইয়া গিয়াছে। আর হয়তো তাহার সহিত দেখা হইবে না।

চম্পারণ জেলার অশিক্ষিত হিন্দুস্থানী কুলি। কিন্তু তাহার সারল্য এবং গভীর নিষ্ঠা কাজলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। অকারণ সৎ মানুষ ভাগ্যের হাতে এইরূপ নিষ্ঠুর শাস্তি পায় কেন? শোকগ্রস্ত সিংহাসনের কথা ভাবিয়া তাহার ভারি দুঃখ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কাজলের মনের মধ্যে একটা বিচিত্র অস্থিরতা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল।

কিছুই করা হইতেছে না, অথচ অমোঘ গতিতে সময় কাটিয়া যাইতেছে। এক-একদিন বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করিবার পরেও ঘুম আসে না। বালিশে কান পাতিলে নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ ধ্বক ধ্বক করিয়া জানাইয়া দেয়—সময় চলিয়া যাইতেছে। সারাদিনের কর্মব্যস্ততা আর কোলাহলের ভিতর সে নিজের মুখোমুখি হইবার সুযোগ পায় না, কিন্তু রাত্রিবেলা দিনের সমস্ত কাজ ফুরাইয়া আসিলে নৈশ স্তব্ধতার একান্ত মুহূর্তগুলিতে তাহার মনে হয় জীবনে অনেক কিছু করিবার আছে, জীবন-মৃত্যু-অস্তিত্বের যে কুয়াশাচ্ছন্ন উত্তরহীন প্রশ্নের জগৎ—সেখানে আগ্রহের মশাল জ্বালিয়া ভ্রমণের প্রয়োজন আছে। দেরি হইয়া যাইতেছে, অথচ কীভাবে অগ্রসর হইতে হয় তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

একদিন কলেজের এক বন্ধুর কথায় তাহার মনে খুব আঘাত লাগিল।

প্রাণতোষ ছেলেটাকে কাজলের কোনোদিনই বিশেষ পছন্দ হইত না। এক ধরনের মানুষ আছে যাহারা পৃথিবীর সবকিছুর বিরোধিতা করিয়া আনন্দ পায়। প্রাণতোষ সেই ধরনের লোক। সে সোচ্চারে নিজের মত জাহির করিয়া থাকে, তাহার মতামত কাহাকেও আঘাত করিতেছে কিনা সে বিষয়ে তাহার কোনো পরোয়া নাই। বিখ্যাত ব্যক্তিদের মহাপুরুষত্ব সম্বন্ধে সে অকাতরে সন্দেহ প্রকাশ করে, সবার যে বিষয়ে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা আছে সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ কটু কথা বলিয়া সে চমক সৃষ্টি করিয়া থাকে। প্রতিষ্ঠিত সমস্ত ধ্যানধারণাকে ভালোমন্দ নির্বিশেষে সে আঘাত করিতে উদ্যত, অনেকেই তাহাকে বীর ও সংস্কারক বলিয়া ভুল করে, কাজেই অপ্রিয়বাদী প্রাণতোষেরও একটি ভক্তের দল ছিল।

অফ্ পিরিয়ডে কাজল একদিন কমন রুমে বসিয়া বই পড়িতেছে, এমন সময় কোথা হইতে প্রাণতোষ আসিয়া উপস্থিত। এককোণে কাজলকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে প্রশ্ন করিল—কী অমিতাভ, ক্লাস নেই?

বই হইতে মুখ তুলিয়া কাজল বলিল—না, এস.বি. আজ আসেন নি—

—কী পড়ছো ওখানা? ক্লাসের বই?

কাজল প্রাণতোষকে বিলক্ষণ চেনে, কিন্তু মিথ্যা বলিয়াও লাভ নাই—সে হয়তো এখনই

বইখানা দেখিতে চাহিবে। একটু ইতস্তত করিয়া সে বলিল—না, ক্লাসের বই নয়। বিংহ্যাম মাচু-পিচ্চু আবিষ্কার করার পর যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেটা পড়ছি—

প্রাণতোষ মুখের একটা বিচিত্র ভঙ্গি করিয়া বলিল—মাচু-পিচ্চু আবার কী?

—স্প্যানিয়ার্ডদের তাড়া খেয়ে ইন্‌কারা পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল জানো তো? সেই যে—কর্টেজ আর পিজারোর ব্যাপার! তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। আন্ডিজের গোলকধাঁধার মধ্যে কোথায় তারা নতুন করে বসতি স্থাপন করেছিল এতদিন তা জানা ছিল না। বিংহ্যাম সাহেব এই শতাব্দীর প্রথম দিকে ইন্‌কাদের সেই গোপন শহর খুঁজে বার করেন, সেই হল মাচু-পিচ্চু।

প্রাণতোষ তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল—তোমার খালি ওইসব পড়া! আরে কোথায় কোন সাহেব কী আবিষ্কার করেছে তা জেনে কী হবে বলতে পারো? আমাদেব দেশেও তো পণ্ডিত রয়েছে, তাদের আবিষ্কারের মূল্য কী কম?

কাজল অবাক হইয়া বলিল—সে কথা কে বলেছে? তুমি কী বলতে চাও?

—তোমাকে সব সময় বিদেশী বইপত্র পড়তে দেখি। এটা একরকমের স্বজাতিবিরোধ।

কাজল রাগ করিতে গিয়াও হাসিয়া ফেলিল বলিল—প্রাণতোষ, আসলে তুমি তর্ক করতে ভালোবাসা, নইলে এক সামান্য কাবণে এত গুরুতর অভিযোগ করতে না—

কাজলের হাসি দেখিয়া প্রাণতোষ চটিয়াছিল. তাছাড়া নিজেকে সে কঠোর যুক্তিবাদী মনে করিয়া থাকে। কাজেই সে রূঢ়স্বরে বলিল—আমি যে অর্থে কথাটা বলেছি তুমি ধরতে পারোনি। আসলে পরাধীন থেকে থেকে আমাদেব ভেতরে সাহেবদের সবকিছু দেখে মুগ্ধ হবার একটা প্রবণতা দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সাহেবদের বই ভালো, গবেষণা উঁচুদরের, তাদের পোশাক আশাক ভালো—আর আমাদের সমস্তই ফাঁকি—

—ইংরেজি বই পড়লে কী তাই প্রমাণিত হয়?

—সবসময় ইংরেজি বই পড়লে তাই মানে দাঁড়ায় বটে। বাংলায় কী ভালো বই লেখা হয়নি? এটা দাসত্বসুলভ মনোভাবের প্রকাশ।

এবার কাজলও চটিল, সে বলিল—দেশের সাহিত্যের কথা বলছো? আমি তো দু-বকমই পড়ি। তুমি কী কী পড়েছো?

প্রাণতোষ থতমত খাইয়া গেল।

কাজল আবার বলিল—'কৃষ্ণচরিত্র' পড়েছ? প্রভাতবাবুর গল্প আর উপন্যাস? রবি ঠাকুরের কী পড়া আছে?

প্রাণতোষ জেদের গলায় বলিল—রবীন্দ্রনাথ আমি অনেক পড়েছি—

—ওরকম বললে হবে না। আমি এঁদের বই প্রায় সবই বহুবার করে পড়েছি। কাজেই আমার অন্য বইও পড়বার অধিকার আছে।

কমনরুমে দুই-একজন করিয়া ছেলের ভিড় বাড়িতেছিল। তাহাদের মধ্যে প্রাণতোষের ভক্তরা কেহ কেহ রহিয়াছে। গরম আবহাওয়ার আভাস পাইয়া তাহারা অন্যদিকে তাকাইয়া থাকিবার ভান করিয়া তর্ক শুনিতে লাগিল। ভক্তদলের সামনে অপদস্থ হইবার আশঙ্কায় প্রাণতোষ মরীয়া হইয়া উঠিল। সে বলিল—কেবল বই পড়ার জন্যই বলছি না, তোমার রুচির মধ্যে একটা escapism আছে, সেটা মানো তো?

কাজল বই মুড়িয়া রাখিয়া বলিল—কী রকম?

—মানুষের জীবনটা গোলাপফুল দিয়ে বানানো শয্যা নয়, এখানে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। সেই বাস্তবের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তুমি সারাদিন নক্ষত্রজগৎ আর পামীরের মালভূমি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করো—এটা এস্‌কেপিজম নয়?

—কিন্তু এই বিশ্বের সবটাই তো ফিজিক্যালি বাস্তব, কাজেই তা নিয়ে ভাবনাচিন্তায় দোষ কোথায়?

প্রাণতোষ ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল—তুমি বুঝবে না। যাদের কঠোর পরিশ্রম করে উদরান্নের সংস্থান করতে হয় তাদের কাছে ডাল-ভাতের জগৎটা অনেক বেশি বাস্তব। মহাশূন্যে ক'খানা নক্ষত্র জন্মালো কী মরলো, কিংবা আফ্রিকার জঙ্গলে কী কী প্রাণী পাওয়া যায় এসব খবরে তাদের প্রয়োজন নেই—

এখানে কাজল রাগের মাথায় একটা ভুল করিল, সে বলিল—দেখ প্রাণতোষ, বাস্তব জিনিসটার অনেক aspect আছে। অ্যাবসলিউট বাস্তব বলে তো কিছু হয় না। প্রতিদিনের ডাল-ভাত-চচ্চড়ি খাওয়ার সাধারণ জীবনটা যেমন বাস্তব, তেমনি এই বিশাল জগতের দূরতম কোণে যা ঘটছে তাও আমার কাছে বাস্তব। তা নিয়ে চর্চায় কোনো অন্যায় আছে বলে মনে করি না—

প্রাণতোষ বলিল—আমি ঠিক সেই কথাটাই বলতে চাচ্ছি, তুমি আমার কথাটাই বললে। ওই জগৎটা তোমার কাছে বাস্তব, কিন্তু পৃথিবীর কোটি কোটি সাধারণ মানুষের কাছে নিতান্ত অলীক। হয়েছে কী অমিতাভ, আমি একথা বলছি বলে রাগ কোরো না—সত্যের খাতিরে বলতেই হচ্ছে—ইউ হ্যাভ্ বীন বর্ন উইথ্ এ সিলভার স্পুন ইন মাউথ! কালকের খাবার কোথা থেকে আসবে এ চিন্তায় তোমাকে ছটফট করতে হয় না—কাজেই তোমার পক্ষে রঙিন কল্পনায় বিভোর থাকতে অসুবিধে নেই। তুমি হচ্ছ গিয়ে প্রিভিলেজ্‌ড্ শ্রেণীর লোক। তাছাড়া যেসব লোকেব বই পড়ে পুলকিত হচ্ছো তাদের মতো কিছু করে দেখাতে পারলেও বুঝতাম। তাও তুমি পারবে না, কাবণ প্রিভিলেজ্‌ড্ জীবনযাপন করে ইউ হ্যাভ্ গন সফ্‌ট্—

কাজলকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রাণতোষের ভক্তেব দল ধরিয়া লইল কাজল তর্কযুদ্ধে হারিয়া গিয়াছে। তাহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কাছে আসিযা বসিল।

এ ধরনের আলোচনার উপর কাজল বিশেষ গুরুত্ব দিয়া থাকে। সারাদিন ধরিয়া তাহার মন বিষণ্ণ হইয়া রহিল। প্রাণতোষ কিছুটা তর্কের জন্যই তর্ক করিয়াছে, তাহাব যুক্তিগুলি বেশিব ভাগই নড়বড়ে এবং তাহার ভিতর আক্রমণের ইচ্ছাই সুস্পষ্ট—তবু প্রাণতোষের কথার মধ্যে কিছু সাববত্তা আছে তাহা সে অনুভব করিতে পারিল। সাধাবণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন সম্বন্ধে প্রাণতোষ যাহা বলিয়াছে তাহা শোনা কথা মাত্র, দারিদ্র এবং সংগ্রাম কাহাকে বলে প্রাণতোষ তাহাব কী জানে? তাহার বাবা এই কলিকাতা শহরে প্রথম যৌবনে কী ভয়ানক দারিদ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে! কোনোদিন খাইযাছে, কোনোদিন খাইতে পায় নাই। থাকিবার জায়গা ছিল না, পড়িবার খরচ ছিল না—তাহা সত্ত্বেও বাবা সুদূরের স্বপ্ন দেখিয়াছে, লেখক হইয়া উঠিয়াছে। আর প্রাণতোষ, ক্রিমিনাল কোর্টের বিখ্যাত উকিলের ছেলে—পাঞ্জাবি আব পাম্পশু পায়ে কলেজে আসিয়া কথায় কথায় সিগারেট খায়—শখের মানবদরদ দিয়া সে কী বুঝিবে সংগ্রাম কাহাকে বলে? কাজল বুঝিল সমস্ত তর্কটা প্রাণতোষের বুদ্ধির ব্যায়াম মাত্র। কিন্তু সংগ্রামের সহিত সুন্দরের সাধনায় যে কোনো বিরোধ নাই এ বিষয়ে তাহার বাবার উদাহরণটা সময়মতো মনে আসিল না। অবশ্য প্রাণতোষ নিশ্চয় একটা ভয়ানক উলটো যুক্তি দেখাইত। ভালোই হইয়াছে বাবার কথাটা মাথায় আসে নাই। প্রাণতোষকে বিশ্বাস নাই, হয়তো একটা খারাপ কথা বলিয়া ফেলিত। বাবার সম্বন্ধে কোনো অসম্মানজনক কথা সে সহ্য করিতে পারিত না।

কিন্তু গত কয়েকদিন হইতে জীবনের সার্থকতার বিষয়ে সে নিজে যাহা ভাবিতেছে, বা প্রভাত পিকনিকের আগের দিন রাত্রে তাহাকে যে কথা বলিয়াছিল, প্রাণতোষ ঠিক সেখানে আর একবার আঘাত করিল। সে কেবলমাত্র বই পড়িতেছে আর স্বপ্ন দেখিতেছে। ইংরাজিতে যাহাকে আর্মচেয়ার ট্রাভেলার বলে সে তাহাতেই পরিণত হইতে চলিয়াছে নাকি? সে কী সত্যই 'গন্ সফ্‌ট'?

কথাটা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তাহার বাবা প্রায় এই বয়েসে জীবনের সঙ্গে

সম্মুখযুদ্ধে নামিয়া পড়িয়াছে—কোথায় কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর সে? সে স্তূপাকাব বইপত্র পড়িয়া অর্থহীন ইন্‌ফরমেশনের বোঝা মাথায় লইয়া ঘুরিতেছে। শুনিতে যতই খারাপ লাগুক, প্রাণতোষের কথা একেবারে যুক্তিহীন নহে।

কিন্তু সে যে জীবনের গভীর রহস্যানুভূতির দিকটা একেবারে উড়াইয়া দিতে পারে না। বর্তমান পৃথিবীটা যাহাদের আত্মত্যাগ এবং মহৎ ক্রিয়াকলাপের উপর দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের জীবনী পড়িতে তাহার ভালো লাগে। দূর সমুদ্রের বুকে চাঁদের আলো পড়িয়া যে স্বপ্নরাজ্যের জন্ম দেয়, নীল আকাশের বুকে উড়ন্ত দুগ্ধধবল শঙ্খচিলের কর্কশ ডাকে সে রাজ্যের আহ্বান তাহার মনের দরজায় আসিয়া কড়া নাড়ে। তাহার ঘুমের মধ্যে আফ্রিকার বিস্তীর্ণ প্রান্তর দৌড়াইয়া পাব হয় জিরাফের দল, নিষ্পাদপ প্রেয়ারিতে আবক্ষ তৃণের গুচ্ছ কাঁপে নির্জন দ্বিপ্রহর ব্যাপিয়া বহমান বায়ুপ্রবাহে, আঙ্গাভা উপসাগবে ভাসমান হিমশৈলের উপর বিশ্রাম করে চিক্কনদেহ সীলমাছের ঝাঁক। আরও কত কী! এই মুহূর্তেই হয়তো ছায়াপথের অপর প্রান্তে দুইটি নক্ষত্রে সংঘর্ষ হইতেছে, কোনো অজানা গ্রহে অঙ্কুরিত হইতেছে নতুন প্রাণ। প্রাণতোষ যাহাই বলুক—এই অকারণ স্বপ্নদর্শিতাই—যাহা ডাল-ভাতের জীবনে কোনো কাজে আসে না—মানুষের সভ্যতাকে যুগে যুগে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিয়াছে।

সেদিন সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া কাজলের মনে হইল—আজ দিনটা বেশ ভালো কাটিবে। কেন একথা মনে হইল তাহা সে বলিতে পারে না। কিন্তু বাড়ির সামনের নিমগাছে প্রভাতেব স্নিগ্ধ রৌদ্র, বাতাসের ঝরঝরে তাজা ভাব আর ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের বাহিরে অবস্থিত একটা বহস্যময় অনুভূতি তাহাকে জানাইয়া দিল—আজ একটি বিশেষ দিন। এগারোটায় জরুরি ক্লাস আছে বলিয়া আজ তাহাকে নটার মধ্যে বাহির হইতে হইবে। স্নান করিতে ঢুকিয়া আপনমনে সে তাহার প্রিয় একটি গান গাহিতেছিল—'আজি দক্ষিণপবনে দোলা লাগিল মনে'। সে লক্ষ করিয়া দেখিয়াছে, সকালবেলা কোনো একটা গানের সুর মনে আসিলে এবং কয়েকবার গুনগুন করিলে সারাদিন সেটি মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। আজও তাহাই হইল, ট্রেনে যাইতে যাইতে, কলেজে ক্লাসের ভিতর এবং কমনরুমে সে সারাদিন ধরিয়া গানটা গাহিল। কমনরুমে পাশে বসিয়া প্রভাত গ্রিম্‌স্ ল সম্বন্ধে ভাষাতত্ত্বের নোট লিখিতেছিল, গান শুনিয়া সে আড়চোখে কাজলের দিকে তাকাইয়া অনুচ্চস্বরে বলিল—ব্যাপাব কী?

গান থামাইয়া কাজল বলিল—কিসের কী ব্যাপার?

—খুশি যে আর ধরে না! গুনগুন গান চলেছে! একবার ঝেড়ে কাশো দেখি—

—কী যা তা বলছো! এমনিই সকাল থেকে সুরটা—খুশির কী দেখলে?

প্রভাত 'সব বুঝি' গোছের মুখভাব করিয়া বলিল—দেখ ভাই, আলো, ধূপের গন্ধ, প্রেম আর বাছুরের শিং—এ যদি ভেতরে থাকে তো ফুটে বেরুবেই। এ জিনিস গোপন করে রাখা যায় না—

কাজল রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। প্রভাত হাসিতে হাসিতে আবার ভাষাতত্ত্বের নোট লেখা শুরু করিল।

কিন্তু সকালের অহেতুক আনন্দ যে প্রতিশ্রুতি বহন করিয়া আনিয়াছিল, সন্ধ্যা অবধি তাহা বাস্তবে রূপায়িত হইবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। সাতটা নাগাদ বাড়ি ফিরিয়া কাজল ভাবিল—যাই, একটু আড্ডা দিয়ে আসি। শিবদাস-অভয় ওদের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না—

নাইটস্কুল উঠিয়া গিয়াছে। দাবার আসর বসিতে দেরি হইতেছিল, তাছাড়া বিদ্যালয়ের বালকেরা আলস্যবশত দূরে না গিয়া বারান্দার ধারেই যথেচ্ছ প্রাকৃতিক আহ্বানে সাড়া দিত। ফলে স্থানটিতে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাকে ঠিক বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিমণ্ডল বলা যায় না। রামযদু সরকার নিতান্ত বিরক্ত হইয়া একদিন জানাইয়া দিলেন—যথেষ্ট হইয়াছে, আর নয়।

এবার তাহারা স্কুলের জন্য অন্য স্থান দেখিয়া লইতে পারে। ছেলেদের উৎসাহও কমিয়া আসিয়াছিল। কাজেই কয়েকমাস চলিবার পর স্কুল উঠিয়া গেল।

শহরের ঘিঞ্জি বসতি ছাড়াইয়া যে পথটি নদীর দিকে চলিয়া গেল, তাহারই ধারে একটি সুপ্রাচীন বটগাছ আছে। গাছটির বয়েস কম করিয়া শ-দেড়েক বছর হইবে, অনেকখানি জায়গা ঝুরি নামিয়া অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যার পর কোনো কোনো দিন এইখানে কাজল এবং তাহার বন্ধুদের আসর বসে। গলা ছাড়িয়া গান গাহিবার বা কবিতা আবৃত্তি করিবার পক্ষে এমন জায়গা আর নাই। লুকাইয়া ধূমপান করিবার জন্যও আদর্শ জায়গা বটে।

পড়ার টেবিলে বই এবং খাতাপত্র রাখিয়া কাজল আড্ডায় যাইবার জন্য বাড়ির বাহিব হইতেছে, এমন সময় হৈমন্তী ডাকিয়া বলিল—কী রে, খাবার খেয়ে যাবিনে? এই তো এলি, আবার কোথায় বেরুচ্ছিস?

—এই একটু কাছেই যাবো। দরকার আছে। দেরি হবে না, ফিরে এসে পড়তে বসবো। তুমি বরং এ ঘরটায় একটু ধুনো দিয়ে রেখো, বড্ড মশা কামড়ায়—

—খেয়ে যাবিনে? হালুয়া করে রেখেছি, খাবি?

—রাত্তিরে খাবোখন, রুটির সঙ্গে দিয়ো। এখন খিদে নেই—

কী মনে পড়ায় হৈমন্তী বলিল—ভালো কথা, তোর একটা চিঠি এসেছে আজ দুপুরে। পড়াব টেবিলে টেবিলক্লথের তলায় চাপা দিয়ে রেখেছি। দেখিস—

—কাব চিঠি মা?

—তা কী জানি! খামের চিঠি—বন্ধুবান্ধব কারও হবে—

হৈমন্তী চলিযা গেলে কাজল আবার নিজের ঘরে ফিরিযা আসিল। তাহাকে কে চিঠি লিখিয়াছে? ছুটির সময় কলেজের বন্ধুবা পুরী, দার্জিলিং বা বৈদ্যনাথ ধাম বেড়াইতে গেলে সেখান হইতে চিঠি লেখে বটে, কিন্তু এখন তো কলেজ পুরাদমে চলিতেছে। চিঠি লিখিবার মতো পরিচিত অন্য কাহারও কথা তাহার মনে আসিল না।

টেবিলক্লথের নিচে হইতে চিঠি বাহির হইল। আকাশী নীল রঙের খাম, ছয় পযসার ডাকটিকিট আঁটা। খামের উপর ইংরাজিতে তাহাব নাম ও ঠিকানা লেখা আছে। কিন্তু হস্তাক্ষর পবিচিত নহে।

খাম খুলিতেই পাত্‌লা এযাব মেলের কাগজে লেখা দুই-তিন পৃষ্ঠার চিঠি। পাতা উল্‌টাইযা চিঠির শেষে কাহার নাম রহিয়াছে দেখিতে গিয়া কাজল অবাক হইয়া গেল। এ কাহার নাম? সে ঠিক দেখিতেছে তো?

অপালা তাহাকে চিঠি লিখিয়াছে!

উঃ, ভাগ্যিস মা চিঠিটা খুলিয়া পড়ে নাই! মায়ের সহিত তাহার সম্পর্কের কোনো আড়াল গড়িয়া ওঠে নাই, অপরের চিঠি পড়িবাব ভদ্রসমাজে যে একটা নিষেধ আছে তাহা এখানে খাটে না। অনেক সময়েই তাহার ফিরিতে দেরি হইলে হৈমন্তী অসংকোচে তাহার চিঠি খুলিয়া পড়িয়া ফেলে। অবশ্য অপালা কী লিখিয়াছে সে জানে না, হয়তো হৈমন্তী এ চিঠি পড়িলে এমন কিছু আসে-যায় না—তবু কেমন একটা সংকোচের বোধ তাহাকে চাপিয়া ধরিল।

কাজলের আর বন্ধুদেব সহিত গল্প করিতে যাইবার উৎসাহ ছিল না। অন্যদিন এইসময়ে বাড়ি থাকিতে হইলে সে হাঁপাইয়া ওঠে। আজ মনে হইল—আবার কে এখন বাহির হয়! রোজ রোজ আড্ডা ভালো লাগে না। বরং বাড়িতে বসিয়া বার্কের কনসিলিয়েশন স্পীচটা শেষ করিয়া ফেলা যাইবে।

পড়ার টেবিলে বসিয়া কাজল চিঠির ভাঁজ খুলিল, তারপর কী ভাবিয়া উঠিয়া গিয়া দরজাটা সন্তর্পণে বন্ধ করিয়া ছিটকিনি তুলিয়া দিল।

চিঠি পড়িতে শুরু করার সময়ে কাজলের মনে হইল একমিনিট আগে অবধি তাহার জীবন

যেরকম ছিল, এই চিঠি পড়ার পর আর তাহা থাকিবে না—একেবারে বদল হইয়া যাইবে। কিছুদিন আগে পড়া কোন্ এক ইংরাজি উপন্যাসের নায়ক যেন বলনাচের আসরে পঞ্চদশী মেয়রের কন্যাকে দেখিয়া ভাবিয়াছিল—Life will never be the same again! ঠিক তেমন।

অপালা লিখিয়াছে :

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনি হয়তো ভেবেছিলেন আমি এমনি ঝোঁকের মাথায় ঠিকানা নিয়েছি, কিন্তু কোনোদিনই চিঠি লিখবো না। প্রথম কারও সঙ্গে পরিচয় হলে অনেকেই আগ্রহ করে ঠিকানা নেয়, যোগাযোগ রাখার সদিচ্ছা সত্যিই থাকে, কিন্তু সময় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামান্য পরিচয়ের স্মৃতি ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসে, চিঠি লেখা আর হয়ে ওঠে না। আমার ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। ছোটবেলা থেকে মাতৃভাষার চর্চায় বঞ্চিত থাকার পর এখন নতুন উৎসাহে আমি প্রচুর বাংলা চিঠি লিখে থাকি। আমার হাতের লেখাটা বিশেষ খারাপ নয়, বলুন? আর আমার বয়েসী মেয়ের আপনার বয়েসী ছেলেকে চিঠি লেখার বিষয়ে বাঙালি সমাজে যে একটা নিষেধাজ্ঞা আছে, সেটাও আমার ক্ষেত্রে খাটে না তা তো আপনাকে সেদিন বলেইছি—কারণ আমি বাঙালি সমাজ বলতে যা বোঝায় তার ভেতরে মানুষ হইনি। একদিক দিয়ে তাতে আমার উপকারই হয়েছে। মাঝে-মধ্যে ছুটিতে যখন বাংলাদেশে যাই, দেখি বাংলার মেয়েরা নানান অকারণ এবং অসহ্য সামাজিক নিয়মের বাঁধনে আধমরা হয়ে বাঁধা পড়ে আছে। তাদের মনের প্রসার নেই, চোখে দীপ্তি নেই—দেখলে এত খারাপ লাগে যে কী বলবো! তাদের দোষ নেই, শত শত বছরের সংস্কার এবং নিষেধের বাধা কাটিয়ে ওঠা দারুণ শক্তিমানের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না, তারা হঠাৎ কী করে পেরে উঠবে? এইসব মেয়েদের জন্য বড়ো কষ্ট হয়, পৃথিবীটা যে আসলে কত বড়ো, কত সুন্দর তা ওরা জানতেই পারলো না।

গতবার ছুটিতে বাড়ি এসে বর্ধমান জেলার এক অজ পাঁড়াগায়ে বাবার দূর-সম্পর্কের এক পিসিমার কাছে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। ভারি সরল মেয়েটি, এমনিতে লেখাপড়া কিছু জানে না, কিন্তু স্বভাবে একটা সহজাত বুদ্ধির ছাপ আছে। তার মধ্যে ভদ্রতা, সেবা আর অতিথিপরায়ণতা যা দেখেছি তাতে অবাক হতে হয়েছে, শহরের অনেক তথাকথিত বড়োলোকের মেয়ের মধ্যে তেমন থাকে না। এই মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—'আচ্ছা দিদি, পাহাড় কেমন দেখতে?' আমি অনেকক্ষণ ধরে তাকে বুঝিয়েছিলাম পাহাড় দেখতে কেমন, পাহাড়ে দাঁড়িয়ে সকালবেলা সূর্যোদয় দেখতে কেমন লাগে। আরও কত গল্প করেছিলাম। মেয়েটা বলেছিল—'আমার খুব ইচ্ছে করে কোথাও বেড়াতে যাই, কিন্তু কে নিয়ে যাবে বলো? এই তো সামনের বছরই বোধহয় আমার বিয়ে হয়ে যাবে, বাবা খুব চেষ্টা করছেন। তারপর সারাজীবন ভাত রান্না, কাপড়কাচা ছেলে মানুষ করা—আর কোনোদিন বেরুতে পারব না—'

আমার এত মায়া হল! ওকে কথা দিয়ে এসেছি এবার যখন ছুটিতে যাবো, তখন ওকে দু-এক মাসের জন্য আমার সঙ্গে নিয়ে আসবো। যদি অবশ্য ততদিনে ওর বিয়ে না হয়ে যায়। কিন্তু এ তো গেল একটা মেয়ের কথা, বাংলাদেশে এমন হতভাগ্য মেয়ে হাজার হাজার আছে। তাদের কী হবে? সবাইকে তো আমি বেড়াতে নিয়ে আসতে পারবো না?

তাই একদিক দিয়ে নিজেকে খুব ভাগ্যবতী বলে মনে হয়।

আপনাকে চিঠি লেখার আর একটা কারণ—আপনার বাবার বইগুলি আমি পড়তে শুরু করেছি। কেমন লাগছে জানতে চাইবেন নিশ্চয়। শুধু একটা কথাই বলি, তার থেকে যতটা পারেন বুঝে নেবেন। কথাটা এই—কেবলমাত্র অপূর্বকুমার রায়ের বই পড়বার জন্যই আমার বাংলা শেখা উচিত ছিল। একটু একটু করে পড়ছি, আর দেখছি উনি যেন ঠিক আমার মনের কথাটি বলছেন।

গ্রামের শান্ত, সুন্দর পরিবেশ—বাঁশবন, পাখির ডাক, সজনের ফুল—আবার তার সঙ্গে মায়ের ভালোবাসা দিয়ে মাখা নিষ্পাপ শৈশব, মাঠের ওপারে নীল দিগন্তের দিকে তাকিয়ে সুদূরের কল্পনায় মগ্ন হয়ে যাওয়া—এসব কথা এত সহজভাবে আর কে বলতে পেরেছেন? আপনার বাবার লেখা ভালো লেগেছে—এটা আপনাকে জানানো দরকার ছিল।

ছোটবেলায় বাবা একবার আমাকে স্টিভেনসনের দু-তিনখানা বই কিনে দিয়েছিলেন। ট্রেজার আইল্যান্ড পড়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। যেন কী অপার মুক্তির সন্ধান এনে দিল বইখানা! নীল সমুদ্র, নির্জন দ্বীপ, পাল-তোলা জাহাজে করে দুঃসাহসিক অভিযান—রাত্তিরে তো লং জন সিলভারকে কদিন স্বপ্নই দেখে ফেললাম। পৃথিবীটা ছোট নয়, শুধু আমার পরিবার, দেশ বা এই গ্রহটা নিয়ে বিশ্ব গঠিত নয়—কোটি কোটি নক্ষত্র আর নীহারিকা দিয়ে তৈরি এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যে রূপ, তার আবছা আভাস সেই বয়েসেই যেন দূর থেকে দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর এতদিন কত মানুষের সঙ্গে মিশেছি, কত লেখাপড়া জানা পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, কিন্তু কারও কাছে এসব কথা আর শুনিনি। সবাই সাধারণ কথা বলে, সবাই তুচ্ছ কথা বলে। এই প্রথম আপনার বাবার বইয়ের ভেতরে আমার ছোটবেলার স্বপ্নের প্রতিধ্বনি পেলাম।

আর সেদিন পিকনিকে গিয়ে আপনার সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল তাতে বুঝেছিলাম, আমাদের চিন্তার বেশ একটা মিল আছে। আপনি বোধহয় এই মানসিকতা আপনার বাবার কাছ থেকে পেয়েছেন। জানেন, আমার পরিচিত মানুষ অনেক আছে, কিন্তু আমার বন্ধু কেউ নেই। অনেক চিন্তা মনে আসে—যা বলবার লোক পাই না। আপনাকে বন্ধু মনে করে যদি মাঝে মাঝে চিঠি লিখি তাহলে আপনি কী আমাকে বেহায়া মেয়ে মনে করবেন?

চেস্টারটন পড়তে শুরু করেছি। এবার আসবার সময় কিনে নিয়ে এসেছিলাম। গতকাল Hammer of God শেষ করেছি। দেখা হলে আলোচনা করব। ততদিনে সব গল্প পড়া হয়ে যাবে।

একবার আমাদের এখানে বেড়াতে আসুন না। আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বাবাকে বলেছি, উনি খুব খুশি হয়েছেন। আপনি এলে ভারি আনন্দ পাবেন।

আশা করি ভালো আছেন। নমস্কার নেবেন। ইতি—

অপালা

চিঠি পড়া শেষ করিয়া কাজল অন্যমনস্কের মতো কাগজ কয়খানা খামে ভরিয়া টেবিলে রাখিয়া দিল। জানালা দিয়া মৃদু বাতাস আসিতেছে। জানালার ঠিক বাহিরেই একটা টগর গাছ, অন্ধকারের ভিতব তাহার আবছা আদল বোঝা যায়। শেলী লিখিয়াছিলেন—The champak odours fail! কী যেন নাম কবিতাটার? Lines to an Indian Air? প্রথম পড়িবার সময় মনের ভিতর চম্পকসুরভিত একঝলক বসন্তের বাতাস বহিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ এখন সেই অনুভূতিটা যেন আবার ফিরিয়া আসিল। কিংবা ঠিক অতটা নহে—তবু কেমন একটা ঘোর-ঘোর ভাব। অবশ্য ইহাকে নিশ্চয় প্রেমপত্র বলা চলে না, ট্রাডিশনাল প্রেমপত্রের কোনো লক্ষণ ইহাতে নাই। কিন্তু এই প্রথম একজন মেয়ে তাহাকে চিঠি লিখিয়াছে। এতদিনে তাহার জীবনে এমন কিছু ঘটিল, যাহা একান্তভাবে তাহার নিজের।

এ চিঠি সে কাহাকেও দেখাইবে না, অন্য কাহারও ইহাতে কিছুমাত্র অধিকার নাই। একটা বয়স পর্যন্ত মানুষের জীবনে কোনো গোপনীয়তা থাকে না, ফলে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের চিহ্নও থাকে না। গোপনীয়তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হয় বটে, কিন্তু তাহার জন্য কিছু মূল্যও দিতে হয়।

যাই যাই করিয়াও সরল শৈশবের যেটুকু অংশ প্রথম যৌবন পর্যন্ত থাকিয়া যায়, সেই অনাবিল সারল্য মূল্য হিসাবে বিসর্জিত হয়।

অবশ্য অপালা প্রেমপত্র লেখে নাই। সাধারণ চিঠি—যেমন বন্ধু বন্ধুকে লেখে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জনার্দন গাঙ্গুলী শহরে একটি অতি পরিচিত মুখ। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ সে সাব-পোস্টাপিস হইতে চিঠির ঝুলি কাঁধে লইয়া একটি পুরাতন র‍্যালে সাইকেলে চাপিয়া চিঠি বিলি করিতে বাহির হয়, এবং বিকাল তিনটা সাড়ে তিনটার সময় পত্রবিতরণ শেষ করিয়া দিনের কর্তব্য সাঙ্গ করে। অন্যান্য পিওনেরা বেলা দেড়টা কি দুইটার ভিতর কাজ শেষ করে, কিন্তু জনার্দন গাঙ্গুলী সবার আত্মীয়—কেহ তাহাকে দাদা, কেহ মামা, কেহ অন্য কিছু বলিয়া ডাকে। প্রত্যেকের বাড়িতে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, একগ্লাস জল খাইয়া, মেয়ের বিবাহের কতদূর কি ঠিক হইল, কর্তার গেঁটেবাত কেমন আছে সে সম্বন্ধে সংবাদ লইয়া চিঠি বিলি করিতে তাহার কিছু বিলম্ব হয়। তাহার বিশ্বস্ত বাহনটি বিগত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া অক্লান্তভাবে তাহাকে পিঠে করিয়া কর্তব্য পালনে সাহায্য করে। সহকর্মী কিংবা চিঠির গ্রাহকদের কাছে বাহনটি বিখ্যাত। তাপ্পি মারা চাকা, জং ধরা নড়বড়ে মাডগার্ড, ছিঁড়িয়া স্পঞ্জ বাহির হওয়া সিট, সামনের রডের সহিত নারিকেলের দড়ি দিয়া বাঁধা, রবারের বলহর্ন—সমস্তটা মিলাইয়া অত্যন্ত করুণ দৃশ্য। নেহাত প্রকৃত বিলাতী র‍্যালে বলিয়া ম্যালেরিয়া রোগীর মতো কাঁপিতে কাঁপিতে এখনও পথ অতিক্রম করে।

জনার্দন গাঙ্গুলীর মুখের আকৃতি কিছুটা চতুষ্কোণ, ছোট ছোট করিয়া চুল ছাঁটা—যথেষ্ট তৈলদান সত্ত্বেও সেগুলি সটান দাঁড়াইয়া থাকে। চোখদুটি বর্তুলাকার এবং সামান্য রক্তবর্ণ। মাঝারি দৈর্ঘ্য, গায়ে মোটা খাকির জামা—তাহাতে পিতলের বোতাম বসানো। পরনে খাকির প্যান্ট এবং পায়ে শক্ত চামড়ার কালো রঙের কাবুলি চপ্পল। বয়েস বছর বাহান্ন হইবে। এই বর্ণনা হইতে চোখের সামনে অবশ্যই একটি নয়নাভিরাম দেবমূর্তি ভাসিয়া ওঠে না, কিন্তু চেহারা যেমনই হোক, গাঙ্গুলী পিওন মানুষটি ভালো।

পরের দিন কী একটা অজুহাতে কলেজ কামাই করিয়া কাজল তাহাদের গলির উলটাদিকে যে বটগাছটা আছে তাহার তলায় বেলা এগারোটা নাগাদ গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গাছের শিকড়ের উপর বসিয়া খোঁড়া অযোধ্যা নাপিত সামনে ইঁটের আসনে উপবিষ্ট খরিদ্দারের দাড়ি কামাইয়া দিতেছে। কাজলকে দেখিয়া বলিল—'কী খোকা, দাড়ি বানাবে?' কাজল হাসিয়া বলিল—'না।' ইহা তাহাদের পুরাতন রসিকতা। কাজল বাড়িতে নিজেই দাড়ি কামায় সে কথা অযোধ্যা জানে, তবু দেখা হইলেই সে রোজ এই কথা বলিবে। অযোধ্যা কাজলকে বালক দেখিয়াছে, তখনও দেখা হইলেই হাতে ক্ষুর লইয়া হাসিয়া বলিত—'এসো খোকা, হজামৎ করে দিই'। সে অভ্যাসটা রহিয়া গিয়াছে।

সাড়ে এগারোটার সময় দূরে নড়বড়ে সাইকেলের উপর গাঙ্গুলী পিওনের খাকি পোশাক পরা পরিচিত চেহারার উদয় হইল। কাজল তাহাকে গলির মুখে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—গাঙ্গুলীমামা, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল—

জনার্দন গাঙ্গুলী সাইকেল হইতে নামিয়া কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—কী রে? এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কী বলবি?

কাজল জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলে নাই এমন নহে, কিন্তু মুখে সারল্য এবং নিষ্পাপ ভাব ফুটাইয়া এ ধরনের ডাহা মিথ্যা বলিতে সে অভ্যস্ত নয়। সে আমতা আমতা করিয়া বলিল—হ্যাঁ, ইয়ে হয়েছে কী—আমার চিঠি সম্বন্ধে আপনাকে—মানে, বিলি না করে যদি—

—কী বলছিস ঠিক করে বল দেখি! বিলি না করে কী করবো?

কাজল ঘামিয়া উঠিয়াছে। অসংলগ্নভাবে সে বলিল—চিঠিগুলো, মানে আমার নামে যেগুলো আসবে, আপনি যদি—বুঝতে পারলেন তো?

গাঙ্গুলী পিওনের চোখ দুটি আরও ছোট ছোট এবং অধিকতর বর্তুলাকার হইয়া গেল। সে বলিল—না, আমি ঠিক বুঝলাম না।

কাজল মরীয়া হইয়া বলিল—সেগুলো যদি আপনি বিলি না করে আপনার কাছে রেখে দেন তাহলে খুব ভালো হয়। বাড়িতে গোলমাল—কে কোথায় রেখে দেয়, পরে আর পাই না। শনিবার আমার কলেজ থাকে না, বাড়িতেই থাকি। সেদিন আমি চিঠি আপনার কাছ থেকে চেয়ে নেবো—

জনার্দন গাঙ্গুলী কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ। তাহার খাড়া খাড়া চুল বাতাসে নড়িতেছে। কান পাতিয়া শুনিলে বুঝিবা মাথার ভিতর চিন্তার যন্ত্র চলিবার খুট্‌খাট্‌ শব্দ শোনা যাইবে।

তারপর সে হাসিয়া বলিল—বেশ, তাই ভালো। শনিবার শনিবার তুই আমার কাছ থেকে চিঠি চেয়ে নিস। তা তোর কী এখন থেকে খুব ঘনঘন চিঠি আসবে মনে হচ্ছে নাকি?

উত্তর হিসাবে কাজলের গলা দিয়া যে শব্দ বাহির হইল তাহার স্পষ্ট অর্থ করা কঠিন। গাঙ্গুলী আবার জিজ্ঞাসা করিল—সব চিঠিই কী আমার কাছে রেখে দেব, না যেগুলো নীল খামে আসবে কেবল সেগুলো? কালকে যেমন একটা এসেছিল—

কাজল যেন এখানে উপস্থিত নাই। গাঙ্গুলী পিওন অন্য কাহাকেও কিছু বলিতেছে। হাসিয়া সাইকেলে উঠিতে উঠিতে জনার্দন গাঙ্গুলী বলিল—ঠিক আছে। চিঠি আমার কাছেই থাকবে।

তারপর আপাদমস্তক কাজলকে একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল—তুই বড়ো হয়ে গেলি, অ্যাঁ? কতটুকু দেখেছি তোকে—

এক-একজন মানুষ আছে যাহাদের কাছে লোকের গোপন কথা নিরাপদে থাকে। গাঙ্গুলী পিওন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল। কেমন করিয়া সে নির্ভুলভাবে কেবলমাত্র অপালার চিঠিগুলিই বাছিয়া নিজের কাছে রাখিত, বাকিগুলি বাড়িতে বিলি করিয়া দিত—তা সে অপালা যে রঙের খামেই চিঠি লিখুক না কেন। প্রতিমাসে হাজার হাজার চিঠি লইয়া যাহার কারবার, মানুষের হাতের লেখা চিনিতে তাহার সময় লাগে না। জনার্দন গাঙ্গুলী সম্ভবত সেই অভিজ্ঞতাই প্রয়োগ করিয়াছিল।

কোনো একজায়গায় বেশিদিন বাস করিলে সেখানকার মাটিতে মানুষের শিকড় গজাইয়া যায়। কাজলের জীবনেও তাহাই ঘটিয়াছিল। অপুর মৃত্যুর পর মামাবাড়িতে বাস করিতে আসা, নিজেদের বাড়ি করিয়া লওয়া, কলিকাতার কলেজে পড়া—এইসব কারণে মালতীপুরে তাহার স্থায়ী ঠিকানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ছোটবেলা হইতে বাস করিবার জন্য জায়গাটার উপর তাহার কিছুটা মায়াও আছে। মালতীপুর কলিকাতা হইতে কাছে বলিয়া আবহাওয়ায় শহরের ছোঁয়াচ পুরাদস্তুর, গাছপালা এবং ফাঁকা জায়গা কম, বাড়িঘর বেশি। প্রতিবৎসরই নতুন নতুন আরও বাড়ি উঠিতেছে, জমির দাম আগুন। মূল রাস্তাগুলির দুইধারে ফাঁকা জমি আর নাই বলিলেই চলে। গ্রাম সুন্দর, বিশাল শহরেরও একটি নিজস্ব সৌন্দর্য আছে—কিন্তু এই ধরনের আধা গ্রাম আধা শহর কাজল দেখিতে পারে না। শহরের চমকপ্রদ অভিনবত্ব নাই, আবার গ্রামের সরল স্বাভাবিকত্বও নাই, পরিকল্পনাহীনভাবে কিছু বাড়িঘর দোকানবাজার আর চালা গড়িয়া উঠিয়াছে—এই মাত্র। নিশ্চিন্দিপুরে তাহার বাবার যে মায়াময় শৈশব প্রকৃতির অকৃপণ দানে স্বর্ণমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল, তেমন ঈশ্বরের আশীর্বাদপূত শৈশব সে মালতীপুরে যাপন করে নাই। প্রবাসী ইংরেজ যেন অকিঞ্চিৎকর ঘটনা সম্বন্ধে রসিকতা করে—nothing to write home about, কাজলের শৈশবও প্রায় তাহাই। তবু নিজের কৈশোর ও শৈশব প্রত্যেকেরই প্রিয়। বড়ো হইয়া উঠিতে উঠিতে মনের মধ্যে কত ভাঙচুর হয়, কত সরল বিশ্বাস সন্দেহে পরিণত হয়, আবার কত অস্পষ্ট ধারণা গভীর বিশ্বাসের রূপ নেয়। ছোটবেলার খেলার সঙ্গী, কতদিনের কত মেঘ-ঘনাইয়া-আসা কালবৈশাখীর অপরাহ্ণ, রাত্রিতে হ্যারিকেনের আলো কমাইয়া দিয়া মায়ের কাছে শুইয়া গল্প শোনা। নাঃ, বাবার মতো না হইলেও তাহার ছোটবেলাও নিতান্ত খারাপ কাটে নাই।

তবু নিশ্চিন্দিপুরের জন্য মাঝে মাঝে ভারি মন কেমন করে।

শহরের সহিত তাহার কোনো আত্মীয়তা নাই। গ্রামে সে বেশিদিন বাস করে নাই সত্য, কিন্তু সেখানেই তাহার অস্তিত্বের মূল প্রোথিত রহিয়াছে। কয়েকদিন ধরিয়া সে ভাবিতেছে—'একবার নিশ্চিন্দিপুরে গেলে বেশ হত। কে কেমন আছে দেখে আসতাম।' এই ইচ্ছার সহিত সমাপতনের মতো আর একটি ঘটনা পরের সপ্তাহেই কাজলের নিশ্চিন্দিপুর যাওয়াকে নিশ্চিত করিয়া তুলিল।

কলিকাতা হইতে অপুর ভক্ত সেই জগদীশবাবু একদিন আসিয়া বলিলেন—সামনের মাসে আমরা অপূর্ববাবুকে নিয়ে সভা করবো। তার আগে একবার তাঁর গ্রামটা ঘুরে আসতে চাই। যে গ্রামকে তিনি তাঁর সাহিত্যে অমর করে রেখেছেন সেটা না দেখলে তাঁকে পুরো চেনা যাবে না। কী করে যেতে হয় একটু বলে দেবে?

কাজল বলিল—তার চেয়ে ভালো হয়, আমি আপনাদের নিয়ে যাই চলুন। আমিও কিছুদিন ধরে যাবো যাবো করছি, বরং এই সুযোগে—

—বাঃ, তাহলে তো খুবই ভালো হয়। যেদিন যাবো সেদিনই ফেরা যাবে তো?

—তা চেষ্টা করলে ফেরা যায়, আজকাল তো মোটববাসও হয়েছে ও-পথে। তবে ভালো করে বেড়াতে হলে আমার সঙ্গে একটা দিন না হয় থেকে যাবেন।

—তা অবশ্য হতে পাবে যদি অসুবিধে না হয়—

—অসুবিধে আর কী? আমার সঙ্গেই তো থাকবেন।

যাইবার দিন ঠিক হইয়া যাইবার পর কাজলের মনে অদ্ভুত একটা আনন্দের ঢেউ বহিতে লাগিল। অপুর মৃত্যুর পর বার দুই সে নিশ্চিন্দিপুর গিয়াছিল। থাকা হয় নাই, বাড়িতে জরুরি কাজ থাকায় আবার রাত্রে ফিরিয়া আসিতে হইযাছিল। রানুপিসির সঙ্গেও দেখা হয় নাই—রানাঘাটে কে একজন আত্মীয় অসুস্থ থাকায রানুপিসি সেখানে গিয়াছিল। এবার গেলে হয়তো দেখা হইবে।

নির্দিষ্ট দিনে নিশ্চিন্দিপুরের পথে পা দিয়া সে অবাক হইয়া গেল। কী আশ্চর্য পরিবর্তন হইয়াছে তাহাদের গ্রামের! ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ডের পাকা সড়ক হইতে যে রাস্তা গ্রামে ঢুকিতেছে সেটা বরাবরই সে কাঁচা দেখিয়া আসিয়াছে। এবার সে অবাক হইয়া দেখিল রাস্তাটায় পিচ দেওয়া হইযাছে। হইতেই পারে—দিন কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্রই উন্নতির স্পর্শ লাগিয়াছে, তাহাদের গ্রামেব পথে যে পিচ পড়িবে উহা এমন আশ্চর্য কী? কিন্তু কাজলেব মন খারাপ হইয়া গেল। এখানে ওখানে বেশ কয়েকখানা পাকা বাড়ি দেখা যাইতেছে। কবে এসব বাড়ি উঠিল? সারি সারি খুঁটির উপর দিয়া বিদ্যুতের তার গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে। রাত্রিবেলা গ্রামে তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বলে তো? নদীর ধার দিয়া আসিবার পথে যে বড়ো আমকাঁঠালের বাগানটা পড়ে সেখানে খুঁটির উপব বিদ্যুতের আলো জ্বলে না তো? পাখির দল কী আজও এ গ্রামের গাছের পাতাব ফাঁকে গান গাহিতে আসে?

নিশ্চিন্দিপুর তাহার একটা বড়ো আশ্রয়। আর হয়তো কোনোদিন পাকাপাকি ভাবে এখানে আসিয়া বাস করা হইবে না, তবুও জীবনের শত দুঃখ এবং আঘাতের মুহূর্তে সেন্দৃঢ় বিশ্বাসে স্থির থাকিতে পারিবে—কোথাও এই পৃথিবীতে সবুজ ঘাস আছে. পাখির ডাক আছে, শান্তির আশ্রয় আছে, সেখানে নির্জন বাঁশবনে উদাস হাওয়ায় নিঃশব্দে শুকনো পাতা খসিয়া মাটি ঢাকিয়া দেয়. পূর্বপুরুষদের নিবিড় স্নেহ যুগান্তের বাধা পার হইয়া শীতল ছায়ার রূপ ধরিয়া বনে-বনান্তে ঘনাইয়া আসে। এই গ্রাম হইতে জীবনের প্রবাহ তাহাকে যত দূরেই লইয়া যাক না কেন, একটা অদৃশ্য সংযোগসূত্র তাহাকে চিরদিন নিশ্চিন্দিপুরের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিবে।

নিশ্চিন্দিপুর বদলাইয়া গেলে তাহা সে সহ্য করিতে পারিবে না। জগদীশ একান্তই শহরের মানুষ, কলিকাতার বাহিরে কমই পা দিয়াছে। তুলনামূলকভাবে গ্রামের যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা জগদীশের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। সে সবকিছু দেখিয়াই ভয়ানক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কাজলের প্রথমটা মজা লাগিলেও পরে সে ভাবিয়া দেখিল—জগদীশের দোষ নাই। He has long been in a city pent, শহরের কুশ্রী ইঁটের স্তূপ দেখিয়া আর কর্কশ শব্দ শুনিয়া তাহার চোখ ও কান ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন প্রতিটি ঘাসের ডগা দেখিয়া তাহার উল্লসিত হইয়া ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

—আহা কী চমৎকার! কী শান্তি! এমন জায়গায় মানুষ হয়েছেন বলেই না অপূর্ববাবু অমন বই লিখতে পেরেছিলেন! আচ্ছা, কুঠির মাঠ কোনদিকে? সেটাও দেখবো কিন্তু—

জগদীশ মানুষ ভালো, কিন্তু আবেগের প্রাবল্যে অনর্গল কথা বলিয়া মুশকিল করিতে লাগিল। কাজলের পক্ষে নিশ্চিন্দিপুরে আসা একটা তীর্থযাত্রার মতো। সারাটা দিন সে নিজের ভিতর মগ্ন হইয়া থাকিতে চায়। এমন চলিলে তাহা কী করিয়া সম্ভব হইবে?

আজ রানুপিসি বাড়িতেই ছিল। কাজলের ডাক শুনিয়া রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া অবাক হইয়া বলিল—ওমা, তুই! আমি ঠিক গলা শুনে চিনতে পেরেছি। ভাবলাম—ভুল শুনছি নাকি? কাজল এখন কোত্থেকে আসবে? খবর নেই, কিছু নেই—আর একবার এসেছিলি শুনলাম, আমি ছিলাম না—মামার অসুখ হয়েছিল, তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম রানাঘাট—

তারপর পেছনে জগদীশকে দেখিয়া সংকুচিত হইয়া বলিল—ইনি কে?

—ইনি, মানে—ধরো আমার দাদা হন। বাবার বই পড়ে আমাদের গ্রাম দেখতে এসেছেন। ভালো কথা পিসি, আমরা কিন্তু আজ এখানে থাকবো—

রানী হাসিয়া বলিল—থাকবি তাই কী? সেকথা কী আবার বলতে হবে? আয়, ঘরে এসে বোস—

বেলা প্রায় এগারোটা বাজে। রানী জলখাবারের ব্যবস্থা না করিয়া একেবারে দুপুরবেলার খাওয়ার আয়োজন করিতে লাগিল। কাজল বলিল—রানুপিসি, তুমি বরং রান্নাবান্না শেষ করে রাখো, আমি ততক্ষণ এঁকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি। দুটো নাগাদ ফিরে খেতে বসবো—

—অত বেলায়? চান করবি কখন?

—সকালে চান করে বেরিয়েছি, শুধু হাতমুখ ধুয়ে নেবো এখন—

উত্তরের মাঠে যাইবার পথে একটি চাষির ছেলে দাঁড়াইয়া খেতে নিড়ান দেওয়া দেখিতেছে। কাজল তাহাকে ডাকিয়া বলিল—এই শোন্, তোর নাম কী?

বালক মুখ হইতে আঙুল বাহির করিয়া বলিল—হারাণ।

—একটা কাজ করবি হারাণ? আমার এই দাদাকে একটু কুঠির মাঠ দেখিয়ে আনবি? তোকে চারআনা পয়সা দেবো—

বালক ঘাড় হেলাইয়া জানাইল—পারিবে।

—তবে নিয়ে যা। জগদীশদা, আপনি রানুপিসির বাড়ি চিনে ফিরতে পারবেন তো? আমার একটু কাজ আছে, সেটা সেরে নিই—

জগদীশ হাসিয়া বলিল—খুব পারবো। তুমি যাও, কাজ সেরে নাও—

কাজল পকেট হইতে একটা সিকি বাহির করিয়া হারাণের হাতে দিতে গেল—এই নে তোর চারআনা—

হারাণ বলিল—নাঃ।

কাজল বিস্মিত হইয়া বলিল—সে কি রে? এই যে বললি যাবি?

—যাবো, পয়সা নেবো না—

কাজল নতুন করিয়া ছেলেটির দিকে তাকাইল। শ্যামবর্ণ, নিতান্ত সাধারণ চেহারা—অনেকদিন চুল কাটা হয় নাই, জুলফি লতাইয়া পড়িয়াছে। পরনে ছেঁড়া ইজের, গা খালি। সর্বাঙ্গে খড়ি উড়িতেছে। মূর্তিমান দারিদ্র। অথচ কত সহজে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করিল।

এই সারল্য চিরস্থায়ী হইবে তো? দিনকাল বড়ো খারাপ পড়িয়াছে। জগদীশ চৌধুরী ছেলেটির সঙ্গে চলিয়া গেলে কাজল একা নিজেদের পুরানো ভিটার দিকে গেল। এখানেও জগদীশ নিশ্চয় আসিতে চাহিবে, তবে সেটা বিকালের দিকে হইলেও ক্ষতি নাই। প্রথমে সে একা কিছুক্ষণ সেখানে কাটাইতে চায়। জগদীশ অপুর যত বড়ো ভক্তই হোক না কেন, পুরানো ভিটার প্রতিটি ইঁটে প্রতি ধূলিকণায় তাহার বাবার যাপিত শৈশবের যে আনন্দময় ইতিহাস লেখা আছে, সে ইতিহাস পড়িবার ক্ষমতা তাহার নাই। কাজলের শৈশবও এখানে কাটে নাই বটে, কিন্তু সে এই গ্রামেরই সন্তান—এই ভিটার সহিত তাহার বত্রিশ নাড়ির সম্বন্ধ। অন্যে তাহা অনুভব করিতে পারিবে না।

ভিটায় যে জঙ্গল হইয়া গিয়াছে তাহা সে ছোটবেলাতেই দেখিয়া গিয়াছিল। কেহ পরিষ্কার না করায় জঙ্গল যেন আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। কাঁটাওয়ালা দুষ্প্রবেশ্য ওকড়া ফলের ঝোপ ঠেলিয়া ভেতরে ঢোকাই কঠিন। নিশ্চিন্দিপুরে তাহার বাবা সম্প্রতি যে বাড়ি কিনিয়াছিল, কেহ বাস না করায় সেটির অবস্থাও ভালো নহে, অবিলম্বে মেরামত প্রয়োজন। বর্তমানে সে রানুপিসির বাড়িতেই থাকিবে।

তাহাদের বাড়িটার বলিতে গেলে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। দু-একটা দেয়াল কোনোমতে দাঁড়াইয়া আছে, চারিদিকে ভাঙা ইঁট আর উইধরা কাঠের খুঁটির স্তূপ। ফ্যাকাসে সবুজ পাতাওয়ালা শেয়ালকাঁটার গাছ সর্বত্র। তাহার পায়ের শব্দে একটা গিরগিটি দ্রুত ছুটিয়া ধ্বংসস্তূপের ফাঁকে কোথায় লুকাইল।

কাজলের পরিচিত একজন প্রৌঢ় ইতিহাসের অধ্যাপক সরকারের অনুমতি লইয়া কিছুদিন এখানে-ওখানে শখের খননকার্য চালাইযাছিলেন। প্রত্নতত্ত্বে উৎসাহী কাজল মাঝে মাঝে সন্ধ্যার দিকে তাঁহার কাছে গিয়া গল্প শুনিত। অধ্যাপক ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন—যেখানে-সেখানে খুঁড়তে আরম্ভ করলেই তো হল না, তোমাকে নিশ্চিত হতে হবে সেখানে আগে মানুষের বাস ছিল। নইলে খোঁড়াখুড়ি করলে, অঢেল পয়সা খরচ হল, পরিশ্রমও হল—তারপর সেখানে মাটির নিচে কিছুই পাওয়া গেল না—

—কী করে নিশ্চিত হওয়া যায়? কোনো উপায় আছে?

—আছে, অন্তত আমি পারি। ধরো, কোথাও একটা ঢিবি দেখে বা অন্য কোনো লক্ষণ দেখে মনে হল এখানে এক্‌স্‌ক্যাভেশন চালানো যেতে পারে। আমি তখন সেখানকার মাটি একমুঠো হাতে তুলে নিয়ে শুঁকে দেখি—

—কেন? মাটি শুঁকে কী বোঝেন?

—মানুষ কোথাও একবার বাস করলে সেখানকার মাটিতে মানুষের গন্ধ মিশে যায়—সে গন্ধ আর নষ্ট হয় না। আমি মাটি শুঁকে বলে দিতে পারি—এখানে একহাজার বছর আগে বসতি ছিল। অবশ্য এ ক্ষমতা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়—কিছুটা সহজাতও বটে। যার থাকে তার থাকে—

কাজল নিচু হইয়া এক মুঠা মাটি হাতে লইল।

এই মৃত্তিকা বিগত তিনপুরুষ ধরিয়া তাহাদের বংশকে লালন করিয়া আসিয়াছে, আশ্রয় দিয়াছে। তাহার ঠাকুরদা এই ভিটার দাওয়ায় বসিয়া পুঁথি লিখিয়াছে, ঠাকুমা রান্না করিয়াছে—দুর্গাপিসি পুতুলের বাক্স সাজাইয়াছে এই উঠানে বসিয়া। তাহার বাবার শৈশবক্রীড়ার সাক্ষী এই ভিটা। এই মাটিতে কী সত্যই তাহাদের স্মৃতির ঘ্রাণ মিশিয়া রহিয়াছে?

বদ্ধমুষ্টি মুখের কাছে আনিয়া কাজল চোখ বুঁজিয়া ঘ্রাণ লইল।

প্রথমে শুধুই সোঁদা সোঁদা সাধারণ মাটির গন্ধ। তারপর যেন তাহারই সঙ্গে মিশিয়া কোন সুদূর অতীত হইতে হারানো দিনের ছবি আর রঙ ভাসিয়া আসিল। কত না-দেখা প্রিয়জন, ভুলিয়া যাওয়া উৎসবের আনন্দ—জন্মান্তরের তটভূমি হইতে প্রবাহিত অলৌকিক বায়ুস্রোতে ভর করিয়া দেবধূপের সৌরভ বহন করিয়া আনিল।

তাহার জন্মের বহু পূর্বেই এই মঞ্চের নাটক সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোথায় ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, কোথায়ই বা দুর্গাপিসি আর বাবার হারানো শৈশব! বাবার কাছে সেইসব দিনের গল্প শুনিয়াছে শুধু, তাহার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ নাই সে যুগটার। অন্যের মুখে শোনা রূপকথার কাহিনীর মতো।

তবু চোখে জল আসে কেন?

জায়গাটায় বেশ ছায়া-ছায়া ভাব, তীব্র সূর্যের আলো প্রবেশ করিয়া পরিবেশের স্বপ্নিল মোহাচ্ছন্নতাকে খর্ব করে নাই। কাজল দুইখানি ইঁট পাশাপাশি পাতিয়া তাহার উপর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

এই বাড়িটাকে আবার সারাইয়া তুলিতে হইবে। আধুনিক নকশা অনুযায়ী নতুন বাড়ি নয়, পূর্বে যেমন ছিল ঠিক তাহাই। সে দেখে নাই, কিন্তু রানুপিসি বলিতে পারিবে বাড়িটা দেখিতে কেমন ছিল। আজ জগদীশের আগমন দিয়া শুরু, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে আগামী কয়েক বছরে তাহার বাবার খ্যাতি আরও বাড়িবে। দেশের দূর দূর প্রান্ত হইতে ভক্তের দল এই বাড়ি দেখিতে আসিবে একদিন। আসিয়া কী দেখিবে? এই শ্রীহীন ভগ্নস্তূপ? নাঃ, বাড়িটার সংস্কারের ব্যবস্থা লইতে হইতেছে। কিংবা থাক। বিগত যুগকে এভাবে কালের গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া লাভ নাই। শেষ জীবনে তাহার বাবা যে বাড়িতে বাস করিত, তাহাই বরং লোকে দেখুক। পুরোনো ভিটার বেদনা-করুণ স্মৃতি বাবার উপন্যাসে অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

ঘণ্টাখানেক পরে উঠিয়া আসিবার সময় কাজল ভিটা হইতে কিছুটা মাটি তুলিয়া লইল। পকেটে একটা কিসের হ্যান্ডবিল রহিয়াছে আজ দিন দুই-তিন, শেয়ালদার মোড়ে কে যেন বিলি করিতেছিল। সেই কাগজখানা বাহির করিয়া মাটিটুকু তাহাতে মুড়িয়া পকেটে রাখিল।

সে রানুপিসির বাড়ি পৌঁছাইবার একটু পরেই জগদীশও ফিরিয়া আসিল। কুঠির মাঠ দেখিয়া সে খুব খুশি। বলিল—নীলকুঠির ভাঙা চৌবাচ্চাগুলো এখনও পড়ে আছে দেখে এলাম, বুঝলে? অপূর্ববাবুর শেষ উপন্যাসখানা তো নীলবিদ্রোহের পটভূমিতে বাংলার গ্রাম নিয়ে লেখা। মহাকাব্য, বুঝলে, মহাকাব্য। সেই উপন্যাসের জন্মস্থানে দাঁড়িয়ে আছি ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিল—

দুপুরে রানী যত্ন করিয়া তাহাদের খাওয়াইল। কাজল ছোটবেলায় কী কী খাইতে ভালোবাসিত তাহা সে ঠিক মনে করিয়া রাখিয়াছে। থালায় চূড়া করিয়া ভাত বাড়িয়াছে—শহরের পালিশ করা চালের সাদা ভাত নয়, ঈষৎ লাঁলচে মোটা চাল। কিন্তু ভারি মিষ্টি স্বাদ। পাতের একপাশে মোচার তরকারি, তাহার উপর বড়িভাজার গুঁড়া আর নারকোলকোরা ছড়ানো। ছোটবেলায় খাইতে বসিয়া মোচার ঘণ্ট দেখিলেই সে বলিত—ও পিসি, বড়ি দাওনি কেন? আমি এমনি এমনি মোচা খাবো না—

অনুরোধ-উপরোধে ফল হইত না, রানীকে আবার বড়ি ভাজিয়া আনিতে হইত। রানুপিসি সেই কথা এখনও মনে রাখিয়াছে দেখিয়া আবেগে তাহার বুকের মধ্যেটা কেমন করিয়া উঠিল। পিসি তাহাকে এত ভালোবাসে, অথচ সে কতবছর আসিয়া একবার খোঁজ করে নাই। কাজটা খুব অন্যায় হইয়া গিয়াছে। এখন হইতে সে নিয়মিত যোগাযোগ রাখিবে।

মধ্যাহ্নভোজনের পর জগদীশ বাহিরের তক্তাপোশের উপর মাদুর পাতিয়া সামান্য বিশ্রাম করিবার জন্য শুইয়া পড়িল। কাজল ভিতরে গিয়া দেখিল খাওয়া সারিয়া রানী শোওয়ার ঘরে মেঝেতে বসিয়া জাঁতি দিয়া সুপারি কাটিতেছে। কাজলকে দেখিয়া রানী বলিল—আয়, বোস এখানে। ও লোকটা ঘুমিয়েছে?

—হ্যাঁ পিসি, ওকে শুতে দিয়েই তো এলাম।

—কে রে লোকটা? তোর মামাবাড়ির দিকের কেউ নাকি?

—না, আমার কেউ হয় না। বাবার এখন খুব নাম হয়েছে তা জানো তো? অনেক বই বেরিয়েছে বাবার, সে-সব বই পড়ে লোকেরা বলছে বাংলা সাহিত্যে অনেক যুগের মধ্যে এতবড়

সাহিত্যিক আর আসেনি। এর নাম জগদীশ চৌধুরী, কলকাতায় থাকে, বাবার লেখার খুব ভক্ত। এরা কয়েকজন বন্ধু মিলে বাবার স্মৃতিতে সভা করবে কলকাতায়, তার আগে একবার আমাদের গ্রাম দেখতে এসেছে।

জাঁতির কুচকুচ শব্দ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আগ্রহপূর্ণ স্বরে রানী জিজ্ঞাসা করিল—কেন রে? অপু বইতে আমাদের গাঁয়ের কথা লিখেছে বুঝি?

কাজল অবাক হইয়া গেল। যে বই লইয়া এখন সারাদেশে এত আলোচনা, রানুপিসি সে সম্বন্ধে কিছুই জানে না? সে বলিল—বাবার প্রথম উপন্যাসখানা তো আমাদের এই গ্রামের কথা নিয়েই লেখা। সব সত্যি ঘটনা, চরিত্রগুলোও সব সত্যি। ঠাকুরদা-ঠাকুরমার কথা আছে, প্রসন্ন গুরুমশাইয়ের কথা আছে, চিনিবাস কাকার কথা আছে।

তারপর একটু থামিয়া আস্তে আস্তে বলিল—তোমার কথাও অনেক আছে পিসি। তুমি নাকি বাবাকে ছোটবেলায় একটা খাতা দিয়েছিলে গল্প লিখে দেবার জন্য, কিছুদূর লেখার পর ঠাকুরদা এ গ্রাম ছেড়ে চলে যান, বাবা আর খাতাটা শেষ করতে পারেনি—সে ঘটনাও লেখা আছে। তুমি বাবার বই একটাও পড়ো নি? কত লোকে পড়ে ফেলল—

রানী ধরা গলায় বলিল—কী করে পড়বো বল? আমাদের গাঁয়ে বই পড়ার রেওয়াজ নেই, কেউ আমাকে বলেও নি অপুর এত নাম হয়েছে। তুইও তো একটা বই আমাকে দিয়ে যেতে পারতিস—আসলে কী জানিস, আমরা সেই গাঁয়েই পড়ে আছি, কাদায় গুণ পুঁতে। তুই শহরে থাকিস, তোর কত বন্ধু, কত কাজ—তোর কী আর মনে পড়বে আমার কথা? তবে তুই ছেলেমানুষ, তোকে দোষ দিই না, তোর বাবা বেঁচে থাকলে—

কাজলের সত্য-সত্যই খুব মনখারাপ হইল। রানীর একটা হাত ধরিয়া সে বলিল—পিসি, তুমি রাগ কোরো না, আমার সত্যিই খুব ভুল হয়ে গিয়েছে। এরপর আমার আসতে আবার ক'মাস দেরি হবে হয়তো, কিন্তু আমি তার আগেই তোমাকে ডাকে পার্সেল করে বাবার এক সেট বই পাঠিয়ে দেব। অন্য লোকে যতই নাচানাচি করুক, এ পৃথিবীতে বাবার বই পড়বার সবচেয়ে বেশি অধিকার তোমার, কেন জানো?

রানী উত্তর দিল না, মাথা নিচু করিয়া কাটা সুপারির টুকরাগুলি আঙুল দিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

কাজল বলিল—কারণ এই যে, ছোটবেলায় তোমার প্রেরণাতেই বাবা প্রথম লিখতে শুরু করে। হলই বা ছেলেমানুষি লেখা, জীবনের প্রথম লেখা তো! বাবা নিজের উপন্যাসে তোমার ঋণ স্বীকার করেছে—

রানী মুখ তুলিল না। সুপারিগুলি আঙুল দিয়া নাড়িয়াই যাইতেছে।

কাজল এতক্ষণ আবেগের বশে কথা বলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল রানুপিসি প্রাণপণে কান্না চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। সে অপ্রতিভ হইয়া কথা ঘুরাইয়া গ্রামের বর্তমান পরিবেশ কিরূপ সে বিষয়ে আলোচনা শুরু করিল। রানী অর্ধমনস্কভাবে দুই-একটা অসংলগ্ন উত্তর দিল। কাজল বুঝিতে পারিল এ আলোচনায় রানুপিসির মনোযোগ নাই। কিছুক্ষণের ভিতরেই দ্বিপাক্ষিক নীরবতার মধ্যে কথাবার্তা থামিয়া গেল।

সারাটা বিকাল ধরিয়া কাজল জগদীশকে লইয়া গ্রাম দেখাইয়া বেড়াইল। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিয়া জগদীশ ঝোলার ভিতর হইতে নোটবই বাহির করিয়া হ্যারিকেনের আলোয় কী সব লিখিতে বসিল। কাজল ভিতর-বাড়িতে ঢুকিয়া দেখিল রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া রানুপিসি তরকারি কুটিতেছে। সে কাছে বসিয়া বলিল—পিসি, বাবা তোমাকে যে খাতাখানা লিখে দিয়েছিল সেটা এখনও তোমার কাছে আছে?

রানী বিষণ্ণ হাসিয়া বলিল—ছোটবেলার জিনিস কী ফেলা যায়? আছে বাক্সের মধ্যে। কেন রে?

—আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। একবার দেখাবে?

বঁটি কাত করিয়া রাখিয়া রানী উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেল। খাটের তলায় রাখা পুরাতন বেতের পেঁটরা টানিয়া বাহির করিয়া খুলিতেই অকস্মাৎ চারিদিকের যেন কঠিন বর্তমানটা আর নাই। আবার সেই অতীতের নিশ্চিন্দিপুর। হলুদ জমির উপর খয়েরী ডুরেপাড় শাড়ি, খানকতক পুরানো চিঠি, ভিক্‌টোরিয়ার আমলের দুইটি তামার ডবল পয়সা। একটা পুঁতির মালা, মালার সূতা ছিঁড়িয়া পুঁতিগুলি বাক্সের ভিতর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সর্বোপরি পেঁটরার মধ্যেটায় কেমন একটা গন্ধ—পুরাতন কাপড় বা কাগজপত্র বন্ধ পড়িয়া থাকিলে যেমন পাওয়া যায়। এই ঘ্রাণের সহিত অতীত দিনগুলির কী যেন সম্পর্ক আছে, শুঁকিলেই মনে হয় মাঝের বৎসরগুলি সব ফাঁকি। আবার যেন সেই কালের গর্ভে বিলীন বাল্যকালটা সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ লইয়া ফিরিয়া আসে।

উদ্‌গত চোখের জল চাপিয়া রানী খাতাখানা কাজলকে আনিয়া দিল।

সেকেলে ধরনের হাতে সেলাই করিয়া বাঁধানো খাতা। মোটা পাতাগুলি হলুদ হইয়া আসিয়াছে। প্রথম পাতাতেই গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—শ্রীঅপূর্বকুমার রায়। চাউলপোড়া আর খয়ের দিয়া তৈয়ারি কালি, এখনও ঝকঝক করিতেছে।

পাতা উলটাইয়া পড়িতে শুরু করিয়া কাজল খুব মজা পাইল। রাজা-রানী, সৈন্যসামন্ত, সেনাপতি আর গূঢ় ষড়যন্ত্র লইয়া একটা সাংঘাতিক কাহিনী! ত্রিশ-বত্রিশ পাতা মোট লেখা হইয়াছিল। তাহার মধ্যেই যুদ্ধ, প্রতিহিংসা, দেশের জন্য আত্মত্যাগ, বাউল ভিখারির ছদ্মবেশে রাজগুরুর রাজমাহাত্ম্য প্রচার, বিশ্বাসঘাতিনী মহিষীর উপযুক্ত দণ্ডবিধান—সব হইয়া গিয়াছে। এই বালকই বড়ো হইয়া এমন সাহিত্য রচনা করিয়াছে যাহা পাঠ করিয়া লোকে লেখকের ভিটা দেখিতে ছুটিয়া আসিতেছে!

খাতা রানীর হাতে ফেরৎ দিয়া কাজল বলিল—যত্ন করে রেখে দিয়ো রানুপিসি, একদিন এখানা দেখতে তোমার কাছে লোক আসবে, দেখো—

কাজল চলিয়া যাইবার দিন দশেক পর একদিন রানী দক্ষিণের ঘরে জানালার পাশে বসিয়া দুপুরবেলা সেলাইয়ের কাজ করিতেছে। উঠানের গাবগাছে একটা ঘুঘু বহুক্ষণ ধরিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া দুপুরবেলার নির্জনতাকে নির্জনতর করিয়া তুলিয়াছে, এমন সময় উঠানে গ্রামের শিশির পিওন আসিয়া দাঁড়াইল।

—একটা পার্সেল রয়েছে দিদিঠাকরুণ—তোমার নামে। সই করে নিতে হবে।

রসিদে সই করাইয়া একটা পুলিন্দা রানির হাতে দিয়া শিশির পিওন চলিয়া গেল।

কাজল কথা রাখিয়াছে। পুলিন্দা খুলিতেই আট-দশখানা বাংলা বই বাহির হইল। প্রত্যেকটির মলাটে অপুর নাম। রানী অবাক হইয়া বইগুলি বার বার দেখিতে লাগিল। বাঃ, কী সুন্দর ছবি মলাটে, কেমন সুন্দর বাঁধানো! পিছনের মলাটে বইগুলি সম্বন্ধে বড়ো বড়ো সমালোচকেরা যাহা বলিয়াছেন তাহা ছাপা হইয়াছে। অত কঠিন কথা রানী বোঝে না, তাহার কেবল গর্বে বুকের মধ্যেটা কেমন করিয়া উঠিল এই ভাবিয়া যে, এত সমস্ত বই তাহার ছোটবেলার সঙ্গী অপু লিখিয়াছে!

সেলাইয়ের সরঞ্জাম সরাইয়া জানালার পাশে বসিয়া রানী অপুর লেখা প্রথম উপন্যাসখানি পড়িতে শুরু করিল।

বেলা গড়াইয়া নিবিড় অপরাহ্ণের ছায়া নামিল বাহিরের উঠানে। ক্রমে আলো কমিয়া আসিল, চোখের কাছে বই না আনিলে আর পড়া যায় না।

কোথাও মন চলিয়া গিয়াছে রানীর। লোকে বলিতেছে অপু নাকি মস্তবড় লেখক। বড়ো

লেখকের লেখা এত সহজ হয় বুঝি? এ তো তাহাদের ঘরের কথা, তাহাদের শৈশবের খেলার গল্প—সংসারের দুঃখকষ্ট হাসিকান্নার কাহিনী।

রানীর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে মনে মনে বলিল—সব ঠিক আছে অপু। সেই মাঠ-বন, আমাদের গাঁ নিশ্চিন্দিপুর—শুধু তুই কেন চলে গেলি?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বি.এ. পাশ করিবার পর প্রথমে কাজল ভাবিয়াছিল আর পড়াশুনা করিবে না। খামোকা দুই বৎসর এম.এ. পড়িয়া বয়েস বাড়াইয়া লাভ কী? বরং যে পেশায় সারাজীবন কাটাইতে হইবে সেটা খুঁজিয়া লওয়া ভালো। কিন্তু বাধা দিল হৈমন্তী।

মার্কশিট হাতে বাড়ি আসিয়া মাকে প্রণাম করিতেই হৈমন্তী কাঁদিয়া ফেলিল। কাজল বলিল—কাঁদছো কেন মা? এই দেখো, এগুলো অনার্স পেপারের নম্বর, আর এগুলো পাস কোর্সেব—

হৈমন্তী কাঁদিতেই থাকিল।

একটিমাত্র মানুষের অনুপস্থিতি তাহার মা ও ছেলের সংসাবে একটা অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। আজ বাবা বাঁচিয়া থাকিলে সবদিক দিয়া আনন্দটা সম্পূর্ণতর হইত। অবশ্য চিন্তা ও জীবনচর্যার ভিতর দিয়া বাবা তাহার কাছে অনেক জীবিত মানুষেব চেয়ে বেশি করিয়া বাঁচিয়া আছে। গভীর চিন্তার মুহূর্তে অপুর স্মৃতি এবং সাহিত্য তাহাকে যে সাহচর্য দেয়, অনেকের জীবিত জনকও ততখানি দিতে পারে না। কিন্তু কাজলের পৃথিবী অনেক বড়ো, প্রান্তর পর্বত আকাশ গ্রহ-নক্ষত্র লইয়া তাহার দুনিয়াটা আপন সংকীর্ণ গৃহাঙ্গন ছাড়াইয়া অনেকদূর অবধি বিস্তৃত। মৃত্যুর কঠোর বিচ্ছেদ সে দার্শনিক ঔদাসীন্যকে কিছুটা সহনীয় করিয়া আনিতে পারে। হৈমন্তীর জগৎ অত বড়ো নহে, তাহার যাহা যায় তাহা যায়।

বিকালের দিকে হৈমন্তী জিজ্ঞাসা করিল—তা এবার এম এ.-তে ভর্তি হবি তো?

—ভাবছি মা। দুটো বছর নষ্ট না করে একটা কাজ খুঁজে নিলে হয় না?

কথাটা হৈমন্তীর পছন্দ হইল না। সে বলিল—তোর বাবার খুব ইচ্ছে ছিল তুই এম.এ. পাস করিস। প্রায়ই বলত। তাছাড়া আমাদের টাকার এমন কী প্রয়োজন যে তোকে এখনই চাকরি কবতে হবে! না, তুই এম.এ. পড়—

প্রভাতও সেই পরামর্শ দিল। বলিল—বয়েস বাড়লে জীবনে নানা জটিলতা আসবে, ইচ্ছে হলেও তখন আর পড়বার সুযোগ থাকবে না। ভর্তি হয়ে যাও দেখি—

—তুমি পড়বে?

—হ্যাঁ। তোমার চেয়ে আমাব বরং একটা চাকরি পাওয়ার দরকার অনেক বেশি। তবু আমি পড়ব—যাতে জীবনে কোনও আফসোস না থাকে। কলেজের চেয়ে ইউনিভার্সিটির পরিধি অনেক বড়ো, সে লাইফটা একটু চেখে দেখবো না?

প্রভাতের সঙ্গে একদিনেই কাজল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইয়া আসিতেছে। হিটলারের দুর্মদ বাহিনীসহ অক্ষশক্তি সর্বত্রই কোণঠাসা। সুদীর্ঘ চারবৎসরব্যাপী প্যারিস অবরোধের অবসান ঘটাইয়া জেনারেল দ্য গলের রেজিস্ট্যানস্ বাহিনী প্যারিসকে মুক্ত করিয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইলেই ভারত স্বাধীনতা পাইবে এমন গুজবও বাতাসে ভাসমান। রাজনীতি সম্বন্ধে কাজলের ততটা আগ্রহ না থাকিলেও বেশ অনুমান করিতে পারে মানবেতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কট ও ক্রান্তিকালের সে সাক্ষী।

একদিন একটা মজার কাণ্ড হইল।

দুপুর আড়াইটার পর ইউনিভার্সিটিতে আর কোনও ক্লাস ছিল না। কাজল বইখানা হাতে ট্রামে চাপিয়া এস্‌প্ল্যানেডে গিয়া নামিল। হাঁটিতে হাঁটিতে ময়দানে একটা কাঠবাদামের গাছ দেখিয়া তাহার নিচে বসিয়া পড়িল। দূরে পশ্চিমদিকে গঙ্গাবক্ষে সারি সারি জাহাজ বাঁধা, তাহাদের মাস্তুলগুলির ঊর্ধ্বমুখ স্পর্ধায় আকাশকে বিদ্ধ করিতেছে। দুপুরে শেষ ক্লাসে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'প্রেল্যুড' পড়ানো হইতেছিল। তাহার কয়েকটা লাইন মনে আসিল কাজলের। হাতে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেসের কবিতার সংকলনখানা ছিল, সেটার পাতা উল্‌টাইয়া সে 'প্রেল্যুড'-এর নির্বাচিত অংশ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। জীবনের এইসব একান্ত মুহূর্তগুলি বড়ো সুন্দর। ঘাসের উপর দিনান্তের রৌদ্র আসিয়া এলাইয়া পড়িয়াছে, আপনমনে বসিয়া কেমন কবিতা পড়া।

কাছেই কেহ কী বলিয়া যেন চেঁচাইতেছে। তাহার কর্কশ স্বরে বিরক্ত হইয়া কাজল মুখ তুলিয়া তাকাইল।

একজন হিন্দুস্থানী গাড়োয়ান শ্রেণীর লোক কিছুদূরে গামছা পাতিয়া ঘুমাইতেছিল। একটা লালমুখো সার্জেন্ট আসিয়া তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া গালিগালাজ করিতেছে। গভীর নিদ্রা হইতে অকস্মাৎ জাগিয়া এই নিদারুণ বিপৎপাতে লোকটা হতচকিত হইয়া পড়িয়াছে। সার্জেন্ট তিরস্কারে ক্ষান্তি দিয়া নির্যাতন পর্বের সমাপ্তি-অনুষ্ঠান হিসাবে লোকটিকে একটা রদ্দা মারিল। নীরবে অপমান পরিপাক করাই এক্ষেত্রে দুর্বলের একমাত্র পন্থা, লোকটা মারের চোটে মাটিতে বসিয়া পড়িল, তারপর ম্লানমুখে ধীরে ধীরে নিজের গামছাটা পাট করিয়া কাঁধে লইয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

কাজলের হঠাৎ খুব রাগ হইল। অকস্মাৎ সে উঠিয়া হিন্দুস্থানী লোকটার সামনে গিয়া বলিল—'দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছো?' শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া ব্যাপার দেখিতেছিল, তাহাকে বলিল—'তুমি এ লোকটাকে অকারণে মারলে কেন?'

বিজিত দেশের নাগরিকের নিকট হইতে শাসকজাতির প্রতিনিধি এ ধরনের প্রশ্ন আশা করে না। সার্জেন্ট বিস্মিত হইয়া বলিল—আমি কী তোমার কাছে আমার কাজের কৈফিয়ৎ দেব? তুমি কে?

—আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। না, তুমি পুলিশ, তোমার কর্তব্যের জন্য আমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নও। কিন্তু আমি লক্ষ করেছি এই লোকটা কোনও অপরাধ করেনি, অথচ তুমি একে শারীরিক নির্যাতন করলে।

সার্জেন্টের মুখ লাল হইয়া উঠিল।—তুমি কী আমাকে চ্যালেঞ্জ করছো?

কাজল বলিল—আদৌ না। আমি শুধু এই কথা বলছি যে, ভাগ্যক্রমে আমরা পরাধীন, তোমরা শাসক। কিন্তু চিরকাল কোনও জাতি পরাধীন থাকে না, যদি কোনওদিন তোমাদের চলে যেতে হয়, তাহলে পেছনে কিছু সুন্দর স্মৃতি রেখে যাওয়াই কী ভালো নয়?

—মাঠের এই অংশ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নয়। এখানে শুয়ে থাকা বেআইনি—

—সেই কথাটা তুমি একে বুঝিয়ে বলতে পারতে। পশুশক্তির প্রকাশে কোনও মহত্ত্ব নেই।

—তোমাকে কর্তব্যে বাধাদানের জন্য আমি এখনই গ্রেপ্তার করতে পারি জানো?

সরাসরি এ কথার উত্তর না দিয়া কাজল বলিল—আমার হাতে এই বইটা দেখছো? এখানা তোমাদের বিখ্যাত কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের লেখা, এক্ষুনি বসে বসে পড়ছিলাম। এঁকে আমি একজন মহাকবি বলে মনে করি। যে জাতি এমন মহাপুরুষের জন্ম দিয়েছে সেই জাতির লোকের কাছে কী আমরা এর চেয়ে ভালো ব্যবহার আশা করতে পারি না?

সার্জেন্টটি একেবারে run of the mill নহে। বয়সেও তরুণ, এখনও কঠিন হৃদয় পুলিশে পরিণত হইতে পারে নাই। তাহার মুখের রাগত ভাব একটু একটু করিয়া কমিয়া আসিল। সে

বলিল—তুমি কী সত্যিই বিশ্বাস করো একদিন ব্রিটিশরা ভারত থেকে চলে যাবে? একদিন এ দেশ আর আমাদের সাম্রাজ্যের অধিকারে থাকবে না?

—আমি সত্যিই একথা বিশ্বাস করি। ইতিহাস কী সেই সাক্ষ্যই দেয় না? কোনও জাতি কখনও চিরকাল পরাধীন থেকেছে? আর প্রকৃত বীর এবং সভ্যজাতের লক্ষণ হল দুর্বলের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করা।

শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট কয়েক মুহূর্ত কী ভাবিল, তারপর হঠাৎ কাজলের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল—অল্ রাইট্, আই অ্যাম সিন্‌সিয়ারলি সরি। কাম, জয়েন হ্যান্ডস্—

এতদূর হইবে তাহা কাজল ভাবে নাই। সে হাসিমুখে করমর্দন করিল।

—আমার নাম হ্যারল্ড ওগডেন, শতকরা একশো ভাগ ব্রিটিশ রক্ত বইছে আমার শরীরে। তবু বলি, তোমরা স্বাধীনতা পেলে আমি খুশি হব—

তারপর হাসিতে হাসিতে বলিল—তুমি আবার আমার এ কথা ওপরওয়ালাদের বলে দিয়ো না, তাহলে গরিবের চাকরিটি যাবে!

ওগডেন চলিয়া গেলে কাজলও ট্রাম ধরিবার জন্য পা বাড়াইল। সমস্ত ঘটনার কেন্দ্র সেই হিন্দুস্থানী লোকটি একটু দূরে দাঁড়াইয়া ব্যাপার দেখিতেছিল। সে এবার আগাইয়া আসিয়া বলিল—আরে বাপ্! আপ তো বহোৎ তেজি আদমি বাবুসাহেব! গোরা পুলিশ ভি আপনাকে কুছু বলল না!

—ও কিছু না ভাই, সাহস করে কথা বললে একটু তো ফল হয়ই—

লোকটির মুখে অকৃত্রিম বিস্ময় ও শ্রদ্ধা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে বলিল—ওফ! বাবুজির আংগ্রেজি যেন মিশিনগানের গুলি—

মনের মধ্যে কীসের একটা অতৃপ্তি, একটা অপূর্ণতার ভাব। কী যেন করিবার ছিল, যাহা করিতে পারিলে জীবনটা সার্থকতা লাভ করিত—সেটা ক্রমাগতই স্বর্ণমৃগের মতো জীবন-অরণ্যের বিশাল বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে সরিয়া বেড়াইতেছে। জন্ম-কর্ম-প্রেম-মৃত্যুর সমস্ত স্বাভাবিক পর্যায়ের মধ্য দিয়া আর এক অলৌকিক জগৎ পরিব্যাপ্ত, শেষরাত্রির নিবিড় সুষুপ্তির ভিতরে যে জগৎটার আবছা তীরভূমি ব্যবধানের সমুদ্রপারে ক্ষণমুহূর্তের জন্য দেখা দিয়াই আবার দেশ-কালের জটিল গোলকধাঁধায় হারাইয়া যায়। রিটায়ার করিবার কিছুদিন আগে সুরপতি একটা হিজ মাস্টার্স ভয়েস্ কোম্পানির গ্রামোফোন কিনিয়াছিলেন। মামাবাড়ি হইতে সেটি কাজল লইয়া আসিয়াছে। ওয়েলিংটনের মোড়ের পুরোনো রেকর্ডের দোকান হইতে সংগ্রহ করা একসেট মোজার্ট, বিঠোফেন, শুম্যান, শোপ্যাঁর রেকর্ড তাহাতে বাজাইয়া মাঝে মাঝে কাজল শোনে। আনফিনিশ্‌ড সিম্‌ফনি বা পেজ্যান্টস মেরিমকিং-এর নরম পর্দার স্বরগুলি ওবো-র বিষণ্ণ উদাস করা আওয়াজে বুকের গভীর গোপন হইতে ভুলিয়া যাওয়া হারানো ব্যথা তুলিয়া আনে, পিয়ানোর শব্দে পাইনবন হইতে বরফগলা জলের ঝরনা নামিয়া আসে। চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে বার্চ, বিচ আব অ্যাসপেন অরণ্য। তাহার ফাঁকে ফাঁকে উত্তরসমুদ্র হইতে বহিয়া আসা হিমশীতল বাতাস সারাদিন খেলা করে। কোথায় রহিয়াছে সাহারা মরুভূমির মধ্যবর্তী তাসিলি পাহাড়, যাহার গুহায় বহুসহস্র বৎসর পূর্বে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আঁকা চিত্র অন্ধকারে গোপন আছে একদিন প্রকৃত রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার আশায়। কোথায় আমাজন অববাহিকার উন্নতশীর্ষ বৃক্ষের ডালে বসিয়া তীক্ষ্ণস্বরে ডাকে টুকান পাখি, তাহার বিচিত্রবর্ণের শরীর বেলাশেষের সূর্যালোকে ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া আসে। ইস্টার দ্বীপের প্রস্তরময় তটভূমিতে লাফাইয়া পড়ে প্রশান্ত মহাসাগরের ব্যস্ত তরঙ্গমালা। জাপান সমুদ্র পার হইয়া যায় বিধ্বংসী শক্তিসম্পন্ন সুনামী প্রবাহ। ট্রম্বোনের স্বরে যেন শতবৎসরের বিস্মৃতির পর্দাটা সরিয়া যায়, কাজলের মনে হয় কবে যেন সে ওইসব দেশে একবার করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কতবার সে বল্‌গাহরিণের স্লেজে চাপিয়া বিভার শিকার করিতে গিয়াছে, দেখিয়াছে নরম তুষারের উপর ভালুকের সদ্যসৃষ্ট পদচিহ্ন। কতবার ইউফ্রেটিস নদীর জলে সাঁতার কাটিয়া নলখাগড়ার বনের

ধারে কাপড় শুকাইতে দিয়া তাকাইয়া থাকিয়াছে নীল আকাশের দিকে। দুর্গের চূড়া হইতে রাজকুমারীকে একহাতে ধরিয়া লাফাইয়া পড়িয়াছে পরিখার জলে। হানিবলের আল্পস্ পর্বত পার হইবার সময় সে ছিল সশস্ত্র সৈনিক, ফিনিশীয় নৌবাণিজ্যের যুগে সে ছিল একজন সার্থবাহ। তারসপ্তকে বেহালার সম্মিলিত করুণ-মধুর স্বরে বুকের মধ্যে হারানো সেই সব দিনের জন্য একটা অদ্ভুত হাহাকার মাথা কুটিয়া মরে।

কিন্তু ভারতীয় রাগসঙ্গীতের প্রভাব অন্যরকম। সুরের জগতের এই অদ্ভুত দিকটা কাজল বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিয়াছে। দেশী গান বা ওস্তাদের বাজনা শুনিলে মন দিগ্‌বিদিকে ছড়াইয়া পড়ে না, বরং আত্মস্থ হইয়া নিজেরই হৃদয়ের গভীরে ডুব দিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়ে। ভাবিলে তাহার অবাক লাগে, একই তো স্বরসপ্তক—তাহারই হেরফেরে কত বৈচিত্র্য!

কে জানে মৃত্যুর পর আর কোথাও নতুন করিয়া জীবন শুরু হয় কিনা, কোথাও আবার মায়ের কোল, স্বপ্নমাখা শৈশব অপেক্ষা করিয়া থাকে কিনা। হয়তো অনন্ত কালসমুদ্রে বর্তমান জীবনই একমাত্র সবুজ দ্বীপ। কিছু একটা করিতে হইবে। সময় বৃথা বহিয়া যাইতেছে।

একদিন বিকালে ইউনিভার্সিটি হইতে বাহির হইয়া কাজল ও প্রভাত গোলদিঘির একটা বেঞ্চে গিয়া বসিল। অপরাহ্নের রৌদ্র রাঙা হইয়া মহাবোধি সোসাইটির বাড়ির গায়ে পড়িয়াছে। কতকগুলি অল্পবয়স্ক ছেলে জল ছোঁড়াছুড়ি করিয়া স্নান করিতেছে। কিছুক্ষণ নানা বিষয়ে আলোচনা করিবার পর কাজল বলিল—প্রভাত, একটা কথা তোমাকে বলব বলে ক-দিন ভেবে রেখেছি, কিন্তু ঠিকমতো সুযোগ না পাওয়ায় আর বলা হয়ে উঠছে না। বিষয়টা আমার কাছে খুব জরুরি—

প্রভাত কাজলের গলার স্বরে একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—খুব জরুরি? কী বিষয়ে?

—দেখ, কিছুদিন ধরেই মনে হচ্ছে জীবনটা যেন বৃথা কাটিয়ে দিচ্ছি। প্রত্যেকেই একটা না একটা কিছু করার জন্য পৃথিবীতে আসে। আমার পড়াশুনো তো শেষ হয়ে এল, কিন্তু সামনে আমার কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নেই। এবার কী করব প্রভাত?

প্রভাত কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল—খুব শক্ত প্রশ্ন। এখুনি আমি তোমাকে এর জবাব দিতে পারবো না। তবে একটা কথা বলি, তোমাকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে বিচার করার সুযোগ আমার হয়েছে—তাতে মনে হয় শিল্পই তোমার পথ।

—শিল্প? কী ধরনের শিল্পের কথা বলছো?

—বৃহত্তরভাবে শিল্প বলতে যা বোঝায়। তোমার মধ্যে অনেক বলবার কথা রয়েছে, শিল্পের মাধ্যমে তা প্রকাশের চেষ্টা করে দেখছো না কেন?

কাজল বলিল—যেমন?

—যেমন তুমি সাহিত্যিক হবার চেষ্টা করে দেখতে পারো। শিল্পের অন্য কোনও শাখায় এমন নিভৃত চর্চার সুযোগ আর নেই।

কাজল হাসিয়া বলিল—এ কথাটা আমি নিজেও ভেবেছি, কিন্তু এতে অনেক অসুবিধা আছে।

—কিসের অসুবিধে?

—অনেক রকম। প্রধান দুটোর কথা বলছি, শোনো। প্রথমতঃ, সাহিত্যে আমার সত্যিকারের কোনো প্রবণতা আছে কিনা তা বোঝা দরকার। নইলে কেবলমাত্র আমার খেয়াল হয়েছে বলেই লিখতে শুরু করার কোনও মনে হয় না। সাহিত্য চার পয়সার চানাচুর নয়, যে ইচ্ছে কিনে এনে চিবোতে পারে না—

প্রভাত বলিল—এর সমাধান এই সমস্যার মধ্যেই নিহিত আছে। তোমার মধ্যে সাহিত্যিক প্রতিভা রয়েছে কিনা জানাবার জন্য তোমাকে আগে তা লিখতে হবে। আর একটা কী?

—আমার বাবা লেখক ছিলেন। নিজের মুখে বলছি বলে কিছু মনে কোরো না, বর্তমান

কালের পাঠকেরা বাবাকে বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এক্ষেত্রে আমাকে লিখতে হলে খুব বিরাট বাধা ঠেলে এগুতে হবে—

—এ কথা আমার ঠিক বলে মনে হয় না।

—নাও হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় পাঠকেরা আমার লেখাকে আমার বাবার লেখার সঙ্গে মনে মনে তুলনা করবে। সেটা নতুন লেখকের পক্ষে কাম্য নয়। বিখ্যাত মানুষের ছেলের পক্ষে বড়ো কাজ করা খুব কঠিন।

প্রভাত সামান্য ভাবিয়া বলিল—হতে পারে, জোর করে 'না' বলব না। কারণ সত্যিই বড়ো মানুষের ছেলেকে বড়ো হতে দেখা যায় না। কিন্তু এটাও তো পরীক্ষাসাপেক্ষ অমিতাভ। তাছাড়া গত তিন-চার বছরে তোমার কিছু লেখা আমি পড়েছি, তাতে প্রকৃতই সৎ সাহিত্যের উপাদান রয়েছে। তুমি লেখো।

দুই বন্ধুতে আরও অনেক আলোচনা হইল। ফিরিবার সময় প্রভাত বলিল—তুমি এবার কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করো, বুঝলে? শুধুমাত্র ভেতরে অনেক বলবার কথা থাকলেই তা দিয়ে সাহিত্য হয় না। বলার কথাটা হচ্ছে পাখি, কিন্তু সে পাখির জন্য একটা ভালো খাঁচা দরকার। খাঁচা বানাবার মালমশলা জোগাড় করতে শুরু করো—

রাত্রিতে শুইয়া কাজল অনেক চিন্তা করিল। জীবনকে সম্যকভাবে জানিতে হইলে এই চার দেওয়ালের মধ্যে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়াই কিছুদিন ঘুরিয়া বেড়াইলে কেমন হয়? সামনে পূজা আসিতেছে, সে সময় ইচ্ছা করিলে মাসখানেক বেড়ানো চলে। অবশ্য পূজার পর তিন-চার মাসের মধ্যেই এম.এ. পরীক্ষা, পড়াশুনার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। তবে বইপত্র কিছু সঙ্গে লওয়া যাইতে পারে। আর ফিরিবার পর বেশি করিয়া পড়াশুনা করিলে ক্ষতি সামলাইয়া লওয়া যাইবে।

এবার বাহির হইবে সম্পূর্ণ একা। বন্ধুদের সঙ্গে নহে।

সিদ্ধান্ত লইবার সঙ্গে সঙ্গে কাজল সমস্ত মনে একটা অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করিল। প্রকৃত জীবনানন্দ স্থাণুত্বের পরিপন্থী—সবরকম বন্ধনকে অগ্রাহ্য করিয়া পৃথিবীর মুক্ত প্রসারে ইচ্ছামতো বিচরণের একটা নেশা আছে। মানুষ মূলতঃ প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির সন্তান, অরণ্যে-প্রান্তরে ছিল তাহার নিবাস। সভ্যতার প্রয়োজনে পরে সে নগর গড়িয়াছে, যন্ত্র বানাইয়াছে বটে, কিন্তু ইঁট কাঠ-লৌহে প্রস্তুত মহানগর তাহার প্রকৃত আশ্রয় নহে। মানুষের মস্তিষ্কের কোনও এক গোপন কোণে তাহার অরণ্যচারী মুক্ত জীবনের প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতি লুকাইয়া আছে, যে কারণে সামান্য সুযোগ পাইলেই লোকে তল্পিতল্পা বাঁধিয়া বেড়াইতে বাহির হয়, হারাইয়া যাওয়া সেই আনন্দময় স্বাধীনতাকে আর একবার আস্বাদন করিতে চায়। তাহা না হইলে কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া, পথের কষ্ট ভোগ করিয়া অচেনা বিদেশে ঘুরিবার অন্য কী সার্থকতা আছে?

দেশভ্রমণের অনুমতি আদায় করিতে কাজলকে বেশ বেগ পাইতে হইল। প্রস্তাব শুনিয়াই হৈমন্তী বলিল—সে কী কথা! সামনে তোর একজামিন, এখন বেড়াতে বেরুলে পাশ করতে পারবি?

—আমি ঠিক সে অর্থে বেড়াতে যাচ্ছি না মা। কলকাতা আর আমাদের এই শহর বড্ড একঘেয়ে হয়ে উঠেছে, পড়াতেও তো মন বসছে না। বরং কদিন কোথাও ঘুরে এলে মনটা হাল্‌কা হবে। বইপত্র সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, যেখানেই থাকি না কেন রোজ পড়াশুনা করব—

—কোথায় যাবি কিছু ভেবেছিস?

সহজে অনুমতি পাইবার জন্য কাজল এইখানে মায়ের সঙ্গে সামান্য তঞ্চকতা করিল। সে বলিল—না, তা এখনও ঠিক হয়নি। আমি তো একা যাচ্ছি না, প্রভাতও যাচ্ছে আমার সঙ্গে। দু-জনে মিলে ঠিক করব।

হৈমন্তী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিল—প্রভাতও যাচ্ছে? তাহলে অবশ্য—

—হ্যাঁ মা, তুমি কিচ্ছু ভেবো না। আমরা খুব সাবধানে থাকব।

জিনিসপত্র কাজল বেশি কিছু সঙ্গে লইল না। একটা মাঝারি সুটকেসে কিছু পাঠ্য এবং কিছু অ-পাঠ্য বই, ডায়েরি, কলম-পেনসিল, কিছু লিখিবার কাগজ এবং কয়েক প্রস্থ জামাকাপড় ভরিল। কাঁধের একটা ঝোলায় লইল চাদর, ফুঁ দিয়া ফোলানো যায় এমন একটা বালিশ, তোয়ালে আর দাড়ি কাটিবার সরঞ্জাম। নিজে বওয়া চলিবে না এমন কোনও জিনিস সে লইল না। বইপত্রের দরুন সুটকেসটা কিঞ্চিৎ বেশি ভারি হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু রওনা হইবার আগের দিন রাত্রে কাজল অনেক হিসাব করিয়াও তাহা হইতে একখানা বইও কমাইতে পারিল না। বরং মনে হইল—উপায় থাকিলে আর কখানা বই নিতাম। সবরকম মুডের জন্য সঙ্গে বই নেওয়া ভালো, কখন কী পড়িতে ইচ্ছে করে তার ঠিক আছে কিছু?

কাজল কোথায় যেন পড়িয়াছিল, বাঙালি বেড়াইতে খুব ভালোবাসে বটে—কিন্তু রওনা হইবার সময় দরজায় তালা দিতে গিয়া মনটা একবার কেমন করিয়া ওঠে। মনে হয়—না গেলেই যেন ভালো হইত।

সুটকেস আর ঝোলাটা গুছাইয়া ঘরের কোণে রাখা আছে। শুইয়া কাজলের ঘুম আসিতেছিল না। আগামীকাল এইসময় তাহার ট্রেন সগর্জনে ছুটিতেছে। বাহিরের পৃথিবীর যেমন একটা রহস্যময় আকর্ষণ আছে, তেমনি সেই অপরিচিত জগৎটা সম্বন্ধে ভয়মিশ্রিত শঙ্কাও মানুষের মজ্জাগত। নিজের গৃহকোণ শতরকমের প্রীতি ও ঘনিষ্ঠ মমতার আয়োজন সাজাইয়া লইয়া বসিয়া আছে। বৃহত্তর জগতে অজানার আকর্ষণ আছে বটে, কিন্তু নিকটজনের প্রীতিপূর্ণ আহ্বান নাই। তবুও সে কেন বাহির হইতেছে?

কল্পনায় রেলগাড়ির চাকার শব্দ শুনিতে শুনিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সন্ধ্যায় হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাইয়া কাজল দেখিল মনের মধ্যে আশঙ্কা আর দ্বিধার ভাবটা আর নাই। চারিদিকে লোকজন ব্যস্ত হইয়া ছুটিতেছে, কুলিদের কোলাহল, ক্যানাডিয়ান এঞ্জিন হইতে তীক্ষ্ণশব্দে স্টিম ছাড়িবার উচ্চনিনাদ, কিছু যাত্রী লাইন দিয়া কুঁজায় জল ভরিয়া লইতেছে—ইহারই মধ্যে কী একটা ট্রেন হুইস্‌ল দিয়া ছাড়িয়া গেল। সব মিলাইয়া বেশ একটা রোমাঞ্চকর পরিবেশ। কিছুক্ষণ থাকিলেই সুদূরে কোথাও যাত্রা করিবার সম্ভাবনায় মন উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

আজ বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় পর্যন্ত কাজল কোথায় যাইবে কিছু ঠিক করে নাই। তাহাদের বাড়ির মাঝখানের ঘরটায় বনমালী মিস্ত্রির তৈয়ারি কাঁঠাল কাঠের আলমারিতে তাহার বাবার অনেক বছরের ডায়েরি রহিয়াছে। কলেজ-জীবনের কিছুদিন পর হইতে মৃত্যুর পূর্ব অবধি অপু নিয়মিত দিনলিপি লিখিত। অবসর পাইলেই কাজল সেগুলি লইয়া পড়ে। বিশেষ করিয়া বাবার জীবনের কোনও কিছু জানিবার জন্য নহে—আসলে ডায়েরি পড়িতে বসিলেই বহুদিন আগে বিদায় লওয়া প্রিয় মানুষটা যেন সম্পূর্ণভাবে সজীব হইয়া আবার সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। বাবার সহিত আবার একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

বাবার একটা ডায়েরিতে সে পড়িয়াছে বাবাও একবার কিছু ঠিক না করিয়া হাওড়া স্টেশনে আসিয়া প্রথম যে গাড়িটা ছাড়িতেছে টিকিট কাটিয়া সেটায় উঠিয়া বসিয়াছিল। সে অবশ্য অতটা করিবে না, কারণ হাওড়া ব্রিজ পার হইবার সময় গঙ্গার ওপারে সমস্ত পশ্চিম দিগন্তব্যাপী সিন্দুরবর্ণ আশ্চর্য সুন্দর সন্ধ্যার দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে অকস্মাৎ সে কোথায় যাইবে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে।

সে কাশী যাইবে, যেমন বাবা গিয়াছিলেন।

কালো কোট পরা একজন টিকিট কালেক্টরকে সে জিজ্ঞাসা করিল—কাশীতে যাবার ট্রেন এখন কী পাব বলতে পারেন?

লোকটা বোধহয় কী জরুরি কাজে যাইতেছিল, থামিবার সময় নাই। চলিতে চলিতেই বলিয়া গেল—কাশী? ভালো ট্রেন পাবেন দিল্লি মেল—

বাকিটা ভালো শোনা গেল না।

কাউন্টারে গিয়া কাজল প্রথমে বেনারস সিটির একখানা টিকিট কিনিল। তাহার পর এনকোয়ারিতে খোঁজ করিয়া জানিল দিল্লি মেল আরও দেড়ঘণ্টা পরে চারনম্বর প্ল্যাটফর্ম হইতে ছাড়িবে। তবে দিল্লি মেল বেনারস সিটির উপর দিয়া যায় না। মোগলসরাই নামিয়া ট্রেন বদলাইয়া অথবা টাঙায় যাইতে হইবে। টাঙাই ভালো, সে কখনও টাঙায় চড়ে নাই।

ট্রেনে উঠিয়া একটা বাঙ্কে সে বিছানা পাতিয়া ফেলিল। দূরভ্রমণের সময় সহযাত্রীদের সঙ্গে খুব সহজেই আলাপ জমিয়া যাওয়াটা নিয়ম, কিন্তু এই কামরায় দুইজন অবাঙালি স্বল্পবাক প্রৌঢ় এবং অনেকগুলি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা রহিয়াছে। অবাঙালি সহযাত্রীদ্বয় ট্রেন ছাড়িবার পূর্বেই পুঁটুলি হইতে চাপাটি ও ভাজি বাহির করিয়া নৈশাহার সম্পন্ন করিল এবং পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করিল। বয়স্কদের দলটি বাঙালি বটে, তাহারাও বাবা বিশ্বনাথের মাথায় জল দিতে কাশী চলিয়াছে এমনও জানা গেল, কিন্তু বর্ধমান ছাড়াইবার পরও তাহাদের সম্মিলিত এবং সরব বৈষয়িক আলোচনায় কাজলের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। যাইতেছে কাশীতে, সেটেলমেন্টের খাজনার রসিদ, আমমোক্তারনামা এবং খুড়তুতো ভাইকে জব্দ করিবার জন্য উকিলের আবিষ্কৃত কূটবুদ্ধির বিষয়ে আলোচনা এখন কোন কাজে আসিবে? কাজলের হাসি পাইল। মূর্খের দল! ধর্ম করিতে চলিয়াছে, ধর্মের মূল উপদেশটিই গ্রহণ করে নাই!

একটা পোকা উড়িয়া উড়িয়া আলোর বাল্বে ঠোক্কর খাইতেছে। সেদিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে কাজল ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙিল খুব সকালে। ট্রেন গুমগুম শব্দ করিয়া একটা বিশাল নদী পার হইতেছে। বাঙ্ক হইতে নামিয়া কাজল জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইল। চওড়া নদীগর্ভে ইতস্তত দু-একটা বড়ো পাথর পড়িয়া আছে। বালুকাপূর্ণ নদীখাতের অধিকাংশই শুষ্ক, দু-এক স্থান দিয়া জলধারা বহিয়া চলিয়াছে। এখনও সূর্য ওঠে নাই, প্রভাতের স্নিগ্ধ মাধুর্যে সমস্ত দৃশ্যটি ভরিয়া আছে। দুই অবাঙালি সহযাত্রী উঠিয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের একজন কাজলের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিল—ইয়ে শোন্ নদ হ্যায় বাবুজি—

দেখিতে দেখিতে শোনের দৃশ্য পিছাইয়া পড়িল।

সূর্য উঠিবার কিছু পরেই মোগলসরাই। কাজল দেখিল তাহার দুই অবাঙালি সহযাত্রীও নামিয়াছে। সে কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনারা কী কাশী যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ বাবুজি, কেন?

—আমিও কাশী যাব। যদি টাঙায় যান তাহলে আমি সঙ্গে যেতে পারি। যা ভাড়া লাগবে তার অর্ধেক আমি দেব—

—নিশ্চয়, আসুন বাবু আমাদের সঙ্গে। ভাড়া কিছু দিতে হবে না। আমরা তো যাচ্ছিই, বাবুজি কী তীর্থ করতে চলেছেন?

কাজল জানাইল সে তীর্থ করিতে যাইতেছে না বটে, কিন্তু যাহারা তীর্থ করিতে যায় তাহাদের প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে।

—আমরা বাবা বিশ্বনাথের মাথায় জল দেব বলে যাচ্ছি বাবু। আমার নাম ধরমদাস, এ আমার চাচেরা ভাই, এর নাম রামচরণ। আমরা বিহারের পূর্ণিয়া জেলার লোক, দু'ভাই মিলে কলকাতায় ব্যবসা করি। এই প্রথম কাশী আসছি।

প্ল্যাটফর্মের কলে কাজল ও তাহার সঙ্গীদ্বয় মুখহাত ধুইয়া লইল। ধরমদাস বলিল—চলুন বাবুজি, কিছু নাস্তা করে নিয়ে টাঙায় উঠব।

মোগলসরাই বেশ বড়ো শহর। স্টেশনের বাহিরেই কিছুদূরে রাস্তার উপর হালুইকরের দোকান। তাহারা তিনজনে ঢুকিয়া পুরী-তরকারি, পেঁড়া ও জিলাপি খাইল। কাজল রাবড়িও লইতে চাহিয়াছিল, ধরমদাস ও তাহার সঙ্গী বারণ করিয়া বলিল—এখানে রাবড়ি খাবেন না বাবুজি, কাশীতে রাবড়ি বিখ্যাত—খেলে সেখানেই খাবেন।

খাওয়া হইলে কাজল সঙ্গীদের বারণ না শুনিয়া তিনজনেরই খাবারের দাম মিটাইয়া দিল। ধরমদাস দুঃখিতমুখে বলিল—এ বড়ো জুলুম করলেন বাবুজি, খেলাম তিনজনে মিলে, তাহলে আপনি একা পয়সা দেবেন কেন?

—তাতে কী হয়েছে ধরমদাস ভাই? বাইরে বেরিয়ে অত চুলচেরা হিসেব করলে চলে না। আপনারা তো টাঙার ভাড়া দিয়ে দেবেন বলেছেন, আমি কী তাতে আপত্তি করেছি?

টাঙায় উঠিয়া কাজল বলিল—আপনারা কোথায় উঠবেন কিছু ঠিক করেছেন?

—না। ভালো কোন ধর্মশালায় উঠব ইচ্ছে আছে।

—আমি আপনাদের সঙ্গে থাকলে আপত্তি নেই তো? ভয় নেই, বিরক্ত করব না—

ধরমদাস বলিল—কী বলছেন বাবুজি! বেফিকর চলে আসুন, আমরা খুব খুশি হব—

এবার দূর হইতে বেণীমাধবের ধ্বজাটা দেখিতে পাওয়া মাত্র কাজলের মন কেমন করিয়া উঠিল। এই কাশী! এখানে তাহার বাবার শৈশবের অনেকখানি কাটিয়াছে, ঠাকুরদার স্মৃতি মাখানো রহিয়াছে। ঠাকুমার মমতা এখানকার বাতাস যেন এখনও বহিয়া ফেবে। ধরমদাসকে সে বলিল বটে যে সে তীর্থ করিতে আসে নাই, কিন্তু এও একপ্রকার তীর্থেই আসা।

বাবাব ডায়েরি হইতে ঠাকুরদার বাসার ঠিকানা সে লিখিয়া আনিয়াছে। সম্ভব হইলে আজই একবার জায়গাটা দেখিতে যাইবে।

যে ধর্মশালায় টাঙাওয়ালা তাহাদেব আনিয়া হাজির করিল তাহা খুব বড়ো না হইলেও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রথমেই কাজল ভালো করিয়া স্নান করিল। সকালে হালুইকরদের দোকানে যে পরিমাণ খাওয়া হইয়াছে তাহাতে এবেলা আর না খাইলেও চলিবে। কিন্তু বর্তমানে একটু ঘুমাইয়া লওয়া প্রয়োজন। ট্রেনে সারারাত ভালো ঘুম হয় নাই, বিকালে ঘুরিতে হইলে শরীরটা ঝরঝরে করিয়া লইলে ভালো হয়।

ঘুম হইতে উঠিয়া কাজল দেখিল বেলা পড়িয়া আসিতেছে। জিনিসপত্র ঘরে রাখিয়া কেবলমাত্র টাকার ব্যাগটি সঙ্গে লইয়া সে বাহির হইল। প্রথমে তো কেহই ঠিকানা শুনিয়া কোনও সন্ধান দিতে পারে না, পরে অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়া এবং অনেক ঘুরিয়া মোটামুটি অঞ্চলটা বাহির হইল। কাশীর গলি সম্বন্ধে তাহার কোনও ধারণা ছিল না, পথের সংকীর্ণতা বিষয়ে কলিকাতার সরু গলিই তাহার ধারণার চরম সীমা। মাকড়সার জালের মতো এতগুলি সরু গলি একসঙ্গে কোনও শহরে থাকিতে পারে তাহা সে জানিত না। রাস্তায় সাইনবোর্ডও নাই যে পথের নাম ও নম্বর দেখিয়া লইবে। শেষে একটি সরু গলির মুখে সিমেন্ট বাঁধানো রোয়াকে বসিয়া তাম্রকূট সেবনরত এক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিতে বাড়িটার সন্ধান পাওয়া গেল। লোকটি নিতান্ত বৃদ্ধ এবং নিতান্ত শীর্ণ। বিকট একটা কাশির দমক সামলাইয়া লইয়া বলিল—কেন, সে বাড়িতে কী?

—এই, এমনি একটু দরকার আছে—

—রামধন মুখুজ্যের কেউ হও নাকি? তাদের এক ভাগ্নে শুনেছি কলকাতায় থাকে।

কাজল সবিনয়ে জানাইল সে রামধন মুখুজ্যের ভাগ্নে নহে।

—আচ্ছা, এগিয়ে যাও, ডাইনে চারখানা দরজা ছাড়িয়ে পাঁচ নম্বরেরটা—বুঝেছো?

কাজল ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া গলিতে ঢুকিল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন প্রায় ঘনাইয়া আসিয়াছে। ইঁট বাঁধানো পথে নানা ধরনের বর্জ্যদ্রব্য জমিয়া পরিবেশে একটা স্থায়ী অপ্রীতিকর গন্ধের জন্ম দিয়াছে। এমন সময় বোধহয় না আসিলেই ভালো হইত। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান, যে বাড়িতে

যাইতেছে সেখানেও তাহাকে কেহ চেনে না। সঙ্গে বেশ কিছু টাকাপয়সাও রহিয়াছে। কে জানে, কাশীর গুণ্ডার গুজবটা যদি হঠাৎ সত্য হইয়া পড়ে! একবার মনে হইল ফিরিয়া যায়, কাল সকালে আসিলেই হইবে। তারপরই ভাবিল—দূর ছাই! ভয়ের কী আছে? দেখিই না কী হয়—

ডানদিকে পঞ্চম দরজাটা খোলা। ভিতরে ছোট্ট একটু বাঁধানো উঠানমতো। উঠানের চারদিক ঘিরিয়া দু-তিনটি খুব ছোট ছোট খুপরির মতো ঘর। উঠানের একপ্রান্তে জলের কল (বাবার ডায়েরিতে আছে বাবা কাশীতে প্রথম জলের কল দেখে, এই কলটাই নাকি?) আর ঠিক মাঝখানে একটি তুলসীমঞ্চ। দুইজন বৃদ্ধা একটি ঘরের সামনে বারান্দায় বসিয়া মালা জপ করিতেছে। ঘরের মধ্যে কথাবার্তার আওয়াজ কানে যাইতেছে বটে, কিন্তু কাহাকেও দেখা যাইতেছে না। বারান্দার বৃদ্ধা দুইজন সম্ভবতঃ চোখে খুবই কম দেখে, কাজলের উপস্থিতি গ্রাহ্য না করিয়া তাহারা মালা জপ করিয়া চলিল।

কাজল দাঁড়াইয়া কী করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যা দিবার জন্য একজন প্রৌঢ়া মহিলা প্রদীপ হাতে বাহির হইয়া কাজলকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন—কে? কে ওখানে? কী চাই?

কাজল বলিল—আজ্ঞে আমি, একটু প্রয়োজন ছিল—

—কী প্রয়োজন? কার কাছে এসেছেন?

—আপনি বরং সন্ধেটা দেখিয়ে নিন, তারপর বলছি। ব্যাপারটা বোঝাতে আমার একটু সময় লাগবে।

প্রৌঢ়াটি অবাক হইয়া কাজলেব দিকে একবার তাকাইয়া তুলসীতলায় প্রদীপ নামাইয়া প্রণাম করিল। এব মধ্যে তাহাদের গলার শব্দ পাইয়া এক ভদ্রলোক ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। কাজল আন্দাজে বুঝিল—ইনিই রামধন মুখুজ্যে। ভদ্রলোক বলিলেন—কী চাই মশাই? এদিকে আসুন—

কাজল রোয়াকের কাছে গিয়া বলিল—আমার নাম অমিতাভ রায়। আমি কলকাতা থেকে আসছি। আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল—

—আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না তো! কী দরকার?

—দরকার তেমন কিছু নয। আসলে এই বাড়িতে অনেকদিন আগে আমার ঠাকুরদা আর ঠাকুমা ভাড়া থাকতেন। বাবা তখন খুব ছোট। এই বাড়িতেই আমাব ঠাকুরদা মারা যান। আমি আজ সকালে কাশী এসেছি, এমনি বেড়াতে—ভাবলাম বাবার ছোটবেলা কেটেছে যেখানে সে বাড়িটা দেখে যাই।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রামধন মুখুজ্যে বলিলেন—ব্যস, এই কারণে এসেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সন্ধ্যা দেখাইতে আসা প্রৌঢ়াটিও অবাক হইয়া তাকাইয়া আছেন। কাজল ইহাদের দোষ দিতে পারিল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে একজন অপরিচিত লোক এমন অদ্ভুত অনুরোধ লইয়া উপস্থিত হইল, যা দিনকাল পড়িয়াছে, সন্ত্রস্ত না হইয়া উপায় থাকে না।

রামধন বলিলেন—বাড়িটা দেখতে এসেছেন মানে বুঝলাম না! কীভাবে বাড়ি দেখবেন?

বাড়িটা সে অতসী কাচ হাতে লইয়া গল্পের গোয়েন্দার মতো হামাগুড়ি দিযা দেখিবে না। কিন্তু অতীতের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত স্থানের প্রতি যে গভীর আকর্ষণ তাহা অন্যকে বোঝানো দুরূহ। বোধটা যাহার মধ্যে আছে, তাহার আছে। যাহাব নাই, নাই।

কাজল বলিল—আজ্ঞে বিশেষ করে দেখার তো কিছু নেই। তবে ঠাকুরদা কোন ঘরটায় থাকতেন সেটা যদি একবার জানতে পারতাম—

ঘরের মধ্যে ঢুকিতে চায় যে! রামধন মুখুজ্যে ভাবিতেছিলেন লোকটাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া

উচিত হইবে কিনা, এমন সময় বাহিরের দরজা দিয়া একজন সুবেশ স্মিতদর্শন যুবক ঢুকিয়া উঠানে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া রামধন যেন গুরুতর সমস্যার হাত হইতে মুক্তি পাইলেন। বলিলেন—এই যে নির্মল, বেড়ানো হল? তুমি একবার কথা বল তো এঁর সঙ্গে। আমি ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি নে—

পরে কাজলের দিকে ফিরিয়া ঈষৎ গর্বের সুরে বলিলেন—আমার ভাগ্নে, কলকাতায় ইংরিজি খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করে—শহরের বড়ো বড়ো সব লোকের সঙ্গে জানাশোনা। আপনি বরং এর সঙ্গে কথা বলুন। কাল এসেছে আমার কাছে বেড়াতে—

যুবকটির বয়েস বছর আটাশ-উনত্রিশ, পরনে পায়জামা ও পাঞ্জাবি, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। ছিপছিপে চেহারা, রঙ ফরসা। মুখেচোখে বুদ্ধির ছাপ। সে কাজলের দিকে ফিরিয়া বলিল—কী ব্যাপার ভাই? আপনি কোথা থেকে আসছেন?

যুবকটির আবির্ভাবে কাজল খুশি হইয়াছিল। ইহাকে বিষয়টা বোঝানো সহজ হইবে। নিজের আগমনের কারণ সে পুনরায় খুলিয়া বলিল। তাহার পর হাসিয়া বলিল—কিছুটা নস্টালজিয়া, কিছুটা নিজের ফ্যামিলির ইতিহাসের প্রতি মোহ—এই আর কী! আপনাদের অবশ্য বড়োই কষ্ট দেওয়া হল—

—কিছু নয়। কিন্তু মামা কী বলতে পারবেন এঁরা কোন ঘরে থাকতেন? পুরোনো ভাড়াটেরা এখন আর কেউ নেই। মামাই নিচের সবটা নিয়ে থাকেন।

রামধন বলিলেন—না, আমি বলতে পারব বলে মনে হচ্ছে। কাবণ এদিকের ঘর দুটো বাড়িওয়ালা কখনওই ভাড়া দিত না, নিজেই থাকত। ওপাশের দুটো ঘরের মধ্যে ডানদিকেরটায় পুরোনো ভাড়াটেরা বহুদিন ছিল, আমরা আসায় উঠে গিয়েছে। কাজেই হলে ওই বাঁদিকের কোণের ঘরটাই হবে। দেখবেন? যাও না নির্মল, একবার দেখিয়ে দাও—

মোটা দেওয়াল আর নিচু ছাদওয়ালা পুরাতন ঘর। বাতাস ঢুকিবার পথ নাই। উঃ, এই ঘরের মধ্যে তাহার বাবা ছোটবেলায় থাকত! ঘরের মধ্যে গত পঞ্চাশ বছরে একবারও বোধহয় চুনকাম হয় নাই। বিবর্ণ, ধূসর দেওয়ালে স্যাঁতাধরা দাগ। বর্তমানে ঘরটি বোধহয় বিশেষ ব্যবহার হয় না, কারণ কয়েকটি টিনের তোরঙ্গ এবং এককোণে দাঁড় করানো একটি গোটানো মাদুর ছাড়া ঘরে আর কোনও আসবাব নাই। কড়িকাঠ হইতে ঝুলন্ত তারের ডগায় একটি অল্প পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাল্‌ব জ্বলিতেছে। তাহার বাবার সময় নিশ্চয়ই বিদ্যুতের আলো ছিল না, পরে হইযাছে।

বাবার শৈশব, ঠাকুরদার মৃত্যু, ঠাকুমার কত দুঃখ ও সংগ্রাম—এই ঘরে। কাজল অনেকক্ষণ অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল, যদিও ঘরের শ্রীহীন অভ্যন্তরে বিশেষ করিয়া দেখিবার কিছু ছিল না। নির্মল ছেলেটি বিবেচক, কাজলের মনের অবস্থা অনুমান করিয়া সে চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে কাজল বলিল—চলুন এবার যাই—

ফিরিতে গিয়া চোখ পড়িল দরজার পাশে। সেখানে দেওয়ালের গায়ে একটা কুলুঙ্গি। কুলুঙ্গির নিচের দিকটায় ইঞ্চি দেড়েক জায়গা সিমেন্ট দিয়া বাঁধানো। সেই সিমেন্টের উপর তীক্ষ্ণাগ্র কোনো কিছু দ্বারা কী যেন লেখা রহিয়াছে। কৌতূহল হওয়ায় কাজল ঝুঁকিয়া লেখাটা পড়িবার চেষ্টা করিল। পরক্ষণেই সে বুঝিতে পারিল কী লেখা আছে! মুহূর্তের মধ্যে বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ হইতে বুকের গভীরে জমিয়া থাকা কান্নাটা হঠাৎ বাধা না মানিয়া বাহির হইয়া আসিল। অক্ষর কয়টার উপর হাত রাখিয়া কাজল নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

নির্মল প্রথমটা খেয়াল করে নাই, সে দরজা দিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। কাজলকে পেছনে না দেখিয়া আবার ঘরে ঢুকিয়া বলিল—কোথায় গেলেন, আসুন—এ কী! কী হল আপনার! কাঁদছেন কেন?

পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া কাজল চোখ মুছিয়া বলিল—আমার বাবার নাম—বাবাই ছোটবেলায় এখানটায় লিখে রেখেছিলেন। এখনও রয়েছে—

সরিয়া আসিয়া নির্মল লেখাটা দেখিল।

—অপূর্বকুমার রায়। আপনার বাবার নাম? তা আপসেট হয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক। আপনার বাবা কী—

—মারা গিয়েছেন। আমার ছোটবেলাতেই।

—ওঃ।

কী ভাবিয়া কাজল বলিল—আমার বাবাকে হয়তো আপনি চিনবেন। উনি লেখক ছিলেন।

নির্মল একটু অবাক হইয়া কাজলের দিকে তাকাইল, বলিল—লেখক ছিলেন? আপনি কী বিখ্যাত সাহিত্যিক অপূর্বকুমার রায়ের কথা বলছেন? যাঁকে আজকাল প্রকৃতির পূজারী বলা হয়?

কাজল ঘাড় কাত করিয়া জানাইল—হ্যাঁ।

—বাট্ অফ্ কোর্স! তাঁকে চিনতে পারব না মানে! এই গত হপ্তাতেও অমৃতবাজারে অপূর্ববাবুকে নিয়ে আমার আর্টিকেল বেরিয়েছে—প্রিস্ট অফ্ নেচার, আপনি তাঁর ছেলে?

কাজল চুপ করিয়া রহিল।

নির্মল কাজলের দুই হাত ধরিয়া বলিল—আসুন, বাইরে আসুন—আপনার সঙ্গে কথা বলি। আমি তো জানতাম না কোনও সময় এই বাড়িতে অপূর্ব রায় থাকতেন! কী আশ্চর্য যোগাযোগ।

বারান্দায় মাদুর পাতিয়া সে ও নির্মল বসিল। ঘটনাটা ততক্ষণে বাড়িতে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। রামধন মুখুজ্যে এবং তার স্ত্রী সাহিত্যের খুব একটা ধার ধারেন না বা প্রিস্ট অফ্ নেচার অপূর্ব রায়ের নামও শোনেন নাই। কিন্তু নির্মলের বিচারবুদ্ধির উপর তাঁহাদের গভীর আস্থা আছে। তাঁহারা মোটামুটি আন্দাজ করিয়া লইয়াছিলেন কাজলের বাবা কোনও একটা কারণে বিখ্যাত লোক এবং তিনি শৈশবে এই বাড়িতে থাকিতেন। অবিলম্বে কাজলের জন্য কিছু জলখাবার এবং চা আসিল।

নির্মল বলিতেছিল—গ্রাজুয়েট হয়েই খবরের কাগজে ঢুকি। সেই কলেজ লাইফ থেকেই আপনার বাবা আমার মানসগুরু। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা পরাধীন দেশে বাস করি—আমাদের ভাষার প্রচার নেই, অনুবাদ হয় না। ইউরোপ অথবা আমেরিকার লেখক হলে অপূর্ববাবু নোবেল প্রাইজ পেতেন। মজার কথা কী জানেন, পরশু রাত্তিরে ট্রেনে আসবার সময় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল—তিনিও কাশীতেই আসছিলেন। সাহিত্য ভালোবাসেন। আধুনিক লেখকদের নিয়ে আলোচনা হতে হতে অপূর্ববাবুর কথা উঠল। তিনি বললেন, তিনি আপনার বাবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন—

কাজল জিজ্ঞাসা করিল—কে বলুন তো? কলকাতার লোক—

—কলকাতার তো বটেই। তবে এখন ভারতের বাইরে থাকেন, কে আত্মীয়া মারা যাওয়ায় কিছুদিনের জন্য ফিরেছেন বললেন। দিনদশেক কাশীতে থাকবেন, নিজের বাড়ি আছে। ভদ্রলোকের নাম বি. রায়চৌধুরী। আমি কাশীর ঠিকানাও নিয়ে নিয়েছি। আপনি তো দেখছি ফ্যামিলির পুরোনো ইতিহাস খুঁজে বেড়াতে ভালোবাসেন। আমার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে একবার গিয়ে দেখুন না চিনতে পারেন কিনা! নারদ ঘাটের কাছে বাড়ি—

ঠিকানা লইয়া কাজল উঠিল। কথা রহিল কলিকাতায় ফিরিয়া খবরের কাগজের অফিসে সে নির্মলের সঙ্গে যোগাযোগ করিবে। নিজের ঠিকানাও তাহাকে দিল। রামধন মুখুজ্যে বলিয়া দিলেন, কাশীতে আসিলেই যখন ইচ্ছা সে বাড়িটা দেখিয়া যাইতে পারে।

গলির মুখে সেই অতিবৃদ্ধ লোকটি এখনও রোয়াকে বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া বলিল—তুমিই রামধন মুখুজ্যের বাড়ি খোঁজ করছিলে না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—পেলে?

—হ্যাঁ।

বৃদ্ধ আপনমনে বিড়বিড় করিয়া বলিল—আমিও ওই বাড়িতে ছিলাম, বুঝলে? ছত্তিশ বচ্ছর থাকবার পর রামধন হারামজাদা আমায় উঠিয়ে, অন্য সব ভাড়াটে উঠিয়ে একা একা ভোগদখল করছে। বাড়িওয়ালাকে কী জাদুই যে করল! এই বুড়োবয়সে আমার কী কষ্ট! তারপর আবার হয়েছে হাঁপের ব্যারাম—

কাজল বলিল—হাঁপানির কষ্ট থাকলে তামাকটা কিন্তু না খাওয়াই ভালো—

বৃদ্ধ বলিল—জানি, কিন্তু ছাড়তে পারিনে। তা ও বাড়িতে কী দরকার ছিল?

—ওই বাড়িতে আমার ঠাকুরদা ভাড়া থাকতেন অনেকদিন আগে। বাবা তখন খুব ছোট। তাই একবার জায়গাটা দেখতে এসেছিলাম—

—ভাড়া থাকতেন? কতদিন আগে? কী নাম ছিল তোমার ঠাকুরদার?

তা বছর চল্লিশ আগে তো বটেই। ঠাকুরদার নাম ছিল হরিহর রায়।

বৃদ্ধের ঘোলাটে চোখ মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল—হরিহর রায়? খোকা, তোমার বাবার নাম কী—অপু? অপূর্ব?

কাজল অবাক হইয়া বলিল—আপনি বুঝি বাবাকে চিনতেন? ঠাকুরদাকে দেখেছেন?

—তোমার ঠাকুরদা মারা যাবার সময় আমি ওবাড়ির ওপরের ঘরে ভাড়া থাকতাম। আমিই গিয়ে লোকজন ডেকে সৎকারের ব্যবস্থা করি। তোমার ঠাকুমা কী—

—অনেকদিন মারা গিয়েছেন। বাবা তখন কলেজে পড়েন।

—আর তোমার বাবা? সে কোথায় আছে?

কাজল বলিল—বাবাও বেঁচে নেই, আমার ছোটবেলাতেই মারা গিয়েছেন।

বৃদ্ধ কেমন একটা অসহায় না-বুঝিবার ভঙ্গিতে তাকাইয়া বলিল—কেউ বেঁচে নেই? তোমার বাবাও মারা গিয়েছে? তার তো মরার বয়েস হয়নি—

তারপর কাজলকে বলিল—কাছে এসো দেখি, পড়াশুনা করো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এবার এম.এ. দেব—

বৃদ্ধ সস্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—ভাল। মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া কববে।

কাজল বলিল—আপনার নামটা তো জানা হল না—

—সে জেনে আর কী হবে? আমাকে যারা চিনতে পাবত তারা তো আর কেউ বেঁচে নেই বল্লে। তোমার বাবা থাকলে 'নন্দবাবু' বললে চিনত—

—আমি কিন্তু আপনার নাম জানি—

বৃদ্ধ বলিল—তুমি কীভাবে আমার নাম জানবে? কে বলেছে তোমাকে?

—কেউ বলেনি। কয়েকখানা বই লিখে মারা যাবার আগে বাবা খুব নাম করেছিলেন। তার মধ্যে একখানা বই বাবার নিজের জীবন নিয়ে লেখা। সেই বইতে আপনার নাম আছে—

নন্দবাবু একটু থতমত খাইয়া বলিল—আমার কথা? কী লেখা আছে তাতে?

প্রকৃত কথা বলিতে গেলে নন্দবাবুর মদ্যপান ও আনুষঙ্গিক দুশ্চরিত্রতার কথা বলিতে হয়। কাজল বলিল—ওই আপনি যা বললেন, ঠাকুরদার মৃত্যুর সময়ে আপনার সাহায্যের কথা।

—শুধু ওই?

—আর কী থাকবে?

বৃদ্ধ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—নাঃ, কিছু না—আর কী থাকবে!

বিদায় লইয়া কিছুদুর আসিয়া পিছন ফিরিয়া কাজল দেখিল নন্দবাবু প্রস্তরমূর্তির মতো

রোয়াকে বসিয়া আছে। আবার সে হয়তো কাশী আসিবে, এই বাড়িটা দেখিতে আসিবে—কিন্তু তখন নন্দবাবু বোধহয় আর থাকিবে না।

মহাকালের ঘটিকাযন্ত্র নিশ্চুপে কাজ করিয়া চলিয়াছে। আগ্রহী জন ছাড়া কে তার নিঃশব্দ প্রহর ঘোষণা শুনিতে পায়?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরের দিন সকালের দিকেই কাজল নারদ ঘাটের ঠিকানাটায় খোঁজ করিতে গেল।

এবার অবশ্য ঠিকানা বাহির করিতে অসুবিধা হইল না। রাস্তার উপরেই বেশ বড়ো বাড়ি। সামনে লোহার কারুকার্য করা ফটক। দেখিলেই মনে হয় বেশ ধনীর বাড়ি—যদিও এখন কিঞ্চিৎ শ্রীহীন। ভিতরে লোকজনও বিশেষ আছে বলিয়া মনে হইল না। ফটকের ভিতরেই একজন বিহারী দারোয়ান বসিয়া খৈনি ডলিতেছে। কাজল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—বাবু আছেন?

নিচের ঠোঁটটা টানিয়া চূর্ণীকৃত খৈনি সেই গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া দারোয়ান বলিল—বোলিয়ে বাবুসাহেব, কিস্‌কো চাহিয়ে?

—মিঃ রায়চৌধুরী আছেন? আমি তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

—জী, আইয়ে—

পুরাতন ধরনের আসবাবে সাজানো ড্রয়িংরুমে তাহাকে বসাইয়া লোকটা ভিতরে খবর দিতে গেল। ঘরে বিচিত্র গঠনের সেকেলে মেহগনি কাঠের চেয়ার, মেঝেতে বহু ব্যবহারে জীর্ণ সূতা বাহির হওয়া কার্পেট, কাচের টপ সমন্বিত ভারি টেবিল, দেওয়ালের সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো বিলাতি ল্যান্ডস্কেপ—সমস্তই এই পরিবারের হৃত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। তাহার বাবার সহিত ইহাদের কীরূপ যোগাযোগ ছিল?

ভিতরের দরজা দিয়া একজন অত্যন্ত সুপুরুষ বছর পঞ্চাশ-বাহান্নর ভদ্রলোক ঘরে ঢুকিয়া একটু বিস্ময়ের সঙ্গে কাজলের দিকে তাকাইলেন।

কাজল দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া বলিল—আমি একবার মিঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে চাই—

প্রতিনমস্কার করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—আমিই বিমলেন্দু রায়চৌধুরী। কী দরকার বলুন তো? আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে—বসুন!

বসিয়া কাজল বলিল—আমাকে বোধহয় কোথাও দেখেন নি। এবার কাশীতে আসার সময় ট্রেনে একজন সাংবাদিক ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছিল, তাঁর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে আসছি—

বিমলেন্দু বলিলেন—ট্রেনে! ওঃ হ্যাঁ, নির্মল চট্টোপাধ্যায় বলে এক ইয়াং ভদ্রলোক—তাঁর কাছ থেকে ঠিকানা পেয়েছেন? আমি কী আপনার কোনও কাজে আসতে পারি?

কথা বলিতে বলিতে কাজল ভদ্রলোককে লক্ষ করিতেছিল। প্রৌঢ়ত্বের প্রথম ধাপে দাঁড়াইয়াও মানুষটি দেখিতে আশ্চর্য রকমের সুন্দর। যৌবনেও লোকে এত রূপবান হয় না। কাব্যে নারীসৌন্দর্যের জয়গান আছে, কিন্তু পুরুষও যে এত সুন্দর হইতে পারে তাহা সে এই প্রথম দেখিল।

কাজল বলিল—আমি কোনও কাজ নিয়ে আপনার কাছে আসিনি, কেবল একটা বিষয় জানবার খুব কৌতূহল হওয়ায় এসেছি। সেদিন ট্রেনে আপনি আর নির্মলবাবু সাহিত্যিক অপূর্বকুমার রায়ের প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন, তাই না? আপনি বলেছিলেন অপূর্ব রায়ের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, সেই পরিচয়ের ব্যাপারটা আমি একটু জানতে চাই—

বিমলেন্দু বলিলেন—আপনিও কী সাংবাদিক? আর্টিকেল লিখবেন?

—আজ্ঞে না।

—তবে? এ প্রসঙ্গে আপনার উৎসাহের কারণ কী?

কাজল একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আমি অপূর্বকুমার রায়ের ছেলে, আমার নাম অমিতাভ রায়।

বিমলেন্দু প্রথমে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন, যেন কাজল কী বলিয়াছে তিনি শুনিতে পান নাই। তাহার পর তাঁহার মুখের উপর দিয়া পরপর অনেকগুলি ভাবের ঢেউ খেলিয়া গেল। সটান দাঁড়াইয়া উঠিয়া তিনি বলিলেন—আপনি—তুমি অপূর্ববাবুর ছেলে! তাই তোমাকে দেখে প্রথমেই—তোমাকে কেউ বলেনি তোমার চেহারা অবিকল তোমার বাবার মতো? কেবল মনে হচ্ছে কোথায় দেখেছি—এখন বুঝলাম। এই বয়েসে তোমার বাবা ঠিক এইরকমই দেখতে ছিলেন। তুমি কাশীতে কী করছো?

—বেড়াতে এসেছি। ছোটবেলায় বাবা কাশীতে থাকতেন জানেন বোধহয়, বাবার ডায়েরি থেকে ঠিকানা পেয়ে সে বাড়িটা দেখতে এসেছিলাম। সেখানেই তো নির্মলবাবুর সঙ্গে পরিচয়। উনি আপনার কথা বললেন—

বিমলেন্দু অস্ফুটস্বরে বলিলেন—কী আশ্চর্য যোগাযোগ! আমার সঙ্গে ট্রেনে নির্মলবাবুর আলাপ হওয়া, তোমার কাশী আসা—আবার তোমার সঙ্গে নির্মলবাবুর দেখা হওয়া—জানো, এইসব কারণে মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় ভগবান আছেন!

কাজল বলিল—কিন্তু আপনার সঙ্গে বাবার পরিচয় কীভাবে হয়েছিল তা তো বললেন না?

প্রশ্নটা শুনিয়া বিমলেন্দু কিছুক্ষণ কাজলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন—তোমার বাবার প্রথম উপন্যাসখানা যে আত্মজীবনীমূলক সেটা নিশ্চয় জানো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাতে লীলা বলে একজনের কথা আছে জানো?

কাজলের বুকের মধ্যে রক্ত চলকাইয়া উঠিল, সে বলিল—জানি।

—লীলা আমার দিদি।

কাজলের মাথার ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। লীলার ভাই বিমলেন্দু! তাই বটে, বাবার বইয়েও নাম বিমলেন্দুই আছে। লীলা! বাবার উপন্যাস পড়িয়া, ডায়েরি পড়িয়া কাজল বুঝিয়াছে লীলার সহিত তাহার বাবার কী গভীর সম্পর্ক ছিল। রক্তমাংসের মানব-মানবীর সাধারণ পারস্পরিক আকর্ষণ নয়, তাহা হইতে অনেক উচ্চস্তরের এক সম্পর্ক—বোঝা যায়, কিন্তু বোঝানো যায় না।—সেই লীলার ভাই ইনি!

কাজল অগ্রসর হইয়া বিমলেন্দুকে প্রণাম করিল।

হৃদয়াবেগ কিছুটা প্রশমিত হইলে বিমলেন্দু বলিলেন—অপূর্ববাবু বিয়ে করেছেন জানতাম, কারণ বিয়ের পর একবার আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এই বাড়িতেও উনি এসেছেন—তোমার মায়ের মৃত্যুর পর। কিন্তু তোমার কথা উনি আমাকে বলেন নি। তুমি কী করছো এখন?

—আমি এইবার এম.এ. দেব। ইংরিজিতে—

—বাঃ, খুব ভালো কথা। তারপর কী করবে কিছু ভেবেছো?

কাজল সসংকোচে জানাইল—এ বিষয়ে সে কোনও সিদ্ধান্ত নেয় নাই।

কিছুক্ষণ কথা বলিবার পর বিমলেন্দু বলিলেন—বোসো একমিনিট, তোমার জন্য একটু জলখাবারের কথা বলে আসি—

কাজল আপত্তি করিতে যাইতেছিল, বিমলেন্দু তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। মিনিট-দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—বাড়িতে যা রয়েছে তাই দিতে বললাম। এ

বাড়ি আমার মায়ের, বৃদ্ধা অবস্থায় মা মারা গিয়েছেন আজ মাস-দুই হল। আমি তখন বিলেতে, আমার ফিরে আসতে আসতে শ্রাদ্ধশান্তি সব চুকে গিয়েছিল। আমি হচ্ছি ডিজাইনিং আর্কিটেক্ট, বুঝলে? একটা কনট্রাকটের চাকরি নিয়ে বিলেত গিয়েছিলাম, তার মেয়াদ ফুরোতে এখনও বছর-দুই বাকি। সামনের মাসেই আমি আবার ফিরে যাচ্ছি লন্ডনে, এবার একেবারে চাকরি শেষ করে তবে ফিরব। এ বাড়ি ততদিন তালাবন্ধ থাকুক, পরে যাহোক ব্যবস্থা করা যাবে—

এইসময় জলখাবারের থালা হাতে ঘরে ঢুকিল আঠারো-উনিশ বৎসর বয়েসের একটি মেয়ে। ভদ্রতাবিরুদ্ধ হয় বলিয়া কাজল একবার তাকাইয়াই চোখ নামাইয়া লইল বটে, কিন্তু তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল আর একবার তাকাইয়া দেখে। মেয়েটি ভারি সুন্দরী, গাঢ় বেগুনী রঙের শাড়ি চাঁপাফুল গাত্রবর্ণের সঙ্গে মানাইয়াছেও ভালো।

বিমলেন্দু বলিলেন—খাবার টেবিলে রাখ্, তারপর একে প্রণাম কর—এ আমাদের পরিবারের খুব পুরোনো বন্ধুর ছেলে, আমাদের আপনার লোক।

মেয়েটি সলজ্জ ভঙ্গিতে আগাইয়া আসিয়া কাজলকে প্রণাম করিল। প্রণাম পাইবার অভ্যাস নাই, অভিজ্ঞতাটা এতই অভিনব যে বাধা দিবার আগেই ঘটিয়া গেল।

প্রণাম করিয়া উঠিবার সময় মেয়েটি চোখ নিচু কবিয়া ছিল, কাজল লক্ষ করিল মেয়েটির চোখের পাতা আশ্চর্যরকম লম্বা।

বিমলেন্দু বলিলেন—এ হচ্ছে তুলি, দিদির মেয়ে।

উদ্বেগ, অজানা কী এক আবেগে কাজলের গলাব কাছে গুটলি-গুটলি কী যেন আটকাইয়া যাইতে লাগিল। লীলার মেয়ে! ছোটবেলায় বাবার ডায়েরিতে ইহারই সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রসঙ্গে বাবার ইচ্ছার কথা সে পড়িয়াছে। না না, ও কথা মনে রাখা উচিত নয়। সে অনেকদিনের কথা, সে-সব কথা নিশ্চয় বাবা কাহাকেও বলে নাই, কেবল ডায়েরিতে লিখিয়াছিল মাত্র।

সাম্প্রতিক মানসিক দুর্যোগ এড়াইবার জন্য সে খাবারের প্লেটটা হাতে তুলিয়া যা হোক একটা কী হাতে লইয়া খাইতে শুরু করিল।

বিমলেন্দু বলিলেন—তুলি, তুই একটু অমিতাভর কাছে বোস। আমি লালুয়াকে কয়েকটা চিঠি পোস্ট করতে দিয়ে আসি, এরপর আবার ডাক ধরতে পারবে না—

বিমলেন্দু চলিয়া গেলেন। মেয়েটি দাঁড়াইয়া ছিল, কাজল বলিল—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না! আমার পরিচয়টা না দিয়েই অবশ্য আপনার মামা চলে গেলেন—

টেবিলের অপর দিকে একটা চেয়ারে বসিয়া তুলি বলিল—আমি মামার কাছে শুনেছি।

ইউনিভার্সিটিতে নিমন্ত্রণবাড়িতে কাজল সুন্দরী মেয়ে কম দেখে নাই, কিন্তু তুলির দিকে ভালো করিয়া তাকাইয়া কাজল অবাক হইয়া গেল। ভালো করিয়া দেখিতে বাধা নাই, তুলি চোখ নিচু করিয়া আছে। একমাথা ঘন চুল, যেন শিল্পীর আঁকা দুই ভ্রূ, পুরন্ত ঠোঁটের নিচে চিবুকের সুন্দর খাঁজ, তাছাড়া—নাঃ, এভাবে কোনও বিচার হয় না, আসলে মেয়েটির এমন একটা শ্রী আছে যাহা বুঝাইয়া বলা যায় না—বুঝিতে গেলে দেখিতে হয়। নিজের সমস্ত উপস্থিতির দ্বারা মেয়েটি অনন্য।

কাজল বলিল—মামার কাছে কী শুনেছেন? আমাদের সম্বন্ধে আগে জানতেন আপনি?

তুলি তাহার ডাগর শান্ত চোখ তুলিয়া বলিল—আমি—আপনার বাবাকে দেখেছি। তখন আমি খুব ছোট, এই বাড়িতে। ওঁর সব বই আমার অনেকবার করে পড়া—

তারপর আবার চোখ নামাইয়া বলিল—আমাকে 'আপনি' বলবেন না—

খাবারের শূন্য প্লেট নামাইয়া কাজল বলিল—বাবার কোন্ বইটা তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে?

—সব বই-ই ভালো লাগে। তবে সবচেয়ে ভালো লাগে ওঁর লেখা প্রথম বইখানা।

পরে একটু বিষণ্ন হাসিয়া বলিল—ওতে আমার মায়ের কথা আছে—

তুলির বিষণ্ণ হাসিটা কাজলের হৃদয়ের মর্মস্থানে আঘাত করিল। বেচারা! ও নিশ্চয় নিজের মায়ের শূন্যতাময়, ব্যর্থ জীবনের কথা জানে। সে বলিল—তুমি কী এইখানেই থাকো?

—হ্যাঁ। দিদিমা এই বাড়িতে থাকতেন, মা মারা যাবার পর দিদিমার কাছেই আমি মানুষ হয়েছি। দিদিমাও মারা গিয়েছেন আজ দু-মাস। এবার হয়তো কলকাতা চলে যাব—

—ভবানীপুরের বাড়িতে থাকবে?

তুলি অবাক হইয়া তাকাইল—ভবানীপুরের বাড়ির কথা আপনি জানেন?

—জানি। বাবার ডায়েরিতে পড়েছি। তোমাদের—তোমার মায়ের অনেক কথা আছে তাতে—

তুলি আগ্রহের সঙ্গে বলিল—মায়ের কথা! আমাকে সে ডায়েরি একবার পড়াবেন?

—বেশ তো। তুমি কলকাতায় গিয়ে তোমাদের ঠিকানা আমাকে জানিও, আমি তোমাকে পড়তে দিয়ে আসবো। আমার ঠিকানা তোমার মামার কাছে দিয়ে যাচ্ছি—

তুলি ঘাড় কাত করিয়া সম্মতি জানাইল, তারপর বলিল—ভবানীপুরের বাড়ি কিন্তু আর নেই, বিক্রি হয়ে গিয়েছে। বড়োমামার কথা জানেন কিনা, তাঁর নাম রমেন, তিনি নানারকম বদখেয়ালে সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলেছেন। কেবল বর্ধমানের বাড়িটা আছে, তাও হয়তো শিগগিরই দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে যাবে। ছোটমামা, এই মামা, তিনি কিছু নেন নি। পড়াশুনো করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। আপনার বাবার বইতে আমাদের কথা যেমন পড়েছেন, আমরা এখন কিন্তু আর তেমন নেই—এখন আমরা গরিব হয়ে গিয়েছি।

কাজল বলিল—আমাকে তুমি এসব কথা বলছো কেন তুলি? আমাদের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্কটা অন্যরকম, তোমরা গরিব কি বড়োলোক তাতে কিছু এসে যায় না।

পরে আলোচনার মোড় অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য বলিল—তুমি পড়াশুনো করো তো?

—ছোটবেলায় স্কুলে পড়েছি, বড় হবার পর বাড়িতে মাস্টারমশাই এসে পড়িয়ে যান। এখানে বাঙালি মেয়েদের পড়বার মতো তেমন ভালো ইস্কুল নেই কিনা। ইচ্ছে আছে এইবারে কলকাতায় কোথাও ভর্তি হয়ে ম্যাট্রিকটা দিয়ে দেব—

এইসময় বিমলেন্দু ফিরিয়া আসিলেন। —তোমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে দেখছি, চা খাবে?

কাজল জানাইল—এইসময়ে সে চা খায় না।

—তুমি আসায় আমি যে কত খুশি হয়েছি তা বলতে পারি না। দেখা যখন হল, এবার থেকে যোগাযোগ রাখবে, কেমন? তোমার ঠিকানাটা দাও দেখি—

কাজল নিজের ঠিকানা লিখিয়া দিয়া বিমলেন্দুকে বলিল—আপনার ঠিকানাটা?

—আমি কিছুদিনের মধ্যেই কাশী থেকে চলে যাচ্ছি, কলকাতায় কোথায় উঠব এখনও কিছু ঠিক হয়নি। মাসখানেকের মধ্যে চিঠি দিয়ে তোমাকে জানাব—

বিদায় দিতে আসিয়া ফটকের কাছে বিমলেন্দু বলিলেন—অনেক কথা তোমায় বলবার আছে, বাবাকে তুমি বেশিদিন পাও নি, তোমারই দুর্ভাগ্য। আর একটু বেশি বয়েস পর্যন্ত তাঁর সাহচর্য পেলে সেটা তোমার জীবনের অক্ষয় সৌভাগ্য হয়ে থাকত। অমিতাভ, আমি জোর গলায় বলছি—অমন মানুষ হয় না। সে সব কথা একদিন তোমাকে বলব—

—আপনি আর কদিন আছেন কাশীতে?

—দিন-পনেরো খুব বেশি হলে। তুমি?

—আমার তেমন কিছু ঠিক নেই, তবে হপ্তাখানেকের বেশি হয়তো থাকবো না—

বিমলেন্দু বলিলেন—সন্ধের দিকে আমি রোজই একবার দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে বেড়াতে যাই। ওখানে যদি ওইসময়ে কখনও আসো, তাহলে দেখা হতে পারে।

ধর্মশালায় ফিরিতে ফিরিতে কাজলের মনে হইল আকাশ-বাতাসের রঙ্ যেন বদলাইয়া

গিয়াছে। এক ধরনের ঘটনা আছে, যাহা ঘটিয়া গেলে জীবনের অর্থ সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়—কিছুই আর যেন পূর্বের মতো থাকে না। তুলির সহিত দেখা হওয়াটা ঠিক সেইরকমের ঘটনা। ডায়েরিতে বাবার গূঢ় ইচ্ছাটা পড়িয়া থাকিবার জন্যই হোক বা প্রথম যৌবনের আশীর্বাদপূত অলৌকিক বয়েসে সুন্দরী একটি মেয়ের সহিত পরিচয় ঘটিয়া যাইবার জন্যই হোক, তাহার ভিতরে এতদিনকার ঘুম ভাঙিয়া কে যেন জাগিয়া উঠিল। সবই ঠিক আছে, সে সেই পুরাতন অমিতাভই রহিয়াছে, তবু সে যেন ঠিক পুরাতন মানুষটা নহে।

রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া ঘুম আসিতেছিল না। ধরমদাস আর রামচরণ আজ নৌকায় করিয়া রামনগর গিয়াছিল। সেখানকার রাজবাড়ি দেখিতে যাইবার পথে এক সাধুর দর্শন পায়। সেই গল্প ধরমদাস উৎসাহের সহিত করিয়া চলিয়াছে। খুব ভারি সাধু, কেবল মুখের দিকে তাকাইয়া ভূত-ভবিষ্যৎ বলিয়া দিতে পারেন, হাত অবধি দেখিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। ধরমদাসের যে বর্তমানে সময়টা ভালো যাইতেছে না, আর রামচরণের ছোটবেলায় বসন্ত হইয়াছিল—এসব তো তাহারা গিয়া বসিবামাত্র বলিয়া দিলেন। অনেক ভাগ্যে এমন সাধুর দর্শন মেলে।

শুনিতে শুনিতে কাজল অন্যমনস্ক হইয়া গেল। তুলিকে তাহার এত ভালো লাগিল কেন? সুন্দরী বলিয়া? কিন্তু সুন্দরী মেয়ে তো সে অনেক দেখিয়াছে—অবশ্য তুলি সত্যই অদ্ভুত সুন্দরী, তাহার দেখা অনেকের অপেক্ষা বেশি, তবু বোধহয় কেবল বাহিরের সৌন্দর্য তাহাকে মুগ্ধ করে নাই। লীলার মেয়ের সহিত তাহার বিবাহ হইবার যে সম্ভাবনার কথা বাবা ডায়েরিতে প্রকাশ করিয়াছে সেই মধুর সম্ভাবনার ইঙ্গিত মনের জানালা দিয়া তাহার চেতনার গভীরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিল। আর একটা বড়ো কারণ—তুলির বর্তমান জীবনের অসহায়তা। লীলার হীরক রায়ের সঙ্গে গৃহত্যাগের ঘটনা কাজল জানে, তাহা লইয়া সমাজে বিশ্রী ঘোঁট হইয়াছিল তাহাও তাহার অজানা নাই। সত্যই তুলির বিবাহ হওয়া কঠিন। যতই সুন্দরী হোক, অমন মায়ের মেয়েকে কেহ গৃহবধূ করিয়া ঘরে তুলিয়া লইবে না। কিন্তু বাবার বই পড়িয়া মনে মনে সে লীলাকে দেবীর আসনে বসাইয়াছে। মনের দেবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত সেই মূর্তির গায়ে কোনো কলঙ্কের দাগ পড়িতে পাবে না। সমাজ যাহাই বলুক, লীলাকে বিচার করিবার দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত নাই, সে অধিকারও তাহার নাই।

অকস্মাৎ তাহার চমক ভাঙিল। নাঃ, মনে একটা গুরুতর পরিবর্তন আসিয়াছে বটে! এতক্ষণ ধরিয়া সে কেবলই তুলির কথা চিন্তা করিয়াছে, অথচ গতকাল এইসময়ে শুইয়া সে মায়ের কথা ভাবিতেছিল। জীবন এমনভাবেও বদলায়!

ধরমদাস এবং রামচরণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চারদিন পর কাজল দিল্লির ট্রেন ধরিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস তাহাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। মহাভারতের যুগ হইতে দিল্লি ভারতীয় সংস্কৃতি এবং প্রাণস্রোতের প্রধান কেন্দ্র, তাহা দেখা না হইলে দেশের ইতিহাস অজানা থাকিয়া যাইবে।

দিল্লি পৌঁছিয়া কাজল লাল দরওয়াজার কাছে একটা ভদ্র অথচ কম খরচের বাঙালি হোটেল খুঁজিয়া বাহির করিল। মালিকের নাম তিনকড়ি দাস, মধ্যবয়স্ক এবং অতীব বিনয়ী। দুই হাত ঘষিয়া তিনি বলিলেন—ছাত্র কিনা? বেড়াতে এসেছেন? দেখুন ঠিক ধরেছি! আপনার বয়েসী বাঙালি যাত্রী যাঁরা দিল্লি বেড়াতে আসেন তাঁরা অধিকাংশই আমার এখানে ওঠেন কিনা। তা যাই হোক, চাকর আপনার ঘর দেখিয়ে দিচ্ছে, স্নান-টান সেরে বিশ্রাম করে খেয়ে নিন, তারপর টানা একখানা ঘুম দিন। ওবেলা কাছাকাছি দু-একটা জায়গা ঘোরবার ব্যবস্থা করে দেব। কাল থেকে সত্যিকারের বেড়াবেন—

হোটেলের অপর একদল অতিথির সহিত তিনকড়িবাবু তাহার টাঙায় ঘুরিবার আয়োজন

করিয়া দিলেন। ব্যবস্থাটা বিশেষ মনঃপূত না হওয়া সত্ত্বেও কাজল মানিয়া লইল। ধরমদাস এবং রামচরণ বরং সঙ্গী হিসাবে ইহাদের অপেক্ষা ভালো ছিল, তাহারা অশিক্ষিত হইলেও সরল এবং উদার। এই বাঙালি পরিবারটির ক্রমাগত লম্বা-চওড়া কথায় আর চালবাজিতে কাজল অবিলম্বে বিরক্ত হইয়া উঠিল। কুতবের পাশে ইলাহি মিনার দেখিয়া এবং পরে পুরানা কিল্লার পাশে দাঁড়াইয়া দলের একজন বলিলেন—নাঃ, এই ভাঙাচোরা ইঁট-পাথরের স্তূপ দেখতে লোকে এত পয়সা খরচ করে বেড়াতে আসে কেন বুঝি না! হুমায়ুনের কবরটা তবু ভালো—

কাজল থাকিতে না পারিয়া বলিল—দেখুন, ঐতিহাসিক নগরী তো আর সবটা হীরে-মুক্তো দিয়ে গাঁথা হবে না, এর ইতিহাসটাই আসল। এখানে দাঁড়িয়ে আপনার পুরোনো দিনের কথা ভেবে অবাক লাগছে না?

লোকটি মৃদু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—কী জানি মশাই, আপনারা হলেন একালের লেখাপড়া জানা আধুনিক মতের ছেলে, আমরা চোখের ভালো লাগাটাকে অনেক দাম দিই—এককাঁড়ি টাকা খরচ করে ফ্যামিলি নিয়ে এলুম কী এই দেখতে? এর চেয়ে আমাদের কলকাতায় ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল কিংবা পরেশনাথের মন্দির খারাপ কী?

কাজল কথা বাড়াইল না। এ ধরনের কল্পনাশক্তির লেশহীন মানুষ সে আবও কয়েকজন দেখিয়াছে। ইহাদের বুঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা। বাল্যসঙ্গী চনুর কথা মনে পড়ে। জ্যোৎস্নারাত্রিতে তাহার কোনও বিচিত্র অনুভূতি হয় কিনা জিজ্ঞাসা করাতে সে অবাক হইয়া না-বুঝিবার দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল। সেই প্রথম শিশুবয়েসের অপরিণত বুদ্ধিতেও কাজল পৃথিবীব অধিকাংশ মানুষের চিন্তাধারার সহিত তাহার পার্থক্য আবছা আন্দাজ কবিয়াছিল। বড়ো হইয়া উঠিবাব সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিতে পারিয়াছিল তাহার জীবন খুব সুখের হইবে না। মানুষ কেবলমাত্র খাইয়া-পবিয়া বাঁচে না, তাহার মনের সঙ্গীব প্রয়োজন হয়। আব নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কাজল বুঝিয়াছে—তেমন সঙ্গী পৃথিবীতে খুবই কম।

হুমায়ুনের সমাধি দেখিতে গিয়া তাহার খুবই ভালো লাগিল। তখন বিকাল হইয়া আসিয়াছে। নির্জন নিজামউদ্দিন দিনাবসানের শান্ত ছায়ায় ঝিমাইতেছে। একজন বৃদ্ধ মুসলমান গাইড তাহাদের সবকিছু ঘুরিয়া দেখাইল। হুমায়ুনের পাথরে বাঁধানো কবর দেখাইয়া বৃদ্ধটি বলিল—এটা কিন্তু নকল কবর বাবু, আসল কবর রয়েছে এর নিচে, মাটির তলায়, যাবেন?

সঙ্গীরা কেহ রাজি হইল না। অজানা জায়গা, তাহার উপর নিজামউদ্দিন এমনিতেই নির্জন স্থান, অপরিচিত মুসলমান বৃদ্ধের সহিত মাটির নিচে তিনশত বৎসব পূর্বে মরিয়া ভূত হইয়া যাওয়া মোগল সম্রাটের সমাধি দেখিতে যাইবার উৎসাহ নাই কাহারও। কাজল একাই চলিল। আসল সমাধিতে পৌঁছিতে হইলে স্মৃতিসৌধের ভিত্তির নিচে একটি সুড়ঙ্গ দিয়া অনেকটা পথ যাইতে হয়। সুড়ঙ্গের মধ্যে ঘোর অন্ধকার, পথপ্রদর্শক বৃদ্ধটি একটি ছোট দুই-পয়সা দামের মোমবাতি জ্বালাইয়া হাতে লইয়াছে। পায়ের নিচে জমি উঁচুনিচু, সর্বত্র সমান নহে, সাবধানে না চলিলে হোঁচট খাইবার সম্ভাবনা। অনেকগুলি বাঁক পার হইয়া বৃদ্ধ তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। শেষে একটি অন্ধকার, বাদুড়ের ডানার শব্দে পূর্ণ চতুষ্কোণ ছোট্ট ঘরে আসিয়া যাত্রা শেষ হইল। অনাড়ম্বর একটি কবর দেখাইয়া বৃদ্ধ বলিল—যহাঁ বাদশা হুমায়ুন শোয়ে হুয়ে হেঁ—

কাজল যুক্তকরে নমস্কার করিল। কে জানে হুমায়ুন প্রকৃতপক্ষে মানুষ হিসাবে কেমন ছিলেন, প্রণামের যোগ্য ছিলেন কিনা। তাহার প্রণাম প্রাচীনত্বের প্রতি, একজন স্বাধীন সম্রাটের প্রতি। বৃদ্ধ মুসলমান কাজলের প্রণাম লক্ষ করিয়া খুশি হইয়াছিল, উৎসাহের প্রাবল্যে সে ফিরিবার পথে উর্দুতে মোগল আমলের কত ইতিহাস শোনাইতে লাগিল। কাজল তাহার কিছু বুঝিল, কিছু বুঝিল না।

দলের সকলে বাহির হইবার মূল দরজার কাছে অপেক্ষা করিতেছিল। কাজলকে অক্ষতদেহে সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইতে দেখিয়া তাহারা যেন ভারি অবাক হইল। টাঙায় উঠিয়া দলের চালাক

সদস্যটি বলিল—ধন্য আপনার সাহস মশায়! কী বলে একটা অচেনা মুসলমানের সঙ্গে ওই অন্ধকূপে ঢুকলেন? জানেন, ওরা আগে থেকে ওইসব জায়গায় গুণ্ডা বসিয়ে রাখে, তারপর নিরীহ যাত্রীকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে তার টাকাকড়ি কেড়ে নেয়—দিতে আপত্তি করলে ছুরি মারে!

কাজল হাসিয়া বলিল—মুসলমান মানেই খারাপ লোক নয়, যেমন হিন্দুরা সবাই দেবতুল্য নয়। তাছাড়া আমার কাছে ছিলই বা কত? মেরে ওদের লাভ কী? বরং ভয় করলেন বলে ভালো একটা জিনিস দেখা থেকে বাদ পড়লেন—

ভদ্রলোকের মুখ দেখিয়া মনে হইল কাজলের কথা তাঁহার মনে ধরে নাই। তিনি বলিলেন—তা হোক মশাই, তবু ওদের বিশ্বাস নেই—

কাজল চুপ করিয়া রহিল।

হোটেলে ঢুকিতেই তিনকড়ি দাস বলিলেন—এই যে সব ফিরেছেন দেখছি। তা বেড়ানো কেমন হল বলুন? ভালো লাগছে দিল্লি শহর?

কাজল বলিল—ভাল লাগছে বইকি। ছোটবেলা থেকে ইতিহাসের বইতে যা পড়েছি সে-সব চোখের সামনে দেখলে রীতিমতো রোমাঞ্চ হয়—

—আর অমরবাবু? আপনার?

অমরবাবু অর্থাৎ কাজলের সঙ্গী সেই ভদ্রলোক, বিবক্তমুখে চুপ কবিয়া রহিলেন। কাজল বলিল—ওঁর বোধহয় বিশেষ ভালো লাগছে না। কুতবের চাইতে নাকি ভিকটোরিয়া মেমোরিযাল ভালো—

অমরবাবু রাগিয়া বলিলেন —কথা ঘোরাবেন না, কুতবের কথা আমি মোটেই বলিনি, ভাঙা ইঁটের গড়টার কথা বলেছি—

তিনকড়িবাবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কাজলের দিকে তাকাইতে সে বলিল—পুরানা কিল্লা ওঁর পছন্দ হয়নি।

খরিদ্দার লক্ষ্মী এবং খরিদ্দার সবসময়ই সঠিক—তাহার সহিত তর্ক করিতে নাই, ইহাই ব্যবসার মূলমন্ত্র। কাজেই তিনকড়িবাবু অচিরাৎ প্রসঙ্গ বদলাইয়া বলিলেন—যান, আপনাবা ফ্রেশ হয়ে নিন, আজ শনিবার—প্রতি শনিবাব আমাদের হোটেলে স্পেশাল ফিস্ট হয়। আজ পোলাও হচ্ছে, সঙ্গে এলাহাবাদের বড়ো বড়ো পাবদা মাছের তেলঝাল, কষা মাংস, মাছের পুর দিয়ে পটলের দোলমা। শেষপাতে রাবড়ি—কেমন?

অমরবাবু সুরুৎ করিয়া শব্দ করিযা সপরিবারে দোতলায় নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। কাজল বলিল—এতসব আয়োজন করেছেন, প্রতি শনিবাবেই হয নাকি?

—হয়, তবে এতটা নয়। মাংস আর পোলাওটা করবাব চেষ্টা করি মাঝে মাঝে, যখন অনেক বাঙালি অতিথি থাকে তখন একটু ভালো রান্নাবান্না হয়। বসুন, দুটো কথা বলা যাক—সিগারেট চলে?

তিনকড়ি দাস কাজলকে একটা কাঁচি সিগারেট দিয়া নিজেও একটা ধরাইলেন।

—বসুন ভালো করে। আজ থেকে বাইশ বছর আগে পেটেব ধান্দায় ঘুরতে ঘুরতে দিল্লি এসে পৌঁছোই, বুঝলেন? হুগলী জেলার তারকেশ্বরের কাছে এক গ্রামে আমার আদি বাড়ি। বাপ-মা মারা গেলেন ছোটবেলাতেই, জমিদার মহাজন এসে ঘরবাড়ি, জমি আর গরু ক্রোক করে নিয়ে গেল দেনার দায়ে। কে জানে সত্যি দেনা ছিল কিনা, আমি তখন ছোট, কে আর দেখতে গিয়েছে? কোনও আত্মীয়স্বজন আমাকে রাখলেন না মশাই, বুঝলেন? কে যেচে পরের হ্যাঁপা ঘাড়ে নেয়? চাকরের কাজ করে, জুতো পালিশ করে, কুলিগিরি করে পেট চালিয়েছি ক'বছর। তারপর ভাসতে ভাসতে এই দিল্লি।

—তারপর এই হোটেল দিলেন কী করে? মূলধন কোথায় পেলেন?

—সেও এক কাহিনী। এখানে ছিল একটা মিঠাইয়ের দোকান, এদেশি মেঠাই—বুঁদের লাড্ডু, ক্ষীরের বরফি এইসব। মালিকের নাম লোচন সিং। সে আমাকে ছোট কারিগরের কাজ দিল। আসল কারিগর যাকে সবাই ওস্তাদ বলে ডাকত সে জিনিসটা বানিয়ে দিত—আর আমি গোল করে পাকিয়ে দিতাম বা সাইজ মাফিক কেটে দিতাম। লোচন সিং-এর বৌ-ছেলেপুলে ছিল না, সব মরে গিয়েছিল, দোকানের পেছনের একটা ঘরে তার সঙ্গে আমি থাকতাম। কিছু মাইনে পেতাম আর তার কাজকর্ম্ম করে দেবার জন্য খেতে পেতাম। দুবছর কাজ করার পর এই অঞ্চলে চেচকের মহামারী হয়। চেচক, বুঝলেন তো, বসন্ত। অনেকদিন দেশছাড়া, আমার কথার ভেতর আজকাল প্রায়ই হিন্দি ঢুকে যায়। একদিন লোচন সিং দোকান বন্ধ করে ঘরে এসে বলল—তবিয়ত ভালো লাগছে না, রাত্রে কিছু খাব না, তুই নিজের মতো অল্প রান্না কর—

দু-দিন বাদে লোচন সিংয়ের গায়ে বসন্তের গুটি দেখা দিল। জলবসন্ত নয়—একেবারে আসল বসন্ত। ভয়ানক ছোঁয়াচে আর মারাত্মক জিনিস। খবর রটে যাওয়া মাত্র দোকানের অন্য দুজন কর্মচারী আর বড়ো কারিগর পালিয়ে গেল বাকি মাইনের মায়া না করেই। আমিও একবার ভাবলাম—যাই পালিয়ে। তারপর লোকটার দিকে তাকিয়ে মায়া হল। বেচারা! কেউ দেখবার নেই ওর—আমি সেবা না করলে বেঘোরে মারা যাবে। আমার বাবা খুব সেবাপরায়ণ লোক ছিলেন, ছোটবেলায় তাঁকে রাত জেগে টাইফয়েড বা কলেরার রোগীকে যত্ন করতে দেখেছি, তাঁর ছেলে হয়ে অসুখের ভয়ে অন্নদাতাকে ফেলে পালিয়ে যাব? নাঃ, থেকেই গেলাম।

কী ভয়ানক অবস্থাই হল লোচন সিংয়ের! সমস্ত গায়ে বড়ো বড়ো গুটি গলে একসঙ্গে মিশে দগদগে ঘা হয়ে গেল। মুখের মধ্যেও ঘা, জল পর্যন্ত খেতে পারে না। চোখ করমচার মতো লাল। সারাদিন বিকারের ঘোরে পাগলের মতো চিৎকার করছে। গা দিয়ে রস গড়াচ্ছে দরদর করে। শেষে সমস্ত শরীরের মাংস ফেটে ফেটে যেতে লাগল। আসল বসন্তের রোগী অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন সাংঘাতিক দশা হতে দেখিনি কখনও। এর আগেও না, পরেও না। আমার তখন একটা নেশাগ্রস্ত অবস্থা। মনে ঘেন্না নেই, ভয় নেই, আপ্রাণ সেবা করছি মানুষটার। তুলো দিয়ে গড়িয়ে পড়া রস মুছিয়ে দিই, কবিরাজী তেলে ভেজানো ন্যাকড়ার পটি দিয়ে দিই ঘায়ের ওপরে—যন্ত্রণা আর কমে না।

একদিন বিকেলে লোচন সিং আমাকে ডেকে বলল—তিনু বেটা, পরমাতমার ডাক এসেছে, এবার আমাকে চলে যেতে হবে। তার আগে একটা কাজ করে যেতে চাই। তুমি গিয়ে মহল্লা থেকে কয়েকজন ভদ্রলোককে আমার নাম করে ডেকে আনো—

—কেন মালিক, লোক দিয়ে কী হবে?

—সে দেখতেই পাবে। যাও, দেরি কোরো না—

কেউ কী আসতে চায়? অনেক ঘুরে লোচন সিংয়ের যিনি চিকিৎসা করছিলেন সেই হেকিম সাহেব আর গঙ্গানাথ তেওয়ারী নামে একজন উকিলবাবুকে ধরে নিয়ে এলাম। তাঁরা ঘরে ঢুকলেন না, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। লোচন সিং বিছানা থেকেই যতদূর সম্ভব গলা উঠিয়ে বলল—হেকিম সাহেব, ভকিলবাবু, ভগবান আমাকে ডেকেছেন—এবার আমি চলে যাব। আমার বালবাচ্চা কেউ নেই, চাকরবাকরও আমাকে ফেলে ভয়ে পালিয়েছে। কেবল এই বাঙালি লেড়কা আমাকে নিজের ছেলের চাইতেও বেশি সেবা করেছে। আমার এই দোকান আমি একে দিয়ে যেতে চাই। লেখালেখি করবার আর সময় নেই, আপনারা মহল্লার ইমানদার আদমি, আপনারা সাক্ষী রইলেন—ও যেন সম্পত্তির দখল নিতে পারে।

ওঁরা দু-জন রোগীকে আশ্বস্ত করে বিদায় নিলেন। সেদিনই মাঝরাত্তিরের একটু পরে লোচন সিং মারা গেল।

দু-একজন পাজী লোক মিঠাইয়ের দোকানের মালিকানা পাবার পথে বাধা সৃষ্টি করবার চেষ্টা

করেছিল বটে, কিন্তু হেকিম সাহেবের এক ধমকে সবাই ভয় পেয়ে থেমে গেল। পথের ভিখিরি আমি, সত্যি সত্যি একটা দোকানের মালিক হয়ে বসলাম।

কাজল মুগ্ধ হইয়া তিনকড়ি দাসের গল্প শুনিতেছিল। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া যে লোক ক্রমাগত নিজের আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সে মানুষ যতই সাধারণ হউক না কেন, তাহার সহিত নেপোলিয়ন কিংবা কলম্বাসের বিশেষ পার্থক্য নাই। পার্থক্য কেবল সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং আর্থিক অবস্থার। কাজের উৎসাহ এবং সাফল্যের আনন্দ উভয়ের ক্ষেত্রেই এক।

সে প্রশ্ন করিল—মিঠাইয়ের দোকান হোটেল হল কী করে?

—প্রথম দু'তিন বছর মিঠাইয়ের ব্যবসাই চলছিল। মাঝে মাঝে বাঙালি যাত্রী এসে অন্য কোথাও থাকবার সুবিধা না পেলে আমার দোকানে থাকতে চাইত। থাকতে দিতাম—যাবার সময় তারা ঘরের ভাড়া হিসেবে কিছু কিছু টাকা দিয়ে যেত। এইভাবে একটা খ্যাতি রটে যাওয়াতে এত বেশি অতিথি আসতে লাগল যে আস্তে আস্তে মিঠাইয়ের দোকান তুলে দিয়ে পুরোপুরি হোটেলের ব্যবসাতে নেমে পড়লাম। তা চলছে মন্দ নয়—

রাত্রের খাওয়া গুরুতর রকমের হইল। কাজল ভালো জিনিস খাইতে ভালোবাসে বটে, কিন্তু বেশি পরিমাণে খাইতে পারে না। তাহার পাশে বসিয়া অমরবাবু প্রাণের আনন্দে ভোজ খাইলেন। নিজের আহার শেষ করিয়া কাজল বহুক্ষণ বসিয়া অবাক বিস্ময়ে তাঁহার খাওয়া দেখিল। খাইতে খাইতে অমরবাবু অকারণ কৈফিয়তের সুরে বলিলেন—খেতে বসে লজ্জা করা কোনও কাজের কথা নয়। তাছাড়া এ তো হোটেল, পয়সা দিচ্ছি—খাওয়া বুঝে নিচ্ছি। কুটুমবাড়ির নেমন্তন্ন তো নয় যে লজ্জা করে খাব—

অমরবাবু যে প্রকৃতই কিছুমাত্র লজ্জা করিলেন না তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল। রাত্রে কিছুক্ষণ না পড়িলে কাজলের ঘুম আসে না। আজও সে হ্যাজলিটের 'টেবল্ টক্'খানা হাতে লইয়া বিছানায় শুইল। সারাদিন ঘুরিয়া শরীব ক্লান্ত ছিল, কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাহা সে নিজেই টের পায় নাই। অনেক রাত্রিতে দরজায় ধাক্কাব শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিল। বিছানা হইতে উঠিতে উঠিতে সে বলিল—কে?

নারীকণ্ঠে উত্তর হইল—একবাব দরজাটা খুলুন না?

কাজল প্রথমটা বিস্মিত হইল, একটু ভয়ও হইল। এখানে সে বেড়াইতে আসিযাছে, কেহ তাহাকে চেনে না। কোন মহিলা এত রাত্রে তাহার দরজায় ধাক্কাচ্ছে—শেষে একটা গোলমালে না জডাইয়া পড়ে!

আবার দরজায় করাঘাত—দয়া করে তাড়াতাড়ি খুলুন, বড়ো বিপদ। সাহস করিয়া দরজা খুলিতেই কাজল অবাক হইয়া গেল। সামনে দাঁড়াইয়া অমরবাবুর স্ত্রী। কাজলকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন—একবার আমাদের ঘরে আসবেন? আপনার দাদা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—

একটা শার্ট গলাইতে গলাইতে কাজল বলিল—ভয় নেই, চলুন যাচ্ছি। কী হয়েছে অমরবাবুর?

অশ্রুরুদ্ধ গলায় মহিলাটি বলিলেন—কী জানি! শুয়ে বহুক্ষণ বকছিলেন, কিছুতেই ঘুমোন না। এই অল্প আগে থেকে বলছেন—দম আটকে আসছে, বুকে ব্যথা—কী হবে ভাই?

—কোনো ভয় নেই, চলুন যাই দেখি—

ঘরে ঢুকিয়া কাজল দেখিল খাটের উপর অমরবাবু শুইয়া বেজায় ছটফট করিতেছেন, মুখ বেদনায় বিকৃত। কপালে এবং সারা গায়ে সামান্য ঘাম। সে জিজ্ঞাসা করিল—কী হয়েছে? কী হচ্ছে আপনার?

উত্তরে অমরবাবু হাত দিয়া বুক দেখাইলেন।

কাজল মনে মনে ভয় পাইল। বুকে ব্যথা, নিঃশ্বাসের কষ্ট এবং গায়ে ঘাম লক্ষণগুলি ভালো নহে, হৃদ্‌রোগের ইঙ্গিত দেয়। তাহার বাবারও ঠিক এমনি হইয়াছিল। এই বিদেশে লোকটার হঠাৎ কিছু হইলে ইহার স্ত্রী-পুত্র এবং দলের অন্যান্যরা মহা বিপদে পড়িবে।

সে অমরবাবুর স্ত্রীকে বলিল—দিদি, আপনি বরং ওঁর বুকে হাত দিয়ে মালিশ করে দিন, আর মাথায় হাওয়া করুন। আমি তিনকড়িবাবুকে বলি একজন ভালো ডাক্তার ডেকে আনতে—

হোটেলের কারবার করিলেও তিনকড়ি দাস আদ্যন্ত ব্যবসায়ী নহেন। ব্যাপার শুনিয়া অত রাত্রে তিনি নিজেই বাহির হইলেন ডাক্তার ডাকিতে। কাজল সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল, তিনি বারণ করিলেন।

আধঘণ্টাখানেক বাদে তিনকড়ি ডাক্তার লইয়া ফিরিলেন। সাহেবী পোশাক পরা লম্বা মানুষটি, পেটা স্বাস্থ্য, ফরসা রঙ্‌। মুখে একটা স্বাভাবিক সহৃদয়তার ছাপ রহিয়াছে। মিনিট দুই রোগীকে পরীক্ষা করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—ইনি রাত্তিরের খাবার কী খেয়েছিলেন?

চিকিৎসকের কাছে সত্য গোপন করিয়া লাভ নাই, কাজল ডাক্তারকে অমরবাবুর নৈশাহারের আনুপূর্বিক বর্ণনা দিল। শুনিয়া ডাক্তাব ব্যাগ হইতে ঔষধ বাহির করিতে করিতে বলিলেন—টারটার এমেটিক দিচ্ছি, এখুনি খুব বমি হতে শুরু করবে, মেয়েদের ভয় পেতে বারণ করুন—

কথাবার্তা উর্দু এবং ইংরেজিতে মিশাইয়া হইতেছিল, ডাক্তারের বক্তব্য বুঝিতে না পারিয়া অমরবাবুর স্ত্রী কাজলের দিকে তাকাইলেন। কাজল ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়া ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—আপনাকে বাবা বলে ডাকছি, আমি আপনার মেয়ে। আমার স্বামী বাঁচবেন তো?

ডাক্তার বলিলেন—ভয় নেই। বেশি পরিমাণে রিচ্‌ ফুড্‌ খাওয়ায় অ্যাসিড আর গ্যাস ফর্ম করে এমনটা হয়েছে। বমি হয়ে গেলে অনেকটা রিলিফ পাবেন। নিন্‌ এটা খাইয়ে দিন—

টারটার এমেটিকের প্রভাবে অমরবাবু অবিলম্বে ঘর ভাসাইয়া বমি করিতে শুরু করিলেন। বমি করিবার আবেগে দম আটকাইয়া আসে আর কী!

অমরবাবু প্রাণপণে ডাক্তারের হাত আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—ডাক্তারবাবু, আমার শরীরের মধ্যে কেমন করছে, আমি আর বাঁচবো না—

ডাক্তার ততোধিক জোরে তাঁহার হাত চাপিয়া বলিলেন—ডোন্ট ওরি, আপনার কিচ্ছু হয়নি, বমি করতে থাকুন—

সব প্রলয়েরই সমাপ্তি আছে, কিছুক্ষণ ধরিয়া অনর্গল বমি করিবার পর অমরবাবু নিশ্চুপ হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার ব্যাগ হইতে আর একটা কী ঔষধ তাঁহাকে খাওয়াইয়া কাজলকে বলিলেন—ইনি এখন ঘুমোবেন। আর ভয় নেই, আমি সকালে আবার এসে দেখে যাব—

অমরবাবুর স্ত্রী বলিলেন—বাবা, আপনার ভিজিট—

—ও সকালে এসে একেবারে নেব—

ডাক্তার বিদায় লইলে অমরবাবুর স্ত্রী বলিলেন—ভাই, আপনি ছিলেন বলে আজ খুব রক্ষে হল। আমি গেরস্তঘরের বৌ, কোনোদিন বিদেশে বেরুই নি, তারপর এসব জায়গার ভাষা মোটে বুঝিনে। আপনি না থাকলে—

কাজল বলিল—ওসব কথা বলবেন না। আপনাকে দিদি বলে ডেকেছি, ভাই তো বোনের জন্য এটুকু করবেই—

—দেখুন তো দেখি কী কাণ্ড! বরাবরই ওইরকম লোভী মানুষ, খেতে ভালোবাসেন। ভালো রান্নাবান্না হলে আর খেয়াল থাকে না। অম্বল, পেটের অসুখ আর বায়ুতে কষ্ট পান—কত বলি! বয়েস হচ্ছে, এবার একটু সামলে চল—তা কে কার কথা শোনে! তবে এত বাড়াবাড়ি কখনও হয়নি।

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ ডাক্তার নিজেই কথামত আসিয়া হাজির। অমরবাবু কিছুক্ষণ হইল উঠিয়া সমবেত পরিজনের তিরস্কার সহ্য করিতেছেন। দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন—ফাইন! এই তো রোগী উঠে বসেছে—কী মশায়, কাল রাত্তিরে সবাইকে অমন ভয় লাগিয়ে দিয়েছিলেন কেন? আর কখনও ঠেসে রিচ্ খাবার খাবেন না! খাবার অন্যের, শরীর তো আপনার নিজের না কী? অমরবাবুর স্ত্রী কিছু টাকা কাজলের হাতে গুঁজিয়া দিয়াছিলেন, সে তাহা দিতে গেলে ডাক্তার অমরবাবুর স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিলেন—না, আপনি আমাকে বাবা বলে ডেকেছেন—এমনিতে এই মহল্লায় আমি অনেক রোজগার করি, জামাইয়ের চিকিৎসা করে আর টাকা নেব না।

অমরবাবু চিঁ-চিঁ করিয়া বলিলেন—আপনি আমার প্রাণদাতা, আপনার নামটা তো জানা হল না—আবার কখনও দিল্লি এলে দেখা করবো—

ডাক্তার বলিলেন—আমার নাম মহম্মদ ইলিয়াস আজম।

ডাক্তার বিদায় লইলে কাজল মৃদু হাসিয়া অমরবাবুকে বলিল—কী দাদা, তাহলে মুসলমান মাত্রেই খাবাপ লোক নয়, কী বলেন?

অমরবাবু লজ্জিত মুখে বললেন—আমার ভুল হয়েছিল ভাই। এক জায়গায় আটকে থাকা মানুষকে বড়ো ছোট করে দেয়। এইজন্যেই তো দেশভ্রমণ প্রয়োজন।

নবম পরিচ্ছেদ

কাজল মনসাপোতা পৌঁছিল সন্ধ্যাবেলা।

বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরিতে ঘুরিতে একটি ভ্রাম্যমাণ দলেব সঙ্গে সে অজন্তায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। গুহাভ্যন্তবে অনতিউজ্জ্বল আলোকে মায়ের কোলে শিশু বুদ্ধের চিত্র দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহার হারানো মায়ের জন্য মন কেমন করিয়া উঠিল। জগতে মাতৃশক্তি একটা বড়ো শক্তি। যে মাকে সে কখনও দেখে নাই, অথচ দশমাস ধরিয়া যাহার গর্ভে বাস কবিয়া, যাহার শরীব হইতে পুষ্টি সংগ্রহ করিয়া তাহার দেহ পুষ্ট হইয়াছে, তাহাব কথা মনে পড়িবামাত্র কাজলের সমস্ত নাড়ীতে টান ধরিল। মায়ের সহিত দেখা কবিবার আব কোনো উপায় নাই, কিন্তু মায়ের পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত মনসাপোতায় গিয়া হাজিব হইতে পারিলে যেন মাকে সে অনেকখানি ফিরিয়া পাইবে।

অপরাহ্ণের রৌদ্র বাঁকাভাবে আসিয়া গুহার দেওয়ালে পড়িয়াছে, চাবিদিকে স্তব্ধতা এবং নিবিড় প্রশান্তি। কোথায় লুকাইয়া বসিয়া কী একটা পাখি ক্রমাগত ডাকিতেছে। পাখির ডাকে সমস্ত পবিবেশ যেন করুণ উদাস হইয়া উঠিল। মানুষ সকলেই সকলের আত্মীয়, তবু মায়ের সঙ্গে শিশুর যে গভীর আত্মীয়তা তাহার সমান্তরাল কোনো সম্পর্ক আর পৃথিবীতে নাই। শৈশব হইতেই একটা বঞ্চনার অনুভূতি হৃদয়ের গভীরতম তলদেশ হইতে উঠিয়া আসিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে কষ্ট দেয়। কী একটা জিনিস যেন তাহার পাওয়া হইল না, কী এক অমৃত আস্বাদন করিতে বাকি রহিয়া গেল। বড়ো হইয়া উঠিবার পর হইতে সে অপর্ণার জন্য তাহার মন-খারাপের কথা হৈমন্তীকে কখনও বলে নাই—বলিলে মা ভাবিতে পারে এত ভালোবাসা সত্ত্বেও ছেলে আপন হয় নাই। কিন্তু মনের ভিতরে গোপন রাখা এক জিনিস, আর ভুলিয়া যাওয়া অপর জিনিস।

তাহার ভয় ছিল সে ঠিক ঠিক পথ চিনিয়া যাইতে পারিবে কিনা, সেই কোন্ ছোটবেলায় বাবার সহিত একবার আসিয়াছিল। স্টেশন হইতে সে একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিল বটে, কিন্তু গ্রামে ঢুকিবার মুখে সেখানা ছাড়িয়া দিল—এই গ্রামে সে হাঁটিয়া ঢুকিবে। জেলে-পাড়া ছাড়াইয়া পথের বাঁকে একটা অশ্বথ গাছ। ছোটবেলায় গাছটাকে সে এইটুকু দেখিয়া গিয়াছে, গোড়ায় কতগুলি

ইঁট সাজাইয়া বেদিমতো করা ছিল। মেয়েরা স্নান করিয়া এক ঘটি করিয়া জল ঢালিয়া দিয়া যাইত। এখন গাছটা দোতলা সমান বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, গোড়াটা গোল করিয়া বাঁধানো। আর কিছুটা হাঁটিতেই দূর হইতে একটা ঝাঁকড়া গাছের মাথা নজরে আসিল, কাহাদের উঠানে যেন গাছটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। তারপরেই তাহার বুকের মধ্যে রক্ত ঢেউ খেলিয়া উঠিল। তাহাদের বাড়ি! তাহার মায়ের হাতে পোঁতা স্বর্ণচাঁপার গাছটা!

স্বপ্নের মধ্য দিয়া হাঁটিবার মতো কাজল নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বাড়ির উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে পতনোন্মুখ বাড়িটা বিস্মৃত ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের মতো দেখাইতেছে। চালে খড় প্রায় নাই, দাওয়ায় ছোট-বড়ো ইঁদুর অথবা সাপের গর্ত, সমস্ত উঠান জুড়িয়া আগাছার জঙ্গল। চাঁপাগাছে এখন ফুল নাই, এখন চাঁপাফুল ফুটিবার সময় নয়, কেবল সান্ধ্য-বাতাস বাধিয়া গাছের পাতায় ঝিরঝির শব্দ হইতেছে। গাছটা কী নিজের ভাষায় তাহাকে কিছু বলিতে চায়?

প্রথমেই একটা আলো প্রয়োজন। স্টেশন হইতে কয়েকটা মোমবাতি কিনিয়া আনা উচিত ছিল। আসলে সে জীবনে কখনও সাংসারিক বিষয়ে মাথা ঘামায় নাই, কোথাও গেলে সেখানে শয্যা, আলো, আহার এবং অন্যান্য গার্হস্থ্য সুবিধা অপেক্ষা করিয়া থাকিবে ইহাতেই সে অভ্যস্ত। আলোর ব্যবস্থা যে আবার নিজেকে সঙ্গে করিয়া আনিতে হইবে ইহা তাহার মাথায় আদৌ খেলে নাই। বস্তুত এখন মনে পড়িল, খাওয়ার ব্যবস্থাও সে কিছু করিয়া আসে নাই বটে। অবশ্য একরাত্রি না খাইলে তেমন কিছু অসুবিধা নাই, কিন্তু আলো নিতান্ত প্রয়োজন।

পাশে তেলিদের বাড়িতে সবে সন্ধ্যার প্রদীপ দেখানো হইতেছে। একজন বৃদ্ধা উঠানের তুলসীতলায় ছোট একটি পিতলের প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া উপুড় হইয়া প্রণাম করিতেছিল, প্রণামের শেষে সোজা হইয়া আধ-অন্ধকারে কাজলকে দেখিয়া অবাক হইয়া বলিল—কে? কে ওখানে?

কাজল আন্দাজ করিল ইনিই কুণ্ডুবাড়ির গৃহিণী, ছোটবেলায় যখন দেখিয়াছিল তখন আরও মোটাসোটা ছিলেন, বয়েস বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে চেহারা ভয়ানকভাবে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বয়স তো কম হইল না, তাহার বাবাকে ইনি ছোট দেখিযাছেন, সে বলিল—আমি—আমি কাজল—

—কাজল? কে কাজল?

—আমি—এই পাশের বাড়ির ছেলে। আমাকে ছোটবেলায় একবার আপনি দেখেছেন। আমার বাবার নাম অপূর্ব—অপু। মায়ের নাম অপর্ণা—

তেলি-গিন্নি অবাক হইয়া আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল—কে? বামুনঠাকরুনের নাতি? অপুর ছেলে? তুমি হঠাৎ কোথা থেকে? এতদিন ছিলে কোথায়—এসো এসো, দাওয়ায় উঠে এসো—

কাজল আধুনিক মনোবৃত্তির ছেলে, সে বৃদ্ধার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে গেল। বৃদ্ধা পিছনে সরিয়া গিয়া বলিলেন—না না, ছিঃ! তোমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের পুরোহিত বংশ। তোমার ঠাকুমা আমার চেয়ে বয়েসে ছোট ছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে চিরদিন পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে এসেছি। আহা, তোমার মা-ঠাকুমা বড়োই অল্প বয়েসে—

তেলিগিন্নি তাহাকে যথেষ্ট আদর করিলেন, গ্রামে আর ভদ্রলোক নাই সে বিষয়ে বিস্তর দুঃখ করিলেন, কিছু ধানী জমি দান করিলে কাজল তাহার বর্তমান মাকে লইয়া আবার মনসাপোতায় আসিয়া বাস করিতে রাজি আছে কিনা সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার বাবা যখন ছোটবেলায় এই গ্রামে বাস করিত, সেই সময় ও বর্তমান সময়ে যে অনেক পার্থক্য তাহা বলিয়া সে এই সরল ও স্নেহময়ী বৃদ্ধার মনে আঘাত দিতে চাহিল না। বিশেষ করিয়া সে জানে একদিন তেলি-গিন্নির দয়ার দানের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাদের সংসার চলিত, আজ একটু সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছিয়া তাঁহাকে অসম্মান করা যায় না। সে বলিল—আমি মায়ের সঙ্গে কথা বলে দেখব, দেখি ওঁর কী মত—

—তুমি কী এখন কদিন এখানে থাকবে? বাড়িঘর যে সারানো দরকার তা তো দেখতেই পাচ্ছো! তোমার বাবাই মারা যাবার আগে মেরামতের জন্য আমাকে শেষ যা টাকা পাঠিয়েছিল—তারপর তোমরা তো আর এদিক মাড়ালেই না—ও, তোমাকে বলতে ভুল হয়ে গিয়েছে, আজকাল তোমাদের বাড়ি দেখতে মাঝে মাঝে শহর থেকে লোক আসে, জানো? অপু নাকি বড়ো হয়ে কী সব বই লিখেছে, সেই বই পড়ে তারা আসে। আমাকে কত কথা জিজ্ঞেস করে। তা তোমার বাবা কী বই লিখত? ঠাকুর-দেবতার কথা?

কাজল হাসিয়া বলিল—না ঠাকুমা, এমনি গল্পের বই। লোক আসে বাড়ি দেখতে আজকাল?

—তবে আর বলছি কী? সেদিনকার ছেলে অপু, এই তো সেদিন বইদপ্তর বগলে করে ইস্কুলে পড়তে যেত, সে নাকি আবার বই লিখে নাম করেছে! প্রায় ছুটির দিনেই লোকজন আসে—

কাজল একটা হ্যারিকেন চাহিয়া লইয়া বাড়িতে ফিরিল। তেলিদের বাড়িতে জেলেপাড়ার একটি মেয়ে কাজ করে, সে গৃহিণীব নির্দেশে এরই মধ্যে আসিয়া দাওয়া ও ঘরঝাঁট দিয়া নড়বড়ে তক্তাপোশটায় চাদর-বালিশ পাতিয়া দিয়া গিয়াছে। কাজলকে তেলি-গিন্নি বলিয়া দিয়াছে, যে কয়দিন থাকিবে তাহাদের বাড়ি দুইবেলা খাইতে। কাজেই আপাতত করিবার কিছু নাই। কাজল সুটকেস হইতে একখানি বই বাহির করিয়া হ্যারিকেনেব আলোয় বালিশে ভর দিয়া পড়িতে লাগিল।

তাহার একান্ত আপন মানুষেরা এই ঘরখানায় বাস করিত। রৌদ্র উঠিবার পর ঘাসের আগায় শিশিরবিন্দুর মতো তাহারা মহাকালেব নির্মম নির্দেশে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বাড়ির প্রত্যেকটি কোণে তাহাদের মমতাব স্মৃতি মাখানো আছে। মায়ের কথাই বেশি করিয়া মনে আসে। ঠাকুমার সহিত নিশ্চিন্দিপুর ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কিন্তু কেন যেন মনসাপোতার সহিত কেবলমাত্র মায়েব স্মৃতি মাখামাখি হইযা আছে। এই ঘরে মা থাকিত, দরিদ্র ঘরের জিনিসপত্র সযত্নে গুছাইয়া রাখিত, কুলুঙ্গিতে রাখা আয়নার সামনে সাজিত, সিঁথিতে সিঁদুর দিত, বাবা কবে কলিকাতা হইতে আসিবে সেজন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিযা থাকিত। ঘরের চারদেযালে আবদ্ধ পরিবেশে যেন সময় আর অগ্রসর হয় নাই, তেইশ বৎসব পূর্বের সেই দিনগুলিতেই আটকাইয়া গিয়াছে।

আচ্ছা, মা যদি হঠাৎ ফিরিয়া আসে? হয়তো আসলে মা বাঁচিয়া আছে, বাংলা উপন্যাসের গল্পের মতো কোনো রহস্যময় কারণবশত আত্মগোপন করিয়া আছে মাত্র, একদিন হঠাৎ স্বেচ্ছানির্বাসন হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে। কিছুদিন আগে সে ওয়েলসের 'টাইম মেশিন' পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। অমন একটি সময়-ভ্রমণের যন্ত্র পাইলে সে প্রথমেই তাহার মাকে দেখিতে যাইত।

কিন্তু তাহা যে হইবার নহে, প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে কে যাইতে পারে?

বই রাখিয়া কাজল দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। শুক্লপক্ষেব চতুর্থীর চাঁদ এর মধ্যেই পশ্চিমদিকে নারিকেল গাছগুলির মাথায় নামিয়া পড়িয়াছে। উঠানের আগাছার জঙ্গলে ঝিঁ ঝিঁ ডাকিতেছে—যেমনটি আজ হইতে তেইশ বৎসর পূর্বেও ডাকিত।

বাড়িটা সারাইতে হইবে। নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িটা নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। আর মৌপাহাড়ির বাড়িটাও ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। আজ তেলি-গিন্নির কথায় সে বুঝিতে পারিযাছে বিশ্বসাহিত্যে তাহার বাবার নাম স্থায়ী হইয়া থাকিবে। আজ আরও কয়জন আসিতেছে, শীঘ্রই এমন দিন আসিবে যখন দর্শনার্থীর জন্য তাহার বাবার স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলিতে গ্রন্থাগার, অতিথিশালা এবং মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। নিজের বাবার প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি এবং ভক্তিবশত সে যে বাবার সাহিত্যকে অহেতুক গৌরবান্বিত করিতেছে এমন নহে, সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে এবং একনিষ্ঠ পাঠক হিসাবে সে নির্মোহ বিচার করিয়া বুঝিয়াছে অপূর্বকুমার রায়ের রচনা সততা, ঐকান্তিকতা ও মানবিকতার অনন্য প্রভায় উদ্ভাসিত। যুগে যুগে ইহার পাঠকের অভাব ঘটিবে না—এ সাহিত্য বাঁচিতে আসিয়াছে।

তিনদিন পর বাড়ি আসিবার সময় কাজল উঠানের চাঁপা গাছটা হইতে কয়েকটি পাতা সংগ্রহ করিয়া সুটকেসে ভরিয়া লইয়া আসিল।

কলেজ স্ট্রীটে একটি পত্রিকার স্টলে দাঁড়াইয়া কাজল মাসিকপত্রের পাতা উলটাইতেছিল। এই পত্রিকাতে সে কিছুদিন আগে একটি গল্প পাঠাইয়াছিল। এত বড়ো কাগজে তাহার গল্প ছাপিবে কিনা কে জানে! ডাকে পাঠানো গল্প তো সম্পাদকেরা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলিয়া দিয়া থাকেন বলিয়া শোনা গিয়াছে। বিজ্ঞাপনের পাতাগুলির পর সূচিপত্রে আসিয়া হঠাৎ তাহার চোখ এক জায়গায় আটকাইয়া গেল। অমিতাভ রায় নামে একজন লেখকের একটা গল্প ছাপা হইয়াছে। বাঃ, তাহার নামে আরও সাহিত্য-যশোপ্রার্থী লোক আছে তাহা হইলে! কিন্তু—কিন্তু গল্পের নামও এক হয় কী করিয়া? কম্পিতহস্তে সে গল্পটা খুঁজিয়া বাহির করিল।

তাহারই গল্প। এই ডাল-ভাত-তরকারির সাধারণ পৃথিবীতে এমন ঘটনা সম্ভব হইল কী করিয়া? পকেটে কয়েকটা টাকা ছিল, তাহা দিয়া সে চার কপি পত্রিকা কিনিয়া লইল।

মানুষ মাঝে মাঝে এমন অনেক কাণ্ড করে যাহা সে আগের মুহূর্তেও ভাবে নাই, এবং পরেও যাহার কোনও সম্যক ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রথম শ্রেণির একটি পত্রিকায় তাহার গল্প বাহির হইয়াছে, এক্ষেত্রে প্রথমেই গল্পটা সে তাহার বন্ধুদের লইয়া দেখাইবে ইহাই সমীচীন। কিন্তু কিছুমাত্র না ভাবিয়া সে কলুটোলা পোস্ট অফিসে গিয়া বাহিরে যে পাবলিক রাইটার বসিয়া থাকে তাহার নিকট হইতে একটি কপি ভালো করিয়া র‍্যাপ করাইয়া লইল, পরে উপরে অপালার নাম লিখিয়া জিনিসটা পার্সেল করিয়া দিল।

গল্পটা লইয়া পাঠকমহলে বেশ আলোচনা হইল। একদল ভালো বলিল, একদল বলিল—তেমন কিছু হয় নাই। কিন্তু পরিচিত এমন কিছু মানুষ, যাহাদের মতামতের উপর কাজল নির্ভর করে, তাহারা বলিল—রচনায় কিছু কিছু দুর্বলতা থাকিলেও গল্পের বিষয়বস্তু এবং ট্রিটমেন্ট একেবারে নতুন ধরনের। লেখক হিসাবে প্রশংসা পাইবার ব্যাপারটা কাজলের জীবনে নূতন, সে লক্ষ করিল খ্যাতির বেশ নেশা আছে।

দিন দশেক বাদে সে অপালার নিকট হইতে একটি চিঠি পাইল। অপালা লিখিয়াছে—আপনি পাঠাবার আগেই গল্পটা আমি পড়ে ফেলেছি, কারণ ওই পত্রিকার আমি গ্রাহক। তবুও আমাকে মনে করেছেন বুঝে খুব ভালো লাগল। বড়ো কাগজে নিজের প্রথম রচনা প্রকাশ হবার আনন্দ কেমন, তা আমি কোনোদিন জানতে পারব না, কারণ আমি লিখি না—কিন্তু আনন্দের তীব্রতাটার সামান্য আন্দাজ করতে পারি। কলকাতায় এ আনন্দ ভাগ করে নেবার মতো বন্ধুর আপনার অভাব নেই, তা সত্ত্বেও এক কপি কাগজ আমাকে পাঠিয়েছেন।

নিজের সৃষ্টির জন্য প্রশংসা পাইবার একটা নেশা আছে, কাজল তাহা বেশ অনুভব করিল। দম্ভ ও অসন্তুষ্টি না আসিলে এই নেশাই প্রেরণার কাজ করে, পরবর্তী সার্থক সৃষ্টির পথে স্রষ্টাকে অগ্রসর করিয়া দেয়। কাজল আবার লিখিতে বসিয়া গেল।

বিখ্যাত মানুষের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করাটা অন্যের নিকট যতখানি সুখের বিষয় বলিয়া মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে ততটা নহে। বস্তুবাদী দর্শনের প্রভাবে আচ্ছন্ন বর্তমান যুগে অপূর্বকুমার রায়ের বিশ্বমুখী মানবিকতা এবং গভীর প্রকৃতিপ্রেম পাঠকসমাজকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সময় কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা প্রকট হইতেছে। অপুর রচনার প্রয়োজনীয়তাও বাড়িতেছে। কাজল যেখানেই যায় সবাই তাহার বাবার নামোল্লেখ করা মাত্র চিনিতে পারে, কাজলকে খাতির করিয়া দুই-একটা মিষ্টি কথা বলে। এ বড়ো কম গৌরবের কথা নহে। কিন্তু সব প্রদীপের নিচেই ছায়ান্ধকার থাকে। এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। গৌরবজনক পিতৃপরিচয়টা ভালো, কিন্তু জগতের তাবৎ মানুষের আকাঙ্ক্ষাপূরণের দায় যখন বিখ্যাত মানুষের পুত্রের ঘাড়ে আসিয়া

পড়ে, তখন সে বেচারির নিজের জীবনটায় ক্রমাগত বড়ো বড়ো গোলযোগ বাধিতে থাকে। কাজলের জীবনে এইবার সেই পর্যায় শুরু হইল।

একদিন বিখ্যাত একটি বাংলা সংবাদপত্রের চিঠিপত্রের স্তম্ভে অপুর স্মৃতিরক্ষার প্রসঙ্গে একটি পত্র প্রকাশিত হইল। পত্রলেখক অপুর জনৈক ভক্ত। তিনি জানিতে চাহিয়াছেন আধুনিক বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক অল্প বয়েসে মারা গিয়াছেন বলিয়া কি সবাই তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে? তিনি সম্প্রতি নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম দেখিতে গিয়াছিলেন, সেখানে লেখকের আদি বাসভবন প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। মৌপাহাড়িতে লেখকের মৃত্যু হয়—সেখানেও স্মৃতিরক্ষার কোনও ব্যবস্থা নাই। অপূর্ব রায়ের সাহিত্য চিরজীবী হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন, অবিলম্বে সকলে কাজে না লাগিলে ভবিষ্যৎ যুগের মানুষের নিকট গালি খাইতে হইবে।

এই চিঠি বাহির হইবার পর একই পত্রিকায় আরও কয়েকটি পত্র প্রকাশিত হইল। তাহাদের লেখক আলাদা হইলেও মর্ম এক।

মনসাপোতায় ঘুরিয়া আসিয়া কাজলেরও মনে হইয়াছিল বাড়িটার মেরামত প্রয়োজন। যাহারা তাহার বাবাকে ভালোবাসে, তাহাদের এরূপ দাবি করিবার অধিকার আছে বটে। হৈমন্তীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে তেলি-গৃহিণী এবং রানুদিকে চিঠিসহ কিছু টাকা পাঠাইয়া দিল। ঠিক করিল, মৌপাহাড়িতে নিজে গিয়া বাড়িঘর সারাইয়া আসিবে।

রানুদিকে লিখিল বাবার কেনা সাম্প্রতিক বাড়িটাকে মেরামত করিতে। পুরানো ভিটা যেমন আছে এখন থাকুক।

পরীক্ষার একেবারে মুখে মুখে কাজল রানুদি এবং কুণ্ডু-গৃহিণীর চিঠি পাইল। বাড়ির কাজ হইয়া গিয়াছে। কাজল যেন গিয়া দেখিয়া আসে।

রানুদিদি নিজেই তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

ভালো করিয়া কান পাতিলে যেন হারানো মানুষগুলির কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া যাইবে।

বিকাল হইয়া আসিয়াছে। অপরাহ্নের বিদায়ী সুর লাগিয়াছে দিবসবীণার তন্ত্রীতে। কোথাও কোনো শব্দ নাই, কেবল একটা নাম-না-জানা পাখি কিচ্‌মিচ্ করিয়া পাতার আড়ালে লুকাইয়া ডাকিতেছে। অকস্মাৎ বিচিত্র এক অনুভূতিতে কাজলের গা শিহরিয়া উঠিল। সময় অদ্ভুত জিনিস। মানুষের যা কিছু একান্ত প্রিয়, একান্ত আপন, সবই মহাকালের স্রোতে কেমন অনিবার্যভাবে বিস্মৃতিব মোহনাব দিকে বহিয়া যায়। আজ যাহা নিতান্ত বাস্তব, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ হাসিকান্না লইয়া যে বৃহৎ সংসারটা—আগামীকাল তাহা তাৎপর্যহীন ইতিহাসে পরিণত হয়। যদি না তাহার বাবার মতো কেহ একটা দাগ কাটিয়া যায়, তাহা হইলে কেহ তাহাকে মনে রাখে না। এই যে আজ পৈতৃক ভিটায় দাঁড়াইয়া তাহার পবিত্র অনুভূতি, রানুদিদির ভালোবাসা—হাজার বৎসর পরে কে মনে রাখিবে? চলিয়া তো যাইতেই হইবে, তবু ইহসর্বস্ব মানুষ অর্থ খ্যাতি প্রতিপত্তির জন্য কত লালায়িত হয়। কাজলের মহাভারতের শ্লোক মনে পড়িল—অহন্যহনি ভূতানি...

বেলা একেবারেই পড়িয়া আসিয়াছে। তাহারা দুইজন বাড়ির দিকে ফিরিল।

এইবার নিশ্চিন্দিপুর ভ্রমণে কাজলের এমন একটা অভিজ্ঞতা হইল, যাহা আগে কখনোই হয় নাই। বস্তুত অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে আঘাত পাইয়া তাহার মন হঠাৎ খুব দমিয়া গেল। এখন সে অন্যত্র থাকে বটে, কিন্তু এই গ্রামের মাটির সহিত তাহার অন্তরের নিগূঢ় যোগাযোগ আছে, এখানকার মানুষকে সে নিতান্ত আপন বলিয়া মনে করে। এইবার চলিয়া আসিবার পূর্বে সতু তাহাকে ডাকিয়া বলিল—তুমি কি আজই চলে যাচ্ছো নাকি?

—হ্যাঁ সতুকাকা। সামনে আমার পরীক্ষা, পড়া আছে। নইলে আরও দু-একটা দিন থাকতে পারলে ভালো হত—

—হুঁ, তা আবার আসবে কবে?

—পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই একবার ঘুরে যাব। চাবি রানুপিসির কাছে রইল।

—চাবির কথা হচ্ছে না, তোমাকে একটা দরকারি কথা বলি শোনো, অপুর বইয়ের তো বাজারে খুব নাম, আজকাল তোমাদের ভিটে দেখতে বহু লোক আসে। কোনো একটা ছুটির দিন এলে দেখবে বাড়ির সামনে মেলা বসে গিয়েছে। আবার শুনছি মহকুমা শহরের ইস্কুলের ছেলেরা এক বছর তোমাদের ভিটেয় অপুর জন্মদিন পালন করবে। তা তোমার কর্তব্য এখন এখানে একটা পাকাপাকি রকমের কিছু ব্যবস্থা করা। চাবি তো দিয়ে যাচ্ছো, তার হ্যাপা সামলাবে কে? রোজ নিত্যিদিন লোক এসে যদি বাড়ি দেখতে চায়, আমি তো কাজকর্ম ফেলে দৌড়তে পারব না? তার কী ব্যবস্থা করে যাচ্ছো?

কথাগুলি শুনিতে কিঞ্চিৎ কটু হইলেও ন্যায়সঙ্গত বটে। কাজল গ্রামের মুখুজ্যেবাড়ি হইতে ঈশানীবালা নামে এক বৃদ্ধাকে খুঁজিয়া বাহির করিল। তাঁহার স্বামী পরেশনাথ কলিকাতায় চাকরি করিতেন, বছর দশেক হইল গত হইয়াছেন। জমিজমা বিষয়সম্পত্তি কিছুই নাই, চলাচলতির ভয়ানক কষ্ট। মাসিক ত্রিশ টাকার বিনিময়ে তিনি অপুর নবনির্মিত বাড়িতে থাকিয়া দেখাশুনা করিতে রাজি হইলেন। তাঁহার নিজের বাড়িও জীর্ণপ্রায়, বৃষ্টি হইলে ঘরের সর্বত্র হুহু করিয়া জল পড়ে। দেওয়ালেরও যা অবস্থা, বড়ো রকমের একটা ঝড় হইলেই ধসিয়া পড়িবে। এমতাবস্থায় ঈশানীবালার রাজি না হইবার কথা নহে। কাজল কিছুটা নিশ্চিন্ত হইল, পিতৃপুরুষের ভিটায় অন্তত সন্ধ্যাবাতি পড়িবে।

রওনা হইয়া আসিবার সময়ে কাজল ব্যাগ হাতে একবার তাহাদের বাড়িটা দেখিযা আসিতে গেল। সুঁড়িপথের বাঁক ফিরিবার পূর্বেই শুনিল উঠানে দাঁড়াইয়া কাহারা কথা বলিতেছে। পথের মোড় ঘুরিয়া দেখিল তাহাদের বাড়ির দাওয়ায় তিন-চারজন লোক বসিয়া রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন গ্রামেরই মানুষ, কাজল চেনে, কিন্তু নাম জানে না। তাহাবা চলিয়া যাইবাব পবে নিশ্চিন্দিপুরে অনেক নতুন লোক আসিয়া বসবাস কবিয়াছে, সকলের সঙ্গে তাহাব পরিচয় হয় নাই।

গ্রামের মানুষটি অন্য তিনজন ভদ্রলোকের দিকে তাকাইয়া কাজলকে দেখাইয়া বলিলেন—এই ইনিই অপূর্ববাবুব ছেলে—

আগন্তুক ভদ্রলোক তিনজন যেন একটু কৌতূহলেব সহিত কাজলের দিকে তাকাইলেন। কাজল বলিল—নমস্কার।

প্রতিনমস্কাব করিয়া তাহাদেব মধ্যে একজন বলিলেন—আপনিই অপূর্বকুমার রায়ের ছেলে? আসুন, উঠে এসে এইখানটায় বসুন—

কাজলের মনে মনে হাসি পাইল, কাহাব বাড়িতে কে আমন্ত্রণ জানাইতেছে! পরমুহূর্তেই যেন কাজলের অন্তরের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—আমরা কিন্তু এখানে অতিথি নই। সেজন্যই আপনাকে ডেকে বসতে বললাম। অপূর্ববাবু শুধু আপনার বাবা নন, তিনি সমস্ত দেশের মানুষের সম্পত্তি। তা এখানে তার স্মৃতিরক্ষার কোনও ব্যবস্থা নেই?

কাজল সবিনয়ে জানাইল—চেষ্টা চলিতেছে, তবে কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

আগন্তুক বলিলেন—কিছু মনে করবেন না, এ বিষয়ে কিন্তু লেখকের ফ্যামিলি হিসেবে আপনাদের আর একটু উদ্যোগী হওয়া উচিত। মানুষ অনেক আশা নিয়ে এখানে আসে।

গ্রামের অচেনা ভদ্রলোক বলিলেন—আমিও তাই বলি। আপনার উচিত শহরের বাস ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে থাকা—

কাজল অবাক হইয়া বলিল—তা কি সম্ভব? আমার পড়াশুনো আছে তো—

আগন্তুকদের একজন বলিলেন—আপনি কী পড়েন?

—আমি এইবার এম.এ. দেব।

—তাহলে তো প্রায় শেষ করে এনেছেন। তারপরে এখানে থাকতে বাধা কী?

কাজল বলিল—পড়া শেষ হলেই তো সবকিছু শেষ হয় না। বরং সেখান থেকেই জীবনের শুরু। গ্রামে থেকে আমার কাজকর্ম—

—আপনার বাবার তো আটকায় নি। এ গ্রামের মানুষ হয়েও তিনি বড়ো লেখক হয়েছেন।

—আমার বাবার জীবনী বোধহয় আপনারা ঠিক জানেন না। খুব ছোটবেলায় তিনি এ গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তারপর সারাজীবন কেটেছে কলকাতায়, কাশীতে, মধ্যপ্রদেশের গভীর জঙ্গলে—আরও কত জায়গায়। গ্রামে আর কোনোদিনই ফিরে আসতে পারেন নি। ভ্রমণ না করে নিশ্চিন্দিপুরে থেকে গেলে তিনি কী লেখক হতে পারতেন?

গ্রামের মানুষটি ঈষৎ রাগতস্বরে বলিল—তাহলে এই গ্রামের প্রতি আপনার যে একটা কর্তব্য এবং দায়িত্ব আছে সেটা আপনি অস্বীকার করতে চান?

আবও প্রায় আধঘণ্টা কাজল তাহাদের চাবজনকে বোঝাইবার চেষ্টা করিল—সে পলায়নপর উদাসীন নহে। মধ্যবিত্ত সংসারেব বিভিন্ন গ্রাস হইতে বাঁচাইয়া এই বাড়িটা নতুন কবিয়া বানানো হইয়াছে। এরপর মনসাপোতার এবং মৌপাহাড়ির বাড়িটাও ঠিক করিতে হইবে। সে একমাত্র ছেলে, কত দিকে একসঙ্গে তাহার পক্ষে দৌড়ানো সম্ভব?

লোকগুলি বিশেষ বুঝিল বলিয়া মনে হইল না। তাহাবা কাজলেব প্রতি কথাব উত্তবে নানান সম্ভব-অসম্ভব যুক্তি দেখাইতে লাগিল। গ্রামেব ভদ্রলোকটি তো মনে হইল কাজলের উপব কোনো অজ্ঞাত কাবণে ভয়ানক চটিয়া বহিয়াছেন। এইটাই কাজলেব মনে বেশি করিয়া লাগিল। তাহার নিজের গ্রামের মানুষ কিনা তাহাকে ভুল বুঝিযা তিরস্কার করিতেছে! তাহাদেব স্বপ্নের নিশ্চিন্দিপুরের মানুষ! তাহার বাবার স্মৃতিরক্ষার প্রসঙ্গে তাহার দায়িত্বেব কথা সে ভালো করিয়াই জানে, এবং সে তাহা অস্বীকারও করিতেছে না। কিন্তু তাহার নিজেরও তো একটা জীবন আছে। সে বাবার মতো লেখক হইতে চায়, পৃথিবীটা ঘুরিয়া দেখিতে চায়। সবচেয়ে বড়ো কথা, নিজের মতো করিয়া বাঁচিতে চায়। অপূর্বকুমার রায় যেমন তাহার একাব বাবা নহে, সমস্ত দেশবাসীর গর্বের স্থল, তাহার স্মৃতিরক্ষার বিষয়েও তো দেশবাসীর মনোযোগী হওয়া উচিত।

দশম পরিচ্ছেদ

এম.এ. পরীক্ষা হইয়া গেল। পরীক্ষা দিয়া কাজল বুঝিতে পারিল সে পাশ করিবে বটে, কিন্তু বিশেষ চমকপ্রদ ফল হইবে না। তেমন ফল করিতে গেলে যে পদ্ধতি অনুযায়ী সাধনা কবা উচিত এবং যতখানি সময় দেওয়া প্রয়োজন, তাহার কোনোটাই কাজলের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাহাতে দুঃখ নাই, জীবনে চলার পথেব দুই ধারে যে সৌন্দর্য এবং বিস্ময় ছড়ানো রহিযাছে তাহাকে অনুভব করা এবং স্বীয় অস্তিত্বের কারণ সন্ধান—এই দুইটিই মানুষেব প্রধান কাজ। সেগুলি সুচারুভাবে সম্পন্ন করিতে পারিলেই জীবন অনেকখানি সার্থক।

আপাতত কী করা যায়? পরীক্ষা শেষ হইবার উল্লাসে প্রথম কয়েকদিন সে খুব বেড়াইল, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিল, বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছু পড়াশুনাও কবিল। ইহার মধ্যে একমাত্র পড়াশুনা ছাড়া অন্য প্রসঙ্গে দিন-দশেকের মধ্যেই সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ ভালো জিনিস, কিন্তু কাঁহাতক অর্থহীন আড্ডা দেওয়া সম্ভব?

একদিন প্রভাতের সঙ্গে সারা দুপুর গল্প করিবার পর কাজল কলেজ স্ট্রীটে তাহার বাবার প্রকাশকদের কাছে গেল। দুই মালিকের নামে দোকানের নাম—বসু ও গুহ পাবলিশার্স। দুই বাল্যবন্ধু মিলিয়া ব্যবসা চালান। বাঙালির কোনোপ্রকার যৌথ উদ্যোগ সচরাচর বেশিদিন স্থায়ী হয় না। অংশীদারকে ছাড়াইয়া নিজের ব্যক্তিত্ব জাহির করিবার ব্যগ্রতায় এবং নানাবিধ ছোটবড়ো স্বার্থের

সংঘাতে অচিরেই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এই দুই বন্ধু ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙালি জাতির আবহমান ঐতিহ্যকে মিথ্যা প্রমাণ করিয়া বহুদিন পাশাপাশি অনড় বসিয়া আছেন। কলেজ-জীবন হইতেই কাজল সপ্তাহে অন্তত একদিন এঁদের দোকানে গল্প শুনিবার লোভে গিয়া হাজির হয়। দুপুর হইতেই বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত মানুষেরা আড্ডার নেশায় আসিয়া জমিতে শুরু করেন। মুড়ি, তেলেভাজা এবং চায়ের সদাব্রত খোলাই আছে। খবরের কাগজে মুড়ি ঢালিয়া হাতের ঠোঙা হইতে গরম বেগুনি তুলিয়া রাত আটটা অবধি গল্প চলিতেছে। এই আড্ডায় ছোটবড়ো ভেদাভেদ নাই। এতগুলি বিখ্যাত লোকের সামনে প্রথম দিন কাজল সংকুচিত হইয়া একপাশে একটু সরিয়া বসিয়া ইঁহাদের কথা শুনিতেছিল। একজন তাহা লক্ষ করিয়া বলিলেন—কী হে, তুমি মুড়ি নিচ্ছ না যে? তেলেভাজা খাবে না?

কাজল লজ্জিত স্বরে বলিল—আজ্ঞে আমি—মানে—

—লজ্জার কিছু নেই, সাহিত্যের আড্ডায় অমন করে একপাশে সরে থাকলে কি চলে? নাও, মুড়ি তোল—

আর গল্পই বা কত রকমের! সেকালের কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া ভূতের গল্প, বিশ্বসাহিত্যের বিশ্লেষণ, নেপোলিয়নের জীবনী, পাঁচমিশেলি খোশগল্প—তাহার তালিকা করাই কঠিন। বসিয়া থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার কাজ হইয়া যায়।

বসু এবং গুহ দুইজনেই খ্যাতনামা সাহিত্যিক বটে। প্রখ্যাত সাময়িকপত্রগুলির যে কোনো সংখ্যা খুলিলে তাঁহাদের রচনা চোখে পড়িবেই। বোধহয় স্বত্বাধিকারীদ্বয় নিজেবা শিল্পী হওযার জন্য এই সংস্থায় ব্যবসার শুষ্ক বৈষয়িক আবহাওয়াটা নাই। বিজনেস উইথ প্লেজার যাহাকে বলে—ইহা তাই।

রাস্তার উপরে দোকান। পাশেই একটি ছোট দরজা, সেখান দিয়া ঢুকিলে সরু ইঁটবাধানো গলির শেষে একটি মাঝারি ঘর। এইটিই প্রকাশনের কার্যালয়। দরজার সামনাসামনি ঘরের অপরদিকে একখানি সবুজ গদিমোড়া আরামকেদারা, কেদারার মাথার কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের অয়েল পেন্টিং। বসু ও গুহ পাবলিশার্সের একজন লেখক, যিনি শিল্পীও বটে, তিনি আঁকিয়া উপহার দিয়াছেন। আরামকেদারাটি কাহার দখলে থাকিবে তাহা লইয়া প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা চলে। বসু মহাশয় আগে পৌঁছিলে তিনি হাত-পা ছড়াইয়া সেটিতে বসিয়া পড়েন, দেবিতে আগত অপর বন্ধু পাশের হাতলওয়ালা চেয়ারে বসিয়া সতর্কভাবে সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকেন। সামান্য কাজে বাহির হইতে দুই মিনিটের জন্য ঘুরিয়া আসিয়া বসু মহাশয় দেখেন সিংহাসন খালি রাখিলে সাধারণত যাহা হয় তাহা হইয়াছে—সেটি বেদখল হইয়াছে। এইবার প্রশান্তমুখে তাঁহার অপেক্ষা করিবার পালা। সামনেই একটি সোফা রহিয়াছে, অতিথিরা তাহাতে বসেন। অফিসের কাজের জন্য কয়েকটি চেয়ার-টেবিল আছে। আড্ডাধারীদের সংখ্যাধিক্য ঘটিলে সেগুলিও দখল হইয়া যায়।

আড্ডাঘরে ঢুকিয়া কাজল দেখিল আজ এখনও সাহিত্যিক সমাগম আরম্ভ হয় নাই। প্রৌঢ় দ্বিজেন্দ্রকুমার গুহ আরামকেদারায় হেলান দিয়া আপনমনে কী ভাবিতেছেন, কাজলকে দেখিয়াই তিনি হঠাৎ চমকাইয়া সোজা হইয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার কেদারায় হেলান দিলেন।

সামনের সোফায় বসিতে বসিতে কাজল বলিল—কী হল কাকাবাবু, আমাকে দেখে অমন চমকে উঠলেন যে?

গুহ মহাশয় প্রথমে উত্তর দিলেন না। তারপর বলিলেন—তোমার চেহারাটা হয়েছে অবিকল তোমার বাবার মতন। হঠাৎ মনে হয়েছিল যেন অপূর্ববাবু ঢুকছেন। খেয়াল ছিল না মাঝখানে এতগুলো বছর কেটে গিয়েছে—সে-সব সুখের দিন আর নেই—

বাবার কথা মনে পড়িয়া কাজলেরও মন ভারি হইয়া উঠিল। পৃথিবীতে কত লোক কত বেশি

বয়েস পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে, তাহার বাবা আর অন্তত দশ-বারোটা বছর বেশি বাঁচিলে কাহার কী ক্ষতি হইত?

গুহ মহাশয় বলিলেন—তোমার দুর্ভাগ্য, বাবাকে তুমি বেশিদিন পেলে না। আমি তোমাকে জোর গলায় বলছি, অমন মানুষ হয় না। সৎ, নির্লোভ, সবরকম আসক্তিহীন পুরুষ। বৈদিক যুগের ঋষিদের দেখিনি, কিন্তু বর্তমান যুগে জন্মালে হয়তো তাঁরা এইরকমই হতেন। মনে মনে আমি নিজেকে অপূর্ববাবুর শিষ্য বলে মনে করি। জীবনের অনেক গভীর শিক্ষা আমি তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। এখনই কী হয়েছে, এমন একটা দিন আসবে দেখো যেদিন লোকে তাঁর ছবি টাঙিয়ে পুজো করবে।

এইসময় একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—এই যে দ্বিজেনবাবু, ভালো আছেন তো? আমার সে অনুবাদগুলো কই? আজ পাব তো?

গুহ মহাশয় টেবিলের টানা হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন—একটা বাদে সবগুলো আছে। নিন—

—একটা বাদ? সর্বনাশ! কালই প্রেসে দেব যে! বাকি কপি কবে পাওয়া যাবে?

দ্বিজেনবাবু বলিলেন—যাকে দিয়ে করাবো তার হয়েছে জ্বর। আচ্ছা দেখি কী করা যায়—

—একটু দেখুন দয়া করে, নইলে বড্ড মুশকিলে পড়ে যাব।

ভদ্রলোক বিদায় লইলে গুহ মহাশয় বলিলেন—উনি বইপাড়ারই একজন নতুন প্রকাশক। সারা পৃথিবীর কিছু গল্প বেছে অনুবাদ করিয়ে 'বিশ্বসাহিত্যে সেরা গল্প' নাম দিয়ে একটা সংকলন প্রকাশ করতে চান। নতুন ব্যবসায় এসেছেন, কাউকে তেমন চেনেন না। তাই গল্পগুলো অনুবাদ করিয়ে দেবার ভার দিয়েছেন আমাকে। শেষ গল্পটার জন্য কাজ ঠেকে থাকছে, দু-একদিনের মধ্যে না দিতে পারলে প্রেস দাঁড়িয়ে যাবে—

কথা থামাইয়া গুহ মহাশয় কাজলের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকাইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন—তুমি তো ইংরেজির ছাত্র, কিছুদিন আগে কী পত্রিকায় তোমার একটা গল্পও দেখলাম। তুমি কাজটা করে দিতে পারবে না?

কাজল অবাক হইয়া বলিল—আমি? আমি করে দেব বলছেন?

—হ্যাঁ, কেন নয়? এমন কিছু কঠিন কাজ নয়—দশবারো পাতা ইংরেজি থেকে সরল বাংলায় তর্জমা করতে হবে। আর তোমার তো নিজের সাহিত্যিক প্রবণতাও রয়েছে। করবে?

ঢোঁক গিলিয়া কাজল বলিল—আজ্ঞে করবো।

আবার টেবিলের টানা খুলিয়া কয়েক পাতা টাইপ করা কাগজ বাহির করিয়া গুহ মহাশয় কাজলের হাতে দিলেন। বলিলেন—তাহলে ওঠো, আজ আর বোসো না। বাড়ি গিয়ে কাজে লেগে যাও। পরশু কিংবা তরশুর মধ্যে অনুবাদটা চাই।

বাড়ি আসিবার সময় ট্রেনের কামরায় বসিয়া কাজলের নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস হইতেছিল না। হাতে লেখা পত্রিকায় গল্প প্রকাশ নয়, সাময়িকপত্রেও নয়, একেবারে বাঁধাই করা দুই মলাটের মধ্যে তাহার গল্প ছাপা হইবে? অবশ্য মৌলিক নয়, অনুবাদ গল্প এবং অন্য আরও গল্পের সহিত, কিন্তু তাহাতে কী আসে যায়? জীবন তো কোথাও না কোথাও শুরু করিতেই হইবে। কে জানে, ইহাই হয়তো তাহার জীবনের প্রথম 'লাকি ব্রেক'। কোথায় যেন পড়িয়াছিল—নাম করিতে হইলে প্রতিভার সহিত ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাতে উপস্থিত থাকিবার যোগাযোগও ঘটা চাই। আজ সে বসু ও গুহ পাবলিশার্সে না ঢুকিয়া সরাসরি বাড়ি চলিয়া গেলে এই যোগাযোগটি ঘটিত না। যোগাযোগ ঘটিয়াছে, বাকিটা এবার তাহার হাতে।

দিনরাত পরিশ্রম করিয়া দুইদিনের মধ্যেই সে অনুবাদটি জমা দিয়া আসিল।

হাতে আবার কোন কাজ নাই। অখণ্ড অবসর। এক বন্ধুর বাড়ি হইতে আনা কারেনিনা চাহিয়া আনিয়াছিল। সমালোচকদের মতে পৃথিবীর দশটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে আনা কারেনিনা স্থান

পাইবার যোগ্য। কিন্তু পড়িতে শুরু করিয়া কাজল কেবলই হোঁচট খাইতে লাগিল, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও পঞ্চাশ-ষাট পৃষ্ঠার বেশি অগ্রসর হইতে পারিল না। ব্রাদার্স কারামাজোভ পড়িবার সময়ও তাহার এমনি হইয়াছিল। কিছুদিন বাদ দিয়া আবার আরম্ভ করিলে হয়তো শেষ করিতে পারিবে এই আশায় তখনকার মতো সে বইটি রাখিয়া দিল। আনা কারেনিনা সে আর শেষ করিতে পারে নাই, কিন্তু বছর দুয়েক পর ছিন্নপত্র পড়িতে পড়িতে হঠাৎ উল্লসিত হইয়া আবিষ্কার করিল—রবীন্দ্রনাথেরও আনা কারেনিনা ভালো লাগে নাই। আরম্ভ করিয়াও তিনি বইখানি অর্ধপঠিত রাখিয়াছিলেন। এতবড়ো মানুষকে দলে পাইয়া কাজল খুশি হইল। অন্তত কোনকিছু না পড়ার দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাহার মিল আছে।

বরং ডিকেন্স্ চলিবে বলিয়া মনে হইল। আর সঙ্গে কিছু এইচ.জি. ওয়েলস এবং জুল ভার্নের গল্প ও উপন্যাস। বিজ্ঞানসুবাসিত গল্পের প্রতি তাহার পরিচিত অনেকেরই বিরূপ মনোভাব আছে। সায়েনস্ ফিকশনের পাঠকসংখ্যা এদেশে নিতান্তই কম। একদিন স্বয়ং গুহ মহাশয়, যাঁহার মতামতের উপর তাহার গভীর শ্রদ্ধা আছে, তাহাকে বলিয়াছিলেন—তুমি সায়েনস্ ফিকশন পড়ে সময় নষ্ট কর কেন? জানো কী, একজন মানুষ সারাজীবন অন্য কিছু না করে কেবলমাত্র বই পড়লেও মাত্র চার-পাঁচ হাজারের বেশি বই পড়তে পারে না। এদিকে পড়বার মতো ভালো বই রয়েছে এর দশগুণ। কাজেই পাঠকের সতর্ক নির্বাচক না হয়ে উপায় নেই। ক্লাসিক পড়—ক্লাসিক।

দ্বিজেনবাবুকে কাজল মনে মনে পিতার মতো শ্রদ্ধা করে, সে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিল না। আসলে বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প পড়িতে সে ভালোবাসে, কারণ এই ধরনের লেখা তাহার মন ও চিন্তাকে প্রসারিত করে। মানুষ যে কেবল এই পৃথিবীটার বাসিন্দা এমন নহে। গ্রহতারকাখচিত সমগ্র বিশ্বজগৎটা তাহার জীবনের পটভূমি। এই সত্য একবার হৃদয়ের গভীরে যথার্থভাবে অনুভব করিতে পারিলে অনেক পার্থিব সমস্যা সরল হইয়া আসে। কারণ বেশিরভাগ সমস্যাই মানুষের লোভ, ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা-কামনা হইতে সঞ্জাত। সংকীর্ণতা দূর করিয়া সমস্ত জীবনটাকে একসঙ্গে দেখিতে পাইলে নতুন আবিষ্কারের আনন্দে মন ভরিয়া ওঠে। অবশ্য আমেরিকায় আজকাল বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের কতগুলি অবাস্তব, বাজে গল্পে ভরা পত্রিকা বাহির হইয়াছে, যাহাকে পালপ্ ম্যাগাজিন বলে—তাহাতে প্রকাশিত লেখাগুলি প্রকৃতই গাঁজাখুরি। তবে খুঁজিলে তাহার মধ্যেও দু-একটা ভালো লেখা চোখে পড়ে।

একদিন রাত্রে খাইতে বসিয়া বাবার গল্প হইতেছিল। হৈমন্তী বলিল—লোকে তোর বাবার কত প্রশংসা করে। আমি মনে মনে ভাবি, বেঁচে থাকলে সে আরও কত লিখতে পারত। প্রথম যে দুখানা বই লিখে তোর বাবা নাম করে, সে দুটো নিজের জীবন নিয়েই লেখা—তা তো জানিস। মারা যাবার কদিন আগে থেকে কেবলই বলছিল—আমার তো বয়েস বাড়ল, ও বইখানার তৃতীয় খণ্ড এবার লিখব। অনেক বলার কথা জমেছে। তা শুরু করার আগেই তার দিন ফুরোলো।

কাজল বলিল—কীভাবে লিখবেন সে বিষয়ে বাবা তোমাকে কিছু বলেন নি?

—নাঃ। সবে খসড়া করতে শুরু করেছিল, আর কিছুদিন সময় পেলে বলত হয়তো। তবে তোর কথা লিখত এটা আমি জানি, কারণ দ্বিতীয় উপন্যাসে তোর চরিত্র অনেকখানি আছে।

অনেক রাত্রে ছাদে পায়চারি করিতে করিতে কাজলের মনে হইল—বাবা যে উপন্যাসটা লিখিবে ভাবিয়াছিল সেটা শেষ করিয়া ফেলিলে কেমন হয়? অন্য কিছু না হইলেও একটা সাহিত্যের অ্যাড্‌ভেঞ্চার তো হইবে।

কিন্তু কী লিখিবে সে? বাবার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাহার নাই। দারিদ্রের সহিত তীব্র সংগ্রামও তাহাকে করিতে হয় নাই। পৃথিবীর সমস্ত মহৎ উপন্যাসের মূলবস্তু যে বঞ্চনা, দুঃখ এবং বিশাল আত্মিক অভিজ্ঞতা, সে তাহার আছে কী? খামোকা একটা অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন সামাজিক উপন্যাস লিখিয়া কী লাভ? আরও দুই-একটা গল্প লিখিয়াই সে বুঝিয়াছে নিজস্ব জীবনসত্য অবলম্বন

না করিয়া কেবল বানাইয়া লিখিলে ভালো সাহিত্য হয় না। তাহা হইলে সে কী লিখিবে? বড়ো বড়ো বিশ্ববন্দিত সাহিত্যিকদের সহিত তাহার জীবনের যে কোনও মিলই নাই।

তাহার পরই মাথার উপরে বিরাট নৈশ আকাশটার দিকে তাকাইয়া তাহার মনে হইল—নাই বা থাকিল অন্য কারও মতো অভিজ্ঞতা, জীবন কী সকলের একরকম হয়? এই যে আকাশটা তাহার মাথার ওপর রহিয়াছে, এই যে বর্ষার মেঘ ঘনাইয়া আসা দিনে সবুজ গাছপালার মধ্য দিয়া গ্রামের পথে বেড়াইবার গভীর আনন্দ—সেই আনন্দ সে পাইয়াছে। জীবন-মৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে চিন্তা কতদিন কতরাত্রি অবধি তাহাকে ঘুমাইতে দেয় নাই। নিকটতম মানুষের মৃত্যু তাহাকে চিরজীবনের মতো নিঃসঙ্গ করিয়া দিয়াছে, কোন ঐশ্বর্যেই যাহা আর পূর্ণ হইবার নহে। কত বিচিত্র মানুষের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে—আখের আলি, রামদাসকাকা, ব্যোমকেশ—নাঃ, জীবনটা একেবারে হেলাফেলায় কাটে নাই। অভিনবত্বের ঘনঘটা না থাকিলেও এইসব সাধারণ কথাই সে লিখিবে, সে যদি ইহা হইতে আনন্দ পাইয়া থাকে তাহা হইলে সততার সহিত লিখিতে পারিলে পাঠকও নিশ্চয় সেই লেখা গ্রহণ করিবে।

পরের কয়েকদিন সে বাবার শেষদিকের দুই-তিন বছরের ডায়েরি ভালো করিয়া খুঁজিয়া দেখিল, কোথাও কোন পরিকল্পনা বা খসড়া পাওয়া যায় কিনা। না, সে রকম কিছুই নাই। বাবা যদি কিছু ঠিক করিয়াও থাকে, সেটা তাহার মনের ভিতরেই ছিল। যাক, এক দিক দিয়া ভালোই হইল। সে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে লিখিতে পারিবে। বাবা নিজের জীবনের কথা লিখিয়াছিল, সেও শৈশব হইতে তাহার নিজের জীবনের কথা লিখিবে। পিতার আরব্ধ কর্ম সম্পন্ন করা এক ধরনের পিতৃতর্পণ, বাবা হয়তো স্বর্গ হইতে তাহাকে আশীর্বাদ করিবে।

কিছু কাগজ কিনিয়া একদিন সকাল হইতে কাজল লিখিতে বসিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

জলাশয়ের কেন্দ্রে ঢেউ উঠিলে সে ঢেউয়ের বৃত্ত ক্রমবিস্তীর্ণ হইয়া একসময় যেমন দূরতম কোণে অবস্থিত জলজ উদ্ভিদের ক্ষুদ্র পাতাটিতে কম্পন জাগায়, তেমনি সমগ্র পৃথিবীতে ঘটিয়া যাওয়া কয়েকটি ঘটনার প্রভাব মহাদেশ পার হইয়া কাজলকে স্পর্শ করিল। জাপানে পরমাণু বোমা পড়িয়া বিশ্বযুদ্ধ থামিলে পৃথিবীসুদ্ধ লোক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ব্যাপারটার নৃশংসতায় অবাক হইয়া গেল। যুদ্ধ যাহারা করে তাহাদের নিকট আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অনেক বাছা বাছা যুক্তি থাকে। আমেরিকা বলিল—এই শেষপর্বেও জাপান যেভাবে মরীয়া হইয়া যুদ্ধ চালাইতেছিল, তাহাতে পরমাণু বোমা ব্যবহার করা ছাড়া অবিলম্বে এই নিরর্থক লোকক্ষয় বন্ধ করিবার আর কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু কিছু লোক এই যুক্তি মানিল না, তাহারা বলিল—জাপান যেভাবে কোণঠাসা হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে যুদ্ধ আর কয়েকদিন বাদে আপনিই থামিয়া যাইত। মৃতপ্রায়, হৃতবল একটা জাতির নিরস্ত্র ও অসামরিক জনগণের উপর এই মহাশক্তিশালী অস্ত্রের প্রয়োগ নিজের শক্তি দেখাইবার একটা অমানবিক পন্থা মাত্র। বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখ শান্তিবাদী দার্শনিকেরা এই মতের পক্ষ লইলেন। যাঁহার বস্তু ও শক্তির অভেদ নির্ণায়ক সূত্র অনুযায়ী বোমা বানানো হইয়াছিল, সেই আইনস্টাইন স্বয়ং ধ্বংসদেবতার নির্মম রূপ দেখিয়া মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। এই ভয়ানক অস্ত্র ব্যবহার না করিবার জন্য তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করিয়া চিঠি দিয়াছিলেন, সে চিঠি খোলাই হইল না। ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট বদল হইয়া গেল। যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে কে খোঁজ রাখে কোথাকার একটা পাগলা বৈজ্ঞানিক কী বলিতেছে! প্রথমে নেভাদার মরুভূমিতে এবং পরে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমার জোরদার পরীক্ষা হইয়া গেল।

অনেকদিন আগে রেললাইনের ধারে একটা মরা গরুকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কাজলের মনে ভয়ানক ধাক্কা লাগিয়াছিল। তখনও তাহার বাবা বাঁচিয়া আছে। তাহার ভীত, আতঙ্কিত মুখ দেখিয়া অপু সস্নেহে তাহাকে একহাত দিয়া জড়াইয়া বুকের কাছে আনিয়া অনেক সান্ত্বনা দিয়াছিল। এখন বাবা নাই, যেদিকে তাকানো যায় জীবনের কোনোক্ষেত্রে নির্ভর করিবার মতো একটা ব্যক্তিত্ব নাই। বীভৎসতার নগ্নরূপ দেখিয়া কাজল কেমন যেন দমিয়া গেল। তাহা হইলে কী কাব্য, দর্শন, সংগীত মিথ্যা? সম্পূর্ণ অর্থহীন? শৈশব হইতে মানবসভ্যতার শুভ প্রভাব সম্বন্ধে তাহার যে গভীর বিশ্বাস, তাহা কী কেবলই কথার কথা? বারবার তাহার মনে পড়িতেছিল ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা— মাচ্ ইট গ্রিভ্‌স্ মাই হার্ট টু সি হোয়াট ম্যান হ্যাজ মেড্ অফ্ ম্যান!

কিছু ভালো লাগে না। কবিতা বিস্বাদ লাগে, ভালো গান শুনিতে ইচ্ছা করে না, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আশাবাদী সাহিত্যকর্মকে হাসির গল্প বলিয়া মনে হয়। চোখের উপর দিয়া মিছিল করিয়া যায় তেজস্ক্রিয়তার কামড়ে আসন্ন মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষারত নিরপরাধ নরনারীর দল। কাহারও গায়ে দগ্‌দগে ঘা, কাহারও শরীর হইতে মাংস খসিয়া পড়িতেছে, কেহ বা কোটর হইতে বাহির হইয়া আসা নিজের গলিত চোখ হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও বা শোকাহত মা নর্দমা হইতে আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া মৃত শিশুর মুখে দিয়া তাহার জ্ঞান ফিরাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। কোথাও নির্জনে গিয়া বসিলেই এইসব দৃশ্য চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে। মনে হয় পৃথিবী সম্পূর্ণ গ্লানিমুক্ত না হইলে এই পাখির ডাক, মায়াময় রঙে রাঙানো সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত, মালকোষের শিহরণ জাগানো আলাপ—কোনও কিছুরই কোনো মূল্য নাই। এই মুহূর্তে যখন বিধ্বংসী কামানের গর্জনে দিগন্ত কাঁপিতেছে, বোমারু বিমানের সার্চলাইটের আলোতে রাত্রির আকাশ শতধা বিভক্ত, তখন সেই সৌন্দর্যহীন, নিরাপত্তা ও বিশ্বাসহীন পৃথিবীতে সুকুমার বৃত্তির স্থান কোথায়?

ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন। সংবাদপত্রের খবরে বিভিন্ন মহলের তৎপরতায় সেই আশ্বাস ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, ইংরাজ যাইবার সময় ভারতকে দুইটি পৃথক রাষ্ট্রে ভাগ করিয়া দিয়া যাইবে। যে ঐশ্বর্য তাহারা নিজেরা ভোগ করিতে পারিল না, কুটিল ইংরাজ তাহা অপরকেও সুখে ভোগ করিতে দিবে না। দুই রাজ্য কীভাবে এবং কিসের ভিত্তিতে ভাগ হইবে তাহা লইয়া সর্বত্র জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইল। দেশের ভিতর যেসব বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় এতদিন শান্তিতে বাস করিত, পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতির কোন অভাব ছিল না—এইবার সেই সহিষ্ণুতা ও বন্ধুত্বের শান্ত জলে ইংরাজ নিক্ষিপ্ত ঢিল আসিয়া পড়িল।

এম.এ. পরীক্ষার ফল বাহির হইলে নিজের নম্বর দেখিয়া কাজল অবাক হইল না, হতাশও হইল না। সে যেমন ভাবিয়াছিল তেমনই ফল হইয়াছে। সেনেট হাউসের দেয়ালে টাঙানো উত্তীর্ণ ছাত্রদের নামের তালিকায় নিজেদের নাম দেখিয়া প্রভাত ও কাজল গোলদীঘিতে আসিয়া বসিল। প্রভাত বলিল—তোকে স্যালুট করতে ইচ্ছে করছে, বুঝলি?

কাজল হাসিয়া বলিল—কেন রে, আমি কী দোষ করলাম?

—তুই দেখিয়ে দিলি কত কম পড়াশুনো করেও এম.এ. পাশ করা যায়। আমার রেজাল্ট্ ধরাবাঁধা হিসেবের মধ্যেই হয়েছে—কিন্তু তোরটা অ্যাচিভ্‌মেন্ট্। এখন কী করবি ভাবছিস?

গোলদীঘির জলে একটি কিশোর সাঁতার শিখিবার প্রচেষ্টায় আপ্রাণ হাত-পা ছুঁড়িতেছিল, সেইদিকে তাকাইয়া দেখিতে দেখিতে কাজল বলিল—মাকে গিয়ে খবরটা দেব—

—না, ইয়ার্কি নয়। কিছু ভেবেছিস এ বিষয়ে?

—নাঃ। আমাকে তো জানিস, ভেবে আমি কিছু ঠিক করতে পারি না। হঠাৎ কিছু শুরু করে দেব—

প্রভাত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তুই খুব ইম্‌পালসিভ্ আমি জানি। কিন্তু

আমাদের ছেলেমানুষি করার বয়েস গেছে। ছোট হোক, বড়ো হোক—একটা কোন কাজ শুরু কর। কেবলমাত্র টাকা উপার্জনের জন্য বলছি না, জীবনে একটা স্থিরকেন্দ্র থাকা দরকার, তাই বলছি।

—তুই কী করবি?

—ম্যাথু আর্নল্‌ড্ সম্বন্ধে রিসার্চ করব ভাবছি। মনে আছে, বছরদুয়েক আগে তুই-ই আমার মাথায় আর্নল্‌ড্ ঢুকিয়েছিলি? তারপর দেখি কী করা যায়—

কাজল অন্যমনস্কভাবে সেনেট হাউসের মাথার দিকে তাকাইয়াছিল, এবার প্রভাতেব দিকে চোখ নামাইয়া বলিল—একটা কথা মনে হচ্ছে—

—কী রে?

—এতদিন আমরা একসঙ্গে পড়াশুনো করছিলাম, রোজ দেখা হবার একটা ব্যাপার ছিল। এবার জীবিকা অর্জনের জন্য কে কোথায় ছিটকে যাবো তার ঠিক নেই। তুই কিন্তু আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবি, বুঝলি? একা মানুষ বাঁচে না—

উত্তরে প্রভাত কেবল একটু হাসিল।

আরও কিছুক্ষণ গল্প করিবার পর প্রভাত ট্রামে উঠিয়া নিজের বাড়িতে পাশের খবর দিতে গেল। ট্রেন ধরিবার আগে কাজল বসু ও গুহের দোকানে ঢুকিল তাহার খবব জানাইতে। আজ প্রথমে বসু আরামকেদারা দখল করিয়া গা এলাইয়া রহিয়াছেন। দ্বিজেনবাবু সম্ভবতঃ কিছু পরে আসিয়া বিপাকে পড়িয়াছেন। সম্প্রতি তিনি পাশেই একটি চেয়ারে বসিয়া কী একটা পত্রিকার পাতা ওলটাইতে ওলটাইতে পরিস্থিতির উপর সতর্ক নজর রাখিতেছেন। প্রমথবাবু কোনো কারণে একবার আরামকেদারা ছাড়িলেই তিনি তৎক্ষণাৎ সেটি দখল করিবেন। কিন্তু বসু ও গুহ পাবলিশার্সের অপর অংশীদারের নিশ্চিন্ত বিশ্রামের ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতেছে দ্বিজেনবাবুর প্রতীক্ষা কিছু দীর্ঘ হইবে।

কাজলের পাশের খবর শুনিয়া দুই বন্ধু যথার্থই খুশি হইলেন। দ্বিজেনবাবু একজন কর্মচারীকে তখনই সন্দেশ আনিতে পাঠাইলেন। পুরোনো দিনের অনেক গল্প হইল, অপু বাঁচিয়া থাকিলে ছেলের কৃতিত্বে সে আজ কত খুশি হইত সে কথা বলিয়া দুইজনে দুঃখ করিলেন। দ্বিজেনবাবু বলিলেন—তোমাকে কেমন যেন বিমর্ষ দেখাচ্ছে। কেন বল তো?

কাজল প্রথমে বুঝিতে পারিল না নিজের মনের ভাব কী করিয়া গুছাইয়া বলিবে, তাহার পর মনে হইল বলিতে হইলে ইহাই সর্বাপেক্ষা ভালো স্থান। সে বলিল—আমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, না? আসলে বর্তমান সময়টাই আমার খাপ খাচ্ছে না। পৃথিবী জুড়ে এতবড় একটা যুদ্ধ হয়ে গেল, কত লোক মারা পড়ল ভাবুন তো কাকা! হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ যে মূল্যবোধের অনুসরণ করে এসেছে, সব মিথ্যে হয়ে গেল? যাই করতে যাচ্ছি, কেবলই মনে হচ্ছে—এসবের আসলে কোন মানে নেই। সাধারণ মানুষের শান্তিপ্রিয়তার কোন দাম নেই, তাদের জীবনেরও কোন মূল্য নেই। পৃথিবীর শক্তিশালী রাষ্ট্রনেতারা ইচ্ছে করলেই যুদ্ধ বাধাতে পারে যে কোন সময়ে। কোটি কোটি সাধারণ মানুষের ইচ্ছে-অনিচ্ছেয় কিছু এসে যায় না। তাহলে?

দ্বিজেনবাবু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন—ঠিকই বলেছ, বর্তমান দুনিয়ার যা হালচাল তাতে আশাবাদ বাঁচিয়ে রাখা খুব কঠিন। কিন্তু জানো তো, সকালের আলো ফুটবার আগে রাত্রির অন্ধকার সবচেয়ে কালো হয়ে আসে? যুদ্ধ রাষ্ট্রবিপ্লব কিছু নতুন কথা নয়—ইতিহাস খুললেই দেখবে যুগে যুগে এসব হয়ে আসছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ থেকে বর্গীর হাঙ্গামা পর্যন্ত—শান্তির চেয়ে অশান্তিই বেশি। মানুষের যা কিছু শ্রেষ্ঠ কীর্তি, তা কিন্তু এসবের মধ্যে থেকেই উঠে এসেছে। রুপার্ট ব্রুক বা উইলফ্রেড ওয়েনের কথা ভাবো—তুমি দূর থেকে কাতর হচ্ছ, তাঁরা রাইফেল হাতে যুদ্ধ করেছেন, হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায় এমন দূরত্ব থেকে মৃত্যুকে দেখেছেন। তার মধ্যেই কিন্তু লিখেছেন অমর কাব্য। এখানেই মানুষের জয়—

তারপর কাজলের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিলেন—তুমিও তো লেখো, লেখকের অনেক দায়িত্ব। উদ্যত রাইফেলের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের গাইতে হবে জুঁইফুলের গান—

বাড়িতে আসিয়া কাজল দেখিল মায়ের শরীর ভালো নয়। দুপুর হইতে পেটে কেমন একটা ব্যথা হইতেছে। সম্প্রতি ব্যথাটা পিঠের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ছেলের এম.এ. পাশের খবর পাইয়া হৈমন্তী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। কাজল বলিল—উঠছো কেন মা, শুয়ে থাকো। আমি বরং তোমার পাশে বসে গল্প করি—

হৈমন্তী শুনিল না, বলিল—না, আমার মানত ছিল তোর পাশের খবর এলে দাঁড়াহরির লুট দেবো। যা, মোড়ের দোকান থেকে কড়াপাকের সন্দেশ কিনে নিয়ে আয়। আসবার সময় রায়বাড়ি, মুখুজ্যেবাড়ি আর অমিয়বাবুর বৌকে বলে আসবি, বলবি—মা বলেছে এক্ষুনি আসতে, হরির লুট হবে—

নিজের পাশের জন্য হরির লুটের নিমন্ত্রণ করিতে কাজলের লজ্জা করিতেছিল। কিন্তু মায়ের আগ্রহে পাড়াসুদ্ধ লোককে বলিয়া আসিতে হইল। সন্দেশ কিনিয়া বাড়ি ফিরিয়া দেখিল মা তখনও বসে নাই, সাধারণ শাড়ি ছাড়িয়া গরদের কাপড় পরিয়াছে এবং খাটের বাজু ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হৈমন্তীর মুখ দেখিয়া মনে হয়, ব্যথার জন্য তাহার দাঁড়াইতে বেশ কষ্ট হইতেছে। মায়ের জন্য কাজলের হঠাৎ খুব মমতা হইল। ঠাকুরমার ঝুলি হইতে আধুনিক সামাজিক উপন্যাস পর্যন্ত সর্বত্র সৎমায়ের যে রক্তশীতলকারী চিত্র আঁকা হইয়াছে, ইহার সহিত সে বিভীষিকার কোনই মিল নাই। পাষণ্ড লেখকগুলিকে ডাকিয়া তাহার মাকে দেখানো উচিত।

দিন-দুই বাদে একদিন পথে স্কুলের মাস্টারমশাই কালিদাসবাবুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। ইনি সেকালের গ্র্যাজুয়েট, ইংরাজি হইতে বিজ্ঞান পর্যন্ত সব বিষয়েই প্রয়োজন হইলে ক্লাস লইতেন। শোনা যায় পিরিয়ড কামাই যাইতেছিল বলিয়া একবার ড্রইংয়ের ক্লাসেও বক আঁকিয়া কাজ চালাইয়া দিয়াছিলেন। শিক্ষকতাকে যাঁহারা বৃত্তি না ভাবিয়া ব্রত হিসাবে লইয়াছিলেন, সেই বিরল মানুষদের ইনি একজন শেষ প্রতিভূ। এই টাইপটাই ধীরে ধীরে শেষ হইয়া আসিতেছে। ক্লাসে কালিদাসবাবু যে কেবলমাত্র পাঠ্যবিষয় পড়াইতেন তাহা নয়, মুখে মুখে ইতিহাসের গল্প শোনাইতেন, মহাপুরুষদের জীবনের কাহিনী বলিতেন। ইহাতেই শেষ নয়, ছুটির পর উৎসাহী কিছু ছাত্রকে স্কুলের পিছনের মাঠে লইয়া গিয়া কুস্তির প্যাঁচ শিখাইতেন। জামা ও গেঞ্জি খুলিয়া ঘাসের উপর রাখিয়া মালকোঁচা মারিয়া নিজে ছাত্রদের সঙ্গে কুস্তি লড়িতেন। কাজলও উৎসাহে পড়িয়া কিছুদিন এই দলে ভিড়িয়াছিল। সে একবার কালিদাসবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—স্যার, আপনি জুজুৎসু জানেন, না? আমরা শিখতে চাই—

কালিদাসবাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন—বাপু হে, ভারতীয় কুস্তির রীতিতে এমন অনেক প্যাঁচ আছে যার কাছে জাপানী জুজুৎসু লাগে না। আগে সেগুলো শেখো, তারপর জুজুৎসুর কথা ভাবা যাবে।

কাজল পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—ভালো আছেন স্যার?

—কে? অমিতাভ নাকি? অনেকদিন তোকে দেখি না—কী পড়ছিস এখন?

—আমি এবার এম.এ. পাশ করলাম স্যার, এই ক-দিন আগে রেজাল্ট বেরিয়েছে—

—বাঃ, খুব আনন্দের কথা। কী সাবজেক্ট্ যেন ছিল—ইংরিজি না?

—হ্যাঁ স্যার।

—কী করবি ভাবছিস এখন?

কাজল বলিল—কিছু ঠিক করিনি স্যার। এই তো সবে ফল বেরুল—

কালিদাসবাবু বলিলেন—তুই তো আজকাল কাগজে গল্প-টল্প লিখছিস। তোর দুটো গল্প আমি পড়েছি। বেশ ভালো লেখা। তোর লেখা নিয়ে মাস্টারমশাইদের মধ্যে আলোচনা হয়—

কাজলের খুব আনন্দ হইল। ছোটবেলায় যে শিক্ষকদের কাছে পড়িয়াছে তাঁহারা তাহার লেখা পড়িয়া আলোচনা করিয়াছেন। মানুষের অহং তৃপ্ত হইবার মতো ব্যাপার বটে।

দিনদুয়েক বাদে সন্ধ্যাবেলা কাজল নিজের ঘরে বসিয়া লিভিংস্টোনের জীবনী পড়িতেছে, এমন সময়ে খট্ খট্ করিয়া বাহিরের দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। দরজা খুলিয়া সে দেখিল কালিদাসবাবু দাঁড়াইয়া আছেন। সে অবাকও হইল, খুশিও হইল। সে যখন স্কুলের ছাত্র, তখনও মাস্টারমশাই কোনোদিন তাহাদের বাড়ি আসেন নাই। এই প্রথম।

ঘরে আসিয়া কালিদাসবাবু খাটের এককোণে বসিলেন, উপুড় করিয়া রাখা বইটা হাতে লইয়া বলিলেন—এই বইটা পড়ছিলি বুঝি? লিভিংস্টোনের জীবনী? খুব ভালো, বই পড়ার অভ্যেস মানুষকে মহৎ করে, মনটাকে বড়ো করে। দেখবি যারা বই পড়তে ভালোবাসে তারা কখনও ছোটোখাটো নীচতা করতে পারে না।

কাজল মাকে ডাকিয়া মাস্টারমশাইয়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন—আলাপ হয়ে ভালোই হল বৌঠান, আপনার কাছ থেকে একটা অনুমতি নেবার আছে। সত্যি বলতে কী, সেজন্যেই আজ এসেছি। অমিতাভ তো এবাব এম.এ. পাশ করেছে, বর্তমানে কোন কাজও করছে না। ওকে আমি আমাদের স্কুলে শিক্ষক হিসেবে নিয়ে যেতে চাই। আপনার কোন আপত্তি হবে না তো?

কাজল শুনিয়া আশ্চর্য হইযা গেল, খুব আনন্দও হইল। স্কুলের মাস্টারমশাইদের শ্রদ্ধা করিতে হয়, দেখা হইলেই প্রণাম কবিতে হয়—নিজেরও যে কোনদিন সেই শ্রেণিভুক্ত হওযা সম্ভব তাহা যেন ঠিকঠাক বিশ্বাস হয না।

কালিদাসবাবু কাজলকে বলিলেন—তোর যদি অসুবিধে না থাকে তাহলে এই সোমবার থেকেই কাজ শুরু কর। পৌনে এগারোটাব ভেতর স্কুলে আসবি।—অবশ্য প্রথম দিন সাড়ে দশটায যাওয়াই ভালো। এখন তোকে স্কেল দিতে পারব না। থাউকো কিছু টাকা ধরে দেবো, কাবণ স্কুলে এখন কোনো পোস্ট খালি নেই, তোকে বাড়তি হিসেবে নিচ্ছি। আট-দশমাস পরে মণীন্দ্রবাবু রিটাযার করবেন, সেই জায়গায় তোকে পাকাপাকিভাবে নিয়ে নেব—

হৈমন্তী জলখাবারের ব্যবস্থা করিতে গেলে কালিদাসবাবু অনেক কথা বলিলেন। স্কুলে এখন কোন হেডমাস্টার নাই, সবচেয়ে সিনিয়ার টিচার হিসাবে তিনিই কাজকর্ম দেখিতেছেন। শিক্ষকদের মধ্যে নানারূপ দলাদলি শুরু হইয়াছে। ভালোভাবে ইংবাজি পড়াইবাব মতো কেহ নাই। বযস্ক শিক্ষক রাখিলে এ অবস্থায় উন্নতি ঘটানো যাইবে না। তরুণ এবং আদর্শবাদী শিক্ষক, যাহার ভিতর উৎসাহ ও স্বপ্ন এখনও মরিয়া যায় নাই, স্কুলকে বাঁচাইতে হইলে এখন তেমন একজনকে প্রয়োজন। কাজলের এইসব গুণ আছে বলিয়া তিনি মনে করেন।

প্রথমদিন স্কুলে যাইবার জন্য রওনা হইয়া কাজলের মনে হইল রাস্তায় যত লোক সবাই তাহার দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে, সবাই যেন ধরিয়া ফেলিয়াছে সে স্কুলে ছাত্র পড়াইতে যাইতেছে। দশটা পনেরোতেই সে পৌঁছাইয়া গেল। এগারোটা হইতে ক্লাস শুরু, একমাত্র কালিদাসবাবু টিচার্স রুমে খাতাপত্র লইয়া কী যেন করিতেছেন, অন্য কেহই এখনও আসে নাই। কাজলকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—এই যে অমিতাভ, এসে গিয়েছিস দেখছি। বোস ওই চেয়ারটায। সবাই আসতে এখনও দেরি আছে। দাঁড়া, অ্যাটেন্‌ডেনস্ রেজিস্ট্রারে তোর নামটা তুলে দিই, তারপর সই কর—

টেবিলের উপর হইতে একটা মোটা খাতা লইয়া কালিদাসবাবু তাহাতে যথাস্থানে কাজলের নাম লিখিলেন, তাহার পর খাতাটা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—নে, সই কর—

কাজল নির্দিষ্ট খোপে জীবনে প্রথম চাকুরির হাজিরাজ্ঞাপক সই দিল।

—বোস না, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

ছাত্রজীবনে এই ঘরে বিভিন্ন কারণে অজস্রবার আসিতে হইয়াছে এবং শিক্ষকদের সামনে তটস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছে, কেহ বসিতে বলেন নাই। সেই মজ্জাগত অভ্যাস ও মনোভাব অকস্মাৎ ত্যাগ করা কঠিন। সে লজ্জিত গলায় সংকুচিত হইয়া বলিল—ঠিক আছে স্যার, আমি বেশ আছি—

কালিদাসবাবু হাসিয়া বলিলেন—বুঝেছি। আচ্ছা তুই এক কাজ কর, লাইব্রেরি ঘরে চলে যা। ছোকরা টিচাররা ওই ঘরটায় বসার ব্যবস্থা করেছে—তুইও যা। প্রেয়ারের ঘণ্টা পড়লে এসে প্রেয়ারে যোগ দিবি। তারপর দেখি তোকে কী ক্লাস দেওয়া যায়—

লাইব্রেরির জন্য নির্দিষ্ট ঘরটি বিশেষ বড়ো নহে। চারিদিকের দেওয়াল ঘেঁষিয়া কয়েকটি কাঁচের পাল্লা লাগানো আলমারি। মাঝখানে একটি লম্বা টেবিল, তাহার দুইদিকে দুইটি বেঞ্চি এবং এদিক ওদিক ছড়ানো কয়েকটি চেয়ার। আলমারিগুলিতে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের বেশ কিছু ভালো বই রহিয়াছে, কিন্তু সেগুলি পারতপক্ষে ছাত্রদের পড়িতে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। ছাত্ররাও যে সকলেই বিশ্বসাহিত্য পড়িবার জন্য ভয়ানক উৎসাহী এমন নয়, তবু দুই-একজন ছেলে বই পড়িতে চাহিলে লাইব্রেরির ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শিবলালবাবু দেশলাইয়ের কাঠি দিয়া অর্ধনিমীলিত চোখে কান খোঁচাইতে খোঁচাইতে উদাস গলায় বলেন—বই পড়বি? কিনে পড়গে যা—এসব দামি বিলিতি বই, হাতে হাতে বেশি ঘুরলে নোংরা হয়ে যাবে—

অত্যুৎসাহী কেহ বলে—নোংরা হবে না স্যার, মলাট দিয়ে পড়ব—

—তাই? বাঃ, ভালো কথা। বেশ, হেডমাস্টারমশাইকে বলে দেখ্—

হেডমাস্টার! কী সর্বনাশ! সাধ করিয়া কে আত্মহত্যা করে?

কাজল গিয়া বসিতে বসিতেই একজন অল্পবয়েসী শিক্ষক ঘরে ঢুকিল। কাজলকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কী কাউকে খুঁজছেন?

—না, আমি—মানে আজ থেকে—কালিদাসবাবু বললেন এখানে বসতে—

দশমিনিটের মধ্যেই দুইজনের পরিচয় বেশ গাঢ় হইয়া গেল। ছেলেটির নাম রমাপদ, বছর দেড়েক হইল বি.এ. পাশ করিয়া এখানে পড়াইতেছে। বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার কী একটা গ্রামে। একলা একটি ছোট ঘর ভাড়া করিয়া থাকে ও নিজে রান্না করিয়া খায়। সাহিত্যে বেশ উৎসাহ। কাজলের নাম শুনিয়াই সে বলিল—ও আপনি অপূর্ব রায়ের ছেলে, না? আপনি নিজেও তো লেখেন? আপনার লেখা আমি পড়েছি—

এমন সময়ে প্রার্থনার ঘণ্টা পড়িল। রমাপদ বলিল—চলুন, প্রেয়ারে যাওয়া যাক। পরে জমিয়ে গল্প করা যাবে। আপনি কী কোনো ক্লাস পেয়েছেন?

—না এখনও কালিদাসবাবু কিছু বলেন নি—

—বেশ, যতক্ষণ হাল্‌কা থাকবেন ততক্ষণই ভালো। চলুন—

প্রেয়ারের পর সকল শিক্ষকেরাই টিচার্স রুমে আসিলেন। কালিদাসবাবু বলিলেন—অমিতাভ, তুমি সেভেন বি-র খাতাটা নিয়ে ক্লাসে যাও, ওটা দুলালবাবুর বাংলা গদ্যের ক্লাস—তিনি এখনও আসেন নি। তারপর দেখি আর কী দেওয়া যায়—

শিক্ষকজীবন শুরু হইয়া গেল।

ইংরাজ শাসকের উদ্দেশ্য সফল হইল। স্বাধীনতা আসিয়া পড়িল বটে, কিন্তু দেশের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কাজল প্রথমে ব্যাপারটার গুরুত্ব ঠিকঠাক উপলব্ধি করিতে পারে নাই। খবরের কাগজে কলিকাতার নানান্ সংবাদ প্রকাশিত হইতেছিল বটে, কিন্তু সেই বিবরণ নিতান্তই গুটিকয়েক অক্ষরের সমষ্টি মাত্র। পৃথিবী এত সুন্দর, জীবন এত মধুর—এখানে খারাপ কিছু ঘটিতে পারে না। মানুষ কখনও মানুষের প্রতি এতটা নির্মম হইতে পারে না।

অথচ সে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দেখিয়াছে, হিরোশিমার তাণ্ডব দেখিয়াছে, জার্মান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ইহুদীদের উপর আইখম্যানের অমানবিক অত্যাচারের কথা সে জানে। মানুষের মানবিকতার উপর এই বিশ্বাস নিষ্ঠুর বাস্তবকে ভুলিয়া থাকিবার জন্য তাহার মনের একটা কারসাজি মাত্র। মানুষ সব মিলাইয়া মোটের উপর ভালোই, কারণ তাহার সভ্যতা অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও আজ এত হাজার বছর টিকিয়া আছে। কিন্তু তাহারই মধ্যে মাঝে মাঝে এক-একটা উন্মত্ততার যুগ আসে, পৃথিবীব্যাপী অশান্তির অন্ধকার ঘনাইয়া আসে। কাজলের কেমন মনে হয়, আসলে দুই পক্ষের মানুষগুলি কেহই খারাপ নহে, অদৃশ্য এক তৃতীয়পক্ষ নিজেদের কূট স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য দুইজনকে লড়াইয়া দিয়াছে।

নানাবিধ গোলযোগের মধ্যে দেশ স্বাধীন হইল। স্বাধীনতা আনিতে যে রক্তপাতের প্রয়োজন হয় নাই, নিরর্থক ভ্রাতৃবিরোধে সেই রক্ত দেশের মাটিতে ঝরিয়া পড়িল। তবু তো এখন দেশ স্বাধীন। জাতীয় জীবনে নতুন একটা উদ্দীপনার জোয়ার আসিয়াছে। কেবল প্রভাত একদিন মির্জাপুর স্ট্রীটে তাহাদের পরিচিত চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে দিতে কাজলকে বলিল—স্বাধীন হয়ে সবাই খুব খুশি, কিন্তু ইট ইজ টু আর্লি টু রিজয়েস্—

বিস্মিত কাজল জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

—এতদিন সবকিছু অসুবিধের জন্য আমরা ইংরেজকে দায়ী করে এসেছি। এবার দায়িত্ব আমাদের নিজেদের ঘাড়ে—সামনে অনেক সমস্যা অমিতাভ, সেখানে ব্যর্থ হলে কাকে দায়ী করব? এবারই আসল পরীক্ষা শুরু হল—

কাজল রাজনীতি বোঝে না, কিন্তু প্রভাতের কথাগুলি তাহার যথার্থ বলিয়া মনে হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

এ বছর ঘোর বর্ষা নামিয়াছিল। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের বহর দেখিয়া সকলে মনে করিয়াছিল এবার বন্যা না হইয়া যায় না, দুর্গাপূজাও বোধহয় নিতান্তই মাটি হইল। কিন্তু পূজার দিনদশেক আগেই বর্ষা শেষ হইয়া ঝকঝকে শরতের আকাশ বাহির হইয়া পড়িল। সারাদিন সুনীল আকাশে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে, বাতাসে আসন্ন উৎসবের আনন্দময় স্পর্শ। কাজলের আর পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইবার বয়েস নাই, তবু তাহার মনে অদ্ভুত আনন্দ ছড়াইয়া পড়িল। ঘরের বাহির হইতেই হইবে তাহার কোনো মানে নাই, চারিদিকে ঢাকের শব্দ আর অনেক মানুষের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে ভালো একখানি বই হাতে জানালার পাশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে মন্দ লাগে না।

মহালয়ার দিন সকালে স্নান করিয়া মায়ের পূজা করিবার শাড়িটি ধুতির মতো করিয়া পরিয়া কাজল ভিতরের বারান্দায় তর্পণ করিতে বসিল। পরলোক এবং আত্মার অবিনশ্বরতা ইত্যাদি বিষয়ে কাজল অন্যান্য সাধারণ মানুষেরই মতাবলম্বী—অর্থাৎ অ্যাগ্‌নস্টিক। তাহার বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনোটাই খুব প্রবল নহে, কিন্তু চিরাচরিত জাতীয় ঐতিহ্য পালন করিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভালোই লাগে। কে জানে সত্যই মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা, কিন্তু তাহার জ্ঞানের সীমানার বাহিরেও তো জগৎটা অনেকখানি প্রসারিত। যদি কিছু থাকে, যদি সন্তানের উৎসর্গ করা জল সত্যই কোনোভাবে স্বর্গত, পিতার তৃষ্ণা নিবারণ করে—আর কিছু না হোক, অন্তত এইভাবে বৎসরে একদিন তো পূর্বপুরুষদের নাম সংসারে উচ্চারিত হইতেছে। তর্পণের মাধ্যমে পারিবারিক ইতিহাসের সহিত বর্তমানের সুন্দর একটা গৌরবময় সেতু প্রস্তুত হয়।

আর কী সুন্দর মন্ত্রগুলি! পিতা পিতামহ এবং পিতৃমাতৃকুলের সকল স্বর্গত মানুষেরা তো

বটেই, তাহা ছাড়া পৃথিবীতে যেখানে যত বান্ধবহীন মানুষ মৃত্যুবরণ করিয়াছে, তৃষ্ণার্ত বা অগ্নিদগ্ধ হইয়া প্রাণবিসর্জন করিয়াছে, তাহারা সবাই যেন আমার প্রদত্ত এই জল পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করে। জল প্রকৃতই কোথায় পৌঁছায় কে জানে, কিন্তু তাবৎ বিশ্বজনের সহিত আত্মীয়তা অনুভব করিবার জন্য অনুষ্ঠানটি সহায়তা করে।

কোথায় স-তিল গঙ্গাজল লইয়া বাবার নাম উচ্চারণ করিবার সময় যেমন উদার আনন্দ হয়, তেমনই একটা চাপা অভিমানে বুক ভরিয়া ওঠে। সে জানে, বাবা ইচ্ছা করিয়া অসময়ে চলিয়া যায় নাই। তবু বাবার উপর অবুঝের মতো রাগ হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা বিশ্বসংসারের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মের প্রতি অসহায় আক্রোশ মাত্র।

দুপুরবেলা কাজল কী একখানা বই লইয়া নিজের ঘরে শুইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় বাহিরের দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল।

কাজল একটু অবাক হইল। এখন বেলা আড়াইটা হইবে, এই সময়টা সাধারণত গৃহস্থবাড়িতে অতিথি আসে না। তবে পিওন হইতে পারে।

একান্ত বিস্ময়ের কিছু ঘটিলে মানুষের মস্তিষ্কে জোর ঝাঁকুনি লাগে, সামনে যাহা ঘটিতেছে তাহা চোখে দেখিলেও তাহার মর্মার্থ হৃদয়ে প্রবেশ করিতে সময় লাগে। দরজা খুলিয়া কাজলেরও ঠিক তাই হইল।

অপালা আসিয়াছে।

কিছুক্ষণ বিহ্বলভাবে তাকাইয়া থাকিবার পর কাজল বলিল—তুমি! আমার বাড়ির ঠিকানা পেলে কী করে? আগে কোনো খবর দাওনি তো!

অপালা হাসিয়া বলিল—ইচ্ছে করেই দিইনি। কেমন সারপ্রাইজ হল, বলুন তো?

কাজল কিছুটা সামলাইয়া বলিল—এসো এসো, ভেতরে এসো—

হৈমন্তী নিজের ঘরে ঘুমাইতেছে। ইদানীং তাহার শরীর ভালো যাইতেছে না। দুপুরে খাইবার পর একটা বই লইয়া শুইলে আপনিই চোখের পাতা বুঁজিয়া আসে। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কাজল এই সময়টা মাকে ডাকে না।

একমুহূর্ত দ্বিধা করিয়া কাজল অপালাকে নিজের ঘরেই আনিয়া বসাইল।

অপালা আঁচল দিয়া গলার ঘাম মুছিয়া ঘরের চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল। বলিল—পড়ুয়া লোকের ঘর যে সেটা বোঝা যায়—

—কী করে বুঝলে? বই দেখে?

—না, বই অনেকের বাড়িতেই থাকে, সবাই কী পড়ে? ও সাজানোই থাকে। আসলে যারা সত্যি বই পড়ে তাদের বইপত্র অগোছালো হয়। এইরকমই ভালো—আপনি যেন আবার গোছাতে গিয়ে ঘরের শ্রী নষ্ট করবেন না। আপনার মা কই? আজ কিন্তু মায়ের সঙ্গে আলাপ করবো বলেই আসা—

কাজলের বিস্ময়ের ঘোরটা তখনও ঠিকঠাক কাটে নাই। নির্জন দুপুরে একজন সুন্দর তরুণী তাহার ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছে—এ অভিজ্ঞতা তাহার জীবনে একেবারেই নতুন। সে বলিল—মা শুয়ে আছেন, বোধহয় ঘুমোচ্ছেন। মার শরীর কিছুদিন ধরে ভালো যাচ্ছে না। একটু পরে উঠলে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তুমি আমার বাড়ি চিনলে কী করে? অনেক খুঁজতে হয়েছে?

অপালা কাজলের দিকে তাকাইয়া বলিল—ভালো।

অবাক হইয়া কাজল বলিল—কী ভালো?

—নিজেদের খ্যাতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকা ভালো। একমাত্র মহতেরাই পারে—

—কী বলছো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

অপালা বলিল—আপনার বাবার নাম কত জানেন? সমস্ত দেশের লোক আজ তাঁকে পুজো করছে। স্টেশনে নেমে একজনকে জিজ্ঞাসা করতে সে একেবারে বাড়ির দরজায় এনে পৌঁছে দিয়ে গেল।

অপালা দেখিতে আরও সুন্দর হইয়াছে। আগে শুধুই সুন্দর ছিল, এখন সৌন্দর্যের সহিত নবোন্মেষিত ব্যক্তিত্ব মিশিয়া তাহাকে একটি দুর্লভ মহিমা দান করিয়াছে। চোখে চোখ পড়িলে লজ্জিত হইবে জানিয়াও কাজল মুগ্ধচোখে অপালাকে দেখিতেছিল।

বাতাসে জানালার বাহিরে গাছের পাতায় মর্মরশব্দ উঠিল। অপালা জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

—এটা কী গাছ, টগর না?

কাজল বলিল—হ্যাঁ। খুব ফুল ফোটে, জ্যোৎস্নারাত্তিরে ঘরের আলো নিভিয়ে গাছটার দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে ভারি ভালো লাগে।

—আপনার লেখার খবর শোনান, নতুন কিছু লিখছেন না?

নিজের লেখা সম্বন্ধে কাজল সাধারণত কাহারও সঙ্গে আলোচনা করে না। কিন্তু অপালার সামনে তাহার সমস্ত সংকোচ কাটিয়া গেল, বলিল—একটা উপন্যাস লিখছি। সবে ধরেছি, শেষ হতে দেরি আছে—

অপালা আগ্রহের সহিত বলিল—কী নিয়ে লিখছেন? বলবেন গল্পটা?

—গল্পটা বলা কঠিন, কারণ সেই অর্থে এতে কোন নাটকীয়তা নেই। একজন ছেলের একটু একটু করে বড়ো হয়ে ওঠার গল্প। কেউ ছাপবে কিনা, ছাপলেও পাঠকরা পড়বে কিনা তা জানি না। তবে তুমি দেখতে পারো ইচ্ছে করলে—

পাণ্ডুলিপিটি আনিয়া অপালার হাতে দিতে সে গভীর মনোযোগের সহিত পড়িতে শুরু করিল। কাজল হাসিয়া বলিল—চল্লিশ-পঞ্চাশ পাতা লেখা হয়েছে, সবটাই এখন বসে পড়বে নাকি? কথা বলবে না?

অপালার মুখে বিভিন্ন আবেগ স্পষ্ট হইয়া ফোটে। সে সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে বলিল—আমি এর আগে কখনও কোন লেখকেব পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে দেখিনি, জানেন? এই প্রথম। তাও আবার অপ্রকাশিত রচনা, কেউ দেখার আগেই আমি পড়ছি! অদ্ভুত লাগছে। এই দেখুন, আমার গায়ে কাঁটা দিয়েছে—

—তোমার চেয়ে আমার অদ্ভুত লাগছে বেশি। আমি এখনও একটা লেখকই নই, গুটি চার-পাঁচ গল্প এখানে-ওখানে ছাপা হয়েছে মাত্র, আমার লেখা কেউ আগ্রহ করে পড়ছে, এটা আমার কাছে একটা নতুনত্ব। তুমি বোসো, আমি আসছি একটু—

হৈমন্তীর সবে ঘুম ভাঙিয়াছে। কাজল আসিয়া খাটের ধারে বসিয়া বলিল—মুখে-চোখে জল দিয়ে একবার আমার ঘরে চলো মা, একটি মেয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—

অবাক হইয়া হৈমন্তী বলিল—মেয়ে? কে এসেছে রে?

—তুমি চিনবে না মা। আমার এক বন্ধুর বোন—

এরপরে যে দুই-তিনটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া পড়ে সেগুলি হৈমন্তী চাপিয়া গেল। কাজল নিজেই যেন কিছুটা কৈফিয়তের সুরে বলিল—একবার পিকনিক করতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল। বাংলাদেশে থাকেনা মা—বাইরে মানুষ হয়েছে বলে একা একা চলাফেরা অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। বাবার লেখার খুব ভক্ত, তাই আর কি—

হৈমন্তী বলিল—এসেছে সে তো ভালোই। তুই গল্প কর গিয়ে, আমি কাপড়টা বদলে আসছি—

ঘরে ফিরিয়া কাজল দেখিল জানালার ধারে হাতলওয়ালা চেয়ারটা টানিয়া বসিয়া অপালা

একমনে তাহার লেখা পড়িতেছে। তাহাকে দেখিয়া মুখ তুলিয়া একবার হাসিল, তারপর আবার পড়িতে লাগিল।

মায়ের আসিতে অন্তত মিনিট দশ-পনেরো দেরি আছে। কাজল একটা সিগারেট ধরাইয়া সামনের সরু বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। এখান হইতে অপালাকে স্পষ্ট দেখা যায়। টগর গাছের পাতায় বৈকালী রৌদ্র পড়িয়াছে, পাঠিকার মুখে তাহার আভা। এক-একটা এমন চমৎকার বিকালও আসে জীবনে!

হৈমন্তীর সহিত অপালা অনেক গল্প করিল। কলেজে পড়া মেয়ে, যে একা একা ট্রেনে চড়িয়া পরিচিত মানুষের বাড়ি বেড়াইতে আসিতে পারে, তাহার সম্বন্ধে হৈমন্তী একধরনের মিশ্র মনোভাব লইয়া কাজলের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই অপালা যেভাবে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল এবং পরে তাহার একখানা হাত নিজের কোলে লইয়া পাশে বসিয়া কথা বলিতে লাগিল, তাহাতে শিক্ষিতা এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে এমন মেয়েদের সম্বন্ধে হৈমন্তীর ধারনা আমূল বদলাইয়া গেল। বিশেষ করিয়া অপালা যখন অপুর রচনা হইতে পংক্তির পর পংক্তি মুখস্ত বলিয়া যাইতে লাগিল, তখন হৈমন্তী মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ গল্প করিবার পর হৈমন্তী বলিল—ঐ যাঃ, কথা বলতে বলতে তোমাকে কিছু খেতে দেবার কথা মনেই নেই। দাঁড়াও, তোমাকে কখানা লুচি ভেজে দিই—

অপালা সংকুচিত হইয়া বলিল—কিচ্ছু দরকার নেই মা, আমার ফিরতেও দেরি হয়ে যাবে—

কাজল বলিল—এমন কিছু দেরি হবে না। সন্ধের আগেই তোমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবো'খন। সাড়ে ছটার মধ্যে শেয়ালদায় পৌঁছে যাবে—

অপালা সেই বিরল মেয়েদের মধ্যে একজন, যাহাদের কোন বিষয়ে রাজি করাইতে দীর্ঘসময় ধরিয়া অনুরোধ করিতে হয় না। সে বলিল—ঠিক আছে, আমার সাতটায় পৌঁছলেও চলবে। তাছাড়া খিদেও পেয়েছে সত্যি। চলুন মা, রান্নাঘরে বসে আপনার সঙ্গে গল্প করি—

কিছুক্ষণ বাদে কাজল দেখিল রান্নাঘরের চৌকাঠের উপর বসিয়া অপালা গভীর মনোযোগের সহিত লুচি বেলিয়া দিতেছে, তাহার মা তোলা উনুনে ছোট অ্যালুমিনিয়ামের কড়াইতে আলুর চচ্চড়ি রাঁধিতেছে। সমগ্র দৃশ্যটায় বেশ একটা তৃপ্তিদায়ক সংসার-সংসার গন্ধ।

স্টেশনে যাইবার পথে অপালা বলিল—সেই কোন্ ছোটবেলার পর আর বাংলাদেশে পুজো দেখিনি। এবার আমার জন্যই বাবা এলেন। বাইরে বাইরে থাকলে কী হবে, বাবা মনেপ্রাণে একজন খাঁটি বাঙালি। আপনি পুজোয় কী করছেন?

—কিছুই না। শুয়ে শুয়ে কুঁড়েমি করবো আর বই পড়বো—

—এক কাজ করুন না, আপনি আমাদের কাছে একটা দিন কাটান।

—তোমাদের কাছে? কোথায়?

অপালা বলিল—হুগলির নারায়ণশিলা গ্রামে বাবার মামাবাড়ি। পুজোর চারদিন আমরা সেইখানে থাকব। তাঁদের বনেদি পরিবার, প্রায় দুশো বছরের পুরোনো দুর্গাপূজা হয় বাড়িতে। আপনি অষ্টমী কি নবমীর দিন আসুন না, ঠিকানা বলে দিচ্ছি—খুব ভালো লাগবে।

কাজল বলিল—শুনে তো যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু সেখানে কেউ আমাকে চেনে না—

—সে চিন্তা করবেন না। তাঁরা লোক খুব ভালো, চট করে এমন আপন করে নেবেন যে আপনার মনেই হবে না আপনি নতুন লোক। তাছাড়া—

অপালা চুপ করিয়া গেল। কাজল বলিল—তাছাড়া কী?

অপালা তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল—তাছাড়া আমি তো আপনাকে চিনি। আমি আপনার সঙ্গে থাকবো।

বাড়ি ফিরিবার পথে চৌমাথার মোড়ের দোকান হইতে কাজল এক প্যাকেট সিগারেট কিনিল।

পথে আজ কী কারণে যেন লোকজন কম। বাতাসে কিসের নেশা, প্রতিদিনকার সাধারণ দৃশ্যই চোখে অপূর্ব ঠেকিতেছে। অনেক কিছু যেন বলিবার আছে, এখুনি কাছাকাছি কোন বন্ধুকে পাইলে তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলা চলিত। কিন্তু কী যে বলিত কাজল তাহা অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিল না।

একটা সিগারেট ধরাইয়া কাজল হাঁটিতে শুরু করিবে, পিছন হইতে দোকানী ডাকিল—বাবু, খুচরা পয়সা তো লেকে যাইয়ে—

—ওঃ, হ্যাঁ—পয়সা ফেরত লইতে হইবে বটে।

নদীর ধারে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়াছে। বাড়ি যাইতে গিয়া কাজল কেন যে এখানে আসিল তাহা সে নিজেই জানে না। বৈকালী বায়ুসেবনকারীর দল বেশ কিছুক্ষণ হইল চলিয়া গিয়াছে। আবছা অন্ধকারে বাবলাগাছের সারি বিভিন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে। নদীর ওপারে পশ্চিম দিগন্তে সন্ধ্যাতারার অগ্নিময় ইশারা। পাড়ের কাছে ছলাৎ ছলাৎ করিয়া ঢেউ আসিয়া লাগিতেছে। কাজল বেশ বুঝিতে পারিল জীবন বদলাইয়া যাইতেছে, নতুন দিকে বাঁক নিতেছে। এতদিন যেমন চলিতেছিল তেমন আর চলিবে না। তাহার পছন্দ-অপছন্দ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস আর এতদিন যাপন কবা একক জীবনের বিভিন্ন ছোট-বড় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া একটা বিশেষ ধরনের পরিবর্তনের সুর জাগিয়া উঠিতেছে। নদীর জলের শব্দে, এই সান্ধ্য নির্জনতায় আর পশ্চিমাকাশের নক্ষত্রের দীপ্তিতে যেন আসন্ন সেই পরিবর্তনের সুস্পষ্ট সংকেত।

রাত্রে খাইবার সময়ে হৈমন্তী বলিল—অপালার কথা শুনে মনে হল তোর সঙ্গে ওর অনেকদিনের যোগাযোগ। অথচ তুই বললি এই নাকি তোদের দ্বিতীয়বার দেখা। ব্যাপারটা কী?

কাজল আমতা আমতা করিয়া বলিল—না, মানে—মাঝে-মধ্যে চিঠিপত্র দিত আর কি—

—তুই দিতিস না?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর কাজল বলিল—দিতাম।

হৈমন্তী বলিল—আমি একটা কথা বুঝতে পেরেছি। মেয়েটা তোকে পছন্দ করে। তোর কথা আমি জানিনে—এসব নিয়ে খেলা নয়, ভালো করে নিজের মন বুঝে দেখ—তেমন বুঝলে সময় থাকতে সরে আসা ভালো। নইলে তোর চেয়ে মেয়েটা কষ্ট পাবে বেশি। সবদিক বিচার করে দেখার আগে বেশি ঘনিষ্ঠতা করে ফেলিস না।

জীবনে এই প্রথম মা তাহার সহিত বড়োদের মতো সমানে সমানে কথা বলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নারায়ণশিলা গ্রামটি বনেজঙ্গলে পূর্ণ। মাত্র ত্রিশ মাইল দূরের কলিকাতা শহরে যে বিংশ শতাব্দী তাহার আধুনিক ভাবনাচিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার লইয়া মহাপ্রতাপে রাজত্ব করিতেছে, এ গ্রামের গভীর বাঁশবন, ছায়াচ্ছন্ন আম-কাঁঠালের বাগান আর অধিবাসীদের নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা দেখিয়া তাহা আন্দাজ করিবার কোন উপায় নাই। নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন হইতেও গ্রামটি মাইল চারেক দূর। অপালা গরু বা ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা রাখিতে চাহিয়াছিল, কাজল হাসিয়া বলিয়াছিল—আমি গ্রামেরই ছেলে, চার মাইল হাঁটার ভয়ে কাবু হই না। তাছাড়া ধরো যদি কোনও কারণে না যেতে পারি, তাহলে খামোকা অতদূর এসে গাড়ি ফিরে যাবে। কিছু দরকার নেই—

ছোট সুটকেসটা হাতে লইয়া ধুলায় ভরা পথে হাঁটিতে হাঁটিতে কাজল ভাবিল—কীটস্ কী সত্যি কথাই লিখে গিয়েছেন! শহরের সেই ধোঁয়া আর ময়লা, গাড়িঘোড়ার আওয়াজ—আই হ্যাভ্ লঙ্ বীন ইন এ সিটি পেন্ট্! এমন সবুজ গাছপালা না দেখলে মানুষ বাঁচে?

পথটা এক জায়গায় আসিয়া দু-ভাগ হইয়া গিয়াছে। এখানে একবার জিজ্ঞাসা না করিয়া লইলে পথ ভুল হইবার খুবই সম্ভাবনা। কিন্তু জায়গাটা সেইমুহূর্তে একেবারেই জনমানবশূন্য। কাজল সুটকেসটা নামাইয়া সিগারেট ধরাইল, এখানে একটু বিশ্রাম করিয়া লওয়া যাইতে পারে। পৌঁছাইবার এমন কিছু তাড়া নাই। শহরে সকাল হইতেই কর্মব্যস্ততা শুরু হইয়া যায়। সব কাজেরই পৃথিবীতে প্রয়োজন আছে কিনা কে জানে, কিন্তু দুনিয়াসুদ্ধ লোক সারাদিন খাটিয়া খুন হয়। এমন কি ছুটির দিনেও প্রকৃত বিশ্রাম পাওয়া কঠিন। সবাই যত কাজ জমাইয়া রাখে আর ছুটির দিনে তাহার কাছে আসিয়া হাজির হয়। এইরকম বাহির হইয়া পড়িলে তবে ইচ্ছামতো কিছু করিবার সুযোগ মেলে।

রাস্তার ধারেই মাদারগাছের ডালে কিচ্‌কিচ্‌ করিয়া শালিক ডাকিতেছে। ঝিরঝিরে বাতাসে মুক্তির স্বাদ। বর্ষার জলে সতেজ হইয়া গাছপালা গভীর সবুজ সাজ পরিয়াছে। পৃথিবীর অনেক স্থানে ব্যবসায়িক লাভের জন্য এমন সুন্দর অরণ্যশোভা কাটিয়া নষ্ট করিতেছে ভাবিলেও মনের মধ্যে কেমন করে! তেমন ঝাঁকালো একখানা গাছ বড়ো হইতে লাগে পঞ্চাশ-ষাট কী একশো বছর। আর কাটিতে বড়োজোর একদিন। বিলাত-আমেরিকায় বৈদ্যুতিক করাত দিয়া আধঘণ্টায় পনেরো ফুট বেড়ের গাছ কাটিয়া ফেলিতেছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় 'জেনারেল শেরম্যান' নামে নাকি একটি বিশাল রেডউড গাছ আছে, তাহার বয়েস প্রায় চার-পাঁচ হাজার বছর। ভাবিলে অবাক লাগে, ওই গাছটি যখন একশো-দেড়শো বছরের তরুণ, তখন মানুষ সবে কিছুকাল গুহা হইতে বাহির হইয়া সভ্যতা গড়িতেছে—মেসোপটেমিয়ায় বর্ণলিপির অভ্যুদয় ঘটিতেছে, মিশরে ফারাও খুফুর পিরামিড তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। মানবসভ্যতার সেই অস্পষ্ট উষাকালের সাক্ষী পাঁচহাজার বৎসরেব ওই রেডউড গাছ। কিন্তু হইলে কী হইবে, কাঠের লোভে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ব্যবসায়ীর দল উহা কাটিল বলিয়া। আধুনিক যুগ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিই সত্য, সাধে কী আব লোকে তাঁহাকে ঋষি বলে! কমলাকান্ত আফিংয়ের ঘোরে যাহা বলিতেছে, তাহা বঙ্কিমেরই হৃদয়ের কথা। কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা—এই যে মানুষ এত টাকা করিতেছে, রেলগাড়ি বানাইতেছে, টেলিগ্রাফের কল বানাইতেছে, মানুষে মানুষে প্রণয়ের একটা কল অবিষ্কার কবা যায় না? নহিলে আর সব কলই যে বেকল হইয়া যাইবে।

আজও হয় নাই। কে জানে কোনোদিন হইবে কিনা।

কাজলের সিগারেট শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দূরে পথেব উপব একজন লোক দেখা দিল। লোকটা স্টেশনের দিক হইতেই আসিতেছে। কাছে আসিতে বোঝা গেল মানুষটি পুবোহিত শ্রেণির। তাহাব পরনে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, গায়ে নামাবলী, ছোট ছোট কবিয়া চুল ছাঁটা। কপালে এবং নাকে চন্দনের ছাপ। খালি পা, হাতে একখানি পিতলের সাজি—তাহাতে পূজার কিছু উপকরণ। সে হনহন করিয়া হাঁটিয়া আসিল এবং কাজলের সামনে দাঁড়াইয়া পড়িয়া অমায়িকভাবে একগাল হাসিল।

কাজল তাহাকে আদৌ চেনে না, কাজেই এ ঘনিষ্ঠ হাসির মর্মোদ্ধার করিতে না পারিয়া সে কী বলিবে ভাবিতেছে, এমন সময় লোকটিই তাহাকে প্রশ্ন করিল—বাবু কী কোথাও যাবেন? এখানে দাঁড়িয়ে আছেন যে?

কাজল তাহার গন্তব্যের কথা বলায় সে বলিল—খুব চিনি, আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আমিও তো সেখানেই যাচ্ছি। আপনার বুঝি সেখানে নেমন্তন্ন?

লোকটির বয়েস বেশি নয়, কাজলেরই সমান হইবে। বাকি পথটা সে আপনমনে গল্প করিতে করিতে চলিল। তাহার কথাবার্তা শুনিয়া মনে হয় সে পুরাপুরি পাগল না হইলেও কিছুটা ছিটগ্রস্ত বটেই।

কাজল বলিল—আপনি কী এই গ্রামেই থাকেন?

উত্তরে লোকটি জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কী ব্রাহ্মণ?

কাজল বলিল—হাঁ। কেন বলুন তো?

—তাহলে আমাকে 'আপনি' বলবেন না। বয়েসে আমি আপনার চেয়ে কিঞ্চিৎ ছোটই হব—

বলিয়া সে নিচু হইয়া খপ্ করিয়া কাজলের পায়ের ধুলা নিতে গেল। কাজল ব্যস্ত হইয়া বলিল—আরে না না, থাক। আচ্ছা তুমিই বলবো এখন—

পথ চলিতে চলিতে লোকটি বলিল—আমার নাম নন্দলাল—নন্দলাল চক্রবর্তী। থাকি এখান থেকে চারক্রোশ দূরে নাটাবেড় গ্রামে। সকালবেলা উঠে পুজোআচ্চা সেরে এতটা পথ হেঁটে আসতে বেলা হয়ে গেল। আসবার সময় আবার মহেন্দ্র বিশ্বাসের আড়তে গণেশের নিত্যপূজাটা করে আসতে হল কিনা—ওরা মাসে তিন টাকা করে দেয়, আর এই পুজোর আগে একখানা কাপড়। এই দেখুন না, তাদের দেওয়া কাপড়ই তো পরে রয়েছি। কেমন, ভালো না?

কাজল বলিল—হ্যাঁ, বেশ সুন্দর।

—হবে না কেন বলুন! বিরাট বড়োলোক তাঁরা, বাবার আমল থেকে আমাদের যজমান। বাবা বাতের ব্যথায় চলাফেরা করতে পারে না, তাই এখন আমিই পুজো সারি। তবে বড়োলোক হলেই হয় না, দেবার মনও থাকা চাই। লালু মুখুজ্জের বাড়ি গত তিনবছর ধরে প্রতি পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ পুজো কবছি—তা ববাবর সেই একসিকি দক্ষিণা আর দেড়সের চাল! এবার কত বললাম—আমার পুজো করার কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছে, একখানা কিনে দাও। শেষ অবধি কী দিলো, জানেন?

—কী?

—একখানা গামছা। তাও আবার কেমন, ষষ্ঠীর দিন সেইটে পরে চান করেছি—তারপর দেখি রঙ উঠে কোমরের নিচে থেকে হাঁটু অবধি একদম সবুজ। বুঝুন কাণ্ড!

কাজল বলিল—তোমারও বুঝি পুজোবাড়িতে নেমন্তন্ন?

নন্দলাল সহজভাবেই বলিল—না, আমায় কী আর আলাদা করে চেনে যে নেমন্তন্ন করবে? পুজোয় ভালো খাওয়ায় শুনে গতবছরও এসে খেয়ে গিয়েছিলাম। ব্রাহ্মণের এতে কোন অপমান নেই, বলুন! আমাদের পেশাই হল ভিক্ষা। ওই যে, পুজোবাড়ি দেখা দিয়েছে—

রাস্তা হইতে একটু ভিতরে ঘন সবুজ গাছপালার ছায়ায় বাড়িটা। জায়গায় জায়গায় পলেস্তারা খসিয়া সেকেলে পাতলা ইঁট দেখা যাইতেছে। ঢুকিবার দরজার দুই পাশে পূর্ণঘট এবং কলাগাছ বসানো। দরজা পার হইলেই বিশাল বাঁধানো উঠান, উঠানের প্রান্তে ঠাকুরদালান। সেখানে ডাকের সাজ দেওয়া দেবীপ্রতিমার সামনে কয়েকটি বালক-বালিকা বসিয়া কলরব করিতেছে। লালপাড় গরদের শাড়ি পরা ফরসা একজন প্রৌঢ়া মহিলা হাতে একটি তামার পাত্র লইয়া কী কাজে ঠাকুরদালানে আসিতেছিলেন, কাজলকে দেখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে বাবা? কাউকে খুঁজছো?

কাজল উত্তর দিবার আগেই কোথা হইতে অপালা আসিয়া হাজির হইল।

—ওমা! সত্যি এসেছেন তাহলে! আসুন, বাড়ির ভেতরে আসুন—পথ চিনতে অসুবিধে হয়নি তো?

নন্দলালের বোধহয় আরও গল্প করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কাজল বাড়ির ভিতর চলিয়া যাওয়ায় সে ঠাকুরদালানের একদিকে দুপুরবেলা খাওয়ার ডাক পড়িবার আশায় বিমর্ষমুখে একা বসিয়া রহিল।

অপালার দাদু-দিদিমা মানুষ ভালো, তাঁহারা কিছুক্ষণের মধ্যেই কাজলকে একান্ত আপন করিয়া লইলেন এবং অপালার সহিত তাহার সম্পর্ক লইয়া নানাবিধ ইঙ্গিতপূর্ণ রসিকতা করিয়া আসর জমাইয়া তুলিলেন। অপালার বাবা স্বল্পবাক মানুষ কিন্তু তাঁহার সংযত ব্যক্তিত্বের মধ্য হইতে একটা সহৃদয়তার প্রভাব ফুটিয়া বাহির হয়। তিনি অপুর বইয়ের পরম ভক্ত, অপুর ছেলেকে দেখিয়া প্রকৃতই খুশি হইলেন।

দুপুরে ঠাকুরদালানের ডানধারে লম্বা বারান্দায় চাটাইয়ের আসন পাতিয়া খাইবার জায়গা হইল। এক সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশজন লোক দুই সারিতে বসিয়া খাইতেছে। কাজলের মুখোমুখি নন্দলাল

বসিয়াছে, চোখে চোখ পড়িতে সে খুশির হাসি হাসিল। খাইবার পদের বিশেষ বাহুল্য নাই। নিজেদের চাষের ঈষৎ মোটা চালের ভাত, কুমড়োভাজা, ডাল, দুইরকম তরকারি, চাটনি ও পায়েস। কাজলের পাতে চাটনি পড়িবার সময় সে তাকাইয়া দেখিল নন্দলাল তৃতীয়বার ডাল চাহিয়া লইয়া ভাত মাখিতেছে।

খাইবার পর অপালা সমস্ত বাড়িটা ঘুরিয়া দেখাইল। বলিল—এটা কিন্তু নতুন বাড়ি, দাদুদের আদি বাড়ি ওইদিকে, আসুন দেখাই—

আম-জাম-কাঁঠাল গাছের সারি পার হইয়া একটা বহু পুরাতন পাকাবাড়ির ধ্বংসস্তূপ আগাছার জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া আছে। ছাদ ভাঙিয়া পড়িয়াছে অনেকদিন, ইঁট বাহির হওয়া দেওয়ালগুলি কোনমতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। খসিয়া পড়া কড়ি-বরগা এমনভাবে ছড়াইয়া আছে যে, তাহা পার হইয়া ভিতরে যাওয়া অসম্ভব।

অপালা বলিল—প্রায় একশো বছর ওই বাড়ি এমনি পড়ে রয়েছে, দাদুর ঠাকুরদার আমলের বাড়ি। তখন আমরা এই অঞ্চলের জমিদার ছিলাম, জানেন?

অপালা তাহার বংশের পূর্ববৃত্তান্ত বলিতেছিল। শুনিতে শুনিতে কাজল অন্যমনস্ক হইয়া গেল। বিশাল বাড়ির ভগ্নস্তূপটা তাহাকে কেমন যেন মুগ্ধ করিয়াছে। কেমন ছিল একশত বৎসর আগের সেই মানুষগুলি? যাহারা এই বাড়িতে বাস করিত, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করিত? তাহাদের কাছে একান্ত বাস্তব সেই বর্তমান আজ এক শতাব্দী পিছাইয়া পড়িয়াছে—যেমন সে নিজে একদিন অতীত ইতিহাসে পর্যবসিত হইবে।

সান্ধ্য-আরতি ও ভোগের আয়োজনে সাহায্য করিতে অপালা বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল। দুই-একজন ছাড়া কাজল এ বাড়ির অন্যদের এখনও ভালো করিয়া চেনে না, অচেনা মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঢুকিবার ইচ্ছা না করায় সে আমবাগানের ওপাশে দীঘির বাঁধানো ঘাটের উপর আসিয়া বসিল। একেবারে উপরের ধাপে বসিবার জন্য দুই দিকে বেদি করা আছে, তাহারই একটিতে নন্দলাল চক্রবর্তী অঘোরে ঘুমাইতেছে। দীঘির জলে প্রাচীন গাছেদের শান্ত ছায়া। অপরাহ্ন গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, গাছের ডালে ডালে বাসায় ফিরিয়া আসা পাখিদের কলরব। এই শান্তির আবাস ছাড়িয়া লোভী মানুষ শহরে চলিয়া গিয়াছে। ভুল বুঝিয়া যখন ফিরিবে, এই পরিবেশ আর থাকিবে কি?

নন্দলাল ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বসিল, আড়ামোড়া ভাঙিয়া চারদিকে তাকাইয়া বলিল—যাঃ, বেলা গিয়েছে দেখছি!

কাজল বলিল—ভালো ঘুম হল? তোমার বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যাবে—

—আজ আর ফিরবো না ভাবছি। শুনলাম ঠাকুরবাড়ি রাত্তিরে লুচি-ভোগ হবে। জনাই থেকে মণ্ডা এনেছে, তাও দেবে। আমরা গাঁয়ের মানুষ, এসব তো বড়ো একটা খেতে পাই না—আমাদের এদিকে পুজোর প্রসাদ বলতে দুটো আখের টিকলি, একমুঠো কুচোনো ফলমূল আর কয়েকটা পিঁপড়েধরা ফোঁপরা বাতাসা। থেকে যাই রাতটা—

কাজল জিজ্ঞাসা করিল—না ফিরলে বাড়ির লোক ভাববে না? বলে এসেছো?

—কে ভাববে বলুন! আমার মা নেই, ছোটবেলাতেই মরে গিয়েছে। বাবা একজন সেবাদাসী রেখেছে—সে আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। ভাববে কে?

কাজল অবাক হইয়া বলিল—সেবাদাসী মানে?

নন্দলাল নির্বোধের মতো হাসিয়া বলিল—মানে যা, তাই। বিয়ে করা বউ নয়, তবু বারো বছর আমাদের সংসারে রয়েছে। নিজের বাবার কথা নিজে বলতে লজ্জা করে। এখন বাবার শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছে, সংসারের সবকিছু সেই সেবাদাসীর হাতের মুঠোয়। আমি ফিরলাম কী ফিরলাম না কেউ খোঁজও করবে না হয়তো—

পুকুরের জলের দিকে তাকাইয়া কিছুক্ষণ নন্দলাল কী ভাবিল, তারপর কাজলকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কখনও জনাইয়ের মণ্ডা খেয়েছেন?

কাজল হাসিয়া বলিল—কী জানি, মনে পড়ছে না—

—তাহলে খাননি। ও জিনিস খেলে মনে থাকত। ওপরে পাত্‌লা চিনির রসের পলেস্তারা থাকে, তার ভেতরে নরম সন্দেশ। নাম হচ্ছে—কী যেন বলে—মনোহরা। চৌধুরীদের ছোট মেয়ের বিয়েতে খাইয়েছিল। ওই একবারই খেয়েছি। তা আজ যখন শুনলাম—পুরুতমশাইও দালানের একদিকে থাকতে দিতে রাজি হয়েছেন—থেকেই যাই—

মুখ-হাত ধুইবার জন্য নন্দলাল ঘাটের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। সেদিকে তাকাইয়া এই সুখাদ্যলোলুপ দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তানটির জন্য কাজলের মায়া হইল। একবার ইহাকে তাহাদের বাড়ি নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলে হয় না?

সন্ধ্যাবেলা আরতির পর কাজল আবার দীঘির ঘাটে গিয়া বসিল। বাঁধানো ঘাটে নবমীর জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। ওপারের নারকেল গাছের পাতায় চাঁদের আলো পড়িয়া চিকচিক করিতেছে। খানিকক্ষণ এমন জায়গায় বসিলেই মনের সব ঢেউ শান্ত হইয়া আসে। সুটকেস হইতে খাতা আর কলমটা লইয়া আসিলে চাঁদের আলোয় কবিতা লেখা যাইত।

হঠাৎ ছোট্ট হাসির শব্দে চমকাইয়া কাজল দেখিল কখন ঘাটের উপর অপালা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

—আমি ঠিক ভেবেছি আপনি এইখানে এসে বসে আছেন।

কাজল বলিল—শহরে থাকি তো, এমন জ্যোৎস্না, পুকুরঘাট, এমন নির্জনতা—এ সবই আমার কাছে নতুন। বেশ লাগছিল বসে থাকতে।

অপালা বলিল—আমার কাছেও। বাংলার গ্রাম তেমন করে দেখিই নি। লোকে পয়সা খরচ করে দূর দেশে বেড়াতে যায় কেন বলুন তো? যা আমি আগে কখনও দেখিনি, তাই তো আমার কাছে রহস্যময় নতুন দেশ, না?

কাজল অপালার সহিত একমত হইল।

বাড়ি হইতে দূরে পুকুরঘাটে রাত্রিবেলা অবিবাহিতা কোন মেয়ের অনাত্মীয় যুবকের সহিত এভাবে বসিয়া গল্প করাটা সমীচীন নয়, বাঙালি সমাজে মানুষ না হওয়ায় অপালা তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। কিন্তু তাহার নিষ্পাপ সারল্যে আঘাত করিতে কাজলের বাধিল। সে বলিল—একটু একটু হিম পড়তে শুরু করেছে, না? চলো বরং বাড়ির ভেতবে গিয়ে বসি—

অপালা প্রখর বুদ্ধিমতী, কিন্তু জীবনের ব্যবহারিক দিকগুলিতে তাহার কোনো অভিজ্ঞতাই নাই। সে কাজলের ইঙ্গিত বুঝিতেই পারিল না, বলিল—আপনি ভারী শীতকাতুরে তো! কোথায় হিম? আমার মতো ছোটবেলা থেকে হিমালয়ের কাছাকাছি থাকলে বুঝতেন শীত কাকে বলে! বসুন না আর একটু, গল্প করি—

বাধ্য হইয়া কাজল বসিল। সামাজিকতার হানি ঘটে বলিয়া মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি থাকিলেও অপালার মতো মেয়ের সহিত জ্যোৎস্নায় একান্তে বসিয়া কথা বলিবার নেশা আছে। দুইজনে অনেক গল্প করিল। বেশির ভাগ গল্পেরই তেমন কোন প্রাসঙ্গিকতা নাই। কিন্তু প্রথম যৌবন, শরতের আশ্চর্য জ্যোৎস্না সামনে বিস্তৃত, পথের সবটা দেখা যায় না—কে জানে তাহার অদৃষ্টে বাঁকে বাঁকে কত রোমাঞ্চ ও শিহরণ অপেক্ষা করিয়া আছে—প্রাসঙ্গিকতার খোঁজ কে করে, তারুণ্যই আসল, তারুণ্যের আনন্দই মানুষকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে।

চন্দ্রালোকিত এই রাত্রির কথা সে কোনোদিন ভোলে নাই।

পরের দিন বিদায় লইয়া চলিয়া আসিবার সময় নন্দলাল আবার সঙ্গী হইল। কিছুদূর হাঁটিবার পর নন্দলাল হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। কাজল বলিল—কী হল? থামলে যে?

নন্দলাল ঘাড় চুলকাইয়া লজ্জিতমুখে বলিল—আপনি একটু এগিয়ে ওই পথের মোড়ে একটু বসুন, আমি এক্ষুনি আসছি—

কাজল প্রথমে বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন, তুমি কোথায় যাচ্ছো?

—এইখানে পথের ধারে জল আছে, সুবিধে হবে। আপনি বসুন, আমি এক্ষুনি আসব।

রাস্তার পাশে নয়ানজুলিতে জল জমিয়া আছে বটে। সেদিকে তাকাইয়া কাজল ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল। গতরাত্রে অপরিমিত লুচি ও মণ্ডা খাইয়া নন্দ বেসামাল হইয়াছে। লোকটাকে ফেলিয়া আসা যায় না, তাহাকে কিছুক্ষণ বসিতেই হইল।

তাহার ট্রেন আসা পর্যন্ত নন্দলাল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া রহিল। কাজল তাহাকে ঠিকানা দিয়া বলিল—সুযোগ করে একদিন আমার বাড়ি যেয়ো, আমার মা খুব ভালো রান্না করেন, তোমাকে পেট ভরে খাওয়াব—

নন্দলাল কৃতজ্ঞতার হাসি হাসিল।

বিজয়ার দিন সন্ধ্যাবেলা কাজল নদীর ধারে প্রতিমা বিসর্জন দেখিতে গেল। অন্যদিন এই সময়ে জায়গাটা নির্জন হইয়া আসে। আজ সেখানে বহু লোকের চেঁচামেচি। মানুষের কাঁধে করিয়া, লরি করিয়া ঠাকুর আসিতেছে। সব দলই সঙ্গে করিয়া পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন আনিয়াছে, কেহ কেহ আবার মশাল জ্বালাইয়া হাতে লইয়াছে। কোন ঠাকুর ঘাটের ধাপে দাঁড়াইয়াই বিসর্জন হইল, কোন দল নৌকায় চাপাইয়া মাঝনদীতে প্রতিমা লইয়া চলিল, সেখানে বিসর্জন দেওয়া হইবে। ঘাটের উপর কোলাহলরত জনতার দিকে তাকাইয়া কাজলের বছর-চারেক আগের এমনই একটি বিজয়ার দিনেব কথা মনে পড়িল।

সে তখন সবে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হইয়াছে। আজকের মতোই একা ঘুরিতে ঘুরিতে নদীব ধারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ঠিক সেই সময়টা নদীর ধার নির্জন, কোন প্রতিমা নাই। কাজলের হঠাৎ নদীর জলে একটু হাত ডুবাইতে ইচ্ছা করিল। কোন বিশেষ কারণে নয়, প্রবহমান জল দেখিলেই মানুষের স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করে, তাই। আস্তে আস্তে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গিয়া সে ঠাণ্ডা জলে আঙুল দিয়া রেখা কাটিয়া খেলা করিতে লাগিল। ভেজা হাত লইয়া মুখে বুলাইয়া দিল। কিছুক্ষণ বসিবার পর হঠাৎ ঢাক-ঢোলের শব্দে উপরে তাকাইয়া দেখে প্রতিমা লইয়া একটি বিসর্জনের দল আসিয়া হাজির হইয়াছে। সে সন্ত্রস্ত হইয়া একপাশে সরিয়া গেল। যাহারা বিসর্জন দিবে তাহারা দাঁড়াইয়া রহিল। সম্ভবত কাহাদের বাড়ির পূজার ঠাকুর, বাড়ির মহিলারাও সঙ্গে আসিয়াছেন। উপরে উঠিতে গিয়া কাজল থামিয়া গেল।

দলের মধ্যে একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া বিসর্জন দেখিতেছে। বছর সতেরো-আঠারো বয়েস। পরনে লালপাড় সাদা শাড়ি। ঘনকুঞ্চিত লম্বা চুল কোমর ছাড়াইয়া নামিয়া আসিয়াছে। পাশেই কাহার হাতে মশাল জ্বলিতেছে, মেয়েটির মুখে সেই আলোর প্রভা। গোল মুখখানি, টানা-টানা দুই চোখ—মশালের আলো পড়িয়া যেন দুর্গাপ্রতিমার মুখে ঘামতেল চকচক করিতেছে।

দৃশ্যটা ভারি সুন্দর লাগিয়াছিল। কাহাদের মেয়ে কে জানে? হয়তো কবেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কতদূরে চলিয়া গিয়াছে হয়তো বা। তবু চার বছর আগের ঘটনাটা সে ভুলিতে পারে নাই। আজ আবার মনে আসিল।

বাড়ি ফিরিয়া মাকে বিজয়ার প্রণাম করিতেই হৈমন্তী বলিল—তুই এসে গিয়েছিস, ভালো হয়েছে। এত দেরি করলি কেন? একটা রিক্শা ডেকে নিয়ে আয় দেখি, মায়ের কাছে যাব—

কাজল বলিল—আজ রাত্তিরে আর কেন মা? কাল সকালে বরং—

—না রে, এখুনি একবার যেতেই হবে। তুই বাড়ি ছিলি না, প্রতাপ এসে খবর দিয়ে গেল মায়ের খুব শরীর খারাপ। আমি আজই একবার যাব।

দিদিমার শরীর খারাপ শুনিয়া কাজলের চিন্তা হইল। দাদু মারা যাইবার পর হইতেই দিদিমা কেমন একরকম যেন হইয়া পড়িয়াছেন। আগেই হৃদ্‌যন্ত্রের গোলমাল ছিল, আজকাল বিছানা ছাড়িয়া ওঠা দূরের কথা, নিজে পাশও ফিরিতে পারেন না। সেবা ও পরিচর্যার জন্য সবসময়ে কাহাকেও কাছে থাকিতে হয়। কাজল সপ্তাহে অন্তত দুইদিন গিয়া দিদিমাকে দেখিযা আসে।

মামাবাড়ির বারান্দায় পুরাতন চাকর ভূষণ বসিয়া আছে। তাহারা রিক্‌শা হইতে নামিতেই সে 'মেজদি এসেছেন?' বলিয়া হৈমন্তীকে প্রণাম করিল।

—ভালো আছো ভূষণ? মা কেমন আছে?

—খুব ভালো না। আজ একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে। যান, ভেতরে যান—

ঘরে ঢুকিয়া কাজল দেখিল দিদিমা চোখ বুঁজিয়া শুইয়া আছেন। দুই অবিবাহিতা মাসি সীতা ও প্রভা পাশে বসিয়া হাওয়া করিতেছে ও কপালে জলপটি দিতেছে। হৈমন্তীকে দেখিয়া প্রভা মায়ের কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল—মা, ও মা—মেজদি এসেছে—

বার-দুই বলিবার পর দিদিমা একবার তাকাইয়া দেখিলেন। উদাসীন নিস্পৃহ দৃষ্টি। তারপব আবার চোখ বন্ধ করিয়া পড়িয়া রহিলেন।

হৈমন্তী খাটের এককোণে বসিয়া বলিল—কবে থেকে এমন হযেছে?

প্রভা বলিল—আজই সকাল থেকে। নইলে তো তোকে আগেই খবর দিতাম। তাও এতটা বাড়াবাড়ি হবে বুঝতে পারিনি। সকালে বলছিলেন মাথায় ব্যথা কবছে, মাথা ঘুরছে। দুপুবেব পর থেকে দেখি আব বিশেষ কথাবার্তা বলছেন না—

—প্রতাপ কোথায়?

সীতা বলিল—দাদা হেমন্তবাবুকে খবর দিতে গিয়েছে—

হেমন্তবাবু আজ বহুদিন মামাবাড়ির পারিবারিক চিকিৎসক। হঠাৎ কোন ছোটোখাটো প্রয়োজনে পাড়াব সুরেশ ডাক্তারকে ডাকা হইলেও বিপদ ঘোরালো হইলে হেমন্তবাবুই ভবসা। বেঁটেখাটো কিন্তু বিপুলায়তন মানুযটি। পোশাকে নিখুঁত পবিচ্ছন্নতা আছে। সমস্ত ব্যক্তিত্বে সহৃদয় বহুদর্শিতার ছন্দ। হেমন্তবাবু সেই বিবল চিকিৎসকের একজন, যাঁহারা ঘরে ঢুকিলেই বোগী আশ্বাস পাইয়া বালিশে ভর দিয়া উঠিয়া বসে।

এই সময়েই প্রতাপ হন্তদন্ত হইয়া ফিবিয়া আসিল। সঙ্গে ডাক্তারবাবু আসিয়াছেন। ধপধপে সাদা শার্ট সাদা প্যান্টেব নিচে গুঁজিয়া পরা, লোমশ মোটা হাতে গোল বড়ো ডায়ালেব ঘড়ি, চলাফেরায় একটা অ-ত্বরিত বিচক্ষণতা। তিনি ঘরে ঢুকিতেই সবাই দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। হৈমন্তী জিজ্ঞাসা করিল—ভালো আছেন ডাক্তারবাবু?

হেমন্তবাবু হাসিয়া বলিলেন—ভাল আছি। আপনি ভালো তো?

হৈমন্তী ছাড়া এ বাড়ির সকলকে তিনি 'তুমি' সম্বোধন করেন। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও হৈমন্তীকে 'আপনি' বলা ছাড়িতে পাবেন নাই। হেমন্তবাবু অপুব বইয়ের ভক্ত পাঠক। সম্ভবত অপুর প্রতি শ্রদ্ধাবশত তাহাব স্ত্রীকে কন্যার বয়েসী হওয়া সত্ত্বেও সম্মান জানানো উচিত মনে করেন।

দিদিমাকে দেখিয়া ডাক্তারবাবু হাত ধুইবার জন্য বারান্দায় আসিলে কাজলও সঙ্গে আসিল। প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিল—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

সীতার কাছ হইতে তোয়ালে লইয়া হাত মুছিতে মুছিতে হেমন্তবাবু বলিলেন—বিশেষ ভালো নয়। এখুনি হয়তো কিছু হবে না, আমি ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি, আপাতত সামলে যাবেন এখন। কিন্তু হার্ট খুব উইক। তোমাদের মন প্রস্তুত করো—

প্রতাপ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—তাছাড়া কি হয়েছে জানো? তোমার বাবা মারা যাবার পর ওঁর বাঁচার ইচ্ছেটাই উনি

হারিয়ে ফেলেছেন। সি উইল টু লিভ্—এইটে খুব বড়ো কথা। শুধু ওষুধে রোগ সারে না, সঙ্গে ওটাও দরকার হয়। মাকে আর বেশিদিন রাখতে পারবে না—

আজ দিদিমাকে দেখিয়া কাজলেরও সেই কথা মনে হইয়াছিল।

বাড়ি ফিরিবার সময় হৈমন্তী বলিল—মার যেমন অবস্থা দেখলাম—তুই একটু ঘন ঘন এসে খবর নিয়ে যাবি, কেমন?

কাজল সংক্ষেপে বলিল—যাবো।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মা গিয়াছে। শৈশবে বাবা। এখন দিদিমা চলিয়া গেলে পুরাতন দিনগুলির সহিত একটা সত্যকারের বিচ্ছেদ ঘটিয়া যাইবে।

কিন্তু ইহাই নিয়ম। ইহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ খাটে না।

স্কুলে পড়াইতে গিয়া কাজল একটা জিনিস লক্ষ করিল। বেশির ভাগ ছাত্রই ইংরেজিতে ভয়ানক কাঁচা। এ বিষয়ে কিছু ব্যবস্থা করিতে গেলে প্রথমেই রুটিনে ইংরেজির ক্লাস কিছু বাড়ানো প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে একদিন সে হেডমাস্টারের সঙ্গেও কথা বলিল। উত্তরে হেডমাস্টার বলিলেন, প্রতিবারের মতো এই বৎসরও সিনিয়র টিচাররা অনেক মাথা খাটাইয়া রুটিন তৈরি করিয়াছেন, নতুন ক্লাস দিবার মতো কোন ফাঁক তাহাতে নাই।

কাজল বলিল—ওপরের ক্লাসগুলোয় হপ্তায় দু-তিনদিন এইটথ্ পিরিয়ড্ ইনট্রোডিউস্ করে দেখলে হয় না স্যার?

হেডমাস্টার নিজের বিরলকেশ মস্তকে একবার হাত বুলাইয়া মৃদু হাসিলেন, তারপর বলিলেন—আমি অবশ্য এই স্কুলে কয়েকমাস হল এসেছি, শিক্ষক বা ছাত্রদের মানসিকতা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা হয়তো উচিত নয়। কিন্তু তবু আমার অভিজ্ঞতা বলে, ওটা সর্বত্রই এক। আপনার এই প্রস্তাব শিক্ষকমহলে সমর্থিত হবে বলে আমি মনে করি না। এমনিতেই তাঁরা মনে করেন তাঁরা ওভারবার্ডেনড্—নিজেদের রুটিনের ক্লাস ছাড়াও অনুপস্থিত শিক্ষকদের ক্লাস ভাগ করে নিতে হচ্ছে। এর ওপরে আর ক্লাস বাড়ালে—না অমিতাভবাবু, আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার উদ্যোগ অ্যাপ্রিসিয়েট করছি, কিন্তু আপনার প্রস্তাব খুব প্রাকটিক্যাল নয়—

—স্যার, আমি যদি নাইন আর টেনের ছাত্রদের নিয়ে ছুটির পর স্পেশাল ক্লাস করি?

হেডমাস্টার আবার হাসিলেন। বলিলেন—ইনডমিটেবল্ ইয়ুথ, অ্যাঁ! তা চেষ্টা করে দেখতে পারেন। ছাত্রদের ভালোর জন্য কিছু করলে আমি তাতে বাধা দেব কেন? তবে আমার পরামর্শ এই—ও কাজ করতে যাবেন না। অফিসিয়াল রুটিনের ক্লাস না হলে অনেকেই স্পেশাল ক্লাসে থাকবে না, কিছু একটা অজুহাত দেখিয়ে পালিয়ে যাবে। আপনিও তাদের শাস্তি দিতে পারবেন না। কিছুদিন পর স্পেশাল ক্লাস আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে। তাতে আপনার এবং স্কুলের সুনামের হানি হবে।

কাজল বিমর্ষ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

রুটিন বাড়ানো সম্ভব নয়। স্পেশাল ক্লাস নেওয়াও হেডমাস্টার সমীচীন মনে করেন না। কিন্তু কী করিলে ছাত্রদের উন্নতি হয় সে বিষয়ে তো আলোচনা হইল না? ছাত্রদের যা অবস্থা, কিছু বাড়তি পড়াশুনা না করিলে বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজির ফল বিভীষিকাময় হইবে। ইংরেজির অপর দুইজন শিক্ষক বহুদিন ধরিয়া কাজ করিতেছেন। নতুন কিছু করিবার উৎসাহ অনেককাল হইল ফুরাইয়াছে। তাঁহারা নির্দিষ্ট ক্লাসগুলি সারিয়া টিচার্স রুমে আসিয়া নস্য লন এবং ভাগাভাগি করিয়া খবরের কাগজ পড়েন। ছাত্ররা চরিয়া খায়।

ভাবিয়া ভাবিয়া কাজল একটা উপায় বাহির করিল। ক্লাস লইতে গিয়া নাইন ও টেনের ছাত্রদের সে বলিল—আমি তোমাদের কিছু কিছু করে হোম-টাস্ক দেব। এর জন্য তোমরা একটা

আলাদা খাতা করবে। কেবল ব্যাকরণ মুখস্থ করে ভালো ইংরেজি শেখা যায় না, বাড়িতে তোমরা সোজা ইংরেজিতে লেখা ছোট ছোট বই পড়বার চেষ্টা করবে। যারা উৎসাহী, তারা আমার বাড়িতে গেলে আমিও এ ধরনের বই দিতে পারব। ক্লাসেও আমি সহজ ইংরেজিতে মাঝে মাঝে গল্প বলব। তারপর তার থেকে প্রশ্ন লিখতে দেব। তোমরা বাড়িতে তার উত্তর লিখে ক্লাসে আমাকে এনে দেবে। আমি অবসর সময়ে কারেক্ট্ করে ফেরত দেব। দেখবে এতে তোমাদের উপকার হবে—

কাজলের প্রস্তাবে ছাত্রদের মধ্যে খুব উৎসাহ দেখা গেল। সকলেই কিছু ফাঁকিবাজ ছাত্র নয়। অনেকেই সন্ধ্যাবেলা কাজলের বাড়ি গিয়া বই লইয়া আসিতে লাগিল। তাহার ক্লাসে টেবিলের উপর হোম-টাস্কের খাতার পাহাড় জমিয়া যায়। অফ পিরিয়ডে সে লাইব্রেরি ঘরে বসিয়া সেগুলি দেখে। পরের দিন টিফিনের সময় ছেলেরা ফেরত লইয়া যায়।

একদিন টিফিন পিরিয়ডে লাইব্রেরি ঘরে ছোকরা টিচারদের আড্ডা জমিয়া উঠিয়াছে। দপ্তরী কেশব ঘরের কোণে স্টোভ জ্বালিয়া চা বানাইয়া দুইটি বিস্কুটসহ সকলকে দিতেছে। মাঝে মাঝে দু-একজন ছাত্র আসিয়া কাজলের নিকট হইতে খাতা ফেরত লইয়া যাইতেছে। এমন সময় প্রৌঢ় ইতিহাসের শিক্ষক রামনাথবাবু দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ভিতরে উঁকি দিলেন। ছোকরারা একটু সন্ত্রস্ত হইয়া গুঞ্জন বন্ধ করিল, যাহারা ধূমপান করিতেছিল তাহারা সিগারেট লুকাইয়া ফেলিল। বিশ্বেশ্বর ভট্চায বলিল—কিছু বলবেন নাকি রামনাথদা? আসুন ভেতরে আসুন—

—না, তোমরা বসো। এ ঘরে টিফিনের সময় আজ ক'দিন ধরে ছাত্ররা খুব যাতায়াত করছে, তাই দেখতে এলাম কী ব্যাপার—

উত্তরে কেহ কিছু বলিল না। রামনাথবাবু আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিন থার্ড পিরিয়ড অফ থাকায় কাজল বসিয়া ক্লাস নাইনের হোম-টাস্কের খাতা দেখিতেছে, রামনাথবাবু আবার আসিলেন।

—কী হে, অমিতাভ, কী করছো?

কাজল দাঁড়াইয়া বলিল—আসুন রামদা। এই একটু খাতা দেখছি আর কি—

—খাতা? কিসের খাতা? প্রাইভেট টিউশনির?

—আজ্ঞে না। উঁচু ক্লাসগুলোয় একটু স্পেশাল কোচিং দেবার চেষ্টা করি, যাতে রেজাল্টটা—এবার ইয়ারলি পরীক্ষার অবস্থা দেখেছেন তো?

রামনাথবাবু কোনো কথা না বলিয়া কিছুক্ষণ টেবিলের উপর স্তূপীকৃত খাতার দিকে তাকাইয়া থাকিলেন, তারপর বলিলেন—বাঃ, বেশ ভালো! নিজের সময় নষ্ট করে ছেলেদের উপকার—এসব আজকাল আর দেখা যায় না—

—না দাদা, আসলে নিজের চর্চাটাও থাকে, ছাত্রদেরও কাজ এগোয়—

—ভালোই তো। চালিয়ে যাও। একটা মহৎ দৃষ্টান্ত—

রামনাথবাবু চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু কাজলের আর কাজে মন বসিল না। পরপর দুইদিন ভদ্রলোকের আসাটা কেমন যেন সন্দেহজনক। এমনিতে সিনিয়র টিচাররা লাইব্রেরি ঘরে বড়ো একটা আসেন না। ব্যাপার কী?

ব্যাপার কয়েকদিন বাদেই পরিষ্কার হইয়া গেল।

ফিফথ্ পিরিয়ডে কাজল আর রমাপদ দুইজনেরই একসঙ্গে অফ পড়িয়াছে। কাজল থুসিডিডিস্-এর 'পেলোপনেশিয়ান ওয়ার' পড়িতেছিল, রমাপদ একটা সিগারেট ধরাইয়া ঊর্ধ্বমুখে ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল—বই রাখুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। নিন একটা সিগারেট ধরান আগে—

সিগারেট ধরাইয়া কাজল বলিল—কী কথা?

—রামনাথদা কাল দুপুরে এসেছিলেন এ ঘরে?

—হ্যাঁ, কেন বলো তো?

—আপনি তখন কী করছিলেন?

—ছাত্রদের হোম-টাস্কের খাতা দেখছিলাম। কেন, কী হয়েছে তাতে?

রমাপদ ধোঁয়ার রিং করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে বলিল—হয়েছে অনেক কিছু। রামনাথদা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছেন এটা প্রকৃতপক্ষে প্রাইভেট টিউশনি জোগাড় করার জন্য আপনার একটা কায়দা—

কাজল স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার কোন সৎ প্রচেষ্টার যে এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে তাহা সে আদৌ ভাবে নাই। সে বলিল—কী বলছো তুমি? রামনাথদা এই কথা রটাচ্ছেন? প্রাইভেট টিউশনি আমি চেষ্টা করলে তো এখুনি দশটা নিতে পারি—কত ছেলে আমার বাড়ি গিয়ে সাধাসাধি করে। কিন্তু আমার সময় কোথায় বলো তো? টিউশনি করতে গেলে আমার লেখাপড়ার সময় আর থাকে না। সেজন্যই তো স্কুলে বসে অফ পিরিয়ডে ছেলেদের খাতা দেখি—

রমাপদ বলিল—আমার কাছে আপনার সাফাই গাইতে হবে না, আমি তো জানি আপনি কী ধরনের লোক। ভুলটা আপনিই করেছেন অমিতাভদা—

—কী রকম?

—এসব ছাত্রকল্যাণমূলক কাজকর্ম শুরু করে ভালো কবেন নি। বাইরে থেকে শিক্ষকতা বেশ একটা মহৎ ব্রত বলে মনে হয়, এব ভেতরে যে কত ঈর্ষা আর গোলমাল রয়েছে তা আপনি জানেন না। স্কুলের প্রায় কেউই আপনাব এই কাজ ভালো চোখে দেখছে না—

কাজল জিজ্ঞাসা করিল—কালিদাসবাবুও?

জিভ কাটিয়া রমাপদ বলিল—উনি বাদে। কালিদাসবাবু অন্যরকম লোক—

কাজল জিজ্ঞাসা করিল—এ নিয়ে রামনাথদার সঙ্গে একবাব কথা বলব নাকি? উনি যদি ভুল বুঝে থাকেন, সেটা ভেঙে দেওয়াও তো উচিত—

—পাগল নাকি? আপনি নিজে কিছুই শোনেননি, রামদা প্রথমেই জিজ্ঞাসা কববেন একথা আপনাকে কে বলেছে? উনি যাদেব বলেছেন তারাও কেউ আপনার কাছে স্বীকার করবে না। মাঝ থেকে আপনি ফেঁসে যাবেন। তাছাড়া রামদা মোটেই ভুল বোঝেন নি, রাগে উনি অমন বলছেন—

—রাগ কিসের?

—বলা কঠিন। নিজের যে কাজ করা উচিত অথচ করতে পারছি না, অন্যে তা করছে—এটা থেকে অকারণ রাগ আসতে পারে। প্রফেশনাল জেলাসি হতে পারে—

কাজল আশ্চর্য হইয়া বলিল—কী রকম?

—আপনি বিনাপয়সায় এরকম পরোপকার করে বেড়ালে ওঁদের টিউশনি কমে যাবে। অন্তত ওঁরা ছাত্রদের কাছে হেয় হবেন। যে কাজ ওঁরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে করে থাকেন, সেটা আপনি বিনাপয়সায় করে দিলে ছাত্রদের কাছে ওঁদের দর কমে যাবে—

বাহিরের জগৎটা সম্পর্কে কাজলের ধারণা বাবার বই পড়িয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। পৃথিবীর মানুষ মোটের উপর সবাই ভালো, বিশ্বসৃষ্টির ভিতর দিয়া প্রবাহিত একটা শুভশক্তি সমাজ-সংসারকে চালিত করিতেছে—এই বিশ্বাস তাহাকে এতদিন নানা বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও আশাবাদী রাখিয়াছিল। আজ প্রথম সেই বিশ্বাসটায় বড়োরকমের ধাক্কা খাইল।

কিন্তু অনেক রাতে নিজের ঘরে বিছানায় শুইয়া হথর্নের 'স্কারলেট লেটার' পড়িতে পড়িতে তাহার হতাশার বোধটা কাটিয়া গেল। নতুন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াই জীবনের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হয়। মানিয়া লইতে যতই কষ্ট হউক, তবু বাস্তবকে স্বীকার করিতেই হইবে।

কত রাত এখন? বারোটা? একটা? গত পাঁচ-ছয়দিন সে কিছু লেখে নাই, উপন্যাসখানি কিছুদূর অগ্রসর হইয়া থামিয়া রহিয়াছে। আচ্ছা, আজ বাকি রাতটুকু সে যদি না ঘুমাইয়া শুধু লেখে?

আউট অফ্ কেওস্ কেম দি কসমস! বিশৃঙ্খলা হইতে, আদর্শ ভাঙিয়া যাইবার বেদনা হইতেই প্রকৃত সাহিত্য উঠিয়া আসে। অপূর্ণতার যন্ত্রণাই সমস্ত শিল্পের মূল কথা। সংসারে সবকিছু ঠিকঠাক চলিলে কে আর ছবি আঁকিয়া বা গান গাহিয়া ফাঁকটুকু পূরণ করিবার চেষ্টা করিত?

সারারাত জাগিয়া কাজল লিখিতে লাগিল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

শীতের সকাল। বারান্দায় রোদ্দুরে বসিয়া কাজল খবরের কাগজ পড়িতেছে, এমন সময় হাসিমুখে নন্দলাল আসিয়া উপস্থিত হইল।

—এসো নন্দলাল। ভালো আছ? সত্যিই এলে তাহলে?

নন্দলালের সাজ একই। পরনে খাটো ধুতি, খালি গায়ের উপর নামাবলী জড়ানো, পায়ে সস্তা দামের চটি, হাতে পূজার উপকরণসহ পিতলের সাজিখানি। বারান্দার নিচে চটি ছাড়িয়া সে উপরে উঠিল এবং নিষেধ না শুনিয়া কাজলের পায়ের ধুলা লইল।

—তারপর খবর কী বলো?

নন্দলাল আকর্ণ হাসিয়া বলিল—আমাদের আর খবর কী থাকবে দাদা? ওই কেটে যাচ্ছে একরকম। সৎমা খুব বাড়িয়েছে, বুঝলেন? বাবার সেই সেবাদাসী! গত জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন বাবা ডেকে বলল—নন্দ, আজ পুজোর দিনটা তুই বাড়িতেই খাবি। ইদানীং আর বাড়িতে খাই না, জানেন তো? তা খেতে খেতে দুটো ভাত চেয়েছি, সৎমা বলল—আর ভাত নেই। তখনও আমার অর্ধেক খাওয়া হয়নি। বললুম—মানুষকে খেতে বললে একটু বেশি করেও তো চাল নিতে হয়। উত্তরে সৎমা কী বললে জানেন? বললে—তোমার ওই হাতির খোরাক জোগানো সম্ভব নয়। আবও চাল নিলে আরও চাল সেঁদিয়ে যেত। শুনে কেমন যেন রাগ হয়ে গেল, বললুম—আমার বাবার বাড়িতে বসে আমি ভাত খাচ্ছি, তুমি ফোঁপরদালালি করবার কে? তাতে সৎমা তেড়ে এসে লোহাব খুন্তি দিয়ে—এই দেখুন না, সামনের দাঁতের আধখানা ভেঙে গিয়েছে—

কথা শেষ করিয়া নন্দ আবার হাসিল। হাসিটা তাহার স্বভাব। মনের বিষাদ বা হর্ষের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই।

কাজল বলিল—বোসো নন্দ, মাকে তোমার কথা বলে আসি। দুপুবে আমার এখানেই খেযে যাবে, কেমন?

—জানি দাদা এই কথা বলবেন—সেজন্যেই তো সকাল সকাল এলুম। আপনাদের রান্না হয়ে গেলে অসুবিধে হত। কিছু জলখাবার হবে কী দাদা?

কাজল হাসিয়া বলিল—পরোটা আর কুমড়োর তরকারি চলবে?

—খুব, খুব! তবে দু-খানা বেশি করে বলবেন। আমরা গাঁয়ের মানুষ, বুঝলেন তো?

হৈমন্তী বরাবরই লোকজনকে খাওয়াইতে ভালোবাসে। নন্দলালের অন্নলোলুপ সারল্য, অর্থহীন আকর্ণ হাসি এবং অগোছালো চালচলন তাহার মাতৃত্বের কাছে গভীর আবেদন লইয়া উপস্থিত হইল। ভিতরের বারান্দায় আসন পাতিয়া হৈমন্তী নন্দলালকে যত্ন করিয়া জলখাবার খাওয়াইল। নন্দলালও সেই যত্নের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করিল না। তরকারি সহযোগে বারোখানি বড়োবড়ো পরোটা খাইয়া ফেলিবার পর হৈমন্তীর প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল—আরও দেবেন মা? আচ্ছা আপনি বলছেন যখন দিন গোটাচারেক, তবে তার বেশি নয়—সকালে একগাদা খেয়ে পেট ভরিয়ে ফেলা কোনো কাজের কথা না। তরকারি আর দেবেন না, বরং গুড় যদি থাকে—

সামান্য জলযোগ করিয়া নন্দলাল বাহিরের বারান্দায় রৌদ্রে পিঠ দিয়া বিশ্রাম করিতে গেল।

হৈমন্তী কাজলকে ডাকিয়া বলিল—হ্যাঁরে, লোকটা দুপুরে খাবে তো বললি—এখনই ও ষোলোখানা পরোটা খেল, আবার দুপুরে খেতে পারবে?

বুঝাইয়া বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। কাজল সংক্ষেপে বলিল—পারবে।

—পেট-টেট খারাপ করবে না তো?

কাজল হাসিয়া বলিল—কিচ্ছু হবে না মা, তুমি ওকে চেনো না—

বাস্তবিকই দুপুরে খাইবার সময় নন্দলাল ভেল্‌কি দেখাইল। মাত্র ঘণ্টাদুই আগে খাওয়া ষোলোখানি পরোটা সে জঠরের কোন দুর্গম গহনে পাচার করিল কে জানে! প্রথমদিকে হিং দেওয়া কলাইয়ের ডাল, পালংশাকের চচ্চড়ি আর পোস্তর বড়া দিয়া সে দুই থালা ভাত খাইয়া ফেলিল। কালোজিরা-কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিয়া ট্যাংরা মাছের ঝোল হইয়াছিল। মাছের ঝোল দিয়া আরও দুই থালা ভাত। মুখে পরিতৃপ্তির ছাপ লইয়া সে উঠিতেছিল, হৈমন্তী তাহাকে বলিল—একটু দুধ খাবে? ভালো পাটালি গুড় আছে, তাই দিয়ে খাও—

নন্দলাল আবার বসিয়া পড়িল। বলিল—দুধের মধ্যে অমনি দুটো ভাতও ফেলে দেবেন মা, শুধু দুধ যেন কেমন লাগে—

সন্ধ্যাবেলা যখন ঘরের ভিতর অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিল, তখনও বারান্দার বেঞ্চির উপর শুইয়া নন্দলাল নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। সাড়ে-ছয়টা নাগাদ সে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া অপ্রতিভমুখে বলিল—এঃ, বড্ড অন্ধকার হয়ে গেল। ডেকে দিলেন না কেন দাদা?

—তাই কী ডাকা যায়? একটা মানুষ ঘুমোচ্ছে—তুমি বরং আজকের রাতটা আমার এখানে থেকেই যাও, কেমন?

মাথা চুলকাইয়া নন্দলাল বলিল—আজ্ঞে তা যখন বলছেন—এত রাত্তিরে যাওয়াটাও—

—এবেলা মাংস খাবে নন্দ?

উৎসাহে নন্দলাল যেন কেমন হইয়া গেল। বলিল—মাংস? নিশ্চয়। আপনি খেলে আমিও একটু—মাংস খেতে আমি খুবই—বাবা প্রায়ই আনতেন। মধ্যে অনেকদিন—ওই সৎমা, বুঝলেন না?

মাংস কিনিতে হইলে চৌমাথার মোড়ের বাজারে যাইতে হয়। নন্দও কাজলের সঙ্গী হইল, ফিরিবার সময় তাহার বারণ না শুনিয়া বাজারের থলি বহিয়া দিল। বাড়ি ঢুকিবার সময় চুপিচুপি বলিল—দাদা, একটা কথা বলবো?

—কী?

—আপনারা কী রাত্তিরে রুটি খান? শহরের দিকে সবাই তাই খায়—

—কেন বলো তো? তুমি কী রুটি খাও না?

—খাবো না কেন দাদা? আমার এখন যা অবস্থা, সবই খাওয়া অভ্যেস করতে হয়েছে। তবে কী জানেন, রুটি জিনিসটা ঠিক পোষায় না। মাকে বলে দেবেন দুটো ভাত করতে?

কাজল বলিল—আচ্ছা, তুমি ভাতই খেয়ো—

রাত্রে একসের মাংসের মধ্যে কাজল দুই টুকরা মাংস এবং এক টুকরা আলু খাইয়াছিল। কিন্তু নন্দলাল থাকিতে বাকি এককড়াই রান্না ফেলা যাইবে তাহা হইতেই পারে না। নিজের উপর সমস্ত ঝুঁকি লইয়া নন্দ অপচয়ের হাত হইতে গৃহস্থকে রক্ষা করিল।

পরদিন সকালে নন্দলাল বিদায় লইল বটে, কিন্তু হৈমন্তীর আদরযত্ন তাহার উপর যাদুপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। দুই-তিনমাস পরপরই সে বিশ্বের ক্ষুধা লইয়া আসিয়া হাজির হইত।

উপন্যাস শুরু করিয়া কাজল বুঝিয়াছিল সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষানবিশীর ব্যবস্থা নাই। ভাস্কর গুরুর কাছে হাতুড়ি-বাটালি ধরিয়া প্রস্তরখণ্ড হইতে মূর্তি বাহির করিবার কৌশল শেখে,

চিত্রশিল্পীও হাতেকলমে কাজ শেখে, গায়ক ওস্তাদের কাছে তালিম নেয়। কিন্তু যাহারা লেখক হইতে চায়, তাহাদের জন্য তেমন কোনো নিয়ম নাই। পূর্বসুরীদের রচনাপাঠ কিছুটা সাহায্য করে মাত্র, নিজের জীবনে লব্ধ অভিজ্ঞতা সম্বল করিয়া বাকি পথটা হাঁটিতে হয়।

লিখিতে আরম্ভ করিবার পর প্রথমটা কাজল কী নিয়া লিখিবে ঠিক করিতে পারিল না। উপন্যাসে কী একটানা একটি গল্প থাকে, নাকি ছোটোছোটো ঘটনার টুকরা দিয়া একটি অখণ্ড সম্পূর্ণতা গড়িয়া ওঠে? বলিবার কথা কী কিছু একটা থাকিতেই হইবে, নাকি কেবল গল্প বলিলেও চলে? জীবনদর্শনের কথা ছাড়িয়াই দেওয়া যাক, শুধুমাত্র একটি নিটোল গল্প জমাইয়া তোলাও যে কত কঠিন, তাহা কাজল মর্মে মর্মে টের পাইল। অথচ কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে পড়িবার সময় সহপাঠীদের কাছে বুদ্ধিজীবী বলিয়া পরিচিত হইবার লোভে যাঁহারা নিটোল গল্প লিখিয়াছেন, সেইসব লেখকদের সে কত তাচ্ছিল্য করিয়াছে। প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্রের ভক্ত হওয়া একটা লজ্জার কথা বলিয়া পরিগণিত হইত। এখন নিজে লিখিবার সময় পূর্বসূরীদের শ্রেষ্ঠত্ব সে অনুভব করিতে পারিল।

কিন্তু গল্প তো জীবন হইতেই উঠিয়া আসে। তাহার জীবনে কী কিছুই ঘটে নাই? নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাহার মনে যে আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, একটু একটু করিয়া বড়ো হইবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে পৃথিবীর রূপটা যেভাবে বদলাইতেছে, গভীর রাতে আকাশের দিকে তাকাইয়া অস্তিত্ব সম্বন্ধে মনে যে প্রশ্ন জাগিয়াছে—সেসব লইয়া কী গল্প হয় না?

লেখা ছাড়া আর কোনো বিষয়ে তাহার দক্ষতা নাই। সে আর কিছু জানে না। কেহ পড়ুক বা না পড়ুক, তাহাকে লিখিতেই হইবে। সততার সহিত নিজের অনুভূতিগুলিকে সে লিপিবদ্ধ করিয়া যাইবে। পুরস্কৃত হওয়া-না-হওয়া ভাগ্যের হাতে। সে অন্তত ফাঁকি দিবে না।

উপন্যাস ধীরে ধীরে শেষ হইতে চলিল।

ফাল্গুনের ঈষত্তপ্ত বাতাস নিমগাছের পাতায় ঝিরঝির শব্দ তোলে। ঋতু পরিবর্তনেব এই মনোরম অলৌকিক মুহূর্তে আজকাল কাজলের মন ছটফট করিতে থাকে। সময় চলিয়া যাইতেছে। পত্রমর্মরে যেন মহাকালের অদৃশ্য ঘটিকাযন্ত্র হইতে বালি ঝরিয়া পড়িবার শব্দ। জীবন ক্রমেই ফুরাইয়া আসিতেছে। কিছুই ঠিকঠাক করা হইল না।

কিন্তু কী করিবার ছিল? কতদূর পরিপূর্ণতা আসিলে তাহাকে সার্থকতা বলে?

এসব প্রশ্নের কোনো সঠিক উত্তর নাই।

কেবল সময়ের ঘড়ি হইতে বালি ঝরিয়া যায়।

নিজের মনের কথাটা ঠিকমতো বুঝাইতে না পারাও ভয়ানক কষ্ট। অধিকাংশ মানুষের জীবনেই কোনো প্রশ্ন নাই। পিপাসাও যেটুকু আছে তাহা আরও ভালো খাইবার-পবিবার কিংবা আরও বেশি টাকা রোজগার করিবার।

এই মানসিক অবস্থায় সে পরপর বিভিন্ন পত্রিকায় কয়েকটি গল্প লিখিল। কেহ বলিল—খুব ভালো হইয়াছে। জীবনের দার্শনিক ব্যাখ্যা খুঁজিবার জন্য লেখকের প্রচেষ্টা আছে। কেহ বলিল—অনেক গালভরা কথা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু গল্পটা কই? আবার কেহ বলিল—ওরিজিনালিটি নেই। একদম অপূর্ব রায়ের নকল—বাপের নাম ভাঙিয়ে নাম করিতে চাহিতেছে। কেবল দ্বিজেনবাবু একদিন বলিলেন—কারও কথায় কান দেবে না। তোমার হাতে ভালো বাংলা গদ্য আছে। কিছুর পরোয়া না করে অনেস্টলি লিখে যাও। তোমার বাবা বলতেন—মশায়, যদি লেখায় নিজেকে ফাঁকি না দিয়ে থাকেন, তাহলে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকুন। আপনার লেখা শাশ্বত হবে।

একান্ত মুহূর্তে কাজল নিজে ভাবিয়া দেখিল—সে কেন লেখে? কেহ প্রশংসা করিলে ভালো লাগে সত্য, কিন্তু কেবলমাত্র সেজন্যই কী দিনরাত এত পরিশ্রম করা? চব্বিশ ঘণ্টাই যে সে লিখিতেছে এমন নহে, কিন্তু সবসময়েই লেখার কথা ভাবিতেছে একথা সত্য। নিজের বলিবার

কথাগুলির একটা নিজস্ব তাগিদ আছে, সেই শক্তিই ভিতর হইতে ধাক্কা দেয়। পাঠক পড়িয়া কী বলিবে এ কথা ভাবিয়া সে অন্তত লেখে না।

পাঠকে যাহাই বলুক, ক্রমাগত লিখিতে থাকিলে নিজের রচনা সম্বন্ধে একধরনের আত্মপ্রত্যয় জন্মায়। কাজলও তাহার ব্যতিক্রম নহে। কিন্তু একটা ঘটনা অকস্মাৎ তাহাকে রীতিমতো বিষণ্ণ করিয়া দিল।

'খুশি ও খেলা' নামে প্রখ্যাত কিশোর পত্রিকায় সে একটি গল্প দিয়া আসিয়াছিল। নিষ্পাপ শৈশব চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের যে এক অমূল্য ঐশ্বর্য চিরতরে অন্তর্হিত হয়—তাহাই গল্পের বিষয়বস্তু। একজন অল্পবয়েসী কল্পনাপ্রবণ কিশোর স্কুল পালাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে নির্জন দুপুরবেলা একটি ভাঙা পাঁচিলের ফোকর গলিয়া ওপারে এক আশ্চর্য দেশে গিয়া হাজির হইল। সেখানে রূপকথা ও লোকায়ত কাহিনীর বিখ্যাত চরিত্রগণ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সারাবেলা পান্তাবুড়ি, ডালিমকুমার, মন্ত্রীপুত্র-কোটালপুত্র, পক্ষীরাজ ও মধুসূদনদাদার সঙ্গে মেলামেশা করিয়া, স্বয়ং ঈশপের কুটিরের বারান্দায় বসিয়া তাহার মুখে গল্প শুনিয়া সন্ধ্যাবেলা মায়ের জন্য মন-কেমন করায় সে বাড়ি ফিরিয়া গেল। বড়ো হইয়া কলেজে পড়িবার সময় ছেলেটি একদিন সেই আশ্চর্য রাজ্যে আর একবার যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু পাঁচিলের ফোকরটা কিছুতেই খুঁজিয়া পায় নাই। এই গল্প।

গল্পটা লিখিয়া কাজলের ভালো লাগিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল সম্পাদক পড়িয়া নিশ্চয় অবাক হইয়া যাইবেন এবং অবিলম্বে প্রেসে দিবেন। গল্প দিতে যাওয়ার দিন সম্পাদক ছিলেন না। দপ্তরের একজন কর্মচারী লেখাটি রাখিয়া বলিয়াছিল—মাসখানেক বাদে খোঁজ করবেন—

কাজল একটু আশাহত হইল। খ্যাতনামা কাগজগুলিতে গল্প প্রকাশ হওয়ায় অন্তত পত্রিকার অফিসগুলিতে লোকে তাহার নামটা চিনিতে পারে। কিন্তু এই ভদ্রলোক তাহার পাণ্ডুলিপি ডানদিকের একটা দেরাজে রাখিয়া গম্ভীরভাবে প্রুফ সংশোধন করিতে লাগিলেন। একটু ইতস্তত করিয়া সে বলিল—তাহলে—

ভদ্রলোক কিছুটা বিরক্ত হইয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন—বললাম যে, মাসখানেক পর!

বাহিরে আসিয়া কাজলের ভারি দুঃখ হইল। মানুষ তো একটু বসিতেও বলে! আহত মর্যাদাবোধ বড়ো খারাপ জিনিস। সারা দিনরাত কাজল বিষণ্ণ হইয়া রহিল। তারপর ভাবিয়া ভাবিয়া ঠিক করিল—লোকটা আমার লেখাটা নিয়েই ড্রয়ারে ঢুকিয়ে ফেলল, নাম-টাম কিছুই পড়বার সুযোগ পায়নি। নাম দেখলে কী আর চিনতে পারত না? ও বেচারীর আর দোষ কী? ওদের অফিসে সারাক্ষণ লোকে বিরক্ত করছে, আমাকে তো আর চিনে রাখেনি—

মাসখানেক কাটিবার পর একদিন কাজল 'খুশি ও খেলা'-র দপ্তরে খোঁজ করিতে গেল। বাহিরের ঘরে পূর্বদিনের সেই ভদ্রলোক আজ নাই। একজন বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল সম্পাদক মহাশয় নিজের ঘরে কাজ করিতেছেন। সে বলিল—একটু দেখা করা যায় না?

—কী দরকার বলুন?

—এমনি একটু প্রয়োজন ছিল—

লোকটি সামান্য ভাবিয়া বলিল—আচ্ছা যান। ওই যে, ওই ঘর—

নির্দেশ দিবার দরকার ছিল না, কারণ সুইং ডোরের ঘষা কাঁচের গায়ে 'সম্পাদক' লেখা কাগজ সাঁটা আছে। সে দরজা ঠেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আসতে পারি?

ধুতি এবং খদ্দরের পাঞ্জাবি পরা সম্পাদক, মাথায় কাঁচাপাকা লম্বা চুল, বিশাল টেবিলের অপর প্রান্তে বসিয়া কী লিখিতেছিলেন। দেখামাত্র কাজল তাঁহাকে চিনিতে পারিল। ইনি বর্তমান বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব—আধুনিক কবি হিসাবেও খুব নাম করিয়াছেন। সম্প্রতি

ছোকরা কবিযশঃপ্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই ইঁহার অনুকরণে লম্বা চুল রাখিতেছে এবং কাঁধে ঝোলা লইয়া ঘুরিতেছে। জলদমন্দ্র কণ্ঠে সম্পাদক জিজ্ঞাসা করিলেন—কী চাই?

কাজল ঘরের ভিতর কিছুটা অগ্রসর হইয়া বলিল—আজ্ঞে, আমি একটা গল্প দিয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে বলা হয়েছিল মাসখানেক বাদে খবর নিতে—

—তা এখানে কী?

ভদ্রলোকের আচরণে হৃদ্যতার লেশমাত্র নাই। কাজল বলিল—লেখাটার বিষয়ে জানতে—

—যাঁকে দিয়েছিলেন তাঁর কাছেই খোঁজ করা নিয়ম। এখানে কেন?

—বাইরে কাউকে দেখলাম না, তাই—

—তাই ঢুকে পড়লেন?

বিরক্তমুখে সম্পাদক ঘণ্টি বাজাইতেই বেয়ারাটি আসিয়া হাজির হইল।

—এঁকে ভেতরে ঢুকতে দিয়েছে কে? রবিবাবু কোথায়?

—আজ্ঞে, উনি টিফিন করতে গিয়েছেন—

—তাঁর টেবিলে বসালে না কেন? যাও, গল্পেব ফাইলটা নিয়ে এস—

সম্পাদক আবার কী লিখিতে লাগিলেন। কাজল দাঁড়াইয়াই রহিল। এই অফিসে কেহ অতিথিকে বসিতে বলে না দেখা যাইতেছে।

বেয়ারা ফাইল আনিয়া দিল। বক্স ফাইলের ঢাকনা খুলিয়া সম্পাদক জিজ্ঞাসা করিলেন—গল্পের নাম কী?

কাজল নাম বলিল। এইবাব গল্প বাহির করিয়া সম্পাদক তাহার নাম দেখিবেন—এবং নিশ্চয় চিনিতে পারিবেন। চিনিতে পারিলেও সম্পাদক মহাশয়ের ব্যবহারে তাহার কোনো প্রমাণ পাওযা গেল না। ফাইল হইতে লেখাটি বাহির করিয়া বলিলেন—ও, এই গল্প! নিয়ে যান—

কাজল অবাক হইয়া বলিল—নিয়ে যাব?

—হ্যাঁ। এটা কোনো গল্পই হয়নি। আমি নিজে পড়ে দেখেছি। তাছাড়া বাংলা ভাষার আপনি কিছুই জানেন না। আপাতত লেখা বন্ধ রেখে ভাষার ব্যবহার শিখুন—

কিছুটা যেন ছুঁড়িবার ভঙ্গিতে সম্পাদক পাণ্ডুলিপিটি টেবিলের এ প্রান্তে কাজলের সামনে ফেলিয়া দিলেন।

মানুষটির আচরণে এক ধরনের রূঢ় ঔদ্ধত্য আছে যাহা কাজল আগে কখনও দেখে নাই। লজ্জায় অপমানে তাহার কান গবম হইয়া উঠিল। কাগজগুলি হাতে লইয়া সে কোনোরকমে বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তায় সবাই যেন তাহার দিকেই তাকাইয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে। সবাই কী করিয়া জানিয়া ফেলিয়াছে এইমাত্র সে পত্রিকার দপ্তর হইতে অপমানিত হইয়া বাহির হইল! বাড়ি ফিরিবার সময় ট্রেনে জানালার ধারে বসিয়া সে মান-অপমানের নিরর্থকতা এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে অবিচল থাকিয়া নিজের কর্তব্য করিবার বিষয়ে মহাপুরুষদের অনেক ভালো ভালো কথা স্মরণ করিল। কিন্তু দেখিল তাহাতে অপমানের জ্বালা কমে না।

ভদ্রলোক নিজে একজন কবি। কবিদের সম্বন্ধে কাজলের মনে বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধার আসন ছিল। তাহারা কী সবাই এমন হয় নাকি? অকারণে তাহার সহিত এরূপ ব্যবহারের কারণ কী? লেখা পছন্দ না হইলে সে কথাটা মধুর করিয়াও তো বলা যাইত।

অনেকদিন পরে বার্ট্রান্ড রাসেলের প্রবন্ধ পড়িতে গিয়া কাজল ইহার উত্তর পাইয়াছিল। রাসেল বলিয়াছেন ক্ষমতার ব্যবহারেই ক্ষমতা অর্জনের সুখ। দুইটা মাথাই যদি না কাটিতে পারিলাম তাহা হইলে ধারালো তলোয়ারের মালিক হইয়া কী লাভ? মানবসভ্যতা নামক ব্যাপারটি এই ক্ষমতা দখলেরই ইতিহাস। নিতান্ত উচ্চকোটির মহাপুরুষ না হইলে এ প্রলোভন এড়ানো কঠিন।

সম্পাদকগণ সকলেই কিছু মহাপুরুষ নহেন।

ঘটনার দার্শনিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যাহাই হোক, কাজল পরিষ্কার বুঝিতে পারিল, লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করা খুব সহজ কাজ হইবে না।

কোনো না কোনো ঘটনা অবলম্বন করিয়া মানুষের জীবনে পরিবর্তন সূচিত হয়। দিদিমার মৃত্যুতে কাজলের জীবনে সেই পরিবর্তন শুরু হইল। দিদিমা অনেকদিন ধরিয়াই ভুগিতেছিলেন, বিশেষ করিয়া দাদুর মৃত্যুর পর তাঁহার বাঁচিবার ইচ্ছাটাই চলিয়া গিয়াছিল। একদিন অনেক রাত্রে কাজল শুইয়া বই পড়িতেছে, দরজায় কে কড়া নাড়িল। দরজা খুলিয়া কাজল দেখিল প্রতাপ আসিয়াছে।

—কী ব্যাপার মামা? এত রাত্তিরে?

—মায়ের শরীর খুব খারাপ হয়েছে, রাত কাটে কিনা সন্দেহ। তাই মেজদিকে নিয়ে যেতে এসেছি—

হৈমন্তী চট করিয়া তৈয়ারি হইয়া লইল। কাজল বলিল—আমিও সঙ্গে যাই মা? যদি ওষুধপত্র বা ডাক্তারের দরকার হয়—

প্রতাপ বলিল—তুই থাক। বাড়ি খালি রেখে যাওয়া ঠিক হবে না। সকালে উঠে চলে যাস এখন। তার মধ্যে দরকার হলে কাউকে দিয়ে খবর দেব—

দিদিমা মারা গেলেন পরদিন বিকাল পাঁচটা নাগাদ।

পাড়ার লোকজন এবং কাজলের বন্ধু-বান্ধবরা আসিয়া রাত আটটার মধ্যে সব ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল। পাড়ার মাতব্বর বৈদ্যনাথ সরকার বলিলেন—আর দেরি কিসের? চল, চল—ওদিকে অনেক সময় লেগে যাবে—

কেষ্ট মুখুজ্যের ঘাটে ল্যাম্পপোস্টের মাথায় মিটমিট কবিয়া একটা ইলেকট্রিক বাল্‌ব জ্বলিতেছে। তাহারই ঘোলাটে আলোয় দিদিমার শেষ শয্যা প্রস্তুত হইল। উনসত্তর বছর বাঁচিয়া এইমাত্র এক প্রিয়জন পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যাইবে। মুখাগ্নি করিবার জন্য ওই ধারে প্রতাপ প্রস্তুত হইতেছে। পুরোহিত মহাশয় ল্যাম্পপোস্টের নিচে বসিয়া নাকে চশমা লাগাইয়া অনুচ্চস্বরে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পড়িতেছেন। শ্মশানবন্ধুদের কয়েকজন নিজেদের মধ্যে গতকাল পাড়ায় ঘটিয়া যাওয়া কী একটা মুখরোচক ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিতেছে। এ সমস্তই থাকিবে, আগামীকাল সকাল হইলেই পৃথিবী আবার আপন কর্মের স্রোতে ভাসিয়া যাইবে। মেঘু গোয়ালা যথাসময়ে দুধ দিতে আসিবে, গলির মুখে খোঁড়া নাপিত ইঁটের উপর বসাইয়া ব্রিজনাথ ভরতের দাড়ি কামাইয়া দিবে। তাহার দিদিমা হেলেন কেলার, মাদাম কুরি বা ফ্লোরেন্‌স্ নাইটিঙ্গেল ছিলেন না, কেহ তাঁহাকে মনে করিয়া রাখিবে না। এমন কী আত্মীয়স্বজনেরাও প্রথমে কিছুদিন শোক করিবে তারপর ভুলিয়া যাইবে।

অথচ দিদিমা কী স্নেহপ্রবণই ছিলেন, সবাইকে লইয়া বাঁচিতে ভালোবাসিতেন। তাঁহারও আলো-বাতাস সকাল-সন্ধ্যা হাসিকান্না লইয়া একটা আস্ত জীবন ছিল। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সবই যদি এমনভাবে মুছিয়া যাইবে তাহলে বাঁচিবার সার্থকতা কী?

কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা, দিদিমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শৈশবের সহিত তাঁহার যোগসূত্র প্রায় সবটাই ছিন্ন হইয়া গেল। এইভাবেই বোধহয় যুগ শেষ হইয়া যায়।

ঘাট হইতে ফিরিতে রাত প্রায় আড়াইটা বাজিয়া গেল। ঝুমুর বেড়ালটা পাঁচিলের উপর লম্বা হইয়া ঘুমাইতেছে। বাহিরের দরজা খোলা, ভূষণ সেখানে একটা ভাঁজ করা শতরঞ্চির উপর বসিয়া ঝিমাইতেছে। সবকিছু কেমন স্বাভাবিক, কেবল দিদিমা নাই।

দিদিমার ঘরের কাছে গিয়া কাজল হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল। চিরপরিচিত খাটটা আর নাই, এরই

মধ্যে তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। ওইখানে দিদিমা দরজার দিকে মাথা দিয়া শুইয়া থাকিতেন। কে জানে পুনর্জ্জন্ম আছে কিনা, এই সুন্দর পৃথিবীতে মানুষের আত্মা আর ফিরিয়া আসে কিনা। দিদিমার সঙ্গে সত্যই চিরকালের মতো ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।

দিনরাত পরিশ্রম করিয়া সে উপন্যাস প্রায় শেষ করিয়া আনিল। একদিন সে উপন্যাসের প্রথমদিকের শ'খানেক পাতা লইয়া দুরু দুরু বক্ষে বসু ও গুহ-এর দোকানে গিয়া হাজির হইল।

দ্বিজেনবাবু কেদারায় হেলান দিয়া উদ্বোধন পত্রিকা পড়িতেছিলেন। তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—কী খবর? অনেকদিন তোমায় দেখিনি, ভালো আছ তো? মা কেমন আছেন?

প্রণাম করিয়া কাজল বসিল। কিছুক্ষণ নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলিবার পর ইতস্তত করিয়া কাজল বলিল—আমি একটা বড়ো লেখায় হাত দিয়েছি, প্রায় শেষও হয়ে এসেছে। আপনি যদি একটু পড়ে দেখেন—

—বড় লেখা? কী ধরনের বড়োলেখা? উপন্যাস?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কী বিষয় নিয়ে লিখছো?

কাজল বলিল—বাবার প্রথম উপন্যাসখানা ওঁর আত্মজীবনীমূলক। উনি যেখানে শেষ করেছেন, সেখান থেকে আমি ধরেছি। বাবা নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন ওঁর জীবনদর্শন ছেলের মধ্যে সঞ্চারিত হোক। সে আশা কতখানি সফল হল তাই নিয়ে আমার লেখা।

দ্বিজেনবাবু বলিলেন—মানে তোমার নিজের জীবন?

কাজল দৃঢ়গলায় বলিল—না। গ্রামের মাটিতে যার উৎস, অথচ শহরের জটিলতায় যে বড়ো হয়ে উঠেছে—এমন একজন বাঙালি ছেলেব জীবন।

দ্বিজেনবাবু কিছুক্ষণ কাজলেব দিকে তাকাইয়া থাকিলেন, তারপর হাত বাড়াইয়া বলিলেন—লেখাটা দাও। চার-পাঁচদিন পর আমার সঙ্গে দেখা করবে—

পাণ্ডুলিপি দিয়া কাজল চলিয়া আসিতেছিল, দ্বিজেনবাবু ডাকিলেন—শোন!

—আজ্ঞে?

—আমি কিন্তু তোমাকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না। লেখাটা পড়ে মতামত জানাবো, এটুকু কেবল জানালাম। লেখা যেমনই হোক, আমি ছাপিয়ে দিতে পারি, কিন্তু তাতে তোমার সর্বনাশ করা হবে—

কাজল হাসিয়া বলিল—ঠিক আছে। মোপাসাঁ আর ফ্লোবেয়ারের গল্প আমি জানি।

হপ্তাখানেক বাদে কাজল দ্বিজেনবাবুর মতামত জানিতে গেল। তিনি বলিলেন—পড়লাম তোমার লেখা। আর কতদূর বাকি আছে?

—আজ্ঞে দশ-পনেরো দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

—লেখা ভালো হয়েছে। তোমার গদ্য সুন্দর তা তো আগেই বলেছি। অপূর্ববাবুর বইখানা জনপ্রিয়। তাঁর উপন্যাসের পরবর্তী পর্ব তাঁরই পুত্র লিখেছে—এতে পাঠকদের মনে আগ্রহ জাগা স্বাভাবিক। আমার বিশ্বাস—এ বই পড়ে তারা নিরাশ হবে না।

কাজল যেন কিছুটা অবিশ্বাসের সুরে বলিল—তার মানে আপনি—

—বইখানা আমি ছাপাবো। যত তাড়াতাড়ি পারো শেষ করে আমাকে কপি দাও—

ঝুঁকিয়া দ্বিজেনবাবুকে প্রণাম করিতে গিয়া কাজল কাঁদিয়া ফেলিল।

বাহিরে আসিয়া কাজল দেখিল হ্যারিসন রোডে ট্রাম চলিতেছে। অফিস-ফেরত লোকের ভিড় চলিয়াছে শিয়ালদহ স্টেশনের দিকে। জ্ঞানবাবুর চায়ের দোকানে চা-রস-প্রত্যাশীদের সান্ধ্য সমাগম আরম্ভ হইয়াছে। ফুটপাথের উপর কাপড় বিছাইয়া একজন খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা লোক যশোরের

চিরুনি বিক্রি করিতেছে। সবই অবিকল ঠিক অন্য অন্য দিনের মতো। কেবল তাহার জীবনে অনতিদূর ভবিষ্যতে এক আশ্চর্য পরিবর্তন আসিতেছে। সবাইকে কথাটা জানাইয়া দিলে হয় না?

বই বাহির হইবার দশ-বারোদিন আগে বিখ্যাত সাময়িক পত্রগুলিতে তাহার উপন্যাসের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল। হৈমন্তী দেখিয়া ভারি খুশি। বলিল—সেকালে বাণভট্টের ছেলে ভূষণভট্ট বাবার আরব্ধ কাজ শেষ করেছিলেন, তুইও তাই করলি—

কিন্তু রাত্রে শুইয়া কাজলের মনে হইল—বাবার কাজ আমি শেষ করিনি, ও কাজ তো শেষ হয় না। বাবা বিশ্বাস করতেন জীবন অনন্ত, পথের কোন আরম্ভও নেই, শেষও নেই। তিনি যেখানে থেমেছিলেন, আমি সেখান থেকে শুরু করে কিছু পথ হাঁটলাম মাত্র। পথ তো পড়ে রইল সামনে—হয়তো ভবিষ্যতে এখান থেকে কেউ আরম্ভ করবে—

বই প্রকাশিত হইবার পর পাঠকমহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। কেহ বলিল—চমৎকার হয়েছে। অপূর্ববাবুর ফিলজফির সঙ্গে অদ্ভুতভাবে সঙ্গতি রেখে লিখেছেন লেখক। অথচ নকলনবিশী নয়—ভাষায় স্পষ্ট স্বকীয়তা আছে। কেহ বলিল—প্রথম থেকেই লক্ষ করা যাচ্ছিল লেখক বাবার নাম ভাঙিয়ে খেতে চান, এই উপন্যাস রচনা সে পথেই আর একটি পদক্ষেপ।

সমালোচনা যেমনই হোক, প্রথম মাসে উপন্যাসটির পাঁচশত কপি বিক্রয় হইয়া গেল। তাহার পর বিক্রি কিছুটা কমিলেও মোটামুটি কাটতি বজায় রহিল। দ্বিজেনবাবু বলিলেন—বিরূপ সমালোচনায় ভেঙে পড়বে না। মনে রেখ, বিরূপ সমালোচনাও একটা প্রচার। আসল মতামত দেবে পাঠকেরা—দেখা যাক তারা কী বলে!

প্রথমদিকের দ্রুত বিক্রিব কাছাকাছি আব না পৌঁছাইলেও বইখানা একেবারে গুদামে পড়িয়া রহিল না, কিছু কিছু বিক্রি হইতেই লাগিল।

এইসময় ডাকে তাহার নামে একদিন একখানা খাম আসিল।

কলিকাতা হইতে একটি মেয়ে চিঠি লিখিয়াছে। তাহার পরিবাবের সকলে কাজলের বই পড়িয়া অবাক হইয়া গিয়াছে। ভূমিকার শেষে যে ঠিকানা ছিল সেই ঠিকানা ব্যবহাব করিয়া চিঠি লিখিতেছে। তাহারা কী একবার বাড়িতে আসিয়া লেখকের সহিত আলাপ করিতে পারে?

পারে বইকি, নিশ্চয় পারে। ব্যস্ত হইয়া কাজল স্নান-খাওয়া না সারিয়াই বাহির হইয়া পোস্ট অফিসে গেল এবং সেখানে দাঁড়াইয়াই পত্রের উত্তর দিয়া আসিল।

দিনদশেক বাদে এক রবিবার সকালে একজন মধ্যবয়স্ক সৌম্যমূর্তি ভদ্রলোক দুই মেয়ে লইয়া আসিয়া হাজির হইলেন। মেয়েরা স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ে, তাহাদের আচরণ সহজ ও সপ্রতিভ। ভদ্রলোক সরকারি চাকরি হইতে সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই অপূর্বকুমার রায়ের লেখার পরম ভক্ত। বিজ্ঞাপন দেখিয়া প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই যে অপূর্ব রায়ের ছেলের উপন্যাস বিশেষ কাজের কিছু হইবে। যাহা হৌক, কৌতূহল হওয়ায় কিনিয়া পড়িয়াছেন এবং আশ্চর্য হইয়া গিয়াছেন।

মেয়ে দুটি মুগ্ধ চোখে কাজলের দিকে তাকাইয়া ছিল। ভদ্রলোক থামিতে তাহাদের মধ্যে বড়োজন বলিল—আমাদের দুইবোনে ঝগড়া হত আপনার বইখানা কে আগে পড়বে তাই নিয়ে। তারপর ঠিক করে নিলাম—একঘণ্টা আমি পড়বো, একঘণ্টা বোন পড়বে—!

ছোটজন বলিল—আমরা আগে কখনও এত কাছে থেকে লেখক দেখিনি, জানেন? বাবা দেখেছেন—বাবার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আলাপ ছিল—

ভদ্রলোক সবিনয়ে বলিলেন—না না, আলাপ নয়। আমার এক বন্ধুর বাবা নামকরা কবিরাজ ছিলেন। তিনি শরৎচন্দ্রের চিকিৎসা করতেন। তাঁর সঙ্গে একবার শরৎবাবুর বাড়ি গিয়েছিলাম। তখন

তিনি বেশ অসুস্থ, বসে গল্প করার মতো অবস্থা ছিল না। তবে হ্যাঁ, কাছে বসে ছিলাম ঘণ্টাখানেক। সেটাও কম কথা নয়, বলুন—

—তা তো বটেই, বড়ো মানুষের কাছে বসে থাকাই আনন্দ—

—আমার তো মনে হয় শরৎবাবুর পর আপনার বাবার মতো সাহিত্যিক বাংলা ভাষায় আর আসেন নি। তার ছেলে আপনি—বইখানা পড়ে সত্যিই আমরা—

ছোটমেয়ে তাহার বইখানি এককপি লইয়া আসিয়াছিল। সেটি বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আমাদের দুজনের জন্য এতে কিছু লিখে আপনার সই দেবেন দয়া করে?

অটোগ্রাফ! জীবনে ইহাও সম্ভব হইল!

অপুর প্রথম উপন্যাসের শেষপাতা হইতে দুইটি প্রিয় লাইন লিখিয়া নিচে কাজল নিজের নাম স্বাক্ষর করিল। জীবনের প্রথম অটোগ্রাফ।

জলখাবার খাইয়া পিতা-পুত্রীরা চলিয়া গেল বটে, কিন্তু ব্যাপারটার অনুরণন সারাদিন কাজলের মনের মধ্যে বাজিতে লাগিল।

আরও অনেক লিখিতে হইবে। অনেক—অনেক ভালো লেখা।

তাহার সময় হঠাৎ খুব কমিয়া গেল। স্কুল তো আছেই, তার উপর অপুর বইগুলির ব্যাপারে নানা কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়। নিজের লেখার জন্য যতখানি সময় দেওয়া প্রয়োজন তত সময় হাতে পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িতে লাগিল। প্রায় প্রতিদিনই কয়েকজন করিয়া লোক আসে সাহিত্যিক অপূর্ব রায়ের স্ত্রী-পুত্রের সহিত আলাপ করিতে। ছুটির দিনে তাহার সংখ্যা বাড়ে। লিখিতে লিখিতে মাঝপথে উঠিয়া অতিথিসৎকার করিতে হয়। দেড়ঘণ্টা বাদে আবার লিখিতে বসিয়া সে আবিষ্কার করে গল্পটা মাথা হইতে অতিথিদের সহিত বিদায় লইয়াছে। অনেক প্রচেষ্টায় সেটিকে ফিরাইয়া আনিয়া দশলাইন লিখিতে না লিখিতে আবার দরজাব কড়া নড়িয়া ওঠে।

কিছুদিন আগে একদল ফিল্‌মের লোক আসিয়াছিল। তাহারা অপুর প্রথম উপন্যাসখানি অবলম্বনে একটি ফিল্ম তুলিতে চায়। একজন মধ্যবয়স্ক বিরলকেশ সতর্ক চেহারার মানুষ তাহাদের দলপতি। তিনিই নাকি ডিরেকশন দিবেন। ভদ্রলোক মাথা চুলকাইয়া কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া বলিলেন—অপূর্ববাবুর লেখা তো এখন খুবই পপুলার। তবে কিনা, জানেন তো—সাহিত্যের ভাষা আর ফিল্মের ভাষায় কিছুটা পার্থক্য আছে। অপূর্ববাবু ছিলেন খাঁটি সাহিত্যিক, উনি তো আর ওঁব গল্প ফিল্ম হবে এ ভেবে লেখেন নি—কাজেই ছবির খাতিরে গল্পের কয়েকটা জায়গা—মানে খুব সামান্যই—অদলবদল করতে হতে পারে। আমি এইরকম ভাবে ভেবেছি—

পরের পনেরো মিনিট ধরিয়া ভদ্রলোক কাজল ও হৈমন্তীকে যে কাহিনী শোনাইলেন, তাহা তাঁহার নিজের অপ্রকাশিত রচনা হইতে পারে, আজারবাইজানের উপকথা হইতে পারে—কিন্তু কোনোমতেই অপুর উপন্যাস নহে।

হৈমন্তী নরম স্বভাবের হইলেও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তেজ প্রকাশ করিতে পারে। সে দৃঢ়স্বরে বলিল—এ একেবারে অন্যরকম গল্প বলে মনে হচ্ছে, আমি এতে মত দিতে পারি না। তাছাড়া আমার স্বামীর ধারণা ছিল ওঁর এই লেখাটির চলচ্চিত্র হতে পারে না। তবু আপনারা অতিথি, কষ্ট করে এসেছেন, তাই আপনাদের কথা শুনলাম। কিন্তু ছবি করবার অনুমতি আমি দেব না।

পরিচালক বলিলেন—আমরা কিন্তু ভালো টাকা দেব—

হৈমন্তী বলিল—আপনার একথা অত্যন্ত অপমানজনক। আমার স্বামী তাঁর বইগুলিকে নিজের সন্তান বলে মনে করতেন। আমিও তাই। টাকার জন্য কেউ নিজের সন্তানকে বিক্রি করে না। আচ্ছা নমস্কার—আমি ভেতরে যাচ্ছি। ডাল বসিয়ে এসেছিলাম, পুড়ে যাবে—

ভিতরের ঘরে যাইবার মুখে দরজার কাছে ফিরিয়া হৈমন্তী কাজলকে বলিল—তুমি এঁদের মিষ্টি আর চা দেবার ব্যবস্থা করো—

পরিচালক রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া বলিলেন—আপনি যদি দয়া করে আপনার মাকে একটু বুঝিয়ে বলতেন—

কাজল বলিল—কিছু মনে করবেন না, মায়ের কথাই শেষ কথা। তাছাড়া আমিও মায়ের সঙ্গে একমত। আমার কিছু করবার নেই—

ফিল্‌মের দল একপ্রকার রাগ করিয়াই জলখাবারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া গেল.।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

প্রগাঢ় বসন্তে কাজল বিমলেন্দু রায়চৌধুরীর চিঠি পাইল।

বিমলেন্দু বিদেশ হইতে আস্তানা গুটাইয়া দেশে ফিরিয়াছেন এবং কলিকাতায় বাড়ি ভাড়া লইয়া আছেন। কাজল কী তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা করিতে পারে? তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন।

অনেক ভাবিয়া কাজল চিঠির ব্যাপারটা আপাতত মাকে জানাইল না। দেখা যাক বিমলেন্দু কী বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রয়োজন বুঝিলে পরে মাকে বলা যাইবে।

কিছুটা খুঁজিয়া বাড়ি বাহির হইল। ভবানীপুরে বড়ো রাস্তা হইতে ভিতরে গলির মধ্যে বাড়ি। ঢুকিবার দরজা দেখিয়া বোঝা না গেলেও ভিতরে বেশ অনেকখানি জায়গা। চতুষ্কোণ উঠানের বাঁদিকে বসিবার ঘর, কয়েকধাপ সিমেন্ট বাঁধানো সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে হয়। কাজল লক্ষ করিল, কাশীতে সে যে আসবাবগুলি দেখিয়াছিল তাহার মধ্যে কয়েকটি এই ঘরে রহিয়াছে। কাশীর বাড়ি কী ইহারা বিক্রি করিয়া দিল নাকি?

একজন পরিচারিকা তাহাকে বসাইয়া বাড়ির ভিতরে খবর দিতে গেল।

কাজলের বুকের ভিতর অদ্ভুত অনুভূতি হইতেছিল। তুলি এখানে আছে কী? বোধহয় আছে। বিমলেন্দু এতদিন পরে দেশে ফিরিয়া কী আর তাহাকে দূরে রাখিবেন? থাকিলেই বা কী? উহারা তো আর তুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া কাজলের সঙ্গে গল্প করিবার জন্য বাহিরের ঘরে পাঠাইয়া দিবে না! ওসব কথা ভাবিয়া লাভ নাই। .

এমন সময় বিমলেন্দু ঘরে ঢুকিলেন। কাজল দেখিল তিনি বিদেশ হইতে সাহেব হইয়া ফেরেন নাই। তাঁহারা পরনে ধুতি ও হাতকাটা ফতুয়া গোছের জামা। তবে মানুষটি সুন্দর, সাধারণ পোশাকেও তাঁহার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

কাজল উঠিয়া তাঁহাকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে তিনি তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। প্রাথমিক আবেগ কমিলে কাজলকে বসাইয়া নিজেও একখানি চেয়ারে বসিলেন। বলিলেন—এবার একেবারে বরাবরের মতো ওদেশের পাট তুলে দিয়ে এলাম, বুঝলে? যতই যা বল, নিজের দেশের মতো কিছু না। তোমার মা ভালো আছেন?

নিজের বিদেশে বসবাস এবং ভবিষ্যতে কী করিতে চান সে বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করিবার পর বিমলেন্দু বলিলেন—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কিছু মনে করবে না তো?

কাজল বলিল—না না, মনে করব কেন? আপনি বলুন—

—তোমার মা কী রকম মানুষ?

প্রশ্ন শুনিয়া কাজল অবাক হইল। হঠাৎ এ প্রশ্নের অর্থ কী? সে বলিল—আজ্ঞে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কী জানতে চাইছেন। মা খুবই ভালো মানুষ—

—আমি আসলে ঠিকভাবে প্রশ্নটা করতে পারছি না। নো অফেন্স—আমি আজ তোমার সঙ্গে একটা খুব জরুরি বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। সেটা করতে গেলে তোমার মায়ের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি জানা থাকলে ভালো হত। উনি কী খুব অর্থোডক্স?

বিমলেন্দু কী বিষয়ে আলোচনা করিবেন কাজল তাহা বেশ বুঝিতে পারিল। সে বলিল—আপনি যদি মায়ের ধর্মবিশ্বাস বা সামাজিক আচারের প্রতি নিষ্ঠার কথা জানতে চান তাহলে বলতেই হবে—আমার মা কিছুটা রক্ষণশীল। তিনি অনুদার বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন নন, কিন্তু পারিবারিক বা সামাজিক কোনো প্রথাকে হঠাৎ ভাঙতেও পারেন না। মধ্যবিত্ত পরিবারে একজন সাধারণ মহিলা যেমন হন।

বিমলেন্দু কাজলের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিলেন, তারপর বলিলেন—তুমি বুদ্ধিমান। সম্ভবত বুঝতে পেরেছ আমি কী বলতে চাই। যাক্, তাতে ভালোই হল, এমনিতে আমার কথা শুরু করতে সংকোচ হচ্ছিল।

কাজল কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিমলেন্দু বলিলেন—তুলিকে তুমি দেখেছ, বাই এনি স্ট্যান্ডার্ড, তাকে সুন্দরী বলতেই হবে। ঘরের সব কাজ জানে—যেটুকু জানে না, শিখে নিতে পারবে। তাছাড়াও মায়ের একটা গুণ ও পেয়েছে, তা হল সেন্‌সিটিভ মন। তুলি বই পড়ে, ভালো গান করে। কিন্তু এত গুণ থাকা সত্ত্বেও ওর বিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হবে। হিন্দুসমাজে আমরা মানুষকে উদার মুক্তির আলো দেখাতে পারিনি, কিন্তু নানান্ নিয়মের নিগড়ে তাকে আচ্ছা করে বেঁধেছি। তুলির কোন দোষ নেই, কিন্তু তার মায়ের ভুলের কথা সমাজ মনে কবে রেখেছে। আমি দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে সমস্ত পুরোনো কথা গোপন করে তুলির বিয়ে দিতে পারি, কিন্তু এ ধরনের ব্যাপার চিরকাল চাপা রাখা যায় না, একদিন প্রকাশ হবেই—এবং হলে ওর জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। আর আমিও বিবাহের মতো পবিত্র ব্যাপারে মিথ্যাচরণ কবতে চাই না। এত কথা তোমাকে বলতাম না, কিন্তু তোমাব বাবা তুলির ভবিষ্যৎ জীবনের অসহায়তার কথা আন্দাজ করে আমার কাছে একটা ইচ্ছে প্রকাশ করে গিয়েছিলেন, তুমি কি সে বিষয়ে কিছু জানো?

কাজল বলিল—জানি। বাবার ডায়েরিতে পড়েছি।

—মায়ের অপরাধে যেমন মেয়ের কষ্ট পাওয়া অনুচিত, তেমনি বাবার কোনো ইচ্ছের বোঝা ছেলেব ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। পুরোনো কোনো ঘটনার জের না টেনেই আমি সামাজিকভাবে তোমার সঙ্গে তুলির বিবাহের প্রস্তাব করছি। এ বিষয়ে তোমার মতটাই আমি আগে জানতে চাই, বলো তোমার কী মত—

গলির মধ্যে একটা ফেরিওয়ালা সুর করিয়া কী যেন হাঁকিতেছে। ঘরের দরজায় পাপোশের উপর হলুদ আর কালো লোমওয়ালা একটা মেনিবেড়াল শান্তভাবে বসিয়া আছে। বিমলেন্দু তর্জনী দিয়া টেবিলের ওপর অদৃশ্য নক্‌শা আঁকিতেছেন। কাজলের মনে হইল সমস্ত পৃথিবী তাহার উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। জগৎসংসার দুইটি সম্ভাবনার দরজায় দাঁড়াইয়া, তাহার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো একটা পথ বাছিয়া চলিতে শুরু করিবে।

কাজল বলিল—আপনার সঙ্গে আমি বন্ধুর মতো কথা বলতে পারি?

বিমলেন্দু হাসিলেন। বলিলেন—পারো।

—তবে আমাকে কিছুদিন সময় দিন। আমাকে ভাবতে হবে।

বিমলেন্দু বোধহয় একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি হয়তো আশা করিয়াছিলেন কাজল আজই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি জানাইবে। কিন্তু তিনি সহজভাবেই বলিলেন—বেশ তো, ভাবো। একটা কথা তোমাকে বারবার বলছি—এই ব্যাপারে তোমার কোনো নৈতিক দায়বদ্ধতা নেই। তুমি 'না' বলতেই পারো, এবং তা বললে আমাদের সম্পর্কের কোনোরকম অবনতি ঘটবে না। আর কিছু বলবে?

কাজল বলিল—আমাকে ভুল বুঝবেন না। তুলির—তুলির মায়ের প্রসঙ্গে যদি কোনো সামাজিক অসুবিধা থাকে, তবে আমি তার পরোয়া করি না। আমি সেজন্য সময় নিচ্ছি না, অন্য বিষয়ে আমার কিছু সিদ্ধান্ত নেবার আছে। কিন্তু—

বিমলেন্দু কাজলের দিকে তাকাইলে।

কাজল বলিল—মাঝে মাঝে এসে আমি তুলির সঙ্গে দেখা করতে এবং কথা বলতে চাই। আমি কথা দিচ্ছি, আমি এমন কোনোভাবে মিশবো না যাতে তুলির বা আপনাদের পরিবারের সম্মানের কোনো ক্ষতি হতে পারে।

বিমলেন্দু কিছুক্ষণ মাথা নিচু করিয়া কী ভাবিলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—কতদিন সময় তুমি চাও?

—অন্তত একবছর।

—বেশ, তাই হোক। একবছর আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। আর তুমি আমার বাড়িতে এলে আমার দিক থেকে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যে কারণে তুমি আসতে চাইছ সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে বলে মনে হয় না। তুলি খুব লাজুক মেয়ে, শী ওয়াজ্ রেইজড্ অ্যালোন ইন এ কনজারভেটিভ ওয়ে। তোমার কাছে তুলি খোলামেলা হতে পারবে কী?

কাজল এ কথার উত্তর দিল না।

বিমলেন্দু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—দেখো চেষ্টা করে।

কাজল বলিল—একটা কথা কিন্তু আগে থেকে পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন। একবছর পরে আমি 'না' বলতেও পারি।

বিমলেন্দু হাসিলেন। বলিলেন—তেমন সম্ভাবনার কথা আমার ভাবতে ভালো লাগছে না বটে, কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে তুমি অনেস্ট। যাক্, অনেক কথা হল, এবার কিছু চা-খাবার আনতে বলি—

কাজল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—না, আজ থাক। আর একদিন—

—তুলির সঙ্গে দেখা করবে?

সামান্য দ্বিধা করিয়া কাজল বলিল—না।

বিমলেন্দু বাহির দরজা পর্যন্ত তাহাকে আগাইয়া দিয়া গেলেন।

দুই-একটা খাঁটি পাগল না থাকিলে জীবন বিস্বাদ হইয়া যায়। সবাই হিসাব করিয়া চলিলে বা পাকা বৈষয়িক হইলে পৃথিবীতে বড়ো কাজ করিবে কাহারা? প্রকৃতির নিয়মেই প্রতি যুগে কিছু পাগল জন্মায়। জ্যোতিপ্রিয় এই ধরনের একজন পাগল। সে কাজলের সহিত এম.এ. পড়িত। লম্বা রোগা চেহারা, মাথার চুল অবিন্যস্ত। জামাকাপড়ের প্রতিও কোনো মনোযোগ নাই। ইস্ত্রিবিহীন প্যান্টের উপর যেমন তেমন একটা শার্ট চাপাইয়া ক্লাসে আসিত। একবার দুই পায়ে দুইরকম চটি পরিয়া ইউনিভার্সিটিতে সারাদিন দ্রষ্টব্য বস্তু হইয়া ছিল। জ্যোতিপ্রিয় ক্লাসের লেকচার বিশেষ শুনিত না, পেছনের বেঞ্চিতে বসিয়া নিবিষ্ট মনে 'মডার্ন এক্সপ্ল্যানেশন অফ্ ডারুইনিজম্', 'থিয়োরী অফ্ এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্স' কিংবা 'কুকস্ ভয়েজ' পড়িত। সর্বদাই সে অন্যমনস্ক। কেহ 'কেমন আছ?' জিজ্ঞাসা করিলে এমনভাবে অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিত যে, তাহাকে বদ্ধ কালা অথবা পাগল ছাড়া কিছু ভাবিবার উপায় ছিল না। অথচ পাশ করিবার সময় সে বেশ ভালো নম্বর পাইয়া পরীক্ষার বেড়া উত্তীর্ণ হইয়া গেল। বহুদিন বিকালে কাজল তাহার সহিত গোলদীঘির ধারে বসিয়া বা উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতে কতরকম গল্প করিয়াছে। ফিফথ্ ইয়ারে পড়িবার সময় একদিন জ্যোতিপ্রিয় বলিল—চল অমিতাভ, কিছু টাকা জোগাড় করে একবার উড়িষ্যার তালচের থেকে ঘুরে আসি—

কাজল বলিল—বেড়ানো ভালো কথা, কিন্তু এত জায়গা থাকতে হঠাৎ তালচের কেন?

উৎসাহ পাইয়া জ্যোতিপ্রিয় বলিল—তালচেরে কতগুলো অদ্ভুত পাথরের খণ্ড আছে, জানো? জিওলজিস্টদের ভাষায় সেগুলো হচ্ছে এরাটিক বোল্ডারস্। অর্থাৎ ওই জায়গায় ওরকম পাথর

থাকবার কথা নয়। চারদিকে কয়েকশো মাইলের মধ্যে নেই। তাহলে এই খাপছাড়া বহুটন ওজনের পাথরের টুকরো তালচেরে এলো কোথা থেকে? জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়ার বুলেটিনে ব্যাপারটা পড়ে অবধি মাথা খারাপ হয়ে আছে। যাবে?

কাজলের কাছে তখন টাকা ছিল না। জ্যোতিপ্রিয়রও বোনের বিবাহ সামনের মাসে। সব মিলাইয়া যাওয়ার ব্যাপারটা চাপা পড়িয়া গেল।

মাস ছয়েক বাদে কাজল লাইব্রেরিতে কী কাজে যেন গিয়াছিল, দেখিল জ্যোতিপ্রিয় এককোণে বসিয়া গভীর অভিনিবেশ সহকারে মোটা একখানা বই পড়িতেছে। কাজল পাশে গিয়া বসিতেও সে তাহাকে লক্ষই করিল না। খপ্ করিয়া বইটা কাড়িয়া লইতেই জ্যোতিপ্রিয় 'এই এই! কী হচ্ছে?' বলিয়া ভয়ানক চমকাইয়া উঠিল, পরে কাজলকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল—ওঃ, তুমি! দাও বইটা দাও—একটা দরকারি জায়গা পড়ছিলাম—

ফেরত দিবার সময় কাজল দেখিল বইখানার নাম 'স্টারস্ ইন দেয়ার কোর্সেস্'। সে বলিল—ব্যাপার কী? এখন আবার গ্রহনক্ষত্র নিয়ে পড়েছো নাকি?

মাথা চুলকাইয়া জ্যোতিপ্রিয় বলিল—না, ঠিক গ্রহনক্ষত্র নয়—আসল ব্যাপারটা হল গিয়ে ডাইনোসোর।

আশ্চর্য হইয়া কাজল বলিল—ডাইনোসোর! তার মানে?

—ডাইনোসোর জানো না? জুরাসিক-ট্রিয়াসিক যুগের যেসব বিশাল সরীসৃপ আজ থেকে ছ'সাতকোটি বছর আগে পৃথিবী কাঁপিয়ে বেড়াত—ব্রন্টোসোর, প্লেসিওসোরাস, টিরানোসোরাস রেক্স্—ছবি দেখনি?

—আহা, তা জানি। বলছি, হঠাৎ তাদের নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ যে?

জ্যোতিপ্রিয় চেয়ারে হেলান দিয়া স্বপ্নালু চোখে এমনভাবে সামনের দিকে তাকাইল, যেন সে সাতকোটি বৎসর আগের পৃথিবীটাকে দেখিতে পাইতেছে। চুলের মধ্যে অন্যমনস্কভাবে হাত বুলাইয়া সে বলিল—কয়েক কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করার পর ডাইনোসোরের দল খুব কম সময়ের মধ্যে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। কেন, তার কোনো সঠিক উত্তর বৈজ্ঞানিকেরা দিতে পারছেন না। এই ব্যাপারটা আমাকে খুব ভাবাচ্ছে—

কাজল বলিল—কোনোরকম মহামারী হয়েছিল হয়তো।

—না, তা সম্ভব নয়। মহামারী হলে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে একটা প্রাণীদল এমন নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যায় না। এখানে ওখানে দু'একটা থেকে যেত, তার থেকে আবার বংশবৃদ্ধি ঘটত। এর মধ্যে অন্য কোনো রহস্য আছে—

সাতকোটি বছর আগে ডাইনোসোরেরা কেন মরিয়া গিয়াছিল সে রহস্য ভেদ করিয়া এইমুহূর্তে বিশেষ কী লাভ আছে তাহা হঠাৎ বোঝা না গেলেও এই ধরনেব কল্পনা চিরদিনই কাজলকে আকর্ষণ করে। সে বলিল—তোমাব কী ধারণা?

—দুটো কারণ থাকতে পারে। আমার মনে হয় সে সময়ে আকাশে সৌরজগতের কাছাকাছি কোনো সুপারনোভার বিস্ফোরণ হয়েছিল—নক্ষত্রদের জীবনের শেষদিকে এরকম হতে পারে, জানো তো? সেই বিস্ফোরণ থেকে কোনোরকম ক্ষতিকর রশ্মি এসে পৃথিবীতে পড়তে থাকে অনেকদিন ধরে। তাতেই এরা মারা পড়ে। এই মতবাদ নিয়ে লেখা একটা প্রবন্ধ পড়লাম ন্যাশনাল জিওগ্রাফি পত্রিকায়। তাই অ্যাস্ট্রোনমির বইপত্র ঘেঁটে দেখছি ওইসময় সত্যি কোনো সুপারনোভার বিস্ফোরণ হয়েছিল কিনা। দ্বিতীয় কারণটা শুনলে অবশ্য তুমি হাসবে—

—হাসবো কেন? তুমি বলো—

জ্যোতিপ্রিয় কাজলের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল—এটা অন্য গ্রহ থেকে আসা প্রাণীদের কীর্তিও হতে পারে—

অবাক হইয়া কাজল বলিল—তার মানে?

—আমার মনে হয় বিশ্বে আমরা একা নই, লক্ষ লক্ষ নীহারিকার কোটি কোটি গ্রহ—কোথাও না কোথাও নিশ্চয় বুদ্ধিমান প্রাণী আছে। তাদের ভেতর কোনো গোষ্ঠী মহাকাশযানে চেপে পৃথিবীতে এসেছিল। সে সময়ে পৃথিবীতে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু তারা ডাইনোসোরদের ভয়ে দিনেরবেলা মাটির তলায় গর্তে লুকিয়ে থাকে, রাত্তিরে চুপিচুপি বেরিয়ে খাবার সংগ্রহ করে আবার ঢুকে পড়ে গর্তে। নভোচারীরা বুঝতে পেরেছিল স্তন্যপায়ীদেরই একমাত্র ভবিষ্যৎ আছে। তাদের একটা সুযোগ দিলে একসময় তারাই পৃথিবী শাসন করবে, উন্নত সভ্যতা গড়বে। তাই অন্য গ্রহমণ্ডলী থেকে আসা নভশ্চরেরা ডাইনোসরদের কোনোভাবে খতম করে দিল—

কাজল বলিল—এর থেকে আর একটা সিদ্ধান্তেও আসা যায়—

জ্যোতিপ্রিয় আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল—কী? কী?

—যে তুমি একটা বদ্ধ উন্মাদ! আর সারবে না!

হতাশ ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দিয়া জ্যোতিপ্রিয় বলিল—দাউ টু? সবাই আমাকে খেপায়, অপদার্থ বলে। তোমাকে আমি অন্য চোখে দেখি, তুমি কমন রান অফ পিপল্-এর মধ্যে পড়ো না। তুমিও পেছনে লাগলে তো মুশকিল—

—তুমি আবার সিরিয়াসলি নিলে নাকি? দূর—আমি এমনি মজা করে বললাম বুঝতে পারলে না? আরে এইসব আনইউজুয়াল বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করো বলেই তো তোমাকে এত ভালোবাসি।

জ্যোতিপ্রিয় উত্তেজিত হইয়া বলিল—ওইখানেই তোমাদেব সঙ্গে আমাব বিবোধ। এগুলো কি আনইউজুয়াল চিন্তা হল? এগুলোই তো আসল ভাববার জিনিস—চর্চা করবার বিষয়। এত বড়ো ব্রহ্মাণ্ডটার ভেতর আমরা বাস করছি—কে আমরা? কোথা থেকে সৃষ্টি হল এই বিশ্ব? এর কী কোনো মানে আছে? সার্থকতা আছে? নাকি আপনাআপনি জড়পদার্থের অন্ধ নিয়মে এর বিকাশ আর ধ্বংস হয়ে চলেছে? বরং জীবনের বাকি সব দিক—যার ওপর সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি জোর দেয়—যেমন ব্যবসা, রাজনীতি—সেগুলোই হচ্ছে আনইউজুযাল! আর কবে যে মানুষের চোখ ফুটবে!

বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে কাজল জ্যোতিপ্রিয়র কথাই ভাবিতেছিল। ছেলেটা শত বিরুদ্ধতার মধ্যেও নিজের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বরং সে নিজে কত বদলাইয়া গিয়াছে। জীবনরহস্যের যে আশ্চর্য ব্যঞ্জনা অস্তিত্বের প্রতিটি মুহূর্তকে সার্থক করিযা তুলিত, তাহা যেন কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। আসলে প্রতিদিন বাঁচিতে বাঁচিতে জীবনটা বড়োই পবিচিত আর একঘেয়ে হইয়া যায়। ভয়ঙ্কর এই একঘেয়েমি হইতে মুক্তির মন্ত্র তাহার বাবা জানিত, বাবার সাহিত্যে, ডায়েরিতে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। সেও কী চেষ্টা করিলে পারিবে না? সে কী এমন আশ্চর্য সুন্দর জীবনটা গতানুগতিক সাংসারিকতার প্রবাহে ভাসাইয়া দিবে?

কাজল বুঝিল এই লড়াই যতদিন চলিবে, এই দ্বন্দ্ব তাহার মনের মধ্যে যতদিন কষ্ট দিবে, ততদিনই তাহার আশা। দ্বন্দ্ব কোনোদিন মিটিয়া গেলেই তখন সে বাবু অমিতাভ রায়, এম. এ.। ভালো পোশাক পরা, সুখাদ্যে লালিত শরীর লইয়া মোটরে চড়িয়া বড়ো চাকরি করিতে যাইবে।

ইস্কুলে কাজলকে বাংলা আর ইংরাজি দুই-ই পড়াইতে হয়। ক্লাস সিক্সের শিবপ্রসাদ নামে ছেলেটা বাংলা রচনায় তাহার হাতে সর্বোচ্চ নম্বর পাইয়াছিল। বিষয় ছিল—'বাংলার গ্রামে বর্ষাকাল'। ছাত্রেরা কী লিখিবে কাজল তাহা জানে—'আষাঢ় ও শ্রাবণ দুইমাস বর্ষাকাল। বর্ষায় গ্রামের পথে ভীষণ কাদা হয়। দিনরাত অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়ে। কালো মেঘের রূপ দেখিয়া কবি গাহিয়াছেন'—এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা অক্ষয় বড়াল হইতে কিছুটা উদ্ধৃতি। ইহার বাহিরে কেহ

বিশেষ কিছু লেখে না এবং মোটামুটি একটা নম্বর পাইয়া পাশ করিয়া যায়। কিন্তু ষান্মাসিক পরীক্ষার খাতা দেখিতে দেখিতে একটি ছাত্রের বাংলা রচনা কাজলকে আকৃষ্ট করিল। পড়িলেই বোঝা যায় ছেলেটি মুখস্থ লেখে নাই, অন্য কাহারও লেখার সঙ্গে তাহার মিলও নাই। নিজের ভাষায় লিখিতে গিয়া প্রকাশভঙ্গি এবং বানানে কিছু ভুল হইয়াছে সত্য, কিন্তু রচনার অনাড়ম্বর সারল্য কাজলের ভালো লাগিল। ছাত্রটি কোনো কবিতা হইতে উদ্ধৃতিও দেয় নাই। পাতা উলটাইয়া নাম দেখিল—শিবপ্রসাদ সেন।

খাতা দেখা হইলে ক্লাসে ক্লাসে ছাত্রদের দেখাইবার নিয়ম আছে, যাহাতে তাহারা নিজের ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইতে পারে। তিন-চারদিন পর ক্লাস সিক্সে খাতা দেখাইবার সময় কাজল জিজ্ঞাসা করিল—শিবপ্রসাদ কার নাম?

একটি শ্যামবর্ণ, দুর্বল চেহারার বালক পেছনের বেঞ্চি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখেমুখে ত্রাসের চিহ্ন। মাস্টারমশায়েরা কোনো কারণে ডাকিলে সচরাচর তাহার ফল ছাত্রের পক্ষে সুখপ্রদ হয় না।

—আমি স্যার, আমার নাম শিবপ্রসাদ—

—বেশ ভালো রচনা লিখেছ তুমি। এই নাও, খাতা নিয়ে যাও—কিছু কিছু বানান ভুল আছে, দেখে নিয়ো। বাড়িতে কার কাছে পড়ো?

—আমি নিজেই পড়ি স্যার, আমার প্রাইভেট টিউটর নেই।

—বেশ। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমার বাড়িতে সন্ধের দিকে গিয়ে পড়া দেখে নিতে পারো। আমার বাড়ি চেনো তো?

—হ্যাঁ স্যার।

বেশির ভাগ ছাত্রই এই ধরনের সুযোগ পাইলে শিক্ষকের কাছে নিজের আগ্রহ প্রমাণ করিবার জন্য একেবারে জ্বালাইয়া মারে। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে কাজল তাহা জানে। কিন্তু শিবপ্রসাদ বয়সে ছোট হইলেও তাহার পরিমিতিজ্ঞান প্রশংসনীয়। সে প্রত্যহ সন্ধ্যায় নিজের বাহাদুরি দেখাইবার জন্য গাদা গাদা অপ্রয়োজনীয় নোট আর রচনা লিখিয়া কাজলকে দেখাইতে আনিল না। কাজল বলিবার দিন পনেরো পর একদিন সে লাজুক মুখে আসিয়া বসিবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইল। কাজল টেবিলে বসিয়া অপুর এক প্রকাশকের চিঠির উত্তর লিখিতেছিল, মুখ তুলিয়া বলিল—ও, তুমি—এসো, বোসো ওই তক্তাপোশে। বই দেখবে? তুমি বরং তাক থেকে যে কোনো বই নামিয়ে দেখ, আমি ততক্ষণ এই চিঠিটা একটু লিখে নিই—

চিঠি লেখা হইলে খামে বন্ধ করিয়া কাজল দেখিল শিবপ্রসাদ সেই মাসের ওয়াইড্ ওয়ার্লড্ ম্যাগাজিনটি লইয়া গভীর মনোযোগের সহিত ছবি দেখিতেছে।

কাজল বলিল—কী পড়ছো দেখি? ও, ওই দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে অ্যাড্ভেঞ্চার! পড়ে মানে বুঝতে পারছো?

শিবপ্রসাদ বলিল—না স্যার। তারপর বলিল—ছবিগুলো খুব সুন্দর।

—হ্যাঁ, ওর সব কিন্তু ফোটোগ্রাফ নয়, মানে ক্যামেরায় তোলা নয়, অনেক হাতে-আঁকা ছবিও আছে। এটা খুব নামকরা বিলিতি পত্রিকা, বুঝলে? নানারকম সত্যি ঘটনা এতে থাকে। আমার বাবা পড়তেন, এখন আমিও রাখি—

শিবপ্রসাদ ইংরাজি বাকরণের টেন্স্ লইয়া গোলমালে পড়িয়াছিল, তাহাই কাজলের কাছে বুঝিয়া লইতে আসিয়াছে। কিছুদূর পড়াশুনা হইলে কাজল বলিল—আজ এই পর্যন্ত থাক, একদিনে টেন্স্ শেখা যায় না, মাথা গুলিয়ে যাবে। বোসো, তোমাকে কিছু খেতে দিই—

বাড়ির ভিতর হইতে প্লেটে করিয়া কলা, দুইখানি ব্রিটানিয়া বিস্কুট এবং একটি সন্দেশ আনিয়া কাজল ছাত্রকে খাইতে দিল। শিবপ্রসাদ প্রথমে কিছুতেই খাইতে রাজি হয় না, পরে কাজলের ধমক

খাইয়া প্লেট হাতে নিল। কাজল তাহাকে পত্রিকা হইতে ছবি দেখাইয়া মেরুভল্লুক, মিশরে ফারাও খুফুর পিরামিড, অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে দিকহারা পর্যটক ইত্যাদির কাহিনী মুখে মুখে সহজ করিয়া শোনাইল। শিবপ্রসাদ বেশ বুদ্ধিমান ছেলে, গল্প শুনিতে শুনিতে সে যে দু'একটি প্রশ্ন করিল তাহা হইতেই কাজল সে কথা বুঝিতে পারিল। মাসখানেক বাদে কাজল একদিন তাহাকে সঙ্গে লইয়া গ্রামের পথে বেড়াইতে গেল। ছাত্রকে অনেক পাখি আর গাছপালা চিনাইয়া দিল।

সেবার বার্ষিক পরীক্ষায় শিবপ্রসাদ বেশ ভালো ফল করিয়া প্রমোশন পাইল। কাজলের মনে হইল একটু সাহায্য ও সঠিক নির্দেশ পাইলে ছেলেটি ম্যাট্রিকে যথার্থ ভালো ফল করিবে। স্কলারশিপ পাইলে কলেজে পড়িবারও অসুবিধা হইবে না।

কিন্তু ক্লাস এইটে পড়িবার সময় শিবপ্রসাদ হঠাৎ পরপর কয়েকদিন স্কুল কামাই করিল। অসুখবিসুখ করিল নাকি? দিনসাতেক দেখিয়া কাজল ক্লাসে জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা কেউ কী শিবপ্রসাদের বাড়ি চেনো? ওর কী হয়েছে বলতে পারো? বেশ কিছুদিন স্কুলে আসছে না—

পরিতোষ নামে একটি ছেলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আমার বাড়ি স্যার শিবুদের পাড়ায়। শিবুর বাবার খুব অসুখ, সেইজন্য স্যার ও আসছে না।

—অসুখ? কী হয়েছে?

—তা তো জানি না স্যার, তবে খুব অসুখ—

ছেলেটির কাছ হইতে ঠিকানা জানিয়া কাজল বিকালে শিবপ্রসাদেব বাড়ি খুঁজিয়া বাহিব করিল। ডাকাডাকি কবিতে শিবু বাহির হইযা কাজলকে দেখিয়া একেবারে অবাক হইযা গেল। কোথায় বসাইবে, কী করিবে ভাবিযা পায় না। পরে বারান্দার কোণে একটা নড়বড়ে চৌকিতে গুবুকে বসিতে দিয়া দৌড়াইযা মাকে ডাকিয়া আনিল। শিবুব মায়ের বয়েস বছর ত্রিশ কী বত্রিশ হইবে। একসময়ে হয়তো দেখিতে ভালো ছিলেন, দারিদ্র্য ও অতিরিক্ত পরিশ্রম বর্তমানে চেহারার মাধুর্যটুকু হরণ করিয়াছে। তিনি কোনো কথা না বলিয়া দরজার পাল্লা ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। কাজল বলিল—আমাকে আপনি চিনবেন না, আমি শিবপ্রসাদের মাস্টাবমশাই। ও আমার খুব প্রিয় ছাত্র। আজ কদিন স্কুলে যাচ্ছে না—ছাত্রদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম আপনাব স্বামী অসুস্থ। আমার কাছে আপনি কোনো সংকোচ করবেন না, নিজেব ভাই বলে মনে করবেন। যদি আমি কোনো কাজে আসতে পারি—

শিবুব মা কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাজল এতদিন ছাত্রের সংসারের খবর বিশেষ কিছু জানিত না, এখন শুনিল শিবুর বাবা শহবের কোন এক লেদ কারখানায় কাজ করেন, বেতন সামান্যই। ছুটির পর খুচরা দু-একটা কাজ করিয়া সব মিলাইয়া কোনমতে চালাইয়া দেন। দিনদশেক আগে কাজ করিতে কবিতে হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া যান, কারখানার লোকেরাই ধরাধরি করিয়া বাড়ি পৌছাইয়া দেয়। জ্ঞান ফিরিবার পর শরীবের বাঁদিক সম্পূর্ণ অবশ হইয়া গিয়াছে, উঠিবার ক্ষমতা নাই। কারখানার মালিক এমনিতে লোক ভালো, পাওনা যাহা ছিল লোক মারফৎ পাঠাইয়া দিযাছে। তাহা ভাঙাইয়াই বর্তমানে চলিতেছে বটে, কিন্তু আর কদিন চলিবে? চিকিৎসারও বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করিয়া যায় নাই। মোড়ের মাথার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবু ভরসা।

কাজল বলিল—আমি কী একবার ওঁকে দেখতে পারি?

ভদ্রমহিলা ছেলেকে ইঙ্গিত করিতে শিবু কাজলকে ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। নিতান্ত নিম্ন মধ্যবিত্তের গৃহস্থালি—চটা ওঠা সিমেন্টের মেঝে, দেওয়ালের দিকে তিনখানি তোবড়ানো রঙ ওঠা টিনের তোরঙ্গ একটার উপর একটা রাখা, তাহার উপর আঁকা গোলাপফুল ম্লান হইয়া আসিয়াছে। ঘরের এক কোণ হইতে অন্য কোণ পর্যন্ত দড়ি টাঙানো, তাহা হইতে মলিন কিছু শাড়ি ধুতি গামছা ঝুলিতেছে। একটা কুলুঙ্গিতে সিঁদুরমাখা মাটির লক্ষ্মীমূর্তি। মেঝেতে বসিয়া একটা বিড়াল রুটির টুকরা খাইতেছে।

ঘরের কোণে চৌকিতে শিবুর বাবা শুইয়া আছেন। চোখ খোলা, মুখ ঈষৎ হাঁ করা। বাঁ চোখের পাতা এমনভাবে অর্ধেক নামিয়া আসিয়াছে যে দেখিলে মনে হয় শায়িত ব্যক্তি কোনো একটা নিগূঢ় ঈঙ্গিত করিতেছেন। ঠোঁটও বাঁদিকে শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কাজল পাশে গিয়া দাঁড়াইতে ভদ্রলোক বোধহয় তাহাকে কিছু বলিবার চেষ্টা করিলেন, গলা দিয়া একটা দুর্বোধ্য ঘড়ঘড় শব্দ বাহির হইল মাত্র। কাজল তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল—থাক, আপনি কথা বলবেন না! আমি শিবুর স্কুলের মাস্টারমশাই। আপনার অসুখের খবর পেয়ে দেখতে এসেছি। ভয় নেই, ভালো হয়ে যাবেন—

শিবুর বাবার গলার মধ্যে আবার বিকৃত ঘড়ঘড় শব্দ হইল, দুর্বল ডানহাত দিয়া তিনি কাজলের হাত জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিলেন। বেশিক্ষণ থাকিয়া রোগীকে উত্তেজিত করিয়া লাভ নাই, কাজল বলিল—আমি আজ যাচ্ছি, আবার আসব। আপনি বিশ্রাম করুন।

এক ডাক্তার বন্ধুকে লইয়া পরের দিন সন্ধ্যায় কাজল আবার শিবুদের বাড়ি গেল। বন্ধু রোগী দেখিয়া বলিল— সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়ে আংশিক পক্ষাঘাত দেখা দিয়েছে। আমি তো ভাই সাধারণ ডাক্তার, কোলকাতায় কোনো হাসপাতালে ভর্তি করে একজন নিউরোলজিস্টকে দেখালে ভালো হত—

কাজল বলিল—সেরে ওঠার সম্ভাবনা কতখানি?

—বলা কঠিন। অনেকে চিকিৎসায় বেশ উপকার পায়, আবার অনেকে—বুঝলে না? তবে আগের স্বাস্থ্য আর বোধহয় ফিরে পাবেন না—

বন্ধুর সুপারিশে কলিকাতার হাসপাতালে বেড পাওয়া গেল, একখানা অ্যামবুলেনসও জোগাড় হইল। কিন্তু একমাস হাসপাতালে থাকিবার পর শিবুর বাবা যখন ফিরিলেন, দেখা গেল তাঁহার অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। লাঠি ধরিয়া সামান্য চলাফেরা করিতে পারেন—চিকিৎসার ফলের মধ্যে এই। কথা জড়াইয়া গিয়াছে, নিকটজনেরা ছাড়া বুঝিতে পারেন না।

কাজল নিজের পকেট হইতে কিছু দিয়া, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া শিবুর মায়েব হাতে দিয়া আসিল। কিন্তু এভাবে কাহারও সংসার বাহির হইতে সাহায্য করিয়া চিরকাল চালানো যায় না। চাঁদাও যে খুব সহজে সংগ্রহ হইল এমন নয়। তাহার নিজের স্কুলের একজন প্রৌঢ় শিক্ষক তিনটি টাকা দিলেন বটে কিন্তু বলিলেন—আপনার কথা এড়াতে পারলাম না, তাই দিচ্ছি। নইলে এব কোনো মানে হয় না—

কাজল বলিল—সে কী কথা! আমাদেরই স্কুলের দরিদ্র ছাত্র, তার ফ্যামিলি একটা স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে—এতে আমাদের কোনো কর্তব্য নেই?

—দেখুন সে কথা বলতে গেলে আমাদের ইস্কুলে আরও পঞ্চাশজন ছাত্র আছে যাদের পরিবার হয়তো এর চেয়েও ডায়ার স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে চলেছে। তাদেব সবাব উপকার করার সাধ্য আপনার আছে? দেশের অগণিত দরিদ্র জনসাধারণের কথা ছেড়েই দিন। এখানে আপনার পার্সোনাল ইন্‌ভলভ্‌মেন্ট রয়েছে, আপনার প্রিয় ছাত্র—অন্যদের কী হবে?

কাজল রাগিয়া বলিল—এটা কী একটা যুক্তি হল? সবার জন্য করার শক্তি নেই বলে সামনে যে কষ্ট পাচ্ছে তাকেও সাহায্য করবো না? আমরা প্রত্যেকে নিজেদের পরিচয়ের গণ্ডীর মধ্যে যদি সেবার কাজ করি, তাহলে পৃথিবীটা বেটার প্লেস হয়ে উঠবে—

প্রৌঢ় শিক্ষক খড়কে দিয়া দাঁতের ফাঁক হইতে পানের কুচি বাহির কবিতে করিতে বলিলেন—ওসব ভাবজগতের কথা মশাই, আমাদের বাস্তবজগতে বাস করতে হয়। যাক, আপনার অনুরোধ রেখেছি, এবার আপনি দেশোদ্ধার করুন গে—

নেহাত শিবুদের এখন প্রতিটি টাকার প্রয়োজন, নতুবা কাজল ভদ্রলোকের চাঁদা ফেরত দিয়া দিত। কিন্তু সেদিনই সন্ধ্যায় যখন সে টাকাটা দিতে গেল, শিবু বলিল—স্যার, আপনি আর টাকা আনবেন না—

কাজল বলিল—তোমার বাবা যতদিন না ভালো হয়ে উঠছেন—মানে সংসার তো চালাতে হবে, তারপর না হয় আর নিয়ো না—

—বাবা কবে ভালো হবেন কিছু ঠিক নেই। বাবার পুরোনো কারখানার ম্যানেজার আমাকে নিতে রাজি হয়েছে। ছমাস কাজ শিখতে হবে, হপ্তায় পনেরো টাকা করে পাবো। ঠিকমত কাজ শিখে নিতে পারলে তারপর থেকে হপ্তায় চল্লিশ টাকা।

—সে কী! তুমি আর পড়বে না?

—না স্যার। কাল থেকে কারখানায় যাবো বলে দিয়েছি—

শিবুর মা তাহার সাহায্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ দিলেন, শিবুর বাবাও অর্ধোচ্চারিত জড়িত স্বরে নিজের কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিলেন। কিন্তু কাজল মনে একটা ঘোর অতৃপ্তি লইয়া বাড়ি ফিরিল। বর্তমান মুহূর্ত হইতে শিবপ্রসাদের ভবিষ্যৎ সে ছবির মতো স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে। নিজের বাবার জীবনেরই সে পুনরাবৃত্তি করিবে—কারখানায় চাকরি, বিবাহ, একগাদা বাচ্চা লইয়া অনটনের সংসার, তারপর একদিন অবসব অথবা অপাবগতা—জীবন শেষ!

অথচ তাহার জীবন অন্যরকম হইতে পারিত। ইহার জন্য কে দায়ী? দেশেব সমাজব্যবস্থা? অর্থনীতি? যাহাই হোক, একটা জীবন তো নষ্ট হইয়া গেল!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অপুব প্রথম উপন্যাসটির খ্যাতি দিন দিন বাড়িতেছিল। সাধাবণ সামাজিক উপন্যাস এবং জোলো প্রেমের কাহিনী পড়িতে পড়িতে বাঙালি পাঠক বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শক্তিমান কয়েকজন তবুণ সাহিত্যিক এই অচলায়তন ভাঙিবার জন্য সাহসী ও বলিষ্ঠ এক নতুন রীতির আমদানি করিয়া লিখিতে শুরু করিলেন। এতাবৎকালে প্রাচীন নীতিবোধসম্পন্ন বাঙালি সমাজজীবনের যে গূঢ় ও অন্ধকাব কোণগুলি সঙ্গোপনে লুকাইয়া রাখা পছন্দ করিতেন, এই নতুন লেখকের দল প্রধানত তাহাকেই নিজেদের রচনাব উপজীব্য কবিলেন। শরীর ও যৌনতা, অবৈধ প্রেম—এসব বিষয়ে স্পর্শকাতর মধ্যবিত্ত মূল্যবোধকে একেবারে ভিতব হইতে নাড়া দিবার জন্য ইহারা উদ্যোগী হইলেন। নীতিবাগীশের দল খেপিয়া আগুন হইলেন, তরুণের দল জয়ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত করিল। কোনো কিছু লইয়া বিতর্ক উপস্থিত হইলে মানুষ স্বভাবতই কৌতূহলী হইয়া ওঠে। কাজেই এই তরুণ-সাহিত্য কিছুদিন বাজারে বেশ ভালো চলিল। কিন্তু একটানা কিছুকাল উত্তেজিত থাকিবার পর একটা ক্লান্তি আসে, কারণ উত্তেজনা জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা নয়। তখন একটু স্বস্তি, একটু আশ্রয় প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অপুর উপন্যাসে তাহা ছিল। জীবনের সমস্ত অকারণ চাহিদা, বস্তুগত প্রাপ্তির জন্য নিরন্তর শ্রম এবং উচ্চকিত কলরবের বাহিরে, যেখানে শান্ত সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষ নিজের প্রকৃত পরিচয় খুঁজিয়া পায়, অপুর রচনা পাঠককে সেই সমাহিত মগ্নতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাইয়া দেয়। পাঠক তাহার বই কাড়াকাড়ি করিয়া কিনিল না বটে, কিন্তু তাহার বিক্রি একটা নির্দিষ্টস্থানে আসিয়া স্থির হইয়া রহিল। ফলে নতুন সাহিত্যের তরুণ লেখকদের অনেককেই যখন পাঠকসমাজ বেমালুম ভুলিয়া গেল, তখনও অপুর খ্যাতি এবং বইয়ের বিক্রি একটি স্থির বিন্দুতে অনড়।

একদিন কাজলদের বাড়ির সামনে একখানা ঝকঝকে স্টুডিবেকার গাড়ি আসিয়া থামিল। বাদামী রঙের এরোপ্লেনের মতো দেখিতে লম্বা গাড়ি। স্টিয়ারিংয়ের পেছনে কেতাদুরস্ত উর্দি পরা চালক বসিয়া আছে। চালক নামিয়া দরজা খুলিয়া দিতে সাদা জামা-প্যান্ট-পরা এক ভদ্রলোক নামিলেন। ছুটির দিন সকাল, কাজল বারান্দায় দাঁড়াইয়া অবসরের আমেজ উপভোগ করিতেছিল।

ভদ্রলোক তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা ভাই, সাহিত্যিক অপূর্বকুমার রায়ের বাড়িটা কোনদিকে বলতে পারেন?

কাজল একটু অবাক হইল। এতবড় গাড়ি চড়িয়া তাহাদের বাড়ি আসবার মতো অতিথি কমই আছে। সে বলিল—এটাই তাঁর বাড়ি। আপনি কাকে চান?

—আমি একবার ওঁর—আচ্ছা আপনি কে?

—আমি ওঁর ছেলে।

—ওঃ, তাহলে তো খুব ভালোই হল। আপনিই কি ওঁর কপিরাইট হোল্ডার?

—না, আমার মা।

—আপনার মায়ের সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে কী?

কাজল বলিল— আপনি ভেতরে এসে বসুন, আমি মাকে ডাকছি।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকিয়া কাজলের বিছানা, টেবিল ও তাকের বইপত্র এবং চেয়ার ইত্যাদি একনজরে দেখিয়া লইয়া সন্তর্পণে চেয়ারে বসিলেন। টেবিলের উপর 'অকসফোর্ড লেকচার্স অন পোয়েট্রি' বইখানা পড়িয়াছিল। সেটা তুলিয়া পাতা উলটাইতেছেন, এমন সময় হৈমন্তীকে লইয়া কাজল ঘরে ঢুকিল। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বই রাখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন—আমার নাম রেবতী সেন, একটা বিশেষ দরকারে এসেছিলাম। আগে খবর না দিয়ে আসার জন্য আমি দুঃখিত—

হৈমন্তী বলিল—তাতে কী হয়েছে, আমরা অত ইংরেজি সামাজিকতা মানি না। আপনি বসুন—

বসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—আমার একটা গর্ব আজ ভেঙে গেল। আমার নামটা বলেই বুঝলাম আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি। আমি ফিল্‌ম তুলি, আমাব ছবি লোকে খুব দেখে। যেখানে যাই, নাম বললেই সবাই চিনে ফেলে। আপনি পারলেন না—

হৈমন্তী হাসিয়া বলিল—আপনি কিছু মনে করবেন না, আসলে আমি বা আমার ছেলে কেউই বায়োস্কোপ দেখি না—

ভদ্রলোকও হাসিলেন, বলিলেন—না না, আমি কিছু মনে করিনি, বরং মজাই লাগছে। নিজের যথার্থ স্থান সম্বন্ধে সচেতন থাকাই ভালো।

কিছুক্ষণ সৌজন্যমূলক বার্তালাপ হইবার পর রেবতী সেন তাঁহার আসিবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। তিনি অপুর প্রথম উপন্যাসটির ছবি করিতে চান। ছবি দেখিবার অভ্যাস না থাকিলেও হৈমন্তী নিশ্চয় তাঁহার নির্মিত 'সুখের সংসার' বা 'অশ্রুজলে লেখা' বায়োস্কোপ দুটির নাম শুনিয়াছে? অপূর্ববাবুর গল্পটি হাতে পাইলে, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি দর্শকদের কাঁদাইয়া পাগল করিয়া দিবেন। বিশেষ করিয়া গল্পের শেষে ছোট মেয়েটির মৃত্যুদৃশ্যে এমন একখানি করুণ গান জুড়িবার কথা ভাবিয়াছেন, যাহা আগামী দশবছরেও দর্শক ভুলিবে না। তাঁহার বলিতে সংকোচ হইতেছে, তবু তিনি বলিতেছেন, টাকার বিষয়ে হৈমন্তীর কোনো আশঙ্কার কারণ নাই। তিনি উপযুক্ত মূল্য দিবেন এবং নগদেই দিবেন।

মানুষটি ভদ্র। তাঁহার প্রার্থনার ভিতরেও দম্ভ বা ঔদ্ধত্য নাই। তিনি যেভাবে অপুর উপন্যাসের চিত্ররূপ দিবার কথা ভাবিয়াছেন, তাহার হাস্যকর দিকটাও তাঁহার নিজের কাছে স্পষ্ট নয়। নিজের অর্জিত সাফল্য সম্বন্ধে সরল তৃপ্তিবোধ এবং তার অসংকোচ প্রকাশ ছাড়া ভদ্রলোকের আচরণে চটিয়া উঠিবার মতো কিছু নাই।

হৈমন্তী বলিল—কিছু মনে করবেন না, এ গল্প আমি আপনাকে দিতে পারব না।

রেবতী সেন অবাক হইয়া বলিলেন—কেন? কেন বলুন তো?

—কারণ—কারণটা ব্যক্তিগতই ধরুন। আপনার আগেও দু-একজন এ গল্প চাইতে এসেছিলেন, তাঁদেরও আমি ফিরিয়ে দিয়েছি—

—সে জানি, তাদের নামও জানি। কিন্তু তারা আর আমি তো এক নই। আমার ছবি বাজারে আঠারো সপ্তাহের কম চলে না। লোকে আমাকেই চায়—

—আমাকে মাপ করবেন, আমি পারবো না।

আরও কিছুক্ষণ অনুরোধ-উপরোধের পর বিদায় লইবার সময় রেবতী সেন বলিলেন—আমাকে আজ ফিরিয়ে দিলেন—বেশ, আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু একটা কথা বলে যাই, এ ছবি খুব শিগগিরই আপনাকে দিতে হবে—বেশিদিন আটকে রাখতে পারবেন না। এক একটা যুগে এক একটা শিল্পের জোয়ার আসে। এই যুগ হচ্ছে ফিল্‌মের যুগ। এর দাবিকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। আমাকে না হোক, অন্য কাউকে অনুমতি দিতেই হবে। আচ্ছা চলি—নমস্কার।

কিছুদিনের মধ্যেই কাজল আর হৈমন্তী রেবতী সেনের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিল। চলচ্চিত্র জগতে গোপনতা রক্ষা করা কঠিন। নামকরা কোনো প্রযোজক বা পরিচালক কোনো একটি গল্প সম্বন্ধে ভাবিতেছেন বলিয়া রটিলে অকস্মাৎ সেই গল্পটির জন্য একেবারে হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। কে কাহাকে ডিঙাইয়া গল্পটির স্বত্ব কিনিয়া ফেলিবে তাহার প্রতিযোগিতা চলে। মাসদেড়েক কাজলদের বাড়িতে খুব সিনেমার লোকের যাতায়াত চলিল। হৈমন্তীর একই উত্তর।

তারপর একদিন আসিলেন প্রত্যয় চৌধুরী।

ত্রিদিব মিত্র নামে একজন প্রকাশক অপুর প্রথম উপন্যাসখানির একটি কিশোরপাঠ্য সংস্করণ ছাপিয়াছিলেন। ভদ্রলোক রুচিবান, উচ্চশিক্ষিত। শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার মৌলিক মতামত রহিয়াছে। বই ছাপা তাঁহার পেশা নয়, নেশা। মুদ্রণ পারিপাট্য, নির্ভুল ছাপা ও ধ্রুপদী গ্রন্থ নির্বাচনের জন্য মননশীল পাঠকমহলে তাঁহার খ্যাতি আছে। অপুর বই প্রকাশ করার সূত্রে কাজলদের পরিবারের সহিত তাঁহার পরিচয় জমিয়া উঠিয়াছিল। মাঝে মাঝে আসিযা তিনি নানান্ গল্প শোনাইতেন। ইউকাটান অঞ্চলের অরণ্যে মায়া সভ্যতার পিরামিড, আদিম চিরোকী ইন্ডিয়ানদের আবাস 'টিপি' তৈরি করিবার কৌশল, ইতালীতে প্রস্তুত কাঠেব গ্রামোফোন এবং বাঁশের পিনে বিঠোফেনের নাইন্থ সিম্‌ফনি কেমন শোনায়, বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস তৈরি করিবার সময় শিল্পীরা তাহাতে তেঁতুলবিচির গুঁড়ার প্রলেপ দিয়া কিভাবে তাসগুলিকে দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী করিবার কৌশল আবিষ্কার কবিয়াছে—ইত্যাদি। ত্রিদিব মিত্রই প্রত্যয় চৌধুরীকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। পরিচয় করাইয়া দিবার পর তিনি বলিলেন—মিসেস বায়, আমি কিন্তু একটা বিশেষ কারণে একে নিয়ে এসেছি। অপূর্ববাবুর বইখানার ছোটদের সংস্করণের প্রচ্ছদ এবং ভেতরের ছবি সব এই প্রত্যয় এঁকেছে। এ খুব ভালো একজন শিল্পী। ওর পরিবারেরও একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে, সে সব শুনবেন এখন। প্রত্যয় ফিল্‌মের বিষয়ে খুব উৎসাহী, অপূর্ববাবুর প্রথম উপন্যাসখানি ও ছবি করতে চায়। এ প্রসঙ্গে আপনার কী মত?

হৈমন্তী হাসিয়া বলিল—মিত্রমশাই, আপনি তো জানেন আমার স্বামী তাঁর এই বইটিকে সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। ওঁর ধারণা ছিল—এবং আমারও ধারণা—এ বইয়ের ছবি করা যায় না। অনেক পরিচালক এসে গল্পের স্বত্ব কিনতে চেয়েছেন, তাঁদের আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। টাকার জন্য কী সন্তানকে বিক্রি করা যায়, বলুন?

ত্রিদিব মিত্র বলিলেন—আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। টাকার জন্য এ কাজ করলে আপনার অখ্যাতি হত। তবে ছবি করা যায় না এ কথা ঠিক নয়। করা কঠিন, কিন্তু করা যায়। ভালো পরিচালকের হাতে পড়লে এ বই থেকে একটি অসাধারণ ফিল্‌ম হতে পারে।

—উনি এর আগে কী কী ছবি করেছেন?

—কোনো ছবিই করেনি। এটাই ওর প্রথম উদ্যোগ হবে। তাছাড়া ওর টাকাও নেই, কাজেই টাকার লোভে আপনি স্বত্ব দিচ্ছেন এ অপবাদও কেউ দিতে পারবে না।

—টাকার অসুবিধে থাকলে উনি ছবি করবেন কীভাবে? ফিল্‌ম তুলতে তো শুনেছি অনেক টাকা লাগে।

এবার প্রত্যয় চৌধুরী নিজে উত্তর দিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর গম্ভীর এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ। কথা বলিবার এমন একটি অ-ত্বরিত ভঙ্গি আছে যাহাতে বক্তব্যের সমীচীনতা স্পষ্ট হইয়া ওঠে। তিনি বলিলেন—এ ছবিতে খুব বেশি খরচ হবে না। দামি নায়ক-নায়িকা বা অভিনেতা কাউকেই আমার প্রয়োজন নেই। শুটিং হবে গ্রামে, শক্ত হাতে বাজেট করে নেব। আমার সামান্য কিছু জমানো টাকা আছে। তারপর দরকার হলে স্ত্রীর গয়না আছে, সেগুলো—

হৈমন্তী প্রত্যয় চৌধুরীর দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি এই ফিলমে গান রাখছেন তো?

কিঞ্চিৎ অবাক হইয়া প্রত্যয় চৌধুরী বলিলেন—গান? কোন্ সিচুয়েশনে?

—কেন, নায়কের বোনের মৃত্যুদৃশ্যে? সেখানে গান থাকবে না?

হৈমন্তীকে দেখিয়া এবং তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া প্রত্যয় চৌধুরীর বোধহয় একটা সম্ভ্রমপূর্ণ মনোভাব জন্মিয়াছিল, গানের প্রস্তাব শুনিয়া তাঁহার মুখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। হৈমন্তী বলিল—আগে যেসব পরিচালকেবা এ ছবি করতে চেয়েছেন তাঁরা কিন্তু গান বাখার কথা ভেবেছিলেন। তাই—

প্রত্যয় চৌধুরী হাসিলেন।

কথা একদিনে শেষ হইল না। নিজেব সহজ বুদ্ধিকে প্রয়োগ করিয়া হৈমন্তী বুঝিতে পারিয়াছিল এই মানুষটি অন্য সকলের মতো নয়। কিন্তু সে দীর্ঘদিনেব দ্বিধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত আছে যাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হইয়া অন্য কেহ গ্রহণ কবিলেই ভালো হয়। হৈমন্তীর তেমন কোনো গুরুজন নাই। সে অনেক ভাবিল। বিবুদ্ধে ও সপক্ষে যুক্তিগুলি মনের মধ্যে সাজাইয়া দেখিল, কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তে আসিতে পাবিল না।

ত্রিদিব মিত্র ও প্রত্যয় চৌধুরী কিছুদিন বাদে-বাদেই আসাযাওয়া করিতে লাগিলেন। হৈমন্তী বুঝিল এ প্রসঙ্গ আব বেশিদিন মুলতুবি রাখা যাইবে না। জীবনে কোনো কোনো বিষযে ঝুঁকি লইতেই হয়। সম্ভাব্য পরিণতিগুলির মধ্যে যেটির সবচেয়ে সফল হইবার সম্ভাবনা সেটিকে নির্বাচন করিযা অগ্রসর হওয়াই ভালো। একদিন ছবির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া গেল।

পরের দিন কাগজে কোনো খবব বাহির হইল না, চুক্তিব কথা কযেকজন বাদে বিশেষ কেহ জানিলও না। কাজল, হৈমন্তী, প্রত্যয় চৌধুরী—কেহই আন্দাজ করিতে পারিল না দেশেব শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হইল। সে দিন আসিতে আরও দুই তিন বৎসর বিলম্ব ছিল।

শুটিং শুরু হইল কলিকাতা হইতে মাইল ত্রিশেক দূরে এক গ্রামে। ছবি তোলাব দলের সবাই সমান উৎসাহী। সবাই মনপ্রাণ দিয়া কাজ করিতে লাগিল। কিছুদুর কাজ অগ্রসর হইলে প্রত্যয় চৌধুরী কাজল আর হৈমন্তীকে কলিকাতা লইয়া যান, যতখানি ছবি উঠিয়াছে সেটুকু প্রোজেক্ট্ করিয়া দেখান, বিশেষ করিযা হৈমন্তীর মতামত মনোযোগ দিয়া শোনেন। হৈমন্তী একদিন তাঁহাকে বলিল—আমি নিতান্ত সাধারণ গৃহবধূ, আমাব জ্ঞানবুদ্ধির সীমা আমি তো ভালো করেই জানি, আমার মতামত আপনি জানতে চাইছেন কেন?

প্রত্যয় চৌধুরী বলিলেন—আপনার মতই আসল মত। সমালোচকদের পাণ্ডিত্য তাদের চোখের সামনে একটা আবরণ তৈরি করে, আপনি কিন্তু সহজ সত্যটা দেখতে পান। প্রায় অর্ধেক ছবি তো হয়ে গেল, আপনার কেমন লাগছে?

—খুব ভালো। ত্রিদিববাবুর ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে, এখন দেখছি তিনি ভুল লোক নির্বাচন করেন নি। কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—আমার ভয় হচ্ছে আপনার এ ছবি সাধারণ মানুষ নেবে না!

প্রত্যয় চৌধুরী সামান্য চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিলেন—ঠিকই বলেছেন। আমারও সে ভয় হচ্ছে। এ ছবির দর্শক এখনও এদেশে তৈরি হয়নি। তবু কাউকে তো একদিন কাজ শুরু করতেই হয়।

কলিকাতার তিনটি প্রেক্ষাগৃহে যেদিন ছবি রিলিজ হইবে তার আগের দিন সারারাত হৈমন্তীর ঘুম আসিল না। শেষরাতে দেয়ালে টাঙানো অপুর ছবিখানার সামনে দাঁড়াইয়া মনে মনে বলিল—তুমি নেই, তোমার হয়ে একটা বড়ো কাজ করলাম। আশীর্বাদ কোরো, যেন সবদিক বক্ষা পায়—!

ছবি বাজারে চলিল না। প্রথম দুই-তিন দিন কিছু দর্শক সমাগম হইল, যেমন নতুন ছবি রিলিজ হইলে হওয়া স্বাভাবিক। তাহার মধ্যে আবার কিছু দর্শক বিরক্ত হইয়া ইন্টারভ্যালে উঠিয়া বাড়ি চলিয়া গেল। বলিতে বলিতে গেল—ছ্যা ছ্যা, গল্প নেই, নাটক নেই, একখানা ভালো গান নেই—এ জিনিস আড়াই ঘণ্টা বসে দেখা—নাঃ, পয়সাটাই নষ্ট!

প্রথম সপ্তাহের শেষ হইতেই বোঝা গেল ছবি সম্পূর্ণ মার খাইয়াছে। প্রতি শো-য়ে পনেরো-বিশজনের বেশি দর্শক হইল না। দ্বিতীয় সপ্তাহ ছবি রাখিবাব জন্য কোনো প্রেক্ষাগৃহেব মালিকই আগ্রহ দেখাইলেন না। অপূর্বকুমাব রায়ের প্রথম উপন্যাসেব চিত্ররূপ ব্যবসায়িক সাফল্য তো দিতেই পারিল না, জনজীবনে সামান্য আবর্তেরও সৃষ্টি হইল না।

কেবল দুই-একটি সংবাদপত্রের সমালোচকেরা অর্ধমনস্ক গোছের প্রশংসার কবিলেন। কলিকাতায় কয়েক জায়গায় বোদ্ধা দর্শকের দল প্রত্যয চৌধুরীকে সর্ম্বধনা দান করিল। তাহাতেও বাজার গরম হইল না।

কাজল কিন্তু বুঝিল ছবি ভালো হইয়াছে। লোকে দেখিল না, সে আর কী কবা যাইবে' ভালো শিল্পের রসিক চিবকালই কম। একদিন সে হৈমন্তীকে বলিল—মা, তুমি মনে দুঃখ রেখো না, তুমি ঠিক কাজই করছো। বাবাব গল্প এভাবেই ছবি হওয়া উচিত ছিল। নাচ-গান-কান্না না থাকলে আমাদের দেশে ছবি কেউ দেখে না। প্রত্যয়বাবু ভালো কাজ কবেছেন, আস্তে আস্তে লোকে নেবে দেখো—

মায়ের মনে যাতে দুঃখ না হয় সেজন্য তখনকার মতো কাজল একটা কথার কথা বলিয়াছিল। কারণ সে জানিত ফিল্ম জিনিসটা ছাপা বইয়ের মতো না। বিলিজ হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি ছবির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইয়া যায়। হয় মানুষ সেই ছবিটি গ্রহণ করে, নয়তো উপেক্ষার অন্তরালে সরাইয়া দেয়। সাহিত্যিকের মৃত্যুর একশত বৎসর পরেও তাঁহার রচনার পুনর্মূল্যায়ন হইতে পারে, কিন্তু উপেক্ষিত ফিল্ম দশ বৎসর বাদে আবার সচরাচর দর্শকের মনোযোগের আলোয় আসে না।

কিন্তু কাজলের ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করিয়া, দর্শক ও সমালোচকের উপেক্ষাকে উপহাস করিয়া এক্ষেত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রত্যয় চৌধুরীর বংশের একটা খ্যাতি ছিল। রাষ্ট্রযন্ত্রের সঠিক স্থানে অবস্থিত কয়েকজন সচেষ্ট হওয়ায় ছবিটি বিদেশের কয়েকটি চলচ্চিত্র উৎসবে দেখাইবার ব্যবস্থা হইল।

এরপর যা ঘটিল তাহাকে বাস্তব ঘটনা না বলিয়া রূপকথা আখ্যা দিলেই ভালো হয়। প্রত্যয় চৌধুরীর ছবি বিদেশে পরপর তিনটি উৎসবে শ্রেষ্ঠ মানবিক দলিল হিসাবে প্রথম পুরস্কার পাইল। ইউরোপের বড়ো বড়ো সব কাগজে ফিল্মের স্থিরচিত্র ও প্রত্যয় চৌধুরীর ছবি বাহির হইল। দেশের যেসব কাগজ এতদিন বিশেষ কোনো উৎসাহ প্রকাশ করে নাই তাহারা প্রত্যয়বাবুর ছবিসহ সাক্ষাৎকার প্রকাশ করিল। সমালোচকেরা বলিলেন ছবিটির অসাধারণত্ব তাঁহারা আগেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, উপযুক্ত তথ্য ও মালমশলা সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা বড়ো বড়ো প্রবন্ধ লিখিবার উদ্যোগ

করিতেছিলেন, এইবার সেগুলি প্রকাশিত হইবে। অনেকে সাক্ষাৎকার নিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিল। প্রত্যয় চৌধুরী কয়েকটি উৎসবে যোগ দিতে বিদেশে গিয়াছেন, দুই মাসের আগে ফিরিবেন না।

কৌতূহলী হইয়া কাজল দেশী-বিদেশী কিছু কাগজ সংগ্রহ করিয়া পড়িল। সকলেই লিখিয়াছে গ্রামের এমন চিত্র, প্রকৃতির এমন বিশ্লেষণ, নিম্নবিত্ত সংসারে একটি ভাবুক শিশুর বিকশিত হইয়া ওঠা—চৌধুরী ছাড়া এমনটি আর কেহ পারেন নাই।

কাজলের মনটা খারাপ হইয়া গেল। বেশ মজা তো! উহারা অপুর নামের কোনো উল্লেখ কোথাও করে নাই। গ্রামের নিপুণ চিত্র, শিশু-মনস্তত্ত্ব—এসব প্রশংসা তো তাহার বাবার প্রাপ্য। তাহার বাবা উপন্যাস না লিখিলে সিনেমার গল্পটা আসিত কোথা হইতে? হ্যাঁ, পরিচালকের অবশ্যই প্রশংসা প্রাপ্য—যথেষ্টই প্রাপ্য, কিন্তু লেখককে যে সবাই একেবারে ভুলিয়া গেল! এ কী রকম ব্যাপার?

পরে অবশ্য তাহার মনে হইল প্রথম উৎসাহের জোয়ারে সবাই এমন করিতেছে, প্রাথমিক উল্লাস স্তিমিত হইলে সত্য আপনিই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

একদিন প্রত্যয় চৌধুরীর ছবির উপর আয়োজিত এক আলোচনার সভায় সে যোগ দিতে গেল। আমন্ত্রণ পাইয়া যায় নাই, সভা হইবে খবর পাইয়া ব্যাপার দেখিতে গিয়াছিল। দরজায় কেহ আটকাইতেছে না দেখিয়া সে পায়ে পায়ে ঢুকিয়া পড়িল। শ্রোতায় সভার ঘর আধাআধিরকম ভর্তি হইয়া গিয়াছে। কাজল পেছনের দিকে বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েসের চালাক চেহারার একজন লোকের পাশে বসিল। লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কোন্ কাগজ থেকে এসেছেন?

কাজল বুঝিতে না পারিয়া বলিল—আমাকে কিছু বলছেন?

—হ্যাঁ। আপনি কোন্ কাগজেব রিপোর্টার?

কাজল হাসিয়া বলিল—কোনো কাগজেরই না। আমি ফ্রিল্যান্সার।

লোকটি অবাক হইয়া বলিল—তাই নাকি? আশ্চর্য তো! আমার ধারণা ছিল ফ্রিল্যানসার কেবল বিদেশেই আছে। এখানেও হয়েছে জানতাম না। আপনি কী অনেক দিন থেকে—

—না, এই তো মাসকয়েক হল—

—ওঃ, তাই বলুন। তা না হলে তো খবর পেতাম।

এমন সময় একজন বক্তা উঠিয়া বলিতে শুরু কবায় কথাবার্তা থামিয়া গেল।

এখানেও একই ব্যাপার। মূল উপন্যাসটির নামও কেহ উচ্চারণ করিলেন না বা ছবিব সাফল্যের পেছনে অপুরও যে সমান অবদান আছে সে কথা সবাই ভুলিয়া গেল। সভার শেষে বাহির হইতে হইতে কাজল তাহার সঙ্গীকে বলিল—কী ব্যাপার বলুন দেখি, ফিল্ম তৈরি করতে তো একটা ভালো গল্প লাগে, বলা যেতে পাবে সেটাই প্রাথমিক শর্ত—এঁরা কেউ তো লেখকের কথা বললেন না?

লোকটি অন্যমনস্কভাবে বলিল—অ্যাঁ? হ্যাঁ, সেকথা ঠিক। আচ্ছা প্রত্যয়বাবুর ডিটেলের ব্যবহার লক্ষ করেছেন? গ্রামকে দেখার কী চোখ!

—কিন্তু সেটা লেখক লিখেছেন বলেই তো—তাছাড়া ক্যামেরা কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তাও প্রত্যয় চৌধুরী দেখিয়ে দিলেন। নবযুগ মশাই, নবযুগ—

কাজলের সঙ্গী বিহ্বল, মুগ্ধ অবস্থায় বিড়বিড় করিতে করিতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো রাস্তা পার হইয়া চলিয়া গেল।

কলিকাতার কয়েকটি সিনেমা হলে ছবিটি নতুন করিয়া দেখানো শুরু হইল। ভিড়ের চোটে হলের সামনে রাস্তা দিয়া চলা যায় না। অথচ এই একই ছবি কিছুদিন আগে কেহ দেখে নাই। সাহেবরা প্রশংসা না করিলে কী আর এদেশে কোন জিনিসের কদর হয়? শহরের অনেক জায়গায়

ফিলম্‌টির পোস্টার কাজলের চোখে পড়িল। সর্বত্রই লেখা আছে—প্রত্যয় চৌধুরীর মহান ছবি। লেখকের নাম পোস্টারে কোথাও নাই।

বিদেশ হইতে ফিরিয়া প্রত্যয় চৌধুরী একদিন কাজলদের বাড়িতে আসিলেন। অপুর উপন্যাসটির অর্ধেকের কিছু বেশি অংশ লইয়া তিনি ছবি করিয়াছিলেন, এবার বাকিটুকু লইয়া আর একটি ছবি করিতে চান। হৈমন্তীর সম্মত না হইবার কোনো কারণ ছিল না। প্রথমবারেই প্রত্যয়বাবু তাঁহার যোগ্যতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় ছবির চুক্তিও হইয়া গেল। সমস্ত কাগজে সংবাদ বাহির হইল—অপূর্বকুমার রায়ের গল্প লইয়া প্রত্যয় চৌধুরী আবার ফিল্‌ম করিতেছেন। শুটিং আরম্ভ হইয়া গেল।

প্রথম ছবির জন্য প্রাপ্য সব টাকা কিন্তু তখনও হৈমন্তী পায় নাই। প্রত্যয় চৌধুরী নিজের টাকা দিয়া কিছুদূর কাজ করিবার পর একজন প্রযোজক বাকি টাকা লগ্নী করিয়াছিলেন। তিনি লেখকের প্রাপ্য অংশ দিতে নানাবিধ গড়িমসি করিতে লাগিলেন। একজন সাংবাদিক খবরটা পাইয়া তাহার কাগজে 'প্রদীপের নিচে অন্ধকার' নামে একটি ফিচার লিখিল। যে অপূর্ব রায়েব গল্পের চিত্ররূপ লইয়া সমস্ত পৃথিবীতে উৎসব হইতেছে, সেই লেখকের পরিবার এখনও তাহাদের প্রাপ্যে বঞ্চিত। আরও দুই-একটি কাগজে অনুরূপ সংবাদ বাহির হইবার পর টাকাটা আদায় হইল।

অপুর গল্পেব দ্বিতীয় চিত্ররূপও দেশে-বিদেশে আগের মতো আলোড়ন তুলিল। এবার আর সমালোচকেরা ভুল করিলেন না। ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল। শুটিং-এর প্রতি পর্যায়ে ছবিসহ খবর প্রকাশিত হইতেছিল। ফিল্‌ম রিলিজ হইবামাত্র পুনরায় দেশজোড়া উৎসাহের বন্যা বহিয়া গেল। নতুন করিয়া আবার অনেক সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হইল, অনেক বড়ো বড়ো সংস্থার পক্ষ হইতে প্রত্যয় চৌধুরী সংবর্ধিত হইলেন।

কোথাও অপুর নাম উচ্চারিত হইল না। এইসব সভায় পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা, কলাকুশলী প্রত্যেকেই আমন্ত্রণ পাইল, কেবল লেখকের পক্ষ হইতে উপস্থিত থাকিবার জন্য কাজলদের কাছে কোনো আমন্ত্রণ আসিয়া পৌঁছিল না।

অবশ্য চলচ্চিত্রের এই সাফল্যে অপুর বই-বিক্রি কিছু বাড়িল। এক শ্রেণির মানুষ আছে যাহারা সাধারণত সাহিত্য পাঠ করে না, কিন্তু কোন উপন্যাসের ফিল্‌ম হইলে বইটা কিনিয়া পড়িবার আগ্রহ দেখায়।

বাবার জন্য কাজলের মনের মধ্যে কোথাও একটা কষ্ট হইতেছিল। যাহার প্রতি তীব্র ভালোবাসা রহিয়াছে তাহাকে শ্রেষ্ঠত্বের সমস্ত অলঙ্কারে সজ্জিত না দেখিলে গভীর বঞ্চনার বোধ বুকের ভিতর ক্রিয়া করে। চলচ্চিত্র এবং সাহিত্য একেবারে ভিন্ন দুটি শিল্পমাধ্যম, যে হৈ-চৈ হইতেছে তাহা কেবলমাত্র চলচ্চিত্র লইয়াই—সাহিত্যের গৌরব তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় না, এসব যুক্তি সে যে জানিত না এমন নয়, কিন্তু সে যুক্তিতে মনখারাপ দূর হইতেছিল না। চলচ্চিত্র তো আকাশ হইতে পড়ে না বা শূন্যে গজাইয়া ওঠে না। তাহার প্রাথমিক অবলম্বন একটি গল্প। তাহা হইলে পরিচালকের সঙ্গে সঙ্গে গল্পকার সমানভাবে সংবর্ধিত হইবেন না কেন?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এক ছুটির দিন সকালে কয়েকজন লোক কাজলের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। নিশ্চিন্দিপুর হইতে মাইল তিনেক দূরে যে ছোট শহর সম্প্রতি জমিয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে তাহারা আসিয়াছে।

ধুতি আর শার্ট পরা একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, কথার ভঙ্গিতে মনে হয় তিনিই দলনেতা, কাজলকে বলিলেন—আপনার বাবা আমাদের অঞ্চলের গৌরব। এ বছর তাঁর জন্মদিনে আমরা

একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করব সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অপূর্ববাবুর নামেই পাঠাগার হবে। আপনার মাকে দিয়ে আমরা পাঠাগার উদ্বোধন করাতে চাই—

কাজল বলিল—সে তো খুব ভালো কথা। মা নিশ্চয় যাবেন।

—আর একটা কথা, আমরা দরজায় দরজায় ঘুরে বই সংগ্রহ করে লাইব্রেরি শুরু করছি। আপনি আমাদের কিছু বই দেবেন—

—তা দেব। বাবার একসেট বই দিচ্ছি, তার সঙ্গে অন্য ভালো বই কিছু। একটু বসুন, চা খান, এখনই বই গুছিয়ে দিচ্ছি।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন—আপনার মায়ের সঙ্গে একবার দেখা হবে কি? ওঁকে কখনও দেখিনি—

—বসুন আপনি, মাকে ডাকছি—

হৈমন্তী ঘরে আসিতে প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছাড়া বাকি সকলে তাহাকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন—আমরা আপনার শ্বশুরবাড়ির দেশ থেকে আসছি। অপূর্ববাবুর নামে একটা পাঠাগার উদ্বোধন হবে ওঁর জন্মদিনে, আমরা আপনার আশীর্বাদ চাই।

হৈমন্তী বলিল—আমার শুভেচ্ছা তো থাকবেই, তাছাড়া যদি কোনো কাজে লাগতে পারি জানাবেন।

—সে তো আপনার ছেলেকে বলেছি, উনি আমাদের কিছু বই দিচ্ছেন। কিন্তু আমাদের তো একটা দাবি আছে, ওদিন আপনাকে পাঠাগার উদ্বোধন করতে হবে।

—বেশ, যাব। কখন আপনাদের অনুষ্ঠান?

—অনুষ্ঠান বিকেলে। সেদিন হয়তো ফিরতে পারবেন না। তাতে অসুবিধে নেই, আমরা থাকার ব্যবস্থা করবো।

কাজল বলিল—আমরা গ্রামেই কারও কাছে থাকব। আপনাদের ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

দলের একজন লোক হঠাৎ প্রশ্ন করিল—আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আপনারা গ্রাম ছেড়ে শহরে বাস করছেন কেন?

কাজল একটু অবাক হইয়া বলিল—আপনার প্রশ্নটা ঠিক ধরতে পারলাম না।

—আমি বলতে চাইছি, আপনার বাবা একজন বরেণ্য ব্যক্তি। সাহিত্যে পল্লীগ্রামের কথা লিখে তিনি যশস্বী হয়েছেন। প্রতিমাসে কত মানুষ নিশ্চিন্দিপুরে আপনাদের বাড়ি দেখতে যায় জানেন? তারা গিয়ে অপূর্ববাবু সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করবার মতো কোনো মানুষ পায় না। বাড়িটারও অবস্থা ভালো নয়। এ বিষয়ে আপনারা কিছু ভাবছেন না?

কাজল বলিল—দেখুন, নিশ্চিন্দিপুর থেকে বাস উঠিয়ে চলে এসেছিলেন আমার ঠাকুরদা। বাবা তখন ছোট। কাজেই আমি গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছি একথা বলা ঠিক হবে না। তাছাড়া আমি নিশ্চিন্দিপুরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছি।

—আর বাস করবেন না সেখানে?

—সেটা কি সম্ভব? আপনিই বলুন? আমার চাকরি, আমার লেখা—এসব তো আছেই, মায়েরও বয়েস হচ্ছে, তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজন হয়—

লোকটি একটু বাঁকা ধরনের হাসি হাসিয়া বলিল—গ্রামে যারা বাস করে তাদের কি চিকিৎসা হয় না? আর চাকরি দেশের কোনো স্কুলেও পেয়ে যেতে পারেন। সাধারণ লোকের সঙ্গে নিজের তুলনা করবেন না। অপূর্ব রায়ের ছেলে হিসেবে আপনার দায়িত্ব অনেক বেশি—

কথাটা কাজল জীবনে বহুবার শুনিয়াছে। কিন্তু সে একা কী করিবে? স্মৃতিরক্ষা জিনিসটা শুনিতে ভালো, কিন্তু বাস্তবে তাহা করা খুব কঠিন। বাড়িঘর মেরামত করিয়া, পাঠাগার সংগ্রহশালা

ইত্যাদি স্থাপন করিতে যে বিপুল ব্যয়, তাহা সে একা সংকুলান করিতে পারিবে কি? না হয় কষ্টেসৃষ্টে করিল, কিন্তু তারপর? স্মৃতিরক্ষা তো একদিনের ব্যাপার নয়, চিরকাল ধরিয়া দেখাশুনা কে করিবে?

লোকটা জিজ্ঞাসা করিল—কী ভাবছেন আপনি?

—আপনার কথাটাই ভাবছিলাম। আচ্ছা একটা কাজ করুন না, আপনারা সবাই মিলে একটা সংস্থা গড়ে তুলুন। আমি সেই সংস্থার হাতে স্মৃতিরক্ষার জন্য বাড়ি, জমি ইত্যাদি দিয়ে দিচ্ছি। আমিও থাকবো আপনাদের সঙ্গে। কেমন হবে?

ইহা যে অতি উত্তম প্রস্তাব, ভদ্রলোকেরা একবাক্যে তাহা স্বীকার করিলেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া পরে এ বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত জানাইবেন এমন বলিয়া গেলেন।

পাঠাগার প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। বেত্রবতী বাহিয়া অনেক জল সমুদ্রে গিয়া পড়িল, কিন্তু উৎসাহী সেই ভদ্রলোকেরা আর সিদ্ধান্ত জানাইতে আসিলেন না।

পাঁচবৎসর আগে হইলে কাজল অবাক হইত, ক্ষুব্ধও হইত। কিন্তু ক্রমেই জীবনের বাস্তব রূপটা তাহার কাছে উদ্‌ঘাটিত হইতেছিল। মানুষ সমালোচনা করিতে যত ভালোবাসে কাজ করিতে ততটা নয়। সঠিক লোকের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ হয় নাই, হইলে অপূর্বকুমার রায়ের স্মৃতিবক্ষার কাজ বসিয়া থাকিবে না।

কাজল তাহার রান্না খাইতে ভালোবাসে বলিযা কাজের লোক থাকা সত্ত্বেও হৈমন্তী বান্নাটা নিজেই করিবার চেষ্টা করে। সেদিন মাছের ঝোলের কড়া নামাইতে গিয়া এক বিপত্তি বাধিল।

সকাল হইতেই হৈমন্তীর কোমরে কেমন একটা যন্ত্রণা হইতেছিল। কড়াটা ধবিবার জন্য দাঁড়ানো অবস্থায় সামনে ঝুঁকিতেই হঠাৎ দারুণ যন্ত্রণার একটা প্রবাহ কোমর হইতে হাঁটু পর্যন্ত ছড়াইযা গেল। কোনোরকমে এক হাত দিয়া সামনেব দেয়াল ধরিয়া সামলাইয়া ফেলিয়াছিল তাই বক্ষা, নহিলে গরম মাছের ঝোল গায়ে পড়িয়া রীতিমত আহত হইবাব সম্ভাবনা ছিল। কড়াটা অবশ্য উলটাইয়া গেল, হলদে-কালো ছোপওয়ালা মেনী বেড়ালটা ছুটিয়া আসিযা মেঝেতে ছড়াইযা পড়া মাছের টুক্‌রা মহানন্দে খাইতে শুরু করিল।

কাজল নিজের ঘরে বসিয়া লিখিতেছিল, কড়াই পড়িবাব শব্দে রান্নাঘরে আসিয়া অবাক হইয়া বলিল—কী হয়েছে মা? কীসের শব্দ হল? এঃ, ঝোল পড়ে গেছে বুঝি!

হৈমন্তী বলিল—আমাকে একটু ধর তো, হঠাৎ কোমরে এমন ব্যথা—

মাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া কাজল হেমন্ত ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল। হেমন্তবাবু রোগী দেখিয়া বলিলেন—ভয়ের কিছু নেই। বয়েস হতে আরম্ভ করলে একটু-আঘটু বাতের প্রবলেম দেখা দিতে পারে, সেটা তো মেনে নিতেই হবে। স্লিপ্‌ড্ ডিস্ক নয় বলেই মনে হচ্চে। দুদিন বিছানায় রেস্ট নিন, আর যে মলমটা লিখে দিচ্ছি, সেটা দুবেলা মালিশ করুন। ঠিক হয়ে যাবে—

জীবনের সমস্ত বড়ো বড়ো পরিবর্তনগুলি সামান্য প্রাথমিক লক্ষণের মাধ্যমে শুরু হয়। বয়েস যে বাড়িতেছে, এ কথাটা সত্যই হৈমন্তীর খেয়াল ছিল না। কোমরের বাতটা তাহার জীবনে প্রৌঢ়ত্বের প্রথম সংকেত হইয়া আসিল। ডাক্তারবাবুর চিকিৎসায় সে চার-পাঁচদিনের মধ্যে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল বটে, কিন্তু শরীরটা যেন আর ঠিকঠাক স্ববশে রহিল না। খাটিবার ক্ষমতা কমিয়া আসিল, পূর্বের সেই স্ফূর্তি আর ফিরিল না। যে নদী বাহিয়া হৈমন্তীর জীবনের নৌকা চলিতেছিল, এই প্রথম তাহার অপর তীর বেশ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। যে তীর ছাড়িয়া আসিয়াছে, দূরত্বের কুয়াশায় তাহা ঝাপসা। শরীরের ভিতরে—কিংবা ঠিক শরীর বা মনের কোথাও নয়—অস্তিত্বের গহনে অত্যন্ত মৃদুস্বরে একটা ঘণ্টা বাজিতেছে। মনোযোগ দিয়া কান পাতিলে শোনা যায়।

ছুটির ঘণ্টা।

ক্ষোভ নাই। জীবনটা ভালোই কাটিয়াছে। কোনো ক্ষোভ নাই।

ওপারের ঘাটে সেই একজন অপেক্ষা করিয়া আছে। হৈমন্তী পৌছাইলেই সে পরিচিত পুরাতন হাসি হাসিয়া অভ্যর্থনা করিতে আসিবে।

কাজেই ভয়ও নাই। রাত্তিরে শুইবার সময় কাজল বলিল—তুমি বিছানায় উঠে পড়ো মা, আমি মশারিটা গুঁজে দিয়ে যাই। সামনে ঝুঁকে কাজ করতে ডাক্তারবাবু বারণ করে দিয়েছেন। আবার কোমরে চোট লাগলে মুশকিল হবে—

হৈমন্তী বলিল—সে হবে এখন। তুই বোস দেখি, তোর সঙ্গে কথা আছে।

—কী মা?

—তুই আর কতদিন আমার মশারি গুঁজে দিবি?

কাজল অবাক হইয়া বলিল—তার মানে?

—আমার বয়েস হচ্ছে। দেখলি তো বাতে কেমন কষ্ট পেলাম। এবার শরীর ক্রমেই অপটু হয়ে আসবে। আমাদের সংসারে হাল ধরবার মতো কেউ নেই। তোকে বিয়ে না দিলে আমি তো ছুটি নিতে পারছি না!

কাজল ব্যস্ত হইয়া বলিল—কেন মা, তোমার কি আবার শরীর খারাপ লাগছে নাকি? কাল তাহলে ডাক্তারবাবুকে একবার—

—ওরে না না, শরীর আমার এখন ঠিকই আছে। আমি সে কথা বলছি না। বয়েসে বুড়ো হচ্ছি, সে তোর ডাক্তারবাবু কী করবে? আমার আর কাজ করতে ভালো লাগছে না। তোর বৌয়ের হাতে সংসার দিয়ে শুধু শুয়ে-বসে কাটাতে ইচ্ছে করছে।

কাজল বলিল—বিয়ে! সে কী কথা! আমি তো—তা কী করে হয়?

—যেমন করে বিয়ে হয় তেমন করেই হবে। তোর তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। তোকে এখন না বললেও চলতো, তবে আজকালকার ছেলে তো—তাহলে আমি কিন্তু খোঁজখবর শুরু করছি—

তখনকার মতো মাকে একটা যাহা হউক উত্তর দিয়া কাজল নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু বিছানায় শুইয়া অনেক রাত পর্যন্ত সে ঘুমাইতে পারিল না। বিবাহের প্রসঙ্গ যে কিছুদিনের মধ্যেই উঠিবে তাহা সে আন্দাজ করিয়াছিল, কিন্তু আজ হৈমন্তী স্পষ্টভাবে বলায় কাজল বুঝিতে পারিল আপাতত এড়ানো গেলেও বিষয়টাকে অনির্দিষ্টকাল ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না।

মায়ের সঙ্গে তাহার কথা বলিতেই হইবে। সব খুলিয়া বলিতে হইবে। কিন্তু তার আগে সে সমস্ত দিকগুলি নিজে একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া লইতে চায়।

অপালার বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা, সংযত বাকভঙ্গি, শরীরটাকে বহন করিয়া বেড়াইবার স্বচ্ছন্দ ও মর্যাদাপূর্ণ বিশিষ্টতা যেমন তাহার মনে আসিতেছিল, তেমনি সব চিন্তার গভীরে নিঃশব্দ মহিমায় জাগিয়া ছিল একজোড়া শান্ত, নিষ্পাপ চোখ।

কাজল বুঝিতে পারিল সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ তাহার পক্ষে কঠিন কাজ হইবে।

সেদিন সকালে হৈমন্তী বসিয়া প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচনাবলী পড়িতেছে, এমন সময় কাজল ঘরে ঢুকিয়া বলিল—কী বই পড়ছ মা?

হৈমন্তী বেশ কিছুদিন হইল চশমা লইয়াছে। রিডিং গ্লাস। সবসময় চোখে দিতে হয় না, কেবল পড়িবার সময় কাজে লাগে। বই মুড়িয়া চশমা খুলিয়া হাতে লইয়া সে ছেলের দিকে তাকাইয়া বলিল—প্রভাত মুখুজ্যের রচনাবলী। 'নবীন সন্ন্যাসী'-টা আবার পড়ছি। সত্যি, এমন গল্প বলার ক্ষমতা সবার থাকে না। তুই পড়েছিস?

কাজল অন্যমনস্কভাবে বলিল—অ্যাঁ? হ্যাঁ, প্রভাতবাবুর লেখা খুবই ইয়ে—মা, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে—

—কীরে, কী হয়েছে?

সবুজ চামড়ায় বাঁধানো বই আকারের একটি খাতা হৈমন্তীর হাতে দিয়া কাজল বলিল—এটা চিনতে পারছো তো? বাবার ডায়েরিগুলোর মধ্যে একটা। তুমি জানুয়ারি মাসের দশ তারিখে লেখা এন্ট্রিটা পড়ো। আমি বসছি—তোমার পড়া হলে কথা বলবো।

এসব দিনলিপি হৈমন্তীর বহুবার পড়া আছে। তবে এই ডায়েরিটায় বিশেষ করিয়া জানুয়ারির দশ তারিখে কী লেখা আছে তাহা সে মনে করিতে পারিল না।

কাজল খাটে বসিয়া জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া রহিল। হৈমন্তী পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ বাদে হৈমন্তী পড়া শেষ করিয়া মুখ তুলিল। তাহার চোখে বিস্ময়। সে বলিল—এ ঘটনা তো আমি জানি, তোর বাবাই আমাকে বলেছিলেন। কাশীতে লীলাদির মেয়ের সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছিল। কিন্তু তারপর তো অনেকদিন—তুই জানিস এ মেয়ে এখন কোথায়?

মুখ না ফিরাইয়াই কাজল বলিল—জানি।

হৈমন্তী অবাক হইয়া বলিল—জানিস? কী করে জানলি? কোথায় সে?

—পরে বলব মা। আগে তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই, শুনবে?

হৈমন্তী ছেলের মুখের দিকে ভালো করিয়া তাকাইয়া দেখিল। হঠাৎ যেন কাজল বড়ো হইয়া গিয়াছে, তাহার গলা ব্যক্তিত্বপূর্ণ, হাবভাব অচেনা। এই এতটুকু ছেলেকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, কবে সে এত বদলাইয়া গেল? ভালোও লাগে, আবার বুকেব মধ্যে কেমন করে।

সে বলিল—বল কী বলবি—

ছোটোবেলা হইতে আজ পর্যন্ত কাজল মায়ের কাছে মন খুলিয়া সব কথা বলিয়াছে, কিন্তু আজ প্রথম তাহার কেমন বাধো বাধো ঠেকিতে লাগিল।

তবু সে আস্তে আস্তে হৈমন্তীকে সমস্ত জানাইল। প্রথমে বলিল অপালার কথা, তারপর বলিল বিমলেন্দুর সহিত অকস্মাৎ দেখা হইবার ঘটনা, তুলির কথাও সে বলিল। তাহার কথা শেষ হইবার পর হৈমন্তী জিজ্ঞাসা করিল—এই দুজনের ভেতর তুই কি কাউকে কোনো কথা দিয়েছিস? এদেব প্রতি তোর দায়িত্ব কতখানি?

—তুলিকে কথা দেওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কারণ তার মামার সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল তাও বোধহয় সে জানে না। অপালার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। সে খুব ভালো আর বুদ্ধিমতী মেয়ে। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বন্ধুর মতো, কিন্তু বেশ গভীর আর অনেকদিনের। মুখে আমাদের স্পষ্ট কোনো আলোচনা না হলেও তার পক্ষে মনে মনে এমন একটা আশা পোষণ করা অন্যায় নয়—

—তোর নিজের ইচ্ছের পাল্লা কোনদিকে ভারি?

একটু ইতস্তত করিয়া কাজল বলিল—আমি বুঝতে পারছি না মা। অপালা মেয়ে হিসেবে খুবই ভালো, পুত্রবধূ হিসেবে আমাদের পরিবারে তাকে খুব সুন্দর মানাবে। সে নিজেও ইচ্ছুক বলে আমার মনে হয়। অন্যদিকে তুলি খুব সুন্দরী, শান্ত স্বভাবের মেয়ে। স্কুল-কলেজে পড়াশুনো করেনি, তার মামা বাড়িতে শিক্ষক রেখে তাকে পড়িয়েছেন। বাইরের দুনিয়া সম্বন্ধে সে একেবারেই অনভিজ্ঞ। কিন্তু বাবা তার সম্বন্ধে ভেবেছিলেন, ডায়েরিতে তার কথা লিখেছেন। সে ইচ্ছের কি আমি দাম দেবো না?

হৈমন্তী বলিল—লীলাদির মেয়ের সঙ্গে তোর দেখা হল কী করে?

কাজল সমস্ত ঘটনা মাকে খুলিয়া বলিল।

কাজলের কথা শেষ হইলে হৈমন্তী বলিল—আমাকে একটু ভাববার সময় দে। এই ধর—আট কী দশদিন। তারপর আমি তোর সঙ্গে কথা বলব।

আট-দশদিন কাটিবার আগেই এক ঘটনা ঘটিল। বিমলেন্দুর কাছ হইতে কাজল একটি চিঠি পাইল। তিনি লিখিয়াছেন—তুলির খুব অসুখ, কাজল কি একবার আসিতে পারে?

দুপুর পার হইয়া চিঠি বিলি হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিলেও সেদিন কলিকাতা হইতে ফিরিবার সম্ভাবনা কম। তবুও সামান্য ভাবিয়া কাজল যাওয়াই স্থির করিল। হৈমন্তীকে তুলির অসুখের কথা জানাইয়া বলিয়া গেল রাত্রে না ফিরিলে সে যেন চিন্তা না করে।

ট্রেন যেন আর চলেই না। কলিকাতা পৌঁছাইতে এত সময় লাগে? কই, এতদিন তো সে খেয়াল করে নাই। কী অসুখ হইয়াছে তুলির? নিতান্ত সাধারণ কিছু নয়, তাহা হইলে বিমলেন্দু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন না। তুলি—তুলি বাঁচিবে তো?

তাহার চিন্তার গতিতে সে নিজেই অবাক হইতেছিল। যাহাকে ঠিক প্রেম বা ভালোবাসা বলে, তেমন কিছু তুলির সঙ্গে তাহার গড়িয়া ওঠে নাই। সে ঘনিষ্ঠতাই ঘটে নাই কখনও। তাহা হইলে প্রায় অচেনা, অনাত্মীয় একটি মেয়ের জন্য তাহার বুকের মধ্যে এমন করিতেছে কেন?

কিছুদিন আগে এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াইতে গিয়া গ্রামোফোন রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের একখানি গান শুনিয়া তাহার খুব ভালো লাগিয়াছিল—যৌবনসরসীনীরে মিলনশতদল। আজ এখন ট্রেনের জানালার ধারে বসিয়া তুলিব কথা ভাবিলেই গানটি কানে ভাসিয়া আসিতেছে। কে যেন দিগন্তের ওপারে বসিয়া গাহিতেছে গানটা। আশ্চর্য তো! তুলির সঙ্গে এ গানের সম্পর্ক কী?

তুলিদের বাড়িতে ঢুকিবার মুখেই বিমলেন্দুর সহিত দেখা হইল। তিনি ব্যস্ত হইয়া কোথায় বাহির হইতেছেন। কাজলকে দেখিয়া বলিলেন—এই যে, তুমি এসে পড়েছো। সব কথা পবে হবে, তুমি একটু তুলির কাছে বোসো, আমি ডাক্তারবাবুর কাছে যাচ্ছি—

—তুলিব কী হয়েছে? অসুখটা কী?

—খুব জ্বর আজ কয়েকদিন ধবে। কোনো ওষুধেই নামছে না। এদিকে বাড়িতে এক বুড়ি কাজের লোক ছাড়া কেউ নেই। তাকে দিয়ে রোগীর সেবা হয় না। আমি যতটা পারি করছি, কিন্তু ফিমেল পেসেন্টের নার্সিং আমার কর্ম নয়। এমন বিপদে পড়েছি—যাক, তুমি এসো, তোমাকে তুলিব কাছে বসিয়ে আমি চট্ করে একবার ঘুবে আসি—

এই প্রথম কাজল বিমলেন্দুর বাড়ির অন্দরমহলে ঢুকিল। চওড়া বারান্দার শেষপ্রান্তে ডানদিকে একখানি বড়ো ঘরে খাটের ওপর তুলি শুইয়া আছে। মেঝেতে শুইয়া বৃদ্ধা পরিচারিকা ঘুমাইতেছে। বিমলেন্দু সেদিকে তাকাইয়া বলিলেন—কাল সারারাত ঘুমোয় নি, আজও দিনটা জেগে ছিল। বুড়ো মানুষ ওকে আর ডাকতে ইচ্ছে করছিল না। ভালোই হয়েছে তুমি এসেছো—

বিছানার পাশে একটা চেয়ার টানিয়া কাজলকে বসিতে বলিয়া বিমলেন্দু বাহিব হইয়া গেলেন।

কাজল সন্তর্পণে বসিল। দেয়ালে লিমটন কোম্পানির ঘড়ির টক্ টক্ শব্দ হইতেছে। একটা বেড়াল কোথায় ডাকিয়া উঠিল। বাড়ির আর কোথাও কোনো শব্দ নাই। কেবল দূরে বড়ো রাস্তা হইতে ভাসিয়া আসা গাড়িঘোড়ার অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা যায়।

পরিস্থিতি একটু অদ্ভুত রকমের। কাজল ইহার আগে কখনও কোনো ঘুমন্ত তরুণীর এত কাছে বসিয়া থাকে নাই। অবশ্য তুলি অসুস্থ, তাহার এখানে বসিয়া থাকাটা কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।

অসুখ তুলির অলৌকিক সৌন্দর্যকে ম্লান করিতে পারে নাই। বরং তাহাকে একটা বিষণ্ণ মহিমা দান করিয়াছে—হেমন্তসন্ধ্যার হাল্কা কুয়াশার পেছনে পূর্ণিমার চাঁদকে যেমন দেখায়। একটু ইতস্তত করিয়া কাজল তুলির কপালে হাত রাখিল। অনেক জ্বর। তাহার দুই ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক হইয়া আছে। নিখুঁত দুইসারি দাঁতের কিছু অংশ দেখা যাইতেছে। কাজলের মনে পড়িল—a double row of oriental pearls—এমনই কাহাকে দেখিয়া কবি লিখিয়াছিলেন।

বেচারী তুলি। ইহার মা নাই, বাবা নাই। তেজস্বিনী মায়ের কন্যা, উহার মাকে সমাজ

সহৃদয়তার সহিত বিচার করিবে না, সে ভার এই অসহায় মেয়েটিকে বহন করিতে হইবে। বিমলেন্দুরও ক্রমে বয়স হইয়া আসিতেছে। কে দেখিবে তুলিকে?

জ্বরে আচ্ছন্ন তুলির আঁচল সরিয়া চাঁপাফুল রঙের ব্লাউজের আড়াল হইতে নিটোল শঙ্খের মতো একটি স্তনের উদ্ভাস চোখে পড়ে। কাজল সন্তর্পণে কাপড় বিন্যস্ত করিয়া তুলির শরীর ঢাকিয়া দিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে তাহার মনে একটা আশ্চর্য অনুভূতি জাগিয়া উঠিল। জীবনে এমন আর কখনও হয় নাই। কী বিচিত্র সে অনুভূতি!

তুলির প্রতি এক সুগভীর মমতায় তাহার মন ভরিয়া গেল। না, ঠিক মমতা নয়, আরও গভীব কিছু। মানুষের প্রাত্যহিক ভাষায় তাহার কোনো প্রতিশব্দ নাই। তুলির লজ্জা ঢাকিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে কাজলের মনে হইল—এই পীড়িতা, নিঃসঙ্গ মেয়েটি তাহার একান্ত নিজের। হর্ষ বেদনা অশ্রু পুলক ব্যর্থতা সমস্ত কিছু লইয়া এ আর অন্য কাহারও হইতে পারে না, অনাদৃতাও থাকিতে পারে না। প্রচলিত অর্থে ঈশ্বরবিশ্বাসের খেই কাজলের হারাইয়া গিয়াছে, তবু সে মনে মনে প্রার্থনা করিল—তুলি সারিয়া উঠুক, আগের মতো হাসিয়া কথা বলুক।

বিমলেন্দুর সঙ্গে বৃদ্ধ ডাক্তারবাবু আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। কাজলেব দিকে তাকাইয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন—এটি কে? আগে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না তো—

—এ আমার ভাগ্নে। বাইরে থাকে। চিঠি পেয়ে এই একটু আগে এসেছে—

ডাক্তারবাবু আর কথা না বলিয়া রোগীর শয্যার দিকে অগ্রসর হইলেন। কাজল ঘর হইতে বাহির হইয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বসিল।

একটু বাদেই ডাক্তারবাবু তুলিকে দেখিয়া বাহিরের ঘরে আসিলেন। বিমলেন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন—কী মনে হচ্ছে ডাক্তারবাবু?

বৃদ্ধ চিকিৎসক চোখ হইতে চশমা খুলিয়া রুমাল দিয়া তাহার কাচ পরিষ্কার করিতে করিতে বলিলেন—টাইফয়েড নিঃসন্দেহে। ব্লাড টেস্ট করার আর দরকার নেই।

বিমলেন্দু উৎসুক চোখে তাকাইয়া রহিলেন।

চশমা চোখে লাগাইয়া চিকিৎসক বলিলেন—দেখুন আমি প্রাচীনপন্থী ডাক্তার, বহুদিন আগে পাশ করেছিলাম ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল থেকে। পুরোনো ঢঙেই আজও অবধি চিকিৎসা করে আসছি। সে পথে খুব একটা কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। জানেনই তো, এ বয়েসে টাইফয়েড বড়ো কঠিন রূপ নেয় অনেক সময়। এতটা জ্বর বেশিদিন চললে ব্রেনের স্থায়ী ড্যামেজ হতে পারে। আমি ভাবছিলাম—

বিমলেন্দু বলিলেন—বলুন ডাক্তারবাবু। তুলি আমার ভাগ্নী নয়, আমার মেয়ে। ওর জন্য আমি সব কিছু করতে পারি।

—আমার মনে হয় আপনি আর একজন কাউকে দেখান। কিছুদিন হল বাজারে নতুন এক ধরনের ওষুধ এসেছে, তাকে অ্যান্টিবায়োটিক বলে। তাতে খুব ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু নতুন ওষুধ প্রয়োগ করতে হলে আধুনিক কোনো ডাক্তারকে দিয়ে দেখিয়ে তার পরামর্শ নেওয়া উচিত। উই হ্যাভ বিকাম আউটডেটেড, বুঝলেন না?

বিমলেন্দু একটু ভাবিয়া বলিলেন—বেশ, তাই হবে। আমি অন্য একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিচ্ছি। কিন্তু আমার ভাগ্নী আপনার চিকিৎসাতেই থাকবে। আপনি তাকে যেমন দেখছেন তেমনই দেখবেন, আমি একটা সেকেন্ড ওপিনিয়ন নেবো মাত্র—

হাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে—

সেদিনই রাত্রে একজন তরুণ ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিলেন এবং ক্লোরোমাইসেটিনের ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন। বলিলেন—টাইফয়েডই বটে। তবে ভয় নাই, এবার জ্বর নামিয়া যাইবে।

রাত্রিতে কাজলের ফিরিবার উপায় ছিল না। বিমলেন্দু তাহাকে বাহিরের ঘরের তক্তাপোশে বিছানা করিয়া ঘুমাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কাজল তাহাতে রাজি হয় নাই। বিমলেন্দুকে শুইতে পাঠাইয়া সে তুলির পাশে চেয়ারে বসিয়া রহিল। বিমলেন্দু বলিয়াছিলেন রাত দুইটায় তাঁহাকে জাগাইয়া দিতে, তাহার পর কাজল একটু বিশ্রাম করিয়া লইতে পারিবে। কাজল তাঁহাকে আর ডাকে নাই। সকালে ঘুম ভাঙিয়া অপ্রস্তুত মুখে বিমলেন্দু বলিলেন—এ কী! এ যে অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে! আমায় ডাকোনি কেন? তোমার বড়োই কষ্ট হল—

পরে চা খাইতে খাইতে তিনি বলিলেন—আজ মেডিক্যাল কলেজের নার্সিং অ্যাসোসিয়েসনে গিয়ে ভালো একজন নার্স জোগাড় করে আনব ভাবছি। এই সময়টা দিনসাতেক ভালো নার্সিং প্রয়োজন হবে। তুমি কি আর একটু থাকতে পারবে? আমি তাহলে চট করে একবার ঘুরে আসতাম—

কাজল বলিল—আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। আমি বিকেলের ভেতর একটা ভালো ব্যবস্থা করে দেব—

বিমলেন্দু অবাক হইয়া বলিলেন—তুমি? তুমি কি করে—তোমার কী কেউ জানাশোনা আছে নাকি? তুমি কীভাবে—

—আমি বিকেলে মাকে নিয়ে আসব, নার্স আনার দরকার নেই—

বিমলেন্দু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—না না, সে কী! ওঁকে তুমি কেন খামোকা কষ্ট দিয়ে—

—কিছু কষ্ট না। মাকে বললে মা খুশি হয়েই আসবেন।

বিমলেন্দু আরও দুই-একবার আপত্তি করিয়া ব্যবস্থাটা মানিয়া লইলেন।

পাড়ার একজন ছেলেকে বাড়ি পাহারা দেওয়ার ভার দিয়া কাজল সন্ধ্যাবেলা মাকে লইয়া তুলিদের বাড়ি আসিল। ছেলের প্রস্তাবে হৈমন্তীও আপত্তি করে নাই। মানসিকতার দিক দিয়া সে সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহবধূ হইতে কিছুটা পৃথক। অচেনা কোনো বাড়িতে রোগীর সেবা করিতে গেলে অন্য কাহারও যে সংকোচ হইতে পারিত, হৈমন্তী তাহার কিছুই অনুভব করিল না। বরং তুলিব রোগশয্যার পাশে দাঁড়াইয়া প্রথমবাব তাহাকে দেখিয়া এক গভীর স্নেহে তাহার মন ভরিয়া গেল। পৌঁছাইবার আধঘণ্টার মধ্যে সে সেবার সব ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইল। বিমলেন্দু কেবলই উদ্ভাসিত মুখে হাতে হাত ঘষিয়া বলিতে লাগিলেন—আমাব বড়োই সৌভাগ্য দিদি যে আপনি এসেছেন। আমি যে কিভাবে আপনাকে—

তুলি ক্রমেই সারিয়া উঠিল। ক্লোরোমাইসেটিন শুরু হইবার চারদিনের দিন জ্বর নামিয়া গেল। তখন শেষরাত, রাত্রে জাগিবে বলিয়া হৈমন্তী দুপুরে কিছুটা ঘুমাইয়া লইয়াছিল। তুলি চোখ খুলিয়া তাকাইল এবং প্রথমে কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে ঘরের চারিদিকে একবার দেখিয়া লইল, যেন সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না সে কোথায় আছে। পরে তাহার দৃষ্টি আসিয়া হৈমন্তীর উপর স্থির হইল। কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিবার পর তুলি বলিল—তুমি কে?

তাহার মাথায় হাত দিয়া হৈমন্তী বলিল—আমি—আমি তোমার মা—

জ্বরতপ্ত মস্তিষ্কে তুলি এই উত্তরের মর্ম গ্রহণ করিতে পারিল না। 'মা' শব্দের সঙ্গে জড়িত কোনো বিশেষ আবেগও তাহার মনে পূর্ব হইতে সঞ্চিত নাই। সে আবার চোখ বুঁজিল।

সেবার গুণেই হোক বা অল্প বয়েসের পরিপূর্ণ জীবনীশক্তির জন্যই হোক—তুলি এত তাড়াতাড়ি সারিয়া উঠিতে লাগিল যে সবাই রীতিমত অবাক হইয়া গেল। হৈমন্তী একদিন বলিল—বিমল ভাই, তুলি এখন ভালো হয়ে উঠেছে, এবার তাকে আপনারাই সামাল দিতে পারবেন। অনেকদিন হল বাড়ি ছেড়ে এসেছি—কাল তাহলে ফিরি?

বিমলেন্দু গাঢ় গলায় বলিলেন—দিদি, মাঝে মাঝে আসবেন, যোগাযোগ রাখবেন। আমিও পৃথিবীতে বড়ো একা, কোথাও এতটুকু স্নেহের ছোঁয়া পেলে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। ভুলে যাবেন না ভাইটাকে—

হৈমন্তী তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিল—ভুলব না আর যোগাযোগও রাখব।

আসিবার সময় তুলি হৈমন্তীকে জড়াইয়া ধরিয়া ছেলেমানুষের মতো কাঁদিল। জীবনে এই প্রথম সে 'মা' কথাটার তাৎপর্য বুঝিতে শুরু করিয়াছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

একদিন সকালের ডাকে এয়ারমেলের লাল-নীল বর্ডার দেওয়া খামে ব্রিটেনের ডাকটিকিট সাঁটা একখানা চিঠি আসিল। কাজলের নামে চিঠি। চিঠিটা হাতে লইয়া প্রথমে কাজল আন্দাজ করিতে পারিল না কে এই চিঠি লিখিতে পারে। বিলাতে তাহার বন্ধুবান্ধব কেহই নাই, আত্মীয়স্বজন তো দুনিয়াতেই কেহ নাই।

খাম খুলিয়া দেখিল লন্ডনের এক প্রখ্যাত প্রকাশক চিঠি লিখিতেছে—অপুর প্রথম উপন্যাসটি, যেটি লইয়া প্রত্যয় চৌধুরী ছবি করিয়াছিলেন, সেটি তাহারা অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতে চায়। কপিরাইট সংক্রান্ত অনুমতি পাইলে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন অধ্যাপককে দিয়া (একজন ভালো বাংলাজানা খাঁটি সাহেব এবং একজন কৃতবিদ্য প্রবাসী বাঙালি) অনুবাদের কাজ শুরু করাইতে পারে। ব্যবসায়িক শর্তাদিও তাহারা চিঠিতেই জানাইয়াছে।

চিঠি পড়িয়া কাজলের খুব আনন্দ হইল। হ্যাঁ, অনুমতি সে পাঠাইয়া দিতেছে। আর ব্যবসায়িক শর্ত? টাকার জন্য তাহার লালসা নাই। পাইলে ভালো, না পাইলেই বা কী? তাহার বাবাব নাম তো বিদেশে ছড়াইয়া পড়িবে। এত ভালো লেখা তাহার বাবার, পৃথিবীর সকলে পড়ুক, পড়িয়া অবাক হউক।

কাজল তাহার জীবনে এই প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর কবিল।

টাকা ছাড়াও একটি চুক্তির আরও অনেক দিক থাকে, অনভিজ্ঞতাবশত কাজল সে সব কিছু খেয়াল করিল না। সই করিয়া ডাকে কাগজ পাঠাইয়া দিল। এব ফল পরে তাহাকে বেশ ভালোভাবেই ভুগিতে হইয়াছিল।

তাহার এক সাংবাদিক বন্ধুকে কাজল ঘটনাটি বলিয়াছিল, চুক্তিপত্রের একটা নকলও দেখাইয়াছিল। দুই-তিনদিন পরে তাহাদের কাগজে অপুর বইয়ের অনুবাদ হওয়ার খবরটা বেশ বড়ো করিয়া বাহির হইল। বন্ধুবান্ধব বা পরিচিতরা পথেঘাটে কাজলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—তোমার বাবার বই দেখলুম বিদেশে অনুবাদ হয়ে বেরুচ্ছে? বাঃ বাঃ, বেশ—

কলিকাতায় এবং মফঃস্বলের কয়েক জায়গায় অপুর স্মৃতিতে সভা হইয়া গেল। দু-একটা সভায় আমন্ত্রণ পাইয়া কাজল যোগ দিতে গিযাছিল। বেশ ভিড়, শ্রোতারা আগ্রহের সঙ্গে বসিয়া বক্তৃতা শুনিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ অধ্যাপক বলিলেন—অপূর্বকুমার রায়ের বই যে বিদেশে অনুবাদ হইতেছে, ইহা অত্যন্ত সময়োচিত হইয়াছে। এই মুহূর্তে বাংলা সাহিত্যে অন্য এমন কেহ নাই যাঁহার রচনা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পেশ করা যাইতে পারে। দুর্ভাগ্য এই, অপূর্বকুমার অকালে গত হইলেন। তিনি বাঁচিলে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধতর হইত।

কাজলকেও বলিবার জন্য আহ্বান করা হইল। সে বাবার সাহিত্য বিশ্লেষণ করিল না, অপুর ব্যক্তিগত জীবনচর্যার কথা বলিল। লেখা পড়িয়া লেখককে যেমন মনে হয়, এক্ষেত্রে লেখক ঠিক তেমনই ছিলেন। সাহিত্যিকসত্তা ও ব্যক্তিসত্তায় কোনো পার্থক্য ছিল না—একই রকম উদার, মহৎ ও গভীর। বাবার সহিত তাহার ছোটবেলা কেমন কাটিয়াছিল, তাহার কিছু গল্প বলিল। সে আগে কখনও ঠিক এভাবে কোনো সভায় আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা দেয় নাই। প্রথমদিকে সামান্য জড়তা এবং সংকোচ বোধ করিতেছিল, কিন্তু মিনিট পাঁচ-ছয় বলিবার পর সে জড়তা কাটিয়া গেল। বাবার

সম্বন্ধে কত কথা বলিবার আছে যে! তাহার সেই হারানো শৈশব—বাবার সাহচর্যে যাহা অমৃতময় হইয়া উঠিয়াছিল, সে কথা বলিতে আর সংকোচ কিসের? প্রায় চল্লিশ মিনিট সে বলিল।

সভা শেষ হইবার পর অনেকেই আসিয়া তাহাকে অভিনন্দন জানাইয়া গেল। একজন বলিল—আপনাব বলার ধরন ভারি সুন্দর, আরও বললেন না কেন?

কাজল হাসিয়া বলিল—বাবার কথা আমি সারাদিন ধরে বলতে পারি, কিন্তু আপনাদের সভা তাহলে আর সফল হত না, সব্বাই পালাতো—

—না না, ও আপনার ভুল ধারণা। সবাই অপূর্ববাবুর কথা আরও শুনতে চাইছিল। তাঁর বই তো ইচ্ছে করলেই বাজার থেকে কিনে পড়া যায়, কিন্তু তাঁর জীবনের গল্প তো আপনজন ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। আমরা সামনের মাসে একটা বড়ো সভার আয়োজন করব, সেখানে এই অঞ্চলের দশ-বারোটা হাইস্কুলের ছাত্রদের ডেকে আনব। সৎ সাহিত্য আর নিজের দেশের সংস্কৃতির বিষয়ে অল্প বয়েস থেকেই সবাইকে সচেতন হতে হবে। সেই সভায় আপনি বাবার জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে বলবেন—আসবেন তো?

কাজল বলিল—বেশ তো, আমাকে জানাবেন—নিশ্চয় আসব।

—আপনি এত সুন্দর বলেন কী করে?

—ওটা আমার গুণ নয়, আমার ঠাকুরদাব গুণ। রক্তের মধ্যে দিয়ে আমার কাছে একটুখানি এসেছে। ঠাকুরদা হরিহর রায় কথক ছিলেন, গান লিখতেন, আবার নিজে সুর দিয়ে গাইতেন। নাতি হিসেবে তারই একটু পেয়েছি—

একদিন দুপুরে সে 'বসু ও গুহ' পাবলিশার্সের অফিসে গেল। এখনও আড্ডাধারীদেব ভিড় জমিতে শুরু করে নাই। সবুজ কেদারাটিতে দ্বিজেন্দ্র গুহ গা এলাইয়া কী যেন পড়িতেছেন। পাশের হাতলওযালা চেয়ারে বসিয়া প্রমথ বসু প্রুফ দেখিতেছেন ও মাঝে মাঝে আশান্বিত চোখে দ্বিজেনবাবুর দিকে তাকাইতেছেন। একবার বন্ধু কোনো কাজে উঠিলেই হয়, সঙ্গে সঙ্গে কেদাবাটি তিনি দখল করিবার সুযোগ পাইবেন।

তাহাকে দেখিয়া দুইজনেই খুশি হইলেন। দ্বিজেনবাবু বলিলেন—বোসো, অনেকদিন পবে এলে এবার। কাগজে দেখলাম তোমার বাবার বই ইংবেজিতে অনুবাদ হচ্ছে—

—আজ্ঞে হ্যাঁ কাকাবাবু, জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন প্রকাশ করছে। একটা ফোলিও এডিশন বেরুবে বলেও লিখেছে লন্ডন বুক ক্লাবের উদ্যোগে—

—বাঃ, ফোলিও এডিশন বের হওয়া তো খুব সম্মানের কথা। তোমাকে তাবা নিশ্চয বই পাঠাবে, হাতে পেলে দেখিয়ে যেয়ো।

প্রমথ বসু প্রুফ দেখা বন্ধ করিয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিলেন, এইবার তিনি বলিলেন—একটা কথা কী জানো, আমার প্রায়ই মনে হয়—অপূর্ববাবু যদি আর একটু লম্বা আয়ু পেতেন, তাহলে ভারতবর্ষ আর একটা নোবেল প্রাইজ পেত—

দ্বিজেনবাবু বলিলেন—সে আমারও বিশ্বাস। তবে তাতে কিছু এসে-যায় না। স্বয়ং টলস্টয় নোবেল প্রাইজ চালু হবার পরও বারো-তেরো বছর বেঁচে ছিলেন, তিনি ও প্রাইজ পান নি। এরিখ মারিয়া রেমার্ক পান নি, সমারসেট মম্ পান নি—তাতে কি তাঁদের সাহিত্যের মূল্য কমে গিয়েছে না পাঠক আর তাঁদের বই পড়ে না? আবার এমন অনেক লেখক আছেন, যাঁরা নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, কিন্তু তাঁদের নাম লোকে ভুলে গিয়েছে, তাঁদের বই আর কেউ পড়ে না—

কাজল বলিল—ঠিকই। হ্যালডর কিলিয়ান ল্যাক্সনেস, ফ্রাঁসোয়া এমিল সিলানপা কিংবা পার ফেবিয়ান লাগের্কভিস্ট-এর লেখা আজ আর কে পড়ে? লেখার নিজস্ব মূল্যই লেখাকে বাঁচিয়ে রাখে, পুরস্কারে কী এসে যায়? বাবার এই পাঠকেরা চিরদিন আগ্রহ করে পড়বে বলে আমার বিশ্বাস।

দ্বিজেনবাবু বলিলেন—তুমি আজ এসে পড়েছ, ভালোই হয়েছে। একটা জরুরি প্রয়োজনে তোমাকে চিঠি লিখব ভাবছিলাম—

—কী কাকাবাবু? কোনো দরকার ছিল আমার সঙ্গে?

—হ্যাঁ। আচ্ছা অপূর্ববাবু তো নিয়মিত দিনলিপি রাখতেন বলে জানি, সেসব ডায়েরির সবগুলো তোমার কাছে আছে?

—দশ-বারোটা রয়েছে কাকাবাবু। মার কাছে শুনেছি আরও কয়েকটা ছিল। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর জিনিসপত্র নিয়ে আসার সময় কিছু খোয়া যায়—

—এঃ, বড়োই দুঃখের কথা!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর দ্বিজেনবাবু বলিলেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বেশ ভেবে উত্তর দাও। তুমি তো সাহিত্যের ছাত্র, তোমার মতে অপূর্ববাবুর ডায়েরিগুলোর সাহিত্যমূল্য বা পাঠযোগ্যতা কতখানি? আমি ওগুলো ছাপতে চাই। তোমার কি মনে হয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে এ বই পাঠকেরা কিনে পড়বে?

প্রশ্ন শুনিয়া কাজল কয়েক মিনিট ভাবিল। তারপর বলিল—আপনার প্রশ্নের দুটো অংশ কাকাবাবু, প্রথম অংশের উত্তর দেওয়াটা আমার পক্ষে সোজা। সাধারণ মানুষ যেভাবে ডায়েরি লেখে, বাবার দিনলিপি তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কোথাও ভ্রমণকাহিনীর মতো, কোথাও বা নাটকের স্বগত সংলাপের মতো, কোথাও আবার ভাষা এমন এক গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে যে, মনে হয় উপনিষদের বাংলা অনুবাদ পড়ছি। সাহিত্যমূল্য বা পাঠকযোগ্যতার দিক দিয়ে এসব রচনার মান খুবই উঁচু। কিন্তু পাঠকেরা কিনে পড়বে কিনা সেকথা আমি বলতে পারি না। অনেক রাবিশ বই প্রতিমাসে হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়, আবার অনেক ভালো বই পোকায় কাটে। এ বিচার আপনার। তবে রিস্‌ক এলিমেন্ট একটা আছেই।

দ্বিজেনবাবু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেন। প্রমথবাবু প্রুফ দেখা থামাইয়া তাঁর দিকে তাকাইয়া ছিলেন, এবার বলিলেন—দ্বিজেন, আমার কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে—

—কী?

—বইটা তুমি ছেপে ফেল। আমার বিশ্বাস পাঠকেরা এ বই নেবে। আর কাজল রিস্‌ক এলিমেন্টের কথা বলল, সে তো প্রকাশনের ব্যবসায় থাকেই। আমরা তো আর আলুকাবলি কিংবা চানাচুর বিক্রি করি না যে, মাঠের ধারে বসলেই হু-হু করে সব বিক্রি হয়ে যাবে! প্রকাশনের কাজে অনেক ধৈর্য লাগে, অনেক সাহস লাগে—

দ্বিজেনবাবু কাজলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—তুমি সামনের সপ্তাহে বাবার দু-তিনটে ডায়েরি নিয়ে চলে এস। কপি করাতে হবে। কপি করে অরিজিনাল তোমাকে ফেরৎ দিয়ে দেব। এডিট করাব দরকার আছে বলে মনে করো কি?

কাজল বলিল—কপি হয়ে গেলে আমাকে একবার দেখতে দেবেন, যদি কোনো অংশ বাদ দেবার প্রয়োজন হয়—আমি দেখবো এখন—

—বেশ। তা কী বই পড়ছো এখন? দু-একখানা জমাট ভূতের গল্পের বই পড়াতে পারো? আমার কাছে পড়বার মতো তেমন বই নেই—

—এম. আর. জেম্‌স্ পড়বেন? ওঁর একটা সংকলন আছে, দিতে পারি।

—ওঃ, আমার খুব প্রিয় লেখক। কাল বা পরশু দিয়ে যেয়ো তো—

—জেমসের লেখা আপনার ভালো লাগে?

—খুব। এম. আর. জেম্‌স্, ই. এফ. বেনসন, অ্যালজারনন ব্ল্যাকউড—এঁরাই তো অলৌকিক গল্পকে জাতে তুলে দিয়ে গেলেন। সমালোচকেরা ভূতের গল্পকে চিরদিন দ্বিতীয় শ্রেণির সাহিত্য বলে নাক কুঁচকে এসেছেন, এঁরাই প্রথম দেখালেন যে অলৌকিক গল্পও প্রথম শ্রেণির সাহিত্যপদবাচ্য হতে

পারে। হেমেন রায়ের 'বাজলে বাঁশি কাছে আসি' তো নিশ্চয় পড়েছো, ওটা জেমসের 'ও হুইস্‌ল্‌, অ্যান্ড আই উইল কাম টু ইউ, মাই ল্যাড'-এর অনুবাদ। কিংবা 'কাস্টিং দি রুন্‌স্‌'—ওঃ, দারুণ গল্প!

একটু থামিয়া বলিলেন—তবে আসল জিনিস হচ্ছে ডিকেনস্‌। যতবার পড় কোনো ক্লান্তি আসবে না। প্রথম দিকটা একটু কষ্ট করে পড়তে হয়, এই ধর—একশো-দেড়শো পাতা, তারপর আর ছাড়তে পারা যায় না। সেকালের লেখক, সে যুগে রেওয়াজই ছিল বড়ো বড়ো বই লেখা। লোকের অবসর ছিল অনেক, মনে শান্তি ছিল, তারিয়ে তারিয়ে বই পড়বার অবকাশ ছিল। সে সব দিন ফিরে পাবে, ডিকেনস্‌ পড়—

এক-একটা কথা মানুষের মনে চিরদিনের জন্য গাঁথিয়া যায়। দ্বিজেনবাবুর এই পরামর্শ সারাজীবনের জন্য কাজলের মনে মুদ্রিত হইয়া গেল। পরবর্তীকালে সে ডিকেন্‌সের রচনাবলী প্রায় সব পড়িয়া ফেলিয়াছিল—পড়িবার সময় প্রায়ই তাহার দ্বিজেনবাবুর কথা মনে পড়িত। অনার্সে এবং এম.এ.-তে ডিকেনস্‌ পাঠ্য ছিল বটে, কিন্তু তখন পরীক্ষার ভয়ে বাধ্য হইয়া পড়িতে হইয়াছিল, গভীর রসোপলব্ধির সুযোগ ঘটিয়া ওঠে নাই। এখন ভালো করিয়া পড়িয়া তাহার মনে হইল তাহার বাবার লেখার সহিত ডিকেন্‌সের রচনার একটা মূলগত ঐক্য রহিয়াছে। মানবিকতায়, জীবনের সদর্থক ও আশাবাদী রূপের উদ্‌ঘাটনে দুজনে একই কথা বলিয়াছেন। বরং তাহার বাবার সাহিত্য যেন আরও গম্ভীর, আরও স্নিগ্ধ এবং সরল, তাহা দুঃখকে ভুলিবার পথ দেখায় না, মৃত্যুকে জয় করিয়া জীবনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে।

ইংল্যান্ডে অপুর বই প্রকাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল। বই প্রকাশ হইবার মাসখানেক পরে বিদেশ হইতে কাজলের নামে একখানা বড়ো পার্সেল ডাকে আসিল। পাঁচকপি বই প্রকাশক উপহার হিসাবে পাঠাইয়াছেন, সেই সঙ্গে লন্ডন টাইম্‌স, বার্মিংহাম পোস্ট, লিটারারি টাইমস, লিভারপুল ডেইলি পোস্ট, দি স্কট্‌সম্যান, অক্সফোর্ড মেল ইত্যাদি কাগজে প্রকাশিত সমালোচনার প্রতিলিপিও পাঠাইয়াছেন। বিদেশের সাহিত্য-সমালোচকেরা অপুর বইয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন, বিশ্বের ধ্রুপদী উপন্যাসগুলির সহিত এ গ্রন্থ স্থান পাইবার যোগ্য সে কথা বলিয়াছেন। কেহ কেহ এত ভালো লেখা এতদিন কেন অনূদিত হয় নাই সেজন্য অভিযোগও করিয়াছেন। সবই ভালো, কিন্তু বই খুলিয়া কাজল অকস্মাৎ একটা ধাক্কা খালি।

বইখানার খণ্ডিত অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যয় চৌধুরী সিনেমায় উপন্যাসের যতখানি ব্যবহার করিয়াছেন ততটুকুই অনুবাদ হইয়াছে, শেষের ষাট-সত্তর পাতার পর্বটি বাদ।

এ কেমন হইল! শেষের ওই অংশেই তো লেখকের জীবনদর্শন আশ্চর্য সুষমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে গভীর দর্শন ও বোধের প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র রচনার অবতারণা! এমনভাবে কাটিয়া-ছাঁটিয়া অনুবাদ করিবার অধিকার সে তো কাহাকেও দেয় নাই।

প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার খুব রাগ হইল। তাহার বাবার অমন সুন্দর বই এভাবে নষ্ট করা! প্রকাশক একথা আগে জানাইলে সে কখনও ওই চুক্তিতে সই করিত না। ধ্রুপদী সাহিত্যের অঙ্গহানি করিবার অধিকার কাহারও নাই। বিদেশের পাঠকেরা বিরাট একটা জিনিস হইতে বঞ্চিত হইল।

অনুবাদের একটি কপি লইয়া একদিন সে দ্বিজেনবাবুর কাছে গেল। তিনি বই দেখিয়া বলিলেন—এঃ, একেবারে সব গোলমাল করে দিয়েছে! পণ্ডিতদের এইজন্য আমি ভয় করি, তাদের আদৌ কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। এই-দেখ অনুবাদক ভূমিকায় কী লিখেছেন—The climax surely is reached when the little boy and his parents leave the village. The sister is dead, the cast has already broken up. With these considerations in mind we have ended the book with the boy looking out of the train window sobbing goodbyes to his

sister, his home and village. The film version also ended at this point. We wonder why the author was of another mind!

পড়া শেষ করিয়া দ্বিজেনবাবু কাজলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—এবার বুঝলে তো ব্যাপারটা? অনুবাদকের মনে হয়েছে ওইখানেই উপন্যাস শেষ হওয়া উচিত ছিল, আর সেই মনে হওয়ার সমর্থনে তিনি খাড়া করেছেন সিনেমার উদাহরণকে। সিনেমা আর সাহিত্য দুটো আলাদা শিল্পমাধ্যম, একটার সমর্থনে আর একটাকে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো যায় না। সিনেমা থেকে কেউ সাহিত্যরচনা করে না, সাহিত্যকে অবলম্বন করেই সিনেমা তোলা হয়। অপূর্ব রায়ের মতো লেখকের রচনাকে এভাবে—আচ্ছা, এই প্রকাশকের সঙ্গে যে চুক্তি সই করেছিলে সেই কনট্র্যাক্ট্-এর কপি আমাকে একবার দেখাতে পার?

প্রয়োজন হইতে পারে ভাবিয়া চুক্তিপত্রটি কাজল সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। পকেট হইতে বাহির করিয়া কাগজখানা সে দ্বিজেনবাবুর হাতে দিল। মনোযোগ দিয়া সেটি পড়িয়া তিনি বলিলেন—তোমারও ছেলেমানুষি! একনম্বর, এটা কিন্তু পারপেচুয়াল কনট্র্যাক্ট্ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ কতগুলো এডিশনের জন্য বা কত বছরের জন্য তুমি পারমিশান দিচ্ছ এতে তা কিছু লেখা নেই। দুনম্বর, মূল রচনাকে কোনোভাবেই খণ্ডিত বা বিকৃত করা যাবে না এমন কোনো শর্ত তুমি দাও নি—

—আমার মাথাতেই আসেনি কেউ এমন করতে পারে—

—ঠিক। তুমি ছেলেমানুষ, অনভিজ্ঞ। আমাদের কাউকে একবার দেখিয়ে নেও্য উচিত ছিল। যাক্, যা হবার তা হয়ে গিয়েছে—

—এই ভুল শোধরাবার কোনো উপায় কি নেই কাকাবাবু?

একটু ভাবিয়া দ্বিজেনবাবু বলিলেন—তুমি প্রকাশককে চিঠি দিতে পার এমন খণ্ডিত অনুবাদ প্রকাশের কারণ জানতে চেয়ে। তবে তাতে খুব একটা ফল হবে না, ওরা বলবে অনুবাদক যে কপি দিয়েছেন তাই ওরা ছেপেছে, আর অনুবাদকের স্বাধীন ইচ্ছামতো কাজ করবার অধিকার তো তুমি দিয়েই রেখেছ।

—তাহলে?

—অন্য একটা পথ আছে। বইটার সম্পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ করবার জন্য তুমি অন্য কোনো প্রকাশককে অনুমতি দিতে পার। সেটা অবশ্য এক্ষুণি হবে না, কিন্তু একদিন হবেই। অপূর্ব রায়ের লেখার খ্যাতি এবং চাহিদা ক্রমেই বাড়বে। ভবিষ্যতে অন্য ভাষায় প্রকাশের সময় এ ভুল আর কোরো না। আমাদের দেশের কোনো ইংরেজি প্রকাশককে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জন্য একটি এডিশন করতে বলতে পারো। পাঠ্যবস্তু বা টেক্সট্ বদলে গেলে তা আলাদা বই হিসেবে বিবেচিত হবে—

কাজল বলিল—বিদেশের একজন বড়ো সমালোচক কিন্তু এ ব্যাপারটার নিন্দে করেছে। এই দেখুন অক্সফোর্ড মেল-এ কী লিখেছে—

পত্রিকার প্রতিলিপিটি বাহির করিয়া সে দ্বিজেনবাবুকে পড়িয়া শোনাইল—The painstaking translators of this book have decided that the author was so simple that he did not know where best to end the book, so they have chosen a different point from him, the same point chosen by the director for the film. Well, the translators are scholars and must know what they are about, but the book is so well-written that to the laymen the author cannot have been all that simple. Western writers today know about non-communication, about sex, betrayal, murder, nervous disorder, but this Bengali writer, Mr. Roy, can teach them a thing or two about the basic.'

দ্বিজেনবাবু চোখ বুঁজিয়া শুনিতেছিলেন, এবার তাকাইয়া বলিলেন—যাক, কারও কারও তাহলে কাণ্ডজ্ঞান এখনো একেবারে নষ্ট হয়নি। শোনো কাজল, এ নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না। আমি

যদি সত্যি সাহিত্য বুঝে থাকি, তাহলে অপূর্ববাবুর লেখা বহু—বহুদিন থাকবে। যখন তুমি কিংবা আমি থাকবো না, আমাদের পরবর্তী পাঁচ-দশ-পনেরো পুরুষ কেটে যাবে, ইতিহাস আর সমাজ সব বদলে যাবে, তখনও তোমার বাবার লেখা থাকবে। এর মধ্যে কত অনুবাদ হবে, কত নতুন এডিশন বেরুবে, আজকের এই ক্রটি কেউ মনে রাখবে না। শিল্পের সমস্ত শাখার মধ্যে সাহিত্য সবচেয়ে দীর্ঘজীবী। উপেক্ষা করো, অপেক্ষা করো—

জীবনটা নিজের ইচ্ছামতো সরলভাবে কাটানো ভারি কঠিন, প্রায়ই নানারকম ঝামেলা আসিয়া উপস্থিত হয়। মৌপাহাড়ি ছাড়িয়া আসিবার পর সেখানকার বাড়িটা কিছুদিন খালি পড়িয়াছিল, পরে এক বাঙালি ভদ্রলোক হৈমন্তীর অনুমতিক্রমে সেখানে বাস করিতেছেন। তিনি বলিয়াছিলেন—বৌদি, আমি গরিব ব্রাহ্মণ, বর্তমানে আশ্রয়হীন। আপনার বাড়িটা খালি পড়ে রয়েছে, আমাকে একটু থাকতে দেবেন? বাড়িটা এমনি পড়ে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে, দেখাশুনো করা প্রয়োজন। আমি কেয়ারটেকার হয়ে থাকব, আমাকে কোনো পারিশ্রমিক দিতে হবে না, আমিও গরিব লোক—আপনাকে ভাড়া দিতে পারব না, গায়ে গায়ে শোধ হয়ে যাবে। আমার ছেলেটা নিজের পায়ে একটু দাঁড়িয়ে গেলে আর মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে আপনার বাড়ি আমি ছেড়ে দেব—

এইরূপ ব্যবস্থায় হৈমন্তী আপত্তি করে নাই। কিন্তু যে ঝামেলা ঘরে আহ্বান করিয়া আনা হইল তাহার স্বরূপ প্রকাশ হইতে তখনও দেরি ছিল।

মৌপাহাড়ির বাড়িতে বসবাসকারী ভদ্রলোকের মেয়ের বিবাহ হইয়া গেল, ছেলেটিও শহরের পাশে তামার কারখানায় মোটামুটি ভালো কাজ পাইয়া গেল, কিন্তু তিনি বাড়ি ছাড়িবার কোনো উদ্যোগ করিলেন না। প্রতি সপ্তাহেই, বিশেষ করিয়া ছুটির দিনগুলিতে, অপুর বাড়ি দেখিতে কিছু কিছু ভক্তের দল যায়। তাহারা ভিতরে ঢুকিতে পায় না, বাহির হইতে বাড়িটার চেহারা দেখিয়া ফিরিয়া আসে। উঠানে হৈমন্তী একটি ছোট স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিল, তাহাতে গ্রথিত একটি শ্বেতপাথরের ফলকে অপুর স্মৃতিতে নিবেদিত হৈমন্তীর লেখা কবিতা উৎকীর্ণ আছে। কেহ কেহ সেই স্তম্ভে মালা দিয়া যায়, ধূপকাঠি জ্বালিয়া দেয়। সাহিত্যিক অপূর্বকুমার রায়ের স্মৃতিরক্ষা যথাযথভাবে হইতেছে না বলিয়া ইহারা অনুযোগ করে, খবরের কাগজে চিঠি লেখে। বসবাসকারী ভদ্রলোককে হৈমন্তী বহুবার উঠিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে, কোনো ফল হয় নাই। ভদ্রলোক বিনীতভাবে কেবলই আরও কিছু সময় প্রার্থনা করেন। ওই বাড়িতে হৈমন্তীর একটি সংগ্রহশালা স্থাপন করিবার ইচ্ছা, সেখানে অপুর লিখিবার কলম, পাণ্ডুলিপি, জামাকাপড়, ব্যবহৃত অন্য দ্রব্যাদি ও ছবি থাকিবে। পাশের ঘরে লাইব্রেরি হইবে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের সংগ্রহ। কিন্তু এসব করিতে হইলে আগে তো বাড়িটা খালি হওয়া চাই।

পূজার কিছুদিন পরেই কাজল মৌপাহাড়ি যাওয়া স্থির করিল। চিঠি লিখিয়া সব কাজ হয় না। একবার নিজে গিয়া ভদ্রলোককে বলিয়া দেখিতে হইবে। হৈমন্তী কিন্তু সঙ্গে যাইতে চাহিল না। যেখানে তাহার সমস্ত পার্থিব সুখ আর শুবুর আনন্দ অকালে ঝরিয়া গিয়াছিল, সেখানে গেলে হারানো স্মৃতির সুতীব্র যন্ত্রণা তাহাকে দগ্ধ করিবে। একান্ত প্রয়োজন না হইলে সে আর মৌপাহাড়ি যাইবে না।

বম্বে এক্সপ্রেস যখন মৌপাহাড়ি পৌছাইল তখন বিকালের ছায়া ঘন হইতেছে। কাজল স্থানীয় হাইস্কুলের হেডমাস্টারের বাড়ি থাকিবে স্থির করিয়া তাঁহাকে আগেই পত্র দিয়াছিল। তিনি আন্তরিকতার সহিত কাজলকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। তাঁহার কাছে নিজের সুটকেসটি রাখিয়া সে উঁচুনিচু লালমাটির প্রান্তরের ভিতর দিয়া সুবর্ণরেখা নদীর দিকে চলিল। সন্ধ্যা নামিতে আর বিশেষ দেরি নাই, প্রথম হেমন্তের শীত-শীত ভাব গায়ে কাঁটা ধরায়। দূরেব পাহাড় নীল দেখায়, কিন্তু আসন্ন সন্ধ্যার আবছায়াতে সিদ্ধেশ্বর ডুংরিকে ধূসর দেখাইতেছে। সুবর্ণরেখা নিজের বালুকাময় শরীর এলাইয়া প্রান্তরের বুকে প্রসারিত। কাজল অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল।

দিগন্তে মসীরেখার মতো ওই অরণ্য, ওই নিশ্চল পর্বতমালা, এই আকাশ-বাতাস নির্জনতা এবং প্রথম ফুটিয়া ওঠা দু-চারটি নক্ষত্র, এসবের মধ্যেই বিশ্বের প্রতি কণার ভিতর দিয়া প্রবহমান জীবনধারা লুকাইয়া আছে। এই বহিঃপ্রকৃতিই জীবন ও চৈতন্যের প্রকৃত ধাত্রী। নগরের উচ্চকিত কোলাহলে একধরনের ভাসমান তরল আনন্দ আছে বটে, কিন্তু তাহা মনকে সংস্থিত করে না।

কবে, বহুদিন আগে সে বাবার সঙ্গে এই রাঙামাটির পথে বেড়াইত। সময়ের বাঁকে ফেলিয়া আসা সেইসব স্মৃতি হেমন্ত-গোধূলির পরিবেশকে বেদনার রঙে ধূসর করিয়া তুলিয়াছে। নিতান্ত সাধারণ এবং পরিচিত সত্যও এক-একসময় মনের মধ্যে বিদ্যুতের আলোর মতো চমকাইয়া ওঠে, চেতনাকে অভিভূত করে। এই মুহূর্তে আসন্ন সন্ধ্যার আবছায়াতে সুবর্ণরেখার তীরে দাঁড়াইয়া তাহার মনে হইল—সে-সব পুরোনো দিন আর ফিরিবে না। সময়ের একমুখী স্রোত তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম দিনগুলিকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

কী একটা দেরি করিয়া বাসায় ফেরা পাখি ডানা ছড়াইয়া নদীর এপার হইতে ওপারে চলিয়া যাইতেছে। কেহ কোথাও নাই, হঠাৎ এক আশ্চর্য অনুভূতিতে তাহার মন-কেমন করিয়া উঠিল।

এই আবছা অন্ধকারে, ওই পাথরটার আড়ালে, সুবর্ণরেখার অর্ধশুষ্ক শিলাস্তীর্ণ প্রসারে, এই রহস্যময় হৈমন্তী বাতাসে যেন তাহার বাবা মিশিয়া আছে। ডাকিলেই সাড়া পাওয়া যাইবে। কেবলমাত্র এখানে নয়, বিশ্বের সুদূরতম নীহারিকার কোনো নক্ষত্রের চাবিদিকে পবিক্রমারত অজানা একটি সুন্দর, সবুজ গ্রহেও তাহার বাবাকে পাওয়া যাইবে। বাবার মতো এমন মানুষ সে আর দেখে নাই। পার্থিব জীবন তাহার বাবাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, মৃত্যুতে মুক্তি আসিয়া সৃষ্টিব প্রতিটি কণায় পরিব্যাপ্ত করিয়াছে।

আলোর পাখি আর কখনও অন্ধকার বাসায় ফিরিয়া আসে না। তবু কাজলের মনে হইল কত লোক তো কত বয়েস পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে, যদি বাবাও থাকিত!

আর একটিবার বাবার সঙ্গে দেখা হয় না?

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

যেজন্য মৌপাহাড়িতে আসা তাহার বিশেষ কিছু সুরাহা হইল না। তাহাদের বাড়িতে বসবাসকারী ভদ্রলোক পুনরায় বিনয়ের সঙ্গে বলিলেন, তাঁহার আরও খানিকটা সময় প্রয়োজন। কতটা সময়? না, সেটা তিনি এখনই বলিতে পারিতেছেন না, তবে সবদিক একটু গুছাইয়া উঠিতে পারিলেই তিনি নিজেই তাহা জানাইয়া দিবেন। পরের বাড়ি অধিকার করিয়া থাকা! ছি ছি, সে প্রবৃত্তি যেন তাঁহার কখনও না হয়।

কাজল বুঝিতে পারিল এ বাড়ি সহজে উদ্ধার হইবে না। ভদ্রলোকের বিনয় এবং ব্যবহারের মিষ্টতা যে একান্তই মিথ্যাচার তাহা তাঁহার চোখের দিকে তাকাইলে বুঝিতে বাকি থাকে না। অপূর্বকুমার রায়ের ভক্তের অভাব নাই, কিন্তু তাহারা তাহাদের প্রিয় লেখকের স্মৃতিরক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া লড়িবে—এ আশা করা বৃথা। তাহার বাবার সঙ্গে পরিচয় এবং বন্ধুত্ব ছিল এমন লোকও মৌপাহাড়িতে এখন বিশেষ নাই। অনেক সময় কাটিয়া গিয়াছে, পটভূমির সার্বিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, প্রকৃত সাহায্য দান করিবার মতো কেহ কোনদিকে নাই।

যে খাটে ছোটবেলায় সে বাবা ও মায়ের সঙ্গে ঘুমাইত, সেই খাটে বসিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে লোকটা ছদ্ম বিনয় করিতেছে। যে কুলুঙ্গিতে তাহার মায়ের লক্ষ্মীর আসন পাতা ছিল, সেখানে এখন বার্লির কৌটা, নারিকেল তেলের শিশি, এক বাক্স টেক্কা-মার্কা দেশলাই এবং আরও কী কী যেন রহিয়াছে। এমন অদ্ভুত পরিস্থিতিতে সে কখনও পড়ে নাই। তাহার বাবার পবিত্র

স্মৃতিপূত বাড়ি, সেখানে অন্য লোক বাস করিতেছে, বলিলেও উঠিতেছে না। সে নিজেও অন্যের বাড়িতে রাত কাটাইতেছে। বাড়িটা কি হাতছাড়া হইয়া যাইবে? সম্পত্তির ওপর তাহার বিন্দুমাত্র লোভ নাই, কিন্তু বাবাব স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা তো করিতেই হইবে। তাহার বাবার সাহিত্য যে চিরজীবী হইবে ইহাতে তাহার কোনো সন্দেহ নাই। আগামীযুগের মানুষ তাহার কাছে কৈফিয়ৎ চাহিবে—এত বড়ো সাহিত্যিকের সন্তান হইয়া সে পিতার স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার জন্য কী করিয়াছে?

সে কী করিতে পারে? একা?

অবশ্য একথা ঠিক যে, বড়ো সাহিত্যিকের স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য আলাদা ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না, নিজের রচনার মধ্যেই তিনি বাঁচিয়া থাকেন। পাঠক আগ্রহ করিয়া না পড়িলে লাইব্রেরি আর সংগ্রহশালা স্থাপন করিয়া কোনো লাভ নাই। পৃথিবীতে কোথায় হোমার বা কালিদাসের স্মৃতিভবন আছে? কিন্তু মানুষ তাঁহাদের ভুলিয়া যায় নাই।

না, উপমাটা যথাযথ হইল না, সেকালের সহিত আধুনিক যুগের অনেক তফাৎ। সেকালে মুদ্রণযন্ত্র ছিল না, সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই। মানুষ কাব্য শুনিয়াই তৃপ্ত হইত। মুখে মুখে তাহা প্রচারিত হইত, অথবা উৎসাহীরা হাতে লিখিয়া পুঁথির নকল করিয়া লইত। আজ 'রঘুবংশ'-এর পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেলেও কি নিশ্চিতভাবে বলা যাইবে যে তাহা স্বয়ং কালিদাসেরই হস্তাক্ষর?

কিন্তু যুগ বদলাইয়াছে। এখন সে বাবার পাণ্ডুলিপি, কল ডায়েরি, জামাজুতা সবই ইচ্ছা করিলে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারে। এই কাজ সে না করিলে সব হারাইয়া যাইবে, তছনছ হইয়া যাইবে। আজ হইতে পাঁচশত বৎসর পবে সে থাকিবে না, বর্তমান পৃথিবীব ভৌগোলিক মানচিত্র বদলাইযা যাইবে, শক্তি হস্তান্তরিত হইবে পাত্র হইতে পাত্রান্তরে, এবাবেব বসন্তে যত কোকিল ডাকিয়াছিল তাহাদের বংশ অতীতেব ছাযামূর্তিতে পর্যবসিত হইবে—কিন্তু তাহার বাবা থাকিবে। সেই আগামীকালের উৎসুক মানুষদেব জন্য ভাবিতে হইবে।

বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময উঠানেব স্মৃতিস্তম্ভটার দিকে তাহার নজর পড়িল। সাদা পাথরের ফলকে তাহার মায়ের লেখা কবিতাটি উৎকীর্ণ বহিযাছে। বাতাসের সঙ্গে ভাসিযা আসা লাল ধুলায় পাথরটা বিবর্ণ। সে পকেট হইতে রুমাল বাহিব কবিয়া সযত্নে পাথরের গা হইতে ধুলা ঝাড়িয়া দিতে লাগিল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বারান্দায় দাঁড়াইয়া হাসিযা বলিলেন—অনেক ধুলো, রোজ জমছে—কত আর সাফ করবেন?

কাজল তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিল—কেউ জমতে দেয, কেউ পরিষ্কাব করে। আপনি কোন দলে?

ভদ্রলোক নিঃশব্দে বাড়ির ভেতরে সরিয়া গেলেন।

হেমন্তকাল হইলেও দুপুরে রৌদ্র বেশ চড়িল। খাওয়াদাওয়া সারিয়া কাজল হেডমাস্টাব মশাইয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করিল। মাস্টারমশাই বলিলেন—এবার বরং একটু বিশ্রাম করে নিন, চারটেয় চা দেব—

বিকালে চা খাইয়া কাজল একটু বেড়াইতে বাহিব হইল।

রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং পার হইয়া যে রাস্তাটা শহরের বাহিরের দিকে গিয়াছে সেই পথ ধরিয়া সে চলিল। জাতীয় সড়কে উঠিয়া পথটা আবার ওপাশেব জঙ্গলের মধ্যে নামিল। এই পথ ধরিয়া আট-দশ মাইল গেলে ধারাগিরি জলপ্রপাত, ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে সে একবার আসিয়াছিল। মৌপাহাড়ির আরও দু'একজন সপরিবারে সঙ্গে ছিলেন। এখনও স্বপ্নের মতো মনে পড়ে—তিনখানি গবুর গাড়ি ক্যাঁচকোঁচ শব্দ কবিয়া মন্থর গতিতে চলিয়াছে। সময়টা ছিল বসন্তকাল, নানান লতাপাতার একটা অদ্ভুত মিশ্র গন্ধ বাতাসে। বনকাটি পাহাড় ছাড়াইয়াই বাসাডেরার দিকে পথ ক্রমশ উঁচুতে উঠিতে লাগিল। তাহার বাবা মাঝে মাঝে গাড়ি হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিতেছে।

বাবার হাতে একটা কী গাছের সরু ডাল, মনের আনন্দে বাবা সেটাকে একটু বাদে-বাদেই তলোয়ারের মতো সাঁই সাঁই করিয়া ঘুরাইতেছে।

বাবার আগুনের মতো রঙ, বড়ো বড়ো চোখ, লম্বা উন্নত চেহারা।

বনের মধ্যে আলো পড়িয়া আসিতেছে।

বহু পিছনে ফেলিয়া আসা শৈশবের সেই দিনটা আর একবার ফিরিয়া আসে না?

কোনোদিকে কেহ নাই। নির্জন বনভূমিতে আশ্চর্য অলৌকিক সন্ধ্যা নামিতেছে। একটা বড়ো অর্জুনগাছের নিচে একখানি শিলাখণ্ডের ওপর সে বসিল। অনেকদিন পরে এমন নির্জনতা সে উপভোগ করিতেছে। পৃথিবীর সমস্ত বড়ো শিল্প, তা সে সাহিত্যই হউক বা সংগীত কিংবা দর্শকই হউক, জন্ম লইয়াছে এই নির্জনতা, একাকীত্ব আর যন্ত্রণা হইতে। সে আজকাল বড়ো বেশি শহুরে হইয়া পড়িয়াছে। কোথায় গেল ছোটবেলার সেই সহজ আনন্দ, সেই দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ, আলোর মধ্যে আরও এক আলো, চোখের মধ্যে আরও এক চোখ? জীবনকে সার্থক করিবার জন্য কী করিতেছে সে? হ্যাঁ, কিছু ভালো ভালো বই পড়িতেছে বটে, কিন্তু এই বিশাল বিশ্বজগৎটার দৃশ্যমান কর্মকাণ্ডের আড়ালে যে রহস্যময় শক্তি ক্রিয়াশীল, তাহার কতটুকু জানা হইল? সময় বড়ো কম, প্রতিদিন একদিন করিয়া সময় কমিয়া আসিতেছে।

কিছু করিতে হইবে না—ব্ল্যাকবোর্ডে বড়ো বড়ো দুর্বোধ্য অঙ্ক কষিবার প্রয়োজন নাই, ল্যাবোরেটরিতে জটিল যন্ত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিবার দরকার নাই, দর্শনের দুরূহ তত্ত্বের জালে জড়াইবার আবশ্যকতা নাই, কেবলমাত্র এইরকম শান্ত পরিবেশে থাকিয়া দুই চোখ ভরিয়া বিশ্বের সৌন্দর্য দেখিলেই চলিবে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিদিনের বাঁচার ইতিহাস, প্রতি সকালের স্নিগ্ধ আমন্ত্রণ, মায়ের ভালোবাসা, প্রথম প্রণয়ের শিহরণ জাগানো পবিত্র অনুভূতি, মহাকাল ও মহাবিশ্ব সম্বন্ধে গভীর অনুধ্যান—এই থাকিলেই চলিবে। দেহের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষের উচিত পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিজের অভিজ্ঞতার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা। কীর্তিই মানুষকে অমর করে, স্বল্পকালের জীবন নহে।

আলো একেবারেই কমিয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যার সময় বনকাটি আর বাসাডেরা পাহাড় হইতে বুনো হাতি নামে। কাজল ফিরিবার পথ ধরিল।

পেছনে শুষ্ক ঝরাপাতার ওপর কাহার যেন পায়ের শব্দ। সে ফিরিয়া তাকাইল। না, কিছু নাই—কেহ নয়। হয়তো বাতাস। অথবা অতীত। অতীত তো পেছনেই থাকে।

মাঝে মাঝে একই ধরনের বিপর্যয় মানুষের জীবনের ওপর আসিতে থাকে। মৌপাহাড়ি হইতে ফিরিয়া কাজল খবর পাইল নিশ্চিন্দিপুরে তাহাদের ভিটা ও সংলগ্ন জমি কাহারা বেড়া দিয়া ঘিরিয়া লইতেছে। নিশ্চিন্দিপুরেরই একজন লোক, তাহাকে কাজল চেনে না, সে আসিয়া সংবাদটা দিয়া গেল। কোনো কোনো মানুষ দুঃসংবাদ দেওয়ার সুযোগ পাইলে ভারি খুশি হয় এমনিতে তাহারা কোনো যোগাযোগ রাখে না, কিন্তু কারুকে চিন্তিত করিয়া তুলিবার মতো পরিস্থিতি হইলে একেবারে দৌড়াইয়া আসে।

দিনদুয়েক পরে কাজল নিশ্চিন্দিপুর রওনা হইল। এখন আর আগের মতো অবস্থা নাই, একেবারে গ্রামে ঢুকিবার পথ পর্যন্ত বাস চলিতেছে। পথে-ঘাটে প্রায়ই মোটরগাড়ি দেখা যায়, গ্রামের ছেলেমেয়েরা অবাক বিস্ময়ে ছুটিয়া আসে না। তাহার বাবা কিংবা পিসির মতো আর কি তাহারা রেলগাড়ি দেখিবার জন্য মাঠঘাট ভাঙিয়া আগ্রহে ছুটিয়া যায়? পৃথিবী বদলাইতেছে, মানুষ বদলাইতেছে, সবকিছুই বদলাইতেছে।

গ্রামে পৌঁছাইয়া কাজলের মন আরও খারাপ হইয়া গেল। পরিবর্তন এভাবে পরিচিত জীবনকে গ্রাস করে? নিশ্চিন্দিপুরের সেকালের আর বিশেষ কেহ বাঁচিয়া নাই, যাহারা আছে

তাহারাও অনেকেই বিদেশে বাস করে। রানুপিসির বয়েস হইয়া গিয়াছে, চুলে পাক ধরিয়াছে, তবু সমস্ত নিশ্চিন্দিপুরে রানুপিসিই তাহার একমাত্র আশ্রয়—যাহার সঙ্গে বাল্যের একটা সম্পর্ক রহিয়াছে।

কিন্তু গ্রামে জনসংখ্যা বাড়িয়াছে। অচেনা সব লোক। এরা কোথা হইতে আসিল? দুপুরবেলা খাইতে খাইতে প্রশ্নটা সে রানুপিসিকে করিল।

রানু বলিল—আর বলিস না, আমাদের ছোটবেলার সে গাঁ আর নেই, সব পালটে গিয়েছে। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে দলে দলে লোক এসে জমি কিনে গাঁয়ে বাস করছে। যশোর খুলনা ঢাকা বরিশাল—আরও কত সব জেলা থেকে। আমরাই সবাইকে চিনি না, তা তুই চিনবি কোথা থেকে? অত বড়ো কুঠির মাঠ, গিয়ে দেখ তার সব প্রায় ভর্তি—

—বাড়ি উঠেছে?

—সার সার বাড়ি উঠেছে, মুদির দোকান হয়েছে, তিন-চারটে বড়ো পাড়া বসে গিয়েছে, তুই দেখলে আর চিনতে পারবি না—

তাহার পব কিছুটা যেন আত্মগত স্বরে বলিল—তোর পিসি দুর্গা আমার খুব বন্ধু ছিল। দুর্গা আর আমি মাঝেমাঝেই কুঠির মাঠে বেড়াতে যেতাম, জানিস? কত সুন্দর ছিল সে সব দিন! একটা এড়াঞ্চির ঝোপের পাশে বসে দুজনে গল্প কবতাম—বিরাট বড়ো ঝোপ। গতবছর সুন্দরপুর যাচ্ছিলাম তোর পিসেমশাইয়ের এক আত্মীয়ের বাড়িতে, কুঠির মাঠের পাশ দিয়েই পথ, দেখলাম আমাদের ছোটবেলার সে ঝোপটা আর নেই, কাবা যেন কেটে ফেলেছে। হয়তো ব্যাপারটা কিছুই না, বুঝলি? কিন্তু তোর বাবা আমার চোখ খুলে দিয়েছিল। হঠাৎ এমন মন-কেমন করে উঠল ঝোপটার জন্য যে কী বলব!

কাজল দেখিল রানুর চোখে জল আসিয়া টলটল করিতেছে।

কাজলের গলায় ভাত আটকাইয়া যাইতে লাগিল। রানুপিসির কাছে যেন তাহার এবং তাহার বাবার শৈশব জমা রহিয়াছে। কত স্মৃতি, বাবার কাছে শোনা কত গল্প, কত তুচ্ছ হাসিকান্নার মালায় গাঁথা বিস্মৃত অতীতদিন! সে বুঝিতে পারিল, পৃথিবীতে যেখানেই সে বাস করুক না কেন, আসলে তাহার আশ্রয় এই গ্রামে।

রানু বলিল—খাচ্ছিস না যে? খা—

কাজল বলিল—রানুপিসি, আমার বাবা এই গ্রামকে প্রাণেব মতো ভালোবাসতেন, তাঁব লেখাতেও এই গ্রামকে অমর করে রেখে গিয়েছেন। আমিও এক্ষুনি বুঝতে পারলাম আমাকেও একদিন আবার এখানে ফিরে আসতে হবে। তুমি দেখো, আমি ঠিক নিশ্চিন্দিপুবে এসে বাস করবো।

রানু যেন কেমন অবাক হইয়া কাজলের দিকে তাকাইল, তারপর বলিল—তোর বাবাও গাঁ ছেড়ে যাবার সময় ঠিক এই কথা বলে গিয়েছিল, কিন্তু কথা রাখে নি—

—বাবা যে অল্পবয়েসেই চলে গেল পিসি, নইলে ঠিক ফিরে আসত—

—তুই সত্যি আসবি? সত্যি করে বলছিস?

—ঠিক আসবো পিসি। দেরি হবে হয়তো, কিন্তু সত্যি আসবো। আর—

কাজল চুপ করিয়া আছে দেখিয়া রানু বলিল—আর কী?

—তুমি ততদিন বেঁচে থেকো পিসি। নইলে আমার ফিরে আসবার মানে থাকবে না। কার কাছে, কার জন্য ফিরে আসবো বলো? কেউ তো নেই, যারা আছে তারাও বন্ধু নয়—

রানু বলিল—হ্যাঁরে, তোদের ভিটের চারপাশের জমিগুলো নাকি চনু ঘিরে নিচ্ছে? সত্যি?

—হ্যাঁ পিসি। কে ঘিরছে জানতাম না, খবর পেয়ে এসেছিলাম, এসে দেখি চনুর কাণ্ড—

চনু তোর ছোটবেলার বন্ধু না?

—একসঙ্গে খেলতাম, খুব বন্ধুত্ব ছিল দুজনের।

—তোর সঙ্গে দেখা হয়েছে? কী বলল?

—এখনও দেখা হয়নি। এসেই যখন খবর পেলাম যে চনু জমি ঘিরছে, তখন ভাবলাম আগে ওর কাছেই যাই, দেখি ওর কী বলার আছে। তা ডাকাডাকি করতে চনুর ছেলে বেরিয়ে এসে বলল—বাবা বাড়ি নেই, বৈরামপুর গিয়েছে। কাল সকালে আর একবার যাবো—

সামান্য বিশ্রাম করিয়া কাজল বলিল—পিসি, যাই একবার আমাদের ভিটের দিক থেকে ঘুরে আসি। ফিরে এসে চা খাবো। আজ সন্ধেবেলা চালভাজা খাওয়াবে পিসি? অনেকদিন খাইনি—

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। মালতীনগরে রোজ সে চালভাজা খায় না সত্য, কিন্তু ইচ্ছা হইলেই মাঝে মাঝে সে মাকে বলে। হৈমন্তী ছেলের জন্য কাঠখোলায় চাল ভাজিয়া দেয়। আসলে সে জানে কোন আবদার করিলে রানুপিসি খুশি হইবে। রানু বলিল—একটু দাঁড়া, কাপড়টা বদলে নিই, আমিও তোর সঙ্গে যাবো।

বাঁশবাগানের ভিতর দিয়া পথ। বেলা এখনও বেশ আছে, কিন্তু বাঁশবনের মধ্যে কেমন একটা রহস্যময় আলোছায়ার জগৎ। প্রাণের শিকড় যে জমিতে আছে সেখানে উপস্থিত হইলে মানুষ যুক্তি ভুলিয়া যায়, প্রাচীন ঐতিহ্য রক্তের মধ্যে অশান্ত কল্লোল তোলে। কাজলের মনে হইল প্রতি পা ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে সে এক অদ্ভুত জগতে প্রবেশ করিতেছে—যেখানে সবই সম্ভব। এখুনি সে তাহার ঠাকুমা কিংবা ঠাকুরদাকে দেখিতে পাইবে, তাহার বাবাকে কিশোররূপে খেলা করিতে দেখিতে পাইবে। অনেকদিন আগের সে যুগটা আবার পুরাতন নাটকের মতো তাহার সামনে অভিনীত হইবে। বাহিরের পৃথিবীটা এখানে তাহার রূঢ় প্রভাব বিস্তার কবিতে পারে নাই। এখানে মেঘের ছাযাব মতো, ফুলের হাল্‌কা গন্ধের মতো, দূরশ্রুত বাঁশির শব্দের মতো, মাযের স্নেহের মতো নরম আলোয় পবিবেশ পরিপূর্ণ। সত্য জীবন এখানেই বিকশিত, যে জীবন হাজাব বছর ধরিয়া নির্জনে শান্ত স্রোতস্বিনীর মতো প্রবাহিত।

রানু বলিল—ঠিক এইখানটায় ছিল তোদের খিড়কির দরজা। তোর ঠাকুমা ঘুমিয়ে পড়লে দুগ্‌গা এই দরজা দিয়ে পালিয়ে আসত, আমরা পুরোনো দীঘির আমবাগানে বসে গল্প করতাম, তেঁতুল মেখে খেতাম—

আবার সেই বুনো গন্ধটা বাহির হইয়াছে, এখানে আসিলেই কাজল যেটা পায়।

বাড়ির সব দেওয়ালই পড়িয়া গিয়াছে, ঢুকিবাব আর কোনো পথ নাই। ঘেঁটু, কালকাসুন্দে আর আসশেওড়ার জঙ্গলে ভিটা ঢাকা পড়িয়াছে, গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ধ্বংসস্তূপের দু-একখানা ইঁট দেখা যায়। শান্ত অপরাহ্ণ। ওপাশের সজিনা গাছের ডালে বসিয়া কী একটা পাখি ডাকিতেছে।

কাজলের বুকের ভিতরটা অদ্ভুত এক অনুভূতিতে ভরিযা উঠিল। তাহার পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ যেন মহাকালের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, তেমনই একদিন সেও কোথায় অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের অলিন্দপথে মিলাইয়া যাইবে। আজকের আনন্দ, ভালোবাসা, ওই নাম-না-জানা পাখিটা, সামান্য কয়েককাঠা জমি লইয়া বাল্যবন্ধুর ষড়যন্ত্র—এসব কোথায় থাকিবে সেই দূর ভবিষ্যতে?

থাকিবে বিশুদ্ধ আনন্দ আর থাকিবে মহাজীবন। সে থাকিবে না, মহাজীবন থাকিবে।

সন্ধ্যার পর চনুর সঙ্গে দেখা হইল। তাহার কথাবার্তার ধরনে কাজলের দৃঢ় বিশ্বাস হইল সে মিথ্যাকথা বলিতেছে। সে বৈরামপুর যায় নাই, বাড়িতেই ছিল। কাজল যে খবর পাইয়া হঠাৎ আসিয়া পড়িবে, এটা সে ভাবে নাই, কাজেই কী বলিবে তাহা ঠিক করিবার জন্য দেখা করিবার সময়টা পিছাইয়া দিতেছিল।

শুক্লপক্ষ। চমৎকার জ্যোৎস্নায় চারদিক মায়াময় দেখাইতেছে। এমন সুন্দর পরিবেশে কাজল চনুর সঙ্গে বৈষয়িক আলোচনায় বসিল। কাজল জিজ্ঞাসা করিল—কেমন আছিস বল্, অনেকদিন দেখা হয় না—

—ওই একরকম। আমাদের আবার থাকা! তোমরা শহরে বড়ো বড়ো ব্যাপার নিয়ে থাকো, তোমাদের ব্যাপারই আলাদা। আমরা ভাই গাঁয়ের মানুষ খেটে খেতে হয়, আমাদের দুঃখ তোমরা বুঝবে না—

চনুর ঠেস দেওয়া কথার ধরনে কাজলের মনটা খারাপ হইয়া গেল। একটু কুশল প্রশ্ন নাই, কিছু নাই, বহুদিন পর প্রথম দেখায় শৈশবের বন্ধুর মুখে এসব কী কথা? আর শহরে থাকে বলিয়া সে কি শ্রম করে না? হয়তো মাঠে চাষের কাজ করে না, কিন্তু যে কাজ সে করে তাহাতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়। যাহার যা কাজ!

সে বলিল—তুই আমাকে 'তুমি' করে কথা বলছিস যে বড়ো? আমরা ছোটবেলার বন্ধু না?

—না ভাই, ছোটবেলার কথা ছেড়ে দাও। এখন কি আর তোমাদের সঙ্গে আমার মেলে?

তাহাদের পুরানো ভিটার দিকের বকুল গাছটা হইতে একটা নিমপেঁচা ডাকিয়া উঠিল। উঠানে জ্যোৎস্নায় গাছপালার পাতা আর ডালের ছায়া পড়িয়া কাঁপিতেছে।

কাজল বলিল—বিকেলে আমাদের ভিটের দিকে গিয়েছিলাম, দেখলাম অনেকখানি জমি কারা বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে—তুই এ ব্যাপারে কিছু জানিস?

চনু অকারণেই একটু গরম হইয়া বলিল—আমি ঘিরেছি। আমাদের জমি আছে, তাই ঘিরেছি। কেন, তাতে কী হয়েছে?

—রাগ করছিস কেন ভাই? আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি? ওদিকটায় তোর কিছুটা জমি আছে সে আমি জানি, কিন্তু দেখে মনে হল আমাদের কিছু জমি তোর দেওয়া বেড়ার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। তাই—

—তাই কী? তুমি ভুল করছো, ওখানে তোমার কোনো জমি নেই—

কাজল দুঃখিত গলায় বলিল—আছে কিনা সে আমরা দুজনেই জানি। মনের অগোচরে তো কোনো সত্য গোপন থাকে না। তুই এমন করলি কেন? আমাকে একবার খবর দিলে তো পারতিস! তোর জমির প্রয়োজন থাকে, আমি তোকে অন্য জায়গায় জমি দিতাম। বাবা মারা যাবার আগে গ্রামে কিছু জমি মায়ের নামে কিনে দিয়ে গিয়েছিলেন, তার থেকে দিতাম। তোর পছন্দমত প্লট বেছে নিতে পারতিস, আমি টাকা নিতাম না। তুই ছোটবেলার বন্ধু হয়ে আমার সঙ্গে এমন করলি?

—অন্য জায়গায় জমি নিয়ে আমি কী করবো? বাড়ির লাগোয়া না হলে আমার চলবে না। তাছাড়া আমি কোনো অন্যায় করিনি—জমি আমার।

—পুরোনো ভিটের পাশে পৌনে একবিঘে জমির টুকরোটা কি করে তোর হল চনু?

চনু বলিল—ওটা তোমার বাবা আমার মাকে দান করেছিলেন। আমার কাছে কাগজ আছে—

কাজল প্রথমটা এত অবাক হইয়া গেল যে তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, তাহার পর সে বলিল—কাগজ আছে? কী কাগজ? পাকা দলিল, না দানপত্র?

—কেন, পাকা দলিল না হলে কি তুমি মানবে না?

—তা নয়, বাবা যদি সাদা কাগজেও কাউকে কিছু লিখে দিয়ে থাকেন আমি তার মর্যাদা দেব। কই সে কাগজ?

চনু বলিল—আজ রাত্তিরে খুঁজে বার করতে পারব না। কাল সকালে এসো, দেখাব।

নিমপেঁচাটা আবার ডাকিয়া উঠিল।

জ্যোৎস্নাভরা এই উঠানে সে আর চনু ছোটবেলায় খেলা করিত। তে হি নো দিবসাঃ গতা।

কাজল বলিল—আচ্ছা ভাই উঠি। কাল সকাল আটটা নাগাদ একবার আসব, দেখাস কাগজখানা। বাবা যদি সত্যি ও জমি তোদের লিখে দিয়ে থাকেন, তাহলে অন্তত আমার দিক থেকে তোর কোনো চিন্তা নেই। চলি।

হেমন্তরাত্রিতে হাল্‌কা কুয়াশার আবরণে তাহাদের গ্রামের কী অপূর্ব রূপই না বিকশিত

হইয়াছে! হায় রে, ইহার সঙ্গে মানুষগুলিও যদি ভালো হইত! সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে ইহাদের মন সঠিকভাবে বাড়িয়া ওঠে নাই, এই গ্রামের দিগন্তেই তাহাদের জীবনের দিগন্তের সীমা। সংস্কৃত উপকথার সেই যাযাবর হাঁসেদের কথা মনে পড়িল, যাহারা মানস সরোবর যাইবার পথে বাংলাদেশের এক গ্রামে একটি ছোট পুকুরের ধারে রাত্রির আশ্রয় লইবার জন্য নামিয়াছিল। স্থানীয় গ্রাম্য হাঁসেরা বুঝিতে পারিল না, এত কষ্ট করিয়া তাহারা কেন মানস সরোবরে যাইতেছে, কী আছে সেখানে? যাযাবর হাঁসেরা হিমালয়ের পর্বতশৃঙ্গ, তুষার আর অপার্থিব সৌন্দর্যের বিবরণ দিল। শুনিয়া গ্রাম্য হাঁসেরা হাসিয়া আকুল। সেখানে তাহাদের পুকুরের মতো গুগলি পাওয়া যায় কি? তাহা না হইলে এত কষ্ট করিয়া কী লাভ?

রানুপিসিদের বাড়ির পথে বাঁশবাগানটায় ঢুকিয়া কাজল দাঁড়াইয়া পড়িল।

এমন সৌন্দর্যময় রাত্রিও পৃথিবীতে আসে! চারিদিক নিঃশব্দ, কেবল দূরে কাহাদের বাড়িতে একটা কুকুর ডাকিতেছে। জ্যোৎস্নায় বাঁশপাতার নক্‌শাকরা ছায়া মাটিতে পড়িয়াছে। বাতাসে আসন্ন শীতের মনোরম স্পর্শ আর কীসের যেন মৃদু সুগন্ধ। কবেকার সব কথা যেন মনে পড়িয়া যায়, তাহার জন্মেরও আগে ঘটিয়া যাওয়া সে-সব ঘটনা কী করিয়া তাহার চেতনায় ধরা দিতে পারে তাহা সে বুঝিতে পারে না, কিন্তু কেমন একটা মেদুর অনুভূতি হয় সে কথা সত্য। জীবনের পটভূমি অকস্মাৎ অনেক বিস্তৃত হইয়া যায়। সে কেবল তাহার গৃহাঙ্গনে, ভারতবর্ষে কিংবা পৃথিবী নামক এই গ্রহটায় বাস করে না, বিশাল অনন্ত বিশ্ব সমস্ত নক্ষত্র-নীহারিকাসহ তাহার অস্তিত্বের অংশ, এই সুন্দর জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি সেই মহত্তর জীবনের সংবাদ পৌঁছাইয়া দিতেছে। আনন্দ—আনন্দেই মুক্তি, আনন্দেই সত্যকার বাঁচিয়া থাকা।

পরের দিন চনু তাহাকে একটা ময়লা কাগজের টুকরা হাতে দিয়া বলিল—এই যে, পড়ে দেখ—

কাজল হাসিবে কী কাঁদিবে ঠিক করিতে পারিল না। বহু ভাঁজ হওয়া একটা নোংরা কাগজ, তাহাতে আঁকাবাঁকা অক্ষরে, ভুল বানানে একখানি হিজিবিজি জমি দানের প্রতিশ্রুতি। নিচে লেখা—অপূর্বকুমার রায়। এই হস্তাক্ষর কখনওই তাহার বাবার নহে। স্বাক্ষরের নিচে যে তারিখ, তাহার দেড় বৎসর আগেই তাহার বাবা মারা গিয়াছে। বেচারা চনু! গ্রাম্যবুদ্ধিতে সঠিক হিসাব করিয়া উঠিতে পারে নাই। এরূপ ভৌতিক দানপত্র সহসা দেখা যায় না।

কাগজটা চনুর হাতে ফেরত দিয়া কাজল বলিল—চনু, আমার এক মাস্টারমশাই বলতেন—সত্যি কথা বলতে প্রয়োজন সাহসের, আর মিথ্যে কথা বলতে বুদ্ধির। ঠিক বলতেন না?

—কী বলতে চাও তুমি?

—কিছুই না। এটা আমার বাবার হাতের লেখা নয়।

—আমি এই কাগজ জাল করেছি বলতে চাও?

—সেটা তো আমার চেয়ে তুই-ই ভালো জানিস। তাছাড়া এমন একটা লেখাকে দানপত্রও বলে না। আইনের চোখে এ জিনিস টিকবে বলে মনে হয় না। এতে অনেক গোলমাল রয়েছে।

চনু রাগিয়া অস্থির হইল। জমি সে কাহাকেও ছাড়িয়া দিবে না, তাহার জন্য সে শেষ অবধি দেখিতে রাজি।

কাজল চুপ করিয়া সব শুনিল, তারপর বলিল—কাউকে পোড়াতে নিয়ে গিয়েছিস কখনও?

আলোচনার দিক বদলে থতমত খাইয়া চনু বলিল—তার মানে?

—গিয়েছিস কখনও?

—গিয়েছি তো, তাতে কী?

শান্ত গলায় কাজল বলিল—আমি প্রথম আমার দাদামশাইকে দাহ করতে নিয়ে যাই। তুই তো

তাঁকে দেখেছিস—সুরপতিবাবু, মনে আছে? তার আগে আর কখনও চোখের সামনে শবদাহ দেখিনি। দাদু খুব রাশভারী মানুষ ছিলেন, লোকে তাঁর চোখে চোখ রেখে কথা বলতে সাহস পেত না। সেই দাদুকে যখন চিতায় ওঠানো হল, দেখলাম কী অসহায়ভাবে তাঁর দেহ চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মন্ত্র পড়া হলে শ্মশানের পুরোহিত দাদুর দেহের ওপর আরও কখানা কাঠ চাপিয়ে দিয়ে তলা থেকে টেনে তাঁর শরীরে ঢাকা দেবার শেষ কাপড়টুকুও বের করে নিল। উলঙ্গ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, উলঙ্গই চলে গেলেন।

চনুর গলার তেজ কমিয়া আসিয়াছে, অবাক গলায় সে বলিল—কী বকছো পাগলের মতো? কী বলতে চাও তুমি?

—বলতে চাইছি যে, সেই প্রথম আমার মনে হল—এ দুনিয়া থেকে কেউ কিছু নিয়ে যেতে পারে না। আমরা সবাই কথাটা জানি, কিন্তু কেউ মনে রাখি না। খামোকা পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কয়েকটা বছর ঝামেলা করে কাটাই। ও জমি আমি কোনেদিন ভোগ করতে আসবো না চনু, ওখানে আমার বাবার স্মৃতিভবন তৈরি হবে। তাঁকে অনেক লোক ভালোবাসে। তাদের সেই ভালোবাসার জোর থাকলে ওখানে স্মৃতিভবন হবেই, কেউ আটকাতে পারবে না। সে বন্যার জল তুই ঠেকাতে পারবি না। যদি তা না হয়, তাহলে সেটাকেই ভবিতব্য বলে মেনে নেব। তোর সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া নেই। ততদিন কলাবাগান কর না, ক্ষতি কী—তবে আমাকে বলে কবলেই পারতিস, তাতে অন্তত আমাদের বন্ধুত্বটা নষ্ট হত না।

খাওয়া-দাওয়া করিয়া একটু বেলায় কাজল বাড়ির দিকে রওনা হইল। রানু ছোটবেলার মতো তাহার চিবুক ধরিয়া চুমু খাইয়া বলিল—তাড়াতাড়ি আবার আসবি, কেমন? একবার মাকে নিয়ে আয় না—

—মায়ের শরীর মোটে ভালো যাচ্ছে না পিসি। আসলে বাবার মারা যাওয়াটা মা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি, মনের কষ্টে ভেতরটা আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যাচ্ছে। এমন দিন যায় না যেদিন বাবার কথা বলতে বলতে মা কাঁদে না—

রানু বলিল—আমরা কেউ তোর বাবাকে ভুলি নি, তোর মাকে সে কথা বলিস—

গ্রামের পথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া পাকা সড়কের দিকে চলিয়াছে। সে পথ ধরিয়া বাঁদিকে গেলে আষাঢ়ু, আর ওপাশে সোনাডাঙার মাঠ। অনেক—অনেকদিন আগে দুইটি গরিব ঘরের বালক-বালিকা ওই পথ দিয়া রেলগাড়ি দেখিবার আশায় ছুটিয়া গিয়াছিল। তাহাদের একজন এই গ্রামেই রহিয়া গিয়াছে, এই গ্রামেরই শান্ত নদীতীরে তাহার শেষ শয্যা রচিত হইয়াছিল। নির্জন বসন্ত দ্বিপ্রহরে এখনও কি সে গহন লতাকুঞ্জে কাঁচপোকা খুঁজিয়া বেড়ায়?

কতদিন আগে স্বরূপ চক্রবর্তী গ্রামের নদীতীরে সন্ধ্যাবেলা দেবী বিশালাক্ষ্মীকে দেখিয়াছিলেন? সে কবেকার কথা? দেবী কি নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন?

বিংশ পরিচ্ছেদ

অল্পবয়েসে জীবনটা একরকম বেশ সুখেই চলিতে থাকে। মাথার ওপরে একটা বড়োসড়ো আকাশ, দিগন্ত অবধি বিস্তৃত পৃথিবী তার সমস্ত আনন্দ দুঃখ হর্ষ আর পথের প্রতি বাঁকে আস্বাদিত চমক লইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। সবকিছুই ঘটিতে পারে, ঘটিবেও। আজ কিছু হইল না বটে, কিন্তু কাল নিশ্চয় হইবে। প্রত্যেকদিন সকালে উঠিয়াই আনন্দে মন ভরিয়া যায়, নতুন সম্ভাবনা লইয়া আর একটি দিন শুরু হইল। বাতাসে সমুদ্রপারের মশলাদ্বীপ হইতে ভাসিয়া আসা সুগন্ধ, চেতনায় মুক্তির সুর।

সময় কাটিতে আরম্ভ করিলে জীবনের এই পট বদলাইতে থাকে। দায়িত্ব, কর্তব্য, ছকে বাঁধা সময়সূচি আর বহুবিধ সমস্যা আসিয়া পূর্বের সরল আনন্দকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। বাতাস আর তেমন করিয়া বয় না, আকাশের নীল বিবর্ণ হইয়া আসে। নদীর স্রোতের শব্দে আর আগের মতো প্রকৃতির রহস্যময় গোপন সংগীত বাজে না। সে বড়ো ভয়ের সময়, বড়ো কষ্টের সময়।

কাজলের এখন সেই বয়েস। যন্ত্রণা একা সহ্য করিতে হয়, সব সমস্যায় দৌড়াইয়া মায়ের কাছে আসিয়া পরামর্শ চাওয়া যায় না, অনেক সমস্যার কোন উত্তরই থাকে না। ছোটবেলার বিশ্বাস, প্রথম যৌবনের মূল্যবোধ, আজীবন সঞ্চিত যা কিছু ভালোলাগার সম্পদ—সব একে একে বদলাইয়া যায়। চেনামুখ সরিয়া যায়, অচেনা মুখ নতুন বন্ধুত্ব লইয়া আসে না—এ বড়ো কঠিন সময়।

তুলিকে সে ফেলিতে পারিবে না। তুলির সঙ্গে তাহার আজ পর্যন্ত একটাও এমন কোন কথা হয় নাই, যাহাকে মন দেওয়া-নেওয়ার ভূমিকা বলা যাইতে পারে। আর দেরি করা যায় না, অপালার প্রতি তাহার আচরণ একান্ত নিষ্ঠুর হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তুলিকে স্বীকৃতি না দিলে আরও বেশি অন্যায় করা হইবে। অপালা উচ্চশিক্ষিতা, প্রতিপত্তিশালী পিতার সুন্দরী কন্যা, তাহার ভালো বিবাহ হইতে সময় লাগিবে না। কিন্তু তুলির কেহ নাই, বিমলেন্দুর বয়েস হইয়া আসিতেছে, তিনি আর কতদিন ভাগ্নীকে দেখিবেন? মায়ের কলঙ্কের জন্য কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইবে না। বাঙালি সমাজে এসব কথা চাপা রাখা কঠিন, নির্যাতন করিতে পারিলে মানুষ আর কিছু চায় না।

সরল তুলি—জীবনের বিরুদ্ধ স্রোতেব তীব্রতায় কোথায় ভাসিয়া যাইবে!

আচ্ছা, এমনও তো হইতে পারে যে, সে এত চিন্তা করিতেছে, কিন্তু তুলি তাহাকে পছন্দ করিবে না? সব মেয়েরই মনে স্বামী সম্বন্ধে একটা ভাবমূর্তি থাকে। তুলির কল্পনার সঙ্গে তাহাব ব্যক্তিত্ব হয়তো একেবারেই মেলে না। বিমলেন্দুর ব্যবস্থা সে হয়তো নীরবে মানিয়া লইবে, কিন্তু বিবাহিত জীবনে সুখী হইবে না।

কী করা যায়? সে কি সংকোচ কাটাইয়া সরাসরি তুলির সঙ্গে কথা বলিবে? নাঃ, সে তাহা পারিবে না। চিঠি লিখিয়া মন জানিতে চাহিবে? না, তাহাও বড়োই নাটকীয় হইয়া যাইবে। অবশ্য এমনি একবার দেখা করিতে যাওয়া যায়। কে কেমন আছে জানিতে যাওয়াটা এমন অন্যায় কিছু নয়।

অনেক ভাবিয়া সে যাওয়াই ঠিক করিল।

তবে সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিতে পারিল যে, কেবলমাত্র কুশল প্রশ্ন করিবার আগ্রহে সে ছুটিয়া যাইতেছে না। নম্রমুখী এক সুন্দরী তরুণীর সহিত দেখা হইবার সম্ভাবনা তাহাকে প্ররোচিত করিতেছে। অবশ্য তাহাতে কিছু আসে-যায় না, নিজের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিয়া কী লাভ? সে যে তুলিকে ভালোবাসিতে শুরু করিয়াছে ইহাতে তো সন্দেহ নাই।

সিদ্ধান্ত লইবার পরদিনই কাজল খুব সকালের ট্রেনে কলিকাতায় রওনা হইল। বিমলেন্দুর বাড়ি পৌঁছাইয়া দেখিল তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া স্টেটসম্যান পড়িতেছেন। তাহাকে দেখিয়া বিমলেন্দু যথার্থই খুশি হইলেন, বলিলেন—তোমার খবর কী হে? কলকাতায় আর আসছ না নাকি, মা কেমন আছেন?

যথাবিহিত কুশল বিনিময়াদির পর বিমলেন্দু বলিলেন—এত সকালে এসেছ মানে নিশ্চয় কিছু খেয়ে বের হওনি? দাঁড়াও, তোমার জলখাবারের ব্যবস্থা করি। এমনি কি বিশেষ কোনো কাজ আছে কলকাতায়? নেই? তাহলে দুপুরেও এখানে খেয়ে একেবারে ওবেলা যাবে। কী ভালোবাসো বল—মাংস না মাছ? আমি নিজে তোমার জন্য বাজার করব—

কাজল বাধা দিবার চেষ্টা করিল, বলিল—অকারণে বাজারে ছুটিবার প্রয়োজন নাই, বাড়িতে যা আছে তাহাই যথেষ্ট।

বিমলেন্দু সে-সবে কর্ণপাত করিলেন না, গলা উঠাইয়া ডাকিলেন—তুলি! তুলি!

কাজলের বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। এইবার দেখা হইবে—এইবার তুলি আসিবে।

একখানি বেগুনী রঙের শাড়ি পরনে, মামার ডাকে তুলি আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

সামাজিকতা ভুলিয়া কাজল অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল।

এই সকালেই তুলির স্নান সারা হইয়া গিয়াছে। ভেজা চুল পিঠের উপর বিন্যস্ত। মুখে কোনো প্রসাধনের চিহ্ন নাই, তবু তুলিকে দেবীর মতো দেখাইতেছে। বাবার ডায়েরিতে তুলির মায়ের কথা কাজল পড়িয়াছে। মেয়েকে দেখিলে মায়ের সে সৌন্দর্য আন্দাজ করিতে পারা যায়।

তুলির মা সুখী ছিলেন না, মেয়েরও কি সেই ভাগ্যই হইবে?

না, তুলিকে সে সমস্ত কষ্ট হইতে রক্ষা করিবে। তাহার গায়ে রৌদ্র লাগিতে দিবে না।

বিমলেন্দু বলিলেন—তোমার ইয়ে, কী বলে—অমিতাভদা এসেছেন। চট করে কিছু লুচি ভেজে দাও।

কাজল বলিল—কেমন আছো তুলি? আর দুর্বলতা নেই তো?

তুলি হাসিয়া বলিল—ভালো আছি। আপনারা কেমন আছেন? মা?

কাজলের ভালো লাগিল, তুলি 'মাসিমা' বা 'কাকিমা' বলিয়া হৈমন্তীকে নির্দেশ করিল না, একেবারে 'মা' বলিয়া ডাকিল। চেহারায় আচরণে এমন কমনীয় মেয়ে সে আর কখনও দেখে নাই।

জলখাবার তৈরি করিবার জন্য তুলি বাড়ির ভিতরে গেলে বিমলেন্দু তাহার সঙ্গে সাহিত্য, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ইউ.এন.ও-র অপদার্থতা, সেকালে সবকিছুই ভালো ছিল ইত্যাদি লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। কাজল বলিল—সে কী মামা, পৃথিবীসুদ্ধ লোক ইউ এন.ও. নিয়ে এত মাতামাতি করছে, আর আপনি বলছেন ও দিয়ে কোনো কাজ হবে না!

—হবে না তো! তুমি মিলিয়ে দেখে নিয়ো আমার কথা খাটে কিনা। লীগ অফ নেশনস হবার পরে কেউ কি আর ভেবেছিল আরও একটা মহাযুদ্ধ হবে? আসলে মানবজাতির চরিত্রের মধ্যে বর্বরতার বীজ আছে। সভ্যতার পালিশ দিয়ে আমরা সেটা ঢেকে রাখি মাত্র। সে পালিশটাও খুব হালকা, মাঝে মাঝেই নিচের কালো রঙটা বেরিয়ে পড়ে। যুদ্ধ আবার হবেই, আজ না হোক বিশ পঞ্চাশ কী সত্তর বছর পরে হলেও হবে। আর ছোটখাটো ঘরোয়া ক্ষেত্রে তো যুদ্ধ চলছেই, তাই না? সংসারে কর্তৃত্বের জন্য, অফিসে ক্ষমতা আর পদোন্নতির জন্য, রাজনীতিতে সর্বশক্তিমান হবার জন্য, যে কোনো উপায়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্য—যুদ্ধ চলছেই। এসবই বাড়তে বাড়তে একদিন বৃহৎ আকারে ফেটে পড়ে।

কাজল বলিল—ইউনাইটেড নেশনস্ ব্যর্থ হবে বলছেন, তাহলে মানুষের বাঁচবার উপায় কী?

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বিমলেন্দু বলিলেন—লোভ ত্যাগ করা। অল্পে সন্তুষ্ট থাকা।

—তাহলে তো জ্ঞান-বিজ্ঞান, কল-কারখানা, সভ্যতার অগ্রগতি সব থেমে যাবে। লোভই বলুন আর যাই বলুন, মানুষ নিজের অবস্থার আরও উন্নতি ঘটাতে চায় বলেই বিজ্ঞানের আবিষ্কার ঘটে, দেশ এগিয়ে যায়—

—না, সম্পূর্ণ ভুল। কল-কারখানা বা ঐশ্বর্য দিয়ে সভ্যতার অগ্রগতি মাপা যায় না, সেটা মাপা হয় সংস্কৃতির মান দিয়ে। শেকস্‌পীয়ার কিংবা কালিদাস অথবা ব্যাসদেবের সময়ে প্রযুক্তি তার শৈশবে ছিল, কিন্তু তাঁদের কীর্তি নিয়েই তো আমরা গর্ব করি, গবেষণা করি। আমি বলছি না যে বিজ্ঞানচর্চা ছেড়ে দাও, প্রযুক্তি থামিয়ে দাও—আমি বলছি এ ধরনের উদ্যোগকে একটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখো। ভোগের তৃষ্ণা বাড়ালেই বাড়ে, সময়মত না থামালে সর্বনাশ!

তুলি এই সময়ে জলখাবার লইয়া আসায় বিমলেন্দুর বক্তৃতাস্রোতে বাধা পড়িল। তিনি উঠিয়া একটা জামা গায়ে গলাইতে গলাইতে বলিলেন—তুমি বসে তুলির সঙ্গে কথা বলো, আমি চট করে একবার বাজার থেকে ঘুরে আসি। তুলি, দেখিস ওর আর কী লাগে—

কাজলের আপত্তিতে কর্ণপাত না করিয়া বিমলেন্দু ব্যাগ হাতে বাহির হইয়া গেলেন।

লুচি খাইবার মতো মনের অবস্থা কাজলের ছিল না। সে মাথা নিচু করিয়া খাবার নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। তুলনায় তুলির আচরণ অনেক সহজ, কারণ শৈশব হইতে যেভাবে সে বড়ো হইয়াছে তাহাতে লজ্জার বোধ জন্মাইবার কোনো সুযোগ ছিল না। মামাকে ছাড়িয়া দিলে কাজল তাহার জীবনে প্রথম পুরুষ যাহার সঙ্গে বসিয়া সে একান্তে কথা বলিতেছে। লজ্জা করিতে সে শেখে নাই, কিন্তু তাহার নম্র, একান্ত মেয়েলি স্বভাব তাহাকে অনন্য করিয়া তুলিয়াছে।

মাথা নিচু করিয়াই কাজল বলিল—তুলি, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে—

বাড়ি খালি, ফিসফিস করিয়া কথা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই, তবু গোপন ষড়যন্ত্র করিবার সময় মানুষের কণ্ঠস্বর যেমন খাদে নামিয়া যায়, কাজলের গলাও তেমনই শুনাইল। এই পরিবেশে অমনভাবে কথা বলিলে তাহার একটিই অর্থ হয়। কিন্তু তুলি তো পূর্ণ নারীত্বে পৌঁছায় নাই। সে কাজলের মুখের দিকে নিঃসংকোচ দৃষ্টি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমার সঙ্গে? কী কথা?

এবার কাজল মুখ তুলিল, গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল—তোমার মামা এখন বাড়ি নেই, এভাবে একথা বলা উচিত হচ্ছে কিনা জানি না। কিন্তু কথাটা কেবল তোমাকেই বলবার মতো, আর কেউ সামনে থাকলে বলা যাবে না। মনোযোগ দিয়ে শুনে তোমার উত্তর দাও—

এইবার বোধহয় পরিস্থিতি তুলি কিছুটা বুঝিল। মেয়েদের স্বাভাবিক উপলব্ধির ক্ষমতা দিয়া সে বুঝিল তাহার জীবনের সম্পূর্ণ নূতন এক পর্বের প্রস্তাবনা হইতে চলিয়াছে। একটু একটু করিয়া তাহার মুখে অরুণাভা ছড়াইয়া পড়িল। এইবার সেও ফিসফিস করিয়া বলিল—বলুন!

—তুমি তো জানো, তোমার মা আর আমার বাবা বন্ধু ছিলেন। হয়তো এই বন্ধুত্ব আরও গভীর সম্পর্কের দিকে গড়াতো, কিন্তু আমার বাবা দরিদ্র ছিলেন, খুবই সাধারণ অবস্থার মানুষ—দুবেলা তাঁর খাওয়া জুটতো না। তোমরা ছিলে বড়ো ঘব, তোমার মা রাজার ঐশ্বর্যেব মধ্যে বড়ো হয়েছেন। ছোটবেলায় বন্ধুত্ব হযতো হয়, কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। শেষপর্যন্ত তোমাদের বাড়ির দিক দিয়ে কেউ ব্যাপারটা মেনে নিতো না। অবশ্য সে প্রশ্নও ওঠে না, কারণ খুব অল্পবযেসেই বাবা আমার ঠাকুমাব সঙ্গে তোমাদের বাড়ি ছেড়ে মনসাপোতায় চলে যান। আই.এ পাস করার পব অদ্ভুত পরিস্থিতিতে বাবার বিয়ে.হয়। সে গল্প হয়তো তোমার মামার কাছে তুমি শুনে থাকবে। তোমার মায়েরও বিয়ে হয়ে যায়। আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে আমাব মায়ের মৃত্যু হয়। মা বলতে আমি এই মাকেই জানি, তিনিও সন্তান বলতে আমাকেই জানেন।

কাজল একটু থামিল। তুলি পূর্ণদৃষ্টিতে তাহাব দিকে তাকাইয়া আছে।

—তোমাব মায়ের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বাবার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব মধুর ছিল, ঘনিষ্ঠ ছিল। এ যে কত পবিত্র ঘনিষ্ঠতা তা আমি বলে বোঝাতে পারবো না। দুজনে পরস্পরের নিঃসীম একাকীত্বকে গভীর আত্মিক সান্নিধ্য দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। তোমার ছোটবেলায় ভবানীপুরের বাড়িতে বাবা তোমাকে প্রথম দেখেন—তখন তোমার মা মারা গিয়েছেন। তোমাকে দেখে সেই রাত্তিরেই বাবা তাঁর ডায়েরিতে একটা ইচ্ছের কথা লিখে যান—সে ইচ্ছে তোমাকে আর আমাকে ঘিরে।

কাজল আবার থামিল। মরিয়ার মতো অনেক কথা বলিবার পর তাহার বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছে। তুলি কি কিছু মনে করিল? সে কি ভাবিতেছে যে, নির্জন বাড়িতে একা পাইয়া কাজল তাহাকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করিতেছে? খুব অস্পষ্ট স্বরে তুলি বলিল—এসব আমি কিছুটা জানি। আপনি কী বলবেন?

তুলির কথায় কাজল অবাক হইল, বেশ ভালোও লাগিল। তুলি সরল, নম্র; কিন্তু তাহার আড়ষ্টতা নাই—সে বোকাও নয়। ঠিক কথা ঠিক সময়ে বুঝিতে পারে।

কাজল বলিল—তুমি কী করে জানলে? কে বলেছে তোমাকে?

—মামা। মানে ঠিক ওভাবে বলেন নি, তবে মাঝে মাঝেই নানা কথায় আমি বুঝতে পারছিলাম এমন একটা কিছু ঘটতে চলেছে।

কাজলের গলার কাছে কী একটা গুটলি পাকাইয়া উঠিতেছে। তুলির শরীর হইতে কেমন একটা মৃদু সুগন্ধ পাওয়া যায়, তার সবটাই এসেন্‌স্ নহে, তরুণী-শরীরের নিজস্ব ঘ্রাণ—রৌদ্রের গন্ধের মতো, বৃষ্টিভেজা কদমের গন্ধের মতো, শাশ্বতী মানবীর মতো।

সে বলিল—এমন কিছু ঘটলে তোমার কি আপত্তি হবে?

এবার তুলি চুপ করিয়া রহিল।

কাজল বলিল—চুপ করে থাকলে তো চলবে না, মামা এসে পড়ার আগে তোমার মতটা আমার জানা প্রয়োজন। তাহলে আমিও ওঁর সঙ্গে কথা বলে যাব।

—আমার মত জানা কেন প্রয়োজন?

—কারণ তুমি খেলার পুতুল নও যে, দোকান থেকে পছন্দ করে কিনে নিয়ে যাব! তাছাড়া আমার বাবা চেয়েছিলেন বলেই এতে তোমারও মত থাকবে তার কী মানে আছে? যাক, এসব ছেড়ে দিলেও তোমার দিক থেকে আরও অনেক ভাববার বিষয় থেকে যায়—

—কী?

—যেমন ধরো, আমার বাবার খ্যাতি আছে সত্য, কিন্তু আমরা বড়োলোক নই। তুমি অভিজাত ধনী পরিবারের মেয়ে, তুমি মানিয়ে নিতে পারবে তো? এ তো দুদিনের খেলা নয়, সারাজীবনের মতো সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তোমার কী মত? ভেবে বলো—

তুলি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল—বাবা যা ঠিক করে গিয়েছেন, তার ওপরে আমার আর বলার কী আছে?

কাজলের সমস্ত শরীরে একটা কেমন ভালো লাগার, তৃপ্তির শিহরণ বহিয়া গেল। সে বুঝিল তাহার বাবাকে তুলিও 'বাবা' বলিয়া উল্লেখ করিতেছে। তবু সে বলিল—না, আরও ভাববার কথা আছে।

—কী?

—আমার বলতে সংকোচ হচ্ছে, তুমি হয়তো ব্যাপারটা জানো, তবু একবার নিজের মুখে না বলে নিলে আমি শান্তি পাবো না—

তুলি বিস্মিত চোখে তাকাইয়া বলিল—কী বলবে তুমি? আমি বুঝতে পারছি না—

—দেখ, আমার ঠাকুমা সর্বজয়া দেবী, তোমাদের বাড়িতে—

কাজল থামিয়া গেল। তুলি অপলকে তাকাইয়া আছে।

মনের জোর সংগ্রহ করিয়া কাজল বলিল—আমার ঠাকুমা তোমাদের বাড়িতে রাঁধুনির কাজ করতেন। আমাকে বিয়ে করলে তোমার সম্মানে আঘাত লাগবে না তো?

এইবার যাহা ঘটিল তাহা সত্যই বিস্ময়জনক। কাজল এতদিন তুলিকে নিতান্ত লাজুক আর স্বল্পভাষিণী বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছে, কিন্তু প্রয়োজনের সময় মেয়েরা যে কত সরল অথচ বলিষ্ঠভাবে নিজের কথা বলিতে পারে তাহা সে আজ দেখিল।

তুলি তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল—যুধিষ্ঠির বিরাটরাজের চাকরি স্বীকার করেছিলেন, ভীম রাঁধুনির কাজ করতেন, দ্রৌপদী রানীর পরিচারিকা ছিলেন। তাঁরা কি সম্মানে কারও চেয়ে কম ছিলেন? অবস্থায় রকমফের সবারই হয়, তার জন্য মানুষ ছোট হবে কেন? আজ বাবার যে দেশজোড়া খ্যাতি, মানুষ তাঁকে উপনিষদকার ঋষির সঙ্গে তুলনা করছে, সে খ্যাতি আর সম্মানের কাছে জমিদারির গর্ব দাঁড়াতে পারে? আজ কোথায় আমাদের সে জমিদারি? কোথায় সে সম্মান? আর বাবাকে দেখ, তিনি সবাইকে ছাড়িয়ে মাথা তুলে উঠেছেন।

তারপর একটু হাসিয়া বলিল—আচ্ছা আমি তোমাদের রাঁধুনি হয়ে সবকিছু শোধবোধ করে দেব, তাহলে হবে তো?

বিমলেন্দু বাজার হইতে ফিরিলেন। তুলি উঠিয়া রান্নার জোগাড় দেখিতে গেল। অন্যমনস্ক

কাজল অনেকক্ষণ বাদে খেয়াল করিল তুলি তাহাকে কখন যেন 'তুমি' সম্বোধন করিতে শুরু করিয়াছে। কখন হইতে এটা ঘটিল? সে খেয়াল করে নাই তো!

সারাদিনে তুলির সঙ্গে আর বিশেষ কথা হইবার সুযোগ হইল না। খাওয়া সারিয়া বিমলেন্দু কাজলকে লইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলেন এবং ক্রমাগত একালের দোষ ও সেকালের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কোনো কোনো প্রসঙ্গে কাজল তাঁহার সহিত একমত হওয়া সত্ত্বেও সে আলোচনায় যোগ দেওয়ার উৎসাহ পাইল না।

মাথার মধ্যে যেন কেমন করিতেছে। অথবা ঠিক মাথার মধ্যে নয়, সমস্ত চেতনায় কেমন একটা অস্থিরতার ভাব।

অনেকদিন আগে, তাহার বাবার কৈশোরে যে নাটক শুরু হইয়াছিল, এতদিনে বোধহয় তাহা স্থির পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। মৃত্যুর ওপারের জগৎ হইতে তাহার বাবা ও তুলির মা নিশ্চয় তৃপ্তিলাভ করিবেন। নিজেদের বিচ্ছেদ সন্তানের মিলনে পূর্ণতা লাভ করিবে। মহাকালের কী বিচিত্র গতি!

বিকালে বিদায় লইবার সময় সে বিমলেন্দুকে বলিল—মামা, আপনি একবার আমাদের বাড়ি যাবেন না?

বিমলেন্দু বলিলেন—হাঁ, সে তো যাবো নিশ্চয়। দেখি এইবার—

হঠাৎ থামিয়া তিনি তীক্ষ্ণচোখে কাজলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—তুমি কি—মানে, বিশেষভাবে যাওয়ার কথা বলছো?

মাথা নিচু করিয়া কাজল বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি আপনার কাছ থেকে ভেবে দেখবাব জন্য সময় চেয়ে নিয়েছিলাম, আমি মনস্থির করে ফেলেছি, এবার আপনি একবার চলুন—

বিমলেন্দুর মুখ দেখিয়া মনে হইল তিনি আগেই আন্দাজ কবিয়াছিলেন, কাজল আজ এই কথা বলিবে। তিনি বলিলেন—তোমার মা?

—মায়ের অমত হবে না।

বিমলেন্দু চুপ করিয়া একমুহূর্ত কী ভাবিলেন, তারপর বলিলেন—আমার দিদির জীবনের সব কথা কি তোমার মা ঠিকঠাক জানেন? সমাজ খুব হিংস্র অমিতাভ, মানুষ মানুষকে পীড়ন করে বড়ো সুখ পায়। বিয়ের পর যদি কেউ এসব পুরোনো কথা দিয়ে ঘাঁটাঘাটি করে।

কাজল বলিল—আমার মা সব জানেন। সমাজকে তিনি মানেন, কিন্তু সমাজের অন্যায় আচরণকে ভয় পান না। তাছাড়া বাবা যাকে সমর্থন করে গিয়েছেন, সে কাজ করতে মায়ের কোনো দ্বিধা হবে না। ও নিয়ে চিন্তা করবার কারণ নেই।

বিমলেন্দুর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—আমি যাব, খুব শিগগীরই যাব, তোমার মাকে বোলো। অমিতাভ, তুমি যে আমাকে কতবড় দায় থেকে উদ্ধারের আশা দিলে, তা আমি কী করে বোঝাবো? পিতার উপযুক্ত সন্তান তুমি, তোমার মঙ্গল হোক—

ছুটির দিনের সন্ধ্যার ট্রেনে বেশি ভিড় নাই। জানালার ধারে বসিয়া কাজল বাহিরে তাকাইয়া ছিল। একটু একটু করিয়া অন্ধকার নামিতেছে, ঝোপঝাড় বাড়িঘর সট্‌সট্‌ পিছাইয়া যাইতেছে।

কাজলের মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। কবেকার ফুরাইয়া যাওয়া আতরের শিশি খুলিলে যেমন অস্পষ্ট সুগন্ধের রেশ মনকে উদাস করে, তেমনি তাহাদের পরিবারের ইতিহাস, তাহার বাবার পুণ্যস্মৃতি, তুলির মায়ের ব্যর্থ জীবন, নিশ্চিন্দিপুর আর মৌপাহাড়িতে কাটানো তাহার স্বপ্নের শৈশব—সমস্ত তাহার চেতনার পটে একসঙ্গে ভাসিয়া উঠিল।

বাবা যদি বাঁচিয়া থাকিত!

কত কথা বলিতে ইচ্ছা করে, ছোটবেলার মতো চুপ করিয়া বাবার পাশে শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা

করে, কিন্তু উপায় নাই। নির্মম মহাকাল তাহার বাবাকে কোন অজানা দেশে লইয়া গিয়াছে। বাবা এখন কেবলমাত্র অতীতের এক সুখস্মৃতি।

কিংবা সত্য কি তাই? বাবাকে কি সে প্রতিমুহূর্তে নিজের রক্তের ভিতর, চেতনা ও উপলব্ধির ভিতর অনুভব করিতেছে না? বাবার চাইতে তাহার কাছে আর কে বেশি করিয়া জীবিত?

মায়ের শরীর ভালো নয়। তুলি আসিয়া মাকে যত্ন করিবে, মায়ের হাত হইতে কাজ তুলিয়া লইবে। সামনে কঠিন কাজ আসিতেছে, বাবার স্মৃতিরক্ষার কাজ, সেই কাজে তাহাকে সাহায্য করিবে। যে কাজ প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ, একান্ত আপন ছাড়া তাহাতে কেহ সহায়তা করিতে পারে না।

একজন খুব কষ্ট পাইবে। সবদিক দিয়াই সে বঞ্চিত হইল।

বাহিরে অন্ধকারে চাহিয়া কাজল মনে মনে তাহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। সেদিন রাত্রে 'She walks in beauty, like the night' পড়িতে পড়িতে ঘুম আসিল। আলো নিভাইবার পর ঘুমাইয়া পড়িবার আগে পর্যন্ত যে স্তিমিত চেতনার রাজত্ব, সেইখানে কাজলের মন সামান্য সময়ের জন্য দাঁড়াইয়া গেল।

ঈর্ষা, যুদ্ধ, লোভ আর মৃত্যুর সীমাবদ্ধতার পরপারে অনন্ত শূন্যের ভিতর দিয়া সৌরবাতাস বহমান। বিশ্বের ইতিহাস মেসোপটেমিয়া, শানিদার গুহাবাসী নিয়ানডার্থাল কিংবা জলচর ট্রাইলোবাইটদের সিলুরিয়ান যুগে শুরু হয় নাই, পৃথিবীর জন্মেরও আগে—নক্ষত্রদের জন্মের আগে, নক্ষত্র-নীহারিকা,মহাশূন্য-মহাকাল যখন একটিমাত্র বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত সম্ভাবনা হিসাবে বিরাজমান ছিল, ইতিহাসের প্রথম পাতা তখন লেখা হইয়াছে। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে মানুষ আসিয়াছে এই সেদিন, কিন্তু সৃষ্টির সেই আদিম মুহূর্ত হইতে চরাচরব্যাপী এক মহাচেতনা দেশকালে ব্যাপ্ত হইয়া ছিল। তাহা হইতেই জগৎ, তাহা হইতেই যাবৎ বস্তুপিণ্ড। প্রেম, কবিতা, দর্শন, বিজ্ঞান—যে ছোট ফুলটি সুবর্ণরেখার তীরে সে ঘাসের মধ্যে ফুটিয়া থাকিতে দেখিয়াছে, সেটি হইতে দূর ভবিষ্যতে সময়ের শেষ ভগ্নাংশ পর্যন্ত সমস্ত কিছু সৃষ্টিপূর্ব ওই মহাচেতনাব মধ্যে লুকাইয়া ছিল।

তুলির সঙ্গে তাহার যোগাযোগ সেই বিশ্ব-পরিকল্পনারই অংশ। আকস্মিক নহে নির্ধারিত।

ঘুম আসিবে—ঘুম আসিতেছে।

কোথায় যেন এক বিস্তৃত শাল-পিয়াশাল-অর্জুনের বন। সে বনের মাথায় পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছে। রাতজাগা পাখি ডাকিতেছে কোথায়। দক্ষিণ হইতে আসা বাতাসে শুষ্কপত্র মর্মরশব্দে সরিয়া যাইতেছে। গানের সুর জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিকে উতলা করিয়াছে। অজানা অদ্ভুত এক সুর, পৃথিবীর সব মানুষই সে সুর শুনিয়াছে। আর্ন্তনাক্ষত্রিক শূন্যে সঞ্চরমাণ নীহারিকাদের সে সংগীত। যে শুনিয়াছে, ঘরে আর তাহার মন বসে না। প্রথম যৌবনে আকাশের দিকে তাকাইয়া সেই আদিম রহস্যময় সুর সে একবার শুনিতে পাইয়াছিল, তাই অল্পে সে আর ভোলে নাই। হয়তো এবার আর কিছু হইল না, এ জন্মটা হয়তো বৃথাই গেল, কিন্তু তাই বলিয়া সে নকল সোনা কিনিতে যায় নাই। যেখানে থাকুক, যাহাই করুক, বুকের পাঁজরে সেই অনির্বাণ সংগীত বাজিয়াছে।

ওই জ্যোৎস্নালোকিত অরণ্যভূমির প্রসার পার হইয়া কে যেন তাহার দিকে আসিতেছে।

কে? অপালা? তুলি? তাহার না-দেখা হারানো মা?

না, যে আসিতেছে তাহাকে সে চেনে না। সমস্ত সৃষ্টির নির্যাস লইয়া ইহার অবয়ব। সে মানব নয়, মানবীও নয়, পৃথিবীর কোনো পরিচিত আকারের স্বীকৃত মাত্রায় ইহাকে ধরা যায় না।

কাজলের জাগতিক চেতনা তখন প্রায় নিদ্রাকে স্পর্শ করিয়াছে। তবু তাহার গায়ে শিহরণ জাগিল। যে আসিতেছে তাহারই জন্য কাজলের এতদিনের অপেক্ষা ছিল। এতদিনে আসিল তবে!

কিন্তু চিরপ্রার্থিত সেই মুহূর্তটি শেষ পর্যন্ত আসিল না। যে আসিতেছিল, সে মানুষের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লইয়া পরম সার্থকতা হিসাবে আসিতেছিল। সে পৌঁছাইবার ঠিক আগেই কাজল ঘুমাইয়া পড়িল।

সুপ্তির প্রান্ত হইতেই শুরু হয় স্বপ্নের অধিকার।

ঘুমাইয়া কাজল সেই রাত্রে অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখিল। যে গ্রহণ করিতে জানে প্রকৃতি তাহাকেই গ্রাহ্যবস্তু দেন। কাজলের সংবেদনশীল মন জীবনের প্রধান এক বাঁকে আসিয়া আরও সংবেদী হইয়া উঠিয়াছিল। স্বপ্নের জগতে সত্যকে যুক্তির জাল দিয়া ধরিতে হয় না, সত্য স্বপ্রকাশ ও সম্পূর্ণ হইয়া আপনিই ধরা দেয়। স্বপ্নের মধ্যে কাজল সমস্ত বস্তুবিশ্বকে কী এক জাদুবলে একসঙ্গে দেখিতে পাইল। সেখানে কণা কণা হাইড্রোজেন সঞ্চিত হইয়া আলোকবর্ষব্যাপী নীহারিকার সৃষ্টি হইতেছে, নীহারিকার গর্ভে জন্ম লইতেছে নক্ষত্রের দল। সীমাহীন শূন্যে জ্যোতিষ্কেরা বিশাল দূরত্বের ব্যবধানে ভ্রাম্যমাণ।

আর সেই নক্ষত্রের কেন্দ্রে আবির্ভূত হইতেছে জীবনের মৌলকণা। যে পদার্থে তাহার শরীর গঠিত, নদী পাহাড় বনস্পতি ও সমগ্র জীবজগৎ গঠিত, সেই বস্তুপুঞ্জ সমস্ত বিশ্ব হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার শরীরে মিলাইয়া যাইতেছে।

মহনীয়, উদার অনুভূতিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। সে নক্ষত্রের সন্তান, মরণশীলতা দ্বারা তাহার জীবন সীমাবদ্ধ নয়। সে মহাবিশ্বের তাৎপর্যবাহী অধিবাসী, সে নক্ষত্রের সন্তান।

শীতের শেষে সে বৎসর বসন্ত আসিল একখানি গীতিকবিতার মতো।

হিমের আড়ষ্টতা ভাঙিয়া সমস্ত জগৎ যখন নতুন প্রারম্ভের ভূমিকা হিসাবে কচি পাতায় আর দক্ষিণ হইতে আসা বাতাসে নিজেকে প্রকাশ করিতেছে, তেমনই এক দিনে হৈমন্তী কলিকাতায় গিয়া তুলিকে আশীর্বাদ করিয়া আসিল। সঙ্গে গেল প্রতাপ আর পরিবারের বন্ধু দু-একজন। বিবাহ হইবে আষাঢ়ের একত্রিশ তারিখে। উভয়পক্ষেরই লোকবল কম, প্রস্তুতির জন্য এই সময়টা প্রয়োজন।

আশীর্বাদের আগের দিন রাত্রে হৈমন্তী একবার কাজলের ঘরে গেল। সকাল সাতটার মধ্যে পুরোহিতের আসা প্রয়োজন, না হইলে ট্রেন ধরা যাইবে না। পুরোহিত মশাইকে খবর দেওয়া হইয়াছে তো?

ছেলের ঘরে ঢুকিয়া হৈমন্তী দেখিল কাজল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। টেবিলের ওপর একটি পুরানো, প্রায় মলাট-ছেঁড়া অ্যালবাম আর কাজলেব ডায়েরিখানা। অ্যালবামটি সে চেনে, অপুব উদাসীন, ভবঘুরে জীবনের ঘূর্ণি হইতে রক্ষা পাওয়া কিছু ছবি তাহাতে আছে।

কিন্তু বিশেষ করিয়া আজই এটি ছেলের টেবিলে কেন?

হৈমন্তী সামান্য ইতস্তত করিয়া অ্যালবাম খুলিল।

প্রথম পাতাতেই অপর্ণার একখানি ছবি কেবলমাত্র মুখ ও গলার খাঁজ পর্যন্ত ছবিতে দেখা যাইতেছে, দৈর্ঘ্যে বারো ইঞ্চি, প্রস্থে দশ ইঞ্চির এনলার্জমেন্ট।

হৈমন্তীর বুকের ভেতরটা একবার টনটন করিয়া উঠিল। সে সব জানিয়া, সব মানিয়াই বিবাহ করিয়াছিল। প্রথমা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আমৃত্যু গভীর ভালোবাসার কথা সে যে জানে না এমন নয়। তবু মন-কেমন করে। অপর্ণার প্রতি তাহার কোন ঈর্ষা নাই, স্বামীর অনির্বাণ ভালোবাসার জন্য কোন ক্ষোভ নাই—তবু মন-কেমন করে। ভাগ্যের অনিবার্যতায় স্বামীকে সে সম্পূর্ণ নিজের করিয়া পায় নাই। তাহার দেবতার মতো স্বামী, কোনদিন কষ্ট দেয় নাই, তাহার মন খারাপ হইতে পারে ভাবিয়া কখনও অপর্ণার প্রসঙ্গ তোলে নাই, স্বামীকে হৈমন্তী কোন দোষ দিতে পারিবে না। কিন্তু মেয়েদের মন বড়ো অদ্ভুত, বিচিত্র। আজ ছেলের টেবিলে মায়ের ছবি দেখিয়া অকস্মাৎ হৈমন্তী আবিষ্কার করিল অপর্ণা এই সংসারে এখনো পরিপূর্ণভাবে জীবিত। কাজল তাহার বিবাহের আশীর্বাদের আগের দিন মায়ের ছবি দেখিতেছিল, ডায়েরিতেও নিশ্চয় মায়ের কথা লিখিয়াছে। একটু ইচ্ছা হইলেও সে নিজেকে সংযত করিল। না, ছেলের ডায়েরি সে পড়িবে না।

স্বামীর মতো ছেলেও। শৈশব হইতে যাহাকে নিজের অপূর্ণ মাতৃত্বের বঞ্চনা ভুলিয়া মানুষ করিয়াছে, সেও সম্পূর্ণ নিজের হইল না, অর্ধেক আরেকজনের রহিল।

কাল তুলির আশীর্বাদ। কিছুদিন পরেই এ সংসারে একজন বহিরাগত আসিবে। অন্য কিছু না, নিজের ওপর তাহার বিশ্বাস আছে, সে নিশ্চয় যে কোনো অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিবে, কিন্তু ছেলের ওপর যে অর্ধেক অধিকার তাহার ছিল, আবার তাহার অর্ধেক আর একজনকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

ছাড়িয়া দেওয়াই নিয়ম। ছাড়িয়া দেওয়াই তো উচিত।

সব ঠিক ঠিক, সব যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু তাহার শেষ সম্বলটুকুরও অর্ধেক ছাড়িয়া দিতে হবে। কাজল একাধারে তাহার ছেলে ও স্বামীর প্রতিনিধি। যদি সবটাই ছাড়িতে হয়?

এমন তো হয় সে শুনিয়াছে। তাহারও হইবে না তো?

আশঙ্কায় তাহার বুকের ভিতরটা কেমন হিম হইয়া গেল!

পরক্ষণেই ছেলের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার সুপ্ত মাতৃত্ব স্নেহের স্তন্যধারায় উৎসারিত হইয়া উঠিল। না, তাহার ছেলে তাহাকে ভুলিবে না। তেমন হইতেই পারে না।

জীবনে কিছু বিপ্লব আসে সরবে, ঢাকঢোল পিটাইয়া। কিছু আসে নিঃশব্দে, মসৃণ সঞ্চারে, কিন্তু সমস্ত জীবনে এক ব্যাপক, সার্বিক পটপরিবর্তন ঘটাইয়া দেয়। তুলির সহিত বিবাহ কাজলেব জীবনে সেই আশ্চর্য রূপান্তর লইয়া আসিল। প্রেম মানে যে কেবল শরীর নয়, বিবাহ মানেই কেবল শয্যা নয়, সেকথা কাজল জানিত। কিন্তু একটি তরুণী, সুন্দরী, মৃদু নারীর সান্নিধ্য মানুষকে যে কী স্বর্গের সন্ধান দিতে পারে তাহা সে এবার বুঝিল।

হৈমন্তীকে কিন্তু সত্যিই অনেকটা ছাড়িতে হইল। আগে নিজের লেখা ও পড়ার সময় বাদ দিয়া বাকি অবসরের সবটুকুই কাজল মাকে দিত। এখন হৈমন্তীর নিঃসঙ্গতা বাড়িয়া উঠিল। এক-একদিন ভুলিয়া ছেলের সঙ্গে কথা বলিবার জন্য দরজা পর্যন্ত গিয়া হৈমন্তী ফিরিয়া আসিয়াছে। ভিতরে পুত্রবধূর সঙ্গে ছেলে গল্প করিতেছে। কিছুই না, ব্যবধান কেবল একটি ভেজানো দরজা অথবা টানিয়া দেওয়া পর্দার, কিন্তু একদিন যেখানে অসংকোচ বিচরণের অধিকার ছিল, এখন সেখানে স্বপ্রযুক্ত বিচ্ছেদেব প্রান্তর।

হৈমন্তী ঘরে ফিরিয়া আসিয়া একটা বই খুলিয়া বসে।

তাহার আছে বই, আছে অপুর স্মৃতি, আছে জানালার বাহিরে রুদ্রপলাশ গাছে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাখি আর কাঠবেড়ালির খেলা, দিনের বিভিন্ন সময়ে আকাশেব রঙ বদলানো। বয়েস বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এইসব জিনিসকে হৈমন্তী অপরিবর্তনীয় এবং প্রকৃত সত্যের প্রকাশ হিসাবে নিজের জীবনে লাভ করিয়াছে।

এই অবস্থার অবসান ঘটিল আপনিই।

একদিন দুপুরের পর আকাশ কালো করিয়া মেঘ ঘনাইয়া আসিল। নিবিড় মেঘের ছায়ায় পৃথিবী মেদুর জলভরা ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে শুরু করিযাছে, বৃষ্টি নামিল বলিয়া। পুরোনো দিনের অভ্যাসমত হৈমন্তী ডাকিয়া উঠিল—ওরে খোকন, দেখে যা কেমন সুন্দর মেঘ করেছে!

ডাক শুনিয়া ছেলের আগে ঘরে ঢুকিল তুলি। পেছন পেছন কাজল।

হৈমন্তীর একেবারে কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া তুলি বলিল—তাই তো মা, কী সুন্দর দেখাচ্ছে! তোমার ঘরের জানালা দিয়ে বেশি ভালো করে দেখা যায়। ওদিকে একটু সরে যাও, আমরা তোমার কাছে বসি। আচ্ছা মা, নিশ্চিন্দিপুরে বা মৌপাহাড়িতে থাকার সময় এমন দিনে বাবা আর তুমি কী করতে বলো না—

তৃপ্তিতে হৈমন্তীর মন ভরিয়া গেল। সে বলিল—এরকম মেঘ দেখলেই তোমার শ্বশুরমশাই বলতেন—দ্যাখো দ্যাখো, কাকের ডিমের মতো মেঘ করেছে—

তুলি জিজ্ঞাসা করিল—কাকের ডিমের মতো মানে?

হৈমন্তী সস্নেহে বলিল—তুমি দেখ নি কখনও, না? কাকের ডিম কালোরঙের হয়। মেঘ ঘনিয়ে আসছে দেখলেই আমরা বেরিয়ে পড়তাম বেড়াতে—

—বৃষ্টি এলে ভিজতে না?

—ভিজতাম তো! হয়তো কুঠির মাঠ কিংবা কাঁচিকাটার পুলের কাছে চলে গিয়েছি, এমন সময় ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি নামতো। সেখানে আর কোথায় আশ্রয়? একটা গাছতলায় দাঁড়ালাম হয়তো, তা একটু পরে পাতা ফুঁড়ে সেখানেও জল পড়তে শুরু করল। তখন আবার হাঁটতে শুরু করতাম, দাঁড়িয়ে ভেজার চেয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভেজা আনন্দের। তোমার শ্বশুরমশাই গলা ছেড়ে গান গাইতে শুরু করে দিতেন, আমিও গাইতাম—

তুলি বলিল—বাবার গানের গলা খুব সুন্দর ছিল, না মা?

—হ্যাঁ বৌমা। তোমার শ্বশুরবংশে সবাই কিছু কিছু গাইতে পারে, তোমার বাবা খুব ভালো গাইতেন। দরাজ গলা ছিল। সুরের বোধ ছিল। নদীতে স্নান করবার সময় বিশুদ্ধ সংস্কৃতে শ্লোক উচ্চারণ করতেন, স্তবগান করতেন। সে সব গান আবার আমাকে শেখাতেন—

তুলি আবদারের সুরে বলিল—সে গান একটা শোনাও না মা—

লজ্জিতমুখে হৈমন্তী বলিল—নাঃ, সে কি আর এখন পারি বৌমা? সে থাক—

—না মা, একটা গান গাইতেই হবে, আমি তুলে নেব তোমার কাছ থেকে।

নদীতে স্নান করিবার সময় আবক্ষ জলে দাঁড়াইয়া অপু যে সংস্কৃত মন্ত্রটি গাহিত হৈমন্তী সেটি শুনাইল। তাহার গলা এখনও বেশ ভালো আছে, উচ্চারণও সুন্দর।

কয়েকদিন পরে কাজল অবাক হইয়া শুনিল তুলি ঘরের কাজ করিতে করিতে গুনগুন করিয়া সেদিনের শেখা গানটি গাহিতেছে। সে বলিল—বাঃ, এর মধ্যে শিখে নিলে গানটা?

—হুঁ, মাকে আবার গাইতে বললাম, দু-তিনবারে উঠে গেল—

—বেশ, ভালো। তুমি গান শিখবে তুলি? তোমার গলা তো খুব সুন্দর!

তুলি রাজি হইল। কাজল স্থানীয় এক প্রবীণ গায়ককে অনুরোধ কবায় তিনি সপ্তাহে একদিন তুলিকে গান শিখাইয়া যাইতেন। গানের ব্যাপারে তুলির স্বাভাবিক দক্ষতা কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশ পাইল। সমস্ত গানই সে অনায়াস দক্ষতায় শিখিয়া ফেলিত। শিক্ষক ভদ্রলোক একদিন কাজলকে বলিলেন—বৌমার সুরের বোধ খুব উঁচুদরের। অনেকদিন ধরে গান শেখাচ্ছি, এমনটি কমই দেখেছি। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত কিংবা টপ্পা অঙ্গের গান বৌমার গলায় খুব ভালো আসে। ওসব কঠিন গান সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী শিখতে চায় না, তারা চায় হালকা বাজার-চলতি গান চটপট তুলে নিতে। বৌমাকে শিখিয়ে আমার গান সার্থক হল—

কোন-কোনদিন খুব ভোরে উঠিয়া কাজল মা আর স্ত্রীকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হয়। ঘাসের ওপর তখনও শিশির শুকায় নাই, সূর্য উঠি উঠি করিতেছে। বাতাসে সকালের পবিত্রতা, কতরকম পাখি ডাকিতেছে গাছে গাছে। শহর হইতে বাহির হইয়া যে রাস্তাটা নদীর ধারে গিয়াছে তাহার দুধারে তেঁতুল, মেহগনি, শিরীষ, বকাইন আর কাঠবাদাম গাছ। মাঝে মাঝে দুয়েকটা জারুল বা ছাতিম। পথের ধারেই ঘন ঝোপঝাড়। এধারে বিশেষ বসতি গড়িয়া ওঠে নাই—শান্ত, স্নিগ্ধ বাতাস গায়ে মাখিয়া গল্প করিতে করিতে বেড়াইবার কী আনন্দ!

কঠ্-র-র-র শব্দে কী একটা পাখি ডাকিয়া উঠিল। হৈমন্তী তুলির দিকে তাকাইয়া বলিল—শুনলে বৌমা?

—হ্যাঁ মা, কী পাখি ওটা?

—বলো তো কী?

তুলি চুপ করিয়া একটু ভাবিয়া বলিল—জানি না। তুমি বলে দাও—

হৈমন্তী হাসিয়া বলিল—ও হচ্ছে কাঠঠোকরা। ওটা ঠিক ডাক নয়, গাছের ডালে ঠোঁট ঠুকে ওইরকম আওয়াজ করে। ডাক অন্যরকম, শুনিয়ে দেব'খন যদি ডাকে—

একটু একটু করিয়া তুলির জীবন সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। ইহার পূর্বে সে বিশেষ বাড়ির বাহিরে পা দেয় নাই, প্রকৃতির সহজ মজাগুলির সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দিবার কেহ ছিল না। এখন শাশুড়ি ও স্বামীর মধ্যে দুইজন পরম সহানুভূতিশীল শিক্ষক পাইয়া তাহার জীবনের প্রকৃত শিক্ষা সবেগে অগ্রসর হইল। হৈমন্তী ঠিক সাধারণ মাপের নারী নহে, অপুর সঙ্গে অতিবাহিত জীবন তাহার অন্তরের সুর অনেক চড়া পর্দায় উঠাইয়া দিয়াছিল। পুত্রবধূকে হৈমন্তী সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

কাজল বাবার ডায়েরিতে তাহার শাশুড়ি লীলার কথা পড়িয়াছে, কিন্তু কখনও তাঁহার ছবি দেখে নাই। বিবাহের পর সে বিমলেন্দুর কাছ হইতে চাহিয়া লীলার একখানা ছবি জোগাড় করিয়াছে এবং ছবিখানা অ্যালবামে অপর্ণার ফোটোগ্রাফের পাশে লাগাইয়াছে। মাঝে মাঝে সে একান্ত মুহূর্তে ছবি দুটি দেখে।

হ্যাঁ, বাবা অথবা অন্যেরা মিথ্যা বলে নাই, তাহার শাশুড়ি দেখিতে সুন্দরী ছিলেন। দক্ষ শিল্পীর হাতে গড়া মূর্তির মতো অপার্থিব, অলৌকিক সৌন্দর্য—পৃথিবীর পথেঘাটে এমন দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু—

কিন্তু তাহার মা যেন আরও সুন্দর।

পাতাকাটা চুল, পানেব পাতার মতো মুখের গড়ন। ঠোঁটের সুকুমার ভঙ্গি তাহার মায়ের চেহারায় এক আশ্চর্য দেবীত্ব দান করিয়াছে। কাহারও সঙ্গে তুলনা হয় না।

নাঃ, এসব ছেলেমানুষি। দুজনেই মা. মায়েব বূপের তুলনা চলে না।

এইসময় হঠাৎ কাজলের কবিতা লিখিবাব ঝোঁক বাড়িয়া উঠিল। তুলির উদ্দেশে কবিতা লিখিয়া স্লিপগুলি ভাঁজ কবিযা বালিশেব নিচে, টেবিলক্লথেব তলায় কিংবা তুলি যে বইখানা পড়িতেছে তাহার ফাঁকে রাখিয়া দিত। কবিতাগুলিকে বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য রতন হিসাবে উল্লেখ করা হয়তো একান্তই বাড়াবাড়ি হইবে, কিন্তু তুলি সেগুলি পাইযা ভারি খুশি হইত। ক্রমে ঘবের সমস্ত সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য স্থান কিছুক্ষণ বাদে খুঁজিযা দেখা তুলির অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গেল। কবিতা না পাইলে তাহার অভিমান হইত, মুখ গম্ভীর হইত। নিজের সৃষ্ট বিপদে কাজল আবক্ষ ডুবিয়া গেল। তুলির মুখ ম্লান হইলে তাহার জগৎ অন্ধকাব হইযা যায়, কিন্তু পত্নীকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য প্রতিদিন ডজনখানেক কবিতা স্বয়ং মহাকবি কালিদাসও লিখিতে পারিতেন কি? প্রাণের দায়ে কাজল এই অসম্ভব কাজেও প্রায় অভ্যস্ত হইযা আসিল।

এক ছুটির দুপুরে সদ্য আবিষ্কৃত গোটাদুই কবিতা পাঠান্তে তুলি বলিল—বেশ হয়েছে, তোমার কবিতার হাত বেশ ভালো। আমি একটাও হারাই নি, জানো তো? সবগুলো একজায়গায় করে বাক্সে রেখে দিয়েছি। এই এত মোটা হয়েছে। আচ্ছা, তুমি ছবি আঁকতে পারো না? কবিতার সঙ্গে ছবি থাকলে দেখতে কত ভালো লাগে—

প্রিয়ার অনুরোধ রক্ষার জন্য যুগে যুগে মানুষ রাক্ষস-রক্ষিত সরোবর হইতে সোনার পদ্ম তুলিতে গিয়াছে, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ করিয়াছে, স্বর্ণমৃগের সন্ধানে গহন বনে ফিরিয়াছে, ছবি আঁকা আর এমন কী কাজ?

কাজল চিত্রশিল্পীতে পরিণত হইল।

সাধনার পথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কাজল বুঝিল বিপদ এইবার গভীরতর। কিছুটা সাহিত্যপ্রতিভা থাকিলে যা হোক করিয়া একটা কবিতা দাঁড় করাইয়া দেওয়া যায়, বিশেষ করিয়া যে কবিতা মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করিয়া পড়া হইবে না, বস্তুত মাত্র একজন ব্যতীত সমস্ত পৃথিবীতে যে কবিতার আর পাঠকই নাই। কিন্তু ছবি আঁকিতে গেলে কিঞ্চিৎ বেশি দক্ষতা ও স্বভাবনৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়। কাজে নামিয়া কাজল বুঝিল এ কাজ তাহার নয়। পাখি আঁকিলে

বিকলাঙ্গ জিরাফের ছানার মতো দেখায়, মেঘের আড়াল হইতে সূর্যরশ্মি বাহির হইতেছে আঁকিলে মনে হয় বড়ো একতাল ময়দার মধ্যে কয়েকটা সরু কাঠি গোঁজা আছে। একবার তুলির মুখখানিকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করিয়া পুকুরে অনেক পদ্মপাতার মধ্যে একখানি ফুল ফুটিয়া আছে এমন একটি ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিল। আঁকা শেষ হইলে মনে হইল জলে অনেকগুলি তেলেভাজা মশলাপাঁপড় ভাসিয়া আছে, তাহার মাঝখানে একটা জটিল কী যেন—আর যা হউক, সেটি পদ্ম নয়।

প্রায় হতাশ হইয়া পড়িবার মুখে আশার আলো দেখা দিল।

কাজল আবিষ্কার করিল সে খুব সহজেই বেড়াল আঁকিতে পারে। সেগুলি যে অবিকল বেড়াল হয় এমন নয়, কিন্তু সাদৃশ্যের যাবতীয় গুরুতর অসঙ্গতি সত্ত্বেও তাহাদের চিনিতে ভুল হয় না। তুলির স্বভাব, চেহারা ইত্যাদির সঙ্গে বেড়ালছানার তুলনা করিয়া কাজল একখানি দুইপাতাব্যাপী কবিতা লিখিল এবং স্থানে স্থানে গোটাকতক মার্জারশাবকের বিভিন্ন ভঙ্গিমার ছবি আঁকিয়া বসাইয়া দিল। একরঙা ছবিতে মজা নাই, তাই রঙপেন্সিল দিয়া ছবিগুলিকে মনোহারী রঙে রঞ্জিত করিল। নেহাত প্রেম যৌক্তিকতার ধার ধারে না তাই রক্ষা, নহিলে নীল, সবুজ আর ম্যাজেন্টা রঙের চৌখুপিওয়ালা শতরঞ্চির ডিজাইনের বেড়াল দেখিলে স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টাও চমকাইয়া উঠিতেন।

যাহার জন্য ছবি সে কিন্তু খুব খুশি হইল।

কবিতা পড়া হইলে ছবিগুলি ভালো করিয়া আবার দেখিতে দেখিতে উজ্জ্বলমুখে তুলি বলিল—তুমি ছবিও আঁকতে পারো কখনও বলো নি তো! চমৎকাব বেড়াল, বেশ বেড়াল।

কাজল বলিল—বেড়ালছানাগুলো কিন্তু তোমাকে ভেবে আঁকা—

—আমাকে? কেন?

—তুমিও ওইরকম নরম নবম, তুলতুলে—

তুলি লজ্জা পাইল, বলিল—যাঃ, যতসব বাজে কথা—

তাহার পর কী ভাবিয়া বলিল—তা হোক, তুমি কবিতার সঙ্গে বেড়াল এঁকো।

অতঃপর কাব্য ও শিল্পচর্চা সমান্তরালভাবে সমানবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কাজল চিরকালের অভ্যাসমত অনেকরাত অবধি পড়াশুনা করে। এক-একদিন বই হইতে চোখ সরাইয়া দেখিত তুলি তাহার পাশে পরম নির্ভরতায় ঘুমাইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথ ‘নৌকাডুবি’-তে যেমন লিখিয়াছেন, তাহার মুখখানি যেন তেমনই সমস্ত বিশ্বচবাচরে একটিমাত্র দেখিবার জিনিসের মতো ফুটিযা আছে। তুলিব ঘুমন্ত মুখে গার্হস্থ্য শান্তিব আলো।

মনে কেমন একটা আনন্দ। দুর্লভ বস্তু একান্তভাবে লাভ করিবার আনন্দ।

সরল পৃথিবীর যে স্বপ্নের মধ্যে কাজলের বড়ো হইয়া ওঠা, তাহা একটু একটু করিয়া ভাঙিয়া যাইতেছিল। এবার একটি ঘটনায় সে বুঝিল মানুষের মুখ মোটেই তাহার মনের দর্পণ নয়। তিক্ততার মূল্যে সে কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিল।

একদিন সকালে নিশ্চিন্দিপুর হইতে একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। কাজলকে দেখিয়া সে বলিল—দাদাবাবু না? নমস্কার দাদাবাবু, ভালো আছেন? কাকীমা কই?

কাজল বলিল—তোমাকে তো ভাই চিনলাম না! কে তুমি?

—চিনবেন আর কী করে? দেশে যাতায়াত বড্ডই কমিয়ে দিয়েছেন। কর্তামশাই থাকলে চিনতে পারতেন। আমার নাম শিবু রায়, আপনাদের গাঁয়েরই চড়কতলার মাঠের ধারে আমার বাড়ি। তা পরিচয় দেবার মতো কিছু নেইও, ব্রাহ্মণবংশে জন্ম—এইমাত্র। গরিব ঘরে জন্মেচি দাদাবাবু, পয়সার অভাবে লেখাপড়া শিখতে পারিনি, জন খেটে পেট চালাই। কাকীমাকে প্রণাম করতে ইচ্ছে হল, তাই চলে এলাম। ভোর রাত্তিরের ট্রেন ধরিচি—

হৈমন্তীকে প্রণাম করিয়া এবং স্বর্গত কর্তামশাইকে স্মরণ করিয়া শিবু কাঁদিয়া আকুল হইল,

তুলিকে দেখিয়া বার বার 'মা যেন আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী' বলিল, এবং বাহিরের বারান্দায় বসিয়া পরোটা, আলুচচ্চড়ি ও আখের গুড় সহযোগে অবিশ্বাস্য-পরিমাণ জলখাবার খাইল। তাহার হাঁটু পর্যন্ত খাটো কাপড়, ছেঁড়া নীলরঙের হাতকাটা ময়লা হাফশার্ট ও বুভুক্ষু চেহারা দেখিয়া কাজলের মায়া হইল। আহা, বেচারা ভালো করিয়া খাইতে পায় না। তাহারই গ্রামের লোক, উহাকে আজ দুপুরে ভালো করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

কাজল বলিল—তুমি খেয়েদেয়ে একেবারে ওবেলা যাবে কিন্তু। মাংস খাও তো?

শিবু রায় আকর্ণ হাসিল।—আজ্ঞে, খাই বইকি। খুব ভালোবাসি। তবে পাচ্ছি কোথায়? আমরা গরিব-গুরবো লোক, মাংস কি কিনে খেতে পারি? আজ আপনার দয়ায়—

শিবুর উচ্ছ্বাসকে বাড়িতে না দিয়া কাজল ব্যাগ হাতে বাজারে বাহিরে হইল।

দুপুরে খাইবার সময় বোঝা গেল সকালে শিবুর জলখাবার খাইবার যে বহর দেখিয়া কাজল বিস্মিত হইয়াছিল, সেটা শিবুর প্রকৃত আহারগ্রহণ ক্ষমতার সামান্য ভূমিকামাত্র। আর একটু হইলেই কাজলকে সে-বেলা সপরিবারে উপবাসে থাকিতে হইত।

বেলা তিনটা নাগাদ শিবু ফিরিবার ট্রেন ধরিবার জন্য তৈরি হইয়া হৈমন্তীকে বলিল—ভালো কথা কাকীমা, আপনাদের অনেক জমি তো গ্রামে এমনি পড়ে রয়েছে, কাউকে দিয়ে চাষ করান না কেন? গ্রামের ভেতরের জমিতে তৈরি তবি-তরকারি লাগালে ভালো ফসল পেতেন। ফেলে রেখে লাভ কী? কখন বেদখল হয়ে যায়—বুঝলেন না?

হৈমন্তী বলিল—ওসব ঝামেলা কে করে বাবা? আমার তেমন লোক কই?

শিবু হাতজোড় করিয়া বলল—কেন, আমিই তো আছি কাকীমা। আপনাদের পুরোনো ভিটের পাশ দিয়ে যদি এখন বেগুনের চারা বসানো যায় তাহলে এবাব শীতে বেগুন খেয়ে শেষ করতে পারবেন না। দিন দেখি আমায় পঞ্চাশটা টাকা, আমি ভুঁই তৈরি করে চারা বসিয়ে দেব। তদারকও আমিই করব। ফসল অর্ধেক আমার, অর্ধেক আপনার।

কথাটা হৈমন্তীর ভালো লাগিল। বেগুন এমন কিছু জিনিস নয়, কিন্তু নিজেদের জমিতে তাহা উৎপন্ন হইবে ভাবিলে আনন্দ হয়। টাকা দিলে গরিব লোকটারও কিছু উপকার করা হইবে। নিজ শ্রমের বিনিময়ে শিবু শীতকালে কিছু উপার্জন করিয়া লইতে পারিবে।

হৈমন্তী তাহার হাতে পঞ্চাশটা টাকা দিল।

পনেরো-কুড়িদিন বাদে বাদে শিবু আসিতে লাগিল। প্রথমবার আসিয়া সে বলিল—চারা লাগানো হয়ে গিয়েছে কাকীমা। অনেকদিন পড়ে থাকা ভুঁই, চারা লাগানোমাত্র চট্ করে ধরে নিয়েছে, একেবারে তনতন করে বাড়ছে। তা গোটাকুড়ি টাকা যদি দেন তো বড়ো ভালো হয়, পাহারা দেবার জন্য একটা ছোঁড়াকে লাগাবো। এই বয়েসে রাত জাগতে পাবিনে আর—

টাকা পাইয়া সে চলিয়া গেল।

দিনকুড়ি বাদে আবার আসিয়া হাজির। হৈমন্তী বলিল—কী বাবা, জমির খবর কী?

—ওঃ, খুব ভালো কাকীমা। গাছে বেগুন ধরেছে। দেখবেন এখন এক-একখানা কেমন নি-কাঁটা মুক্তকেশী বেগুন হবে। ইয়ে হয়েছে, গোটা পঁচিশ টাকা যে দরকার—

—আবার টাকা কী হবে?

—নিড়েন দিতে হবে জমিতে। আগাছায় ভরে যাচ্ছে। একা কি আর পারি?

মোট টাকা যা গেল প্রাপ্ত ফসলের দামের সহিত তাহার সঙ্গতি থাকিবে না বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু এখন আর থামা যায় না।

শীতের প্রায় মাঝামাঝি শিবু সের দুই মাঝারি আকারের বেগুন গামছায় বাঁধিয়া আনিল।

—কাকীমা, নিন জমির বেগুন। খেয়ে দেখবেন কেমন স্বাদ।

ফসল তুলিবার খরচ বাবদ কুড়ি টাকা লইয়া সে বিদায় হইল।

হৈমন্তী জমির প্রথম ফসল পাইয়া ভারি খুশি। ভাগ্যিস শিবু ছিল।

কিন্তু শিবু আর আসিল না। ফসলের আকাঙ্ক্ষিত বাকি বস্তাও আসিয়া পৌঁছাইল না। খবর লইয়া জানা গেল পুরোনো ভিটের জমিতে একটিও বেগুনচারা বসে নাই। শিবু ওই দুই সের বেগুন আষাঢুর হাট হইতে কিনিয়া আনিয়াছিল। বর্তমানে সে চুরি করিয়া জেলে আছে।

কাজলদের পারিবারিক কৃষি-উদ্যোগ সে বৎসর বেগুনের মরশুমের সঙ্গেই শেষ হইয়া গেল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

ঋতুর বদলের সময় যখন এলোমেলো বাতাস বয়, ঘরের মধ্যে সূর্যের আলো কেমনভাবে যেন আসিয়া মেঝেতে পড়ে, চিরদিনের চেনা পৃথিবীকে অদেখা সৌন্দর্যের জগৎ বলিয়া মনে হয়, ফাল্‌গুন মাসের তেমনই এক উন্মনা দিনে তুলির প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। কলিকাতায় বিমলেন্দু একা, কাজেই মাতুলালয়ে প্রথম সন্তান হইবার অলিখিত একটা প্রথা থাকিলেও এক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হইল না। হৈমন্তীর তত্ত্বাবধানে হেমন্তবাবুর হাতে কাজলের পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল।

কাজল একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেল। গৃহস্থবাড়িতে মাঝেমধ্যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ইহা সত্য, কিন্তু সংবাদপত্রে পঠিত খবরের মতোই এ সত্যকে সে চিবকাল নৈর্ব্যক্তিক ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। বড়ো বড়ো খবর সব অপরের জীবনেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এ আবার কী! একটা সঠিক স্থানে হাত-পা-যুক্ত সত্যকারের মানবশিশু তাহাদের বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করিল যে। শুধু তাহাই নয়, মাঝে মাঝে কাঁদে, ঘুমায় এবং অত্যন্ত সরল উপায়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকে। অদ্ভুত কথা বটে!

সেই সঙ্গে একটু ঈর্ষাও হইল। তুলি একান্তভাবে তাহার, তুলিকে পাশে বসাইয়া সে কবিতা পড়িয়া শুনাইবে, গল্প করিবে, বেড়াইতে লইয়া যাইবে—যেরূপ এতদিন হইয়া আসিতেছে। এ আবার কে একটা আসিয়া জুটিল, দিব্যি তুলির পাশে শুইয়া ঘুমাইয়া আছে। তাহার অধিকারবোধে ভয়ানক আঘাত লাগিল। ক্ষুদ্র মানবটির উপর প্রতিশোধ লইবার কোনো উপায় নাই, প্রতিহিংসার ইচ্ছাটা সে তুলির উপর অকারণ অভিমান করিয়া পূরণ করিতে লাগিল। ঘবে বেশি আসে না, আসিলেও কাঠ-কাঠ কথা বলে, কিছুক্ষণ উসখুস করিয়া উঠিয়া চলিয়া যায। তুলি বুদ্ধিমতী বটে, কিন্তু সরল। তার বুদ্ধি সহজ বুদ্ধি, কোনো বিশ্লেষণ বা মারপ্যাঁচের ধার দিয়া যায় না। সে কাজলের আচরণের তারতম্য অনুভব করিল বটে, কিন্তু কারণটা ঠিকঠাক ধরিতে পারিল না। নিজের সহজ বুদ্ধি অনুসারে ভাবিল ছেলেকে স্বামীব কোলে দিলে হয়তো মেঘ কিছুটা কাটিবে। একদিন সকালে জলখাবার খাইবার পর কাজল তুলির ঘরে গেল। সন্তান হইবার পর তুলির শরীর এখনও ভালো করিয়া সারিয়া ওঠে নাই, ডাক্তারবাবু বলিয়াছেন কিছুদিন টানা বিশ্রাম লইতে। সে ছেলেকে বুকের কাছে লইয়া শুইয়া আছে, হালকাভাবে ছেলের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে।

আর ছেলেটা! নির্লজ্জ ছেলেটা সরল উপায়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে।

ইহাদের দুইজনের আহ্লাদী ভাব দেখিয়া কাজলের গা জ্বলিয়া গেল।

তাহাকে দেখিয়া তুলি বলিল—এসো, এইখানটায় বোসো। বাব্বাঃ, আজকাল তোমার কী হয়েছে, একেবারেই আসো না, কথা বলো না—কী এত কাজ তোমার?

কাজল কিছুটা অনিচ্ছুকভাবে সন্তর্পণে খাটের পাশে বসিল। তুলি বলিল—খোকনসোনাকে কোলে নাও না গো, কী রকম বাপ তুমি, ছেলেকে আদর করতে ইচ্ছে করে না? নাও, কোলে নাও—

কাজল চক্ষুলজ্জার খাতিরে যথাসম্ভব সংস্পর্শ বাঁচাইয়া ছেলেকে কোলে লইয়া দু-একটা প্রথাগত আদরের মিষ্টবাক্য বলিল। তুলি খুশি হইয়া বলিল—বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে।

কাজল রসিকতা করিবার চেষ্টায় বলিল—কাকে? আমাকে?

তুলি অম্লানবদনে বলিল—না না, আমি খোকনসোনার কথা বলছি—

তিক্তরসে কাজলের মন ভরিয়া গেল। হায়, তাহার জীবনের আনন্দের দিনগুলি বোধহয় ফুরাইল!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কোলের কাছে একধরনের উষ্ণ এবং সান্দ্র অনুভূতি তাহাকে সচকিত করিল। দুই হাতে ছেলেকে তুলিয়া কোলের দিকে তাকাইয়া কাজল বুঝিল, এখনি তাহাকে কাপড় বদলাইতে হইবে।

প্রথমটা তাহার ভয়ানক রাগ হইল। সকালবেলা দিব্য ফিটফাট জামাকাপড় পরিয়া বসিয়া আছি, পাজি ছেলেটা সবকিছু ভিজাইয়া কী কাণ্ডই না বাধাইল! তাহার উপর ব্যাপার দেখিয়া তুলি মজা পাইয়া খুব হাসিতেছে। নাঃ, জীবনে আর সুখ রহিল না।

তাহার ঠিক পরেই সেই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটিল। জীবনের দিকপরিবর্তনকারী ঘটনাটা।

তুলির কোলে ঝুপ করিয়া ছেলেকে নামাইতে গিয়া কাজলের চোখে পড়িল সন্তানের মুখ। যে উপলব্ধি ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বহির্জগতের সঙ্গে শিশুর যোগাযোগ ক্রমে বাড়িয়া ওঠে, সেই পর্যায়ে তাহার সন্তান এখনও পৌঁছায় নাই, কিন্তু বাহিরের সংবেদনের প্রতি সে সচেতন হইয়া উঠিতেছে। বাপের হাতে উপর হইতে নিচে দুইবার দোলা খাইয়া তাহার খুব মজা লাগিয়াছে, নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় নিজেকে সমর্পণ করিয়া কী অম্লান হাসিই না সে হাসিতেছে!

কাজলের বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। এই শিশুটির অম্লান হাসির সঙ্গে সৃষ্টির রহস্যময়তা মিশাইয়া আছে। সে ইহার স্রষ্টা। সে এবং তুলি। অকস্মাৎ নিজেকে তাহার ঈশ্বরের মতো শক্তিমান বলিয়া মনে হইল, আর সেই সঙ্গে অনুভব করিল সন্তানের প্রতি সুগভীর মমতার ও স্নেহের অনুভূতি কিংবা আরও বেশি কিছু, কী তাহা সে জানে না।

পিতৃত্বের অনুভূতির জোয়ার নিজস্ব তীব্রতায় কাজলকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

মায়ের কোলে না দিয়া ছেলেকে সে বুকের কাছে ধরিয়া বলিল—দেখেছ তোমার ছেলের কাণ্ড? কেবল দুষ্টুমি, ঠিক তোমার মতো—দুষ্টু মায়ের দুষ্টু ছা—

হৈমন্তী আনন্দে দিশাহারা হইয়া গেল। কাজলকে সে একেবারে শিশু অবস্থায় পায় নাই, একটি শিশুকে সম্পূর্ণ নিজের হাতে মানুষ করিয়া তুলিবার যে সুপ্ত কামনা নারীর মনে সেই পুতুলখেলার সময় হইতে লুকাইয়া থাকে, হৈমন্তীর সে কামনা পূর্ণ হয় নাই। পৌত্রের মধ্য দিয়া এইবার তাহা সার্থকতা লাভ করিল। দুইমাসের শিশুর ভিতর সে এমন সব গুণ আবিষ্কার করিতে লাগিল বাস্তবে যাহার মাথামুণ্ডু কিছুই নাই। পৃথিবীতে আর কোনো শিশু এমন করিয়া হাসে না, এমন করিয়া হাত-পা নাড়ে না, এমন বুদ্ধিমানের মতো তাকায় না! তাহার নাতি ছাড়া দুনিয়ার আর সব শিশুকে মা-লক্ষ্মীর বাহনের মতো দেখিতে! যে এইসব মতের বিরোধিতা করে, সে ঈর্ষায় জ্বলিতেছে বলিয়াই সেইরূপ করে! ব্যাপার দেখিয়া কাজলের হাসি পাইত। তাহার মা গল্প লেখে, বাবার একখানা বড়ো জীবনী লিখিতেছে, উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তি করে, মা তো আর যে-সে লোক নয়—সেই মায়ের এমন কাণ্ড! নাঃ, স্নেহ সত্যই অতি বিষম বস্তু!

ছেলে একটু বড়ো হইবার সঙ্গে সঙ্গে কাজল তুলিকে আবার অনেকখানি ফিরিয়া পাইল, কারণ নাতির ভার প্রায় সবটাই হৈমন্তী নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছে। সকালবেলা ভালো করিয়া আলো ফুটিবার আগেই ছেলে জাগিয়া ভয়ানক চেঁচামেচি শুরু করে। পৃথিবী ভোরের আলোয় তখনও চোখ মেলে নাই, তুলিকে জাগাইতে কাজলের মায়া হয়, সে নিজেই ছেলেকে কোলে লইয়া বারান্দায় পায়চারি করে, বলে—ওই দেখ্ কেমন একটা পাখি, ওই নিমগাছের ডালে। কি পাখি জানিস? ওটা হল কাক—

ছেলে বড়ো বড়ো চোখ করিয়া অবাক বিস্ময়ে কাক দেখে। এই আলো-পাখি-গানের জগতে

সে সদ্য আগত। সবই তাহার ভালো লাগে। পাঁচিলের ওপর দিয়া বিড়াল হাঁটিতেছে, উঠানের মাটিতে গাছের পাতার ফাঁক দিয়া আলোছায়ার খেলা, ছেঁড়া খবরের কাগজের একটা টুকরা বাতাসে উড়িয়া কোথায় ভাসিয়া গেল—সবই বেশ কেমন সুন্দর।

নাতির কোলাহলে হৈমন্তী বারান্দায় আসিয়া বলে—দে, আমার কোলে দে। তুই ঘুমুবি আর একটু?

—না মা, উঠেই যখন পড়েছি, বরং লেখাটা একটু এগিয়ে রাখি।

হৈমন্তী নাতিকে কোলে লইয়া উঠানের ছোটো বাগানে নামিয়া পড়ে। একধারে একটা আমগাছ আছে। অল্পবয়েসে কাজল আম খাইয়া আঁটি পুঁতিয়া দিয়াছিল। তাহা হইতে বেশ বড়ো গাছ হইয়াছে, গত বৎসর হইতে ফলও ধরিতেছে। পৌষের শেষ হইতে মঞ্জরী আসে, ফাল্গুনের প্রথমে বউলের মাতাল করা গন্ধ পরিবেশকে আকুল করিয়া তোলে। একটা মাঝারি ধরনের কৃষ্ণচূড়া আছে। আর আছে রঙ্গন, টগর, কলাবতী, হৈমন্তীর শখ করিয়া পোঁতা বড়ো এলাচের ঝাড়। মাধবীলতা বারান্দার থামকে আশ্রয় করিয়া প্রায় কুঞ্জবন সৃষ্টি করিয়াছে। নাতিকে কোলে লইয়া হৈমন্তী শিশিরে ভেজা ঘাসের ওপর দিয়া বেড়ায়, কতরকমের ছড়া বলে।

ঘরে ঢুকিয়া কাজল দেখে ইতিমধ্যে তুলির ঘুম ভাঙিয়াছে, চায়ের জল চড়ানো হইযাছে। কাজল মুগ্ধ দৃষ্টিতে কর্মরতা স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া থাকে। কিছু কিছু মেয়েকে ঘুম হইতে উঠিলে দেখিতে ভালো লাগে না, কেমন যেন বিশ্রস্ত আলুথালু চেহারা হইয়া থাকে, কিন্তু তুলি সবসময়েই অপরূপা। বরং ঘুম ভাঙবার পর ঈষৎ নিদ্রা জড়াইয়া থাকা তাহাব মুখের দিকে তাকাইলে অকস্মাৎ তাক লাগিয়া যায়। সদ্যনিদ্রোত্থিতা তুলিকে দেবীর মতো মনে হয়।

তুলি ঠোঁট টিপিয়া হাসিয়া বলিল—কী দেখছ অমন করে শুনি?

—রাজকন্যা দেখছি। গরিব মানুষ, রাজকন্যে তো আগে কখনও দেখিনি—

—সাহস তো কম নয়! কোথাকার কে ঠিক নেই, লুকিয়ে রাজার মেয়ে দেখা হচ্ছে!

কাজল কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—শুধু কি দেখা? একেবারে হরণ করে এনেছি।

—যাও, কী হচ্ছে! মা এক্ষুনি আসবে ঘরে।

জীবন বেশ সুন্দর। রোজ পোলাও-কালিয়া-মাংস খাইতে হয় না, ভালো ভালো জামাকাপড় পরিয়া গাড়িতে চড়িয়া বেড়াইতেও হয় না, ডাল-ভাত খাইয়া সাধারণভাবে জীবনযাপন করাটাই বড়ো আনন্দের। রোজ সকালে যে সূর্য উঠিতেছে, পাখি ডাকিতেছে, কষ্ট দুঃখ উল্লাস মিলাইয়া জীবনের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তাহা আশ্চর্যের নয়? শোক দুঃখ বঞ্চনা আছেই, বাঁচিতে গেলে তাহার বিরুদ্ধে লড়াইও করিতে হইবে, কিন্তু সমস্ত আঘাত আর বিরুদ্ধতার মধ্যেও জীবন আনন্দের। জীবনের জন্য লড়াই, যেন লড়াইটাই প্রধান হইয়া না দাঁড়ায়—তাহা হইলে গৃহকোণের এই সরল সুখ, শিশুর গায়ের ঘ্রাণ, প্রিয়ার উষ্ণ সান্নিধ্য সব মিথ্যা হইয়া যাইবে।

তুলি তাহাকে সেই সরল সুখের সন্ধান দিয়াছে।

চা আসিল। সকালের প্রথম চায়ের কাপটির গভীর প্রারম্ভিক মূল্য আছে। ধূমায়িত কাপ হাতে লইয়া কাজল বলিল—বোসো তুলি, চা খেতে খেতে গল্প করা যাক—

কাজের পৃথিবীটা তাহার বাস্তব চেহারা লইয়া পুরোপুরি জাগিয়া উঠিবার আগে যে একটা স্নিগ্ধ অবকাশ থাকে, এখন সেই দৈবী সময়। কত কী মনে পড়ে, সারাদিন ধরিয়া অয়নপথে সূর্যের পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দিক হইতে রৌদ্র আসিয়া পৃথিবীর গায়ে এলাইয়া থাকে, বুকের মধ্যে অদ্ভুত এক আনন্দের জন্ম দেয়—সে কথা কাহাকেও ঠিকমত বুঝাইয়া বলা যায় না।

কোথায় যেন যাইবার কথা ছিল। সেখানে গেলে মনে শান্তি আসিবে, পরিপূর্ণতা ফিরিবে।

কাজল বলিল—চল, একবার নিশ্চিন্দিপুর থেকে ঘুরে আসি। সেই বিয়ের পরপরই যা গিয়েছিলে, আর তো যাওয়া হয়নি। যাবে? বড্ড মন কেমন করছে দেশের জন্য—

তুলি বলিল—তুমি বল কবে যাবে। ভালোই তো, অনেকদিন কোথাও বেরুনো হয়নি। কিন্তু সেদিনই তো আর ফেরা যাবে না, খোকা কি মায়ের কাছে থাকতে পারবে?

—কেন পারবে না? ও আমাদের চাইতে ঠাকুমার কাছে থাকাই বেশি পছন্দ করে—

হৈমন্তীও মত দিল, বলিল—যা, ঘুরেই আয়। খোকন আমার কাছে বেশ থাকবে। তাছাড়া উষা রয়েছে, ওকে আমার ঘরে বিছানা পেতে শুতে বলব এখন। একদিনের তো ব্যাপার—

—হ্যাঁ মা, আমরা পরের দিন সন্ধের মধ্যেই ফিরে আসব।

হৈমন্তীর শরীর ইদানীং আগের চাইতেও ভাঙিয়া পড়িয়াছে। তুলি তাহাকে সংসারের সব কাজে সহায়তা করে, কিন্তু কাজও তো বাড়িয়া গিয়াছে অনেক, বিশেষ করিয়া কাজলের সন্তান হইবার পর। পরিচিত এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে উষা নামে একটি মেয়েকে পাওয়া গিয়াছে, সে ঘরের কাজকর্ম দেখে, খোকাকে দেখাশুনা করে, প্রয়োজন হইলে কোলে লইয়া ঘুম পাড়ায়। হৈমন্তীকে একেবারে একা থাকিতে হইবে না।

পরের সোমবার কী একটা পর্ব উপলক্ষে ইস্কুল ছুটি ছিল। রবিবার সকালে কাজল তুলিকে লইয়া নিশ্চিন্দিপুর রওনা হইল। সঙ্গে রানুর জন্য একটা ভালো শাড়ি লইয়াছে। গতবার রানুর সহিত দেখা হয় নাই, সে কোন এক অসুস্থ আত্মীয়াকে দেখিতে কৃষ্ণনগর গিয়াছিল। বৌ দেখিতে পায় নাই বলিয়া অনেক দুঃখ করিয়া তাহার পর তিন-চারখানা চিঠি দিয়াছে। রানুপিসির সঙ্গে দেখা করাও কাজলের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

নিশ্চিন্দিপুরের সহিত বহু, বহুদিনের সঞ্চিত নানা স্মৃতি জড়াইয়া আছে। বসন্তের প্রথমে না-গরম না-ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে আরম্ভ করিলে, শুষ্কপত্রে গাছের তলা ভরিয়া থাকিলে মনের মধ্যে যে একটা কেমন করা ভাব জাগিয়া ওঠে, যাহার ঠিক কোনো ব্যাখ্যা হয় না, সেই রহস্যময় অনুভূতির সহিত প্রত্যেকবার নিশ্চিন্দিপুর যাইবার সময় তাহাব যে মনোভাব হয় তার মিল আছে। ঠাকুরদা হরিহর, তাহার বাবা, পিসি দুর্গা, ঠাকুমা সর্বজয়া—সবার হাসিকান্না মাখানো জীবনযাত্রার ইতিহাস দিয়া গ্রামখানি যেন এক রূপকথার জালে জড়ানো। বাস্তব নিশ্চিন্দিপুরের চাইতে এই ভাবরাজ্যের গ্রামটিই তাহার বেশি পরিচিত। চারিদিকে জীবন দ্রুত বদলাইতেছে। কিছুই আর আগের মতো থাকিবে না। কিন্তু তাহাদের এই গ্রাম, যে গ্রামকে তাহার বাবা ভালোবাসিয়া বিশ্বসাহিত্যে অমর করিয়া গিয়াছে, তাহা থাকিবে। বাহিরে যতই পরিবর্তন ঘটুক না কেন, মনের ভিতরের একটি শান্তিপূর্ণ গহন, গভীর কেন্দ্রে নিশ্চিন্দিপুর এক অপরিবর্তনীয় আশ্রয়ের প্রতীক হিসাবে বিরাজমান। এ যুগে সেখানে আর পৌঁছানো যায় না, তবু জীবনের সকল পদযাত্রার শেষে নিশ্চিন্দিপুর অপেক্ষা করিয়া থাকে।

তুলিকে দেখিয়া রানু আনন্দে অস্থির হইল। এটা করে, সেটা করে, কীভাবে যত্ন করিবে ভাবিয়া পায় না। তাহার অবস্থা এখন একটু ভালো, সংসারের কর্তৃত্ব অনেকখানি তাহারই হাতে। ছেলে বড়ো হইয়া কী যেন ব্যবসায় ভালোই উপার্জন করিতেছে, কাজেই ভাইয়ের সংসারে আগের মতো জুজু হইয়া থাকিবার প্রয়োজন হয় না। ছেলের বিবাহ দিবার কথাও ভাবিতেছে। সতুরও আগের সে দাপট নাই, ব্যবসায় ক্রমাগত লোকসান দিয়া সে এখন দিদির মুখাপেক্ষী। ভাগ্যচক্র এইভাবেই আবর্তিত হয় বটে!

দুপুরবেলা রানু তুলিকে লইয়া প্রতিবেশীদের বাড়ি বেড়াইতে যায়। কাজল একা গ্রামের পথে ঘুরিতে বাহির হয়। নীল আকাশের পটভূমিতে থোকা থোকা সাদা সজিনার ফুল ফুটিয়া আছে, ছোটবেলায় মতোই বিন্দুবৎ চিল ওড়ে। পথের পাশের জঙ্গল হইতে বন্য সুঘ্রাণ বাহির হয়। পৃথিবীটা একইরকম থাকে, কেবল মানুষ চলিয়া যায় কোথায়।

এই গ্রামের মাটিতে একজন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার বাবা, যে নশ্বর দেহে না থাকিয়াও

অনেকের অপেক্ষাই বেশি করিয়া বাঁচিয়া আছে। কাজল নিজে সাহিত্যের ছাত্র, সে নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করিতে পারে একটু একটু করিয়া দেশের মানুষের হৃদয়ে তাহার বাবার আসন আরও পাকা হইয়া আসিতেছে। আজ হইতে অনেক বছর কাটিয়া যাইবে, শতাব্দী অতিক্রান্ত হইবে, তখনও তাহার বাবার লেখা লোকে পড়িবে।

কেন?

না, তাহা সে জানে না। শুধু এইটুকু জানে যে, বাবার লেখা পড়িলে গঙ্গাস্নানের পবিত্রতা এবং তৃপ্তিলাভ হয়। কীভাবে লেখক এই অমরত্বের জাদু সৃষ্টি করেন তাহা কেহ বলিতে পারে কি? লেখে তো অনেকেই, অমর হয় কয়জন? দক্ষতা ও প্রতিভার রহস্য চিরঅভেদ্য।

একটা জিনিস সে উপলব্ধি করিতে শুরু করিয়াছে।

তাহার খুব বড়ো রকমের কিছু হওয়া ঘটিয়া উঠিবে না। লেখকের সন্তানের পক্ষে লেখক হওয়া নিতান্ত কঠিন। এমন কোনো আইন যে কোথাও লিপিবদ্ধ আছে তাহা নহে, কিন্তু সাধারণত ইহাই ঘটিয়া থাকে। সে পাহাড়ে চড়িতে পারিত, ফিলম তুলিতে, গান গাহিতে বা অভিনয় করিতে পারিত। কিন্তু সাহিত্যরচনার চেষ্টা করিলে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সে উদ্যোগ নিভিয়া যাইবে। কাহারও দোষ নাই, দোষ বিশ্বের নিয়মের।

অথবা তাহার দুর্মুখ বন্ধু সঞ্জয়ের কথাই কি ঠিক? সঞ্জয় বলিয়াছিল—ওহে, লেখা ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু করো। তোমার মধ্যে চেষ্টা বা প্রতিভা নেই তা বলছিনে, কিন্তু ইউ জাস্ট ডোন্ট হ্যাভ দি ফায়ার উইদিন ইউ। তোমার জীবনটা সফ্‌ট্। বিশেষ সংগ্রাম নেই, ক্ষোভ নেই, সামনের বড়ো কোনো প্রতিবন্ধকতা জয় করার দায় নেই—মোটামুটি খেয়ে পড়ে ভালোই আছ। ইউ হ্যাভ গন সফ্‌ট্। তুমি বইয়ের জগতে, ভাবের জগতে বাস করো। কোনো সমস্যা থাকলেও তা ওই ভাবজগতেরই সমস্যা। আমি একথা বলছি বলে আমাকে শত্রু ভেবো না, নিজের মনের মতো কথা না বললেই মানুষ সচরাচর বক্তাকে শত্রু ভাবে। আমি এ কথা বলছি যাতে ভবিষ্যতে তোমার হতাশা না আসে।

সবটা না হইলেও সঞ্জয়ের কথা কিছুটা হয়তো ঠিক।

কী আসে যায়? অনেক লেখা প্রকাশিত হইতেই হইবে, খ্যাতি পাইতেই হইবে এমন কোনো মাথার দিব্য কেহ দেয় নাই। ভালো লাগে বলিয়া লিখিতেছে, না ভালো লাগিলে বা কেহ না ছাপিলে আর লিখিবে না। বিশ্বনিকষের প্রেক্ষাপটে তাহার চেতনার আলোকবিন্দু ফুটিয়া উঠিয়াছে, যতদিন তাহা স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে জ্বলে, জ্বলুক না।

সে জানে এই জীবনদর্শন বিরূপ সমালোচনা আমন্ত্রণ করিয়া আনিবে, সঞ্জয় আবার হাসিয়া বলিবে—'সফট্, সফ্‌ট্ লাইফ।' তাহাতে দুঃখ নাই। এমন নিজের মতো করিয়া বাঁচিবার সুযোগই বা কজন পায়? বিশেষ করিয়া সে তো অন্য কাহারও ক্ষতি কবিতেছে না। অনন্তপ্রবাহে কেবলমাত্র ভাসিয়া চলিবারই যে কী আনন্দ!

বিকালে চা খাইবার সময় বাড়ি ফিরিয়া কাজল দেখিল রানুপিসিদের বসিবার ঘরে বেশ কয়েকজন লোক তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ব্যাপার কী? তাহাদের মধ্যে একজন বলিল—আমরা আজই সকালে খবর পেয়েছি আপনি এসেছেন। আমাদের পল্লীমঙ্গল সমিতির ঘরে আজ সন্ধেবেলা অপূর্ববাবুকে স্মরণ করার একটু ব্যবস্থা করেছি, মানে—আপনি এসেছেন শুনে সকাল থেকে লোকজনকে খবর দিয়ে সব আয়োজন করে ফেলুলম। আপনাকে কিন্তু আসতেই হবে। শুনলাম বউদিও এসেছেন, ওঁকেও আনবেন সঙ্গে দয়া করে।

দুদিনের জন্য নিজগ্রামে আসিয়া একটা সম্পূর্ণ সন্ধ্যা আটকাইয়া পড়িবার ইচ্ছা কাজলের ছিল না, কিন্তু তাহার জীবনে বাবার নাম সঞ্জীবনী মন্ত্রের মতো কাজ করে। তাহার বাবার জন্য একদল লোক সভার আয়োজন করিয়াছে, আর সে যাইবে না? নিশ্চয়ই যাইবে। সে বলিল—আপনারা রানুপিসিকেও যেতে বলুন, উনি বাবাকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—নিশ্চয়। আমরা ওঁকে বলে যাচ্ছি—

সন্ধ্যাবেলা তুলি আর রানুকে সঙ্গে লইয়া কাজল পল্লীমঙ্গল সমিতিতে উপস্থিত হইল। ওপরে লাল টালির ছাদ দেওয়া লম্বামতো ঘর। মেঝেতে শতরঞ্চি পাতিয়া বসিবার জায়গা করা হইয়াছে, বেশ কিছু মানুষ ইতিমধ্যেই জমা হইয়াছে। উদ্যোক্তা ভদ্রলোক, সকালে যাঁহার সঙ্গে কথা হইয়াছিল, বলিলেন—আসুন অমিতাভবাবু, আসুন বউদি। পিসিমাও এসেছেন তো? বসুন, বসুন এইখানে—

বাহিরে হেমন্তের শিশিরার্দ্র সন্ধ্যা নিবিড় হইয়া আসিতেছে। বক্তাদের কথা শুনিতে শুনিতে কাজল মাঝে মাঝে বাহিরে তাকাইয়া দেখিতেছিল। জীবনটা কী অদ্ভুত! এই গ্রামের পথে পথে শৈশবে খেলা করিয়া বেড়াইবার সময় তাহার বাবা কখনও কি ভাবিয়াছে যে, একদিন ভবিষ্যতের এক হেমন্ত-সন্ধ্যায় এই গ্রামেই তাহার স্মরণে সভা হইবে? বাবার, ঠাকুরদার সাহিত্যচর্চা আজ সার্থক হইল।

মায়ের কাছে রাখিয়া আসা সন্তানের কথা মনে পড়িল। খোকাকে নিশ্চিন্দিপুরে আনিয়া কিছুদিন রাখিতে হইবে। এই গ্রাম তাহাব সন্তানেব ন্যায্য উত্তরাধিকার, ইহা হইতে সে ছেলেকে বঞ্চিত করিবে না। যদিও সে গ্রাম আর নাই, তবু—

বক্তারা বেশিরভাগই এলোমেলো কথা বলিতেছে, তাহাদের উচ্ছ্বাস যতটা, গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতা ততটা নহে। তবু কাজলের খারাপ লাগিল না। যাহাই হউক, ইহারা তাহার বাবাকে ভালোবাসিয়াই তো সভার আয়োজন করিয়াছে।

সভা শেষ হইলে অন্ধকার গ্রাম্য পথ দিয়া তাহারা বাড়ি ফেরে । চালতা আর জামরুল গাছের ফাঁক দিয়া অসংখ্য নক্ষত্রখচিত আকাশ চোখে পড়ে। বর্ষাকাল চলিয়া গিয়াছে, ধূলিমুক্ত আকাশ বিপুল বিস্তারে প্রসারিত হইয়া আছে। দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত আলোর নদীর মতো ছায়াপথ, যাহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি আলোর গতিতে যাইতে সময় লাগে ত্রিশ হাজার বৎসর। এই দুর্বোধ্য বিশালত্বের মধ্যে সে, তাহার বাবা, তুলি, সাহিত্য-সংস্কৃতি-সভ্যতা-বিজ্ঞান এবং জীবনের আর যা যা কাম্য সার্থকতা। মানবসভ্যতা বাঁচিলেই বা কী, না বাঁচিলেই বা কী? এই অনাদ্যন্ত 'বিশ্বজগৎটা একইভাবে নৈর্ব্যক্তিক ঔদাসীন্যের সঙ্গে বর্তমান থাকিবে।

পরের দিন খুব ভোরে তুলিকে লইয়া সে নদীর ধারে গেল।

তখনও সূর্য ওঠে নাই। প্রভাতের দৈবী আলো পৃথিবীতে ছড়াইয়া আছে। নদীর জলে স্রোতের মৃদু টান। স্রোতাভিমুখী সরু সরু লম্বা জলজ শ্যাওলা জলের টানে সামান্য কাঁপিতেছে। যদি মানুষ লোভের বশে, হিংসা, ক্ষমতা বা হঠকারিতার বশে পৃথিবীটাকে বসবাসের অযোগ্য করিয়া না ফেলে, তাহা হইলে এই শান্ত, সুন্দর সকাল আরও অনেক আসিবে। সে যখন পাঁচশত বৎসর অতীত ইতিহাসের গর্ভে, তখনও আসিবে।

খেয়া পারাপার এখনও শুরু হয় নাই। পারের নৌকা জলের কিনারে নদীতে পোঁতা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা আছে। জলের উপর দিয়া বহিয়া আসা বাতাস সমস্ত শরীব কেমন জুড়াইয়া দেয়। ওই যে ওখানে প্রায় জল ছুঁইয়া একটা পাখি ওপারের দিকে উড়িয়া গেল। কী পাখি ওটা?

আজ একটু পরেই স্ত্রীকে লইয়া তাহাকে শহরে ফিরিয়া যাইতে হইবে, কিন্তু তাহাব সমস্ত চেতনা আর ভালোবাসা থাকিয়া যাইবে এই গ্রামের পথের বাঁকে। চিরদিন বসবাসের জন্য আর ফিরিয়া আসা হয়তো ঘটিবে না, কিন্তু মহীরূহ যত উর্ধ্বে মাথা তুলুক, তাহার শিকড় থাকিয়া যায় মৃত্তিকার গভীরে।

তুলি বলিল—কী সুন্দর, না?

—ভালো লাগছে তোমার?

—হুঁ।

—তাহলে এ সবই তোমাকে উপহার দিলাম।

সময় কাটিতে থাকে। যে জীবনে নাটকীয়তা থাকে, দুর্যোগ, উত্থান-পতন কিংবা তীব্র গতি থাকে, তেমন জীবন কাজল বাছিয়া লয় নাই। এই বিশ্বকে সে ভালোবাসিয়াছে, দুর্বোধ্য রহস্যে ভরা এই বিশ্বজগৎটার দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টি লইয়া তাকাইয়াছে, তাহাতেই সে তৃপ্ত। লোকে অবশ্য কবির ভাষায় তাহার সম্বন্ধে বলিতে পারে—'অল্প একটু হেসে-খেলেই ভরে যায় এর মনের জঠর,' বলুক—তাতে কিছু আসে যায় না। বিশুদ্ধ আনন্দলাভ জীবনের পরম উদ্দেশ্য, বিস্ময় মনের সবচেয়ে পুষ্টিকর খাদ্য।

র‍্যান্ডম হাউস প্রকাশিত একখানি প্রবন্ধের সংকলন পড়িতে পড়িতে চার্লস ল্যাম-এর জীবনীর এক জায়গায় তাহার চোখ আটকাইয়া গেল। নিজের জীবনের সাদামাটা অকিঞ্চিৎকর সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ল্যাম লিখিতেছেন যে, উল্লেখ করিবার মতো কিছুই তাঁহার জীবনে ঘটে নাই। কেবলমাত্র একবার এক পার্কে বসিয়া থাকিবার সময় খপ করিয়া হাত বাড়াইয়া একটি উড়ন্ত চড়াই পাখি ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহাকে যদি 'ঘটনা' বা 'সাফল্য' বলা যায়, বলা যাইতে পারে।

সুন্দর কথা। মনের মতো কথা। ভূমাতে আনন্দ নাই, সারল্যেই আনন্দ।

খোকা বড়ো হইতেছে। এখন সে গুট গুট করিয়া সারাবাড়ি হাঁটিয়া বেড়ায়, ঠাকুমার কোলে হেলান দিয়ে রূপকথার গল্প শোনে। রাত্রিতে বিছানায় বসিয়া বই পড়িতে পড়িতে কাজল ঘুমন্ত ছেলের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখে। ঠিক যেন তুলির মুখের আদল। ঠোঁটের চমৎকার ভঙ্গি, রেশমের মতো চুল, বড়ো বড়ো চোখের নিষ্পাপ দৃষ্টি। শেক্সপীয়ারের সনেটগুলির কথা মনে পড়িল, সন্তানের ভিতর দিয়াই তো জীবনের প্রবাহ আর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে। আজ হইতে অর্ধশতাব্দী পরে সে থাকিবে না, খোকা থাকিবে।

প্রথম যৌবনের তারল্য কাটিয়া তাহার জীবনে একটা সুসংবদ্ধ স্থিতির ভাব আসিতেছে। এখন মনে হয় হৈ চৈ, আনন্দ, অর্থ, খ্যাতি কিংবা ক্ষমতাই সার্থকতার নামান্তর নয়। নাটক-নভেল আর পড়িতে ভালো লাগে না, ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান বা মহাপুরুষদের স্মৃতিকথা পড়িতে ইচ্ছা করে। সে মধ্যবয়সে পৌঁছাইল নাকি?

একটা ভয়ের ব্যাপার হইয়াছে।

আগে সে নদীর ধারে গিয়া বসিলে জলের শব্দের মধ্যে অনন্তের বাঁশি শুনিতে পাইত, তারাভরা আকাশের দিকে তাকাইলে অসীম শূন্যের পথহীন গভীরতায় সে কবিতার পংক্তি খুঁজিয়া পাইত। এখন জল শুধুই জল, রাত্রির কালো আকাশ কেবলমাত্রই খানিকটা আলোকহীনতা। জীবনের দম ফুরাইয়া গেল নাকি?

কিছুই জানা হইল না। ইস্কুল জীবনের শেষের দিকে বা কলেজে পড়ার সময় যখন জীবন আর অস্তিত্ব সম্বন্ধে যাবতীয় প্রশ্ন ধীরে ধীরে জন্ম লইতেছিল, সে সময় মনে হইয়াছিল বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত রহস্য সে ভেদ করিয়া ফেলিবে। সামনে এত বড়ো জীবনটা পড়িয়া আছে, সে কত পড়িবে, জানিবে, হয়তো তাহারই জন্য সবকিছু অপেক্ষা করিয়া আছে। এখন সে বুঝিতে পারিয়াছে খুব জোরে দৌড়াইলেই দিগন্তকে স্পর্শ করা যায় না।

কাজল ভূতের গল্প পড়িতে ভালোবাসে। অ্যালজারনন ব্ল্যাকউডের লেখা তাহার খুব প্রিয়। ব্ল্যাকউডের একটি গল্প পড়িতে গিয়া একজায়গায় লেখকের বক্তব্য তাহার মনে হঠাৎ নাড়া দিল। এক শিক্ষকের মুখ দিয়া লেখক বলাইতেছেন—What was the use of all this? What in the world was the good of all the labour and drudgery one goes through? Wherein lay the value of so much uncertain toil when the ultimate secrets of life were hidden

and no one knew the final goal? How foolish was effort, discipline, work! How vain was pleasure! How trivial the noblest life!

অদ্ভুত ব্যাপার। আজ কয়েকদিন ধরিয়া যে অনির্দেশ্যতা তাহাকে কষ্ট দিতেছে, তাহারই নির্যাস যেন ব্ল্যাকউড চোখের সামনে তুলিয়া ধরিলেন। সত্যই তো, কী লাভ পরিশ্রম করিয়া? কী লাভ খ্যাতিতে, প্রতিষ্ঠায়, অধ্যয়নে? সব তো অন্ধকারই থাকিয়া যাবে। মৃত্যু সমস্ত উদ্যোগের অবশ্যম্ভাবী সমাপ্তি।

নদীর স্রোতে আর কোনো গান নাই। দিগন্তের ওপারে কোনো দেশ নাই।

বছরখানেক আগে পুরানো বইয়ের দোকান হইতে নীটশের 'দাস স্পেক জরথুস্ট' পাঁচসিকা দামে কিনিয়াছিল। ভালো লাগে নাই বলিয়া পড়া বেশিদূর অগ্রসর হয় নাই। একদিন রাত্রিবেলা বইখানা লইয়া বিছানায় শুইল। পাশে তুলি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ওপাশে খোকা। মধ্যরাত্রির জীবন্ত স্তব্ধতা থমথম করিতেছে। তাহারই ভিতরে নীটশে আসিয়া বিছানার পাশে বসিলেন। বলিলেন, সুপারম্যান থিয়োরির কথা, ঈশ্বরের অনস্তিত্বের কথা। কোনো উদ্যোগেরই কোনো মূল্য নাই, কারণ পৃথিবীতে কিছুই নতুন ঘটিতেছে না। ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি করিতেছে মাত্র। বিশ্বে মানুষের অস্তিত্ব, দেশ ও কালের মধ্যে বস্তুবিশ্বের অস্তিত্ব, সমস্ত অর্থহীন। তাৎপর্যহীন বিশ্বে সে একটা তাৎপর্যহীন, ক্লান্তিকর জীবন বহন করিয়া চলিতেছে।

নীটশে পড়িতে পড়িতে রাগ হয়, আজন্মলালিত বিশ্বাস এবং সংস্কার একেবারে ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়, কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের নিরেট যুক্তির বিরুদ্ধে কিছুই করিবার থাকে না। পণ্ডিতের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না বলিয়াই ভয়টা আরও চাপিয়া বসে।

অন্ধকারে ডুবিয়া যাইবার অসহায় মুহূর্তে একটি তুচ্ছ ঘটনা তাহাকে রক্ষা করিল।

একদিন বিকালে তুলির ঘরে ঢুকিয়া কাজল দেখিল কোলের কাছে একরাশ বকুল ফুল লইয়া তুলি মালা গাঁথিতেছে। কাজল বলিল—কী ব্যাপার, হঠাৎ মালা গাঁথছো যে?

তুলি হাসিয়া বলিল—উষার মা দিয়ে গিয়েছে। সকালে মেয়েকে দেখতে এসেছিল, বলল—বৌমা, এই নাও, আমাদের উঠোনের গাছের ফুল—তোমার জন্য এনেছি। বাবা বকুলফুল খুব ভালোবাসতেন, তাই না? মালা গেঁথে বাবার ছবিতে পরিয়ে দেব—

তুলি একটি একটি করিয়া ফুল লইয়া ছুঁচের মাথায় গাঁথিয়া সুতায় পরাইতেছে। তাহার মুখে নিবিষ্ট মনোযোগ। কাজল কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিল।

এমনিতে বেশ সুন্দর পরিচিত একটি গার্হস্থ্য দৃশ্য। একজন গৃহবধূ আপনমনে বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছে। এই দৃশ্য লইয়া কত কবিতা লেখা হইয়াছে, কত শিল্পী ছবি আঁকিয়াছে, কত তরুণ এই দৃশ্য দেখিয়া অজানা নায়িকাকে প্রাণমন সমর্পণ করিযাছে।

কিন্তু রোম্যান্টিক অস্বচ্ছতা সরাইয়া ভিতরে তাকাও। সব মিথ্যা। অর্থহীন।

চরাচরব্যাপী কিছু না-র মধ্যে কেন বস্তুর আবির্ভাব? ঈশ্বরের পরিকল্পনা? বেশ, কে ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তা? কারণ অনুপস্থিত, কিন্তু কার্য ঘটিতেছে এমন তো মানা যায় না।

তুলি মুখ তুলিয়া কাজলকে দেখিতে পাইয়া বলিল—একটু এসো না, এইখানে বসে আমাকে একটা করে ফুল এগিয়ে দাও—

কাজল অন্যমনস্কভাবে খাটের একপাশে বসিল। একটি করিয়া বকুলফুল সে তুলির হাতে দেয়, তুলি সেটিকে ছুঁচে গাঁথিয়া আবার হাত বাড়ায়। দেখিতে দেখিতে সুন্দর একটি মালা গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

একটু পরে কাজল অবাক হইয়া দেখিল বসিয়া বসিয়া ফুল হাতে তুলিয়া দেওয়ার মতো আপাত নীরস এবং একঘেয়ে কাজও তেমন খারাপ লাগিতেছে না। বরং মালাটি ক্রমে বড়ো হইয়া

উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের নিবিড় তৃপ্তি চেতনার মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ফুল ছিল, ছুঁচ ও সূতা ছিল, কিন্তু মালাটি এই বিশ্বে কোথাও ছিল না। সেটি মানুষের নির্মাণ, রিক্তহস্ত মানুষের সবচেয়ে বড়ো গৌরব।

যখন আলো কমিয়া আসিয়াছে, তখনও দুজনে বসিয়া শেষ কয়েকটি ফুল সূতায় পরাইতেছে। দুজনের মাথা প্রায় এক হইয়া গিয়াছে।

অজস্র বকুলের বেশ বড়ো একটা মালা হইল। তুলি বলিল—চল তো, চেয়ারে দাঁড়িয়ে বাবার ছবিতে পরিয়ে দেবে। আমি হাত পাই নে—

রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়া মিটিলে হৈমন্তী খোকাকে তাহার কাছে লইয়া গেল। তুলি মশারির একটা কোণ খুলিয়া ওদিকে সরাইয়া দিয়া বলিল—আজ কিন্তু এখনি ঘুমোব না। এসো, দুজনে মিলে লুডো খেলি—

লুডো জিনিসটা কাজল মোটেই ভালোবাসে না, কিন্তু তুলির আগ্রহ দেখিয়া সে রাজি হইল। তুলির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা তাহার পক্ষে কঠিন।

খেলা আরম্ভ হইল। তুলির লাল ঘুঁটি, তাহার সবুজ। কাজল তুলির হইয়া তাহার ঘুঁটি চালিয়া দিতে লাগিল। তুলি কৌটা নাড়িয়া চাল দেয়, কতর দান পড়িয়াছে দেখিয়া কাজল তুলির ঘুঁটি আগাইয়া দেয়। তুলি সরল ও সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, দান চালিয়া সে স্বামীর দিকে তাকাইয়া বসিযা থাকে, কতক্ষণে সে ঘুঁটি চালিবে।

একবার কাজলের ছয় পড়িল, আর একবার চালিতেই দুই। মোট আট। কাজল দেখিল যে ঘুঁটি তাহার মধ্যপথে আছে তাহা আটঘর অগ্রসর হইলে তুলির প্রায় পাকা একটি ঘুঁটি মারা পড়ে। সে দ্রুত ভাবিয়া নতুন একটি ঘুঁটি ঘর হইতে ছযের দানে বাহিব করিয়া মধ্যপথে থাকা ঘুঁটিখানা দুইঘর আগাইয়া দিল। তুলির খেলা কি নষ্ট করা যায়?

তুলি এই সূক্ষ্ম আত্মদানের মহিমা কিছুই বুঝিল না, বলিল—যাক, তোমার একটা ঘুঁটি বের হল। তোমার এত কম ছয় পড়ে কেন বল তো?

কয়েকদান পরে তুলির পাঁচ পড়িল। ছয় পড়িলে একটি ঘুঁটি ঘবে উঠিতে পারিত। কাজল ঘুঁটি হাতে লইয়া একঘর আগাইয়া গুনিল—এক, দুই, দুই, তিন, চাব আর এই হল পাঁচ। বাঃ উঠে গেল!

তুলি ভারি খুশি হইল। পরক্ষণেই তাহার মনে হইল সে জিতিতেছে মানেই স্বামী হারিতেছে। স্বামীব পবাজয়ে এতটা খুশি হওয়া বোধহয় ভালো দেখাইতেছে না। সে বলিল—লুডো খুব সোজা খেলা। তুমি একটু মনোযোগ দিয়ে খেললেই জিততে পারবে—

গভীর রাত্রিতে একবার ঘুম ভাঙিযা কাজল দেখিল মাথাব কাছের জানালা দিযা বিছানায় মৃদু জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। খোকা ঘুমের মধ্যে একবাব হাসিযা উঠিল। তুলির নিঃশ্বাসের শব্দ।

বিশ্ব নিবর্থক, দেশ-কাল স্বপ্নমাত্র, বাঁচা মানে বুদ্ধিহীন কালযাপন। কিন্তু তাহারই ভিতর মানুষ খেলা করে। খেলাই আসল। মানুষের নিজস্ব নির্মাণ। বকুলফুলের মালাটির মতো।

মমতাহীন যান্ত্রিক বিশ্বের উদ্দেশে প্রতিস্পর্ধী মানুষেব নান্দনিক উত্তর।

সেদিন কলিকাতায় কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে স্কুলজীবনের এক বন্ধুর সহিত কাজলের দেখা হইয়া গেল। বন্ধু সামনে ঝুঁকিয়া ফুটপাতের এক পুস্তক-বিক্রেতার সাজাইয়া রাখা বইয়ের স্তূপের মধ্যে কী খুঁজিতেছিল। কাজল তাহার পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল—কী রে রাখাল, কী খবর? আর যাতায়াত করিস না, এক্কেবারে ডুব দিয়ে বসে আছিস কেন?

রাখাল চাপড় খাইয়া প্রথমে অবাক হইয়া পেছন ফিরিয়া তাকাইল, তাহার পর খুশি হইয়া বলিল—আরে অমিতাভ! কেমন আছিস? এখানে কী করছিস?

—বাবার পাবলিশারের কাছে এসেছিলাম। মাঝে মাঝে আসি। তুই?

-ছেলের বই কিনছি রে ভাই। সব নতুন বই কেনার রেস্ত নেই, আমার উপার্জন তো জানিস।

—ছেলে কোন ক্লাসে পড়ে?

—এইটে। আর মেয়ে থ্রি-তে।

—মেয়েও আছে বুঝি?

রাখাল অবাক হইয়া তাকাইল, বলিল—তুই তো শালা দেখছি বুদ্ধুই রয়ে গেলি। মেয়ে না থাকলে সে ক্লাস থ্রি-তে পড়ছে কী করে?

যুক্তির সারবত্তা কাজলকে স্বীকার করিতে হইল।

রাখালের চরিত্র বিশেষ বদলায় নাই। সে এখনও হৈ-হৈ করিয়া কথা বলে, অনর্গল ভুল ইংরাজিতে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা গেল সে এখনও বড়ো লেখক হইবার আসা পোষণ করে, রোজ একটি করিয়া কবিতা লেখে এবং তিন-চারপাতা করিয়া গদ্যরচনা করে। একখানি উপন্যাস নাকি শেষ হইয়া আসিল বলিয়া।

কাজল বলিল—বাঃ, সাহিত্যসাধনা চালিয়ে যাচ্ছিস শুনে ভালো লাগছে—

রাখাল উৎসাহ পাইয়া বলিল—ভালো না? তুই বন্ধু মানুষ তাই অ্যাপ্রিসিয়েট করলি। পাড়ার লোক আমাকে পাগল বলে। অন্তত পনেরো-কুড়িটা ভালো গল্প লেখা হয়ে গিয়েছে। এবার সেগুলো এক এক করে কাগজে পাঠাতে আরম্ভ করব। ওরা গল্প ছাপলে টাকা দেয়, জানিস? টাকাটা জমিয়ে রাখব, বিপদের সময় 'হ্যান্ডস ফাইভ' থাকবে।

হা ঈশ্বর! সরল বন্ধুকে সে বাস্তব পৃথিবীর জটিলতা কী বোঝাইবে? লেখা ছাপানো কি অত সহজ? নাকি লিখিয়া উপার্জন করা কেবলমাত্র লেখকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে? কিন্তু যুক্তির আঘাতে রাখালের স্বপ্নের স্বর্গ ভাঙিয়া দিতে তাহার ইচ্ছা করিল না।

সে বলিল—চল, কিছু খাওয়া যাক। অনেকদিন একসঙ্গে বসে খাওয়া হয়নি—

বন্ধুকে লইয়া কাজল মির্জাপুর স্ট্রীটের পুঁটিরামের দোকানে ঢুকিল। ভিতরের রান্নাঘর হইতে রাধাবল্লভি ভাজিবার সুঘ্রাণ ভাসিয়া আসিতেছে। কাজল চারখানা করিয়া রাধাবল্লভি দিতে বলিয়া কোণের একটা টেবিলে বসিল। রাখাল হুস্‌হাস্ শব্দ করিয়া গরম রাধাবল্লভি নিমেষে খাইয়া ফেলিল, দুইবার বাড়তি ডাল চাহিয়া লইল।

কাজল বলিল—তোকে আর চারখানা দিক?

রাখাল সাগ্রহে সম্মতি জানাইল। বলিল—একেবারে হাতে গরম, যাকে বলে খোলা টু নোলা। বেশ লাগছে খেতে। আসলে এ সময়ে কোনোদিন এত জমিয়ে খাওয়া হয় না, বুঝলি? কাজ থেকে ফেরবার সময় সামান্য মুড়ি আর সস্‌কুইটো—ব্যস!

কাজল অবাক হইয়া বলিল—সস্‌কুইটো আবার কী?

—বাঃ, তুই যেন কী! মশা মসকুইটো হলে শশা সস্‌কুইটো নয়?

এ যুক্তিও কাজল বিনা আপত্তিতে মানিয়া লইল।

পুঁটিরাম হইতে বাহির হইয়া রাখাল বলিল—তুই এত ভালো খাওয়ালি, আমার তো কিছু প্রতিদান দেওয়া উচিত। চল, গোলদীঘির বেঞ্চিতে বসে, তোকে কবিতা শোনাই—

সর্বনাশ! কাজল ব্যস্ত হইয়া রাখালকে বোঝাইতে লাগিল যে, বন্ধুত্বের নিঃস্বার্থ শুভ্রতার মধ্যে দান-প্রতিদানের কালিমা ডাকিয়া আনা কোনো কাজের কথা নহে, রাখালের কিছুমাত্র সংকোচের কারণ নাই। বিশেষ করিয়া তাহাকে পৌনে পাঁচটার লোকাল ধরিতেই হইবে।

দেখা গেল রাখাল সরল বাংলা বোঝে না। কাজলের আপত্তিতে কিছুমাত্র কান না দিয়া সে তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে গোলদীঘিতে আনিয়া বসাইল। জীর্ণ ব্যাগ খুলিয়া মার্বেল কাগজ দিয়া বাঁধানো একটা খাতা বাহির করিয়া একের পর এক কবিতা পড়িয়া যাইতে লাগিল।

কবিতাগুলির ভাব বাষ্পবৎ, বিষয়ের মাথামুণ্ড কিছুই নাই, ছন্দ তদ্‌বৎ। একটি কবিতা স্বদেশপ্রেম দিয়া শুরু হইয়া দুর্গাপূজা দিয়া শেষ হইয়াছে। পর্যুদস্ত, হতাশ কাজল মুখে একধরনের স্থায়ী উল্লাস ফুটাইয়া মনে মনে অন্য কথা ভাবিতে লাগিল।

দশ-বারোটা কবিতা পড়িবার পর রাখাল থামিল। বলিল—আজ এই পর্যন্ত থাক। আজ সঙ্গে গল্প নেই বলে শোনাতে পারলাম না। তুই দুঃখ করিস না, একদিন তোর বাড়িতে গিয়ে সকাল থেকে—বেশ হবে, না?

কাজলের মুখের ভাব অত্যন্ত করুণ হইয়া আসিয়াছিল, আবছা গলায় সে কী বলিল ভালো বোঝা গেল না। তাহাকেই সম্মতি ধরিয়া লইয়া রাখাল বলিল—তাহলে ওই কথাই ঠিক থাকল। যাব শিগ্‌গীরই, বিলম্বে আর দেরি কেন, বল? চলি ভাই, গিয়ে লিখতে বসব—

যাইবার আগে হঠাৎ থামিয়া রাখাল কাজলের দিকে তাকাইয়া একটা অদ্ভুত কথা বলিল। রোগা, অনটনে ভোগা, সামান্য মানুষ রাখাল বলিল—জানিস অমিতাভ, খুব আনন্দে আছি, খুব মজায়। এমনিতে আমি কেমনভাবে বেঁচে আছি তা তো দেখছিস, টেনেটুনে সেলাই করে চালাই। সবার কাছে ছোট হয়ে থাকি। কিন্তু যখন লিখি, কিংবা লেখার কথা ভাবি—তখন মনের ভেতর কেমন যে একটা ভালো লাগা—সে তোকে বোঝাতে পারব না। তখন কে মনে রাখে কাল বাজার খরচ কোথা থেকে আসবে। বাড়িওয়ালা ভাড়ার তাগাদায় এলে তাকে কী বলব, এসব লেখা সত্যিই কোনদিন ছাপা হবে কী না, হলেও নাম হবে কী না। দূর! তখন শুধু লিখতেই ভালো লাগে, কী লিখব তাই ভাবতে ভালো লাগে। নইলে কী করে যে বাঁচতাম!

পিছন ফিরিয়া রাখাল ওই হাঁটিয়া চলিয়া যাইতেছে। কাজল তাকাইয়া রহিল। অনেক তথাকথিত বড়োমানুষ অপেক্ষা, দাম্ভিক ধনী অপেক্ষা বড়ো তাহার বন্ধু। আহা, রাখাল ভালো থাকুক, তাহার স্বপ্ন আর শান্তি চিরজীবী হউক।

পৃথিবীতে মানুষ বড়ো কষ্টে আছে। বাসনার আগুনে ইন্ধন নিক্ষেপ করিয়া সে শান্তির আশা করিতেছে। কাজল নিজের শরীরের ভিতর টের পায় নাই চারিদিকে দুনিয়া বদলাইয়া যাইতেছে। হাসিমুখে মানুষ বন্দীত্বের খাঁচার দিকে অগ্রসরমান। খাঁচাটা সোনার, তবু খাঁচাই।

আহা মানুষ! প্রিয় মানুষ, বোকা মানুষ!

পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য শান্তি চিরজীবী হউক।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

সেদিন স্নান করিয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইতে গিয়া কাজলের চোখে পড়িল একটি রূপালি সুতা।

আশ্চর্য! পাকাচুল নাকি?

হ্যাঁ, তাই বটে। ডানদিকে, কানের একটু ওপরে। পাকা চুল।

কাজল প্রথমে একটু অবাক হইল। তাহার পর হাসি পাইল। একটু ভয়ও করিল।

বাবার সঙ্গে সেই জাদুঘর দেখিতে যাওয়া। কলিকাতার বাড়িতে বাবার জ্বর, বারান্দার কোণে ঝুড়িতে বাবার প্রিয় পালং শাকের গোড়া শুকাইয়া যাইতে দেখিয়া বুকের ভিতর হু হু করিয়া ওঠা। মামাবাড়ির ঘাটে বাবাকে নৌকা হইতে নামিতে দেখিয়া সে কেমন দৌড়াইয়া গিয়া বাবার কোমর জড়াইয়া ধরিয়াছিল। শৈশব-কৈশোর-যৌবনের কত মায়াময় প্রভাত, প্রিয়জনের মুখ, কত হলুদ আলোয় ভরা অপরাহ্ন। সব তো এই সেদিনের কথা। সে-সব আর ফিরিবে না বুঝি? সে প্রৌঢ়ত্বের প্রথম ধাপে পৌঁছাইল তবে?

প্রকৃতির এই স্বাভাবিক নিয়ম। ক্রমে একদিন তাহার পায়ে বাত ধরিবে, দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসিবে, আশৈশব স্মৃতির উজ্জ্বল শরীরকে জড়াইয়া ধরিবে বিস্মৃতির ধূসর জাল। কিন্তু মনের মধ্যে যে শিশু বাস করে সে মানিতে চায় না। জীবনের প্রথম চশমাখানি হাতে লইয়া কমলাকান্তের যেমন মনোভাব হইয়াছিল, তাহারও তেমন হয়। যৌবনের উৎসবে আর তাহার নিমন্ত্রণ নাই। সূর্য পশ্চিম দিগন্তের দিকে নামিতেছে।

নাঃ, সে খামোকাই ভাবিয়া মরিতেছে। মানুষের গড় আয়ু আশি ধরিলে অবশ্য সে মধ্যবয়স পার হইয়াছে, কিন্তু তেতাল্লিশ বছব এমন কিছু বয়েস নহে। বার্ধক্য আসিতে এখনও অনেক দেরি। তবে হ্যাঁ, সেইসব হারানো দিন আর ফিরিবে না।

খোকা বড়ো হইয়া উঠিতেছে। বাড়িতে তাহার লেখাপড়া শুরু হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় ভাগ শেষ হইবার মুখে। স্লেট পেনসিল ধারাপাত লইয়া সকাল-বিকাল সে গম্ভীর মুখে ঠাকুমার কাছে পড়িতে বসে। ঘণ্টাখানেক পাঠাভ্যাস চলিবার পর দেখা যায় বইপত্র বিছানার একদিকে পড়িয়া আছে, খোকা ঠাকুমার কোলে হেলান দিয়া পা ছড়াইয়া গল্প শুনিতেছে। গল্পই বা কতরকমের। রূপকথার কাহিনী তো আছেই, তাহার সঙ্গে আছে মধুসূদনদাদার দইয়ের হাঁড়ির গল্প, অমাবস্যার রাতে গ্রামের অন্ধকার পথে গোভূতের গল্প—আর আছে খোকার ঠাকুরদার গল্প। সে গল্পই আসরের বেশিটা জুড়িয়া থাকে।

কাজল ছেলের নাম রাখিয়াছে সপ্তর্ষি। নামটা একটু প্রাচীন ভারতগন্ধী হইল বটে, কিন্তু কাজলের চিরদিনই ধ্রুপদী ব্যাপার পছন্দ। আজকাল সবাই কায়দা করিয়া নাম রাখা শুরু করিয়াছে—জয়, রাণা, কাবুল—এমন কী, এই নামই তাহাদের কর্মজীবনেও স্থায়ী হইতেছে। আলাদাভাবে পোশাকি নাম অনেক ক্ষেত্রেই আর ব্যবহৃত হয় না।

পরিবর্তন সর্বত্র আসিতেছে। বদল ভালো, স্থাণুত্ব জীবনেব পরিপন্থী। কিন্তু সে কি এই বদল? মানুয লঘু হইয়া যাইতেছে, অন্নময় হইযা যাইতেছে। যদি আবও খারাপের দিকে অবস্থা যায়? অন্ধকাব যদি আরও ঘনাইয়া আসে? তাহা হইলে এ কোন পৃথিবীতে সে তাহার সন্তানকে রাখিয়া যাইবে?

তাহার এবং তুলির দ্বিতীয় সন্তান আসিতেছে। অপুর নিঃসঙ্গ জীবন সংগ্রাম আর বঞ্চনা পরিপূর্ণতা লাভ করিতে চলিয়াছে উত্তবাধিকারীর সমাগমে। এখন নিজের কথা আর ততটা ভাবিতে ইচ্ছা করে না, কেবল মনে হয় যাহারা থাকিয়া যাইবে তাহাদের সমকাল সুগম হউক।

পৃথিবীটা কেমন যেন দুভাগ হইয়া গিয়াছে। একভাগে উজ্জ্বল আলো, নীল আকাশ, সৌরচরাচরে ব্যাপ্ত বাঁচিয়া থাকিবার সহজ আনন্দ। আর একদিকে অবকাশহীন, নীরন্ধ্র পাষাণময় কারাকক্ষের শতাব্দী সঞ্চিত অন্ধকার, পরশ্রীকাতরতা, অশিক্ষা, ঈর্ষার 'বিষময়' প্রকাশ। মৃদু পরিবেশে মানুষ হইয়া সে জগতের বাস্তব রূপ ততটা দেখে নাই, ভাবিয়াছিল জীবনের সবটাই গোলাপী রঙের আলোয় উদ্ভাসিত, সকলেই এখানে রবীন্দ্রনাথের গান গায়, চাঁদ উঠিলে সকলেই বনে যাইবার জন্য ব্যস্ত হয়।

না, জীবন ঠিক তেমন নয়। অপুর একটি ছোটগল্প হইতে ফিল্ম্ কবিবার জন্য এক পরিচালক ভদ্রলোক কিছুদিন ঘোরাফেরা করিতেছিলেন। একদিন তিনি কাজলকে লইয়া প্রোডিউসারের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন। বড়োবাজারেব কাছে দোতলায় একটা খুপরিমতো ঘর, টেবিল আর খানকতক চেয়ার ছাড়া ঘরে বিশেষ কোনো আসবাব নাই। ভদ্রলোকের কীসের ব্যবসা কাজল তাহা বুঝিতে পারিল না। ছবি তুলিতে অনেক টাকা লাগে, এইটুকু ঘরে কী ব্যবসা করিয়া অত টাকা রোজগার হয়?

প্রোডিউসার মাঝবয়েসী, পরনে শার্ট ও প্যান্ট। একটু শিথিল, থলথলে চেহারা। মুখে কুটিল বৈষয়িক বুদ্ধি এবং জীবনের অপরাপর ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতার ছাপ। তিনি কাজলকে

বলিলেন—বসুন, বসুন। মিঃ সেন বললেন আপনি আজ আসবেন—খুব ভালো হয়েছে। বাংলা গল্প আমি খুব ভালোবাসি। আপনার তো বয়স বেশি নয়, এত সুন্দর গল্প আপনি লিখেছেন? কতদিন লিখছেন আপনি?

একটু কাশিয়া মিঃ সেন, অর্থাৎ পরিচালক বলিলেন—শর্মাজী, গল্প এঁর নয়, এঁর বাবার লেখা। অবশ্য ইনিও ভালো লেখেন—

শর্মাজী বলিলেন—ও হো হো, সরি, আপনি অপূর্বচাঁদ বাবুর ছেলে?

কাজল বলিল—অপূর্বকুমার।

—সরি, সরি। কুমার। তা, উনি এলেন না? একটু আলাপ হয়ে যেত—

মিঃ সেনকে তাসের গোলামের মতো দেখাইতেছিল। বিবর্ণ হাসিয়া তিনি বলিলেন—শর্মাজী, অপূর্ববাবু মারা গিয়েছেন। আমি বলেছিলাম আপনাকে—

শর্মা একটুও বিব্রত হইলেন বলিয়া মনে হইল না। মুখে দুঃখসূচক চুক্ চুক্ শব্দ করিয়া বলিলেন—ও, মারা গিয়েছেন। হাঁ, শুনেছিলাম বটে। এত কাজের চাপ, কিছু আর মাথায় থাকে না। সরি।

কাজল অস্বস্তিকর প্রসঙ্গ এড়াইবার জন্য বলিল—কী কাজ আপনার?

শর্মা মিটমিট করিয়া হাসিলেন, বলিলেন—আপনি নিজের লোক, বলতে আপত্তি নেই। আমি একটু টাকাপয়সার কারবার করি—

কাজল ঠিক বুঝিল না। কারবারে টাকাপয়সা লাগে বটে, কিন্তু টাকাপয়সার কারবার কী?

কাজলের মুখের ভাব দেখিয়া শর্মা বলিলেন—বুঝলেন না? আমি যা করি তাকে বলে ফান্ড ম্যানেজমেন্ট। ধরুন রাম আমার কাছে মাসখানেকের জন্য দুলাখ টাকা চাইল, আমি শ্যামের কাছ থেকে টাকাটা ধার করে রামকে দিলাম। দশদিন পরে যদুর কাছ থেকে দুলাখ ধার করে শ্যামের টাকা মিটিয়ে দিলাম। সামান্য কিছু সুদ লাগল। পনেরো দিন পরে মধুর থেকে দুলাখ নিয়ে যদুর টাকা মিটিয়ে দিলাম। আবার সামান্য সুদ লাগল। একমাস পরে রাম সাড়ে বারো পার্সেন্ট সুদ আর টাকা ফেরত দিল। তার থেকে মধুর টাকা দিয়ে দিলাম। এই হাত ফেরতে আমার ছয় পার্সেন্ট সুদ অন্যদের দিতে হল, বাকি সাড়ে-ছয় আমার। সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার এই যে, বিজনেসটায় আমার নিজের কোনো টাকা লগ্নী হল না। এর টাকা ওকে দিয়ে মুফতে প্রফিট—

কাজল বলিল—আপনার মাধ্যমে না করে ওরা তো ডিরেক্ট ধার করতে পারে—

—না পারে না। কেউ দেবে না ওদের। আমার একটা গুডউইল আছে। তাছাড়া বিজনেসের চেন বলে একটা ব্যাপার আছে। বিজনেস চেন কেউ নষ্ট করবে না, সে বদনাম হয়ে যাবে—

—চেনের মাঝখানে কেউ যদি টাকা মেরে পালিয়ে যায়? কী করবেন তখন?

শর্মা আবার মিটমিট করিয়া হাসিলেন, বলিলেন—সেদিকে নো রিস্ক, আমি কোল্যাটেরাল কিছু রেখে টাকা দিই, শুধু হাতে দিই না।

কাজল এ ব্যবসার কিছুই জানে না। সে জিজ্ঞাসা করিল—কোল্যাটেরাল কী?

—মানে সিকিউরিটি। গোল্ড। কিংবা বাড়ির বা জমির দলিল। কারখানা বা বিজনেসের মালিকানার কাগজ। সময়মতো টাকা না মেটালে বাড়ি জমি বিজনেস আমার—

—এমন হয়েছে?

—বেশি না? দুবার। টাকা ফেরত পেলে সাড়ে-ছয় কী সাত পার্সেন্ট থাকত, এতে থেকে গেল টুয়েন্টি সেভেন পার্সেন্ট। তবে কী জানেন, এ বিজনেসে পয়সা আছে, নাম নেই। সিনেমা করলে লোকে বলবে ওই দেখ শর্মা যাচ্ছে, ও একটা ভালো সিনেমা প্রোডিউস করেছে। নাম হবে, প্রেস্টিজ বাড়বে। তবে হাঁ, সিনেমায় রিসক্ বেশি। যদি ফ্লপ করল, বাজারে চলল না, তাহলে তামাম ডুবল। সেইজন্যে তো মিঃ সেনকে বেছেছি, মিঃ সেনের সিনেমা বাজারে খুব চলে। লোকে খুব দেখে।

কাজের সময় কিন্তু দেখা গেল খ্যাতির অভিলাষী শর্মা লেখককে বেশি পয়সা দিতে একেবারে রাজি নহেন। অমায়িক হাসিয়া বলিলেন—নিয়ে নিন। আপনার তো কোনো ইনভেস্টমেন্ট নেই, আটআনার কাগজ আর চারপয়সার কালি। ধরুন যদি পিকচার লেগে যায়, তাহলে আরও কত সিনেমা তৈরি হবে আপনার বাবার—

রাস্তায় বাহির হইয়া পরিচালক ভদ্রলোক লজ্জামিশ্রিত গলায় কাজলকে বলিলেন—কিছু মনে করবেন না, এরা শিল্প-সংস্কৃতির ধার ধারে না তো—নেহাত আমার লাস্ট ছবিটা বাজারে ভালো চলেছে, একটু নাম হয়েছে, তাই আমাকে দিয়ে ছবি করাতে চাইছে। যাতে টাকা না ডোবে। নইলে ও কি আমাকেই পাত্তা দেবার লোক?

কাজলের মন কেমন সংকুচিত হইয়া গিয়াছিল। মনে পড়িতেছিল—তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারেবারে, পণ্ডিতেব মূঢ়তায় ধনীর দৈন্যেব অত্যাচাবে, সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে—

স্থূল বৈষয়িকতার কী নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ! কেমন হাসিয়া লোকটা বলিল—বিজনেস আর আমি কী করলাম বলুন, ও তো করলেন আপনি। সব মিলিয়ে আমি লাগাব আড়াই লাখ, তিন লাখ। ঝুঁকি নেব, ফিলম চলবে কী চলবে না ভগবান জানে। তারপর হল তো খুব বেশি বিশ-পঁচিশ পার্সেন্ট। আপনার ইনভেস্টমেন্ট আটআনা, প্রফিট টু থাউজ্যান্ড টাইমস্! হাঃ হাঃ হাঃ—

কাজল বলিল—আব ইনটেলেকচুযাল ইনভেস্টমেন্ট? সেটাব দাম?

অবাক হইয়া শর্মা বলিলেন—সেটা কী?

হাসিয়া কাজল বলিল—কিছু না। ওটা একটা নন-কমার্শিয়াল টার্ম।

শর্মা নিশ্চিন্ত হইলেন।

কোথায় কাব্য-সাহিত্য, কোথায় তাহার দরিদ্র বাবাব চালভাজা খাইযা আনন্দ কবিবাব ইতিহাস। অর্থই সব। অর্থনীতিব নিয়মের ওপর ভিত্তি করিয়াই মানবসভ্যতার অধিষ্ঠান। বাকি সব কথার কথা। মূল্যহীন।

তখনই আবার কে মনের মধ্যে কথা বলিয়া ওঠে। আশাব বাণী শোনায, প্রলোভনে স্থিব থাকিতে বলে। যাঁর হাতে কাল অন্তহীন, সেই দেবতাব বিচাবে আস্থা বাখিতে বলে। সমসামযিকত্বেব ঊর্ধ্বে শাশ্বত জীবন বিদ্যমান। তাহার ছবি আঁকে।

বাড়ি ফিরিতে সন্ধ্যা। বারান্দায় আলো জ্বলিতেছে, জানালায তুলিব পছন্দ কবা হালকা বঙেব পর্দা। ওই তাহার গৃহ। সারাদিন অচেনা, বিষয়োন্মত্ত পৃথিবীর সঙ্গে নিদাবুণ পবিচযেব পর ওইখানে তাহার শান্তির আশ্রয়।

দরজার কাছেই ছেলে বসিয়া কযেকটা রঙ-চটা টিনেব খেলনা আব মাটিব পুতুল লইযা খেলা করিতেছে। সারাদিন পর বাবাকে দেখিয়া সে একগাল হাসিল।

কাজল বলিল—কী খেলছিস রে খোকা? ওঃ, সব খেলনা বেব কবেছিস।

খোকা বলিল—এটা জঙ্গল। এখানে—এই দেখ হাতি, বাঘ, হরিণ সব আছে। বাঘ আর হবিণ এদিকে থাকে, এদিকে থাকে হাতি আর জিরাফ—

—সে কী রে! বাঘ আর হরিণ একসঙ্গে থাকবে। বাঘ হবিণকে খেযে ফেলবে তো—

খোকা এতটা ভাবিয়া দেখে নাই। তাহার জগতে হিংসা থাকিবার কথা নয়। একটু ভাবিয়া সে বলিল—আচ্ছা, আমি বারণ করে দেব। ওরা লক্ষ্মী হয়ে থাকবে।

কাজল মনে মনে বলিল—আশীর্বাদ কবি বাবা, তুই যেন তাই পাবিস। পৃথিবীর বড়ো কষ্ট, তোর বেঁধে দেওয়া নিয়মে যেন শান্তি নেমে আসে—

কাজলের গলা শুনিয়া হৈমন্তী আসিয়া দাঁড়াইল, পেছনে পেছনে তুলি।

কাজল কাঁধের ঝোলা ব্যাগ হইতে টাকাভবা খামটা বাহির করিয়া মায়ের হাতে দিয়া বলিল—

আজ বাবার সিনেমার কনট্রাক্‌টটা হয়ে গেল মা। টাকাটা রেখে দাও। একশো টাকা আমি নিয়েছি। বই কিনেছি, তোমার জন্য বালুসাই আর অমৃতি কিনেছি—

হৈমন্তী বলিল—বৌমার জন্য কিছু কিনিস নি?

কাজল একটু কাশিয়া বলিল—সে আছে। সে এমন কিছু না—ওকে পরে দেব এখন—

হৈমন্তীর পেছন হইতে তুলি মুখ টিপিয়া হাসিল।

হাতমুখ ধুইবার জন্য ঘরে ঢুকিতে গিয়া কাজল দেখিল খোকন তাহার সামান্য খেলনার ভাণ্ডার লইয়া তন্ময় হইয়া খেলা করিতেছে। তাহার মুখে সরল আনন্দ।

সার্থকতা আর আনন্দ পাইবার জন্য শর্মাকে লক্ষ টাকা নিয়োগ করিতে হয়। তাহার খোকার মূলধন মাটির পুতুল। মুনাফা শতকরা একশো ভাগ।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রাবণমাসের প্রথম সপ্তাহে তুলির দ্বিতীয় পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। কাজল আশা করিয়াছিল এবার মেয়ে হইবে। তুলির কাছে একদিন সেকথা বলিতে তুলি বলিল—নাঃ, আমার মেয়ে ভালো লাগে না। তুমি যেন কী!

—কেন, মেয়ে হলে কেমন সাজিয়ে মজা! ভালো ভালো ফ্রক, শাড়ি, ফিতে, স্নো-পাউডার, গয়না সব কিনে দেব। ভালো করে লেখাপড়া শেখাব। তাছাড়া মেয়েরা বাপ-মায়ের যেমন সেবা করে ছেলেরা তেমন পারে না—

তুলি অবুঝ জেদের গলায় বলিল—না, মেয়ে না। আমি ছেলে চাই—

কাজল জিনিসটাকে মেয়েদের স্বাভাবিক পুত্রসন্তান কামনা মনে করিয়া কী একটা রসিকতা করিতে যাইতেছিল। হঠাৎ তাহার চোখ পড়িল স্ত্রীর দিকে। তুলি বিবর্ণমুখে কেমন যেন শক্ত হইয়া বসিয়া আছে। সচরাচর সে কোনো বিষয়ে জেদ করে না, তাহার স্বভাবে তিক্ততাও নাই। সে এমন স্বরে কথা বলিতেছে কেন?

হঠাৎ সে বুঝিতে পারিল।

নিজের বঞ্চিতা মায়ের কষ্ট, অপমান আর পরাধীনতার কথা তুলির মনে পড়িয়াছে। সে নিজে মেয়ে, বিবাহিত জীবনে সে সুখীও বটে, কিন্তু তবু তুলি কন্যাসন্তান চায় না।

বাংলাদেশের চিরকালের অভিশাপ। তবে দিন বদলাইতেছে। বদল সব যেমন ভালো নয় আবার সব খারাপও নয়। নারী পূর্ণ মর্যাদা পাইবে এমন দিন আসিতেছে। সবটা সে দেখিয়া যাইতে পারিবে না। তাহার ছেলেরা দেখিবে।

অপুর খ্যাতি ক্রমে পাঠকদের মধ্যে সকালের আলোর মতো ছড়াইয়া পড়িতেছে। বড়ো বড়ো সমালোচক, সম্পাদক আর অধ্যাপকেরা তাহাকে চিরকালের ধ্রুপদী সাহিত্যিক বলিয়া প্রবন্ধ লিখিতেছেন, ক্লাসে বক্তৃতা দিতেছেন! স্বাধীনতার পরে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় সাহিত্যের প্রচারের জন্য সংস্থা করিয়াছেন, সেখান হইতে অপুর বই বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হইয়া বাহির হইতেছে। স্কুলের, কলেজের আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে উঠিয়াছে। স্টপ্ গ্যাপে কখনও স্কুলে বাংলার ক্লাস লইতে গেলে ছাত্ররা বলে—'স্যার, আপনার বাবার পিসটা পড়ান'। পড়ানো শেষ হইলে বলে—'বাবার গল্প বলুন স্যার, আমরা শুনবো'—কাহারও সঙ্গে নতুন আলাপ হইলে মানুষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকায়।

কাজল মনে মনে হাসিয়া ভাবে—আমি হলাম চাঁদের মতো, অন্য জ্যোতিষ্কের আলোয় উজ্জ্বল। লোকে আমাকে সম্মান দেয়, আমার বাবার খাতিরে। আমার বোধহয় আর কিছু হল না—

মনের মধ্যে একটু কষ্ট হয় কি? হয় বোধহয়। কিন্তু গৌরব আর আনন্দ তুলনায় এত বেশি যে, বিষণ্ণতা সেখানে কোনো দাগ ফেলিতে পারে না।

বাবার প্রতি তাহার মনোভাব সে কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারিবে না। পারিবাহিক সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ-মধুর অনুভূতি তো আছেই, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অনেক বড়ো কিছু মনকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। বাবা কেবল শৈশবের জয়গান গায় নাই, কিংবা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে নিমগ্ন থাকে নাই—যেমন অনেক পাঠক মনে করে। অস্তিত্ব আর জীবনের গূঢ়তম রহস্যের দিকে বাবা পুলকিত বিস্ময় লইয়া তাকাইয়াছে। চেষ্টা করিয়াছে, তাহাব সঙ্গে সকলকে সেই আনন্দময় জগতের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাইয়া দিতে। আগামী বহু শতাব্দীতেও তাহার বাবার মতো সাহিত্যিক আর আসিবে না।

গেলই না হয় একটা জীবন বড়ো একজন লেখকেব ছায়ায় ছায়ায়। সে তাহার বলিবাব কথা লিখিয়া রাখিয়া যাইবে, সে পাঠকেরা গ্রহণ করুক আব নাই কবুক। কিন্তু একথা সত্য যে, শত বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও জীবন বড়ো সুন্দর। বড়ো আনন্দের।

একদিন স্কুল হইতে ফিরিয়া কাজল দ্বিজেনবাবুর একখানা চিঠি পাইল। তিনি অবিলম্বে একবার দেখা করিতে বলিযাছেন। জরুবি প্রয়োজন।

পরের দিনই কাজল কলকাতায গেল। বসু ও গুহ পাবলিশার্সের ঘরে আরামকেদাবায আজ প্রমথবাবু আসীন। পাশেব চেয়ারে দ্বিজেনবাবু বসিয়া সুযোগের অপেক্ষায় আছেন। কাজল ঢুকিতে ঢুকিতে শুনিল দ্বিজেনবাবু বলিতেছেন—যাও না প্রমথ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে কী কিনতে যাবে বলছিলে। দেরি না করে এইবেলা ঘুরে এস—

কথায় ভুলিয়া বন্ধু একবার বাহির হইলেই হয়! অমনি সন্ধ্যার মতো কেদারা দখল।

কিন্তু প্রমথবাবু বন্ধুকে আশৈশব চেনেন। তিনি উদাস গলায় বলিলেন—যাব'খন। পবে যাব—

কৌশল বিফল হওয়ায় দ্বিজেনবাবু চটিয়া পা নাচাইতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়েই কাজল ঘরে ঢুকিল। দ্বিজেনবাবু বলিলেন—এই যে তুমি এসেছ, আমাব চিঠি পেয়েছ তো?

কাজল দুজনকে প্রণাম কবিযা বলিল—চিঠি পেয়েই তো আসছি। কী ব্যাপার কাকাবাবু?

—বোসো, বলছি। অপূর্ববাবুর দিনলিপির প্রোডাকশন কেমন লাগল?

—খুব ভালো কাকাবাবু। কভার, ছাপা সবই ভালো। কেমন চলছে বইখানা?

—ভালো। কিছুটা সেইজন্যই তোমাকে ডাকা। তোমাব বাবাব ডায়েবি আমরা একটু দ্বিধা নিয়ে ছেপেছিলাম সেকথা স্বীকার করছি। প্রমথ ছাড়া সবাই ভয দেখিযেছিল। কিন্তু প্রমাণিত হযেছে অপূর্ববাবু সম্বন্ধে আমাদের ধারণাই সঠিক।

কাজল চুপ করিয়া রহিল।

মাথার উপরে পুরানো ডিসি পাখাটা শব্দ কবিয়া ঘুবিতেছে।

দ্বিজেনবাবু বলিলেন—আমরা তোমার বাবার রচনাবলী প্রকাশ কবতে চাই।

কাজল অবাক হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইল। সে ঠিক শুনিতেছে তো? রচনাবলী! তাহার বাবার! রচনাবলী তো রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র এঁদের বাহির হয়। মানে, যাঁদের ছবি ক্যালেন্ডারে থাকে। বাবা সেইখানে পৌঁছাইয়া গেল নাকি?

প্রমথবাবু বলিলেন—আমরা মোটামুটি একটা স্কীমও করে ফেলেছি। সমস্ত সেটটা দশ ভল্যুমে কমপ্লিট হবে। তোমার মা রাজি হলেই আমরা গ্রাহকভুক্তির জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেব—

কাজল বলিল—বাবার রচনাবলী! দশ ভল্যুমে! খুব আনন্দের কথা কাকাবাবু, কিন্তু জিনিসটা কমার্সিয়ালি ভায়েব্‌ল্ হবে তো? বাবার বই এমনিতে ভালোই বিক্রি হয় জানি, পাঠকেরা বাবাকে ভালোবাসে। কিন্তু রচনাবলী অন্য জিনিস। আপনারা কিন্তু ভেবে দেখুন—

দ্বিজেনবাবু বলিলেন—আমরা ভেবে দেখেছি। অপূর্ববাবুকে আমরা ভালোবাসি ঠিকই কিন্তু এই ব্যবসাটাও আমাদের চালাতে হয়। বাজারে চলবে না এমন বই আমরা ছাপাই না। তোমার বাবার যুগ এসে গিয়েছে কাজল। আধুনিক লেখকদের মধ্যে ওঁরই প্রথম রচনাবলী হবে—

প্রমথবাবু বলিলেন—দশ খণ্ডে কী থাকবে তা আমরা ছকে ফেলেছি। দেখাচ্ছি তোমাকে—

দেয়ালের গায়ে বইয়ের তাকে রাখা ব্যাগ হইতে কাগজখানি বাহির করিবার জন্য তিনি উঠিতেই টুক করিয়া দ্বিজেনবাবু চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। কাগজ বাহির করিয়া পেছন ফিরিয়া প্রমথবাবু বলিলেন—এই যে, দেখ—উপন্যাসগুলো ক্রোনোলজি ফলো করে—এ কী! এ তো ভারি—যাঃ!

দ্বিজেনবাবু নির্বিকার। পৃথিবীতে কোথাও কোনো অশান্তি নাই। তিনি কাগজ পড়িতেছেন।

সমস্ত পরিকল্পনাটা কাজল বুঝিয়া লইল। মা কখনওই আপত্তি করিবে না। তবু সে বলিল মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে সামনের সপ্তাহেই আবার আসিবে।

মাসখানেকের মধ্যে সমস্ত বাংলা সংবাদপত্র আর সাময়িকপত্রে অপূর্বকুমার রায়-এর রচনাবলীর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল। সকলেই যে খুশি হইল এমন নহে, তবে কাজল পৃথিবীর আসল রূপ অনেকটা দেখিয়া ফেলিয়াছে, সে অবাক হইল না।

বিজ্ঞাপন বাহির হইবার কিছুদিন পরে কাজল বসু ও গুহ পাবলিশার্সে গেল। তাহাকে দেখিয়া দ্বিজেনবাবু খুশি হইয়া বলিলেন—এই যে, এসো এসো। আবার তোমাকে একটা চিঠি দেব ভাবছিলাম। তা তুমি এসেই পড়েছ—

—কেন কাকাবাবু?

দ্বিজেনবাবু আনন্দের হাসি হাসিয়া বলিলেন—আমাদের ধারণাই ঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। সবাই বলেছিল অপূর্ববাবুর রচনাবলী ছাপছেন, আপনাদের কি পয়সা বেশি হয়েছে? কী দেখেছেন মশাই ও লেখকের মধ্যে? হ্যাঁ, একটা দুটো বই দাঁড়িয়ে গিয়েছে তা স্বীকার করি। কিন্তু তা বলে রচনাবলী? ও জিনিস বাজারে কাটবে না—

কাজল ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—বিজ্ঞাপনের ফিডব্যাক কী রকম কাকাবাবু?

—ভালো। খুব ভালো। এর মধ্যেই আমরা পাঁচহাজার গ্রাহক পেয়েছি। শুধু মুখে নয়, রীতিমত টাকা জমা দিয়ে নাম লিখিয়েছে। প্রথম খণ্ড বেরুবার আগে আরও কিছু পাব আশা রাখি। এইবাব বুঝলে এই সবজান্তা পণ্ডিতেরা কত মূর্খ? দু একজন এসে গ্রাহকদের লাইন দেখে পালিয়ে গিয়েছে, আমাদের সঙ্গে আর দেখা করেনি।

অপুর রচনাবলীর প্রথম খণ্ড বাহির হইবার দিন বসু ও গুহ পাবলিশার্স একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন। বাংলা সাহিত্যের নামি লেখকেরা ছাড়াও অনেক সাধারণ পাঠকের দল আসিয়া ভিড় জমাইল। কাজল হৈমন্তী আর তুলিকেও সঙ্গে আনিয়াছিল। মানুষের ভিড় দেখিয়া তুলি চুপি চুপি স্বামীকে বলিল—উঃ! অনেক লোক হয়েছে, তাই না?

হৈমন্তীর চোখে জল। সে সভা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। এতটা সে আশা করে নাই।

অপুর একটা ভালো ছবি দ্বিজেনবাবু কাজলের কাছে চাহিয়া লইয়াছিলেন। সেটি বড়ো করিয়া বাঁধাইয়া মঞ্চে রাখা হইয়াছে। সভাপতি একজন প্রবীণ সাহিত্যিক, তিনি অপুর ছবিতে মালা দিয়া পাশে রাখা প্রদীপ জ্বালাইয়া সভার উদ্বোধন করিলেন।

কাজলের মনে হইল মালা পরিয়া বাবা যেন হাসিতেছে। কী সুন্দর দেখাইতেছে বাবাকে। কত লোক তো সে জীবনে দেখিল, তাহার বাবার মতো কি কেহ দেখিতে সুন্দর?

একের পর এক বক্তা উঠিয়া অপুর সাহিত্য সম্বন্ধে বলিতেছেন। শুনিতে শুনিতে কাজলের যেমন ভালো লাগিতেছিল, আবার এ কথাও মনে হইতেছিল—সবটা এঁরা ঠিক বুঝতে পারেন নি।

বাবার ব্যক্তিগত জীবনকেও আলোচনার মধ্যে ধরতে হবে। এঁরা যা বলছেন বাবা তার চেয়েও অনেক বড়ো। যাক, একজন সাহিত্যিকের যথার্থ মূল্যায়ন হতে তো সময় লাগেই—

তবে এ কথা সে বুঝিল যে, বাংলা সাহিত্যের জগতে তাহার বাবার আসন পাকা হইয়া গিয়াছে। আলোচনা হয়তো অনেক হইবে, কিন্তু তাহার বাবার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন তুলিবে না।

সভা শেষ হইলে লেখকেরা অনেকেই আসিয়া হৈমন্তীর সঙ্গে আলাপ করিলেন। দ্বিজেনবাবু বলিলেন—বৌদি, একটা কথা আপনাকে বলব ভাবছিলাম। আজ দেখা হয়ে ভালো হল। আপনি অপূর্ববাবুর একটা স্মৃতিকথা লিখুন না, সমালোচনা বা মূল্যায়ন নয়, কীভাবে আপনাদের পরিচয়, জীবনের ছোট ছোট ঘটনা—এই আর কী। অনেক খদ্দের কাউন্টারে জিজ্ঞাসা করে—অপূর্বকুমার রায়ের কোনো জীবনী পাওয়া যায় না? বাজার তৈরি আছে বৌদি, আপনি লিখুন—

হৈমন্তী বলিল—আমি কি পারব ঠাকুরপো? উনি অনেক বড়ো মানুষ ছিলেন—

—আপনিই পারবেন, আর কেউ এ কাজ পারবে না। পাঠক অধ্যাপকের তাত্ত্বিক আলোচনা চায় না, মানুষটার জীবনের গল্প জানতে চায়। সে আর আপনি ছাড়া কে পারবে?

অপুর জীবনী হৈমন্তী এমনিতেই একখানা লিখিতেছিল, এইবার উৎসাহ পাইয়া দ্রুত শেষ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আগে সে গল্প-কবিতা লিখিয়াছে, লিখিয়া উপার্জনও করিয়াছে, কিন্তু নিজের সহজ বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া সে বুঝিতে পারিল এইবার কাজ অনেক কঠিন। যাহার জীবনকাহিনী সে লিখিতে বসিয়াছে তাহার কথা সম্ভবত আগামী অনেক শতাব্দী মনে রাখিবে। কিন্তু বাদ দিলে চলিবে না। যতই তুচ্ছ হোক, সবকিছু লিখিয়া রাখিতে হইবে। তাহার চাইতে ভালো করিয়া তাহার স্বামীকে কেহ চেনে না, একদিন হয়তো তাহার লেখা হইতেই গবেষকরা উপাদান সংগ্রহ করিবে।

সাদা পটভূমিতে হালকা জলরঙের কাজ যেমন একটু একটু করিয়া শিল্পীর তুলির স্পর্শে ফুটিয়া ওঠে, তেমনি হৈমন্তীর কলমে মূর্ত হইয়া উঠিল পেছনে ফেলিয়া আসা বাসন্তী দুপুর, দিনের কাজের ফাঁকে অকারণ চকিত চাহনি, ঘন বর্ষার দিনে জানালার পাশে চেয়ার পাতিয়া কবিতা পড়া, গান গাওয়া। লিখিতে লিখিতে মনে পড়িয়া গেল স্বামীর পাশে ঘুম ভাঙিয়া জানালার পাশে ছোট রাধাচূড়া গাছটার দিকে তাকাইয়া থাকিবার কথা। সূর্য ওঠে নাই, মেঘলা আকাশের পটে লাল ফুলের গুচ্ছ। তাকাইয়া থাকিতে থাকিতেই একটা টুনটুনি পাখি আসিয়া গাছের ডালে বসিয়াছিল। জানালার তিন হাতের মধ্যে গাছটা। অত কাছ হইতে সে আর কখনও টুনটুনি দেখে নাই। অসম্ভব রকমের ছোট আর ক্ষিপ্র পাখিটা। সকালবেলা জাগিয়া উঠিবার আনন্দে কী কবিবে ভাবিয়া পাইতেছে না।

কত—কতদিন হইয়া গেল তারপর। সে পাখি আর বাঁচিয়া নাই।

পথের ধারে ফুটিয়া থাকা হলুদ রঙের বুনোফুল তুলিয়া স্বামী তাহার চুলে পরাইয়া দিয়াছিল। পর্বতসানুর অরণ্যে জ্যোৎস্নারাত্রে দাঁড়াইয়া তাহাকে বলিযাছিল—শক্তিমতী হও, এই বিশ্ব, এই প্রকৃতির প্রসাদ তোমার অন্তরে নেমে আসুক। স্রষ্টাকে জানো, আদিত্যবর্ণ সেই পুরুষকে, অন্ধকারের পরপাবে যাঁর স্থিতি, ত্বমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি—

প্রতিদিনের আপাততুচ্ছতা দিয়া তৈরি জীবনের মহৎ স্থাপত্যের কথা সে বলিয়া যাইবে।

খুব জেদের সঙ্গে কোনো কাজ করিবার সময় মানুষ নিজেকে ভুলিয়া তাহা করে। হৈমন্তী অপুর জীবনী সেই জেদ লইয়া লিখিতেছিল। লেখা শেষ হইতে কাজল যেদিন পাণ্ডুলিপি দ্বিজেনবাবুর কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল, তাহার দিন সাতেক পরেই হৈমন্তী গুরুতর অসুখে পড়িল। আগে হইতেই তাহার শরীর ভালো যাইতেছিল না, কেবল মনের জোরে সে আসন্ন অসুস্থতাকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। এবার সে শয্যা নিল। ক্ষুধা নাই, শরীরে শক্তি নাই, চোখে কেমন একটা উদাসীন নিস্পৃহ দৃষ্টি। কলিকাতা হইতে বড়ো ডাক্তার আসিয়াও দেখিলেন। বিশেষ কিছু উপকার হইল না। ডাক্তারকে কাজল জিজ্ঞাসা করিল—কেমন বুঝছেন ডাক্তারবাবু? কী হয়েছে মায়ের?

চিকিৎসক বলিলেন—ইন ফ্যাক্ট, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। ওঁর শরীরের যন্ত্রপাতি সবই ঠিকঠাক ফাংশান করছে। প্রেশার নেই, ব্লাড সুগার নেই, হার্ট এই বয়েসের তুলনায় মোটামুটি ভালো। আসলে আমার মনে হয় ওঁর বাঁচার ইচ্ছেটাই যেন কমে গিয়েছে। এ রকম হয়। ইনভলভ্‌মেন্ট নেই, কিছুর সঙ্গে উনি আর তেমন যোগাযোগ অনুভব করছেন না—

—এর চিকিৎসা কী? কিছু নিশ্চয় করার আছে?

—পেসেন্টকে আনন্দে রাখুন, কাছে বসে গল্পগুজব করুন। আমি একটা বলকারক ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি, তাতে হয়তো কিছুটা কাজ হবে। অবশ্য আপনি আরও সিনিয়র কারও মত নিতেই পারেন—

বাহিরে আসিয়া কাজল বলিল—ডাক্তারবাবু, আপনার দক্ষিণা কত ঠিক জানি না। একটু যদি—

ডাক্তার বলিলেন—দক্ষিণা দিতে হবে না। আপনার বাবা আমাদের দেশের গর্ব। অপূর্ব রায়েব স্ত্রীর চিকিৎসা করে পয়সা নিতে পারব না। যে যাই বলুক, ডাক্তাররা একেবারে চামার নয়—

কাজলের চোখে জল আসিল। কত শ্রদ্ধা করে মানুষ তাহার বাবাকে! ধরা গলায় সে বলিল—ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু, অনেক ধন্যবাদ—

ঘরে আসিয়া সে হৈমন্তীর পাশে বসিল। বলিল—মা, ডাক্তাববাবু তো বললেন তোমার কোনো অসুখই নেই। একটু দুর্বলতা আছে, তার জন্য ওষুধ দিয়েছেন, সেটা খেলে দুর্বলতা কেটে যাবে। এবার মনে জোর এনে উঠে পড় দেখি. আমাদেব আর চিন্তায় রেখো না—

হৈমন্তী ম্লানভাবে হাসিল। ছেলের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—তুই কিন্তু বড়ো বোগা হয়ে যাচ্ছিস—

কাজল বলিল—মা না দেখলে ছেলে তো রোগা হবেই।

হৈমন্তী বলিল—তা কেন, মা কি কারও চিরদিন থাকে? কেমন লক্ষ্মীর মতো বৌমা এসেছে, বৌমার হাতে সব ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি—

—সে ছেলেমানুষ। তোমাকেই সব আবার বুঝে নিতে হবে। আমি বুঝতে পেবেছি, তোমার হচ্ছে আমার আর বৌমার ঘাড়ে কাজ চাপিয়ে দেবার ফন্দি। ওসব চলবে না, চটপট সেরে ওঠো—

হৈমন্তী কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া তাকাইয়া থাকিল।

মায়ের বইখানা তাড়াতাড়ি প্রকাশ কবিবার জন্য কাজল খুব খাটিতে লাগিল। প্রায়দিনই বিকালে দ্বিজেনবাবুর দোকানে গিয়া প্রুফ দেখিয়া দেয়, প্রচ্ছদ সম্বন্ধে পরামর্শ করে। ছবি থাকিবে কী না সে বিষয়ে আলোচনা হয়।

সে ডাক্তার নয়, চিকিৎসাশাস্ত্রের কিছু বোঝেও না। কিন্তু মায়ের চোখের দিকে তাকাইয়া সে বুঝিতে পারিয়াছে মা আর বাঁচিবে না। সংসার হইতে মায়ের মন উঠিয়া গিয়াছে। বড়ো সাধের বই মায়ের, বইখানা যেন মা দেখিয়া যাইতে পারে—

বইখানা যেদিন প্রকাশ হইবার কথা সেদিন কাজল স্কুল কামাই করিয়া প্রায় সকাল হইতে দ্বিজেনবাবুর দোকানে গিয়া বসিয়া থাকিল। বেলা একটা কী দেড়টা নাগাদ দপ্তরীখানা হইতে প্রথম লট্‌ বাঁধাইয়া আসিল। দপ্তরীর লোক ঝাঁকাটা মাথা হইতে নামাইয়া রাখিতেই দ্বিজেনবাবু এককপি বই হাতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—বাঃ, বেশ হয়েছে। নাও, দেখ—

প্রখ্যাত এক শিল্পীর আঁকা অপুর ছবি দিয়া কভার হইয়াছে। বিস্কুট রঙের জমির ওপর গাঢ় খয়েরি রঙ দিয়া আঁকা রেখাচিত্র। বেশ হইয়াছে বই।

পাঁচকপি বই লইয়া বিকালে কাজল বাড়ি ফিরিল। তাহার অপেক্ষায় তুলি বারান্দায় বসিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কী হল? বেরিয়েছে বই? কই, দেখি—

তাহার পর দুইজনে হৈমন্তীর ঘরে গিয়া তাহার বিছানার পাশে দাঁড়াইল। কাজল বলিল—মা, এই দেখ, তোমার লেখা বই বেরিয়েছে। দেখ—

হৈমন্তী বইখানা হাতে লইল। কাজল গিয়া ঘরের আলো জ্বালিয়া দিল। তুলি একটু আগে ঘরে ধূপকাঠি জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে। মা চন্দন ধূপ ভালোবাসে। ঘরের বাতাসে চন্দনের মৃদু সৌরভ।

হৈমন্তী বইয়ের প্রচ্ছদের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিল। তারপর বই খুলিয়া উৎসর্গপত্রটা ভালো করিয়া পড়িল। জীবনের প্রথম এবং সম্ভবত শেষ বইখানি সে স্বামীকে উৎসর্গ করিয়াছে। যাহার জীবনী তাহাকেই।

বই মুড়িয়া বালিশের পাশে রাখিয়া হৈমন্তী বলিল—সুন্দর বই হয়েছে। মলাটে তোর বাবার ছবি কে এঁকেছে রে? আমার নাম করে বলিস—ছবি ঠিকঠাক আঁকা হয়েছে। বৌমা, ওকে কিছু খেতে দাও। সেই সকালে খেয়ে বেরিয়েছে—

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ

বিসর্জনের বাজনা বাজিতে শুরু করিয়াছে, কাজল জানে। জন্মের পরে উজ্জ্বলভাবে বহুদিন জ্বলিয়া একটা নক্ষত্র যেমন ক্রমে ম্লান আর হলুদ হইয়া আসে, তেমনি মানুষের জীবনও। স্রোতে এবার ভাঁটার টান। সবাই মিলিয়া আনন্দ করিয়া বাঁচিবার দিনগুলি ফুরাইয়া আসিল। এখনও আনন্দ থাকিবে, জীবন থাকিবে, চারদিকে পৃথিবী তেমন করিয়াই চলিতে থাকিবে, কিন্তু তেমন করিয়া আর সকাল হইবে না, কী যেন একটা থাকিবে না। মা চলিয়া গেলে তাহার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্ব শেষ হইয়া যাইবে। কে আর বাবার গল্প শোনাইবে, কালো মেঘ ঘনাইলে দেখিবার জন্য ডাকিয়া আকুল হইবে।

পৃথিবী কত বদলাইয়া গেল। এমন সে কখনও দেখে নাই। মানুষ হাসে কম, ভালোবাসে কম। হাসিলে তাহার অনেকরকম অর্থ হয়, ভালোবাসিলে তাহার পেছনে অনেক কারণ থাকে। কাহারও আড্ডা দিবার সময় নাই, দু দণ্ড শান্ত হইয়া বসিয়া মানবিক গল্প করিবার সময় নাই। প্রত্যেকে আখের গুছাইবার জন্য ব্যস্ত। প্রত্যেকেই টাকা জমাইতেছে, বাড়ি করিতেছে, ছেলেকে ডাক্তার আর ইঞ্জিনীয়ার করিতেছে। এমনভাবে আর কিছুদিন চলিলে দেশে আর শিক্ষক, কবি, দার্শনিক কিংবা শিল্পী থাকিবে না। একটা জাতি একেবারে মরিয়া যাইবে।

তাহার সন্তানদের সে এ কোথায় আনিল? এ কোন উপলব্ধিহীন, মননহীন, অসুস্থ ঘোলাটে আলোয় স্তিমিত পৃথিবীতে সে তাহাদের রাখিয়া যাইবে?

পিতার কর্তব্য সন্তানকে প্রকৃত আনন্দ লাভ কবিবার পথের সন্ধান দিয়া যাওয়া। যুগ যতই পরিবর্তিত হোক, শৈশবে পিতামাতার কাছ হইতে লাভ কবা শিক্ষা বুকের মধ্যে থাকিযা যাইবে। ছোট ছেলে এখনও খুবই ছোট, কাজল সপ্তর্ষিকে মনের মতো করিয়া গড়িবার চেষ্টায লাগিয়া পড়িল।

সকালবেলা সে ছেলেকে লইয়া শিশিরভেজা ঘাসের ওপর হাঁটে, উবু হইয়া বসিয়া ঘাসফুল দেখায়। নিজের ছোটবেলার গল্প শোনায়, ঠাকুরদার কথা বলে। মাঝে মাঝে ছেলে আর হাঁটিতে চায না, দুই হাঁত উঁচু করিয়া বাবার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কাজল তখন ছেলেকে কোলে নেয়। সপ্তর্ষি বাবার গালে গাল ঠেকাইয়া অবাক চোখে সব কিছু দেখে। ওই একটা পাখি আসিয়া গাছেব ডালে বসিল। ওই একটা বাছুর কোথা হইতে আসিয়া মাঠের মধ্যে খুব খানিকটা দৌড়াইয়া বেড়াইল। বাবার বুকের গরমে থাকা কী আরামের। বাবা কী একটা গান গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতেছে। বেশ সুন্দর গানটা।

তুলি তাহার জীবনকে ধন্য করিয়াছে। সুন্দরী স্ত্রী অনেকেরই থাকে, সুন্দর স্বভাবের মেয়েও পৃথিবীতে বিরল নয়। কিন্তু তুলি অনন্যা, জগতে একমাত্র। জীবন সুন্দর, কারণ সে জীবনে তুলি আছে।

কেন যেন ফেলিয়া আসা দিনগুলির কথা মনে পড়ে, অনেকদিন যাহাদের দেখে নাই তাহাদের কথা মনে পড়ে। ভবঘুরে মামা প্রণব কোথায় চলিয়া গিয়াছে কে জানে। রামদাস কাকা বোধহয় আর বাঁচিয়া নাই, বাঁচিয়া থাকিলে একবার অবশ্যই আসিত। ব্যোমকেশ নিজের গ্রামে বিবাহ করিয়া শেকড় গাড়িয়া বসিয়াছে। মা অসুস্থ, খুবই অসুস্থ। হয়তো আর উঠিবে না। থাকিবার মধ্যে আছে আকাশ, বাতাস, প্রান্তর, গাছপালা। অনেকদিন আখের আলির খবর লওয়া হয় নাই। কেমন আছে মানুষটা? একবার গেলে মন্দ হয় না।

সেই বাঁশবন, বরতি বিল, দিগন্তস্পর্শী প্রান্তর—সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে বাঁশবনের মাথা হইতে আকাশে শয়তান উড়িয়া যায়, তাহাদের মুখ দিয়া আগুনের শিখা বাহির হয়, আখের আলি গল্প করিয়াছিল। কেমন আছে আখেরের বৌ রাবেয়া? এতদিন কেন তাহাদের কথা মনে পড়ে নাই? কিন্তু মনে পড়িতেই বুঝিতে পারিল ওই মুক্ত প্রকৃতির প্রসারেই তাহার অস্তিত্বের আসল সার্থকতা লুকাইয়া আছে। খ্যাতিতে বা অর্থে নয়, সভা-সমিতি কিংবা সামাজিক প্রতিষ্ঠায় নয়। মাঠের পারে অলৌকিক সূর্যাস্তের সৌন্দর্যে মহাজীবনের যে সংবাদ আলোর সংকেতে ফুটিয়া ওঠে, সঠিকভাবে তাহা পাঠ করিতে পারার আনন্দই জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ।

বাতাসে মাটির গন্ধ বহিয়া আসে। শুষ্ক খড়ের গন্ধ, জলের শব্দ, পাখির ডাক। মাঝখানের দশ-বারোটা বছর মুছিয়া যায়, আশা-আকাঙ্খায় উদগ্রীব অল্প বয়সের জীবনটা আবার ফিরিয়া আসে। অনেক দেরি হইয়াছে, আর নয়। কালই সে যাইবে, ছেলেকে লইয়া।

পরের দিন দুপুর গড়াইয়া গেলে কাজল ছেলেকে লইয়া বাহির হইল। রাস্তায় বেশ লোকের ভিড়, অনেক গাড়িঘোড়া চলিতেছে। আজকাল সারাদিনই বহু লোক বিভিন্ন কাজে কোথা হইতে কোথায় যাতায়াত করে। এত ব্যস্ততা কীসের? কাহারও এতটুকু সময় নাই। সকলেই জীবনযাত্রার মান আর একটু বাড়াইয়া লইবার জন্য দিশাহীন ছুট লাগাইয়াছে। ডায়োজিনিসের কথা মনে পড়ে। সামান্য ডালসিদ্ধ খাইয়া সারাদিন পড়াশুনা করিতেন। শিষ্যদেব উপদেশ দিতেন। স্টোইক দর্শনের মূল কথাটাই মানুষ ভুলিয়া গেল। বিশাল বাড়ি, দামি পোশাক, সুখাদ্যের দীর্ঘ তালিকা, ক্ষমতার মাদকতা—সব হইতেছে, কিন্তু জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা কীসে পূর্ণ হইবে?

বাবার সঙ্গে বাহির হইতে পাইয়া সপ্তর্ষি খুব খুশি। সে বলিল—আমরা কোথায় যাব বাবা?

—চল না, দেখবি এখন। আমার অল্পবয়েসে যেখানে বেড়াতে যেতাম, সেখানে নিয়ে যাব। দেখবি কত পাখি, বড়ো বড়ো মাঠ, বাঁশবন। তুই ফিঙে পাখি দেখেছিস? মাছরাঙা?

—হুঁউ-উ। মা চিনিয়ে দিয়েছে। যেখানে যাচ্ছি সেখানে ফিঙে আছে?

—আছে তো। তালচড়াই আছে, দোয়েল ছাতারে বসন্তবৌরি আছে—

সপ্তর্ষি বলিল—প্যাঁচা নেই?

—তাও আছে। তবে প্যাঁচা তো দিনে বেরোয় না। ফেরার সময় সন্ধে হয়ে গেলে দেখা যাবে হয়তো। তুই প্যাঁচা দেখেছিস?

—হুঁ। মা দেখিয়েছে।

—মা! তোর মা প্যাঁচা পেল কোথায়?

—ছবির বইতে। দু রকম প্যাঁচা আছে, ভুতুম প্যাঁচা আর লক্ষ্মী প্যাঁচা।

—আচ্ছা দেখি, আজ তোকে জ্যান্ত প্যাঁচা দেখানো যায় কী না।

প্রথম বাসটায় বড়ো ভিড়। ছেলের কষ্ট হইবে ভাবিয়া সেটা ছাড়িয়া দিল। পরের বাস আসিল মিনিট দশেক পরেই। এটায় তত ভিড় নাই। এমন কী উঠিবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দু জন লোক নামিয়া যাওয়ায় কাজল ছেলেকে লইয়া বসিবার জায়গাও পাইয়া গেল।

অনেক, অনেকদিন পরে আবার সে এই পথে বেড়াইতে যাইতেছে। প্রথম যৌবনের সেই আশ্চর্য জীবনানুভূতি, রৌদ্রভরা দুপুর, সামনে বিস্তৃত না-দেখা সমগ্র জীবনটা, সমস্ত আবার

মনে পড়িয়া যায়। ছেলেকে সে এই বিস্তারের মধ্যে মুক্তি দিয়া যাইবে। এইভাবেই উত্তরাধিকারের হস্তান্তর।

বাসের দরজায় দাঁড়ানো সহিসটা হাঁকিল—মোহনপুর, মোহনপুর মোড়!

কাজল বলিল—খোকা, এরপরেই আমরা নামব। চল, এগুই—

পরের স্টপেই সহিস চেঁচাইল—কাঁঠালিয়া! কাঁঠালিয়া!

নামিতে গিয়া কাজল অবাক হইয়া থামিয়া গেল।

কাঁঠালিয়া গ্রামটা কোথায় গেল? মাঠ, বাঁশবন আর ধানক্ষেত? এ তো দেখা যাইতেছে চারদিকেই নিবিড় বসতি, গায়ে গায়ে লাগা বাড়ি, ইটের পয়েন্টিং করা বাঁধানো রাস্তা পাড়ার মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে। রীতিমত শহর জমিয়া উঠিবার উপক্রম। একজন আধুনিক চেহারার যুবক আবার একটা বিলাতি কুকুর চেনে বাঁধিয়া বেড়াইতেছে। কলিকাতা হইতে আর বাকি কী?

পেছন হইতে কে বলিল—দাদা, না নামলে সরে দাঁড়ান, দরজা আটকাবেন না—

ছেলেকে লইয়া কাজল সরিয়া আসিল।

সপ্তর্ষি বলিল—নামলে না যে বাবা?

—হ্যাঁ, ইয়ে—আমরা একটু গাছপালা আছে এমন জায়গায় নামব। এখানে খালি বাড়িঘর—

—তুমি যে বলেছিলে কাঁঠালিয়ায় গাছপালা আর মাঠ আছে?

কাজল ইতস্তত করিয়া বলিল—ছিল তো। একটু এগিয়ে পাওয়া যাবে এখন। দেখা যাক—

পরের দুইটা স্টপেও নামা গেল না। শিউলি, তেলিনিপাড়া চলিয়া গেল। কোথায় নামিবে সে? সভ্যতার অগ্রগতির প্রতীক হিসাবে জনপদ প্রসারিত হইয়াছে। এখানে বসিবার মতো ঘাস নাই, দেখিবার মতো দিগন্ত নাই, ভাবিবার মতো সময় নাই। পুত্রকে লইয়া সে এখন কোথায় যায়?

দেবপুকুরে গিয়া কাজল বাস হইতে নামিল। এখানে রাস্তার ধারে এখনও মাঠ, ঝোপজঙ্গল। দেবপুকুরে সে আগেও আসিয়াছে। তখন এসব জায়গা অজ পাড়াগাঁ ছিল। এখন দুই-একটা বাড়ি উঠিতে শুরু করিয়াছে। এখানেও শহর গ্রামকে স্পর্শ করিল বলিয়া। কাজল মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিল—ভালোই তো, দেশের উন্নতি হইতেছে, ভালোই তো। কিন্তু মনের নিভৃতে গোপন কান্না বাজিতে থাকে। পরিচিত, প্রিয় সবকিছু হারাইবার কান্না।

তাহার হাত ছাড়াইয়া সপ্তর্ষি মাঠের মধ্যে দৌড়াইয়া বেড়াইতেছে। পড়ন্ত রৌদ্রে পৃথিবী মায়াময়। সে আর কিছু চায় না, শুধু এই পৃথিবীর মাটিতে মাটি হইয়া মিশিয়া থাকিতে চায়। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়া দূরে তাকাইয়া দেখিতে চায় কীভাবে সন্ধ্যা নামে, আকাশে প্রথম তারাটি ফুটিয়া ওঠে, পাখির ডানায় দিনের আলো মুছিয়া যায়। মাটিতে কান পাতিয়া সে চলমান জগতের স্পন্দন শুনিতে চায়।

তারপর একদিন আসিবে, আসিবেই, যখন সে এই মাটিতে, আলো আর বাতাসে নিঃশেষে মিশিয়া যাইবে। আর সে ঘুম হইতে উঠিবে না, কুলের অম্বল দিয়া ভাত মাখিয়া খাইবে না, প্রিয় বইয়ের সন্ধানে পুরোনো বইয়ের দোকানে ঘুরিয়া বেড়াইবে না।

অনেক বই না-পড়া থাকিয়া যাইবে, অনেক লেখা বাকি থাকিবে।

তবু সে তো চেষ্টা করিল। সে ফাঁকি দেয় নাই, নিজের বিশ্বাসের কথা, মানুষকে ভালোবাসিবার কথা, ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি কণার মধ্য দিয়া বহমান বিশ্বসংগীতের কথা লিখিয়াছে। মানুষ নেয় ভালো, নহিলে সে আর কী করিবে?

আলের পথ দিয়া একজন হাঁটিয়া আসিতেছিল। সাধারণ গ্রামের মানুষ। কাজলকে দেখিয়া সে বলিল—বাবু কী করছেন এখানে? জমি কিনবেন নাকি?

—না, এমনি একটু ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে এসেছি—

—ও, ওই যে খোকাটা, ওটা বুঝি আপনার?

—হ্যাঁ ভাই। আচ্ছা, আমি জমি কিনতে এসেছি মনে হল কেন তোমার? জমি বিক্রি হচ্ছে বুঝি খুব?

লোকটি সোৎসাহে বলিল—নয় তো কী! আর একবছরের মধ্যে এতটুকু জমি আর পড়ে থাকবে না বাবু। দেখেছেন তো কাঁঠালিয়া মোহনপুরের অবস্থা? সব বিক্কিরি হয়ে গেল বলে। রোজ দলে দলে লোক আসছে—

আঞ্চলিক উন্নতিতে তৃপ্ত মানুষটি আলপথ ধরিয়া চলিয়া গেল।

সারাটা বিকেল ছেলের সঙ্গে মাঠে মাঠে খেলিয়া বেড়াইল কাজল। দেখিল শেয়ালকাঁটার ফুলে হলুদ প্রজাপতি আসিয়া বসিতেছে। ঘাসের ডগা হইতে উড়িয়া যাইতেছে ফড়িং।

যখন আলো কমিয়া আসিল, সন্ধ্যা নামিবার উপক্রম হইল, কাজল ছেলেকে ডাকিয়া বলিল—চলো বাবা, এইবার বাড়ি যাই—

নক্ষত্রভরা আকাশের নিচে ছেলের হাত ধরিয়া বাসরাস্তার দিকে হাঁটিয়া ফিরিতে ফিরিতে কাজল বলিল—বাবাই, তোকে একটা কথা বলব। এখন হয়তো যা বলব তার মানে বুঝতে পারবি না, কিন্তু ভালো করে শুনে রাখ। বড়ো হয়ে তোকে একটা কাজ করতে হবে—

সপ্তর্ষি বাবার গলার স্বরে অবাক হইয়া বলিল—কী বাবা?

কাজল হাঁটু গাড়িয়া ছেলের সামনে বসিল, ছেলের দুই কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল—তোর ঠাকুরদা বই লিখতেন জানিস তো?

—হুঁ। দাদু লেখক ছিলেন।

—হ্যাঁ বাবা! দাদুর প্রথম বইটার দ্বিতীয় পর্ব আমি লিখেছি। দাদু যেখানে শেষ করেছিলেন সেখান থেকে আমি শুরু করেছিলাম। এটা আমাদের পরিবারের গল্প, মানুষের গল্প। এই বইখানার তিন নম্বর পর্ব তুই লিখবি। কেমন? আমি যেখানে শেষ করেছি সেখান থেকে ধরবি। মনে থাকবে?

—তুমি লিখবে না?

—না বাবাই, আমায় একজায়গায় যেতে হবে যে—

—কবে ফিরবে?

ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধবিয়া কাজল বলিল—ফিরব। তোর ছেলে হয়ে ফিবব।

সপ্তর্ষি সবটা বুঝিল না। কিন্তু বাবা ফিরিবে শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইল। বলিল—আমি লিখব বাবা। তোমার মতো, ঠাকুরদার মতো।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তোমার কলমটা আমাকে দিয়ে যেয়ো।

—ঃ অপুর সংসার সমগ্র সমাপ্ত ঃ—